বৈজ্ঞানিক পরিভাষা।

[illegible]

গ্রন্থাগার

– ২০৮

HINDUISM

Scientific, Philosophic and Theo[illegible]

Part I. solves the Problems of Existence.
Part II. explains the Doctrines of Hinduism.
Part III. explains its Social Customs.

BY

Srinath Ghosh, M. B.

[illegible]ate Medical [illegible]dvisor to H. H. The Maharaja of Panna.

বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম্ম

[illegible] নের মতে
হিন্দুধর্ম্মের কালোচিত ব্যাখ্যান।

প্রথম ভাগে—জীবনের কূট প্রশ্ন মীমাংসা।
দ্বিতীয় ভাগে—হিন্দুধর্ম্মের মতামত।
তৃতীয় ভাগে ইহার রীতিনীতি।

শ্রীশ্রীনাথ ঘোষ, এম্, বি

পান্নাধিপতির ভূতপূর্ব্ব ডাক্তার কর্তৃক বিরচিত।

কাহং মন্দমতিঃ কেদং মন্থনং ক্ষীরবারিধেঃ
কিং তত্র পরমাণুর্ব্বৈ যন্মজ্জতি মন্দরঃ।
(শ্রীধরস্বামী)

দ্বিতীয় সংস্করণ

সাল ১৩[illegible]

প্রিণ্টার—শ্রীভূতনাথ সরকার।
ভিক্টোরিয়া প্রেস।
২১এ মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা।



স্বামী বিবেকানন্দ।

উৎসর্গ পত্র।

পূজ্যপাদ বিবেকানন্দ স্বামি-জি! যেমন জগৎগুরু শঙ্করাচার্য্যদেব এক সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের খণ্ডন করিয়া ভারতের অশেষ মঙ্গল সাধন করেন, আপনিও সেইরূপ এই বিংশ শতাব্দীতে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া সুশিক্ষিত সম্প্রদায়কে স্বধর্ম্মে আস্থাবান করিয়া যান। যেদিন চিকাগো সহরের ধর্ম্মমণ্ডপে আপনি ইংরাজি ভাষায় বজ্রনির্ঘোষে বেদান্তধর্ম্মের সারতত্ত্ব ব্যক্ত করাতে পাশ্চাত্য জগতের মহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ আপনার কণ্ঠে জয়মালা অর্পণ করিয়া আপনাকে সুসম্মানিত করেন, সেইদিন হইতে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত আপনার যশঃসৌরভ বিস্তৃত হইয়াছে এবং দেশের সুশিক্ষিত সম্প্রদায় দলে দলে আপনার গুরুজীর মিসনে সাগ্রহে যোগদান করিতেছেন। সত্যবটে, আপনার অকালমৃত্যুতে ভারতগগন হইতে একটি উজ্জ্বলতম নক্ষত্র খসিয়াছে এবং দেশের প্রভূত অনিষ্টসাধন হইয়াছে, তথাচ চিরদিন অনেকে আপনার সুগ্রন্থাদি পাঠ করিয়া হিন্দুধর্ম্মে নিষ্ঠাবান্ হইবে। এই অজ্ঞাতনামা অশিক্ষিত গ্রন্থকারও আপনার গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া হিন্দুধর্ম্মসম্বন্ধে নানা তথ্য শিক্ষা করিয়াছেন এবং চিরদিন আপনাকে গুরুদেব বলিয়া ভক্তি করিবেন। আপনারই মহৎ পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ইনিও সনাতন ধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক মাহাত্ম্য, বিশেষতঃ পৌরাণিক ধর্ম্মের সারমর্ম্ম উদ্ঘাটন করিতে সাধ্যমত চেষ্টা পাইয়াছেন। সেজন্য এই সামান্য অকিঞ্চিৎকর পুস্তকখানি আপনার করপল্লবে প্রীতিপুষ্পাঞ্জলিস্বরূপ উৎসর্গ করিলাম। আশা করি, যে দেবলোকে গিয়া আপনি মহীয়ান হইয়াছেন, সেখান হইতে এই পুস্তকের প্রতি কিঞ্চিৎ কৃপাকটাক্ষপাত করিবেন, যাহাতে দেশের লোক ইহার কিঞ্চিৎ মর্ম্ম বুঝিয়া স্বধর্ম্মে আরও অধিক আস্থাবান্ হইতে পারে।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

প্রথম সংস্করণে পুস্তকের নানাস্থল কঠিন ও দুর্ব্বোধ্য ছিল। আবার রচনা ও মুদ্রাঙ্কন সম্বন্ধে নানা ভুলচুক হইয়াছিল, এজন্য অনেকে ইহার যথার্থ ভাব ও মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। এবারে ভাল করিয়া লিখিয়া অমূল পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিলাম। এ সংস্করণে সমগ্র পুস্তকখানি যথা-সম্ভব আরও সহজ, প্রাঞ্জল ও কালোচিত করিতে সবিশেষ চেষ্টা পাইলাম। আশা করি, সহৃদয় পাঠকমাত্রেই গ্রন্থকারের ভুলচুক মার্জ্জনা করিয়া সমগ্র পুস্তকখানি মনোযোগের সহিত আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া এবারে অধিক আনন্দ ও সুফল পাইবেন।

প্রথম সংস্করণের উপর সমালোচনা।

EDITORIAL NOTES.

Indian Mirror,

26th October 1904.

Babu Shrinath Ghosh M. B. has brought out a remarkable book in Bengalce in three pretty big volumes under the title Biagnanic Hindoo Dharma or HindooismScientifically explained. One can not help being struck with the industry of the author and the vast erudition he has brought to bear upon the happy treatment of his subject. The work purports to explain in the light of modern scientific researches the true philosophy of the Hindoo Religion and the various rites, ceremonies and beliefs, which appear to the uninitiated as mere superstitious and meaning-less formalities. We are really surprised and glad to find that the author has been ablo to successfully grasp the fundamental principles of the Hindoo Religion and the Hindoo Philosophy and explain them to the readers in a clear and lucid language. The careful perusal of the book is sure to dissipate many doubts and questions which well up from within and give the reader a magnificient view of the Hindoo Religion and Hindoo Philoso-phy. we commend the book to the attention of all Hindoos who feel interested in the study of their Religion and Philosophy. The first 2 volumes deal with the principles of Hindoo Religion and Philosophy and the third with the Hindoo Social structure.

বঙ্গানুবাদ।

শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ ঘোষ এম, বি বাঙ্গালা ভাষায় একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা অনতিবৃহৎ তিন ভাগে বিভক্ত ও সম্পূর্ণ এবং ইহার নাম "বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম্ম" বা বিজ্ঞানের মতে হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যান। যিনি এ পুস্তক পাঠ করিবেন, তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন, গ্রন্থকার গ্রন্থ রচনায় কিরূপ প্রগাঢ় পরিশ্রম করিয়াছেন এবং প্রবন্ধগুলির সুলেখনে কিরূপ অগাধ পাণ্ডিত্য ও গবেষণা দেখাইয়াছেন। হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম কি এবং ইহার যাবতীয় পূজাপদ্ধতি, অনুষ্ঠান ও মতামত, যাহা অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর নিকট যৎ সামান্য কুসংস্কার ও অর্থশূন্য বৃথা আড়ম্বর বলিয়া সাধারণতঃ বিবেচিত হইয়া থাকে, উহাদের প্রকৃত মর্ম্ম কি, তিনি তাহাই নিজ গ্রন্থে বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত মহৎ মহৎ সত্যের সাহায্যে ব্যাখ্যান করিয়াছেন। যথার্থ বলিতে কি, আমরা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত ও আনন্দিত হইলাম, যে হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুদর্শনের মৌলিক তত্ত্বগুলি, যাহা সচরাচর অনেকে বুঝিতে পারেন না, তিনি অনুচিন্তনবলে উহাদের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইয়াছেন এবং পাঠকবর্গের নিকট সরল ও সুললিত ভাষায় উহাদের ব্যাখ্যান করিয়াছেন। যিনি এই পুস্তক মনোযোগের সহিত পাঠ করিবেন, হিন্দুধর্ম্মসম্বন্ধে সচরাচর যে সকল সন্দেহ ও প্রশ্ন উত্থিত হইয়া থাকে, সে সকল তাঁহার মন হইতে স্বতঃ দূরীভূত হইবে এবং হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুদর্শনসংক্রান্ত একটী অপূর্ব্ব মনোরম দৃশ্য তাঁহার মানসপটে উদিত হইবে। যাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুদর্শন সম্বন্ধে পুস্তক পাঠ করিয়া উহাদের নিগূঢ় তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে আমরা এ পুস্তকখানি মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে বিশেষরূপ অনুরোধ করি। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুদর্শন সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে এবং তৃতীয় ভাগে হিন্দুধর্ম্মের সামাজিক রূপ দেখান হইয়াছে।

From Raja Piary Mohun Muckerjee C. I. E.
To Babu Srinath ghosh M. B.

Dear Sir

On behalf of the commitee of curators I offer you their best thanks for your kind present of a copy of your valuable work to the Utterpara Public Library—

By essaying to establish a concordance between orthodox theocracy on one hand and rational scientific truths on the other, you have laid the reading public of Bengal under obligation and I can very well auger for your book a warm reception as a valuable contribution to the scanty treasures of Bengalee Literature. In India more than any other country religion has played an important part in influencing and colouring life and it is gratifying to find that in the midst of religious earthquakes and wreckages there is at least one man who in demanding a fair share of salvage has succeeded in clutching at the skirts of most of the burning social questions and in tracing their origin to the religious and for that matter transcendal a priori sources, I admire your literary venture as an able advocacy of Hindooism and doubt not it will meet with intelligent appreciation every where,

Yours truly

Utterpara
Dated 5th February 1905.

Piary Mohun Mukerjee

ইহার বঙ্গানুবাদ—

মহাশয়! আপনি আপনার 'বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম্ম' নামক পুস্তকখানি উত্তর-পাড়ার সাধারণ পুস্তকালয়ে উপঢৌকন দিয়াছেন, তজ্জন্য উহার সভ্যদিগের পক্ষ হইতে আমি আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ দিতেছি।

একদিকে হিন্দুধর্ম্মের গোঁড়া কুসংস্কারপূর্ণ মতামত, অপরদিকে বিজ্ঞানের সুযুক্তিপূর্ণ মহাসত্য, উহাদের সমন্বয় করিতে চেষ্টা পাওয়াতে আপনি বঙ্গীয় পাঠকবর্গের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন এবং আশা করি, ভবিষ্যতে সুগ্রন্থবিরল বাঙ্গালা ভাষায় আপনার পুস্তকখানি বহুমূল্য গ্রন্থ বলিয়া সাদরে সর্ব্বত্র গৃহীত হইবে। যে ভারতে অন্যান্য দেশ অপেক্ষা ধর্ম্ম মানবজীবনকে অধিক পরিমাণে অনুশাসিত ও রঞ্জিত করিয়াছে এবং যে ভারতে আজকাল ধর্ম্ম-বিষয়ক মতামত, সদনুষ্ঠান ও রীতিনীতি ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে, সে ভারতে উহাদের মূলে হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুদর্শনের অনুশাসন কতদূর, তাহা দেখাইয়া আপনি অধঃপতিত হিন্দুধর্ম্মের পক্ষ এমন দক্ষতার সহিত সমর্থন করিয়াছেন দেখিয়া আমি আনন্দিত হইলাম এবং আপনার অশেষ প্রশংসা করিতেছি। নিশ্চয় বলিতেছি, বুদ্ধিমান গুণগ্রাহকদিগের মধ্যে আপনার গ্রন্থখানি সাদরে গৃহীত হইবে।

উত্তর পাড়া
৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০৫ } রাজা পিয়ারীমোহন মুখোপাধ্যায়, সি,আই, ই।

ভূমিকা

আজকাল ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য শিক্ষা বহুবিস্তৃত হইতেছে। এই শিক্ষার গুণে ভারত সভ্যতার পথে, উন্নতির পথে, স্বরাজলাভের পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। এখন শিক্ষিত নব্যসম্প্রদায় নবোৎসাহে, নবোদ্যমে ও নবোচ্চাভিলাষে উৎসাহান্বিত হইয়া চিরাগত মোহ-নিদ্রা হইতে ক্রমশঃ জাগরিত হইতেছেন। জাতীয় জীবনে নূতন ধমনীস্পন্দন দেখা দিয়াছে। চতুর্দ্দিকে জাগ, জাগ ও সাজ, সাজ এই রব শুনা যাইতেছে। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন, যে বিদ্যাবলে পাশ্চাত্যজগৎ আজ সুসভ্য ও জ্ঞানজ্যোতিতে উদ্ভাসিত, আমাদের পরম সৌভাগ্য, আমরা আপামর সেই বিদ্যার আস্বাদ পাইতেছি।

যিনি যাহাই বলুন না কেন, সংসারের নিয়ম এই, যাহা একদিকে উৎকৃষ্ট, তাহাই আবার অপরদিকে নিকৃষ্ট; যাহা একদিকে অমৃতোপম, তাহাই অপরদিকে বিষতুল্য। যে পাশ্চাত্য শিক্ষা দ্বারা ভারতের মঙ্গল অশেষরূপে সাধিত হইতেছে ও হইবে, সে শিক্ষা ধর্ম্ম ও নীতিবিবর্জ্জিতা হওয়ায় নানাদিকে নানা কুফল আনয়ন করিতেছে। যে দেশে ধর্ম্মবিষয়ে শিক্ষাই এতকাল প্রধান শিক্ষা ছিল এবং যে দেশে সকল বিষয়ে ধর্ম্মের প্রীতিকর অনুশাসন চিরকাল পূর্ণভাবে চলিয়া আসিতেছে, সে দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা ধর্ম্মবিবর্জ্জিতা হওয়াতে আমরা দিশেহারা হইতেছি এবং কালে প্রকৃত হিন্দুয়ানি ভুলিয়া গিয়া দোয়াঁসলা ফিরিঙ্গ জাতিতে পরিণত হইব।

ইতিমধ্যে এই পাশ্চাত্য শিক্ষার দোষে যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের যত উচ্চ উপাধি প্রাপ্ত হন, তাঁহারা স্বধর্ম্মে তত বীতশ্রদ্ধ হইয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা বিজ্ঞানশাস্ত্র অধিক অলোচনা করেন, তাঁহারা প্রায় নাস্তিক হন; অপরে একেশ্বরবাদী হইয়া স্বধর্ম্মকে অসার পৌত্তলিকতা জ্ঞানে অন্তরের সহিত ঘৃণা করেন। আর অধিকাংশ শিক্ষিত সম্প্রদায় নাপার্য্যমানে দেশাচার মাত্র পালন করিয়া হিন্দু নামে পরিচিত হন। কিন্তু তাঁহারাও পাশ্চাত্যশিক্ষার দোষে স্বধর্ম্মের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস হারাইয়া বসেন। তাঁহারা সনাতন

ধর্ম্মের প্রকৃত মাহাত্ম্য না বুঝিয়া ইহার প্রতি এত বীতশ্রদ্ধ হন। এজন্য হিন্দুসমাজের মঙ্গলার্থে শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়কে স্বধর্ম্মের কিঞ্চিৎ সারতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য এ পুস্তকরচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

পুরাকালের মহর্ষিগণ যোগবলে ও মহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ প্রতিভাবলে যে সনাতন ধর্ম্মের পোষণ ও বর্দ্ধন করিয়া যান, সে ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম উদ্ঘাটন করা মাদৃশ মূর্খ লোকের পক্ষে অর্ব্বাচীনতা মাত্র। কিন্তু সময়গুণে অনেককে কি না করিতে হয়! যিনি নিতান্ত ভীরু ও কাপুরুষ, স্বদেশের স্বাধীনতারক্ষার জন্য তিনিও সশস্ত্রে সংগ্রামক্ষেত্রে বহির্গত হন। হিন্দুধর্ম্মের এই অধঃপতনের দিনে যিনি ধর্ম্মশাস্ত্রে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, তাঁহাকেও লেখনী ধারণ করিয়া "প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাৎ উদ্বাহুরিব বামনঃ" সকলের নিকট হাস্যাস্পদ হইতে হইল।

পুস্তকখানির নাম "বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম্ম" রাখিলাম। যাঁহারা বিজ্ঞান শব্দে কেবল পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞান বুঝিয়া থাকেন, তাঁহারা ইহাতে আপত্তি করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, সংসারে জ্ঞান বা বিজ্ঞান দুই-প্রকার, অধ্যাত্মবিজ্ঞান ও জড়বিজ্ঞান। আজকাল পাশ্চাত্য সভ্যজগতে জড়বিজ্ঞানের যেরূপ প্রাদুর্ভাব, প্রাচীনকালে প্রাচ্যজগতে যোগেশ্বরপ্রকটিত অধ্যাত্মবিজ্ঞানের সেইরূপ সমাদর ছিল। কলিযুগবর্দ্ধনের সঙ্গে লোকের আধ্যাত্মিকতা হ্রাস পাওয়াতে অধ্যাত্মবিজ্ঞান সাধারণ মানবমণ্ডলীর ভিতর লুপ্ত হইয়া যায় এবং মানবধর্ম্ম সকলে দেশে অবনত ভাব ধারণ করে। প্রাচীন কালে এদেশের মহর্ষিগণ অধ্যাত্মবিজ্ঞান সম্যক অনুশীলন করিতেন। সনাতন হিন্দুধর্ম্মের আভ্যন্তর তাঁহাদেরই মতামতে পূর্ণ। এজন্য অধ্যাত্মবিজ্ঞানের মহৎ মহৎ সত্য কলিকলুষিত মানবমনে যতদূর বুঝিতে পারা যায়, উহাদের উল্লেখ করিয়া এধর্ম্মের সারতত্ত্ব কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিতে চেষ্টা পাইব।

ঐতিহাসিক যুগে যে দর্শনশাস্ত্র সভ্য দেশমাত্রেই সম্যক অনুশীলিত হইত এবং যাহা মানবধর্ম্মকে নানাদেশে উচ্চপদবীতে আরোহণ করায়, সেই দর্শনশাস্ত্রের আবিষ্কৃত নানা সত্যের উল্লেখ করিয়া এধর্ম্মের সারতত্ত্ব কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিতে চেষ্টা পাইব।

আজকাল যে জড়বিজ্ঞান জ্ঞানজগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে এবং যাহার প্রতিপত্তি সভ্যদেশমাত্রেই ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে, সেই বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত নানা সত্যের উল্লেখ করিয়া এধর্ম্মের মতামত ও পুরাণোক্ত অলীক উপাখ্যানগুলির কিরূপ অভিনব ব্যাখান করা যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে সাধ্যমত চেষ্টা পাইব। এই জড়বিজ্ঞান আজকাল সমাজে নাস্তিকতার অধিক প্রশ্রয় দেয়; এজন্য ইহার দোষগুণ, জড়বাদিতা ও অসম্পূর্ণতা বিশদভাবে দেখাইতে চেষ্টা পাইব।

এখন আমাদের সনাতন হিন্দুধর্ম্ম প্রাচীন কালের সেই গূঢ় অধ্যাত্মবিজ্ঞান, পুরাকালের সেই উন্নত দর্শনশাস্ত্র ও আজকালের সেই অত্যুন্নত জড়বিজ্ঞান, এই ত্রিবিধ শাস্ত্রের কতদূর অনুমোদিত, উহাদের দ্বারা কতদূর প্রতিপাদিত ও সপ্রমাণিত, তাহাই এ পুস্তকে ভালরূপ দেখাইতে চেষ্টা পাইব, এজন্য ইহার নাম "বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম্ম" রাখিলাম।

সমগ্র পুস্তকখানি তিনভগে বিভক্ত ও একুশ অধ্যায়ে সমাপ্ত। প্রথমভাগে জীবনের কূট প্রশ্নগুলি (Problems of existence) সুমীমাংসা করিতে সাধ্যমত চেষ্টা পাইব। প্রথম তিন অধ্যায় সাধারণের পক্ষে অতীব কঠিন ও নীরস বোধ হইবে। কঠিন দেখিয়া কেহ যেন পুস্তকখানি দূরে প্রক্ষেপ না করিয়া বসেন। তার পর যত অগ্রসর হইবেন, তত সহজ বোধ হইবে। দ্বিতীয় ভাগে হিন্দুধর্ম্মের মতামত, বিশেষতঃ পৌরাণিক ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম ও মাহাত্ম্য বর্ণন করিব। তৃতীয় ভাগে ইহার সামাজিক রূপটী বিশদভাবে দেখাইব।

প্রথমভাগের প্রথম আধ্যায়ে দেখাইব, রহস্যময় ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত রহস্যের মধ্যে মানব সসীম জ্ঞানশক্তি পাইয়া ও প্রকৃতদত্ত মায়াঠুলি পরিয়া কিরূপ আলোকে ও আঁধারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহার জ্ঞানশক্তির বিশেষত্ব কি, জীবনের কূট প্রশ্নগুলি কি। এই সকল প্রশ্ন অধ্যাত্মবিজ্ঞান, দর্শন ও জড় বিজ্ঞানের মতামত লইয়া মীমাংসিত হইবে বলিয়া দ্বিতীয় অধ্যায়ে উহাদের উৎপত্তি, পরস্পর সম্বন্ধ বা বিরোধ ও গুণাগুণ উল্লেখ করিব। তৎপরে কূট-প্রশ্ন মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইব।

তৃতীয় অধ্যায়ে দেখাইব, প্রথমতঃ থিওসফি, পুরাণ, সাংখ্য ও বিজ্ঞানের মতে সৃষ্টিরহস্য কতদূর উদ্ভেদ করিতে পারা যায়; দ্বিতীয়তঃ বিজ্ঞান, থিওসফি

ও পুরাণের মতে অতীত ভৌতত্ত্বিক যুগসমূহে ধরিত্রীর ভৌগোলিক সংস্থান সম্বন্ধে কতদূর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে এবং পুরাণোক্ত সপ্তদ্বীপ ও সপ্তসাগরের কিরূপ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হইতে পারে, তৃতীয়তঃ বিজ্ঞান ও থিওসফি মতে আধুনিক মানবজাতি কি প্রকারে জগতে উদ্ভূত হইল; চতুর্থতঃ উৎকৃষ্ট জীবজন্তুদিগের ভিতর স্ত্রীপুরুষের বিভাগ হইয়া জগতে কি প্রকারে মৈথুনধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইল, পঞ্চমতঃ পাশ্চাত্য বিবর্ত্তবাদ, জীবনসংগ্রাম, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন প্রভৃতির প্রকৃত তাৎপর্য্য কি?

চতুর্থ অধ্যায়ে দেখাইব, ধর্ম্ম শব্দের প্রকৃত অর্থ কি, সংসারে ইহা কোন্ কোন্ মহৎ কার্য্য সাধন করিতেছে; প্রাকৃতিক ধর্ম্মের মহৎ উদ্দেশ্য কি, বৈশেষিক ধর্ম্মগুলি কি প্রকারে উত্থিত হইল এবং যুগে যুগে ইহা ক্রমোন্নত বা ক্রমাবনত হইতেছে। পঞ্চম অধ্যায়ে দেখাইব,-ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও স্বরূপ কি প্রকার, নির্গুণ পরব্রহ্মে ও সগুণ লৌকিক ঈশ্বরে কত প্রভেদ, তাঁহার অবতার গ্রহণের উদ্দেশ্য কি, আত্মার যথার্থ প্রকৃতি কিরূপ, মানবজীবনের প্রধান উদ্দেশ্য কি, পরলোক কোথায়, নির্ব্বাণ ও মুক্তির প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, আস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র ঈশ্বরপ্রকটিত কেন?

ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিজ্ঞানের মতামত খণ্ডন করিয়া পাপপুণ্যের বা ধর্ম্মাধর্ম্মের যথার্থ বিচার করিব এবং এদেশের প্রায়শ্চিত্তবিধান সমাজকে সাত্ত্বিক ভাবে শাসন করিবার জন্য রাজদণ্ডবিধি অপেক্ষা কতদূর মহোচ্চ ও ফলপ্রদ, তাহাও দেখাইব। সপ্তম অধ্যায়ে বিজ্ঞান, অধ্যাত্মবিজ্ঞান ও জ্যোতিষ শাস্ত্রানুসারে মানবের সুখদুঃখের প্রকৃত কারণপরম্পরা নির্দ্দেশ করিব। ইহাতে অদৃষ্টবাদ কর্ম্মফল, ধনদৌলতের অসারত্ব ভালরূপ দেখাইব।

দ্বিতীয় ভাগের প্রথম অধ্যায়ে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের সাধারণ মতামত ও প্রকৃত মাহাত্ম্য বর্ণন করিব। আরও দেখাইব এ ধর্ম্ম পৃথিবীস্থ যাবতীয় ধর্ম্মের কিরূপ সমন্বয়, পৌত্তলিকতা অবলম্বন করিয়া ইহা ধর্ম্মসাধনার কিরূপ সহজ, সুগম ও শ্রেষ্ঠ পথ দেখাইয়াছে এবং যোগসাধনের প্রক্রিয়াগুলি শরীরতত্ত্ব নির্দ্দিষ্ট সত্য দ্বারা কতদূর ব্যাখ্যান করা যাইতে পারে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখাইব, কর্ম্মমার্গ, জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গ দ্বারা আমরা কিরূপ অলৌকিক সিদ্ধিলাভ করি, হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণজাতির পদগৌরব কতদূর প্রকৃতিসিদ্ধ,

ঈশ্বরকে পিতৃমাতৃভাবে ও পতিপুত্রভাবে আরাধনা করিয়া মনের সাত্ত্বিক ভাবাবলি স্ফুরণ করিতে করিতে আমরা কতদূর মনুষ্যত্ব লাভ করি, এ ধর্ম্ম একেশ্বরবাদী ও নিরাকারবাদী না হইয়া কেন বহ্বীশ্বরবাদী ও সাকারবাদী হইল? তৃতীয় অধ্যায়ে এ ধর্ম্মের মূলবিশ্বাস ও ত্রিমূর্ত্তি, প্রতিমূর্ত্তিপূজন অসার নিরাকারোপাসনা অপেক্ষা কতদূর শ্রেষ্ঠ ও সিদ্ধিপদ, নানা দেবদেবীর কথা এবং দুর্গা ও কালিকা মূর্ত্তির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইবে। চতুর্থ অধ্যায়ে পুরাণোক্ত নানা অলীক উপাখ্যানের, বিশেষতঃ সাগরমন্থনের অপূর্ব্ব বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এবং পৌরাণিক অবতারতত্ত্বে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মহোচ্চ বিবর্ত্তবাদ কিরূপ জাজ্জল্যমান, তাহাই ভালরূপ দেখাইব এবং হিন্দুধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক মাহাত্ম্য প্রকাশ করিব!

পঞ্চম অধ্যায়ে দেখাইব, রামাবতার দ্বারা আমরা গার্হস্থ্য ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা (অর্থাৎ) অসাধারণ পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃভক্তি, পতিপরায়ণতা, রাজধর্ম্ম প্রভৃতি কিরূপ প্রকৃষ্ট পদ্ধতিতে শিক্ষা করি এবং কৃষ্ণাবতার দ্বারা তদীয় জীবনলীলায় নবরসের পূর্ণ অভিনয় দেখিয়া সাত্ত্বিক ভাবসাগরে ভাসিতে ভাসিতে আমরা ধর্ম্মপথে কিরূপ অগ্রসর হই। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা, কৈশোরলীলা ও যৌবনলীলা এবং তাঁহার অলৌকিক ধর্ম্মোপদেশ ও গুণগ্রাম, রাসলীলার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা, সকলই বর্ণিত হইবে। ষষ্ঠ আধ্যায় দেখাইব, তীর্থভ্রমণে কেন এত পুণ্যনির্দ্দেশ, ইহাদ্বারা লোকবিশেষের ও সমগ্র সমাজের কত মহোপকার সাধিত হইতেছে, উপবাস দ্বারা শরীর ও মনের কত মহোপকার সাধিত হইয়া থাকে, গাভীপূজা দ্বারা কৃষিপ্রধান ভারতের কত মঙ্গল সাধন হইতেছে এবং আজকাল গোহত্যাবশতঃ সমাজের কিরূপ দুর্গতি ইত্যাদি।

সপ্তম অধ্যায়ে হিন্দুজাতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দুইচারি কথায় দিব এবং বৈদিক, বেদান্ত, বৌদ্ধ, স্মার্ত্ত ও পৌরাণিক ধর্ম্মের বিষয় লিখিব। আরও দেখাইব, মুসলমান যুগে সমাজনায়ক ব্রাহ্মণগণ কি প্রকারে আমাদের জাতিধর্ম্ম রক্ষা করিতে সমর্থ হন এবং এই খৃষ্টানযুগে আমরা কি প্রকারে ভারতের ধন-দৌলত রক্ষা করিয়া নিজ কর্ত্তব্য পালন করিব।

শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায় একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন, এ দেশের বেদান্ত ধর্ম্ম, যাহাতে পৌত্তলিকতার নাম গন্ধ নাই, তাহা অন্যদেশপ্রচলিত

একেশ্বরবাদ অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ ; কিন্তু তাহারা পৌরাণিক বা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মকে ততদূর শ্রদ্ধা করেন না। তাঁহাদের ভ্রান্তি অপনোদনার্থ এই দ্বিতীয় ভাগে এ ধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্ম ও মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়া জগৎকে দেখাইব, তথা কথিত হেয়, অপদার্থ পৌরাণিক ধর্ম্মই জনসাধারণের পক্ষে কালোচিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

তৃতীয় ভাগের প্রথম অধ্যায়ে দেখাইব—

প্রথমতঃ। মানবসমাজ ও মানবপরিবার কিরূপে গঠিত হইল এবং উহাদের উপর ধর্ম্মের অনুশাসন কতদূর চলিতেছে, দ্বিতীয়তঃ সমাজ কিরূপ শরীরী পদার্থ এবং সামাজিক নির্ব্বাচন দ্বারা ইহা কিরূপ চালিত হইতেছে। তৃতীয়তঃ, জাতিবিশেষ সমবেত চেষ্টা দ্বারা কিরূপ উন্নতির পথে অগ্রসর হয় এবং জাতীয় নিয়তি জাতিবিশেষকে সময়ে সময়ে কিরূপ উন্নত বা অবনত করে। চতুর্থতঃ জাতীয়তা শব্দের প্রকৃত অর্থ কি এবং আমাদের জাতীয়তা রক্ষণে এখন কি কি আবশ্যক ?

দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখাইব, হিন্দুপরিবার ও হিন্দুসমাজের উপর হিন্দুধর্ম্মের অনুশাসন কিরূপ চলিতেছে, সমাজের মহোৎসবগুলি কতদূর আনন্দদায়ক, জীবনের সংস্কারগুলির গূঢ় উদ্দেশ্য কি এবং বর্ণাশ্রমধর্ম্মের কঠোর নিয়মাবলি কিরূপ ?

তৃতীয় অধ্যায়ে দেখাইব, জাতিভেদপ্রথা আর্য্যসমাজে কি প্রকারে স্বতঃ উদ্ভূত হইল এবং পৌরাণিক যুগে ইহা কি প্রকারে আধুনিক আকার ধারণ করিল, এ প্রথা হিন্দুসমাজকে চিরদিন কিরূপ শাসন করিতেছে, কৌলিক গুণাগুণের উন্নতি সাধনে, বিশেষতঃ ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও বুদ্ধি প্রবৃত্তির উৎকর্ষ সাধনে ইহা কিরূপ সিদ্ধিপ্রদ।

চতুর্থ অধ্যায়ে দেখাইব, এই জাতিভেদ প্রথা অতীতকালে (অর্থাৎ) বৌদ্ধ ও মুসলমান যুগে ভারতের কত মঙ্গল সাধন করিয়াছে, ইহার মহৎ দোষ কি কি, ভবিষ্যতে ইহা স্থায়ী হইবে কি না এবং এতৎ সম্বন্ধে এখন আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য কি ?

পঞ্চম অধ্যায়ে দেখাইব বিবাহপ্রথা সমাজে কি প্রকারে উত্থিত হইল, হিন্দুবিবাহের মহোচ্চ ও প্রধান উদ্দেশ্য কি ; পতিনির্ব্বাচন, বাল্যবিবাহ,

কৌলিন্যপ্রথা ও বহুবিবাহের দোষগুণ কি এবং নারীবহুলদেশে বিধবাবিবাহ কতদূর অসঙ্গত এবং ইহার অপ্রবর্ত্তনে হিন্দুধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য কি?

ষষ্ঠ অধ্যায়ে দেখাইব, আজকাল বরপণের বিষময় ফলে বঙ্গীয় সমাজ কিরূপ ছারখার হইতেছে এবং কি প্রকারে এ কুপ্রথা রহিত করা যাইতে পারে, সতীত্ব ধর্ম্ম কাহাকে বলে এবং সতীদাহের প্রধান উদ্দেশ্য কি, পরাধীন অবস্থায় অবরোধপ্রথা কিরূপ আবশ্যক?

সপ্তম অধ্যায়ে দেখাইব, দেশের আচার ব্যবহার হিন্দুসমাজের কতদূর উপযোগী ও সুখবর্দ্ধক, শাস্ত্রোক্ত সদাচার পালন করিয়া আমরা ধর্ম্মপথে কতদূর অগ্রসর, খাদ্যাখাদ্যের বিচার কতদূর আবশ্যক।

জীবনের মধ্যাহ্নকালে মধ্যভারতের বনজঙ্গলে বসিয়া এ গ্রন্থের পত্তন করিয়াছিলাম। এখন আবার ইহার সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে সুন্দরবনের প্রান্তভাগে অরণ্যে বসিয়া ইহার লেখা সমাপ্ত করিলাম। এইরূপ চিরদিন অরণ্যে বসিয়া দেশের জন্য ক্ষীণস্বরে যে রোদন করিলাম, তাহা কাহার কর্ণে উঠিবে, কেই বা ইহাতে কর্ণপাত করিবেন? যথেষ্ট পরিশ্রম করিলাম বটে, কিন্তু জীবনব্রত উদ্‌যাপন করিতে পারিলাম না। পুস্তকের ইংরাজী সংস্করণ বাহির হইল না। মনের দুঃখ মনেই রহিল।

পুস্তকখানি নবযুগের শিক্ষিত নব্যসম্প্রদায়ের জন্য নবপুরাণস্বরূপ। বেদান্ত, সাংখ্য, পাতঞ্জল, থিওসফি, নানাবিজ্ঞানশাস্ত্র, নানাপুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি নানা শাস্ত্র নিগড়াইয়া বা উহাদের সার মর্ম্ম লইয়া মানবসমাজ, মানবজীবন, মানবপ্রকৃতি ও মানবধর্ম্ম সম্বন্ধে নানাকথা বৈজ্ঞানিক যুক্তির সহিত আলোচিত হইল। নানা স্থলে ইহার নূতন কথা, নূতন ভাব এবং নানা পৌরাণিক উপাখ্যানের নূতন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাঠ করিয়া অনেকে হাসিবেন সত্য, কিন্তু যাঁহারা নানা বিজ্ঞানশাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা ইহাতে কোন হাসির কথা পাইবেন না।

শিক্ষা বিভ্রাট বশতঃ আজকাল অল্পশিক্ষিত সাধারণ পাঠকবর্গ ধর্ম্মগ্রন্থ আদৌ পাঠ করিতে চান না। তাঁহারা নাটক নভেল ও উপন্যাস পড়িয়া সময় ক্ষেপণ করেন। এবংবিধ লোকেরা এ পুস্তকের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিবেন না এবং ইহাকে পছন্দও করিবেন না। অপর পক্ষে সুশিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতর এখন দুই দল দেখা যায়। একদল ইংরাজী ভাবে গদ্‌গদ হইয়া বাঙ্গালা

পুস্তক দেখিলেই পায়ে থাঁৎলান। অপর দল পুরাতন জাতীয়তা মিটাইয়া নবজীবন গঠনে একান্ত তৎপর। তাঁহারা জাতিভেদ উঠাইয়া, বিধবাদিগের পুনঃসংস্কার করাইয়া, অবরোধপ্রথা রহিত করিয়া ইংরাজদিগের অনুকরণে অতীব ব্যগ্র। এ সম্প্রদায়ের হস্তে এ পুস্তক পড়িলে তাঁহারা ইহাকে আস্তাকুড়ে ফেলিয়া দিবেন। যখন দেশের অবস্থা এরূপ, তখন ইহা যে বঙ্গীয় সাহিত্য-ভাণ্ডারে তিলার্দ্ধ স্থান পাইবে, এরূপ আশা করা বৃথা।

পরিশেষে বক্তব্য, যদি সনাতন হিন্দুধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক মাহাত্ম্য ও সারমর্ম্ম বুঝিতে ইচ্ছা করেন, যদি ভাবপ্রধান পৌরাণিক ধর্ম্মের স্বর্গীয় ও মহোচ্চ ভাব এবং সাত্ত্বিক ভাবাবলি শিক্ষা দিয়া মনের উৎকর্ষ সাধনে ইহা কতদূর সিদ্ধিপ্রদ, তাহা জানিতে ইচ্ছা করেন, যদি বেদান্ত, সাংখ্য ও পাতঞ্জলের গূঢ় মর্ম্ম সহজ ভাষায় পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন, যদি যোগেশ্বরপ্রকটিত নানা পৌরাণিক উপাখ্যানের অভিনব বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা শুনিতে ইচ্ছা করেন, যদি দেশের রীতিনীতি ও পূজাপদ্ধতি সমাজের যে কতদূর মঙ্গলদায়ক, মনের যে কতদূর উৎকর্ষসাধক ও জীবনের যে কতদূর সুখবর্দ্ধক, তাহা জানিতে ইচ্ছা করেন, সমগ্র পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত মনোযোগের সহিত পাঠ করিবেন। অলমতি বিস্তরেণ।

ইতি নিবেদনং গ্রন্থকারস্য।

কোন্নগর
১১৩৩ সাল।

দ্বিতীয় সংস্করণের উপর

সমালোচনা

অমৃতবাজার পত্রিকা।

২২শে মে ১৯২৭ সাল।

REVIEW,

"Baijnanik Hindoo Dharma" (Sceintific Hindoo Religion) by Srinath Ghosh M. B. Late Medical Advisor to H. H. The Maharaja of Panna. Parts I, and II, published by the Author, Price Rs. 3/ only, To be had of him at Konnagar, Zilla Hooghly .

The book under review was published for the first time more than two decades ago, when the merits of the book were appreciated by the public as well as by the press. We are glad that a second edition of such a useful Book has been again brought out at a time when its need is felt such keenly.

The religion of the Hindoos is the oldest religion on earth. Though a thoroughly scientific and philosophical religion, Hinduism is full ot multifarious rites, ceremonies and beliefs which appear to the uninitiated as mere superstitious and insane formalities. Western culture has its bright as well as its dark side. Its good effects can on no account be denied. but it is a regret, those among us, who have received the so-called western education, have begun to sneer at some of the Hindoo rituals

and beliefs. To dispel such erroneous notions, the author has produced such a treatise at a great sacrifice of time and energy. We admire his erudition ann perseverance. The religion that is evolved out of the brains of the great Rishis of yore, who wrote the veds, the Upanishads, the Purans, the six great systems of Hindoo philosophy, can not be mere bundles of meaningless dogmas. The author has tried at great pains to render quite a rational and scientific interpretation of Hindoo beliefs and ceremonies which Is sure to appeal to the most nnreasonable sceptic. In past I. of the book the author has attempted to solve subtle questions of the creation, problems of sin and virtue, Misery and Happiness, the nature of the soul, the Hereafter and other questions. In the part II. the esoteric meaning of Puranic stories. the incarnation of Ram and Krishna, the Development of Hindooism in the various ages, Budhism and other cognate matters have been dealt with.

The author is gifted with the blessings of western and Oriental culture and it is proper that a book like this should be written by him. We have read his book with interest, which we consider to be a timely and useful production. The language he has used is atonce simple and lucid. We desire its wide popularity.

"পাম্নাধিপতির ভূতপূর্ব্ব ডাক্তার

শ্রীশ্রীনাথ ঘোষ এম, বি, প্রণীত

বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম্ম

প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত। মূল্য ৩৲। গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য কোন্নগর, জেলা হুগলী।

বিশ বৎসর পূর্ব্বে এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ বাহির হইয়াছিল। তৎকালে সম্বাদপত্র ও জনসাধারণ সকলেই ইহার কদর করিয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে এরূপ অত্যাবশ্যক পুস্তকের অভাব সকলেই বিশেষ অনুভব করিতেছেন। সেজন্য ইহার পুনঃ সংস্করণ দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইলাম।

সনাতন হিন্দুধর্ম্ম পৃথিবীর মধ্যে সকল ধর্ম্মাপেক্ষা প্রাচীনতম। যদিও ইহা সর্ব্বতোভাবে বিজ্ঞান ও দর্শনসম্মত, তথাচ ইহাতে এত বিভিন্ন প্রকার মতামত, অনুষ্ঠান ও বিধিব্যবস্থা আছে, যাহা অদীক্ষিত লোকবর্গের নিকট কুসংস্কারপূর্ণ উন্মত্তের আড়ম্বর বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণও অনেক, দোষও অনেক। ইহা দ্বারা হিন্দুসমাজে যে সকল সুফল ফলিতেছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের মধ্যে যাঁহারা তথাকথিত পাশ্চাত্য শিক্ষা অধিক পরিমাণে পাইয়াছেন, তাঁহারা আজকাল হিন্দুধর্ম্মের মতামত ও বিধিব্যবস্থার উপর উপহাস করেন। তাঁহাদের ভ্রান্তি দূর করিবার জন্যই গ্রন্থকার যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করিয়া গ্রন্থপ্রণয়নে নিজের সময় ও মানসিক শক্তি লাগাইয়াছেন। আমরা তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি ও অধ্যবসায়ের যথেষ্ট প্রশংসা করিতেছি। পুরাকালে মহর্ষিগণ যাঁহারা বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, পুরাণ ও ষড়দর্শন লিখিয়া যান, তাঁহাদের মস্তিষ্কপ্রসূত হিন্দুধর্ম্ম কদাচ অর্থশূন্য মতামতের সমষ্টিমাত্র হইতে পারে না। গ্রন্থকার যথাসাধ্য কষ্টস্বীকার করিয়া হিন্দুধর্ম্মের মতামত ও অনুষ্ঠান

গুলির সমর্থনার্থ বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক উহাদের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার যুক্তিগুলি এত উৎকৃষ্ট, যাঁহারা ঘোর নাস্তিক, হিন্দুধর্ম্মে যাঁহাদের আদৌ বিশ্বাস নাই, তাঁহারাও তাঁহার যুক্তি সকল পাঠ করিয়া বিমোহিত হইবেন।

প্রথম ভাগে গ্রন্থকার সৃষ্টিরহস্য, পাপপুণ্যের বিচার, সুখদুঃখের বিচার, আত্মার প্রকৃতি, পরলোক প্রভৃতি নানা কূট প্রশ্নের মীমাংসা করিয়াছেন। দ্বিতীয় ভাগে তিনি পৌরাণিক উপাখ্যানগুলির গুপ্ত অর্থ ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, রামাবতার ও কৃষ্ণাবতারের গূঢ় উদ্দেশ্য, হিন্দুধর্ম্মের ক্রমস্ফুরণ, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভৃতি নানা আবশ্যকীয় বিষয় বর্ণন করিয়াছেন।

গ্রন্থকার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় সম্যক বিভূষিত বলিয়া ঈদৃশ পুস্তক তাঁহারই লেখনী হইতে নিঃসৃত হইতে পারে। আমরা সাগ্রহে পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম। সকলেই স্বীকার করিবেন, বর্ত্তমান সময়ের উপযোগিতানুসারে ইহা হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক। ইহার ভাষা অতি সহজ ও প্রাঞ্জল। আশাকরি, জনসাধারণ এরূপ পুস্তকের ভালরূপ কদর করিবেন।

"ভারতবর্ষ"

শ্রাবণ ১৩৩৪ সাল

"বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম্ম"

শ্রীশ্রীনাথ ঘোষ এম, বি বিরচিত। মূল্য প্রতিভাগ দেড়টাকা। এখানি আধ্যাত্ম বিজ্ঞান, দর্শন ও বিজ্ঞানের মতে হিন্দুধর্ম্মের কালোচিত ব্যাখান। এখনকারদিনে শিক্ষিত সম্প্রদায় শাস্ত্রের দোহাই মানিতে চান না, সকলেই বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ চান। এ অবস্থায় হিন্দুর ক্রিয়াকর্ম্ম, আচার অনুষ্ঠান প্রভৃতির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইয়াছে। শ্রীযুৎ ঘোষ মহাশয় এই সুবৃহৎ গ্রন্থে সেই চেষ্টাই ভালরূপ করিয়াছেন। বেদান্ত, সাংখ্য, পাতঞ্জল, থিয়োসফি, বিজ্ঞান প্রভৃতি যাহা কিছু আছে, ঘোষ মহাশয় তাহার কোনটাই বাদ দেন নাই। যাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে অনেক নূতন কথা জানিতে পারিবেন এবং তাঁহাদের আলোচনার সুবিধা হইবেক। গ্রন্থকার যে এই পুস্তকখানি লিখিতে বহু আয়াস ও কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, তাহা ইহার প্রত্যেক পৃষ্ঠায় দেদীপ্যমান।

প্রথম ভাগের সূচীপত্র।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

পাপপুণ্যের বিচার।

সপ্তম অধ্যায়।

সুখদুঃখের বিচার।

প্রথমভাগ সমাপ্ত।

পৃষ্ঠা	...	...	...	৩২
অধ্যায়	...	...	...	৭
প্রবন্ধ	...	...	...	৬৬

* চিহ্নিত প্রবন্ধগুলি বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিবেন।

প্রথম ভাগের—

শুদ্ধিপত্র।

প্রথম অধ্যায়।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা
বিশিষ্ট ...	বিশ্লিষ্ট ...	৩	অধ্যাত্মকিজ্ঞান	অধ্যাত্মবিজ্ঞান	১৫
অনুবীক্ষণ ...	অণুবীক্ষণ ...	৪	Augels ...	Angels ...	১৬
অপ্রজান ...	অম্লজান ...	৫	নিকৃষ্টষানি ...	নিকৃষ্টযোনি...	১৬
চতুদ্দিকস্থ ...	চতুর্দ্দিকস্থ ...	৮	ষাহর ...	যাহার ...	১৬
পিপালিকা ...	পিপীলিকা ...	৯	লোরব্রাম ...	সেরিব্রাম ...	১৬
তারতম্য ...	তারতম্য ...	১২	ইাতেও ...	ইহাতেও ...	১৭
ত্রিগুণাত্মিকা	ত্রিগুণাত্মিকা	১২	উণ্মেষ ...	উন্মেষ ...	১৮
দেখিতেছে ...	দেখিতেছ ...	১২	Teare ...	There ...	২১
ঈষর্ণাত্র ...	ঈষন্মাত্র ...	১৪	চিরপ্রদপ্ত ...	চিরপ্রদীপ্ত ...	২৪
উভাবন ...	উদ্ভাবন ...	১৪	অধায়ন ...	অধ্যয়ন ...	২৪

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা
দৈববানী ...	দৈববাণী ...	২৭	পুর-ভুজ ...	পুরুভুজ ...	৫৩
যোগা ...	যোগো ...	২৮	শান্তলোকে—	শান্তলোকে ...	৫৩
রহস্যং ...	রহস্যং ...	২৯	মনেজ্ঞেগতের	মনোজগতের	৫৪
স্বার্থ্যসিদ্ধি ...	স্বার্থসিদ্ধি ...	৩০	সযোগে	সংযোগে ...	৫৫
গ্রীষ ...	গ্রীশ ...	৩২	Spermathozoa.	Spermatozoa.	৫৫
একবার ...	(বসিবে না)...	৩৬	ব্যাথাত ...	ব্যাখান ...	৫৩
রাম ...	রম্য ...	৩৬	সংঘটিত ..	সংঘট্টিত ...	৫৬
অনুবীক্ষণ ...	অণুবীক্ষণ ...	৩৭	বিঘটিত ...	বিঘট্টিত ...	৫৬
বেদান্ত ...	বেদান্তে —	৩৮	পৌনপুন্য ...	পৌনঃপুন্য ...	৫৮
যান ...	ব্যান —	৪৩	যাহারা ...	যাহার ...	৬১
সুধা ...	সুধী —	৪৬	সক্রেটিশাপ্রমুখ	সক্রেটিশপ্রমুখ	৬৪
অনুধারনা ...	অনুধাবন —	৪৯			

তৃতীয় অধ্যায়।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা
বৈচিত্র	বৈচিত্র্য	৬৮
পুঙ্খ্যানুপুঙ্খ	পুঙ্খানুপুঙ্খ	৬৯
সাহার্য্যে	সাহায্যে	৬৯
কিযদ্দূর	কিয়দ্দূর	৬৯
অধেগত	অধোগত	৭১
অঘটনঘটনপটীয়সী	অঘটনঘটনপটীয়সী	৭২
বেদবণিত	বেদবর্ণিত	৭৪
পরব্রহ্মোর	পরব্রহ্মের	৭৫
অগুগুলি	যন্ত্রগুলি	৭৬
বশ্বের	বিশ্বের	৭৬
শূন্ত	শূন্য	৭৬
গুপা	গুণা	৭৮
উদ্ভু	উদ্ভূত	৮২
প্রটেপ্লাসম	প্রটোপ্লাসম	৮৩
জ্ঞানেন্দ্রিয়	জ্ঞানেন্দ্রিয়	৮৬
দেবণ	দেবগণ	৮৭
করিতেছি	করিতেছে	৮৭
লহাদের	উঁহাদের	৮৮
সেবা	সেবন	৮৮
প্রকটীত	প্রকটিত	৯৯
মৌন	মৌ	৯৭
merica	America	১০০
Upheaven	Upheaval	১০০
অঙ্গারমাহী	অঙ্গারবাহী	১০১

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা
বহিত	বহিতে	১০২
যাহারা	সাহারা	১০২
পঞ্চবান	পঞ্চবাণ	১০৪
অজাগুবি	অজগবি	১০৫
ক্ষীরোদাদ	ক্ষীরোদাদি	১০৬
কালশাৎ	কালবশাৎ	১১০
অভ্যন্তরীন	অভ্যন্তরীণ	১১০
জ্ঞানশাস্ত্রে	হিন্দুশাস্ত্রে	১১৩
আদীমজাতীয়	আদামজাতীয়	১১৫
চলিত	চলিল	১১৫
সকলা	সকল	১১৫
বিল্পব	বিপ্লব	১১৫
পাশ্চাত্ত্য	পাশ্চাত্য	১১৫
ত	এ	১১৬
Hermanphrodite	Hermaphrodite	১১৮
বস্তিদ্রেশে	বস্তিদেশে	১১৮
প্রত্যেকে	প্রত্যেক	১১৮
প্রবাদবসতঃ	প্রমাদবশতঃ	১১৯
আমাদের	আদামের	১১৯
Laba	Labia	১২০
জগতে মৈথুনধর্ম্ম এবং প্রবর্ত্তিত হইয়াছে	এবং জগতে মৈথুনধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে	১২১

বিজ্ঞানশাস্ত্র অনুশীলন করিয়া আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি, আমরা জগতের কতকগুলি বাহ্য সত্য শিক্ষা করি মাত্র।

সত্য বটে, জগতে অগাধ জ্ঞানানুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে নানা সত্য নানা-দিকে আবিষ্কৃত হইতেছে ও হইবে, তথাচ ভালরূপ অনুধাবন করিলে বুঝিতে পারা যায়, চির-রহস্যময়ী প্রকৃতির মহারহস্য উদ্ঘাটন করা কীটাণুকীট মানবের সাধ্যাতীত। পঞ্চেন্দ্রিয়ের পঞ্চ ফাঁদে পতিত হইয়া তাঁহার জ্ঞানশক্তি যেরূপ সীমাবদ্ধ, তাহাতে তিনি কস্মিনকালে জ্ঞানের চরম সীমায় উপনীত হইতে পারিবেন না। তিনি যতই কেন চেষ্টা করুন না, প্রকৃতির চরমাদ্য বিষয়গুলি (Ultimate facts of nature) চিরদিন তাঁহার নিকট অজ্ঞেয় থাকিবে।

পাঠক! এখন তুমি জ্যোতিষ শাস্ত্র পাঠ করিয়া ব্যোমমার্গের বিবিধ সংবাদ আনয়ন করিতেছ এবং ভূতত্ত্ব পাঠ করিয়া ভূগর্ভের বিবিধ সংবাদ জানি-তেছ। এখন তুমি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান পাঠ করিয়া প্রাকৃতিক দৃশ্যপটলের কারণপরম্পরা অবগত হইতেছ এবং রসায়ন-শাস্ত্র পাঠ করিয়া জগতের বিভিন্ন পদার্থ কি কি উপাদানে নির্ম্মিত, তাহাও অবগত হইতেছ এবং পরীক্ষাগারে উহাদের পরীক্ষা করিয়া তুমি জগতের নানা সত্য জানিতেছ। কিন্তু বল দেখি, ইহাতেই কি তোমার জ্ঞানপিপাসা যথার্থরূপ পরিতৃপ্ত হই-তেছে? জগতের জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে তুমি কতদূর শিক্ষা করিলে, তাহা কি একবার ভাবিয়া দেখ? বেশ জানিবে, জ্ঞাতব্য বিষয়ের সহস্রাংশের একাংশও এখনও তোমার সম্পূর্ণ আয়ত্ত হয় নাই।

এই যে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ ও নক্ষত্রগণ তোমার নয়ন সমক্ষে প্রতিদিন ব্যোম-মার্গে উদিত ও অস্তমিত হইয়া তোমায় চিরদিন বিস্ময়োৎফুল্ল করিতেছে, উহাদের সম্বন্ধে তুমি কি শিক্ষা কর, বল? সূর্য্য সৌরজগতের কেন্দ্রস্থল, গ্রহগণ উহার চতুর্দ্দিকে অমিতবেগে ভ্রাম্যমাণ হইয়া উহা হইতে আলোক, উত্তাপ ও জীবনীশক্তি প্রাপ্ত হইতেছে, ঐ সকল জ্যোতিষ্কমণ্ডল পরস্পর পর-স্পরের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া শূন্যমার্গে অবস্থিত, প্রত্যেক নক্ষত্র এক একটী সূর্য্য স্বরূপ এবং সকলেই কোটী ২ যোজন দূরে অবস্থিতি করিয়া অহর্নিশি ঘূর্ণ্যমান, ইত্যাদি নানা সত্য তুমি আজ জ্যোতিষ শাস্ত্র হইতে শিক্ষা

করিতেছ বটে ইহাতেই কি তোমার জ্ঞানপিপাসা যথার্থরূপে চরিতার্থ হইতেছে? আর যিনি দূরবীক্ষণ সহযোগে উহাদিগকে আজীবন পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, তিনিই বা তোমা অপেক্ষা অধিক কি শিক্ষা করিয়া থাকেন? যথার্থ বলিতে কি, এ বিষয়ে তুমি যে তিমিরে, চিরদিন তুমি সে তিমিরে।

এই যে ভূমণ্ডল, যাহা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে নগণ্য ধূলিকণা বিশেষ, যাহার উপর অসংখ্য জাতীয় জীবজন্তু সদা বিচরমাণ ও অসংখ্য জাতীয় উদ্ভিজ্জ সদা উৎপদ্যমান, সেই ভূমণ্ডল সম্বন্ধে তুমি কতদূর শিক্ষা কর, বল? সত্য বটে, ভূগোল, প্রাকৃতিক ভূগোলাদি পাঠ করিয়া তুমি এতৎ সম্বন্ধে নানা বার্ত্তা ও নানা তথ্য অবগত হইতেছ, এমন কি যে সকল ভৌতিক পদার্থের পরমাণুপুঞ্জ দ্বারা ইহার যাবতীয় পদার্থ বিরচিত, তুমি আজ পরীক্ষাগারে উহাদিগকে বিশ্লিষ্ট করিতেছ এবং যে সকল ভৌতিক শক্তি দ্বারা চালিত হইয়া ইহা এমন রমণীয় ও বিচিত্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, উহাদের নিয়মাবলি তুমি আজ সোৎসাহে নিরূপণ করিয়া আপনার অভূতপূর্ব্ব জ্ঞানের সম্যক পরিচয় দিতেছ, তাহাতেই বা তুমি জ্ঞাতব্য বিষয়ের কতটুকু জানিতে পারিলে, বল? যথার্থ বলিতে কি, এ বিষয়েও তুমি যে তিমিরে, চিরদিন তুমি সে তিমিরে।

এই যে তুমি রসায়নশাস্ত্রে সম্যক ব্যুৎপন্ন হইয়া পরীক্ষাগারে আজ যাদুকরের ন্যায় অত্যল্প উদক লইয়া যন্ত্র সহযোগে উহাকে উদজানে ও অম্লজানে বিশ্লিষ্ট করিতেছ, পুনরায় উদজান ও অম্লজান লইয়া উদক প্রস্তুত করিতেছ এবং নিমিষ মধ্যে কতপ্রকার পদার্থ লইয়া বিভিন্ন বর্ণের বিভিন্ন পদার্থ প্রস্তুত করিয়া সকলকে আশ্চর্য্যান্বিত করিতেছ; এই যে তুমি যে সকল জৈবনিক পদার্থ (Organic matter) এতকাল একমাত্র উদ্ভিজ্জদেহে বা জীবদেহে প্রস্তুত হইত, উহাদের মধ্যে কোন কোন পদার্থ (যেমন নীল) আজ সামান্য দ্রব্য সহযোগে প্রস্তুত করিতেছ, এমন কি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ বিস্বাদ সামান্য আলকাতরা হইতে বিভিন্নপ্রকার উজ্জ্বলবর্ণ ও শর্করা অপেক্ষা অধিক সুমিষ্ট সাক্সিন (Saxin) প্রস্তুত করিয়া স্বোপার্জ্জিত জ্ঞানের গৌরব করিতেছ, ইহাতেই কি তুমি যাবতীয় পদার্থের উপাদানজ্ঞান সম্যক শিক্ষা করিলে? যথার্থ বলিতে কি, এ বিষয়েও তুমি যে তিমিরে, চিরদিন তুমি সে তিমিরে।

এই যে নানাবিধ বৃক্ষলতাদি, যাহারা তোমার পুরোভাগে বিদ্যমান, যাহাদের হরিৎবর্ণের পত্রাদি দর্শনে তোমার নয়নদ্বয় সদা পরিতৃপ্ত, যাহাদের অমৃতময় ফলাস্বাদনে তোমার রসনা সদা পরিতৃপ্ত, যাহাদের পুষ্পের সৌরভ আঘ্রাণে তোমার নাসিকাদ্বয় সদা পরিতৃপ্ত, উহাদের সম্বন্ধেই বা তুমি কি জান বল? সত্য বটে, উন্নত উদ্ভিজ্জবিজ্ঞান উহাদের সম্বন্ধে তোমায় নানা কথা শিখায় এবং উহাদের শ্রেণিবিভাগ, দেহপোষণ ও জননেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সম্বন্ধে নানা অদ্ভুত উপদেশ দেয়, তাহাতেই কি তোমার মন সম্পূর্ণ প্রবোধ মানে? যথার্থ বলিতে কি, এ বিষয়েও তুমি যে তিমিরে, চিরদিন তুমি সে তিমিরে।

এই যে ধরণী পৃষ্ঠে অসংখ্য জীবজন্তু, যাহারা তোমার নয়ন সমক্ষে সদা বিচরণ করিতেছে, যাহাদের শান্তসৌম্য বা ভয়াল মূর্ত্তি দর্শনে তুমি অনুক্ষণ হৃষ্ট বা ভয়বিহ্বল হইতেছ, যাহারা চিরদিন তোমার অশেষ সেবা করিতেছে অথবা তোমায় শমন সদনে প্রেরণার্থ সদা ব্যগ্র, উহাদের সম্বন্ধে তুমি কি জান, বল? সত্য বটে, উন্নত জীবতত্ত্ব উহাদের শ্রেণিবিভাগ, দেহ ও যন্ত্রাদির ক্রিয়া সম্বন্ধে নানা অদ্ভুত সত্য শিক্ষা দেয় তাহাতেই কি তোমার মন সম্পূর্ণ প্রবোধ মানে? যথার্থ বলিতে কি, এ বিষয়েও তুমি যে তিমিরে চিরদিন তুমি সে তিমিরে।

এই যে মানব কোথা হইতে কালসমুদ্রে জলবুদ্বুদের ন্যায় উত্থিত হইয়া কখনও বা সুখে উৎফুল্ল হইয়া হাসিতেছেন, কখন বা রোগশোকে জর্জ্জরিত হইয়া অশ্রুজলে ভাসিতেছেন, তৎপরে পুনরায় কালসমুদ্রে বিলীন হইয়া যাইতেছেন, সেই মানবের দেহ ও জীবন সম্বন্ধে তুমি কতদূর শিক্ষা কর, বল? সত্য বটে, তোমার বিজ্ঞান, তোমার দর্শন, তোমার ধর্ম্মশাস্ত্র ইহাদের সম্বন্ধে তোমায় নানা কথা ও নানা তথ্য শিখায় এবং তুমি ও নিজ বিশ্বাসে তাহা জগতের মহাসত্য জ্ঞানে চিরদিন আদর কর; কিন্তু তাহাই যে প্রকৃতির অখণ্ডনীয় অমোঘ সত্য, তাহাই বা তুমি কিরূপে জানিলে, বল? সত্য বটে, তোমার শারীরস্থানবিদ্যা (Anatomy) ও তোমার শরীরতত্ত্ব (Physiology) তোমার দেহ সম্বন্ধে নানা কথা শিখায় এবং অনুবীক্ষণ সহযোগে উহার প্রত্যেক যন্ত্র তোমায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখায়, তাহাতেই কি তোমার জ্ঞানপিপাসাতুর

ক্ষুদ্র মন সম্পূর্ণ প্রবোধ মানে? যথার্থ বলিতে কি, এ বিষয়েও তুমি যে তিমিরে চিরদিন তুমি সে তিমিরে।

এখন মানবমাত্রেরই মনের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা এইরূপ যে, চিররহস্যময়ী প্রকৃতির মহারহস্যগুলি ক্রমশঃ মীমাংসা করিতে থাকে। আমাদের বুদ্ধিশক্তি যেরূপ, অথবা যুগধর্ম্মে আমাদের আধিভৌতিক উন্নতিসাধিকা জ্ঞানশক্তি নৈসর্গিক সংস্কারের পরিবর্ত্তে যেরূপ বিকসিত, তাহাতে আমরা সকল বিষয়ে স্বতঃ তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া থাকি। এই স্বাভাবিক কৌতূহল বশতঃ আমরা সাধন বলে, অনুশীলন বলে অপার জ্ঞানোন্নতি সাধন করিতে ২ জাতীয় জ্ঞানভাণ্ডার পরিবর্দ্ধন করিয়া আসিতেছি এবং সভ্যতার পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছি।

যেমন এক অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু সামান্য জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে চতুর্দ্দিকস্থ ঘটনাপরম্পরা সন্দর্শনে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া পিতামাতাকে উহাদের কারণ জিজ্ঞাসা করে, সেইরূপ মানবও জাতীয় জীবনের শৈশবাবস্থা হইতে নিজের অল্লাধিক বুদ্ধিবিকাশের সঙ্গে সকল বিষয়ের কারণপরম্পরা অবগত হইবার জন্য সমুৎসুক হন। তাঁহার জ্ঞানশক্তি যে সময়ে যেরূপ স্ফুরিত হইয়াছে, বিশ্বের কার্য্যকারণ সম্বন্ধে তিনি তদনুরূপ তত্ত্ব উদ্ভাবন করিয়া আপনার চিরপ্রদীপ্ত কৌতূহলশিখা নির্ব্বাপিত করিয়া আসিতেছেন। তাহার সাক্ষ্য দেখ না, অসভ্যযুগে বায়ু দেবতা বিশেষ, দার্শনিক যুগে ইহা একটী ভৌতিক পদার্থ এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে ইহা অম্লজান ও যবাক্ষারজানের মিশ্রসংযোগমাত্র (Mechanical mixture)।

আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি চালনা করিয়া মহারহস্যময়ী প্রকৃতির মহারহস্য আমরা অধিকাংশ স্থলে আদৌ মীমাংসা করিতে পারিনা। সুতরাং আমরা অনন্যোপায় হইয়া ধর্ম্মের সুমধুর বাক্যে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হই এবং একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরের দোহাই দিয়া জগতের রহস্য মীমাংসা করিয়া থাকি। এই আদ্যন্তবিহীন চিররহস্যময় জগতের অনন্ত রহস্যের মধ্যে যে কোন বিষয় আমাদের অজ্ঞেয় বলিয়া বোধ হয়, সে বিষয় সৃষ্টিকর্ত্তা ও সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বর এইরূপে সৃষ্টি ও চালনা করিতেছেন, এই সামান্য কথা উল্লেখ করিয়া আমরা আমাদের দুর্ব্বল মনকে চিরদিন সান্ত্বনা করিয়া আসিতেছি,ইহা ব্যতীত আমাদের গত্যন্তর নাই।

কীটাণুকীট মানবের কি সাধ্য যে, তিনি সামান্য বুদ্ধিবলে এই অনন্ত রহস্যময় ব্রহ্মাণ্ডের একটা সামান্য রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে পারিবেন? সুতরাং চিরকাল তিনি ধর্ম্মের সুমধুর বাক্যে কর্ণপাত করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছেন। আধুনিক উন্নত বিজ্ঞান জড়জগতের গোটা দুই সত্য আবিষ্কার করিয়া স্পর্দ্ধার সহিত স্বরচিত পুস্তকাবলি হইতে দয়াময় ঈশ্বরের নাম যতই কেন উড়াইয়া দেউক না, তাঁহার উপর বিশ্বাস ব্যতীত দুর্ব্বল, অসহায় মানবের গত্যন্তর নাই। ভবপারাবারে তিনিই একমাত্র কাণ্ডারী। ওহে বিজ্ঞানবিৎ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ! যে পরব্রহ্মের অনন্ত চিৎশক্তির কণামাত্র পাইয়া তোমরা আজ জ্ঞানজগতের অধীশ্বর হইয়া ধরাকে শরার ন্যায় জ্ঞান করিতেছ, সেই পরব্রহ্মকে সর্ব্বাগ্রে অস্বীকার করিয়া বসিলে? ধিক্ তোমাদের প্রতিভায়! ধিক্ তোমাদের গবেষণায়!

মায়াবাদ।

কেন ব্রহ্মাণ্ড আমাদের নিকট এমন রহস্যময় হইল? ইহার প্রকৃত কারণ কি। এ সংসারে জীবমাত্রেই পঞ্চেন্দ্রিয়ের পঞ্চ ফাঁদে পতিত হইয়া সর্ব্বদা মায়াচ্ছন্ন? ইহাতে প্রকৃতি স্বয়ং সকলের চক্ষে মায়াঠুলি পরাইয়া দেয় এবং উহাদিগকে যেমন দেখায়, উহারা তেমনি দেখে। সুতরাং এ জগৎ আমাদের নিকট প্রকৃত রহস্যময়। প্রকৃতিদত্ত মায়াঠুলি বুঝাইবার জন্য মায়াবাদের বিচার করা আবশ্যক।

অধ্যাত্মবিজ্ঞানের এই শ্রেষ্ঠ মতটী হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম জগতে প্রচার করে। সেদিনকার খৃষ্ট ও মুসলমান ধর্ম্ম ইহা আদৌ জানে না। এ দেশে বেদান্তদর্শন ও গ্রীশ দেশে প্লেটোর দর্শনশাস্ত্র ইহাকে ভালরূপ প্রচার করিয়াছে আজকাল বিখ্যাত জার্ম্মাণ পণ্ডিতগণও এই মত প্রচার করিতেছেন। কিন্তু উন্নত বিজ্ঞান ইহাকে গ্রাহ্য করে না। ইহার মতে তোমার অস্তিত্বের ন্যায় এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগতের অস্তিত্ব সকলের নিকট জীবন্ত ও জাগ্রত সত্য, কদাচ মিথ্যাজ্ঞানসম্ভূত হইতে পারে না।

মায়াবাদের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝা কঠিন। তাহার সাক্ষ্য, এ দেশের অনেক পণ্ডিত ইহার ব্যাখ্যানকালে দৃষ্টান্ত দেন, যেমন অন্ধকারে রজ্জুদর্শনে সর্পভ্রম

উপস্থিত হয়, পরে রজ্জুজ্ঞান হইলে অলীক সর্পজ্ঞান মন হইতে দূরীভূত হয়; সেইরূপ সংসারে পরমার্থজ্ঞান হইলে, ইহার যাবতীয় মায়াজনিত মিথ্যাজ্ঞান মন হইতে দূরীভূত হয়; তৎকালে কোনরূপ ভেদাভেদজ্ঞান থাকে না এবং সকলই ব্রহ্মময় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যাহা হউক ইহাতে মায়াবাদের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝা গেল না। সেজন্য এ স্থলে ইহার প্রকৃত অর্থ বুঝাইতে চেষ্টা পাইব।

যাহা ভুলাইয়া দেয় বা মোহিত করে; তাহাই মায়া। শাস্ত্রে মায়াশব্দ দুই প্রকার অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইহার প্রথম অর্থে অতিরিক্ত মোহ বা মমতা বুঝায়, যেমন দেহ, পুত্র, কলত্রাদি সংসারের ক্ষণভঙ্গুর বিষয়ে মানবমন স্বভাবতঃ মায়ায় মুগ্ধ থাকে। এ মায়াবন্ধন ছেদন করা ইহার পক্ষে অনেক সময় দুঃসাধ্য বটে; কিন্তু সংসারে বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে, ইহাকে সহজে ছেদন করা যায়। সেইরূপ সংসারের যাবতীয় অনিত্য মিথ্যাজ্ঞান লাভ করিতে ২ পরমাত্মাকে ভুলিয়া গিয়া সকল বিষয়ে আমার ২ যে মিথ্যাজ্ঞান বা অহংকার জন্মে, তাহাও ইহার মায়াজ্ঞান। শাস্ত্রোক্ত পরমহংসমার্গ অবলম্বন করিলে এ মায়াজ্ঞান দূরীভূত হইতে পারে।

মায়াশব্দের দ্বিতীয় অর্থে মহামায়া বুঝায়, যাহা ছেদন করা জীবের পক্ষে একেবারে অসাধ্য। এই মহামায়া সংসারে যাবতীয় জীবজন্তুর অস্তিত্বের মূলে সংলগ্ন আছে। যতদিন প্রাণধারণ করিতে হইবে, ততদিন সকলকে এই মহামায়ার মহাবরণে সমাচ্ছন্ন হইয়া সংসারে বিচরণ করিতে হইবে। এ মহামায়ার মহাবন্ধন কোন জীব জীবিতাবস্থায় কদাচ ছেদন করিতে পারে না।

যেমন সাধর্থা বলদের চক্ষুদ্বয়ে চর্ম্মঠুলি দিয়া ঘানিগাছে ঘোরায়, জীবজন্তুগণ তেমনি মায়াঠুলি পরিয়া ভবের হাটে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। প্রকৃতিদেবী স্বয়ং এ মায়াঠুলি সকলের চক্ষে পরাইয়া দেন। এ ঠুলি ত্যাগ করিবার অধিকার কাহারও নাই। যতদিন বাঁচিবে, ততদিন এই ঠুলি পরিয়া সকলে অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইবে।

পঞ্চেন্দ্রিয়ের যে মহাপাশে জীবমাত্রেই আবদ্ধ, তাহাই প্রকৃতিদত্ত মহামায়ার মহাঠুলি ইন্দ্রিয়গণের বন্ধন বড়ই কঠিন ব্যাপার। উহারা যাহা জানাইবে, বুঝাইবে, দেখাইবে ও শুনাইবে, সকলে তাহাই জানিবে, বুঝিবে, দেখিবে ও শুনিবে। তদ্ব্যতীত সংসারে কেহই কিছুই জানে না, বুঝে না দেখে না

ও শুনে না, ইহাতেই বুঝা উচিত, ইন্দ্রিয়গণ সকলকে কেমন নিগড় বন্ধনে বাঁধিতেছে।

এখন মায়াবাদের প্রকৃত মর্ম্ম ব্যাখান করিতেছি, মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করুন।

এই যে পথিমধ্যে অন্ধকারে যাইতে ২ তুমি একখণ্ড রজ্জু অবলোকন করিয়া সর্পভ্রমে ভয়বিহ্বল হইয়া পশ্চাৎপদ হইলে, পরে উহাকে ভালরূপ নিরীক্ষণ করাতে তোমার অলীক সর্পভ্রম মন হইতে দূর হইয়া গেল এবং তুমিও সুস্থির হইলে। ইহাই কি তোমার মায়ামুগ্ধ মনের মায়াজ্ঞান?

এই যে বাষ্পীয় শকটে যাইতে ২ তুমি চতুর্দ্দিকস্থ বৃক্ষগণকে চলিতে দেখ, পরে কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলে বুঝিতে পার, রেল গাড়ীর গতি বশাৎ বৃক্ষগুলি বিপরীতদিকে চলিতেছে; আবার যখন তুমি ভাবিতে থাক, ধরিত্রী স্বয়ং উহার পৃষ্ঠস্থ যাবতীয় পদার্থ ও চতুর্দ্দিকস্থ বায়ুরাশি লইয়া ব্যোমমার্গে অমিতবেগে ঘূর্ণ্যমান, তজ্জন্য প্রত্যহ সূর্য্যকে প্রাতঃকালে পূর্ব্বদিকে উদয় হইতে ও পশ্চিমদিকে অস্ত যাইতে দেখ এবং রাত্রিকালে আকাশস্থ যাবতীয় নক্ষত্রমণ্ডল ধ্রুব তারার চতুর্দ্দিকে শিশুমারচক্রে পরিভ্রমণ করিতে দেখ। ইহাই কি তোমার মায়ামুগ্ধ মনের মায়াজ্ঞান?

এই যে একজন পথিক উত্তপ্ত মরুভূমিতে যাইতে যাইতে পিপাসায় আতুর হইয়া পুরোভাগে জলাশয় দেখে এবং জলপানার্থ যেমন উহার দিকে ধাবমান হয়, তেমনি জলাশয়টী আরও দূরে সরিয়া যায়। ইহাই কি মৃগতৃষ্ণিকায় ভ্রান্ত পথিকের মায়ামুগ্ধ মনের মায়া জ্ঞান?

এই যে উদয়াস্ত সময়ে সকলে সূর্য্যদেবকে অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার দেখে, ইহাও কি উহাদের মায়ামুগ্ধ মনের মায়াজ্ঞান?

উপরোক্ত দৃশ্যপটল আদৌ মানবের মায়াজ্ঞান নহে। উহারা চক্ষের সামান্য ভ্রান্তিদর্শন মাত্র। বিজ্ঞান উহাদের যুক্তিসঙ্গত কারণ নির্দ্দেশ করে এবং এরূপ ভ্রান্তি দর্শনোৎপাদনে যে মহামায়ার কথা উপরে লিখিত হইল, তাহার কিছুমাত্র অনুশাসন নাই।

কিন্তু এই যে অশ্বত্থ বৃক্ষ, যাহা বিশাল ও বিস্তৃত শাখা-প্রশাখা লইয়া তোমার পুরোভাগে দণ্ডায়মান, যাহার প্রতিকৃতি তোমার নয়নদ্বয়ের অভ্যন্তরে

বিপরীতভাবে প্রতিবিম্বিত এবং যাহার রূপ তুমি জন্মাবধি একরূপ দেখিতেছ, ইহাই তোমার মায়ামুগ্ধ মনের মায়াজ্ঞান। প্রকৃতি ঐ বৃক্ষের সহিত তোমার চক্ষু ও মনের যেরূপ সম্বন্ধ স্থিরীকৃত করিয়া দিয়াছে, তাহাতে তুমি আজ উহাকে যেরূপ দেখিতেছ, চিরকাল সেইরূপ দেখিবে এবং মানবমাত্রেই সেইরূপ দেখিবে। আলোক যোগে বৃক্ষটীর যেরূপ প্রতিবিম্ব তোমার নয়নদ্বয়ে পতিত হয়, অধ্যাসবশতঃ তুমি উহার সাধারণ রূপটী নয়ন গোচর কর এবং বাহ্য জগতে উহার অবস্থিতি অনুভব কর। তুমি কদাচ বলিতে পার না, উহার বাস্তব রূপ কি প্রকার। এস্থলে প্রকৃতি ঐ বৃক্ষকে যেমন দেখাইতেছে বা দেখিতে দিয়াছে, আমরা সেইরূপ দেখিতেছি মাত্র। এতদ্ব্যতীত আমরা আর কিছুই জানি না এবং জানিবার উপায়ও নাই।

আবার তুমি ঐ বৃক্ষটীকে একরূপ দেখিতেছ; একটী পিপীলিকা উহাকে কিরূপ দেখে, তাহাও তুমি জান না। তুমি উহার বিষয় একরূপ ভাব, একজন জন্মান্ধ কিরূপভাবে, তাহাও তুমি বলিতে পার না। ইহাতে কি বুঝিতে পারিতেছ না, যে অশ্বত্থ বৃক্ষটীর জ্ঞান তোমার মায়ামুগ্ধ মনের মায়াজ্ঞান মাত্র। সেইরূপ জগতের যাবতীয় পদার্থকে প্রকৃতি ইন্দ্রিয়যোগে যেমন দেখাইতেছে, আমরা তেমনি দেখিতেছি। অতএব উহাদের জ্ঞান আমাদের মায়াজ্ঞান মাত্র। এখন যে মায়ার মহাপাশে আবদ্ধ হইয়া অথবা যে মায়ার মহাঠুলি ধারণ করিয়া আমরা যাবতীয় পদার্থের মায়াজ্ঞান লাভ করি, তাহাই মহামায়া।

এ স্থলে দৃষ্টান্ত দ্বারা এ বিষয়টী আরও বিশদরূপে বুঝাইতেছি। সকলেই ত চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় দেখেন এবং ইহার স্নিগ্ধ, উজ্জ্বল কিরণছটা দর্শনে বিমুগ্ধ হন। চন্দ্র ও ইহার কলঙ্ক কবিগণের মনে কতপ্রকার কল্পনার উদ্রেক করে। কিন্তু বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত জানেন, চন্দ্র ও পৃথিবীর ন্যায় জড়পিণ্ড, ইহার আলোক আদৌ নাই, সূর্য্যের আলোক পাইয়া ইহা জ্যোতির্ম্ময় দেখায় এবং ইহার পৃষ্ঠস্থ বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বতকন্দরাদিতে সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ না করাতে ঐ সকল আমাদের চক্ষে কলঙ্কস্বরূপ প্রতীয়মান হয়। এখন চন্দ্র সম্বন্ধে শেষোক্ত ব্যক্তির জ্ঞান যদি বাস্তব জ্ঞান হয়, এতৎ সম্বন্ধে জনসাধারণের জ্ঞানকে আমরা মিথ্যাজ্ঞান

বা মায়াজ্ঞান বলিব। সেইরূপ আকাশস্থ যাবতীয় নক্ষত্র ও তারাগণ আমাদের চর্ম্মচক্ষে হীরকখণ্ডস্বরূপ দেখায় বটে ; বস্তুতঃ উহারা সুবিশাল সূর্য্যের ন্যায় এক এক সৌর জগতের কেন্দ্র। উহাদের সাধারণ জ্ঞান আমাদের মায়াজ্ঞান মাত্র।

এখন বুঝিয়া দেখ, জগতের যাবতীয় পদার্থের যে রূপ আমরা সচরাচর নয়ন গোচর করি, তাহা উহাদের বাস্তব রূপ (Neumenon) নহে, উহাদের মায়ারূপ (Phenomenon) মাত্র। যথার্থ বলিতে কি, এ স্থলে প্রকৃতি দর্শনেন্দ্রিয় যোগে উহাদের যে রূপ বা আকৃতি দেখায়, আমরা তাহাই দেখি মাত্র। তদ্ভিন্ন আর কিছুই দেখি না বা কখন দেখিতে পাইব না। ইহাতে বুঝা উচিত, এ জগৎ মায়াময় এবং আমরা মায়াঠুলি পরিয়া ভবের হাটে আলোকে ও আঁধারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি।

যতদিন আমরা মায়ায় মুগ্ধ হইয়া এ মায়াময় জগতে বিচরণ করি, ততদিন মায়াজনিত জ্ঞানই আমাদের নিকট চিরদিন মহাসত্য জ্ঞানে পূজিত হয় এবং উহাকে কদাচ মিথ্যাজ্ঞান বলিয়া বুঝিতে পারি না ; এজন্য আমরা আলোকে আছি। বস্তুতঃ ঐ জ্ঞান আমাদের মিথ্যাজ্ঞান এবং এই বিশ্বপ্রপঞ্চ আমাদের নিকট চিররহস্যময়, এজন্য আমরা ঘোর অন্ধকারে আছি।

ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ই প্রকৃতিদত্ত মহামায়ার মহাঠুলি। ইহাদের কার্য্যকলাপ বিশদরূপে ব্যাখান করা আবশ্যক। পঞ্চেন্দ্রিয়ই মনের দ্বারস্বরূপ এবং ইহাদের দ্বারাই মন বাহ্য জগতের জ্ঞান লাভ করে। ইহারা না থাকিলে জগৎ যে কিরূপ, তাহা আমরা আদৌ জানিতাম না। অনেকের বিশ্বাস, জগৎ পঞ্চেন্দ্রিয় যোগে মনের বিকার মাত্র Scopenhau" says "Nature is non-existent per se. It is the infinite illusin of our senses." স্কোপেনহর বলেন, প্রকৃতি স্বয়ং অস্তিত্বশূন্য ; ইহা কেবল পঞ্চেন্দ্রিয়ের অনন্ত ভ্রান্তি।"

পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যে চক্ষু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পদার্থনিচয়ের জ্ঞানলাভে চক্ষুই আমাদের প্রধান সহায়। ইহা দ্বারা আমাদের বর্ণজ্ঞান, রূপজ্ঞান আকৃতিজ্ঞান প্রভৃতি সকলপ্রকার জ্ঞান জন্মে। চক্ষু না থাকিলে, জগৎ যে কি, তাহা আমরা আদৌ জানিতাম না।

প্রকৃতির নিয়ম এই, পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যে যদি কোন ইন্দ্রিয়ের অভাব হয়, অপরগুলি সেই অভাব পূরণ করিতে চেষ্টা পায়; যেমন অন্ধের যষ্ঠি স্পর্শযোগে অনেক স্থলে চক্ষের কার্য্য করে। এ কারণ দর্শনশক্তি নষ্ট হইলে, শ্রবণশক্তি ও স্পর্শজ্ঞান অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।

এ সংসারে মনের সহিত চক্ষুর সম্বন্ধ যেরূপ এবং উহাদের প্রকৃতি যেরূপ, তাহাতে দর্শনশক্তি দ্বারা সকলে যাবতীয় পদার্থের সাধারণতঃ এক প্রকার জ্ঞান লাভ করে। এখন যদি কোন পীড়া বশতঃ চক্ষুদ্বয় বিকৃত হইয়া যায়, পদার্থ বিশেষের জ্ঞানও তখন অন্যরূপ হইবে। যদি মন বিকৃত হইয়া যায়, উত্তম চক্ষু সত্বেও উহার জ্ঞান অন্যরূপ হইবে।

আরও দেখ, যখন তোমার নয়নদ্বয় এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সম্মুখে উন্মীলিত হয় এবং তোমার মন ঐ দিকে ধাবিত হয়, তখন তুমি ইহার বিচিত্র রূপ দর্শনে বিমুগ্ধ হও। চক্ষুদ্বয় নিমীলিত করিয়া দেখ, সেই অপরূপ দৃশ্যটী তোমার মানসপট হইতে অন্তর্হিত হইবে এবং জগৎও ঘোরান্ধকারে আবৃত হইবে। তখনই তুমি স্পষ্ট বুঝিতে পার, এ বিশ্বপ্রপঞ্চ কেবল চোকের ভেল্‌কি।

তাহার সাক্ষ্য, একজন জন্মান্ধকে জিজ্ঞাসা কর, তোমার সম্মুখস্থ বৃক্ষ বিশেষের বা জন্তুবিশেষের স্বরূপ কি প্রকার অথবা উহাকে তুমি কি প্রকার জানিয়া আসিতছ? দর্শন ব্যতীত অন্যান্য ইন্দ্রিয় যোগে তাহার মনে ঐ পদার্থের বা জন্তুর যেরূপ জ্ঞান ও স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, তাহাই সেই হতভাগ্য ব্যক্তি তৎকালে উল্লেখ করিবে। সংসারে রূপজ্ঞান ও আকৃতিজ্ঞান তাহার আদৌ নাই; সেজন্য তাহার পদার্থনিচয়ের জ্ঞান ও তোমার সাধারণ জ্ঞান, উভয়ের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য আছে। তুমি দণ্ডায়মান হইয়া জিজ্ঞাসা কর, আমি কি অবস্থায় আছি? সে ত তোমায় দেখিতেছে না; কিন্তু তোমার বাক্য উচ্চ দেশ হইতে নিঃসৃত হইতেছে শ্রবণ করিয়া, সে ব্যক্তি বলিবে, তুমি দণ্ডায়মান আছ। এইরূপ প্রত্যেক পদার্থ লইয়া তোমার মায়াজ্ঞানে ও তাহার মায়া জ্ঞানে বিস্তর পার্থক্য আছে, কিন্তু তোমার মায়াজ্ঞান তোমার নিকট যেরূপ মহাসত্য, তাহার মায়াজ্ঞানও তাহার নিকট সেইরূপ মহাসত্য। ইহাতে বুঝিয়া দেখ, ইন্দ্রিয়গণ জীবমাত্রকে কিরূপ নিগড় বন্ধনে বাঁধিতেছে।

জীবজগৎ পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায়, অনেক নিকৃষ্ট জীবে ইন্দ্রিয়গণ অতি অস্ফুট ভাবে বিদ্যমান; এমন কি কোন ২ জীবে এক বা ততোধিক ইন্দ্রিয়ের অভাব দৃষ্ট হয়; অথচ সকলেই দেহযাত্রানির্ব্বাহোপযোগী যাবতীয় কর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পাদন করে। প্রকৃতি যাবতীয় জীবজন্তুকে স্ব স্ব অবস্থার উপযোগী করিয়া দেয়। ইহাতে বোধ হয়, সকল জীবের মায়াজ্ঞানে কিছু না কিছু তারতম্য আছে। যে জীব যে অবস্থায় অবস্থিত, উহার মায়াজ্ঞান তদবস্থোপযোগী। পিপীলিকা মিষ্টান্ন দেখিয়া পাঁচজনকে কিরূপে ডাকে, তাহা উহারাই বুঝিতে পারে।

যে মহামায়ার মহাপাশে এই ব্রহ্মাণ্ড বিমুগ্ধ, ইনি কে জান? ইনি পরব্রহ্মের আদ্যাশক্তি এবং শাস্ত্রানুসারে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি। যে প্রকৃতিপুরুষের সংযোগে সৃষ্টি, স্থিতিও সংহার চলিতেছে তন্মধ্যে পরব্রহ্ম পুরুষরূপে উদাসীন এবং মহামায়াই পুরুষার্থপ্রবর্ত্তিণী প্রকৃতিরূপিণী তদীয় আদ্যাশক্তি। প্রকৃতপক্ষে ইনিই সৃষ্টি স্থিতি সংহারকর্ত্রী ইঁহার অনুশাসন সর্ব্বত্র সমভাবে চলিতেছে। যাবতীয় ভৌতিক শক্তি, যাহাদের ঘাত প্রতিঘাতে এ জগৎ চলিতেছে, সকলেই সেই মহাশক্তির কণামাত্র বা রূপান্তর মাত্র। জগতের যে অনন্তরূপ, অনন্ত বৈচিত্র্য ও অনন্ত শোভা দেখিতেছে, সকলই মহামায়ার মহালীলা বশতঃ ঘটিতেছে।

এই মহামায়াকে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম আমাদিগকে জগদম্বারূপে পূজা করিতে শিখায়। যেস্থলে একেশ্বরবাদী ধর্ম্ম প্রকৃতিপুরুষের যাবতীয় কর্ম্ম একেশ্বরে অর্পণ করিয়া একটা অসত্য পথ দেখায়, সেস্থলে পৌত্তলিক হিন্দুধর্ম্ম একমাত্র জগতে প্রকৃতিপুরুষের কার্য্যানুসারে পরমাত্মার যথার্থ স্বরূপ ও জগদম্বার যথার্থ রূপ দেখাইয়া আমাদিগকে সত্যের পথে লইয়া যাইতেছে।

মানবের জ্ঞানশক্তি।

মানব আজ সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর। তাঁহার বুদ্ধিবলে এই শ্মশানসদৃশা পর্ব্বতজঙ্গলাকীর্ণা মেদিনী আজ কবিগণের মনঃকল্পিত নন্দন-কাননে পরিণত! এখন তিনি অনন্ত সুখৈশ্বর্য্যে বিভূষিত হইয়া যাবতীয় জীবজন্তুর উপর একাধিপত্য করিতেছেন। অধিকাংশ ইতর জন্তু তাঁহার সেবায় অনুরক্ত সকলেই তাঁহার ভয়ে ভীত ও ত্রস্ত। বনের মত্ত মাতঙ্গ আজ তাঁহার নিকট আলানে

নিবদ্ধ, এবং তাঁহার অঙ্কুশে জর্জ্জরিত হইয়া তাঁহার আদেশপালনে একান্ত ব্যগ্র। করিকুম্ভখাদক বনের কেশরী ও শার্দ্দূল তাঁহার বন্দুকের ভয়ে কম্পমান এবং স্থলবিশেষে তাঁহার নিকট ভৃত্যভাবে দণ্ডায়মান। অধিক আর কি বলিব, অমিততেজস্বিনী চিররহস্যময়ী প্রকৃতদেবীও এখন তাঁহার সেবায় অনুরতা। বাষ্প ও তাড়িৎ এখন ভৃত্যভাবে তাঁহার নিকট যোড়হস্তে দণ্ডায়মান এবং তাঁহার আদেশপালনে একান্ত তৎপর।

বলি, কি গুণে তিনি এ জগতে এমন শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিলেন? কি মোহিনী শক্তি বলে, কি যাদু বলে তিনি আজ সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া এমন একাধিপত্য করিতেছেন? একমাত্র জ্ঞানশক্তিতে বিভূষিত হওয়ায় তাঁহার এতদূর পদ-বৃদ্ধি, এতদূর সুখৈশ্বর্য্যলাভ ও এতদূর একাধিপত্য হইয়াছে। এই জ্ঞানশক্তির ক্রমোন্নতিতে তাঁহার ভাগ্যে এমন ঐশ্বর্য্যলাভ, সমৃদ্ধিলাভ ও সুখলাভ ঘটিয়াছে। বর্ব্বর মানব ও সুসভ্য দেশের সুসভ্য মানব, উভয়ের অবস্থা তুলনা করিলে জ্ঞানশক্তির প্রভাব বুঝা যায়।

যে স্থলে বর্ব্বর মানব পর্ব্বতগুহায়, বৃক্ষকোটরে বা পর্ণ কুটীরে থাকিয়া শীত, গ্রীষ্মে ও বৃষ্টিতে নানা কষ্ট পায়, সে স্থলে সুসভ্য মানব সুরম্য হর্ম্ম্যে বাস করিয়া দারুণ গ্রীষ্মে ও দারুণ শীতে কিছুমাত্র কষ্ট না পাইয়া মনের আনন্দে দিন যাপন করেন। যে স্থলে প্রথমোক্ত সহজাত বন্য ফলমূলে বা নিকৃষ্ট জন্তুর আম মাংসে দগ্ধোদর পূরণ করিয়া অতৃপ্ত, সে স্থলে শেষোক্ত চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়াদি নানা সুখাদ্য ভোজন করিয়া অশেষ রূপে পরিতৃপ্ত হন। যে স্থলে প্রথমোক্ত উলঙ্গ, বল্কলধারী বা অজিনধারী, সে স্থলে শেষোক্ত বিবিধ মনোহর বস্ত্রে ও বহুমূল্য আভরণে বিভূষিত হইয়া সকলের নিকট আপনার বাহার দেখান।

যে স্থলে বর্ব্বর মানব প্রস্তরময় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া প্রাকৃতিক প্রতি-দ্বন্দ্বিবর্গের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত ও উহাদের ভয়ে ভীত, সে স্থলে সুসভ্য মানব লৌহাস্ত্রে ও আগ্নেয়াস্ত্রাদিতে সুসজ্জিত হইয়া উহাদিগকে নিমিষ মধ্যে সংহার করেন বা পদানত করেন। যে স্থলে প্রথমোক্ত মনের ভাব কদর্য্য ভাষায় ব্যক্ত করে এবং কাব্য সাহিত্যাদির কিছুমাত্র আস্বাদ না পাইয়া পশুতুল্য হয়, সে স্থলে শেষোক্ত বিবিধ কাব্যাদি প্রণয়ণ ও পাঠ করিয়া অশেষ জ্ঞান বিজ্ঞান

অনুশীলন করিতে করিতে দেবতুল্য হন। অধিক আর কি বলিব, যে দিন মহাত্মা কলম্বস দুস্তর আটল্যান্টিক মহাসাগর পার হইয়া আমেরিকার এক দ্বীপের উপকূলে দণ্ডায়মান হন, সে দিন তত্রত্য আদিম নিবাসিগণ উঁহাদিগকে স্বর্গের দেবতা মনে করিয়া বিস্মিত হইয়াছিল। ইহাতে বুঝা যায়, মানব জ্ঞানানুশীলন করিতে করিতে স্বকীয় অবস্থা কতদূর উন্নত করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

জীবজগৎ পর্য্যালোচনা করিতে করিতে বিজ্ঞান সিদ্ধান্ত করে, মনের দুই প্রকার শক্তি আছে, যথাঃ—

(১) জ্ঞানশক্তি (Reason) (২) নৈসর্গিক সংস্কার (Instinct) জ্ঞানশক্তি মানবে পূর্ণমাত্রায় এবং ইতর জন্তুবর্গে ঈষন্মাত্র বিকসিত; অপরপক্ষে নৈসর্গিক সংস্কার ইতর জন্তুবর্গে পূর্ণমাত্রায় ও মানবে ঈষন্মাত্র বিকসিত।

ইহারা বিরুদ্ধভাবাপন্ন। যে জীবে একটীর প্রবল বিকাশ ঘটে, অপরটী প্রায় লোপ পায়; এজন্য মানবে নৈসর্গিক সংস্কার খর্ব্ব হইয়া জ্ঞানশক্তি প্রবল; আর ইতর জন্তুবর্গে জ্ঞানশক্তি খর্ব্ব হইয়া, নৈসর্গিক সংস্কার প্রবল।

ইহাদের তারতম্য বিস্তর। ইতর প্রাণিগণ যদৃচ্ছালব্ধ বা প্রকৃতিদত্ত আহার্য্যে উদর পূরণ করে; কিন্তু মানব বুদ্ধিবলে কৃষিকার্য্য দ্বারা গোধূমাদির পুষ্টিকরত্ব বর্দ্ধন করিয়া নানারূপ খাদ্য উদ্ভাবন করত নিজের উদর পূরণ করিতে শিক্ষা করেন। অপরাপর জন্তু প্রকৃতিদত্ত পরিধেয়ে পরিহিত; এ বিষয়ে উঁহাদের কিছুমাত্র চিন্তা নাই। যে স্থলে যেমন আবশ্যক, প্রকৃতি উঁহাদিগকে সেইরূপ সরবরাহ করে। কিন্তু মানবকে দেশভেদেও কালভেদে রীতিমত পরিধান উদ্ভাবন, নির্ম্মাণ ও অর্জ্জন করিয়া লইতে হয়। জ্ঞানশক্তির উন্মেষের সঙ্গে তদীয় হৃদয়ে লজ্জা স্ফুরিত হওয়ায় তন্নিবারণার্থ তাঁহাকে পরিধান ব্যবহার করিতে হয়।

নিকৃষ্ট জন্তুগণ যদৃচ্ছালব্ধ আবাসে বাস করে; কিন্তু মানব নিজ বুদ্ধিবলে নানাবিধ উপাদান লইয়া যথোপযুক্ত সুন্দর বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া সপরিবারে বাস করেন। যেমন মধুমক্ষিকা, বীবর, পিপীলিকা, বাবুই প্রভৃতি জীবগণ

মানবের অসাধ্য অপরূপ বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া নৈসর্গিক সংস্কারের অশেষ কৃতিত্ব দেখায়, মানব ও সেইরূপ পদ্মার ন্যায় সুবিশাল নদী সেতু দ্বারা বাঁধিয়া ও তাজমহলের ন্যায় সুরম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিয়া জ্ঞানশক্তির পূর্ণ প্রতাপ দেখান।

ইতর প্রাণিগণের নৈসর্গিক সংস্কার প্রকৃতি কর্তৃক চালিত হওয়ায় সকল সময়ে সম্পূর্ণ থাকে, কদাচ ভ্রমে পতিত হয় না। উহারা চিরদিন প্রাকৃতিক সাম্যাবস্থায় থাকে। উহাদের যেমন উন্নতি নাই, তেমনি অবনতিও নাই। কিন্তু মানবের জ্ঞানশক্তি প্রকৃতির কোনরূপ সহায়তা না পাইয়া সকল সময়ে ইহার বিপক্ষে গমন করে ও নানা ভ্রমে পতিত হয়। এ জগতের সমস্ত বিষয়ই তাঁহাকে হাতে হেতড়ে শিখিতে হয়। ভূমিষ্ঠ হইবার পর মৃত্যু পর্য্যন্ত আজীবন তাঁহাকে কেবল শিক্ষা করিতে হয়। বুদ্ধিশক্তি অসম্পূর্ণ হওয়ায়, যদিও তিনি নানা ভ্রমে পতিত হন, কিন্তু ভূয়োদর্শনের গুণে তাল খাইতে খাইতে বা ঠেকিতে ঠেকিতে সমস্ত ভ্রম বিদূরিত করেন এবং ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হন। এইরূপে সাধন বলে, অনুশীলন বলে তিনি জ্ঞানশক্তির ক্রমোন্নতি লাভ করিয়াছেন। ইহার ফল স্বরূপ তিনি যে সভ্যতাহর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহাও সর্ব্বথা অপরূপ ও অলৌকিক।

হিন্দুশাস্ত্র বলে :—

আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনাঞ্চ
সামান্যমেতৎ পশুভি র্নরাণাং।
জ্ঞানংহি তেষামধিক বিশেষং
জ্ঞানেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ।

"আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন, এ সকল বিষয়ে ইতর প্রাণীতে ও মানবে কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। কেবল মাত্র জ্ঞান থাকাতে মানব সকল জীবজন্তু হইতে পৃথক। যাঁহার জ্ঞান নাই, তিনি পশুর সমান।"

অধ্যাত্মবিজ্ঞানের মতে সংসারে তিন প্রকার শক্তি দেখা যায়, যথা :—

(১) আধ্যাত্মিক শক্তি।

(২) জ্ঞানশক্তি।

(৩) নৈসর্গিক সংস্কার।

ইতর প্রাণিগণে নৈসর্গিক সংস্কার অধিক মাত্রায় ও জ্ঞানশক্তি ঈষন্মাত্র স্ফুরিত, সেইরূপ আধুনিক মানবে, কলিকালে জ্ঞানশক্তি অধিক মাত্রায় এবং আধ্যাত্মিক শক্তি ও নৈসর্গিক সংস্কার ঈষন্মাত্র স্ফুরিত। একমাত্র সূক্ষ্মজগৎস্থ দেবগণে (gods and augels) আধ্যাত্মিক শক্তি পূর্ণভাবে বিকসিত।

হিন্দুশাস্ত্র ও থিওসফি বলে, মানব দেবযোনি হইতে ভ্রষ্ট হওয়ায় একদিকে তাঁহার আধ্যাত্মিক পতন ও অপর দিকে জ্ঞানশক্তির উন্মেষ ঘটিয়াছে। আধ্যাত্মিক শক্তির মধ্যে যে সংস্কার দ্বারা তিনি এখন হিতাহিত ও ঈশ্বরজ্ঞান প্রাপ্ত হন, কেবলমাত্র তাহাই অবশিষ্ট আছে। ইহাকে ইংরাজিতে Spiritual Intuition বলে। নিকৃষ্ট জন্তুগণে আধ্যাত্মিক শক্তি আদৌ স্ফুরিত হয় না, এজন্য উহারা ধর্ম্মপ্রবৃত্তি হইতে চির-বঞ্চিত। ইহাতে বুঝা উচিত, দেবযোনি, মানবযোনি ও নিকৃষ্টযোনির ভিতর কিরূপ পার্থক্য আছে।

মানবহৃদয়ের ধর্ম্মপ্রবৃত্তিগুলি আত্মার আধ্যাত্মিক শক্তি হইতে আইসে। মনের জ্ঞানশক্তি হইতে বুদ্ধিবৃত্তি, চিন্তাশক্তি স্মরণশক্তি প্রভৃতি আইসে। যে মানবে আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ অধিক, তাঁহার ধর্ম্মপ্রবৃত্তিগুলি স্বভাবতঃ বলবতী এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানে তাঁহার মন স্বতঃ ধাবিত হয়। যাঁহার জ্ঞানশক্তি অধিক বিকসিত, তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি স্বভাবতঃ বলবতী এবং তিনি দুরূহ বিষয় সহজে শিক্ষা করেন। বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি লইয়া সংসারে বিস্তর তারতম্য দেখা যায়। এজন্য কেহ অতিধার্ম্মিক, কেহ বা ঘোর পাপাচারী; কেহ প্রতিভাশালী, কেহ বা একেবারে নির্ব্বোধ ও গোবরগণেশ।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, মানবের জ্ঞানশক্তি কি প্রকারে উদ্ভূত হইল? বিজ্ঞান এখনও মনের গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হয় নাই বটে, তথাচ ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত, বিবর্দ্ধিত মস্তিষ্ক। জ্ঞানশক্তির আধার বা যন্ত্র। দেখিতে পাওয়া যায়, কশেরুকা মজ্জা (Spinal cord) মেডুলা অবলঙ্গেটা ও মস্তিষ্কের তলদেশের স্নায়ুগ্রন্থিমণ্ডলীর ক্রিয়া সম্বন্ধে অন্যান্য জন্তুদিগের সহিত মানবের বিশেষ সৌসাদৃশ্য আছে। ইহারা নৈসর্গিক সংস্কারের যন্ত্র। কিন্তু মানবমস্তিষ্কের উপরিস্থ স্তরগুলি যাহা ঘৃতবৎ দর্ব্বুলাকার পদার্থে (Convolutions of the brain) পূর্ণ এবং যাহাকে ইংরাজিতে সেরিব্রাম (Cerebrum) বলে, তাহাই অধিক স্ফুরিত হওয়াতে তাঁহার জ্ঞানশক্তি উৎপন্ন হইয়াছে।

বর্ব্বর মানবের মস্তিষ্ক অপেক্ষা সুসভ্য দেশের প্রতিভাশালী ব্যক্তির মস্তিষ্কের গুরুত্ব অধিক হইলেও উহাদের প্রকারগত প্রভেদ অল্প, কিন্তু প্রথমোক্তদের মস্তিষ্কের সহিত বানর ও বনমানুষের মস্তিষ্কের প্রভেদ অত্যন্ত অধিক। ইহাতে সিদ্ধান্ত করা উচিত, মানববুদ্ধি এ জগতে বৈশেষিক (অর্থাৎ) একমাত্র মানবে ঐ প্রকার বুদ্ধিশক্তি দেখা যায়।

আবার নিকৃষ্ট জন্তুবর্গের সেরিব্রাম অল্পাধিক স্ফুরিত হওয়ায় উহাদের অল্পাধিক বুদ্ধির বিকাশ দেখা যায়। ইহাতে অনেকে বলেন, মানববুদ্ধি সম্পূর্ণ বৈশেষিক নহে। তাঁহাদের মতে জীবজগতে যে বুদ্ধিশক্তি বিক্ষিপ্ত আছে তাহাই সমষ্টিভাবে একাধারে মানবে অর্পিত হইয়াছে।

অনুশীলন ব্যয় সাধন বলে মানববুদ্ধি ক্রমশঃ উন্নত ও স্ফুরিত হইতে থাকে। কিন্তু প্রকৃতি ইতর জন্তুবর্গকে আদৌ এ ক্ষমতা প্রদান করে নাই। উহাদের উন্নতিও নাই, অবনতিও নাই। ইহাতেও সিদ্ধান্ত করা উচিত, মানববুদ্ধি এ জগতে বৈশেষিক।

অন্য কোন জন্তু অগ্নি উৎপাদন করিতে পারে না, মনোভাব ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারে না। কিন্তু অতি বর্ব্বর মানবও উপরোক্ত দুই ক্ষমতায় বিভূষিত। ইহাতেও সিদ্ধান্ত করা উচিত, মানববুদ্ধি এ জগতে বৈশেষিক।

জনসাধারণের বিশ্বাস, মস্তিষ্ক জ্ঞানশক্তির যন্ত্র বটে, কিন্তু হৃদয় ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও ভাবাবলির স্থান। বিজ্ঞান এ কথার তীব্র প্রতিবাদ করে। খেদের সময় হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া মন্দীভূত হয় এবং আনন্দের সময় ইহার ক্রিয়া দ্রুতবেগে চলে এবং যুগপৎ নিশ্বাসও দ্রুত বহিতে থাকে। মনে হঠাৎ খেদ উপস্থিত হইলে Inhibitory branches of the Vagus এর ক্রিয়া দ্বারা হৃৎপিণ্ডের কার্য্য মন্দীভূত হয় এবং বোধ হয় বক্ষের ভিতর চাপিয়া যেন বসিয়া গেল। সেইরূপ আনন্দের সময় Accelerating branches of the same nerve এর ক্রিয়া দ্বারা হৃৎপিণ্ডের কার্য্য দ্রুতবেগে চলিতে থাকে এবং নিশ্বাস দ্রুত বহিতে থাকে, তাই এই দুই ঘটনা হইতে সাধারণের উপরোক্ত ভ্রম উৎপন্ন হইয়াছে। বস্তুতঃ ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও ভাবাবলির স্থানও মস্তিষ্কই, সকলের মূলাধার।

কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, কতদিন হইল, মানবের জ্ঞানশক্তি উদ্ভূত হইয়াছে? ভূতত্ত্ববিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত এই যে, ভৌতত্ত্বিক চতুর্থ যুগে (Quartern

period) মানব অতি বর্ব্বর অবস্থায় অস্ফুরিত জ্ঞানশক্তি লইয়া এ জগতে আবির্ভূত হন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিজ্ঞান এ ঘটনার নিরূপিত সময় এখনও ভালরূপ নির্দ্দেশ করিতে পারে নাই।

বাইবেল পাঠে অবগত হওয়া যায়, মানবজাতির আদিপুরুষ আদাম ও ঈভ সর্ব্বপ্রথমে ঈডেন উদ্যানে (Eden Garden) পূতাত্মা, ধর্ম্মাত্মা ও সর্ব্বসুখে সুখী ছিলেন।* পরে সয়তানের প্রলোভনে ঈভ নিষিদ্ধজ্ঞানবৃক্ষফলের আস্বাদ পাইয়া নিজ স্বামী আদামকে সেই ফল ভোজন করান। ইহাতে উভয়ে পতিত হইয়া সংসারের বিবিধ শোকতাপে জড়িত হন। তদবধি সমগ্র মানবজাতির পতন হইয়াছে।

এই শ্রুতিমনোহর উপাখ্যানের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? ইহাতে বুঝা উচিত জ্ঞানশক্তি স্ফুরিত হইবার পূর্ব্বে আধুনিক মানবজাতির পূর্ব্বপুরুষগণ আধ্যাত্মিক শক্তিতে বিভূষিত থাকায় ধর্ম্মাত্মা, পূতাত্মা ও সর্ব্বসুখে সুখী ছিলেন। যখন ঈভ নিজ স্বামী আদামকে প্রলোভিত করিয়া জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভোজন করান, তখন বুঝা উচিত, মানবজাতি স্ত্রীপুরুষে বিভক্ত হইয়া আধুনিক মৈথুনধর্ম্ম জগতে প্রবর্ত্তিত হইলে তদীয় মনে জ্ঞানশক্তির উন্মেষ আরম্ভ হয়। শাস্ত্রপাঠে জানা যায়, এ ঘটনাটি দ্বাপরযুগের মধ্যভাগে দৈত্যাসুরদিগের সময় সংঘটিত হয়।

অধ্যাত্মবিজ্ঞান চিরদিন উপদেশ দেয়, প্রাচীন যুগের মনুপুত্রগণের (দেবাসুরদিগের) আধ্যাত্মিকতা কালক্রমে অপগত হওয়াতে ও যুগধর্ম্মে প্রকৃতিজগতে স্থূলত্বের ক্রমোন্নতি হওয়াতে আধিভৌতিক উন্নতিসাধিকা জ্ঞানশক্তি মানবমনে ক্রমশঃ স্ফুরিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক সময়ে যে সভ্যতাস্রোত মানবসমাজে বর্দ্ধিত হইতে দেখা যায়, তাহা একমাত্র জ্ঞানশক্তির ক্রমোন্নতি বশতঃ সংঘটিত হইয়াছে। প্রাচীন যুগের সভ্যতার বিষয় আমরা কিছুই অবগত নহি।

এখন দেখা যাউক, জ্ঞানশক্তির প্রকৃতি কিরূপ? ইহা একমাত্র পঞ্চেন্দ্রিয়লব্ধ বিষয় দ্বারা সীমাবদ্ধ হইয়া আছে। ইন্দ্রিয়গণ যাহা জানায়, তাহাই আমরা জানি, তদ্ব্যতীত আর কিছু জানিবার উপায় নাই। কেন এরূপ হইল? যে আত্মা পরমাত্মার অংশ, ইনি ত সর্ব্বজ্ঞ ও অনন্ত শক্তিতে বিভূষিত। এই কর্ম্মদেহে নিবদ্ধ হইলে ইনি পঞ্চেন্দ্রিয়ের গণ্ডফাঁদে পতিত হইয়া সব

হারাইয়া বসেন। এজন্য এখন ইহার এত দুর্গতি এবং মানবমনও এরূপ সীমাবদ্ধ।

জ্ঞানশক্তির প্রকৃতি যেরূপ, তাহাতে কস্মিন কালে আমরা কোন বিষয়ের আদি ও অন্ত পাইব না, চিরদিন ইহার মধ্যস্থিত গুণাগুণ ইন্দ্রিয়যোগে বিচার করিতে থাকিব। এ জন্য জগৎ আমাদের নিকট দুর্ভেদ্য রহস্যে পূর্ণ।

শাস্ত্রে সকলেই পাঠ করেন, মহারাজা ত্রিশঙ্কু স্বর্গেও যাইতে পারেন নাই, মর্ত্ত্যেও নামিতে পারেন নাই, আকাশের মধ্যস্থলে অবস্থিতি করিয়া ছিলেন। সেইরূপ আমরাও এ সংসারে মহাকালরূপ মহাকাশের বর্ত্তমানরূপ মধ্যস্থলে চিরদিন অবস্থিতি করি। বেশী দূর অগ্রে যাইতে পারি না, পশ্চাৎভাগেও ফিরিয়া চাহিতে পারি না। অগ্রপশ্চাৎ স্বল্প দূর নিরীক্ষণ করি বটে, কিন্তু চিরদিন বর্ত্তমান লইয়াই থাকি। অতীতের কথা যাহা জাতীয় জ্ঞানভাণ্ডারে দেখিতে পাই, তাহাই শিক্ষা করি, ভবিষ্যতের কথা কিছুই জানি না।

এখন আমাদের এই জাগ্রত বর্ত্তমান কিরূপ? যেমন উপরে অনন্ত নীলনভঃ, নিম্নে অনন্ত নীলবারিধি, উভয়ে যে সমতলক্ষেত্রে মিলিত হইতেছে, সেই সমতল ক্ষেত্রকে বর্ত্তমান বলা উচিত। আমাদের সসীম জ্ঞানশক্তি চিরদিন এই বর্ত্তমানক্ষেত্র লইয়া আন্দোলন করে। সত্য বটে, যাহা আজ বর্ত্তমান, দুইদিন পরে উহা অনাদি অতীতের গর্ভে বিলীন হইবে, তথাচ আমরা অতীতের ঈষদ্দূর মাত্র অবলোকন করি। কোটী ২ বৎসর হইল, জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, তন্মধ্যে ইতিহাসে আমরা পঞ্চসহস্র বৎসরের বিষয় অবগত হইমাত্র। সুখের বিষয়, বিজ্ঞান এখন ভূগর্ভের ভিন্ন ২ স্তর অনুসন্ধান ও পর্য্যালোচনা করিয়া অতীতের বিষয় ক্রমশঃ আবিষ্কার করিতেছে।

জগতের মহাসত্য।

চিররহস্যময়ী প্রকৃতির মহারহস্য মীমাংসা করিবার জন্য আমরা চিরদিন একান্ত ব্যগ্র। ইহাতে জগতের নানা সত্য কালে ২ আবিষ্কৃত হইতেছে। অগাধ পর্য্যবেক্ষণ, সন্দর্শন, ভূয়োদর্শন ও অনুচিন্তনের গুণে ইহারা সময় ২ মানবসমাজে প্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু যে সত্য লোকবিশেষের বহু যত্নে ও পরিশ্রমে একবার আবিষ্কৃত ও প্রচারিত হয়, অপরে সে সত্য সহজে শিক্ষা করে।

[illegible] মহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণই অসাধারণ পর্য্যবেক্ষণাদিবলে জগতের মহাসত্য আবিষ্কার করিয়া যশোমন্দিরের অত্যুচ্চ স্থান অধিকার করিয়া থাকেন। সকলেই ত দেখিয়া থাকেন, আতাফল বৃন্তচ্যুত হইলে ভূপতিত হয়; কিন্তু মহাত্মা নিউটন সাহেব এই সামান্য ঘটনাদর্শনে বিশ বৎসর অনুচিন্তন করিয়া বিশ্বজগতের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ও উহার নিয়মাবলী আবিষ্কার করেন। সকলেই ত দেখিয়া থাকেন, জল ফুটিবার সময় বাষ্পের শক্তি [illegible] কিন্তু মহাত্মা ওয়াট সাহেব এই ঘটনা দর্শনে বহুদিন অনুচিন্তন করিয়া বাষ্পীয় কল উদ্ভাবন করত শ্রমশিল্পজগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়া গিয়াছেন।

[illegible] অতি প্রাচীনকালে মহাত্মা ও মহর্ষিগণ যোগ-[illegible] অষ্টসিদ্ধি [illegible] জগতের মহাসত্য অবগত হইতেন। এ কলিযুগে [illegible] জ্ঞানশক্তির উন্মেষ বশতঃ এখন তিনি [illegible] অবগত হইতে চেষ্টা পান। এখন কেবল প্রকৃতি পুস্তক [illegible] জ্ঞানভাণ্ডার অন্বেষণ করিয়া তিনি জগতের মহাসত্য অবগত হইতেছেন।

পুরাকালে দর্শনশাস্ত্র [illegible] দার্শনিক পণ্ডিতগণ জগতের নানা সত্য আবিষ্কার করিয়া [illegible] করিয়াছেন। এখন এই বৈজ্ঞানিক যুগে [illegible] নানাদিকে আবিষ্কৃত হইতেছে। [illegible] জগতের [illegible] ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে এবং যাহা [illegible] তাহাও কালে দৃষ্টি-গোচর হইতেছে। পূর্ব্বে কে ভাবিত [illegible] বাষ্পীয় রথ ও জাহাজ যোগে এমন অনায়াসগম্য হইবে? [illegible] জাহাজযোগে লোকে মৎস্যের ন্যায় গভীর জলধিগর্ভে অবলীলাক্রমে গমনাগমন করিবে এবং এরোপ্লেন যোগে ব্যোমমার্গে স্বচ্ছন্দে উড্ডীয়মান হইবে।

[illegible] অনন্ত জ্ঞানরাশিকে অসীম জ্ঞানসমুদ্র বলা উচিত। ইহার গুপ্ত রত্নরাজিই জগতের মহাসত্য। এই সকল রত্নের অন্বেষণে নানাদেশের নানা পণ্ডিত [illegible] ছুটিতেছেন বটে; কিন্তু অনেকেই ভূতের বেগার খাটেন এবং অল্প লোকের ভাগ্যে কেবল মাণিক দেখা দেয়।

এতকাল মানব জ্ঞানানুশীলন দ্বারা জগতের মহাসত্য আবিষ্কারের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন বটে; কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ পর্য্যন্ত তিনি স্বল্পমাত্র সত্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন। এজন্য জগৎ-বিখ্যাত নিউটন সাহেব বলেন—"জ্ঞানসমুদ্র পুরোভাগে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, আমি কেবল মাত্র উপকূলে দণ্ডায়মান হইয়া উপলখণ্ড সংগ্রহ করিতেছি।" পণ্ডিতবর সক্রেটিস্ বলেন—"আমি এইমাত্র জানি, যে আমি সংসারে কিছুই জানি না।" প্রকৃতির গূঢ়রহস্যজ্ঞ মহাকবি সেক্সপিয়ার যথার্থই বলেন,—Teare are more things in heaven and earth than are dreamed of in your philosophy" তোমার দর্শনশাস্ত্র যাহা কখনও স্বপ্নেও ভাবিতে পারে না এমন অনেক বিষয় স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে আছে। যথার্থ বলিতে কি, যে মায়াঠুলি ধারণ করিয়া আমরা এই মায়াময় জগতে বিচরণ করিতেছি, যথার্থ আলোক উহার ভিতর প্রবেশ করিতে পারে না।

প্রকৃতির মহাসত্য অবগত হওয়া মানবজীবনের এক প্রধান উদ্দেশ্য। যিনি যত সত্যলাভ করিবেন, তাঁহার জীবন তেমনি সার্থক হইবে। "নাস্তি সত্যাৎ পরোধর্ম্মঃ।" সত্যজ্ঞান লাভ করা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম সংসারে আর কিছুই নাই। সত্যজ্ঞান লাভেই মানবের প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ হয়। অধ্যাত্মবিজ্ঞানের সত্য হউক, জড়বিজ্ঞানের সত্য হউক, অথবা অন্য কোন প্রকার সত্য হউক, যে সত্য তুমি শিক্ষা করিবে, তাহাতেই তোমার আত্মা ও মনের উন্নতিলাভ হইবে। এই বৈজ্ঞানিক যুগে নানা বিজ্ঞানশাস্ত্র অনুশীলন করিয়া নানা বৈজ্ঞানিক সত্য লাভ কর বা আবিষ্কার কর, ইহাতেই তোমার মানবজীবন সার্থক হইবে এবং তুমিও সংসারে ধন্য হইবে। আর যদি জীবাত্মার প্রকৃত উন্নতিসাধন করিয়া জীবনের প্রকৃত শ্রেয়োলাভ করিতে চাও, পরমার্থজ্ঞান লাভ করিতে বিশেষ সচেষ্ট হইবে। ইহারই জন্য সনাতন হিন্দুধর্ম্ম চিরদিন জ্ঞানমার্গের সম্যক্ অনুশীলন করিতে উপদেশ দেয়। মনে রাখিও, এই তত্ত্বজ্ঞানলাভেই মহাত্মাগণ সংসারে জীবন্মুক্ত হইয়া গিয়াছেন।

জগতে সত্যের বিনাশ বা ধ্বংস নাই। ইহা চিরদিন সংসারে নিজ জ্যোতি সমভাবে বিকীর্ণ করিয়া আছে। যেমন পরমাত্মা নিখিল বিশ্বে জাজ্বল্যমান, তৎসৃষ্ট মহাসত্যও সেইরূপ আমাদের নিকট অত্যাধিক রহস্যময় হইলেও চিরদিন

সমভাবে চলিতেছে। তাহার সাক্ষ্য, পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক গতির বার্ত্তা প্রচার করাতে যে সকল পাদরিপুঙ্গবেরা মহাত্মা গ্যালিলিয়োকে কারারুদ্ধ করে, তাহারা কি সেইরূপ পাশব অত্যাচার দ্বারা পৃথিবীর আহ্নিক গতি রোধ করিতে পারিয়াছিল? দেখ, সেই সকল ধর্ম্মান্ধ দুরাচারগণ অনন্তকালে বিলীন হইয়া গিয়াছে; কিন্তু মহাত্মা গ্যালিলিয়ো এখনও জগতে জীবিত আছেন ও চিরদিন জীবিত থাকিবেন, "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।"

একমেবাদ্বিতীয়ং এর বার্ত্তা প্রচার করাতে যে সকল নরাধম যীশুখ্রীষ্টকে ক্রুসে বিদ্ধ করিয়া হত্যা করে, তাহারা কি সেইরূপ ঘোর নৃশংস অত্যাচার দ্বারা জগতে একেশ্বরবাদ বন্ধ করিতে পারিয়াছিল? দেখ, তাহারা সকলে কে কোথায় চলিয়া গিয়াছে; জগতে তাহাদের নাম গন্ধ নাই; কেবলমাত্র তাহাদের দুষ্কৃতির ধ্বজা এখনও দেশে দেশে উড়িতেছে; কিন্তু যীশুখৃষ্ট জগতে অদ্বিতীয় হইয়া আছেন এবং খৃষ্টজগতে কোটী কোটী মানববৃন্দ তাঁহারই উপদিষ্ট ধর্ম্মামৃত পান করিয়া নিজ নিজ জীবন বরীয়ান করিতেছে।

মানবের বিদ্যাবুদ্ধির ক্রমোন্নতি বশতঃ জ্ঞানজগতে নূতন নূতন সত্য আবিষ্কৃত হইতেছে বটে, কিন্তু স্থলবিশেষে দেখা যায়, প্রকৃত সত্যের নবাবিষ্কার সেই পূর্ব্বতন জ্ঞানের পুনরভিনয় মাত্র বা পুনরাবৃত্তি মাত্র। ডাল্টনের পরমাণুবাদ ইউরোপে নূতন হইলেও আমাদের গৌতমনির্দ্দিষ্ট পরমাণুবাদ ব্যতীত আর কিছুই নয়। মহাত্মা নিউটন সাহেব মাধ্যাকর্ষণ শক্তি নূতন আবিষ্কার করেন নাই। মহাত্মা গ্যালিলিয়ো পৃথিবীর আহ্নিকগতিও নূতন আবিষ্কার করেন নাই। ঐ সকল মহাসত্য ইউরোপে নূতন হইলেও উহাদের অনেক পূর্ব্বে আমাদের জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশদরূপে লিখিত রহিয়াছে। আর্য্যভট্ট পঞ্চশতাব্দীতে পৃথিবীর আহ্নিকগতি প্রচার করেন ও বরাহমিহির মাধ্যাকর্ষণের বিষয় লিখিয়া যান। ঐ সকল কথা এদেশ হইতে আরব দেশে নীত হয় এবং তথা হইতে ইউরোপে কালক্রমে চলিয়া যায়।

মানবজীবনের কূটপ্রশ্ননিচয়।

মানবজীবনের কূট প্রশ্নগুলি কি? কি জানিতে বা মীমাংসা করিতে সকল দেশের সকল মানব চিরদিন সমভাবে ব্যগ্র? এই অনন্ত রহস্যময় ব্রহ্মাণ্ডের

অনন্ত রহস্যের মধ্যে থাকিয়া মানবমাত্রেই যে সকল বিষয় জানিতে চিরদিন সমুৎসুক, তাহাই জীবনের কূট প্রশ্ন (Problems of existence)। মনের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা বশতঃ অথবা যেরূপ জ্ঞানশক্তিতে বিভূষিত, উহার স্বাভাবিক প্ররোচনায় আমরা জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে যে সকল গূঢ় রহস্য জানিতে সদা ব্যাকুল, তাহাই জীবনের কূটপ্রশ্ন।

কি সুশিক্ষিত, কি অশিক্ষিত, কি সুসভ্য, কি অসভ্য, কি বালক, কি বৃদ্ধ সকলেই জীবনের এই সকল প্রশ্ন মীমাংসা করিতে চিরদিন সমভাবে ব্যগ্র। সামান্য বুদ্ধিবিকাশের সঙ্গে এই সকল প্রশ্ন মানবহৃদয়ে স্বতঃ উত্থিত হয়। যে যেমন ভাবে ইহাদের মীমাংসা করুক না, ইহারা চিরদিন মানবহৃদয়ে উত্থিত হইতেছে।

এ পৃথিবীর আদি কোথায়, ইহার অন্ত কোথায়, কে ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা, কিরূপেই বা ইহা সৃষ্ট হইল, কতদিন হইল ইহা সৃষ্ট হইয়াছে, কতদিনই বা রহিবে, পরেই বা কি হইবে, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারাগণই বা কি, কেন উহারা আকাশে মিট্ মিট্ করিতেছে? তুমি কোথা হইতে এখানে আসিলে, পরে বা কোথায় যাইবে, তোমার সৃষ্টিকর্ত্তা কে, তিনি কোথায়, তাঁহার স্বরূপ কিপ্রকার, কেন তুমি সংসারে আসিয়া হেসে কেঁদে যাইতেছ, কি কাজ করিতে তুমি এখানে আসিয়াছ? এই সকল প্রশ্নই মানবজীবনের কূটপ্রশ্ন।

এই সকল প্রশ্নের আন্দোলন সংসারে চিরদিন চলিতেছে। যিনি যেরূপ শিক্ষা ও দীক্ষা পান, তিনি ইহাদের সম্বন্ধে তদনুরূপ শিক্ষা করিয়া নিজ মনকে প্রবোধ দেন। একজন অসভ্য মানবকে ইহাদের বিষয় জিজ্ঞাসা কর, পাঁচ জনের মুখে সে যাহা এতদিন শুনিয়া আসিতেছে, তাহাই উল্লেখ করিবে মাত্র। একজন সুশিক্ষিত সুসভ্য মানবকে ইহাদের বিষয় জিজ্ঞাসা কর, তিনিও ধর্ম্মশাস্ত্র ও দর্শন-বিজ্ঞানাদি পাঠ করিয়া যাহা শিক্ষা করিয়াছেন, তাহাই উল্লেখ করিবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কেহই ইহাদের সম্বন্ধে প্রকৃত তত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারিবেন না। সকলেই নিজ নিজ মনের ঔৎসুক্য মিটাইবার জন্য কিছু না কিছু শিক্ষা করে মাত্র। চিরদিন সকলেই এরূপ গোলকধাঁধায় চলিয়া আসিতেছে।

কূটপ্রশ্নমীমাংসার্থ মানবের বিবিধ চেষ্টা।

জীবনের কূটপ্রশ্ন গুলি মীমাংসা করিবার জন্য মানব চিরদিন সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। এবিষয়ে কোন সময়ে ও কোন দেশে তাঁহার কিছুমাত্র ত্রুটি ও অবহেলা দেখা যায় না। তাঁহার বুদ্ধিশক্তি যতদূর ধাবিত হইতে পারে, তাঁহার কল্পনাশক্তি যতদূর উড়িতে পারে, তিনি উহাদিগকে ততদূর চালনা করিয়া প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটন করিতে চেষ্টা পান।

জাতীয় উন্নতি বল, জাতীয় জ্ঞানভাণ্ডার বল, জাতীয় সভ্যতাবর্দ্ধন বল সকলই তিনি ঐ সকল কূটপ্রশ্ন মীমাংসা করিতে গিয়া পাইয়াছেন। ইহাদের সুমীমাংসার জন্য স্বভাবতঃ তাঁহার হৃদয়ে যে কৌতূহলশিখা চির প্রদপ্ত, আছে, তাহা নির্ব্বাপিত করিবার জন্য তিনি প্রকৃতি জগতের নানাবিষয় অশেষ-রূপে পর্য্যবেক্ষণ ও অনুচিন্তন করিতে বাধ্য হন। এইপ্রকার পর্য্যবেক্ষণ ও অনুচিন্তনের গুণে তাঁহার জ্ঞানভাণ্ডার নানা রত্নরাজিতে পরিপূর্ণ হইতেছে এবং তিনিও সভ্যতার উচ্চপদবীতে ক্রমশঃ অধিরোহণ করিতেছেন।

আমরা যেমন স্ব স্ব প্রাণরক্ষার্থ [illegible] যত্নবান, তেমনি [illegible] করিয়া সুখলাভের জন্য স্বভাবতঃ [illegible] সুখলাভের জন্য আমরা [illegible] আকাঙ্ক্ষাগুলি মিটাইতে বিশেষ চেষ্টা পাইয়া [illegible] মিটাইবার জন্য আমরা জীবনের কূটপ্রশ্ন মীমাংসায় প্রবৃত্ত হই। ইহাদের সুমীমাংসার জন্য আমরা প্রকৃতিপুস্তক ও জাতীয় জ্ঞানভাণ্ডার ভালরূপ অধ্যয়ন করিতে বাধ্য হই। [illegible] প্রকৃতিপুস্তক [illegible] চিরদিন প্রচলিত [illegible] প্রকৃত তথ্য আবিষ্কার করিতে যত্নবান হইয়া [illegible] আমাদের [illegible] জ্ঞানভাণ্ডার [illegible] উন্নতি [illegible] হইয়াছে। ধর্ম্মশাস্ত্র বল, দর্শনশাস্ত্র বল, বিজ্ঞানশাস্ত্র বল, কাব্য সাহিত্যাদি বল, সকল শাস্ত্রই জীবনের কূটপ্রশ্ন মীমাংসার [illegible] হইতে উদ্ভূত জানিবে।

[illegible] বটে, এই সকল কূটপ্রশ্ন মীমাংসার জন্য মানব চিরদিন স্বীয় অসীম বুদ্ধি চালনা করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু তাহার বিশ্বাস তিনি কোন কালে জ্ঞানের চরম সীমায় উপনীত হইয়া ইহাদের ভালরূপ মীমাংসা করিতে পারিবেন

বেন না। দেখ, ইহাদের সুমীমাংসার জন্য তিনি বুদ্ধিবলে কত ধর্ম্মশাস্ত্র, কত দর্শনশাস্ত্র ও কত বিজ্ঞানশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন। কিন্তু সকল শাস্ত্রই তাঁহাকে সমস্বরে বলিতেছে, এ সকল বিষয়ের পূর্ণজ্ঞান পাওয়া তাঁহার সাধ্যাতীত। তিনি এবিষয়ে যতই কেন চেষ্টা করুন না, তাঁহার সকল চেষ্টা কদাচ ফলবতী হইবে না। ইহাদের সুমীমাংসা করিতে পারুন ভাল, না পারুন ভাল, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত, যে তাঁহার অশেষ চেষ্টার গুণে জগতের অলৌকিক উন্নতিলাভ ঘটিতেছে। পরেশপাথর পান ভাল, না পান ভাল, ইহার অন্বেষণে তিনি পথিমধ্যে অমূল্য রত্নরাজি সংগ্রহ করিতেছেন।

আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধি বলে জীবনের কূট প্রশ্নগুলি মীমাংসা করা যায় না বলিয়া ধর্ম্মশাস্ত্র ইহাদের সম্বন্ধে যাহা উপদেশ দেয়, তাহাই আমরা অন্ধ বিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করি এবং তাহাই জীবনের অবলম্বন স্বরূপ জ্ঞান করি। ধর্ম্মশাস্ত্র মাত্রেই ইহাদের বিষয় লিখিত আছে এবং সকল দেশের জনসাধারণ নিজ নিজ শাস্ত্রানুসারে ইহাদের বিষয় শিক্ষা করিয়া নিজ নিজ মনকে চিরদিন প্রবোধ দিতেছে। বাল্যকালে যে যাহা শিক্ষা করে, তাহাই তাহার মনে আজীবন বদ্ধমূল থাকে।

কলিকালে ভ্রমসঙ্কুল জ্ঞানশক্তি বলে জীবনের কূটপ্রশ্ন মীমাংসা করা যায় না বটে; কিন্তু অধ্যাত্মবিজ্ঞান বলে, প্রাচীনকালে এ সকল বিষয়ের পূর্ণজ্ঞান যোগেশ্বরদিগের সমাধিস্থ আত্মায় প্রতিভাত হইত। তাঁহাদের অগাধ জ্ঞানের আভাস এখন জগতের প্রাচীন সভ্য জাতিবর্গের ধর্ম্মগ্রন্থে কথঞ্চিৎ পাওয়া যায়। ইহুদিদিগের ক্যাবালা (Kabala) কাল্ডিয়ানদিগের তালমুদ (Talmud), প্রাচীন আর্য্যজাতির ঋক্‌বেদ এবং পারসীকদিগের জেন্দাভেস্তা এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অধ্যাত্মবিজ্ঞান দর্শন ও জড়বিজ্ঞান।

উপরোক্ত ত্রিবিধ শাস্ত্রের সাহায্যে জীবনের কূটপ্রশ্নগুলি মীমাংসা করিতে হইবে। এজন্য প্রথমেই উহাদের উৎপত্তিবিষয় লিখিতেছি।

উন্নত বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত এই যে, ভৌতত্ত্বিক যুগসমূহের শেষভাগে পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ আধুনিক আকার ধারণ করিবার পর মানবজাতি আবির্ভূত হয় এবং এ জাতি অতি বর্ব্বর অবস্থা হইতে সমাজবদ্ধ হইয়া জ্ঞানানুশীলন করিতে করিতে আধুনিক সুসভ্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে মানবের জাতীয় ইতিহাসে জ্ঞানোন্নতি সম্বন্ধে তিনটী যুগ দেখা যায়, যথা—

(১) অসভ্য যুগ।

(২) দার্শনিক যুগ।

(৩) বৈজ্ঞানিক যুগ।

অসভ্য যুগে বর্ব্বর অশিক্ষিত মানব জগৎকে বিভীষিকাময় সন্দর্শন করে এবং ভীতিসংবলিত চমৎকার রস কর্ত্তৃক চালিত হইয়া কল্পনা বলে সকল বিষয়ের কাল্পনিক কারণতত্ত্ব উদ্ভাবন করত নিজের দুর্ব্বল মনকে সান্ত্বনা করে। আধুনিক অসভ্য মানবসমাজ দর্শন কর, জগতের সেই আদিম অবস্থা সম্যক বোধগম্য হইবে। পরে জাতীয় সাধনার গুণে বিদ্যাবুদ্ধির ক্রমোন্নতি সাধন করিতে করিতে যখন তিনি অসভ্য অবস্থা হইতে উন্মুক্ত হইয়া কিঞ্চিৎ সভ্যতাসোপানে আরূঢ় হন, তখন তিনি স্বজাতির সুখবর্দ্ধনোদ্দেশে জীবনের ও জগতের কূটপ্রশ্ন মীমাংসায় মনোভিনিবেশ করেন। এস্থলে নিজ অভীষ্টসিদ্ধির জন্য তিনি দুইটী বিপরীত পথ (দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক পথ) দেখিতে পান। প্রথমতঃ তিনি বহুকাল দার্শনিক পথে বিচরণ করিতে থাকেন, পরে ঐ পথের অসারত্ব দর্শনে আধুনিক অশেষ ফলপ্রদ বৈজ্ঞানিক পথ অনুসরণ করিতে আরম্ভ করেন।

প্রাচ্য জগতের অধ্যাত্মবিজ্ঞানবিৎ মহাত্মাগণ বলেন, সৃষ্টির সত্য, ত্রেতা ও
পর যুগে আধ্যাত্মিকশক্তিসম্পন্ন মনুপুত্রগণের ভিতর (দেবাসুরদিগের
তর) প্রাচীন অধ্যাত্মবিজ্ঞান সম্যক অনুশীলিত হইত। তৎপরে যুগধর্ম্মা-
রে কলিকালে মানবজাতির আধ্যাত্মিক অধঃপতন হইয়া উহাদের মনে
নশক্তি স্ফুরিত হইলে অধ্যাত্মবিজ্ঞান সংসারে লুপ্ত হইয়া যায় এবং তৎপরিবর্ত্তে
শ দেশে দর্শনশাস্ত্র অনুশীলিত হইতে থাকে। এই শাস্ত্র অনুশীলন করিয়া
গুতবর্গ আত্মার আধ্যাত্মিক স্ফূর্ত্তি ও মনের জ্ঞানশক্তির উন্মেষ করিতে
া পান। পরে কলিযুগবর্দ্ধনের সঙ্গে জ্ঞানশক্তি সম্যক স্ফুরিত হইলে,
শ্চাত্য পণ্ডিতগণ আধ্যাত্মিকতা ভুলিয়া গিয়া আধিভৌতিক উন্নতিলাভের
য় জড়বাদী জড়বিজ্ঞান সম্যক অনুশীলন করিতে আরম্ভ করেন।

এখন বিজ্ঞানের মত সত্য, কি অধ্যাত্মবিজ্ঞানের মত সত্য, তাহা কালে
ণীত হইবে। এ বিষয়টী মীমাংসা করাও অতীব দুরূহ। কিন্তু অধ্যাত্ম
জ্ঞানের মত কদাচ ভ্রান্ত বলিয়া বোধ হয় না; কারণ মহাত্মাগণ যোগবলে এ
সকল তথ্য অবগত হন। কিন্তু বিজ্ঞানের অনেক মতামত কালে কালে
ণ্ডিত হইতে দেখা যায়।

অধ্যাত্মবিজ্ঞান।

অধ্যাত্মবিজ্ঞান, ব্রহ্মবিদ্যা, পরমার্থবিদ্যা, রাজযোগ, গুপ্তবিদ্যা (Isoteric
cience) তত্ত্ববিদ্যা (Theosophy) প্রভৃতি সকলশাস্ত্র একপ্রকার। এ
াচীন শাস্ত্র বহুকাল হইতে জনসাধারণের ভিতর লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এমন
, ইহার অস্তিত্ব বিষয়ে অনেকে আদৌ অবগত নয়। এদেশের ভগবদ্গীতা,
দান্ত, উপনিষদ প্রভৃতি ইহার কালোচিত অংশবিশেষ। তদ্ভিন্ন ইহার
সত্য যাবতীয় ধর্ম্মগ্রন্থে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আছে।

মহাত্মাগণের বিশ্বাস, অতি প্রাচীন কালে বা সত্যযুগে যখন সুমেরু পৃথি
তে দেবমানব বিচরণ করেন, তৎকালে তাঁহাদের ভিতর দৈববাণীযোগে
্যাত্মবিজ্ঞান সর্ব্বপ্রথম প্রকটিত হয়। ইহাই প্রাথমিক শ্রুতি (Primeval
evelation) বা প্রকৃতবেদ। আধুনিক বেদ ও প্রত্যেক ধর্ম্মের ধর্ম্মগ্রন্থ

ইহার নকল মাত্র, অথবা উহাদের আভ্যন্তরে প্রাচীন অধ্যাত্মবিজ্ঞানের নানা-সত্য নিহিত আছে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেন—

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ং
বিবস্বান মনবে প্রাহ মনুরিক্ষাকবেহ ব্রবীৎ।
এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ।
স এবায়ং ময়া তেহদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পরন্তপ
ভক্তোহসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমং।

(গীতা)

"আমি পূর্ব্বে এই যোগশাস্ত্র বা প্রাচীন কালের অধ্যাত্মবিজ্ঞান সূর্য্যদেবকে বলি, অর্থাৎ দেবতাদিগের ভিতর প্রথম প্রকটিত করি। সূর্য্যদেব এ শাস্ত্র মনুকে বলেন, অর্থাৎ এ শাস্ত্র দেবতাদিগের নিকট হইতে দৈত্যাসুররূপী মনুপুত্রগণের ভিতর প্রচারিত হয়। এই প্রকারে অনৈতিহাসিক সময়ে জনকাদি রাজর্ষিগণ পরম্পরাগত অধ্যাত্মবিজ্ঞান অবগত হন। কিন্তু সেই বিজ্ঞান বহুকালপরে সংসারে লুপ্ত হইয়া যায়। তুমি আমার একান্ত ভক্ত, প্রিয় ও সখা এবং ইহাও অত্যুত্তম রহস্য, এজন্য আজ আমি তোমায় সেই পুরাতন যোগশাস্ত্র বা অধ্যাত্ম বিজ্ঞান বলিতেছি।"

যদি তুমি এ কথার গীতোক্ত প্রমাণ না মান, ইহার কোনরূপ বৈজ্ঞানিক প্রমাণ এখন দেওয়া অসম্ভব। তোমার প্রত্নতত্ত্ব এখনও ঘোরান্ধকারে আচ্ছন্ন ও প্রাচীনযুগ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। কালক্রমে ইহার যতই উন্নতিসাধন হইবে, প্রাচীনযুগ সম্বন্ধে নূতন ২ সত্য ততই আবিষ্কৃত হইবে। ততদিন আমাদের ধৈর্য্য ধরিয়া থাকা উচিত।

অনৈতিহাসিক সময়ে যে সকল জাতি জগতে সভ্যতা সোপানে আরূঢ় হয় এবং যাহাদের ধর্ম্মগ্রন্থের বিশেষ নিদর্শন পাওয়া যায়, উহাদের ধর্ম্মগ্রন্থগুলি একরূপ ভাবে ও মতামতে পূর্ণ। অনেকে মনে করেন, উহারা সেই প্রাচীন কালের অধ্যাত্মবিজ্ঞান হইতে সংগৃহীত। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ বলেন, যেমন অসভ্যাবস্থায় বর্ব্বর জাতিমাত্রেই প্রস্তরনির্ম্মিত অস্ত্র ব্যবহার করে,

সেইরূপ মানবপ্রকৃতি একরূপ বলিয়া সেই প্রাচীনকালেও অতিদূরবর্ত্তী দেশের ধর্ম্মগ্রন্থগুলি একরূপ মতামতে পূর্ণ। ফলতঃ যখন উহারা অত্যুচ্চ স্বর্গীয়ভাবে পূর্ণ ও অনেক স্থলে দুর্বোধ্য, তখন সিদ্ধান্ত করা উচিত, উহারা প্রাচীন অধ্যাত্মবিজ্ঞান হইতে সংগৃহীত।

যুগধর্ম্মে প্রকৃতির অপরিহার্য্য পরিণামবশতঃ কলিকালে মানবমস্তিষ্কের বিস্তর পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। তাঁহার তৃতীয় জ্ঞানচক্ষু অপগত হওয়ায় এক-দিকে জ্ঞানশক্তির উন্মেষ, অপরদিকে আধ্যাত্মিকতা হ্রাস পায়। এ কারণ যোগসিদ্ধ মহাত্মাগণ নানা দেশে একালের উপযোগিতানুসারে অধ্যাত্মবিজ্ঞান গোপন করিয়া যান। এদেশেও বেদের নানা অংশ লোপ পায়! এজন্য শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেন—সকালেনেহ মহতা যোগোনষ্টঃ পরন্তপ 'হে অর্জ্জুন! সেই অধ্যাত্মবিজ্ঞান বহুকাল পরে সংসারে লুপ্ত হইয়া যায়।

সত্য বটে, এই স্বর্গীয় শাস্ত্র এই প্রকারে দেশে দেশে লুপ্ত হইয়া গেল, কিন্তু কোন কোন দেশে মুনিঋষিগণ গোপনে এ শাস্ত্রে অনুশীলন করিতে থাকেন (যেমন ভারত ও তিব্বত প্রভৃতি দেশ) এবং কোন কোন দেশে মন্দিরের গুপ্ত দীক্ষায় এ শাস্ত্র দীক্ষা দেওয়া হয় (যেমন প্রাচীন গ্রীশ)। জনসাধারণ ইহাতে ব্যুৎপন্ন হইলে যোগের অষ্টসিদ্ধি লাভের জন্য ব্যগ্র হইবে; ইহাতে কলিকালে সমাজের প্রভূত অনিষ্টোৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা। এ কারণ অধ্যাত্মবিজ্ঞান সংসারে লোপ পায়।

যে সকল যোগেশ্বর সময়ে সময়ে এ শাস্ত্রের যৎকিঞ্চিৎ জগতে প্রচার করেন, তন্মধ্যে বশিষ্টাদি মহর্ষিগণ, জরথুস, ব্যাসদেব, শ্রীকৃষ্ণ, ঋষভদেব, যোগা-চার্য্য, কপিলদেব, হরমিজ, মুষা, বুদ্ধদেব, প্লেটো, ঈশা, মহম্মদ, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি বিখ্যাত। তাঁহারা সকলে এ শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইলেও ইহার অত্যল্পমাত্র সাধারণের নিকট প্রচার করেন এবং সেই সঙ্গে যেরূপ অলৌকিক যোগবল দেখান, তাহা-তেই তাঁহারা নিজ নিজ দেশে অশেষ পূজ্য হন।

বশিষ্ঠাদি মহর্ষিগণ প্রাচীন আর্য্যসমাজে, জরথুস পারসীক সমাজে, শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায়, ব্যাসদেব বেদান্তে ও আদিপুরাণে, মুষাদেব ইহুদিসমাজে, হামির্জ প্রাচীন মিসর সমাজে, বুদ্ধদেব বৌদ্ধ সমাজে, ঈশাদেব খৃষ্টান সমাজে, মহম্মদ মুসলমান সমাজে, শঙ্করাচার্য্য আধুনিক হিন্দুসমাজে ইহার অত্যল্পমাত্র প্রচার

করিয়া যান। যোগবলে অধ্যাত্মবিজ্ঞানের মহাসত্য পাইয়া তাঁহারা সকলে কালোচিত ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছেন।

তাঁহারা যে ধর্ম্মোপদেশ দেন, তাহা গঙ্গোত্রীনিঃসৃত গঙ্গোদকের ন্যায় পবিত্র ও বিশুদ্ধ ছিল। কিন্তু তদীয় শিষ্যোপশিষ্যগণ তাঁহাদের উপদেশের প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া স্বার্থসিদ্ধির জন্য উহাদের বিকৃত অর্থ করিতে করিতে গুরূপদিষ্ট পবিত্র ধর্ম্মকে বৈশেষিক ধর্ম্মে পরিণত করিয়া যান। এজন্য আজকাল সকল মানবধর্ম্মে এত পার্থক্য দেখা যায়।

একমাত্র যোগবলে ও তপোবলে স্বর্গীয় অধ্যাত্মবিজ্ঞানে পূর্ণ ব্যুৎপত্তি লাভ করা যায়। বেদাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া পরমার্থজ্ঞানের আভাস পাওয়া যায় সত্য; কিন্তু যোগসিদ্ধ না হইলে প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান মনে উদয় হয় না। আবার তত্ত্বজ্ঞানী হইলেও প্রকৃতপক্ষে তত্ত্বদর্শী হওয়া যায় না। ইহা বহুসাধনসাপেক্ষ।

সংসারে যোগবলে চিরদিন অসাধ্যসাধন হইতেছে; এজন্য হিন্দুসমাজে চিরদিন বিঘোষিত হইতেছে "নাস্তি যোগসমং বলং"।

সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে মনুপুত্রগণের (দেবাসুরদিগের) আধ্যাত্মিক শক্তি পূর্ণভাবে বিকসিত ছিল। তাঁহাদের যোগবল সহজাত ছিল এবং অনায়াসে বা স্বভাবতঃ তাঁহারা অণিমাদি আত্মার অষ্টসিদ্ধি স্ফুরণ করিতে পারিতেন। তাঁহারা ইচ্ছামত যে সকল কর্ম্ম করিতেন, তাহা এখন এ কলিযুগে আমাদের নিকট সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। এজন্য পূর্ব্বতন যুগের শাস্ত্রোল্লিখিত অনেক কথা শিক্ষিত সম্প্রদায় সামান্য উপকথা বলিয়া উড়াইয়া দেন। তাঁহারা ভাবেন, এ সকল কবির কল্পনামাত্র। সংসারে আধ্যাত্মিকতায় অবনতি ও জ্ঞানশক্তির ক্রমোন্নতির সঙ্গে, মানবমনের যে সকল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, তাহা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান পাঠ করিয়া বুঝা যায় না; এজন্য তাঁহারা শাস্ত্রের কথা উড়াইয়া দেন।

দর্শনশাস্ত্র।

জগতের ইতিহাস অন্বেষণ করিলে বুঝা যায়, আজকাল সভ্যজগতে জড় বিজ্ঞানের যেরূপ সমাদর ও প্রতিপত্তি, পুরাকালে সভ্য জগতে দর্শনশাস্ত্রের সেইরূপ সমাদর ও প্রতিপত্তি ছিল। আজকাল যেমন বিজ্ঞানের কল্যাণে

পাশ্চাত্য জগৎ সভ্যতাজ্যোতিতে উদ্ভাসিত, পুরাকালে দর্শনশাস্ত্রের কল্যাণে প্রাচ্যজগৎ সেইরূপ সভ্যতাজ্যোতিতে উদ্ভাসিত ছিল। ইহা এক প্রকার সর্ব্ববাদিসম্মত, এই সোণার ভারত হইতেই জ্ঞানবিজ্ঞান ও সভ্যতাজ্যোতি পুরাকালে চীন, পারস্য, এসিরিয়া, ব্যাবিলন, মিসর, গ্রীশ, রোম প্রভৃতি নানাদেশে বিকীর্ণ হইয়াছিল।

যখন সমগ্র মেদিনী ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন, যখন আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার মূলমন্ত্রদাতা গ্রীশ ও রোম অসভ্য অবস্থায় অবস্থিত, তৎকালে এ দেশের জ্ঞান-গরিষ্ঠ মহর্ষিগণ বনের ফল মূল খাইয়া দর্শনাদি বিদ্যায় যে সকল মহাসত্য আবিষ্কার করেন, তাহা এই শ্মশানসদৃশ ভারতের চিতাভস্মে ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে এবং আমরা তাঁহাদের অধমাধম বংশধর হইয়া পরের মুখে তাহা শুনিয়া লজ্জায় মাথা হেঁট করিতেছি।

ইহা আমাদের পরম গৌরবের বিষয়, এই সোণার ভারতই দর্শনশাস্ত্রের প্রকৃত জন্মভূমি, এখানেই ইহার চরম উন্নতি সাধন হয় এবং হিন্দুজাতি এ বিষয়ে পৃথিবীস্থ অন্যান্য জাতির আদিগুরু! কপিলাদি মহর্ষিগণ যে সকল দর্শনশাস্ত্র রচনা করেন, তাহা জগতে অতুলনীয়। তাঁহারা মানবজীবন সম্বন্ধে যে সকল তত্ত্ব উদ্ঘাটন করেন, তাহা জ্ঞানজগতে চিরদিন আদৃত হইবে। সাংখ্য বল, বেদান্ত বল, যোগশাস্ত্র বল, ইহাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর দর্শন শাস্ত্র কোন দেশের কোন ভাষায় দেখা যায় না।

সকলেই স্বীকার করেন, প্রাচীন গ্রীশ দর্শনশাস্ত্রের উন্নতির জন্য ভারতের নিকট চিরঋণে আবদ্ধ। পিথাগোরাস, প্লেটো প্রভৃতি গ্রীশদেশের সুবিখ্যাত দার্শনিকগণ এ শাস্ত্র শিক্ষা করিবার জন্য পূর্ব্ব দেশে বা ভারতে আগমন করিতেন। যেমন শিল্পচাতুর্য্যনিপুণ ভারতের বিবিধ শিল্প পুরাকাল হইতে নানা সভ্য দেশে আদৃত হইয়া থাকে, সেইরূপ জ্ঞানগরিমায় গৌরবান্বিত ভারতের জ্ঞানজ্যোতিও পুরাকালে দিগ্‌দিগন্তে ও দেশদেশান্তরে বিকীর্ণ হইয়াছে।

ভারতবর্ষে যতগুলি দর্শনশাস্ত্র রচিত হয়, তন্মধ্যে ষড়দর্শন বিখ্যাত এবং আজ পর্য্যন্ত সমগ্র দেশে উহাদের সম্যক সমাদর দেখা যায়। কপিলদেব, ব্যাসদেব, পাতঞ্জল, কনাদ, গৌতম ও জৈমিনি ঐ সকল দর্শন শাস্ত্র রচনা

করিয়া ভুবনবিখ্যাত হইয়াছেন। সেইরূপ গ্রীশদেশে পিথাগোরাস, সক্রেটিস, প্লেটো, অরিষ্টটল, ষ্ট্রাবো, ডিমক্রাইটাস প্রভৃতি মহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ দর্শনশাস্ত্রের উন্নতি সাধন করিয়া যান। গ্রীশদর্শনের সহিত হিন্দুদর্শনের তুলনা করিলে, শেষোক্তটী যে উৎকৃষ্টতর, তাহা ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন। যথার্থ বলিতে কি, আমাদের পরমপূজ্য প্রপিতামহগণ কালক্ষেত্রে আপনাদের যে সকল কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রোথিত করিয়া গিয়াছেন এবং যাহা কালের সর্ব্বসংহারিকা শক্তি উপেক্ষা করত এখনও ভারতগগনে দেদীপ্যমান, তন্মধ্যে অগাধ চিন্তাশীলতার পূর্ণ পরিচায়ক ষড়্দর্শন অন্যতম। যে জাতি মানবমনের এত গভীরতম প্রদেশে অনুপ্রবেশ করিতে সমর্থ, সে জাতির জাতীয় উন্নতি বিষয়ে কি কোনরূপ সন্দেহ করা উচিত?

ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায়, সভ্য গ্রীকদিগের নিকট হইতে রোমানেরা এই সকল উৎকৃষ্ট বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া সভ্যতা লাভ করে। পরে মধ্যযুগে সমগ্র ইউরোপ গ্রীষ ও রোমান সভ্যতার ভগ্নাবশেষ অনুশীলন করিয়া আধুনিক সভ্যতা সোপানে অধিরোহণ করিতে সমর্থ হয়। অতএব সাহঙ্কারে বলা উচিত, পাশ্চাত্য জগতের আধুনিক উৎকৃষ্ট সভ্যতার মূলীভূত কারণ এ দেশের দর্শনাদি বিদ্যা। তাহার সাক্ষ্য দেখ না, এ দেশের গণিত, বীজগণিত ও জ্যামিতি অনুশীলন করিয়া পৃথিবীর অন্যান্য জাতি ঐ সকল বিদ্যায় উন্নতি লাভ করে এবং আমাদের গণনাপদ্ধতি (Decimal Notation) সমগ্র জগতে প্রচলিত দেখা যায়।

আরও দেখ, এ দেশের উন্নত আয়ুর্ব্বেদ সমগ্র জগতের চিকিৎসা-বিজ্ঞানের আদিগুরু। গ্রীশদেশের সুবিখ্যাত চিকিৎসক হিপোক্রাইটাস আমাদের চরক ও সুশ্রুত অধ্যয়ন করিয়াই চিকিৎসা শাস্ত্রে এতদূর বিশারদ হন। আরব ও চীন দেশের চিকিৎসকগণ এ দেশের আয়ুর্ব্বেদ দেখিয়াই নিজ নিজ শাস্ত্রের উন্নতি সাধন করে। অতএব বেশ জানিবে, এই সোণার ভারত হইতেই সভ্যতা-জ্যোতি সমগ্র মেদিনীমণ্ডলে বিকীর্ণ হইয়াছে।

হিন্দুজাতি দর্শনশাস্ত্রের আলোচনায় কিরূপ অনুরক্ত, তাহা পণ্ডিতবর মোক্ষমুলার সাহেবের একটী কথায় সম্যক্ প্রকাশ পায়। তিনি হিন্দুজাতিকে দার্শনিক জাতি বলিয়া অশেষ প্রশংসা করেন। দেখ যে ইংরাজ জাতি বাণিজ্য-

বলে জগতে অগ্রগণ্য হইয়া পৃথিবীর ধনদৌলত স্বদেশে রাশীকৃত করে, সে জাতি অন্যান্য জাতির নিকট দোকানদারের জাতি (Nation of shop-keepers) বলিয়া উক্ত হয়। সেইরূপ আমরাও চিরদিন দর্শনশাস্ত্রের অনুশীলনে একান্ত অনুরক্ত বলিয়া অন্যান্য জাতির নিকট দার্শনিক জাতি (Nation of Philosophers) বলিয়া উক্ত হই। যথার্থ বলিতে কি, হিন্দুজাতির এত অধিক আধ্যাত্মিক স্ফূর্ত্তি ও ধর্ম্মপরায়ণতা কেবলমাত্র এতকাল ধরিয়া দর্শনশাস্ত্রের প্রগাঢ় অনুশীলন হইতে জন্মিয়াছে।

দার্শনিক যুগে জ্ঞানজগতে দর্শনশাস্ত্রই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা ছিল। তদানীন্তন সকল গ্রন্থে এ শাস্ত্রের প্রভাব পূর্ণভাবে প্রকটিত আছে। তৎকালে সকলে এ শাস্ত্র পড়িয়াই মহোপাধ্যায় পণ্ডিত হইতেন এবং তাঁহারা ইহাতেই অপার আনন্দ লাভ করিতেন।

দার্শনিক যুগে কেহ কেহ যোগাভ্যাস করিয়া যোগবলে বলীয়ান হইতে চেষ্টা পান। এই প্রকারে তাঁহারা অতীন্দ্রিয় দর্শন অতীন্দ্রিয় শ্রবণ, পরকায় প্রবেশ, বশীকরণ প্রভৃতি নানা অদ্ভুত ক্রিয়া দেখান।

যোগাভ্যাস করিতে করিতে অনন্ত শক্তিসম্পন্ন ও সর্ব্বজ্ঞ আত্মার আধ্যাত্মিক শক্তি ক্রমশঃ স্ফুরিত হয় এবং মনের ইচ্ছাশক্তি (will power) বর্দ্ধিত হওয়ায় ইহা প্রভূত শক্তির আধার হয়। এই প্রকারে অনেককে, এমন কি শ্বাপদকুলকেও মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক গায়ে হাত বুলাইয়া বশীভূত করা যায়, সূক্ষ্ম জগৎ দেখিবার ও অপরের মনের কথা বলিয়া দিবার ক্ষমতা জন্মে যাহা ইচ্ছা, তাহা করা যায়, অনেক দিন অনাহারে থাকা যায়, ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়াও মাসাবধি প্রাণধারণ করা যায়, শূন্যে উত্থিত হওয়া যায়, খড়ম পায়ে দিয়া নদনদী পার হওয়া যায় ইত্যাদি নানা অলৌকিক ক্রিয়া দেখান যায়। ইহার জন্য চিরদিন হিন্দুশাস্ত্রে বিঘোষিত হইতেছে। "নাস্তি যোগসমং বলং।"

বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ যোগবল আদৌ স্বীকার করেন না। তাঁহারা ভাবেন এরূপ অপরূপ ঘটনা অসম্ভব, প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধ, যাদুকরের যাদু, ভেল্‌কি বা বুজরুকি, ইহাদিগকে গোটেহেল (go to hell) করাই শ্রেয়। কিন্তু তাঁহাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, বিজ্ঞানবলে বাষ্পীয় শকটাদি উদ্ভাবিত হইবার পূর্ব্বে কে ভাবিত, বাষ্পশক্তিবলে এরূপ সহজ গমনাগমন

সম্ভব? যে সময়ে সংসারে যাহা ঘটে, সাধারণতঃ তাহাই সকলে বিশ্বাস করে। এখন যোগবল সচরাচর দেখা যায় না বলিয়া সকলে উহার উপর অবিশ্বাস করে। ইহার দুইটী কারণ আছে।

(১) সদ্‌গুরুর অভাবে যোগাভ্যাস সংসারে লুপ্তপ্রায়।

(২) কলিযুগবর্দ্ধনের সঙ্গে আত্মার আধ্যাত্মিক অবনতি, মনের জ্ঞানশক্তির ক্রমোন্নতি ও দেহের স্থূলত্ববর্দ্ধন।

বিজ্ঞান শাস্ত্র।

বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন, বহুকাল ধরিয়া দর্শনশাস্ত্র অনুশীলিত হওয়াতে মানববুদ্ধি ক্রমশঃ প্রখর হইতে প্রখরতর হইতে থাকে এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের পথ পরিষ্কৃত করিয়া দেয়। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে জগৎ-বিখ্যাত পণ্ডিত বেকন সাহেব অরিষ্টটলের মতানুসারে (Inductive method) জ্ঞানানুশীলনের নূতন মার্গ প্রদর্শন করিয়া যান। তদবধি পাশ্চাত্য জগতে পুরাতন মার্গানুসৃত দর্শনশাস্ত্রের পূর্ব্ব গৌরব খর্ব্ব হওয়াতে নববিজ্ঞানের অভ্যুদয় ঘটে। তিন শতাব্দীর ভিতর বিজ্ঞানসংসারের যাবতীয় ব্যাপারে যুগান্তর আনয়ন করত মানবজাতির সুখসম্ভার ও ঐশ্বর্য্য সহস্রগুণ বর্দ্ধন করিয়াছে। ইহার অসাধারণ ও অলৌকিক উন্নতিতে পাশ্চাত্য জগৎ যে কিরূপ উপকৃত, তাহা এস্থলে বর্ণনাতীত।

সুবিশাল জ্ঞানবৃক্ষের ভিন্ন ভিন্ন শাখা লইয়া নানা বিজ্ঞান শাস্ত্র রচিত হইয়াছে। কত সহস্র সহস্র মহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর্গ আজীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া প্রত্যেক বিজ্ঞান শাস্ত্রে অসংখ্য সত্য আবিষ্কার করত ইহার অপূর্ব্ব ও অচিন্তনীয় উন্নতি সাধন করিতেছেন। জল ও স্থল, ব্যোমমার্গ ও ভূগর্ভ, দেশ ও দেশান্তর, সাগর ও উপসাগর, গিরিগহ্বর ও গিরিশিখর, দ্বীপ ও উপদ্বীপ, সুমেরু ও কুমেরু, কোন স্থান বাকী নাই, যেখানে তাঁহারা পর্য্যবেক্ষণাদি না করিতেছেন। পৃথিবীর এমন স্থান বাকী নাই, যেখানে তাঁহাদের গতিবিধি নাই। এখন তাঁহারা কত উৎসাহ, কত যত্ন ও কত অধ্যবসায়ের সহিত বিদ্যাদেবীর শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিতেছেন। অধিক

আর কি বলিব, যদি কলিকালে কোনরূপ উৎকৃষ্ট তপস্যা থাকে, তবে তাহাদের সত্যান্বেষণরূপ মহৎ তপস্যার গুণে কালে জগতের মহোপকার সাধিত হইবে।

এমন বিদ্যার বিভাগ নাই, যাহাতে বিজ্ঞান আদৌ হস্তক্ষেপ করে নাই এখন দেখ, কতপ্রকার বিজ্ঞানশাস্ত্র রচিত হইয়াছে।

(১) পদার্থ বিজ্ঞান (Physics)

(২) রসায়ন শাস্ত্র (Chemistry)

(৩) প্রাকৃতিক ভূগোল (Physical Geography)

(৪) উদ্ভিজ্জতত্ব (Botany)

(৫) জীবতত্ব (Zoology)

(৬) মানবতত্ব (Anthropology)

(৭) প্রত্নতত্ব (Archeology)

(৮) ভূতত্ব (Geology)

(৯) কঙ্কাল তত্ব (Paliontology)

(১০) মনোবিজ্ঞান (Metaphysics)

(১১) ধর্ম্মবিজ্ঞান (Theology)

(১২) নীতিবিজ্ঞান (Ethics)

(১৩) শব্দবিদ্যা (Philology)

(১৪) শারীর স্থানবিদ্যা (Anatomy)

(১৫) শরীরতত্ব (Physiology)

(১৬) আয়ুর্ব্বেদ (Practice of Medicine)

(১৭) রোগতত্ব (Pathology)

(১৮) ভৈষজ্যতত্ব (Therapeutics)

(১৯) ধাত্রীবিদ্যা (Midwifery)

(২০) ভ্রূণতত্ব (Embryology)

(২১) অস্ত্রোপচার বিদ্যা (Surgery)

(২২) স্বাস্থ্যবিজ্ঞান (Hygiene)

(২৩) স্থপতিবিদ্যা (Engineering)

(২৪) আলোকবিদ্যা (Optics)

(২৫) ধাতুতত্ত্ব (Mineralogy)

(২৬) ছায়াবিদ্যা (Photography)

(২৭) গণিতশাস্ত্র (Mathematics)

ইত্যাদি (Etcetra)

এখন একবার বিজ্ঞানের যে কত মাহাত্ম্য, তাহা একবার শ্রবণ করুন। ইহার কল্যাণে পাশ্চাত্য জগৎ আজ অপূর্ব্ব সভ্যতাজ্যোতিতে উদ্ভাসিত ইহার মহানগরীগুলি স্বর্গের অমরাবতীর ন্যায় শোভমানা, এবং ইহার যশসৌরভ দিগ্‌দিগন্ত পরিব্যাপ্ত। নববিজ্ঞানের কল্যাণে পাশ্চাত্য জগৎ আজ সমগ্র মেদিনী গ্রাস করিতে উদ্যত; সর্ব্বত্র উহাদের বাণিজ্যপোত ঘুরিতেছে, পৃথিবীর ধনদৌলত উহাদের দেশে রাশীকৃত হইতেছে, সর্ব্বত্র উহাদের সমরপোত সগর্ব্বে ঘুরিতেছে এবং উহাদের সাম্রাজ্য নানাদেশে বিস্তৃত হইতেছে।

নববিজ্ঞানের কল্যাণে পর্ব্বতজঙ্গলাকীর্ণ জনপদ আজ রাম নন্দন কাননে, শুষ্ক মরুভূমি আজ স্নিগ্ধ জলাশয়ে, কঠিন শৈল আজ সুকোমল শয্যায়, অনুজ্জ্বল অঙ্গার আজ সমুজ্জ্বল হীরকে এবং দশযোজনব্যাপী পর্ব্বতাকীর্ণ সুয়েজ ও পানামা যোজক আজ বাষ্পীয় পোতাদির জন্য অনায়াসগম্য রমণীয় খালে পরিণত। নববিজ্ঞানের কল্যাণে চিররহস্যময়ী অমিততেজস্বিনী প্রকৃতি দেবীর উপর মানবের অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব্ব আধিপত্য ক্রমশঃ বিস্তীর্ণ হইতেছে এবং উহার শক্তিবিশেষ পদানত হইয়া বিধিমতে তাঁহার সেবা করিতেছে।

নববিজ্ঞানের কল্যাণে বারিবাষ্প আজ শকট ও পোতযোগে অল্পসময়ের মধ্যে তাঁহাকে দেশ দেশান্তরে লইয়া যাইতেছে ও তাঁহার পণ্যদ্রব্য বহন করিতেছে, তাঁহার শ্রম লাঘবার্থ গমাদি পেষণ করিতেছে, পুস্তকাদি মুদ্রিত করিতেছে, ভূমি কর্ষণ করিতেছে, ধান ভানিতেছে, আঁক মাড়িতেছে, তুলা পিঁজিতেছে, সূতা কাটিতেছে, বস্ত্র বুনিতেছে, ঔষধাদি প্রস্তুত করিতেছে, পয়ঃপ্রণালী যোগে পানীয় জল দ্বারে দ্বারে আনিয়া দিতেছে।

নববিজ্ঞানের কল্যাণে যে তাড়িতের বজ্রনিনাদ শ্রবণে মানব চিরদিন ভীত ও চকিত হন, সেই তাড়িত আজ তাঁহার পরম ভক্ত পেয়াদা হইয়া তার যোগে বা বিনাতারে তাঁহার বার্ত্তা নিমিষ মধ্যে দেশ দেশান্তরে লইয়া যাইতেছে,

দূর হইতে পরস্পর পরস্পরের কথোপকথন করাইতেছে (Telephone), তাঁহার হর্ম্ম্যরাজি অত্যুজ্জ্বল আলোকে আলোকিত করিতেছে (Electric light), গাঢ় অন্ধকারে দূরস্থ পদার্থনিচয় দিবসের ন্যায় অতি স্পষ্টরূপে দেখাইতেছে (Search light), রোগের সময় চর্ম্ম ও মাংসপেশী ভেদ করিয়া আভ্যন্তরিক যন্ত্র সমূহের বিকৃত অবস্থা স্পষ্টরূপে দেখাইতেছে (X'ray), তাঁহার উত্তপ্ত ও ঘর্ম্মাক্ত কলেবর তালবৃন্ত যোগে সুশীতল করিতেছে (Electric fan), শকটে অশ্বযোজন না করিয়া দ্রুতবেগে তাঁহাকে একস্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাইতেছে (Electric Tram and Motor car), জেপেলিন ও এরোপ্লেন যোগে তাঁহাকে ব্যোমমার্গে লইয়া যাইতেছে এবং ইন্দ্রজিতের ন্যায় মেঘের অন্তরাল হইতে আকাশযুদ্ধ করাইতেছে, সাগরবক্ষে জলযুদ্ধে টরপেডোযোগে বিপক্ষদলের সমরপোতে অজ্ঞাতসারে ভগ্ন করিয়া দিতেছে, স্থলযুদ্ধে ক্রুপকামান যোগে অজস্র গোলাগুলি বর্ষণ করিয়া শত্রুদলের অসংখ্য সৈন্য নিমিষ মধ্যে ধরাতলশায়ী করিতেছে।

নববিজ্ঞানের কল্যাণে আজ আমরা স্বগৃহে বসিয়া বিখ্যাত গায়ক গায়িকার সুমধুর সঙ্গীত গ্রামোফন যোগে শ্রবণ করিয়া কর্ণদ্বয় জুড়াইতেছি, রণক্ষেত্রে না যাইয়া উহার ভীষণ কাটাকাটি, রক্তারক্তি ও গোলাগুলি বর্ষণ বায়স্কোপ যোগে দেখিয়া বিস্মিত হইতেছি, দূরবীক্ষণ যোগে ব্যোমমার্গের বিবিধ সংবাদ আনয়ন করিতেছি, অনুবীক্ষণ যোগে চর্ম্মচক্ষুর অগোচর কীটাণুসকল দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি, দেশদেশান্তর পর্য্যটন না করিয়া ষ্টীরিওস্কোপ যোগে (Sterioscope) সমৃদ্ধ নগরীর প্রকৃত সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া বিমোহিত হইতেছি।

নববিজ্ঞানের কল্যাণে আজ আমরা ডুবো জাহাজ (Submarine) দিয়া মৎস্যের ন্যায় জলধিগর্ভের মধ্য দিয়া অবলীলাক্রমে যাইতেছি, এরোপ্লেন যোগে আকাশমার্গে অনায়াসে উড়িয়া দেশদেশান্তর দেখিতেছি, পাহাড় পর্ব্বত কাটিয়া ভূগর্ভ খনন করিয়া রেলগাড়ি চালাইতেছি, পদ্মার ন্যায় সুপ্রশস্ত নদীর বক্ষের উপর সুবৃহৎ সেতু নির্ম্মাণ করিয়া স্থপতি বিদ্যার অপূর্ব্ব গৌরব দেখাইতেছি। নববিজ্ঞানের কল্যাণে জগতে এইরূপ অত্যাশ্চর্য্য ঘটনাপরম্পরা ঘটিতেছে। ইহার গুণে আমরা কালে যে কত অসাধ্য সাধন করিব, তাহার কিছুমাত্র

ইয়ত্তা নাই। কেহ কেহ বলেন, বিজ্ঞানের যত উন্নতিসাধন হইবে, মানবের শারীরিক বল সেই পরিমাণে হ্রাস পাইবে। যাহাহউক, এতদিন সংসারে "নাস্তি যোগসমং বলং" এই কথা বিঘোষিত হইয়া আসিয়াছে; এখন হইতে "নাস্তি বিজ্ঞানসমং বলং" এই কথা সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইবে।

অধ্যাত্মবিজ্ঞানের সহিত দর্শনের সম্বন্ধ।

এই দুই শাস্ত্রের মধ্যে গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ দেখা যায়। এস্থলে অধ্যাত্মবিজ্ঞান জগদ্গুরু এবং দর্শন এ কলিকালে উহার লোকপ্রখ্যাত শিষ্য মাত্র। ভারতবর্ষ, মিসর, গ্রীশ প্রভৃতি যে সকল সভ্য জনপদবর্গে নানাদর্শন শাস্ত্র বিরচিত হইয়া লোকসমাজে প্রচারিত হয়, তত্তৎ দেশের পণ্ডিতগণ প্রাচীনকালের অধ্যাত্মবিজ্ঞানের কিছু না কিছু মহাসত্য পাইয়া নিজ নিজ মত পোষণ করত নিজ নিজ দেশে তাহা প্রচার করেন। (ব্ল্যাভ্যাস্কির মত)। তাহার সাক্ষ্য হিন্দু ষড়দর্শনের মৌলিক মতামতগুলি বেদে পাওয়া যায়।

কেহ কেহ বলেন, দর্শনশাস্ত্রের মৌলিক মতামতগুলি একমাত্র অনুমান বা প্রগাঢ় অনুচিন্তার বলে পাওয়া যায়। কিন্তু অনেক স্থলে উহারা প্রাচীন অধ্যাত্মবিজ্ঞান হইতে গৃহীত মনে হয়। তাহার সাক্ষ্য, এ দেশের বেদান্ত, সাংখ্য ও যোগশাস্ত্র অধ্যাত্মবিজ্ঞানের অংশীভূত! যোগেশ্বর ব্যাসদেব বেদান্ত ও উপনিষদে জীবাত্মা ও পরমাত্মার যেরূপ স্বরূপ নির্দ্দেশ করেন, তাহা কোন দেশেরকোন পুস্তকে পাওয়া যায় না।

যোগাচার্য্য যোগশাস্ত্র প্রথম প্রণয়ন করেন নাই। এ শাস্ত্র পূর্ব্বে মহাত্মা ও মহর্ষিগণের ভিতর প্রচলিত ছিল এবং রাজযোগের প্রক্রিয়াগুলি তাঁহাদের ভিতর চিরদিন অনুষ্ঠিত হইত। কেবলমাত্র যোগাচার্য্য যোগশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া সাধারণ পণ্ডিত মণ্ডলীর ভিতর যোগক্রিয়া প্রচার করেন। তৎপ্রণীত শাস্ত্র এখন হিন্দুসমাজে লুপ্ত। কিন্তু পণ্ডিতবর পাতঞ্জল প্রাচীন যোগশাস্ত্র দেখিয়া যোগের নিয়মাবলী যাহাতে লোকের সহজে কণ্ঠস্থ হইতে পারে, তজ্জন্য তিনি সূত্রাকারে লিখিয়া যান। আজকালের পণ্ডিতগণ তৎপ্রণীত যোগসূত্র পাঠ করিয়া যোগের নিয়মাবলী ও প্রক্রিয়াগুলি অবগত হন।

বেদাধ্যায়ী পণ্ডিতগণ বলেন, সাংখ্যদর্শনের মৌলিক মতামত বেদে পাওয়া যায়। যোগসিদ্ধ মহর্ষি কপিলদেব যোগবলে বা অসাধারণ অনুচিন্তন বলে স্থূলজগতের আদ্যন্তর অবগত হইয়া সাংখ্যমত জগতে প্রচার করেন। সূত্রযুগে তদীয় মতামত সূত্রাকারে লিখিত হইয়া সাংখ্যদর্শন নামে হিন্দুসমাজে প্রতিপত্তি লাভ করে।

প্লেটো, বুদ্ধদেব প্রভৃতি মহাত্মাগণ প্রাচীন অধ্যাত্মবিজ্ঞান সম্বন্ধে জন সাধারণের নিকট কিছুমাত্র প্রকাশ করেন নাই; কিন্তু দুই এক প্রিয়শিষ্যের নিকট উহার কিঞ্চিন্মাত্র বলিয়া যান। মহাত্মা ঈশাদেবও স্বশিষ্যমণ্ডলীর ভিতর অলৌকিক ধর্ম্মোপদেশ দেন বটে; কিন্তু গুপ্ত অধ্যাত্মবিজ্ঞান সম্বন্ধে দুই এক প্রিয় শিষ্য ব্যতীত কাহাকেও কিছু বলেন নাই; ফলতঃ যোগসিদ্ধ বলিয়া যোগবলে অলৌকিক ক্রিয়া দেখাইয়া সকলকে বিমোহিত করিয়া যান। সেইরূপ আমাদের পরম পূজ্য শ্রীকৃষ্ণও প্রিয় সখা অর্জ্জুনকে অধ্যাত্মবিজ্ঞান গোপনে প্রকাশ করেন; উহারই কিয়দংশ গীতায় লিখিত হইয়া লোকপ্রখ্যাত হইয়াছে; এজন্য হিন্দুসমাজে চিরদিন গীতার এত অধিক সমাদর ও প্রতিপত্তি।

অধ্যাত্মবিজ্ঞান ও দর্শন উভয়েই এক পথের পথিক। উভয়েই জগতের কূটপ্রশ্নগুলি মীমাংসা করে। প্রভেদের মধ্যে প্রথমটী সত্যত্রেতা দ্বাপর যুগের শাস্ত্র বা দেবাসুরদিগের শাস্ত্র, আর দ্বিতীয়টী কলিযুগের শাস্ত্র বা আধুনিক মানবজাতির শাস্ত্র। প্রথমটী দৈববাণী যোগে বা যোগবলে প্রাপ্ত; দ্বিতীয়টী ভ্রমসঙ্কুল জ্ঞানশক্তি বলে বিরচিত, এজন্য অসম্পূর্ণ!

অধ্যাত্মবিজ্ঞান মূলে অভ্রান্ত; সকলদেশের মহাত্মাগণ প্রায় একরূপ মতামত অবলম্বন করিয়া থাকেন। প্রত্যেক যোগীর মনে আধ্যাত্মিকতা যেরূপ স্ফুরিত হয়, তিনি অধ্যাত্মবিজ্ঞানের মহাসত্য তেমনি বুঝিতে পারেন। বুদ্ধদেবের মনে পরমার্থ জ্ঞান যে পরিমাণে প্রতিভাত হয়, ঈশাদেবের মনে সেরূপ হয় নাই; কারণ তিনি কর্ম্মফল সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই।

যাহা হউক, অধ্যাত্মবিজ্ঞানের সহিত দর্শনের কোনরূপ বাক্‌বিতণ্ডা নাই, উভয়েই এক পথের পথিক। কেবলমাত্র দ্বিতীয়টী প্রথমটীর ন্যায় সম্পূর্ণ ও

অভ্রান্ত নহে এবং এক এক দর্শনশাস্ত্র এক এক প্রকার মতামত প্রচার করে। চিরদিন দর্শন অধ্যাত্মবিজ্ঞানকে পরমারাধ্য গুরু বলিয়া মান্য করিবে।

বিজ্ঞানের সহিত দর্শনের বিরোধ।

যেমন অশেষ পাশ্চাত্য বিদ্যার সার পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, সেইরূপ অশেষ প্রাচ্যবিদ্যার সার প্রাচ্য দর্শন। ইহাকে প্রাচ্যবিজ্ঞান বলিলে ক্ষতি হয়না। প্রসর, ক্রিয়া, বিষয় ও উদ্দেশ্য লইয়া উহাদের বিস্তর পার্থক্য আছে।

প্রাচ্যদর্শন মূলানুসন্ধায়িনী ও সংশ্লেষকারিণী যুক্তিবলে (By Synthetic a priori, Deductive method) সকল পদার্থের সারতত্ত্ব উদ্ঘাটন করিতে চেষ্টা পায়। ইহা প্রথমে বস্তুর মৌলিক গুণাগুণ নির্দ্দেশ করিয়া উহার বাহ্য গুণাগুণ বিচার করে। পদার্থের মৌলিক গুণ নির্দ্দেশ করিবার সময় ইহা কোনপ্রকার প্রমাণ চায় না, বরং উহাদিগকে একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধ (Axiomatic) মানিয়া লয়। কিন্তু উহাদের সাহায্যে ইহা যাবতীয় পদার্থের বাহ্য গুণাগুণ বিচার করে ও তদনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। বস্তুর মৌলিক গুণাগুণ যাহা দর্শন স্বতঃসিদ্ধ মানিয়া লয়, তাহা প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত অথবা প্রাচীন অধ্যাত্মবিজ্ঞান হইতে গৃহীত। তাহার সাক্ষ্য, বেদান্তের মায়াবাদ ও পরব্রহ্মের অস্তিত্ব, সাংখ্যদর্শনের ত্রিগুণাদি বস্তুর মৌলিক গুণাগুণ অধ্যাত্মবিজ্ঞান হইতে গৃহীত। কিন্তু পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এ কথা স্বীকার করে না।

অপর পক্ষে বিজ্ঞান কার্য্যানুসন্ধায়িনী ও বিশ্লেষকারিণী যুক্তিবলে (By Analytic, a posteriori, Inductive method) জগতের যাবতীয় তত্ত্ব অন্বেষণ করে। ইহা পর্য্যবেক্ষণাদি বলে পদার্থবিশেষের বাহ্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণাগুণ সম্যক বিচার করিয়া বা পরীক্ষাগারে বৈজ্ঞানিক যন্ত্র দ্বারা পদার্থ বিশেষের বাহ্য গুণাগুণ সম্যক্ পরীক্ষা করিয়া উহার অভ্যন্তরীণ মৌলিক ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা পায়।

দর্শন সকল বিষয়ের প্রাথমিক স্তর প্রকৃতির স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ দ্বারা বা অধ্যাত্মবিজ্ঞানোক্ত মহাসত্যের সাহায্যে ভালরূপ মীমাংসা করিয়া উহাদের বাহ্যস্তর ব্যাখ্যা করে। কিন্তু বিজ্ঞান পদার্থবিশেষের বাহ্যস্তর অধিক মনো-

নিবেশ পূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করিয়া তল্লব্ধজ্ঞান দ্বারা উহার প্রাথমিক স্তর ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা পায়। ইহাতে বুঝা উচিত, দর্শনের গতি কেন্দ্র হইতে পরিধির দিকে, (Centrifugal), আর বিজ্ঞানের গতি পরিধি হইতে কেন্দ্রের দিকে (Centripetal)। দর্শন বস্তুর সাধারণ মৌলিক ধর্ম্ম হইতে বৈশেষিক ধর্ম্মের অনুসন্ধানে তৎপর, আর বিজ্ঞান বস্তুর বৈশেষিক গুণাগুণ আলোচনা করিতে করিতে উহার মৌলিক গুণাগুণ আবিষ্কার করিতে ব্যগ্র।

এদেশের আয়ুর্ব্বেদ ও পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞান পর্য্যালোচনা করিলে দর্শন ও বিজ্ঞানের বিরোধ ভালরূপ বুঝা যায়। প্রাচ্য আয়ুর্ব্বেদের মূলভিত্তি দর্শনপ্রতিপাদিত বাতপিত্তকফের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার মতে বাতপিত্তকফ দেহের আদ্যন্তর এবং ইহার যাবতীয় গ্রন্থে শরীরের প্রত্যেক পীড়া বাতজ, পিত্তজ ও কফজ এই তিন শ্রেণিতে লক্ষণানুসারে বিভক্ত। শুনিতে পাই, ইহাদের তারতম্য মণিবন্ধের নাড়ীতে ভালরূপ প্রকাশ পায় কিন্তু পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞান শবব্যবচ্ছেদলব্ধ চাক্ষুষ পরীক্ষিত প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং যাবতীয় গ্রন্থে পীড়াগুলি দেহস্থ যন্ত্রানুসারে, এমন কি, যন্ত্রের অংশবিশেষ অনুসারে বিভক্ত করা হয়, যেমন ফুস্ফুসের পীড়াগুলি নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস, প্লুরিসি প্রভৃতি।

এস্থলে ধান ভান্‌তে শিবের গীত গাইব। বাতপিত্তকফ এই মতটী কি প্রকার এবং ইহা কোথা হইতে আসিল। অনেকে মনে করেন, এই উৎকৃষ্ট মতটী পুরাকালে আর্য্য ঋষিগণ যোগবলে প্রাপ্ত হন। এই মতের জন্য আয়ুর্ব্বেদের এত উন্নতি এবং আজ পর্য্যন্ত ইহার এত প্রতিপত্তি। এই ভারত হইতে এই শ্রেষ্ঠ মত আরব, গ্রীস্‌ প্রভৃতি নানাদেশে প্রচারিত হয়। আয়ুর্ব্বেদের এমন সুসময় গিয়াছে যে, পৃথিবীবিজেতা মহৎ আলেকজাণ্ডার, খলিফা হারুণ রসিদ প্রভৃতি অধীশ্বরবর্গ এ দেশের সুচিকিৎসক রাখিতেন। ইউরোপে নববিজ্ঞানের অভ্যুদয়ে যখন হারভি সাহেব হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ও রক্তসঞ্চালনের নিয়মাবলি আবিষ্কার করেন, তদবধি এই শ্রেষ্ঠ মত পাশ্চাত্যজগতে রহিত হইয়া যায়।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, আয়ুর্ব্বেদের এই মত কেবল অনুমানসিদ্ধ; শরীরের প্রত্যেক ব্যাধিতে ইহার বিভিন্ন দ্বারদেশ হইতে বাত, পিত্ত ও কফ, এই তিন রসের কোন না কোন রস নির্গত হয়। অতএব বাত-পিত্তকফ শরীরের প্রধান রস (Humours)। ইহাদের বিকৃতিতে শরীরের বিকৃতি এবং উহাদের সাম্যাবস্থা স্বাস্থ্য নামে উক্ত হয়। তাঁহারা আরও বলেন, যেমন ভারতের দর্শনশাস্ত্রে সত্ত্বরজস্তম প্রকৃতির ত্রিগুণ এবং এই ত্রিগুণের অনন্ত ক্রিয়াবশতঃ বিশ্বের অনন্ত মঙ্গলামঙ্গল সম্পাদিত হইতেছে, সেইরূপ ভারতের আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে বাতপিত্তকফ শারীরিক প্রকৃতির ত্রিগুণ এবং এই ত্রিগুণের অনন্তক্রিয়াবশতঃ শরীরের অনন্ত মঙ্গলামঙ্গল ঘটিতেছে।

আজকাল আয়ুর্ব্বেদের এই মত লইয়া চিকিৎসক সম্প্রদায়ের ভিতর বিস্তর বাদানুবাদ চলিতেছে; সেজন্য পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহিত ইহার সমন্বয় করা উচিত।

বাহ্যদর্শনে তুমি শরীরের অভ্যন্তর হইতে বিবিধ রোগে যে বাত, পিত্ত ও কফ নিঃসৃত হইতে দেখ, উহারা তাহা নহে। উহারা শরীরের মূলে বা আদ্যন্তরে বর্ত্তমান। উহারা ইহার মূলপ্রকৃতি গঠন করে। তন্মধ্যে বাতকে দেহের যাবতীয় স্নায়ুমণ্ডলের ক্রিয়াপরম্পরা, পিত্তকে ইহার অগ্ন্যুৎপাদিকা ও পোষণকারিনী শক্তি এবং কফকে স্নিগ্ধকররসোৎপাদিকা ও আবর্জ্জন-নিঃসরণকারিনী শক্তি জ্ঞান করা উচিত। শরীরস্থ প্রত্যেক যন্ত্র, ইহার প্রত্যেক অংশ, এমন কি, প্রত্যেক জীবাণু উহাদের লীলাস্থল। জীবনীশক্তি-সম্পন্ন যে প্রটোপ্লাসম প্রত্যেক জীবাণুতে দেখা যায়, ইহার মূলপ্রকৃতি বাত পিত্তকফ গঠন করে। যেখানে জীবনীশক্তি দেখা যায়, সেইখানেই উহাদের ক্রিয়া প্রকটিত হয়।

স্নায়ুমণ্ডলের সাধারণ ক্রিয়ার নাম বাত। জীবদেহের দুই প্রকার স্নায়ু-মণ্ডলে (Cerebro-spinal and Sympathetic systems) যে তাড়িৎ প্রবাহ রূপ ক্রিয়া (Neural current) অনুক্ষণ চলিতেছে, যদ্দারা প্রত্যেক যন্ত্রের ক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে, তাহার সাধারণ নাম বাত। ইহাতে মস্তিষ্ক, মেডুলা অবলঙ্গেটা ও কশেরুকা মর্জ্জার ক্রিয়া পরম্পরা বুঝায়, পঞ্চ

জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় যোগে যত অসংখ্য ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে, তাহাও বুঝায় এবং আমাদের অজ্ঞাতসারে (Sympathetic) স্নায়ুমণ্ডল দ্বারা আভ্যন্তরিক যন্ত্রসকলের যত অসংখ্য ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া জীবন রক্ষিত হইতেছে, সকল ক্রিয়ার মূলীভূত কারণ একমাত্র বাত। এই বাত শরীরের পঞ্চস্থানে পঞ্চবিধ কর্ম্ম করায় অপান প্রাণ বান উদান প্রভৃতি নামে খ্যাত।

পিত্ত অগ্নিরূপী; ইহা কেবল যকৃৎ হইতে নিঃসৃত রস নহে। ইহাতে প্রাণধারণোপযোগিনী ত্রিশক্তি বুঝায়।

প্রথমতঃ। দেহের যাবতীয় যন্ত্রে উহাদের ক্রিয়াবশতঃ অম্লজান যোগে যে দাহক্রিয়া (Oxidation) অনুক্ষণ চলিতেছে, যদ্দ্বারা ইহার স্বাভাবিক উত্তাপ জীবদ্দশায় রক্ষিত হয় এবং ইহা বিকৃত হইলে যে দাহক্রিয়ার আধিক্য বশতঃ সেই উত্তাপ বর্দ্ধিত হয়, সেই দাহক্রিয়ার মূলীভূত কারণ পিত্ত। স্বাভাবিক অবস্থায় শরীরে যে অগ্নি জ্বলিতেছে, তাহাই পিত্ত।

দ্বিতীয়তঃ। যে অগ্নি দ্বারা ভুক্তদ্রব্য পাকাশয়ে ও অন্ত্রে জীর্ণ হয়, তাহার নাম পিত্ত। ইহাতে মুখবিবরনিঃসৃত লালা, পাকাশয় রস (Gastric juice) যকৃতের পিত্ত, প্যানক্রিয়ার রস ও অন্ত্ররস প্রভৃতি বিবিধ রসের যে রসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা ভুক্ত দ্রব্য উদরাভ্যন্তরে পরিপাক পায়, তাহার সাধারণ নাম পিত্ত। ইহাতে শরীরস্থ যাবতীয় রসনিঃসারক যন্ত্রের (Secretory organs) ক্রিয়া বুঝায়।

তৃতীয়তঃ। উদরের জীর্ণ দ্রব্যরাশি অন্ত্রস্থ শিরা ও ল্যাকটিয়াল (Lactials) দ্বারা শোষিত হইয়া যকৃত, প্লীহা ও রসগ্রন্থির ভিতর দিয়া সঞ্চারিত হইতে হইতে যে সকল পরিবর্ত্তন দ্বারা ক্রমশঃ শোণিতে পরিণত হয়, উহার মূলীভূত কারণ পিত্ত। ইহাতে বুঝা উচিত, অগ্নিরূপী পিত্ত দ্বারা শরীরের স্বাভাবিক উত্তাপ রক্ষিত হইতেছে, ভুক্ত দ্রব্য জীর্ণ, শোষিত ও শোণিতে পরিণত হইতেছে।

এখন কফ কাহাকে বলে? শরীরের বিবিধ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি (Mucous membrane) ও রসঝিল্লি (Synovial and Serous membrane) হইতে যে রস ও আম নির্গত হইয়া ইহার আভ্যন্তরিক ক্লেদ বা গ্লানি দূর করে, তাহার সাধারণ নাম কফ। ইহাতে ফস্‌ফস্‌ ও নাসিকার কফ, অন্ত্রের আম,

যোনির আম, গ্রন্থিসমূহের রস (Synova), রসঝিল্লির রস (Serum) প্রভৃতি সকলই বুঝায়। ইহাতে আরও মূত্রগ্রন্থিদ্বয়ের মূত্রনিঃসরণ, চর্ম্মস্থ স্বেদগ্রন্থির স্বেদনিঃসরণ, অণ্ড হইতে শুক্রনিঃসরণ, সকলই বুঝায়। এইরূপে শরীরের নানা যন্ত্র হইতে আম ও কফ নিঃসৃত হইয়া ইহাকে বিশুদ্ধ রাখে ও স্নিগ্ধ করে। এক কফ দ্বারা (Excretory organs) ক্রিয়া বুঝায়।

দেখ, একদিকে শরীরের সর্ব্বস্থানে ক্রিয়াঘটিত ও পিত্তজনিত উত্তাপ উৎপন্ন হইয়া দাহক্রিয়া চলিতেছে, আবার অপর দিকে সেই উত্তাপকে মন্দীভূত করিয়া সাম্যাবস্থায় রাখিবার জন্য ইহার নানা স্থলে জলীয় আম ও রস নির্গত হইতেছে। বাত বা স্নায়ুমণ্ডলের ক্রিয়া পিত্ত ও কফকে সাম্যাবস্থায় রাখিয়া দিয়া দেহের কার্য্য সুচারুরূপে চালাইতেছে।

এই প্রকারে শরীরের বাত, পিত্ত ও কফ সমঞ্জসীভূত হওয়ায় ইহার স্বাভাবিক স্বাস্থ্য রক্ষিত হয়। যখন উহাদের কোন না কোন বৈলক্ষণ্য বা বিকার উপস্থিত হয়, তখন বিবিধ রোগ দেখা দেয়। সাধারণতঃ মস্তিষ্ক ও কশেরুকামজ্জা বিকৃত হইলে বাতবিকার বা বাতব্যাধি জন্মে, ফুস্‌ফুস্‌ ও হৃদয়ের ক্রিয়া বিকৃত হইলে কফবিকার ঘটে এবং অন্ত্রের ক্রিয়া বৈলক্ষণ্য হইলে পিত্তবিকার ঘটে। যখন এই ত্রিগুণ যুগপৎ বিকৃত হইয়া যায়, তখন ত্রিদোষ বা সান্নিপাতিক বিকার উপস্থিত হয়।

এখন বাতপিত্তকফ এই মতের সাহায্যে আয়ুর্ব্বেদে শরীরের যাবতীয় পীড়ার বাহ্য লক্ষণগুলি নির্দ্দেশ করা হয়। কিন্তু পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞান কোন্ রোগে কোন্ যন্ত্রের কিরূপ বিকার উপস্থিত, তাহাই শব ব্যবচ্ছেদ করিয়া জানিতে চেষ্টা পায়। উভয় প্রণালী রোগের লক্ষণাদি ভালরূপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া উহার প্রতীকার করিতে চেষ্টা পায়; কিন্তু উহাদের পার্থক্য এই, আয়ুর্ব্বেদ শারীরিক প্রকৃতির আভ্যন্তরে বাতপিত্ত কফ সিদ্ধান্ত করিয়া উহাদের সাহায্যে রোগের বাহ্য লক্ষণগুলি ব্যাখ্যান করে; আর বিজ্ঞান রোগের লক্ষণাদি ও যন্ত্রের অণুবীক্ষণদৃষ্ট বিকারাদি ভালরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া উহাদের আভ্যন্তর বা মূল কথা জানিতে চেষ্টা পায়। ইহাতে বুঝা যায়, একের গতি কেন্দ্র হইতে পরিধির দিকে, অপরের গতি পরিধি হইতে কেন্দ্রের দিকে, একের ভিত্তি

প্রাচ্যদর্শন, অপরের ভিত্তি পাশ্চাত্যবিজ্ঞান। ইহাতে প্রাচ্যদর্শন ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের বিরোধ কথঞ্চিৎ বুঝা যাইতেছে।

বিষয় ও উদ্দেশ্য লইয়া উহাদের ভিতর বিস্তর পার্থক্য দেখা যায়। দর্শন সূক্ষ্মজগৎ ও মনোজগতের তত্ত্ব অন্বেষণ করিতে যত অধিক যত্নবান, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্যজগতের সত্য তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে তত নারাজ, আর বিজ্ঞান বাহ্যজগতের সত্য তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে যত অধিক যত্নবান, মনোজগৎ ও সূক্ষ্মজগতের তত্ত্ব অন্বেষণ করিতে তেমনি নারাজ। দর্শন অনুমান বলে হউক, অধ্যাত্মবিজ্ঞানের সত্য পাইয়া হউক, মনোজগতের ক্রিয়া ও বাহ্য জগতের আদ্যন্তর ভালরূপ ব্যাখ্যা করে। আর বিজ্ঞান পঞ্চেন্দ্রিয় যোগে প্রাকৃতিক দৃশ্যপটল ভালরূপ সন্দর্শন ও পরীক্ষা করিয়া বাহ্যজগতের আভ্যন্তর ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা পায়।

দর্শনের মতে স্থূল জড় সূক্ষ্মবুদ্ধির চরম পরিণাম বা বিকার, ইন্দ্রিয়াতীত সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও সূক্ষ্ম পদার্থের ক্রমবিবর্দ্ধনে এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল বিশ্বপ্রপঞ্চ উদ্ভূত। কিন্তু বিজ্ঞানের মতে কেবলমাত্র জড়পদার্থ ও জড়শক্তির সংযোগে ও বিয়োগে এ জগৎ সৃষ্ট। ইহার মতে সূক্ষ্মবুদ্ধি স্থূলজড়ের চরম পরিণতি বা স্ফূর্ত্তি, স্থূলজড় ভৌতিক নিয়মানুসারে ক্রমবিবর্ত্তিত হইয়া উৎকৃষ্ট জীবদিগের উন্নত বুদ্ধি উৎপাদন করে। একের মতে মানববুদ্ধি বৈশেষিক ও স্বর্গীয়, পশুবুদ্ধি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন; অপরের মতে মানব বুদ্ধিতে ও পশুবুদ্ধিতে পরিমাণগত বিস্তর প্রভেদ থাকিলেও কোনরূপ প্রকারগত প্রভেদ নাই, মানববুদ্ধিকে ইতর প্রাণীদের বুদ্ধির সমষ্টি জ্ঞান করা উচিত। মানবমস্তিষ্ক অধিক স্ফুরিত হওয়ায় তাঁহার জ্ঞানশক্তি এত অধিক স্ফুরিত।

দর্শনের প্রধান উদ্দেশ্য মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন, কি প্রকারে তাঁহার অধঃপতিত আত্মার প্রকৃত উন্নতি সাধন হইবে, কি প্রকারে তিনি এ জগতে দ্বন্দ্বজ ক্ষণস্থায়ি আধিভৌতিক সুখদুঃখ উপেক্ষা করিয়া প্রকৃত আধ্যাত্মিক সুখে সুখী হইবেন। ইহার মতে তাঁহার চরম উন্নতি, কি প্রকারে তিনি যোগবলে অলৌকিক ক্ষমতা পাইবেন, কি প্রকারে আত্মার অষ্টসিদ্ধি স্ফুরণ

করিয়া তিনি সিদ্ধপুরুষ হইবেন, কি প্রকারে তাহার ধর্ম্মপ্রবৃত্তিগুলি স্ফুরিত হইয়া তিনি সংসারে দেবতুল্য হইবেন।

বিজ্ঞানের প্রধান উদ্দেশ্য মানবের আধিভৌতিক উন্নতি সাধন, কি প্রকারে তিনি এ সংসারে অশেষ ভৌতিক সুখে সুখী হইবেন, কি প্রকারে তিনি নিজ বুদ্ধিবলে প্রকৃতির বিপক্ষে গমন করিয়া নিজের ইন্দ্রিয়সুখভাণ্ডার বর্দ্ধন করিতে পারিবেন। ইহার নিকট এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎই সর্ব্বস্ব এবং এই স্থূল জগতের উপর আধিপত্য বিস্তারই ইহার চরম উদ্দেশ্য। বিজ্ঞান মানবের বুদ্ধিশক্তির প্রাধান্য কেবল স্বীকার করে এবং একমাত্র বুদ্ধিবলে তাঁহাকে দেবতুল্য করিতে চাহে।

বিজ্ঞানের মতে ধর্ম্ম মানবমনের দুর্ব্বলতা মাত্র এবং যদি ইহার কিছুমাত্র আবশ্যকতা থাকে, তাহা কেবল সমাজস্থিতির জন্য। ইহার মতে এ জগতের এক আদিকারণ থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু যখন ইহা সর্ব্বতোভাবে অজ্ঞেয়, তখন ইহাকে জানিবার কি প্রয়োজন? যে নিয়মতন্ত্রের অধীন হইয়া এ জগৎ ঘুরিতেছে ও ফিরিতেছে, তাহা জানাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। ইহা লোকপ্রখ্যাত বা লৌকিক ঈশ্বর আদৌ মানে না। ইহার মতে আত্মার অস্তিত্ব নাই, পরলোকেরও অস্তিত্ব নাই এবং মানবের যথাসর্ব্বস্ব মানবমন কেবল মস্তিষ্ক হইতে উপজাত বা সমষ্টিভাবে উহার ক্রিয়ামাত্র। ইহা অনুমানসিদ্ধ প্রমাণকে একবারে অগ্রাহ্য করে এবং যাহা চাক্ষুষ প্রমাণ, তাহাই সাদরে গ্রহণ করে।

এইরূপ নানাবিষয় লইয়া দর্শনের সহিত বিজ্ঞানের ঘোরতর বিবাদ বিসম্বাদ চলিতেছে; কিন্তু সভ্যতাবর্দ্ধনের সঙ্গে বিজ্ঞানের যত প্রাদুর্ভাব বাড়িবে, দর্শনকে পরিশেষে পর্ব্বতগুহায় আশ্রয় লইতে হইবে।

দর্শনের দোষোদ্ঘাটন।

পাশ্চাত্যবিজ্ঞান প্রাচ্যদর্শনের নানা দোষ দর্শনে ইহার বিস্তর নিন্দাবাদ করে। ইহার মতে শেষোক্ত অসার, শূন্যগর্ভ ও কাল্পনিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ। এ শাস্ত্রের আলোচনায় সমাজের তাদৃশ কোন বিশেষ উপকার নাই বলিলেই হয়। এই অপদার্থ ও অলীক শাস্ত্র অনুশীলন করিয়াই এতকাল সুধীবর্গ কেবল বিপথে চালিত হইতেন।

অনেকে বলেন, যতকাল পাশ্চাত্যজগতে বিজ্ঞানের অভ্যুদয় হইয়াছে, ততকাল ইহা প্রকৃত জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইয়াছে এবং তৎপূর্ব্বে ইহা ঘোরান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। তাহার সাক্ষ্য দেখ না, পাশ্চাত্যজগৎ বিজ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইয়া উন্নতির পথে কিরূপ ধাবমান, আর প্রাচ্যজগৎ দর্শনশাস্ত্র অনুশীলন করিয়া কিরূপ রক্ষণশীল বা অবনত! দর্শনশাস্ত্র অপেক্ষা বিজ্ঞান যে শতগুণে শ্রেষ্ঠ, সে বিষয়ে সন্দেহ কি? ফলতঃ জগৎ ক্রমশঃ উন্নতির পথে ধাবমান বলিয়া আজকাল জ্ঞানের এত উন্নতি এবং বিজ্ঞানের এত প্রাদুর্ভাব ও প্রতিপত্তি।

বিজ্ঞানের মতে দার্শনিক পণ্ডিত অপেক্ষা একজন অধম পাদুকাকার ও সমাজের অধিক উপকারক। দর্শনশাস্ত্র অনুশীলন করিয়া প্রথমোক্ত সমাজের যে কি উপকার করেন, তাহা বুঝা যায় না; কিন্তু শেষোক্ত পাদুকা নির্ম্মাণ করিয়া লোকের পদযুগল কণ্টকাদি হইতে রক্ষা করে; অতএব সে ব্যক্তি সমাজের মহোপকারী; আর প্রথমোক্ত দুর্বোধ্য দর্শন শাস্ত্র নিভৃতে অনুশীলন করিয়া কতকগুলি মানবকপোলকল্পিত জ্ঞানে বিভোর হন ও কাল্পনিক আনন্দে উন্মত্ত হন। কল্পনাজগতে উড্ডয়ন করিতে করিতে তিনি সম্মুখস্থিত বাস্তব জগতের অস্তিত্ব একপ্রকার ভুলিয়া যান। এবংবিধ লোককে সমাজের অপোগণ্ড জ্ঞান করা উচিত। যে বেদান্ত পাঠ করিয়া অনেকে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী সাজে, তাহার কি সুখ্যাতি করা উচিত?

বিজ্ঞানের মতে দার্শনিক জ্ঞানমাত্রেই কাল্পনিক ও ভ্রমসঙ্কুল, আর বাগাড়ম্বরে ও বাক্যালঙ্কারে পূর্ণ। ইহার পর্য্যবেক্ষণ, পরীক্ষা কিছুই নাই; আছে মাত্র কেবল স্বকপোলকল্পনা ও অনুমান। ইহাদের সাহায্যে দার্শনিক পণ্ডিত একটী অপরূপ জ্ঞানব্যূহ রচনা করেন এবং তাহাতেই আপনাকে গুটিপোকার ন্যায় জড়ীভূত করিয়া রাখেন।

বিজ্ঞানের মতে দর্শনশাস্ত্র মূলে ভ্রান্ত। ইহার মৌলিক মতামত সর্ব্বৈব অনুমানসিদ্ধ বলিয়া ইহা আদ্যোপান্ত ভ্রমে পরিপূর্ণ। পদার্থের যে সকল মৌলিক গুণাগুণ ইহা নির্দ্দেশ করে বা প্রকৃতির আদ্যগুণ যেরূপ বর্ণন করে, বিজ্ঞান তাহা কস্মিন্‌কালে গ্রাহ্য করিবে না, বরং এক

তুড়িতে তাহা উড়াইয়া দিবে। দেখ, বিজ্ঞান, দর্শনপ্রতিপাদিত ঈশ্বর, আত্মা, পরলোক, অতীন্দ্রিয়জ্ঞান প্রভৃতি কিছুই স্বীকার করে না।

বিজ্ঞান সদর্পে ও সাহঙ্কারে দর্শনের উপর উপহাস করিয়া বলে "রে ভ্রান্ত দর্শন! ত্রিংশ শতাব্দী ব্যাপিয়া তুমি যে মানবমনকে চালিত করিয়া আসিলে, তাহাতে জগতের কি কি মহোপকার সাধিত হইল? এতকাল নানা দেশের পণ্ডিতগণ তোমার অনুশীলন করিয়া কেবল বিপথে চালিত হইতেন এবং জগৎও ঘোরান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু দেখ, অল্প দিন মাত্র হইতে চলিল, আমি পাশ্চাত্য জগৎ চালাইতে আরম্ভ করিয়াছি; ইতিমধ্যে সর্ব্বত্র আমার বাহবা পড়িয়া গিয়াছে এবং সর্ব্বত্র আমারই জয়জয়কার হইতেছে। তাহার সাক্ষ্য দেখ না, আমার সৃষ্ট বাষ্পীয় রথ, তাড়িৎ বার্ত্তাবহ, এরোপ্লেন প্রভৃতি দ্বারা জগতের কত মহোপকার সাধিত হইতেছে! ভবিষ্যতে আমি নূতন নূতন আবিষ্কার ও উদ্ভাবন করিয়া সমাজের সুখসমৃদ্ধি আরও যে কতগুণ বর্দ্ধিত করিব, তাহা এখন কেহ স্বপ্নেও জানেন না।

রে নির্ব্বোধ দর্শন! এতকাল মানব কেবল তোমার কুহকে পতিত হইয়া নিজ শ্রেয় বুঝিতে পারে নাই এবং তুমিও তাহাকে প্রকৃত সভ্যতাপথে অগ্রসর হইতে দেও নাই। আজকাল সভ্যজগতের লোকেরা তোমার গুণাগুণ ভালরূপ বুঝিতে পারিয়াছে; তাহারা আর তোমার কুহকজালে পতিত হয় না। তোমার অপদার্থতা ও অসারত্ব দর্শন করিয়াই ত তাহারা আজকাল তোমার এত অনাদর ও নিন্দা করিতেছে; বস্তুতঃ তোমাতে অণুমাত্র সারবত্তা নাই; তুমি সর্ব্বথা অনাদরের যোগ্য।

আজকাল সভ্যদেশমাত্রেই বিজ্ঞানের অধিক প্রাদুর্ভাব ও প্রতিপত্তি। দর্শন সম্বন্ধে ইহা যাহা প্রকাশ করে, জনসাধারণ তাহাই আগ্রহ পূর্ব্বক শিরোধার্য্য করিয়া লয়। কিন্তু যাহারা প্রকৃত জ্ঞানী ও বাক্‌দেবীর প্রকৃত সেবক, তাহারা কদাচ দর্শনের অনাদর করিবেন না। তাঁহারা জানেন, যে শাস্ত্র মানবকে আধ্যাত্মিক পথে ও ধর্ম্মপথে অধিক অগ্রসর করায়, যে শাস্ত্র জীবনের কূট প্রশ্ন মীমাংসা করিতে গিয়া প্রকৃতির আদ্যন্তর ভালরূপ ব্যাখ্যান করে, যে শাস্ত্রের অনুশীলন দ্বারা মানববুদ্ধি প্রখর হইতে প্রখরতর হইয়াছে, সে শাস্ত্র

অনেকে মনে করেন, এই মতটী বৈজ্ঞানিকদিগের সর্ব্বথা অনুমানসিদ্ধ। যে বিজ্ঞান দর্শনকে অনুমানসিদ্ধ বলিয়া উপহাস করে, সেই বিজ্ঞান জড়বস্তুর আদ্যন্তর বর্ণন কালে নিজে অনুমানের সাহায্য লয়। যে স্থলে অধ্যাত্ম বিজ্ঞান ও দর্শন স্থূল পদার্থের মূলে সূক্ষ্ম পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া উহার আভ্যন্তর ব্যাখ্যান করে, সে স্থলে জড়বাদী জড়বিজ্ঞান জড়পদার্থের সূক্ষ্মতর পরমাণুপুঞ্জ দ্বারা অধিকৃত অনুমান করিয়া উহার আদ্যন্তর ব্যাখান করিতে চেষ্টা পায়। বিজ্ঞানবিৎপণ্ডিত বলেন, যেমন কোন সুগন্ধ দ্রব্যের সূক্ষ্ম অণুগুলি আকাশে মিলিত হইয়া বায়ুর তরঙ্গ যোগে নাশাভ্যন্তরে প্রবেশ করত ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের স্নায়ুযোগে মস্তিষ্কে ঘ্রাণোৎপাদন করে এবং উহার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অণুগুলি যদিও কোন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের আয়ত্তে আইসে নাই, তথাচ ইহাদের অস্তিত্ব আমরা ঘ্রাণযোগে সম্যক্ অনুভব করি; সেইরূপ যাবতীয় ভৌতিক পদার্থের পরমাণুরাশি আমাদের নিকট সম্পূর্ণ অদৃশ্য হইলেও উহাদের একত্র সমাবেশ ও পুঞ্জীকরণ দ্বারা জগতের যাবতীয় পদার্থ বিরচিত ও নির্ম্মিত জ্ঞান করা উচিত। যে সকল জড়শক্তি দ্বারা জড়জগৎ অনুক্ষণ পরিচালিত, উহারা ঐ সকল ভৌতিক পদার্থের পরমাণুপুঞ্জের উপর নিজ নিজ প্রতাপ ও ক্রিয়া সকল সময়ে প্রকটিত করে।

পরমাণুবাদের সাহায্য লইয়াও জড়বাদী জড়বিজ্ঞান জড়জগতের আদ্যন্তর ভালরূপ মীমাংসা করিতে পারে নাই। এমত পাঠে প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তির মনে তাদৃশ তৃপ্তিবোধ হয় না। যোগী ও মহাত্মাগণ এ কথা শ্রবণে হাস্য সম্বরণ করেন না। আরও দেখা যায়, এক বিজ্ঞানশাস্ত্র পরমাণুগুলির গুণাগুণ আবশ্যকমত একরূপ নির্দ্দেশ করে, অপর শাস্ত্র নিজের আবশ্যকমত উহাদের গুণাগুণ অন্যরূপ নির্দ্দেশ করে। কোন শাস্ত্র বলে, উহারা অবিভাজ্য, অপর শাস্ত্র বলে উহারা অবিভাজ্য ও স্থিতিস্থাপক; যে বস্তু অবিভাজ্য, সে বস্তু কি প্রকারে স্থিতিস্থাপক হইতে পারে? এইরূপ সামান্য কথা লইয়া বিজ্ঞানজগতে নানামুনির নানামত চলিতেছে। ইহাতে সিদ্ধান্ত করা উচিত, পরমাণুবাদ (Dalton's Atomic Theory) অসম্পূর্ণ (থিওসফির মত)।

আরও দেখ, যে সকল ভৌতিক শক্তি দ্বারা জড়জগৎ অনুক্ষণ পরিচালিত, যাহাদের ঘাতপ্রতিঘাত ও ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া জড় বস্তুর উপর নিয়ত প্রকটিত,

উহাদেরও প্রকৃত স্বরূপ বিজ্ঞান ভালরূপ নির্দ্দেশ করিতে পারে না। ইহার মতে, উহারা চিৎশক্তি-রহিত অচেতন অন্ধ জড়শক্তি মাত্র, কেবল জড়পদার্থের সংযোগে উহাদের ক্রিয়া জড়জগতে দেখা যায়। মাধ্যাকর্ষণ, যোগাকর্ষণ রাসায়নিকাকর্ষণ,চৌম্বুকাকর্ষণ, উত্তাপ, আলোক,তাড়িৎ প্রভৃতি যে সকল ভৌতিক শক্তির নিয়মাবলি বিজ্ঞান সোৎসাহে নির্দ্দেশ করে, উহাদের প্রকৃত আদিকারণ ইহা ভালরূপ নির্দ্দেশ করিতে পারে না। এ বিষয়েও নানামুনির নানামত চলিতেছে। দেখ, এক উত্তাপ সম্বন্ধে কেহ বলেন, ইহা ইথারের তরঙ্গায়ন (undulation) কেহ বা বলেন, ইহা ইথারাণুগণের পৌণপুণ্য সঞ্চালন (Vibration)। যাহা হউক, এস্থলে বিজ্ঞান নিজ দোষ স্বীকার করিয়া বলে, বিশ্বের চরমাদ্য বিষয়গুলি (Ultimate facts of Nature) অবগত হওয়া মানবের সাধ্যাতীত।

থিওসফি বলে, যদিও ভৌতিক শক্তিগুলি কেবল মাত্র জড়পদার্থযোগে এ সংসারে প্রকটিত, তথাচ সূক্ষ্ম জগতের সহিত উহাদের সম্বন্ধ অতীব ঘনিষ্ঠ। সেজন্য পঞ্চেন্দ্রিয়যোগে এক মাত্র জড়জগতের ক্রিয়া দেখিয়া উহাদের প্রকৃত স্বরূপ নির্দ্দেশ করা বাতুলতা মাত্র। যে আকাশ বা ইথর দ্বারা উহারা এ জগতে ব্যক্ত, তাহাই আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর নয়। তবে কিপ্রকারে উহাদের প্রকৃত স্বরূপ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে?

সকলের পক্ষে ইহা জানা যথেষ্ট, যে উহারা প্রকৃত আধিদৈবিক অর্থাৎ সূক্ষ্মজগতের দেবগণ প্রত্যেক ভৌতিক শক্তির মূলদেশ অধিকার করিয়া আছেন। তাঁহারাই সূক্ষ্মজগৎ হইতে এই স্থূলজগৎকে এমন সামঞ্জস্য ও সুশৃঙ্খলতার সহিত পরিচালিত করিতেছেন। সমগ্র জগতে যে বিশ্বজনীন অপূর্ব্ব সুশৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য দেদীপ্যমান, তাহা কি কদাচ অন্ধ জড়শক্তির ক্রিয়া হইতে পারে?

ঝটিকা, দুর্ভিক্ষ, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, জলপ্লাবন প্রভৃতি যাবতীয় প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা, আমাদের মনে হয়, অন্ধ জড়শক্তির ক্রিয়া মাত্র। কিন্তু বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে বোধ হয়, ইহাদের কোন গূঢ় কারণ আছে। ইহারা প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে ঘটিতেছে সত্য, অথচ সূক্ষ্ম জগৎস্থ দেবগণের অধিনেতৃত্বে ঘটিতেছে। একথা শ্রবণে অনেকে হাস্য সম্বরণ করিবেন না বটে, কিন্তু ইহা

অধ্যাত্মবিজ্ঞানের কথাও সনাতন হিন্দুধর্ম্মের কথা। দেবতাদিগের অনুশাসনের উপর লোকের পূর্ণ বিশ্বাস ছিল বলিয়া আকস্মিক ঘটনা মাত্রেই পূর্ব্বে দৈবঘটনা বলিয়া উক্ত হইত। এখন আমরা দৈব শব্দের অন্যরূপ অর্থ করিতে শিখিতেছি।

এখন জীবদেহ সম্বন্ধে বিজ্ঞান কতদূর আবিষ্কার করিতে সমর্থ, তাহার আভাস দেওয়া কর্ত্তব্য। অধিক আর কি বলিব, অসাধারণ পর্য্যবেক্ষণাদি বলে ইহা যে সকল মহাসত্য আবিষ্কার করে, তাহাও অনেকস্থলে অসম্পূর্ণ।

সকলেই জানেন, জীবদেহে যতদিন প্রাণ অবস্থিতি করে, ততদিন জীব এ সংসারে জীবিত থাকিয়া অনন্ত কর্ম্মে ব্যাপৃত হয় এবং যে মুহূর্ত্তে প্রাণ জীবদেহ হইতে বহির্গত হইয়া যায়, সেই মুহূর্ত্তে ইহা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হয়; এখন প্রাণ শব্দের প্রকৃত অর্থ কি? জনসাধারণের বিশ্বাস, ইহা এক প্রকার বায়ুবিশেষ। নিশ্বাস প্রশ্বাস যোগে যতক্ষণ এই বায়ু শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করে, ততক্ষণ প্রাণ জীবদেহে অবস্থিতি করে। যখন শ্বাস রুদ্ধ হইয়া যায়, তখনই জীবের মৃত্যু উপস্থিত হয়। বায়ুর সহিত জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বশতঃ লোকে ঐরূপ ভাবিয়া থাকে। কিন্তু বিজ্ঞানের ব্যাখ্যান অন্যরূপ।

জড়জগৎ ব্যাখ্যা করিবার সময় বিজ্ঞান যেমন পরমাণুপুঞ্জের অস্তিত্ব স্বীকার করে, সেইরূপ জীবদেহের কার্য্যপরম্পরা ব্যাখ্যা করিবার সময় ইহা জীবাণুপুঞ্জের শরণ লয়। এই সকল জীবাণু (cells) অণুবীক্ষণ যোগে দৃষ্ট হয়। ইহারা প্রটোপ্লাসম (Protaplasm) নামক জৈবনিক পদার্থে পূর্ণ ও জীবনীশক্তি সম্পন্ন। এখন প্লোটোপ্ল্যাসমে জীবনীশক্তি কোথা হইতে আইসে, তাহা নির্দ্দেশ করা সুকঠিন। যেমন পরমাণুরাশি পুঞ্জীকৃত হইয়া জড়বস্তু নির্ম্মাণ করে, সেইরূপ জীবাণুরাশি পুঞ্জীকৃত হইয়া দেহের এক এক যন্ত্র (Organ) গঠন করে। এখন যে জীবাণুপুঞ্জ একত্রিত হইয়া জীবদেহ নির্ম্মাণ করে, উহাদের জীবনীশক্তির সমষ্টি সমগ্র জীবদেহের প্রাণ। এই প্রাণ জীবের সমস্ত শরীরে অধিব্যাপ্ত থাকে। ইহাকে আয়ুর্ব্বেদে ব্যান বায়ু কহে।

এখন জীবজগতে যে জীব যত উচ্চ পদবীতে অধিরূঢ়, উহার দেহস্থ যন্ত্রগুলি তত জটিল এবং উহাদের পরস্পর সম্বন্ধও তত ঘনিষ্ঠ। একারণ উৎকৃষ্ট জীবের মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড ও ফুস্‌ফুসের ক্রিয়াপরম্পরা যতদিন সমভাবে ও রীতিমত চলিতে থাকে এবং বিশুদ্ধ রক্ত সর্ব্বশরীরে বহিতে থাকে, ততদিন

ঐ জীবদেহ জীবনসম্বন্ধীয় কতকগুলি রাসায়নিক, ভৌতিক ও মানসিক ক্রিয়া প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রকৃতিজগতের উপর আধিপত্য করে। কিন্তু যখন উপরোক্ত যন্ত্রগুলির অসাধ্য ক্রিয়াবৈলক্ষণ্য উপস্থিত হয় এবং শ্বাসক্রিয়া রুদ্ধ হওয়ায় দেহের অপবিত্র শোণিত বিশুদ্ধ হইতে পায় না, তখনই সমস্ত দেহের ক্রিয়া রহিত হইয়া যায় এবং উহার জীবনীশক্তি লোপ পায়। তৎকালে প্রকৃতিজগৎ উহার উপর আধিপত্য প্রদর্শনপূর্ব্বক উহার পরমাণুপুঞ্জকে বিশ্লিষ্ট করিয়া দেয়।

জীবদেহে যে শোণিত সর্ব্বত্র প্রবাহিত হয়, তাহা সার ও অসার বস্তুতে পূর্ণ। উহা হইতে দেহস্থ প্রত্যেক যন্ত্রের জীবাণুগুলি স্ব স্ব প্রয়োজনীয় সার বস্তু গ্রহণ করিয়া নিজ কার্য্য সাধন করে এবং ক্রিয়াঘটিত অসার পদার্থ উহাতেই প্রক্ষেপ করে। শোণিত হইতে অসার পদার্থ বা দেহের আবর্জ্জনী ঘর্ম্ম ও মূত্র যোগে নিঃসৃত হইয়া যায়। আর সমস্ত শরীরে অঙ্গার ও অম্লজান যোগে যে রাসায়নিক ক্রিয়া (Oxidation) হইতে ইহার স্বাভাবিক উত্তাপ রক্ষিত হয়, তদুৎপন্ন কার্ব্বনিক এসিড (Carbonic Acid) শোণিতে মিশ্রিত হওয়ায় ইহা কৃষ্ণ বর্ণ হইয়া অপবিত্র হইতে থাকে।

এই অপবিত্র শোণিত শিরাযোগে বহিতে বহিতে ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করে, তথায় ইহা বায়ুর অম্লজান যোগে বিশুদ্ধ হয়। নিশ্বাস দ্বারা বহির্জ্জগতের অম্লজান মিশ্রিত বায়ু ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করে ও অপবিত্র শোণিতকে বিশুদ্ধ করে। আর প্রশ্বাস যোগে কার্ব্বনিক এসিড পূর্ণ অশুদ্ধ বায়ু ফুস্‌ফুস হইতে বায়ুর সহিত নিঃসৃত হইয়া যায়। শোণিত শোধনের জন্য বায়ু বা উহার অম্লজান এত আবশ্যক বলিয়া শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হইলেই তৎক্ষণাৎ মৃত্যু উপস্থিত হয়। এজন্য জনসাধারণ প্রাণকে বায়ু স্বরূপ জ্ঞান করে।

হৃৎপিণ্ড নিজ সঙ্কোচন দ্বারা সমস্ত শরীরের অপবিত্র শোণিতকে শোধনার্থ ফুস্‌ফুসে প্রেরণ করে এবং ফুস্‌ফুস হইতে আগত বিশুদ্ধ শোণিতকে জীবনীক্রিয়া নির্ব্বাহার্থ শরীরের সকল স্থানে ধমনীযোগে প্রেরণ করে। এজন্য যে মুহূর্ত্তে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া স্থগিত হয়, সেই মুহূর্ত্তে শরীরের জীবনীক্রিয়া লোপ পায় ও মৃত্যু উপস্থিত হয়। এইরূপ দেহের যন্ত্র বিশেষ জীবনীক্রিয়া নির্ব্বাহার্থ বিশেষ আবশ্যক।

দেহস্থ যন্ত্র সকলের ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া সমস্ত শরীরের কার্য্য কিরূপ চলি-

তেছে, বিজ্ঞান তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা পায় বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, এতৎ সম্বন্ধে এখন যাহা অজ্ঞাত ও অনাবিষ্কৃত, তাহার সহিত তুলনা করিলে বিজ্ঞানাবিষ্কৃত সত্য অতি সামান্য বোধ হয়। তাহার সাক্ষ্য দেখ, সকল ক্রিয়ার মূলাধার যে জীবনী-শক্তি (Vital force) উহার প্রকৃত স্বরূপ বিজ্ঞান নির্দ্দেশ করিতে পারে না। কারণ স্থূলদেহ পরীক্ষা করিয়া বা শবব্যবচ্ছেদ করিয়া উহা জানা যায় না।

পূর্ব্বে শরীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা মনে করিতেন, জীবদেহের জীবনী-শক্তি বৈশেষিক। আজকাল তাঁহারা ইহাকে রাসায়নিক ও ভৌতিক শক্তি হইতে আদৌ পৃথক জ্ঞান করেন না। এদেশের বেদান্ত চিরদিন উপদেশ দেয়, কি স্থাবর, কি জঙ্গম, সর্ব্বত্র জীব বা জীবনী শক্তি বর্ত্তমান। পণ্ডিতবর জগদীশ বসু মহাশয় সমস্ত জগতের সমক্ষে এ কথা সপ্রমাণ করিয়াছেন। ইহাতে সিদ্ধান্ত করা উচিত, জীবনী-শক্তি এ সংসারে বৈশেষিক এবং রাসায়নিক ও ভৌতিক শক্তি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

জীবদেহে যে চৈতন্য বর্ত্তমান, যাহারা বলে জীব আমিত্বজ্ঞান বিশিষ্ট হইয়া সংসারে সর্ব্ববিধ কর্ম্ম করে ও প্রকৃতিজগতের উপর আধিপত্য করে, সেই চৈতন্য কোথা হইতে আইসে, উহার প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহাও বিজ্ঞান স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিতে পারে না। এ স্থলেও ইহা আপনাকে এই বলিয়া প্রবোধ দেয়, জগতের চরমান্ত বিষয়গুলি আমাদের অজ্ঞেয়।

মনের ক্রিয়াগুলি বিজ্ঞানের নিকট ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। ইহা এই পর্য্যন্ত জানে, মস্তিষ্ক মনের যন্ত্র, ইহার সর্ব্বাংশের ক্রিয়া হইতে মনের সমস্ত কার্য্য চলিতেছে, আর এই যন্ত্র অধিক স্ফুরিত হওয়ায় মানবের বুদ্ধিশক্তি অন্যান্য জন্তু অপেক্ষা অধিক বিকসিত; কিন্তু ইহা বলিতে পারে না, মস্তিষ্কের কোন্ স্থলের কিরূপ ক্রিয়া, ইহার কোন্ অংশ বুদ্ধির স্থান, কোন অংশ ধর্ম্মপ্রবৃত্তির স্থান ইত্যাদি। দর্শনশক্তি,শ্রবণশক্তি,বাক্‌শক্তি প্রভৃতির কেন্দ্র স্থিরীকৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও অন্ধকার ঘনীভূত আছে, মানসক্ষেত্রে যে অনন্ত চিন্তা ও অনন্ত ভাবনা উদিত হয়, উহারা ইহার মতে স্নায়বীয় পদার্থের নিষ্ঠীবন মাত্র (Secretion) অথবা স্নায়বীয় পদার্থ শোণিত সংযোগে পরিবর্ত্তিত হইয়া চিন্তায় পরিণত হয়।

বিজ্ঞান আরও একপদ অগ্রসর হইয়া বলিবে, যে তাড়িৎ-প্রবাহ (Electric Current) স্নায়ুগ্রন্থি ও স্নায়ুশিরার স্নায়বীয় আকাশে (Nervous ether) সঞ্চরণ করিতে করিতে যে প্রতিফলিত ক্রিয়াগুলি (Reflex actions) উৎপাদন করে, তাহাই প্রস্ফুরিত মস্তিষ্কে মানসিক ক্রিয়ায় পরিণত হয়। যাহা হউক, বিজ্ঞানোক্ত এই সকল শ্রুতিমনোহর বাক্যগুলি অন্ধকারে উপলখণ্ড প্রক্ষেপের স্থায় বোধ হইতেছে। ইহাতে মন আদৌ সন্তোষ লাভ করে না।

থিওসফি বলে, জীবের স্থূলদেহ এই পরিদৃশ্যমান স্থূলজগতের বস্তু বটে, কিন্তু দেহনিবদ্ধ মন জীবনের অপর সমতল ক্ষেত্রের বস্তু, অর্থাৎ সূক্ষ্মজগতের বস্তু। ইহা উভয় জগতের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বশতঃ মানসিক ক্রিয়াগুলি স্থূল জগতের পঞ্চেন্দ্রিয় ও উহাদের বিষয় দ্বারা সম্যক চালিত হইলেও ইহারা প্রকৃত পক্ষে সূক্ষ্মজগৎ হইতে মস্তিষ্কে প্রতিফলিত হইতেছে। সূক্ষ্ম জগতের সহিত মানবমনের এতাদৃশ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকাতে মানববিশেষের বা জাতিবিশেষের নিয়তিচক্র সূক্ষ্মজগৎস্থ দেবগণ কর্ত্তৃক এত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। সূক্ষ্ম জগতের বস্তু বলিয়া মনের ক্রিয়াগুলি জড়বাদী জড়বিজ্ঞান তালরূপ ব্যাখান করিতে পারে না।

বিজ্ঞান সাহংকারে উপদেশ দেয়, কতকগুলি অপরিবর্ত্তনশীল ভৌতিক নিয়মাবলী দ্বারা এ জগৎ পরিচালিত হইতেছে। কিন্তু স্থলবিশেষে এমন অলৌকিক অতিপ্রকৃত ঘটনাবলী দেখা যায়, যাহা বিজ্ঞান নিজের আবিষ্কৃত ভৌতিক নিয়ম দ্বারা ব্যাখান করিতে অসমর্থ। যোগীরা যোগবলে শূন্যে উত্থিত হয়, মাসাবধি অনশনে থাকিয়াও প্রাণধারণ করেন, ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়াও এক মাস পরে পুনরুজ্জীবিত হন এবং অতীন্দ্রিয়দর্শন ও পরকায় প্রবেশাদি নানা অদ্ভুত ক্রিয়া প্রদর্শন করেন। বিজ্ঞান এ সকল অলৌকিক ঘটনা এক ফুড়িতে উড়াইয়া দিতে চেষ্টা পায়। এ সকল প্রবঞ্চক বা যাদুকরের কার্য্য বলিয়া বিজ্ঞান উহাদের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে। উহাদিগকে বাস্তব বলিয়া স্বীকার করিলে বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত নিয়মাবলী অনেক স্থলে মিথ্যা হইয়া যায়। সে স্থলে উহাদিগকে অস্বীকার করাই যুক্তিসঙ্গত।

বাইবেল পাঠে জানা যায়, পরমযোগী ঈশাদেব গ্যালিলিয়ো হ্রদের উপর চলিয়া যান, তত্রস্থ প্রবল ঝটিকা মন্ত্রবলে শান্ত করেন, কত অন্ধ ও খঞ্জকে

গাত্রে হাত বুলাইয়া আরাম করেন। বিজ্ঞানের মতে এ সকল অলৌকিক ঘটনা ধর্ম্মের প্রলাপ মাত্র। লোক ভুলাইবার জন্য ধর্ম্মশাস্ত্রে এ সকল ঘটনা লিখিত হইয়াছে। বিজ্ঞান ইহাদিগকে বিশ্বাস করুক বা না করুক, কালে মনোবিজ্ঞানের যথার্থ উন্নতি হইলে ইহা যোগবল গ্রাহ্য করিতে বাধ্য হইবে।

ধর্ম্মের সহিত দর্শন ও বিজ্ঞানের সম্বন্ধ।

পুরাকালের অধিকাংশ দর্শনশাস্ত্র ধর্ম্মের সম্পূর্ণ পোষকতা করিয়া যায়, এমন কি, দর্শনশাস্ত্রবিশেষ ধর্ম্ম বিশেষের জন্মদাতা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু আজকাল পাশ্চাত্যজগতের উন্নত বিজ্ঞান প্রকাশ্য ভাবে ইহার বিপক্ষে দণ্ডায়মান। ভূমণ্ডলে যত প্রকার উৎকৃষ্ট ধর্ম্মমত প্রচলিত আছে, উহাদের সহিত দর্শনশাস্ত্রের সম্বন্ধ অতীব ঘনিষ্ঠ, এমন কি উহাদের মূলভিত্তি ইহার উপর প্রতিষ্ঠিত। সত্য বটে, দর্শনশাস্ত্রবিশেষ (চার্ব্বাকাদি) নাস্তিকবাদ প্রচার করাতে ঘোর ধর্ম্মদ্বেষী হইয়াছিল; তথাচ ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে, অধিকাংশ দর্শনশাস্ত্র সকল দেশে ও সকল সময়ে ধর্ম্মের সম্পূর্ণ পোষকতা ও পৃষ্ঠপোষণ করিয়া গিয়াছে।

তাহার সাক্ষ্য, এ দেশের সাংখ্য ও বেদান্ত, চীনের কন্‌ফুউসাস মত, পারস্যের জোরাষ্টার মত, গ্রীসের প্লেটোমত প্রভৃতি সকল দর্শনশাস্ত্র মানব-ধর্ম্মকে দেশে দেশে উন্নতির পথে অগ্রসর করায়। সভ্য প্রাচ্যজগতে দর্শনশাস্ত্র সম্যক্ উন্নতি লাভ করে এবং প্রাচ্যজগতে দর্শন-প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মগুলি কালে কালে উত্থিত হয়। এই প্রাচ্যজগৎ হইতে উহারা কালক্রমে সমস্ত পৃথিবীতে অভিব্যাপ্ত হইয়াছে।

দর্শনশাস্ত্র ভূমণ্ডলে একেশ্বরবাদ ও অন্যান্য উৎকৃষ্ট ধর্ম্মমত প্রচার করে। তাহার সাক্ষ্য, বেদান্ত ও উপনিষদ হিন্দুধর্ম্মে পরব্রহ্মের বার্ত্তা প্রচার করে এবং সাংখ্যদর্শন ইহার ত্রিমূর্ত্তি আনয়ন করে। নিরীশ্বরবাদী বৌদ্ধধর্ম্মের মতামত সাংখ্যদর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেইরূপ গ্রীক ও ইরান দর্শন খৃষ্টধর্ম্মের অধিকাংশ মতামত প্রচার করে।

জগতের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, দর্শনশাস্ত্রের উন্নতি ধর্ম্মোন্নতির মূলীভূত কারণ। সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে যে দেশে মানবের বিদ্যাবুদ্ধি যেরূপ স্ফূর্ত্তি লাভ

করে, তিনি তদনুরূপ পরমার্থজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া প্রথমে দেশীয় দর্শনশাস্ত্রের, পরে জাতীয় ধর্ম্মের উন্নতিসাধন করিয়া যান।

ইতিহাসপাঠে আরও বুঝা যায়, যৎকালে গ্রীশদেশে পৌত্তলিকতা প্রবল ছিল, তৎকালে সক্রেটিশাপ্রমুখ দার্শনিক পণ্ডিতগণ-যুক্তিবলে একেশ্বরজ্ঞান লাভ করেন। পরে তিন শতাব্দীর ভিতর তাঁহাদের উৎকৃষ্ট মতামত বহুপ্রচারিত হইলে ধর্ম্মজীবন মহাত্মা ঈশাদেব দুন্দুভিস্বরে সেই উন্নত মত জগতে প্রচার করেন এবং তদর্থে নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়া ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বর্দ্ধন করিয়া যান। তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যদিগের উৎসাহে ও যত্নে তৎপ্রচারিত ধর্ম্ম কালক্রমে পাশ্চাত্য জগতে প্রবল হইয়া উঠে। তাঁহার অনুকরণে পয়গম্বর মহম্মদদেব প্রাচ্যজগতে উন্নত একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়া যান।

আত্মার অস্তিত্ব ও অবিনশ্বরত্ব, পরলোক ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং তৎকর্ত্তৃক জগতের সৃষ্টিস্থিতিসংহার প্রভৃতি ধর্ম্মের উৎকৃষ্ট মতামত সর্ব্বথা দর্শনশাস্ত্রসম্মত। এখন দর্শনশাস্ত্রের কল্যাণে ঐ সকল শ্রেষ্ঠ মতামত সকল দেশে প্রায় সর্ব্ববাদি-সম্মত। ইহারা খৃষ্ট প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্মগুলির প্রধান অঙ্গস্বরূপ। এমন কি, ঈশ্বরে ও পরলোকে বিশ্বাস আজকাল সকল উৎকৃষ্টধর্ম্মের মূলভিত্তি। এখন ভাবিয়া দেখ, দর্শনশাস্ত্র ধর্ম্মবিষয়ে জগতের কত মহোপকার সাধন করিয়াছে!

ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, দর্শনের সহিত নানাবিষয় লইয়া বিজ্ঞানের ঘোরতর বিবাদবিসম্বাদ চলিতেছে; এজন্য বিজ্ঞান দর্শনপ্রতিপাদিত ধর্ম্মের উপর খড়্গহস্ত, এমন কি, উহার মূলোৎপাটন করিতে একান্ত ব্যগ্র। আজকাল সভ্যদেশের মহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ ধর্ম্মের তাদৃশ গৌরব করেন না। তাঁহারা সর্ব্বত্র একমাত্র নাস্তিকবাদ প্রচার করিতেছেন। তাঁহাদের মূলমন্ত্র eat, drink and be merry হেসে খেলে নাওরে যাদুমণি। তাঁহারা ঈশ্বর, আত্মা, পরলোক কিছুই মানেন না, একমাত্র জড় ও শক্তি তাঁহাদের উপাস্য দেবতা এবং চাক্ষুষ প্রমাণ তাঁহাদের উপদেবতা।

তাঁহাদের মতে সংসারে ধর্ম্মও নাই, কেবল সমাজে বসবাসদরুণ মানবের হিতাহিতজ্ঞান, ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান, পাপপুণ্যজ্ঞান ও বিবেক তদীয় হৃদয়ে কালবশে উত্থিত হইয়াছে। সত্য বটে, তাঁহারা জ্ঞানের নানাবিভাগে অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কার করিয়া প্রকৃতিজগতে ঈশ্বরের অগাধ নির্ম্মাণকৌশল ও অদ্ভুত

নিয়ন্তৃত্ব দেখান। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কোন বিজ্ঞানশাস্ত্রের কোন পংক্তিতে বিশ্বরচয়িতা ঈশ্বরের নামোল্লেখ নাই। তাঁহারা ভাবেন, বিজ্ঞানের এমন সমুজ্জ্বল আলোকের মধ্যে ঈশ্বরের নামোল্লেখ কেবল দুর্ব্বলতাপরিচায়ক এবং তৎপরিবর্ত্তে তাঁহারা অন্ধ জড়শক্তির একমাত্র উপাসক।

কোন কোন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ঈশ্বরকে বিশ্বের অজ্ঞেয় আদিকারণ মনে করেন বটে, কিন্তু যখন এ বিশ্বসংসার কতকগুলি অপরিবর্ত্তনশীল নিয়মানুসারে সৃষ্ট ও পরিচালিত, তখন ঈশ্বরকে ভাবিবার বা মানিবার কি প্রয়োজন? যখন তিনি এজগতে সাক্ষীগোপালমাত্র, তখন তাঁহার আরাধনা বা উপাসনা করিবার কি প্রয়োজন? তাঁহারা বলেন, অবোধ, দুর্ব্বল মানব নিজের কুসংস্কারবশতঃ বিপদে পতিত হইলেই ঈশ্বরকে ডাকিতে থাকে। কিন্তু আমরা এখন জ্ঞানবিজ্ঞানবলে বলীয়ান, বিপদে পতিত হই, বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিপদ প্রতীকার করিতে চেষ্টা পাইব, কেন অনর্থক ঈশ্বরকে ডাকিয়া জিহ্বা অপবিত্র করিব? বরং লোকের কুসংস্কার দূর করিবার জন্য উহাদের মন হইতে ঈশ্বরকে বিতাড়িত করিতে চেষ্টা পাইব?

তাঁহারা এখন ঈশ্বর মানেন না বটে, কিন্তু তাঁহাদের নিকট জড়, শক্তি ও অন্ধ দৈব উপাস্য ত্রিমূর্ত্তি!

According is Science, the Holy Creative Trinity is inert Matter senseless Force and Blind chance.

Secret Doctrine.

এই উপাস্য ত্রিমূর্ত্তির তাঁহারা এখন ষোড়শোপচারে পূজা করেন এবং তাঁহাদের শাস্ত্রগ্রন্থে ইহাদের গুণানুবাদ ও গুণকীর্ত্তন পূর্ণাংশে শোভা পায়, তাঁহারা বলেন, বিশ্বব্যাপারে জড়শক্তিই সর্ব্বেসর্ব্বা; এতৎব্যতীত অন্য কোনরূপ চিৎশক্তি নাই, যাহার নিকট আমাদের মস্তক অবনত করা উচিত।

এবংবিধ নাস্তিক মতামত পাশ্চাত্য জগতে অল্পদিনের ভিতর বহু প্রচারিত হওয়ায় তথায় প্রভূত অনিষ্টোৎপত্তি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সভ্যজগতে আজকাল অধিকাংশ কৃতবিদ্য লোক খৃষ্টধর্ম্মে বিশ্বাস করে না, কেবল লোকলজ্জার ভয়ে ইহার কায়দাকরণ মানিয়া চলে। জড়বাদিতার এক

প্রাদুর্ভাব বশতঃ তথায় কত অশান্তি, কত ধর্ম্মঘট, কত যুদ্ধবিগ্রহ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

পাশ্চাত্য জগতে আজকাল অনেকে সমাজের নানাবিষয়ে ধর্ম্মের অনুশাসন উঠাইয়া দিতে ব্যস্ত এবং ধর্ম্মযাজকদিগের ক্ষমতা খর্ব্ব করিতে বদ্ধপরিকর। এদেশেও তাঁহাদের ভক্ত চেলারা দুই পৃষ্ঠা বিজ্ঞান পড়িয়া দেবদেবী মানেন না, সকলকেই গোটেহেল করিতে প্রস্তুত। যাহা হউক, বিজ্ঞানের নাস্তিক মতামত জগতে বহুপ্রচারিত হইলে ধর্ম্মসম্বন্ধে সমাজে যুগান্তর উপস্থিত হইবে। তখনই বোধ হয় শাস্ত্রোল্লিখিত ঘোর কলি দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে সংসারে রাজত্ব করিবে। ইহা তাহারই পূর্ব্বসূচনা মাত্র।

জিজ্ঞাসা করি, বিজ্ঞান এইরূপ নানা নাস্তিক মতামত প্রচার করিয়া ধর্ম্মকে কি সমাজ হইতে তাড়াইতে সক্ষম হইবে? ইহা সম্প্রদায় বিশেষের বৈশেষিক মতামত খণ্ডন করিতে পারে, দর্শনপ্রতিপাদিত ধর্ম্মের মৌলিক মতামতের উপর অবিশ্বাস জন্মাইতে পারে, খৃষ্ট-ধর্ম্মকে নকড়া ছকড়া করিতে পারে; কিন্তু যে প্রাকৃতিক সনাতন ধর্ম্ম সকল মানবধর্ম্মের মূলে বর্ত্তমান, যে ধর্ম্মবল পাইয়া মানব ইহসংসারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, যে ধর্ম্ম ব্যতীত তাঁহার জীবন অসার ও অপদার্থ, বিজ্ঞান কি সেই ধর্ম্মের বিপক্ষতাচরণ করিতে পারিবে? মানবসমাজে আবহমানকাল যে সামাজিক ও পারিবারিক ধর্ম্ম চলিয়া আসিতেছে, যাহার গুণে আমাদের গৃহ আজ স্বর্গের নন্দনকানন, যে ধর্ম্ম সমাজের স্থায়িত্বের সহিত অপরিহার্য্যরূপে জড়িত, নবোত্থিত নববিজ্ঞান কি সেই সনাতন ধর্ম্মের কোনরূপ অনিষ্ট সাধন করিতে পারিবে?

যেমন সলিল বিনা মৎস্য জীবিত থাকে না, বায়ু বিনা কোন জীব প্রাণ ধারণ করিতে পারে না, সেইরূপ কোন না কোন প্রকার ধর্ম্ম ব্যতীত কোন সমাজ জগতে স্থায়ী হয় না। যতদিন হৃদয়ে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বলবতী থাকিবে, ততদিন সংসারে ধর্ম্মানুশীলন স্বতঃ চলিবে। বিজ্ঞান যতই কেন ইহার বিপক্ষে চীৎকার করুক না, উহার সমস্ত চীৎকার অরণ্যে রোদন মাত্র হইবে।

বিজ্ঞান ঈশ্বর, আত্মা, পরলোক সকলই উড়াইয়া দিতে পারে; কিন্তু ইহা চিরদিন সামাজিক ধর্ম্মকে মান্য করিবে। সমাজে থাকিতে হইলেই চুরি করা মহাপাপ, পরোপকার করা মহাপুণ্য, এ কথা নাস্তিক, আস্তিক সকলেই

সমভাবে মানিবে। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত বলেন, সমাজশাসনের জন্য রাজদণ্ডবিধি যথেষ্ট, ধর্ম্মের আবার প্রয়োজন কি? কিন্তু সমাজে এমন অনেক বিষয় আছে, যাহাতে শাসনতন্ত্র আদৌ হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। সে স্থলে ধর্ম্মের অনুশাসন পূর্ণভাবে চালান একান্ত আবশ্যক, যেমন বিবাহপ্রথা ইত্যাদি। সত্য বটে, শাসনতন্ত্র সাধারণের মনে ভীতি উৎপাদন করিয়া সমাজের গর্হিত কর্ম্ম সম্পাদনে অনেককে কথঞ্চিৎ সংযত রাখে; কিন্তু ইহা সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে কাহাকেও ভালরূপ প্রোৎসাহিত করে না। অপর পক্ষে ধর্ম্মের গুণে লোকে যেমন গর্হিত কর্ম্ম করিতে চায় না, তেমনি সৎকর্ম্ম করিতে স্বতঃ প্রোৎসাহিত হয়। এজন্য সমাজে ধর্ম্মের এত আবশ্যকতা।

নববিজ্ঞানের আদিগুরু সুবিখ্যাত বেকন সাহেব বলেন :—

"A little Philosophy inclineth a man's mind to atheism But depth in philosophy bringeth a man's mind to religion—"

"অল্প জ্ঞান মানবমনকে নাস্তিকতায় লইয়া যায়, কিন্তু গভীর জ্ঞান উহাকে পুনরায় ধর্ম্মের দিকে আনয়ন করে।" ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা উচিত, বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ, যাঁহারা এখন নাস্তিকতার দিকে ধাবমান, কিছুকাল পরে তাঁহারা আপনাদের ভ্রম বুঝিতে পারিবেন। তখন তাঁহারা আর ধর্ম্মের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইবেন না।

আজকাল নববিজ্ঞান ধর্ম্ম ও নীতিবিবর্জ্জিতা যে সভ্যতাজ্যোতি পাশ্চাত্য জগতে বিস্তীর্ণ করিতেছে, উহা দানবিক সভ্যতা। ইহাতে দানবদিগের তাণ্ডব নৃত্য সর্ব্বত্র দেখা যায়। সকলেই প্রকৃত ধর্ম্ম ভুলিয়া গিয়া কামিনী-কাঞ্চনের জন্য দৌড়াদৌড়ি, হুড়াহুড়ি, মারামারি ও কাটাকাটি করিতেছে। ইহাদের ভয়ে ধর্ম্মবেচারা শীঘ্রই পর্ব্বতগুহায় লুক্কায়িত হইবে এবং কলির রাজ্য সর্ব্বত্র বিস্তীর্ণ হইবে। অপর পক্ষে প্রাচ্যদর্শন যে সভ্যতা জ্যোতি বিস্তীর্ণ করে, তাহা মানবিক সভ্যতা। ইহাতে সকলে ধর্ম্মানুশীলন করিয়া ধর্ম্মের কল্যাণে দেবোপম হন।

তৃতীয় অধ্যায়।

সৃষ্টিরহস্য।

প্রথম অংশ।

ইহার গৌরচন্দ্রিকা।

এখন হইতে জীবনের কূটপ্রশ্নমীমাংসায় প্রবৃত্ত হইলাম। সর্ব্বাগ্রে দেখাইব, সৃষ্টিরহস্য কতদূর উদ্ঘাটন করা যাইতে পারে।

এই যে অনন্ত, অসীম ব্রহ্মাণ্ড, যাহা তোমার নয়নসমক্ষে বিস্তৃত, যাহার অনন্ত শোভা, সৌন্দর্য্য ও বৈচিত্র্য দর্শনে তুমি অনুক্ষণ বিমুগ্ধ হও, এই যে অগণিততারকাজালমণ্ডিত অনন্ত নীল নভস্তল, যাহাতে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রাদি উদিত হইয়া তোমায় সদা বিস্ময়বিস্ফারিত করে, এই যে সুন্দর ধরাধাম, যাহা অসংখ্য উদ্ভিজ্জে ও জীবজন্তুতে পরিপূর্ণ, যাহা তোমার অনন্ত সুখের আগার, ইহারা কি প্রকারে সৃষ্ট হইল, কতদিন সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা জানিতে কি তোমার কোনরূপ অভিলাষ জন্মে? সামান্য বুদ্ধি বিকাশের সঙ্গে মানবমাত্রেই এ সকল বিষয় জানিতে চিরদিন সমুৎসুক হন।

অতি পুরাকাল হইতে মানবধর্ম্ম সকল দেশে সৃষ্টির বিষয় বর্ণন করিয়া আসিতেছে। তদীয় সেবকবৃন্দ অন্ধ বিশ্বাসের সহিত উহার মতামত গ্রহণ করিয়া আপনাদের চিরপ্রদীপ্ত কৌতূহলশিখা নির্ব্বাপিত করিতেছে। তাহার সাক্ষ্য, দেখ খৃষ্টধর্ম্ম বলে, যখন সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর স্বর্গের একান্তে বসিয়া বিশ্ব সৃষ্টি করিতে মানস করেন, তখন তিনি আদেশ দিলেন, "আলোক হউক" এবং তাঁহার আদেশমত আলোক সর্ব্বপ্রথমে সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান হইল। তৎপরে তিনি ছয়দিবসে এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্রমণ্ডলাদি সমুদায় সৃষ্টি করেন। এই মতটী আদৌ যুক্তিসঙ্গত না হইলেও জনসাধারণকে সহজ কথায় সৃষ্টিরহস্য বুঝাইবার জন্য খৃষ্টধর্ম্ম ঐরূপ নির্দ্দেশ করে মাত্র।

সৃষ্টিরহস্য উদ্ভেদ করিবার জন্য দর্শন ও বিজ্ঞান উভয়েই সমভাবে সচেষ্ট। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যে সকল ক্রিয়াপরম্পরা বা ঘটনাপরম্পরা দ্বারা এ জগৎ সৃষ্ট বা ক্রমবিবর্দ্ধিত, তাহা ধারাবাহিকরূপে ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণন করা বা হৃদয়ঙ্গম করা অসম্পূর্ণ মানবমনের সাধ্যাতীত। এবিষয়ে দর্শনশাস্ত্র অধ্যাত্মবিজ্ঞানের সাহায্যে বহুদূর অগ্রসর হইয়া গূঢ় রহস্যটী বুঝাইবার জন্য অনেক প্রয়াস পায়; কিন্তু বিজ্ঞান কিয়দ্দূরমাত্র অগ্রসর হইয়াই অন্ধকার ক্রমশঃ ঘনীভূত ও গাঢ়তর হইতে দেখিয়া ক্ষুণ্ণমনে প্রত্যাবর্ত্তন করে। এ বিষয়ে মনোরথ সিদ্ধ না হওয়াতে বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতবর বলেন, জগৎ সৃষ্টি যেরূপ রহস্যময়, একটী পরমাণুর সৃষ্টিও সেইরূপ রহস্যময়, তবে কেন বৃথা চেষ্টা?

কেহ কেহ বলেন, বিশ্বের সৃষ্টিও নাই, প্রলয়ও নাই, ইহা অনাদি কাল হইতে সমভাবে চলিয়া আসিতেছে ও অনন্ত কাল স্থায়ী হইবে। কাল-কর্ম্ম-স্বভাববশতঃ ইহা লোকপরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে। তাঁহারা বলেন, মানব-মনের প্রকৃতি যেরূপ, তাহাতে আমরা সকল বিষয়ের আদি ও অন্ত অন্বেষণে ব্যগ্র হই বটে, কিন্তু ইহা যেরূপ সীমাবদ্ধ, তাহাতে কোন বিষয়ের আদ্যন্ত পাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। মনে কর, সৃষ্টির পর প্রলয়, প্রলয়ের পর পুনরায় সৃষ্টি, সেইরূপ সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রলয়, প্রলয়ের পূর্ব্বে সৃষ্টি। এইরূপ যুক্তি অবলম্বন করিয়া আমরা ইহার আদি ও অন্ত পাই না; অতএব সৃষ্টি অনাদি ও অনন্তকালস্থায়ী বলাই শ্রেয়।

দেখ, আমাদের নিকট কালের আদিও নাই, অন্তও নাই, ইহা অনাদি ও অনন্ত। ব্রহ্মাণ্ডের প্রারম্ভও নাই অন্তও নাই, ইহা সর্ব্বব্যাপী। আকাশের আদিও নাই, অন্তও নাই, ইহা সর্ব্বময়। ভূমণ্ডল যেরূপ গোলাকার, ইহার প্রারম্ভও নাই, অন্তও নাই, ব্রহ্মাণ্ডও সেইরূপ গোলাকার, ইহারও প্রারম্ভ নাই, অন্তও নাই। সেইরূপ সৃষ্টিও পরম্পরা চলিয়া আসিতেছে; ইহারও আদি নাই, অন্ত নাই। মনের প্রাকৃতিক আকাঙ্ক্ষাবশতঃ সকলে জগতের আদি ও অন্ত অন্বেষণ করিতে চেষ্টা করে মাত্র।

জগৎসৃষ্টিসম্বন্ধে অধিকাংশ শিক্ষিত লোকের মনে একটা মহৎ কুসংস্কার বদ্ধমূল দেখা যায়। তাঁহারা ভাবেন, সৃষ্টির পূর্ব্বে কিছুই ছিল না, সকলই

তমোময় ও শূন্যময় ছিল। সৃষ্টির প্রাক্-কালে পরমপিতা পরমেশ্বর যাবতীয় ভৌতিকপদার্থ ও ভৌতিকশক্তি সৃজন করিয়া কতকগুলি প্রাকৃতিক নিয়ম স্থাপন করেন, উঁহাদের ক্রিয়াবশতঃ এ জগৎ সৃষ্ট বা উদ্ভূত হয়। সেইরূপ প্রলয়ের প্রারম্ভে সমুদয় ভৌতিক পদার্থ ও ভৌতিক শক্তি বিনষ্ট হইবে, প্রাকৃতিক নিয়মাবলী রহিত হইবে এবং সকলই পুনরায় তমোময় ও শূন্যময় হইয়া যাইবে। যাঁহাদের এরূপ ধারণা, তাঁহারা সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার বিন্দু বিসর্গ বুঝিতে পারেন নাই। আর ইহা এমন সহজ ব্যাপার নহে যে, ইহা ছয় দিনে ঘটিয়াছে এবং একদিনে প্রলয় ঘটিবে।

সংসারে সৃষ্টিস্থিতিসংহার এই ত্রিবিধ ক্রিয়া চিরদিন সমভাবে চলিতেছে; একদিকে যেমন ইহার পদার্থনিকর নূতনরূপে সৃষ্ট বা উদ্ভূত হইতেছে, অপরদিকে উহারা সাম্যাবস্থায় রহিতেছে; আবার অন্যদিকে উহারা ধ্বংসও পাইতেছে। সেজন্য বলা উচিত, যে ক্রমবিবর্ত্তন দ্বারা এ জগৎ সৃষ্ট, পরিবর্ত্তিত ও রূপান্তরিত, সে বিবর্ত্তনের বিরাম নাই, বিচ্ছেদ নাই, উহা চিরদিন সমভাবে চলিতেছে ও চলিবে। এখন যে সকল ভৌতিক পদার্থ, ভৌতিক শক্তি ও উহাদের নিয়মাবলী দেখা যায়, উহারাও মন্বন্তরে মন্বন্তরে কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে (থিওসফির মত)। এজন্য সৃষ্টিপ্রক্রিয়া আমাদের নিকট এতদূর রহস্যময় বা দুর্বোধ্য, এমন কি, এক প্রকার অজ্ঞেয়।

অধ্যাত্মবিজ্ঞানের মতে সৃষ্টিরহস্যোদ্ভেদ।

অধ্যাত্মবিজ্ঞানের মতে ব্রহ্মই বিশ্বের আদি ও অন্ত। তিনি ইহার রচয়িতা, তিনি ইহার উপাদানকারণ এবং তিনিই ইহার আধারস্বরূপ। যে চিৎশক্তিযোগে ইহা রচিত, তিনিই সেই বিশ্বব্যাপিনী চিৎশক্তির সমষ্টি। যে সকল উপাদানযোগে ইহা রচিত, তিনিই সেই বিশ্বব্যাপী উপাদান সমূহের সমষ্টি। যে অসীম ও অনন্ত আধারে বা আকাশে ইহা রচিত, তিনিই সেই বিশ্বব্যাপী আধারের সমষ্টি। যিনি মায়াশক্তিবলে বর্দ্ধিত হইয়া বিশ্বপ্রপঞ্চে পরিণত, তিনিই ব্রহ্ম। একোঽহং বহু স্যামি। তিনি অগ্রে এক ছিলেন, পরে বহু হন।

কোন কোন শাস্ত্রকার উল্লেখ করেন, যেমন ঊর্ণনাভ স্বীয় জাল স্বাভ্যন্তর

হইতে নিঃসরণ করে ও পুনরায় উহাকে স্বাভ্যন্তরে সঙ্কুচিত করে; সেইরূপ পরব্রহ্ম সৃষ্টিকালে বিশ্বপ্রপঞ্চকে স্বাভ্যন্তর হইতে প্রকটিত করেন এবং প্রলয়-কালে উহাকে স্বাভ্যন্তরে গ্রাস করিয়া লন। ভালরূপ অনুধাবন করিলে বুঝিতে পারা যায়, এই মতটী দ্বৈতবাদীদিগের; কারণ ঊর্ণনাভে ও তদীয় জালে বিস্তর পার্থক্য আছে। কিন্তু অদ্বৈতবাদীদিগের মতে, বিশ্বে ও ব্রহ্মে কিছুমাত্র পার্থক্য নাই; একই ব্রহ্ম বর্দ্ধিত হইয়া বিশ্বপ্রপঞ্চে পরিণত হন। তিনিই আবার ইহার স্রষ্টা। প্রলয়কালে সেই ব্রহ্মের চিৎশক্তি, বিশ্বের উপা-দানরাশি ও আকাশরূপী আধার এই তিনের একাধারে মিলন হইয়া যায়।

বিশ্বের দুইটী অবস্থা, ব্যক্ত ও অব্যক্ত। সৃষ্টিই ইহার ব্যক্ত অবস্থা এবং প্রলয় ইহার অব্যক্ত অবস্থা। কিন্তু ইহার দুই অবস্থাতেই বিশ্বরচয়িতা পরব্রহ্ম আমাদের নিকট অবিতর্ক্য, অপ্রমেয় ও অপরিমেয়। তিনি আমাদের জ্ঞানের অগোচর। সংসারে তিনি একমাত্র মায়াযোগে ব্যক্ত। মায়াতীত বলিয়া তিনি মায়ামুগ্ধ মানবমনের কদাচ ভাব্য নন। জগৎ-স্থিতিকালে তিনি মায়াযোগে ব্যক্ত বলিয়া মায়ার ত্রিগুণানুসারে ত্রিমূর্ত্তিরূপে (ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর) অথবা মানবমনের মায়াময়ী প্রকৃতি অনুসারে লৌকিক ঈশ্বর রূপে একমাত্র ভাব্য বা ধ্যেয়।

বিশ্বের ব্যক্ত অবস্থায় ব্রহ্মের আবার দুইটী রূপ, সূক্ষ্ম (Spirit) ও স্থূল (Matter); যতকাল জগৎ ব্যক্ত অবস্থায় অবস্থিতি করে, ততকাল কেবল স্থূলসূক্ষ্মের বিকার, পরিণাম ও রূপান্তর ঘটিতে থাকে। পরব্রহ্মের আদ্যাশক্তি মহামায়া স্থূলসূক্ষ্মের এই পরিণাম ও পরিবর্ত্তন ঘটায়। যে সকল ভৌতিক শক্তি দ্বারা এ জড়জগৎ অনুক্ষণ পরিচালিত, যাহাদের ঘাত-প্রতিঘাত ইন্দ্রিয়-যোগে সদা অনুভূত, উহারা সকলে সেই মহামায়ার কণা বিশেষ। এই মহা-মায়াই সৃষ্টিপ্রক্রিয়ায় বিগত কয়েক কল্পে সূক্ষ্ম জগৎকে বিকৃত, কলুষিত ও অধোগত করিতে করিতে ক্রমশঃ স্থূলজগতে পরিণত করে এবং এই মহাশক্তিই ভবিষ্যৎ কল্পে স্থূল জগৎকে উন্নীত করত ক্রমশঃ সূক্ষ্ম জগতে স্থাপন করিবে; তৎপরে মহাপ্রলয় ঘটাইবে।

এখন অধ্যাত্মবিজ্ঞানোক্ত পরব্রহ্মের সৃষ্টিচক্র কিরূপ? ইহা মায়াযোগে তাঁহার মহালীলামাত্র। ইহাতে পরব্রহ্ম পুরুষরূপে মায়ারূপিনী প্রকৃতি

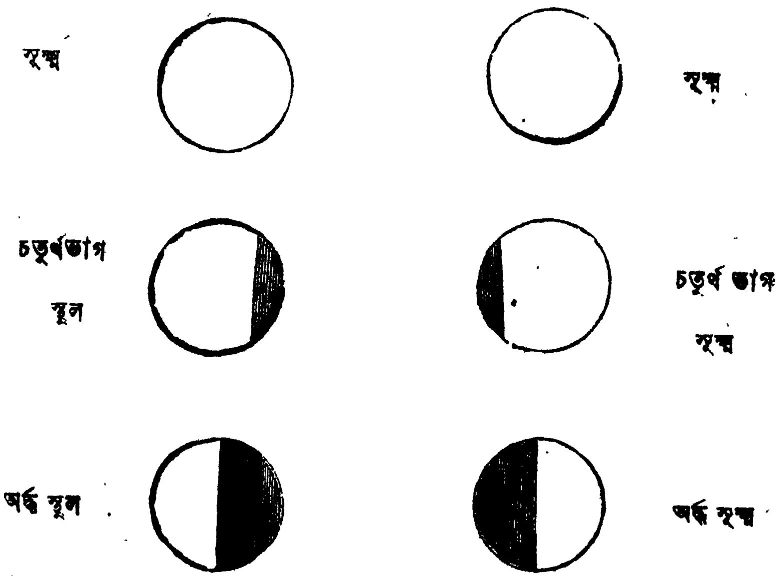
জেয়ীর সহিত গোপনে মহানৃত্য করিতেছেন। এ নৃত্য চিরদিন চলিতেছে ও চলিবে। ইহার তালমান কেহই বুঝিতে পারেন না। তাঁহার অঘটনঘটনপটীয়সী মায়া কে বুঝিতে পারে? এই মহালীলার অনুকরণে তোমার শ্রেষ্ঠ সনাতন হিন্দুধর্ম্ম শ্রীরাধারূপিনী আত্যাশক্তিসম্পন্না প্রকৃতিদেবীর সহিত পরব্রহ্মের পূর্ণ অবতার শ্রীকৃষ্ণের মহারাসলীলা লোকাচারে দেখায়। এই রাসলীলা বা রহস্তলীলা চর্ম্মচক্ষে দর্শন করিয়া তুমি পরব্রহ্মের মহালীলা জ্ঞানচক্ষে বা দিব্য-নেত্রে বুঝিতে চেষ্টা পাইবে।

সৃষ্টিচক্রে পরব্রহ্মের ব্যক্ত স্থূলসূক্ষ্ম দুইরূপের পরিণাম, রূপান্তর ও ক্রম-বিবর্ত্তন ঘটিতে থাকে। তাঁহারই একাংশ অব্যক্ত মূলপ্রকৃতি (ভাবি বিশ্বের উপাদান রাশি) তাঁহার চিৎশক্তিযোগে ক্ষোভিত হইয়া সর্ব্বাগ্রে সূক্ষ্মজগতে পরিণত হয়; পরে সেই সূক্ষ্ম জগৎ আরও ক্ষোভিত, বিকৃত, কলুষিত ও অধোগত হইয়া স্থূলজগতে পরিণত হয়; আবার এই স্থূলজগৎ ক্রমোন্নত হইতে হইতে পুনরায় সূক্ষ্মজগতে উত্থিত হইবে, তৎপরে পরব্রহ্মে লীন হইবে। ইহার প্রধান তাৎপর্য্য এই, সৃষ্টিপ্রক্রিয়ায় সর্ব্বাগ্রে সূক্ষ্মজগৎ সৃষ্ট হয়; এজন্ত শাস্ত্রে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার মানসপুত্রগণের উৎপত্তি বিষয় লিখিত আছে। এখন এই প্রথম সৃষ্ট সূক্ষ্মজগৎ কিরূপ, তাহা আমাদের কল্পনায় আদৌ আসিবে না। বিগত কয়েক কল্পে এই সূক্ষ্মজগৎ ক্রমশঃ অধোগত ও বিকৃত হইতে হইতে আধুনিক স্থূলজগতে পরিণত। এই বরাহকল্পে স্থূলত্বের সম্যক স্ফূর্ত্তি হইতেছে; পরে ভবিষ্যৎ কল্পে এই স্থূলজগৎ ক্রমোন্নত হইয়া আবার সূক্ষ্মরূপ ধারণ করিবে; তৎপরে মহাপ্রলয় ঘটিবে। ইহাই পরব্রহ্মের সৃষ্টিচক্র এবং ইহাই মহামায়াযোগে তাঁহার মহালীলা মাত্র।

এখন সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে প্রথমসৃষ্ট সূক্ষ্মজগৎ কোন্ কোন্ স্তর অতি-ক্রম করিয়া কোন্ কোন্ শক্তি দ্বারা চালিত হইয়া ক্রমবিবর্ত্তিত হইতে হইতে আধুনিক স্থূলজগতে পরিণত হইল, তাহা "ন দেবা জানন্তি কুতো মানবাঃ" দেবতারাই তাহা জানেন না, মানব কোন্ ছার। কত কোটী কোটী বৎসর ব্যাপিয়া এই সৃষ্টিপ্রক্রিয়া চলিতেছে, তাহা কেহ নির্ণয় করিতে পারেন না। এজন্য অসম্পূর্ণ বিজ্ঞান বলে, হয়ত ১ কোটী বৎসর, না হয় ১০ কোটী, না হয় ৫০ কোটী বৎসর হইল, এ জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে।

থিওসফি বলে, কল্পে কল্পে জগতে স্থূলসূক্ষ্মের তারতম্য ঘটিতেছে। প্রথম কল্পে পৃথিবী অতীব সূক্ষ্ম ছিল; ইহাতে স্থূলের লেশমাত্র ছিল না। দ্বিতীয় কল্পে পৃথিবীতে সূক্ষ্ম হ্রাস পাইতে থাকে এবং স্থূলও ক্রমশঃ স্ফুরিত হয়। তৃতীয় কল্পে পৃথিবীতে স্থূলসূক্ষ্ম সমভাবাপন্ন। চতুর্থ বরাহ কল্পে আধুনিক পৃথিবী সম্পূর্ণ স্থূলভাবাপন্ন। পঞ্চম ও ষষ্ঠ কল্পে পৃথিবীতে যে পরিমাণে স্থূলের অবনতি ঘটিবে, সেই পরিমাণে সূক্ষ্মের উন্নতি হইবে। সপ্তম কল্পে পৃথিবী পুনরায় সূক্ষ্ম হইয়া যাইবে। তৎপরে মহাপ্রলয় ঘটিবে।

পৃথি



স্থূল পৃথিবী

বামদিকে সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে সূক্ষ্ম পৃথিবী কালক্রমে বিবর্ত্তিত হইতে হইতে কিরূপে স্থূল-পৃথিবীতে পরিণত হইল এবং দক্ষিণদিকে মহাপ্রলয়ের,

পূর্ব্বে স্থূল পৃথিবী সূক্ষ্মে উন্নীত হইতে হইতে কি প্রকারে পুনরায় সূক্ষ্ম হইবে, তাহাই দেখান হইল।

সূক্ষ্ম হইতে স্থূলের উৎপত্তি বিষয়ে গীতায় ভালরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়।

ঊর্দ্ধ মূলমধঃ শাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ং,

ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ।

(গীতা)

"সংসাররূপ অব্যয় বা চিরস্থায়ী অশ্বত্থবৃক্ষের মূলদেশ উর্দ্ধে অবস্থিত; ইহার শাখাগুলি অধোদেশে বিস্তৃত; বেদের ছন্দগুলি ইহার পত্রস্বরূপ। যিনি সেই অশ্বত্থবৃক্ষটী ভালরূপ জানেন, তিনি প্রকৃত বেদজ্ঞ।" সংসাররূপ মহাবৃক্ষের মূলদেশ উর্দ্ধে এবং ইহার শাখাগুলি নিম্নে অবস্থিত, এ কথায় প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? যেমন বৃক্ষের মূলদেশ প্রথম উৎপন্ন হয়, পরে মূল হইতে কাণ্ড ও শাখাগুলি ক্রমশঃ বিস্তৃত হয়, সেইরূপ ঊর্দ্ধস্থিত সূক্ষ্মজগৎ এই নিম্নস্থিত সংসারের মূলদেশ, (অর্থাৎ) সূক্ষ্ম ক্রমশঃ বিকৃত হইতে হইতে এই স্থূলজগৎ সৃষ্ট হইয়াছে এবং এই স্থূলজগতের মূলদেশে সূক্ষ্ম বা অধ্যাত্মজগৎ বিদ্যমান। ইহাই আমাদের স্বর্গ এবং ইহার অধিবাসী দেবগণ স্বর্গ হইতে এই মর্ত্ত্যলোক শাসন করেন। যেমন বৃক্ষের পত্রগুলি ইহার জীবনধারণের যথেষ্ট সহায়তা করে, সেইরূপ বেদবর্ণিত জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড সংসার রক্ষার প্রধান উপায়। বেদবাক্যানুসারে চলিলে সংসারের সুখস্বচ্ছন্দতা বর্দ্ধিত হয়।

যে রাজযোগ অধ্যাত্মবিজ্ঞানের অংশীভূত, উহার মতে সূক্ষ্ম আকাশ হইতে এ বিশ্বপ্রপঞ্চ উদ্ভূত হয়। এই আকাশ স্থানে ২ ঘনীভূত ও আকার-বিশিষ্ট হইয়া বিশ্বসংসার উৎপাদন করে। যে প্রাণ সমস্ত আধ্যাত্মিক, মানসিক ও প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের সমষ্টি, উহার কার্য্যবশতঃ সূক্ষ্ম আকাশ বিশ্ব উৎপাদন করে।

পুরাণমতে সৃষ্টিবর্ণনা।

হিন্দুশাস্ত্র মতে ব্রহ্মা এই চরাচর বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং তাঁহার শতবৎসর আয়ুর মধ্যে প্রথমার্দ্ধ অতীত হইয়াছে। এখন চতুর্থ বরাহ কল্প চলিতেছে এবং চতুর্দ্দশ মনুর অধিকারকাল মধ্যে সপ্তম বৈবস্বত মনুর মন্বন্তর চলিতেছে। ইহাতে বুঝা উচিত, পৃথিবী আধুনিক অবস্থা প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে কতপ্রকার খণ্ড প্রলয় ও বিপ্লব অতিক্রম করিয়াছে, তাহার কিছুমাত্র ইয়ত্তা নাই এবং কত

কোটী কোটী বৎসর হইতে চলিল, ইহা সৃষ্ট হইয়াছে, তাহারও কিছুমাত্র ইয়ত্তা নাই। যাহা হউক, যে স্থলে সুসভ্য ইউরোপের সুসভ্য খৃষ্টধর্ম্ম কেবল মাত্র ছয় হাজার বৎসর পূর্ব্বে ঈশ্বরকে জগতের অন্তরালে বসাইয়া সপ্ত দিবসে জগৎ সৃষ্টি করায়, সেস্থলে অর্দ্ধসভ্য ভারতের অর্দ্ধসভ্য হিন্দুধর্ম্ম অধ্যাত্মবিজ্ঞানের সুবিমল জ্যোতি পাইয়া কত যুগযুগান্তর, কত কোটী কোটী বৎসর নির্দ্দেশ করত সৃষ্টি বিষয়ে যে সকল মহাসত্য প্রচার করে, তাহা এখনও তোমার পূর্ণ্যতম বিজ্ঞান বুঝিতে অক্ষম, অথবা অনেক পর্য্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধানের পর তাহার আভাস মাত্র পাইতেছে।

শাস্ত্রপাঠে অবগত হওয়া যায়, সৃষ্টি রচনা করিবার পূর্ব্বে ব্রহ্ম একটী অত্যুজ্জ্বল হিরণ্ময় অণ্ড উৎপাদন করেন। ইহাতে সর্ব্বপ্রথমে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করেন। অনেকের মতে তিনি বিষ্ণুরূপী ব্রহ্মের নাভিপদ্ম হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া কমলযোনি নামে খ্যাত হন। তিনি শত বৎসর পদ্মকোষে অবস্থিতি পূর্ব্বক পরব্রহ্মের তপ করেন এবং সৃষ্টিবিষয়ক পূর্ণজ্ঞান লাভ করেন। পরে তিনি প্রলয়পয়োধিজল পান করিয়া বিবিধ প্রজাসৃষ্টির জন্য ঋষি ও প্রজাপতিগণকে উৎপাদন করেন। তাঁহারাই তাঁহার মানসপুত্র এবং তাঁহারাই এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ সৃষ্টি করেন। জনসাধারণকে গূঢ় সৃষ্টির প্রক্রিয়া সহজ ভাষায় বুঝাইবার জন্য শাস্ত্রকারেরা এইরূপ রূপকভাবে নানা কথা লিখিয়া যান।

এস্থলে অণ্ড, পদ্ম, প্রলয়পয়োধি প্রভৃতি যে কয়েকটী উপমাবাচক শব্দ ব্যবহৃত হইল, উহাদের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝা আবশ্যক।

প্রথমতঃ। অণ্ড শব্দ শাস্ত্রে কোথা হইতে আসিল? যেমন একটী ক্ষুদ্র অণ্ডের অভ্যন্তরস্থ সাম্যাবস্থাপন্না স্ত্র্যণু (ovum) পুরুষনিষিক্ত পুমণু (spermatozoa) সংযোগে পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তন সহ্য করিতে করিতে কিছুদিনের মধ্যে বিবিধ অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সুশোভিত হইয়া একটী জীবে পরিণত হয়; সেইরূপ বিশ্বের সাম্যাবস্থাপন্না ত্রিগুণা মূলপ্রকৃতি পুরুষনিষিক্ত তেজোরাশি বা পরব্রহ্মের চিৎশক্তি দ্বারা সংক্ষোভিত হইয়া পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তন সহ্য করিতে করিতে কালক্রমে অনন্তবৈচিত্র্যবিশিষ্ট আদ্যন্তবিহীন বিশ্বমণ্ডলে পরিণত হয়। এজন্য নিখিল বিশ্ব ব্রহ্মের অণ্ড স্বরূপ এবং ইহার নাম ব্রহ্মাণ্ড।

দ্বিতীয়তঃ পদ্মের বীজে ভাবি উদ্ভিজ্জের অঙ্গগুলি অব্যক্ত অবস্থায় নিহিত থাকে এবং উত্তাপ ও জল পাইয়া উহা বিবর্ত্তিত ও বর্দ্ধিত হইতে হইতে উদ্ভিজ্জে পরিণত হয়। সেইরূপ প্রলয় কালের অব্যক্ত মূলপ্রকৃতিতে ভবিষ্যৎ বংশের উপাদানরাশি (সূক্ষ্ম আদিম ভৌতিক পদার্থগুলি) অস্ফুট অবস্থায় বর্ত্তমান থাকে এবং উহাও ব্রহ্মের চিৎশক্তি যোগে বিবর্ত্তিত ও পরিবর্ত্তিত হইতে হইতে কালক্রমে বিশ্বপ্রপঞ্চে পরিণত হয়। এজন্য যে ব্রহ্মার বিরাট দেহ ত্রিখণ্ডিত হইয়া স্বর্গ, মর্ত্ত্য, ও পাতাল বিরচিত, সেই সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা শাস্ত্রে কমলযোনি বলিয়া উক্ত হন।

তৃতীয়তঃ। কমলযোনি ব্রহ্মার প্রলয়পয়োধিজলে জন্মবৃত্তান্ত বুঝিবার জন্য জরায়ুগর্ভে ভ্রূণের উৎপত্তিবিষয় ভাবা উচিত। স্ত্র্যণুর সহিত পুমণুর সংযোগ ঘটিলে কিছু দিনের মধ্যে জরায়ু বর্দ্ধিত হইতে হইতে গর্ভোদকে (Liquor Amnii) পূর্ণ হয় এবং উহাতে একটী জীব ভ্রূণরূপে দেখা দেয়। এই ভ্রূণের-নাভি-দেশ নালী দ্বারা (Umbilical cord) জরায়ুপুষ্পে (Placenta,) সংলগ্ন থাকে। এই ভ্রূণ নিমীলিতাক্ষ হইয়া ধ্যানমগ্ন বেশে কয়েক মাস জরায়ুগর্ভে বাস করে। সেইরূপ সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা বিষ্ণুরূপী ব্রহ্মের নাভিপদ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রলয়পয়োধিজলে ভাসিতে থাকেন এবং নিমীলিতাক্ষ হইয়া শত বৎসর পরব্রহ্মের ধ্যান করত সৃষ্টিবিষয়ক পূর্ণ জ্ঞান লাভ করেন।

চতুর্থতঃ। প্রলয়পয়োধি শব্দের প্রকৃত অর্থ কি? ইহাতে কি এইরূপ বুঝায়, প্রলয় কালে সমগ্র মেদিনী বা বিশ্ব এক মাত্র মহাসাগরে পূর্ণ থাকে এবং সৃষ্টি কালে কি ইহার স্থলভাগ মাত্র যাবতীয় প্রাণী ও উদ্ভিজ্জীব সহিত সৃষ্ট হয়? এস্থলে পয়োধিশব্দের এরূপ অসঙ্গত অর্থ করিলে চলিবে না। প্রলয়ের ভীষণ তমিস্রাময় ও বিশৃঙ্খলতাময় অবস্থা জ্ঞাপনার্থে শাস্ত্রকারেরা পয়োধি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ইংরাজিতে ইহাকে (Choas) বলে, অর্থাৎ বিরাট শূন্য ও সকলই বিশৃঙ্খলতাময়। এ দেশের পণ্ডিতেরা ইহাকে আদৌ শূণ্য ভাবেন না। তাঁহারা ইহাকে অব্যক্ত সূক্ষ্ম মূলপ্রকৃতির তমঃপ্রধানা অবস্থা ভাবেন। তমোগুণের আধিক্য হইয়া প্রলয় আরম্ভ হয় এবং রজোগুণের আধিক্য হইয়া সৃষ্টি আরম্ভ হয়। এজন্য রজঃপ্রধান ব্রহ্মা প্রলয়পয়োধি পান করিয়া বা তমোগুণ নাশ করিয়া সৃষ্টি আরম্ভ করেন। সেই-

রূপ সৃষ্টি রচনা করিবার পূর্ব্বে তিনি শত বৎসর ব্যাপিয়া পরব্রহ্মের তপ করেন। এ কথারও গূঢ় অর্থ আছে। সৃষ্টির ন্যায় প্রলয়ও ব্রহ্মার শত বৎসর ব্যাপী; এজন্য তিনি ধ্যানমগ্ন বেশে নিশ্চেষ্ট থাকিয়া শত বৎসর পরব্রহ্মের তপ করেন।

ব্রহ্মাদি দেবগণ যে সৃষ্টি রচনা করেন, তাহাকে বৈকারিক সৃষ্টি বলে; কারণ ইহাতে সমস্তই ক্রমশঃ বিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। তাঁহার সাক্ষ্য, সূক্ষ্ম অধ্যাত্মজগৎ বিকৃত হইয়াই স্থূলজগতে পরিণত হইয়াছে এবং কি জীবজগৎ কি উদ্ভিজ্জজগৎ সকলই যুগে যুগে ক্ষুদ্রকায় ও অপগত হইতেছে।

ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, অণ্ডের সহিত ব্রহ্মাণ্ডের বিশেষ সৌসাদৃশ্য আছে। অণ্ডমাত্রেই দুই ভাগে বিভক্ত; এক ভাগ শ্বেতবর্ণ অণ্ডলালে (Albumen) পূর্ণ, অপর ভাগ পীতবর্ণ (Yelk) যাহা হইতে জীব উৎপন্ন হয় এবং প্রথমোক্ত উহার খাদ্য স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। সেই রূপ ব্রহ্মের জ্যোতির্ম্ময় অণ্ডও দুই ভাগে বিভক্ত; এক ভাগের নাম ব্রহ্মবাক্, যাহা সৃষ্টি বিষয়ক পূর্ণ জ্ঞান, অপর ভাগের নাম ব্রহ্মবিরাজ, যাহা হইতে এই চরাচর বিশ্ব সমুৎপন্ন।

বিভিন্ন লোক ও বিভিন্ন প্রজা সৃষ্টি করিবার জন্য সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা দশটী মানসপুত্র সৃজন করেন। তাঁহারা হিন্দুশাস্ত্রে ঋষি ও প্রজাপতি নামে, বৌদ্ধশাস্ত্রে ধ্যানীবুদ্ধ নামে এবং বাইবেলে সেফিরথ নামে খ্যাত। তাঁহারাই ব্রহ্মার সৃষ্টিবিষয়ক পূর্ণ জ্ঞান কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া বিবিধ আদ্যাশক্তি ও উপাদান রাশি লইয়া এই বিশ্বমণ্ডল সৃষ্টি করেন। সর্ব্বপ্রথমে সূক্ষ্ম জগৎ সৃষ্ট হয়। উহাতে স্থূলত্বের লেশমাত্র ছিলনা। সে সূক্ষ্ম জগৎ যে কিরূপ, তাহা আমাদের ইন্দ্রিয়াতীত বলিয়া উহার বিষয় আমরা আদৌ ভাবিয়া উঠিতে পারিনা। আজকাল স্থূল পৃথিবীর জড়পদার্থমাত্রেই যে সকল ভৌতিক পদার্থে বিরচিত ও যে সকল ভৌতিক শক্তি দ্বারা পরিচালিত, সূক্ষ্ম জগতে উহারা ছিল না।

বিগত কয়েক কল্পে প্রথম সৃষ্ট সূক্ষ্ম জগৎ ক্রমবিবর্ত্তিত ও বিকৃত হইতে হইতে আধুনিক স্থূল জগতে পরিণত। সূক্ষ্ম আদিম ভৌতিক পদার্থগুলি কালক্রমে পরিবর্ত্তিত ও রূপান্তরিত হইতে হইতে আধুনিক ভৌতিক পদার্থে এবং আদিম শক্তিগুলি মন্বন্তরে মন্বন্তরে রূপান্তরিত হইতে হইতে আধুনিক ভৌতিক

শক্তিতে পরিণত এবং সেই সঙ্গে জগতের অধিবাসী মনুপুত্রগণ সূক্ষ্ম রূপ হইতে ক্রমশঃ স্থূলরূপ ধারণ করে।

এখন কোন্ কোন্ স্তর অতিক্রম করিয়া এবং কোন্ কোন্ মহাশক্তি দ্বারা চালিত হইয়া সূক্ষ্ম জগৎ কালে স্থূল জগতে পরিণত হইল এবং সূক্ষ্ম মনুপুত্রগণ আধুনিক স্থূলকায় মানবে পরিণত হইল, অথবা কত কোটী কোটী বৎসর ব্যাপিয়া উপরোক্ত পরিবর্ত্তনপরম্পরা সংঘটিত হইয়াছে, তাহা "ন দেবা জানন্তি কুতো মানবা" তাহা দেবতারাই জানেন না, মানব কোন্ ছার। আমাদের পক্ষে ইহা জানাই যথেষ্ট যে, পৃথিবী আধুনিক অবস্থায় সৃষ্ট হয় নাই, সূক্ষ্ম জগৎ হইতে ইহার উৎপত্তি এবং কালে ইহা পুনরায় সূক্ষ্ম হইয়া লয় পাইবে। ইহাতে অনন্ত কাল ব্যতীত হইবে।

সৃষ্টিরহস্য।

দ্বিতীয় অংশ।

সাংখ্যমতে সৃষ্টিরহস্যোদ্ভেদ।

যোগসিদ্ধ মহর্ষি কপিলদেব এই সাংখ্যমত প্রচার করিয়া জগৎবিখ্যাত হন। এই শ্রেষ্ঠ মতটী লোকে বুঝিতে পারুক না পারুক, জ্ঞানজগতে যাবচ্চন্দ্রদিবাকর আদৃত হইবে। ইহাকে প্রাচ্য দার্শনিক বিবর্ত্তবাদ (Theory of Evolution) বলে। ইহা পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক বিবর্ত্তবাদ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ইহা দ্বারা এদেশের দার্শনিক পণ্ডিতগণ সৃষ্টিরহস্য উদ্ঘাটন করিতে চেষ্টা পান।

সর্ব্বাগ্রে দেখিতে পাই, মানবদেহনির্ম্মাণ বর্ণন করিয়া তাঁহারা বিশ্বসৃষ্টি ব্যাখ্যান করেন। ইহাতে তাঁহাদের কয়েকটী মুখ্য উদ্দেশ্য আছে।

(১) যে সকল উপাদানে বা তত্ত্বে বিশ্ব বিরচিত, তৎসমুদায় একাধারে মানবদেহে পাওয়া যায়; "ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণা সন্তি, তে বসন্তি কলেবরে, মানবদেহ ব্রহ্মের ক্ষুদ্রমূর্ত্তি (microcosm) ও বিশ্ব তাঁহার বিরাট্ দেহ (macrocosm).

(২) বিরাট্ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ হৃদয়ঙ্গম করা মানবের অসাধ্য। মানবদেহরূপ ক্ষুদ্র মূর্ত্তির নির্ম্মাণ মানবমন অসম্পূর্ণ হইলেও কিঞ্চিৎ বুঝিতে সক্ষম।

(৩) সূক্ষ্ম মন ও স্থূলদেহের সহিত বাহ্য জগতের যে সকল সম্বন্ধ আছে, তাহা নিরূপণ করিয়া উহাদের মধ্যে যে অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য দেখা যায়, তাহা বুঝিতে পারিলে, সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার গূঢ় রহস্য কিয়ৎ পরিমাণে বুঝা যাইবে।

(৪) যতদিন তুমি জীবিত থাক, ততদিন জগৎও তোমার সমক্ষে বিদ্যমান থাকে। যখন তুমি মৃত্যুমুখে পতিত হও, তখন জগৎও তোমার নিকট অদৃশ্য হইয়া যায়। যে জগতের কেন্দ্র সর্ব্বত্র, পরিধি কোথাও নাই, (centre is everywhere and circumference is nowhere) সে জগতের তুমিও কেন্দ্র, আমিও কেন্দ্র। আবার এই পরিদৃশ্যমান জগৎ যেরূপ হউক না, ইহা প্রকৃত পক্ষে ইন্দ্রিয়যোগে মনের অসংখ্য ভ্রান্তিমাত্র। সে স্থলে মানবদেহনির্ম্মাণ বর্ণন করিয়া জগৎসৃষ্টি বর্ণন করা হইতেছে।

(৫) মানবদেহ জগতের চরম পরিণতি। সেজন্য সৃষ্টিরহস্য উদ্ঘাটন করিতে হইলে ইহার চরম পরিণতির বিষয় অগ্রে লেখা আবশ্যক।

(৬) যে সকল প্রক্রিয়াবশতঃ ইন্দ্রিয়াতীত সূক্ষ্ম পদার্থ ক্রমশঃ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূলপদার্থে পরিণত, অথবা যে সকল স্তর অতিক্রম করিতে ২ সূক্ষ্ম পদার্থ কালক্রমে স্থূলপদার্থে পরিণত, তাহা বুঝিবার বা বর্ণন করিবার অন্য কোন সহজ উপায় নাই, যে হেতুক মানবের আত্মা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, মস্তিষ্কোৎপন্ন মানবমন সূক্ষ্ম ও মানবদেহ সম্পূর্ণ স্থূল, এই তিনের পরস্পর সম্বন্ধ এবং বাহ্যজগতের সহিত উহাদের যে সম্বন্ধ, তাহা নিরূপণ করিলে সূক্ষ্ম হইতে স্থূলের উৎপত্তি কিয়ৎপরিমাণে বুঝা যায়। এজন্য মানবমন ও মানবদেহের সৃষ্টি বর্ণন করিয়া সাংখ্যকারেরা সূক্ষ্মজগতের নানা কথাও স্থূলজগতের আভ্যন্তর ব্যাখান করেন।

সাংখ্যমতানুসারে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া বর্ণন করিবার পূর্ব্বে সাংখ্যোক্ত মূলপ্রকৃতি, পুরুষ, ত্রিগুণ ও গুণক্ষোভ এই কয়েকটী শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝা আবশ্যক। দুঃখের বিষয় এই যে, অনেকেই সাংখ্যসূত্র পাঠ করেন, কিন্তু অল্প লোকে ইহার অন্তঃ প্রবেশ করিতে সমর্থ হন। যাঁহার যেরূপ বোধশক্তি, তিনি উহাদের তদনুরূপ অর্থ করিয়া নিজ মনকে প্রবোধ দেন।

(১) মূলপ্রকৃতি শব্দের অর্থে সৃষ্টির পূর্ব্বে জগতের আদিম অবস্থা

বুঝায়। ইহাতে যে কেবল বিশ্বের আদিম উপাদানসমষ্টি বুঝায়, তাহা নহে; কিন্তু যে সকল মহাশক্তি দ্বারা ঐ উপাদানরাশি বিবর্ত্তিত হইবে, তাহাও বুঝায়। ইহা ব্রহ্মের আবরণ-স্বরূপ; উভয়ে একাধারে মিলিত। এস্থলে বুঝা উচিত, সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়াতীত মূলপ্রকৃতি কালক্রমে বিবর্ত্তিত হইতে ২ আধুনিক স্থূল বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রকৃতিতে পরিণত। কেহ যেন এরূপ ভাবিবেন না, যে সকল ভৌতিক পদার্থ দ্বারা জড়জগৎ নির্ম্মিত এবং যে সকল ভৌতিক শক্তি দ্বারা ইহা অনুক্ষণ চালিত, উহাদের সমষ্টি সাংখ্যকারদিগের মূলপ্রকৃতি।

(২) পুরুষ শব্দের প্রকৃত অর্থ কি? সংসারে স্ত্রীপুরুষের সঙ্গম ব্যতীত সন্তান উৎপন্ন হয় না দেখিয়া সাংখ্যকার প্রকৃতিপুরুষের অবতারণা করিয়াছেন। সত্য বটে, তিনি লৌকিক ঈশ্বর মানেন নাই, অথচ তদুক্ত পুরুষকে পরব্রহ্মের চিৎশক্তি জ্ঞান করা উচিত। স্ত্র্যণু যেমন পুমণুর সংযোগ ব্যতীত পরিণাম প্রাপ্ত হয় না, সেইরূপ পরব্রহ্মের মূলপ্রকৃতি পুরুষরূপ তাঁহার চিৎশক্তির সংযোগ ব্যতীত পরিণাম প্রাপ্ত হয় নাই। এস্থলে স্ত্র্যণুর সহিত মূলপ্রকৃতির এবং পুমণুর সহিত পুরুষের তুলনা করা হইতেছে।

তাহার সাক্ষ্য, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেন :—

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরং,
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে।

(গীতা)

স্বামীরূপে আমার দ্বারা বীর্য্যনিষিক্ত হইলে প্রকৃতি চরাচর বিশ্ব প্রসব করে। এ কারণ হে কৌন্তেয়; জগতের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে।

মমযোনি মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিনগর্ভং দধাম্যহং
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত।
সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মর্ত্তয়ঃসম্ভবন্তি যাঃ
তাসাং ব্রহ্ম মহৎ যোনিরহং বীজপ্রদঃপিতা।

(গীতা)

এস্থলে যাহা বর্দ্ধিত হইয়া বিশ্বে পরিণত হয়, তাহাই মহদ্‌ব্রহ্ম। মূল প্রকৃতিরূপ ইহার প্রধান অংশ আমারই যোনিবিশেষ। তাহাতে আমি বীর্য্য

নিষিক্ত করিয়া গর্ভাধান করি। তাহা হইতেই সকল জীবের উৎপত্তি হয়। সকল লোকে যে সকল জীবজন্তু ও ভূতাদি উৎপন্ন হয়, সে সকলের প্রধান যোনি বা উৎপত্তিস্থল মূল-প্রকৃতিরূপ ব্রহ্মের অংশ এবং আমি উহাদের বীজপ্রদ পিতা।" যেমন উভলিঙ্গজীবে উভয়প্রকার জননেন্দ্রিয় দেহাভ্যন্তরে একাধারে মিলিত থাকায় স্ত্রাণু ও পুমণুর সংযোগ অনায়াসে ঘটিয়া সন্তান উৎপন্ন হয়, সেইরূপ মূলপ্রকৃতি ও চিৎশক্তি লইয়াই ব্রহ্ম এবং উহাদের মিলন হইতে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

(৩) সত্বরজস্তম প্রকৃতির ত্রিগুণ, উহাদের প্রকৃত অর্থ কি? কোথা হইতে সাংখ্যকার উহাদের উল্লেখ করিলেন? কেহ বলেন যোগসিদ্ধ কপিলদেব যোগবলে এই শ্রেষ্ঠ মত প্রাপ্ত হন। কেহ বলেন, প্রাচীনকালের অধ্যাত্মবিজ্ঞান হইতে তিনি এই মত গ্রহণ করেন। তাহার সাক্ষ্য, চতুর্ব্বেদে ত্রিগুণের উল্লেখ আছে। কেহ বলেন, প্রকৃতিপুস্তক ভালরূপ অধ্যয়ন করিয়া অসাধারণ যুক্তি বলে তিনি এই মতটী আবিষ্কার করিয়াছেন।

তাহার সাক্ষ্য, দেখ সংসারের যাবতীয় বস্তু উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন শ্রেণিতে বিভক্ত; আবার অবস্থাভেদে ও কালভেদে একই বস্তু উত্তম, মধ্যম ও অধম জ্ঞান করা হয়। সংসারে মঙ্গল আছে, অমঙ্গল আছে, মঙ্গলা-মঙ্গলমিশ্রিত আছে; সুখ আছে, দুঃখ আছে, সুখদুঃখমিশ্রিত আছে; জ্ঞান আছে, অজ্ঞান আছে, জ্ঞানাজ্ঞানমিশ্রিত আছে। সংসারে সৃষ্টিস্থিতি সংহার ইহার চরমান্ত ও প্রধান ক্রিয়া। এই ত্রিবিধ ক্রিয়া লইয়াই সংসার-চক্র। কাল ও ত্রিবিধ, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান; পরিমাণও ত্রিবিধ, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ। এইরূপ সংসারের যাবতীয় পদার্থে ও কার্য্যে ত্রয়ী অবস্থা দেখা যায়। যে প্রকৃতি আমাদের নয়নসমক্ষে সকল বিষয়ে ত্রয়ী অবস্থা দেখায়, সেই প্রকৃতি মূলে ত্রিগুণাত্মিকা, ইহাই সাংখ্যকার নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। এই ত্রিগুণের অনন্তলীলাবশতঃ বা অনন্ত সংযোগ ও বিয়োগ বশতঃ (Combination and permutation) সংসারের অনন্ত বৈচিত্র্য ও তারতম্য দেখা যাইতেছে।

ত্রিগুণ সম্বন্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেন :—

সত্ত্বরজস্তম ইতিগুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ং।
তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশক মনাময়ং
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ।
রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবং
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনং।
তমস্ত্বজ্ঞানং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাং
প্রমাদালস্যনিদ্রাভি স্তন্নিবধ্নাতি ভারত।

(গীতা)

"প্রকৃতি বা মায়া হইতে উদ্ভূত সত্ত্ব রজস্তম এই গুণত্রয় জীবদেহে অবিনশ্বর জীবাত্মাকে রজ্জুর ন্যায় বন্ধন করিয়া রাখে। জীবাত্মা অবিনশ্বর হইলেও যতদিন এই নশ্বর দেহে অবস্থিতি করে, ততদিন উপরোক্ত ত্রিগুণ ইহাকে দেহের সহিত বাঁধিয়া রাখে, অর্থাৎ ত্রিগুণের একান্ত বশীভূত হইয়া ইহাকে সকল কাজ করিতে হয়। ইহাদের মধ্যে সত্ত্বগুণ নির্ম্মলতা প্রযুক্ত বা সম্পূর্ণ দোষশূন্য হওয়ায় আত্মাকে উজ্জ্বল ও নীরোগ করে এবং ইহাকে বিবিধ সুখে ও জ্ঞানে যুক্ত করে। সত্ত্বগুণই আমাদের বিবিধ সুখ ও জ্ঞানের আকর। রজোগুণ অনুরাগসূচক; ইহা হইতে বিবিধ অভিলাষ, আসক্তি ও প্রবৃত্তি জন্মে; ইহা জীবাত্মাকে বিবিধ কর্ম্মে প্রেরণ করে। আমাদের সকল কর্ম্মের মূল রজোগুণ। তমোগুণকে অজ্ঞান বলিয়া জানিবে। ইহা হইতেই জীবজন্তুগণ নানা বিষয়ে মুগ্ধ হইয়া থাকে। ইহা জীবাত্মাকে প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রায় অভিভূত করে।" ইহাতে বুঝা উচিত, সংসারের যাবতীয় মঙ্গলামঙ্গল ও সুখ দুঃখের প্রধান কারণ মায়ার ত্রিগুণ। এই ত্রিগুণের বৈষম্য বা তারতম্যবশতঃ বস্তুবিশেষ বা ঘটনাবিশেষ আমাদের মঙ্গলামঙ্গল ও সুখদুঃখের কারণ হইয়া থাকে।

(৪) গুণক্ষোভ সাংখ্যকার বলেন, উপরোক্ত ত্রিগুণ ক্ষোভিত হইলে প্রকৃতি পরিণাম প্রাপ্ত হইতে থাকে। এখন গুণক্ষোভ শব্দের প্রকৃত অর্থ কি? ইহাতে ত্রিগুণের পুনঃপুনঃ আন্দোলন বা স্পন্দন বুঝায়। প্রকৃতির

নিয়ম এই, স্থূল হউক, সূক্ষ্ম হউক, জগতের কোন পদার্থ এক ক্ষোভন বা স্পন্দন ব্যতীত পরিণাম বা অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় না। বিজ্ঞানও নির্দ্দেশ করে, প্রকৃতিজগতে কি পরমাণু, কি জীবাণু, সকল প্রকার অণু একমাত্র ক্ষোভিত হইয়া পরিবর্ত্তিত ও রূপান্তরিত হয়। তাহার সাক্ষ্য, জীবাণুর অভ্যন্তরস্থ জীবনীশক্তিসম্পন্ন প্রটোপ্লাসম গ্রহ নক্ষত্রাদির ন্যায় সদা ঘূর্ণ্যমান। সেইরূপ সৃষ্টি আরম্ভ হইলে ত্রিগুণ ক্ষোভিত হইতে থাকে এবং সূক্ষ্ম মূলপ্রকৃতি ও পরিণাম প্রাপ্ত হইতে থাকে।

এস্থলে একটী প্রশ্ন উঠিতেছে, যখন ত্রিগুণ সূক্ষ্ম বস্তু বা বস্তুর মনো-গ্রাহ অবস্থামাত্র, তখন উহারা কি প্রকারে ক্ষোভিত হইতে পারে? দুগ্ধের ক্ষোভনে বা মন্থনে নবনীত প্রস্তুত হয়, ইহা প্রত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধ; তবে গুণক্ষোভ শব্দের প্রকৃত অর্থ কি? যেমন কোন বিষয় মনে পুনঃ পুনঃ আন্দোলিত হইলে উহা হইতে সার বস্তু বাহির করা যায়, সেই রূপ সূক্ষ্ম ত্রিগুণ ক্ষোভিত বা পুনঃ পুনঃ আন্দোলিত হইলে প্রকৃতি পরি-ণাম প্রাপ্ত হইয়া বিভিন্ন অবস্থা ধারণ করিতে থাকে। এই প্রকারে ইহা সাম্যাবস্থা হইতে ক্রমশঃ বিভিন্ন ও বিষম হইতে আরম্ভ হয়। মহাপ্রলয়ে মূলপ্রকৃতি সম্পূর্ণরূপ নিশ্চেষ্ট থাকে এবং ইহার ত্রিগুণ আদৌ ক্ষোভিত হয় না। কিন্তু সৃষ্টির প্রাক্কালে পুরুষের তেজ ইহাতে সংক্রামিত হইলে, ইহার গুণক্ষোভ আরম্ভ হয় এবং ইহাও ক্রমশঃ বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইতে থাকে। বেশ জানিবে, এস্থলে মনের ক্রিয়ার সহিত গুণের ক্রিয়ার তুলনা করা হইতেছে। আবার অনেকে বলেন, সত্ত্বরজস্তম প্রকৃতির ত্রিশক্তি, আকর্ষণ, বিকর্ষণ ও সামঞ্জস্য। এই ত্রিশক্তির ক্ষোভনবশতঃ এ জগতের সৃষ্টি হইয়াছে।

এখন সাংখ্যমতে সৃষ্টির প্রক্রিয়া বর্ণন করিতেছি। গুণক্ষোভবশতঃ মূলপ্রকৃতির প্রথম পরিণামে মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি হয়। ইহা আর কিছু নয় কেবল বিশ্বব্যাপী বুদ্ধি শক্তির বীজস্বরূপ মূলীভূত কারণ বা সমষ্টি। ইহা দ্বারা বেদান্তের নির্গুণ ও অব্যক্ত পরব্রহ্ম সগুণ ও ব্যক্ত হইয়া মানব মনের ভাব্য হন। চরাচর বিশ্বপ্রপঞ্চের প্রত্যেক পদার্থে যে অলৌকিক বুদ্ধিশক্তি অন্তর্নিহিত আছে, যাহার বলে সমগ্র জগৎ সুসামঞ্জস্যে পূর্ণ

হইয়া এক মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ক্রমশঃ অগ্রসর, সেই অসীম বুদ্ধি-শক্তি মহত্তত্ত্ব হইতে যাবতীয় পদার্থে প্রতিভাত হয়। যেমন একমাত্র সূর্য্যদেব জগতের তমোরাশি নাশ করতঃ যাবতীয় পদার্থকে আলোকিত করে, সেইরূপ মহত্তত্ত্ব ও বিশ্বের যাবতীয় পদার্থে ন্যূনাধিক বুদ্ধিশক্তি প্রদান পূর্ব্বক সকলকে উজ্জ্বল, জাগ্রত ও জীবন্ত করিতেছে।

গুণভেদে মহত্তত্ত্ব ত্রিবিধ, যথা সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। এই ত্রিবিধ মহত্তত্ত্ব হিন্দুধর্ম্মে ব্রহ্মাবিষ্ণু মহেশ্বররূপে পূজিত হয়; এজন্য রজঃপ্রধান ব্রহ্মা আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা, সত্ত্বপ্রধান বিষ্ণু পালনকর্ত্তা এবং তমঃপ্রধান মহেশ্বর সংহারকর্ত্তা।

এই মহত্তত্ত্বরূপ ধারণই বিশ্বের বা বিশ্বস্থ প্রত্যেক পদার্থের প্রথম সূক্ষ্মতম আবরণ। সূক্ষ্ম স্থূলে পরিণত হইবার ইহাই প্রথম স্তর। সাধারণতঃ জীবদেহে যে চৈতন্য প্রভাবে নেত্র দ্বারা দর্শন, কর্ণ দ্বারা শ্রবণ প্রভৃতি নানা জ্ঞান জন্মে ও মন দ্বারা নানাচিন্তা করা যায়, সেই চৈতন্য মহত্তত্ত্বের আংশিক বিকাশ মাত্র।

গুণক্ষোভবশতঃ প্রকৃতির দ্বিতীয় পরিণামে অহংতত্ত্বের উৎপত্তি হয়। যে জ্ঞানদ্বারা জীবমাত্রেরই আত্মাভিমান বা আমিত্বজ্ঞান জন্মে, তাহাই অহংতত্ত্ব। ইহা মহত্তত্ত্বকে আবৃত করিয়া বিশ্বের দ্বিতীয় আবরণস্বরূপ হয়। সূক্ষ্ম স্থূলে পরিণত হইবার ইহাই দ্বিতীয় স্তর। সত্যবটে, এই অহংতত্ত্ব জঙ্গমে যতদূর প্রকটিত, স্থাবরে ততদূর নয়, তথাচ ইহা জীবের ন্যায় সর্ব্বত্র বিদ্যমান।

গুণভেদে অহংতত্ত্ব আবার ত্রিবিধ, সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। ইহার সাত্ত্বিক অংশ ক্ষোভিত হইয়া মন ও ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবগণ, রাজসিক অংশ ক্ষোভিত হইয়া ইন্দ্রিয়গণ এবং তামসিক অংশ ক্ষোভিত হইয়া বাহ্য জগতের পঞ্চ তন্মাত্র ও পঞ্চ মহাভূত উৎপন্ন হয়। ত্রিবিধ অহংতত্ত্বের পরিণাম বশতঃ একদিকে দেহের মন ও ইন্দ্রিয়গণ, অপরদিকে বাহ্য জগতের পঞ্চ তন্মাত্র ও পঞ্চ মহাভূত সৃষ্ট হয়। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায়, প্রকৃতিজগতে উহাদের মধ্যে পরস্পর কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ও অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য স্থাপিত আছে।

অহংতত্ত্বের তামসিক অংশ ক্ষোভিত হইলে প্রথমে শব্দতন্মাত্র উৎপন্ন হয়। পরে শব্দতন্মাত্র ক্ষোভিত হইলে শব্দগুণবিশিষ্ট আকাশ উৎপন্ন হয়। এই

আকাশ মহত্তত্ত্ব ও অহংতত্ত্বকে আবৃত করিয়া বিশ্বের তৃতীয় আবরণ স্বরূপ হয়। ইহাই জগতের সূক্ষ্ম তৃতীয় স্তর।

আকাশ ক্ষোভিত হইলে প্রথমে স্পর্শতন্মাত্র উৎপন্ন হয়। পরে স্পর্শ তন্মাত্র ক্ষোভিত হইলে স্পর্শগুণবিশিষ্ট বায়ু উৎপন্ন হয়। এই বায়ু মহত্তত্ত্ব, অহংতত্ত্ব ও আকাশকে আবৃত করিয়া জগতের চতুর্থ আবরণ স্বরূপ হয়। ইহাই জগতের সূক্ষ্ম চতুর্থ স্তর।

বায়ু ক্ষোভিত হইলে প্রথমে রূপতন্মাত্র উৎপন্ন হয়, পরে রূপতন্মাত্র ক্ষোভিত হইলে রূপগুণবিশিষ্ট জ্যোতি বা আলোক উৎপন্ন হয়। এই জ্যোতি মহত্তত্ত্ব, অহংতত্ত্ব, আকাশ ও বায়ুকে আবৃত করিয়া জগতের পঞ্চম আবরণ স্বরূপ হয়। ইহাই জগতের সূক্ষ্ম পঞ্চম স্তর।

জ্যোতি ক্ষোভিত হইলে প্রথমে রস তন্মাত্র উৎপন্ন হয়; পরে রসতন্মাত্র ক্ষোভিত হইলে রসগুণবিশিষ্ট সলিল উৎপন্ন হয়। এই সলিল মহত্তত্ত্বাদি উপরোক্ত তত্ত্বগুলিকে আবৃত করিয়া জগতের ষষ্ঠ আবরণস্বরূপ হয়। ইহাই জগতের সূক্ষ্ম ষষ্ঠ স্তর।

সর্ব্বশেষে সলিল ক্ষোভিত হইলে প্রথমে গন্ধতন্মাত্র উৎপন্ন হয়। পরে গন্ধতন্মাত্র ক্ষোভিত হইলে গন্ধগুণবিশিষ্ট ক্ষিতি উৎপন্ন হয়। এই ক্ষিতি উপরোক্ত সকলকে আবৃত করিয়া জগতের সপ্তম আবরণ স্বরূপ হয়। ইহাই জগতের সূক্ষ্ম সপ্তম স্তর। এই সকল সপ্ত আবরণ থাকাতে পৃথিবী শাস্ত্রে সপ্তাবরণসংযুতা বলিয়া খ্যাত।

এখন দেখ, অহংতত্ত্বের তামসিক অংশ হইতে বাহ্য জগতের পঞ্চ তন্মাত্র ও পঞ্চ মহাভূত সৃষ্ট হয়। ইহাতে বুঝা উচিত, তমোগুণের আধিক্য হইয়া সূক্ষ্ম জগৎ ক্রমশঃ কলুষিত ও অধোগত হইতে হইতে স্থূল জগতে পরিণত। যখন আমরা এই ব্রহ্মাণ্ডের দিকে নেত্রপাত করি, তখন আমরা কি দেখিতে পাই? প্রথমে আকাশ, তারপর বায়ু, তারপর আলোক, তারপর একদিকে জল, অপরদিকে স্থল দেখিতে পাই। সাংখ্যকারও বাহ্য জগতের পঞ্চভূত সৃজনে উপরোক্ত ধারা রাখিয়াছেন।

অহংতত্ত্বের রাজসিক অংশ ক্ষোভিত হইলে ইন্দ্রিয়গণ উৎপন্ন হয়। ইন্দ্রিয়গণ দুই প্রকার :—

(১) জ্ঞানেন্দ্রিয়।
(২) কর্ম্মেন্দ্রিয়।

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পায়ু, উপস্থ, হস্ত, পদ ও বাক্ এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়। জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা মন বাহ্য জগতের জ্ঞানলাভ করে এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা ইহা বাহ্য জগতের নানা কার্য্য সম্পাদন করে। রজোগুণ রাগাত্মক বলিয়া অহংতত্ত্বের রাজসিক অংশ হইতে ইন্দ্রিয়গণের উৎপত্তি হয়।

এস্থলে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, সৃষ্টির বিষয় লেখা হইতেছে, তবে কেন ইন্দ্রিয়গণের উৎপত্তিবিষয় লিখিত হইল? ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, সাংখ্যকার মানবদেহসৃষ্টি বর্ণন করিয়া জগতের সৃষ্টিরহস্য উদ্ঘাটন করিতে চেষ্টা পান। এজন্য যে ইন্দ্রিয়গণ বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে দেহের প্রধান অঙ্গ, উহাদের উৎপত্তিবিষয় লিখিত হইল। আরও সাংখ্যকার অণ্ডের আদর্শে বিশ্বরূপ ব্রহ্মের অণ্ডের সৃষ্টি বর্ণন করেন বলিয়া অণ্ড হইতে একটী জীব বিবিধেন্দ্রিয়বিশিষ্ট হইয়া জন্ম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে ইন্দ্রিয়গুলি সূক্ষ্মভাবে উৎপন্ন হইয়া অণ্ডে কিরূপ অব্যক্ত অবস্থায় থাকে, তাহাই তিনি এ স্থলে দেখান। সত্য বটে, ইন্দ্রিয়গুলি জঙ্গমে যত অধিক স্ফুরিত, স্থাবরে তেমনি অস্ফুরিত, তথাচ উহাদের ক্রিয়া সর্ব্বত্র চলিতেছে। বৃক্ষগণ দর্শনেন্দ্রিয়বিহীন হইলেও উহারা দেখে।

অহংতত্ত্বের সাত্ত্বিক অংশ ক্ষোভিত হইলে মন ও ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবগণ উৎপন্ন হয়। ইহাতে বুঝা উচিত, স্থূল দেহের মস্তিষ্ক মনের যন্ত্র হইলেও ইহা সূক্ষ্ম জগতের বস্তু এবং সূক্ষ্মজগৎস্থ দেবগণের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকাতে উহারা ইহাকে সদা নিয়ন্ত্রিত করে। ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতৃ দেবগণ, যথা :—

সূর্য্য	...	চক্ষুর	মিত্র	...	পায়ুর
দিক্‌পাল	...	কর্ণের	প্রজাপতি	..	উপস্থের
পবন	...	ত্বকের	ইন্দ্র	...	করের
প্রচেতা	...	জিহ্বার	বিষ্ণু	...	পদের
অশ্বিনীকুমারদ্বয়	...	নাসার	বহ্নি	...	বাক্যের

এই সকল দেবগণ স্ব স্ব অধিকারে থাকিয়া যাবতীয় জীবের ইন্দ্রিয় ও মন চালাইতেছেন। ইহাতেই জগতে বিশ্বজনীন সামঞ্জস্য স্থাপিত হইয়াছে।

ত্রিগুণাত্মক অহংতত্ত্ব একদিকে সত্ত্বগুণসংযোগে মন ও দেবগণ, অপরদিকে তমোগুণ সংযোগে স্থূলজগতের পঞ্চ তন্মাত্র ও পঞ্চমহাভূত এবং মধ্যে রজোগুণ সংযোগে ইন্দ্রিয়গণ সৃজন করিয়া দেখায়, উহারাই পঞ্চভূতাশ্রিত তন্মাত্ররূপ আপনাদের ভোগ্য বিষয়গুলি বাহ্য জগৎ হইতে গ্রহণ করিয়া কেমন সুশৃঙ্খলতার সহিত মনের গোচর করিতেছে এবং মন ও স্বেচ্ছায় বা দৈব ইচ্ছায় চালিত হইয়া কেমন সুচারু রূপে জগতের যাবতীয় কার্য্য উহাদের দ্বারা সম্পাদন করিতেছে। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ নক্ষত্রগণ ও জগতের যাবতীয় পদার্থ, যথার্থতঃ যেরূপ হউক না কেন, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবগণ ইন্দ্রিয়যোগে আমাদিগকে যেমন দেখায়, আমরা আজীবন সেইরূপ দেখি। তদ্ভিন্ন জগৎ বুঝিবার বা জানিবার অন্য উপায় নাই। এজন্য ইহা মায়াময় এবং সকলই মহামায়ার মহালীলা মাত্র।

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ ইহারা জগতের পঞ্চ তন্মাত্র। ইহারা পঞ্চেন্দ্রিয়ের ভোগ্য বিষয় এবং যাবতীয় পদার্থের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণবিশেষ। মহাভূতের অন্তর্গত অতীব সূক্ষ্ম অংশকে উহার তন্মাত্র বলে। ইহাদের মধ্যে সূক্ষ্ম আকাশের আশ্রয়ভূত শব্দতন্মাত্র শ্রবণেন্দ্রিয়ের ভোগ্য, সূক্ষ্ম বায়ুর আশ্রয়ভূত স্পর্শতন্মাত্র ত্বগিন্দ্রিয়ের ভোগ্য, সূক্ষ্ম আলোকের আশ্রয়ভূত রূপতন্মাত্র দর্শনেন্দ্রিয়ের ভোগ্য, সূক্ষ্ম সলিলের আশ্রয়ভূত রসতন্মাত্র রসনেন্দ্রিয়ের ভোগ্য এবং সূক্ষ্ম ক্ষিতির আশ্রয়ভূত গন্ধতন্মাত্র ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের ভোগ্য। এই প্রকারে পঞ্চেন্দ্রিয় নিজ নিজ ভোগ্য বিষয় বাহ্য জগৎ হইতে গ্রহণ করিয়া মনের গোচর করিতেছে এবং মনও এই প্রকারে বাহ্য জগৎ বুঝিতেছে। ও উপলব্ধি করিতেছি।

ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পাঁচটী জগতের মহাভূত। ইহার যাবতীয় পদার্থ ও জীব উপরোক্ত পঞ্চ মহাভূতে নির্ম্মিত। যখন কোন জীব উৎপন্ন হয়, তখন ইহার নশ্বর দেহ ঐ সকল মহাভূতে বিরচিত হইয়া থাকে। যখন ইহা মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তখন ইহার দেহস্থ পঞ্চভূত বাহ্য জগতের পঞ্চভূতের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়। তন্মধ্যে বিজ্ঞানোক্ত যে সকল ভৌতিক পদার্থে ইহার দেহ বিরচিত, উহাদের সমষ্টি দর্শনোক্ত ক্ষিতি। রসাত্মক যে

সকল জলীয় পদার্থে ইহার দেহ বিরচিত, তাহাদের সমষ্টি দর্শনোক্ত অপ্। যে সকল রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা দেহের স্বাভাবিক উত্তাপ রক্ষিত হয় এবং সকল যন্ত্রের কাজ অনলরূপ চলে, উহাদের সমষ্টি দর্শনোক্ত তেজ। যে সকল স্নায়বিক ক্রিয়াপরম্পরা দ্বারা ইহার যাবতীয় যন্ত্রের কার্য্য সুচারুরূপে চালিত হয়, উহাদের সমষ্টি দর্শনোক্ত মরুৎ। সূক্ষ্ম মনের যাবতীয় ক্রিয়ার সমষ্টি দর্শনোক্ত আকাশ। এজন্য মনকে চিত্তাকাশ বলে।

জীবাত্মা পঞ্চভূতের দেহ পাইয়া এ সংসারে পঞ্চ তন্মাত্র লইয়া খেলিতে আইসে। খেলা সাঙ্গ হইলে, দেহের পঞ্চভূত বাহ্য জগতের পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়। ধূলার শরীর ধূলায় মিশায় এবং জীবাত্মাও স্বধামে প্রস্থান করে।

ক্ষিত্যপতেজ মরুদ্ব্যোম এই যে পঞ্চভূত, যদ্দ্বারা জগৎ বিরচিত, ইহারা কিরূপ পদার্থ? এই যে ধরা, যাহার উপর তুমি সানন্দে বিচরণ কর, তাহাই কি দার্শনিকদিগের মহাভূত ক্ষিতি? এই যে বারি, যাহা পান করিয়া তুমি নিজের তৃষ্ণা দূর কর, তাহাই কি তাঁহাদের মহাভূত অপ্? এই যে অগ্নি যাহা তোমার খাদ্য দ্রব্য পাক করে, তাহাই কি তাঁহাদের মহাভূত তেজ? এই যে বায়ু, যাহা তুমি প্রাণধারণের জন্য অনুক্ষণ সেবা কর, তাহাই কি তাঁহাদের মহাভূত মরুৎ? এই যে নীল নভস্তল, যাহা তুমি মস্তকোপরি দর্শন কর, তাহাই কি তাঁহাদের মহাভূত আকাশ?

পঞ্চ মহাভূতের প্রকৃত অর্থ অনেকে বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা মনে করেন, স্থূলাবয়ববিশিষ্ট ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পৃথিবী সলিল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ, যাহা আমরা অনুক্ষণ নয়নগোচর করি, তাহাই দর্শনোক্ত পঞ্চমহাভূত। বস্তুতঃ তাহা নহে। মহাভূতগুলি অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম পদার্থ। উহারা কারণাত্মক, কার্য্যাত্মক নহে। পদার্থের গন্ধবিশিষ্ট সূক্ষ্ম অংশকে <u>ক্ষিতি</u> বলা হয়; অপর পক্ষে যে মৃত্তিকা তুমি চর্ম্মচক্ষে দেখ, উহা সম্পূর্ণ স্থূল ও পঞ্চ মহাভূতে নির্ম্মিত। সলিলের বা তরল পদার্থের রসাত্মক সূক্ষ্ম অংশকে <u>অপ</u> বলা হয়; অপর পক্ষে যে সলিল তুমি পান কর, উহা পঞ্চ মহাভূতে নির্ম্মিত। উহারও গন্ধ আছে এবং উষ্ট্রগণ দূর হইতে সেই গন্ধ পায়। পদার্থের যে সূক্ষ্ম অংশ রূপ উৎপাদন করে এবং যাহার স্পন্দন অক্ষিবয়ে পতিত হয়, তাহাকে তেজ বলা হয়; অপর পক্ষে যে অগ্নি তোমার খাদ্য পাক করে, তাহা পঞ্চ

মহাভূতে নির্ম্মিত ও স্থূল। পদার্থের যে সূক্ষ্ম অংশ স্নায়ুযোগে স্পর্শ জ্ঞান জন্মায়, তাহাকে মরুৎ বলা হয়; অপর পক্ষে যে বায়ুর হিল্লোল তুমি স্পর্শেন্দ্রিয় যোগে অনুভব কর, তাহা পঞ্চমহাভূতে নির্ম্মিত। যাহা শব্দ উৎপাদন করে, তাহাকে আকাশ বলা হয়; অপর পক্ষে যে শূন্যময় আকাশ তুমি চতুর্দ্দিকে দেখ, তাহা দর্শনোক্ত আকাশ নহে। এখন বুঝিয়া দেখ, পঞ্চভূতের অর্থ কত দূর গূঢ়?

সাংখ্যমতে জগতে পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ তন্মাত্র ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়। ইহাতে বুঝা যায়, যেমন দেহে পঞ্চেন্দ্রিয়, তেমনি উহাদের বিষয় ও সংসারে পঞ্চ এবং বিষয়ের আশ্রয়ভূত মহাভূতও পঞ্চ। এই প্রকারে বাহ্যজগতের সহিত জীবমাত্রের সার্ব্বজনীন সামঞ্জস্য স্থাপিত আছে।

সাংখ্যাকারদিগের মহত্তত্ত্বাদি চব্বিশ তত্ত্বের সৃষ্টিকে প্রাকৃতিক সৃষ্টি বলে। ব্রহ্মের হিরণ্ময় অণ্ড এই চব্বিশ তত্ত্ব বিরচিত হয়।

তৎপরে ব্রহ্মাদি দেবগণ যে সৃষ্টি রচনা করেন, তাহাকে বৈকারিক সৃষ্টি বলে। ইহাতে সমস্ত বিকার প্রাপ্ত হইতে থাকে। এই প্রকারে সূক্ষ্ম ক্রমশঃ স্থূলে পরিণত হইয়াছে।

সাংখ্যমতে সৃষ্টিরহস্য ভেদ করিতে চেষ্টা পাইলাম বটে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহার গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিতে পারিলাম না এবং ইহার প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম হইল না। মহর্ষি কপিলদেব কিরূপ যুক্তি অবলম্বন করিয়া জগতের এই সকল মহাসত্য আবিষ্কার করেন, তাহা এখন আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য। বোধ হয়, যোগসিদ্ধ কপিলদেব যোগবলেই জগতের আভ্যন্তর অবগত হন।

যাবতীয় হিন্দুশাস্ত্রে চিরদিন বিঘোষিত হইতেছে "নাস্তি সাংখ্যসমং জ্ঞানং"। আজ পর্য্যন্ত এ কথার কোনরূপ খণ্ডন হয় নাই এবং কস্মিন কালে এ কথার খণ্ডন হইবে না। সাংখ্যমত যাবচ্চন্দ্রদিবাকর জ্ঞানজগতে সম্যক আদৃত হইবে। যে মহাত্মা বুদ্ধদেব চতুর্ব্বেদ অমান্য করেন, তিনিও সাংখ্যদর্শনকে রাজমুকুটস্বরূপ নিজ মস্তকে ধারণ করিয়া স্বধর্ম্ম জগতে প্রচার করিয়া যান।

পণ্ডিতপ্রবর রমেশ চন্দ্র দত্ত বলেন :—

"The Sankhya Philosophy is the first recorded Philosophy in the world, the earliest attempt on record to give answers from reason alone to the mysterious questions which arise in every thoughtful mind about the origin of the world, the nature and relations of man and his future destiny."

Ancient Civilization of India

by R. C. Dutta.

"জগতের আদি, মানবের প্রকৃতি, বাহ্য জগতের সহিত তাঁহার বিবিধ সম্বন্ধ, তাঁহার জীবনের ভবিষ্যৎ এই সকল বিষয় সম্বন্ধে প্রত্যেক চিন্তাশীল লোকের মনে যে সকল প্রশ্ন স্বতঃ উত্থিত হয়, তাহা জ্ঞানশক্তি বলে সুমীমাংসা করিবার জন্য সাংখ্যদর্শন প্রথম চেষ্টা পায় এবং জগতের ইতিহাসে ইহারই উল্লেখ প্রথম দেখা যায়।"

যাহা হউক, তিনি ইংরাজের চক্ষে সাংখ্যদর্শন দেখিয়াছেন এবং তদনুযায়ী ইহার উপর সমালোচনা করিয়াছেন; কিন্তু ইহার প্রকৃত মাহাত্ম্য বা গৌরব বুঝিতে পারেন নাই বা প্রকাশ করেন নাই।

সৃষ্টি রহস্য।

তৃতীয় অংশ।

বিজ্ঞানের মতে সৃষ্টি রহস্যোদ্ভেদ।

এখন যে বিজ্ঞান জ্ঞানজগতে সম্যক আদৃত, যাহার প্রতিপত্তি ও প্রভাব সভ্যদেশমাত্রেই পূর্ণাংশে প্রকটীত, সে বিজ্ঞান কি প্রকারে সৃষ্টিরহস্য উদ্ভেদ করিতে চেষ্টা পায়, তাহার আভাস দিতেছি।

ইহার মতে জগৎ কতকগুলি অনাদি, অবিনশ্বর ভৌতিক পদার্থ দ্বারা বিরচিত। ইহাদের পরমাণুরাশি কতকগুলি অন্তর্নিহিত ভৌতিক শক্তি

দ্বারা চালিত হইয়া কোথাও সংশ্লিষ্ট, কোথাও বা বিশ্লিষ্ট, কোথাও সংযোজিত, কোথাও বা বিয়োজিত। এই প্রকারে ইহারা বিভিন্ন রূপে পুঞ্জীকৃত, রূপান্তরিত, পরিবর্ত্তিত ও বিবর্ত্তিত হওয়ায় এ জগৎ সৃষ্ট হয়। এই প্রক্রিয়াবলে ইহা সাম্যাবস্থা হইতে ক্রমশঃ বিষম, বিমিশ্র ও জটিল অবস্থায় পরিণত হয়।

জগৎসৃষ্টিবিষয়ে বিজ্ঞান অনুমান করে, কল্পনাতীত যুগ পূর্ব্বে বাষ্পময় ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত আকাশে ঘূর্ণ্যমান ছিল। তৎকালে যাবতীয় ভৌতিক পদার্থ বাষ্পাকারে আকাশে অভিব্যাপ্ত ও ইতস্ততঃ পিণ্ডাকারে বিক্ষিপ্ত ছিল। ইহাই লাপ্লাস সাহেবের নেবুলার মত (Nebular theory) ব্রহ্মাণ্ডের ঘূর্ণন বশতঃ বাষ্পরাশি স্থানে গাঢ় ও তরল হইতে থাকে। গাঢ়াংশের বেগাতিশয্য বশতঃ তরলাংশ উহার পশ্চাৎপদ হইয়া যায় এবং ক্রমশঃ বিযুক্ত হইয়া উহা হইতে পৃথক হইয়া পড়ে। অনন্তর তরলরাশি পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট ঘূর্ণন বশতঃ গাঢ় রাশিকে কেন্দ্র করিয়া উহার চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করিতে থাকে। এই প্রকারে এক একটী সৌরজগতের সূর্য্য ও গ্রহগণ উৎপন্ন হয়। এজন্য গ্রহগণ সূর্য্যের পুত্র-স্বরূপ। এক একটী তরলরাশি হইতে বিচ্যুত হইয়া যাহারা উহার পরিধি-ক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করিতে থাকে, উহারা উপগ্রহ বলিয়া খ্যাত হয়।

পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশের উত্তাপরাশি যতই আকাশে বিকীর্ণ হইয়া হ্রাস পাইতে থাকে, ততই ইহার বাহ্যস্তর কঠিন হইয়া দুগ্ধসরের ন্যায় জমাট বাঁধিয়া যায় এবং অভ্যন্তরস্থ তরলরাশি ক্রমশঃ গাঢ় হইতে থাকে। ইহাতে পৃথিবীর ব্যাস ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। উপরিস্থিত বায়ুর ভারবশতঃ ইহার পৃষ্ঠস্তর ব্যাস সঙ্কোচন অনুসরণ করে। ইহার পৃষ্ঠস্তর সকল স্থানে সমভাবে সঙ্কুচিত হয় নাই; সেজন্য স্থলবিশেষে স্থানচ্যুতি ও ব্যতিক্রম ঘটিয়া নিম্নতল ক্ষেত্রগুলি উৎপন্ন হয়। ভূ-পৃষ্ঠে বায়ুবিলীন বারিবাষ্প শীতলতা প্রযুক্ত সলিলরূপে পরিণত হইয়া নিম্নতল ক্ষেত্রগুলি অধিকার করে। এই প্রকারে সাগরাদি উৎপন্ন হয়। উচ্চপর্ব্বতগুলি বৃষ্টির জলে ধৌত হইয়া সমতল অধি-কার করে এবং উহারা ভূ-পৃষ্ঠে স্তরে স্তরে বিন্যস্ত হইয়া যায়। পৃথিবীতে জল উৎপন্ন হইবার পর জীবজন্তু ক্রমশঃ দেখা দেয়।

কোন কোন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত বলেন, এক কোটী বৎসর হইল পৃথিবী সৃষ্ট হইয়াছে; অপর পণ্ডিতেরা বলেন, ১০ কোটী বৎসর হইল। এই

প্রকারে বিজ্ঞানজগতে এই বিষয় লইয়া নানা মুনির নানা মত চলিতেছে। এ বিষয়ে উঁহাদের বিবাদ মীমাংসিত হইবে কিনা সন্দেহ।

যাহা হউক, বিজ্ঞানের সৃষ্টিবিষয়ক মতামত পাঠ করিয়া মন আদৌ সন্তোষ লাভ করে না। সেজন্য পণ্ডিতবর হারবার্ট স্পেন্সার সৃষ্টিরহস্য উদ্ঘাটন করিতে গিয়া বিফল মনোরথ হওয়াতে বলেন :—

"Ultimate Mystery continues as great as ever. The problem of existence is not solved. It is simply removed further back. Nebular Theory throws no light on the origin of the diffused matter and diffused matter as much needs accounting for as the concrete matter. The genesis of an atom is not easier to conceive than the origin of a Planet. Nay, indeed so far from making the universe a less mystery than before, it makes it a greater mystery."

Herbert Spencer.

"চরম রহস্য যেমন তেমনি রহিয়া গেল। জীবনের কূট প্রশ্ন মীমাংসিত হইল না, কেবল মাত্র ইহাকে পশ্চাতে প্রক্ষেপ করা হইল। আকাশব্যাপ্ত বিক্ষিপ্ত ভৌতিক পদার্থের পরমাণুরাশি (নীহারিকা) কোথা হইতে আসিল, নেবুলার মত উহার প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারে না। ঘনীভূত ও বিক্ষিপ্ত উভয় প্রকার পদার্থের কারণ নির্দ্দেশ করা সমভাবে আবশ্যক। এক গ্রহের উৎপত্তি যেরূপ রহস্যময়, এক পরমাণুর উৎপত্তিও তেমনি রহস্যময়। যথার্থ বলিতে কি, যাহা লেখা গেল, তাহাতে সৃষ্টিরহস্য উদ্ঘাটন করা দূরে থাকুক, ইহাকে আরও রহস্যময় করিয়া দিলাম।"

দর্শন ও বিজ্ঞানের সমন্বয়।

"দর্শনশাস্ত্রমতে জগতের যাবতীয় পদার্থ, কি স্থাবর, কি জঙ্গম, সকলই ক্ষিত্যপতেজমরুদ্‌ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূতে নির্ম্মিত। এখন উন্নত জড়বিজ্ঞান এই দার্শনিক মতের মস্তকে পদাঘাত করত সাহঙ্কারে বলে, রসায়নশাস্ত্রে যে সোত্তর প্রকার ভৌতিক পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহারাই জগতের যাবতীয় পদার্থ নির্ম্মাণ করে। এখন কোন্ মত সত্য ?

দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় বিজ্ঞানের অধিক পক্ষপাতী। টোলের পণ্ডিতেরা যাহাই বলুন না কেন, তাঁহারা বেশ জানেন, উন্নত বিজ্ঞানই সত্যে পরিপূর্ণ এবং ইহার চাক্ষুষ প্রমাণগুলি সর্ব্বথা অখণ্ডনীয়। অতএব তাঁহাদের মতে দার্শনিক মতটি সর্ব্বৈব অনুমানসিদ্ধ বা কাল্পনিক। তাঁহাদের মনস্তুষ্টির জন্য দর্শনও বিজ্ঞানের বিরোধ ভঞ্জন করা আবশ্যক।

থিওসফির মতে জড়বস্তুর প্রকৃতি বস্তুতঃ সপ্তধা; তন্মধ্যে আমরা কেবল ইহার বাহ্য স্তরটী ইন্দ্রিয়যোগে বুঝিতে পারি। অন্যান্য স্তরগুলি ইন্দ্রিয়াতীত সূক্ষ্ম বলিয়া আমাদের মনোগ্রাহ্য নহে। হিন্দুশাস্ত্রও বলে, পৃথিবী ও ইহার প্রত্যেক স্থূল জড়পদার্থ সপ্তাবরণে আবৃত। সপ্তাবরণ যথা (১) মহত্তত্ত্ব (২) অহংতত্ত্ব (৩) আকাশ (৪) মরুৎ (৫) তেজ (৬) সলিল (৭) ক্ষিতি। ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত তিনটী আবরণ ইন্দ্রিয়াতীত বলিয়া আমাদের আদৌ মনোগ্রাহ্য নয় এবং শেষোক্ত চারি আবরণ উহাদের তন্মাত্র রূপে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইলেও বস্তুতঃ সূক্ষ্ম। কিন্তু উহাদের বিমিশ্রণে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল পদার্থ উৎপন্ন হয়। এখন যে বিজ্ঞান কেবল স্থূল পদার্থের বাহ্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্তর আলোচনা করে, তাহার কথা কি প্রকারে এক মাত্র শিরোধার্য্য করিয়া দর্শনের কথা উড়াইয়া দিব?

সত্য বটে, বিজ্ঞান অসাধারণ অনুসন্ধান ও পর্য্যবেক্ষণ বলে ভৌতিক পদার্থগুলি (Elements) ক্রমশঃ আবিষ্কার করিতেছে এবং কি প্রকারে উহাদের সংযোগে ও বিয়োগে রাসায়নিক আকর্ষণের তারতম্যবশতঃ ভিন্ন ভিন্ন যৌগিক পদার্থ (Compound) উৎপন্ন হয়, তাহাও ইহা নির্দ্দেশ করিতেছে; কিন্তু আজকাল অনেক পণ্ডিতের মত, যেমন জড় জগতের ভিন্ন ভিন্ন শক্তিগুলি কোন এক মহাশক্তির বিকার বা রূপান্তর, সেইরূপ জগতের যাবতীয় ভৌতিক পদার্থ কোন এক মহাভূতের বিকার।

তাঁহারা সেই মহাভূতকে প্রোটীল (Protyle) নামে অভিহিত করেন। দর্শনপ্রতিপাদিত মহাভূত ক্ষিতিকে অনেকে প্রোটীল মনে করেন। ইহাতে দর্শন ও বিজ্ঞানের বিরোধ কিয়ৎ পরিমাণে ভঞ্জন করা হইতেছে।

মহাত্মাগণের বিশ্বাস, প্রত্যেক জীবপ্রবাহে বা কল্পে পঞ্চ মহাভূতের মধ্যে এক একটী মহাভূত ইহার স্থূলরূপে জীবের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হইয়া থাকে। এখন

যেমন এই বরাহকল্পে চতুর্থ জীবপ্রবাহ চলিতেছে, তেমনি পঞ্চ মহাভূতের মধ্যে চারিটী মহাভূত উহাদের স্থূলরূপে জীবের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, যথা ক্ষিতি; অপ্, তেজ ও মরুৎ এবং পঞ্চম মহাভূত আকাশ এখনও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় নাই। বিজ্ঞানও অনুমানবলে আকাশের অস্তিত্ব স্বীকার করে এবং ইহাকে ইথর নামে অভিহিত করে। শুনিতে পাই, এই আকাশের গুণাগুণ বুঝিতে পারিয়া যোগসিদ্ধ মহাপুরুষগণ সংসারে অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ দেখান।

সূর্য্যের সুষুম্নাদি যে সাত প্রকার রশ্মি আছে, উহারা আকাশের উপাধি এবং উহাদের দ্বারা জড়শক্তিগুলি জড়বস্তুসংযোগে জড়জগতে প্রকটিত হয়। আকাশ আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হওয়াতে আমরা ইহাকে শূন্য জ্ঞান করি বটে; কিন্তু ইহা অনন্ত গুণে গুণান্বিত। অনন্ত আকাশ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছে। পরমাণু হইতে অগণ্য নক্ষত্রমণ্ডল পর্য্যন্ত ইহা সর্ব্বত্র সমভাবে বর্ত্তমান। লক্ষ লক্ষ যোজন দূরে অবস্থিত গ্রহনক্ষত্রগণ এক আকাশ দ্বারা পরস্পর পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠ রূপে সম্বদ্ধ ও আকৃষ্ট। সূর্য্য আকাশ দ্বারা পৃথিবীকে আলোকিত করে ও জীবসমূহে পূর্ণ করে।

প্রলয়।

সৃষ্টির বিষয় কিঞ্চিৎ লেখা গেল। এখন ইহার বিপরীত অবস্থা প্রলয় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিতেছি।

প্রলয় দুই প্রকার, যথা :—

(১) মহাপ্রলয় বা প্রাকৃতিক প্রলয়।

(২) খণ্ডপ্রলয় বা নৈমিত্তিক প্রলয়।

প্রথমটী সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার শতবৎসর আয়ুর শেষে এবং দ্বিতীয়টী তাঁহার দিবাবসানে প্রত্যেক মন্বন্তরের শেষে সংঘটিত হয়। মহাপ্রলয়ে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড লয় পায়। এই পরিদৃশ্যমান স্থূলজগৎ ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে হইতে পরব্রহ্মে মিলিয়া যায়। খণ্ডপ্রলয়ে পৃথিবীর বা জগতের অংশবিশেষ পরিবর্ত্তিত হইয়া অন্যরূপ ধারণ করে অথবা আকাশের কোন নক্ষত্রলোক ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এরূপ খণ্ডপ্রলয় জগতে মধ্যে মধ্যে ঘটিতেছে।

মহাপ্রলয়ে মহামায়ারূপিনী ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি পরব্রহ্মে লীন হইয়া

অব্যক্ত মূলপ্রকৃতিতে পরিণত হয় এবং ভবিষ্যৎ সৃষ্টির উপাদানকারণ স্বরূপ অবস্থিতি করে। এই যে প্রত্যক্ষপরিদৃশ্যমান জগৎ ও ইহার চন্দ্রসূর্য্যগ্রহনক্ষত্রাদি লোকসমূহ, যাহারা বহু পূর্ব্ব হইতে সূক্ষ্মে পরিণত হইতে থাকে, উহারা তৎকালে পরব্রহ্মরূপ মহাকাশে বিলীন হইয়া তমোময়, শূন্যময় আধার-স্বরূপ রহিয়া যায়। যে চব্বিশ তত্ত্ব লইয়া সাংখ্যকার সৃষ্টিরহস্য উদ্‌ঘাটন করেন, তৎসমুদায় তৎকালে মূলপ্রকৃতিতে লীন হইয়া যায়। ব্রহ্মাদি দেবগণ পরব্রহ্মে লয় পান এবং ব্রহ্মলোকাদি সকল লোক তৎকালে বিনাশ পায়। মহাপ্রলয়ের সেই ভীষণ অবস্থা আমাদের কল্পনাতীত ও বর্ণনাতীত।

যেমন সুষুপ্তির অবস্থায় মনের মানসিক ক্রিয়া রহিত হইয়া যায়, সেইরূপ মহাপ্রলয়ে পরব্রহ্মের চিৎশক্তির ক্রিয়া রহিত থাকে। তৎকালে তাঁহার সেই নিশ্চেষ্ট অবস্থাটী তোমার স্থূলমনের সম্যক বোধগম্য করাইবার জন্য তোমার শ্রেষ্ঠ সনাতন হিন্দুধর্ম্ম প্রলয়পয়োধি মধ্যে অনন্তকালরূপ শেষনাগোপরি অধিশয়ান ও নিদ্রিত বিষ্ণুরূপ কল্পনা করে এবং জরায়ুগর্ভে গর্ভোদক মধ্যে ভাসমান ভ্রূণের ন্যায় প্রলয়পয়োধিজল মধ্যে অধিশয়ান নারায়ণরূপ কল্পনা করে। এরূপ কল্পনা ব্যতীত আমাদের গত্যন্তর নাই।

মহাপ্রলয়ে বিশ্বের প্রকৃত অবস্থা কিরূপ হয়, তাহা আরও বিশদরূপে বুঝা আবশ্যক। তৎকালে নিখিল বিশ্ব সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া কেবল তমোময় ও শূন্যময় হয়। যেমন নয়নদ্বয় নিমীলিত করিলে সম্মুখস্থ দৃশ্যপটল অদৃশ্য হইয়া তৎক্ষণাৎ শূন্যময় ও তমোময় হইয়া যায়, মহাপ্রলয়ে বিশ্বের অবস্থাও ঠিক সেইরূপ হইয়া থাকে। তখন কিছুই থাকে না, অথচ সকলই অব্যক্ত অবস্থায় থাকে। সমগ্র আকাশ গাঢ় তমিস্রায় অভিব্যাপ্ত। সকলই একাকার ও সাম্যাবস্থায় পতিত। কোন জীব, কোন দেবতা, কোন ভূতাদি কেহই থাকে না। থাকেন একমাত্র পরব্রহ্ম নিশ্চেষ্ট ভাবে। চর্ম্মচক্ষে এখন যে সকল লোক দেখা যায়, ভৌতিক পদার্থ ও ভৌতিক শক্তি রহিত হওয়াতে উহারা ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে থাকে। মহাপ্রলয়ে সেই সকল সূক্ষ্ম লোক পরব্রহ্মে মিশিয়া যায়।

পুরাণের মতে মহাপ্রলয়ে বিশ্বের ভীষণ অবস্থা ভীষণ পয়োধি-স্বরূপ। যেমন মহাসাগরের উদ্বেলিত মহোর্ম্মি দর্শনে মনে স্বতঃ আতঙ্ক উপস্থিত হয়,

সেইরূপ মহাপ্রলয়ের ভীষণ বার্ত্তা ভাবিলে আমাদের মনে স্বতঃ আতঙ্ক আইসে। এজন্য শাস্ত্রে প্রলয় ভীষণ পয়োধি বলিয়া উক্ত।

সাংখ্যমতে মহাপ্রলয় কিরূপ? সাংখ্যকার বলেন, তমঃপ্রধানা সাম্যাবস্থাপন্না মূলপ্রকৃতি সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় গুণক্ষোভ বশতঃ কেবল বিষম, বিমিশ্র ও জটিল অবস্থায় পরিণত হয়। এজন্য মহাপ্রলয়ে যে সকল তত্ত্ব দ্বারা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বিরচিত, সে সকল তত্ত্ব স্ব স্ব উৎপত্তিস্থলে লয় পাইয়া সৃষ্টির বৈষম্য নাশ করত পুনরায় সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়; যথা পঞ্চভূত পঞ্চতন্মাত্রে, পঞ্চতন্মাত্র অহংতত্ত্বে, অহংতত্ত্ব মহত্তত্ত্বে লয় পাইয়া সকল তত্ত্বগুলি মূলপ্রকৃতিতে মিলিয়া যায়। সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় উহারা ক্রমশঃ বা একাদিক্রমে বিবর্ত্তিত হইতে থাকে, মহাপ্রলয়ে উহারা ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া যায়। এই প্রকারে তৎকালে মূলপ্রকৃতি কেবল অব্যক্ত অবস্থায় থাকে।

এখন বিশ্বের সেই অব্যক্ত অবস্থা বুঝাইবার জন্য একটী দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করা আবশ্যক। দেখ, অম্লজান ও উদজান রাসায়নিক আকর্ষণে সংযুক্ত হইয়া উদক প্রস্তুত করে। উদকাবস্থায় ঐ দুই বাষ্প (Gas) অব্যক্তাবস্থায় থাকে, কারণ উদক বিশ্লিষ্ট করিলে পুনরায় উহাদিগকে পাওয়া যায়, বাষ্পাবস্থায় বা স্বাভাবিক অবস্থায় উহারা আমাদের নিকট ভালরূপ ব্যক্ত; কিন্তু উদকাবস্থায় উহারা সম্পূর্ণ অব্যক্ত। সেইরূপ মহাপ্রলয়ে বিশ্বের বৈষম্য নষ্ট হয় বটে, কিন্তু ইহা কেবল অব্যক্ত অবস্থায় থাকে।

সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার আয়ুঃ শেষে মহাপ্রলয় উপস্থিত হয়। যখন তাঁহার রাত্রি হয় এবং তিনি নিদ্রা যান, তৎকালে জগতে খণ্ডপ্রলয় সংঘটিত হয়। তৎকালে ব্রহ্মাণ্ডের স্থলবিশেষ পরিবর্ত্তিত হইয়া বিভিন্ন আকার ধারণ করে এবং উহার যাবতীয় জীবজন্তু ও উদ্ভিজ্জাদি নাশ প্রাপ্ত হয়।

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে।

(গীতা)

ব্রহ্মার রাত্রি হইলে (খণ্ড প্রলয়ে) জীবজন্তু ও উদ্ভিজ্জাদি লয় প্রাপ্ত হয় এবং তাঁহার দিন হইলে সকলে আবার উৎপন্ন হয়। এই প্রকারে অবশ হইয়া

(অর্থাৎ প্রাকৃতিক নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া প্রকৃতির পরিণাম বশতঃ উহাদের উৎপত্তি ও লয় হইতেছে।"

পৃথিবীর খণ্ডপ্রলয় ভূগর্ভস্থ সংকর্ষণাদি অগ্নিসংযোগে অথবা ভূমিকম্প ও জলপ্লাবন দ্বারা সংঘটিত হয়। ইহাতে ইহার মহাদ্বীপবিশেষ বিপ্লবের পর বিপ্লব অতিক্রম করিতে করিতে কখনও বা জলধিগর্ভে নিমগ্ন হইয়া যায়, কখন বা মহাসাগর হইতে উত্থিত হয়। যাঁহারা ভূতত্ত্ব পাঠ করেন, তাঁহারা অবগত হন, অতীত যুগসমূহে পৃথিবীর নানা অংশ কত বিপ্লবের পর বিপ্লব অতিক্রম করিতে করিতে আধুনিক আকার ধারণ করিয়াছে। খণ্ডপ্রলয় দ্বারা লিমুরিয়া আটলাণ্টিস মহাদ্বীপদ্বয় এবং মৌন মহাদ্বীপ জলমগ্ন হইয়া যায় এবং আধুনিক পৃথিবী বা জম্বুদ্বীপ সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থিত হয়।

শেষ মন্তব্য।

অধ্যাত্মবিজ্ঞান, দর্শন ও জড়বিজ্ঞানের মতামত লইয়া সৃষ্টিরহস্য উদ্ভেদ করিতে চেষ্টা পাইলাম বটে, কিন্তু চরম রহস্য যেমন তেমনি রহিয়া গেল এবং মন কিছুমাত্র সন্তোষ লাভ করিল না। মানব মন যেরূপ সীমাবদ্ধ ও অসম্পূর্ণ তাহাতে এ বিষয়ে আমাদের সকল চেষ্টাই বৃথা হইবে। সত্য বটে, বিজ্ঞান বলে ভৌতিক পদার্থ ও ভৌতিক শক্তি অনাদি ও অবিনশ্বর; কিন্তু থিওসফি বলে, কল্পে কল্পে ও মন্বন্তরে মন্বন্তরে উহাদের বিস্তর পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। সে স্থলে কলিকালের মানব হইয়া সৃষ্টিরহস্য উদ্ঘাটন করিতে যাওয়াই আমাদের বাতুলতা। ভোলা মন মানে না, তাই সকলে এবিষয় জানিতে ইচ্ছা করে।

অতীত যুগে ধরিত্রীর পরিবর্ত্তন।

সকলেই ভূগোলে পাঠ করেন, ভূমণ্ডল দুই মহাদ্বীপে বিভক্ত, পূর্ব্ব মহাদ্বীপ ও পশ্চিম মহাদ্বীপ। প্রথমটী আবার এসিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা এই তিন মহাদেশে বিভক্ত এবং দ্বিতীয়টী উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় বিভক্ত। এই দুই মহাদ্বীপ লবণাক্ত নীলাম্বুরাশি দ্বারা বেষ্টিত। ভূমণ্ডলের সমস্ত বারিধি পাঁচ মহাসাগরে বিভক্ত, তন্মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগর আমেরিকাকে এসিয়া হইতে

এবং আটলাণ্টিক মহাসাগর উহাকে ইউরোপ ও আফ্রিকা হইতে পৃথক করিতেছে ; এসিয়ার দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, সুমেরুর নিকট উত্তর মহাসাগর এবং কুমেরুর নিকট দক্ষিণ মহাসাগর ; পৃথিবীতে স্থল এক ভাগ ও জল তিন ভাগ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্যাণে আমরা বাল্যকালেই ভূগোলের এই সকল সারকথা শিক্ষা করি। মনে হইলেই এখন আমরা বাষ্পীয় পোতযোগে মহাসাগরের বক্ষোপরি যাতায়াত করিয়া ঐ সকল মহাদেশ ও মহাসাগর দর্শন করিয়া নয়ন সার্থক করি। এখন যদি ইহার বিপরীত কোন কথা কোন শাস্ত্রে দেখি, সে শাস্ত্র আমরা স্বতঃ প্রত্যাখ্যান করিয়া থাকি।

অনেকে হয়ত মনে করিতে পারেন, সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে ভূমণ্ডলের ভৌগোলিক সংস্থাপন এইরূপ সমভাবে চলিয়া আসিতেছে এবং ইহার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। কিন্তু জগতের অনন্ত পরিবর্ত্তনের মধ্যে এরূপ হওয়া অসম্ভব। ইহা এক অমোঘ সত্য, পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ ও অভ্যন্তর যুগে ২ নানারূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। বিজ্ঞান অসাধারণ পর্য্যবেক্ষণাদি বলে সপ্রমাণ করে, যাহা আজ মহাদেশ বা দেশবিশেষ নামে ভূগোলে পরিচিত, তাহা অতি প্রাচীনকালে সমুদ্রগর্ভে নিহিত ছিল এবং যে স্থলে আজ মহাসাগর উত্তাল তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হইয়া মহাশব্দে বহমান, সে স্থলে পূর্ব্বে মহাদেশ বৃহদাকার জীবজন্তু ও উদ্ভিজ্জ লইয়া বিরাজমান ছিল। আধুনিক আকার ধারণ করিবার পূর্ব্বে ধরিত্রীর পৃষ্ঠদেশ ও অভ্যন্তর যে কতপ্রকার ভৌতত্ত্বিক বিপ্লব বা খণ্ডপ্রলয় অতিক্রম করিয়াছে অথবা কত দেশ দেশান্তর সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থিত বা উহাতে নিমগ্ন হইয়াছে তাহার কিছুমাত্র ইয়ত্তা নাই। যাহা হউক, এ বিষয়ে বিজ্ঞান, থিওসফি ও হিন্দুশাস্ত্রের মতামত দেখা আবশ্যক।

বিজ্ঞানের মতে ধরিত্রীর পরিবর্ত্তন।

Geographical distribution of land and water during Geological periods.

At first there were Northern and Southern Hemispheres instead of the present Eastern and Western ones. Before the

Carboniferous Period perhaps both the Hemispheres were joined together by land as has been evidenced from the fact that they supported similar plants and animals as has been traced out from the organic remains. But in the great orogenic movements which convulsed the world in the end of the middle Carboniferous Period or before the Permian set in, many countries were upheaved from and many submerged into the sea and big mountains were formed. These mountains are no longer visible now, as they were denuded by the atmospheric action or have gone back to the bottom of the sea. As a result of the submersion or upheavel of many countries a deep furrough almost encircling the earth and constituting an ocean, of which the Mediterranean sea is the last remnant, was formed. The ocean is known as the Tethys which seperated Northern and southern Hemispheres. Gradually all connections between the two Hemispheres were severed in the Permian Period. The Southern continent included the Indian Peninsula or the Deccan (The Hemalaya and Hindoostan Proper then being under the Tethys) Ceylon, South Africa, Australia & part of South America, all of which were joined together by lands and these have now subsided beneath the Atlantic and Indian Oceans.

The Permian Period was marked by Glacial Phenomena due to the formation of big mountains, tops of which were covered with ice from the climatic condition, which began to flow as glaciers. This fact has been proved from the Boulder beds next to the beds of the Carboniferous Periods. The average temperature along the Equitoreal Zone lower than at the present day, as

a result of which glaciers were formed in places which are now almost tropical. From these it is also evident that in the middle Carboniferous Period a huge continent was formed, including portions of Asia, Africa, South America and Australia which were connected by lands and these have all gone below to the bottom of the sea and seperate continents Asia, Africa, S. America and Australia were formed afterwards.

In the Tertiary Period great and acute disturbances took place which brought the earth to its present form. At the end of the Eocene Period there was a grand upheavel, as a result of which enormus masses of sedimentary rocks of the floor of the Tethys were powerfully compressed in tangential directions producing Himalayas, Perinies, Alps etc. But though some portions of the floor of the Tethys were upheaved, it was not altogether obliterated by this movement. Many portions of the upheaved floor again subsided under water and enormous thick sandstones were formed in the depressions.

In the middle Miocene Period there was another great upheaven and the Himalayas and Alps were further raised and these sandstone beds were compressed and upheaved and they were found still. The Tethys was cut off into series of disconnected lagoons or inland seas and the greater portions of the floor were upheaved, while many portions of the continents subsided and the sea rolled over them.

In the Pliocene Period the final great disturbance took place. The Himalays and the Alps were thrust into their fullest height and the lagoons of the Tethys were also upheaved, only present Mediterranian sea remained of that big ocean.

Lands were upheaved and again subsided and the seperation among America, Australia and Asia was complete. The Atlantic and the Pacific began to roll over the continents and the present form of the distribution of land and water was completed.

It is believed by some that an arm of the Tethys seperated the Hemalays from the Hindustan. Proper which was filled up by the debiies of the Himalays and is now covered by the Gangetic Alluvium.

(Geology)

ইহার ভাবার্থ—ভৌতত্ত্বিক যুগসমূহে পৃথিবীর ভৌগোলিক সংস্থান।

আধুনিক পূর্ব্ব ও পশ্চিম মহাদ্বীপের পরিবর্ত্তে পূর্ব্বে উত্তর ও দক্ষিণ মহাদ্বীপ ছিল। অঙ্গারময়ী যুগের পূর্ব্বে উহাদের মহাদেশগুলি স্থলযোগে একত্র সংলগ্ন ছিল; কারণ উহাদের জীবজন্তুর কঙ্কাল ও উদ্ভিজ্জের ভগ্নাবশেষ দেখিয়া ঐরূপ সিদ্ধান্ত করা হয়। ঐ যুগের মধ্যভাগে যে সকল বিপ্লবের পর বিপ্লব পৃথিবীকে প্রকম্পিত করে, তাহাতে অনেক দেশ সমুদ্র হইতে উথিত হয় ও অনেক দেশ সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া যায় এবং বৃহৎ ২ পর্ব্বতশ্রেণী সৃষ্ট হয়। এই সকল বৃহৎ পর্ব্বত এখন পৃথিবীতে আর দেখা যায় না; উহারা জলবৃষ্টিতে ধৌত হইয়া ক্ষুদ্রতর হইয়া গিয়াছে অথবা সমুদ্রগর্ভে পুনরায় নিমগ্ন হইয়াছে। এইরূপ নানাদেশের উত্থান ও নিমজ্জন বশতঃ পৃথিবীর মধ্যভাগে উহাকে বেষ্টন করিয়া এক বিশাল মহাসাগর উৎপন্ন হয়। ইহার নাম টিদিস। তৎকালে এই মহাসাগর উত্তর ও দক্ষিণ মহাদ্বীপকে পৃথক করিত। পারমিয়ান যুগে উহারা সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া যায়। দক্ষিণ মহাদ্বীপস্থ মহাদেশে ভারতের দাক্ষিণাত্য, লঙ্কাদ্বীপ, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা ছিল; উহারা স্থলযোগে সংলগ্ন ছিল। পরে ব্যবহিত দেশগুলি আটলান্টিক ও ভারত মহাসাগরে নিমগ্ন হইয়া যায়।

অঙ্গারবাহী যুগে নানা স্থানে যে সকল বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বতশ্রেণী উৎপন্ন হয় পারমিয়ান যুগে উহাদের শিখর দেশ বরফাবৃত থাকায় স্তূপাকার বরফরাশি নানা দিকে বহিত থাকে। ইহাতে বিষুবরেখার পার্শ্বস্থ দেশসমূহ আজকালের সুমেরু ও কুমেরুর ন্যায় শীতপ্রধান ছিল। এ কারণ অনেকে অনুমান করেন, পৃথিবীর উত্তর দিকের ন্যায় দক্ষিণ দিকে এক মহাদেশ উৎপন্ন হয়। এই মহাদেশের স্থলভাগগুলি এখন ভারত মহাসাগরে ও দক্ষিণ আট্লাণ্টিক মহাসাগরে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে।

ভৌতত্ত্বিক তৃতীয় যুগে যে সকল বিপ্লবের পর বিপ্লব ঘটে, তাহাতেই পৃথিবী আধুনিক আকার ধারণ করে। ইহার অন্তর্গত ইয়োসিয়ান যুগের শেষ ভাগে অনেক দেশ আর একবার সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থিত হয়; একারণ টিদিশ মহাসাগরের তলদেশও নানাস্থলে উত্থিত হয় এবং উত্থিত অংশের শৈলরাশি স্থলবিশেষে সঙ্কুচিত হইয়া হিমালয়, আল্পস, পিরীনিস প্রভৃতি পর্ব্বতশ্রেণী উৎপাদন করে। যদিও টিদীস মহাসাগর নানাস্থলে উত্থিত হয়, ইহার চিহ্ন সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হয় নাই। উত্থিত অংশগুলি আবার নানাস্থলে জলমগ্ন হইয়া যায় এবং রেতময় শৈলরাশি (Sandstone) নিম্নতলভূমিতে থাকিয়া যায়।

তৃতীয় মহাযুগের অন্তর্গত মাইয়োসিয়ান যুগের মধ্যভাগে সমুদ্রগর্ভ হইতে দেশসমূহের উত্থান আর একবার ঘটে। ইহাতে হিমালয় ও আল্পস্ আরও অধিক উচ্চ হয় এবং রেতময় প্রস্তর নানা স্থলে উত্থিত হয়। ইহাতে টিদীস মহাসাগর ভূমধ্যস্থিত কয়েক সাগরে ও হ্রদে ভিন্ন হইয়া পড়ে। ইহার অধিকাংশ তলদেশ উত্থিত হইয়া নানা দেশ উৎপাদন করে, ইহার অপর অংশগুলি সমুদ্রে মিশ্রিত হইয়া যায় এবং উহাদের উপর আট্লাণ্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগর বহিতেছে।

তৃতীয় মহাযুগের অন্তর্গত প্লিয়োসিয়ান যুগে পৃথিবীর চরম বিপ্লব ঘটে। ইহাতে হিমালয় ও আল্পস্ পর্ব্বত আধুনিক উচ্চতা প্রাপ্ত হয়, টিদীস মহাসাগরের ভূমধ্যস্থিত সাগরগুলি উত্থিত হয় এবং যাহারা ও আরবদেশের মরুভূমি প্রভৃতি সৃষ্ট হয়; কেবল মাত্র ভূমধ্যসাগর বহিয়া যায়। এই যুগে নানাদেশের উত্থান ও পতন বশতঃ আধুনিক পৃথিবীর ভৌগোলিক সংস্থান সম্পূর্ণ হইয়া যায়।

অনেকে অনুমান করেন, টিদীস মহাসাগরের এক বাহু হিমালয়কে

দাক্ষিণাত্য হইতে পৃথক্ করিত। কালক্রমে ইহা শুষ্ক হওয়াতে যে নিম্নতল ক্ষেত্র পড়িয়া থাকে, তাহা গঙ্গাদির পলি পড়িয়া পূর্ণ হয়; তাহাতে ঐ সকল অঞ্চল অত্যুর্ব্বর হইয়াছে।

ভূতত্ত্ব নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি করিতেছে; যথা—

(১) আধুনিক পূর্ব্ব ও পশ্চিম মহাদ্বীপের পরিবর্ত্তে অতি প্রাচীন কালে উত্তর ও দক্ষিণ মহাদ্বীপ ছিল।

(২) উহারা টিদীস্ মহাসাগর দ্বারা বিভিন্ন ছিল। এই মহাসাগরের ভগ্নাবশেষ ভূমধ্যসাগর, কৃষ্ণসাগর, কাস্পীয়ানসাগর, সাহারা মরুভূমি ইত্যাদি।

(৩) আজকাল সুমেরু ও কুমেরু বরফাবৃত ও শীতপ্রধান; প্রাচীন কালে বিষুবরেখার সন্নিকটস্থ দেশগুলি বরফাবৃত ও শীতপ্রধান ছিল। ইহাতে সুমেরু ও কুমেরু অঞ্চলে বসন্ত বিরাজমান ছিল।

(৪) নানাদেশের উত্থান ও পতন বশতঃ ভূপৃষ্ঠের জলভাগ ও স্থলভাগ বিশেষরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

(৫) ভৌতত্ত্বিক তৃতীয় মহাযুগে পৃথিবী আধুনিক আকার ধারণ করে।

থিওসফিমতে ধরিত্রীর পরিবর্ত্তন।

ম্যাডামব্লাভাস্কি নিজ পুস্তকে এতৎ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া যান, এস্থলে তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস দিতেছি। এ সকল কথা জানিলে পুরাণোক্ত অনেক অলীক উপাখ্যান পাঠকবর্গের নিকট সত্য বলিয়া বোধ হইবে।

থিওসফিমতে অতীত যুগে ধরিত্রীর পৃষ্ঠদেশ যেরূপভাবে পরিবর্ত্তিত হয়, তাহাতে পঞ্চ মহাদ্বীপের পূর্ণ নিদর্শন পাওয়া যায়। যথা:—

(১) সুমেরু মহাদ্বীপ।

সুমেরুর চতুঃপার্শ্বস্থ দেশসমূহ। ইহাই সর্ব্বাগ্রে মহাদ্বীপরূপে পরিণত হয়। আজ তুষারাবৃত, তৎকালে চিরবসন্ত বিরাজমান ছিল। ভূমণ্ডলের মেরুদণ্ডের (Axis of the earth) স্থানচ্যুতিবশতঃ সুমেরু ও কুমেরু তুষারাবৃত ও শীতপ্রধান হইয়া গিয়াছে এবং বিষুবরেখা গ্রীষ্মপ্রধান হইয়াছে।

(২) হাইপারবোরা।

আধুনিক এসিয়া ও ইউরোপের উত্তরাংশ। আজ শীতপ্রধান, তৎকালে

চিরবসন্তযুক্ত। উপরোক্ত মহাদ্বীপদ্বয় দেবভূমি বলিয়া খ্যাত। ইহারা বিজ্ঞানোক্ত উত্তর মহাদ্বীপের অংশীভূত।

(৩) লিমুরিয়া।

ম্যাডাগাস্কার হইতে অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এখন ভারত মহাসাগরে নিমগ্ন। ইহা অসুরদিগের বাসভূমি। বিজ্ঞানের মতে অঙ্গারবাহী যুগে এই মহাদেশ গঠিত হয়। ইহা দক্ষিণ মহাদ্বীপের অংশীভূত।

(৪) আট্‌লান্টিস মহাদ্বীপ।

ইহার উত্তরাংশ বিজ্ঞানোক্ত উত্তর মহাদ্বীপের এবং দক্ষিণাংশ দক্ষিণ মহাদ্বীপের অংশীভূত। এ মহাদেশ এখন আট্‌লান্টিক মহাসাগরে নিমগ্ন। ইহা দীর্ঘকায় দৈত্যদিগের বাসভূমি। আটলান্টিস মহাদ্বীপ যে আটলান্টিক মহাসাগরে নিমগ্ন হইয়া যায়। ইহার কিম্বদন্তি সুবিখ্যাত গ্রীক পণ্ডিত মহাত্মা প্লেটো উল্লেখ করিয়া গান।

(৫) জম্বুদ্বীপ।

আধুনিক পৃথিবী, যাহা সকলে চক্ষে দেখিতেছেন ও ভূগোলে পাঠ করেন।

বিজ্ঞান ও থিওসফি পৃথিবীর স্থলভাগের পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে যেরূপ নির্দ্দেশ করে, তাহাই এস্থলে উল্লেখ করা গেল। কিন্তু উঁহারা ইহার জলভাগের পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ করে না। উঁহাদের বিশ্বাস, স্বাদুদক কালক্রমে লবণাক্ত হইয়া নীলাম্বুরাশি হইয়াছে।

হিন্দুশাস্ত্র মতে ধরিত্রীর পরিবর্ত্তন বা সপ্তদ্বীপ ও সপ্ত সাগরের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা।

এ দেশে সকলই পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের নিকট শিক্ষা করে, একে চন্দ্র, দুয়ে পক্ষ, তিনে নেত্র, চতুর্ব্বেদ, পঞ্চবান, ছয়ে ঋতু, সাত সমুদ্র, অষ্টবসু নয়ে নবগ্রহ, দশে দিক। শৈশব কাল হইতে আমাদের মনে বদ্ধমূল হয় যে পৃথিবীতে সাত সমুদ্র আছে। এক জন টোলো পণ্ডিত পুরাণ খুলিয়া চৈতন্য নাড়িয়া বাহু আস্ফালন পূর্ব্বক বলিবেন মেদিনী সপ্তদ্বীপা ও সপ্তসাগরা (অর্থাৎ) ইহাতে সাত সাতটা মহাদ্বীপ আছে এবং একএকটা মহাদ্বীপ এক এক প্রকার সাগরে বেষ্টিত ; যথা :—

মহাদ্বীপের নাম	কিরূপ সাগরে বেষ্টিত।
(১) জম্বুদ্বীপ	লবণ সমুদ্র।
(২) প্লক্ষ	ক্ষীরোদ সাগর।
(৩) শাল্মলী	ইক্ষুরস সমুদ্র।
(৪) কুশ	সুরাসমুদ্র।
(৫) ক্রৌঞ্চ	ঘৃতসমুদ্র।
(৬) শাক	দধিসমুদ্র।
(৭) পুষ্কর	স্বাদূদক সমুদ্র

শাস্ত্রের এই সকল কথা শ্রবণে আমাদের স্বতঃ হাস্যোদ্রেক হয় এবং মনে হয়, ইহারা অলীক পুরাণের অলীক উপকথামাত্র। পৌরাণিকগণ অধিক মাত্রায় গঞ্জিকা সেবন করিয়াই এরূপ অজাগুবি গল্প রচনা করিয়াছেন। কিন্তু বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত ইহাদিগকে সামান্য উপকথা বলিয়া উড়াইবেন না। যদিও ভূতত্ত্ব মোটামুটি নির্দ্দেশ করে, আধুনিক পূর্ব্ব ও পশ্চিম মহাদ্বীপের পরিবর্ত্তে অতি প্রাচীন কালে উত্তর ও দক্ষিণ মহাদ্বীপ ছিল, তথাচ ভূপৃষ্ঠের নানা দেশ যুগে যুগে সমুদ্র হইতে উত্থিত ও উহাতে নিমগ্ন হওয়াতে পৃথিবীর যে কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, কোন্ যুগে ইহা কিরূপ আকার ধারণ করিয়াছে, তাহার প্রকৃত তথ্য এখনও নিরূপিত বা আবিষ্কৃত হয় নাই; সে স্থলে হিন্দুশাস্ত্রের কথা কি একেবারে অমূলক বলিয়া উড়ান উচিত?

মেদিনী সপ্তদ্বীপা বলাতে আমাদের বুঝা উচিত, অতীত ভৌতত্ত্বিক যুগ-সমূহে ভূপৃষ্ঠ ইহার নানা অংশের উত্থান ও পতন বশতঃ নানারূপে পরিবর্ত্তিত হওয়ায় মেদিনী যখন যেরূপ পরিচিত বৃক্ষের বা পক্ষীর আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহাই শাস্ত্রকারেরা রূপকভাবে বর্ণন করিয়াছেন। ইহা আদৌ তাঁহাদের গেঁজেলি বা কল্পনাপ্রসূত নহে। যোগসিদ্ধ মহর্ষিগণ যোগবলেই জগতের এ সকল মহাসত্য অবগত হন। তুমি আমি অস্বীকার করিলে সত্যের অপলাপ হইবে না।

ইহাদের মধ্যে পুষ্কর মহাদ্বীপ, যাহা স্বাদূদক সমুদ্রে বেষ্টিত, তাহা সর্ব্বাগ্রে দেখা দেয়। ইহাই থিওসফিনির্দ্দিষ্ট সুমেরু মহাদ্বীপ। শাকদ্বীপ যাহা দধি সমুদ্রে বেষ্টিত, তাহা থিওসফিনির্দ্দিষ্ট হাইপারবোলার অংশীভূত।

প্লক্ষমহাদ্বীপ, যাহা ক্ষীরোদসাগরে বেষ্টিত, তাহাই লিমুরিয়া মহাদেশ। ক্রৌঞ্চ ও কুশ দ্বীপ বিজ্ঞানোক্ত দক্ষিণ মহাদ্বীপের অংশীভূত। ইহারা কুমেরুর নিকট উত্থিত হয়। শাল্মলী মহাদ্বীপ যাহা ইক্ষুরসসমুদ্রে বেষ্টিত, তাহা আট্‌লাণ্টিস মহাদেশ। জম্বুদ্বীপ যাহা লবণাক্ত নীলাম্বুরাশি দ্বারা বেষ্টিত, তাহা আধুনিক পৃথিবী। ইহা ভৌতত্ত্বিক তৃতীয় যুগে সমুদ্র হইতে উত্থিত হয়।

জম্বুদ্বীপ সকলেই স্বচক্ষে দেখিতেছেন। তবে শাস্ত্রোক্ত আর ছয়টী মহাদ্বীপ কোথায় গেল বা কোথায় আছে? কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলে বুঝা যায়, যুগে ২ পৃথিবী বিপ্লবের পর বিপ্লব অতিক্রম করিতে করিতে যে ২ মহাদ্বীপ গঠন করিয়াছিল, তাহা কালক্রমে ভূগর্ভে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে বা মহাসাগরের তল দেশে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে। ইহাতে অনুমান করা উচিত, আজকাল ভূপৃষ্ঠে যেমন জম্বুদ্বীপ দেখা যায়, পূর্ব্বে ২ যুগে অন্যান্য মহাদ্বীপ ভূপৃষ্ঠে দেখা দিয়াছিল এবং কালপূর্ণ হইলে উহারা সকলে ভূগর্ভে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। অতএব শাস্ত্রকারেরা মেদিনীকে যে সপ্তদ্বীপা বলিতেছেন, তাহা সর্ব্বৈব সত্য। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এখনও উহাদের নিদর্শন পায় নাই বলিয়া শাস্ত্রের কথা অমূলক জ্ঞান করা উচিত নহে। এসকল কথা আবিষ্কৃত হইতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে।

এখন শাস্ত্রোক্ত সপ্তসমুদ্রের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখান কিরূপ হইতে পারে? সর্ব্বপ্রথমে মহাসাগরের জল স্বাদূদক ছিল। এজন্য পুষ্কর বা সুমেরু মহাদ্বীপ স্বাদূদকে বেষ্টিত ছিল। কালক্রমে এই স্বাদূদক লবণাক্ত হইয়া পড়ে; এজন্য জম্বুদ্বীপ বা আধুনিক পৃথিবী লবণাক্ত মহাসাগরে বেষ্টিত; ইহার বর্ণ সচরাচর নীলাভ হইলেও স্থলবিশেষে বর্ণের পার্থক্য দেখা যায়, যেমন লোহিতসাগর, পীতসাগর, কৃষ্ণসাগর ও শ্বেতসাগর। এ সকল স্থলে কীটাণু ও উপাদানের পার্থক্যবশতঃ উহারা বিভিন্ন বর্ণের দেখায়। ইহাতে অনুমান করা উচিত, শাস্ত্রকারেরা বর্ণের ও উপাদানের পার্থক্যবশতঃ রূপকভাবে ক্ষীরোদাদ সাগরের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

অতীত যুগসমূহে ভূপৃষ্ঠের জলীয় তরল অংশ ইহার স্থলভাগের ন্যায় নানারূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এখন সমুদ্রের জলে লবণ (Sodium chloride) অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। অন্যান্য যুগে ইহাতে অন্যান্য লবণ অধিক পরিমাণে

পাওয়া যাইত; সেজন্য ইহার বর্ণও পৃথক ছিল। যে অঙ্গারবাহী যুগে ভূপৃষ্ঠে নানা বৃহৎ ২ পর্ব্বতশ্রেণি সৃষ্ট হয় এবং যাহারা বৃষ্টির জলে ধৌত হইয়া আধুনিক পৃথিবীর মৃত্তিকা গঠন করে, তৎকালে সমুদ্রজলে ক্যালসিয়াম কার্ব্বনেট ও সিলিকেট অধিক পরিমাণে থাকায় উহার বর্ণ শ্বেত ছিল। ইহাই শাস্ত্রোক্ত ক্ষীরোদ ও দধি সমুদ্র। বিজ্ঞান বলে, ভূপৃষ্ঠের তরল জলীয় অংশ লক্ষ ২ বৎসর পূর্ব্বে তরল কার্ব্বনিক এসিডে (Liquified carbonic Acid) পূর্ণ ছিল। ইহার বর্ণ জল হইতে পৃথক, সুরার ন্যায়। ইহাই শাস্ত্রোক্ত সুরাসমুদ্র। সেইরূপ ভূপৃষ্ঠের তরল জলীয় অংশ যখন অধিক পরিমাণে ধাতু-দ্রবের সহিত মিশ্রিত ছিল, তখন ইহা ঘৃতের ন্যায় দেখাইত। ইহাই শাস্ত্রোক্ত ঘৃত সমুদ্র। ক্রৌঞ্চ মহাদ্বীপ ঘৃত দ্বারা ও কুশ মহাদ্বীপ সুরাসমুদ্রদ্বারা বেষ্টিত ছিল। এই দুই মহাদ্বীপ কুমেরুর নিকট উত্থিত হয়। সেইরূপ শাল্মলী মহাদ্বীপ যাহাকে অনেকে আটলান্টিস মনে করেন, তদীয় মহাসাগরের বর্ণ ইক্ষুরসের ন্যায় ছিল, ইহাই পরিশেষে লবণ সমুদ্রে পরিণত হয়।

ভূগর্ভ খনন করিয়া ভারতে যে সকল প্রস্তরফলক পাওয়া গিয়াছে, উহাদের খোদিত চিত্রলিপি পাঠ করিয়া বৌদ্ধপণ্ডিতগণ স্থির করিতেছেন, প্রাচীন কালে প্রশান্ত মহাসাগরে মৌনামে এক বিস্তৃত মহাদ্বীপ ছিল। তথায় সূর্য্যবংশীয় রাজাদের এক বিশাল সাম্রাজ্য ছিল। ১৮০০০ বৎসর হইল ঐ সমগ্র মহাদেশ ভূগর্ভস্থ সংকর্ষণ অগ্ন্যুৎপাতে একেবারে জলমগ্ন হইয়া যায় এবং তদুপরি প্রশান্ত মহাসাগর বহমান হয়। বোধ হয় এই মহাদেশ থিওসফিপ্রোক্ত হাইপারবোলার অংশীভূত ছিল।

যে পৃথিবীর ব্যাস ৮০০০ মাইল, উহার অভ্যন্তর কিরূপ তরল ও কঠিন পদার্থে পূর্ণ, তাহা এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। তবে কেন আমরা জম্বুদ্বীপ ব্যতীত অন্যান্য মহাদ্বীপ নিজ ২ সাগরের সহিত ভূগর্ভে মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছে, এ কথায় অবিশ্বাস করিব? বেশ জানিবে, মেদিনী সপ্তদ্বীপা ও সপ্তসাগরা নির্দ্দেশ করাতে হিন্দুশাস্ত্র আমাদের নিকট জগতের এক অমোঘ সত্য প্রচার করিতেছে। আমরা কেবল নিজ বুদ্ধির দোষে শাস্ত্রের কথা বুঝিতে পারি না ও গেঁজেলি মনে করি।

মানবসৃষ্টি।

যে মানব আজ সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর, তিনি কোন্ যুগে কোন্ অবস্থায় প্রথম উদ্ভূত হন, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। এতদর্থে অসাধারণ অনুসন্ধান ও পর্য্যবেক্ষণের গুণে ভূতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, প্রভৃতি নানা বিজ্ঞানশাস্ত্র অনুশীলন করিয়া মানবতত্ত্ব (Anthropology) বিরচিত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ বিষয়ে এখনও মানবতত্ত্ব সর্ব্ববাদিসম্মত যথার্থ মত প্রকাশ করিতে পারে নাই।

খৃষ্টধর্ম্ম বলে, আদাম ও ঈভ মানবজাতির আদিপুরুষ এবং ছয় সহস্র বৎসর হইল, ঈশ্বর সৃষ্টিকালে উহাদিগকে নিজের প্রতিমূর্ত্তি অনুসারে সৃজন করেন। এ ধর্ম্ম এক কথায় সব গোলযোগ মিটাইয়া দিয়াছে। সুকুমারমতি বালক বালিকাগণ উপরোক্ত সামান্য উপকথায় বিশ্বাস করিতে পারে। কিন্তু বিবর্ত্তবাদী বিজ্ঞান এ কথায় হাস্য সম্বরণ করিতে পারে না।

সকল দেশের জনসাধারণের বিশ্বাস, পরমপিতা পরমেশ্বর পৃথিবীর যাবতীয় উদ্ভিজ্জ, জীবজন্তু ও মানবজাতি স্বতন্ত্রভাবে সৃজন করিয়াছেন। এ কথার উপরও বিজ্ঞান যথেষ্ট উপহাস করে। একজন কুম্ভকার যেমন মৃত্তিকা লইয়া ঘটাদি নির্ম্মাণ করে, সেইরূপ কি ঈশ্বর এ জগতে বসিয়া বিবিধ উপাদান লইয়া এক এক জাতির স্ত্রীপুরুষ গঠন করিয়া সংসার প্রবর্ত্তন করেন? বিজ্ঞান বলে, ইহা অপেক্ষা অজ্ঞতার কথা, মূর্খতার কথা আর কি হইতে পারে? এ সকল উপকথা জ্ঞানজগতে আর শোভা পায় না। বিংশশতাব্দীর এমন অত্যুজ্জ্বল আলোকের মধ্যে মূর্খ লোকেরাই ঐ সকল উপকথায় বিশ্বাস করিবে মাত্র।

বিজ্ঞানের মতে জীবজগতের ললামভূত মানব নিকৃষ্ট জন্তুর ক্রমবিবর্ত্তনে বিবর্ত্তিত হইয়া এ জগতে আবির্ভূত হন এবং লক্ষ লক্ষ বৎসর ব্যাপিয়া পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তন অতিক্রম করিতে করিতে আধুনিক আকার ধারণ করেন। ইহার স্থির সিদ্ধান্ত এই, পৃথিবী জীবজন্তুদিগের বসবাসের উপযুক্ত হইলে প্রথমে অমেরুদণ্ডীয় জীবসমূহ (Invertebrata) দেখা দেয়। ইহারা উচ্চ ও নিম্ন সিলুরিয়ান যুগে উৎপন্ন হয়। ইহাদের কতকগুলি বংশধর ডিভোনিয়ান যুগে মহামৎস্যজাতিতে পরিণত হয়। অঙ্গারবাহী যুগে মহামৎস্যজাতির কতকগুলি বংশধর মহাকূর্ম্মজাতিতে বিবর্ত্তিত হয়। উচ্চ ও নিম্ন

ক্রীটেসাস যুগে মহাকূর্ম্ম হইতে মহাসর্প ও পতত্রবিশিষ্ট গোধা উৎপন্ন হয়। ভৌতাত্ত্বিক তৃতীয় যুগে বৃহদাকার স্তন্যপায়ী জীবসমূহ দেখা দেয়। চতুর্থ যুগে বানর ও মানবাদি উৎপন্ন হয় এবং বৃহদাকার জীবজন্তুগণ লয় প্রাপ্ত হয়।

বিজ্ঞান বলে, স্তন্যপায়ী বানরজাতির কতকগুলি বংশধর কালক্রমে বিবর্দ্ধিত হইয়া বনমানুষের ন্যায় একপ্রকার জীব উৎপাদন করে। উহাদেরই বংশে আধুনিক মানবজাতি উদ্ভূত হয়। বৃক্ষশাখারূঢ় বানর তাঁহার পিতামহ। কিন্তু তাঁহার পিতা বহুপূর্ব্বে পৃথিবী হইতে চির বিদায় লইয়া যান। ভূধরশায়ী কঙ্কালরাশি পর্য্যালোচনা করিয়া এখনও তাঁহার পিতার নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। এই প্রকারে বিজ্ঞান সিদ্ধান্ত করে, মানব অধমাধম বানর হইতে সমুৎপন্ন। পাশ্চাত্য জগতে ডার্ব্বিনপ্রমুখ পণ্ডিতগণ এই হাস্যোদ্দীপক মত প্রচার করিতেছেন। ইহাতে তাঁহারা দেখান, নিকৃষ্ট জীবোৎপন্ন বর্ব্বর মানব কি প্রকারে জ্ঞানানুশীলন করিতে করিতে এ জগতে এত শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

ওহে ডার্ব্বিন প্রমুখ পণ্ডিতগণ! আপনারা আজ জ্ঞানজগতের অধীশ্বর। আপনাদের সিদ্ধান্ত সমগ্র জগৎ নতশিরে গ্রহণ করিবে। মানবের স্থূলদেহ সম্বন্ধে জীবজগৎ হইতে যে সকল প্রমাণাদি লইয়া আপনারা ঐরূপ অপরূপ সিদ্ধান্ত করিতেছেন, তাহা অনেক স্থলে অখণ্ডনীয় হইলেও কয়েকটী যৎসামান্য কথা স্মরণ রাখা উচিত।

(১) জীবজগতে যাবতীয় জীবের গঠনপদ্ধতি একরূপ বলিয়া বানর ও মানবের ভিতর এত সৌসাদৃশ্য দেখা যায়।

(২) মানবমনটী কদাচ নিকৃষ্টজীবোৎপন্ন হইতে পারে না। এতৎসম্বন্ধে উহাদের ভিতর বিস্তর পার্থক্য আছে।

(৩) কেবল স্থূলদেহ লইয়া মানব গঠিত নহে। তাঁহার আত্মা আছে এবং তিনি আধ্যাত্মিক শক্তিতে বিভূষিত। কোন নিকৃষ্ট জন্তুর এ শক্তি নাই। এজন্য তিনি যাবতীয় ইতর জন্তু হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্।

অতএব বলা উচিত, যে বিজ্ঞান কেবলমাত্র মানবের স্থূলদেহ পর্য্যালোচনা করিয়া ঐরূপ অপরূপ সিদ্ধান্ত করে, তাহা ঐকদেশীক সত্য মাত্র এবং তাহা কালে খণ্ডিত হইবে।

এখন থিওসফি ও হিন্দুশাস্ত্র একাসনে বসিয়া বিজ্ঞানের ঐ অপরূপ মতের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে। উহারা স্পষ্ট নির্দ্দেশ করে, আধুনিক মানবজাতি নিকৃষ্ট জীবোৎপন্ন হওয়া দূরে থাকুক, পূর্ণ আধ্যাত্মিকশক্তিসম্পন্ন দেবযোনি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া বহুকাল দীর্ঘকায় দৈত্যাসুররূপে বিচরণ করিবার পর কালক্রমে এ জগতে জ্ঞানশক্তিসম্পন্ন বামনরূপে আধুনিক মানবাকারে দেখা দেয়। এখন থিওসফির মতামত অনুসরণ করিতেছি।

ইহার মতে মানব একমূর্ত্তি হইলেও বস্তুতঃ তিনি ত্রিমূর্ত্তিধারী। (Truine)। আত্মা, মন ও স্থূলদেহ এই তিন মূর্ত্তি একাধারে মিলিত হইয়া তাঁহাকে গঠন করে। এই ত্রিমূর্ত্তির বিবিধ বিবর্ত্তন ও পরিবর্ত্তন বশতঃ তিনি আধুনিক আকারে এজগতে দেখা দিয়াছেন। বিজ্ঞান যেমন নির্দ্দেশ করে, তাঁহার বাহ্য স্থূল দেহ কালবশাৎ নানারূপে বিবর্ত্তিত হইয়া উৎপন্ন, সেইরূপ আধ্যাত্মবিজ্ঞানও স্পষ্ট নির্দ্দেশ করে, তাঁহার আত্মা ও মন এই দুই অভ্যন্তরীন সূক্ষ্ম মূর্ত্তিতেও কালক্রমে অনেক বিবর্ত্তন ও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ইহার মতে যুগধর্ম্মে তদীয় আত্মার আধ্যাত্মিক শক্তির যেমন অপকর্ষ, অবনতি বা সঙ্কোচন ঘটে, তেমনি মনও জ্ঞানশক্তির উৎকর্ষ বা ক্রমোন্নতি লাভ করে। তাঁহার বাহ্যস্থূলদেহ কালশাৎ যে পরিমাণে অঙ্গসৌষ্টব ও সৌন্দর্য্য লাভ করে, সেই পরিমাণে তদীয় মনের জ্ঞানশক্তি ক্রমশঃ স্ফুরিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়; কিন্তু সেই সঙ্গে আত্মার আধ্যাত্মিক শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস পায়। আত্মার এই অবনতি বা পতন বশতঃ চতুষ্পাদ ধর্ম্ম এ কলিযুগে একপাদে পরিণত এবং জ্ঞানশক্তির ক্রমোন্নতি বশতঃ কৃত্রিম সভ্যতাস্রোত জগতে বর্দ্ধনশীল।

ইতিপূর্ব্বে স্থূলসূক্ষ্মের তারতম্য লইয়া পৃথিবীসম্বন্ধে যে সপ্ত লোক উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতে সপ্ত জীবপ্রবাহ (Rounds) ধারাবাহিকরূপে প্রবর্ত্তিত হয় এবং এক ২ জীবপ্রবাহ প্রত্যেক কল্পে দেখা দেয়। ঐ সপ্ত লোকের মধ্যে আধুনিক স্থূল পৃথিবী চতুর্থ। এখন চতুর্থ বরাহকল্প চলিতেছে এবং পৃথিবীতে চতুর্থ জীবপ্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছে। প্রত্যেক জীবপ্রবাহে বা কল্পে সপ্ত মূলজাতি সমুৎপন্ন হয় এবং এক ২ মূলজাতি আবার সপ্ত শাখাজাতিতে বিভক্ত হইয়া থাকে।

প্রত্যেক মূলজাতি প্রত্যেক মন্বন্তরে দেখা দেয়। দুই মনুর আবির্ভাবের

মধ্যবর্ত্তী অন্তকাল বা ব্যবহিত কালকে মন্বন্তর বলে। এজন্য এখন সপ্তম মনুর অধিকার সত্ত্বেও চতুর্থ জীবপ্রবাহ চলিতেছে। এস্থলে হিন্দুশাস্ত্রোক্ত মন্বন্তর ও কল্পের সহিত বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত মন্বন্তর ও কল্পের অনেক প্রভেদ দেখা যায়।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেন :—

মহর্ষয়ঃ সপ্তপূর্ব্বে চত্বারো মনবস্তথা মদ্ভাবা
মানসাজ্জাতা যেষাং লোকা ইমে প্রজাঃ।

(গীতা)

"প্রথমে ভৃগু আদি সপ্ত ঋষি ও চারিজন মনু আমার মানস পুত্র হইয়া আমার প্রভাব বশতঃ এই সকল লোক ও এই সকল প্রজা সৃষ্টি করেন।" এস্থলে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ কেন সাত জন মনুর পরিবর্ত্তে ৪জন মনুর কথা লিখিলেন? পৃথিবীতে এখন চতুর্থ জীবপ্রবাহ চলিতেছে, সেজন্য তিনি ৪ জন মনুর কথা উল্লেখ করেন। এক ২ মনু দ্বারা এক ২ জীবপ্রবাহ বুঝা উচিত।

ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, অতীত ভৌতত্ত্বিক যুগসমূহে এই পৃথিবী সুমেরু, হাইপারবোরা, লিমুরিয়া, আট্‌লাণ্টিস ও জম্বুদ্বীপ এই পঞ্চ মহাদ্বীপে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে। এক ২ মহাদ্বীপে এক ২ মূলজাতি এক ২ মন্বন্তরে আবির্ভূত হইয়া সাংসারিক লীলাপ্রদর্শন করে এবং উহাদের কাল পূর্ণ হইলে ভূগর্ভস্থ সংকর্ষণাদি অগ্নিসংযোগে দগ্ধ হইয়া বা খণ্ডপ্রলয়ে সমগ্র দেশ সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন হইয়া উহারা মহাদ্বীপের সহিত কালগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। এখনও উহাদের প্রকৃত স্থায়ী নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। ভূতত্ত্ব এখনও সমুদ্রের তলদেশ পর্য্যালোচনা করিতে সক্ষম হয় নাই।

উপরোক্ত পঞ্চমূল জাতির মধ্যে প্রথম দুই জাতিতে দৈবী প্রকৃতি অধিক পরিমাণে ও মানবী প্রকৃতি অত্যল্প ভাবে স্ফুরিত হইয়াছিল এবং শেষোক্ত তিন জাতিতে দৈবীপ্রকৃতি ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া মানবী প্রকৃতি বলবতী হইয়াছে। প্রথম দুই জাতি হিন্দুশাস্ত্রোক্ত সত্যযুগের মানব, দেহ একবিংশতিহস্ত পরিমিত, প্রাণ মজ্জাগত, আধ্যাত্মিক শক্তি পূর্ণভাবে বিকসিত। ইহারা অযোনিসম্ভব। ইহাদের দেহের মেদ, মাংস, অস্থি প্রভৃতি সপ্ত ধাতু কিরূপ স্ফুরিত ছিল, তাহা আমরা অবগত নহি।

থিওসফিমতে চন্দ্রলোকের তেজ পৃথিবীতে সংক্রামিত হইলে ইহা নববাল

বলীয়ান হয় এবং চন্দ্রলোকস্থ পিতৃগণ প্রকৃত মানব সৃষ্টি করেন। প্রথম কল্পে তাঁহাদেরই ছায়া হইতে সূক্ষ্মরূপধারী দেবমানব সমুৎপন্ন হয় এবং ইহাদিগকে আধুনিক ত্রিমূর্ত্তিধারী মানবের অভ্যন্তরীণ সূক্ষ্মরূপ জ্ঞান করা উচিত। এই সূক্ষ্মরূপ বিগত কয়েক কল্পে বিবর্ত্তিত হইতে ২ প্রপঞ্চীকৃত হইয়া আধুনিক স্থূলকায়বিশিষ্ট মানবে পরিণত হয়।

এ পৃথিবীর প্রথম মূল জাতি যাঁহারা সত্যযুগে একবিংশতিহস্তপরিমিত দেহ ধারণ করিয়া সৃষ্ট হন, তাঁহারা সুমেরু মহাদ্বীপে বিচরণ করেন। আজ সুমেরু মহাদ্বীপ চিরবরফাবৃত, ছয় মাস ধরিয়া আলোকে ও অন্ধকারে পূর্ণ। তৎকালে ইহাতে, চিরবসন্ত বিরাজমান ও পারিজাতপুষ্পালঙ্কৃত নন্দন কাননে সুশোভিত ছিল। ভূতত্ত্ব বলে, পুরাকালে বিষুবরেখার সমীপস্থ দেশগুলি এইরূপ তুষারাবৃত ছিল। ভূমণ্ডলের মেরুদণ্ডের স্থানচ্যুতি বশতঃ এখন সুমেরু ও কুমেরু চিরতুষারাবৃত হইয়াছে। যখন সুমেরু মহাদেশ ভালরূপ আবিষ্কৃত হইবে, তখন প্রথম মূলজাতির পূর্ণ নিদর্শন পাওয়া যাইবে। মেক্সিকোদেশে একবিংশতিহস্তপরিমিত মানবদেহের কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে।

এই সুমেরু মহাদেশই প্রকৃত দেবভূমি। কি ভারত, কি গ্রীশ, কি রোম, কি মিসর, সকল দেশের কিম্বদন্তি এই যে, দেবভূমি উত্তরে। আজ ভারতের কবিগণ-হিমালয়কে ইহার দেবভূমি স্থির করেন এবং যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ হিমালয়ের উপর দিয়া গমন বর্ণনা করেন; কিন্তু সুমেরু মহাদ্বীপই সকলের দেবভূমি। এস্থলে চতুষ্পাদধর্ম্মবিশিষ্ট মানব প্রথম আবির্ভূত হন। খৃষ্টধর্ম্ম মতে ইহাই ইডেন গারডেন। পণ্ডিতবর তিলক মহোদয় বেদ হইতে সপ্রমাণ করেন সুমেরু মহাদেশ আর্য্যজাতির পূর্ব্বপুরুষদিগের আদিম বাসস্থান। ইহাতে তিনি জগতের এক মহাসত্য আবিষ্কার করিয়া যান।

দ্বিতীয় মূলজাতি দ্বিতীয় মন্বন্তরে হাইপারবোলা মহাদ্বীপে আবির্ভূত হয়। এই হাইপারবোলামহাদ্বীপ আধুনিক এসিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার উত্তরাংশ অধিকার করিয়াছিল। বিজ্ঞানের মতে ইহাই উত্তর মহাদ্বীপ, যাহা দক্ষিণ মহাদ্বীপ হইতে টিদীস মহাসাগর দ্বারা বিভিন্ন ছিল। তৎকালে ইহাতে চিরবসন্ত বিরাজমান ছিল। তাহার সাক্ষ্য, এখনও সাইবিরিয়া দেশে বরফরাশির নিম্নে মহাহস্তী, মহাঘোটকাদির অস্থিপঞ্জর যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। এই

দ্বিতীয় মূলজাতি অযোনিসম্ভব, দীর্ঘকায় ও দীর্ঘায়ু ছিল। ইহারাও শাস্ত্রোক্ত সত্য যুগের চতুষ্পাদধর্মবিশিষ্ট মানব। ইহাদের বাহ্যদেহ সম্বন্ধে আমরা কিছুই অবগত নহি। ইহারা ত্রিনয়নবিশিষ্ট। ইহাদের যোগবল সহজাত ছিল। অযোনিসম্ভব হইলেও ইহাদের লোকসংখ্যাবৃদ্ধি অন্য প্রকারে ঘটিত। ইহারা শাস্ত্রে দেবমানব নামে খ্যাত, তৃতীয় মূলজাতি যাহারা লিমুরিয়া মহাদেশে আবির্ভূত হয়, জ্ঞানশাস্ত্রে অসুর নামে খ্যাত। লিমুরিয়া মহাদেশ বিজ্ঞানোক্ত দক্ষিণে মহাদ্বীপের অন্তর্গত এবং ম্যাডাগাস্কার হইতে অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আধুনিক পৃথিবীর যে স্থলে ভারত মহাসাগর উত্তাল তরঙ্গে বহমান, তথায় ত্রেতাযুগেলিমুরিয়া মহাদেশ বর্ত্তমান ছিল। ইহার অধিবাসীগণ চতুর্দ্দশহস্তপরিমিত দেহ ধারণ করিয়া তদানীন্তন পৃথিবীতে সাংসারিক লীলা প্রদর্শন করিয়া যায়। ইহাদের স্থায়ী চিহ্ন এখন ভারতমহাসাগরের তলদেশে।

এই তৃতীয় মূলজাতিতে জ্ঞানশক্তির আধার মানব মন সর্ব্বপ্রথম সৃষ্ট হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় মূলজাতি পূর্ণ আধাত্মিক শক্তিতে বিভূষিত হইলেও উহারা মনশূন্য ও জ্ঞানশক্তি রহিত ছিল। উহাদের ক্রিয়াকলাপ এখন আমরা বুঝিতে পারি না। মানবমনসৃষ্টিবিষয়ে শাস্ত্রে একটি অদ্ভুত উপাখ্যান পাওয়া যায়। যখন দেবরূপী মনুপুত্রগণ জগতে বিচরণ করেন, তৎকালে সূর্য্য-লোকস্থ অগ্নিসত্ত্ব পিতৃগণ, সনকাদি কুমারগণ, নারদাদি দেবগণ মানবমন সৃষ্টি করিয়া প্রজা বৃদ্ধি করিতে আদিষ্ট হন। কিন্তু তাঁহারা সকলে অস্বীকার করাতে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার অভিসম্পাতে পতিত হন। ইহাতে তাঁহারা সকলে শাঁপভ্রষ্ট হইয়া মর্ত্ত্যে আগমন করিতে বাধ্য হন। যখন তৃতীয় মূলজাতির বাহ্য দেহ বিভিন্ন চর্ম্মাবরণে (coats skin) আবৃত হইয়া কথঞ্চিৎ সুন্দর হইতে থাকে এবং সেই সঙ্গে মনের যন্ত্র মস্তিষ্ক ও অন্যাধিক স্ফুরিত হয়, তখন উপরোক্ত দেবগণ মানবমন সৃষ্টি করিয়া প্রজা বৃদ্ধি করেন।

মানবমন সৃষ্টি হইলে ইহাতে জ্ঞানশক্তির উন্মেষ আরম্ভ হয় এবং সেই সঙ্গে আধ্যাত্মিকতা হ্রাসের সূত্রপাত হয়। বাইবেল মতে জ্ঞানবৃক্ষের ফলাস্বাদনে সমগ্র মানবজাতির যে পতন উল্লিখিত আছে, তাহাতেও মানবের জ্ঞানশক্তির উন্মেষ ও আধ্যাত্মিক অধঃপতন জানায়। দুঃখের বিষয়, এ সকল কথার কোনরূপ বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই। অনেকে মনে করেন, ইহারা ধর্ম্ম

শাস্ত্রের প্রলাপ বা বুজরুকি মাত্র। কিন্তু যোগসিদ্ধ মহাত্মাগণ যোগবলেই জগতের এ সকল মহাসত্য অবগত হন। সকল ধর্ম্ম শাস্ত্রেই ইহাদের কিছু না কিছু উল্লেখ আছে। হিন্দু শাস্ত্রও বলে, স্বর্গের দেবগণ শাঁপভ্রষ্ট হইয়া মর্ত্তে জন্ম লন।

তৃতীয় মূলজাতি কিম্ভুত কিমাকার অসুররূপী। হিন্দুশাস্ত্রও অসুরদিগের অতীব কদাকার রূপ বর্ণন করে। কিন্তু এই জাতি হইতে বাহ্য স্থূলদেহে অঙ্গ-সৌষ্ঠব প্রকাশ পাইতে আরম্ভ হয়। এ জাতি ত্রিনয়ন বিশিষ্ট, ইহাদের যোগ-বল সহজাত। ঐ জাতি প্রথমে উভলিঙ্গ ছিল। ইহাদের উভয় প্রকার জন-নেন্দ্রিয় একাধারে মিলিত ছিল। বস্তিদেশে জরায়ু ও বক্ষোদেশে স্তনদ্বয় সমধিক স্ফুরিত ছিল। সকলেই সন্তান প্রসব করিত এবং স্তন দুগ্ধ দ্বারা উহার লালন পালন করিত। পরে প্রকৃতির পরিণাম বশতঃ এই মূলজাতির চতুর্থ শাখাজাতি একলিঙ্গ হইয়া আধুনিক মানবের ন্যায় স্ত্রী পুরুষে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এই স্থলেই জগতে মৈথুন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন আরম্ভ হয়।

এই দীর্ঘকায় অসুর জাতি হইতে আধুনিক বামনরূপী মানব উদ্ভূত হন। বিজ্ঞাননির্দ্দিষ্ট বৃক্ষশাখারূঢ় বানর তাঁহার পিতামহ নহে। কিন্তু এই চতুর্দ্দশহস্তদেহধারী দীর্ঘকায় অসুরগণ যাহারা লিমুরিয়া মহাদেশে আবির্ভূত হইয়া স্ত্রীপুরুষে বিভক্ত হইয়া আধুনিক মৈথুন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করে, তাহারাই আমাদের যথার্থ পিতামহ। লিঙ্গভেদের পর এ জাতিতে জ্ঞানশক্তি ও কামপ্রবৃত্তি ক্রমশঃ স্ফুরিত হইতে থাকে এবং সেই সঙ্গে আধ্যাত্মিক অধঃপতন ঘটিতে আরম্ভ হয়। এ কারণ সকল ধর্ম্ম শাস্ত্রে দেখা যায়, স্ত্রীজাতি উদ্ভবের সঙ্গে মানবের জাতীয় অধঃ-পতন ঘটে এবং খৃষ্টধর্ম্মও ঈভকে দিয়া আদামের পতন ঘটায়। পতন কি প্রকারে ঘটে? জ্ঞানবৃক্ষের ফল আস্বাদন করিয়া সমগ্র মানবজাতির পতন ঘটে ও সংসারে বিবিধ শোকতাপ প্রবেশ করে। জ্ঞান বৃক্ষ আর কিছুই নয়, উহা দ্বারা কেবল মানবমনে জ্ঞানশক্তির উন্মেষ বুঝায়। সকলেই এ কথা জানে, কিন্তু কেহই ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝে না।

চতুর্থ মূলজাতি চতুর্থ মন্বন্তরে আটলান্টিক মহাদ্বীপে আবির্ভূত হয়। ইহারা শাস্ত্রে দৈত্য নামে খ্যাত এবং সৃষ্টির দ্বাপর যুগে উদ্ভূত বোধ হয়। হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু, প্রহ্লাদ, বলি প্রভৃতি যে সকল দৈত্য রাজের কথা শাস্ত্রে পাওয়া

যায়, উহারা সকলে উক্ত মহাদ্বীপ বাসী। জম্বুদ্বীপবাসী আধুনিক মানবের তুলনায় উহারা দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ ও দীর্ঘজীবী ছিল; কিন্তু তত্দূর সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ছিল না। যেমন লোকে শিব গড়িতে গিয়া বানর গড়িয়া ফেলে, সেইরূপ প্রকৃতিদেবীও আধুনিক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মানব গড়িবার পূর্ব্বে নানা কিম্ভূতকিমাকার মূর্ত্তি গড়েন ও ভাঙ্গেন। উহাদের মধ্যে শাস্ত্রোক্ত অসুর, দৈত্য, দানব ও রাক্ষসাদি গণনীয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ উহাদিগকে ভারতের বর্ব্বর আদিম নিবাসী মনে করিতে পারেন; কিন্তু তাঁহাদের কথা কতদূর যুক্তিসঙ্গত, তাহা কালে নির্ণীত হইবে।

এই চতুর্থ জাতি জগতে বাক্যকথন ভাষা প্রস্ফুরিত করে, এজন্য আদিম ভাষাকে রাক্ষসী ভাষা বলে। ইহারা সভ্যদেশোচিত শিল্পাদি প্রচলিত করিয়া সভ্যতা-সোপানে আরূঢ় হয়। এজন্য শাস্ত্রকারেরা যুধিষ্ঠির মহারাজার রাজসূয়যজ্ঞের অলৌকিক সভাগৃহ ময়দানব কর্ত্তৃক বিরচিত বলিয়া বর্ণন করিতেছেন। এই জাতি কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধন করিয়া আধুনিক গোধুমাদির ব্যবহার প্রচলিত করে। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ ঋকবেদাদি প্রাচীন গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করিয়া যে সভ্যতার নিদর্শন পান, তাহা পূর্ব্বতন যুগের সভ্যতার ভগ্নাবশেষ মাত্র। প্রাকৃতিক মহাবিপ্লব বা ভৌতত্ত্বিক খণ্ড-প্রলয় দ্বারা আটলাণ্টিস মহাদ্বীপ সমগ্র অধিবাসীগণের সহিত আটলাণ্টিক মহাসাগরে নিমগ্ন হইয় যায়। হিন্দুশাস্ত্রও দৈত্যরাজ বলিকে চিরদিনের জন্ত পাতালে নিবদ্ধ রাখে। শুনিতে পাই, বলিরাজার পুরী আটলাণ্টিক মহাসাগরের তলদেশে অবস্থিত। এই প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা বশতঃ পূর্ব্বতন যুগের সভ্যতার পূর্ণ নিদর্শন এখনও পাওয়া যায় না।

আধুনিক মানবজাতি পৃথিবীর পঞ্চম মূলজাতি এবং বহুকাল হইতে চলিত, এ জাতি পৃথ্বীতলে আবির্ভূত হইয়াছে। ইহারা বৈবস্বত মনুবংশীয় বা আদীমজাতীয় (Adamic race)। ইহারা পূর্ব্ব-পুরুষদিগের তুলনায় খর্ব্বাকায়, অথচ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। প্রকৃতির পরিণাম বশতঃ ইহাদের দেহ খর্ব্বাকৃতি ধারণ করে, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গ সৌন্দর্য্যশালী হয়। ইহাদের আয়ুর্ব্বলও অল্প; কিন্তু জ্ঞানশক্তি অধিক স্ফুরিত হওয়ায় ইহারা বিশেষ চতুর ও চপল। ইহাদের আধিভৌতিক উন্নতি যে পরিমাণে বর্দ্ধিত হইতেছে, আধ্যাত্মিকতাও সেই পরিমাণে হ্রাস পাইতেছে। ককেসিয়ান মঙ্গোলিয়ান কাফরী, এসকিউমো প্রভৃতি যে সপ্ত

শাখা জাতি এখন পৃথিবীতে দেখা যায়, তন্মধ্যে আর্য্যজাতি সর্ব্বপ্রধান। ইহাদের বংশাবলি জম্বুদ্বীপের অধিকাংশ স্থল ক্রমশঃ অধিকার করিতেছে। ইহারা কত কাল ধরিয়া নানা দেশে জ্ঞানানুশীলন করিতে করিতে ক্রমশঃ সভ্যতা পথে অগ্রসর হইতেছে, তাহা এখন ভালরূপ সপ্রমাণিত হয় নাই।

ইহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সুমেরুমহাদ্বীপবাসী। পৃথিবীর মেরুদণ্ডের স্থানচ্যুতি বশতঃ ঐ মহাদেশ শীত প্রধান হইয়া চিরতুষারাবৃত হইয়া পড়ে। ইহাতে আর্য্য জাতির বংশধরেরা ক্রমশঃ দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইতে থাকে। এসিয়া ও ইউরোপের অধিকাংশ ভাগ শীতপ্রধান হইয়া অনুর্ব্বর হইলে উহারা আরও দক্ষিণদিকে অগ্রসর হয়। এই প্রকারে উহারা ভারত, পারস্য গ্রীশ, রোম প্রভৃতি নানা জনপদবর্গে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া স্বরাজ ও স্বধর্ম্ম বিস্তার করে।

আঠার হাজার বৎসর হইল যে মৌ মহাদ্বীপ অধিবাসীগণের সহিত একদিনে প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তরাংশে নিমগ্ন হইয়া যায়, তথায় মঙ্গোলিয়ান জাতি বাস করিত। উহারাও জ্ঞানানুশীলন করিতে করিতে অপূর্ব্ব সভ্যতা লাভ করিয়াছিল।

পরিশেষে বক্তব্য, যে বিজ্ঞানের স্থিরসিদ্ধান্ত এই যে, ভৌতত্ত্বিক তৃতীয় যুগে (Tertiary Period) পৃথিবী আধুনিক আকার ধারণ করিলে পর চতুর্থ যুগে (Quartan Period) মানবজাতি অতি বর্ব্বর অবস্থায় এ জগতে আবির্ভূত হয়। সে বিজ্ঞান পাঠ করিয়া অনেকে থিওসফি ও হিন্দুশাস্ত্রের কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন। কিন্তু পুরাকালের সকল সভ্য জাতির পুরাণ-কাহিনী সাক্ষ্য দেয়, আধুনিক মানব জাতির পূর্ব্বে দেবাসুরগণ পৃথ্বীতলে বিচরণ করিয়া গিয়াছে। এখন বিজ্ঞানের কথা সত্য, না শাস্ত্রের কথা সত্য, তাহা কালে মীমাংসিত হইবে। যত দিন না আটলাণ্টিক মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশ ভালরূপ পরীক্ষিত হইতেছে, ততদিন ও সকল কথার সত্যতা সপ্রমাণিত হইবে না।

জগতে মৈথুন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন।

অনেকের ধারণা, সৃষ্টিরক্ষাহেতু সকল জীবজন্তুর ভিতর মৈথুনধর্ম্ম সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে চলিয়া আসিতেছে। এই রূপে সন্তান উৎপন্ন হওয়ায় সৃষ্টিরক্ষা হইতেছে। আবার শাস্ত্রপাঠে অবগত হওয়া যায়, পুরাকালে

অযোনিসম্ভব মানব ও মানবী উৎপন্ন হইত। শাস্ত্রের এ কথা অনেকে গেঁজেলি বলিয়া উড়ান। শাস্ত্র যে আদৌ অমূলক নহে, তাহা দেখাইবার জন্য এ প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম।

সৃষ্টিরক্ষাহেতু সন্তানোৎপত্তি-প্রথা সংসারে নানাবিধ। তন্মধ্যে সাধারণতঃ চারি প্রকার পদ্ধতি দেখা যায় যথাঃ—

(১) মিশ্র সংযোগ।

স্ত্রীপুরুষের সঙ্গম বশতঃ—

(Sexual intercourse)

(২) অমিশ্র সংযোগ।

স্ত্রীপুরুষের সঙ্গম ব্যতীত

(Without sexual intercourse)

(৩) মুকুল জন্ম

(Budding or gemmation)

(৪) বিভাগ করণ

(Division)

প্রথম পদ্ধতি জীবজগতে যাবতীয় উচ্চজাতীয় প্রাণীদিগের ভিতর দৃষ্ট হয়। যাহাদের ভিতর স্ত্রীপুরুষ ভিন্ন, তাহাদের সঙ্গম ব্যতীত স্ত্র্যণু (ovum) ও পুমণুর (Spermatoza) সংযোগ ঘটে না ও সন্তান উৎপন্ন হয় না। সরীসৃপ, পক্ষীজাতি ও স্তন্যপায়ী জীবদিগের ভিতর এই প্রথা বা মৈথুন ধর্ম্ম বহু কাল হইতে চলিতেছে। উহাদের সঙ্গমার্থ স্ত্রীপুরুষ উভয়ের মনে কামপ্রবৃত্তি সম্যক স্ফুরিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি জীবজগতে উভলিঙ্গ জীবদিগের ভিতর দৃষ্ট হয়। যাহাদের স্ত্রীপুরুষ আদৌ বিভক্ত হয় নাই, যাহাদের দুই প্রকার জননেন্দ্রিয় একাধারে মিলিত থাকে, তাহারা উভলিঙ্গ, স্ত্রীপুরুষের সঙ্গম ব্যতীত তাহাদের সন্তানোৎপত্তি হয়। এ সকল স্থলে প্রকৃতি স্বয়ং ইন্দ্রিয়-দ্বয়ের মিলন ঘটাইয়া বা স্ত্র্যণু ও পুমণুর শরীরাভ্যন্তরে সংযোগ ঘটাইয়া সন্তান উৎপাদন করে। মেরুদণ্ডীয় জীবদিগের ভিতর অধিকাংশ মৎস্যজাতি এবং অমেরুদণ্ডীয় জীবদিগের ভিতর অধিকাংশ উভলিঙ্গ।

তৃতীয় প্রথা-পুরুভুজ, স্পঞ্জ, প্রবাল প্রভৃতি জীবজগতে অতি নিকৃষ্ট জাতীয় জীবদিগের ভিতর দৃষ্ট হয়। উহাদের দেহের স্থলবিশেষ স্ফীত হইয়া মুকুলের ন্যায় হয়, পরে উহা দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নূতন জীবে পরিণত হয়।

চতুর্থ প্রথা তদপেক্ষা আরও নিকৃষ্ট জীবসমূহে দৃষ্ট হয়। এ সকল স্থলে উহাদের দেহ দুই বা ততোধিক ভাগে বিভক্ত হইয়া নূতন জীবে পরিণত হয়, যেমন আমি বা, মনিরা ফারামিনিফেরা ইত্যাদি। ইহাতে বুঝা উচিত, প্রথম ও দ্বিতীয় প্রথা দ্বারা যোনিসম্ভব জীব এবং তৃতীয় ও চতুর্থ প্রথা দ্বারা অযোনিসম্ভব জীব জগতে উৎপন্ন হইতেছে।

বিজ্ঞান বলে, মানবও এক সময়ে উভলিঙ্গ (Hermanphrodite জীব ছিল। এজন্য পুরুষজাতিতে এখনও স্তনযুগল ও জরায়ু অস্ফুট ভাবে দেখা যায়। পূর্ব্বে পুরুষজাতির যে স্তনদ্বয় সন্তানের লালন পালন করিত, এখন উহাদের সে কর্ম্ম না থাকায় উহারা বক্ষঃ স্থলে এমন অস্ফুট ভাবে থাকে যে জরায়ুতে ভ্রূণ বর্দ্ধিত হয়, তাহা ব্যবচ্ছেদ করিয়া এখন পুরুষজাতির বস্তিদেশে অস্ফুট ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। জরায়ু ও স্তনদ্বয় এমন অস্ফুট রাখিবার কি প্রয়োজন? ইহাতে প্রকৃতি আমাদিগকে জগতের এক অমোঘ সত্য জানায়।

এক সময় এ পৃথিবীর উভলিঙ্গ সমগ্র মানবজাতি স্ত্রীপুরুষে আদৌ বিভক্ত না হইয়া অমিশ্রসংযোগ দ্বারা সন্তান উৎপাদন করিত ও নিজের স্তনদুগ্ধ দ্বারা উহার লালন পালন করিত, একথা শ্রবণে অনেকে হাস্য সম্বরণ করিবেন না সত্য, কিন্তু ইহা উন্নত বিজ্ঞানের কথাও জগতের অমোঘ সত্য। জিজ্ঞাসা করি, প্রকৃতি কি সামান্য শোভা বর্দ্ধনের জন্য পুরুষজাতির বক্ষঃস্থলে এমন অস্ফুট স্তনদ্বয় রাখিয়া দেয়? বেশ জানিবে, এ জগতে কোন বস্তুই অনর্থক সৃষ্ট হয় না। প্রত্যেক বস্তু, প্রত্যেকে উদ্ভিজ্জ, প্রত্যেক জীব, এমন কি জীবদেহের প্রত্যেকে যন্ত্র ও ইহার অংশবিশেষ প্রকৃতির মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সৃষ্ট হয়।

এখনও সময় বিশেষে ও স্থল বিশেষে উভলিঙ্গ মানব দেখা যায়। এ স্থলে প্রকৃতি পূর্ব্বানুকরণে উভলিঙ্গ মানব উৎপাদন করিয়া আমাদিগকে

জানায়, অতি প্রাচীন কালে মানবজাতির এই অবস্থা ছিল। এই যে নপুংসক বা হিজড়া তুমি সচরাচর দেখিতে পাও, উহারাই বা কি, জান? কেন উহাদের জননেন্দ্রিয় রীতিমত স্ফুরিত না হইয়া এমন অস্ফুট ভাবে রহিয়া যায়? কেন প্রকৃতি নিজের প্রবাদ বসতঃ উহাদের জননেন্দ্রিয়ের যথার্থ স্ফূর্ত্তি করিতে ভুলিয়া যায়? বোধ হয়, পুরাকালে উভলিঙ্গ মানবকে স্ত্রীপুরুষে যথার্থরূপে বিভক্ত করিবার পূর্ব্বে প্রকৃতি নপুংসক মানবের ন্যায় অনেক জাতি এ জগতে গড়ে ও ভাঙ্গে, উহাদেরই নিদর্শন এখন হিজড়ায় পাওয়া যায়। কদাচ মনে ভাবিও না, এ সকল প্রকৃতির খেয়ালমাত্র (Freaks of Nature.)। প্রকৃতি তোমার আমার ন্যায় খামখেয়াল নহে। উহার কার্য্যপ্রণালী অপূর্ব্ব পারিপাট্যে ও শৃঙ্খলতায় পূর্ণ।

এখন অনেকের মনে কৌতূহল হইতে পারে, যদি পুরাকালে মানবজাতি উভলিঙ্গ ছিল, তবে কোন্ যুগে বা কোন্ সময়ে এ জাতি স্ত্রীপুরুষে বিভক্ত হওয়ায় আধুনিক মৈথুন ধর্ম্ম জগতে প্রবর্ত্তিত হইল? বিজ্ঞান পাঠে আমরা এসমস্যা আদৌ মীমাংসা করিতে পারিনা। বিজ্ঞান এখনও অসম্পূর্ণ; এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ সংগৃহীত হয় নাই, যদ্দ্বারা ইহা স্থিরীকৃত করিতে পারে, কোন্ যুগে মানবাদি উৎকৃষ্ট জন্তুগুলি যৌননির্ব্বাচনের বশবর্ত্তী হইয়া বিভিন্ন-জননেন্দ্রিয়বিশিষ্ট পুংজাতি ও স্ত্রীজাতিতে বিভক্ত হওয়ায় মৈথুনধর্ম্ম জগতে প্রবর্ত্তিত হইল।

সুসভ্য ইউরোপ খণ্ডের সুসভ্য খৃষ্টধর্ম্ম এ সমস্যা এক কথায় মীমাংসা করে। ইহার মতে সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর সৃষ্টিকালে আদিমানব আদামের এক খণ্ড পঞ্জরাস্থি লইয়া আদি স্ত্রী ঈভকে সৃজন করেন। সুকুমারমতি বালক বালিকাগণ এ কথায় বিশ্বাস করিবে মাত্র; কিন্তু বিবর্ত্তবাদী পণ্ডিত-দিগের নিকট এ মতটী সম্পূর্ণ হাস্যোদ্দীপক।

যাহাহউক, এ বিষয়ে থিওসাফি যথার্থ যুক্তিসঙ্গত মত প্রকাশ করিতেছে ইহার মতে মানবসৃষ্টির বর্ণন কালে উল্লেখ করিয়াছি, প্রথমে দেবরূপী মনুপুত্রগণ অযোনি সম্ভব ছিলেন; তাঁহাদের বংশবৃদ্ধি কিরূপে ঘটিত তাহা আমরা অবগত নহি। পরে দক্ষিণ মহাদ্বীপের অন্তর্গত লিমুরিয়া মহাদেশে অসুররূপী যে তৃতীয় মূলজাতি উৎপন্ন হয়, উহারা বহুকাল

উদ্ভিদ ছিল; পরিশেষে এই জাতির চতুর্থ শাখাজাতিতে স্ত্রী পুরুষ বিভিন্ন হইয়া পড়ে। তদবধি সংসারে মৈথুন ধর্ম চলিতেছে।

সনাতন হিন্দুধর্ম পূর্ব্বোক্তভাবে বিবর্ত্তনবাদের সম্পূর্ণ পোষকতা করে। পুরাণাদির একস্থলে দেখা যায়, দক্ষ প্রজাপতি দ্বাপর যুগে জগতে মৈথুন ধর্ম প্রবর্তন করেন। যখন তাঁহার পুত্রগণ প্রজাবৃদ্ধি করিতে অস্বীকৃত হন, তখন তিনি ষাটি কন্যা উৎপাদন করিয়া উহাদের দ্বারা প্রজাবৃদ্ধি করান। উহাদের গর্ভে দৈত্য, দানব, তির্য্যককুল, পক্ষিজাতি ও মানবজাতি উৎপন্ন হয়। এখন দক্ষ প্রজাপতির পুত্রগণ প্রজাবৃদ্ধি করিতে অস্বীকার করাতে বুঝা উচিত, প্রজাবৃদ্ধি করা (অর্থাৎ) সন্তান প্রসব করিয়া স্তনদুগ্ধ দ্বারা উহার লালন পালন করা তদীয় পুত্রগণের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম ছিল এবং উহারা উদ্ভিদ ছিল। ইহাতে আরও বুঝা উচিত, উদ্ভিদ জীবজন্তু দ্বারা প্রজাবৃদ্ধি করাতে প্রকৃতির মহৎ উদ্দেশ্য তাদৃশরূপ সিদ্ধ হয় নাই, সেজন্য সংসারে উৎকৃষ্ট জীবজন্তুদিগের ভিতর স্ত্রীপুরুষের বিভাগ ঘটে এবং উহাদের মনে কামপ্রবৃত্তি সম্যক স্ফূরিত হয়। আর উক্ত প্রজাপতির ষাটী কন্যার গর্ভে প্রথম দৈত্য ও দানব উদ্ভূত হয়। ইহাতে বুঝা উচিত, আধুনিক মানব জাতির আদিপুরুষ দৈত্য ও দানবদিগের ভিতর প্রথম স্ত্রীপুরুষের বিভাগ ঘটিয়া জগতে মৈথুনধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়।

স্ত্রীপুরুষের বিভাগ দ্বাপর যুগের মধ্যভাগে ঘটে। এখন দ্বাপর যুগ শাস্ত্রানুসারে ৮৬৪০০০ বৎসর এবং কলিযুগের সবে মাত্র ৫০০০ বৎসর গত হইয়াছে। ইহাতে অনুমান করা উচিত, ৪।৫ লক্ষ বৎসর হইল, সংসারে মৈথুন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কলিকালে শিশ্নোদরপরায়ণ মানব কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য কি রূপ উন্মত্ত! কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, যে সত্য ত্রেতা, অর্দ্ধ দ্বাপর যুগ পর্য্যন্ত কামদেব কি, তাহা কেহ জানিত না।

স্ত্রীপুরুষের জননেন্দ্রিয়ের পার্থক্য পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায়, অল্পদিন হইতে চলিল উহাদের প্রভেদ ঘটিয়াছে। পুরুষ জাতির অণ্ডকোষের সম্মুখ ভাগে ঠিক মধ্যস্থলে যে সীবন আছে, তাহাই স্ত্রীজাতিতে মিলিত না হওয়ায় যোনি (vagina) উৎপন্ন হয়। ঐ অণ্ডকোষের বাহ্য চর্ম্ম যোনির ওষ্ঠ স্বরূপ (laba Majora and Minora) হয়। স্ত্রীলোকের গুহ্যদেশের নাসিকারূপ

ক্লাইটরিসটী (Clittoris) বর্দ্ধিত হইয়া পুরুষ জাতির শিশ্ন উৎপাদন করে। স্ত্রীজাতির মূত্রনিঃসরণদ্বার (Mouth of the Urethra) ঐ ক্লাইটরিসের ঠিক নিম্নদেশে এবং যোনির ঠিক উপরে থাকে; কিন্তু পুরুষজাতিতে উহা থোবনায় (Glans penis) থাকে এবং মূত্রনালীটী শিশ্নের মধ্যদেশে যাওয়াতে উহার নিম্ন দেশে সীবন পড়ে। শরীরের অন্য কোন স্থানে সীবন দেখা যায় না। ইহাতে সিদ্ধান্ত করা উচিত, যতকাল মানব জগতে সৃষ্ট হইয়াছেন, উহার শেষ ভাগে তিনি স্ত্রীপুরুষে বিভক্ত হন। অনেকে অনুমান করেন, ৪.৫ লক্ষ বৎসর হইল, স্ত্রীপুরুষের এরূপ বিভাগ ঘটিয়াছে জগতে মৈথুনধর্ম্ম এবং প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

গ্রন্থকার বুঁদেলখণ্ডে একবার এক উভলিঙ্গ মানব স্বচক্ষে দর্শন করেন। উহার বয়স ১৬ বৎসর। এক সন্ন্যাসী উহাকে পালন করিত। যোনিদেশ ভালরূপ ছিল; তদুপরি শিশ্নও ছিল, তাহা অন্য পুরুষের ন্যায় দণ্ডায়মান হইত। কিন্তু মূত্রনিঃসরণদ্বার স্ত্রীলোকের ন্যায় যোনির ঠিক উপরে ছিল বলিয়া শিশ্নের নিম্ন দেশে সীবন পড়ে নাই, কেবল খাঁজকাটা ছিল। যোনির এক দিকের চর্ম্ম কিঞ্চিত স্ফীত থাকায় বোধ হইল, পুরুষের অণ্ডকোষ একদিকে ছিল। স্তনদ্বয় স্ত্রীলোকের মত ছিল না, পুরুষের ন্যায় ছিল। সে লোক স্ত্রীপুরুষ উভয়ের কাজের যোগ্য ছিল এবং সামান্য রেতস্খলন হইত।

এদেশের পুরাণাদি গ্রন্থে উভলিঙ্গ মানবের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে সুদ্যুম্ন রাজার উপাখ্যান পাঠ করিতে করিতে অনেকে হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন না। সুদ্যুম্ন রাজা ইলাবৃতবর্ষে মৃগয়া করিতে গিয়া স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হন এবং বুধের ঔরষে তাঁহার পুরোরবা সন্তান উৎপন্ন হয়। অতঃপর মহাদেবের বরে তিনি ১ মাস স্ত্রীলোকের কার্য্য, আর ১ মাস পুরুষের কার্য্য করিতে থাকেন। বিজ্ঞানের মতে তিনি উভলিঙ্গ মানব এবং তাঁহার উভয়প্রকার জননেন্দ্রিয় একাধারে মিলিত ছিল। শরীরতত্ত্ব এইরূপ উভলিঙ্গ মানবের অনেক দৃষ্টান্ত দিয়া থাকে এবং উহাদের শুক্রের পুমণু তেজস্বী নির্দ্দেশ করে।

শাস্ত্রে পাঠ করি, মান্ধাতার পিতা যুবনাশ্ব রাজা নিশাকালে পুংসবন জলপান করিয়া গর্ভ ধারণ করেন। তিনিও বিজ্ঞানের মতে উভলিঙ্গ

মানব। ভগীরথের জন্মবিষয়ে এক অদ্ভুত উপকথা পাওয়া যায়। যখন সগর রাজার সমস্ত বংশ কপিলদেবের শাপে ভস্মীভূত হইল, তখন ভগীরথের দুই মাতা পরস্পর সঙ্গম করিয়া তাঁহার জন্ম দেন। এ স্থলে নিশ্চয়ই তাহার এক মাতা উভলিঙ্গ ছিলেন। দেখ, দেখি, অলীক পুরাণের ভিতরও কেমন বৈজ্ঞানিক সত্য পাওয়া যায়! যে শাস্ত্র আজ অনেকে অপাঠ্য মনে করেন, তাহার ভিতরও বৈজ্ঞানিক সত্য আছে, কিমাশ্চর্য মতঃপরং!

নারীজাতির উৎপত্তিবিষয়ে শাস্ত্রে এক অদ্ভুত উপাখ্যান পাওয়া যায়। যৎকালে দেবাসুরগণ ক্ষীরোদসাগর মন্থন করিতে থাকেন, তৎকালে দেবচিকিৎসক ধন্বন্তরিদেব সুধাভাণ্ড লইয়া সাগর হইতে উত্থিত হন। সুধাভাণ্ডের লোভে দেবাসুরগণ তুমুল সংগ্রামে লিপ্ত হন। বহুকাল এ যুদ্ধ চলিল। পরে দেবকার্য্যসাধনার্থ বিষ্ণু মোহিনীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সকলের সমক্ষে দেখা দেন। সুধাবণ্টন কালে তিনি দেবগণকে ঐ সুধা পান করান এবং দৈত্যদিগকে নিজ মোহিনী মূর্ত্তিতে মোহিত করিয়া ছলনা করেন। দেবগণ সুধা পান করিয়া অমরত্ব লাভ করেন, আর দৈত্যাসুরগণ উহা হইতে বঞ্চিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

এই শ্রুতিমনোহর উপাখ্যানের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? কেন, বিষ্ণু মোহিণী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দৈত্যাসুরগণকে ছলনা করিতে গেলেন?

শাস্ত্রকারেরা এই ঘটনা লইয়া কত হাস্য বিদ্রূপ করিয়াছেন; কিন্তু কেহই ইহার প্রকৃত মর্ম্ম উদ্ঘাটন করেন নাই। লোকেও শাস্ত্র যেমন পড়ে, তেমনি বুঝে। উহার গূঢ় অর্থ কেহই বুঝিতে চেষ্টা পান না। পুরাণের উপাখ্যানমাত্রেই রূপকে পূর্ণ। এখন সেই রূপক ভেদ করিয়া উহার বিজ্ঞানসম্মত অর্থ করা আবশ্যক।

নারীজাতির যে মোহিণী মূর্ত্তিতে জগৎ বিমুগ্ধ, যাহাদের সৌন্দর্য্য দর্শনে মুনি ঋষিদের মন পর্য্যন্ত টলে, এস্থলে বিষ্ণুর মোহিণী মূর্ত্তি ধারণে সেই নারীজাতির উৎপত্তি বুঝায়। ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, নারীজাতি সর্ব্বপ্রথমে দৈত্যাসুরদিগের ভিতর উদ্ভূত হয় এবং উহারা তাঁহাদের সৌন্দর্য্যে

বিমুগ্ধ হয়। এ সকল কথা বিজ্ঞান এখনও জানিতে পারে নাই বলিয়া আমরা থিওসফি ও হিন্দুশাস্ত্রের কথা অগ্রাহ্য করিতে পারিনা।

এখন সুধা পান করিয়া দেবগণ অমর হন এবং অসুরগণ তাহা না পাইয়া মরণশীল হয়, এ কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? হিন্দুশাস্ত্রমতে যে দেবরূপী মনুপুত্রগণ অতি প্রাচীন কালে পৃথিবীতে বিচরণ করেন, তাঁহারা অযোনিসম্ভব ও অমর ছিলেন। এখন তাঁহারা মহর্ল্লোকাদি সূক্ষ্মজগতে অধিষ্ঠিত। কিন্তু তাহাদের মধ্যে অনেকে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার অভিশাপে অসুরযোনি প্রাপ্ত হইয়া মর্ত্ত্যলোকে আইসে; ইহারা স্ত্রীপুরুষে বিভক্ত হইয়া জগতে প্রথম যোনিসম্ভব হয়; ইহারা আবার অমর দেবযোনি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া প্রথম মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এজন্য হিন্দুধর্ম্ম সামান্য উপকথাচ্ছলে আমাদিগকে জগতের ঐ সকল মহাসত্য শিখায়।

যে বস্তুতে যতই স্থূলত্বের বিকাশ হয়, সেই বস্তু এ মর জগতে ততই মরণশীল হইয়া থাকে। স্ত্রীজাতির উৎপত্তির সঙ্গে যখন দৈত্যদিগের ভিতর জ্ঞানশক্তি ও কামপ্রবৃত্তি স্ফুরিত হইতে থাকে, তখন হইতে সংসারে স্থূলত্বের বৃদ্ধি দ্রুতগতিতে আরম্ভ হয় এবং সকলই নশ্বর হইয়া পড়ে। এ স্থলে হিন্দুধর্ম্মের গূঢ় রহস্য সহজে বোধগম্য হয় না।

যেস্থলে খৃষ্টধর্ম্ম উপদেশ দেয়, মানবজাতির আদি স্ত্রী ঈভ সয়তানের প্রলোভনে প্রলোভিত হইয়া নিজ স্বামী আদামকে নিষিদ্ধ জ্ঞান বৃক্ষের ফল আস্বাদন করাইয়া সমগ্র জাতিকে মৃত্যুমুখে পাতিত করে ও সংসারে অশেষ শোক তাপ আনয়ন করে, সে স্থলে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম শিখায়, বিশ্বপালনকর্ত্তা শ্রীবিষ্ণু দেবকার্য্য সাধনার্থ মোহিনী স্ত্রী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মানবের আদি পুরুষ দৈত্যগণকে নিজ সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ করতঃ জীবনামৃত পানে বঞ্চিত রাখেন এবং এই প্রকারে সমগ্র জাতিকে মরণশীল ও শোকতাপের ভাগী করিয়া দেন। ভালরূপ অনুধাবন করিলে বুঝা যায়, উভয় ধর্ম্মের উদ্দেশ্য এক।

যুগধর্ম্ম।

আজকাল সুশিক্ষিত সম্প্রদায় ভাবেন, শাস্ত্রোক্ত চতুর্যুগ সর্ব্বৈব মিথ্যা ও কবিদিগের কল্পনামাত্র। পাশ্চাত্য গুরুকুলে সুশিক্ষা পাইয়া যে সকল সুসংস্কার তাঁহাদের মনে বদ্ধমূল হইতেছে, তাহাতে যে পুস্তকে কলিযুগের উল্লেখ দেখেন, তাঁহারা সে পুস্তকখানি দূরে প্রক্ষেপ না করিয়া নিরস্ত হন না। তাঁহারা কি কোথাও শুনেন নাই, আধুনিক উন্নত বিজ্ঞান ভূতত্ত্বাদি অনুশীলন করিয়া স্থিরসিদ্ধান্ত করিতেছে, লক্ষ ২বৎসর হইল, পৃথিবী ও মানবজাতি সৃষ্ট হইয়াছে এবং ইহা প্রকাশ্য ভাবে খৃষ্টধর্ম্মের অলীক মতামতের উপর পদাঘাত করিতেছে। তবে কেন তাঁহারা শাস্ত্রের কথা অগ্রাহ্য করেন?

সৃষ্টির চতুর্যুগ সম্বন্ধে শাস্ত্রে যাহা লিখিত আছে, তাহা জ্ঞানগরিষ্ঠ মহর্ষিগণ যোগবলে প্রাপ্ত হন। সকল শাস্ত্রে ও সকল পণ্ডিতের মুখে একই কথা চিরদিন প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কিন্তু বিজ্ঞানজগতে নানা মুনির নানামত চলিয়া থাকে। কেহ বলেন, এক কোটী বৎসর হইল, পৃথিবী সৃষ্ট হইয়াছে; অপরে তাহা খণ্ডন করিয়া বলেন, ১০ কোটী বৎসর হইল। এই প্রকারে সকলেই নিজ ২ জ্ঞানের গর্ব্ব দেখান।

সৃষ্টির চতুর্যুগ সম্বন্ধে শাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে, যথা:—

সত্যযুগ ১৭২৮০০০
ত্রেতাযুগ...১২৮৬০০০
দ্বাপরযুগ...৮৬৪০০০
কলিযুগ...৪৩২০০০
মহাযুগ...৪৩২০০০০

ইহাতে বুঝিতে পারা যায়, দ্বাপর কলিযুগের দ্বিগুণ, ত্রেতা উহার ত্রিগুণ, সত্য উহার চতুর্গুণ এবং মহাযুগ উহার দশগুণ।

ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, ব্রহ্মাদি দেবগণ যে সৃষ্টি রচনা করেন, তাহা বৈকারিক সৃষ্টি; ইহাতে সমস্তই বিকার প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ অধোগত ও অপগত হইতেছে। এজন্য যুগ-ধর্ম্মানুসারে পৃথিবীর কি উদ্ভিজ্জ, কি জীবজন্তু, কি মানব সকলেই দীর্ঘকায় হইতে কালক্রমে

খর্ব্বকায় হইতেছে। তাহার সাক্ষ্য দেখ, বিজ্ঞান ভূধরশায়ী কঙ্কালরাশি পর্য্যালোচনা করিয়া স্থিরসিদ্ধান্ত করে, পুরাকালে মহাকূর্ম্ম, মহাহস্তী মহাঘোটক, পতত্রবিশিষ্টগোধা প্রভৃতি অতিবৃহদাকার জীবজন্তুগণ ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করিয়া গিয়াছে। এখন উহারা লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, অথবা উহাদের বংশধরেরা কালক্রমে অপগত হইতেছে। ডিভোনিয়ান যুগে বৃহদাকার মহামৎস্যজাতি, অঙ্গারবাহী যুগে মহাকূর্ম্ম,মহাভেক প্রভৃতি, ক্রিটেসাস যুগে বৃহদাকার সর্প ও পতত্রবিশিষ্টগোধা, তৃতীয় যুগে বৃহদাকার স্তন্যপায়ী জীবসকল উৎপন্ন হয়। এখন উহাদের বংশধরেরা সকলই অপগত ও খর্ব্বকায়। ভূপৃষ্ঠের নিম্ন স্তরে পাথুরিয়া কয়লারাশি আছে, উহারা বৃহৎ ২ বৃক্ষের ভগ্নাবশেষ। অঙ্গারবাহী যুগে উহারা উৎপন্ন হয়।

হিন্দুশাস্ত্রানুসারে মানবের যুগধর্ম্ম এইরূপ যথা :—

সত্যযুগে —ধর্ম্ম চতুষ্পাদবিশিষ্ট।
দেহ একবিংশতিহস্ত।
প্রাণ মজ্জাগত।

ত্রেতাযুগে—ধর্ম্ম ত্রিপাদবিশিষ্ট।
দেহ—চতুর্দ্দশহস্ত।
প্রাণ—অস্থিগত।

দ্বাপর যুগে—ধর্ম্ম দ্বিপাদবিশিষ্ট।
দেহ সপ্তহস্ত।
প্রাণ—রুধিরগত।

কলিযুগে—ধর্ম্ম—একপাদ বিশিষ্ট।
দেহ—সার্দ্ধত্রিহস্ত।
প্রাণ—অন্নগত।

এখন জিজ্ঞাস্য, শাস্ত্রের এ সকল কথা কি উপকথামাত্র, না জগতের মহাসত্য? যে বিজ্ঞানের স্থিরসিদ্ধান্ত, পৃথিবী ভৌতত্ত্বিক তৃতীয় যুগে আধুনিক আকার ধারণ করিবার পর মানবজাতি সর্ব্বশেষে নিকৃষ্ট জন্তুদিগের ক্রমবিবর্ত্তনে ও ক্রমোন্নতিতে উদ্ভূত হয়, সে বিজ্ঞান পড়িয়া শাস্ত্রের ঐ সকল অপরূপ কথায় কেহ আদৌ বিশ্বাস করিবেন না। ইহা কি কদাচ সম্ভব, মানবদেহ সত্য-

যুগের ২১ হস্ত হইতে ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে ২ এখন কি না ৩॥ হস্তে পরিণত? আর তদীয় দেহে মজ্জা, অস্থি ও রুধির কি যুগে ২ উৎপন্ন হয়? বিজ্ঞানের মতে এ সকল কথা গেঁজেলি ও উপকথা-মাত্র। কিন্তু থিওসফি হিন্দুশাস্ত্রের বিশেষ পোষকতা করে।

ইতিপূর্ব্বে থিওসফি মতে মানব-সৃষ্টি যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, উহার সহিত শাস্ত্রোক্ত যুগধর্ম্মের কোনরূপ প্রভেদ দেখা যায় না। যে মানব এখন খর্ব্বকায়, বামনরূপী, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, অল্পায়ু, শঠ ও চতুর, সে মানব অতি পুরাকালে দীর্ঘকায়, অসুররূপী, দৈত্যরূপী, সবল ও ধর্ম্মিষ্ঠ ছিলেন। যে মানব এখন জ্ঞানশক্তিসম্পন্ন হইয়া জগতের আধিভৌতিক উন্নতিসাধনের জন্য ব্যগ্র, সে মানব অতিপুরাকালে দেবাসুররূপে যোগবলে বলীয়ান হইয়া আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনের জন্য ব্যগ্র ছিলেন। যে মানব এখন স্থূলরূপে যোনিসম্ভব ও মরণশীল, সে মানব অতিপ্রাচীনকালে সূক্ষ্মলিঙ্গশরীরবিশিষ্ট দেবরূপে অযোনিসম্ভব ও অমর ছিলেন।

এখন দীর্ঘকায় জীবজন্তুদিগের অস্থিপঞ্জরের সহিত দীর্ঘকায় মানবের কঙ্কাল কোথাও পাওয়া যায় নাই। এজন্য বিজ্ঞান শেষোক্তের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করে। ইহার কয়েকটী প্রধান কারণ আছে।

(১) যে লিমুরিয়া ও আটলান্টিক মহাদ্বীপে দীর্ঘকায় অসুর ও দৈত্যগণ বিচরণ করিত, তাহা এখন জলধিগর্ভে নিমগ্ন। ভূবিদ্যা এখনও সমুদ্রগর্ভ অনুসন্ধান করিতে সক্ষম হয় নাই, সবেমাত্র পর্ব্বতের ভিন্ন ভিন্ন স্তর অনুসন্ধান করিতেছে।

(২) যদি দৈত্যাসুরদিগের ভিতর অগ্নিসৎকারপ্রথা প্রচলিত থাকে, উহাদের কঙ্কাল না পাইবার কথা।

(৩) যে মানব সূক্ষ্মলিঙ্গশরীরবিশিষ্ট দেবরূপ হইতে ক্রমশঃ অধোগত হইয়া চর্ম্ম হইতে মজ্জা পর্য্যন্ত সপ্তধাতুতে বিনির্ম্মিত স্থূলদেহে পরিণত এবং যাহার দেহের সপ্তধাতু যুগে যুগে ক্রমস্ফুরিত, তাহার অস্থিপঞ্জর পাওয়া দুর্ঘট।

যাহা হউক, যখন বিজ্ঞান প্রাচীন যুগের দীর্ঘকায় জীবজন্তুদিগের অস্তিত্বে পূর্ণ বিশ্বাস করে, তখন ঐ সকল প্রাকৃতিক প্রতিদ্বন্দিবর্গের সহিত জীবনসংগ্রামে জয়ী হইবার জন্য প্রকৃতি যে তদানীন্তন মনুপুত্রগণকে দৈত্যাসুররূপে দীর্ঘকায় করিয়াছিল, সে বিষয়ে কি কিছুমাত্র সন্দেহ করিতে আছে?

আজ পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে দৈত্যাসুরগণ ভারতের বর্ব্বর আদিম নিবাসী অথবা পারসীকদিগের সহিত পাঞ্জাবের আর্য্যজাতির বিরোধ উপস্থিত হইলে, প্রথমোক্তের দেবমণ্ডলী সংস্কৃত ভাষায় অসুরাখ্যা প্রাপ্ত হয়, ইত্যাদি যে সকল সিদ্ধান্ত তাঁহারা করিতেছেন, তাহা অগ্রাহ্য করিয়া আমরা শাস্ত্রানুসারে বলিব যে, দৈত্যাসুরগণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে পৃথ্বীতলে বিচরণ করিয়া গিয়াছে।

শাস্ত্রে সকলেই পাঠ করেন, যুগধর্ম্মে মানবের আয়ুর্ব্বল ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। শাস্ত্রের এ কথা কতদূর প্রমাণসিদ্ধ? জীবজগতের সাধারণ নিয়ম এই, যে জীব বৃহদাকার, তাহার আয়ুর্ব্বল ততোধিক এবং যে জীব খর্ব্বকায় তাহার আয়ুর্ব্বলও সেই পরিমাণে অল্প। ইহাতে অনুমান করা উচিত, যদি কলিযুগে মানবের আয়ু শতবৎসর হয়, দ্বাপরে ইহা সাধারণতঃ ২০০ বৎসর বা ততোধিক ছিল; তাই বলিয়া ত্রেতাযুগে রাজা দশরথ দশ হাজার বৎসর রাজত্ব করেন, এ কথা কবিগণের অতি রঞ্জিত বোধ হয়।

এই চতুর্যুগ নির্দ্দেশে শাস্ত্রকারদিগের আর একটী গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। আর্য্যজাতি যতকাল ভারতে আসিয়াছেন, তাঁহারা সেই কালকে সৃষ্টির চতুর্যুগানুসারে চারিযুগে বিভক্ত করেন। এজন্য জাতীয় সত্যযুগে ইক্ষ্বাকু, মান্ধাতা প্রভৃতি অধীশ্বরবর্গ ভারতে, আধিপত্যস্থাপন করেন, জাতীয় ত্রেতাযুগে পরশুরাম ও শ্রীরামচন্দ্র আবির্ভূত হন, জাতীয় দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধদেব অবতার গ্রহণ করেন এবং জাতীয় কলিযুগে ভারত ম্লেচ্ছ রাজাদিগের অধীনস্থ হইয়া নানাদিকে নানা নিগ্রহ ভোগ করিতেছেন। ইংরাজ ইতিহাসলেখকেরা হিন্দুজাতির ইতিহাস সম্বন্ধে যেরূপ কাল নিরূপণ করেন, জাতীয় চতুর্যুগ নির্দ্দেশে উহার সহিত কোনরূপ অসামঞ্জস্য দেখা যায় না। অতএব পাঠকগণ শাস্ত্রোক্ত চতুর্যুগের উপরোক্ত দুইপ্রকার অর্থ করিয়া দেশীয় ও পাশ্চাত্য গ্রন্থাদির সামঞ্জস্য করিয়া লইবেন।

এখন উন্নত ভূবিদ্যা ভূগর্ভ ও পর্ব্বতের ভিন্ন ভিন্ন স্তর ও উহাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রস্তর পর্য্যালোচনা করিয়া পৃথিবীর অতীত যুগসম্বন্ধে যাহা নির্দ্দেশ করে, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। কিন্তু কালে এ তালিকার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিবে।

GEOLOGICAL PERIODS—ভৌতত্ত্বিক যুগসমূহ।

Eras	Periods.	Epocks.	Ages and Organic remains.
Cenozoic.	Quaternary. চতুর্থ যুগ।	Recent.	Age of Man. মানব জাতির আবির্ভাব।
		Pliestocene.	Man first appeared.
		Glacial.	Big animals all extinct. বৃহদাকার জীবজন্তুদিগের লয়।
	Tertiary. তৃতীয় যুগ।	Pliocene.	Age of Mammals. স্তন্যপায়ী জীবদিগের আবির্ভাব।
		Miocene.	These were of gigantic size. ইহারা বৃহদাকার যেমন মহাহস্তী, মহাঘোটক।
		Eocene.	এক্ষণে লুপ্ত অথবা ক্ষুদ্রাকারে অপগত।
Paleozoic.	Cretaceous. Jurasoic. Triasoic.	Upper Cretaceous Lower Cretaceous Lias. Muschel-kalk.	Age of Reptiles. সরীসৃপ জাতির উদ্ভব। Snakes of gigantic size. বৃহদাকার সর্পজাতি। পতত্র বিশিষ্ট গোধা এখন সমস্ত লুপ্ত।
	Carboniferous. অঙ্গার রাজী যুগ।	Permian. Carboni-ferous. Coal measures. Sub carboni-ferous. Mountain limestone.	Age of Amphibians and big plants. উভয়চর জন্তু ও মহাবৃক্ষগণ। Big toads, tortoises. বৃহদাকার ভেক ও মহাকূর্ম্ম। Carbon was abandant in the atmosphere, hence big trees, these deposited under ground as coal.
	Devonian	Red Sandstone.	Age of fishes, very big fishes all extinct. বৃহদাকার মহামৎস্যে, সমস্ত লুপ্ত।
	Upper	Silurian.	Age of Invertebrata. অমেরুদণ্ডীর জীবদিগের উৎপত্তি।
	Lower	Silurian	
	Cam	brian.	
Eozoric		Precambrian.	No distinct organic remains.

বিবর্ত্তবাদ।

(Theory of Evolution)

জ্ঞান জগতে আজকাল দুই প্রকার বিবর্ত্তবাদ প্রচলিত দেখা যায়, যথা—

(১) প্রাচ্য দার্শনিক বিবর্ত্তবাদ।

(২) প্রতীচ্য বৈজ্ঞানিক বিবর্ত্তবাদ।

কপিলাদি মহর্ষিগণ যে সাংখ্যমত প্রাচ্যজগতে প্রচার করিয়াছেন, তাহা দার্শনিক বিবর্ত্তবাদ; আর ডার্ব্বিনপ্রমুখ ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ পাশ্চাত্য জগতে যে বিবর্ত্তবাদ আজকাল প্রচার করিতেছেন, তাহা বৈজ্ঞানিক বিবর্ত্তবাদ। ইতিপুর্ব্বে সাংখ্যমতের ব্যাখ্যান দিয়াছি; এখন বৈজ্ঞানিক বিবর্ত্তবাদ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিতেছি।

এই বৈজ্ঞানিক বিবর্ত্তবাদ উনবিংশ শতাব্দীতে জ্ঞানজগতের একটি সুমহৎ কীর্ত্তিস্তম্ভ। আজকাল বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ এই উৎকৃষ্ট মত প্রচার করিয়া জ্ঞান জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন। পাশ্চাত্য জগতে ইহার এত অধিক প্রতিপত্তি ও সমাদর যে, যাহা ইহার বিরুদ্ধ বা অনভিমত, তাহা অসত্য জ্ঞানে সচরাচর পরিত্যক্ত হইয়া থাকে।

এই শ্রেষ্ঠ মত উপদেশ দেয়, এ জগতের যাবতীয় পদার্থ ও জীবজন্তু ক্রম বিবর্ত্তনে বা ক্রমবিকসনে কালক্রমে উদ্ভূত ও স্ফুরিত হয়। রোমের ন্যায় সুবিশাল নগরী একদিনে নির্ম্মিত হয় না। আরব্য উপন্যাসে আলাউদ্দীন তাঁহার আশ্চর্য্য প্রদীপ বলে একরাত্রের ভিতর সুরম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করাইতে পারেন; কিন্তু কার্য্যতঃ বিশ্বব্যাপারে আমরা সেরূপ কিছুই দেখি না। প্রাকৃত হউক বা অপ্রাকৃত হউক, বস্তুমাত্রেই একদিনে একরূপে স্বতন্ত্রভাবেসৃষ্ট বা উদ্ভূত হয় না। কিন্তু উহা কালে কালে, যুগে যুগে, অল্পে অল্পে, অননুভূত ভাবে ক্রমশঃ রূপান্তরিত হইয়া পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তন সহ্য করিতে করিতে আধুনিক আকার ধারণ করে।

দেখ সর্ষপকণাবৎ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতম বীজ হইতে কি প্রকারে প্রকাণ্ড-শাখা-পল্লব সংবলিত সুবিশাল বটবৃক্ষ কালসহকারে উৎপন্ন হইতেছে। দিনের পরদিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অতীত হইতেছে,

সেই বীজ বা বীজোৎপন্ন অঙ্কুর নিঃশব্দে ও অবিরামে অন্তর্নিহিত শক্তিবলে বাহ্য জগৎ হইতে ভিন্ন ভিন্ন ভৌতিক পদার্থের পরমাণুপুঞ্জ আকর্ষণ পূর্ব্বক দেহস্থ যন্ত্র সংযোগে উহাদিগকে জৈবনিক পদার্থে পরিণত করিয়া স্বদেহ পোষণ ও বর্দ্ধন করে এবং কালক্রমে প্রকাণ্ড বৃক্ষবিশেষে পরিণত হয়। এস্থলে বটবৃক্ষ ক্ষুদ্র বীজের ক্রমবিবর্ত্তনে বিবর্ত্তিত বা উদ্ভূত বলা উচিত।

এইরূপ ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তু ক্রমবিবর্ত্তনে ও ক্রমবিকসনে উৎপন্ন ও স্ফুরিত হয়। প্রকৃতিপুস্তক অধ্যয়ন করিলে বুঝা যায়, মানব, জীবজন্তু ও উদ্ভিজ্জ সকলই বটবৃক্ষের বীজের ন্যায় অতি সূক্ষ্ম জীবাণু বা জীবকোষ হইতে বর্দ্ধিত হইয়া সাধারণ সুপরিচিত দেহ ধারণ করে। এই যে অণুবীক্ষণদৃষ্ট অতি-সূক্ষ্ম স্ত্র্যণু (Ovuman) ও পুমণু (Spermatozoa) মৈথুনযোগে একত্রিত হইবার পর উহারা জরায়ুগর্ভে জ্রূণরূপে আবির্ভূত হইয়া মাতৃশোণিত প্রাপ্তির সহিত স্বদেহের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্ফুরণ করতঃ দশমাসে হস্তপরিমিত দেহে বর্দ্ধিত হইয়া ভূমিষ্ঠ হয় পুনরায় এ সংসারে মাতৃস্তনদুগ্ধ বা অন্য প্রকার আহার্য্যের সহিত বাহ্যজগতের পরমাণুপুঞ্জ আকর্ষণ পূর্ব্বক স্বদেহ পোষণ ও বর্দ্ধন করিয়া কালক্রমে সার্দ্ধত্রিহস্ত পরিমিত অশেষ সৌন্দর্য্যশালী দেহে পরিণত হয়। এস্থলে তুমি তোমার নয়নসমক্ষে কি দেখিতেছ? এই মানবদেহ কি একদিনে উৎপন্ন হইল, না কালসহকারে ক্রমবিবর্ত্তনে বিবর্ত্তিত হইল?

এই যে সংস্কৃত দেবভাষা যাহার লালিত্য ও মাধুর্য্য দর্শনে জগৎ বিমুগ্ধ, যাহার ব্যাকরণঘটিত নিয়মাবলিদর্শনে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ স্তম্ভিত, তাহাও কি একদিনে উৎপন্ন হইয়াছিল? একবার ভাব দেখি, কত ২ প্রকৃতির মহাকবি ও প্রতিভাশালী পণ্ডিত আজীবন পরিশ্রম করিয়া ইহার অবয়ব বর্দ্ধন করিয়াছে? কত কাল ব্যাপিয়া উন্নতির পর উন্নতি ঘটিতে ২ ইহা আধুনিক আকার ধারণ করিয়াছে এবং বিভিন্ন জাতির সংঘর্ষে ইহাতে কত নূতন ২ ভাব ও সত্য কালক্রমে আনীত ও স্ফুরিত হইয়াছে? এইরূপ জগতের ভাষামাত্রেই কালক্রমে উদ্ভূত ও বিকসিত হইতেছে?

এই যে একখণ্ড মিষ্টান্ন, যাহার উপাদানরাশি প্রস্তুত করিতে সহস্রলোক যুগপৎ নিযুক্ত, যাহা ভোজন করিয়া তোমার রসনা অনুক্ষণ পরিতৃপ্ত, যাহা বন্ধুজনকে ভোজন করাইয়া তোমার মন সদা পরিতৃপ্ত, তাহাও কি একদিনে

এক ব্যক্তিদ্বারা উদ্ভাবিত হইয়াছে? কত ২ বুদ্ধিমান মোদকের উদ্ভাবিনী শক্তি ইহাতে ব্যয়িত হইয়াছে, তাহা কি একবার তুমি ভাবিয়া দেখিবে?

বেশ জানিবে, এ জগতের যাবতীয় বস্তু, কি কৃত্রিম, কি অকৃত্রিম, সকলই কালবশে ক্রমবিবর্ত্তিত হইতেছে। যে প্রক্রিয়াবলে উহাদের ক্রমবিবর্ত্তন ঘটে তাহার নাম বিবর্ত্তন (Evolution)। এখন যে উৎকৃষ্ট মতদ্বারা পৃথিবীস্থ যাবতীয় জীবজন্তুর উৎপত্তিবিষয়ে ক্রমবিবর্ত্তন দেখান হয়, তাহার নাম বিবর্ত্তবাদ।

এখন পাশ্চাত্য বিবর্ত্তবাদের প্রকৃত তাৎপর্য্য ব্যাখান করা আবশ্যক। এতদ্দ্বারা বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ দেখান, মানব ও অন্যান্য জীবজন্তু কি প্রকারে ক্রমবিবর্ত্তনে বিবর্ত্তিত হইয়া এ জগতে কালক্রমে উদ্ভূত হইল। এতকাল মানবধর্ম্ম সকল দেশে প্রচার করিয়া আসিতেছে, যে মানব ও যাবতীয় ইতর প্রাণিগণ ঈশ্বর কর্ত্তৃক স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্ট হয় এবং সকল দেশের জনসাধারণ ও এইরূপ বিশ্বাস করিয়া থাকে। এখন বিজ্ঞান বিবর্ত্তবাদ দ্বারা ধর্ম্মের এই চিরাদৃত মতের মস্তকে পদাঘাত করত সাহঙ্কারে বলে, সমুদ্রগর্ভস্থ একখণ্ড প্রোটোপ্লাসমনির্ম্মিত মনিরা নামক ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতম জীব কোটী ২ বৎসর ব্যাপিয়া প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন দ্বারা চালিত হইয়া প্রকৃতিজগতের অসংখ্য অবস্থায় পতিত হওয়াতে পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তন সহ্য করিতে ২ পৃথিবীর যাবতীয় জীবজন্তু উৎপাদন করে। সত্য বটে, ঐ সকল জীবজন্তু সচরাচর প্রাকৃতিক চিহ্নে চিহ্নিত থাকিয়া স্বতন্ত্রভাবে সংসারে বিচরণ করে; কিন্তু সুদীর্ঘ কালে স্ব ২ দেহের অনাটনা ও চতুর্দ্দিকস্থ অবস্থার তীব্র তাড়না বশতঃ অল্পে ২ ক্রমশঃ অননুভূতভাবে দেহস্থ যন্ত্রবিশেষের রূপান্তর ঘটিতে ২ উহারা অন্যজীবে পরিণত হয়। এক জীব হইতে অন্য জীবের উৎপত্তি বহুকালসাপেক্ষ। যে সকল পরিবর্ত্তন অতিক্রম করিতে ২ জীববিশেষ কালক্রমে অন্য জীবে পরিণত হয়, সে সকল পরিবর্ত্তন যে সকল জাতিতে স্থায়ী, উহারা সকলে ভূপৃষ্ঠে লয় পায় এবং উহার নিদর্শন ভূধরশায়ী কঙ্কালরাশি পর্য্যালোচনা করিয়া পাওয়া যায়।

জীবতত্ত্ব নির্দ্দেশ করে, প্রথম জীব মনিরা হইতে সৃষ্টির চরম পরিণতি মানব পর্য্যন্ত যতপ্রকার অমেরু-দণ্ডীয় ও মেরুদণ্ডীয় জীবজন্তু সংসারে বিদ্যমান, উহাদের শ্রেণিবিভাগ ও জাতিবিভাগ লইয়া পরস্পর পরস্পরের সহিত এত

অধিক ঘনিষ্ঠতা দেখা যায় যে একটী উৎকৃষ্ট জীব উহার নিম্নস্থ জীবের ক্রমবিবৰ্ত্তনে উদ্ভূত হওয়া ব্যতীত অন্য কোন প্রকার যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। মনিয়া হইতে কালক্রমে অমেরু দণ্ডীয় জীবগুলি এবং অমেরু দণ্ডীয় জীব হইতে মেরু-দণ্ডীয় মৎস্য জাতি উদ্ভূত হয়। এই মৎস্য জাতির কতকগুলি বংশধর চতুৰ্দ্দিকস্থ অবস্থার তীব্র তাড়নায় স্ব স্ব দেহের অনাটনানুসারে যন্ত্রবিশেষের পরিবৰ্ত্তন করিতে করিতে কূৰ্ম্মাদি উভচর জন্তুতে পরিণত হয়। এই উভচর জন্তু একদিকে পরিবৰ্ত্তনের পর পরি-বৰ্ত্তন সহ্য করিতে করিতে পক্ষিজাতিতে পরিণত, অপরদিকে অশেষরূপে পরিবৰ্ত্তিত হইয়া স্তন্যপায়ী জীবে পরিণত। বেশ জানিবে, যুগযুগান্তরে লক্ষলক্ষ বৎসর ব্যাপিয়া পরিবৰ্ত্তন ঘটিতে ঘটিতে জীবজগতের আধুনিক শ্রেণীবিভাগ উৎপন্ন হইয়াছে। পরিশেষে মানবদেহের সহিত বানর দেহের এত অধিক সৌসাদৃশ্য দেখা যায়, যে মানবজাতি ও বানরজাতির ক্রমবিবৰ্ত্তনে উদ্ভূত হওয়া ব্যতীত অন্য কোন প্রকার সিদ্ধান্ত করা যায় না। এই প্রকারে বৈজ্ঞানিক বিবৰ্ত্তবাদ পৃথিবীস্থ যাবতীয় জীবজন্তুর উৎপত্তিকারণ নির্দ্দেশ করিতেছে।

কোন কোন বিবৰ্ত্তবাদী পণ্ডিত বলেন, মূলসৃষ্টি কেবল অচেতন পদার্থ এবং এক অচেতন পদার্থের ক্রমবিবৰ্ত্তনে চেতন ও অচেতন উভয়বিধ পদার্থ উৎপন্ন হয়। অন্যান্য পণ্ডিতদিগের মতে মূলসৃষ্টি দ্বিবিধ চেতন ও অচেতন চেতনের ক্রমববৰ্ত্তনে চেতন পদার্থ ও অচেতনের ক্রমবিবৰ্ত্তনে অচেতন পদার্থ উদ্ভূত হয়। এদেশের বেদান্ত চিরদিন উপদেশ দেয়, কি স্থাবর, কি জঙ্গম, সকল পদার্থে জীব বা জীবনীশক্তি সমভাবে বৰ্ত্তমান। বঙ্গমাতার সুসন্তান জগদীশ বসু মহাশয় তাড়িৎ স্পন্দন দ্বারা জগতের সমক্ষে বেদান্তের কথা সপ্রমাণ করিয়াছেন। ইহাতে বোধ হয়। একমাত্র অচেতন পদার্থের বিবর্ত্তনে চেতন ও অচেতন দ্বিবিধ পদার্থ উৎপন্ন হয়। থিওসফি ও একথার সম্পূর্ণ পোষকতা করে। ইহার মতে একখণ্ড প্রস্তর কালে বৃক্ষ, বৃক্ষ কালে প্রাণী, প্রাণী কালে মানব, মানব কালে দেবতায় পরিণত হয়। এস্থলে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক বিবৰ্ত্তবাদের উপর কিঞ্চিৎ সমালোচনা করা উচিত। ইহাদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ পৃথক। প্রথমোক্ত দেখায়, কি প্রকারে অতীন্দ্রিয়

সূক্ষ্ম পদার্থ ক্ষোভিত হইয়া বা ক্রমশঃ কলুষিত ও অধোগত হইয়া, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য প্রপঞ্চীকৃত স্থূল পদার্থে পরিণত এবং কোন্ কোন্ স্তর অতিক্রম করিয়া সপ্তাবরণসংযুক্ত বিশ্বপ্রপঞ্চ উদ্ভূত। ইহাতে সমস্ত জীবজন্তু, উদ্ভিজ্জ ও অচেতন পদার্থের উৎপত্তি জানায়। শেষোক্ত দেখায়, কি প্রকারে একখণ্ড স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জৈবনিক পদার্থ প্রকৃতির অসংখ্য অবস্থায় পতিত হইয়া ক্রমবিবর্ত্তন দ্বারা জগতে অসংখ্য জাতীয় জীব উৎপাদন করে। ইহাতে যাবতীয় জীব-জন্তুদিগের উৎপত্তি জানায়। এই প্রপঞ্চীকৃত স্থূল জগতের আভ্যন্তরে যে অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম জগৎ বর্ত্তমান অথবা যে সূক্ষ্ম জগতের ক্রম-বিবর্ত্তনে এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূলজগৎ সমুৎপন্ন, সেই সূক্ষ্মজগৎ সম্বন্ধে মানবের সসীম জ্ঞানশক্তি যতদূর বুঝিতে পারে, তাহাই প্রথমোক্ত নির্দ্দেশ করে। আর জগতে যাবতীয় জীবজন্তু কি প্রকারে উদ্ভূত অথবা কি প্রকারে উহারা প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন দ্বারা চালিত হইয়া ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইতে হইতে আধুনিক আকার ধারণ করে, তাহা শেষোক্ত দেখায়।

প্রথমোক্ত বিবর্ত্তবাদ যোগবলে বা অগাধ অনুচিন্তনবলে পাওয়া যায়, আর শেষোক্ত বিবর্ত্তবাদ অগাধ পর্য্যবেক্ষণাদি বলে পাওয়া যায়। প্রথমের সপক্ষে কোনরূপ চাক্ষুষ প্রমাণ নাই; কিন্তু দ্বিতীয়ের সাপক্ষে জীবজগৎ হইতে অনেক চাক্ষুষ প্রমাণ দেওয়া যায়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ প্রথমটীকে অনুমানসিদ্ধ বলিয়া উড়ান সত্য; কিন্তু ইহা জ্ঞানজগতে যাবচ্চন্দ্রদিবাকর দেদীপ্যমান থাকিবে।

জীবনসংগ্রাম, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন ও যৌন নির্ব্বাচন।

জীবন সংগ্রাম।

এ সংসারে আমরা যে দিকে নেত্রপাত করি, সেই দিকেই দেখিতে পাই, কেবল অনন্ত সমরানল অনুক্ষণ প্রজ্বলিত ও প্রধূমিত হইতেছে। মানব মানবের সহিত, প্রতিবেশী প্রতিবেশীর সহিত, এক জাতি অপর জাতির সহিত, এক জীব অপর জীবের সহিত চিরদিন সমরে লিপ্ত আছে। এ সংসারে সকলেই স্বজীবন রক্ষায়, স্বোদর পূরণে ও স্বকীয় অবস্থার উন্নতিসাধনে তৎপর। কেহ কাহারও মুখাপেক্ষী নয়, কেহ কাহারও প্রতি দয়া ও মমতা দেখায় না, সকলেই স্বার্থপরতার বশীভূত হইয়া নিজ উদ্দেশ্য সাধনে একান্ত তৎপর।

এ সংসারে একপ্রকার জীব অন্যপ্রকার জীবকে হত্যা করিয়া তদীয় মাংসে স্বীয় উদর পুরণ করে। বলবান দুর্ব্বলকে, হিংস্র অহিংস্রকে, ক্রূর অক্রূরকে অনুক্ষণ গ্রাস করে। মনুষ্য মৎস্যকে, মৎস্য কীটাণুকে, কীটাণু পুনরায় মনুষ্যকে ভক্ষণ করে। যে যাহার আহার, তাহাকে হত্যা করিতে কাহারও কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ হয় না। কেন তুমি মৎস্য ধরিতে ও মারিতে অথবা মা কালীর সম্মুখে ছাগ বলি দিতে এত উৎসুক! কেন শ্বাপদকুল দুর্ব্বল তৃণভোজী জন্তু দিগকে বধ করিতে এত তৎপর? কেন এক জাতি অপর জাতিকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া উহার স্বাধীনতারূপ অমূল্য রত্ন হরণ করিতে এত ব্যগ্র?

এইরূপ জগতের চতুর্দ্দিকে অহরহঃ কেবল অনন্ত সমরানল প্রজ্বলিত হইতেছে। এ সমরানলে প্রত্যহ যে কত কোটী কোটী জীব প্রাণাহুতি দিতেছে; তাহার কিছুমাত্র ইয়ত্তা নাই। হে দয়াময় জগদীশ! তোমার দয়ার রাজ্যে এ কি ভীষণ দৃশ্য আমাদের নয়নপথে সদা পতিত? হে শান্তিপ্রিয় ঈশ্বর কোথায় তোমার বিশ্বরাজ্য সর্ব্বদিকে শান্তিময় হইবে, না কোথায় অনন্তকাল ব্যাপিয়া অনন্ত সমরানল অনন্তদিকে প্রজ্বলিত ও প্রধূমিত হইতেছে! হা হত-বিধে! তোমার এ কি বিড়ম্বনা! আমরা এক মুহূর্ত্ত সংগ্রাম ব্যতীত জীবন ধারণ করিতে পারি না।

সংসারে কেন এমন সমরানল চতুর্দ্দিকে চিরপ্রদীপ্ত হইল? কেন জগতে এত অশান্তি, এত অস্বস্তি, এত কাটাকাটি, এত মারামারি ও এত হুড়াহুড়ি? গভীরতম প্রদেশ অনুসন্ধান করিলে বুঝিতে পারা যায়, সংসারের প্রকৃত মঙ্গল সাধনের জন্য স্বয়ং প্রকৃতিদেবী এত নিষ্ঠুর ও নির্ম্মম ভাবে এমন জীবনসংগ্রাম সর্ব্বত্র সমভাবে প্রচারিত করিয়া রাখিয়াছেন। ইহাতে যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন (Survival of the fittest) হইয়া সংসারের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইতেছে। ইহাতে প্রত্যেক জাতির দুর্ব্বল জন্তুগুলি অন্যজাতির বলবান জন্তু দ্বারা কবলিত হওয়ায় প্রত্যেক জাতির বলবান্ জন্তুগুলি জীবনসংগ্রামে জয়ী হইয়া উৎকৃষ্ট সন্ততিবর্গ উৎপাদন করত স্বজাতির ক্রমোন্নতি সাধন করে। ইহাতে প্রত্যেক ব্যক্তির বুদ্ধিশক্তি ও বলবীর্য্য সম্যক্ স্ফুরিত হওয়ায় তিনি নিজের প্রতিদ্বন্দ্বি বর্গকে সংসারে পশ্চাৎপদ করিয়া নিজের উন্নতি-সাধন করেন। এই প্রকারে এই বিশ্বজনীন জীবনসংগ্রাম দ্বারা প্রত্যেক মানবজাতির, প্রত্যেক জীবজাতির

এমন কি প্রত্যেক ব্যক্তির ও জীবের ক্রমোন্নতি সাধন হইয়া জগতের অশেষ মঙ্গল সাধিত হইতেছে।

প্রকৃতি স্বভাবতঃ অবনতির দিকে ধাবমানা। যেমন নদনদী উচ্চ পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে উত্থিত হইয়া ক্রমশঃ নিম্নগামিনী হয়, সেইরূপ সৃষ্টিও মহোচ্চ স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমাগত অধোগামিনী হইতেছে। এজন্য সূক্ষ্ম জগৎ ক্রমশঃ অধোগত হইয়া স্থূল জগতে পরিণত হয় এবং প্রাচীন যুগের বৃহদাকার জীবজন্তুগুলি কালক্রমে ভূপৃষ্ঠে লুপ্ত হয় বা খর্ব্বকায় হইয়া পড়ে। এরূপ অবস্থায় যদি জীবনসংগ্রামরূপ সর্ব্বজনীন উন্নতির উপায় সকল জীবজন্তুর ভিতর প্রচলিত না থাকিত, সৃষ্টি অচিরে ধ্বংস পাইত। এখন বুঝিয়া দেখ, কোন্ মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এমন কঠোর জীবনসংগ্রাম সংসারে চলিতেছে।

এই প্রকারে জীবন সংগ্রাম দ্বারা জগতের অশেষ মঙ্গল সাধিত হইতেছে। ইহাতে প্রত্যেক জাতির বলিষ্ঠ সন্তানগুলি ক্রমশঃ উদ্বর্ত্তিত হওয়ায় জাতীয় উন্নতি সুচারুরূপে সংসাধিত হয়। ইহাতে প্রত্যেক জাতির, প্রত্যেক জীবজন্তুর বুদ্ধি-শক্তি ও বলবীর্য্য সম্যক্ স্ফুরিত হয়, জীবনসংগ্রামের সেই ভীষণ শোণিতপাত সেই ভীষণ যন্ত্রণা, সেই ভীষণ আর্ত্তনাদের ভিতর সর্ব্বমঙ্গলা সংসারের যে কত মঙ্গল সাধন করিতেছেন, তাহা অবোধ আমরা কি বুঝিব? অশেষ দুঃখানলে সুখসলিল প্রদান করা, অশেষ ঝঞ্ঝাবাতে শান্তিতৈল নিক্ষেপ করা সর্ব্বমঙ্গলার ইচ্ছা।

আমরা অনুক্ষণ যেরূপ জীবনসংগ্রামে লিপ্ত হই, প্রকৃতি জগৎ, জীবজগৎ, ও সমাজজগতের প্রতিদ্বন্দিবর্গের সহিত আমরা জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে যেরূপ ভীষণ সংগ্রামে ব্যাপৃত হই, তাহাতে আমাদের বুদ্ধিশক্তির কত উন্মেষ, শারীরিক ও মানসিক বলবীর্য্যের কত স্ফুরণ হয় এবং কালোচিত শঠতা ও চাতুর্য্যে কত নৈপুণ্য লাভ হয়, তাহা কি তোমরা একবার ভাবিয়া দেখিবে?

এই জীবনসংগ্রামের অনুকরণে আজকাল সভ্য জগতে প্রতিযোগিতা প্রথা এত আদরণীয়া ও প্রশংসনীয়। যে কোন বিষয় হউক না, যিনি প্রতি-যোগিতায় শ্রেষ্ঠ, তিনি সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও মাননীয়! আজকাল সংসারে যিনি পাঁচ জনের চক্ষে ধূলি প্রদান করিয়া নিজের স্বার্থসিদ্ধি করিতে পারেন,

তিনি জীবনসংগ্রামে জয়লাভ করেন। সভ্যজগতে আজকাল কূটরাজনীতির কত সমাদর ও প্রশংসা দেখা যায়।

প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন

এই মহাবাক্য ব্যবহার করিয়া ডার্ব্বিনপ্রমুখ ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ জীবতত্ত্বের নানা রহস্য মীমাংসা করেন। এস্থলে উহার প্রকৃত অর্থ ব্যাখান করা কর্ত্তব্য।

জীবজগতে দেখা যায়, যে জীবে যে কোন বিষয়ের অনাটন, অভাব ও প্রয়োজন উপস্থিত হয়, সেই অনাটন কালসহকারে স্বতঃ পূর্ণ হইয়া থাকে। এইরূপে অনাটন পূরণ করাই প্রকৃতির স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম। প্রকৃতি যে প্রক্রিয়া বলে জীবজগতের অনাটন পূরণ করে, তাহা উহা স্বয়ং পছন্দ করিয়া লয় বলিয়া ঐ প্রক্রিয়াকে তাঁহারা প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন (Natural selection) এই মহদাখ্যা প্রদান করেন।

কয়েক দৃষ্টান্ত দ্বারা এ বিষয় বুঝান আবশ্যক। মনে কর, নিকৃষ্ট জীবোৎপন্ন মানব এক সময়ে পশুর ন্যায় লোমাবৃত ছিল। এখন তদীয় দেহে সেই লোমাবলির অবশিষ্ট মাত্র দেখা যায়। এখন জিজ্ঞাস্য, আদিম মানবের রোমগুলি তদীয় বংশধরদিগের গাত্র হইতে কি প্রকারে উৎপাটিত হইয়া গেল? নিশ্চয় জানিবে, বহু কাল ধরিয়া কৃত্রিমবস্ত্রাদি ব্যবহার করিতে করিতে রোমগুলি তদীয় দেহ হইতে স্বতঃ উঠিয়া গিয়াছে। প্রকৃতির স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম এই, যে বস্তুর আদৌ প্রয়োজন নাই, সে বস্তু দেহে অস্ফুটভাবে থাকিবে। এজন্য রোমগুলি দেহ হইতে উঠিয়া গিয়া অস্ফুটভাবে রহিয়াছে। এস্থলে জন সাধারণ বলিবে, পরমেশ্বর মানবজাতিকে ইতর জন্তু হইতে পৃথক করিবার জন্য রোমশূন্য সৃজন করিয়াছেন। কিন্তু বিজ্ঞান বলে, স্বয়ং প্রকৃতি প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন দ্বারা বস্ত্র পরিহিত মানবের দেহ হইতে রোমগুলি কালক্রমে উঠাইয়া দিয়াছে। রোমশূন্য হওয়াই তাদৃশ মানবের প্রকৃত অনাটন এবং প্রকৃতি স্বয়ং কালক্রমে সে অনাটন পূর্ণ করিয়াছে।

এই যে মানব এত কাল ধরিয়া অগ্নিপক্ক ভক্ষ্যদ্রব্য ভোজন করিতেছেন; ইহাতে তাঁহার দন্তের বল ক্রমশঃ হ্রাস পাইবে, এবং কালে তিনি অদন্ত হইয়া যাইবেন। এই যে তিনি আজকাল বিদ্যুতালোক ব্যবহার করিতে শিখিয়াছেন;

ইহাতে তাঁহার চক্ষুর তেজ ক্রমশঃ মন্দীভূত হইবে অথবা বহুকাল পরে ইহা নষ্ট হইয়া যাইবে।

জীবজগতে আর একটী সাধারণ নিয়ম দেখা যায়, জীবগণের চতুর্দ্দিকস্থ বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার যেরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে, নূতন অবস্থায় অবস্থিতির জন্য উহারা অবস্থাপযোগী শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করিতে শিক্ষা করে। এরূপ পরিবর্ত্তন না ঘটিলে উহারা জীবনসংগ্রামে জয়লাভ করিয়া জগতে স্থায়ী হইতে পারেনা। যেমন সংসারে সকল বিষয়ে পরিবর্ত্তনই যুগধর্ম্ম, সেইরূপ যুগপরিবর্ত্তনে যাহারা অবস্থার বৈষম্যে পতিত হইয়া আপনাদের শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটাইতে সক্ষম হয়, তদীয় বংশধরেরা জীবজগতে উন্নতিসাধন করিতে থাকে। আর যাহারা সে বিষয়ে অপারগ হয় তাহারা কালক্রমে ভূপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

এইরূপ অবস্থাবিপর্য্যয়ে প্রয়োজনানুসারে জীবের শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতির যে পরিবর্ত্তন ক্রমশঃ ঘটিতে থাকে, তাহা প্রকৃতি স্বয়ং ঘটাইয়া উহাকে জীবজগতে স্থায়ী করিয়া দেয়। যে সকল প্রক্রিয়া বশতঃ প্রকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহা প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে সম্পাদিত বলা উচিত। এস্থলে প্রকৃতি স্বয়ং পছন্দ করিয়া ঐ সকল পরিবর্ত্তন ঘটায়; এজন্য ইহার নাম প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন।

দেখ, জলচর হংসজাতির পাদদ্বয়ের অঙ্গুলিগুলি চর্ম্মলিপ্ত। জলে থাকিয়া সন্তরণ দিয়া আহার অন্বেষণের জন্য প্রকৃতি স্বয়ং ঐরূপ ঘটাইয়া দেয়। কিন্তু স্থলচর হংসজাতির ঐরূপ আবশ্যকতা নাই বলিয়া উহাদের অঙ্গুলি চর্ম্মলিপ্ত নয়। এস্থলে জনসাধারণ বলিবে, ঈশ্বর হংসজাতিকে জলচর করিবার জন্য উহার অঙ্গুলিগুলি চর্ম্মলিপ্ত করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু বিজ্ঞান একথার উপর উপহাস করিয়া বলিবে, যে সকল উড্ডয়নশীল স্থলচর হংস জলে থাকিতে ভাল বাসিত, উহাদের বংশধরদিগের পদদ্বয়ের অঙ্গুলিগুলি কালে চর্ম্মলিপ্ত ও পক্ষদ্বয় ক্ষুদ্র হওয়াতে উহারা জলচর হংসজাতিতে পরিণত হইয়াছে। এখনও উভয় প্রকার হংসজাতি দেখা যায়।

দেখ, উষ্ট্রের পঞ্চম পাকস্থলী আছে। ইহাতে এত জল সঞ্চিত থাকে যে ৭।৮ দিন জলপান না করিয়াও উষ্ট্র অনায়াসে দুস্তর মরুভূমি পার হইয়া

যায়। এস্থলে সকলেই বলিবেন, জলাশয়বিহীন মরুভূমিতে ভ্রমণের উপযুক্ত করিবার জন্য পরমেশ্বর উষ্ট্রজাতিকে পঞ্চম পাকস্থলী দিয়াছেন। বিজ্ঞান এ কথার উপর উপহাস করিয়া বলিবে, ঐ জাতির পঞ্চম পাকস্থলীগঠন প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে ঘটিয়াছে। সহস্র সহস্র বৎসর মরুভূমিতে ভ্রমণ করিতে করিতে ঐ জাতি জলের অনাটন বিশেষরূপে অনুভব করিত। সে স্থলে প্রকৃতি স্বয়ং উহাদের অনাটন পূরণ করিবার জন্য স্বতন্ত্র পাকস্থলী কালে গঠন করিয়াছে। এক দিনে বা এক বৎসরে উহা গঠিত হয় নাই; পরন্তু সহস্র সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া অল্পে অল্পে বাড়িতে বাড়িতে ঐ স্বতন্ত্র পাকস্থলী গঠিত হইয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, ভৌতত্ত্বিক বিপ্লব দ্বারা যুগে যুগে পৃথিবীর কত দেশ দেশান্তর জলধিগর্ভে নিমগ্ন বা উহা হইতে উত্থিত হইয়াছে। এরূপ প্রাকৃতিক বিপ্লবে কত স্থলচর জন্তু কালসহকারে জলচর জন্তুতে এবং কত জলচর জন্তু কালসহকারে স্থলচর জন্তুতে পরিণত হইয়াছে। বলি, জীবদেহে এতদূর পরিবর্ত্তন কি প্রকারে ঘটিতে পারে? যখন দেশবিশেষ জলমগ্ন হয়, যে স্থলে অগাধ জল, তথায় সমুদয় স্থলচর জন্তু নষ্ট হইয়া যায়; কিন্তু যে স্থলে অল্প জল থাকে, তথায় অধিকাংশ স্থলচর জন্তু কায়ক্লেশে জীবন ধারণ করে। অবস্থাবৈষম্যে পতিত হইয়া উহারা যে সকল অনাটন অনুভব করে, উহাদের বংশধরদিগর দেহে প্রকৃতি স্বয়ং সে সকল অনাটন কালে পূরণ করিয়া থাকে। এই প্রকারে নানা স্থলচর জন্তু কালে জলচর জন্তুতে পরিণত হইয়া যায়। এই প্রকারে সমুদ্রের জলহস্তী, জলসিংহ, জলকুকুর প্রভৃতি জলচর পশুগুলি জগতে উদ্ভূত। সেইরূপ যখন দেশবিশেষ সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থিত হয়, অনেক জলচর জন্তুও কালসহকারে স্থলচর জন্তুতে পরিণত হইয়া থাকে। এই প্রকারে অনেক উভচর জন্তু উৎপন্ন হইয়াছে। বিজ্ঞান বলে, জীবদেহের এতদূর পরিবর্ত্তন একমাত্র প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের কার্য্য।

ডার্ব্বিণপ্রমুখ ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনকে জীবজগতে সর্ব্বকর্ত্তৃত্বপদে ও সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব পদে আরূঢ় করেন। তাঁহারা যে পরব্রহ্ম বিশ্বের অজ্ঞেয় আদিকারণ, তাঁহার বিশ্বব্যাপিনী চিৎশক্তি স্বীকার করুন বা না করুন, তাঁহারা বলেন, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনই জীবজগতে সর্ব্বেসর্ব্বা এবং ইহাই সকল প্রাণিজাতির সৃষ্টিকর্ত্তা। তাঁহাদের মতে পৃথিবীস্থ যাবতীয় জীবজন্তু একখণ্ড

প্রোটোপ্ল্যাসমের ক্রমবিবর্ত্তনে কোটী কোটী বৎসর পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তন সহ্য করিতে করিতে নানা অবস্থায় পতিত হইয়া ও ক্রমোন্নত হইয়া আধুনিক শ্রেণিগত প্রভেদ ও উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।

(যৌন নির্ব্বাচন)

(Sexual selection.)

জীবজগৎ অনুসন্ধান করিলে, আরও বুঝা যায়, অনেক স্থলে পুংজাতীয় জীব স্ত্রী জাতীয় জীব হইতে অল্পাধিক পৃথক্। যেমন প্রকৃতি যাবতীয় জীবজন্তুদিগের মধ্যে শ্রেণীগত নানা পার্থক্য আনয়ন করে, সেইরূপ ইহা প্রত্যেক জাতির মধ্যে লিঙ্গভেদবশতঃ আবার নানা পার্থক্য রাখিয়া দেয়। হস্তীর দন্ত, সিংহের কেশর, বৃষের কুকুদ্ প্রভৃতি এ বিষয়ে যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করে।

লিঙ্গভেদ বশতঃ জীবদেহে যে সকল অনাটন অনুভূত হয়, তাহাও স্বতঃ পূর্ণ হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, এরূপ স্থলে যৌননির্ব্বাচন দেহের অনাটনগুলি পূরণ করিয়া দেয়। পুংজাতীয় কোকিলের কলকণ্ঠ স্ত্রীজাতীয় কোকিলের মন মুগ্ধ করিবার জন্য স্ফুরিত হয়। ময়ুব ময়ূরীকে মোহিত করিবার জন্য নৃত্য করিতে শিখে এবং উহার পুচ্ছদেশ নানা বর্ণে চিত্রিত হইয়া থাকে। এইরূপ যাবতীয় জীবজন্তুদিগের ভিতর লিঙ্গভেদবশতঃ পার্থক্যগুলি যৌন নির্ব্বাচনে সম্পাদিত হয়।

সমালোচনা।

প্রাকৃতিক ও যৌন নির্ব্বাচন এই দুইটী শ্রুতিমনোহর বৃহৎ শব্দ। হঠাৎ শুনিলে সকলের মনে চমক লাগিবে। এখন জিজ্ঞাস্য, ইহারা কি জগতের মহাশক্তি, যে ইহারা যাবতীয় জীবজন্তু সৃজন করে এবং উহাদের শ্রেণীগত ও লিঙ্গগত পার্থক্য আনয়ন করে? এ কথা কি বিশ্বাসযোগ্য? পূর্ব্বে নাস্তিকগণ যেমন প্রকৃতির দোহাই দিয়া ঈশ্বর অস্বীকার করিতেন, আজকাল ইউরোপীয় পণ্ডিত বর্গ ঐ দুই মহাশব্দ ব্যবহার করিয়া কার্য্যতঃ ঈশ্বর মানেন না।

জড় ও জড়শক্তি লইয়া প্রকৃতি। এই প্রকৃতি অন্ধ ও চিৎশক্তিরহিত। একটা অন্ধ শক্তির অন্ধক্রিয়ার উপর এ জগতের যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ আরোপ করা কি যুক্তিসঙ্গত? জড়বাদিগণের ইহা একটী মহৎ ভ্রম, যে তাঁহারা অন্ধ

প্রকৃতির স্কন্ধে চিৎশক্তির কার্য্যগুলি আরোপ করেন। প্রকৃতির যে সকল ক্রিয়াকলাপ তাঁহারা প্রাকৃতিক বা যৌন নির্ব্বাচনে সম্পাদিত মনে করেন, ভালরূপ অনুধাবন করিলে বুঝা যায় যদিও ঐ সকল ক্রিয়া প্রাকৃতিক নিয়মাবলি অনুসারে ঘটিতেছে, তথাচ পরব্রহ্মের বিশ্বব্যাপিনী চিৎশক্তি উহাদের মূলাধার। প্রকৃতির অভাব ও অনাটন স্বতঃ পূর্ণ হয় বলিয়া আমরা কেমন করিয়া বলিব, অন্ধ প্রকৃতি নিজের অভাব নিজে পূরণ করিতেছে। এ মায়া জগতে আমরা মায়াঠুলি পরিয়া আছি, সে জন্য মায়াতীত পরব্রহ্ম জানি না বা বুঝি না; তাই বলিয়া তাঁহার অনন্ত চিৎশক্তির অনন্ত কার্য্যপ্রণালী চতুর্দ্দিকে চক্ষে দেখিয়াও তাহা স্বীকার করিব না, এ কেমন কথা? এস্থলে সাংখ্যকার প্রকৃতির সহিত পুরুষের অবতারণা করিয়া যথার্থ মত প্রকাশ করিয়াছেন। পুরুষ আর কিছুই নয়, কেবল পরব্রহ্মের অনন্ত চিৎশক্তি।

এ বিষয় মীমাংসা করিবার জন্য শাস্ত্র অন্ধপঙ্গুর ন্যায় উল্লেখ করে। প্রকৃতি অন্ধ ও পুরুষ পঙ্গু। গন্তব্য পথে যাইতে উভয়েই একাকী অসমর্থ। কিন্তু যখন পঙ্গু অন্ধের স্কন্ধে আরূঢ় হয়, তখন পঙ্গু অন্ধকে চালিত করিয়া যথার্থ গন্তব্য পথে লইয়া যায়। সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় ব্যাপারে অন্ধ জড়প্রকৃতি একমাত্র পঙ্গুস্বরূপ পরব্রহ্মের চিৎশক্তি দ্বারা চালিত হইতেছে। প্রকৃতি নৌকাবিশেষ, চিৎশক্তি উহার কর্ণধার।

সূক্ষ্ম পরমাণু হইতে বিশাল সূর্য্য পর্য্যন্ত জগতের প্রত্যেক বস্তুতে পরব্রহ্মের যে চিৎশক্তি বা ঐশ্বরিক বুদ্ধি অন্তর্নিহিত আছে, যাহার গুণে ভৌতিক শক্তিগুলি যাবতীয় ভৌতিক পদার্থকে কয়েক সুমহৎ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য চালিত করে এবং যাহার গুণে বিশ্বসংসারে এমন সার্ব্বজনীন অলৌকিক সামঞ্জস্য ও সুশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই বিশ্বব্যাপিনী চিৎশক্তি সকল বিষয়ের মূলাধার এবং অন্ধ জড়প্রকৃতি ইহার পরিচারিকা মাত্র। তবে কেন তোমরা বিজ্ঞানোক্ত প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনরূপ মহৎ বাক্যে বিমোহিত হইতেছ? বেশ জানিবে নবোত্থিত নববিজ্ঞান যে সকল উপায়ে লোকের মনে ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস মন্দীভূত করিতে চেষ্টা পায়, তন্মধ্যে ইহা একটী উহার প্রধান উপায়। স্মরণ রাখিবে, প্রাকৃতিকনির্ব্বাচন কেবল একটা কথার কথা মাত্র।

চতুর্থ অধ্যায়।

মানবধর্ম্ম।

ধর্ম্ম শব্দের প্রকৃত অর্থ কি, ইহা লইয়া আজকাল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতর বিস্তর বাদানুবাদ চলিতেছে। ইংরাজি প্রতিবাক্য (Religion) লইয়া ইহার অর্থ করিতে গেলে বাঙ্গালাভাষায় ধর্ম্ম শব্দের ভিতর যে বিশ্বোদার ভাব অন্তর্নিহিত আছে, তাহা সম্যক ব্যক্ত করা হয় না।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে পাশ্চাত্য জগতের সহিত প্রাচ্যজগতের বিস্তর প্রভেদ দেখা যায়। পাশ্চাত্য জগতে জ্ঞানোন্নতির সহিত ধর্ম্মের অন্তর্নিহিত ভাব ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে। তথায় পার্থিব জ্ঞানের যত উন্নতি সাধিত হইতেছে, ইহা ধর্ম্মবিষয়ক জ্ঞান হইতে তত বিভিন্ন হইয়া পড়িতেছে। তথায় ঐহিক সমাজবন্ধন ও পারত্রিক মঙ্গলসাধন ধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য। সপ্তম দিবসে গির্জ্জায় পাঁচজন মিলিত হইয়া ঈশ্বরের উপাসনা করা সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মানুষ্ঠান এবং ঈশ্বর ও পরলোকে বিশ্বাস ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। প্রাচ্যজগতে ধর্ম্মের অন্তর্নিহিত ভাব জ্ঞানোন্নতির সহিত ক্রমশঃ বিস্তারিত ও প্রসারিত হইয়াছে। তথায় পার্থিব জ্ঞান ও ধর্ম্মজ্ঞানের ভিতর স্বল্প প্রভেদ এবং যে পরিমাণে পার্থিব জ্ঞানের উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহা কেবল ধর্ম্মের বিশ্বোদার ভাব স্ফুরণ করিতে প্রযুক্ত হইয়াছে।

যাহা ধারণ করে, তাহাই ধর্ম্ম। যে বস্তুর যে গুণ, তাহাই উহার ধর্ম্ম। আত্মা, মন, দেহ, পরিবার, সমাজ ও রাজ্যশাসন এই সকল বিষয় লইয়া ধর্ম্ম প্রাচ্যজগতে প্রযুক্ত বা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ধর্ম্ম অবিনশ্বর আত্মার প্রধান গুণ। ইহা উহার সর্ব্বপ্রধান আধার ও সহায়। ইহা অনন্ত কাল ব্যাপিয়া উহার একমাত্র সাথের সাথী। ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল সাধন, শারীরিক ও মানসিক মঙ্গল সাধন, আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক মঙ্গল সাধন, পারিবারিক ও সামাজিক মঙ্গল সাধন, ইত্যাদি আমাদের ধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য।

ধর্ম্ম আমাদের জীবনের প্রত্যেক কর্ম্মের উপর, সমাজের প্রত্যেক অনুষ্ঠান ও রীতিনীতির উপর স্বীয় প্রীতিপ্রদ অনুশাসন চিরদিন পূর্ণভাবে চালাইতেছে। ধর্ম্ম আমাদের ঐহিক ও পারত্রিক সুখের উপায়স্বরূপ এবং ভবপারাবারে আমাদের একমাত্র কাণ্ডারী।

জগতের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে বুঝা যায়, ধর্ম্ম সকল দেশে কি সুমহৎ কার্য্যসম্পাদন করিয়াছে। ইহাই মানবকে পরিবারবর্গে বেষ্টিত ও সমাজবদ্ধ করিয়া লোকালয়ে সুখসচ্ছন্দে বসবাস করিতে শিক্ষা দিয়াছে। যে জাতীয় সাধনার গুণে বা যে জ্ঞানানুশীলন বলে তিনি আজ জগতের জীবরাজ হইয়া নন্দন-কাননতুল্যা বসুন্ধরা ভোগ করিতেছেন, ধর্ম্মই সে বিষয়ে তাঁহার প্রধান সহায়। সত্য বটে আজকাল সভ্যজগতে ধর্ম্মের তাদৃশ সমাদর নাই এবং তৎপরিবর্ত্তে জ্ঞানের প্রতাপ ও প্রতিপত্তি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে; কিন্তু পূর্ব্বে তাঁহার জাতীয় জীবনে সর্ব্বপ্রকার উন্নতি এক-মাত্র ধর্ম্ম সম্বন্ধে সংঘটিত হইয়াছিল। ভাষা, সাহিত্য, কাব্য, দর্শন, সঙ্গীত, শিল্প, স্থাপতিবিদ্যা, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, কৃষিকর্ম্ম, দেশাচার, রাজনীতি, সমাজ-নীতি, দিগ্বিজয় প্রভৃতি সকল বিষয়ে ধর্ম্ম তাঁহার একমাত্র চালক ও পথদর্শক ছিল। এমন কি, এক ধর্ম্মের উন্নতিতে সমাজের উন্নতি এবং ইহার অবনতিতে সমাজের অবনতি সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইয়াছে।

ধর্ম্মবিজ্ঞান বলে, ধর্ম্ম মানবহৃদয়ে বিশ্বস্রষ্টা ঈশ্বরের জ্ঞান প্রস্ফুরিত করে, আধ্যাত্মিক উন্নতিকল্পে তাঁহাকে অশেষ গুণের পূর্ণ আদর্শস্বরূপ দেখায় এবং সংসাররূপ মহাদাবানলে দগ্ধীভূত মানবহৃদয়ে সান্তনা করি। ধর্ম্ম সকল দেশে মানব পরিবারকেন্দ্র প্রণালীতে গঠিত করিয়া হৃদয়ে নানা অভিষিঞ্চন পারিবারিক ভাব স্ফুরণ করে এবং মানবসমাজকে সুপ্রণালীতে ও সুশৃঙ্খলতার সহিত আবদ্ধ করিয়া জাতীয় উন্নতি সাধনে সম্যক সাহার্য্য করে।

যে ধর্ম্ম সমাজের এত মহোপকার সাধন করিয়াছে সে ধর্ম্ম আবার লোকের বুদ্ধিভ্রংশবশতঃ বিষম অনর্থপাত আনয়ন করিত। তাহার সাক্ষ্য দেখনা, মুসল-মানযুগে ধর্ম্মপ্রচারোদ্দেশে নানা দেশ কিরূপ নরকবিনিঃসৃত শোণিতপ্রবাহে প্লাবিত হইয়াছিল, তাহা ভাবিলে কাহার না শরীরে লোমহর্ষণ উপস্থিত হইবে। চারিশত বৎসর পূর্ব্বে সুসভ্য ইউরোপখণ্ডে ধর্ম্মাত্মাগণ ভিন্নমতাবলম্বী বিপক্ষ-

বর্গের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া কিরূপে জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে প্রাণাহুতি দিয়াছেন বা চিরজীবন কারাগারে কিরূপ অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন, তাহা ভাবিলে এখনও আমাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, ধর্ম্মসম্বন্ধে যাহা কিছু সংসারে সংঘটিত হইয়াছে,তাহা অপাতদর্শনে বিষম অনিষ্টকর হইলেও পরিণামে তাহাতে সমাজের অশেষ মঙ্গল সাধিত হইয়াছে। দেখ, ধর্ম্মপ্রচারোদ্দেশে একজাতি অপর জাতির সংঘর্ষে আনীত হওয়ায় উহাদের জাতীয় উন্নতি কতদিকে সাধিত হইয়াছে! ধর্ম্মজীবন মহাত্মাগণ অগ্নিকুণ্ডে দগ্ধ হইয়া লোকবর্গকে কিরূপ উৎকৃষ্ট ধর্ম্মোপদেশ দিয়া গিয়াছেন! সেই ভীষণ সমরানল, সেই ভীষণ নরহত্যা সেই ভীষণ নগরলুণ্ঠন, সেই ভীষণ যন্ত্রণা রাশির ভিতরও ধর্ম্ম স্বীয় সুবিমল জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া সকলকে সুখের পথ, শান্তির পথ ও উন্নতির পথ দেখাইয়া দিয়াছে।

পৃথিবীতে যত প্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে বৌদ্ধ, খৃষ্ট, মুসলমান, হিন্দু প্রধান। আবার প্রত্যেক ধর্ম্ম যৎসামান্য মতভেদ লইয়া ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত। বৌদ্ধদিগের ভিতর মহায়ন ও হীনায়ন, খৃষ্টানদিগের ভিতর প্রটেষ্টাণ্ট, রোমান ক্যাথলিক ও গ্রীকচার্চ্চ, মুসলমানদিগের ভিতর সীয়া ও সুন্নী, হিন্দুদিগের ভিতর শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায়-বর্গ এ বিষযে সাক্ষ্য দিতেছে। চিরকালই ধর্ম্মজগতে ধর্ম্মের মতামত লইয়া ঘোরতর বিবাদবিসম্বাদ চলিতেছে। এক ঈশ্বরের রাজ্যে একপ্রকার ধর্ম্ম সংস্থাপন করিবার জন্য সকল দেশের ধর্ম্মাত্মাগণ সাধ্যমত চেষ্টা পাইয়াছেন, এমন কি তাঁহারা পুরাকালের সহস্র সহস্র ধর্ম্মগ্রন্থ নষ্ট করিয়া মানবের জাতীয় জ্ঞানভাণ্ডার সম্যক লুণ্ঠন করিয়াছেন এবং শত শত দেবালয় ভগ্ন করিয়া পূর্ব্বতন ধর্ম্মের সমূলোচ্ছেদ সাধন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে। এ জগতে কেহই এক ধর্ম্ম স্থাপন করিতে সমর্থ হন নাই বা হইবেন না। অনন্ত বৈচিত্র্যবিশিষ্ট পৃথিবীতে ধর্ম্ম সম্বন্ধে একমত হওয়া অসম্ভব।

শাস্ত্রপাঠে অবগত হওয়া যায়, সৃষ্টির সত্যত্রেতা দ্বাপর যুগে দেবাসুরদিগের ভিতর সনাতন অকৃত্রিম ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা ও যোগাভ্যাস ইহার প্রধান অঙ্গ। তদানীন্তন পৃথিবীর অধিবাসিগণের আধ্যাত্মিক শক্তি পূর্ণভাবে বিকসিত ছিল বলিয়া তাঁহারা যোগাভ্যাস বা ঘোর তপস্যা করিয়া অলৌ-

কিক ক্ষমতা সহজে প্রাপ্ত হইতেন। শাস্ত্রের এ সকল কথা উন্নত বিজ্ঞানের নিকট অলীক উপকথা বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু যে সকল প্রাকৃতিক বিপ্লব দ্বারা পৃথিবী ইহার অধিবাসিগণের সহিত পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে, যতদিন না বিজ্ঞান সে সকল ঘটনা ভালরূপ প্রমাণিত করিতে পারিতেছে, ততদিন আমরা পুরাণের কথাই শিরোধার্য্য করিয়া লইব।

পরে এই কলিযুগে মানবের আধ্যাত্মিক অধঃপতন ও কৃত্রিম জ্ঞানশক্তির ক্রমস্ফূর্ত্তি বশতঃ সংসারে সনাতন ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে কৃত্রিম ধর্ম্ম প্রবল হইয়া উঠে। যে সকল ধর্ম্ম লোকবিশেষ কর্ত্তৃক প্রচারিত তাহাই কৃত্রিম ধর্ম্ম; এ জন্য খৃষ্টাদি ধর্ম্মগুলির প্রাদুর্ভাব ও প্রতিপত্তি জগতে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।

সকল ধর্ম্ম তন্ন তন্ন করিয়া পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায়, প্রত্যেক ধর্ম্মে দুইটী রূপ বিদ্যমান, একটী ইহার ব্যক্ত রূপ (Exoteric form), অপরটী ইহার অব্যক্ত রূপ (Isoteric form)। ইহার অব্যক্ত রূপ প্রাচীন কালের যোগেশ্বর প্রকটিত অধ্যাত্মবিজ্ঞানসম্মত সেই সনাতন অকৃত্রিম ধর্ম্ম। ইহা চিরদিন গূঢ় ও অপরিবর্ত্তন শীল। সকল দেশের মহাত্মাগণ এ ধর্ম্মের বিষয় ভালরূপ অবগত আছেন। তাঁহারা বাহ্য দর্শনে যে ধর্ম্মাবলম্বী হউন না কেন, তাঁহারা গোপনে ইহার অনুশীলন করেন। ধর্ম্মের বাহ্য রূপ সাধারণপ্রচলিত ধর্ম্মবিষয়ক মতামতের সমষ্টিমাত্র; ইহা চিরদিন কালোচিত ও দেশোচিত। কালে কালে ইহার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে।

ধর্ম্মের অব্যক্ত রূপই সকল ধর্ম্মের আদ্যস্তব বা উহাদের প্রধান আকর। ইহা যোগেশ্বরপ্রকটিত বলিয়া গঙ্গোত্রীনিঃসৃত গঙ্গোদকের ন্যায় চিরদিন পবিত্র ও বিশুদ্ধ। কিন্তু কলিকালে মানবের আধ্যাত্মিক অধঃপতনবশতঃ ইহা ক্রমশঃ কলুষিত হইয়া বিকৃত ভাব ধারণ করিয়াছে। সকল দেশের অজ্ঞ জনসাধারণের বিদ্যাবুদ্ধি যখন যেরূপ বিকসিত, উহারা যখন যেরূপ ধর্ম্মোপদেশ বুঝিতে সক্ষম, যোগেশ্বরগণ তৎকালে উহাদিগকে তদনুরূপ ধর্ম্মোপদেশ দিয়া গিয়াছেন। যখন উহারা কেবল যাগযজ্ঞ বুঝিতে সক্ষম, তখন যোগেশ্বরগণ (বশিষ্ঠাদি মহর্ষি-গণ). উহাদিগকে যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করাইয়াছেন। যখন উহারা সামাজিক ধর্ম্ম পালন করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভে ও সমাজের উন্নতি সাধনে ব্যগ্র, তখন যোগেশ্বরগণ (বুদ্ধাদি) উহাদিগকে সামাজিক ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছেন। যখন

উহারা মায়াতীত পরব্রহ্মের মায়ারূপ বুঝিতে ব্যগ্র, তখন যোগেশ্বরগণ (খৃষ্টাদি) উহাদিগকে মানবমনের প্রকৃত্যনুযায়ী লৌকিক ঈশ্বর দেখাইয়াছেন। এইরূপে ধর্ম্মের ব্যক্তরূপ চিরদিন পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। বশিষ্টাদি আর্য্য ঋষিগণ, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, ঈশা, মূসা, মহম্মদ, শঙ্করাচার্য্য, চৈতন্য প্রভৃতি সকলেই কালোচিত ধর্ম্মমত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তদ্ভিন্ন জনসাধারণকে যথার্থ ধর্ম্মপথে লইয়া যাইবার অন্য উপায় নাই।

ইতিহাস পাঠে বুঝা যায়, জ্ঞানজগতে মধ্যে মধ্যে প্রতিভাশালী কবিবর ও পণ্ডিতবর দেশবিশেষে আবির্ভূত হইয়া জ্ঞানের অসাধারণ উন্নতি সাধন করিয়া থাকেন। তাঁহারাই নিজ নিজ দেশে জাতীয় হৃদয় গঠন করেন। ইংলণ্ডে সেক্ষপিয়র ও মিল্টন, এ দেশে বাল্মীকি ও কালিদাস এইরূপে জাতীয় হৃদয় চিরদিন গঠন করিতেছেন। সেইরূপ ধর্ম্মজগতেও এক এক যোগেশ্বর মহাত্মা মধ্যে মধ্যে আবির্ভূত হইয়া দুন্দুভিস্বরে নূতন ধর্ম্মমত প্রচার করত ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করিয়া যান। তাঁহারাও জাতীয় জীবন ও জাতীয় হৃদয় বিশেষরূপে গঠন করিয়া থাকেন।

আবার প্রত্যেক ধর্ম্মকে অন্য প্রকারে বিশ্লিষ্ট করিলে বুঝা যায়, ইহা দুই ভাগে বিভক্ত, প্রাকৃতিক ধর্ম্ম ও বৈশেষিক ধর্ম্ম। সকল ধর্ম্মের মৌলিক সাধারণ বিশ্বাস ও মতামতের সমষ্টিকে প্রাকৃতিক ধর্ম্ম বলা উচিত। পরমাত্মা বা পরমেশ্বর বিশ্বের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা, আত্মা অমর, চুরিকরা মহাপাপ ইত্যাদি ধর্ম্মের সাধারণ মতামত প্রাকৃতিক ধর্ম্মের অন্তর্গত। যাবতীয় ধর্ম্ম অন্যান্য বিষয়ে ভিন্ন মতাবলম্বী হইলেও উহাদের অন্তর্গত প্রাকৃতিক ধর্ম্মে কোন প্রকার ভেদাভেদ নাই। মানবপ্রকৃতি সকল দেশে একরূপ বলিয়া এ ধর্ম্মও সর্ব্বত্র একরূপ। কিন্তু ইহা সকল দেশে বৈশেষিক ধর্ম্মের সহিত অল্পাধিক মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। ধর্ম্মের বৈশেষিক অংশ দেশবিশেষে বা জাতিবিশেষে উদ্ভূত। এই অংশ লইয়া একধর্ম্ম অন্যধর্ম্মের সহিত চিরদিন বিবাদবিসম্বাদে লিপ্ত। বৈশেষিক মতামত লইয়াই সংসারে এত ধর্ম্মবিদ্বেষ ও জাতিবিদ্বেষ চলিতেছে। জাতীয়তা রক্ষা করিয়া স্বজাতিকে অন্যান্য জাতি হইতে চিরদিন বিশিষ্ট রাখিবার জন্য সকল দেশের জনসাধারণ কেবল বৈশেষিক ধর্ম্মপালনে একান্ত তৎপর।

প্রাকৃতিক ধর্ম্ম।

প্রথম অংশ।

যে প্রাকৃতিক ধর্ম্ম সকল ধর্ম্মের মূলে বর্ত্তমান, উহার প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে হইলে, মানবের প্রকৃতি কিরূপ, তাঁহার শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক প্রকৃতির বিশেষত্ব কি. তিনি সমাজবদ্ধ ও পরিবারবর্গে বেষ্টিত হইয়া কিরূপে দিনযাপন করিতেছেন, ইত্যাদি নানা বিষয় পর্য্যালোচনা করা উচিত।

এ জগতে মানব শরীরের গঠন, উপাদান ও ক্রিয়াসম্বন্ধে ইতর জন্তুদিগের সহিত অল্পাধিক সমতুল্য হইলেও মস্তিষ্কের অধিক স্ফূর্ত্তি বশতঃ তিনি বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সম্বন্ধে উহাদের হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। উহাদের জ্ঞানশক্তি নাই বলিলেই হয়। যাহা আছে, তাহা অল্পমাত্র। ধর্ম্মপ্রবৃত্তির ত কথাই নাই। উহারা সকল বিষয়ে প্রকৃতিদত্ত নৈসর্গিক সংস্কার দ্বারা চালিত হয়। কিন্তু মানবের জ্ঞানশক্তি যে পরিমাণে স্ফুরিত, তাঁহার নৈসর্গিক সংস্কার সেই পরিমাণে মন্দীভূত। তাঁহার মস্তিষ্কের বাহ্যস্তরস্থিত কুণ্ডলাকার ঘৃতবৎ পদার্থ (convolutions of the brain) যে পরিমাণে স্ফুরিত, ইহার অভ্যন্তরীণ পঞ্চেন্দ্রিয়ের স্নায়ুগ্রন্থি সেই পরিমাণে অপগত। ইহাতে তাঁহার নৈসর্গিক সংস্কার খর্ব্ব হওয়ায় তাঁহার জ্ঞানশক্তির অধিক উন্মেষ হইয়াছে।

অন্যান্য জীবজন্তু নৈসর্গিক সংস্কার দ্বারা চালিত হইয়া সুখদুঃখ সম্বন্ধে সাম্যাবস্থায় আছে। উহাদের সুখের ভাগ যেমন অল্প, দুঃখের ভাগও তেমনি অত্যল্প। বিজ্ঞানের মতে আদিম অবস্থায় বর্ব্বর মানবও নৈসর্গিক সংস্কার দ্বারা চালিত হইয়া প্রাকৃতিক সাম্যাবস্থায় ছিল। পরে বহুকালব্যাপিনী জাতীয় সাধনার গুণে তদীয় মানসক্ষেত্রে নৈসর্গিকসংস্কারখর্ব্বকারিণী জ্ঞানশক্তি ক্রমশঃ উদ্ভূত হয়। এই জ্ঞানশক্তির অনুশীলন করিয়া তিনি অপ্রাকৃত অবস্থায় থাকিতে আরম্ভ করেন। এইস্থলে তাঁহার সভ্যতার সূত্রপাত হয় এবং অশন, বসন ও বসবাস সম্বন্ধে তিনি কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করেন।

যে প্রকৃতিদেবী এতকাল বর্ব্বর অবস্থায় তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন, জ্ঞানশক্তির সাহায্য পাইয়া তিনি তাঁহার বিপক্ষে গমন করিতে থাকেন। সুতরাং তিনি তাঁহার কোপানলে পতিত হইয়া সংসার সমুদ্রের সুখদুঃখরূপ

মহাবর্ত্তে পতিত হন। একদিকে যেমন তিনি কৃত্রিম উপায়ে নিজের সুখ সম্ভার বৰ্দ্ধন করিতে চেষ্টা পান, অপরদিকে দুঃখরাশিও তাঁহার অনুগমন করিতে থাকে, যে সকল আপদবিপদ ও রোগশোক দ্বারা তিনি অহরহ এমন নিষ্ঠুর ও নির্ম্মম ভাবে প্রপীড়িত হন, সে সকল প্রকৃতিদেবীর ক্রোধসম্ভূত। তাহার সাক্ষ্য দেখ না, একটী অশেষ প্রীতিকর সুকুমার সন্তান পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হইবে, অথচ উহার মাতাকে তজ্জন্য কতই না দুঃৰ্ব্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। এস্থলে অনেকে দয়াময় ঈশ্বরে দোষারোপ করেন। কিন্তু যাঁহারা প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ, তাঁহারা বলিবেন, অপ্রাকৃত অবস্থায় থাকাই এরূপ যন্ত্রণাভোগের প্রধান কারণ।

বিজ্ঞানের মতে মানব প্রকৃতিদেবীর একপ্রকার বিদ্রোহী সন্তান। তন্নির্দ্দিষ্ট সহজ পথ উল্লঙ্ঘন করিয়া তিনি ভ্রমসঙ্কুল কৃত্রিম জ্ঞানশক্তিবলে এ জগতে শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্তির অভিলাষী। তাঁহার সভ্যতা বৰ্দ্ধনই প্রকৃতিদেবীর সহিত সংগ্রাম-সংঘটন। যে সময়ে তিনি তাঁহার কোপানলে পতিত হইয়া পদে পদে দলিত হন, সে সময়ে বুদ্ধিশক্তি তাঁহার একমাত্র সহায়। এই বুদ্ধিশক্তিবলে তিনি পুরাকাল হইতে ধর্ম্মরূপ কল্পবৃক্ষের সুশীতল অনাতপে থাকিয়া সংসারের বিপদ আপদকে তুচ্ছজ্ঞান করিতে শিক্ষা করেন। যথার্থ বলিতে কি, ধর্ম্ম তাঁহাকে সংসারের অশেষ বিপদ রাশির মধ্যে প্রকৃত সুখের পথ প্রদর্শন করে। ভবসাগরে ধর্ম্ম তাঁহার পোতদীপস্বরূপ (Light house), স্বীয় সুবিমল জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া প্রবল ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যে তাঁহাকে সুখবন্দরে লইয়া যায়। ধর্ম্ম যে পতিত মানবের পরিত্রাতা, তাহা পুরাকালের দর্শনশাস্ত্রই দেখাইয়াছিল। কিন্তু আধুনিকবিজ্ঞান ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে জ্ঞানকে তাঁহার পবিত্রাতাস্বরূপ দেখাইতেছে এবং শতমুখে উহার নিন্দাবাদ করিতেছে।

অধ্যাত্মবিজ্ঞান জড়বিজ্ঞানের উপরোক্ত মত খণ্ডন করিয়া বলিবে, মানব আদৌ প্রকৃতিদেবীর বিদ্রোহী সন্তান নহে; তিনি উহার বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করেন নাই। তিনি প্রাকৃত অবস্থায় থাকুন, বা অপ্রাকৃত অবস্থায় থাকুন, অসভ্য হউন বা সুসভ্য হউন, তাহার কোন অবস্থা প্রকৃতির ত্রিগুণের বহির্ভূত নহে। ইহাদের অনন্ত লীলাবশতঃ তাহাকে সকল অবস্থায় বিবিধ সুখ দুঃখের ভাগী হইতে হয়, ও নানা বিপদ আপদে পড়িতে হয়। যুগধর্ম্মানুসারে তাঁহার আধ্যাত্মিক শক্তি, আয়ুর্ব্বল ও শারীরিক বল হ্রাস পাওয়াতে তিনি এখন

এ কলিযুগে রোগশোকে ও বিপদ আপদে এত জর্জ্জরীভূত হন, যে ধর্ম্মধন তাঁহার চিরসহায় ও সহচর, সেই ধর্ম্মের বলে তিনি সংসারের যাবতীয় বিপদ আপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন। কৃত্রিম জ্ঞানবলে তিনি আপনার বাহ্যাবস্থা যতই কেন সমৃদ্ধ যা সমুন্নত করুন না, তাহাতে তিনি ত্রিগুণের ক্রিয়া হইতে অব্যাহতি পান না। বিজ্ঞান যতই কেন আস্ফালন করুক না যে এক জ্ঞানানুশীলন দ্বারা তাঁহাকে যাবতীয় বিপদ হইতে উদ্ধার করিবে, উহার সে আস্ফালন অনেক সময়ে ব্যর্থ হইবে।

এ জগতে মানব "ব্যাষ্টি ভাবে অতি দুর্ব্বল ও অসহায় জীব; কিন্তু সমষ্টি ভাবে তিনি প্রভূত শক্তির আধার। অতি পুরাকাল হইতে তিনি সমাজবদ্ধ হইয়া সমবেত চেষ্টা দ্বারা নিজের অভাবপূরণ ও স্বকীয় অবস্থার শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিয়া আসিতেছেন। এইপ্রকারে তিনি চতুর্দ্দিকস্থ প্রাকৃতিক প্রতিদ্বন্দ্বিবর্গকে পরাস্ত করিয়া জীবনসংগ্রামে জয়লাভ করেন এবং নিকৃষ্ট জন্তুবর্গকে স্বায়ত্ত করিয়া উহাদের দ্বারা নিজের সুখবর্দ্ধন করাইয়া লন। এমন কি, স্থলবিশেষে অমিততেজস্বিনী চিররহস্যময়ী প্রকৃতিদেবীর শক্তিবিশেষকে ভৃত্যের ন্যায় স্বাভীষ্ট-সাধনে নিযুক্ত করেন। জনসমাজে বনবাসই তাঁহার এতাদৃশ সুখভোগ ও জাতীয় উন্নতির মূলীভূত কারণ। যে জাতীয় সাধনার গুণে তিনি এজগতে এমন শ্রেষ্ঠত্ব পাইয়াছেন, ধর্ম্মই উহার প্রধান উপায়স্বরূপ এবং যে সমাজের নিকট তিনি স্বীয় উন্নতির জন্য এতদূর ঋণে আবদ্ধ, সেই সমাজের বন্ধনই ধর্ম্মের এক প্রধান উদ্দেশ্য।

আবার মানব পরিবারবর্গে বেষ্টিত হইয়া চিরদিন লোকালয়ে বসবাস করিতেছেন। অসংখ্য ভিন্ন ২ পরিবার লইয়া এক ২ সমাজ গঠিত হয়। সমাজের অসংখ্য সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়া উহাকে সুশৃঙ্খলতার সহিত পরিচালন করা যেমন প্রাকৃতিক ধর্ম্মের এক মহৎ উদ্দেশ্য, সেইরূপ পরিবারের অসংখ্য সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়া উহাকে সুচারুরূপে পরিচালন করাও ইহার আর এক প্রধান উদ্দেশ্য। একারণ অতিপুরাকাল হইতে ধর্ম্ম সকল দেশে বিবাহাদি সংস্কারগুলি স্বহস্তে পরিচালন করিতেছে এবং সমাজে পারিবারিক গঠনপদ্ধতি অটুট রাখিবার জন্য সর্ব্বত্র নানাবিধ অবশ্যপ্রতিপাল্য রীতিনীতি স্থাপন করিয়াছে।

এখন মানবের আধ্যাত্মিক ও মানসিক প্রকৃতি কিরূপ, তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা আবশ্যক। বিজ্ঞান ত মন হইতে আত্মার পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করে না বলিয়া আধ্যাত্মিক শক্তিবিষয়ে ইহা একপ্রকার নীরব। মানব মনকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লিষ্ট করিয়া বিজ্ঞান নির্দ্দেশ করে, তিন প্রকার প্রবৃত্তি লইয়া মানব মন গঠিত, যথা :—

(১) স্বার্থ প্রবৃত্তি।

(২) পরার্থ প্রবৃত্তি।

(৩) বুদ্ধিবৃত্তি।

ইহাদের মধ্যে স্বার্থপ্রবৃত্তিগুলি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি বা মানবরিপু, আর পরার্থ প্রবৃত্তিগুলি ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বা সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি। স্বার্থপ্রবৃত্তিগুলি অযথা চরিতার্থ হইলে আত্মসুখ বর্দ্ধন হয় বটে, কিন্তু ইহাতে সমাজের ঘোর অমঙ্গল ঘটিতে পারে; আবার ইহারা যাবতীয় ইতরপ্রাণীতেও দৃষ্ট হয়। এজন্য ইহারা সামাজিক মানবের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি বলিয়া চিরদিন অবজ্ঞাত। অপরপক্ষে পরার্থপ্রবৃত্তিগুলি যত অধিক চালনা করা যায়, সমাজের তত মঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে; আবার ইহারা ইতর প্রাণীবর্গে আদৌ দৃষ্ট হয় না। এজন্য ইহারা সামাজিক মানবের উৎকৃষ্ট ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বলিয়া চিরদিন প্রশংসিত। ইহাদেরই উৎকর্ষলাভে তিনি প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করেন। সাধারণতঃ নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি উত্তেজিত হইলে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি নীরব হইয়া থাকে। এজন্য সংসারে পাপ-কর্ম্ম এত অধিক দেখা যায়।

বলি, নিকৃষ্টপ্রবৃত্তিগুলি মানবহৃদয়ে কেন এত বলবতী হইল? ইহার কয়েকটী কারণ দেখান হয়।

(১) স্বার্থপ্রবৃত্তিগুলি দেহযাত্রা ও সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য এবং বংশবৃদ্ধির জন্য অত্যাবশ্যক বলিয়া প্রকৃতি স্বয়ং উহাদিগকে হৃদয়ে বলবতী করিয়া দেয়।

(২) সমধিক অনুশীলন বশতঃ উহারা হৃদয়ে এখন এত বলবতী। তাহার সাক্ষ্য, মানব ইতর প্রাণী অপেক্ষা অধিক কামপরায়ণ।

(৩) নিকৃষ্ট জীবোৎপন্ন মানব চিরকালই উহাদিগকে সম্যক চরিতার্থ করিতেছেন বলিয়া উহারা পূর্ব্বসংস্কার বশতঃ তদীয় হৃদয়ে এত বলবতী;

অপর পক্ষে যতদিন হইতে তিনি সমাজবদ্ধ হইয়া সমাজে বসবাস করিতেছেন, ততদিন পরার্থপ্রবৃত্তিগুলি সমাজের মঙ্গলের জন্য, স্বজাতির উন্নতির জন্য তদীয় হৃদয়ে অঙ্কুরিত ও ক্রমশঃ স্ফুরিত হইয়াছে; এজন্য উহারা এখনও তাদৃশ বলবতী হয় নাই।

অধ্যাত্মবিজ্ঞান ধর্ম্মবিজ্ঞানের এ সকল কথার তীব্র প্রতিবাদ করে। যুগ-ধর্ম্মে তাঁহার আধ্যাত্মিক পতন ও জ্ঞানশক্তির ক্রমস্ফূর্ত্তি বশতঃ তাঁহার নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি এত বলবতী ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি এত নিস্তেজ। এ কলিযুগে তিনি সমধিক শিশ্নোদরপরায়ণ ও কামিনীকাঞ্চনের জন্য সদা বিব্রত। এ কারণ তাঁহার ষড়রিপু (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য এত প্রবল। ইহার অনিবার্য্য ফলস্বরূপ পাপকর্ম্ম সংসারে এত অধিক দেখা যায়।

সংসারে মানব যে অবস্থায় অবস্থিত, তাহাতে স্বার্থপ্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হইয়া সকল বিষয়ে ঘোর স্বার্থপর হইলেও পরার্থপ্রবৃত্তি চালনা করিয়া জন সমাজে বসবাস না করিলে তাঁহার একদণ্ড চলে না; আবার সমাজে থাকিতে হইলে উহাদের বিরোধ অনিবার্য্য। সুতরাং তিনিও ঘোর বিপদে পতিত হন। এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য ও তাঁহাকে প্রকৃত সুখের পথ দেখাইবার জন্য ধর্ম্ম সকল দেশে উদ্ভাবিত হয়। ধর্ম্মবিজ্ঞান বলে, সামাজিক মানব যাহাতে সমাজে সুখ স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারেন, ইহার জন্য ধর্ম্মের একমাত্র আবশ্যকতা।

বিজ্ঞান ধর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা বলে, তাহাই কি জগতের অমোঘ সত্য? মনের ধর্ম্ম প্রবৃত্তিগুলি কি সামাজিক মানবে সমাজের মঙ্গলের জন্য অঙ্কুরিত ও স্ফুরিত হইয়াছে, সমাজে পাঁচজন লইয়া বসবাস করিবার জন্য কি উহাদের একমাত্র আবশ্যকতা? ইহাতে বোধ হয়, বিজ্ঞানের মতে ধর্ম্ম আমাদের ঐহিক ক্ষণ-স্থায়ী ভাব মাত্র। ইহজীবন নষ্ট হইলে, ইহাও শরীরের সহিত নাশ পাইবে! হায়! হায়! স্বর্গীয় ধর্ম্মের কিরূপ অবমাননা!

এখন আইস, অধ্যাত্মবিজ্ঞানের অমৃতময়ী কাহিনী শ্রবণ করিয়া আমরা কর্ণদ্বয় জুড়াই। ইহার মতে ধর্ম্ম জীবাত্মার চির সহচর বা অনন্ত কালের জন্য ইহার সাথের সাথী এবং ইহার অবিনশ্বর ভাব।

এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনযাতি যঃ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমনত্তু গচ্ছতি।

(হিতোপদেশঃ)।

"যে ধর্ম্ম মৃত্যুর পর আত্মার অনুগমন করে, সেই ধর্ম্মই ইহার একমাত্র প্রকৃত বন্ধু। তদ্ভিন্ন অপরাপর বস্তু শরীরের সহিত সমভাবে নাশ পায়।" আমাদের আধ্যাত্মিক প্রকৃতি যেরূপ, তাহাতে ধর্ম্মই জীবাত্মার সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন। একমাত্র ধর্ম্মই ইহাকে অনন্ত কাল ধারণ করিয়া থাকে। যে সূক্ষ্ম জীবাত্মা নানালোকে ভ্রমণ করিতে করিতে কিছুদিনের জন্য এই স্থূল-দেহে আবদ্ধ হইয়া যুগধর্ম্মানুসারে কলুষিত ও অধোগত হইয়া থাকে, সেই জীবাত্মার আধ্যাত্মিক স্ফূর্ত্তির জন্য ধর্ম্মই ইহার প্রধান সহায়।

যে জীবাত্মা ইহসংসারে জন্মগ্রহণ করাতে নিজ কর্ম্মানুসারে মন, শরীর ও বাহ্যজগতের সহিত বিবিধ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়া অশেষ সুখদুঃখের ভাগী হয়, সেই জীবাত্মাকে যথার্থ সুখের পথ প্রদর্শন করিবার জন্য ধর্ম্ম ইহার প্রধান সহায়। যে জীবাত্মা নিজ কর্ম্মানুসারে নানালোকে জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য, পূর্ণ আধ্যাত্মিক স্ফূর্ত্তি দ্বারা ইহার কর্ম্মসূত্র ছেদন করিয়া ইহাকে ক্রমশঃ নির্ব্বাণোন্মুখ করিবার জন্য ধর্ম্ম ইহার প্রধান সহায়। ধর্ম্ম জীবাত্মাকে ইহার প্রকৃত শ্রেয় দেখাইয়া দেয় এবং ইহাকে প্রকৃত পথের পথিক করে। ধর্ম্ম জীবাত্মাকে অনন্ত উন্নতির পথে ক্রমশঃ অগ্রসর করায়। অতএব আধ্যাত্মিক স্ফূর্ত্তি দ্বারা জীবাত্মার প্রকৃত উন্নতিসাধন করা প্রাকৃতিক ধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান ও প্রথম উদ্দেশ্য।

এই উদ্দেশ্য লইয়া বিচার করিলে সনাতন হিন্দুধর্ম্মকে জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিতে হয়। যে যোগাভ্যাস ও তপশ্চরণ দ্বারা স্থূলদেহের স্থূলত্ব নাশ করিয়া সর্ব্বজ্ঞ আত্মার অনিমাদি অষ্টসিদ্ধি স্ফুরণ করত পূর্ণ আধ্যাত্মিকতা লাভ করা যায়, এমন কোন্ ধর্ম্ম এ জগতে শিখায়, বল? দেখ খৃষ্টাদি ধর্ম্ম কেবল অসার নিরাকারোপাসনা শিক্ষা দিয়া এবং ঈশ্বরোদ্দেশে কতকগুলি ভক্তিব্যঞ্জক বাক্যসমন্বয় উচ্চারণ করাইয়া আত্মার আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন করিতে চেষ্টা পায়; কিন্তু তাহাতে তাদৃশ ফললাভ হয় না।

প্রাকৃতিক ধর্ম্ম।

দ্বিতীয় অংশ।

আত্মার আধ্যাত্মিক স্ফূর্ত্তির পর মনের উৎকর্ষসাধন প্রাকৃতিক ধর্ম্মের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। মানব সমাজবদ্ধ ও পরিবারবর্গে বেষ্টিত হইয়া চিরদিন লোকালয়ে বসবাস করাতে তিনি স্বজাতি ও স্বজনবর্গের সহিত বিবিধ প্রীতিকর সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হন। এই সকল বিবিধ সম্বন্ধ বশতঃ তাঁহার মনে অনুক্ষণ নানা সাত্বিক ভাবের উদয় হইতেছে। সমাজ ও পরিবার মধ্যে সুখসচ্ছন্দে থাকিতে হইলে ঐ সকল সাত্বিক ভাবের সম্যক উৎকর্ষসাধন করা তাঁহার পক্ষে একান্ত আবশ্যক; নতুবা তাঁহার জীবন নিকৃষ্ট জন্তুর ন্যায় অসার হইয়া থাকে।

ভক্তি, প্রেম, বাৎসল্য, সখ্য, সৌভ্রাত্র, দয়াদাক্ষিণ্যাদি যে সকল সাত্বিক ভাব আমাদের মনে সদা উত্থিত হইতেছে, উহাদের সম্যক অনুশীলন করিয়া উৎকর্ষসাধন করাতে আমরা প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করি ও দেবতুল্য হই। ইহাদের উৎর্ষসাধনই আমাদের প্রধান ধর্ম্মশিক্ষা। যিনি যতই ইহাদের উৎকর্ষ সাধন করিবেন, তিনি ততই দেবোপম হইবেন। নাস্তিক হও বা আস্তিক হও, ঈশ্বরের নিরাকারোপাসক হও বা সাকারোপাসক হও, দীনদরিদ্র হও বা ক্রোর-পতি হও, যদি সংসারে পরমানন্দে থাকিতে চাহ, ইহাদের উৎকর্ষ সাধন করিয়া চিরদিন উৎকৃষ্ট ভাবরসে ভাসিতে থাকিবে। ইহাদের অনুশীলনপদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া প্রত্যেক ধর্ম্মের একান্ত কর্ত্তব্য।

ভাবশিক্ষাবিষয়ে ঈশ্বর আমাদের পূর্ণ আদর্শ। এখন নিরাকারোপাসক হউক বা সাকারোপাসক হউক, সকল ধর্ম্ম পরমপিতা পরমেশ্বরের উপর একান্ত ভক্তি দেখাইয়া ভক্তিভাবের সম্যক স্ফূর্ত্তি করিতে চেষ্টা পায়। কিন্তু হৃদয়স্থ অন্যান্য ভাবের শিক্ষাবিষয়ে উহারা একপ্রকার মৌনাবলম্বন করে। সে বিষয়ে উহারা আদৌ মাথা ঘামায় না।

কাব্যনাটকে সাধারণ মানবচরিত পাঠ করিয়া ভাববিষয়ে যে শিক্ষা হইয়া থাকে, তাহা সামান্য শিক্ষামাত্র। অলৌকিকগুণসম্পন্ন মহাপুরুষদিগের জীবনচরিত পাঠে ভাববিষয়ে কথঞ্চিৎ শিক্ষা হইতে পারে। এখন যদি সাধ-

রূণে এমন বিশ্বাস করে, যে স্বয়ং ঈশ্বর মানবাকারে আবিভূর্ত হইয়া সাংসারিক লীলায় ঐ সকল ভাবের পূর্ণ অভিনয় দেখান, ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার লীলা পাঠ ও শ্রবণ করিলে ভাববিষয়ে যেরূপ সুশিক্ষা হইবে, এমন কিছুতে সম্ভব নয়। ইহার জন্য সনাতন হিন্দুধর্ম্ম পরব্রহ্মের পূর্ণ অবতার শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণন করিয়া ভাববিষয়ে আমাদিগকে যেরূপ সুশিক্ষা দিতেছে, তাহা ধর্ম্মজগতে অতুলনীয় এবং তাহা অন্যান্য ধর্ম্ম ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে পারে নাই। ভাবশিক্ষাবিষয়ে এ দেশের পৌরাণিক ধর্ম্ম চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। এজন্য শতমুখে ইহার সুখ্যাতি করা উচিত।

যে সকল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি হৃদয়ে স্বাভাবতঃ বলবতী, যাহাদের দুর্নিবার্য্য বেগ বশতঃ মানব সদা বিপথে চালিত হন এবং যাহাদের উচ্ছৃঙ্খলতায় সমাজধ্বংস অবশ্যম্ভাবী, ইহাদের দমন প্রাকৃতিক ধর্ম্মের তৃতীয় উদ্দেশ্য। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য এই ষড়রিপু লোকযাত্রানির্ব্বাহের জন্য আবশ্যক হইলেও ইহাদের সামান্য উচ্ছৃঙ্খলতায় মানব সময়ে সময়ে বিপথে চালিত হন ও সমাজের অনিষ্ট সাধন করিয়া বসেন। ইহারা যে কেবল সমাজের অপকারী, তাহা নহে; কিন্তু মনকে পাপপঙ্কে লিপ্ত করায় ও জীবাত্মার অধোগতি আনয়ন করে।

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ
স্যকামক্রোধস্তথা লোভ স্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ।

(গীতা)

"কাম, ক্রোধ ও লোভ ইহারা মানবকে নরকে লইয়া যায় এবং জীবাত্মার নাশ সাধন করে। অতএব ইহাদিগকে সদা পরিত্যাগ করিবে।" এই ষড়রিপুর কার্য্য বশতঃ অনেকে নরক গুলজার করে। আর যে জীবাত্মা পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ তন্মাত্র ও পঞ্চভূত লইয়া সংসারে খেলিতে আইসে, যাহার দাসস্বরূপ মন ষড়রিপুর সরদার, ইহাদের কুমন্ত্রণায় উহারও ঘোর অনিষ্ট সাধন ঘটে।

এই সকল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি দমন করিবার জন্য মানবধর্ম্ম সকল দেশে নানাবিধ সদুপদেশ প্রদান করে, নানাবিধ সৎকর্ম্মানুষ্ঠান বিধিবদ্ধ করে, এমন কি উহাদের মূলোৎপাটনের জন্য নিবৃত্ত্যাদি মার্গ সৃজন করে। সাধুসন্ন্যাসিগণ ইন্দ্রিয় দমন করিবার জন্য কিরূপ সংযম শিক্ষা করেন, কামিনীকাঞ্চন হইতে দূরে থাকিবার জন্য সাধ্যমত কত চেষ্টা পান এবং স্ব স্ব সমাজে কত সুদৃষ্টান্ত

দেখান! কিন্তু দুঃখের বিষয়, এতদর্থে ধর্ম্মের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইতেছে। কলিযুগ বর্দ্ধনের সঙ্গে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিগুলি হৃদয়ে এত বলবতী, যে সর্ব্বত্র কেবল পাপের জয় দেখা যায়।

প্রাকৃতিক ধর্ম্মের এই উদ্দেশ্য লইয়া বিচার করিলে সনাতন হিন্দু ধর্ম্মকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানিতে হয়। বল দেখি, পাঠক! রিপু দমনের জন্য, ইন্দ্রিয় সংযমের জন্য এ ধর্ম্ম যে সকল ক্রিয়াযোগের ব্যবস্থা করে, তাহা অন্য কোন্ ধর্ম্মে দেখিতে পাও? যোগাভ্যাস, তপশ্চরণ, তান্ত্রিক সাধনবিধি প্রভৃতি ধর্ম্মের যে সকল উচ্চ অঙ্গ শাস্ত্রে উপদিষ্ট, সে সকল ক্রিয়াযোগ কি খৃষ্টাদি ধর্ম্ম একবার স্বপ্নেও ভাবিতে পারে? উহারা ইন্দ্রিয়সংযমের জন্য কতকগুলি মৌখিক উপদেশ দেয় মাত্র, যাহা এক কর্ণ দিয়া যেমন প্রবেশ করে, তেমনি অপর কর্ণ দিয়া বহির্গত হইয়া যায়।

আত্মা ও মনের পর শরীরের উপর ধর্ম্মের তীক্ষ্ণ নজর। ইহার স্বাস্থ্যরক্ষা ও দীর্ঘায়ুলাভ প্রাকৃতিক ধর্ম্মের চতুর্থ উদ্দেশ্য। এজন্য ইহা নানা দেশে খাদ্যাখাদ্যের সুবিচার করে ও উপবাসাদি পালনে সকলকে বিশেষ প্রোৎসাহিত করে। জীবনের সুখ অধিক পরিমাণে শারীরিক স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করে, বলিয়া ধর্ম্ম এ বিষয়ে এত যত্নবান হইয়া থাকে। কিন্তু পাশ্চাত্য জগতে ধর্ম্ম এ বিষয়ে আদৌ হস্তক্ষেপ করে না।

যে পরিবারবর্গে বেষ্টিত হইয়া লোকালয়ে বসবাস ব্যতীত দুর্ব্বল অসহায় মানবের গত্যন্তর নাই, সেই পরিবারের গঠন ও সংরক্ষণ এবং ইহার বিবিধ সাত্ত্বিক ভাবের স্ফুরণ প্রাকৃতিক ধর্ম্মের পঞ্চম উদ্দেশ্য। বিজ্ঞান বলে, আদিম অবস্থায় যে মানব নিরুপায় শৈশবকালে একমাত্র মাতার পরিচয় পান, সেই মানবকে ধর্ম্ম এতকাল পিতামাতা, ভ্রাতাভগিনী, স্ত্রীপুত্র কন্যা প্রভৃতি পরিজনবর্গের সহিত সুপরিচিত করায় এবং চিরদিন উহাদের লইয়া একত্র বসবাসের জন্য তদীয় হৃদয়ে নানা পারিবারিক ভাব স্ফুরণ করে।

ইহার গুণে পিতামাতা পুত্রকন্যার জন্য আজ এতদূর অপত্যস্নেহে পরিপ্লুত, পুত্রকন্যা পিতামাতার প্রতি এতদূর ভক্তিমান, ভ্রাতায় ভ্রাতায় এতদূর প্রণয় ও সদ্ভাব এবং দম্পতির ভিতর এমন পবিত্র প্রেম ও ভালবাসা। এই পারিবারিক সংস্থান অটুট রাখিবার জন্য ধর্ম্ম সকল দেশে পরিবারস্থ প্রত্যেক

ব্যক্তির সম্বন্ধ ও কর্ত্তব্য ভালরূপ নিরূপণ করে এবং পরিবার মধ্যে ব্যভিচারে যে কত মহাপাতক, তাহাও ভালরূপ নির্দ্দেশ করে।" এই উদ্দেশ্য লইয়া বিচার করিলে হিন্দুধর্ম্মকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিতে হয়। বল দেখি পাঠক! আর কোন্ ধর্ম্ম এ জগতে পারিবারিক ভাব এতদূর স্ফুরণ করে এবং স্ত্রীপুত্র ব্যতীত অন্যান্য পরিজনবর্গ লইয়া এতদূর ঘনিষ্ঠ ভাবে একত্র বসবাস করিতে শিক্ষা দেয়?

যে সমাজে বসবাস ব্যতীত দুর্ব্বল মানবের উপায়ান্তর নাই, যে সমাজে বাস করিয়াই তিনি এতদূর জাতীয় উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ, সেই সমাজের বন্ধন ও পরিচালন প্রাকৃতিক ধর্ম্মের ষষ্ঠ উদ্দেশ্য। এই সুমহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ধর্ম্ম স্ব স্ব সমাজে এক প্রকার ঈশ্বরোপাসনা বা দেবারাধনা পদ্ধতি স্থাপন করিয়া জনসাধারণকে এক পথের পথিক করে। ইহার জন্য ধর্ম্ম বিশ্বের আদিকারণ, পরলোক, ঐহিক সুখ দুঃখের কারণ প্রভৃতি নানা বিষয় সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ মতামত প্রচার করিয়া জনসাধারণের সরল বিশ্বাসকে এক পথে চালিত করে। ইহার জন্য ধর্ম্ম মানবজীবনের অত্যাবশ্যকীয় বিবাহাদি ঘটনা সম্বন্ধে একপ্রকার সংস্কার ও আচার ব্যবহার প্রচারিত করিয়া সমাজ মধ্যে যথেচ্ছাচার নিবারণ করত এক দেশস্থ বা কয়েক দেশস্থ যাবতীয় লোককে এক রজ্জুতে আবদ্ধ করে এবং সুশৃঙ্খলতার সহিত চিরদিন স্বসমাজ চালায়।

ধর্ম্ম বিজ্ঞান বলে, এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য যে সকল দুষ্কর্ম্ম সমাজের বিশেষ অনিষ্টকর, যাহা সর্ব্বদা অনুষ্ঠিত হইলে ইহার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী, সেই সকল কর্ম্মকে ধর্ম্ম সকল দেশে মহাপাপ আখ্যা প্রদান করিয়া চিরদিনের জন্য উহাদিগকে অভিশপ্ত করে। অপর পক্ষে যে সকল সৎকর্ম্ম সমাজের অশেষ কল্যাণকর, যদ্দ্বারা ইহার শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি ক্রমশঃ সাধিত হয়, সেই সকল কর্ম্মকে ধর্ম্ম মহাপুণ্য আখ্যা প্রদান করিয়া উহাদের অনুষ্ঠানে সকলকে বিশেষ প্রোৎসাহিত করে।

এই উদ্দেশ্য লইয়া বিচার করিলে হিন্দুধর্ম্মকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিতে হয়। বল দেখি, পাঠক! জগতে কোন্ ধর্ম্ম এ ধর্ম্মের ন্যায় স্বসমাজকে এমন নিগড় বন্ধনে আবদ্ধ করে? জাতিভেদাদি প্রবর্ত্তিত করিয়া ইহা রাজাধিরাজ হইতে পথের কাঙ্গাল পর্য্যন্ত সকলকে এক রজ্জুতে সমভাবে বাঁধে এবং বর্ণা-

শ্রমধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া স্বসমাজের অলৌকিক উন্নতি সাধন করে। বিবাহাদি বিষয়ে ইহা যে সকল রীতিনীতি স্থাপন করে, তাহাও জগতে অতুলনীয়।

মানব বুদ্ধির অজ্ঞেয় জীবন ও বিশ্বসম্বন্ধে গূঢ় রহস্যগুলি সরল বিশ্বাস দ্বারা মীমাংসা করা প্রাকৃতিক ধর্ম্মের সপ্তম উদ্দেশ্য। এই পৃথিবীর আদি কোথায়, অন্তই বা কোথায়, আমরা কোথা হইতে আসিলাম, কোথায় বা যাইব, ইত্যাদি বিষয়ের প্রশ্ন আমাদের মনে স্বতঃ উত্থিত হয়। এই সকল প্রশ্ন মীমাংসার জন্য আমরা আমাদের সসীম বুদ্ধি যতই কেন চালনা করি না, আমরা চিরদিন যে তিমিরে সে তিমিরে থাকি। যে স্থলে আমাদের বুদ্ধি পরাস্ত হইতেছে, সে স্থলে আমাদের সরল বিশ্বাস জয়লাভ করে। এস্থলে ধর্ম্ম ঈশ্বরে ও পরলোকে সরল ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করাইয়া আমাদের স্বাভাবিক চিরপ্রদীপ্ত কৌতূহলশিখা নির্ব্বাপিত করে। সকল ধর্ম্মের মূল-ভিত্তি কতকগুলি সরল বিশ্বাসের উপর প্রোথিত আছে। ঈশ্বরে ও পরলোকে বিশ্বাস প্রায় সকল ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ।

প্রাকৃতিক ধর্ম্মের অষ্টম উদ্দেশ্য সুমহৎ ও সর্ব্বোচ্চ। এই দুঃখময়, পাপময় ভবসংসারে ধর্ম্ম দুর্ব্বল ও অসহায় মানবের একমাত্র প্রকৃত বন্ধু। নিষ্ঠুর প্রকৃতি তাঁহাকে যে পরিমাণে প্রপীড়িত করে, তিনি সেই পরিমাণে ধর্ম্মরূপ মাতৃক্রোড় আশ্রয় করেন। ধর্ম্মধন পাইয়া বা ধর্ম্মবলে বলীয়ান হইয়া তিনি সংসারের যাবতীয় বিপদ আপদকে ও রোগশোককে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে শিক্ষা করেন। যখন তিনি ঘোর দুঃখসাগরে, শোকসাগরে বা বিপদসাগরে নিমগ্ন হইয়া হাবুডুবু খান, তখন ধর্ম্ম অমৃতবর্ষী হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক তাঁহার উদ্ধার সাধন করে। যখন তিনি রোগশোকে জর্জ্জরীভূত হন, তখন ধর্ম্মের অমৃতময়ী কাহিনী শ্রবণে আশ্বাসিত হইয়া তিনি সংসারের সকল জ্বালা ও যন্ত্রণা বিস্মৃত হন।

সর্ব্বাবাধাসু ঘোরাসু বেদনাভ্যর্দ্দিতোঽপি বা
স্মরন্ মমৈতচ্চরিতং নরো মুচ্যতে সঙ্কটাৎ।
মমপ্রভাবাৎ সিংহাদ্যা দস্যবো বৈরিণ স্তথা
দূরাদেব পলায়ন্তে স্মরতশ্চরিতং মম।

(চণ্ডী)

"সর্ব্বপ্রকার ঘোর বিপদে পতিত হইয়া ও অশেষ যন্ত্রণায় প্রপীড়িত হইয়া যিনি আমায় স্মরণ করিবেন, তিনি বিপদ হইতে স্বতঃ মুক্তিলাভ করিবেন। আমার নামের গুণে সিংহাদি হিংস্রজন্তুগণ, দস্যু ও শত্রুগণ তাঁহাকে দূর হইতে দেখিয়া পলায়ন করিবে।" বস্তুতঃ ধর্ম্মের এরূপ আশ্বাসবাণী প্রাপ্ত হইয়া আমরা দুঃখের জীবন অনায়াসে বহন করি। ধর্ম্মধন প্রাপ্ত হইয়া আমরা দুস্তর ভবসাগর অনায়াসে পার হই।

এস্থলে বিজ্ঞান ধর্ম্মের উপর উপহাস করিয়া বলিবে, বিপদে পতিত হইয়া ঈশ্বরকে ডাকা বা তাঁহার উপাসনা করা কেবল দুর্ব্বল মনের প্রবোধমাত্র। রোগগ্রস্ত হইয়া যন্ত্রণায় অস্থির হইলে তুমি অভ্যাসবশতঃ কাতরকণ্ঠে ভগবানের নাম লইবে বটে ; কিন্তু তাহাতে কি তোমার যন্ত্রণার কিছুমাত্র লাঘব হইবে? এই যে এদেশে উৎকট রোগের সময় অনেকে স্বস্ত্যয়ন ও চণ্ডীপাঠাদি করান, তাহাতে কি রোগের উপশম হইয়া থাকে। বরং আরোগ্য লাভের জন্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের আশ্রয় লও তুমি সকল যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। দেখ প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যত্যয় নাই। তুমি রোরুদ্যমান হইয়া সহস্রবার কাতর কণ্ঠে ঈশ্বরকে ডাক না কেন, নিষ্ঠুর প্রকৃতি স্বীয় ভবিতব্য ঘটাইবেই ঘটাইবে। তবে কেন ঈশ্বরকে ডাকিয়া অনর্থক জিহ্বা অপবিত্র কর? মনে কর, বিজ্ঞানের কথা সর্ব্বৈব সত্য এবং বিধাতৃবিহিত মার্গ উল্লঙ্ঘন করা কাহারও সাধ্য নাই ; তথাচ আমাদের চতুর্দ্দিকে বিপদরাশি অনুক্ষণ এমন ঘনীভূত হইতেছে, যে দীনবন্ধু ঈশ্বর ব্যতীত আমাদের উপায়ান্তর নাই, গত্যন্তর নাই। বিজ্ঞান বল, দর্শন বল, আয়ুর্ব্বেদ বল, যে যাহা করুক না কেন, এস্থলে সকলের দর্প সমভাবে চূর্ণ হইতেছে এবং সকলকেই মানবের প্রকৃত বন্ধু ধর্ম্মের নিকট মস্তক অবনত করিতে হইতেছে।

বিজ্ঞান যতই কেন আস্ফালন করুক না, অনেক সময় ইহা আমাদের কোনরূপ উপকারে আইসে না। দেখ সংসারে কত অসাধ্য ব্যাধি রহিয়াছে। সে স্থলে চিকিৎসাবিজ্ঞান কিছুমাত্র প্রতীকার করিতে না পারিয়া হতবশের ন্যায় বসিয়া কেবল মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে থাকে। খোদার উপর কে খোদকারী করিতে পারে? কীটাণুকীট মানব আজ দুই পৃষ্ঠা বিজ্ঞান রচনা করিয়া ঈশ্বরের উপর কলম চালাইতে চাহে। উহার কি আস্পর্দ্ধা! কি গর্ব্ব! উহার কথায়

আমাদের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। আমরা মা জগদম্বার দীনহীন তাপিত সন্তান। বিপদে পতিত হইলেই আমরা মা দুর্গাকে প্রাণভরে ডাকিব ও কাতর কণ্ঠে বলিব—

শরণাগতদীনার্ত্তপরিত্রাণপরায়ণে
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তুতে।
(চণ্ডী)

এ সংসারে নিষ্ঠুর কাল স্বীয় করাল বদন ব্যাদান করিয়া সকলকে গ্রাস করিতে উদ্যত। ইহার বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি দর্শনে মানবমাত্রেই সদা শঙ্কিত, সদা অস্থিরচিত্ত। মৃত্যু সকলের শিয়রে বসিয়া আছে, ঘাড় মট্‌কাইলেই হইল। যখন ইহার থাড়া ওয়ারেণ্ট আইসে, তখন মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রলয় হইয়া যায় ও সব ফুরাইয়া যায়।

বিজ্ঞানের মতে মৃত্যু প্রকৃতির অপরিহার্য্য পরিণাম বিশেষ। ইহাকে ভয় করিলে চলিবে কেন? কিন্তু ধর্ম্ম মৃত্যুরূপ বিষধরের বিষদন্ত ভগ্ন করিয়া দেয়। ধর্ম্মধন প্রাপ্ত হইয়া আমরা মৃত্যুকে অম্লানবদনে, হাস্যমুখে বন্ধুভাবে আলিঙ্গন করি। পরলোক বা মানবের অন্ত ঘোরান্ধকারে আবৃত থাকিলেও ধর্ম্ম স্বীয় সুবিমল জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া ইহাকে আমাদের চক্ষে অনন্ত সুখের আগারস্বরূপ দেখায়, ইহার দ্বারস্বরূপ মৃত্যুকে ধার্ম্মিকদিগের নিকট সহজ ও সুগম করিয়া দেয়। জনসাধারণকে সৎপথে চালিত করিবার জন্য নরকের ভীষণ দৃশ্য দেখাইয়া অধার্ম্মিকদিগের নিকট মৃত্যুকে ভীষণ হইতে ভীষণতর করে।

প্রাকৃতিক ধর্ম্মের মহৎ উদ্দেশ্যগুলি যথাক্রমে লিখিত হইতেছে।

(১) আত্মার আধ্যাত্মিক স্ফূর্ত্তি।
(২) মনের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উৎকর্ষসাধন ও সাত্ত্বিক ভাবাবলির স্ফুরণ।
(৩) নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির দমন ও ইন্দ্রিয় সংযম।
(৪) শরীরের স্বাস্থ্যবর্দ্ধন ও দীর্ঘায়ুলাভ।
(৫) পরিবারগঠন ও সংরক্ষণ এবং বিভিন্ন পারিবারিক ভাবের স্ফুরণ।
(৬) সমাজগঠন ও সংরক্ষণ এবং ইহার শ্রীবৃদ্ধিসাধন।
(৭) প্রকৃতির মহারহস্য সরল বিশ্বাস দ্বারা মীমাংসা করা।

(৮) রোগ শোক ও বিপদকালে মনকে প্রবোধ দেওয়া।

এই সকল মহৎ উদ্দেশ্য সকল ধর্ম্মের মূলে দেখা যায়। তন্মধ্যে কোন কোন ধর্ম্ম ইহাদিগকে অল্পাধিক সংসাধন করে। জগতের মধ্যে একমাত্র সনাতন হিন্দুধর্ম্ম ইহাদিগকে অধিক পরিমাণে সংসাধন করিতে চেষ্টা পায়। এ জন্য শতমুখে ইহার প্রশংসা করা উচিত।

বৈশেষিক ধর্ম্ম।

বৌদ্ধ, খৃষ্ট, মুসলমান, হিন্দু ও জড়োপাসনা প্রভৃতি যে সকল ধর্ম্ম দেশবিশেষে প্রচলিত দেখা যায়, উহাদের অধিকাংশ ভাগ বৈশেষিক ধর্ম্মে পূর্ণ। বৈশেষিক মতামত, বৈশেষিক পূজাপদ্ধতি ও বৈশেষিক আচারব্যবহার লইয়া বৈশেষিক ধর্ম্ম বিরচিত। এই বৈশেষিক অংশ লইয়া প্রত্যেক ধর্ম্ম অন্যান্য ধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

জগতের সকল ধর্ম্ম এক পরমেষ্ঠিপদ প্রাপ্তির অভিলাষী হইলেও উহারা ভিন্ন ভিন্ন মার্গ অনুসরণ করিতেছে। ইহাতে সংসারে ধর্ম্মবিষয়ক মতামত সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইয়াছে। এই বিভিন্ন মতামতবশতঃ এক ধর্ম্ম অন্যধর্ম্মের সহিত চিরদিন বাক্‌বিতণ্ডায় বা বিবাদবিসম্বাদে লিপ্ত। একারণ সংসারে এত ধর্ম্মবিদ্বেষ, জাতিবিদ্বেষ, অনর্থপাত ও শোণিতপাত ঘটিয়া থাকে। যখন যে জাতি সামরিক বলে জগতে অগ্রগণ্য হয়, তখন সে জাতি অন্য ধর্ম্মের বিলোপসাধন করিয়া নিজ ধর্ম্ম নানা দেশে প্রচার করিতে অতীব ব্যগ্র হয়। মুসলমান ভাগ্যোদয়ে মুসলমানজাতি এইরূপ নানাদেশ স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিল। এখন খৃষ্টান ভাগ্যোদয়ে খৃষ্টান জাতি এইরূপ স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেছে।

জগতের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে বুঝা যায়, যখন কোন নূতন ধর্ম্ম জগতে উত্থিত হইয়াছে, তখন সে ধর্ম্ম ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মের মালমসলা লইয়া নূতন হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিয়াছে। এই হর্ম্ম্যনির্ম্মাণে ইহা আবার অনেক নূতন মাল মসলাও যোগ করিয়াছে। তাহার সাক্ষ্য দেখ, বৌদ্ধধর্ম্ম সনাতন আর্য্যধর্ম্ম হইতে, খৃষ্টধর্ম্ম পূর্ব্বতন পৌত্তলিক ধর্ম্ম (Paganism) ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম হইতে এবং মুসলমান ধর্ম্ম, খৃষ্টধর্ম্ম হইতে নানা পুরাতন মতামত লইয়াছে বটে, কিন্তু ইহারা আবার নানা নূতন মতামত লইয়া স্বদেহ পোষণ করত আপনাদিগকে সম্পূর্ণ

পৃথক রাখিয়াছে। ইহাদের বৈশেষিক অংশ যত অধিক স্ফুরিত হয়, ইহারা সংসারে ততোধিক বিভিন্ন হইয়া থাকে। যেমন শাসনতন্ত্র স্বরাজ্যকে নানা প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক চিহ্নে চিহ্নিত করিয়া ইহাকে জগতে বিশিষ্ট রাখে, সেইরূপ প্রত্যেক ধর্ম্মও নানা বৈশেষিক মতামত ও আচার ব্যবহার প্রবর্ত্তিত করিয়া স্বসেবকমণ্ডলীকে জগতে বিশিষ্ট রাখিতে সাধ্যমত চেষ্টা পায়।

মানব প্রকৃতি সাধারণতঃ একরূপ হইলেও প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানবের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি নানা কারণে বিভিন্ন। তাঁহার শারীরিক প্রকৃতি যেমন বিভিন্ন, মানসিক প্রকৃতিও সেইরূপ বিভিন্ন। আবার প্রত্যেক দেশের শিক্ষা ও দীক্ষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এই সকল কারণে যাহা এক জনের বিবেচনায় সত্য, তাহা অপরের বিবেচনায় অসত্য; যাহা একজনের নিকট মহাপুণ্য, তাহা অপরের নিকট মহাপাতক। এই প্রকারে সংসারে এক বিষয় লইয়া নানা মুনির নানা মত প্রচলিত হইয়াছে। এই প্রকারে সংসারে নানা ধর্ম্ম ও নানা সম্প্রদায় উত্থিত হইয়াছে।

অনেকের ধারণা, অতি প্রাচীন কালে জগতে ধর্ম্মবিষয়ে একপ্রকার মতামত প্রচলিত ছিল; এজন্য ভারত, মিসর এসিরিয়া, ব্যাবিলন; কাল্ডিয়া গ্রীশ প্রভৃতি পূর্ব্বতন সভ্যদেশগুলির প্রাচীন ধর্ম্মের আদ্যন্তর প্রায় একপ্রকার মতামতে পূর্ণ। পরে কালক্রমে ঐ সকল দেশে বিভিন্ন ভাষা উত্থিত হইলে পূর্ব্বতন মতামতের বিভিন্ন প্রকার অর্থ ও প্রত্যর্থ হইতে থাকে। বাইবেল মতে ব্যাবেল মন্দির নির্ম্মাণ কালে (Tower of Babel) যে ভাষা বিপর্য্যয় একদিনে মজুরদের ভিতর ঘটে, সেই প্রকৃত ঘটনা জগতে ঘটিতে বহুকাল ব্যতীত হয়। যাহা হউক, নানা দেশে বিভিন্ন ভাষা উত্থিত হইবার পর ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানা মত প্রচারিত হইয়াছে। এই প্রকারে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম কালক্রমে উত্থিত হইয়াছে।

সমাজনেতা প্রতিভাশালী পণ্ডিত দিগের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি যে দেশে যেরূপ বিকশিত, তত্রত্য বৈশেষিক ধর্ম্ম সেই রূপ আকার ধারণ করিয়াছে। আবার যে সমাজের যেরূপ শিক্ষা ও দীক্ষা, যেরূপ অনাটন ও অভাব, সেইখানকার বৈশেষিক ধর্ম্মও সেইরূপ আকার ধারণ করিয়াছে। বেদ, ত্রিপিটক, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থগুলি স্ব স্ব সমাজে ঈশ্বরপ্রকটিত বলিয়া

বিবেচিত হইলেও উহাদের ভিতর নানা পণ্ডিতের লেখনী চালিত হইয়াছে এই প্রকারে বিভিন্ন মতামত জগতে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। আবার প্রাকৃতিক ধর্ম্মের মূল উদ্দেশ্যগুলি প্রত্যেক বৈশেষিক ধর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে সম্পাদন করে বলিয়া উহাদের ভিতর মতামত লইয়া এত পার্থক্য দেখা যায়।

ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস প্রায় সকল ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ; তথাচ এতৎ সম্বন্ধে ও প্রত্যেক ধর্ম্মে বিস্তর পার্থক্য দেখা যায়। খৃষ্ট ও মুসলমান ধর্ম্ম গুণাতীত মায়াতীত পরব্রহ্ম আদৌ বুঝিতে পারে নাই; কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে উহারা মানব-মনের প্রকৃত্যনুযায়ী সগুণ নিরাকার লৌকিক ঈশ্বরের আরাধনা করে। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম গুণাতীত পরব্রহ্ম সম্যক বুঝিয়াছে এবং এই মায়াময় জগতে তাঁহার মায়ারূপ ব্রহ্মাবিষ্ণু মহেশ্বরকে এক ধর্ম্ম পূজা করে,অপর ধর্ম্ম স্বপ্রবর্ত্তক বুদ্ধদেবকে অর্চ্চনা করে। আবার ভূমণ্ডলে এমন অনেক অসভ্য সমাজ আছে, যাহাদের ভাষায় ঈশ্বরের নামগন্ধ নাই। উহারা তৎপরিবর্ত্তে ভূতপ্রেতাদির পূজা করে।

প্রত্যেক বৈশেষিক ধর্ম্মে ঈশ্বরের এক এক লৌকিক প্রতিনিধি দেখা যায়, খ্রীষ্টধর্ম্ম স্বপ্রবর্ত্তক ঈশাদেবকে তাঁহার প্রিয়পুত্র ও পতিত মানবের একমাত্র পরি-ত্রাতা জ্ঞান করে। মুসলমান ধর্ম্ম স্বপ্রবর্ত্তক মহম্মদদেবকে তাহার প্রিয় পয়-গম্বর ও প্রিয় সুহৃৎ জ্ঞান করে এবং তাঁহারই উপদেশ মতে চলিতে বলে। বৌদ্ধধর্ম্ম স্বপ্রবর্ত্তক বুদ্ধদেবকে ঈশ্বরের স্থানে পূজা করে। হিন্দুধর্ম্ম শিব ও দুর্গাকে জগতের পিতামাতাস্বরূপ জ্ঞান করে এবং শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বরের অবতার জ্ঞানে পূজা করে।

উপাসনা ও পূজার্চ্চনা বিধি লইয়া সকল ধর্ম্মের ভিতর বিস্তর প্রভেদ দেখা যায়। এমন কি, প্রত্যেক ধর্ম্মের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিতর এতৎ সম্বন্ধে অল্লাধিক পার্থক্য আছে। নিরাকারবাদিগণ নিরাকার ঈশ্বরের উদ্দেশে জানু পাতিয়া কতকগুলি বাক্যসমন্বয় উচ্চারণ পূর্ব্বক মনের আন্তরিক ভক্তি প্রকাশ করে ও তাঁহার নিকট মুক্তি প্রার্থনা করে। সাকারবাদিগণ তাঁহার সাকার প্রতিমূর্ত্তির সমক্ষে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া অপারভক্তিপূর্ব্বক উহাকে পাদ্য ও অর্ঘ্য দিয়া পূজা করে ও জীবনের শ্রেয় লাভ করে।

খৃষ্টধর্ম্ম স্বসেবকদিগকে রবিবাসরে গির্জ্জায় গিয়া ঈশ্বরোপাসনা করিতে ও ধর্ম্মযাজকের নিকট ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিতে বলে,মুসলমান ধর্ম্ম প্রত্যহ পাঁচবার

নামাজ পাঠ করিতে ও শুক্রবারে মস্‌জিদে গিয়া পাঁচজনে মিলিয়া ঈশ্বরোপাসনা করিতে বলে। হিন্দুধর্ম্ম সকলকে ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী ও ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে বলে এবং বৎসরের মধ্যে মধ্যে কয়েক দেবোৎসব করিয়া উহাদিগকে আনন্দে উৎফুল্ল করে। এইরূপে প্রত্যেক ধর্ম্ম স্বসমাজের মঙ্গলের জন্য বিবিধ ঈশ্বরারাধনা পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছে।

মৃত্যুর পর পরলোকে প্রেতাত্মার মঙ্গলের জন্য প্রত্যেক ধর্ম্ম বিবিধ ক্রিয়া-যোগ অনুসরণ করে। নিরাকারোপাসকগণ মৃতব্যক্তিকে কবরে রাখিয়া উহার প্রেতাত্মার মঙ্গলের জন্য গির্জ্জায় ও মসজিদে উপাসনা করে। সাকারোপাসক-গণ অগ্নিতে মৃতব্যক্তির সংকার করিয়া প্রেতাত্মার মঙ্গলের জন্য শ্রাদ্ধে পিণ্ড দানাদি করে। সকল ধর্ম্মই বলে, ধর্ম্মাত্মাগণ স্বর্গে গিয়া অনন্ত সুখভোগ করে এবং পাপাত্মারা কেবল নরক গুলজার করে।

আবার প্রত্যেক বৈশেষিক ধর্ম্মের সামাজিক রূপ ততোধিক বিভিন্ন। এক দেশে এক ধর্ম্ম বিবাহাদি বিষয়ে একরূপ আচার ব্যবহার ও রীতিনীতি স্থাপিত করে, অন্য ধর্ম্ম অন্য দেশে অন্য প্রকার রীতিনীতি প্রবর্ত্তিত করে। এমন কি প্রত্যেক ধর্ম্মের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিতর ঐ সকল রীতিনীতি লইয়া ইতরবিশেষ দেখা যায়।

সামান্য মতভেদ লইয়া প্রত্যেক ধর্ম্ম কয়েক সম্প্রদায়ে বিভক্ত। খ্রীষ্টজগতে প্রটেষ্টাণ্ট, রোমানকাথলিক ও গ্রীকচার্চ্চের ভিতর, মুসলমানজগতে সীয়া ও সুন্নীদিগের ভিতর, বৌদ্ধজগতে মহায়ন ও হীনায়নদিগের ভিতর এবং হিন্দু-জগতে শৈব, বৈষ্ণব ও শাক্তদিগের ভিতর যে, কত মতভেদ, তাহা এস্থলে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। এই মাত্র মনে রাখা উচিত, যেমন জীবজগতে শরীরের গঠন সম্বন্ধে যৎসামান্য পার্থক্য লইয়া নানা জাতীয় জীব উৎপন্ন হয়, সেইরূপ ধর্ম্মজগতেও যৎসামান্য মতভেদ লইয়া নানা সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। জগতে সকল বিষয়ে অনন্ত বৈচিত্র্য প্রদর্শন করাই লীলাময়ী প্রকৃতির মহৎ উদ্দেশ্য।

মানবের ইহা স্বভাবসিদ্ধ, বাল্যকালে যে সকল সংস্কার মনে বদ্ধমূল হয়, উহারা মস্তিষ্কের অঙ্গীভূত হইয়া যায় এবং আজীবন বলবৎ থাকে। এজন্য সকল দেশের জনসাধারণ স্বধর্ম্মের উপর বাল্যকাল হইতে অতীব আস্থাবান

হইয়া থাকে এবং স্বধর্ম্মের মতামতকে জগতের অমোঘ সত্যজ্ঞান করে। উহারা তন্নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলি অতি যত্নের সহিত পালন করিয়া স্বধর্ম্মের বৈশেষিকত্ব বা স্বজাতির জাতীয়তা চিরদিন রক্ষা করিতে একান্ত তৎপর।

ধর্ম্মের ক্রমোন্নতি বা ক্রমাবনতি।

সংসারে ধর্ম্ম ক্রমোন্নত বা ক্রমাবনত হইতেছে, ইহাই এ প্রবন্ধে বিচার্য্য।

পাশ্চাত্য ধর্ম্মবিজ্ঞানের মত এই যে, ইহা মানবের সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সংসারে ক্রমোন্নত হইতেছে। কিন্তু অধ্যাত্মবিজ্ঞান ও হিন্দুধর্ম্মের মত ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। উহারা স্পষ্ট নির্দ্দেশ করে, যুগে যুগে ইহা সংসারে অবনত হইতেছে। তবে ইহাদের মধ্যে কাহার মত সত্য?

বিজ্ঞানের মতে সংসারের যাবতীয় বস্তু, কি কৃত্রিম, কি অকৃত্রিম, সকলই ক্রমবিবর্ত্তনে বিবর্ত্তিত ও ক্রমবিকসনে বিকসিত হইতেছে। ধর্ম্মও ভাষার ন্যায় সকল দেশের মানবের বুদ্ধি বিকাশ ও সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে কালক্রমে বিকসিত হইয়াছে। প্রাচীন কাল হইতে ইহা কতকগুলি স্তরের পর স্তর অতিক্রম করিতে করিতে আধুনিক উন্নত অবস্থা ধারণ করিয়াছে।

সকল দেশের ধর্ম্ম তন্ন তন্ন করিয়া পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়, ইহা কালক্রমে কোন্ কোন্ স্তর অতিক্রম করিতে করিতে আধুনিক আকার ধারণ করে। ধর্ম্মবিজ্ঞানের মতে প্রধানতঃ ইহাতে তিনটী বিশেষচিহ্নিত স্তর দেখা যায় যথা:—

(১) জড়োপাসনা।

(২) পৌত্তলিকতা।

(৩) একেশ্বরবাদ।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে অতি প্রাচীন কালে বা সমাজের আদিম অবস্থায় সমগ্র মানব জাতি ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ও বর্ব্বর ছিল। পরে জ্ঞানানুশীলন আরম্ভ হইলে জগতে সভ্যতার সূত্রপাত হয়। এই সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে ধর্ম্ম সকল দেশে ক্রমোন্নত হইয়া আসিতেছে। তাহার সাক্ষ্য, আজকাল

যে সকল জাতি অসভ্য, উহারা জড়োপাসক, যাহারা অর্দ্ধসভ্য,উহারা পৌত্তলিক এবং যাহারা সুসভ্য, উহারা একেশ্বরবাদী।

এখন আদিম বর্ব্বর মানবের ধর্ম্ম কিরূপ ছিল, অথবা তদীয় মনে ধর্ম্মভাব আদৌ উদিত হইত কি না, তাহা নিরূপণ করা সুকঠিন। অনেকের বিশ্বাস, ভীতি ও বিস্ময় হইতে মানব মনে প্রথম ধর্ম্মভাব উদিত হয়। যেমন একটী দুগ্ধপোষ্য শিশু সামান্য কারণে ভীত হইয়া মাতৃক্রোড় আশ্রয় করে; সেইরূপ জাতীয় জীবনের শৈশব অবস্থায় মানবও জগতের ভয়াবহ দৃশ্যপট সে দর্শনে ভীত ও বিস্মিত হইয়া ধর্ম্মরূপ মাতৃক্রোড় আশ্রয় করিয়াছিলেন। তৎকালে বুদ্ধিশক্তি তাদৃশ স্ফুরিত ও মার্জ্জিত না থাকায় তিনি কল্পনাবলে সকল বিষয়ের কাল্পনিক তত্ত্ব উদ্ভাবন করত নিজের দুর্ব্বল মনকে প্রবোধ দিতেন। প্রকৃতি-জগতে যেস্থলে তিনি কিছু অসাধারণত্ব দেখিতেন, সেই স্থলে তিনি প্রথমে প্রাণিত্ব, পরে দানবত্ব, তৎপরে দেবত্ব কল্পনা করিয়া যান।

বায়ু, মেঘ, আকাশ, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, সর্প, বৃক্ষ, মহানদী প্রভৃতি যে সকল প্রাকৃতিক দৃশ্য তাঁহার অশিক্ষিত দুর্ব্বল মনে ভীতি ও বিস্ময় উৎপাদন করিত, উহাদের প্রকৃত কারণতত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া স্বীয় অসম্পূর্ণ জ্ঞানানুসারে তিনি উহাদিগকে দানব, ভূত বা দেবতা জ্ঞান করিতেন এবং নিজ জীবনের সুখদুঃখের নিয়ন্তাজ্ঞানে উহাদের প্রীতি বর্দ্ধনার্থ কতকগুলি অবোধ্য মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক উহাদের পূজা করিতেন। এই প্রকারে জগতে জড়োপাসনা প্রবর্ত্তিত হয়। অসভ্য মানবসমাজ অনুসন্ধান কর, ধর্ম্মের এ অবস্থা সম্যক বোধগম্য হইবে।

পরে জ্ঞানানুশীলন করিতে করিতে যখন মানব উন্নতির পথে, সভ্যতার পথে কিয়দ্দূর অগ্রসর হন, তখন তিনি অসভ্যোচিত জড়োপাসনায় সন্তুষ্ট না হইয়া ধর্ম্মবিষয়ে আরও উন্নতিলাভ করেন। পূর্ব্বে যে প্রাকৃতিক দৃশ্যপটলে দৈবশক্তির বিকাশ উপলব্ধি করেন, এখন সেই বিশ্বাসে আরও বদ্ধমূল হইয়া শক্তির উগ্র বা সৌম্যভাব দর্শনে দেবতারও উগ্র বা সৌম্যমূর্ত্তি কল্পনা করত পাদ্য ও অর্ঘ্যদানে উহার পূজা করিতে শিক্ষা করেন। এ অবস্থায় হৃদয়ের উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট মনোবৃত্তিগুলি দেববর্গে আরোপিত করিয়া উহাদের অলৌকিক সাংসারিক লীলা পুরাণাদি গ্রন্থে বর্ণন করত নিজমনের উন্নতির

প্রার্থী হন। এই সময়ে বীরধর্ম্ম শিক্ষা করিবার জন্য বীরপূজা (Hero worship) সংসারে প্রবর্ত্তিত হয়। এই সময়ে লোক বিশেষের লোকাতিগুণ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে নিজ জীবনের আদর্শস্বরূপ জ্ঞান করত তাঁহার পূজা করিতে থাকেন। এই প্রকারে পৌত্তলিকতা জগতে প্রবর্ত্তিত হয়। আধুনিক একেশ্বরবাদ প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে পুরাকালীন সভ্য জনপদবর্গে এইরূপ পৌত্তলিকতা প্রচলিত ছিল।

কালসহকারে জগতে জ্ঞানের অশেষ উন্নতিলাভ হইলে মানবের বুদ্ধিশক্তি যখন পূর্ণভাবে বিকসিত হয়, তখন তিনি পুরাণকাহিনী অগ্রাহ্য করিয়া পূজ্য-দেবতাদিগের সদসৎগুণদর্শনে দোষাবহ পৌত্তলিকতায় বীতশ্রদ্ধ হন। তখন তিনি প্রকৃতি জগতের দৃশ্যপটল দর্শনে ভীত ও বিস্মিত না হইয়া সোৎসাহে উহাদের কারণপরম্পরার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন এবং মনোবিজ্ঞান অনুশীলন করিতে করিতে যখন তিনি বুঝিতে পারেন যে,জীবাত্মা বা মন তাঁহার যাবতীয় কার্য্যের একমাত্র মূলীভূত কারণ, তখন তিনি নিজ মনের আদর্শে বহুসংখ্যক দেবতা-দিগের পরিবর্ত্তে অদ্বিতীয় ঈশ্বরকে চরাচর বিশ্বের একমাত্র আদিকারণ জ্ঞান করেন। এইরূপে তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারেন, একেশ্বরই জগতের প্রাণস্বরূপ, মনস্বরূপ, সর্ব্বনিয়ন্তা, তিনিই ইহার সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকর্ত্তা। তখন তিনি তাঁহাকে যাবতীয় সুখদুঃখের একমাত্র নিয়ন্তা জ্ঞানে ভক্তি ও প্রেমরসে পরিপ্লুত হইয়া নিরাকাররূপে তাঁহার উপাসনা করিতে আরম্ভ করেন এবং অসার পৌত্তলিকতাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতে থাকেন। যে সকল ধর্ম্মজীবন আত্মোৎসর্গী মহাত্মাগণ তাঁহাকে উপরোক্ত শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মমত উপদেশ দেন, তাঁহাদের শিষ্যানুশিষ্যগণ তদীয় উপদেশ যে সকল ধর্ম্মগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া যান, সেই সকল শাস্ত্রানুসারে তিনিও নিজ জীবন ও চরিত্র গঠন করিতে শিক্ষা করেন। এই প্রকারে খ্রীষ্টাদি ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ একেশ্বরবাদ জগতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে।

ধর্ম্মবিজ্ঞান জড়োপাসনা হইতে একেশ্বরবাদরূপ ধর্ম্মের যে ক্রমোন্নত অবস্থা নির্দ্দেশ করে, তাহা আদৌ অধ্যাত্মজ্ঞানসম্মত নহে। এ বিষয়ে উহাদের সম্পূর্ণ মতভেদ দেখা যায়। বিজ্ঞান কলিযুগের পঞ্চ সহস্র বৎসরের ইতিহাসাদি অনুসন্ধান করিয়া যে সকল সিদ্ধান্ত করে, তাহা সত্য ও প্রমাণসিদ্ধ হইলেও

ইহা সৃষ্টির সত্যত্রেতা দ্বাপর যুগের বিষয় কিছুই অবগত নয়। কিন্তু প্রাচীন কালের অধ্যাত্মবিজ্ঞান এ সকল বিষয় ভালরূপ অবগত আছে। উপরোক্ত তিন যুগের দেবরূপী ও দৈত্যরূপী মনুপুত্রগণ, যাঁহারা পূর্ণ অধ্যাত্মিক শক্তিতে বিভূষিত ছিলেন, তাঁহাদের ভিতর যে নিগুর্ণ ব্রহ্মোপাসনা ও যোগাভ্যাস প্রচলিত ছিল, তাহাই এ জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মমত। ইহারই ভগ্নাবশেষ ঋকবেদাদি প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায় এবং বেদান্তসূত্রে ও উপনিষদে ইহাই অনেকে পাঠ করিতেছেন। ইহার সহিত তুলনা করিলে আধুনিক সভ্যদেশপ্রচলিত একেশ্বরবাদ অপকৃষ্ট যুগের অপকৃষ্ট ধর্ম্মমাত্র।

মস্তিষ্কের পিনিয়াল গ্লাণ্ড (Pineal Gland) নামক তৃতীয় নয়নের যন্ত্রটী যুগধর্ম্মে ক্রমশ অপগত হইতে আরম্ভ হইলে, আত্মার আধ্যাত্মিকতা কালে হ্রাস পাইতে থাকে, মনের জ্ঞানশক্তি ক্রমশঃ স্ফুরিত হয় এবং মানবপ্রকৃতির বিস্তার পরিবর্ত্তন ঘটিয়া যায়। মহাত্মাগণের বিশ্বাস, দ্বাপরযুগের মধ্যভাগে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। তদবধি আধ্যাত্মিকতার পরিবর্ত্তে আধিভৌতিক উন্নতিসাধিকা জ্ঞানশক্তি সংসারে দেখা দেয়। যখন এই জ্ঞানশক্তির ঈষৎ উন্মেষ ঘটে, তখন অসভ্য মানব জড়োপাসনার আশ্রয় লয়; এজন্য এখনও জগতে অসভ্য জাতিবর্গ জড়োপাসক যখন এই জ্ঞানশক্তির অধিক উন্মেষ হওয়াতে জগতে সভ্যতার বৃদ্ধি হইতে থাকে, তখন সভ্যজাতিবর্গ তৎকালীন মানবের প্রকৃত্যানুযায়ী পৌত্তলিকতা অবলম্বন করে। যখন জ্ঞানশক্তির পূর্ণ উন্মেষ হওয়াতে মানব সুসভ্য হন, তৎকালে তিনি নিজ মনের প্রকৃত্যানুসারে একেশ্বরবাদ গ্রহণ করেন। এজন্য আজকাল জগতের সুসভ্য জাতিবর্গ একেশ্বরবাদী। এখন জ্ঞানশক্তির তারতম্য বশতঃ তিনি জড়োপাসক, পৌত্তলিক বা একেশ্বরবাদী হউন, যুগধর্ম্মানুসারে বা কলিযুগের প্রভাববশতঃ তাঁহার আধ্যাত্মিকতা বা প্রকৃত ধর্ম্মভাব বিশেষরূপে অপগত হইতেছে।

সনাতন হিন্দুধর্ম্ম স্পষ্ট নির্দ্দেশ করে, সংসারে ধর্ম্মের ক্রমোন্নতি হওয়া দূরে থাকুক, কালক্রমে ইহা ক্রমাবনত হইতেছে। তাহার সাক্ষ্য, সত্য যুগে ধর্ম্ম চতুষ্পাদবিশিষ্ট,সংসারে পাপের লেশ মাত্র ছিল না এবং জীবাত্মার আধ্যাত্মিকতা পূর্ণভাবে বিকসিত ছিল। এক এক যুগে যেমন ধর্ম্মধেনুর এক একটী পাদ নষ্ট হইয়া যায়, জীবাত্মার আধ্যাত্মিকতা তেমনি ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে এবং

সংসারে শোকতাপ ও পাপরাশি ক্রমশঃ প্রবল হইতে থাকে। পরিশেষে এই কলিযুগে ধর্ম্মের একটীমাত্র পাদ অবশিষ্ট আছে, তাহাও আবার ভগ্নাবস্থায়। এখন সংসারে অধ্যাত্মিকতার পরিবর্ত্তে আধিভৌতিকতার পূর্ণ বিকাশ, ধর্ম্মের পরাজয়, অধর্ম্মের জয়, প্রবঞ্চনা ও চাতুর্য্য সর্ব্বত্র জল জল করিতেছে; কেন এ কলিযুগে ধার্ম্মিকদিগের এত কষ্ট,এত যন্ত্রণা ও এত লাঞ্ছনা এবং অধার্ম্মিকদিগের এত সমৃদ্ধি, এত সম্মান ও এত ঐশ্বর্য্য? শ্রীরাম, বুদ্ধদেব, ঈশা, মহম্মদ প্রভৃতি সকল ধর্ম্মাত্মা সংসারে কষ্টরাশি বহন করিয়া গিয়াছেন। সংসারে এ কলিযুগে পাপের স্রোত প্রবলবেগে বহমান বলিয়া বেচারা ধার্ম্মিকদিগের মস্তকোপরি এত ঝঞ্ঝাবাত বহিতে থাকে।

এখন ধর্ম্মবিজ্ঞানের মত সত্য, না হিন্দুধর্ম্মের মত সত্য অর্থাৎ সংসারে ধর্ম্মের ক্রমোন্নতি বা ক্রমাবনতি হইতেছে, ইহার মীমাংসা করা কর্ত্তব্য। এ বিষয় মীমাংসা করিবার পূর্ব্বে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের একটা মহৎ ভ্রম দেখান আবশ্যক। ইতিহাসও প্রত্নতত্ত্বাদি অনুশীলন করিয়া তাঁহারা সিদ্ধান্ত করেন, পুরাকালে মিসর, ভারত, চীন, ক্যাণ্ডিয়া, এসিরিয়া, ব্যাবিলন, পারস্ত, গ্রীশ,রোম প্রভৃতি জনপদবর্গ কালোচিত সভ্যতাসোপানে আরোহন করিয়াছিল; তৎপূর্ব্বে সমগ্র মানবজাতি সকল দেশে ঘোর অসভ্য-অবস্থায় নিপতিত ছিল। ঋক্‌-বেদাদি জগতের প্রাচীন গ্রন্থাবলি পাঠ করিয়া তাঁহারা সিদ্ধান্ত করেন, যৎকালে আর্য্যজাতি তাহাদের আদিম নিবাসস্থল হইতে বহির্গত হন, তৎকালে তাঁহারা কালোচিত সভ্যতাসোপানে আরূঢ় ছিলেন। তাঁহারা মনে করেন, এই আর্য্য-জাতির পূর্ব্বে সমগ্র জগৎ ঘোরান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল।

লক্ষ লক্ষ বৎসর হইতে চলিল, মানবজাতি জগতে আবির্ভূত হইয়াছে; তন্মধ্যে বিগত পঞ্চসহস্র বৎসর দেশবিশেষ জ্ঞানানুশীলন করিয়া সভ্যতা লাভ করে; আর এতকাল সমগ্র মানবজাতি অসভ্য অবস্থায় ছিল, এ কথা কি যুক্তি সঙ্গত? অনেকের ধারণা চিরদিনই জগৎ অসভ্য, অর্দ্ধসভ্য ও সভ্য জাতিতে পরিপূর্ণ। যে সকল ভৌতত্ত্বিক বিপ্লব দ্বারা ধরণীর পৃষ্ঠদেশ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, যদ্দ্বারা মহাদ্বীপবিশেষ জলধিগর্ভে নিমগ্ন বা ইহা হইতে উত্থিত হইয়াছে, উহারাই আমাদিগকে প্রকৃত তথ্য জানিতে দেয় না। যখন কোন মহাদেশ অধিবাসীদিগের সহিত সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া যায়, উহার পূর্ব্বতন সভ্যতার কোন-

রূপ নিদর্শন থাকে না। আবার যখন কোন মহাদেশ সমুদ্র হইতে উত্থিত হয়, উহার অধিবাসীদিগকে অসভ্য অবস্থা হইতে কালক্রমে সভ্যতা লাভ করিতে হয়।

তাহার সাক্ষ্য, আঠার হাজার বৎসর হইল, যখন মৌ মহাদ্বীপ হঠাৎ প্রশান্ত মহাসাগরে এক মুহূর্ত্তে নিমগ্ন হইয়া যায়, তখন উক্ত মহাদ্বীপস্থ সূর্য্যবংশীয় সম্রাট্‌দিগের সুবিশাল সাম্রাজ্য কোথায় ভাসিয়া গেল এবং উহাদের সভ্যতার কোনরূপ নিদর্শন এখন জগতে নাই। সেইরূপ যখন আট্‌লান্টিশ মহাদ্বীপ দীর্ঘকায় দৈত্যজাতির সহিত আট্‌লান্টিক মহাসাগরে নিমগ্ন হইয়া যায়, উহাদেরও সভ্যতার কোন নিদর্শন এখন জগতে নাই। অনেকে অনুমান করেন, যখন পূর্ব্বোক্ত দুই মহাদ্বীপ সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া গেল, তখন আধুনিক আমেরিকা ভূগর্ভ হইতে কালক্রমে উত্থিত হয় এবং অসভ্য জাতিতে পূর্ণ হয়। ইহাতে বুঝা উচিত, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ভ্রমবশতঃ ভাবেন, আর্য্যজাতির পূর্ব্বে সমগ্র মেদিনী অসভ্য অবস্থায় ছিল।

হিন্দুশাস্ত্র পাঠ করিয়া আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি, এ কলিযুগে মানবের আধ্যাত্মিক, মানসিক ও শারীরিক অবনতির সহিত তাঁহার সভ্যতারও ক্রমাবনতি ঘটিতেছে। আজকাল যেমন তাঁহার আত্মা ও মনের তাদৃশ শক্তি নাই, তাঁহার শরীরও ক্রমশঃ খর্ব্বাকৃতি ধারণ করিতেছে এবং তাঁহার আয়ুর্ব্বল হ্রাস পাইতেছে; সেইরূপ সকল দিকে তাঁহার অবনতি দেখা যাইতেছে। যাঁহারা পাশ্চাত্য গুরুকুলে সুশিক্ষা পান, তাঁহারা শাস্ত্রের এ সকল কথায় বিশ্বাস করিবেন না। তাঁহারা ত ভালরূপ জানেন, আজকাল বিজ্ঞানের কল্যাণে পাশ্চাত্য জগৎ অভূতপূর্ব্ব সভ্যতা-জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইতেছে; এমন সভ্যতা জগতে কোনকালে কোন জাতি লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু নূতন নূতন আবিষ্কারের সঙ্গে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আপনাদের ভ্রম বুঝিতে পারিবেন।

শাস্ত্রোল্লিখিত কয়েকটী ঘটনা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, আধুনিক আর্য্যজাতির পূর্ব্বে অন্যান্য জাতি জগতে সভ্যতা লাভ করিয়াছিল। মহাভারতে সকলেই পাঠ করেন, ময়দানব মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের অত্যদ্ভুত সভাগৃহ নির্ম্মাণ করে। ময়দানব কোথা হইতে আসিল এবং কেন সভাগৃহ নির্ম্মাণ করিল, সে সব কথা ছাড়িয়া দেও। তেমন অপরূপ সভাগৃহ আধুনিক মানব

দ্বারা রচিত হইতে পারে না বলিয়া শাস্ত্রকারেরা তাহা ময়দানবকর্ত্তৃক নির্ম্মিত উল্লেখ করেন। ইহাতে বুঝা উচিত, দানবরূপী মনুপুত্রগণ পূর্ব্বতন যুগে শিল্প ও স্থপতিবিদ্যায় অসাধারণ নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিল। রামায়ণে পাঠ করি, শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কায় যাইবার জন্য বানরবাহিনী দ্বারা মান্নার উপসাগরের উপর বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর দ্বারা সমুদ্র বন্ধন করেন। ইহাকে রামেশ্বর সেতুবন্ধ বা আডাম সেতু (Adam's Bridge) বলে। যাঁহারা এই সেতু দেখিয়াছেন, তাঁহারা বলেন, ইহা সাগরোত্থিত কোন শৈলের ভগ্নাবশেষ নহে। দীর্ঘকায় দানবেরা বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর দ্বারা ইহাকে নির্ম্মাণ করিয়াছিল। আধুনিক খর্ব্ব-কায় মানব দ্বারা ইহা কদাচ রচিত হইতে পারে না। এজন্য মহর্ষি বাল্মীকি পবননন্দন হনুমানকে দীর্ঘকায় বর্ণন করেন। রাবণবংশ ধ্বংস করিয়া শ্রীরাম চন্দ্র সস্ত্রীক পুষ্পকরথে করিয়া লঙ্কা হইতে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করেন। পুষ্পকরথ আধুনিক এরোপ্লেন অপেক্ষা সহজ উপায়ে শূন্যমার্গে চালিত হইত। ইহাতে অনুমান করা উচিত, পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে মানবজাতি দেশবিশেষে সুসভ্য ছিল।

যাহা হউক, কোনরূপ ঐতিহাসিক প্রমাণ না থাকিলেও আমরা শাস্ত্রানু সারে চিরদিন স্বীকার করিব, আর্য্যজাতির পূর্ব্বে, অন্যান্য দীর্ঘকায় জাতি বিশেষ দেশবিশেষে সভ্যতা লাভ করিয়া গিয়াছে এবং পৃথিবী সকল যুগে অসভ্য ও সুসভ্য জাতিতে পূর্ণ আছে।

অনেকে মনে করেন, যে পাশ্চাত্য জগৎ বহুকাল ঘোরান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল এবং অল্পদিনমাত্র জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইয়াছে, তত্রত্য পণ্ডিতগণ স্বতঃ-সিদ্ধান্ত করেন, যে পুরাকালে সমগ্র জগৎ অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল এবং জগতে সভ্যতার ক্রমোন্নতি হইতেছে। আর যে প্রাচ্যজগৎ পুরাকালে অত্যুন্নত ছিল এবং এখন অবনত হইয়াছে, তত্রত্য পণ্ডিতগণ স্বতঃ সিদ্ধান্ত করেন, জগতে সভ্যতার ক্রমাবনতি ঘটিতেছে। যাহা হউক, পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মত সত্য, না প্রাচ্য পণ্ডিতদিগের মত সত্য, তাহা কালে মীমাংসিত হইবে।

এখন মূলবিষয় অনুসরণ করা যাউক। ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, যুগ-ভেদে মানবের আধ্যাত্মিক শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস পাওয়াতে জ্ঞানানুশীলন বশতঃ তাঁহার আধিভৌতিক বাহ্য সভ্যতা যেমন একদিকে বর্দ্ধিত হইতেছে, তেমনি

অপর দিকে অশেষ পাপতাপ ও রোগশোক সংসারে প্রবল হইতেছে। এই প্রকারে তাঁহার মনের প্রকৃত ধর্ম্মভাব ক্রমশঃ মন্দীভূত হইতেছে।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে এখন পৃথিবীর যেরূপ অবস্থা উপস্থিত, তাহাতে শাস্ত্রোক্ত কলিযুগবর্ণনের সহিত ইহার অক্ষরে অক্ষরে মিলন দেখা যায়। এখন জনসাধারণ যেরূপ অধর্ম্মপরায়ণ, শঠ, ধূর্ত্ত ও মিথ্যাবাদী, তাহাতে বোধ হয় কলিযুগবর্দ্ধনের সঙ্গে ঐ সকল পাপ সংসারে এতদূর প্রবল হইতেছে। অতএব হিন্দুশাস্ত্রের কথা যে সম্পূর্ণ সত্য (অর্থাৎ) ধর্ম্ম যে সংসারে ক্রমশঃ অবনত হইতেছে তদ্বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ করা উচিত নয়। তবে বিজ্ঞানোক্ত ধর্ম্মের ক্রমোন্নতি কোথায়? মানবের জতীয় ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে বুঝা যায়, কলিযুগে তাঁহার জ্ঞানশক্তি যেরূপ ক্রমবিকসিত হইতেছে, ধর্ম্মবিষয়ক মতামতও সেইরূপ কালসহকারে পরিবর্ত্তিত ও ক্রমোন্নত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু ইহাতে তাঁহাতে মনের প্রকৃত ধর্ম্মভাব আদৌ উন্নত হয় নাই; বরং ইহা আরও অবনত হইয়া পড়িতেছে।

অসভ্য অবস্থায় লোকে ঈশ্বর মানুক বা না মানুক, মুখে ধর্ম্মের বড়াই করুক বা না করুক এবং সর্ব্বদা ভূত প্রেতাদির ভয়ে অস্থির হইলেও উহাদের প্রকৃতি সকল দিকে সরল ও বালোচিত থাকে। কিন্তু সভ্য দেশের জনসাধারণ ঈশ্বরকে সর্ব্বান্তঃকরণে মান্য করে ও অশেষ ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার উপাসনা করে এবং মুখে সদা ঈশ্বরকে ডাকিতেছে, অথচ উহাদের মন শঠতা ও কপটতায় পূর্ণ। মনটী যেরূপ জিলিপির প্যাচে ভরা, সে প্যাচ খোলা দায়। সুসভ্য সমাজে কূট রাজনীতির কেন এত সমাদর ও প্রশংসা?

যাঁহারা মনে করেন, সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে ধর্ম্ম সংসারে ক্রমোন্নত হইতেছে, তাঁহারা নেত্রোন্মীলন করিয়া একবার সুসভ্য ইউরোপীয় সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, বুঝিতে পারিবেন, কৃত্রিম সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সংসারে ধর্ম্মের কিরূপ প্রকৃত অবনতি ঘটিতেছে। দেখ না, সুসভ্য জাতিবর্গ, যাঁহারা খৃষ্টধর্ম্মের উদার প্রেম ও আপনাদের সভ্যতার বড়াই করেন, তাঁহারা কয়েক বৎসর ধরিয়া মহাকুরুক্ষেত্র সমরে লিপ্ত হইয়া জগতের কি না সর্ব্বনাশ ঘটাইলেন। এই সকল দানবদিগের তাণ্ডব নৃত্য দেখিয়া সংসারে ধর্ম্ম আছে বলিয়া কি মনে হয়?

সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সমাজের অবস্থা এখন যেরূপ, তাহাতে যে বেচারা ধর্ম্মভীরু ও ধর্ম্মপরায়ণ, তিনি হন পদে পদে প্রতারিত; এখন যিনি হন সরল,

তিনি হন মহানির্ব্বোধ। এখন যিনি মনের কথা খুলিয়া বলেন, তিনি হন পাগল। এখন যিনি লোকের চোক্ষে যত ধূলি দিতে পারেন, তাঁহার ততোধিক সম্মান ও প্রতিপত্তি। এখন যে সমাজে অধর্ম্মরূপিনী নারী জাতির যত অধিক সম্মান ও সমাদর, সে সমাজ তত সভ্যতাসোপানে অগ্রসর। এখন যে দেশে পার্থিব অর্থকরী বিদ্যার যত অধিক গৌরব ও উন্নতি, সে দেশ তত সভ্যতা পথে অগ্রসর। এখন একজন স্বার্থসিদ্ধির জন্য অপরের সহিত মিত্রতা করে, স্বার্থসিদ্ধি হইবার পর উহার গলায় ছুরি বসাইতে সঙ্কুচিত হইবে না। এখন তুমি প্রাণপণ করিয়া এক জনের মহোপকার কর, শেষোক্ত তোমার দিকে মুখ তুলিয়া আদৌ চাহিবে না, প্রত্যুপকার করা ত স্বপ্নের কথা। ধর্ম্ম কর বা অধর্ম্ম কর, সংসারে সকলেই কৃতঘ্ন ও বেইমান। ইহাকেই বলে ঘোর কলির রাজ্য। তবে শাস্ত্রের কথায় কেন অবিশ্বাস করিতেছ?

পণ্ডিতবর মোক্ষমূলার সাহেব বেদের তথা কথিত জড়োপাসনার মধ্যে অত্যুন্নত একেশ্বরবাদের পূর্ণ নিদর্শন পাইয়া বিজ্ঞাননির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মের ক্রমোন্নতিমত খণ্ডন করিয়া যান। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তিনিও বুঝিতে পারেন নাই, এই অত্যুন্নত একেশ্বরবাদ পূর্ব্বতন যুগের নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনার ভগ্নাবশেষ মাত্র।

পরিশেষে বক্তব্য, পাশ্চাত্য বিজ্ঞাননির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মের ক্রমোন্নতিতে আমাদের বুঝা উচিত, এই কলিযুগে মানবের জ্ঞানশক্তির ক্রমোন্নতি ও ক্রমবিকাশের সহিত ধর্ম্মবিষয়ক মতামত কিরূপ ক্রমোন্নত হইয়াছে; এজন্য জগতের অসভ্য জাতিবর্গ জড়োপাসক, অর্দ্ধসভ্য জাতিবর্গ পৌত্তলিক এবং সুসভ্য জাতিবর্গ একেশ্বরবাদী। আর হিন্দুশাস্ত্রের কথানুসারে আমাদের বুঝা উচিত, সমাজের ধর্ম্মবিষয়ক মতামত যেরূপ হউক না কেন, কি প্রকারে কলিযুগবর্দ্ধনের সঙ্গে মনের প্রকৃত ধর্ম্মভাব দেশে দেশে ক্রমশঃ অবনত বা অধোগত হইতেছে, এমন কি, লোপ পাইতেছে। যাহা হউক, বিজ্ঞানের কথা একদিকে কিঞ্চিৎ সত্য এবং শাস্ত্রের কথাও সম্পূর্ণ সত্য।

পঞ্চম অধ্যায়।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও স্বরূপ।

এই নিখিল বিশ্বসংসার, যাহার অত্যদ্ভুত কৌশল ও বৈচিত্র্য দর্শনে আমরা অনুক্ষণ বিমুগ্ধ হই, যাহা নন্দনকাননের ন্যায় আমাদের অনন্ত সুখের আগার, ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা কে, কে ইহার রচয়িতা, তিনি কেমন, তাঁহার স্বরূপ কি প্রকার তিনি কোথায় থাকেন, এ সকল কথা জানিতে আমরা চিরদিন সমুৎসুক। সামান্য বুদ্ধিবিকাশের সঙ্গে এ সকল প্রশ্ন আমাদের মনে স্বতঃ উত্থিত হয়। ইহাদের সুমীমাংসার জন্য ধর্ম্ম সকল দেশে জগৎস্রষ্টা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করায়।

এখন আমরা বাল্যকালে জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে পরমপিতা পরমেশ্বরকে বুঝিয়া থাকি এবং তাঁহার সুমধুর নাম লইয়া ভবসাগরের নানা ঝঞ্ঝাবাত উত্তীর্ণ হইতে চেষ্টা পাই। প্রায় সকল দেশের জনসাধারণ ঈশ্বরে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে এবং অপার কৃতজ্ঞতারসে আপ্লুত হইয়া সর্ব্বান্তঃকরণে অশেষ ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার উপাসনা বা আরাধনা করে। আজ ধর্ম্মের কল্যাণে আমাদের ঈশ্বরজ্ঞান একরূপ প্রকৃতিসিদ্ধ বা স্বতঃসিদ্ধ। সকলেই জানেন, আমরা নৈসর্গিক সংস্কারে (Intuition) ঈশ্বরজ্ঞান লাভ করিয়া থাকি।

ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস এখন প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত। ধর্ম্মের এই শ্রেষ্ঠ মতটী এখন প্রায় সকল মানবসমাজে প্রচলিত দেখা যায়। কেবল নাস্তিকগণ ঈশ্বর মানেন না, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে তাঁহারা অন্ধ প্রকৃতির শরণ লন। আজ কাল বিজ্ঞানের কল্যাণে সুসভ্য সমাজে নাস্তিকমত ক্রমশঃ প্রবল হইতেছে। এস্থলে স্মরণ রাখা উচিত, মানব ধর্ম্ম সরল বিশ্বাসে ঈশ্বরসম্বন্ধে যাহা যাহা নির্দ্দেশ করে, তাহাই নাস্তিকগণ মানেন না; কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে তাঁহারা অন্ধ প্রকৃতি বিশ্বাস করেন।

জনসাধারণের বিশ্বাস, পরম পিতা পরমেশ্বর বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতিসংহারকর্ত্তা। তিনি ইহা স্বহস্তে রচনা করিয়াছেন এবং তিনি ইহার পালন করিতেছেন।

তাঁহার ইচ্ছায় ইহার যাবতীয় ব্যাপার ঘটিতেছে। তিনি আমাদের সুখদুঃখের একমাত্র নিয়ন্তা। কেহ বলেন, তিনি জগতের অন্তরালে বা স্বর্গের একান্তে বসিয়া সকল করিতেছেন ও দেখিতেছেন; কেহ বলেন, তিনি সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিয়া সকল করিতেছেন ও দেখিতেছেন। শিক্ষিত সম্প্রদায় ভাবেন, যদিও সকলই তাঁহার ইচ্ছায় ঘটিতেছে, তথাচ প্রত্যেক বিষয়ে তাঁহার অখণ্ডনীয় ভৌতিক নিয়মাবলী বর্ত্তমান, যদনুসারে সংসার চলিতেছে। আমাদের বিশ্বাসে তিনি সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বমঙ্গলময়, সর্ব্বদয়াময় ও পরম ন্যায়বান। মানব মনে যে সকল উৎকৃষ্ট গুণ আছে, তাহা অনন্ত গুণিত করিয়া আমরা সাধারণতঃ ঈশ্বরে আরোপ করিয়া থাকি। এইরূপ যে ঈশ্বরের উপর সাধারণ লোকের বিশ্বাস বহুকাল হইতে মানবসমাজে বদ্ধমূল, তিনি লৌকিক ঈশ্বর বা লোক-প্রখ্যাত ঈশ্বর (Anthromorphic God)

এখন ঈশ্বর সম্বন্ধে জন সাধারণের বিশ্বাস আদৌ অধ্যাত্মবিজ্ঞানের অনুমোদিত নহে। যে স্থলে উহারা সরল বিশ্বাসে লৌকিক সগুণ নিরাকার ঈশ্বর মানিয়া চলে, সে স্থলে অধ্যাত্মবিজ্ঞান নির্গুণ পরব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করে। অনেকে মনে করিতে পারেন পরব্রহ্মে ও লৌকিক ঈশ্বরে কোনরূপ প্রভেদ নাই, উহারা এক; কিন্তু উহাদের ভিতর যথার্থতঃ বিস্তর প্রভেদ আছে। যিনি পরব্রহ্ম, তিনি মায়াতীত ও গুণাতীত; তিনি সৎস্বরূপ ও চৈতন্যস্বরূপ; তিনি অবিতর্ক, অপ্রজ্ঞাত ও অপরিমেয়, তিনি পিতাও নন, মাতাও নন; তিনি নিরাকারও নন, সাকারও নন। এই অপকৃষ্ট কলিযুগে তিনি কদাচ মানবমনের ভাব্য নন।

যস্যামতং তস্যমতং মতং যস্য ন বেদ সঃ
অবিজ্ঞানং বিজানতাং বিজ্ঞানমবিজানতাং।
(উপনিষদ)

"যিনি নিশ্চয় জানেন, ব্রহ্মকে জানা যায় না, তিনিই তাঁহাকে জানেন; আর যাঁহার এরূপ নিশ্চয় হয়, আমি ব্রহ্মকে জানি, তিনি তাহাকে জানেন না। জ্ঞানবান ব্যক্তিদিগের বিশ্বাস, ব্রহ্মকে আদৌ জানা যায় না। অজ্ঞ ব্যক্তিরাই মনে করে, তাঁহাকে জানা যায়।"

আমরা প্রকৃতিদত্ত পঞ্চেন্দ্রিয়রূপ মায়াঠুলী পরিয়া ভবের হাটে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। মহামায়া আমাদিগকে যাহা দেখিতে দিয়াছেন, আমরা তাহাই

দেখি মাত্র; তদ্ভিন্ন আর কিছু দেখিবার উপায় নাই। তবে আমরা কি প্রকারে পরব্রহ্ম, দেবতা ও স্বর্গাদি সূক্ষ্মলোক এই চর্ম্মচক্ষে দেখিব? এজন্য তিনি আমাদের জ্ঞানের অতীত।

অনাদিকারণ তুমি জ্ঞানের অতীত,
রেখেছ আমার বোধ করে আচ্ছাদিত।
(ঈশ্বর চন্দ্রগুপ্ত)

শাস্ত্রে পাঠ করি, সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগে দেবরূপী ও অসুররূপী মনুপুত্রগণ সহজাত যোগবলে নির্গুণ পরব্রহ্ম অনায়াসে বুঝিতেন। এ কলিযুগে আমাদের আধ্যাত্মিক শক্তিক্ষয় ও সংসারে স্থূলত্বের সম্যক বৃদ্ধি পাওয়াতে আমরা এখন পরব্রহ্ম ও দেবমণ্ডলী হইতে বহুদূরে পতিত হইয়াছি। এখন আমরা নির্গুণ পরব্রহ্ম আদৌ বুঝিতে বা ভাবিতে পারি না। অথচ আমাদের অধঃপতিত আত্মায় যে আধ্যাত্মিক শক্তি অবশিষ্ট আছে, উহার প্ররোচনায় ও মনের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা বশতঃ আমরা পরব্রহ্মের স্থানে নিরাকার লৌকিক ঈশ্বরে বিশ্বাস করিয়া থাকি। অতএব বলিতে হইবে, মায়াতীত, গুণাতীত পরব্রহ্মকে সগুণ নিরাকার ঈশ্বররূপে ভাবিয়া আমরা তাহাকে মায়ামুগ্ধ মনের ভাব্য করি এবং ইহার উৎকৃষ্ট গুণাবলী তাঁহাতে আরোপ করিয়া তাঁহার গুণানুবাদ করি। ইহা ব্যতীত পরব্রহ্ম ভাবিবার বা বুঝিবার এ কলিযুগে আমাদের উপায়ান্তর নাই।

খৃষ্ট ও মুসলমান জগতে যে লৌকিক ঈশ্বরের (গড ও আল্লা) উপর বিশ্বাস প্রচলিত দেখা যায়, তিনি মায়াতীত পরব্রহ্মের মায়ারূপ। হিন্দুজগতে যে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের উপর লোকের বিশ্বাস বদ্ধমূল, তাঁহারাও তাঁহার মায়ারূপ। বৌদ্ধ জগতে যে বুদ্ধদেবকে লোকে পরব্রহ্ম স্থানে পূজা করে, তিনিও তাঁহার মায়ারূপ। এই মায়াময় জগতে মায়ামুগ্ধ মনের প্রকৃত্যনুসারে মানব সর্ব্বত্র মায়াতীত পরব্রহ্মকে মায়ারূপে ভাবিতে বাধ্য। ইহা ভিন্ন তাঁহার উপায়ান্তর নাই।

এখন পরব্রহ্ম মান বা ঈশ্বর মান, যাঁহাকে মান না কেন, এ জগতের যে এক অজ্ঞেয় আদিকারণ আছে, সে বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ নাই। সেই আদিকারণ, আমাদের নিকট যতই কেন জ্ঞানবুদ্ধির অগোচর হউক না, সেই কারণের

কারণ, সেই অনাদিকারণ যে বর্ত্তমান, এমন কি সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান ও জাজ্জল্যমান, তাহা কে অস্বীকার করিবে? ওহে নাস্তিকবাদী পণ্ডিতগণ! তোমরা যে একটা কথার কথা তথা-কথিত প্রকৃতির দোহাই দিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানিতে চাহ না, বল দেখি, তোমাদের সেই পরমপূজনীয়া প্রকৃতি কিরূপ শক্তিশালিনী? চিৎশক্তি ব্যতীত অন্ধ জড় শক্তি দ্বারা কি এমন চৈতন্যময় জগৎ সৃষ্ট বা চালিত হইতে পারে? জ্যামিতির প্রতিজ্ঞাগুলি বানরকর্ত্তৃক উদ্ভাবিত ও অঙ্কিত বলা যেরূপ অসঙ্গত, এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, অনন্ত কৌশলময়, অনন্ত বৈচিত্র্যময়, অনন্ত সামঞ্জস্যময় জগৎ জড় প্রকৃতির অন্ধ শক্তি দ্বারা সৃষ্ট ও চালিত বলাও সেইরূপ অসঙ্গত। দেখ, তোমাদের আদিগুরু কপিলদেব যিনি লৌকিক ঈশ্বর মানেন নাই, তিনি প্রকৃতির সহিত পুরুষের অবতারণা করিয়া যথার্থ মত প্রকাশ করিয়াছেন। তবে কেন তোমরা চিৎশক্তির ক্রিয়া উড়াইয়া দিয়া অন্ধ প্রকৃতির উপর সমস্ত আরোপ করিতেছ? বেশ জানিবে, যে অনন্ত চিৎশক্তির কণামাত্র পাইয়া তোমরা আজ জগতের অধীশ্বর, সেই চিৎ শক্তি অনন্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছে এবং সমস্তই উহার একমাত্র ক্রিয়া।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলেন :—

> ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
> মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ।
>
> (গীতা)

"আমি অব্যক্ত মূর্ত্তিতে সমস্ত জগতে অভিব্যাপ্ত আছি, আমি যে ভাবে জগৎ জুড়িয়া আছি, তাহা কেহ জানে না। যাবতীয় জীব ও পদার্থ আমাতে বর্ত্তমান আছে, আমা ব্যতীত বা আমার চিৎশক্তির ক্রিয়া ব্যতীত কোন জীবজন্তু ও পদার্থ থাকিতে পারে না। কিন্তু আমি ঐ সকল জীবে ও পদার্থে অবস্থিত নহি, উহারা মায়ার ত্রিগুণের লীলাস্থল বলিয়া আমি উহাদের হইতে নির্লিপ্ত।"

পরব্রহ্মের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিবার জন্য আমাদিগকে দূরদেশে যাইতে হয় না। মনের গভীরতম প্রদেশ অনুসন্ধান করিলে আমরা ইহার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়া থাকি। যে জীবাত্মা দেহপিঞ্জরে নিবদ্ধ থাকিয়া আমাকে আমিত্ব জ্ঞান প্রদান করে এবং সমস্ত দেহকে চৈতন্যময় করে, সেই জীবাত্মা পরমাত্মার অংশবিশেষ।

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি।

(গীতা)

"যে সনাতন অবিনশ্বর আত্মা আজ জীবলোকে জীব নামে ব্যক্ত, উহা আমারই অংশবিশেষ এবং শরীরস্থ হইলে দেহের পঞ্চেন্দ্রিয় ও মনের সহিত সংযুক্ত হইয়া জীবনের কার্য্য করে।"

এস্থলে কেহ কেহ বলিবেন, মন ও দেহ লইয়াই ত মানব, আবার জীবাত্মা কোথা হইতে আসিল; তবে জীবাত্মার প্রমাণ লইয়া কি প্রকারে পরমাত্মার বা পরব্রহ্মের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিতে চাহ? এখন দেখ, জীবাত্মার অস্তিত্ব বিষয়ে আমরা কিরূপ প্রমাণ পাইয়া থাকি। সাধারণতঃ আমরা দেহ ও মনের পৃথক অস্তিত্ব যেরূপ উপলব্ধি করি, মনও আত্মার অস্তিত্ব সেরূপ অনুভব করিতে পারি না। কিন্তু সময়ে সময়ে অনেকে উহাদের পৃথক অস্তিত্ব ভালরূপ বুঝিতে পারেন। যোগিগণ যোগবলে আত্মা ও মনের পৃথক সত্তা ভালরূপ বুঝিয়া থাকেন। সমাধির অবস্থায় যখন তাঁহারা ইন্দ্রিয়গণের সহিত মনের লয় সাধন করে, তখন আত্মার আধ্যাত্মিক শক্তি স্ফূরিত ও জাগরিত হয়। এই প্রকারে তাঁহারা ভালরূপ বুঝিতে পারেন, আত্মা ও মন সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ। যদি ভণ্ড যোগীর কথায় বিশ্বাস না হয়, সুষুপ্তির অবস্থায় যখন মানসিক ক্রিয়া রহিত হইয়া যায়, তখন এমন স্বপ্ন কখন কখন দেখা যায়, যাহা হুবহু সত্য ঘটনায় পরিণত হয়। এস্থলে সর্ব্বজ্ঞ আত্মা ভবিষ্যৎ ঘটনার আভাস পাইয়া আমাদিগকে স্বপ্নযোগে জানাইয়া দেয়। অতএব মানবমনের গভীরতম প্রদেশে আত্মা বর্ত্তমান এবং উহার আকরস্বরূপ পরমত্মাও সর্ব্বত্র বর্ত্তমান।

এখন পরমাত্মার অনন্ত চিৎশক্তি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে কিরূপ ভাবে ইহার অনন্ত ক্রিয়া চালাইতেছে, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করা উচিত। যেমন একমাত্র গগন বিহারী সূর্য্যদেব সকল জলাশয়ে প্রতিবিম্বিত হয় ও সকল পদার্থকে আলোকিত করে, সেইরূপ পরমাত্মার অনন্ত চিৎশক্তি সংসারের যাবতীয় জীবেও পদার্থে প্রতিভাত ও প্রতিফলিত আছে। সেই চিৎশক্তি এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগতে এমন কি জগতের প্রত্যেক জীবাণুতে ও প্রত্যেক পরমাণুতে প্রকটিত আছে। যেমন শরীরের প্রত্যেক অংশ চৈতন্যময় ও অনন্ত ক্রিয়ার আধার, সেইরূপ

এই নিখিল বিশ্বের প্রত্যেক অংশ সেই চিৎশক্তিযোগে চিরদিন চৈতন্যময় ও অনন্ত ক্রিয়ার আধার। জগতের যে অনন্ত ভৌতিক শক্তি অনন্ত ভৌতিক পদার্থের যোগে অনন্ত লীলা দেখাইতেছে, উহারা কেবল সেই চিৎশক্তি যোগে এখন সামঞ্জস্য ও সুশৃঙ্খলতার সহিত চলিতেছে।

যেমন সর্ব্বব্যাপী আকাশ সমস্ত জগৎ জুড়িয়া আছে, ইহার প্রত্যেক বস্তুর অভ্যন্তর ভাগ ও বহির্ভাগ যুগপৎ ব্যাপিয়া আছে, সেইরূপ পরব্রহ্মও নিখিল সংসার জুড়িয়া আছেন, ইহার অভ্যন্তরে যেমন আছেন, ইহার বহির্ভাগেও তেমনি আছেন। সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ ইহা অধ্যাত্মবিজ্ঞানের একটী জলন্ত সত্য

বেদান্তমতে এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বই পরব্রহ্মের বিরাটরূপ। তিনি যে কেবল আকাশরূপে সর্ব্বত্র অভিব্যাপ্ত আছেন, তাহা নহে। তিনিই মায়াযোগে বর্দ্ধিত হইয়া এই মায়াময় স্থূল বিশ্বপ্রপঞ্চে পরিণত হইয়াছেন।

ঈশ্বর সম্বন্ধে জগতে নানা প্রকার মত প্রচলিত আছে, যথা :—

(১) অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ।

(২) নিরাকারবাদ ও সাকারবাদ।

(৩) একেশ্বরবাদ ও বহ্বীশ্বরবাদ।

প্রথমতঃ। যাঁহারা অদ্বৈতবাদী, তাহারা ব্রহ্ম ও বিশ্বকে আদৌ পৃথক জ্ঞান করেন না; মনে ভাবেন, বিশ্বই ব্রহ্মের বিরাটরূপ। অপর পক্ষে যাঁহারা দ্বৈতবাদী, তাঁহরা স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে চিরদিন পৃথক্ জ্ঞান করেন; মনে ভাবেন, স্রষ্টা ও পাতা স্বর্গের একান্তে বসিয়া বিশ্বের সৃষ্টি ও পালন করেন।

দ্বিতীয়তঃ। যাঁহারা নিরাকারবাদী, তাঁহারা নিরাকার মানব-মনের প্রকৃত্যনুযায়ী—ঈশ্বরের নিরাকারূপ কল্পনা করিয়া তাঁহার উপাসনা করেন। অপরপক্ষে যাঁহারা সাকারবাদী, তাঁহারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মানবদেহের প্রকৃত্যনুসারে ঈশ্বরের সাকার মূর্ত্তি গঠন করিয়া তাঁহাকে সম্যক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করত তাঁহার আরাধনা বা অর্চ্চনা করেন।

তৃতীয়তঃ। যাঁহারা একেশ্বরবাদী, তাঁহারা জগৎপাতা জগদীশ্বরকে স্ব স্ব পিতার ন্যায় অদ্বিতীয় জ্ঞান করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার উপাসনা করেন। অপরপক্ষে যাঁহারা বহ্বীশ্বরবাদী, তাঁহারা মানবমনের বিবিধ সাত্ত্বিক ভাবে অথবা পিতামাতা পতি পুত্র ভাবে ঈশ্বরকে পূজিবার জন্য তাঁহার বিভিন্ন রূপ

কল্পনা করেন। সচরাচর দেখা যায়, যাঁহারা সংসারে দ্বৈতবাদী, তাঁহারা একেশ্বরবাদী ও নিরাকারবাদী, আর যাঁহারা অদ্বৈতবাদী, তাঁহারা সাকারবাদী ও বহ্বীশ্বরবাদী।

এখন পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ঈশ্বর সম্বন্ধে কিরূপ সিদ্ধান্ত করে,তাহার অনুসন্ধান লওয়া উচিত। এত মহোন্নতি, এত গৌরবান্বিত আবিষ্কার, এত সমুজ্জল জ্ঞানালোকের মধ্যে বিজ্ঞান বিষম গোলকধাঁধায় পতিত হইয়া ক্ষীণস্বরে বলে, বিশ্বের আদিকারণ (First cause) মানববুদ্ধির অগম্য ; আমরা কস্মিন কালে স্বীয় সসীম বুদ্ধি চালনা করিয়া এ রহস্য মীমাংসা করিতে পারিব না। এই-রূপে বিজ্ঞান পাকে প্রকারে বিশ্বের অজ্ঞেয় আদিকারণ স্বীকার করে বটে, কিন্তু ইহা লৌকিক ঈশ্বরের উপর খড়্গহস্ত, উহাকে এক তুড়িতে উড়াইতে চেষ্টা পায় ; এজন্য ইহার পুস্তকাবলীতে উহার নামগন্ধ উড়িয়া গিয়াছে। যাহা হউক, এ স্থলে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা উচিত, বিজ্ঞানপ্রতিপাদিত বিশ্বের অজ্ঞেয় আদিকারণ আমাদের বেদান্তের পরব্রহ্ম।

বিজ্ঞান স্পষ্ট নির্দ্দেশ করে, যখন বিশ্বের আদিকারণ আমাদের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞেয়, তখন সেই আদিকারণ অন্বেষণ করিবার কি প্রয়োজন ? বরং ইহার পরিবর্ত্তে যে সকল অপরিবর্ত্তনীয় ভৌতিক নিয়মাবলি দ্বারা এ জগৎ পরিচালিত, উহাদের বার্ত্তা লওয়াই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। ইহার মতে বিশ্বসংসার কতকগুলি অপরিবর্ত্তনশীল প্রাকৃতিক নিয়মাবলী দ্বারা চালিত হইতেছে এবং জড় ও শক্তির ভিন্ন ভিন্ন সমবায়ে ভিন্ন ভিন্ন ঘটনাবলী সংঘটিত হইতেছে। ঈশ্বরের হস্ত দ্বারা ঐ সকল সংঘটিত বলা এখন প্রকৃত মূর্খতা ; জনসাধারণ নিজের অজ্ঞানতাবশতঃ ঈশ্বরকে সর্ব্বনিয়ন্তা জ্ঞান করে। হায়! আর কতকাল এ সকল কুসংস্কার মানবসমাজে বদ্ধমূল থাকিবে। এজন্য যে ধর্ম্ম ঐ সকল অসত্য জগতে শিক্ষা দেয়,সেই ধর্ম্মের উপর ও তৎপ্রতিপাদিত লৌকিক ঈশ্বরের উপর বিজ্ঞান এখন এত নারাজ।

খৃষ্টধর্ম্ম উপদেশ দেয়, মানব ঈশ্বরের প্রতিকৃতি অনুসারে সৃষ্ট হন (Man was made according to the image of God)। বিজ্ঞান ধর্ম্মের সেই চিরাদৃত মত খণ্ডন করিয়া স্পর্দ্ধার সহিত বলিবে, ঈশ্বর মানব সৃষ্টি করেন নাই, কিন্তু মানবই নিজ মনের আদর্শে ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহার মতে ঈশ্বর-

জ্ঞান আমাদের নৈসর্গিক বা সহজ জ্ঞান নহে। বাল্যকালে অন্যান্য সংস্কারের সহিত আমরা ঈশ্বরজ্ঞান প্রাপ্ত হই।

দেখ শরীর রক্ষার জন্য আহার একান্ত আবশ্যক। যাবতীয় জীবজন্তু ও মানব সকলেই ভোজনার্থ ক্ষুধা সমভাবে অনুভব করে। ক্ষুধা আমাদের একটী নৈসর্গিক সংস্কার। কামপ্রবৃত্তিও অপত্যস্নেহ প্রাণিজগতে সেইরূপ সহজ জ্ঞান। কিন্তু এক মানব ব্যতীত অন্য কোন জন্তু এ জগতে ঈশ্বর জানে না বা ভাবিতে পারে না। ভূমণ্ডলে অনেক অসভ্য জাতি আছে, যাহাদের ভাষায় ঈশ্বরবাচক শব্দ আদৌ নাই। তবে ঈশ্বরজ্ঞান কি প্রকারে আমাদের নৈসর্গিক হইল?

নৈসর্গিক জ্ঞানের পর বাল্যকালার্জ্জিত সংস্কার মনে চিরদিন বলবৎ থাকে। বাল্যকালে আমরা মাতৃভাষা শিক্ষা করি। ইহার অনুশাসন মনে যাবজ্জীবন বলবৎ থাকে। সেইরূপ ঈশ্বরে বিশ্বাস বাল্যকাল হইতে মনে বদ্ধমূল হওয়াতে মাতৃভাষার ন্যায় ইহা মস্তিষ্কের অঙ্গীভূত হইয়া যায়। এজন্য বিপদে পতিত হইলেই আমরা স্বতঃ ঈশ্বরকে ডাকিয়া থাকি। মানবমস্তিষ্ক কালসহকারে যেরূপ স্ফুরিত হয়, বুদ্ধিশক্তিও তদনুরূপ বিকসিত হইতে থাকে। এই উন্নত বুদ্ধিশক্তিপ্রভাবে ও সংসারের বিবিধ তাড়নায় তাড়িত হইয়া তিনি নিজের মঙ্গলের জন্য নিজ মনে ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞান উদ্ভাবিত করেন।

একেশ্বরবাদ সম্বন্ধে বিজ্ঞান আরও বলে, মানবের ইহা স্বভাবসিদ্ধ, কোন বিষয়ের কারণ পরম্পরার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে তিনি নিজ মনের আদর্শে একমাত্র আদিকারণে উপনীত হইতে চেষ্টা পান। যেমন জীবনের যাবতীয় ঘটনাবলী বিবিধকারণোদ্ভূত হইলেও তিনি উহাদিগকে এক অদৃষ্ট হইতে উৎপন্ন জ্ঞান করেন, সেইরূপ জগতের ঘটনাপরম্পরা বিবিধ কারণোদ্ভূত হইলেও তিনি সমস্তই একেশ্বরে অর্পণ করিয়া থাকেন।

দেখ, তোমার মন এক এবং এক আমিত্বজ্ঞানে পূর্ণ। যখন তুমি সেই মন দিয়া বিশ্বের আদিকারণ নির্ণয় করিতে যাও, তখন নিজ মনের আদর্শে তুমি স্বতঃ ভাবিবে, এ জগতের একজন সৃষ্টিস্থিতিসংহার কর্ত্তা আছেন। তোমার মনের প্রকৃতি যেরূপ এবং তুমি যেরূপ শিক্ষা দীক্ষা পাও, তাহাতে ঐরূপ সিদ্ধান্ত করাই তোমার স্বভাবসিদ্ধ। বিজ্ঞানের মতে এই প্রকার যুক্তি অবলম্বন

করিয়া পূর্ব্বতন দার্শনিক পণ্ডিতগণ জগতে উন্নত একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়া যান।

এইরূপ নানাপ্রকার নাস্তিক মতামত প্রচার করিয়া বিজ্ঞান ঈশ্বরের উপর জনসাধারণের বিশ্বাস মন্দীভূত করিতে চেষ্টা পায়। ইহাতে কালে সমাজের ঘোর অনিষ্টোৎপত্তি হইবে। যে করুণাময় পরমেশ্বরে বিশ্বাস করিয়া নিরুপায়, অসহায়, দুর্ব্বল মানব এই পাপতাপপূর্ণ সংসারে অশেষ শান্তিসুখে দিন অতিবাহিত করিতেছেন, যিনি ভবপারাবারে তাঁহার একমাত্র কাণ্ডারী এবং যাঁহাকে তিনি জীবনের আদর্শ করিয়া ধর্ম্মপথে ও উন্নতির পথে ক্রমশঃ অগ্রসর, সেই পরম পিতা পরমেশ্বর হইতে বিজ্ঞান আজ তাঁহাকে চিরবঞ্চিত করিতে চাহে। রে বিজ্ঞান! তোমার কুহকজাল আর অধিক বিস্তার করিও না। সমাজ অচিরে অধঃপাতে যাইবে।

এখন বিজ্ঞানোক্তির প্রতিবাদ করা উচিত। নিকৃষ্ট জন্তুগণ আধ্যাত্মিক শক্তি হইতে চিরবঞ্চিত। উহাদের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি না থাকায় উহারা কি প্রকারে ঈশ্বর বুঝিতে সক্ষম হইবে? যেমন বাক্‌শক্তি ও জ্ঞানশক্তি থাকাতে মানব উহাদের হইতে চিরদিন পৃথক, তেমনি ধর্ম্মপ্রবৃত্তিগুলি থাকাতে তিনি আরও পৃথক। বিজ্ঞান যতই কেন সিদ্ধান্ত করুক না, সমাজে বসবাস করাতে তাঁহার ধর্ম্মপ্রবৃত্তিগুলি ক্রমস্ফুরিত হইয়াছে; কিন্তু উহাদের অঙ্কুর হৃদয়ে না থাকিলে উহারা কি প্রকারে এতদূর স্ফুরিত হইতে পারে? এ কলিযুগে তাঁহার অধঃপতিত আত্মায় যে আধ্যাত্মিক শক্তি অবশিষ্ট আছে, উহারই প্ররোচনায় তিনি ঈশ্বরজ্ঞান প্রাপ্ত হন। অতএব ইহা তাঁহার নৈসর্গিক সংস্কার।

এ মায়াজগতে জীবাত্মার সহিত মনের যেরূপ সম্বন্ধ, তাহাতে শেষোক্ত জ্ঞানশক্তির স্ফূর্ত্তির সহিত প্রথমোক্ত ঈশ্বর জ্ঞান লাভ করে। যেমন কামপ্রবৃত্তি নৈসর্গিক সংস্কার হইলেও ইহা যৌবনকালে প্রস্ফুরিত হয়, সেইরূপ বয়সগুণে মস্তিষ্কের রীতিমত স্ফূর্ত্তি হইলে মনের জ্ঞানশক্তির স্ফূর্ত্তির সহিত আত্মার ধর্ম্মপ্রবৃত্তিগুলি স্ফুরিত হয় এবং সেই সঙ্গে ঈশ্বরজ্ঞান ও পাপপুণ্যজ্ঞান হৃদয়ে উদিত হয়। অতএব ইহারা আমাদের নৈসর্গিক সংস্কার। যখন মন চৈতন্যে ও জ্ঞানে পূর্ণ, তখন সেই চৈতন্য ও জ্ঞানের যে এক অনন্ত ভাণ্ডার আছে, তাহা ত একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধ।

আরও বুঝা উচিত, মানবমনের নৈসর্গিক আকাঙ্ক্ষাবশতঃ ঈশ্বরজ্ঞান উহাতে নিগূঢ় ভাবে থাকে, পরে জ্ঞানশক্তির উন্মেষের সঙ্গে ইহা প্রস্ফুরিত হয়। এখন যে সকল অসভ্য জাতি ঈশ্বর বুঝিতে পারে না, উহাদের আধ্যাত্মিক শক্তি তত্দূর স্ফুরিত হয় নাই বলিয়া উহাদের এমন দুর্গতি।

যখন দুর্ব্বল মানবের প্রকৃতি এইরূপ, যে ঈশ্বরে বিশ্বাস ব্যতীত ভবসংসারে তাঁহার গত্যন্তর নাই, তখন এ জ্ঞান যে বয়সে উদ্ভূত হউক না কেন, ইহা তাঁহার নৈসর্গিক সংস্কার। যখন ইহা সকল দেশে সর্ব্ববাদিসম্মত, তখন ইহা তাঁহার নৈসর্গিক।

চিরকালই মানবধর্ম্ম তাঁহাকে এইরূপ উপদেশ দিয়া আসিতেছে এবং তিনিও ঈশ্বরের সুমধুর নাম লইয়া এই দুস্তর ভবসাগর সুখে পার হইতেছেন। অতএব তাঁহাকে ঈশ্বর, গড, হরি, কৃষ্ণ, আল্লা, খোদা, বুদ্ধ প্রভৃতি যে নামে ডাক না কেন, সকল নামে একমাত্র পরব্রহ্মকে ডাকা হইতেছে। যথার্থ বলিতে কি, সংসারের সকল ধর্ম্মই এক পথের পথিক।

বহুধা প্যাগমৈ ভিন্না পন্থানঃ সিদ্ধিহেতবঃ
ত্বয্যেব নিপতন্ত্যোঘাঃ জাহ্নবীয়া ইবার্ণবে।

(রঘুবংশ)

"যেমন গঙ্গোদক যেদিক দিয়া আসুক না কেন, ইহা এক মহাসাগরে পতিত হইতেছে, সেইরূপ জগতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্র প্রকৃত সিদ্ধিলাভের উপায়গুলি বিভিন্ন রূপে নির্দ্দেশ করাতে উহারা যতই কেন বিভিন্ন হউক না, উহারা সকলে একমাত্র পরব্রহ্মে লইয়া যাইতেছে।"

এখন পরব্রহ্মের বা ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। দুঃখের বিষয়, এতৎসম্বন্ধে সুমীমাংসা করা কাহারও সাধ্য নাই। তাঁহাকে সগুণ বা নির্গুণ ভাবে ভাব, সাকার বা নিরাকার ভাবে ভাব, তাঁহার যথার্থ স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারিবে না। তাঁহাকে দেবমূর্ত্তিতে ভাব বা মানবমূর্ত্তিতে ভাব, তাঁহার যথার্থ স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারিবে না। আগম, নিগম, পুরাণ ত্রিপিটক, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি সংসারে যত প্রকার ধর্ম্মশাস্ত্র আছে, কোন শাস্ত্রই তাঁহার যথার্থ স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে পারে না। ঈশা, মূষা, মহম্মদ, বুদ্ধদেব, শ্রীকৃষ্ণ, শঙ্করাচার্য্যদেব প্রভৃতি যোগেশ্বরগণ তাঁহার যথার্থ স্বরূপ পান

নাই। তাঁহারা দেশে দেশে যাহা বলিয়া গিয়াছেন; তাহাই সকলে জানে মাত্র। তদ্ভিন্ন আর কেহ কিছু জানে না ও জানিবার উপায়ও নাই। আমরা কস্মিন কালে আমাদের সসীম জ্ঞানশক্তি চালনা করিয়া যুক্তিবলে ও তর্কবলে পরমাত্মার অস্তিত্ব ও স্বরূপ জানিতে পারি না। সকল দেশের যোগেশ্বরগণ যোগবলে অন্তর্জগৎ অন্বেষণ করিতে করিতে এতৎসম্বন্ধে যে সকল সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহাই জনসাধারণ জানে ও মানিয়া চলে। সকল দেশের ধর্ম্মশাস্ত্র যেরূপ নির্দ্দেশ করে, তাহাই সকলে অন্ধবিশ্বাসের সহিত শিরোধার্য্য করিয়া লয়।

সংসারে যাহারা নিরাকারবাদী, তাঁহারা শাস্ত্রের কথানুসারে নিজ নিজ হৃদয়াকাশে মনগড়া একটা ঈশ্বরের রূপ কল্পনা করিয়া তাঁহার উপাসনা করেন; আর যাঁহারা সাকারবাদী, তাহারাও শাস্ত্রের কথানুসারে ঈশ্বরের বা তাঁহার অবতার বিশেষের সাকার প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করেন। কিন্তু উভয় সম্প্রদায়ই ভাবেন, তাঁহারা নিজ নিজ মনের বিশ্বাসানুসারে ঈশ্বরের স্বরূপ পাইয়াছেন।

জগতে একমাত্র বেদান্তধর্ম্ম পরব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতেছে। তিনি বেদে ওঁ তৎসৎ ও সচ্চিদানন্দ নামে কথিত হন। তিনি সত্যস্বরূপ, চৈতন্যস্বরূপ ও আনন্দ স্বরূপ। মায়াতীত বলিয়া তিনি সৎ, এজন্য তিনি নিত্য নিরঞ্জন সত্য সনাতন, নির্ব্বিকার ও নির্ব্বিকল্প; তিনি নির্গুণ বা গুণাতীত, অর্থাৎ মায়ার ত্রিগুণের ক্রিয়ার সম্পূর্ণ বহির্ভূত। ত্রিগুণ আদৌ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। ত্রিগুণের অনন্ত লীলাবশতঃ জগতে এত পরিবর্ত্তন, এত মঙ্গলামঙ্গল, এত পাপ পুণ্য ও এত সুখদুঃখ দেখা যায়। পরব্রহ্ম এসকল হইতে বহুদূরে আছেন। তিনি সকল বিষয়ে উদাসীন ও নিরপেক্ষ। তাঁহার রূপ চিন্ময় ও আনন্দময়। তাঁহার চিৎশক্তি বিশ্বব্যাপিনী ও তাঁহার আনন্দও বিশ্বব্যাপী। আমাদের চৈতন্য ও বুদ্ধিশক্তি তাঁহারই অনন্তচিৎশক্তির কণাবিশেষ এবং আমাদের ব্রহ্মানন্দ, প্রেমানন্দ ও জ্ঞানানন্দ তাঁহারই অনন্ত আনন্দের কণা বিশেষ।

আধুনিক একেশ্বরবাদিগণ নির্গুণ পরব্রহ্ম বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার স্থানে সগুণ লৌকিক ঈশ্বরকে মায়াময় মানবমনের আদর্শে ব্যক্ত করেন। যেমন ইহা নিরাকার ও নীরূপ, ঈশ্বরও তাঁহাদের নিকট নিরাকারও নিরূপ। ইহাতে যে সকল শ্রেষ্ঠ গুণ আছে, উহাদিগকে অনন্ত গুণিত করিয়া তাঁহারা ঈশ্বরে

আরোপ করিয়া থাকেন। এজন্য তিনি তাঁহাদের নিকট সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বমঙ্গলময়, সর্ব্বদয়াময় ও সর্ব্বন্যায়বান। তাঁহাদের নিকট ঈশ্বর সর্ব্ববিধ সদ্‌গুণে বিভূষিত। সংসারের অসৎগুণরাশি ব্যাখ্যা করিবার জন্য তাঁহারা তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী সয়তানের অবতারণা করেন। কিন্তু এক জন হিন্দু নির্গুণ পরব্রহ্মে মানবোচিত কোন গুণ বা ভাব দেখেন না, তিনি কেবল তাঁহার মায়ারূপ ব্রহ্মাবিষ্ণু মহেশ্বরে মায়াময় মানবমনের মায়াগুণ দেখেন।

বিজ্ঞান বলে, পাশ্চাত্য জগতে মানবমনের শ্রেষ্ঠ গুণাবলী ঈশ্বরে আরোপ করাতে তাঁহার এক অপরূপ রূপ দেখান হইয়াছে? তিনি দয়াময়, অথচ ন্যায়বান। যিনি দয়াময়, তিনি কিরূপে ন্যায়বান হইবেন? যিনি ন্যায়বান, তিনি সদা কঠোর, তিনি তুলাদণ্ড লইয়া সদা ন্যায় বিচার করিবেন। তবে তিনি কিরূপে দয়াময় হইলেন? দয়া ও ন্যায়পরতা দুই বিরুদ্ধভাবাপন্ন ধর্ম্ম; উহারা একাধারে থাকিতে পারে না। তাহার সাক্ষ্য, জজসাহেব সকল সময় ন্যায়বিচার করেন; কিন্তু লাটসাহেবই দয়া দেখাইতে পারেন। জজসাহেব দয়া প্রকাশ করিলে ঘোর অবিচার করিয়া বসিবেন।

সেইরূপ ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান অথচ মঙ্গলময়। যিনি সর্ব্বশক্তিমান তিনি তৎযথেচ্ছাচারী, তিনি কিরূপে মঙ্গলময় হইবেন? যখন জগৎ অলৌকিক নিয়মতন্ত্রের অধীন এবং কোন প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যত্যয় নাই, তখন তাহাকে কেন সর্ব্বশক্তিমান বল? যখন সংসার মঙ্গলামঙ্গলে ও সুখদুঃখে পরিপূর্ণ, তখন তাহাকে কেন মঙ্গলময় বল? বিজ্ঞান বলে, এইরূপ বিরুদ্ধ গুণাবলি ঈশ্বরে আরোপ করিয়া পাশ্চাত্য জগৎ তাঁহার উপর কেবল বিদ্রূপ করিতেছে।

ইহা আমাদের পরম গৌরবের বিষয়, যে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম পরব্রহ্মে অসম্পূর্ণ মানবমনের অসম্পূর্ণ গুণরাশি আরোপ করিয়া কোনরূপ দোষে দূষিত হয় নাই বা কোনরূপ বিভ্রাটে পতিত হয় নাই। বিজ্ঞান সকল ধর্ম্মের উপর উপহাস করিবে, কিন্তু বেদান্তধর্ম্মের স্বর্গীয় ভাব দেখিয়া চিরদিন স্তম্ভিত থাকিবে।

পরিশেষে বক্তব্য, এই পাপতাপপূর্ণ ও বিপদআপদসমাকুল সংসারে ভগবান ব্যতীত আমাদের গত্যন্তর নাই। ভবপারাবারে তিনিই আমাদের একমাত্র সহায় ও বন্ধু। শ্রীহরির পাদপদ্ম স্মরণ না করিয়া কেহ ভবসাগর

পার হইতে পারেন না। যে জীর্ণ তরণী লইয়া আমরা ভবসাগর পার হইতেছি, তাহা ত পদে পদে বাঞ্চাল হইবার সম্ভাবনা। সেই দীনবন্ধু কাণ্ডারী ব্যতীত কে ইহাকে পরপারে লইয়া যাইবে? যদি ভবসাগর সুখে পার হইতে ইচ্ছা কর অনুক্ষণ ভগবানকে স্মরণ করিবে। একমাত্র তাঁহার কৃপায় সকল বিপদ আপদ তরিয়া যাইবে। আর যদি মূঢ় পাশ্চাত্যবিজ্ঞানের কথায় কর্ণপাত কর, তোমার ইহকাল ও পরকাল নষ্ট হইবে এবং তুমিও জাহান্নমে যাইবে।

ঈশ্বরের অবতার গ্রহণ।

প্রত্যেক ধর্ম্মে মানবরূপে ঈশ্বরের এক এক প্রতিনিধি দেখা যায়। ঈশা, মহম্মদ, বুদ্ধদেব, ও শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ এ জগতে তাঁহার প্রতিনিধি। খৃষ্টধর্ম্ম স্বপ্রবর্ত্তক ঈশাদেবকে তাঁহার প্রিয়পুত্র মনে করিয়া পতিত মানবের পরিত্রাতা জ্ঞান করে এবং উঁহাকে মধ্যস্থ রাখিয়া তাঁহার নিকট মুক্তি প্রার্থনা করে। মুসলমান ধর্ম্ম স্বপ্রবর্ত্তক মহম্মদদেবকে তাঁহার প্রিয় পয়গম্বর ও প্রিয় সুহৃৎ মনে করিয়া উঁহার উপদেশ মতে চলে। বৌদ্ধধর্ম্ম স্বপ্রবর্ত্তক বুদ্ধদেবকে স্বয়ং ঈশ্বর বলিয়া পূজা করে। হিন্দুধর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণাদি মহাপুরুষগণকে তাঁহার অবতার জ্ঞানে পূজা করে।

যে দ্বৈতবাদী ধর্ম্ম জগৎ ও স্রষ্টাকে পৃথক্ জ্ঞান করে, সে ধর্ম্ম আরাধ্য প্রতিনিধিকে তাঁহার প্রিয়পুত্র বা প্রিয়সুহৃৎ জ্ঞান করিয়া থাকে। আর যে অদ্বৈতবাদী ধর্ম্ম জগৎ ও স্রষ্টাকে আদৌ পৃথক্ জ্ঞান করে না, সে ধর্ম্ম পূজ্য প্রতিনিধিকে স্বয়ং ঈশ্বর বা তাঁহার অবতার জ্ঞান করিয়া থাকে। ধর্ম্মজগতে দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ চিরদিন প্রচলিত বলিয়া ধর্ম্মের মতামত লইয়া এত পার্থক্য দেখা যায়।

প্রিয়পুত্র, প্রিয়পয়গম্বর ও অবতার এই তিনটী কথার তাৎপর্য্যে বিস্তর প্রভেদ থাকিলেও উঁহাদের উদ্দেশ্য প্রায় একরূপ। যখন উঁহাদের মধ্যে কোন না কোনরূপ প্রত্যেক ধর্ম্মে দেখা যায়, তখন বুঝা উচিত, নিশ্চয়ই উঁহাদের

সম্যক আবশ্যকতা আছে। কঠোর আবশ্যকতাই সংসারে সকল কর্ম্মের মূলীভূত কারণ। কঠোর আবশ্যকতা ব্যতীত উহারা কদাচ সর্ব্ববাদিসম্মত হইতে পারে না। মানবমনের প্রকৃতি যেরূপ, তাহাতে উহাদের আবশ্যকতা সর্ব্বত্র সমভাবে অনুভূত হইতেছে।

এ কলিযুগে আত্মার আধ্যাত্মিক পতন বশতঃ লোকে গুণাতীত, মায়াতীত পরব্রহ্ম আদৌ বুঝিতে পারে না; এমন কি, তাহারা সগুণ নিরাকার ঈশ্বর ভজনা করিয়াও মনে তাদৃশ তৃপ্তি বোধ করে না। নিরাকার ঈশ্বর ভজনা করিতে গেলেই তাহারা মনের অধিকাংশ ভাগ শূন্যময় ও অন্ধকারময় দেখে এবং বাধ্য হইয়া তাঁহার এক এক প্রতিনিধির শরণ লয়। তাহারা ঐ সকল মহাপুরুষ-দিগকে স্থূলদেহধারী ঐশ্বরিক রূপ জ্ঞান করত তাঁহাদিগকে জীবনের আদর্শ করিয়া ধর্ম্মপথে অগ্রসর হয়।

নিরাকার ভজন দ্বারা স্থূল দেহধারী মানবের মন যথার্থ তৃপ্তি বোধ করে না বলিয়া পৃথিবীর অধিকাংশ জাতিবর্গ এখন সাকারবাদী।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেন :—

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তচেতসাং
অব্যক্তা হি গতি দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে।

(গীতা)

"যাহারা অব্যক্ত নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনায় রত,তাহাদের ঐরূপ উপাসনা অতি ক্লেশকর, কারণ স্থূলদেহ ধারণ করিয়া লোকে অতিকষ্টে নিরাকার ঈশ্বর পাইয়া থাকে।"

নিরাকারবাদী খৃষ্টধর্ম্মের রোমান কাথলিক ও গ্রীকচার্চ্চ সম্প্রদায় ঈশা ও মেরীর মূর্ত্তি ও আলেখ্য কেন গির্জ্জায় দেখাইয়া থাকে? নিরাকার ঈশ্বর ভজনা করিয়া লোকে আদৌ তৃপ্তি বোধ করে না বলিয়া উহারা ঐরূপ করিতে বাধ্য হয়। উহারা একরূপ সাকারোপাসক; এই অনুপাতে হিসাব করিলে পৃথিবীর অধিকাংশ জাতি এখন সাকারোপাসক ও সাকারবাদী।

প্রিয়পুত্র, প্রিয়সুহৃৎ বা অবতার মানাতে প্রত্যেক বৈশেষিক ধর্ম্ম প্রাকৃতিক ধর্ম্মের এক মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করে। ধর্ম্মমাত্রেই লোকশিক্ষার জন্য এক মহোচ্চ আদর্শ সকলের সমক্ষে ধারণ করে। খৃষ্ট ও মুসলমান ধর্ম্ম সগুণ নিরা-

কার ঈশ্বরকে সকলের আদর্শস্বরূপ দেখায়। কিন্তু মানবমন সেরূপ নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনায় প্রকৃতরূপ তৃপ্তি বোধ না করাতে উহারা স্ব স্ব প্রবর্ত্তককে তাঁহার প্রিয়পুত্র বা প্রিয়সুহৃৎ জ্ঞানে অলৌকিক ভক্তি ও সম্মান দেখায়,এমন কি উহাদিগকে পুত্র ঈশ্বর বা পয়গম্বর ঈশ্বর বলিয়া সম্মান করে এবং মধ্যস্থ রাখিয়া তাঁহার নিকট মুক্তি প্রার্থনা করে। যদিও মুসলমানধর্ম্ম মহম্মদদেবকে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে মধ্যস্থ মানে না; কিন্তু যখন তাঁহার উপদেশ মতে সকলকে চলিতে বলে, তখন তিনি সদ্‌গুরু বলিয়া পরোক্ষভাবে মধ্যস্থ।

বৌদ্ধধর্ম্ম বুদ্ধদেবকে নির্গুণ পরব্রহ্মের স্থূলরূপ জ্ঞানে পূজা করে। হিন্দুধর্ম্ম ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরকে পরব্রহ্মের মায়ারূপ জ্ঞানে পূজা করে; এমন কি, এক এক সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক লোকবিশেষও স্বসম্প্রদায়স্থ লোকবর্গদ্বারা সদ্‌গুরু জ্ঞানে পূজিত হন। ফলতঃ ঐ সকল মহাপুরুষদিগের প্রতি জনসাধারণের তাদৃশ অলৌকিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা না জন্মিলে, উহারা কি প্রকারে তাঁহাদের উপদিষ্ট ধর্ম্মামৃত পান করিয়া সকল বিষয়ে তাঁহাদের অনুকরণ করতঃ নিজজীবনের উন্নতি সাধন করিতে পারে? এস্থলে তাঁহাদের উপর যিনি যত ভক্তি ও যত বিশ্বাস দেখাইবেন, তিনি ততই ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইবেন।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, যখন পরমেশ্বর আমাদের সাধারণ পিতা এবং আমরাও তাঁহার সাধারণ পুত্র, তখন পিতার নিকট পুত্রের যাইবার বাধা কি? তবে কেন আমরা মধ্যস্থ (Mediator) মানিতে যাইব? পিতা মাতা ও পতি যে ভাবে তুমি নিরাকার ঈশ্বরকে ভাব না কেন, যখন তোমার মন অসম্পূর্ণ, তখন তিনি কিছুতেই তোমার সম্যক্ আয়ত্ত হইবেন না। এজন্য একজন মধ্যস্থ রাখা বিশেষ প্রয়োজন। প্রিয়পুত্র, প্রিয়পয়গম্বর, অবতার ও সদ্‌গুরু সকলেই নিরাকার ঈশ্বর ও অসম্পূর্ণ মানবমনের মধ্যস্থ। যদি নিরাকার ভজনা করিয়া মানবমন যথার্থ তৃপ্তি বোধ করিত অথবা নিরাকার ঈশ্বরে যদি আন্তরিক প্রগাঢ় প্রেম ও ভক্তি প্রদর্শন করা যাইত, কোন দেশের কোন ধর্ম্ম ঐ সকল সগুণ মধ্যস্থের শরণ লইত না।

আরও দেখ, নিরাকার ঈশ্বরকে স্থূলমনের সম্যক ভাব্য করিবার জন্য তাহার একটা স্থূলরূপের বিশেষ প্রয়োজন। অগ্রে তাঁহার স্থূলরূপে অপার ভক্তি ও প্রেম প্রদর্শন করিতে শিক্ষা কর, তবে তুমি বহুদিবসান্তে নিরাকার ভজনের

উপযুক্ত হইবে। প্রিয়পুত্র, প্রিয়পয়গম্বর, অবতার ও সদ্‌গুরু উহারা সকলে নিরাকার ঈশ্বরের স্থূলরূপ মাত্র। উহাদিগকে দেখাইয়া মানবধর্ম্ম সকল দেশে ঈশ্বরারাধনা সহজ ও সুগম করিয়াছে।

এখন বুঝিতে চেষ্টা করা উচিৎ, যাহারা ঈশ্বরের প্রিয়পুত্র, প্রিয়পয়গম্বর বা অবতারকে মধ্যস্থ মানেন, তাহাদের মধ্যে কে অতি সহজে ঈশ্বর লাভ করিয়া থাকেন? ইনি ঈশ্বরের প্রিয়পুত্র বা প্রিয়সুহৃৎ, ইহাকে মানিলে লোকে সহজে ঈশ্বর পাইবে, না ইনিই ঈশ্বর বা তাঁহার অবতার, ইহাকে মানিলে তাহারা আরও সহজ উপায়ে ঈশ্বর পাইবে? সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিবেন, শেষোক্ত উপায়ে (হিন্দু ও বৌদ্ধ মতে) অতি সহজে ঈশ্বর পাওয়া যায়। প্রিয়পুত্রকে ধর বা প্রিয়সুহৃৎকে ধর, ইহাতে ঈশ্বরের সহিত তোমার বিশেষ ব্যবধান রহিয়া গেল; কিন্তু অবতার পূজন করিলে, যেমন ঈশ্বরে ও তদীয় অবতারে কোনরূপ ভেদাভেদ নাই, তুমিও অতি সহজ উপায়ে ঈশ্বর পাইয়া থাক। অতএব মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা উচিত, হিন্দুধর্ম্ম অবতার পূজন করিয়া অন্যান্য ধর্ম্ম অপেক্ষা ঈশ্বরারাধনা আরও সহজ ও সুগম করিয়াছে।

যে অদ্বৈতবাদী হিন্দু নির্গুণ পরব্রহ্মের অস্তিত্ব বুঝিয়া সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময় বলেন, তাঁহার নিকট তুমিও ব্রহ্ম, আমিও ব্রহ্ম এবং সকলই ব্রহ্ম। তাঁহার নিকট কি সাকার পূজন, কি অবতার পূজন, কিছুতেই পরব্রহ্মের অবমাননা করা হয় না। বরং ইহাতেই তাঁহার ব্রহ্মভক্তি সম্যক্ প্রকাশ পায়। যে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম মায়াতীত পরব্রহ্মের মায়াময়ী ত্রিমূর্ত্তি দেখাইয়া তাঁহাকে তোমার মায়ামুগ্ধ স্থূলমনের সম্যক ভাব্য করিতে চেষ্টা পায়, সে ধর্ম্ম আবার তোমার আত্মার প্রকৃত মঙ্গলের জন্য, তোমার মনের সাত্ত্বিক ভাবাবলির সম্যক স্ফূর্ত্তির জন্য সেই পরব্রহ্মের সাত্ত্বিক রূপ বিশ্বপালক শ্রীবিষ্ণুকে কয়েক অবতারে পৃথিবীতে অবতীর্ণ করায়; যেখানে অসাধারণ গুণের বিকাশ দেখে, সেইস্থলে পরমাত্মার অলৌকিক রূপ দর্শন করিয়া তাঁহাকেই মানবজীবনের আদর্শস্বরূপ দেখায়; তৎপ্রদর্শিত ধর্ম্মজীবনের অনুকরণে লোকবর্গকে প্রোৎসাহিত করিবার জন্য তাঁহার অসাধারণ গুণগ্রাম ও কার্য্যকলাপ করিব সুললিত কণ্ঠে অতিরঞ্জিত ভাবে গান করায়। এখন বুঝিয়া দেখ, অবতারপূজনে হিন্দুধর্ম্মের কি মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে

এস্থলে জিজ্ঞাস্য, লোকবর্গকে যথার্থ ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য, বা সংসারে ধর্ম্মের উন্নতি সাধনের জন্য ঈশ্বর কি স্বয়ং জগতে অবতীর্ণ হন? মানবের জাতীয় ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে বুঝা যায়, যখন সংসারে ধর্ম্ম লোপ পাইয়া অধর্ম্ম প্রবল হয়, তখন এক এক মহাত্মা দেশবিশেষে আবির্ভূত হইয়া ধর্ম্মজগতে মহৎ আন্দোলন করেন এবং নূতন ধর্ম্মমত প্রচার করিয়া স্বদেশের মহোপকার সাধন করেন। সকল বিষয়ে অবনতির দিকে প্রকৃতি এত অধিক প্রবণা, যে মধ্যে মধ্যে এরূপ মহাত্মার আবির্ভাব ব্যতীত সংসারে ধর্ম্মোন্নতির সম্ভাবনা অত্যল্প।

এখন দেখ, জগতের ইতিহাস এ বিষয়ে কিরূপ সাক্ষ্য দিতেছে। যৎকালে বুদ্ধদেব ভারতে অবতীর্ণ হন, তৎকালে জনসাধারণ সামাজিক ধর্ম্ম ভুলিয়া গিয়া যাগযজ্ঞে বিবিধ পশুহত্যা করিতে করিতে হিংসাপর হইয়া উঠে। উহাদিগকে যথার্থ ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য তিনি সমাজধর্ম্ম ও অহিংসাপরম ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করেন। যৎকালে ঈশাদেব পেলেষ্টাইনে আবির্ভূত হন, তৎকালে তত্রত্য জনসাধারণ পৌত্তলিকতার বীভৎস কাণ্ডগুলি অনুষ্ঠান করিতে করিতে অধর্ম্মপরায়ণ হইয়া উঠে। তন্নিবারণার্থ তিনি একেশ্বরবাদের জয় ঘোষণা করিয়া ও তদুদ্দেশে নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়া ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বর্দ্ধন করিয়া যান। যৎকালে মহম্মদদেব আরব দেশে আবির্ভূত হন, তৎকালে জনসাধারণ পৌত্তলিকতায় অধর্ম্মাচারী হইতে থাকে; তন্নিবারণার্থ তিনি নিখুঁত নিরাকারোপাসনা প্রবর্ত্তিত করিয়া ও সকলকে ধর্ম্মান্ধ করিয়া স্বদেশে উৎসাহবহ্নি প্রজ্বলিত করিয়া যান।

যৎকালে শঙ্করাচার্য্যদেব ভারতে আবির্ভূত হন, তৎকালে বহুসংখ্যক লোক নিরীশ্বরবাদী বৌদ্ধধর্ম্মের আশ্রয়ে অধর্ম্মপরায়ণ হইয়া উঠে; তন্নিবারণার্থ তিনি সনাতন হিন্দুধর্ম্মের আমূল সংস্কার করিয়া উহাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া যান। যৎকালে বঙ্গীয় সমাজে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব আবির্ভূত হন, তৎকালে জনসাধারণ তন্ত্রোক্ত কুলক্রিয়াদির অনুষ্ঠান করিতে করিতে অধর্ম্মপরায়ণ হইয়া উঠে; তন্নিবারণার্থ তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিয়া যান। যৎকালে গুরু নানক পাঞ্জাবে আবির্ভূত হন, তৎকালে তত্রত্য বহুসংখ্যক লোক মুসলমানদিগের সংস্রবে ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হয়; তন্নিবারণার্থ তিনি তথায় শিখসম্প্রদায়

স্থাপন পূর্ব্বক হিন্দুধর্ম্মের পুনরুজ্জীবন সাধন করেন। যৎকালে মাঙ্গবর রাম-মোহন রায় বঙ্গদেশে আবির্ভূত হন, তৎকালে পাশ্চাত্য শিক্ষা পাইয়া অনেক বঙ্গীয় যুবক খৃষ্টানধর্ম্ম অবলম্বন করিতে থাকে; তন্নিবারণার্থ তিনি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন পূর্ব্বক বঙ্গদেশের মহোপকার করিয়া যান। সেইরূপ যখন বঙ্গের শিক্ষিত সম্প্রদায় পাশ্চাত্য শিক্ষার হলাহল পান করিয়া সনাতন হিন্দুধর্ম্মে বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠে, তখন পরমহংস রামকৃষ্ণদেব মা কালীর সাধনে সিদ্ধ হইয়া সকলকে সদুপদেশ দিয়া স্বধর্ম্মে শ্রদ্ধাবান করিয়া যান।

এইরূপ যখন সংসারে ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন ভগবদিচ্ছায় ধর্ম্মাত্মাগণ আবির্ভূত হইয়া ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেন :—

যদা যদা ধর্ম্মস্য গ্লানি র্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।
পরিত্রাণায় চ সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

(গীতা)

"যখন পৃথিবীতে ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি আপনাকে সৃজন করিয়া থাকি। সাধুদিগের উদ্ধার, পাপাত্মাদিগের বিনাশ ও জগতে যথার্থ ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।" গীতোক্ত মহাসত্য মানবের জাতীয় ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। কেবলই কি ধর্ম্মজগতে এইরূপ ঘটে, তাহা নহে। জ্ঞানজগতে ও রাজনৈতিক গগনে কবিবর ও বাগ্মিবর মধ্যে মধ্যে দেখা দিয়া দেশের কত মহোপকার করিয়া যান।

এস্থলে কেহ কেহ বলিবেন, পাপাত্মাদিগের বিনাশ, সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য ভগবান স্বয়ং পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, এ কেমন কথা? যে সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের সামান্য ইচ্ছায় এমন লক্ষ লক্ষ পৃথিবী নিমিষ মধ্যে চূর্ণ হইতে পারে, তিনি কি না এই সামান্য কাজের জন্য মানবজন্ম গ্রহণ করিয়া অশেষ দুঃখের ভাগী হইবেন? শাস্ত্রকারদিগের উদ্দেশ্য অন্যরূপ। এস্থলে তাঁহারা যুদ্ধব্যবসায়ী ক্ষত্রিয়জাতিকে ধর্ম্মযুদ্ধ শিখাইবার জন্য তাঁহাদের আদর্শ পুরুষের কথা উল্লেখ করিতেছেন। কি প্রকারে ধর্ম্মযুদ্ধ

করিয়া দেশ উদ্ধার করিতে হইবে, কি প্রকারে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিতে হইবে,তাহাই জগৎকে দেখাইবার জন্য তাঁহারা ঈশ্বরের অবতার গ্রহণ স্বীকার করেন। যে হিন্দুধর্ম্ম সমাজের সকল কর্ম্মের উপর নিজের প্রীতিকর অনুশাসন পূর্ণভাবে চালায়, সে ধর্ম্ম কি যুদ্ধবিষয়ে আদর্শপুরুষ দেখাইয়া লোকবর্গকে ধর্ম্মযুদ্ধ শিখাইবে না? শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ ইহার জন্য ভারতে অবতীর্ণ হন।

শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, মুষা, বুদ্ধদেব, ঈশা, মহম্মদ, চৈতন্য প্রভৃতি যে সকল মহাত্মা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া দুন্দুভিস্বরে ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করেন ও মানবধর্ম্মের উন্নতিসাধন করেন, তাঁহারা সকলেই এ জগতে প্রকৃত দেবতা, তাঁহারা পরমাত্মার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অংশ লইয়া জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা প্রকৃত যোগেশ্বর। যোগবলেই তাঁহারা জগতে অত্যদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ দেখাইয়া সকলের মন আকর্ষণ করেন ও অলৌকিক ধর্ম্মোপদেশ দিয়া যান।

এই সকল মহাপুরুষগণ দেশে দেশে মানবজাতির আদর্শপুরুষ। তাঁহাদের উপদেশানুসারে চলিয়া বা তাঁহাদের জীবনী অনুকরণ করিয়া সকলে ধর্ম্মের পথে, উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। তাঁহাদিগকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বা অবতার বলিয়া মানাতে জগতের মহোপকার সাধিত হইতেছে। নিরাকার ঈশ্বরে মানবের অসম্পূর্ণ গুণাবলী আরোপ করিয়া তাঁহাকে পূর্ণ আদর্শ বলিয়া ভাবাতে মনে তাদৃশ তৃপ্তিবোধ হয় না। অশেষ গুণশালী মানবই মানবজাতির পূর্ণ আদর্শ। আবার সেই মানব যদি ঈশ্বরের প্রিয় পুত্র, প্রিয় সুহৃৎ বা অবতার বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস জন্মে, তাঁহার উপদেশ ও জীবনী দ্বারা সকলের যতদূর উপকার হইবে, এমন কিছুতে সম্ভব নয়। অতএব মানবমনের প্রকৃত তৃপ্তিসাধনের জন্য,সমাজের প্রকৃত মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরকে মানবাকারে ভাবাই শ্রেয়।

এস্থলে স্মরণ রাখা উচিত, খৃষ্টধর্ম্মে ঈশা ঈশ্বরের প্রিয়পুত্র, মুসলমানধর্ম্মে মহম্মদ তাঁহার প্রিয় সুহৃৎ ও হিন্দুধর্ম্মে শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার,উহাদের তাৎপর্য্য এক; প্রভেদের মধ্যে দ্বৈতবাদিগণ তাঁহার অবমাননার ভয়ে অবতার কথাটি ব্যবহার করেন নাই, আর অদ্বৈতবাদিগণ পক্ষপাত শূন্য হইবার জন্য প্রিয়পুত্র ও প্রিয়সুহৃৎ ব্যবহার করেন নাই; কারণ ভগবানের চক্ষে সকলই সমান।

এই অপকৃষ্ট কলিযুগে শিশ্নোদরপরায়ণ মানবের যথার্থ ধর্ম্মশিক্ষার জন্য অবতারপূজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। দেখ, এখন তাঁহার পক্ষে নিরাকার সগুণ ঈশ্বরের সামান্য মৌখিক উপাসনা বিড়ম্বনামাত্র। তাঁহার পক্ষে এখন ঈশ্বরের অবতারপূজন সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও সুগম। ইহার জন্য হিন্দুধর্ম্ম যুগধর্ম্মে বাধ্য হইয়া আমাদিগকে ধর্ম্মপথে অধিক অগ্রসর করাইবার জন্য অবতার পূজন বিধিবদ্ধ করে এবং অবতারদিগের বিবিধ সাংসারিক লীলা শ্রবণ করায়। আমরাও সেই সকল লীলা শ্রবণ করিয়া আনন্দাশ্রু ও শোকাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে মনের সাত্ত্বিকভাব সম্যক্ স্ফূরণ করত ধর্ম্মপথে অধিক অগ্রসর হই।

উন্নত একেশ্বরবাদিগণ অবতারপূজনকে হিন্দুধর্ম্মের একটা মহৎ কুসংস্কার মনে করেন। কিন্তু শাস্ত্রোল্লিখিত অবতারগণের লীলাদি শ্রবণ ও পাঠ করিলে সাধারণ লোকের যেরূপ ধর্ম্মশিক্ষা হইবে অথবা মানবমনের উচ্চ, স্বর্গীয়, সাত্ত্বিক ভাবগুলি যেরূপ স্ফুরিত হইবে, ঈশ্বরকে কেবল দয়াময়, দয়াময় বলিয়া ডাকিলে অথবা তাঁহার সামান্যরূপ মৌখিক উপাসনা বা সংকীর্ত্তন করিলে সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব হিন্দুসমাজের অশেষ মঙ্গল ভাবিয়া অবতার পূজন এ ধর্ম্মের কুসংস্কার জ্ঞান করা উচিত নয় পরমপিতা পরমেশ্বরে আন্তরিক প্রগাঢ় ভক্তি ও প্রেম শিক্ষা দিবার জন্য শাস্ত্রে অবতারের সৃষ্টি হইয়াছে। আমাদের যথার্থ মঙ্গলের জন্য হিন্দুধর্ম্ম ঈশ্বরকে কয়েক মানবাকারে দেখাইয়া তাঁহার আরাধনা ও ধর্ম্মসাধনা আমাদের নিকট অতি সহজ ও সুগম করিয়াছে।

আত্মার প্রকৃতি।

বিদ্যালয়ে সকলেই শিক্ষা করেন, আত্মা, মন ও স্থূলদেহ লইয়া মানব গঠিত পরে যখন তাঁহারা কলেজের উচ্চশিক্ষা পাইয়া বিজ্ঞানের আস্বাদ পান, তখন তাঁহারা অন্ধকার হইতে আলোকে আইসেন এবং শিক্ষা করেন, আত্মা কেবল একটা কথার কথা মাত্র, উহার অস্তিত্ব আদৌ নাই, মনও দেহ লইয়াই মানব গঠিত। চিরকাল মানবধর্ম্ম সকল দেশে যে অবিনশ্বর আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে, বিজ্ঞান আজ সেই চিরাদৃত মতকে পদে দলন করে ও এক তুড়িতে উড়ায়।

খৃষ্ট প্রভৃতি একেশ্বরবাদী ধর্ম্মের মতে পরমপিতা পরমেশ্বর মানবের আত্মাকে স্বতন্ত্র ভাবে নূতন সৃষ্টি করেন। যতদিন প্রাণ জীবদেহে বর্ত্তমান থাকে, ততদিন আত্মা দেহপিঞ্জরে আবদ্ধ থাকিয়া দেহকে চৈতন্যময় করে এবং সর্ব্ববিধ কর্ম্মানুষ্ঠানে ও জ্ঞানোপার্জ্জনে মনকে নিয়োজিত করে। মানবমন আত্মার দাস এবং উহা দ্বারাই অনুক্ষণ চালিত। স্বাধীন ইচ্ছায় বিভূষিত বলিয়া আত্মা ইহজন্মে পাপপুণ্যের পথ স্বয়ং পছন্দ করে; তজ্জন্য ইহা সংসারে বিবিধ সুখদুঃখ ভোগ করে ও অন্তে স্বর্গগামী বা নিরয়গামী হয়। আজ যে মন সংসারের অনন্ত চিন্তায় চিন্তায়মান ও যে দেহ অনন্ত কর্ম্মে ব্যাপৃত, প্রাণপক্ষী উড়িয়া গেলে ধূলার শরীর ধূলায় মিশিয়া যায়, আত্মাও দেহত্যাগ করিয়া স্বধামে চলিয়া যায়। যতদিন জগতে উন্নত একেশ্বরবাদ প্রচলিত হইয়াছে, ততদিন জনসাধারণ উপরোক্ত মত মানিয়া আসিতেছে!

এখন আত্মা ও মন সম্বন্ধে বিজ্ঞানের কিরূপ সিদ্ধান্ত, তাহা সকলের শুনিয়া রাখা উচিত। শবব্যবচ্ছেদ ও রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা ইহা শরীরকে তন্ন তন্ন রূপে পরীক্ষা করিয়া নির্দ্দেশ করে, জীবদেহ ঘটিকা যন্ত্রের ন্যায় চলিতেছে; কিন্তু ইহা ঘটিকাযন্ত্র অপেক্ষা সহস্রগুণ জটিল। যেমন ঘটিকার কোন এক আবশ্যকীয় কল বিকৃত হইলে, উহা আর চলে না; সেইরূপ দেহের হৃৎপিণ্ড ফুসফুস্ ও মস্তিষ্কাদির ক্রিয়া অধিক পরিমাণে বিকৃত হইলে ইহাও অচল হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

যেমন বাষ্পীয় কলে উদক অগ্নিসংযোগে অমিতবলশালী বাষ্পে পরিণত হইয়া ও যন্ত্রবিশেষ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া মূলচক্র (Fly wheel) ঘূর্ণায়মান পূর্ব্বক বাষ্পীয় পোতাদি চালায়, সেইরূপ জীবদ্দশায় জীবমাত্রেই নিজদেহে নানাযন্ত্র সংযোগে উদ্ভিজ্জনিহিত সূর্য্যের অব্যক্ত তেজোরাশিকে (Potential energy. অঙ্গসঞ্চালন ও মানসিক ক্রিয়াদিরূপ ব্যক্ত তেজোরাশিতে Kinetic energy. প্রকটিত করত সংসারের অনন্ত ক্রিয়া সম্পাদন করে।

এস্থলে প্রকৃতিজগতে উদ্ভিজ্জের সহিত জীবজন্তুর কিরূপ সম্বন্ধ, তাহার কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান লওয়া উচিত। উদ্ভিজ্জদেহে সৌরতেজ অব্যক্ত ভাবে নিহিত

থাকে। যৎকালে উদ্ভিজ্জপত্রের হরিৎবর্ণীয় জীবাণুগুলি সূর্য্যালোকের সমক্ষে বায়ুবিলীন কার্ব্বনিক এসিড গ্যাসকে বিশ্লিষ্ট করিয়া উহার কার্ব্বনকে স্বাভ্যন্তরে গ্রহণ করে, তৎকালে সৌরতেজ অব্যক্ত ভাবে উদ্ভিজ্জদেহে নিহিত হইয়া যায়। পরে যে জীব সেই উদ্ভিজ্জ ভক্ষণ করে, উহার দেহে সেই সৌরতেজ ব্যক্তরূপে প্রকটিত হয়। এজন্য জীবদেহ অঙ্গসঞ্চালনাদি জীবনীশক্তির বিবিধ ক্রিয়া সম্পাদন করে। বিজ্ঞানের মতে, কি উদ্ভিজ্জ, কি জীবজন্তু, সকলেই সূর্য্যের পুত্রস্বরূপ। হিন্দুধর্ম্মও সেই সাধারণ পিতা সবিতৃদেবকে পূজা করিতে বলিয়া আমাদিগকে বিপথে লইয়া যায় নাই।

মানবদেহে স্ফুরিত ও বিবর্ত্তিত মস্তিষ্কই মানসিক ক্রিয়ার যন্ত্র। এই যন্ত্র সংযোগে জড়পদার্থ ইহার চরম পরিণতি সূক্ষ্ম মানববুদ্ধি প্রকাশ করে। যাবতীয় জীবজন্তুতে যে বুদ্ধি অল্পাধিক বিক্ষিপ্ত আছে, তাহাই সমষ্টিভাবে একাধারে মানবমস্তিষ্কে স্ফুরিত হয়। যতক্ষণ বিশুদ্ধ শোণিত মস্তিষ্কে বহিতে থাকে, ততক্ষণ ইহার যাবতীয় ক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। পঞ্চেন্দ্রিয়যোগে বাহ্য বস্তুর জ্ঞানলাভ বল, বাহ্যজগতের কোনরূপ ক্রিয়া সম্পাদনার্থ যন্ত্রবিশেষের উদ্দীপনা বল, চিন্তা, মনন বা অনুভব বল, কোন অতীত ঘটনার স্মৃতি বল, যাবতীয় মানসিক ক্রিয়া মস্তিষ্কের ঘৃতবৎ বর্ত্তুলাকার পদার্থের পরিবর্ত্তন বা নিষ্ঠীবন বশতঃ উৎপন্ন হয়। মস্তিষ্কে শোণিতপ্রবাহের ব্যতিক্রম ঘটিলে, বা ঘৃতবৎ পদার্থের কোমলতা উপস্থিত হইলে মানসিক ক্রিয়ারও ব্যতিক্রম উপস্থিত হয়।

মস্তিষ্ক দেহের রাজা এবং ইহার আদেশ সকল যন্ত্রই পালন করে বটে; কিন্তু যে সমস্ত যন্ত্রের ক্রিয়া জীবনধারণের জন্য অত্যাবশ্যক, যেমন ফুসফুস্ হৃদয়, অন্ত্র প্রভৃতি, উহাদের ক্রিয়া মস্তিষ্কের অজ্ঞাতসারে সম্পাদিত হয়। যাহা হউক, বিজ্ঞানের মতে মানবমন, যাহা এক আমিত্বজ্ঞানে পূর্ণ, উহা সমস্ত মস্তিষ্কের ক্রিয়ার সমষ্টিমাত্র এবং মন নামে পৃথক্ বস্তু আদৌ দেহে বর্ত্তমান নাই।

এই সকল মতামত প্রচার করিয়া বিজ্ঞান স্পষ্ট নির্দ্দেশ করে, আত্মা নামে অভিহিত কোন সূক্ষ্ম পদার্থও মানবদেহে বর্ত্তমান নাই। আত্মা মানবমনের কল্পিত আকাশকুসুমমাত্র এবং ভ্রান্ত দর্শন ও ভ্রান্ত ধর্ম্ম এতকাল এই ভ্রান্তমত

জগতে প্রচার করিয়া রাখিয়াছে। এইরূপে ধর্ম্মের যত বুজরুকি, বিজ্ঞান তাহা একে একে উদ্‌ঘাটিত করিতেছে। মহামহিম, অত্যুজ্জ্বল ও অতিদর্পী বিজ্ঞানের ভয়ে ধর্ম্ম বেচারা সদা শঙ্কিত ও শশব্যস্ত, কোন্‌দিন উহা ইহার আর কোন সর্ব্বনাশ করিয়া বসে।

জনসাধারণের বিশ্বাস, গর্ভাবস্থায় চতুর্থ মাসে যখন ভ্রূণের অঙ্গসঞ্চালন মাতা প্রথম অনুভব করেন, তখন উহাতে জীব প্রদত্ত হয় এবং সেই সঙ্গে আত্মাও উহাতে অনুপ্রবেশ করে। বিজ্ঞান এ সকল কথার তীব্র প্রতিবাদ করে। ইহা স্পষ্ট নির্দ্দেশ করে, যে দিন স্ত্র্যাণু ও পুম্বণু জরায়ুগর্ভে একত্রিত হইয়া পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হয়, সেই দিন হইতে ভ্রূণে জীবনীশক্তি স্বতঃ আইসে এবং জরায়ুজীবনের কোন সময়ে আত্মা নামে কোন সূক্ষ্ম বস্তু প্রবেশ করে না। তবে যে চতুর্থ মাসে মাতা ভ্রূণের স্পন্দন অনুভব করেন, তাহা কেবল জরায়ু বর্দ্ধিত হওয়ায় উহার স্পন্দন উদরের ঐচ্ছিক মাংসপেশী দ্বারা অনুভূত হইয়া থাকে। শরীরের অনেক স্থলে এমন নানাবিধ ক্রিয়া অনুক্ষণ চলিতেছে; যাহা আমরা আদৌ অনুভব করিতে পারি না। সেইরূপ প্রথম তিন মাস ভ্রূণের গর্ভাভ্যন্তরে অবস্থিতি আদৌ অনুভূত হয় না।

সেইরূপ জীবন নাশেও প্রাণ বা আত্মা নামে কোন বস্তু দেহ হইতে বহির্গত হয় না। নিশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইলেই মৃত্যু উপস্থিত হয়। কখন কখন ফুসফুসের শেষ বায়ু মুখবিবর দ্বারা নিঃসৃত হওয়ায় উহা ব্যাদিত থাকে। তাহা দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন, আত্মা মুখবিবর দিয়া বহির্গত হইয়াছে। বিজ্ঞান সে কথাও উড়াইয়া দেয়।

বিজ্ঞানের মতে যেমন অন্যান্য জীবজন্তু পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে এবং কিছু দিন থাকিয়া কালগ্রাসে পতিত হয়; উহাদের প্রধান কর্ম্ম উদর পূরণ ও বংশবৃদ্ধি; সেইরূপ মানবও এ পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে, কিছুদিন এখানে সুখদুঃখ ভোগ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হয়। উদরপূরণ, বংশবৃদ্ধি ও সমাজধর্ম্মপালন তদীয় জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। ইহার মতে আত্মার অস্তিত্ব নাই, পরলোকের অস্তিত্ব নাই, আমরা কেবল ছাগছাগির ন্যায় জন্মিয়া থাকি, ধর্ম্মাধর্ম্ম আমাদের সকলই মিথ্যা; আছে কেবল আমাদের

জ্ঞানশক্তি ও সমাজ। এই জ্ঞানশক্তিবলে আমরা সমাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া থাকি।

ইহার মতে এই নশ্বর দেহ নষ্ট হইলে আমরা পুনরায় জন্মগ্রহণ করিব না। যে সকল পরমাণুপুঞ্জ একত্রিত হইয়া আমাদের দেহ নির্ম্মাণ করে, হয়ত মৃত্যুর পর উহাদের পুনরায় একাধারে ঐরূপ সমাবেশ কস্মিনকালে ঘটিবে না। আর যদি কখন কোন যোগাযোগে উহাদের ঐরূপ সমাবেশ ঘটে, তবে আমরা এ জগতে পুনরায় আসিতে পারি। এইরূপ জড়বাদী জড়বিজ্ঞান কত অপরূপ সিদ্ধান্ত করিতেছে।

আজকাল বিজ্ঞান এই সকল নাস্তিক মতামত গগনভেদি রবে প্রচার করিতেছে। যাঁহারা উহার প্রিয় শিষ্য ও উহার কুহকে মুগ্ধ, তাঁহারা উহার কথায় বিশ্বাস করিয়া ধর্ম্মের কাহিণী অশ্রদ্ধা করেন। সুখের বিষয়, উহার মতামত এখনও সাধারণের নিকট পৌঁছায় নাই। তাহারা এখনও আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত ঈশ্বর ও পরলোক মানিয়া চলিতেছে।

বিজ্ঞানের অসার কথা দূরে প্রক্ষেপ করিয়া আইস এখন আমরা অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের সুমধুর কথা শ্রবণ করিয়া আত্মাও প্রাণ জুড়াই। পুরাকালে আর্য্যঋষিগণ যোগবলে মানবপ্রকৃতির বিষয় যেরূপ অবগত হন, তাহা এখন বেদান্তে ও যোগশাস্ত্রে দেখা যায়। তাঁহারা সমাধির অবস্থায় স্পষ্ট বুঝিতে পারেন, মন ও আত্মা সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ। সমাধির অবস্থায় মন ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়ার সহিত লয় পায়; কিন্তু তৎকালে আত্মা জাগরিত হয় ও ইহার সর্ব্বজ্ঞ অনন্ত শক্তি প্রকাশিত হয়। যুগধর্ম্মে ইহার আধ্যাত্মিক অধঃপতন ও বর্ত্তমান শরীরলব্ধ অপরিহার্য্য অভ্যাসবশতঃ এখন আমরা আত্মার অস্তিত্ব পৃথক উপলব্ধি না করিয়া মন ও আত্মাকে এক পদার্থ জ্ঞান করি।

আত্মার যথার্থ প্রকৃতি নির্দ্দেশ করিতে হইলে, মানবপ্রকৃতির সম্যক বিশ্লেষণ করা কর্ত্তব্য। এখন সাংখ্য, থিওসফি, বেদান্ত ও যোগশাস্ত্র ইহাকে যেরূপ ভাবে বিশ্লিষ্ট করে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল—

প্রথমতঃ। সাংখ্যমতে—

(১) বাহ্যদেহ ও পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের বাহ্যযন্ত্র, ইহারা বাহ্য জগৎ হইতে পঞ্চতন্মাত্র সংগ্রহ করে।

(২) মস্তিষ্কাভ্যন্তরস্থ পঞ্চেন্দ্রিয়ের স্নায়ুকেন্দ্র, যদ্দ্বারা পঞ্চ তন্মাত্রগুলি উপলব্ধ হয়।

(৩) মন (mind) যাহা পঞ্চেন্দ্রিয়ে সংলগ্ন হইয়া বাহ্যজগতের উদ্দীপনা গ্রহণ করে।

(৪) নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি (Reasoning Faculty) যাহা বাহ্যজগতের উদ্দীপনাগুলি চৈতন্যময় আত্মার নিকট লইয়া যায়।

(৫) চৈতন্যময় আত্মা যিনি বাহ্যজগৎ অনুভব করেন।

দ্বিতীয়তঃ। থিওসফি মতে সপ্তবিধ তত্ত্বে মানব রচিত, যথা :—

(১) স্থূলদেহ।

(২) প্রাণ।

(৩) লিঙ্গ শরীর।

(৪) কামরূপ।

(৫) মন { ইচ্ছা, ভাব, বিজ্ঞান।

(৬) বুদ্ধি।

(৭) আত্মা।

যেমন আয়ুর্ব্বেদ মতে স্থূলদেহ সপ্তবিধ ধাতুতে নির্ম্মিত, তেমনি স্থূলসূক্ষ্ম রূপধারী মানব ও উপরোক্ত সপ্তবিধ তত্ত্বে বিরচিত হইয়া থাকে।

তৃতীয়তঃ। বেদান্তমতে মানবে পাঁচটী কোষ আছে। যথা :—

(১) অন্নময় কোষ।

(২) প্রাণময় কোষ।

(৩) মনোময় কোষ।

(৪) বিজ্ঞানময় কোষ।

(৫) আনন্দময় কোষ।

(৬) আত্মা।

যেমন একটী থলিয়ার ভিতর অপর একটী থলিয়া প্রবেশ করাইলে, তার পর আর একটী এই প্রকারে পাঁচটী থলিয়া প্রবেশ করাইলে যেরূপ দেখায়,

ঠিক সেইরূপ মানবের বাহ্য দেহ হইতে সূক্ষ্ম আত্মা পর্য্যন্ত পাঁচটী কোষ যথাক্রমে অনুপ্রবিষ্ট আছে। যেমন পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ স্তরে স্তরে নির্ম্মিত, সেইরূপ স্থূলসূক্ষ্মরূপধারী মানবও উপরোক্ত স্থূল ও সূক্ষ্ম স্তরে গঠিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে তাহার অন্নময় কোষ বা স্থূলদেহ আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং অপরগুলি সূক্ষ্ম বা অতীন্দ্রিয়জ্ঞান সাপেক্ষ। এখন বুঝিয়া দেখ, যে বিজ্ঞান মানবদেহের কেবল স্থূল অন্নময় কোষটী পর্য্যালোচনা করে, উহার সিদ্ধান্ত কতদূর অসম্পূর্ণ!

চতুর্থতঃ। রাজযোগশাস্ত্রমতে মানবে তিনটী উপাধি আছে, যথা :—

(১) স্থূলোপাধি।

(২) সূক্ষ্মোপাধি।

(৩) কারণোপাধি।

(৪) আত্মা।

যোগীগণ যোগবলে উপরোক্ত উপাধি গুলিকে পৃথক করিতে পারেন। যোগবলে তাঁহারা উহাদের পৃথক সত্ত্বা অনুভব করেন। পরকায় প্রবেশ, অতীন্দ্রিয় দর্শন, দূরদর্শন, অতীন্দ্রিয় শ্রবণ প্রভৃতি যে সকল অলৌকিক ক্রিয়া তাঁহারা দেখান, তাহাতেই আত্মার যথার্থ অস্তিত্ব সপ্রমাণিত হয়। এ সকল কথা স্বীকার করিলে নিজের আবিস্কৃত নিয়মাবলি মিথ্যা হইবে বলিয়া বিজ্ঞান ইহাদিগকে উড়াইয়া দেয়।

এখন উপরোক্ত তিনটী মতের পরস্পর সম্বন্ধ এইরূপ—

থিওসফি	বেদান্ত	যোগশাস্ত্র
স্থূলশরীর	অন্নময় কোষ	স্থূলোপাধি
প্রাণ লিঙ্গশরীর	প্রাণময় কোষ	
কামরূপ মন — ইচ্ছাভাব	মনোময় কোষ	সূক্ষ্মোপাধি
মন — বিজ্ঞান	বিজ্ঞানময় কোষ	

বুদ্ধি... ... ... আনন্দময় কোষ·· ... ·· ... কারণোপাধি
আত্মা ... ... আত্মা ... ... আত্মা

এই সকল তত্ত্বের মধ্যে আত্মা পরমাত্মার অংশ। যেমন পরমাত্মা নির্গুণ ও নির্ব্বিকার, এবং সকল বিষয়ে নির্লিপ্ত, মানবের আত্মাও নির্গুণ, নির্ব্বিকার ও সকল বিষয়ে নির্লিপ্ত। ইহা অবিনাশি, নিত্য ও অজ। ইহার জন্ম ও মৃত্যু, কিছুই নাই।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেন :—

ন জায়তে ন ম্রিয়তে বা কদাচি
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্য শাশ্বতোঽয়ং পুরাণঃ
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।

(গীতা)

"আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যুও নাই; ইহা হইয়া কদাচ হয় নাই বা হইবে না; ইহা জন্ম লয় নাই বা লইবে না। (ইহার কোনরূপ পরিবর্ত্তন নাই)। ইহা অজ, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাণ। শরীরকে হত্যা করিলে, কেহ ইহাকে হত্যা করিতে পারে না।"

মনের অভ্যন্তরে যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আত্মা বর্ত্তমান,ইহা পরমাত্মার অংশ বলিয়া মায়াতীত ও গুণাতীত। ইহা নিত্য নিরঞ্জন ও সত্য সনাতন। ইহাতে ও জীবাত্মাতে অনেক প্রভেদ। যখন নির্গুণ আত্মা দ্বিতীয় তত্ত্ব বুদ্ধির সহিত যুক্ত হইয়া সগুণ ও উপাধিবিশিষ্ট হয়, তখন ইহাকে পুরুষ, ক্ষেত্রজ্ঞ ও জীবাত্মা বলে। আত্মা সকল অবস্থায় ও সকল লোকে বুদ্ধির সহিত সংযুক্ত থাকে। একমাত্র নির্ব্বাণাবস্থায় ইহা বুদ্ধি হইতে বিয়োজিত হইয়া পরমাত্মায় মিলিত হয়।

জীবাত্মার অপর নাম পুরুষ, কারণ ইনি দেহরূপ সপ্তপুরে বাস করেন। দেহরূপ ক্ষেত্রকে ইনি ভালরূপ জানেন। এজন্য ইহার নাম ক্ষেত্রজ্ঞ। ইনি সমগ্র দেহকে চৈতন্যময় করেন।

কর্ম্মফল বশতঃ জীবাত্মা ভিন্ন ভিন্ন লোকে জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য। সেজন্য এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইতে জন্মমৃত্যুরূপ যে দুইটী ঘটনা সহ্য করে না; কিন্তু ইহার জীবোপাধি বা উপাধিবিশেষ জীব তাহা সহ্য করে।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণানি
অন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।

(গীতা)

"যেমন জীর্ণ পুরাতন বস্ত্র ত্যাগ করিয়া লোকে নববস্ত্র পরিধান করে, সেইরূপ জীবাত্মাও জরাগ্রস্ত পুরাতন দেহ ত্যাগ করিয়া নূতন দেহ ধারণ করে।" এস্থলে জীবাত্মা দেহে দেহে বিচরণ করে বলিয়া দেহী নামে উক্ত হইল।

দ্বিতীয় তত্ত্বের নাম বুদ্ধি। জনসাধারণ যে বুদ্ধিকে জ্ঞানশক্তি বলে এবং যাহার বলে আমরা পার্থিব জ্ঞান লাভ করি, ইহা সে বুদ্ধি নয়। ইহা মহত্তত্ত্বের অংশ এবং আমাদের চৈতন্যের মূল কারণ। আত্মা মায়াতীত হইলেও বুদ্ধিরূপ ইহার অংশটুকু মায়াময়, ইহারা অনুক্ষণ একত্র থাকে বলিয়া জীবাত্মাও মায়াময়।

যাহা বোধ করায় বা জ্ঞান জন্মায়, তাহাই বুদ্ধি। এই বুদ্ধি জীবাত্মায় সংযুক্ত থাকাতে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল উহাতে সংলগ্ন হওয়া যায় এবং ইহা অনন্ত কালের জন্য উহার সঙ্গে যায়। মোটামুটি পাপপুণ্য হইতে যে আত্মগ্লানি ও আত্মপ্রসাদ লাভ হয়, তাহাই জীবের কর্ম্মফল। এই কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য জীবাত্মা ভিন্ন ভিন্ন লোকে জন্ম গ্রহণ করে।

বেদান্তে বুদ্ধি আনন্দময় কোষ বলিয়া উক্ত। কারণ জীবাত্মা স্থূলদেহ হইতে বিমুক্ত হইলে বুদ্ধি যোগে স্বর্গে, দেবলোকে বা সূক্ষ্মজগতে বিমল পরমানন্দ ভোগ করে। ইহ জীবনের এত কষ্টরাশি ও যন্ত্রণারাশি ভোগ করিবার পর এই পরমানন্দ ভোগেই জীবাত্মার প্রধান শ্রেয়োলাভ হয়। আবার ইহলোকে কোন পুণ্যকর্ম্ম করিলে যে আত্মপ্রসাদ লাভ করা যায়, তাহাও এই বুদ্ধি হইতে উৎপন্ন হয়। এজন্য গীতায় শ্রীকৃষ্ণ আত্মবুদ্ধিপ্রসাদকে সাত্ত্বিক সুখ বলেন।

যোগশাস্ত্রে বুদ্ধি কারণোপাধি বলিয়া উক্ত। এই উপাধি হইতে জীবের অবিনশ্বর বা কারণ দেহ আইসে, তদ্ভিন্ন অন্যান্য অংশ জীবের অন্য বা নশ্বর দেহ মাত্র। এক মাত্র জীবাত্মা অমর ও অবিনশ্বর, তদ্ভিন্ন অন্যান্য অংশ ক্ষণবিধ্বংসী।

জীবাত্মার যথার্থ প্রকৃতি আরও বিশদরূপে বুঝা আবশ্যক আমিত্বজ্ঞান বিশিষ্ট জীবাত্মা বা পুরুষ সর্ব্বপ্রকার সুখ দুঃখের এক মাত্র ভোক্তা।

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থোঽপি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুনান্
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদযোনি জন্মসু।

(গীতা)

"জীবাত্মা দেহনিবদ্ধ হইয়াও প্রকৃতির ত্রিগুণ সত্ত্বরজস্তম ভোগ করে, উহাদের দ্বারা চালিত হইয়া বিবিধ সুখ দুঃখের ভাগী হয়। এই ত্রিগুণের আসক্তি বশতঃ ইহা পুনরায় উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়।" যে জীবাত্মা পঞ্চভূতের দেহ পাইয়া পঞ্চেন্দ্রিয় যোগে জগতের পঞ্চ তন্মাত্র ভোগ করিতে আইসে, সে জীবাত্মা প্রকৃতিসম্ভূত ত্রিগুণের ক্রিয়ার বশীভূত বলিয়া যখন যে গুণ অবলম্বন করে, তখন সেই গুণানুযায়ী সুখ দুঃখ ভোগ করে এবং সেই সঙ্গে উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট যোণিতে জন্মগ্রহণ করে।

জীবাত্মা আবার কি প্রকার?
উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ

(গীতা)

"ইনি শরীরের উপদ্রষ্টা বা উপদেশকারী চালক। ইহার ইঙ্গিতে দেহের যাবতীয় ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে। ইহার আদেশ ব্যতীত কোন যন্ত্র চলিতে পারে না।

ইনি শরীরের অনুমন্তা বা অনুভবকারী। আমরা পঞ্চেন্দ্রিয়যোগে যাহা অনুভব বা উপলব্ধি করি এবং মন দ্বারা যাহা মনন করি, ইনি সেই সব করান। ইনি শরীরের ভর্ত্তা বা ইহার ভরণ পোষণ সর্ব্বপ্রকারে

করেন। যে ভোজন দ্বারা ইহার পোষণ হয়, জীবাত্মা না থাকিলে কেই বা তাহা গ্রহণ করে, জীর্ণ করে ও শোষণ করে? ইনি শরীরের রাজা। ইহার আজ্ঞা সর্ব্বত্র পালিত হইতেছে। ইনি এই দেহের পরমাত্মাস্বরূপ পরম পুরুষ। যেমন পরমাত্মা এই নিখিল বিশ্বের অনন্ত চিৎশক্তির মূলাধার এবং ইহার ক্রিয়াপরম্পরার মূলীভূত কারণ, সেইরূপ জীবাত্মাও সমস্ত শরীরের চৈতন্যের মূলাধার এবং ইহার ক্রিয়াপরম্পরার মূলীভূত কারণ।"

থিওসফিমতে মনস্তত্ত্ব দুই ভাগে বিভক্ত, বিজ্ঞান ও ইচ্ছা ভাব প্রভৃতি। পরমার্থজ্ঞান, পাপপুণ্যজ্ঞান ও জ্ঞানশক্তি লইয়া মনের বিজ্ঞানতত্ত্ব গঠিত। বেদান্তে ইহাকে বিজ্ঞানময় কোষ বলে। দেহনাশে ইহা জীবাত্মার সহিত মিলিত হয়। ইহাতে বোধ হয়, মৃত্যুর পর আত্মা বুদ্ধি ও বিজ্ঞানতত্ত্ব লইয়া স্বধামে চলিয়া যায়। আমরা জন্মে জন্মে যে পরমার্থজ্ঞান লাভ করি, তাহা এই বিজ্ঞানময় কোষের অংশীভূত। জীবের ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য বা কর্ম্মফল সংসারে আত্মপ্রসাদ ও আত্মগ্লানি ভোগ দ্বারা মনের গভীরতম প্রদেশে চিরাঙ্কিত হওয়ায় বিজ্ঞানতত্ত্বের অংশীভূত হয়। যে জ্ঞানশক্তিবলে আমরা সংসারে হিতাহিত বিচার করি ও সর্ব্ববিধ পার্থিব জ্ঞান লাভ করি, তাহাও বিজ্ঞানতত্ত্বের অংশীভূত। দেহনাশে পার্থিব সম্বন্ধ ও যাবতীয় পার্থিব জ্ঞান নষ্ট হইলেও প্রকৃত জ্ঞানশক্তি জীবাত্মায় সংলগ্ন থাকে এবং উহার সঙ্গে যায়। এ কারণ এক পিতামাতার সন্তানদিগের ভিতর বুদ্ধিবৃত্তি লইয়া অনেক পার্থক্য দেখা যায় এবং লোকবিশেষ কোন না কোন বিষয়ে অসাধারণ প্রতিভাশালী হইয়া জন্মগ্রহণ করে। আর পূর্ব্ব জন্মের পরমার্থজ্ঞানের পার্থক্যবশতঃ সমাজে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি লইয়া বিস্তর ভেদাভেদ দেখা যায়; এজন্য কেহ এ সংসারে অসাধারণ ধর্ম্মপরায়ণ, কেহ বা ঘোর পাপাচারী হইয়া থাকে।

কখন কখন লোকবিশেষের আধ্যাত্মিকতা অধিক স্ফুরিত হওয়ায় প্রাক্তন বিজ্ঞানতত্ত্ব পূর্ণভাবে সহজাত হয়; তাহাতে তিনি জাতিস্মর হন এবং পূর্ব্বজন্মের কথা সহজে বলিতে পারেন অথবা প্রাক্তন জন্মবিদ্যা মাতৃগর্ভে লাভ করেন। সংসারে এমন লোক দেখা যায়, যিনি ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র সংস্কৃত ভাষায় অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখান। সকলেই জানেন, শঙ্করা-

চার্য্যদেব একাদশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে বেদবেদাঙ্গে অসাধারণ পণ্ডিত হইয়াছিলেন। কিন্তু সাধারণতঃ জীবাত্মার জড়ত্ব বশতঃ বিজ্ঞানতত্ত্ব আদৌ স্ফূর্ত্তি পায় না এবং সকলে পূর্ব্বজন্মের কথা আদৌ বলিতে পারে না।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেন :—

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন
তান্যহং বেদ সর্ব্বানি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপঃ।

(গীতা)

"হে অর্জ্জুন! তোমার ও আমার অনেক জন্ম অতীত হইয়াছে। আমি আমার সকল জন্মের কথা জানি; কিন্তু তুমি তাহা কিছুই জান না।" বস্তুতঃ কলিযুগে আমাদের আধ্যাত্মিক অধঃপতন বশতঃ আমরা পূর্ব্বজন্মের কথা কিছুই অবগত নহি। এখন বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে আমাদের জ্ঞান শক্তির উন্মেষ হওয়াতে স্মরণশক্তি যতই কেন বর্দ্ধিত হউক না, আমরা ইহজন্মের কথাই মনে করিব, পূর্ব্ব জন্মের কথা কিছুই বলিতে পারিব না। কেহ কেহ পূর্ব্বজন্মের কথা ভালরূপ বলিতে পারেন, এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যায়।

থিওসফিমতে ইচ্ছাশক্তি ও ভাবাবলি লইয়া মনের দ্বিতীয় অংশ গঠিত। যে ইচ্ছাশক্তি বলে আমরা সংসারে আবশ্যকমত যাবতীয় কার্য্য করি, তাহা মন হইতে উৎপন্ন। এই ইচ্ছাশক্তি সম্যক স্ফুরিত হইলে আমরা অনেককে বশীভূত করিতে পারি ও সংসারে অনেক অসাধ্য সাধন করিতে পারি। যোগবলে মনের একাগ্রতা লাভ হইলে ইচ্ছাশক্তি সম্যক বর্দ্ধিত হয়।

সমাজ ও পরিবার মধ্যে বসবাস করাতে যে সকল উৎকৃষ্ট ভাবাবলি হৃদয়ে অনুক্ষণ উত্থিত হয়, উহারা সকলে মন হইতে উৎপন্ন এবং ঐহিক ভাবমাত্র। দেহনাশে পার্থিব সম্বন্ধ ঘুচিলে উহারা নাশ পায়, এজন্য শাস্ত্র বলে "কেউ কাহারও নয়, কেবল পথের পরিচয়।" কিন্তু উহাদের সার অংশটুকু (অর্থাৎ) স্ফুরিত সাত্ত্বিক ভাবাবলি বিজ্ঞানময় কোষের সহিত মিলিত হইয়া মৃত্যুর পর জীবাত্মায় সংলগ্ন হয়।

কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি লইয়া থিওসফিমতে দেহের কামরূপ গঠিত। ইহারা ইতর জন্তুতেও সমধিক প্রবল। দেহনাশে

কামরূপ কামলোকে মিলিয়া যায়। কামরূপ হইতে দেহের নিম্নস্থ তত্ত্বগুলি ইতর জন্তুবর্গে দেখা যায়। ইহাতে বুঝা উচিত, উহারা মানব হইতে কত পৃথক! উহাদের জীবাত্মা, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি, পাপপুণ্যজ্ঞান, জ্ঞানশক্তি, বাক্যকথনশক্তি কিছুই নাই। আছে কেবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি বা কামরূপ।

কামরূপ (নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি) ও মনের প্রথম অংশ (ইচ্ছা ও ভাব) বেদান্তে মনোময় কোষ বলিয়া উক্ত। কারণ বেদান্তমতে ইহারা মনের ক্রিয়ামাত্র এবং মন হইতে উৎপন্ন। যোগশাস্ত্র মত বেদান্তের মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষ দুইটী দেহের সূক্ষ্মোপাধি, কারণ ইহারা সূক্ষ্ম জগতের সূক্ষ্ম উপাদানে নির্ম্মিত ও সূক্ষ্ম জগৎস্থ দেবগণ কর্ত্তৃক সদা নিয়ন্ত্রিত।

দেহের মনোময় কোষ জন্মানুসারে বা অবস্থা ভেদে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। যে কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য জীব ইহসংসারে আইসে, সেই কর্ম্মফলানুসারে ইহার মনোময় কোষ (ইচ্ছা, ভাব ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি) সূক্ষ্মজগৎস্থ দেবগণ কর্ত্তৃক সংযোজিত হয়। ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, সনকাদি দেবগণ ও নারদাদি দেবর্ষিগণ মানবমন সৃজন করেন। এস্থলে বেশ বুঝা যাইতেছে, নিজের কর্ম্মফলবশতঃ জীবাত্মা যে বিভিন্নরূপ সুখ দুঃখের ভাগী হয়, তাহা কেবল ইহার মনোময় কোষের বিভিন্নতা প্রযুক্ত ঘটিয়া থাকে। এ সংসারে যাহার নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি প্রবল, সে লোক কামিনীকাঞ্চনের লোভে অসৎ কর্ম্ম করিয়া দুঃখের ভাগী হইবে, আর যাহার ধর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রবল, সে লোক বিবিধ সৎকর্ম্ম করিয়া সুখসলিলে ভাসিবে।

লিঙ্গশরীর (Astral body) স্থূলদেহের ছায়াস্বরূপ; ইহার আদর্শে বা নমুনায় বাহ্য স্থূলদেহ পার্থিব উপাদানে নির্ম্মিত। জীবদ্দশায় যতদিন লিঙ্গ শরীর, প্রাণ ও স্থূলদেহ, এই তিন তত্ত্বের অবিচ্ছিন্ন সংযোগ থাকে, ততদিন উপরোক্ত তিন তত্ত্বের বিচ্ছেদ একেবারে অসম্ভব।

থিওসফির লিঙ্গশরীর ও প্রাণ বেদান্তে প্রাণময় কোষ বলিয়া উক্ত। এই প্রাণময় কোষ জীবের জীবনীশক্তির আধার এবং উহাদ্বারা সমগ্র দেহ জীবিত থাকে। বাহ্য স্থূলদেহ অন্ন দ্বারা পালিত বলিয়া উহা বেদান্তে অন্নময় কোষ বলিয়া উক্ত। যোগশাস্ত্রে উপরোক্ত তিন তত্ত্ব স্থূলোপাধি বলিয়া খ্যাত, কারণ উহারা অল্পাধিক স্থূল উপাদানে গঠিত।

যখন প্রাণতত্ত্ব দেহ হইতে বহির্গত হয়, তখন ইহার অন্যান্য তত্ত্বগুলি ছিন্ন ভিন্ন হওয়াতে স্থূলদেহ বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং ইহার পঞ্চভূত বাহ্যজগতের পঞ্চভূতের সহিত মিলিত হইয়া যায়। তৎকালে লিঙ্গশরীর ক্রমশঃ স্থূলদেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আকাশে বিলীন হয়। স্থলবিশেষে ও অবস্থাভেদে এই লিঙ্গ শরীর প্রাণ, কামরূপ ও মন দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া আকাশে সূক্ষ্মরূপে বিচরণ করে এবং প্রেতাদিরূপে আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবর্গের দৃষ্টিপথে পতিত হয়।

উপরোক্ত তত্ত্বগুলি একাধারে ক্রমান্বয়ে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আমিত্বজ্ঞান-বিশিষ্ট জীব উৎপাদন করে। ইহার আমিত্বজ্ঞান সর্ব্বথা মায়াসম্ভূত। জন্মে জন্মে জীব বিভিন্ন শরীরে নিবদ্ধ হইয়া নূতন নূতন আমিত্বজ্ঞান পায়। এক দেহ হইতে দেহান্তরে জন্ম লইবার পূর্ব্বে সূক্ষ্ম জীব (Incarnating monad) ক্রমশঃ নিম্নলিখিত স্থান অধিকার করে, যথা—

(১) সূর্য্য মণ্ডল (২) পঞ্চ মহাভূত (৩) অন্ন (৪) রক্ত (৫) রেত (৬) মাতৃগর্ভ। বেদান্ত মতে সূক্ষ্ম জীব মৃত্যুর পর চন্দ্র মণ্ডলে গমন করে। তথা হইতে ইহা চন্দ্র কিরণ যোগে ঔষধিতে বা অন্নে গমন করে। যে জীব সেই অন্ন ভোজন করে, উহার রক্তে সেই জীব ভ্রমণ করে। তার পর রক্ত হইতে ইহা শুক্রে গমন করে, পরিশেষে শুক্রের সহিত ইহা মাতৃগর্ভে গমন করে। এই শেষোক্ত স্থানে ইহা ব্যক্তরূপ ধারণ করে। তদ্ভিন্ন সকল স্থানে ইহা অব্যক্ত অবস্থায় থাকে। যেমন বসন্তাদি ঋতু নিজ নিজ সময়ে দেখা দেয়, সেইরূপ জীবের কাল পূর্ণ হইলে এবং ইহার প্রাক্তন কর্ম্ম ফলোন্মুখ হইলে ইহা ইহসংসারে বা অন্য কোন লোকে জন্ম গ্রহণ করে। কর্ম্মফলানুসারে উপযুক্ত মাতৃগর্ভ ও রাশিচক্রের গ্রহনক্ষত্রাদির উপযুক্ত সম্মিলন পাইয়া ইহা জন্ম গ্রহণ করে। একবারও মনে ভাবিও না, অন্ধদৈব ইহাকে এ জগতে আনয়ন করে এবং অন্ধ দৈবই ইহার ক্ষণস্থায়ী জীবনকে চালিত করে। সকল বিষয়ে পরব্রহ্মের অখণ্ড্য ও অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম চলিতেছে।

অধ্যাত্মবিজ্ঞানের সুমধুর কথা শ্রবণ করিয়া আমাদের মন প্রাণ জুড়াইল। এখন যে বিজ্ঞান একমাত্র স্থূলদেহ পর্য্যালোচনা করিয়া অবিনশ্বর আত্মা ও পরলোকের অস্তিত্ব ঘুচাইয়া আমাদিগকে নৈরাশ্য সাগরে নিমগ্ন করে, উহার কথা কর্ম্মনাশার জলে প্রক্ষেপ করিয়া দেও।

মানব জীবনের উদ্দেশ্য।

অশেষ পুণ্যবল না থাকিলে কেহ মানবজন্ম গ্রহণ করেন না। দুর্লভ মানবজীবন পাইয়া আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য কি, কোন্ কোন্ মহৎ কার্য্য করিবার জন্য আমরা এ সংসারে আসি, তাহাই এ প্রবন্ধে বিচার্য্য।

জগৎ অসংখ্যজাতীয় জীবজন্তুতে ও উদ্ভিজ্জে পরিপূর্ণ; প্রত্যেকের কোন না কোন মহৎ উদ্দেশ্য আছে। সকলে প্রকৃতির মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করে এবং প্রকৃতি সকলকে স্বোদ্দেশ্য সাধনের জন্য তদনুরূপ অবস্থায় স্থাপিত করে। সকলে নিজ নিজ অবস্থায় নিজ প্রকৃতি অনুসারে জীবন যাপন করে; ইহাতেই প্রকৃতির মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

তাহার সাক্ষ্য দেখ, লক্ষ লক্ষ প্রবাল সমুদ্রগর্ভে একস্থলে একত্রিত হইয়াছে। উহারা জীবন যাপন করিতেছে, বংশবৃদ্ধি করিতেছে ও মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। কিন্তু উহাদের কঙ্কালরাশি একত্রিত হইতে হইতে বহুকাল পরে সুবিশাল প্রবালদ্বীপ উৎপন্ন হইবে এবং কালক্রমে ইহা মনুষ্যাদি উৎকৃষ্ট জীবসমূহের বাসভূমি হইবে। দ্বীপনির্ম্মাণ প্রবালের জাতীয় জীবনের যে এক মহৎ কার্য্য, তাহা উহারা অবগত নয়। গৃধ্রকুল পূতিগন্ধযুক্ত গলিত শবমাংস ভক্ষণে একান্ত আসক্ত; এমন কি, শবমাংসই উহাদের একমাত্র আহার্য্য। জগতে আসিয়া উহারা প্রকৃতির যে মহৎ কার্য্য করিতেছে, তাহাও উহারা অবগত নয়।

এই যে উষ্ট্রগণ মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকারাশির মধ্য দিয়া প্রায় নিরম্বু উপবাসে চলিতেছে, উহারা কি নিজ জীবনের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারে? খায় দায় এই মাত্র জানে, মানবের ভার বহন করিতে আমাদের জন্ম। এই যে গরুগুলি মাঠের মুষ্টিমেয় তৃণ ভক্ষণ করিয়া বিধিমতে মানবের সেবা করিতেছে, উহারাও কি নিজ জীবনের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারে? খায় দায় এই মাত্র জানে, মানবের সেবা করিতেই আমাদের জন্ম। এই যে মানব সর্ব্বোৎকৃষ্ট জ্ঞানশক্তিতে বিভূষিত হইয়া জীবরাজ্যে একাধিপত্য করিতেছেন, যিনি পর্ব্বতজঙ্গলাকীর্ণ বসুন্ধরাকে নন্দনকানন করিয়া নানাদিকে নানা সুখৈশ্বর্য্য ভোগ করিতেছেন, তিনিই কি নিজ জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য বুঝিতে পারেন? সকলেই যে ভাবে

জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করুক না কেন, উহারা কেবল প্রকৃতিক মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে।

জগতে প্রত্যেক জীব, প্রত্যেক উদ্ভিজ্জ ও প্রত্যেক বস্তুর কোন না কোন মহৎ উদ্দেশ্য আছে। কেহই এ জগতে অনর্থক সৃষ্ট হয় না। কেহ ভোক্তা-রূপে, কেহ বা আহার্য্যরূপে, কেহ বা ভেষজরূপে, কেহ বা সেবকরূপে, কেহ বা প্রকৃতির শোভাবর্দ্ধনার্থ ও ভূভার হরণার্থ সৃষ্ট হয়। লীলাময়ীর মহালীলা কীটাণুকীট মানব কি বুঝিবে?

প্রকৃতির উদ্দেশ্য যাহাই হউক না, সাধারণতঃ বুঝা যায়, মানবজীবনের উদ্দেশ্য দুই প্রকার, যথা—

(১) জাতীয় উদ্দেশ্য।

(২) ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য।

আবার এই দুইপ্রকার উদ্দেশ্য দুই প্রকার উন্নতিতে সংসাধিত হয়, যথা:—

(১) আধিভৌতিক উন্নতি।

(২) আধ্যাত্মিক উন্নতি।

প্রথমোক্ত দ্বারা পার্থিব জ্ঞানানুশীলন ও বাহ্য সভ্যতাবর্দ্ধন বুঝায়, আর শেষোক্ত দ্বারা ধর্ম্মোন্নতি বা আত্মার আধ্যাত্মিক শক্তি স্ফুরণ বুঝায়। জাতি-বিশেষ হউক, ব্যক্তিবিশেষ হউক, এই দুইপ্রকার উন্নতি সাধন করিলে জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ হইবে।

এ জগতে মানব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব। তিনিই ইহার রাজা এবং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তিনি ইহার দেবতা। এই রমনীয় বসুন্ধরা তাঁহার প্রমদোদ্যান। ইহাই তাঁহার নন্দনকানন। তাঁহারই পাদপদ্ম সেবার জন্য যাবতীয় জীবজন্তু এ সংসারে সৃষ্ট। তাঁহারই সুখৈশ্বর্য্যবর্দ্ধনের জন্য যাবতীয় পদার্থ রচিত। তাঁহারই ভোগবিলাস চরিতার্থতার জন্য যাবতীয় বিলাস দ্রব্য পরিকল্পিত। তিনি না থাকিলে কেই বা জগতের শোভা দেখে, কেই বা ইহার সুখৈশ্বর্য্য ভোগ করে?

জ্ঞান শক্তিতে বিভূষিত হওয়ায় তিনি পুরাকাল হইতে অশেষ জ্ঞান ও ধর্ম্মের অনুশীলন করিয়া ও প্রাকৃতিক উপাদান রাশির (Natural resources) সদ্ব্যবহার করিয়া জাতীয় সভ্যতাবর্দ্ধন করিয়া আসিতেছেন। ইহাই তাহার

জাতীয় জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। এই সভ্যতার গুণে শ্মশানসদৃশ পর্ব্বত-জঙ্গলাকীর্ণ মেদিনী আজ সুরম্য নন্দনকাননে ও সমৃদ্ধ নগরীগুলি আজ স্বর্গের অমরাবতীতে পরিণত।

বিজ্ঞানও বলে যে, মানব আদিম বর্ব্বর অবস্থায় বনজঙ্গলে থাকিয়া বস্ত্রাভাবে, গৃহাভাবে ও অন্নাভাবে অশেষ কষ্টরাশি বহন করিত, সে মানব এখন সুসভ্য অবস্থায় সুরম্য হর্ম্ম্যে অধ্যুষিত হইয়া,সুখাদ্যে উদর পূর্ত্তি করিয়া ও বিবিধ মনোহর সজ্জায় সুশোভিত হইয়া যেরূপ সুখসচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেছেন তাহা ভাবিলে মানবজীবনের প্রধান উদ্দেশ্য কি, তাহা ভালরূপ বুঝা যায়। যে জাতীয় সভ্যতার গুণে তিনি স্বকীয় অবস্থার এতদূর শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিয়াছেন, যাহার গুণে তিনি এখন অনন্ত সুখে কালাতিপাত করিতেছেন, সেই সভ্যতার ক্রমোন্নতিসাধনই তদীয় জাতীয় জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য।

এতদর্থে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, জ্ঞান, বিজ্ঞানানুশীলন, শাসন প্রণালী প্রভৃতির জন্য যে সকল অনুষ্ঠান অত্যাবশ্যক এবং যাহাদের উন্নতিতে দেশের প্রকৃত মঙ্গলসাধন ও শ্রীবৃদ্ধিসাধন হইবে, তাহাতে সকলে মনোনিবেশ কর এবং কায়মনোবাক্যে তাহাতে একনিষ্ঠ হও, ইহাই জাতীয় জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। অতএব স্থিরনিশ্চয় জানিবে, জগতের বাহ্য সভ্যতা বর্দ্ধন বা আধিভৌতিক উন্নতি সাধন সমগ্র মানবজাতির জাতীয় জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য এবং যে জাতি যতই সভ্যতা সোপানে অগ্রসর হইবে, সে জাতি প্রকৃতির মহৎ উদ্দেশ্য ততই সাধন করিবে।

এ সংসার একটী বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র। কর্ম্মদেহ পাইয়া সকলকে এ কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মজীবন যাপন করিতে হয়। আবার এ সংসার এক মহানাট্যশালাস্বরূপ। এখানে সকলে বিবিধ সাজ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া নিজ নিজ অংশ অভিনয় করিতে আইসে। যার ভাগ্যে যেরূপ পালা পড়ে, তাহাকে সেই পালা অভিনয় করিতে হয়। একবার ভাবিয়া দেখ সংসারে কত লোক কতপ্রকার কাজে ব্যাপৃত আছে। কেহ তরবারি ও বন্দুক হস্তে লইয়া অসংখ্য ভ্রাতার প্রাণনাশে ধাবমান; কেহ বা ভৈষজ্যপুট্টলী লইয়া অসংখ্য ভ্রাতার শারীরিক যন্ত্রণা দূর করিতে বা প্রাণরক্ষা করিতে অগ্রসর; কেহ কৃষিশিল্প বাণিজ্যাদি কর্ম্মে ব্যাপৃত হইয়া অক্লান্ত পরিশ্রমে সমাজের বিবিধ অনাটন দূর

করিতে তৎপর ; কেহ বা প্রগাঢ় পরিশ্রম সহকারে দিবানিশি স্বাধ্যায়পর হইয়া বিদ্যোপার্জ্জনে বা বিদ্যাধনবিতরণে ব্যস্ত ; কেহ ধর্ম্মযাজক হইয়া সকলকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া পরসেবায় একান্ত তৎপর ; কেহ বা রাজসেবায় নিযুক্ত হইয়া রাজাদেশ পালন করিতে একান্ত যত্নবান ; কেহ আদালতে অপরাধী বা নিরপরাধ ভ্রাতার শাস্তিবিধানে বা দোষস্খালনে তৎপর ; কেহ বা স্থপতিবিদ্যায় নিপুণ হইয়া রাজবর্ত্মাদি নির্ম্মাণ করিয়া দেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে ও শোভাবর্দ্ধনে যত্নবান।

এই প্রকারে সমাজবিশেষের বা জাতিবিশেষের বিবিধ অনাটন বিবিধ উপায়ে দূরীভূত হইতেছে। এ স্থলে সকল শ্রেণীর লোকবর্গ নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করিয়া সমাজের মহোপকার করে, ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য করে ও প্রকৃতির মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করে। সমাজসেবার জন্য যাহা কিছু আবশ্যক, তাহাই ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য। অতএব কি ধর্ম্মযাজক, কি কৃষক, কি শিল্পকার, কি চর্ম্মকার, কি মেতর,সকলেই সমাজের সেবা করিয়া ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য করিতেছে ও প্রকৃতির মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে। এই প্রকারে নানা উপায়ে সমাজবিশেষের জাতীয় উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে।

এখন জীবনের ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে দেখা যাউক। অবনীমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া মানব আত্মা, মন, দেহ, পরিবার, সমাজ ও বাহ্যজগতের সহিত যেরূপ বিবিধ সম্বন্ধে জড়িত হন, তাহাতে তিনি কতকগুলি অবশ্যপ্রতিপাল্য কর্ত্তব্যকর্ম্মসূত্রে স্বতঃ আবদ্ধ হইয়া থাকেন। এই সকল কর্ত্তব্যপালনই তাঁহার জীবনের মহৎ ব্রত। ইহাদিগকে এই প্রকারে নির্দ্দেশ করা যায়, যথা :—

(১) দেহযাত্রা নির্ব্বাহ ও বংশবৃদ্ধি।
(২) পারিবারিক ধর্ম্মপালন।
(৩) সামাজিক ধর্ম্মপালন।
(৪) স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন।
(৫) জ্ঞানানুশীলন দ্বারা মনের উন্নতি সাধন।

} ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য

(৬) মনের সাত্ত্বিক ভাবাবলিরস্ফূর্ত্তি।

(৭) আত্মার উন্নতিসাধন।

আধ্যাত্মিক উন্নতি

ইহাদিগকে অন্যপ্রকারে নির্দ্দেশ করা যায়; যথা :—

(১) জ্ঞানানুশীলন।

(২) অর্থোপার্জ্জন।

(৩) শরীরের স্বাস্থ্যরক্ষা।

(৪) ধর্ম্মানুশীলন।

ইহাদের মধ্যে দেহযাত্রানির্ব্বাহ ও বংশবৃদ্ধি জীবমাত্রেরই সাধারণ ধর্ম্ম বলিয়া উহারা মানবের মনুষ্যত্বপরিচায়ক নহে, কিন্তু অপরগুলি তাঁহার বৈশেষিক ধর্ম্ম ও প্রকৃত মনুষ্যত্ব পরিচায়ক। এই সকল বৈশেষিক ধর্ম্ম পালন করিয়াই তিনি এ জগতে এত শ্রেষ্ঠত্ব পাইয়াছেন। যদিও জনসাধারণ বিবিধ উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিয়া পরিবার প্রতিপালনকে আপনাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য জ্ঞান করে, তথাচ স্বধর্ম্মের আদেশমত অশেষ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া আত্মার আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করা ও দেশকালোচিত বিদ্যা শিক্ষা করিয়া মনের জ্ঞানোন্নতি সাধন করা সকলের পক্ষে সমান কর্ত্তব্য। যিনি যে অবস্থায় পতিত হউন না, মনের জ্ঞানোন্নতি ও ধর্ম্মোন্নতি ব্যতীত মনুষ্যত্ব লাভ হয় না। এই মনুষ্যত্ব লাভ করিলেই দুর্লভ মানবজন্ম সার্থক হয়।

তুমি যে হও, সে হও, শারীরিক নিয়ম পালন করিয়া শরীরের স্বাস্থ্য রক্ষা করা যেমন তোমার কর্ত্তব্য, দেশকালোচিত বিবিধ সৎ উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিয়া পরিবার প্রতিপালন করাও তেমনি তোমার কর্ত্তব্য। অগাধ বিদ্যা-শিক্ষা করিয়া মা সরস্বতীর বরপুত্র হওয়া যেমন তোমার কর্ত্তব্য, অশেষ পুণ্য-কর্ম্ম করিয়া স্ববিবেকের নিকট আত্মপ্রসাদ লাভ করাও তেমনি তোমার কর্ত্তব্য। বিবিধ সৎকর্ম্মে অর্থব্যয় করিয়া নিজবংশ উজ্জ্বল করা যেমন তোমার কর্ত্তব্য, স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধনের জন্য বিবিধ সদনুষ্ঠানে যোগদান করাও তেমনি

তোমার কর্ত্তব্য। প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা মাতৃভূমি শত্রুবর্গকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে ইহার স্বাধীনতা রক্ষা করা যেমন তোমার কর্ত্তব্য, ইহা পরাধীনতারূপ নিগড় শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলে দেশোদ্ধারের জন্য অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন করা বা হাসিতে হাসিতে জেলে যাওয়াও তেমনি তোমার কর্ত্তব্য। এ ভবসংসারে আসিয়া তুমি এইরূপ নানা কর্ত্তব্যপাশে আবদ্ধ আছ এবং নির্ভীকচিত্তে ও প্রাণপণে এই সকল কর্ত্তব্য পালন করিয়া নিজ জীবন বরীয়ান ও মহীয়ান কর।

সংসার সমরাঙ্গণে যুদ্ধ কর দৃঢ়পণে
ভয়ে ভীত হও না মানব।
কর যুদ্ধ বীর্য্যবান যায় যাবে যাক্ প্রাণ
মহিমাই জগতে দুর্লভ।
(হেমচন্দ্র বন্দ্যো)

পরলোক।

যে মানবের জীবন জলবুদ্বুদের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী, এই আছে ত এই নাই, যাঁহার শিয়রে কাল অনুক্ষণ উপবিষ্ট, ঘাড় মটকাইলেই হইল, তিনি মৃত্যুর পর কোথায় যান, দেহনাশের সহিত তাঁহার অস্তিত্ব কি একেবারে লোপ পায়, না তিনি কোন অদৃশ্য লোকে চলিয়া যান, বা পুনরায় ইহলোকে আইসেন, এ সব কথা জানিবার জন্য আমরা চিরদিন অতীব ব্যগ্র। কৌতূহল হইলেই বা কি হইবে? আমরা এখন যে অবস্থায় অবস্থিত, আমাদের আধ্যাত্মিক শক্তি যে পরিমাণে অপগত, তাহাতে আমরা কস্মিন্ কালে এ রহস্য মীমাংসা করিতে পারিব না। আমরা এই পর্য্যন্ত জানি,

That undiscovered land from whose bourne no traveller ever returns"

"সেই অনাবিষ্কৃত দেশ, যাহার প্রান্ত সীমা হইতে কোন পথিক কোন সময়ে প্রত্যাগমন করে না।"

এখন মানবধর্ম্ম সকল দেশে পরলোকে বিশ্বাস স্থাপন করাইয়া উপরোক্ত রহস্য মীমাংসা করিতে চেষ্টা পায়। পরলোকে বিশ্বাস এখন সর্ব্ববাদিসম্মত। ঈশ্বরে বিশ্বাসের ন্যায় ইহা এখন সকল ধর্ম্মের অঙ্গীভূত। এজন্য প্রত্যেক ধর্ম্ম

পরকালে প্রেতাত্মার মঙ্গলের জন্য কতকগুলি অবশ্যপ্রতিপাল্য অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া উপদেশ দেয় এবং জনসাধারণ সেই সকল অনুষ্ঠান অতি শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত পালন করে। কোন ধর্ম্ম প্রেতাত্মার উদ্দেশে পিণ্ডদান ও তর্পণাদির ব্যবস্থা করে এবং কোন ধর্ম্ম তদুদ্দেশে ঈশ্বরের উপাসনা বা নামাজ পাঠ করিতে বলে।

পরলোক লইয়া পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহিত ধর্ম্মের ঘোরতর বিবাদ চলিতেছে। যে বিজ্ঞান আত্মা, ঈশ্বর কিছুই মানে না, সে বিজ্ঞান কি প্রকারে পরলোক মানিতে পারে? ইহা এই পর্য্যন্ত জানে—

Imperious Coezar, dead and turned to clay.
Shall patch a wall to keep the winter away.
On that, that earth that kept the world in awe
Shall patch a wall to keep the winter's flaw

(shakespeare.)

"পরাক্রান্ত সম্রাট তুল্য সিজরের মৃত্যুর পর তদীয় দেহ কর্দ্দমে পরিণত হইবে এবং হিমনিবারণার্থ প্রাচীরে লেপনস্বরূপ ব্যবহৃত হইবে। হায়! হায়! যে ধূলার শরীর সমগ্র জগৎকে থরহরি কম্পমান করিয়াছিল, সেই শরীর ধূলায় পরিণত হইয়া শীতকালের সামান্য হিম নিবারণ করিবার জন্য ব্যবহৃত হইবে। কিন্তু বিজ্ঞান জানে না বা স্বপ্নেও ভাবে না, যে ব্যক্তি আজ পথের কাঙ্গাল, তাহার আত্মাও অনন্ত কালে অনন্ত উন্নতি করিবে এবং পরিশেষে দেবতায় পরিণত হইবে।

ইহার মতে যেমন জন্মপরিগ্রহের পূর্ব্বে মানবের কোনরূপ অস্তিত্ব ছিল না, সকলই অন্ধকার ছিল; সেইরূপ মৃত্যুর পর তাঁহার কোনরূপ অস্তিত্ব থাকিবে না, পুনরায় সকলই অন্ধকার হইয়া যাইবে; কেবলমাত্র দিন কয়েকের জন্য জগতের পরমাণুপুঞ্জ প্রাকৃতিক নিয়মে একত্রিত হইয়া চৈতন্যময় জীব উৎপাদন করত তাঁহাকে সুখদুঃখের ভাগী করে। যেমন অন্যান্য জীবজন্তু সংসারে আসিতেছে ও যাইতেছে, কে কার খপর রাখে, সেইরূপ মানবও আস্‌চেন ও যাচ্চেন, কে কার খপর রাখে, "কাকস্য পরিবেদনা"। যেমন উহারা মৃত্যুর পর একেবারে লয় পায়, তিনিই সেইরূপ মৃত্যুর পর চিরদিনের জন্য লয় পাইবেন। বিজ্ঞানের মতে কেবল ভ্রান্ত দর্শন ও ভ্রান্ত ধর্ম্ম এতকাল এই সকল

অলীক মতামত জগতে প্রচার করিয়া আসিতেছে এবং নির্ব্বোধ মানবও উহাদের ভ্রান্ত মত লইয়া নিজের দুর্ব্বল মনকে চিরদিন সান্ত্বনা করিতেছেন।

এখন জিজ্ঞাস্য, যে বিজ্ঞান আমাদের অনন্তকালের আশা নির্ম্মূল করিয়া আমাদিগকে নৈরাশ্য সাগরে ডুবায়, উহার কথাই কি অমোঘ সত্য? বস্তুতঃ কেবল মরিবার জন্যই কি আমরা এ সংসারে আসি? আমাদের ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপ-পুণ্য ও সুখদুঃখ সকলই কি একমাত্র মৃত্যুতে পর্য্যবসিত? জগতের ক্ষণবিধ্বংসী আধিভৌতিক উন্নতিই কি মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য? জড়বাদী জড়বিজ্ঞান যাহাই বলুক না কেন, উহার কথায় কর্ণপাত করা আমাদের উচিত নয়। যে বিজ্ঞান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূলপদার্থ ব্যতীত আর কিছুই জানে না, সে বিজ্ঞান ইন্দ্রিয়াতীত সূক্ষ্ম পরলোক সম্বন্ধে কি ভাবিবে বা কি জানিবে? মানবধর্ম্ম বলিবে, তবে ভ্রান্ত বিজ্ঞানের কথা 'অমৃতং বালভাষিতং' বলিয়া উড়াইয়া দেও।

এখন দেখা উচিত, জীবাত্মা যে অবিনশ্বর, তদ্বিষয়ে আমরা কিরূপ প্রমাণ পাই। প্রকৃতিপুস্তক ভালরূপ অধ্যয়ন করিলে বুঝা যায়, এ জগতে কোন বস্তুর বিনাশ নাই। অবস্থাভেদে সকল বস্তুর পরিবর্ত্তন ও রূপান্তর ঘটিতেছে বটে, কিন্তু যে সকল পরমাণু দ্বারা উহারা বিরচিত, তাহাদের আদৌ বিনাশ নাই, অথবা যে সকল ভৌতিক শক্তি দ্বারা উহারা অনুক্ষণ চলিত, তাহাদেরও বিনাশ নাই। দেখ, একখণ্ড জলন্ত মোমবাতি দেখিতে দেখিতে তোমার নয়ন সমক্ষে অদৃশ্য হইতেছে। সাধারণতঃ তোমার মনে হইবে, মোমবাতিটি ধ্বংস হইয়া গেল, কিন্তু তাহা নহে। অঙ্গার ও উদজানের যে সকল পরমাণু দ্বারা উহা বিনির্ম্মিত, সেই সকল পরমাণু জলন্ত অবস্থায় বায়ুর অম্লজান যোগে জলীয় বাষ্প ও কার্ব্বণিক এসিড গ্যাসে পরিণত হইয়া আকাশে বিলীন হইতেছে। সেইরূপ জীবদেহ মৃত হইলে, ইহার জটিল জৈবনিক পদার্থের অঙ্গার, উদজান ও যবক্ষারজানের পরমাণুপুঞ্জ বায়ুর অম্লজান যোগে বিশ্লিষ্ট হইয়া জলীয় বাষ্প, কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস ও এমোনিয়ায় পরিণত হয়। এস্থলে উহাদের নাশ হয় না, রূপান্তর হয় মাত্র।

সেইরূপ সূক্ষ্ম জগতের সূক্ষ্ম পদার্থেরও আদৌ বিনাশ নাই। যে দৃশ্য একবার নয়নপথে পতিত হয়, উহা মস্তিষ্কের স্নায়বীয় আকাশে অঙ্কিত হওয়ায় চিরদিন স্মৃতিপথে উদিত হয়। যে চিন্তা একবার মনে উত্থিত হয়, উহারও

বিনাশ নাই। উহা মানসাকাশে অঙ্কিত হওয়ায় অতীন্দ্রিয়জ্ঞানসম্পন্ন মহাত্মাদিগের দিব্যচক্ষে প্রতিভাত হয়। এজন্য তাঁহারা তোমায় দেখিয়া তোমার মনের কথা বলিয়া দিতে পারেন। সূক্ষ্ম জগতের যে সকল সূক্ষ্ম উপাদানে মানব মন গঠিত, প্রাণনাশে উহা নষ্ট হইয়া গেলেও উহার সূক্ষ্ম উপাদানের নাশ হয় না। ইহারা পুনরায় দ্বিতীয় মন গঠনে প্রযুক্ত হয়।

যখন স্থূলজগতে ভৌতিক পদার্থের বিনাশ নাই এবং সূক্ষ্ম জগতে সূক্ষ্ম পদার্থের বিনাশ নাই; তখন যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চৈতন্যস্বরূপ জীবাত্মা স্থূলদেহ ও সূক্ষ্ম মনের রাজা এবং পরমাত্মার অংশ, ইহার নাশ কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? সত্য বটে, নূতন নূতন অবস্থায় পতিত হইয়া ইহার আমিত্বজ্ঞান জন্মে জন্মে পরিবর্ত্তিত হয় এবং নূতন নূতন দেহে নিবদ্ধ হয়; কিন্তু ইহা যে নিখিল সংসারে অবিনশ্বর, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাণ, সে বিষয়ে সন্দেহ কি?

মৃত্যুর পর প্রেতাত্মা পরলোকে কি ভাবে থাকে, তাহা লইয়া প্রত্যেক ধর্ম্মের বিস্তর মতভেদ আছে। কোন কোন ধর্ম্ম কর্ম্মফল ও পুনর্জ্জন্ম মানে; অন্য ধর্ম্ম তাহা আদৌ মানে না। কিন্তু সকল ধর্ম্মই স্বর্গ ও নরকের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে এবং উপদেশ দেয়; ধর্ম্মাত্মারা মৃত্যুর পর স্বর্গলোকে গিয়া পরমানন্দে থাকেন এবং পাপাত্মারা নরক গুলজার করে। তবে স্বর্গ ও নরক কোথায়?

কেহ কেহ বলেন, দেহনাশে ইন্দ্রিয়াদি নষ্ট হইলে জীবাত্মা কি প্রকারে সুখ দুঃখ অনুভব করিবে? অতএব স্বর্গ ও নরক কবিদিগের কল্পনা মাত্র। তাঁহাদের মতে জীবদ্দশায় পুণ্যকর্ম্ম করিয়া যে স্বর্গোপম আত্মপ্রবাদ লাভ করা যায় অথবা পাপকর্ম্ম করিয়া যে নরকোপম আত্মগ্লানি অনুভব করা যায়, তাহাই প্রকৃত স্বর্গ ও নরক। ধর্ম্মাত্মাদিগের মনই স্বর্গ ও পাপাত্মাদিগের মনই নরক।

আবার কেহ কেহ বলেন, জীবাত্মা যাবতীয় সুখ দুঃখের একমাত্র ভোক্তা। বাহ্য ইন্দ্রিয়াদি থাকুক বা না থাকুক সংসারে অশেষ পুণ্যকর্ম্ম করাতে ইহা পরলোকে যে ব্রহ্মানন্দ ভোগ করে, তাহাই ইহার স্বর্গলাভ এবং অশেষ পাপকর্ম্ম করাতে ইহা যে আত্মগ্লানি অনুক্ষণ ভোগ করে, তাহাই ইহার নরকযন্ত্রণা।

যথার্থ বলিতে কি; এই স্থূল জগতের মূলে যে সূক্ষ্ম অধ্যাত্মজগৎ বিদ্যমান,

যাহা হইতে দেবগণ পরব্রহ্মের প্রতিনিধিস্বরূপ এ সংসার চালনা করিতেছেন, তাহাই আমাদের প্রকৃত স্বর্গ বা দেবলোক এবং তাহাই আবার পাপাত্মাদিগের নিকট নরককুণ্ডস্বরূপ বিবেচিত হয়।

যে জাতির যেরূপ অভিরুচি, পরলোক সম্বন্ধে সে জাতি সেইরূপ কল্পনা করে। অসভ্য শিকারী মানব মৃতব্যক্তিকে অস্ত্রশস্ত্রের সহিত কবর দিয়া ভাবে, পরলোকে পুনরায় ঐ ব্যক্তি শিকারে ব্যাপৃত হইবে। অর্দ্ধসভ্য কামাসক্ত মুসলমান ভাবে, পরলোকে প্রেতাত্মা স্বর্গের পরীদের সহিত বিবিধ ইন্দ্রিয়-সুখ ভোগ করিবে। সুসভ্য কৃতবিদ্য ভাবেন প্রেতাত্মা স্বর্গের ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডলে অশেষ জ্ঞানোন্নতি করিতে করিতে অপার আনন্দ ভোগ করিবে। ধর্ম্মাত্মা একেশ্বরবাদী ভাবেন, পরলোকে প্রেতাত্মা অনন্তকাল ঈশ্বরের উপাসনায় ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিবে। ধর্ম্মাত্মা হিন্দু ভাবেন, পরলোকে প্রেতাত্মার ভোজনের জন্য আতপ চাউল ও রম্ভার পিণ্ডদান না দিলে তিনি সুখে থাকিতে পারিবেন না। এইরূপ প্রেতাত্মা সম্বন্ধে নানা জাতি নানারূপ কল্পনা করিয়া থাকে।

খৃষ্ট ধর্ম্ম বলে, মৃত্যুর পর প্রেতাত্মা কবরে নিদ্রিত থাকে। পৃথিবীর প্রলয় হইবার পর প্রধান বিচার দিবসে (Great Judgment day) স্বর্গের বাদ্যধ্বনি শ্রবণে প্রেতাত্মাগণ কবর হইতে উত্থিত হইয়া ঈশ্বরের সন্নিধানে উপস্থিত হইবে এবং ইহজন্মকৃত পাপপুণ্যের হিসাব নিকাশ দিবে। তৎকালে ঈশ্বরের প্রিয়-পুত্র পরিত্রাতা ঈশাদেব খৃষ্টানদিগের জন্য স্বপিতার নিকট সুপারিশ করিলে, উহারা ইহজন্মকৃত সমস্ত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অনন্ত কাল স্বর্গসুখ ভোগ করিবে। কিন্তু অন্যান্য জাতি ঈশা ভজনা করে নাই বলিয়া নিরয়গামী হইবে। সেইরূপ মুসলমান ধর্ম্মও সমস্ত কাফেরদিগকে নিরয়গামী করে।

খৃষ্টধর্ম্মের মতে এ সংসার কেবল পরীক্ষাক্ষেত্র। আমরা স্বাধীন ইচ্ছায় বিভূষিত হওয়াতে নিজকৃত পাপপুণ্যের জন্য ঈশ্বরের নিকট সম্পূর্ণ দায়ী। ইহার মতে প্রত্যেক মানবে নূতন জীবাত্মা সৃষ্ট হয় এবং এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের পাপপুণ্যের জন্য জীবাত্মাকে অনন্ত কাল সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। এই দুইটী মত আদৌ যুক্তিসঙ্গত নয়। প্রত্যহ পৃথিবীতে লক্ষ লোক জন্ম পরিগ্রহ করে ও লক্ষ লোক মৃত হয়, সকলে যে নূতন জীবাত্মা লইয়া ইহসংসারে আইসে

এ কথা কি বিশ্বাস যোগ্য ? অথবা যে খৃষ্টধর্ম্ম বলে ছয় সহস্র বৎসর হইল, পৃথিবী সৃষ্ট হইয়াছে এবং দুই সহস্র বৎসর পরে ইহার প্রলয় ঘটিবে, উহার পক্ষে এরূপ অসঙ্গত উক্তি আদৌ বিচিত্র নহে।

পরলোক সম্বন্ধে হিন্দুধর্ম্মের মতামত স্বর্গীয় মহোচ্চ। জনসাধারণকে ধর্ম্ম-পথে অধিক অগ্রসর করাইবার জন্য এ ধর্ম্মও অন্যান্য ধর্ম্মের ন্যায় নরকের ভীষণ দৃশ্য দেখায়; তদ্ভিন্ন উহাদিগকে পাপপথে আরও অধিক সংযত রাখিবার জন্য ইহা আবার নিকৃষ্টযোণিভ্রমণ উপদেশ দেয়। ইহার মতে মৃত্যুর পর জীবাত্মা দেবলোকে বা স্বর্গে কিছুকাল শান্তি সুখ ভোগ করিবার পর পুনরায় ইহলোকে বা অন্য কোন লোক জন্মগ্রহণ করে।

এ ধর্ম্ম বলে, তুমি এ সংসারে একা এসেছ, একাই যাবে, রিক্ত হস্তে এসেছ রিক্ত হস্তে চলে যাবে। দারাপুত্র ও ধনদৌলত যাহাদের জন্য এত হুড়াহুড়ি ও দৌড়াদৌড়ি, সকলই পড়িয়া থাকিবে। কেহই সাথের সাথী হবে না। যা করে গেলে, তাই কেবল সঙ্গে যাবে। কালসমুদ্রে তৃণ-বৎ ভাস্‌তে ভাস্‌তে এ জম্বুদ্বীপে এসেছ ! আবার কালসমুদ্রে ভাস্‌তে ভাস্‌তে অন্য কোন দ্বীপে চলে যাবে। কে কোথায় যাবে, তাহা কেহ বলিতে পারে না।

পরলোকযুষাং স্বকর্ম্মভিঃ
গতয়ো ভিন্নপথাহি দেহিনাম্।

(রঘুবংশং)

"দেহধারী মানবগণ পরলোকগত হইলে নিজ নিজ কর্ম্মফলবশতঃ ভিন্ন ভিন্ন পথে গিয়া ভিন্ন ভিন্ন গতি প্রাপ্ত হয়।" পঞ্চভূতের দেহ পাইয়া পঞ্চ তন্মাত্র লয়ে এ ভবে খেল্‌তে এসেছে। খেলা সাঙ্গ হলে সকলকে ফেলে যেতে হবে। যখন রবিসুতের দূতে বাঁধিবে, তখন সকলের সম্মুখ হতে টেনে হিঁচ্‌ড়ে লয়ে যাবে। শেষে একটা বাঁশের ঠাট্‌রী. একগজ কাপড় ও একটা কলসী দিয়ে আত্মীয় স্বজন তোমায় চিরবিদায় দিবে। ভবের সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ এই পর্য্যন্ত। তবে কেন মিছে মায়ায় ভুলে আছ ?

হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্ম পূর্ব্বজন্মে ও পরজন্মে বিশ্বাস করে।

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্যচ।

(গীতা)।

"যিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহার মৃত্যু নিশ্চিত ও অপরিহার্য্য। যিনি মৃত হন, তাঁহার পুনর্জ্জন্মও নিশ্চিত।

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥
(গীতা)।

"অনেক জন্ম জন্মান্তরবাদ জ্ঞানীলোক আমাকে প্রাপ্ত হন। সকলই বাসুদেব এ জ্ঞান যে মহাত্মার জন্মে, তিনি এ সংসারে সুদুর্লভ।"

পুনর্জ্জন্ম সম্বন্ধে প্রকৃতিজগৎ হইতে আমরা কিরূপ প্রমাণ পাইয়া থাকি? এ সংসারে সকলই চক্রাকারে পরিভ্রমণ করিতেছে। জীবনের সুখদুঃখ বল, দিবারাত্রি বল, ষড়ঋতু বল, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রগণ বল, সকলই চক্রবৎ পরিভ্রমণ করিতেছে। দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর পুনরায় দিন আসিতেছে। যে বারিবিন্দু আজ সমুদ্রের গর্ভস্থিত, কল্য সূর্য্যরশ্মি কর্ত্তৃক শোষিত হইয়া আকাশে মেঘরূপে দেখা দিতেছে, পুনরায় সলিলাবস্থায় পতিত হইয়া সমুদ্রে মিলিত হইতেছে। যে ধূমকেতু আজ আকাশে উদীয়মান, উহা কিছুকালের জন্য অদৃশ্য হইয়া পুনরায় আকাশে দেখা দিতেছে। যে সৌরশক্তি আজ উদ্ভিজ্জদেহে অব্যক্ত ভাবে নিহিত ও কল্য জীবদেহে ব্যক্ত অবস্থায় প্রকটিত, দেহনাশে উহা পুনরায় সূর্য্যরশ্মিতে মিলিত হয়। সেইরূপ যে জীবাত্মা আজ দেহনিবদ্ধ হইয়া সংসারে অবতীর্ণ, দেহনাশেও উহা কিছুকাল এদিক, ওদিক ঘুরিয়া পুনরায় দেহবদ্ধ হইবে।

বাসনাদ্বারা কর্ম্মবন্ধে জড়িত হইয়া জীবাত্মা ইহলোকে বা অন্যান্য লোকে বিচরণ করে। যে লোকে ইহা যে দেহ ধারণ করে, তাহা ইহার কর্ম্মদেহ মাত্র। কেবল প্রাক্তন কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য ইহার সে দেহধারণ। যেমন জপ-মালায় এক একটী গুটিকা সূত্র দ্বারা আবদ্ধ থাকে, সেইরূপ এক জীবাত্মাই ভিন্ন ভিন্ন লোকে বিভিন্ন আমিত্বজ্ঞান পাইয়া বিভিন্ন রূপ ধারণ করিলেও কর্ম্ম বন্ধরূপ এক দুশ্ছেদ্য সূত্র দ্বারা আবদ্ধ থাকে। এই কর্ম্মসূত্রের বন্ধনবশতঃ ইহার এত জন্মপরিগ্রহ, এত সুখদুঃখভোগ ও এত উন্নতিলাভ। খৃষ্টধর্ম্ম যাহাই বলুক না কেন, নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক জীবাত্মাই যে কর্ম্মফলবশতঃ ইহলোকে বা

অন্যান্য লোকে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করে এবং ইহার কর্ম্মফল যে অধ্যাত্ম্য-বিজ্ঞানের অমোঘ সত্য, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

যেমন ব্যক্তিবিশেষ দিবাভাগে নানাকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়া নিশাগমে বিশ্রামসুখ ভোগ করে, পুনরায় প্রভাত হইলে আবার নানাকর্ম্মে ব্যাপৃত হয়, সেইরূপ যে জীবাত্মা আজ দেহনিবদ্ধ হইয়া ইহসংসারে প্রাক্তন কর্ম্মফল ভোগ করিতেছে, সেই জীবাত্মা মৃত্যুর পর কিছু কাল দেবলোকে বা স্বর্গে বিশ্রাম সুখ ভোগ করত পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মফল ভোগের জন্য পুনরায় দেহ পরিগ্রহ করিবে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেন—

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং।
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
(গীতা)

"তাঁহারা পুণ্যবলে বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয়ে পুনরায় মর্ত্ত্য-লোকে আগমন করেন।" ইহাতে বুঝা উচিত, যতদিন পুণ্যবল থাকে, ততদিন জীবাত্মা দেবলোকে অবস্থিতি করিবে; পরে পুণ্যক্ষয় হইলে ইহা নিজের কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য মর্ত্ত্যলোকে আগমন করিবে।

কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, মৃত্যুর পর জীবাত্মা দেবলোকে কি ভাবে থাকে? তথায় ইহা কি কেবল ব্রহ্মোপাসনা করিতে করিতে অপার ব্রহ্মানন্দ ভোগ করে, না অশেষ জ্ঞান লাভ করিতে করিতে বিশুদ্ধ আনন্দনীরে অভিষিক্ত হয়? সত্য বটে, ব্রহ্মানন্দ ও জ্ঞানানন্দ আমাদের পরম সাত্ত্বিক সুখ, তথাচ উহারা সর্ব্বথা মায়াজনিত। কোনপ্রকার ঐহিক সুখে আমাদের প্রকৃত স্বস্তি বা শান্তি নাই। কিন্তু সুষুপ্তির অবস্থায় যখন আমরা অজ্ঞানে আচ্ছন্ন থাকি, তাহাই আমাদের প্রকৃত শান্তি। প্রকৃত শান্তি যাহাকে বলে, তাহা আমরা সুষুপ্তির অবস্থায় ভোগ করি। সেইরূপ যখন একজন যোগী সমাধিস্থ হন, তখন মনের ক্রিয়া রহিত হওয়াতে আত্মা ব্রহ্মানন্দে পূর্ণ থাকে। ইহাতে অনুমান করা উচিত, মৃত্যুর পর দেবলোকে যখন জীবাত্মা দেহ, লিঙ্গশরীর ও মন হইতে বিচ্যুত হইয়া আমিত্বজ্ঞান ভুলিয়া যায়, তখন ইহা আনন্দময় কোষের সহিত সংযুক্ত থাকায় ব্রহ্মানন্দে পূর্ণ থাকে। যেমন দিবসের গাঢ় পরিশ্রমের

পর নিদ্রা একান্ত আবশ্যক, সেইরূপ ইহলোকের এত কষ্টরাশি ও যন্ত্রণারাশি ভোগ করিবার পর নূতন অবস্থায় নূতন কর্ম্মদেহ পাইয়া কর্ম্মজীবন আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে দেবলোকে জীবাত্মার এইরূপ বিশ্রামসুখভোগ একান্ত আবশ্যক।

আবার অপঘাতে মৃত্যু ও নানা কারণবশতঃ জীবাত্মার প্রেতত্ব যায় না। তখন ইহা লিঙ্গশরীর ও মন দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া ও আমিত্বজ্ঞান না ভুলিয়া গিয়া সূক্ষ্মরূপে আকাশ মার্গে কিছুকাল ঘুরিয়া বেড়ায়, কখন কখন লোকের দৃষ্টিপথে পতিত হয় এবং আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবকে আহ্বান করে। প্রকৃতির মহাকবি সেক্ষপীয়ার বলেন, হ্যামলেট তদীয় পিতাকে প্রেতরূপে এইভাবে দেখেন, এমন কি, তাঁহার সহিত কথোপকথন করেন। শুনিতে পাই, প্রেততত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা প্রেতাত্মাদিগের সহিত কথোপকথন করেন।

কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, স্বর্গ বা দেবলোক কোথায়? এ কথার উত্থাপনে সকলে উর্দ্ধদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে মাত্র। বস্তুতঃ স্বর্গ যে কোথায়, তাহা কেহ বলিতে পারে না। জরায়ুজীবনে ও পার্থিব জীবনে যেরূপ প্রভেদ, ইহলোকে ও পরলোকে সেইরূপ প্রভেদ। যতদিন মানবভ্রূণ জরায়ুগর্ভে অবস্থিতি করে, ততদিন ইহা পৃথিবীর বিষয় ভাবিতে পারে না, কারণ ইহার সে মন তখনও স্ফুরিত হয় নাই। সেইরূপ মর্ত্ত্যের লোক স্বর্গের বিষয় আদৌ ভাবিতে পারে না। ইহা আমাদের জ্ঞান ও ইন্দ্রিয়গণের অগোচর। একমাত্র মৃত্যুরূপ দ্বার দিয়া সেই অনাবিষ্কৃত দেশে প্রবেশ করা যায়।

দেবলোকে শান্তিসুখে ভোগ করিতে করিতে যখন জীবাত্মার কর্ম্মফল ফলোন্মুখ হয়, তখন ইহা পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। যে লোকে ও যে অবস্থায় পতিত হইলে কর্ম্মদেবি ইহার কর্ম্মফল সুচারুরূপে ও সুশৃঙ্খলতার সহিত বিতরণ করিবেন, ইহা সেই লোকে ও সেই অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে। এ বিষয়ে প্রকৃতির কি নিয়ম, তাহা কীটাণুকীট মানব কি বুঝিবে? কেহ কেহ অনুমান করেন, এক সৌর জগতের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন গ্রহে ও উপগ্রহে এক জাতীয় জীবাত্মা সকল জন্মগ্রহণ করে। এজন্য শাস্ত্রে বলে এক দেহ হইতে দেহান্তরে জন্ম লইবার পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রথমে জীব (Incarnating monad)

সূর্য্যমণ্ডল অধিকার করে এবং উহার রশ্মি যোগে এক গ্রহ হইতে অপর গ্রহে চলিয়া যায়।

এই প্রকারে জীবাত্মা পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করাতে ভিন্ন ভিন্ন মায়াজগতের মায়াজনিত জ্ঞান লাভ করিতে করিতে এবং মায়াজনিত সুখদুঃখ ভোগ করিতে করিতে ইহা ক্রমোন্নতি লাভ করিতে থাকে; পরিশেষে ইহা ষড়ৈশ্বর্য্য লাভ করত দেবতায় পরিণত হয়। তৎকালে ইহা দেবতাদিগের ন্যায় পরব্রহ্মের প্রতিনিধিস্বরূপ মায়াজগৎ শাসন করে। ইহাই অনন্তৈশ্বর্য্যশালী জীবাত্মার চরমোৎকর্ষ। ইহাই মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির পরাকাষ্ঠা। বিজ্ঞানোপদিষ্ট এ জগতের ক্ষণস্থায়ী আধিভৌতিক উন্নতিলাভ অবিনশ্বর জীবাত্মার চরমোৎকর্ষ নহে। অতএব নিশ্চয় জানিবে, ইহার ভবিষ্যৎ অনন্তকাল ব্যাপী। এই অনন্ত কালে ইহা অনন্ত জ্ঞানোপার্জ্জন, অনন্ত সুখ ভোগ ও অনন্ত ঐশ্বর্য্য লাভ করিবে।

নির্ব্বাণ ও মুক্তি।

নির্ব্বাণ শব্দের প্রকৃত অর্থ কি, তাহা এক দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান আবশ্যক।

মনে কর, একবিন্দু সলিলকণা সূর্য্যরশ্মি কর্তৃক শোষিত হইয়া আজ মহাসমুদ্রের গর্ভ হইতে উত্থিত হইল। এখন সেই বারিবিন্দু এ জগতে কতকাল কতস্থানে পরিভ্রমণ করিতে করিতে পুনরায় মহাসমুদ্রে লীন হইবে, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। সেই বারিবিন্দু কখন বাষ্পাকারে, কখনও বা মেঘাকারে বায়ুবেগে তাড়িত হইয়া কত দেশ দেশান্তর দর্শন করে, অথবা আকাশে কত চিত্র বিচিত্র রূপ দেখায়; কখনও বা ধরায় বৃষ্টিরূপে পতিত হইয়া নদ, নদী, হ্রদ, পল্লোল ও সরোবর আশ্রয় করে, কখনও বা ভূগর্ভে, উদ্ভিজ্জদেহে ও জীবদেহে সঞ্চরণ করত প্রকৃতির নানা কার্য্য সম্পাদন করে। এইরূপে সেই বারিবিন্দু নানাস্থানে, নানাদেহে ও নানা অবস্থায় পরিভ্রমণ করিবার পর পুনরায় মহাসমুদ্রে মিলিত হইয়া যায়।

জীবাত্মার গতিও অবিকল বারিবিন্দুর ন্যায়। সৃষ্টির প্রারম্ভে মহার্ণবরূপ পরব্রহ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া উহা নিজ কর্ম্মফল কর্তৃক চালিত হইয়া কত বিভিন্ন লোকে পরিভ্রমণ করে, কত বিভিন্ন অবস্থায় পতিত হয়, কত বিভিন্ন সুখদুঃখের

ভাগী হয় ও কত বিভিন্ন প্রকার জ্ঞান অর্জ্জন করে, তাহার কিছুমাত্র ইয়ত্ত নাই এবং কত যুগ যুগান্তর বাদ ইহা পরব্রহ্মে মিলিত হইবে, তাহাও কেঃ জানেন না।

পরব্রহ্মে জীবাত্মার পুনর্মিলনকে নির্ব্বাণ কহে। জীবাত্মা নামে যে মহানল এতকাল সংসারে প্রজ্জ্বলিত ছিল, তাহা স্বোৎপত্তিস্থলে লীন হইয়া নিবিয় গেল; অথবা যে কর্ম্মফলরূপ মহানলে ইহা এতকাল দগ্ধ হইতেছিল, তাহ শেষ হওয়াতে মহাগ্নি নিবিয়া গেল এবং ইহাও পরব্রহ্মে মিলিত হইল। আর যাঁহারা বলেন, জীবদ্দশায় যে জীবাগ্নি প্রজ্জলিত ছিল, মৃত্যুর সময় সেই মহাগ্নি নিবিয়া যায়, তাঁহারা নির্ব্বাণের কদর্থ করেন।

নির্ব্বাণাবস্থায় জীবাত্মার পৃথক অস্তিত্ব থাকে না। যেমন মহাপ্রলয়ে বিশ্ব পরব্রহ্মে লীন হওয়াতে ইহার অস্তিত্ব আদৌ থাকে না; সেইরূপ নির্ব্বাণেও জীবাত্মার পৃথক অস্তিত্ব আদৌ থাকে না; ইহাও পূর্ণব্রহ্মসনাতনে মিলিত হইয়া পূর্ণব্রহ্মসনাতন হইয়া যায়। বৌদ্ধ ধর্ম্মমতে মহাত্মা বুদ্ধদেব অসাধারণ সাধন বলে মৃত্যুর পর এইরূপ নির্ব্বাণপদ প্রাপ্ত হন; এজন্য তিনি বৌদ্ধজগতে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন বলিয়া পূজিত হন। যে সকল ধর্ম্ম জগতে অদ্বৈতবাদী এবং যাহাদের মতে জীবাত্মায় ও পরমাত্মায় কোনরূপ ভেদাভেদ নাই, উহারা জীবাত্মার নির্ব্বাণ স্বীকার করে এবং উহাদের মতে নির্ব্বাণপদ লাভ ইহার চরমোৎকর্ষ সাধন। এক নির্ব্বাণ ব্যতীত সকল অবস্থায় জীবাত্মা নিজ কর্ম্মফলানুসারে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতেও সুখদুঃখ ভোগ করিতে বাধ্য।

নির্ব্বাণ সম্বন্ধে জগতে দুইপ্রকার মতামত প্রচলিত আছে। কেহ কেহ বলেন, নির্ব্বাণ প্রকৃতির অপরিহার্য্য পরিণামবিশেষ। যৎকালে মহাপ্রলয় ঘটে, তৎকালে ব্রহ্মাদি দেবগণ ও অন্যান্য ভূতগ্রাম পরব্রহ্মে লীন হইয়া নির্ব্বাণপদ লাভ করে; তদ্ভিন্ন মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বে কেহই নির্ব্বাণপদ লাভ করিতে পারে না। তাঁহাদের মতে জন্মজন্মান্তর বাদ অসাধারণ সাধন বলে জীবাত্মা ষড়ৈশ্বর্য্যশালী দেবমণ্ডলীর ভিতর উন্নীত হইলেও ইহা মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বে প্রকৃত নির্ব্বাণপদ পায় না, কিন্তু পরম ধামে থাকে।

আবার কেহ কেহ বলেন, একমাত্র অসাধারণ যোগসাধন বা তপঃসাধন বলে জীবাত্মা কোন এক জন্মে বা কয়েক জন্মে নির্ব্বাণপদ পাইতে পারে,

যেমন বুদ্ধদেব যোগসাধনবলে মৃত্যুর পর নির্ব্বাণপদ প্রাপ্ত হন। যে কর্ম্মসূত্র দ্বারা জীবাত্মা আবদ্ধ, অশেষ সাধন বলে সেই কর্ম্মবন্ধন ছেদন করিতে পারিলে ইহাকে কোন লোকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না এবং ইহাই ইহার নির্ব্বাণপদলাভ। বৌদ্ধধর্ম্মে নির্ব্বাণের অর্থ এই প্রকার এবং বৌদ্ধ ভিক্ষু ভিক্ষুণীগণ অন্তে নির্ব্বাণলাভের জন্য আজীবন একাগ্রচিত্তে যোগসাধন করিয়া থাকেন।

যে সকল ধর্ম্ম জগতে দ্বৈতবাদী এবং যাহারা জীবাত্মায় ও পরমাত্মায় সম্পূর্ণ পার্থক্য স্বীকার করে, উহারা জীবাত্মার মুক্তি বা মোক্ষলাভ ধর্ম্মসাধনার চরমফল বলিয়া উপদেশ দেয়। মানবজন্ম গ্রহণ করাতে জীবাত্মা ইহার আধ্যাত্মিক অধঃপতনবশতঃ বা আদিপুরুষের পতনবশতঃ যে সকল সাধারণ পাপ তাপে জড়িত হয়, তাহা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া যাহাতে ইহা স্বর্গধামে নিরবচ্ছিন্ন সুখ ভোগ করে ও নরকযন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পায়, অথবা যে কর্ম্মফলানুসারে ইহা পুনঃ পুনঃ ইহলোকে বা অন্যান্য লোকে জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য, সেই কর্ম্মফল সাধনবলে লয় পাওয়াতে যখন ইহাকে কোন লোকে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না এবং স্বর্গলোকে দেবগণের মধ্যে থাকিয়া নিরবচ্ছিন্ন সুখ ভোগ করে, তখন ইহা মুক্তি লাভ করে বা মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়।

মোক্ষপদপ্রাপ্তি জীবাত্মার অশেষ সাধন সাপেক্ষ। যোগাভ্যাস ও তপশ্চরণ করিতে করিতে পরব্রহ্মের নির্গুণ উপাসনা দ্বারা হউক, অসাধারণ ধর্ম্মাচরণ করিতে করিতে সগুণ ঈশ্বরোপাসনা দ্বারা হউক, অথবা একান্ত ভক্তিভাবে ভগবানের সাকার মূর্ত্তি পূজন দ্বারা হউক, যে কোন সাধনবিধি অবলম্বন করিয়া যদি জীবাত্মা পরমার্থজ্ঞান লাভ করিতে করিতে ভগবানের তন্ময়ত্ব লাভ করিতে পারে, তবে ইহা মোক্ষপদ লাভের উপযুক্ত হয়।

হিন্দু ও বৌদ্ধ শাস্ত্র মতে বিষয়বাসনা জীবাত্মার জন্মপরিগ্রহের মূলীভূত কারণ। এইজন্য এই বিষয় বাসনাকে যথাসাধ্য সংযত করিয়া সংসারের সকল বিষয়ে প্রকৃত বৈরাগ্য অবলম্বন করত অশেষ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে ইহা কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরম ধামে যায় ও পরমাত্মা প্রাপ্ত হয়। এই প্রকারে জন্মে জন্মে অশেষ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে পরমার্থজ্ঞান মনে উদিত হয়।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেন :—

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান

মাং প্রপদ্যতে।

(গীতা)

যিনি জন্ম জন্মান্তরবাদ সাধনবলে পরমার্থজ্ঞান লাভ করেন, তিনি আমাকে পান।

এখন ভগবানের পরম ধাম কি প্রকার, তাহা একবার শ্রবণ করুন।

ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ

যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম,

(গীতা)

"যেখানে চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি দীপ্তি পায় না (যাহা সূক্ষ্ম ও ইন্দ্রিয়াতীত) এবং যেখানে গমন করিলে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না, সেই লোক আমার পরম ধাম।" শাস্ত্রমতে ব্রহ্মলোক, গোলক প্রভৃতি দেবলোক, ভগবানের পরম ধাম।

জীবাত্মা পরম ধামে পৌছিলে ইহা দেবতাদিগের ন্যায় অত্যুন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তখন ইহা ষড়ৈশ্বর্য্য ও অনন্ত শক্তিতে বিভূষিত হইয়া দেবতাদিগের ন্যায় ভূতাদি শাসন করিতে থাকে। এতকাল ইহা শাসিতবর্গের মধ্যে ছিল এবং নিজ কর্ম্মফল ভোগের জন্য দেবতাদিগের হস্তে ক্রীড়াপুত্তলি ছিল। পরমধামে যাইয়া ইহা শাসকবৃন্দের মধ্যে উন্নীত হয় এবং দেবতাদিগের ন্যায় স্থুলসূক্ষ্ম বিবিধ জগৎ শাসন করিতে থাকে। এই প্রকারে অসাধারণ সাধনবলে কোটী কোটী বৎসরে জীবাত্মার ক্রমোন্নতি হইয়া থাকে।

দেখ, অবিনশ্বর জীবাত্মার ভবিষ্যৎ কত সমুজ্জ্বল ও আশাপ্রদ! যে জীবাত্মা আজ ক্ষণবিধ্বংসী মানবদেহে নিবদ্ধ হইয়া সংসারের বিবিধ জ্বালা যন্ত্রণায় অস্থির ও ইহার নানা ঝঞ্ঝাবাতে ও তরঙ্গে সদা আলোড়িত, সেই জীবাত্মা জন্ম জন্মান্তরে বিভিন্ন লোকের মায়াজ্ঞান লাভ ও মায়াসুখদুঃখ ভোগ করিতে করিতে ক্রমোন্নত হইবে এবং অশেষ সাধনবলে ষড়ৈশ্বর্য্যশালী দেবতায় পরিণত হইয়া ভূতাদি শাসন করিবে, ইহা অপেক্ষা জীবের ভাগ্য আর অধিক

সুপ্রসন্ন কি প্রকারে হইতে পারে? জীবাত্মার অনন্ত উন্নতির কথা ভাবিলে কাহার না হৃদয়চকোর পরমানন্দে নৃত্য করিয়া উঠিবে? রে অধ্যাত্ম বিজ্ঞান! ধন্য তোমার উপদেশ! ধন্য তোমার আশাপ্রদ কাহিনী! তুমি অবিনশ্বর জীবাত্মার অনন্ত উন্নতির কথা যাহা নির্দ্দেশ কর, তাহার সহিত তুলনা করিলে, যে জড়বিজ্ঞান আত্মার অস্তিত্ব ও অমরত্ব ঘুচাইয়া এই নগণ্য মেদিনীর বাহ্যাড়ম্বরবৃদ্ধি ও বাহ্য শ্রীবৃদ্ধিসাধন মানবজীবনের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া উপদেশ দেয়, উহার কথা কিরূপ তুচ্ছ ও হেয়?

মুক্তিসম্বন্ধে হিন্দু ধর্ম্মের উপদেশ স্বর্গীয় ও মহোচ্চ। কি নির্গুণ পরব্রহ্মের স্বরূপ, কি জ্ঞানযোগ, কি ভক্তিযোগ, কি কর্ম্মযোগ, সকল বিষয়ে এ ধর্ম্ম যেমন পরাকাষ্ঠা দেখায়, সেইরূপ মুক্তি বিষয়ে ইহা যাহা কল্পনা করে, তাহা ধর্ম্মজগতে অতুলনীয়। কোন দেশের কোন ধর্ম্ম কোন কালে মুক্তির এমন স্বর্গীয় ভাব স্ফুরণ করিতে পারে নাই। বোধশক্তি থাকে, স্বধর্ম্মের মুক্তিতত্ত্ব বুঝিয়া নিজের বোধশক্তি চরিতার্থ কর; আর না হয় সকলই এ ধর্ম্মের কুসংস্কার বলিয়া মনের সাধে উড়াও।

শাস্ত্রানুসারে মুক্তি পাঁচ প্রকার যথা:—

(১) সাযুজ্য।

(২) সারূপ্য।

(৩) সালোক্য।

(৪) সার্ষ্টি।

(৫) সামীপ্য।

সাযুজ্য মুক্তি লাভ হইলে জীবাত্মা পরমাত্মায় সংযুক্ত বা লীন হইয়া যায়। নির্ব্বাণের সহিত ইহার কোনরূপ প্রভেদ নাই।

সারূপ্য মুক্তি লাভ হইলে জীবাত্মা পরব্রহ্মের স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ) অনন্ত ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া ইহা সাক্ষাৎ পরব্রহ্মস্বরূপ হয়; কিন্তু এ অবস্থায় পরব্রহ্ম হইতে ইহার পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে, নির্ব্বাণের ন্যায় পরব্রহ্মে মিলিয়া মিশিয়া যায় না।

সালোক্য মুক্তি লাভ হইলে জীবাত্মা পরব্রহ্মের সহিত পরম ধামে থাকে ও অপার ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিতে থাকে।

সার্ষ্টি মুক্তি লাভ হইলে জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত সমান ঐশ্বর্য্য ভোগ করে। যেমন পরব্রহ্মের অনন্ত ঐশ্বর্য্য, সেইরূপ জীবাত্মাও অনন্ত সাধনবলে কালে অনন্ত শক্তি ও অনন্ত জ্ঞান লাভ করিয়া পূর্ণব্রহ্মসনাতন হইয়া থাকে।

সামীপ্য মুক্তি লাভ হইলে, জীবাত্মা পরমাত্মার সমীপে বা সন্নিধানে অবস্থিতি করে। যেমন রাজার অনুচরবর্গ রাজপ্রসাদ লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়, সেইরূপ জীবাত্মাও অনন্ত সাধন বলে ভগবানের পার্শ্ববর্ত্তী অনুচর হইয়া অপার ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিতে থাকে।

নৈষ্ঠিক হিন্দু জীবাত্মা ও পরমাত্মা, উভয়কে অদ্বৈতভাবে দেখেন বলিয়া তিনি নির্ব্বাণ অথবা সাযুজ্য ও সারূপ্য মুক্তিলাভকে তাঁহার ধর্ম্মসাধনার চরম ফল মনে করেন। আবার তিনি উভয়কে দ্বৈতভাবে দেখেন বলিয়া সালোক্যাদি মুক্তিলাভ তাঁহার সাধনার চরমফল জ্ঞান করেন। এখন এক বার ভাব দেখি, তাঁহার সাধনার প্রধান উদ্দেশ্য কি? তিনি সাধন বলে অনন্তশক্তিশালী সর্ব্বজ্ঞ জীবাত্মার পূর্ণ আধ্যাত্মিক স্ফূর্ত্তি দ্বারা যে কেবল ব্রহ্মলোকে যাইতে বা পরব্রহ্মের সমীপে থাকিতে অভিলাষ করেন, তাহা নহে; কিন্তু তিনি অনন্ত কালে অনন্ত সাধন বলে অনন্ত ঐশ্বর্য্যে বিভূষিত হইয়া স্বয়ং পূর্ণব্রহ্মসনাতন হইতে ইচ্ছা করেন। যে জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ, এই প্রকারে উহার পূর্ণ আধ্যাত্মিক উন্নতি কল্পনা করা উচিত।

এ জগতে এক সনাতন হিন্দুধর্ম্ম ব্যতীত অন্যান্য ধর্ম্ম মনের এমন উচ্চাভিলাষ বা উচ্চাকাঙ্ক্ষা স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই। উহারা না হয় অশেষ ধর্ম্মাচরণ করিয়া স্বর্গলোকে বা ঈশ্বরের সমীপে যাইতে অভিলাষ করে; কিন্তু আমরা কালে স্বয়ং ঈশ্বর হইব এরূপ উচ্চাশা কদাচ তাঁহাদের মনে স্থান পায় না। অপর পক্ষে পূর্ণব্রহ্মসনাতন হইবার জন্য নৈষ্ঠিক হিন্দু ইহসংসারে পরব্রহ্মের পূর্ণ অবতার শ্রীহরির প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক তন্ময়ত্ব লাভে একান্ত যত্নবান হন। তন্ময়ত্ব কাহাকে বলে খৃষ্টাদি ধর্ম্ম তাহা আদৌ বুঝিতে পারে না।

এস্থলে যাঁহারা খৃষ্ট ধর্ম্মের অশেষ প্রশংসা করেন, তাহাদের ভ্রম দূর

করিবার জন্য তদুপদিষ্ট মুক্তির বিষয় কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা আবশ্যক। ইহার মতে এ সংসার কেবল পরীক্ষাক্ষেত্র। আমরা স্বাধীন ইচ্ছায় বিভূষিত বলিয়া পাপপুণ্যের জন্য ঈশ্বরের নিকট সম্পূর্ণ দায়ী। এজন্য এক বিচার দিন (Great Judgment day) আসিবে; সে দিন সকলকে ইহজন্মকৃত পাপ পুণ্যের হিসাব দিতে হইবে। জীবনে যত পাপ করা যায়, একমাত্র ঈশা ভজনা করিলে উহার জন্য আমাদিগকে নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না। পরমেশ্বরের প্রিয়পুত্র ঈশার অনুগ্রহে সকল পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া স্বর্গলোকে নিরবচ্ছিন্ন সুখ ভোগ করার নাম মানবের মুক্তিলাভ।

যে খৃষ্টধর্ম্ম মানবের আধ্যাত্মিক পতনের বিকৃত অর্থ করিয়া প্রচার করে, সে ধর্ম্ম তাঁহার মুক্তিরও বিকৃত অর্থ করিতেছে। যে ধর্ম্ম সয়তানের প্রলোভনে জ্ঞানবৃক্ষের নিষিদ্ধ ফলাস্বাদনে সমগ্র মানবজাতির পতন ঘটাইয়া যাবতীয় শোকতাপ সংসারে আনয়ন করে, সে ধর্ম্ম আবার যে মহাত্মা ধর্ম্ম প্রচারোদ্দেশে ক্রুসে বিদ্ধ হইয়া হত হন, তিনি জগতের মঙ্গলের জন্য নিজ প্রাণ বিসর্জ্জন করেন ভাবিয়া তাঁহাকে পতিত মানবের একমাত্র পরিত্রাতা বা মুক্তিদাতা বলিয়া ঘোষণা করে। ঈশার ন্যায় শত শত যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ হিন্দু ও বৌদ্ধজগতে আবির্ভূত হইয়া যোগবলে অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ দেখাইয়াছেন; কিন্তু কেহই মানবের পরিত্রাতা বলিয়া কোথাও পূজিত হন নাই।

এ ধর্ম্মের মতে রবিবাসরে একবার গির্জ্জায় গিয়া মুক্তিদাতাকে মধ্যস্থ রাখিয়া দুইটা কথায় ঈশ্বরের উপাসনা করিলে প্রকৃত ধর্ম্মসাধন হয় এবং অন্তে মুক্তিলাভ করা যায়। যেমন ইহার সাধনবিধি যৎসামান্য, তেমনি ইহার মুক্তিবিধিও যৎসামান্য। কি ঐশ্বর্য্যের বিষয়, পূর্ব্বে সুশিক্ষিত সম্প্রদায় কি ভাবিয়া ও কি দেখিয়া সনাতন ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ঐ অপকৃষ্ট ধর্ম্মের ক্রোড়দেশে আশ্রয় লইবার জন্য ব্যগ্র হইত? তাঁহারা যদি স্বধর্ম্মের মহোচ্চভাব হৃদয়ঙ্গম করিতেন, তাঁহারা কি ঐহিক সুখ ভোগের জন্য নিজ ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া এমন জাঁহান্নমে যাইতেন?

যদি বল বুদ্ধদেব যেমন বৌদ্ধধর্ম্মে পরব্রহ্মের প্রতিনিধি এবং শ্রীকৃষ্ণ যেমন

হিন্দুধর্ম্মে পরব্রহ্মের প্রতিনিধি, সেইরূপ যীশুখৃষ্টও খৃষ্টধর্ম্মে পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি, তবে কেন ঐ ধর্ম্মের নিন্দা করিয়া নিজ লেখনী অপবিত্র করিতেছ? এ দেশের সুশিক্ষিত সম্প্রদায়কে স্বধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝাইবার জন্য অপর ধর্ম্মের এমন দোষ দেখান হইল। অপরাধ হইয়া থাকে, পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন।

ঈশ্বরপ্রকটিত ধর্ম্মশাস্ত্র।

সংসারে ধর্ম্মমাত্রেই প্রচার করে, ইহার আদ্যগ্রন্থ ঈশ্বরপ্রকটিত। হিন্দুদিগের চতুর্ব্বেদ, পারসীকদিগের জেন্দাভেস্তা, ইহুদিদিগের পুরাতন বাইবেল, বৌদ্ধদিগের ত্রিপিটক, খৃষ্টানদিগের নূতন বাইবেল, মুসলমানদিগের কোরাণ, সকলই ঈশ্বরপ্রকটিত বলিয়া স্ব স্ব সমাজে চিরদিন পূজিত হইতেছে। সকল দেশের জনসাধারণ স্ব স্ব ধর্ম্মগ্রন্থের উপর আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন পূর্ব্বক উহার বাক্য ও উপদেশ সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া পালন করে। ঈশ্বরের বা তদীয় প্রতিনিধির উপর তাহাদের যেরূপ প্রগাঢ় ভক্তি ও বিশ্বাস, আদ্যধর্ম্মগ্রন্থের উপরও তাহাদের সেইরূপ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা দেখা যায়। বস্তুতঃ ইহার উপর তাহাদের তাদৃশ ভক্তি ও বিশ্বাস না থাকিলে তাহারা কি প্রকারে ইহার আদেশ পালন করিয়া ধর্ম্মপথে অধিক অগ্রসর হইতে পারে? "যাদৃশী ভাবনা যস্য, সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।" মুসলমানদিগের ভিতর দেখা যায়, কোরাণসরিফ যাহা আদেশ করে, তাহা তাহারা সর্ব্বান্তঃকরণে ও প্রাণপণে পালন করে। এমন ধর্ম্মান্ধ জাতি জগতে আর দ্বিতীয় নাই।

এখন জিজ্ঞাস্য, এই সকল আদ্য ধর্ম্মশাস্ত্র কি সত্য সত্যই ঈশ্বরপ্রকটিত? ঈশ্বর কি স্বয়ং সিনাই পর্ব্বতের উপর প্রজ্বলিত দাবাগ্নির মধ্যে আবির্ভূত হইয়া মুষাদেবকে দশ মহাজ্ঞা (Ten commandments) প্রদান পূর্ব্বক জনসমাজে তাহা প্রচার করেন? তিনি কি প্রিয়পুত্র ঈশাদেবের শ্রীকণ্ঠে অধিষ্ঠিত হইয়া তদীয় মুখারবিন্দ হইতে স্বর্গীয় মহোচ্চ ধর্ম্মোপদেশ নিঃসরণ পূর্ব্বক জনসমাজে তাহা প্রচার করেন? তিনি কি প্রিয় সুহৃৎ মহম্মদ দেবকে নিভৃতে কোরাণ সরিফ উপদেশ দেন?

বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত বলেন, মূর্খ জনসাধারণ যাহাই ভাবুক না কেন, ধর্ম্মের এ সকল রূপক কি বিজ্ঞানের সমক্ষে আর খাটিতেছে না এবং এ সকল কুসংস্কার সমাজ হইতে ক্রমশঃ দূরীভূত হইতে চলিল। তিনি আরও বলেন, এ সকল ধর্ম্মগ্রন্থ কদাচ ঈশ্বরপ্রকটিত হইতে পারে না। ইহারাও অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় ভ্রান্ত মানবরচিত। কেবল মাত্র স্ব স্ব ধর্ম্মগ্রন্থের উপর জনসাধারণের আন্তরিক ভক্তি ও বিশ্বাস উৎপাদনার্থ প্রত্যেক বৈশেষিক ধর্ম্ম কঠোর আবশ্যকতায় বাধ্য হইয়া ইহার আস্ত ধর্ম্মগ্রন্থকে ঈশ্বরপ্রকটিত বলিয়া চিরদিন প্রচার করিয়া আসিতেছে।

বিজ্ঞানের কথা ছাড়িয়া দিয়া এখন আসল কথা কি, তাহা বলা আবশ্যক। অনেকের মতে মূষ, বুদ্ধ, ঈশা, মহম্মদ প্রভৃতি মহাত্মাগণ পরব্রহ্মের শ্রেষ্ঠ অংশ লইয়া সংসারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের আধ্যাত্মিকতা স্বভাবতঃ অধিক স্ফুরিত থাকায় বিদ্যাশিক্ষা না করিয়াও তাঁহারা স্বশিষ্যমণ্ডলীর ভিতর যে সকল স্বর্গীয় উপদেশ দেন, তাহা তাঁহারা ধ্যানবলে হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে, নিজ আত্মা হইতে প্রাপ্ত হন।

যে আত্মা পরমাত্মার অংশ, সেই আত্মাই তাঁহাদিগকে সেই সকল স্বর্গীয় উপদেশ দেন এবং ঈশ্বর স্বয়ং উহাদিগকে প্রকটিত করেন। অতএব তাঁহাদের উপদেশ ঈশ্বরপ্রকটিত (Revealed by God) বলাই উচিত। এই যে সেদিন মূর্খ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব মা কালীর সাধনায় সিদ্ধ হইয়া বঙ্গীয় সুধী সমাজে যে সকল স্বর্গীয় উপদেশ দিলেন, অনেকের বিশ্বাস, তাহা মা কালী স্বয়ং তাঁহার হৃদয়ে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

আবার অনেকের মত, সকল দেশের যোগসিদ্ধ মহাত্মাগণ প্রাচীন কালের সেই লুপ্তপ্রায় অধ্যাত্মবিজ্ঞান হইতে স্বর্গীয় উপদেশ পাইয়া স্ব স্ব শিষ্যমণ্ডলীর ভিতর কালোচিত ধর্ম্মমত প্রচার করিয়া যান। বুদ্ধদেব ও ঈশা উভয়েই অধ্যাত্মবিজ্ঞানে পূর্ণ বিশারদ ছিলেন।

ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, অতি প্রাচীন কালে বা সত্যযুগে দৈববাণী যোগে অধ্যাত্মবিজ্ঞান দেবরূপী মনুপুত্রগণের ভিতর প্রথম প্রকটিত হয়। ইহাই প্রাথমিক বা প্রকৃত বেদ (Primeval Revelation) ইহারই অনু-

করণে বৈশেষিক ধর্ম্মের প্রবর্ত্তকগণ স্ব স্ব ধর্ম্মগ্রন্থকে ঈশ্বরপ্রকটিত বলিয়া চিরদিন প্রচার করিতেছেন।

শাস্ত্রে সকলেই পাঠ করেন, পুরাকালে আকাশে দৈববাণী হইত এবং এতদ্দ্বারা নানা গুপ্ত রহস্য সংসারে প্রকটিত হইত। আমাদের সুশিক্ষিত বান্ধবগণ শাস্ত্রের এ কথায় বিশ্বাস করিবেন না। তাঁহারা ভাবেন, শাস্ত্রকারেরা এক দৈববাণীর দোহাই দিয়া শাস্ত্রে আষাঢ়ে গল্প জমাট বাঁধেন। যাহা এখন ঘটিতে দেখি না বা শুনি না, তাহা পূর্ব্বে ঘটিত, এ কথা কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব?

শাস্ত্রের কথা আদৌ অমূলক নহে। থিওসফি বলে, মন্বন্তরে মন্বন্তরে জগতের ভৌতিক নিয়মাবলির কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে; এজন্য যাহা এখন অসম্ভব ও অতিপ্রকৃত, তাহা পুরাকালে ঘটিত। কলিযুগে আত্মার আধ্যাত্মিক অধঃপতন ও সংসারে স্থূলত্বের সম্যক বৃদ্ধি বশতঃ যদিও আমরা দেবমণ্ডলী হইতে অনেক দূরে পতিত হইয়াছি এবং দেববাণী বা দেবতাদিগের কথা এখন আমরা আর শুনিতে পাই না, তথাচ শাস্ত্রের কথায় অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। তাহার সাক্ষ্য, এখনও মধ্যে মধ্যে আমাদের হৃদয়াকাশে দৈববাণী হইয়া থাকে এবং দৈবযোগে আমরা অনেক নূতন বিষয় অবগত হই। এদেশের জনসাধারণ মা কালীর বা তারকনাথের স্বপ্নাদেশে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে।

প্রত্যেক ধর্ম্মের আদ্যগ্রন্থকে ঈশ্বরপ্রকটিত বলাতে জগতের মহোপকার সাধিত হইয়াছে। ইহার উপর জনসাধারণের আন্তরিক ভক্তি, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস না জন্মিলে কি প্রকারে উহারা ইহার উপদেশ সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে পালন করিতে ব্যগ্র হইবে? অতএব জগতের অশেষ মঙ্গলকর ভাবিয়া আদ্য ধর্ম্মশাস্ত্রকে ঈশ্বরপ্রকটিত বলাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। বেদ বল, কোরাণ বল, বাইবেল বল, উহাদের ভিতর এমন কঠিন ভাব নিহিত আছে, যাহা সহজে বোধগম্য হয় না। গীতার অর্থ কত জায়গায় কত কঠিন! যোগেশ্বরপ্রকটিত বলিয়া উহারা স্থলবিশেষে এত কঠিন ও ক্লিষ্ট। যাঁহারা উহাদিগকে প্রণয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা যে অধিক আধ্যাত্মিক শক্তিতে বিভূষিত ছিলেন, তদ্বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ নাই।

যেমন প্রত্যেক ধর্ম্মে এক এক জন ঈশ্বরের প্রতিনিধি বা অবতার না থাকিলে সে ধর্ম্ম জগতে আদৌ স্ফূর্ত্তি পায় না এবং ইহার সেবকবৃন্দ অত্যধিক হয় না, সেইরূপ প্রত্যেক ধর্ম্মে এক এক খানি ঈশ্বরপ্রেরিত আদ্যধর্ম্মগ্রন্থ না থাকিলে ইহাও জগতে স্ফূর্ত্তি পায় না। যে ধর্ম্মের সেবকবৃন্দ এক শাস্ত্রের উপদেশানুসারে নিজ নিজ জীবন ও চরিত্র গঠন করে এবং ইহার আদেশ সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঈশ্বরের মহাজ্ঞা বলিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে পালন করে, সে ধর্ম্ম বহুদেশ বিস্তৃত হয় ও বহুকালস্থায়ী হয়। অতএব জগতের অশেষ মঙ্গল ভাবিয়া আদ্য ধর্ম্মগ্রন্থকে ঈশ্বরপ্রকটিত বলাই শ্রেয়।

এদেশে যে অষ্টাদশ মহাপুরাণ বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্ত এই তিন সম্প্রদায়ের বিদ্বেষসূচক মতামতে পূর্ণ, উহারা সকলে এক বেদব্যাস রচিত বলিয়া কেন জগতে প্রচারিত হইল? উহাদের উপর নিজ নিজ সম্প্রদায়ের অন্ধ বিশ্বাস উৎপাদনার্থ উহারা সকলে আদিপুরাণরচয়িতা বেদব্যাসের রচিত বলিয়া জগতে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। যাহাতে দেশের অশেষ মঙ্গল, তাহা মিথ্যা হইলেও জগতের মহাসত্য।

সনাতন হিন্দুধর্ম্মের আদ্যগ্রন্থ চতুর্ব্বেদ সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার চতুর্ম্মুখ হইতে নিঃসৃত। বেদ অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। নৈষ্ঠিক হিন্দু ভাবেন, প্রকৃত বেদ অনাদি শব্দব্রহ্মের রূপ। সৃষ্টিবিষয়ক যে জ্ঞান পরব্রহ্ম হইতে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার হৃদয়াকাশে প্রতিভাত হয় এবং যদ্দ্বারা তিনি এই বিশ্বপ্রপঞ্চ সৃষ্টি করেন, তাহাই প্রকৃত বেদ। কেহ কেহ ভাবেন, সত্যযুগে দেবরূপী মনুপুত্রগণের ভিতর দৈববাণীযোগে যে অধ্যাত্মবিজ্ঞান প্রকটিত হয়, তাহাই প্রকৃত বেদ। যুগপরিবর্ত্তনে এ বেদের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। কিন্তু আমরা সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগে বেদ কিরূপ ছিল, তাহা আমরা আদৌ অবগত নহি। যে অধ্যাত্মবিজ্ঞান চতুর্যুগের যোগেশ্বরগণ চিরদিন অনুশীলন করিয়া আসিতেছেন, তাহাই প্রকৃত বেদ। আর তুমি আমি আজকাল যে বেদ দেখিতে পাই, যাহা গলিতে গলিতে ছড়াছড়ি যাইতেছে ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের হস্তে কলুষিত হইতেছে, তাহা প্রকৃত বেদ নহে, তাহা প্রাচীন কালের বেদের অপভ্রংশ মাত্র। কলিযুগে

বেদ এখন অপ্রকাশিত অথবা ঈষন্মাত্রপ্রকাশিত। ইহার শ্রেষ্ঠ অংশগুলি মানবসমাজে ধর্ম্মের অবনতির সহিত ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এ কলিযুগে মানবের অধ্যাত্মিক অধঃপতনবশতঃ যথার্থ বেদ গোপন করা হইয়াছে (থিওসফিরমত)।

কলিযুগে আর্য্যসমাজে যাগযজ্ঞাদি প্রবর্ত্তিত হইবার পর ব্রাহ্মণগণ উঁহাদের অনুষ্ঠানের জন্য বেদের যে সকল অংশ শ্রুতিপরম্পরায় প্রয়োজন মত রক্ষা করিতে সমর্থ হন, তাহাই এখন সংসারে বেদ নামে খ্যাত।

এখন বেদ দুই ভাগে বিভক্ত।—

(১) জ্ঞান কাণ্ড।

(২) কর্ম্ম কাণ্ড।

জ্ঞানকাণ্ড মহর্ষিগণ বনজঙ্গলে অনুশীলন করিতেন। ইহাতে নির্গুণ পর-ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপ ও উপাসনা দেখা যায়। তদ্ভিন্ন ইহাতে দর্শন, আয়ুর্ব্বেদ জ্যোতিষ, পুরাণ ও ইতিহাসের মূল কথা পাওয়া যায়। কর্ম্মকাণ্ড—যাগযজ্ঞা-দির অনুষ্ঠানে যে সকল মন্ত্রাদি ব্যবহৃত হইত, তাহার কথায় পূর্ণ। ঋত্বিক-দিগের জন্য ঋকবেদ, উদ্গাতাদিগের জন্য সামবেদ, অধ্বর্য্য ও দ্বারপাল প্রভৃতির জন্য যজুর্বেদ সঙ্কলিত হইয়াছিল। ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি ও সূর্য্য প্রভৃতি দেবগণ কিরূপে স্তবনীয় হওয়া উচিত, তাহাই উহাতে দেখান হইয়াছে। জড়-জগতের জড়শক্তিতে দৈবশক্তির কিরূপ বিকাশ, তাহাই দেখান হইতেছে। সূক্ষ্ম জগৎস্থ দেবগণ স্থূলজগতে পঞ্চমহাভূতের মহালীলায় কিরূপ প্রকাশিত, তাহাই দেখান হইতেছে।

বেদমন্ত্রের অর্থ দুই প্রকার, ব্যক্ত ও অব্যক্ত বা গূঢ়। ব্যক্ত অর্থের সমালোচনা করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেন, যে বেদ অসভ্য জড়োপাসক আর্য্য কৃষককুলের ভীতিসংবলিত গীত মাত্র। তাহাই পরে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান কালে মন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয়। ইহার গূঢ় অর্থ যোগীরাই বুঝিতে পারেন; কিন্তু তাঁহারা সে কথা কিছুই প্রকাশ করেন নাই।

সপ্তস্বরের সহিত মন্ত্রগুলির সম্বন্ধ অতীব ঘনিষ্ঠ। এক এক স্বরে গীত হইলে মন্ত্রগুলি ভিন্ন ভিন্ন ফল উৎপাদন করে। যেমন দেহ হইতে প্রাণ উড়িয়া গেলে সর্ব্বশেষে উহার কঙ্কালমাত্র পড়িয়া থাকে, সেই রূপ বেদের

প্রাণস্বরূপ মন্ত্রশক্তি এখন উড়িয়া গিয়াছে, পড়িয়া আছে মাত্র উহার কুকুরদষ্ট কঙ্কাল। এখন উহার সে তেজ, সে প্রভাব ও সে জ্যোতি কিছুই নাই। যাঁহারা উহার রক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক, তাঁহাদের সহিত বেদের কিছুমাত্র আলাপ পরিচয় নাই। তাঁহারা এখন কালসমুদ্রে মগ্ন হইয়া হাবুডুবু খাইতেছেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

পাপপুণ্যের বিচার।

পাপপুণ্যের বিচার সম্বন্ধে ভালরূপ লিখিতে হইলে, ইহাকে কয়েক প্রবন্ধে বিভক্ত করিয়া লেখা উচিত। সেই সকল প্রবন্ধ যথাক্রমে লিখিত হইতেছে। প্রথমে দেখাইতে চেষ্টা পাইব, হিতাহিত জ্ঞানে ও পাপপুণ্যজ্ঞানে কতদূর প্রভেদ।

মানবের হিতাহিত জ্ঞান।

অবনীমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া সংসারের যেরূপ অবস্থায় আমাদিগকে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়, পরিবারবর্গে বেষ্টিত ও সমাজবদ্ধ হইয়া আমরা চিরদিন যে ভাবে জীবন যাপন করি, হৃদয়ে বিরুদ্ধ প্রবৃত্তির সমাবেশ হওয়াতে আমরা যেরূপ ইষ্টানিষ্টের মহাদ্বন্দ্বে অনুক্ষণ লিপ্ত হই, তাহাতে আমরা হিতাহিত বিবেচনা ব্যতীত জীবনের এক মুহূর্ত্ত যাপন করিতে পারি না; পদে পদে ঐ সকল বিষয়ে আমাদিগকে হিতাহিত বিচার করিয়া চলিতে হয়।

বাল্যকালে জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে হিতাহিত জ্ঞান মনে প্রস্ফুটিত হইতে আরম্ভ হয়। পিতামাতা ও গুরুজন সদুপদেশ দিয়া এ জ্ঞানের পত্তন করেন। পরে সংসারের নানা বিষয় পর্য্যবেক্ষণ, শ্রবণ ও মনন করিয়া আমাদের এ জ্ঞান আজীবন পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। আমরা ইহা দ্বারাই আজীবন চালিত হই।

ইতর জন্তুগণ নৈসর্গিক সংস্কার দ্বারা সকল বিষয়ে চালিত হয়। উহাদের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি আদৌ নাই। প্রকৃতি উহাদিগকে যে ভাবে চালায়, উহারা সেই ভাবে চিরদিন চালিত হয়। ক্ষুধার উদ্রেক হইলে উহারা যেন-তেন-প্রকারেণ ইহার শান্তি করে; ছল, বল ও ক্রূরতা প্রয়োগ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না; কামোদ্রেক হইলে মা, মাসী জ্ঞান থাকে না, ইহাকে চরিতার্থ করে।

অপরপক্ষে মানব অত্যুজ্জ্বল জ্ঞানশক্তিতে ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তিতে বিভূষিত। ইহাদের প্ররোচনায় তিনি পদে পদে নিজের হিতাহিত বিচার করিয়া চলেন। বাল্যকালে বিবিধ সংস্কার ও উত্তর কালে বিবিধ শিক্ষা পাইয়া যে বিবেক তদীয় হৃদয়াভ্যন্তরে গঠিত হয়, উহার আদেশমত নিজের হিতাহিত বা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার করিয়া তিনি দুস্তর ভবসাগর উত্তীর্ণ হইতে চেষ্টা পান।

মানবহৃদয়ে দুইপ্রকার বিরুদ্ধভাবাপন্ন প্রবৃত্তির সমাবেশ দেখা যায়। যথা :—

(১) স্বার্থসাধিকা।

(২) পরার্থসাধিকা।

প্রথমোক্তগুলির প্রধান উদ্দেশ্য আত্মসুখবর্দ্ধন ও আত্মোন্নতিসাধন। নীতিবিজ্ঞানের মতে ইহারা আমাদের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি। ধর্ম্মের মতে ইহারা আমাদের ষড়রিপু। ইহারা সদা আমাদিগকে বিপথে চালিত করে। আর শেষোক্ত গুলির প্রধান উদ্দেশ্য পরসেবা ও পরহিতসাধন। বিজ্ঞানের মতে ইহারা আমাদের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি এবং সমাজধর্ম্ম পালনের জন্য ইহারা অত্যাবশ্যক। ধর্ম্মের মতে ইহাদের উন্নতিতে মন ও আত্মার প্রকৃত উন্নতি ঘটে।

মানবের স্বার্থ নিকৃষ্ট জন্তুর স্বার্থ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। তিনি চিরদিন পুত্রকলত্রাদি পরিজনবর্গ লইয়া একগৃহে বাস করিতেছেন। যেমন জরায়ুগর্ভে সন্তান মাতার অঙ্গীভূত, একই শোণিত উভয়ের দেহকে পুষ্ট করে; সেইরূপ নিজের পরিজনবর্গও তাঁহার অঙ্গীভূত; তাঁহাদের লইয়াই তাঁহার সংসার। ইহাতে তাঁহার স্বার্থ ও উহাদের স্বার্থ অপরিহার্য্যরূপে জড়িত হইয়া গিয়াছে। তিনি নিজের জন্য যেমন নানাকারণে চিন্তিত হন, উহাদের জন্যও তিনি তেমনি নানাকারণে চিন্তিত হইতে বাধ্য হন। কিন্তু নিকৃষ্ট জন্তু নিজের প্রাণরক্ষা, উদরপূরণ ও কামপ্রবৃত্তির চরিতার্থতা ব্যতীত আর কিছুই জানে না। উহার

পরিবারও নাই, সমাজও নাই। যাহা হউক, উভয়েই স্বার্থ প্রবৃত্তি চালনা করিয়া নিজের স্বার্থ রক্ষা করিতেছে।

আবার হৃদয়ে পরার্থপ্রবৃত্তি থাকাতে তিনি পরের জন্য অনেক সময় সমবেদনা অনুভব করেন ও পরদুঃখে কাতর হন। ইহাদের প্ররোচনায় তিনি প্রতিবেশীমণ্ডলীর উপকার, স্বসমাজের মঙ্গলসাধন ও স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিতে সাধ্যমত চেষ্টা পান।

উপরোক্ত দুই প্রকার বিরুদ্ধ প্রবৃত্তি দ্বারা অনুক্ষণ চালিত হওয়াতে, নানাস্থলে, নানা সময়ে ও নানাকারণে তাঁহার স্বার্থে ও পরার্থে বিরোধ উপস্থিত হয় এবং তিনিও সদা সর্ব্বদা ইষ্টানিষ্টের বা হিতাহিতের সংঘর্ষে লিপ্ত হন। যাহা তাঁহার এক সময়ে মহৎ ইষ্ট, তাহাই আবার অন্য সময়ে মহৎ অনিষ্ট হইয়া পড়ে; যাহা তাঁহার বা তাঁহার পরিজনের ইষ্ট, তাহাই তাঁহার প্রতিবেশীর অনিষ্ট হইয়া থাকে। যদি তিনি আত্মসেবায় অধিক অনুরক্ত হন, তিনি পরসেবা অগ্রাহ্য করিবেন। যদি তিনি লোভের বশীভূত হইয়া অসৎ উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিতে যান, তিনি আত্মবিনাশের পথ পরিষ্কার করিবেন।

এই স্বার্থপরার্থের বিরোধ, এই ইষ্টানিষ্টের মহৎ সংগ্রাম তদীয় জীবনের প্রতিমুহূর্ত্তে ঘটিতেছে। তিনিও ঘোর বিপদে পতিত হইয়া সময়ে সময়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হন। তৎকালে হৃদয়স্থ বিবেক তাঁহাকে সমূহ বিপদ হইতে উদ্ধার করে এবং উহার বাণী শ্রবণ করিয়া তিনি বিষম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

হিতাহিত বিচারে আমরা সাধারণতঃ চারিপ্রকার নীতিদ্বারা চালিত হই, যথা :—

(১) সমাজনীতি।

(২) অর্থনীতি।

(৩) রাজনীতি।

(৪) ধর্ম্মনীতি।

আমাদের যাবতীয় হিতাহিত উপরোক্ত চারিনীতিমূলক। ইহাদের আদেশ শ্রবণ করিয়া আমরা নৈতিক জীবন গঠন করি এবং চরিত্রবান হইয়া সমাজে প্রশংসাভাজন হই।

সুশৃঙ্খলতার সহিত সমাজ চালাইবার জন্য যে সকল দেশাচার ও রীতিনীতি লোকপরম্পরায় প্রচলিত হয়, উহাদের প্রতিপালন সমাজনীতির উদ্দেশ্য। সদুপায়ে অর্থোপার্জ্জন ও সুনিয়মে ইহার সদ্ব্যবহার করিয়া পরিবার প্রতিপালন ও দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা অর্থনীতির উদ্দেশ্য। রাজ্যসুশাসনের জন্য রাজতন্ত্র যে সকল আইন কানুন প্রতিষ্ঠিত করে, উহাদের প্রতিপালন রাজনীতির উদ্দেশ্য। লোকহিতের জন্য ধর্ম্ম যে সকল রীতিনীতি, অনুষ্ঠান ও উপাসনা-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করে, উহাদের প্রতিপালন ধর্ম্মনীতির উদ্দেশ্য।

সমাজনীতি পালন না করিলে আমাদিগকে সমাজে নিন্দনীয় হইতে হয়। অর্থনীতি পালন না করিলে আমাদিগকে দারিদ্র্যদশায় পতিত হইয়া সংসারে অনেক কষ্ট পাইতে হয়। রাজনীতি পালন না করিলে আমাদিগকে রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হইতে হয়। ধর্ম্মনীতি পালন না করিলে আমাদিগকে পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে হয়। অতএব হিতাহিত বিচার করিয়া জীবন সুখে ও শান্তিতে যাপন করিতে হইলে, আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য কি, তাহা সকলের বুঝা উচিত।

মানবের পাপপুণ্যজ্ঞান।

যেমন নীতিশাস্ত্র হিতাহিতজ্ঞান হৃদয়ে প্রস্ফুরিত করে ও বিবেক গঠিত করে, সেইরূপ যে দেশে যে ধর্ম্ম প্রচলিত, উহার বিবিধ শাস্ত্র হৃদয়ে আত্মার পাপপুণ্যজ্ঞান সম্যক প্রস্ফুরিত করে এবং বিবেককে তদনুযায়ী গঠিত করে। দেশবিশেষে এতৎ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ইতরবিশেষ থাকিলেও মানব মাত্রেরই নিজ নিজ ধর্ম্মানুযায়ী পাপপুণ্যজ্ঞান আছে। সংসারের এই কর্ম্মে পাপ ও এই কর্ম্মে পুণ্য, তাহা তিনি বাল্যকাল হইতে শিক্ষা করিয়া থাকেন। ইহাদের সংস্কার তাঁহার মনে আজীবন বদ্ধমূল থাকে এবং আজীবন তিনি এই সংস্কার দ্বারা চালিত হন।

মনের যে সংস্কার হইতে পাপপুণ্যজ্ঞান জন্মে, তাহার নাম বিবেক। সকলের ধারণা বিবেক হৃদয়াভ্যন্তরে ঈশ্বরের প্রতিনিধি। ইহার আদেশকে উহারা সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে মান্য করে এবং তাহা পালন করিতে অতীব ব্যগ্র হয়। ইহার অভিমতে কাজ করিলে আমরা আত্মপ্রসাদরূপ ঈশ্বরের চরণামৃত লাভ করি এবং ইহার

অনভিমতে কাজ করিলে আত্মগ্লানিরূপ তাঁহার কোপানলে দগ্ধ হই। সাধারণের বিশ্বাস, আত্মপ্রসাদ হইতে পুণ্য এবং আত্মগ্লানি হইতে আমাদের পাপ জন্মে।

এই যে বিপন্নের বিপদুদ্ধার করিয়া একজন মনে মনে বিমল আনন্দ ভোগ করে, তাহাই উহার পুণ্যকর্ম্ম এবং অপরের অনিষ্ট সাধন করিয়া যে পতানুশোচনা অনুভব করে, তাহাই উহার পাপকর্ম্ম। এই যে একজন হিন্দু গঙ্গাস্নান করিয়া বা কাশীধামে বিশ্বেশ্বর দর্শন করিয়া যে বিমল আনন্দ ভোগ করে, তাহাই উহার পুণ্যকর্ম্ম; আর গোহত্যা দর্শন করিয়া মনে যে হৃদয়বিদারণ কষ্ট অনুভব করে, তাহাই উহার পাপকর্ম্ম। এই যে একজন মুসলমান অশেষ কষ্টের পর মক্কা দর্শন করিয়া যে বিমল আনন্দ ভোগ করে, তাহাই উহার পুণ্যকর্ম্ম এবং শূকর মাংস স্পর্শ করিয়া যে ঘোর অনুতাপানলে দগ্ধ হয়, তাহাই উহার পাপকর্ম্ম। আত্মপ্রসাদ ও আত্মগ্লানি হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে অঙ্কিত হওয়ায় উহাদের হইতে যে পাপপুণ্য উত্থিত হয়, তাহা আত্মার চিরসহচর।

ধর্ম্মের মতে যে সকল সৎকর্ম্ম দ্বারা আত্মা ইহলোকে ও পরলোকে সদ্গতি প্রাপ্ত হয় ও বিমল আত্মপ্রসাদ লাভ করে, তাহাই ইহার পুণ্যকর্ম্ম বা ধর্ম্ম, আর যে সকল দুষ্কর্ম্ম দ্বারা ইহা উভয়লোকে দুর্গতি প্রাপ্ত হয় ও আত্মগ্লানিতে পরিদগ্ধ হয়, তাহাই ইহার পাপকর্ম্ম বা অধর্ম্ম।

প্রাচ্যজগতে ধর্ম্মশাস্ত্রই পাপপুণ্য বিচারের কেন্দ্রস্থল। যাহা করিতে শাস্ত্র আদেশ দেয়, তাহাই আমাদের পুণ্যকর্ম্ম এবং যাহা উহা নিষেধ করে, তাহাই আমাদের পাপকর্ম্ম। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে ধর্ম্মাত্মা হিন্দুর নিকট গঙ্গাস্নানে মহাপুণ্য ও গোহত্যায় মহাপাতক এবং কোরাণ মতে কাফরকে তরবারি বলে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করায় মহাপুণ্য ও শূকরমাংস স্পর্শে মহাপাতক। এই রূপ বৈশেষিক ধর্ম্মাধর্ম্ম ব্যতীত প্রত্যেক ধর্ম্মশাস্ত্র নিজ নিজ সমাজে সাধারণ ধর্ম্মাধর্ম্মও ভালরূপ নির্দ্দেশ করে। জনসাধারণ প্রগাঢ় ভক্তি সহকারে ইহার সকল আদেশ ও নিষেধ বিধিবৎ পালন করেন। ইহার মতে পাপ পুণ্য বিচার করিবার ক্ষমতা তোমার এক প্রকার নাই বলিলেই হয়।

ধর্ম্মশাস্ত্র নানাবিধ ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া তোমার বিবেককে যে ভাবে গঠিত করিবে, তুমিও তদনুরূপ ইহার আদেশ মতে চালিত হইয়া ভব-সাগর পার হইবে। এস্থলে তোমার বিবেকাদেশে ও শাস্ত্রাদেশে কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। জনসাধারণের বিশ্বাস, শাস্ত্র ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা নির্দ্দেশ করে তাহাই সকলকে অন্ধ বিশ্বাসের সহিত পালন করিতে হইবে এবং তাহা হইতে কেহ কোন কারণে এক চুলও স্খলিত হইতে পারিবে না। শিক্ষিতাশিক্ষিত যাবতীয় লোকবর্গকে এক মার্গে চালিত করিয়া সমাজের প্রকৃত মঙ্গল সাধন করাই ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য। সমাজে স্বেচ্ছাচারিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণ করিবার জন্য ইহা একপ্রকার মতামত স্থাপন করিয়া সকলের বিবেককে এক পথের পথিক করিতে চেষ্টা পায়।

অপর পক্ষে পাশ্চাত্য জগতে বিবেক পাপপুণ্যবিচারে মানবের প্রধান সহায়। যাহা উহার অনুমোদিত, তাহাই পুণ্যকর্ম্ম বা ধর্ম্ম এবং যাহা উহার বিরুদ্ধ, তাহাই পাপকর্ম্ম বা অধর্ম্ম। খৃষ্টধর্ম্ম এ সংসারকে পরীক্ষাক্ষেত্র ভাবে বলিয়া স্বাধীন ইচ্ছা ও বিবেকের এত প্রাধান্য স্বীকার করে।

তথাকার সুশিক্ষিত সম্প্রদায় বলেন, বিবেক তোমায় যে পথে লইয়া যাইবে, তুমি কেবল সেই পথে যাইতে বাধ্য। যদি সে পথ শাস্ত্রবিরুদ্ধ হয়, শাস্ত্রকে অমান্য করিয়া একমাত্র বিবেকের আদেশ শিরোধার্য্য করিবে। দেখ, শাস্ত্র মানবরচিত, অতএব ভ্রমসঙ্কুল; কিন্তু হৃদয়স্থ বিবেক অভ্রান্ত ও সাক্ষাৎসম্বন্ধে এ জগতে ঈশ্বরের প্রতিনিধি (Vicegerent of God) আমরা নৈসর্গিক জ্ঞানে স্বর্গীয় বিবেক পাইয়া থাকি। ইহার আদেশ ও ঈশ্বরের আদেশ একই কথা। অতএব ইহার আদেশ সর্ব্বতোভাবে পালনীয়।

পাপপুণ্যজ্ঞান আমরা জাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে শিক্ষা করি অথবা হৃদয়ের বিবেকবাণী হইতে শিক্ষা করি। ইহা সুনিশ্চিত, কোন পাপ কর্ম্ম করিয়া আত্মগ্লানি বোধ করিলে, উহার কালিমা আত্মার গভীরতম দেশে সংলগ্ন হয়, সেইরূপ কোন পুণ্যকর্ম্ম করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিলে, উহার সুন্দর ছাপও আত্মায় সংলগ্ন হয়। উহাদের সমষ্টি আমাদের কর্ম্মফল। এই কর্ম্মফল জীবাত্মাকে জন্মে জন্মে চালিত করে।

নীত্যুপদিষ্ট সমাজের হিতাহিত, আর ধর্ম্মনির্দ্দিষ্ট পাপপুণ্য ইহাদের ভিতর আকাশপাতাল প্রভেদ। একটী ক্ষণভঙ্গুর দেহের ঐহিক ক্ষণস্থায়ী ভাব মাত্র, অপরটী অবিনশ্বর আত্মার অবিনশ্বর ভাব। মৃত্যুর পর পাপপুণ্য আত্মার সঙ্গে সঙ্গে যাইবে।

লোকসমাজে নিন্দার ভয়ে ও রাজদণ্ড ভয়ে যাহা আমরা কর্ত্তব্য জ্ঞান করি, তাহাতে আমরা স্বতঃ প্রণোদিত হই না বা তাদৃশ আনন্দ লাভ করি না। কিন্তু যাহা ধর্ম্মের মতে আমাদের পুণ্যকর্ম্ম, তাহাতে আমরা স্বতঃপরতঃ প্রণোদিত হই,তাহাতে মনপ্রাণ সমর্পণ করি এবং তাহাতে প্রকৃত আনন্দ উপভোগ করি। সত্য বটে, সমাজে যশোলাভের জন্য অনেকে নানা সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তথাচ ধর্ম্মনির্দ্দিষ্ট পুণ্যলাভের জন্য যাহা আমরা করি, তাহা আমাদের কর্ত্তব্য অপেক্ষা গুরুতর। কর্ত্তব্যপরায়ণ ইংরাজ নিজের কর্ত্তব্যকে ধর্ম্ম অপেক্ষা গুরুতর জ্ঞান করিতে পারেন। কিন্তু ধর্ম্মপরায়ণ হিন্দু ধর্ম্মকে কর্ত্তব্য অপেক্ষা গুরুতর জ্ঞান করেন। আমাদের কোন কোন সুশিক্ষিত বান্ধব বলিবেন, ধর্ম্মের সম্মুখে কর্ত্তব্যকে অবহেলা করা জাতীয় চরিত্রের একটী মহৎ কলঙ্ক। সেজন্য কর্ত্তব্য পরায়ণ ইংরাজের নিকট কর্ত্তব্যজ্ঞান শিক্ষা করা আমাদের একান্ত উচিত। পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তৃতির সঙ্গে এখন অনেকে অধিক কর্ত্তব্যপরায়ণ হইতেছেন।

হিতাহিত ও পাপপুণ্য সম্বন্ধে বিজ্ঞানের মতামত।

বিজ্ঞানের মতে সমাজের হিতাহিত ও ধর্ম্মের পাপপুণ্য উভয়েই এক কথা। শেষোক্তের মূলে প্রথমোক্ত পূর্ণমাত্রায় নিহিত আছে। ইহাদের সম্বন্ধে নীতিশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র ও বিবেক যাহাই বলুক না কেন, ইহাদের বিচারে বিজ্ঞানের মতে একটী প্রধান মানদণ্ড বা তুলাদণ্ড থাকা উচিত, তাহা কেবল সমাজের মঙ্গলামঙ্গল। যদ্দ্বারা সমাজের বহুসংখ্যক লোকের মঙ্গল সম্পাদিত হয়, তাহাই আমাদের হিতকর্ম্ম, তাহাই আবার পুণ্যকর্ম্ম বা ধর্ম্ম; আর যদ্দ্বারা বহু সংখ্যক লোকের অনিষ্টোৎপত্তি হয়, তাহাই আমাদের অহিত কর্ম্ম, তাহাই আবার পাপকর্ম্ম বা অধর্ম্ম।

বিজ্ঞান ধর্ম্মশাস্ত্র ও বিবেক, উভয়ের মর্য্যাদা লাঘব করিতে সাধ্যমত চেষ্টা পায়। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত বলেন, ধর্ম্মশাস্ত্র যতই কেন স্পর্দ্ধার সহিত বলুকনা,

ইহা ঈশ্বরপ্রকটিত বা মহাত্মাবিরচিত, তথাচ ইহা নানা কুসংস্কারে ও ভ্রমে পূর্ণ। যখন জগৎ ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, যখন ইহা বিজ্ঞানের আলোক আদৌ পায় নাই, তখনই ধর্ম্মশাস্ত্রের সৃষ্টি হয়। এই বিংশ শতাব্দীর এমন সমুজ্জ্বল বিজ্ঞানালোকের মধ্যে কে সেই স্থবির মুমূর্ষ শাস্ত্রের কথা মান্য করিবে? সেইরূপ হৃদয়ের বিবেক বাল্যকালের সংস্কার ও উত্তরকালের শিক্ষা অনুসারে গঠিত হয় এবং ইহা সর্ব্বথা পরিবর্ত্তনশীল। কে বলে, ইহা ঈশ্বরের প্রতিনিধি বা নৈসর্গিক সংস্কার? যদি তাহাই হইবে, তবে এতৎসম্বন্ধে সংসারে কেন এত পার্থক্য দেখা যায়?

দেখ, হিন্দুর নিকট গঙ্গাস্নানে মহাপুণ্য; কিন্তু ইংরাজের নিকট কি গঙ্গাস্নান, কি টেম্‌স স্নান, উভয়ই সমান। মুসলমানের নিকট মক্কাদর্শনে মহাপুণ্য; কিন্তু খৃষ্টানের কি বোম্বাই দর্শন, কি মক্কাদর্শন, উভয়ই সমান। ধর্ম্মাত্মা হিন্দু বিশ্বেশ্বর দর্শন করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইবেন; কিন্তু গিজনীর মামুদ সোমনাথদেবকে এক পদাঘাতে ভগ্ন করিতে ছাড়েন নাই। বিবেক লইয়া সংসারে কত পার্থক্য আছে! তোমার বিবেক তোমার নিকট তোমার বিশ্বাসে অভ্রান্ত বটে, কিন্তু তোমার বিবেক আমার নিকট আমার বিশ্বাসে ভ্রান্ত। তবে কেন বিবেককে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া এত আস্ফালন কর? ভ্রান্ত ধর্ম্মের এ সকল বুজরুকি বিজ্ঞানের নিকট আর খাটে না। এখন ধর্ম্মবেচারা শীঘ্রই সংসার হইতে পাততাড়ি গুটাইতে বাধ্য হইবে।

বিজ্ঞান বলে, মানব সামাজিক জীব; সমাজই তাঁহার জাতীয় উন্নতির প্রধান কারণ; ইহা ব্যতীত তাঁহার গত্যন্তর নাই; ইহা ব্যতীত তাঁহার এক মুহূর্ত্ত চলে না। অতএব সামাজিক মঙ্গলামঙ্গলের উপর তাঁহার হিতাহিত বা পাপপুণ্য নির্ভর করা কর্ত্তব্য। চিরকালই নীতিশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্র একমাত্র সমাজের মঙ্গলামঙ্গল লইয়া হিতাহিত ও ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার করিয়া আসিতেছে। কিন্তু মূঢ় জনসাধারণ তাহা বুঝিতে না পারিয়া কেবল ধর্ম্মশাস্ত্র ও তৎপ্রতিষ্ঠিত বিবেকের গৌরব বর্দ্ধন করিয়া বেড়ায়। এই মতের প্রকৃত নাম "বৈজ্ঞানিক হিতবাদ।"

যাহা হউক, ডার্ব্বিণপ্রমুখ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ ঈশ্বরের প্রতিনিধি বিবেককেও এক তুড়িতে উড়াইতে চেষ্টা পান। মনের বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন প্রবৃত্তি

সমূহ দ্বারা চালিত হওয়াতে সামাজিক মানব নানাবিষয়ে নিজের ও পরের হিতাহিত বিবেচনা করিতে বাধ্য হন। এই প্রকারে তদীয় হৃদয়ে বিবেকরূপ সংস্কার কালক্রমে স্ফুরিত হয়। ইহা আদৌ তাঁহার নৈসর্গিক সংস্কার নহে। মাতৃভাষা ও ঈশ্বরজ্ঞানের ন্যায় ইহা তাঁহার মনে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে ক্রমবিকসিত হইয়া থাকে। আজকাল যেমন তিনি বাল্যকালে অন্যান্য সংস্কারের সহিত হিতাহিত জ্ঞান লাভ করেন, সেইরূপ তদীয় জাতীয় জীবনের বাল্যকালে অন্যান্য জ্ঞানের সহিত হিতাহিতজ্ঞানও মানবসমাজে প্রথম উদ্ভূত হয়।

বিজ্ঞান বলে, চুরি করা মহাপাপ, তুমি কোথা হইতে শিখিলে? তুমি সমাজে বসবাস কর বলিয়াই ভালরূপ বুঝিতে পার, পরের দ্রব্য অপহরণ করিলে তাহার মহৎ অনিষ্ট হইবে; সেইরূপ যদি অপরে তোমার দ্রব্য অপহরণ করে, ভাবিয়া দেখ তোমার কত অনিষ্ট হইবে এবং তোমার মনে কত কষ্ট হইবে? একারণ ধর্ম্ম সকল দেশে উপদেশ দেয়, চুরি করা মহাপাপ এবং রাজতন্ত্রও চোরকে গুরুতর শাস্তি দিয়া রাজ্যশাসন করে। এই প্রকারে তুমিও বাল্যকাল হইতে শিক্ষা কর, চুরিকরা মহাপাপ ও রাজদণ্ডনীয় অপরাধ।

দেখ, একটা শঙ্খচিল তোমার হস্ত হইতে অম্লান বদনে একখণ্ড মিষ্টান্ন ছো মারিয়া লইয়া যাইবে; উহার মনে কোনরূপ দ্বিধা বোধ হইবে না। শঙ্খচিল নিজের উদরপূরণ ভালরূপ বুঝে, ক্ষুধাতৃপ্তির জন্য ছল ও বলপূর্ব্বক কোন জিনিস অপরের নিকট হইতে গ্রহণ করা যে অন্যায়, তাহা উহার জ্ঞান নাই। ভাল! তুমি ত এ সংসারে শ্রেষ্ঠ ও বিবেকী জীব। গাভীর যে দুগ্ধে উহার বৎস পরিপুষ্ট হইবে, তাহাকে জীর্ণ ও শীর্ণ করিয়া কেন তুমি উহার সে দুগ্ধ বলপূর্ব্বক দোহন করিয়া নিজে পান কর বা সন্তানবর্গকে পান করাও? এ স্থলে তোমার স্বার্থপর বিবেক তোমায় কি বলে? আরও ভাবিয়া দেখ, সংসারে কেন এমন কথা উঠিল "জোর যার মুল্লুক তার"। ইহাতে কি পরের দ্রব্য লুণ্ঠিত বা অপহৃত হয় না? কিন্তু এরূপ লুণ্ঠনকে কেহ চুরি বলেন না, বলে গৌরবান্বিত দিগ্বিজয়।

এইরূপ নানাপ্রকার যুক্তি দেখাইয়া বিজ্ঞান স্পষ্ট নির্দ্দেশ করে, যথার্থতঃ তোমার ধর্ম্মও নাই, অধর্ম্মও নাই, বিবেক একটা কথার কথা মাত্র

এবং তোমার আছে কেবল একমাত্র সমাজ; এই সমাজ বশতই তোমার যাবতীয় ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান বা হিতাহিতজ্ঞান জন্মে এবং এই সমাজ বশতই তোমার হৃদয়ে তোমার পূজ্যতম বিবেক কালবশে ক্রমশঃ স্ফুরিত হয়। আরও দেখ, শিক্ষার তারতম্যবশতঃ বিবেকের কত বৈলক্ষণ্য দেখা যায়। যে হিন্দু এখন গোহত্যায় মহাপাপ জ্ঞান করে, তাহারই প্রপিতামহগণ গোমেধ যজ্ঞে গোবধ করিয়া গোমাংস ভক্ষণ করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন না। যে খ্রীশান এখন ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে পরিতৃপ্ত, তাহার প্রপিতামহগণ একেশ্বরবাদ প্রচারের জন্য পণ্ডিতবর সক্রেটিশকে বিষ প্রযোগে হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। অতএব তথাকথিত ঈশ্বরের প্রতিনিধি বিবেকও সর্ব্বথা পরিবর্ত্তনশীল।

সকলের বিশ্বাস, পাপপুণ্যজ্ঞান আমাদের নৈসর্গিক সংস্কার। বিজ্ঞান এ কথার তীব্র প্রতিবাদ করে। ইহার মতে পাপপুণ্যজ্ঞান ও বিবেক আমাদের বাল্যকালার্জ্জিত সংস্কার মাত্র, কদাচ নৈসর্গিক নহে। যাহা নৈসর্গিক সংস্কার, তাহা সকল দেশে ও সকল জীবে সমভাবে অনুভূত হয়। ক্ষুধা, কামপ্রবৃত্তি ও ভয় জীবের নৈসর্গিক সংস্কার! কিন্তু পাপপুণ্যজ্ঞান এক মাত্র মানবে দৃষ্ট হয়। এজন্য বিজ্ঞান বলে, ভাষাজ্ঞান, ঈশ্বরজ্ঞান প্রভৃতি অন্যান্য সংস্কারের ন্যায় পাপপুণ্যজ্ঞানও আমরা বাল্যকালে শিক্ষা করি। মস্তিষ্কের স্ফূর্ত্তির সহিত আমাদের জ্ঞানশক্তি যেরূপ বিকসিত হইতে থাকে, অতি শৈশব কাল হইতে সংসারের বিবিধ বিষয় দর্শন ও শ্রবণ করিয়া এবং গুরুজনের নিকট সুশিক্ষা পাইয়া যে সকল সংস্কার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইতে থাকে, তদনুসারে আমাদের বিবেক গঠিত হয়। এ কারণ বিবেক লইয়া দেশে দেশে এত পার্থক্য দেখা যায়।

যাহা সমগ্র মানবসমাজের অনিষ্টকর, তাহা সকল দেশে পাপজ্ঞানে ঘৃণিত হয়; আর যাহা সমাজমাত্রেরই কল্যাণকর, তাহা সকল দেশে ও সকল সময়ে পুণ্যজ্ঞানে আদৃত হয়। তাহার সাক্ষ্য, চৌর্য্যনরহত্যাদি সমাজের অমঙ্গলকর দুষ্কর্ম্মগুলি সকল দেশে পাপজ্ঞানে ঘৃণিত হইতেছে এবং পরোপকারাদি সমাজের মঙ্গলকর সৎকর্ম্মগুলি পুণ্যজ্ঞানে সর্ব্বত্র আদৃত হইতেছে। সেইরূপ যাহা

বিজ্ঞানের মতখণ্ডন।

বিজ্ঞান যেমন বলে, সমাজের হিতাহিতই আমাদের একমাত্র পাপপুণ্য; ইহাতে ধর্ম্মের ঘোর অবমাননা করা হয়, এমন কি, ইহার সর্ব্বনাশ করা হয়। কোথায় ধর্ম্মের মতে পাপপুণ্য আমাদের অবিনাশী আত্মার অবিনাশী ভাব ও চিরসহচর, না কোথায় ইহারা বিজ্ঞানের মতে ক্ষণস্থায়ী ইহজীবনের ক্ষণস্থায়ী ভাবমাত্র। যে পাপপুণ্য জীবাত্মার প্রকৃত কর্ম্মফল, যেজন্য ইহা জন্মে জন্মে ভিন্ন ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন সুখদুঃখের ভাগী হয়, সে পাপপুণ্য কি না আজ সমাজের সামান্য হিতাহিত! যে বিজ্ঞান ঈশ্বর, আত্মা ও পরলোক কিছুই মানে না, সে বিজ্ঞান পাপপুণ্যের এরূপ বিকৃত অর্থ করিয়া ধর্ম্মের সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইবে, তাহাতে ইহার কোন্ বিচিত্রতা?

বিজ্ঞানের মতকে ভালরূপ বিশ্লিষ্ট করিলে বুঝা যায়, পাপপুণ্য শব্দের আমরা যেরূপ অর্থ করি, ইহার মতে সেরূপ পাপপুণ্যের অস্তিত্ব সংসারে নাই, ইহারা ধর্ম্মের বুজরুকি মাত্র। বিজ্ঞান বলে, মানবধর্ম্ম সকল দেশে সমাজের হিতাহিতকে পাপপুণ্য নামে অভিহিত করিয়া উহাদের গৌরব এরূপ ভাবে বর্দ্ধন করে, যাহাতে জনসাধারণ সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে স্বতঃপ্রোৎসাহিত হইবে ও অসৎকর্ম্মে স্বতঃ সংযত থাকিবে। ইহাতে বোধ হয়, বিজ্ঞানের মত এই, সকলের মন ভুলাইয়া সমাজের হিতসাধন করিবার জন্য ধর্ম্ম সকল দেশে পাপপুণ্যের ফাঁদ পেতেছে।

বিজ্ঞানের এই সকল কথা শুনিয়া ধর্ম্মাত্মাদিগের মনে স্বতঃ হাস্যোদ্রেক হয়; মনে জানেন, সকলকে জাহান্নমে পাঠাইবার জন্য উহার এইরূপ অপরূপ কথা আজকাল শুনা যাইতেছে।

ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, আত্মা ও মনের উন্নতিসাধন, দেহের স্বাস্থ্যরক্ষা এবং পরিবার ও সমাজকে সুচারুরূপে চালনা, ইহারা ধর্ম্মের পঞ্চ অঙ্গ। এই পঞ্চাঙ্গের উন্নতি সাধনই উহার মূল উদ্দেশ্য। ইহাদের মধ্যে যদি বিজ্ঞান এক-মাত্র সমাজের হিতাহিতকে ধর্ম্মের পাপপুণ্য বলে, কে উহার কথায় কর্ণপাত করিবে? কে উহার কথানুসারে চলিবে? পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ভাবেন, একমাত্র সমাজবন্ধনই ধর্ম্মের মূল উদ্দেশ্য; এজন্য তাঁহারা সমাজের হিতাহিতকে ধর্ম্মের পাপপুণ্য বলিয়া উহার এতদূর অবমাননা করিতেছেন।

আরও দেখ, বিজ্ঞান যেরূপ ভাবে সমাজের হিতাহিত সম্বন্ধে উপদেশ দেয়, তাহাতে জনসাধারণের কিছুমাত্র উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। সে উপদেশ অনেক স্থলে অসার বলিয়া ব্যর্থ হইবে বা কথায় পর্য্যবসিত হইবে। কে বল পরের খাতিরে, সমাজের খাতিরে ঐ সকল কর্ত্তব্য পালন করিবে? স্বার্থপর মানব নিজের জন্য প্রাণপণ করেন; কিন্তু পরের জন্য তিনি কিছুই করিতে চান না। এজন্য মুক্তকণ্ঠে বলা উচিত, বিজ্ঞানের হিতবাদ বাক্যালঙ্কারে ও বাগাড়ম্বরে শোভা পায় বটে, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া থাকে। তবে উহার কথায় কর্ণপাত না করাই শ্রেয়ঃ।

বিজ্ঞানের মতে বিবেক আমাদের বাল্যকালার্জ্জিত সংস্কার, আদৌ নৈসর্গিক সংস্কার নহে, এবং হৃদয়ে বিরুদ্ধ প্রবৃত্তির সমাবেশ হওয়াতে ইহা ক্রমশঃ উত্থিত হয়। এই দুই কথার প্রতিবাদ করা উচিত।

কামপ্রবৃত্তি বল, জ্ঞানশক্তি বল, বিবেক বল, ইহারা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে হৃদয়ে ক্রমস্ফুরিত হয়। যখন শুক্র অণ্ডকোষে উৎপন্ন হইতে আরম্ভ হয়, তখন মনে কামপ্রবৃত্তির সঞ্চার হয়। যখন বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে মস্তিষ্ক স্ফুরিত হইতে থাকে, তখন জ্ঞানশক্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তিগুলি স্ফুরিত হইতে আরম্ভ হয়। উহাদের যেরূপ স্ফূর্ত্তি হইতে থাকে, নানাপ্রকার শিক্ষা পাইয়া বিবেকও তদনুরূপ গঠিত হয়। যখন জ্ঞানশক্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি আমাদের নৈসর্গিক বা প্রকৃতিদত্ত, তখন উহাদের হইতে উৎপন্ন বিবেকরূপ সংস্কারটি বাল্যকালার্জ্জিত হইলেও, ইহাও নৈসর্গিক বা প্রকৃতিদত্ত। প্রকৃতি মস্তিষ্কের অন্তর্নিহিত শক্তিগুলি এরূপভাবে বিকসিত করায়, যে এখন আমরা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে জ্ঞানশক্তি, ঈশ্বরজ্ঞান ও বিবেক প্রাপ্ত হই। কৈশোরে স্ফুরিত কামপ্রবৃত্তি যখন আমাদের নৈসর্গিক সংস্কার, তখন বাল্যকালার্জ্জিত বিবেক কেন নৈসর্গিক হইবে না?

যে সকল বিরুদ্ধ প্রবৃত্তির সমাবেশ হওয়াতে বিবেক হৃদয়ে উত্থিত হয়, উহাদের এরূপ সমাবেশ কেন হইল? পাপ ও পুণ্য, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, হিত ও অহিত, সুখ ও দুঃখ এই সকল বিরুদ্ধ অবস্থা উৎপাদন করিবার জন্য প্রকৃতি হৃদয়ে এইরূপ বিরুদ্ধ প্রবৃত্তির সমাবেশ করিয়া দেয়। মানবসমাজে ও মানবহৃদয়ে এরূপ বৈষম্য আনয়ন না করিলে, জীবাত্মা এ সংসারে কর্ম্মদেহ পাইয়া

কি প্রকারে ইহার প্রাক্তন কর্ম্মফল ভোগ করিবে এবং ভবিষ্যতের জন্য কাল-ক্ষেত্রে নূতন নূতন কর্ম্মবীজ রোপণ করিবে?

বিবেক সম্বন্ধে বিজ্ঞান যে সকল নাস্তিক মতামত প্রচার করে, তাহাতে সমাজের ঘোর অনিষ্টোৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা। সে সকল কথায় কর্ণপাত না করাই শ্রেয়।

নৈসর্গিক ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্ররোচনায় ঈশ্বরজ্ঞান যেমন আমাদের প্রকৃতি সিদ্ধ, সেইরূপ বিবেকও আমাদের প্রকৃতি-সিদ্ধ। এই বিবেকবলে আমরা যাবতীয় কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বা হিতাহিত বিচার করি। ইহার আদেশ সকল সময়ে পালন করিয়া আমরা দুস্তর ভবসাগর পার হই। অতএব বিবেকবাণীই আমাদের নিকট ঈশ্বরের আদেশ স্বরূপ। সকলেই জানেন, একমাত্র বিবেকের আদেশানুসারে আমরা পাপপুণ্যের ভাগী হই। অতএব বিবেককে তুচ্ছ করিবার কিছুমাত্র কারণ নাই এবং বিজ্ঞানের উক্তিতে কর্ণপাত না করাই শ্রেয়।

পাপপুণ্যসম্বন্ধে হিন্দুধর্ম্মের মতামত।

পাপপুণ্য সম্বন্ধে হিন্দুধর্ম্মের উপদেশ স্বর্গীয় ও মহোচ্চ। এ ধর্ম্ম এতৎ সম্বন্ধে যে সকল উদার ভাব সেবকহৃদয়ে প্রস্ফুটিত করে, তাহা অন্য ধর্ম্ম ঘুণাক্ষরেও ভাবিতে পারে না।

ইহার মতে যাবতীয় পাপপুণ্য ও সুখদুঃখ মায়ার ত্রিগুণের ক্রিয়াবশতঃ উদ্ভূত হয়। এই মায়ার ত্রিগুণ জীবাত্মাকে ভিন্ন ভিন্ন লোকে অনন্তকালের জন্য চালিত করে। ইহার এমনি গুণ, জীবাত্মা যখন যে লোকে বিচরণ করে, তখন উহা সেই লোকের মায়া জন্য অবস্থায় পতিত হইয়া পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল ভোগ করে ও নূতন কর্ম্মফল সঞ্চয় করে। কর্ম্মফল ভোগের জন্য মায়ার ত্রিগুণ জগতে অনন্ত বৈচিত্র্য ও বৈষম্য আনয়ন পূর্ব্বক উহাকে নানা অবস্থায় নিক্ষেপ করে এবং উহা নিজ কর্ম্মানুসারে সুখ দুঃখের ভাগী হয়। এখন উহার কর্ম্মফলই পাপপুণ্যের সমষ্টি।

হিন্দুশাস্ত্রানুসারে পাপপুণ্যের কিরূপ অর্থ করা উচিত? সংসারের বিবিধ অবস্থায় পতিত হইয়া জীবাত্মা যে সকল সদনুষ্ঠান দ্বারা ইহলোকে সাত্ত্বিক

ভাব ও সাত্ত্বিক সুখ এবং পরলোকে সদ্‌গতি প্রাপ্ত হয়, যদ্দ্বারা ইহা আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হইয়া উৎকৃষ্ট লোকের উপযুক্ত হইতে থাকে, তাহাই ইহার পুণ্যকর্ম্ম; আর যে সকল অসৎকর্ম্ম দ্বারা ইহা তামসিক ভাব প্রাপ্ত হইয়া ইহলোকে অশেষ কষ্ট ভোগ করে ও পরলোকে অধোগতি বা নিকৃষ্ট যোনি প্রাপ্ত হয়, তাহাই ইহার পাপকর্ম্ম; যদ্দ্বারা ইহা আত্মপ্রসাদরূপ পরমানন্দ ভোগ করিতে করিতে দেবতুল্য হয় এবং অন্তে দেবলোকে যাইবার উপযুক্ত হয়, তাহাই ইহার পুণ্যকর্ম্ম এবং যদ্দ্বারা ইহসংসারে আত্মগ্লানিরূপ নরকাগ্নিতে দগ্ধ হইতে হইতে ক্রমশঃ পশুতুল্য হয় এবং অন্তে নিকৃষ্টযোনি প্রাপ্ত হয়, তাহাই ইহার পাপকর্ম্ম।

হিন্দুধর্ম্ম পাপপুণ্যের যেরূপ অর্থ করে, এমন অন্য কোন ধর্ম্ম এ জগতে সেরূপ অর্থ করিতে পারে নাই। ইংরাজিতে পাপপুণ্য শব্দের প্রকৃত অনুবাদ হয় না। যদি Merit and demerit বা Vice and Virtue বল, ইহাদের প্রকৃত ভাব প্রকাশ পাইবে না। পাপপুণ্য কথার উত্থাপনে এক জন নৈষ্ঠিক হিন্দুর মনে যে সকল স্বর্গীয় ভাব উদিত হয়, তাহা কি একজন ম্লেচ্ছ ভাবিতে পারে? যে কুকর্ম্মে হিন্দু মহাপাপ জানেন, তাহা করিবার পূর্ব্বে তাঁহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইবে, তাঁহার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিবে, কে যেন তাঁহাকে পশ্চাৎ হইতে টানিয়া রাখিবে, অথবা হয়ত তিনি বালকের ন্যায় রোদন করিতে থাকিবেন। যদি এদেশের সতী সাধ্বী স্ত্রীলোককে পরপুরুষ স্পর্শ করে, তৎকালে তাঁহার মনের ভাব কিরূপ হয়, বল দেখি? তাঁহার ধর্ম্মনাশ করিতে গেলে তিনি ত গলায় ছুরি দিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিবেন। বল দেখি, জগতের কোন্ ধর্ম্ম এতদূর পাপপুণ্যজ্ঞান শিখাইতে পারে?

সনাতন হিন্দুধর্ম্মের প্রধান গৌরব এই যে, পাপপুণ্যনির্দ্দেশে ইহার প্রসার যেমন একদিকে বহুবিস্তৃত, তেমনি অপরদিকে অতীব সূক্ষ্ম। যে সকল কর্ম্ম আত্মা, মন, দেহ, পরিবার ও সমাজের পরমকল্যাণকর, তাহাই ইহার মতে পুণ্যকর্ম্ম; আর যাহা উহাদের প্রকৃত অপকারক, তাহাই পাপকর্ম্ম। যে স্থলে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কেবলমাত্র সামাজিক হিতাহিতে ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া ধর্ম্মের অবমাননা করেন, সে স্থলে হিন্দুধর্ম্ম

আধ্যাত্মিক, মানসিক, শারীরিক, পারিবারিক ও সামাজিক হিতাহিতে পাপপুণ্য নির্দ্দেশ করিয়া নিজের বিশোদার ভাব স্ফুরণ করে ও নিজের গৌরব বর্দ্ধন করে।

যেমন দেহপিঞ্জরবদ্ধ জীবাত্মা যুগধর্ম্মে জড়দেহের সহিত জড়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া বাহ্য জগতের সহিত বিবিধ সম্বন্ধে অশেষরূপে সম্বদ্ধ, সেইরূপ; ধর্ম্মও ঐসকল সম্বন্ধ বিশদরূপে প্রকাশ করিয়া উহাদের দ্বারা ইহার স্বাভাবিক আধ্যাত্মিকতা কিরূপে কথঞ্চিৎ স্ফূর্ত্তি পাইবে, সে বিষয়ে বিশেষ যত্নবান। ইহার জন্য এ ধর্ম্ম তোমার অশেষ মঙ্গলের জন্য তোমার সামাজিক, পারিবারিক, শারীরিক ও মানসিক অনুষ্ঠানগুলির উপর স্বীয় প্রতিপদ অনুশাসন সুচারুরূপে চালায় এবং উহাদের উপর পাপপুণ্যের স্থরপনের ছাপ দিয়া জীবাত্মার গভীরতম প্রদেশে চিরাঙ্কিত করত বিবেককে তদনুসারে গঠিত ও চালিত করে। অন্যান্য ধর্ম্ম এতদূর পাপপুণ্য নির্দ্দেশ করে না বলিয়া কদাচ মনে ভাবিওনা, ইহারা স্বধর্ম্মের কুসংস্কার।

দেখ, গঙ্গাস্নানে ও পুষ্করিণীপ্রতিষ্ঠায় হিন্দুর মহাপুণ্য এবং গোহত্যার মহাপাতক। স্বাস্থ্যকর, আয়ুষ্কর ও অশেষ রোগনাশক স্রোতের জলে অবগাহন করিতে লোকবর্গকে অন্তরের সহিত প্রোৎসাহিত করিবার জন্যই কি গঙ্গাস্নানে এত পুণ্য নির্দ্দিষ্ট হইল? ক্ষণবিধ্বংসী শরীরের সামান্য উপকারের জন্য কি গঙ্গামাতা আমা- দের পতিতপাবনীও জগৎতারিণী হইলেন? বিশুদ্ধ পানীয় জল সেবন করাইয়া গ্রামস্থ লোকবর্গের উপকারার্থে জলাশয় প্রতিষ্ঠায় কি এত পুণ্য নির্দ্দিষ্ট হইল? আপাতদর্শনে ঐরূপ প্রতীয়মান হয় বটে, সমাজের বা শরীরের সামান্য উপকারের জন্য ঐ সকল কর্ম্মে এত পাপপুণ্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু উহাদের ভিতর ধর্ম্মের আরও গূঢ় উদ্দেশ্য আছে, তাহা উদ্ঘাটন করা আবশ্যক।

ধর্ম্মজগতের নিয়ম এই, "যাদৃশী ভাবনা যস্য, সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" যাঁহার যেরূপ ভাবনা, তাঁহার ফললাভও তদনুরূপ। যাঁহার যাহাতে অটল বিশ্বাস, তিনি তাহা সম্পাদন করিয়া হৃদয়ে আত্মপ্রসাদ ও আত্ম- গ্লানি ভোগ করত জীবাত্মাকে পাপপুণ্যের ভাগী করেন। অতএব গঙ্গা-

স্নান ও জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিয়া নৈষ্ঠিক হিন্দু অশেষ পুণ্যলাভ করিবেন এবং গোহত্যা করিয়া তিনি পাপপঙ্কে লিপ্ত হইবেন। আর একজন মুসলমান গঙ্গাস্নান করিয়া কিছুমাত্র ফল পাইবেন না এবং গোহত্যা করিয়া নিরয়গামী হইবেন না। ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট পাপপুণ্য বিষয়ে লোকে শরীরের বা সমাজের সামান্য উপকারের দিকে লক্ষ্য রাখে না, পরন্তু পরকালের মঙ্গলের জন্য পুণ্য লাভের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখে। অতএব বেশ জানিবে, আমাদের প্রত্যেক পাপকর্ম্মে ও পুণ্যকর্ম্মে ধর্ম্মের গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। ধর্ম্মাত্মা হিন্দু সে সকল উদ্দেশ্য বুঝিতে চেষ্টা করেন না; তিনি কেবল পুণ্যলাভের জন্য লালায়িত হন। ইহাতেই তাঁহার প্রকৃত শ্রেয়োলাভ হইয়া থাকে।

সংসারে পাপপুণ্যের উদ্ভব।

এতৎ সম্বন্ধে সুসভ্য ইউরোপখণ্ডের সুসভ্য খৃষ্টধর্ম্ম একটী অপরূপ উপাখ্যান রচনা করিয়াছে। যখন সয়তান ঈশ্বর কর্তৃক স্বর্গরাজ্য হইতে বিতাড়িত হয়, তখন সেই মূর্ত্তিমান অধর্ম্ম তাঁহার নবসৃষ্টি ধ্বংস করিবার মানসে সর্পরূপ ধারণ করিয়া ইডেন উদ্যানে প্রবেশ করে এবং আদি স্ত্রী ঈভকে প্রলোভিত করিয়া নিষিদ্ধ জ্ঞানবৃক্ষের ফল আস্বাদন করায়। পরে ঈভ নিজ স্বামী আদামকেও সেই নিষিদ্ধ ফল ভোজন করান। ইহাতে উভয়ে পতিত হইয়া অশেষ শোকতাপে জড়িত হন ও মৃত্যুমুখে পতিত হন। তদবধি সমগ্র মানব জাতির পতন হইয়াছে এবং ঈশ্বরের শান্তিরাজ্যে অশেষ পাপতাপ প্রবেশ করিয়াছে। ইউরোপের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই এই সুমধুর উপাখ্যানে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে; কিন্তু কেহই ইহার গূঢ় অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করে না।

অধ্যাত্মবিজ্ঞানের মহাসত্য উল্লেখ করিলে, উপরোক্ত উপাখ্যানের গূঢ় রহস্য ও মূল উদ্দেশ্য কথঞ্চিৎ বোধগম্য হইবে। যৎকালে যুগধর্ম্মে সংসারে স্থূলতত্ত্ববৃদ্ধির সঙ্গে স্ত্রীজাতি উৎপন্ন হইয়া আধুনিক মৈথুনধর্ম্ম জগতে প্রবর্ত্তিত হয়, তৎকালে মানবমাণ্ডকে জ্ঞানশক্তির উন্মেষ আরম্ভ হয়। এই জ্ঞান শক্তির স্ফূর্ত্তির সহিত তাঁহার পূর্ব্বতন আধ্যাত্মিকতা ক্রমশঃ লোপ পাইতে থাকে। এই প্রকারে তিনি পতিত হইয়া সংসারের অশেষ পাপতাপে

জড়িত হইয়া পড়েন এবং মৃত্যুও তাঁহার অনুধাবন করে। এস্থলে কৃত্রিম জ্ঞানশক্তির উন্মেষ ও খৃষ্টধর্ম্মোক্ত নিষিদ্ধ জ্ঞানবৃক্ষের ফলাস্বাদন উভয়ই এক কথা। আর আদিস্ত্রী ঈভ আদিমানব আদামকে এই নিষিদ্ধ ফল ভোজন করান, ইহাত বুঝা উচিত, সংসারে স্ত্রীজাতির উদ্ভব, মৈথুনধর্ম্মপ্রবর্ত্তন এবং কামপ্রবৃত্তি ও জ্ঞানশক্তির উন্মেষ, ইহারা এক সময়ে ঘটিয়াছে।

জ্ঞানশক্তির উন্মেষের সঙ্গে মানব পূর্ব্বতন অবস্থা ত্যাগ করিয়া আধুনিক অপ্রাকৃত অবস্থায় থাকিতে আরম্ভ করেন এবং বস্ত্রদ্বারা নিজের লজ্জা নিবারণ করিতে শিখেন। এই অপ্রাকৃত অবস্থায় থাকিয়া জ্ঞানবলে যেমন একদিকে তাহার অশেষ সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইতেছে, তেমনি অপর দিকে তাহার শোকতাপ ও দুঃখরাশি বাড়িতেছে। সংসারের নিয়ম এই যাহাতে যত সুখ, তাহাতেই তত দুঃখ। মায়ার ত্রিগুণের অনন্তলীলাবশতঃ সংসারে এত সুখ ও দুঃখ, এত পাপ ও পুণ্য এবং এত ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম দেখা যায়।

বিজ্ঞান বলে, পুরাকালে যে আদিমানব বর্ব্বর অবস্থায় প্রাকৃত অবস্থায় ছিল, সেই মানব জ্ঞানানুশীলন করিতে করিতে সুসভ্য হইয়া অপ্রাকৃত অবস্থায় থাকিতে আরম্ভ করেন। ইহাতে তিনি প্রকৃতিদেবীর কোপানলে পতিত হইয়া অশেষ শোকতাপের ভাগী হন। ইহার মতে মানবসমাজের গঠনপদ্ধতি যেরূপ এবং মানবহৃদয়ে বিরুদ্ধ প্রবৃত্তির যেরূপ সমাবেশ, উহার অনিবার্য্য ফলস্বরূপ সমাজের হিতাহিত ও ধর্ম্মাধর্ম্ম স্বতঃ উত্থিত হয়। এখন যদি বিজ্ঞানকে জিজ্ঞাসা কর, কেন সমাজের গঠনপদ্ধতি ও মানব প্রকৃতি এরূপ হইল, যাহাতে তিনি অনুক্ষণ স্বার্থপরার্থের সংঘর্ষে পতিত হইয়া সমাজের হিতাহিত ও নিজের ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করিতে বাধ্য হইলেন? সে কথায় বিজ্ঞান প্রায় নিরুত্তর।

হিন্দুধর্ম্মের মতে যুগভেদে ধর্ম্মধেনুর এক একটী পাদ নষ্ট হওয়াতে সংসারে পাপতাপ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে। সত্যযুগে সকলেই ধর্ম্মাত্মা, পুণ্যাত্মা ও সুখী ছিলেন। ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে সংসারে পাপতাপ প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে। পরিশেষে এ কলিযুগে পাপতাপের আতিশয্য সকল দিকে দেখা যায়।

আলোক ও অন্ধকার, সুখ ও দুঃখ, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ, সুস্বর ও কুস্বর, প্রভৃতি সকলই সম্বন্ধবাচকশব্দ। সংসারের এই সকল দ্বন্দ্বজ ভাব সর্ব্বথা মায়াজনিত। একটী না থাকিলে অপরটী বুঝা যায় না। অধর্ম্ম না থাকিলে ধর্ম্ম কি, তাহা কেহ বুঝিতে পারে না। যে সংসারে মহামায়ার অনন্তলীলা সকল বিষয়ে চলিতেছে, সে সংসারে যেমন একদিকে পুণ্যের ছড়াছড়ি, তেমনি অপর দিকে পাপেরও ছড়াছড়ি দেখা যায়। সমাজে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি লইয়া বিস্তর বৈষম্য আছে, সেজন্য সংসারে এত ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, এত পাপ ও পুণ্য দেখিতে পাও।

শাস্ত্রাদেশ ও বিবেকাদেশ কোন্ পালনীয়?

কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, শাস্ত্রাদেশ ও বিবেকাদেশ ইহাদের মধ্যে কাহার আদেশ সর্ব্বাগ্রে পালনীয়? আমাদের সুশিক্ষিত বান্ধবগণ বলিবেন, এসংসারে হৃদয়স্থ যে বিবেক সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঈশ্বরের প্রতিনিধি, উহার আদেশ সর্ব্বতোভাবে পালনীয়। যিনি নিজ বিবেকের অনভিমতে কর্ম্ম করেন, তিনি ঈশ্বরের নিকট প্রকৃত দোষী হন। যে কোন অসৎ কর্ম্ম কর না কেন, যখন তুমি সেই কর্ম্ম করিয়া নিজ বিবেকের নিকট অপরাধী হও, তখন তুমি যথার্থতঃ ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইয়া পাপপঙ্কে লিপ্ত হও। অতএব বিবেকাদেশ সর্ব্বাগ্রে পালনীয়।

যে সমাজে একমাত্র ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচলিত, তথায় শাস্ত্র ও বিবেকের মধ্যে কোনরূপ বিরোধ ঘটে না, কারণ একই শাস্ত্র সমাজস্থ যাবতীয় লোকের বিবেককে গঠিত করে। ইহার জন্য মুসলমান ও খৃষ্ট ধর্ম্ম জগতে প্রচারিত হইবার পর উহারা নিজ নিজ দেশে পূর্ব্বতন ধর্ম্মগ্রন্থরাশি সমূলে ধ্বংস করিয়া নিজ নিজ শাস্ত্র প্রচার করিয়াছিল।

যে সমাজে ভিন্নমতাবলম্বী ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র প্রচলিত থাকে, তথায় শাস্ত্রবিশেষ ও লোক বিশেষের বিবেকের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়। সে স্থলে যে শাস্ত্র পাঠে যে ধর্ম্ম তোমার বিবেকসম্মত হয়, তুমি তাহা অবলম্বন করিয়া নিজের ধর্ম্মপিপাসা শান্ত করিয়া থাক। তাহার সাক্ষ্য দেখ, যদি তুমি একমাত্র হিন্দুশাস্ত্র পাঠ ও শ্রবণ করিতে, ঐ শাস্ত্রানুসারে তোমার

বিবেক গঠিত হইত এবং হিন্দুধর্ম্মে তোমার প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা থাকিত। কিন্তু কালগতিকে এখন তুমি পাশ্চাত্য শিক্ষায় বিভূষিত হইয়াছ, তোমার মনও পাশ্চাত্য ভাবরসে আকণ্ঠ ভাসিতেছে, হিন্দুয়ানী ও ক্রমশঃ তোমার চক্ষুঃশূল হইতেছে। এখন তুমি একেশ্বরবাদের প্রকৃত মাহাত্ম্য বুঝিয়াছ, হিন্দুধর্ম্মও তোমার নিকট অসার পৌত্তলিকতা বোধ হইতেছে।

যে সমাজে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচলিত থাকাতে লোকবর্গের বিবেক বিভিন্নরূপে গঠিত ও পরিচালিত হয়, সে সমাজে যদি জনসাধারণ স্ব স্ব বিবেকের অভিমতে কাজ করে, তথায় যথেচ্ছাচারিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা অনায়াসে প্রশ্রয় পায়। এই দুই দোষ সমাজমাত্রেরই বিশেষ অপকারক। যে সমাজে যথেচ্ছাচারিতা যত প্রবল, সে সমাজ তত অধিক ক্ষীণবীর্য্য এবং অল্প কারণে ধ্বংস পাইবার সম্ভাবনা। অতএব যে বিবেক লোককে যথেচ্ছাচারী করে, উহার আদেশ স্থলবিশেষে লঙ্ঘন করা উচিত। আর যে ধর্ম্মশাস্ত্র সমাজস্থ যাবতীয় লোককে এক পথের পথিক করে ও উচ্ছৃঙ্খল হইতে দেয় না, উহার আদেশ সকল সময়ে সর্ব্বতোভাবে পালন করা বিধেয়।

দেখ, সমাজের সঙ্গে তোমার জীবনের সুখদুঃখ অপরিহার্য্যরূপে জড়িত; স্বসমাজের সাধারণ ও বৈশেষিক নিয়মাবলি পালন করা তোমার একান্ত বিধেয়। যদি তুমি স্ববিবেকের অভিমতে যথেচ্ছাচারী হইয়া সমাজের কোন নিয়ম উল্লঙ্ঘন কর, প্রকৃতপক্ষে তুমি সমাজদ্রোহী হইবে। চৌর্য্য-নরহত্যাদি করিলে কেবল সমাজদ্রোহী হইতে হয়, এমন নহে; কিন্তু সমাজপ্রতিষ্ঠিত কোন নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিলেও সমাজদ্রোহী হইতে হয়। স্বর্গীয় কেশবচন্দ্রসেন স্বীয় স্বার্থপর বিবেকের অভিমতে হিন্দুমতে নিজ কন্যার বিবাহ দিয়া ব্রাহ্মসমাজের বিস্তর ক্ষতি করিয়া যান; ইহাই তাঁহার জীবনের মহৎ কলঙ্ক।

আরও দেখ, যদি কেহ নিজের বিকৃত বিবেকের অভিমতে শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও লোকাচারবিরুদ্ধ বিধবাবিবাহ করেন বা করান, তিনিও হিন্দুসমাজ-দ্রোহী হইয়া থাকেন। অতএব সমাজের মঙ্গলের জন্য স্থলবিশেষে বিবেক-বাণী অগ্রাহ্য করিয়া একমাত্র শাস্ত্রাদেশ ও সমাজাদেশ পালন করা বিধেয়।

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাংগতিং।
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থিতৌ
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্মকর্ত্তুমিহার্হসি।

(গীতা)

"যিনি শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়া বা শাস্ত্রকে অমান্য করিয়া যথেচ্ছাচারী হইবেন, তিনি ইহজীবনে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন না, সংসারে যথার্থ সুখী হইতে পারিবেন না এবং অন্তেও উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইবেন না। অতএব কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে শাস্ত্রই তোমার একমাত্র প্রমাণ এবং শাস্ত্রোক্ত সকল বিধিব্যবস্থা অবগত হইয়া নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে থাক।"

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখারবিন্দ হইতে যে অমৃতায়মান উপদেশ নিঃসৃত হইয়াছে, উহার প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া তদনুসারে চলা সকলের একান্ত কর্ত্তব্য। ধর্ম্মশাস্ত্র ও সমাজের পাঁচজনে যাহা বলিবে, তাহাই করিবে এবং স্থলবিশেষে বিবেকবাণী অগ্রাহ্য করিবে।

পাপপুণ্যের সহিত যশাযশ, আত্মপ্রসাদ ও আত্মগ্লানির সম্বন্ধ।

লোকসমাজে বসবাসের দরুণ হৃদয়ে যশোলিপ্সা স্বতঃ স্ফুরিত হয়। তুমি যে দেশে বা যে গ্রামে বাস কর, তত্রত্য লোকেরা তোমার কীদৃশ সুখ্যাতি বা অখ্যাতি করে, তাহা জানিতে বা শুনিতে তুমি একান্ত ব্যগ্র। হিতাহিত জ্ঞানের ন্যায়, পাপপুণ্যজ্ঞানের ন্যায় মানাপমানজ্ঞানও হৃদয়ে সমধিক বলবৎ। এমন কি শেষোক্ত প্রথমোক্ত অপেক্ষা বলবত্তর। পাপপুণ্যজ্ঞান হৃদয়ের নিভৃতস্থলে একমাত্র বিবেকবাণী হইতে উত্থিত হয়; কিন্তু মানাপমান বাহ্য জগতে পাচজনের মুখে উত্থিত হইয়া সকলের হৃদয়কন্দরে অধিষ্ঠিত হয়।

মানসম্ভ্রম সকলের একান্ত প্রিয়। কি ধনবান্, কি নির্ধন, কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, সকলেই নিজ নিজ সমাজে মানসম্ভ্রম রক্ষা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। যখন প্রতিবেশীমণ্ডলী একজনের কুৎসা গায়, তিনি লোকালয়ে মুখ

দেখাইতে পারেন না; তিনি মনে মনে ভাবেন, তাঁহার মাথা কাটা গিয়াছে। লোকে যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও নিজের মানসম্ভ্রম রক্ষা করে। রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইলে কেন উহারা অজস্র অর্থব্যয় করিয়া উকিল মোক্তার ও পুলিশের পেট ভরায়?

হিতাহিতজ্ঞানের ন্যায় মানাপমানজ্ঞান সকলের মনে বাল্যকাল হইতে জাগরিত হয়। যিনি যে অবস্থায় অবস্থিত, তাঁহার অবস্থানুযায়ী এই জ্ঞান জন্মে। মানাপমানজ্ঞান হৃদয়ে অধিক বলবৎ হইলে কেহ কেহ অহঙ্কারী ও অভিমানী হইয়া থাকে এবং অল্প কারণে তাহাদের মন ক্ষুব্ধ হওয়াতে তাহারা ক্রোধান্বিত হইয়া থাকে।

সুসভ্য দেশে অর্থ ও বিদ্যার প্রাচুর্য্য মানসম্ভ্রমের মূলকারণ। এজন্য সকলেই নিজ নিজ মানসম্ভ্রম বজায় রাখিবার জন্য প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া বিদ্যার্থোপার্জ্জন করিতে সাধ্যমত চেষ্টা পান।

পাপপুণ্যের সহিত বা সামাজিক হিতাহিতের সহিত আমাদের যশাযশের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সমাজের মঙ্গলের জন্য সৎকর্ম্ম বা পুণ্যকর্ম্ম করিলে আমাদের যশোবৃদ্ধি হয়। আর অসৎকর্ম্ম বা পাপকর্ম্ম করিয়া সমাজের অমঙ্গলসাধন করিলে আমাদিগকে অপযশের ভাগী হইতে হয়।

সচরাচর দেখা যায়, যেমন সমাজে অপযশ ও রাজদণ্ডভয় অনেককে গর্হিত কর্ম্ম সম্পাদনে সংযত রাখে, তেমনি মানসম্ভ্রমও উহাদিগকে পুণ্যকর্ম্মে প্রোৎসাহিত করে। এই যে অনেকে দোলদুর্গোৎসবাদি সৎকর্ম্মে অজস্র অর্থব্যয় করিতেছেন, কেহ বা পুণ্যলাভের জন্য করেন, কেহ বা সমাজে সুখ্যাতি লাভের জন্য করেন। এই যে ধনবানেরা স্কুল দাতব্যচিকিৎসালয়াদি স্থাপন করিয়া অর্থের সদ্ব্যবহার করিতেছেন, কেহ বা পুণ্যলাভের জন্য করেন, কেহ বা রাজসম্মান লাভের জন্য করেন। পুণ্যলাভের জন্য বা সম্মান লাভের জন্য কর, যাহা ভাবিয়া কর না কেন, তাহাতেই সমাজের অশেষ মঙ্গল।

পুণ্যকর্ম্ম করিলে যেমন আমাদের পুণ্যলাভ, আত্মপ্রসাদলাভ, সম্মানলাভ ও শ্রেয়োলাভ, সকলই ঘটে; তেমনি পাপকর্ম্ম করিলে অন্তরে আত্মগ্লানি, সমাজে অখ্যাতি এবং জীবনের প্রধান শ্রেয়োলাভে বঞ্চিত হইতে হয়। যখন তুমি কোন সৎকর্ম্ম কর, যেমন লোকে শতমুখে তোমার সুখ্যাতি করিতে থাকে,

তুমিও তেমনি হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে পুণ্যজনিত আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া কৃতার্থ হও। যখন তুমি কোন অসৎকর্ম্ম করিয়া সমাজের অমঙ্গল সাধন কর, লোকে যেমন চতুর্দ্দিকে তোমার অপযশ গাইতে থাকে, তুমিও তেমনি অন্তরে আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হও। আত্মপ্রসাদ পুণ্যকর্ম্মের সমুচিত পুরস্কার এবং আত্ম-গ্লানি পাপকর্ম্মের গুরুতর দণ্ড। একের সহিত যেমন যশের সংযোগ, তেমনি অপরের সহিত অপযশের সংযোগ।

স্থলবিশেষে ধর্ম্মজনিত আত্মপ্রসাদের সহিত লোকের যশাযশের বিরোধ উপস্থিত হয়। যদি তুমি ধর্ম্মের খাতিরে, সত্যের খাতিরে উচ্চ আদালতে অন্নদাতা স্বপ্রভুর বিপক্ষে যথার্থ সাক্ষ্য প্রদান করিয়া তাঁহাকে দণ্ডনীয় কর, দেশস্থ লোকে তোমার উপর ছি! ছি! করিবে ও চতুর্দ্দিকে তোমার অপযশ গাইবে বটে; কিন্তু তুমি ধর্ম্মজনিত আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া চরিতার্থ হইবে। যদি তুমি নিজ বিবেকের অভিমতে স্বধর্ম্মকে পৌত্তলিক জ্ঞানে পরধর্ম্মে দীক্ষিত হও, দেশস্থ লোকে তোমাদের বিস্তর অপবাদ করিবে বটে; কিন্তু তুমি স্ব-বিবেকের নিকট আদৌ অপরাধী না হইয়া আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হইবে না।

পুনঃ পুনঃ পুণ্যকর্ম্ম করিলে আত্মপ্রসাদ পদে পদে লাভ করা যায়; কিন্তু পুনঃ পুনঃ পাপ কর্ম্ম করিলে আত্মগ্লানি আদৌ অনুভূত হয় না এবং অভ্যাস বশতঃ মন প্রস্তরবৎ কঠিন হইয়া পড়ে। যে দুর্বৃত্ত পাপাত্মা কসাই প্রথম গোহত্যা করে, গাভীর মৃত্যুকালীন যন্ত্রণাদর্শনে প্রথমে তাহার মনে আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়। পরে প্রত্যহ গোহত্যা করিতে করিতে তদীয় মন প্রস্তরবৎ কঠিন হইয়া পড়ে এবং গাভীগুলির মৃত্যুযন্ত্রণা চক্ষে দেখিয়াও দেখে না। এই প্রকারে সেই পাপিষ্ঠ নরাধম মনের আনন্দে সহস্র সহস্র গোবধ করিতে থাকে ও গোমাংস ভক্ষণ করিতে থাকে। পরিশেষে যখন তদীয় হস্তদ্বয় কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইয়া গলিত হইয়া যায়, তখন সে নিজকৃত পাপের ফল ভালরূপ ভুগিতে থাকে এবং আল্লা আল্লা করিতে থাকে।

এই যে একজন লম্পট চুরাট ফুঁকিতে ফুঁকিতে মনের আনন্দে প্রতিদিন বেশ্যালয়ে যাইতেছে ও কত আমোদ করিতেছে, পরে যখন বাও, বাগী, উপদংশ ও প্রমেহ রোগে জর্জ্জরীভূত হইয়া যন্ত্রণায় অস্থির হইবে, তখনই সে ব্যক্তি নিজকৃত পাপের জন্য পরিতাপে অনুশোচনায় দগ্ধ হইবে। এই যে একজন মাতাল

প্রত্যহ সুরাপান করিতে করিতে স্বর্গের সপ্তম মণ্ডলে উত্থিত হইতেছে, পরে যখন যকৃতাদি পাকিয়া মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইবে, তখনই সে ব্যক্তি নিজ-কৃত পাপের জন্য গতানুশোচনায় দগ্ধ হইবে! এই যে একজন দস্যু অকাতরে দস্যুবৃত্তি করিতে করিতে লুণ্ঠনাদি করিতেছে, পরে যখন রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইবে, তখনই সেই পামর নিজকৃত পাপের জন্য অন্তর্দাহে দগ্ধ হইবে। এই প্রকারে সংসারে পাপকর্ম্ম করিয়া কেহ কর্ম্মদণ্ড ও গতানু-শোচনা হইতে অব্যাহতি পায় না।

পাপানুচিন্তনে কতদূর পাপ।

সকলেই জানেন, পাপাচরণ করিলে পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে হয়। পাপানু-চিন্তন করিয়া কি কেহ পাপের ভাগী হইয়া থাকে? দেখ, পাপাচরণ দ্বারা সমা-জের ঘোর অনিষ্ট সাধন করা হয় এবং কোন না কোন লোক তদ্দ্বারা বিশেষ ক্লিষ্ট ও প্রপীড়িত হয়। কিন্তু পাপানুচিন্তন দ্বারা সমাজের কোনপ্রকার অনিষ্ট সাধন করা হয় না বা কোন লোক প্রপীড়িত হয় না, তবে কেমন করিয়া ইহাতে পাপস্পর্শ করিবে? যখন কোন লোক বিরলে বসিয়া পাপানুচিন্তন করে এবং তদ্বিষয়ে মনে মনে নানা আন্দোলন করিতে থাকে, অন্তর্যামী ঈশ্বর না হয় সে বিষয়ে অবগত হইলেন। কিন্তু যখন সুযোগের অভাবে সে কুচিন্তা কার্য্যে পরিণত হইল না, তখন সে লোক কি প্রকারে সেই পাপচিন্তা করিয়া পাপপঙ্কে লিপ্ত হইবে?

যথার্থ বলিতে কি, পাপানুচিন্তন করিয়াই আত্মা পাপপঙ্কে লিপ্ত হইয়া থাকে। কোন পাপকর্ম্ম করিবার পূর্ব্বে, পরে বা তৎকালে যে সকল কুচিন্তা মনোমধ্যে উদিত হয়, তদ্দ্বারা আত্মা যথার্থরূপ কলুষিত হইয়া পাপগ্রস্ত হয়। সুচিন্তার সুন্দর ছাপ, কুচিন্তার কালিমা সকলই আত্মার গভীরতম প্রদেশে অঙ্কিত হওয়ায় ইহা চিন্তাজন্য পাপপুণ্যের ভাগী হয়।

অশেষ চিন্তারাশি লইয়া আমরা মনোরূপ মহাকাশে যে সূক্ষ্মজগৎ সৃজন করি, তাহাতে আমাদের পাপপুণ্যের ছাপ স্থায়ীভাবে থাকে। ঈশ্বর কি কোন বিষয় চক্ষে দেখিতেছেন? কি স্থূলজগৎ, কি সূক্ষ্মজগৎ, সকলই তাঁহার

নিয়মতন্ত্রের অধীন। পাপকর্ম্মের ফলাফল বাহ্য স্থূল জগতে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পাপচিন্তার ফলাফল সূক্ষ্ম জগতে থাকে। যেমন পাপকর্ম্ম তরঙ্গের পর তরঙ্গ উত্থাপিত করিয়া স্থূলজগৎ তোলপাড় করে, সেইরূপ পাপচিন্তাও তরঙ্গের পর তরঙ্গ উত্থাপিত করিয়া সূক্ষ্ম জগৎ তোলপাড় করিতে থাকে।

যেমন ফটোগ্রাফী লোকের সামান্য ছায়া লইয়া রাসায়নিক দ্রব্যযোগে উহার প্রতিকৃতি চিত্রফলকে মুদ্রিত করে, সেইরূপ মনের চিন্তারাশি সূক্ষ্ম জগতের আকাশপটে অনুক্ষণ অঙ্কিত হইয়া থাকে. সত্য বটে, ঐসকল চিন্তা উত্থিত হইয়াই হৃদয়ে বিলীন হইয়া যায় এবং মস্তিষ্কে উহাদের কোন স্থায়ী চিহ্ন থাকে না, তজ্জন্য উহারা স্মৃতিপথে উদিত হয় না, তথাচ উহারা সূক্ষ্ম জগতে স্থায়ীভাবে প্রতিফলিত ও অঙ্কিত হইয়া থাকে।

মানবমন অসম্পূর্ণ বলিয়া চিন্তার কোন স্থায়ী চিহ্ন উহাতে থাকে না। কিন্তু যে দৃশ্য একবার নয়নপথে পতিত হয়, উহার ছাপ যাবজ্জীবন মস্তিষ্কে থাকে এবং স্মৃতিপথে উদিত হয়। চিন্তাগুলি উহাতে জলবুদ্বুদের ন্যায় উত্থিত হইয়া পরক্ষণে মিলিয়া যায়। যাঁহার মন যোগবলে বলীয়ান ও অতীন্দ্রিয়জ্ঞান সম্পন্ন, তিনি একজন লোক দেখিয়া উহার মনের কথা বলিয়া দিতে পারেন। এস্থলে উহার মনে যে সকল চিন্তা উদিত হয়, তাহা আবার যোগীর হৃদয়াকাশে প্রতিফলিত হইয়া থাকে, এজন্য তিনি উহার মনের কথা বলিয়া দিতে পারেন। ইহাতে সিদ্ধান্ত করা উচিত, মনের চিন্তারাশি যতই কেন ক্ষণস্থায়ী হউক না, উহারা সূক্ষ্মজগতে চিরাঙ্কিত হয় এবং পাপচিন্তা করিয়া জীবাত্মা পাপপঙ্কে লিপ্ত হইয়া থাকে।

হিন্দুশাস্ত্রে ধর্ম্মরাজ যমের যে চিত্রগুপ্ত লেখক যাবতীয় লোকের পাপপুণ্যের হিসাব রাখেন, ইনি কে, জান? তিনি সকল বিষয় গোপনে চিত্রিত বা অঙ্কিত করেন বলিয়া তাঁহার নাম চিত্রগুপ্ত। এখন এ কাজে একজন দেবতা, না অনেক দেবতা আছেন, তাহা কীটাণুকীট মানব কেমন করিয়া জানিবেন? আমরা এই পর্য্যন্ত জানি, আমরা দেবতাদিগের হস্তে ক্রীড়াপুত্তলি মাত্র। তাঁহারা সূক্ষ্মজগৎ হইতে তারযোগে আমাদিগকে যে ভাবে নাচান, আমরা সেই ভাবে নাচি। কিন্তু এখন আমরা অবোধ মনকে বুঝাই যে, এক ঈশ্বর

এই সকল বিধান করেন এবং সকল বালাই তাঁহার উপর অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হই।

সূক্ষ্ম জগতের সহিত এই স্থূলজগতের সম্বন্ধ অতীব ঘনিষ্ঠ। ইহাদের মধ্যে মনোজগৎ বর্ত্তমান। যাহা এই মনোজগতে আন্দোলিত হয়, তাহা তৎক্ষণাৎ সূক্ষ্মজগতে আন্দোলিত হওয়ায় দেবতাদিগের গোচর হয়। অতএব পাপকর্ম্ম কর বা পাপচিন্তা কর, উভয়দ্বারা তুমি সমভাবে পাপগ্রস্ত হইয়া থাক। সকল দেশের ধর্ম্মশাস্ত্র তোমায় চিরদিন এইরূপ উপদেশ দিয়া আসিতেছে।

ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার।

যে পৃথিবীতে হৃদয়ে বিরুদ্ধ প্রবৃত্তির সমাবেশ হওয়াতে স্বার্থে ও পরার্থে অনুক্ষণ সংঘর্ষ উপস্থিত, যে পৃথিবীতে দেশে দেশে বিভিন্ন ভাষা ও বিভিন্ন শিক্ষাপদ্ধতি থাকায় নানামুনির নানামত প্রচলিত, সে পৃথিবীতে ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার অতীব সুকঠিন, সে পৃথিবীতে যাহা এক জনের নিকট ধর্ম্ম, তাহা অপরের নিকট অধর্ম্ম, যাহা একজনের নিকট মহাপুণ্য, তাহা অপরের নিকট মহাপাতক।

দেখ, গোহত্যায় হিন্দুর মহাপাতক, কিন্তু মুসলমানের মহাপুণ্য। শূকর-মাংস ভোজনে (হারাম্) মুসলমানের মহাপাতক কিন্তু খৃষ্টানের কিছুমাত্র পাপ নাই। জীবহিংসায় জৈন ও বৌদ্ধের মহাপাতক, অপরের তাদৃশ নহে। কেহ বলে, শালীবিবাহ দোষাবহ, কেহ বলে, ইহা আদৌ দোষাবহ নহে: কেহ বলে, বিধবাবিবাহ বৈধ, কেহ বলে ইহা অবৈধ। কোন ধর্ম্ম জাতিভেদ ও উচ্ছিষ্ট প্রথা মানে, কোন ধর্ম্ম ঐ সকল কিছুই মানে না। এই প্রকারে সংসারে ধর্ম্মাধর্ম্ম:সম্বন্ধে নানামুনির নানামত চলিতেছে।

আরও দেখ, নরহত্যা, আত্মহত্যা ও লুণ্ঠন একস্থলে মহাপাপ, অন্যস্থলে উহারা মহাপুণ্য। প্রত্যেক কর্ম্মের উদ্দেশ্য ও ফলাফল দেখিয়া উহার গুণাগুণ বিচার করা কর্ত্তব্য। যে কর্ম্মের দ্বারা সমাজবিশেষের মঙ্গল অশেষরূপে সাধিত হয়, সে কর্ম্ম সে সমাজে প্রশংসনীয়, যশস্কর ও পুণ্যদায়ক। আর যে কর্ম্ম দ্বারা

সমাজবিশেষের অমঙ্গল সাধিত হয়, সে কর্ম্ম সে সমাজে গর্হিত, অযশস্কর ও পাপজনক।

তুমি সমাজস্থ কোন ব্যক্তিকে ক্রোধপরবশ হইয়া বা কোন দুরভিসন্ধি পূরণার্থ হত্যা কর, তুমি স্বদেশপ্রতিষ্ঠিত রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবে, স্বসমাজে নিন্দনীয় হইবে এবং স্ব বিবেকের নিকট অপরাধী হইয়া ঈশ্বরের নিকট, ধর্ম্মের নিকট মহাপাপী হইবে। অপর পক্ষে তুমি আত্মরক্ষার্থ আততায়ীর প্রাণবধ কর, তুমি রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবে না, স্ববিবেকের নিকট অপরাধী হইয়া ধর্ম্মের নিকট মহাপাপী হইবে না; অথবা সংগ্রামক্ষেত্রে স্বদেশ রক্ষার্থ বা অন্য দেশ বিজয়ার্থ তুমি সহস্র সহস্র নরহত্যা কর, তোমার স্বজাতীয়েরা তোমার পাদপূজা করিবে, তুমিও জয়োল্লাসে অপার আনন্দনীরে অভিষিক্ত হইবে এবং সকলেই তোমার যশোগুণ মুক্তকণ্ঠে কীর্ত্তন করিবে।

তুমি সমাজের কোন ব্যক্তিকে লুণ্ঠন কর, তুমি রাজদ্বারে দণ্ডিত হইবে এবং সমাজের লোকেরা তোমার উপর খড়্গহস্ত হইবে। কিন্তু সৈন্য সামন্ত লইয়া তুমি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হও এবং গ্রামের পর গ্রাম, নগরের পর নগর দগ্ধ করিতে করিতে অন্যদেশ লুণ্ঠন কর, তুমি স্বসমাজে বীর বলিয়া পূজিত হইবে এবং স্বদেশের ইতিহাসও তোমার শৌর্য্যবীর্য্যের অশেষ প্রশংসা জলদাক্ষরে ঘোষণা করিবে।

তুমি আত্মহত্যা করিতে চেষ্টা পাও, রাজদ্বারে দণ্ডিত হইবে। শাস্ত্রানুসারেও আত্মহত্যা করা মহাপাপ। কিন্তু স্বর্গাদপি গরীয়সী মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বা ইহাকে পরাধীনতাশৃঙ্খল হইতে উদ্ধার করিবার মানসে সংগ্রামক্ষেত্রে অশেষ বীরত্ব দেখাইয়া প্রাণবিসর্জ্জন কর, তুমি শাস্ত্রানুসারে সশরীরে স্বর্গারোহণ করিবে এবং জাতীয় ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইবে, অথবা স্মরণার্থ তোমার প্রতিমূর্ত্তি মহাসমারোহে দেশের মহানগরীতে স্থাপিত হইবে। উপরোক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝা যায়, ধর্ম্মাধর্ম্মের গতি এ সংসারে কত সূক্ষ্ম ও কত জটিল।

ন্যায়ের ফাঁকি নৈয়ায়িক পণ্ডিত বুঝেন; আইনের ফাঁকি উকিলবাবু বুঝেন, ঔষধের ফাঁকি ডাক্তারবাবু বুঝেন। সেইরূপ ধর্ম্মশাস্ত্রেরও অনেক ফাঁকি আছে, যাহা পণ্ডিতগণ বুঝেন। তাহার সাক্ষ্য দেখ, মিথ্যা কথা কহিলে পাপ

হয় এবং সত্যকথা কহিলে পুণ্য হয়। কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্র বলে,"সত্যং ব্রূয়াৎ নানৃতং ব্রূয়াৎ, ন সত্যমপ্রিয়ঞ্চ ব্রূয়াৎ" সদা সত্য কথা বলিবে, মিথ্যা বলিবে না, আর অপ্রিয় সত্য কথাও বলিবে না। ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই, সদা সত্য বলিবে, মিথ্যা বলিবে না, আর যদি সত্য কথা বলিলে লোকবিশেষের বা সমাজের মহৎ অনিষ্ট ঘটে, তাহা বলিবে না। তবে দেখ, সত্য কথার প্রকৃত মাহাত্ম্য থাকিতেছে না। ধর্ম্মশাস্ত্র স্থলবিশেষে আমাদিগকে মিথ্যা কথাও কহিতে বলে।

আরও দেখ, যদি কোন লোক দৈবদুর্ব্বিপাক বশতঃ অকারণ হত্যা করিয়া রাজদ্বারে অভিযুক্ত হয়, তাহার পক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া তাহাকে ফাঁসিকাষ্ঠ হইতে রক্ষা করা কি ধর্ম্মসঙ্গত নয়? আইনের চক্ষে ইহা কদাচ ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে না। যে উকিল বা ব্যারিষ্টার হত্যাকারীর পক্ষ সমর্থন করেন, তিনি যদি সাক্ষীর জেরায় গোলমাল বাঁধাইয়া আইনের ফাঁকি বাহির করিয়া আসামীকে ফাঁসি হইতে বাঁচান, চতুর্দ্দিকে তাঁহার বাহবা পড়িয়া যায়। এরূপ স্থলে ধর্ম্মাধর্ম্মের মীমাংসা করা সুকঠিন।

সংসারে এমন অনেক নৃশংস ও অত্যাচারীপুরুষ আছেন, যাঁহারা আইনের অন্তরালে থাকিয়া অপরের নিকট অপরিমিত সুদ খাইয়া বা অমানুষিক অত্যাচার করিয়া আপনাদের বিষয়সম্পত্তি বৃদ্ধি করেন। ঈদৃশ লোকদিগকে শাসন করিবার জন্য তাঁন্তিয়া ভীলের ন্যায় দস্যু যদি উহাদিগকে লুণ্ঠন করে এবং লুণ্ঠিত দ্রব্য অকাতরে দরিদ্রদিগের মধ্যে বিতরণ করে, আইনানুসারে সে ব্যক্তি দণ্ডার্হ হইলেও ধর্ম্মানুসারে সে লোক কি মহাপাপী? এরূপ স্থলে ধর্ম্মাধর্ম্ম মীমাংসা করা সুকঠিন।

সংসারে এই প্রকার অনেক ঘটনা ঘটিতেছে, যে স্থলে ধর্ম্মাধর্ম্ম মীমাংসা করা সুকঠিন। এজন্য শাস্ত্রকারেরা বলেন :—

বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।

(মহাভারতং)

"চতুর্ব্বেদ ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী, স্মৃতিগুলিও ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করে। এমন মুনি নাই, যাঁহার মতামত বিভিন্ন নয়। প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্ব পর্ব্বতগুহায় লুকায়িত আছে, (লোকে তাহা জানে না) দেশের গণ্যমান্য লোকেরা যে পথ অবলম্বন করিবেন, তাহাই সকলের পক্ষে সুপথ (দেশের বড় বড় লোকেরা যদি জাতিভেদ না মানেন ও বিধবা বিবাহ দেন, তোমাদেরও তাহাই করা উচিত)।

ধর্ম্মাধর্ম্ম মীমাংসা করিতে গিয়া শাস্ত্রকারেরা বিষম বিভ্রাটে পতিত হইয়া ঐরূপ লিখিয়া যান। তবে উহাদের মীমাংসা কি প্রকারে করিলে যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে? সাধারণতঃ উহাদের বিচার চারিপ্রকারে করা উচিত যথা :—

(১) শাস্ত্রাদেশমত।

(২) বিবেকাদেশ মত।

(৩) সামাজিক হিতবাদ মত।

(৪) লোকমুখে।

প্রথমতঃ—যাহা শাস্ত্রসম্মত, তাহাই ধর্ম্ম এবং যাহা ইহার বিরুদ্ধ, তাহাই অধর্ম্ম। যদি শাস্ত্রে তোমার অটল বিশ্বাস থাকে, ইহার উপদেশমত ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার করিয়া চলিবে।

দ্বিতীয়তঃ—যদি নানাশাস্ত্র পাঠ করিয়া হিন্দুশাস্ত্রে তোমার অবিশ্বাস জন্মে, হৃদয়স্থ বিবেক যাহা উপদেশ দিবে, তাহাই তোমার ধর্ম্মাধর্ম্ম। যাহা ইহার মতে ধর্ম্ম, তাহাতেই তোমার পুণ্যলাভ, আর যাহা ইহার মতে অধর্ম্ম, তাহাতেই তোমার পাপ। নানা লোকের বিবেক বিভিন্ন হইলেও প্রত্যেকে নিজ নিজ বিবেকানুযায়ী পাপপুণ্যের ভাগী হইয়া থাকে।

তৃতীয়তঃ—বিজ্ঞান সব গোলযোগ মিটাইয়া স্পষ্ট বলে, যাহা পাঁচজনের ইষ্ট, তাহাই তোমার ধর্ম্ম, আর যাহা পাঁচজনের অনিষ্ট, তাহাই তোমার অধর্ম্ম।

চতুর্থতঃ—আমি শাস্ত্র, বিজ্ঞান কিছুই জানি না; দেশের পাঁচজনে যাহাকে ধর্ম্ম বলে, তাহাই আমার ধর্ম্ম এবং উহারা যাহাকে অধর্ম্ম বলে, তাহাই আমার অধর্ম্ম। আমি উহাদের কথামত চলিব।

স্বাধীনইচ্ছা ও দৈবইচ্ছা।

পাপপুণ্যবিচারে একটা মহৎ প্রশ্ন সময়ে সময়ে উত্থিত হইয়া থাকে, মানবের স্বাধীন ইচ্ছা, না দৈব ইচ্ছা বলবতী? স্বাধীন ইচ্ছা বলবতী না হইলে তিনি কি প্রকারে নিজকৃত পাপপুণ্যের জন্য দায়ী হইয়া কালক্ষেত্রে নূতন নূতন কর্ম্ম-বীজ রোপণ করিবেন? আবার দৈবইচ্ছা বলবতী না হইলে আমরা কি প্রকারে নিজ নিজ প্রাক্তন কর্ম্মফল ভোগ করিব?

পাশ্চাত্য জগৎ এ সংসারকে পরীক্ষাক্ষেত্র মনে করিয়া স্বাধীন ইচ্ছার যত অধিক প্রাধান্য স্বীকার করে, দৈব ইচ্ছার ততদূর স্বীকার করে না। অপর পক্ষে প্রাচ্যজগৎ কর্ম্মফলে বিশ্বাস করে বলিয়া দৈব ইচ্ছার যত অধিক প্রাধান্য স্বীকার করে, স্বাধীন ইচ্ছার ততদূর করে না। এখন কাহাদের মত সত্য, তাহাই এস্থলে বিচার্য্য।

অগত্যা হিন্দুশাস্ত্র আমাদিগকে উপদেশ দেয়:—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।
(গীতা)

"হে অর্জ্জুন! যেমন সূত্রধর দারুযন্ত্রে আরূঢ় পুত্তলিগণকে ইচ্ছামত নাচায়, সেইরূপ ঈশ্বরও সকল জীবের হৃদয়ে থাকিয়া নিজ মায়া দ্বারা সকলকে নাচাই-তেছেন। তোমার আমার ইচ্ছায় কিছুই হয় না, সকলই ভগবদিচ্ছায় ঘটিতেছে।"

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ
জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।

"আমি ধর্ম্ম জানি; কিন্তু তাহাতে আমার প্রবৃত্তি নাই। আমি অধর্ম্মও জানি; কিন্তু তাহাতে আমার নিবৃত্তি নাই। হে হৃষীকেশ! তুমি আমার হৃদয়াভ্যন্তরে থাকিয়া আমাকে যেমন প্রেরণ কর, আমি সেইরূপ করি।"

ধর্ম্মাধর্ম্ম জানিলেই বা কি হইবে? ঈশ্বর যেমন করাইবেন, তুমি তেমনি করিবে। কোথায় বা তোমার স্বাধীন ইচ্ছা? কোথায় বা তোমার বিবেক? সকলই সে জনার ইচ্ছা জানিবে।

এস্থলে একেশ্বরবাদী বলিবেন, হিন্দুশাস্ত্রকার কিরূপ অর্ব্বাচীন! এমন কথাও কি শাস্ত্রে লিখিতে আছে, আমি ধর্ম্ম জানি, অথচ তাহা করিব না, অধর্ম্মও জানি, অথচ তাহা ত্যাগ করিব না? অধর্ম্মের প্রশ্রয় যতদূর দিতে পারা যায়, তাহাই এই এক শ্লোক দ্বারা দেওয়া হইতেছে। এমন অপদার্থ শ্লোক কেন শাস্ত্রে লেখা হইল?

এস্থলে শাস্ত্রকারের উদ্দেশ্য মহৎ। হিন্দুধর্ম্ম স্বাধীন ইচ্ছার পরিবর্ত্তে দৈব ইচ্ছার অধিক প্রাধান্য স্বীকার করে বলিয়া ঐরূপ উপদেশ দিতেছে। তাঁহাদের এমন উদ্দেশ্য নয়, তুমি ধর্ম্ম জানিয়াও তাহা করিবে না, অধর্ম্ম জানিয়াও তাহা ত্যাগ করিবে না। এই শ্লোকের প্রধান তাৎপর্য্য, আমরা সূক্ষ্ম জগৎস্থ দেবতাদিগের হস্তে ক্রীড়াপুত্তলি মাত্র। তাঁহারা উপর হইতে যেমন কল টিপিতেছেন, আমরা তেমনি পালা গাহিতেছি, নাচিতেছি, হাসিতেছি ও কাঁদিতেছি।

যখন ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ের অভ্যন্তরে থাকিয়া আমাদিগকে যে ভাবে চালান, আমরা সেই ভাবে চলি, তখন তিনিই আমাদের দ্বারা পাপকর্ম্ম করাইয়া অনেকের নিগ্রহ করান বা সৎকর্ম্ম করাইয়া উহাদের মঙ্গল করান। তুমি আমি সংসারে নিমিত্ত মাত্র। তাঁহারই ইচ্ছানুসারে সকল ঘটিতেছে। সংসারের ঘটনাচক্র এমন জটিল, যে কিছুই বুঝা যায় না। চক্রীর চক্র কে বুঝিতে পারে? তাঁহার অঘটনঘটনপটিয়সী মায়া কে বুঝিতে পারে?

যদি ঈশ্বর বা দেবগণ আমাদের দ্বারা সকল করান, প্রকৃত প্রস্তাবে আমরা কর্ত্তা হই না; কিন্তু যখন সমস্ত ফলাফল আমাদিগকে ভোগ করিতে হয় বা সমস্ত হাঙ্গাম আমাদিগকে পোয়াইতে হয়, তখন যথার্থতঃ আমরাই কর্ত্তা।

মনে কর হিন্দুশাস্ত্রের কথা সম্পূর্ণ অমূলক এবং সংসারের ঘটনাচক্রে দৈব-ইচ্ছার অনুশাসন আদৌ নাই, আমরা কেবল নিজ নিজ স্বাধীন ইচ্ছানুসারে সকল কার্য্য করিয়া পাপপুণ্যের ভাগী হই। সাধারণতঃ এইরূপ বোধ হয় বটে, কিন্তু ইহার ভিতর গূঢ় রহস্য আছে।

যখন দেখি, মানবমাত্রেই চতুর্দ্দিকস্থ অবস্থাপরম্পরার দাস, তাঁহার স্বাধীন ইচ্ছা যেরূপ হউক না কেন, চতুর্দ্দিকস্থ অবস্থাস্রোত তাঁহাকে যে ভাবে চালিত করে, তিনি সেই ভাবে চালিত হন, তখন তিনি কিরূপে নিজকৃত পাপপুণ্যের জন্য দায়ী হইলেন? যখন দেখি, পিতৃমাতৃদত্ত বা প্রকৃতিদত্ত গুণাগুণবশতঃ ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বা নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি হৃদয়ে সমধিক বলবতী হইয়া স্বাধীন ইচ্ছাকে চালিত করত তাঁহাকে ধর্ম্মাধর্ম্মে প্রণোদিত করে, তখন তিনি কি প্রকারে নিজকৃত পাপপুণ্যের জন্য দায়ী হইলেন? যখন দেখি, গ্রহাদির সঞ্চার বা অদৃষ্ট বশতঃ তিনি বিবিধ সদসৎ কর্ম্ম করেন, তখন তিনি কিরূপে নিজকৃত পাপপুণ্যের জন্য দায়ী হইবেন? সকলকে প্রবোধ দিবার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেন—

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চ সুকৃতং বিভুঃ
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ।

(গীতা)

"ঈশ্বর কাহারও পাপপুণ্য গ্রহণ করেন না। আমাদের জ্ঞান অজ্ঞানে আবৃত, সে জন্য আমরা মোহান্ধ হইয়া কিছুই বুঝিতে পারি না।"

মানবমাত্রেই নিজ নিজ কর্ম্মফলে আবদ্ধ। এই কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য তিনি এ জগতে আইসেন। সকলের কর্ম্মফল সুচারুরূপে বিতরণ করিবার জন্য সংসারে দৈব ইচ্ছা বলবতী। এই দৈব ইচ্ছা, ঈশ্বরের ইচ্ছা বা দেবতাদিগের ইচ্ছা তোমার স্বাধীন ইচ্ছাকে অনুশাসিত করিয়া বিবিধ সদসৎ কর্ম্মে প্রেরণ করত পাঁচ জনের নিগ্রহ করায় বা পাঁচ জনের মঙ্গল করায়। গ্রহবৈলক্ষণ্য থাকিলে বা দুরদৃষ্টবশতঃ দৈব ইচ্ছায় তুমি নানাদিকে নানা কষ্ট পাও, শুভগ্রহ বা শুভাদৃষ্ট বশতঃ দৈবইচ্ছায় তুমি নানাদিকে সুখ ভোগ কর।

এই দৈব ইচ্ছার অনুশাসন তোমার চতুর্দ্দিকস্থ অবস্থাপরম্পরার উপর পূর্ণভাবে চালিত হইয়া থাকে। যে স্থলে যেরূপে, বা যে লোক মারফৎ তোমার অদৃষ্টচক্র পরিবর্ত্তিত হইবে, সে স্থলে সেইরূপে বা সেই লোক মারফৎ তোমার পক্ষে বা বিপক্ষে নানা সুযোগ বা কুযোগ আনয়ন করিবে। এই দৈব ইচ্ছা তোমার স্বাধীন ইচ্ছাকে অনুক্ষণ চালিত করিতেছে; এজন্য উহা যেরূপ হউক

না কেন, তুমি চতুর্দ্দিকস্থ অবস্থাপরম্পরার দাস এবং তোমার অদৃষ্ট বা নিয়তি সম্পূর্ণরূপে দৈবাধীন।

অনেক স্থলে তোমার স্বাধীন ইচ্ছা দৈবইচ্ছার সমক্ষে পিপীলিকাবৎ দলিত হইয়া যায়। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, রাষ্ট্রবিপ্লব প্রভৃতি দুর্ঘটনায় লোকের স্বাধীন ইচ্ছা কি করিতে পারে? তৎকালে সকলকে দৈবনিয়তির সমক্ষে মস্তক অবনত করিতেই হয়।

অপর পক্ষে তোমার মন স্বাধীন ইচ্ছায় ও বিবেকে বিভূষিত বলিয়া তুমি উহাদের প্ররোচনায় বিবিধ সদসৎ কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে নূতন নূতন কর্ম্মবীজ রোপন কর এবং উহাদের ফলাফল ইহজন্মে বা পরজন্মে তোমায় ভোগ করিতে হয়। অতএব স্থিরনিশ্চয় জানিবে, একদিকে যেমন তুমি প্রাক্তন কর্ম্মফল ভোগের জন্য দৈবের অনুশাসনে সম্পূর্ণরূপ চালিত হইতেছ, অপর দিকে নিজের স্বাধীন ইচ্ছাবশতঃ নূতন নূতন কর্ম্ম করিয়া নূতন নূতন পাপ-পুণ্যের জন্য দায়ী হইতেছে।

আমরা মনে করি, আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা মনে নানাবিধ চিন্তা আনয়ন করিয়া বিবিধ কর্ম্মে আমাদিগকে প্রেরণ করে এবং তদনুরূপ ফলভাগী করে। কিন্তু বিশেষরূপে অনুধাবন করিলে বুঝা যায়, অনেক সময়ে দৈব ইচ্ছা আমাদের চিন্তারাশিকে পরিচালিত করিয়া বিবিধ কর্ম্মে প্রেরণ করে ও প্রাক্তন কর্ম্মফল প্রদান করে। হৃদয়স্থ চিন্তারাজ্যে স্বাধীন ইচ্ছার বা দৈব ইচ্ছার অনুশাসন কতদূর চলিতেছে, তাহা কীটাণুকীট মানব কি বুঝিবেন? তিনি এইমাত্র জানেন, আমিই ভাবিতেছি; কিন্তু কে তাঁহাকে ঐরূপ ভাবায়, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন না। তিনি ত দেবতাদিগের হস্তে ক্রীড়া-পুত্তলি মাত্র। তাঁহারা তাঁহাকে যেরূপ ভাবাইবেন, তিনি সেইরূপ ভাবিবেন। তাঁহার নিজের এবং অপর পাঁচ জনের কর্ম্মফল দিবার জন্য তাঁহারা তাঁহাকে ঐরূপ ভাবাইয়া বিবিধ কর্ম্মে প্রেরণ করেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেন :—

স্বেন কর্ম্মণানিবদ্ধো যৎ তৎ কর্ত্তুং
নেচ্ছসি কর্ত্তব্যামবশস্তমেবতৎ।

(গীতা)

"তুমি যাহা এখন (স্বাধীন ইচ্ছার প্রেরণে) করিতে ইচ্ছা করিতেছ না, নিজ কর্মফলে আবদ্ধ বলিয়া (দৈব ইচ্ছা বশতঃ তুমি তাহা করিতে অবশ্য বাধ্য হইবে।" প্রত্যেক মানবের জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটে, যে স্থলে তাঁহার স্বাধীন ইচ্ছা কোথায় চলিয়া যায় এবং তাঁহাকে অবস্থানুযায়ী বা দৈবইচ্ছানুসারে নানা ভাবনা ভাবিতে হয় ও সেইরূপ কার্য্য করিতে হয়। ইহাতে সিদ্ধান্ত করা উচিত, কর্মফল হইতে জীবনের যে সকল সুখদুঃখ উৎপন্ন হয়, তাহা অধিক পরিমাণে দৈব ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।

শাস্ত্রে পাঠ করি

কর্ম্মণা বাধ্যতে বুদ্ধিঃ

ন বুদ্ধিঃ কর্ম্মবাধিকা।

"প্রত্যেক মানবের বুদ্ধি নিজ নিজ কর্মফলে বাঁধা, আবার সেই বুদ্ধি তাঁহার কর্ম্মফল যেমন হইবে, তোমার মনে তদনুরূপ চিন্তার উদয় হইবে। সংসারে সকলের মন এক এক প্রকার চিন্তাব্যূহে জড়িত। পাপাত্মার মনে নানা পাপচিন্তার উদয় হয়, ধর্ম্মাত্মার মনে নানা ধর্ম্মচিন্তার উদয় হয়। মামলা-বাজ কেবল মামলার কথা ভাবে। ঘোর সাংসারিক কেবল স্ত্রীপুত্রের জন্য ভাবে। এই সকল চিন্তা করিয়া উহারা কর্ম্মক্ষেত্রে নানাবিধ কর্ম্ম করিয়া নিজের কর্ম্মফল ভোগ করে এবং ভবিষ্যতের জন্য কর্ম্মবীজ রোপন করে। এখন যাহাকে যেরূপ কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইবে, তদীয় মনে তদনুরূপ চিন্তার উদয় হইবে। নিজ নিজ কর্ম্মফলে বাধ্য হইয়া সে সেইরূপ চিন্তা করিবে, অন্য চিন্তা কদাচ করিবে না। আবার বুদ্ধি বা হৃদয়স্থ চিন্তা আমাদের কর্ম্মফল ভোগে বাধা দিতে পারে না। তোমার মনের চিন্তা যেমন হউক না কেন, তোমার কর্ম্মফল তোমার জীবনে নিশ্চয়ই ফলিবে। তুমি নিজ বুদ্ধির বা স্বাধীন ইচ্ছার প্রেরণে যেরূপ ভাব না কেন, যাহা তোমার অদৃষ্টের লিখন বা বিধাতার ভবিতব্য, তাহা অবশ্যই ঘটিবে। নিজ নিজ জীবনের অতীত ঘটনা স্মরণ করিয়া দেখ এ কথা অমোঘ সত্য বলিয়া বুঝিতে পারিবে।

এ সংসারে সকলই বুদ্ধিমান ও মহাজ্ঞানী। যে ব্যক্তি গণ্ডমূর্খ, সেও ভাবে, আমার মত বুদ্ধিমান ও বোঝদার আর কে আছে? পণ্ডিত যিনি, তিনি ত নিজ জ্ঞানের বড়াই লইয়া মরে আছেন। তবে জিজ্ঞাসা করি, কেন সকলে

নানা সময়ে নানা ভুলচুক করিয়া বসে? কেন উহাদের এমন দুর্ব্বুদ্ধি ঘটে, যে জন্য ঘোর বিপদে বা কষ্টে পড়িয়া চিরদিন অনুতাপনলে দগ্ধ হইতে থাকে? সংসারে দৈব ইচ্ছা বলবতী বলিয়া, উহার প্রেরণে উহারা ভুলচুক্ করিয়া নিজের কর্ম্মফল ভোগ করে।

সোণার মৃগ ত কেহ কখন দেখে নাই। তবে কেন শ্রীরামচন্দ্র এত বড় বুদ্ধিমান হইয়া স্বর্ণ মৃগের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন? জগতের মহৎ কার্য্য সাধনের জন্য দেবতারা তাঁহার ঐরূপ বুদ্ধিভ্রংশ ঘটান। লোকবর্গের কর্ম্মফল দিবার জন্য দেবতারা এইরূপে লোকবিশেষের বুদ্ধিভ্রংশ ঘটাইয়া থাকেন। সংসারে দৈবইচ্ছাই বলবতী; ইহার সমক্ষে কীটাণুকীট মানবের ইচ্ছা কোন্ ছার!

রাজদণ্ডবিধি।

কলিকালে হৃদয়ের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিগুলি এমন বলবতী, যে অনেকে উহাদের সম্যক চরিতার্থতার জন্য শাস্ত্রাদেশ, বিবেকবাণী ও মানাপমান সকলই তুচ্ছ করিয়া অসৎপথে ধাবিত হয়। এই সকল দুশ্চরিত্র লোকদিগের শাসনের জন্য ধর্ম্ম যতই কেন উপায় অবলম্বন করুক না,উহার সকল চেষ্টা অনেক সময়ে ব্যর্থ হইয়া থাকে। কামিনীকাঞ্চনের জন্য, স্বার্থসিদ্ধির জন্য উদ্দাম কাম, ক্রোধ ও লোভের বশীভূত হইয়া উহারা সমাজের ঘোর অনিষ্ট সাধন করে। উহাদের সুশাসনের জন্য সমাজে রাজদণ্ডের একান্ত আবশ্যক।

অতি পুরাকাল হইতে রাজদণ্ডবিধি সকল দেশে প্রচলিত আছে। চৌর্য্য নরহত্যাদি যে সকল দুষ্কর্ম্ম সমাজের অতীব অনিষ্টকারক, তন্নিবারণার্থ রাজ-দণ্ড সকল দেশে নানাবিধ শারীরিক যন্ত্রণা দিয়া সকলকে কঠোর ভাবে শাসন করে। এই রাজদণ্ডভয়ে জনসাধারণ কোনরূপ অসৎকর্ম্মে বা বে-আইনী কাজে হস্তক্ষেপ করিতে চায় না।

দেখ, রাজদণ্ড কত কঠোর ভাবে লোকশাসন করিতেছে! অর্থদণ্ড, বেত্রাঘাত, কারাবাস; দ্বীপান্তরবাস, প্রাণদণ্ড প্রভৃতি যে সকল দণ্ড শাসনতন্ত্র বিধান করে, তাহাতেও লোকশাসন ভালরূপ হয় না। তাহার সাক্ষ্য, সংসারে কত দাঙ্গাবাজ, ফোরেববাজ, চোর,ডাকাত ও গুণ্ডা আইনের চক্ষে ধুলি দিয়া

আপনাদের বদমাইসী নানাদিকে চালাইতেছে। দণ্ডবিধি এরূপ লোকের সুশাসন করিতে পারে না।

রাজতন্ত্র এরূপ দুশ্চরিত্র লোকদিগকে কারাগারে নিক্ষেপ করে। সকল দেশের কারাগারগুলি নরককুণ্ডস্বরূপ। ইহাদের কষ্টরাশি ও যন্ত্রণারাশির বিষয় ভাবিলে কাহার না অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিবে ও মুখমণ্ডল পরিশুষ্ক হইয়া যাইবে? ভদ্র লোকের পক্ষে কারাবাস দুঃসহ যন্ত্রণাদায়ক। লোকে রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইলে, যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া কারাদণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইবার চেষ্টা পায়। অনেকে দুরভিসন্ধি পূরণার্থ দুষ্কর্ম্ম বা বে-আইনী কাজ করিয়া কারাদণ্ড ভোগ করে; আবার অনেকে গ্রহবৈলক্ষণ্যবশতঃ বিপাকে পড়িয়া রাজদণ্ড ভোগ করে। সংসারে কত কত নিরীহ নিরপরাধ লোক পাপিষ্ঠদিগের ষড়যন্ত্রে রাজদ্বারে নিগ্রহ ভোগ করিতেছে! শান্তিরক্ষক পুলিশ কর্ম্মচারীবর্গ রূপচাঁদের লোভে কত নিরীহকে জেলে দিতেছে ও কত বদ্‌মাসকে ছাড়িয়া দিতেছে।

সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে রাজদণ্ডবিহিত শারীরিক যন্ত্রণা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। পূর্ব্বে সামান্য অপরাধীকে শূলে দেওয়া হইত বা কুকুরকে দিয়া খাওয়ান হইত। সে সকল বিভৎস দণ্ড এখন আর কোন দেশে প্রচলিত নাই। সুসভ্য দেশে কারাগারের বন্দোবস্ত ক্রমশঃ উৎকৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু কারাগারে লোকের চরিত্র আরও দূষিত হয়। দেশের যত বদমাইস, উহারা প্রায় নানা জেলে নিক্ষিপ্ত হয়। ইহাতে কুসংসর্গবশতঃ ভাললোকও দুশ্চরিত্র হইয়া উঠে। আবার জেল হইতে ফিরিয়া আসিবার পর অনেকের মানাপমানজ্ঞান ও জেলের ভয় হ্রাস পায়; ইহাতে উহারা আরও দুষ্কর্ম্মশীল হইয়া উঠে। এমন সুদিন কবে হইবে, যে দিন শাসনতন্ত্র কারাগারের সুবন্দোবস্ত করিয়া দুশ্চরিত্র লোকদিগের চরিত্র সংশোধন করিতে সাধ্যমত চেষ্টা পাইবে।

ধর্ম্মনীতি ও রাজনীতি উভয়েই সমাজ শাসন করিতেছে। প্রভেদের মধ্যে প্রথমোক্ত ইহাকে সাত্ত্বিকভাবে শাসন করে, আর শেষোক্ত ইহাকে রাজসিক ভাবে শাসন করে। মনে কর, যেমন বিজ্ঞান বলে, আমাদের যাবতীয় পাপ পুণ্য সর্ব্বথা অমূলক এবং উহারা একমাত্র সমাজের মঙ্গলামঙ্গল হইতে উত্থিত, তথাচ যে ধর্ম্ম সামাজিক হিতাহিতকে পাপপুণ্য নামে অভিহিত করিয়া হৃদয়ের

গভীরতম প্রদেশে চিরাঙ্কিত করে, সকলের বিবেককে তদনুসারে গঠিত করে পুণ্যের নামে সকলকে সমাজের মঙ্গলদায়ক সৎ কর্ম্মানুষ্ঠানে স্বতঃ প্রোৎসাহিত করে, এবং পারৎপক্ষে অসৎকর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতে দেয় না, সে ধর্ম্মের যাবতীয় বিধিব্যবস্থা সাত্ত্বিক ভাবে করা হয়; আর যে রাজনীতি ইহার দণ্ডবিধি দ্বারা বিবিধ শারীরিক যন্ত্রণা প্রদান পূর্ব্বক সাধারণের মনে ভীতি উৎপাদন করত সমাজের গর্হিত কর্ম্মসম্পাদনে উহাদিগকে সংযত রাখে, সে রাজনীতির বিধি-ব্যবস্থা রাজসিক বলিয়া মনে হয়। সাত্ত্বিক হউক বা রাজসিক হউক, প্রজা-বর্গের ধনপ্রাণ সুরক্ষিত করিয়া রাজ্যের সুশাসন ও শ্রীবৃদ্ধিসাধন করাই রাজ-দণ্ডের প্রধান উদ্দেশ্য।

আজকাল সুসভ্যদেশে ধর্ম্মনীতি অপেক্ষা রাজনীতির প্রাধান্য অধিক। এজন্য ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত দণ্ডবিধির কোনরূপ সংশ্রব নাই। কিন্তু পুরাকালে এদেশে রাজনীতি অপেক্ষা ধর্ম্মনীতির অধিক প্রাধান্য থাকায় ধর্ম্মশাস্ত্র সমাজ শাসনের জন্য দণ্ডবিধি প্রণয়ন করিত এবং রাজন্যবর্গকে অনেক বিষয়ে সংযত রাখিত। তাঁহারা যথেচ্ছাচারী হইলেও ব্রাহ্মণদিগের সুপরামর্শে চলিয়া প্রজাবর্গের উপর কোনরূপ অত্যাচার করিতেন না।

এদেশে ব্রাহ্মণদিগের ক্ষমতা অধিক বলিয়া তাঁহারা চিরদিন হিন্দুসমাজকে ধর্ম্মভাবে ও সাত্ত্বিকভাবে শাসন করিয়া আসিতেছেন। রাজদণ্ড যে সকল মঙ্গলদায়ক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে না, সে সকল বিষয়ে প্রায়শ্চিত্তাদি বিধান দিয়া তাঁহারা সমাজ শাসন করিতেছেন। তাঁহাদের গুণে জনসাধারণ এখনও নিতান্ত ধর্ম্মভীরু ও ধর্ম্মপরায়ণ।

প্রায়শ্চিত্তবিধান।

ধর্ম্মশাস্ত্রে নানা প্রায়শ্চিত্তবিধান বিধিবদ্ধ আছে। এখনও ভারতের নানা অঞ্চলে উহারা যথাবিধি পালিত হইতেছে। তত্রত্য জনসাধারণ অধ্যাপকবর্গের ব্যবস্থা মতে চলিয়া থাকে। কিন্তু আমাদের সুশিক্ষিত বান্ধবগণ এ সকল ব্যবস্থা অন্য কোন ধর্ম্মে না দেখিতে পাইয়া উহাদিগকে হিন্দুধর্ম্মের কুসংস্কার মনে করেন। তাঁহাদের মঙ্গলার্থে প্রায়শ্চিত্তবিধানের গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

শাস্ত্রোক্ত প্রায়শ্চিত্তবিধানের চারিটী মুখ্য উদ্দেশ্য আছে।

(১) পাপক্ষয়।

(২) রোগশান্তি।

(৩) ধর্ম্মযাজকদিগের প্রভুত্ববিস্তার।

(৪) সাত্ত্বিকভাবে সমাজশাসন।

কলিকাল কেবল পাপেভরা। ষড়রিপুর বশীভূত হইয়া লোকে কত দিকে কত পাপ না করিতেছে! মিথ্যাকথন, চৌর্য্য, প্রতারণা, জীবহত্যা, নরহত্যা, সতীত্বহরণ, বলাৎকার প্রভৃতি নানা কুকর্ম্ম করিয়া অনেকে পাপভাগী হইয়া থাকে। যথার্থ বলিতে কি, আমরা উঠ্‌তে বস্‌তে পাপ করি এবং অনেক সময় জানিয়া শুনিয়া পাপ করি। অপরের মনে কষ্ট দিলেই পাপভাগী হইতে হয়। একমাত্র পাপকর্ম্ম হইতে আমরা সংসারে নানা রোগশোকে জর্জ্জরীভূত হই।

এই সকল পাপ হইতে মুক্তি লাভের জন্য হিন্দুধর্ম্ম নানাবিধ প্রায়শ্চিত্ত-বিধান উপদেশ দেয়। এখনও অশিক্ষিত সম্প্রদায় পাপক্ষয়ের জন্য ঐ সকল শাস্ত্রোক্ত বিধান অবলম্বন করিয়া থাকে। কুসংস্কার হউক বা সুসংস্কার হউক, যখন উহারা ঐ সকল প্রায়শ্চিত্তকে ধর্ম্মানুষ্ঠান জ্ঞানে অনন্ত ভক্তি ও বিশ্বাসের সহিত সম্পাদন করে, তখন উহারা প্রায়শ্চিত্ত করিয়া নিশ্চয়ই পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। যদি খৃষ্টানেরা একমাত্র ঈশা ভজনা করিয়া এবং মুসলমানেরা পাঁচ বার নামাজ পাঠ করিয়া সমস্ত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে, আমরাও সেইরূপ আন্তরিক ভক্তির সহিত প্রায়-শ্চিত্ত করিয়া পাপ হইতে মুক্তি লাভ করি, কথায় বলে, "ভক্তিতে মুক্তি।"

পাপকর্ম্ম করিলে মনে যে আত্মগ্লানি বোধ হয়, উহাকে অন্যান্য ধর্ম্ম পাপের প্রায়শ্চিত্ত জ্ঞান করে। কিন্তু দেখা যায়, পুনঃ পুনঃ পাপাচরণ করিলে আত্ম-গ্লানি আদৌ অনুভূত হয় না। সেজন্য পাপের দণ্ডবিধানের জন্য হিন্দুধর্ম্ম কেবলমাত্র আত্মগ্লানির উপর নির্ভর করে না।

মনের আত্মগ্লানি পাপের নির্গুণ প্রায়শ্চিত্তমাত্র। ইহাতে নিরাকারোপাসক খৃষ্টানদিগের মনে তৃপ্তি বোধ হইতে পারে; কিন্তু সাকারোপাসক ধর্ম্মাত্মা হিন্দুর মনে তাদৃশ তৃপ্তিবোধ হয় না। সুতরাং পুরাকাল হইতে শাস্ত্র-কারেরা সংসারে পাপকর্ম্মের সম্যক্ শাসনের জন্য নানাবিধ সগুণ প্রায়শ্চিত্ত

বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহারা পাপকে মহাপাপাদি চারি শ্রেণিতে বিভক্ত করিয়া পাপের গুরুত্ব অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত ও তদানুষঙ্গিক ব্যয়ভূষণ নির্দ্ধারিত করিয়া দেন। মহাপাপে যেরূপ কষ্টস্বীকার ও খরচপত্র, উপপাপে তদ্রূপ নহে। যে কাজে যেরূপ কষ্টস্বীকার ও খরচপত্র করিতে হয়, সে কাজ সেইরূপ সকলের মর্ম্মস্থলে বিদ্ধ হয় বা আঁতে লাগে। ইহাতে পাপকর্ম্ম সহজে সমূলে হ্রাস পাইতে থাকে।

যদি তুমি কোনরূপ পাপকর্ম্ম করিয়া আত্মগ্লানি অনুভব কর, তুমি হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে স্ববিবেকের নিকট, না হয় অন্তর্যামী ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইলে বটে; কিন্তু সমাজস্থ কোন ব্যক্তি তোমার পাপকাহিনী স্বকর্ণে শ্রবণ করিল না, তুমিও কাহারও নিকট কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইলে না, সকলকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বচ্ছন্দ মনে বিহার করিতে লাগিলে। ইহাতে বুঝা উচিত, আত্মগ্লানি দ্বারা ভালরূপে সমাজশাসন হয় না।

যেস্থলে অসার খৃষ্টধর্ম্ম একজন খৃষ্টানের পাপকাহিনী পাদরী সাহেবের নিকট গোপনে বর্ণন করাইয়া কেবল মাত্র উহার নিকট তাহাকে কুণ্ঠিত করায়, কিন্তু তদ্দ্বারা সমাজকে ভালরূপ শাসন করিতে পারে না, সে স্থলে তোমার সনাতন হিন্দুধর্ম্ম পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান দিয়া, তুমি যে হও সে হও, তোমার পাপকাহিনী ডঙ্কা বাজাইয়া সমাজে ঘোষণা করত সকলের নিকট তোমায় যথার্থ ভাবে কুণ্ঠিত করায়, তোমার বিস্তর অর্থব্যয় করাইয়া সে বিষয়ে তোমার আরও সাবধান করায় এবং এইরূপে সমগ্র সমাজকে ভালরূপ শাসন করিতেছে।

বিবেকানুভুক্ত আত্মগ্লানিতে সমাজের শিক্ষোপযোগী কোনরূপ সুদৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হয় না। কিন্তু ব্যয়বহুল প্রায়শ্চিত্তবিধান দ্বারা সমাজস্থ যাবতীয় লোক সুদৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হয়; ধর্ম্মভাবে অনুষ্ঠিত হওয়ায় উহাদের ভালরূপ সুশিক্ষা হয় এবং তাহারা অপবাদকারী ও ব্যয়বহুল প্রায়শ্চিত্ত বিধানকে যেরূপ অন্তরের সহিত ভয় করিবে,এমন শাসনতন্ত্রপ্রতিষ্ঠিত কারাগারকেও তত ভয় করিবে না।

ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্ত বিধান নানা প্রকার। সমাজনায়ক ব্রাহ্মণগণ স্বহস্তে

পাপাচারীর দণ্ডবিধানের জন্য এসকল ধর্ম্মানুষ্ঠান চালাইয়া আসিতেছেন। প্রায়শ্চিত্তবিধানগুলি যথা :—

(১) সান্তপণ।

(২) মহাসান্তপণ।

(৩) প্রজাপত্য।

(৪) অতিকৃচ্ছ।

(৫) পরাক।

(৬) তপ্তকৃচ্ছ।

(৭) কৃচ্ছাতিকৃচ্ছ।

(৮) চান্দ্রায়ণ।

অগম্যাগমন, ব্রহ্মহত্যা, নরহত্যা, গোহত্যা, চৌর্য্যাপরাধ প্রভৃতি নানা গুরুতর দুষ্কর্ম্মে ইহারা প্রযোজ্য। আজকাল চন্দ্রায়ণ ব্যতীত অন্য কোন প্রকার প্রায়শ্চিত্ত দেখা যায় না; যদি সমাজে ধর্ম্মতন্ত্রের ক্ষমতা অধিক থাকিত, অপর গুলিও দেখা যাইত এবং সেই সঙ্গে সংসারে পাপের স্রোত যথার্থভাবে মন্দীভূত হইত। এখনও এ সকল রহিত হইয়া গিয়াছে। ইহাদের বিষয় শাস্ত্রে পাঠ করিতে করিতে আমাদের বিলক্ষণ বিরক্তি জন্মে মাত্র।

এই সকল উৎকৃষ্ট বিধান অন্য কোন ধর্ম্মে দেখা যায় না বলিয়া উহারা যে হিন্দুধর্ম্মের কুসংস্কার, তাহা কদাচ ভাবিও না। জ্ঞানগরিষ্ঠ মহর্ষিগণের জ্ঞানগরিমায় চিরোদ্ভাসিত ভারতের যে কোন বিধান বা অনুষ্ঠান দেখ না তাহাতেই তাঁহারা অগাধ প্রতিভা ও চিন্তাশীলতার পূর্ণ পরিচয় দিয়াছেন। সমাজকে ভালরূপ সুশাসনে রাখিতে হইবে, বল দেখি জাতিভেদ প্রথা এ বিষয়ে যেরূপ সিদ্ধিপ্রদ, এমন আর কোন্ প্রথা আছে? সেইরূপ সমাজে পাপানুষ্ঠান সমূলে নাশ করিতে হইবে, প্রায়শ্চিত্তবিধানের ন্যায় আর কোন অনুষ্ঠান এবিষয়ে এতদূর সিদ্ধিপ্রদ।

কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা রোগশান্তি কি প্রকারে হইবে? যদি ২০০ক্রম হোমিওপ্যাথি ঔষধের ১ ফোঁটা খাইয়া অনেক ব্যাধি আরোগ্য লাভ করে, যদি তারকনাথের বা বদ্রীনাথের চরণামৃত পান করিলে দুঃসাধ্য রোগ আরোগ্য লাভ করে, তবে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা কেন ব্যাধি আরোগ্য

হইবে না? কিসে যে রোগ শান্ত হয়, তাহা কেহ জানে না। আন্তরিক বিশ্বাসে অনেকে রোগমুক্ত হইয়া থাকে। যদি তোমার প্রায়শ্চিত্তের উপর অটল বিশ্বাস থাকে, তুমি তাহাই করিয়া রোগমুক্ত হইবে। যক্ষ্মা, কুষ্ঠ, ক্যান্সার প্রভৃতি এমন অনেক অসাধ্য পীড়া আছে, যাহা পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল বলিয়া সচরাচর বিবেচিত হয়। সে স্থলে যদি পাপক্ষয়ের জন্য চান্দ্রায়ণব্রত করা যায়, তাহাতে ক্ষতি কি? রোগ আরোগ্য না হইলেও ইহাতে ত মনে সৎসাহস বাড়িবে।

সমাজশাসনই প্রায়শ্চিত্তের মহৎ গুণ। দেখ রাজতন্ত্র রাজনীতিবিহিত দণ্ডবিধান করিয়া সমাজকে যতই কেন রাজসিক বা তামসিক ভাবে শাসন করুক না, ধর্ম্মনীতি ইহাকে চিরদিন সাত্ত্বিক ভাবে শাসন করিবে। ইহাকে সাত্ত্বিক ভাবে ও ধর্ম্মভাবে শাসন করিবার জন্য প্রায়শ্চিত্তের ন্যায় স্বর্গীয় ও মহোচ্চ বিধান শাস্ত্রে বিধিবদ্ধ আছে। সমাজের অশেষ মঙ্গলের জন্য ইহারা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। আর যাঁহারা ভাবেন, ব্রাহ্মণঠাকুরেরা প্রতারণা পূর্ব্বক আপনাদের জীবিকানির্ব্বাহার্থে কিঞ্চিৎ আতপচাউল ও কাঞ্চনমুদ্রা পাইবার আশায় এই সকল বিধান দেন, তাঁহারা আদৌ ইহাদের মহোচ্চভাব বুঝিতে পারেন না।

শাসনতন্ত্রের অনুমোদিত বেত্রাঘাত, কারাদণ্ড দ্বীপান্তরবাস ও প্রাণদণ্ড কেবল রাজসিক বা তামসিক দণ্ড। কিন্তু এদেশের ধর্ম্মতন্ত্রের অনুমোদিত প্রায়শ্চিত্ত পাপের সাত্ত্বিক দণ্ড। ইহাতে লোকের যেরূপ সুশিক্ষা হইবে, আজীবন কারাগারে থাকিলেও তাহার শতাংশের একাংশ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাহার সাক্ষ্য দেখ, গোহত্যার জন্য শাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্ত বিধিবদ্ধ আছে। যদি তোমার গাভী অকারণ তোমার দোষে হত হয়, দাঁতে কুটা করিয়া গলায় বস্ত্র দিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া ভিক্ষালব্ধ কড়িতে প্রায়শ্চিত্ত করিলে তুমি গোবধজনিত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবে। এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত বহুকাল হিন্দুসমাজে প্রচলিত থাকায় গোহত্যা আমাদের নিকট মহাপাতক এবং প্রাণ যায়, সেও স্বীকার, তথাপি কোন হিন্দু স্বপ্নেও গোহত্যার বিষয় ভাবিতে পারে না। এইরূপ বহুকাল হইতে বহুপাপের নানা প্রায়শ্চিত্ত থাকাতে ঐ সকল পাপ হিন্দুসমাজে অশ্রুত ছিল।

ধন্য ধর্ম্মাত্মা ব্রাহ্মণগণ! ধন্য তোমাদের বুদ্ধিকৌশল! ধন্য তোমাদের সমাজতত্ত্বজ্ঞান। সমাজস্থ কোন ব্যক্তিকে কারাগারে নিক্ষেপ না করিয়া, দ্বীপান্তর প্রেরণ না করিয়া বা কোনরূপ শারীরিক যন্ত্রণা না দিয়া তোমরা প্রায়শ্চিত্তাদি প্রবর্ত্তন করিয়া স্বসমাজকে যেরূপ সুশাসনে সুশাসিত করিয়াছিলে, সভ্যতাভিমানী ইউরোপবাসী রাজনীতিজ্ঞ দিগ্‌গজ পণ্ডিতগণ বৃহৎ বৃহৎ দণ্ডবিধি প্রণয়ন করিয়া স্বসমাজকে কস্মিন্ কালে সেরূপ সুশাসন করিতে পারিবেন না। তাঁহাদের দণ্ডবিধি, তাঁহাদের আইনকানুন, তাঁহাদের বিচারালয়, সকলই সভ্যতার চিহ্নমাত্র, কিন্তু কাজের বেলায় সমাজশাসন প্রকৃষ্টরূপ হইতেছে না; চৌর্য্যাদি দুষ্কর্ম্মগুলি চিরদিন সমভাবে চলিতেছে। তাঁহারা যতই কেন পাশ্চাত্য সভ্যতার বড়াই করুক না, তাঁহাদের সমাজশাসন অতীব শিথিল। যে দেশে এক গৃহস্বামিনী কয়েক অল্পবয়স্কা সুন্দরী বেশ্যা আমদানি করিয়া বৎসরে লক্ষ টাকার আয় করে, সে দেশে কিসের সভ্যতা! কিসের ধর্ম্ম! কিসের নীতি! সকলই ছারখারে গিয়াছে জানিবে।

অপর পক্ষে আমাদের জাতীয় জীবনে এমন সুসময় গিয়াছে, যখন মিথ্যাকথন, চৌর্য্য, প্রতারণা ও বেশ্যাবৃত্তি প্রভৃতি অসৎকর্ম্মগুলি হিন্দুসমাজে কেহ জানিত না। এখনও পল্লীগ্রামে বেশ্যা দেখা যায় না। কেন যবনদূত মেগাস্থেনিস আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের সততা, সত্যবাদিতা ও ন্যায়পরতার এত সুখ্যাতি করেন? কেন চীনদেশের পরিব্রাজকগণ উঁহাদের এত সুখ্যাতি করেন? হিন্দুধর্ম্মের গুণে, ধর্ম্মাত্মা ব্রাহ্মণদিগের সমাজশাসনের গুণে হিন্দুসমাজ চিরদিন ধর্ম্মভীরু ও ধর্ম্মপরায়ণ। কিন্তু বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, বক্ষঃস্থল অশ্রুজলে প্লাবিত হইতেছে, "তে হি নো দিবসা গতাঃ," হায়! আমাদের সে সকল সুখের দিন এখন কোথায়? পুরাকালের সেই সোণার ভারত এখন রসাতলে ডুবেছে। এই কপটধর্ম্মযুগে আমরা বিজাতীয় বিধর্ম্মী রাজতন্ত্রের শাসনে কেবল কপট ও পাপাচারী হইতেছে।

এখন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ইংরাজের রাজনীতির সহিত অনেক স্থলে আমাদের চিরন্তর ধর্ম্মনীতির বিরোধ ঘটিতেছে। আমরাও চতুর্দ্দিকস্থ অবস্থার তীব্র তাড়নায় কপটতা আশ্রয় করিয়া প্রাণে প্রাণে জাতিধর্ম্ম ও মানসম্ভ্রম রক্ষা করিতে চেষ্টা পাই। যে কৃত্রিম সভ্যতাসুলভ পাপস্রোতে এখন আমরা

বায়ুমান, তাহা প্রত্যাবর্ত্তন করা দুর্ব্বল মানবের সাধ্যাতীত। কোথায় হে বিপদভঞ্জন মধুসূদন! তুমিই আমাদের একমাত্র সহায়।

সপ্তম অধ্যায়।

সুখদুঃখের বিচার।

সংসারে সুখদুঃখের তারতম্য।

এ ভবসংসার কেবল সুখদুঃখে পূর্ণ। চক্রবর্ত্তী অধীশ্বর হইতে কৌপিন-ধারী পথের ভিখারী পর্য্যন্ত সকলের জীবন সুখদুঃখে জড়িত। প্রত্যেক মানব জীবনের কোন না কোন সময়ে সুখসাগরে ভাসমান হন, বা কোন না কোন সময়ে দুঃখসাগরে নিমগ্ন হন। এ সংসারে কেহ রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া সুখের পর সুখ ভোগ করিতেছে; কেহ বা মুষ্টিমেয় ভিক্ষায় দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াও দুরন্ত শীতে চীরবসন পরিধান করিয়া কষ্টের পর কষ্ট বহন করিতেছে। কেহ সুরম্য হর্ম্ম্যে বাস করিয়া ও বিবিধ সুস্বাদ খাদ্যে উদর পূরণ করিয়া পরমসুখে কালাতিপাত করিতেছে; কেহ বা পূর্ণকুটীরে বাস করিয়া ও শাকান্নে দগ্ধোদর পূরণ করিয়া নিজ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতেছে।

স্বর্ণময় পর্য্যঙ্কেতে তোমার শয়ন,
আমি করি বৃক্ষমূলে যামিনী যাপন।
তোমার অরুচি হয় দধিদুগ্ধসরে,
দ্বারে দ্বারে ফিরি আমি মুষ্টিভিক্ষা তরে।
পরিধান কর তুমি বিচিত্র বসন,
আমি করি তরুত্বকে তনু আচ্ছাদন।

(সদ্ভাব শতক)

কেহ পুত্রকলত্রশোকে জীবন্মৃত হইয়া অগাধ ঐশ্বর্য্যের মধ্যে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে মানবজীবনকে অসার ভাবিতেছে! কেহ বা যৎসামান্ত পর্ণ কুটীরের মধ্যে স্ত্রীপুত্রের সহাস্যবদনে পরিবেষ্টিত হইয়া আপনাকে সার্থক-জন্মা জ্ঞান করিতেছে। কেহ অশেষ রোগ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া অতুল সম্পত্তি ও অতুল বিভবের ভিতরও আপনাকে হতভাগ্য জ্ঞান করিতেছে; কেহ বা স্বাস্থ্যসুখে সুখী হইয়া গ্রাসাচ্ছাদনের অশেষ কষ্ট সত্ত্বেও আপনাকে ভাগ্যবান মনে করিতেছে। কেহ ক্রোড়পতি হইয়া পুত্ররত্নে বঞ্চিত হওয়াতে রাজ-প্রাসাদেও স্বজীবনকে বিড়ম্বনা মাত্র ভাবিতেছে। কেহ বা কপর্দ্দকশূন্য হইয়া নবকুমারের মুখারবিন্দ দর্শনে অপার আনন্দনীরে অভিষিক্ত হইতেছে। কেহ কারাগারে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া খাটিতে খাটিতে দুঃখের দিন দুঃখে অবসান করিতেছে; কেহ বা মহানগরীর মহাবর্ত্মে মোটরকার আরোহণ করিয়া সগর্ব্বে মেদিনীমণ্ডল কম্পায়মান পূর্ব্বক বিস্ফারিতহৃদয়ে গমন করিতেছে।

এই প্রকারে সংসারে সুখদুঃখ চিরদিন অসমভাবে বণ্টিত রহিয়াছে। ধনপুত্রে লক্ষ্মীলাভ করা অল্প লোকের ভাগ্যে ঘটে। অধিকাংশ লোকই নানাপ্রকার শোকতাপে ও জ্বালাযন্ত্রণায় অস্থির হয়। প্রকৃত শান্তিসুখ কেহই পান না।

সকল দেশে মানবসমাজ ধনবান, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র এই তিন শ্রেণিতে বিভক্ত। প্রত্যেক শ্রেণির লোকে বিশেষ বিশেষ সুখদুঃখের ভাগী হইয়া থাকে। দরিদ্রের যেমন একদিকে গ্রাসাচ্ছাদনের অশেষ কষ্ট, অপর দিকে গাঢ় পরিশ্রম করিয়া ও সুনিদ্রা যাইয়া মনসুখে থাকে। ধনবানের যেমন একদিকে গ্রাসাচ্ছাদনের কিছুমাত্র কষ্ট নাই, অপর দিকে তিনি নানা দুশ্চিন্তাবশে জর্জ্জরিত হইয়া মনসুখে নিদ্রা যাইতে পান না। মধ্যবিত্ত লোকেরও এইরূপ নানা কষ্ট আছে।

'শরীরং ব্যাধিমন্দিরং,' রক্তমাংসের শরীর ধারণ করিলেই নানাবিধ রোগ স্বতঃ আইসে। কোন্ ব্যাধি কোন্ দুর্লক্ষ্য সূত্র অবলম্বন করিয়া আমাদিগকে যন্ত্রণা দিবে, তাহা কি কেহ পূর্ব্বে জানিতে পারে না? সংসারে অল্পসংখ্যক লোকে সুস্থশরীরে ও বাহাল তবীয়তে সমস্ত জীবন কাটাইতে পারেন; অধিকাংশ লোক নানা সময়ে নানা রোগে আক্রান্ত

হইয়া যন্ত্রণা পায়। যিনি হউক না কেন, এসকল ব্যাধি হইতে কাহারও নিস্তার নাই।

সংসারে কেহ ছেলে ছেলে করিয়া মরে, কেহ বা ছেলেদের ট্যাঁ ভোঁতে বিরক্ত হয়। কেহ টাকা টাকা করিয়া মরে, কেহ বা টাকার ছালার উপর বসিয়া গর্ব্বীয়ান হয়। এই প্রকারে মহামায়ার মহালীলা সংসারে অনুক্ষণ চলিতেছে।

সংসারে সুখের ভাগ অপেক্ষা দুঃখের ভাগ অত্যন্ত অধিক। এমন কি, মানবের সুখ যত অল্প, তাঁহার দুঃখ ততোধিক। সুখের দিন দেখিতে দেখিতে চলিয়া যায়; কিন্তু দুঃখের দিন প্রতি মুহূর্ত্ত জানাইয়া যায় ও যাইতে চায় না। যদি সমাজের চতুর্থাংশ লোককে সুখী মনে কর, ইহার তিনাংশ লোক কেবল দুঃখভারে আক্রান্ত ও প্রপীড়িত। যদি মনে কর, জীবনের চতুর্থাংশ সময় সুখে অতিবাহিত হয়, ইহার তিনাংশ সময়ে কেবল দুঃখের করালছায়া পতিত হয়। সে সময়ে কেবল শোকের উচ্ছ্বাস, রোদন ও হাহাকার এবং রোগের অশেষ যন্ত্রণা ব্যতীত আর কিছুই দেখা যায় না। হায়! হত-বিধে! তুমি এ সংসারকে কেন এত দুঃখময়, শোকময় ও যন্ত্রণাময় করিলে? কোথায় হে পূজ্যপাদ বুদ্ধদেব! তোমার ন্যায় অনেক সহৃদয় ব্যক্তি ভবসংসারের যন্ত্রণারাশি দর্শনে ব্যথিতহৃদয় হইয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করিয়াছে।

সংসারে যে সকল জ্বালাযন্ত্রণা ও রোগশোক মানবকে অহরহঃ প্রপী-ড়িত করে, সে সকল দূরীভূত করিয়া তাঁহার প্রকৃত সুখসম্ভার বর্দ্ধন করি-বার মানসে সকল দেশের মনীষিগণ চিরদিন সাধ্যমত চেষ্টা পাইতেছেন; এতদর্থে নানা ধর্ম্মশাস্ত্র ও বিজ্ঞানশাস্ত্র সংসারে রচিত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কোন শাস্ত্র সংসার হইতে দুঃখরাশি নির্ম্মূল করিতে সমর্থ হয় নাই। যথার্থ বলিতে কি, সমাজের দুঃখরাশি কস্মিনকালে নির্ম্মূল হইবে না। একদিকে যেমন সুখ বাড়িবে, অপর দিকে দুঃখও সঙ্গে সঙ্গে বাড়িবে। সুখদুঃখ পরস্পর ছায়ার ন্যায় এসংসারে অনুগমন করিতেছে। দুঃখ ভোগ না করিয়া কেহ কখন সুখের মুখ দেখিতে পান না।

কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে
দুঃখ বিনা সুখলাভ হয় কি মহীতে ?

(সদ্ভাবশতক)

সুখদুঃখের কারণসম্বন্ধে সাধারণের মতামত।

জনসাধারণের বিশ্বাস, জগৎপাতা জগদীশ্বর সর্ব্বনিয়ন্তা; তিনিই স্বহস্তে সকলের সুখদুঃখ বিতরণ করিতেছেন। যিনি এসংসারে যেমন কর্ম্ম করিবেন, তিনি ঈশ্বরের নিকট তদনুরূপ ফল পাইবেন। তাহাদের বিশ্বাস, সংসারের সুখদুঃখ কেবল পাপপুণ্যের ফলস্বরূপ। সুখ যেমন পুণ্যকর্ম্মের পুরস্কার, দুঃখও তেমনি পাপকর্ম্মের দণ্ডস্বরূপ।

দেখ, তোমার মন স্বাধীন ইচ্ছায় ও বিবেকে বিভূষিত এবং তোমার পুরোভাগে পাপপুণ্যের পথ সমভাবে বিস্তীর্ণ। স্ববিবেকাভিমতে ও স্বাধীন ইচ্ছায় চালিত হইয়া তুমি যে পথ অবলম্বন করিবে, এ সংসারে ঈশ্বরের নিকট তদনুরূপ ফলও পাইবে। পাপপথ অবলম্বন কর, তুমি চিরদিন দুঃখানলে দগ্ধ হইবে। ধর্ম্মপথ অবলম্বন কর, তুমি চিরদিন সুখসলিলে ভাসিবে।

রোগশোকপরিতাপবন্ধনব্যসনানি •
আত্মাপরাধবৃক্ষাণাং ফলমেতানি দেহিনাম্।

(হিতোপদেশঃ)

"রোগ, শোক, মনকষ্ট, কারাবাস ও বিপদজাল, ইহারা স্বকৃত অপরাধরূপ বৃক্ষের ফলস্বরূপ।"

বলি, উপরোক্ত সহজ নিয়ম কি সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়? মোটামুটি সুখদুঃখসম্বন্ধে ঐরূপ নিয়ম চলিতেছে বটে; কিন্তু ইহার বিস্তর ব্যতিক্রম ও বিপর্য্যয়ও দেখা যায়। তাহার সাক্ষ্য, এ সংসারে অনেকে কিছুমাত্র পাপকর্ম্ম না করিয়াও চির-দুঃখে দুঃখী ও চির রোগগ্রস্ত; আবার অনেকে কিছুমাত্র পুণ্যকর্ম্ম না করিয়াও চিরসুখে সুখী ও নীরোগ। সংসারে অনেকে অশেষ ধর্ম্মাচরণ করিয়াও সুখের পথ দেখিতে পান না; আবার অনেকে অশেষ পাপাচরণ করিয়াও সুখে কালাতিপাত করে। তবে কি প্রকারে বলিব, একমাত্র ধর্ম্ম হইতে সুখ ও অধর্ম্ম হইতে দুঃখ উৎপন্ন হইয়া থাকে ?

যে পাপময় সংসারে পাপাত্মাদিগের কুচক্রবশতঃ নিরীহ-ধর্ম্মাত্মাগণ অশেষ নির্য্যাতন ভোগ করে, সে সংসারে একমাত্র ধর্ম্ম হইতে সুখ কেন বল? যে পাপময় সংসারে ধনবানের অত্যাচারে দীনদরিদ্রের এত কষ্ট ও এত নিগ্রহ, সে সংসারে একমাত্র ধর্ম্ম হইতে সুখ কেন বল? যে স্বার্থপর সংসারে সামান্য স্বার্থের জন্য এত দৌড়াদৌড়ি, এত রেষারেষি ও এত হুড়াহুড়ি, সে সংসারে একমাত্র ধর্ম্ম হইতে সুখ কেন বল?

সত্য বটে, কলিযুগে শঠতা ও প্রবঞ্চনার আতিশয্যবশতঃ অনেক স্থলে ধর্ম্মের পরাজয় ও অধর্ম্মের জয় দেখা যায়; কিন্তু পূর্ব্বাপর ভালরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, ধর্ম্ম পরিশেষে অধর্ম্মকে পরাস্ত করিয়া জয়লাভ করে। ধর্ম্মাত্মা পুরুষ পরের অত্যাচারবশতঃ যতই কেন যন্ত্রণা ও নিগ্রহ ভোগ করুন না, পরিশেষে তিনিই প্রকৃত সুখী হন; আর যাহারা তাঁহার উপর অকারণ অত্যাচার করে, তাহারা সকলে নিধন প্রাপ্ত হয়। ধার্ম্মিক পুরুষ গ্রাসাচ্ছাদনের অশেষ কষ্ট পাইলেও হরিনামের গুণে প্রকৃত সুখী হন; আর অধার্ম্মিক বাহ্যদর্শনে সুখী বোধ হইলেও তদীয় হৃদয়ে সদা চিন্তাকীট দংশন করে; তজ্জন্য সে লোক অন্তরে বিশেষ অসুখ ভোগ করে। অধর্ম্মের বাড় কয় দিনের জন্য? ধর্ম্মের বাড় বহুদিনের জন্য। অধর্ম্ম করিয়া সংসারে কে কোথায় সুখী হইতে পারে? অতএব সাধারণে যাহা বলে, ধর্ম্ম হইতে সুখ, অধর্ম হইতে দুঃখ, তাহা সর্ব্বৈব সত্য।

অনেকে বলেন, পরম ন্যায়বান পরমেশ্বর স্বহস্তে কাহারও সুখদুঃখ বিতরণ করেন না। তিনি সকল বিষয়ে অখণ্ড নিয়মাবলি স্থাপন পূর্ব্বক বিশ্বরাজ্য পালন ও শাসন করিতেছেন। সমগ্র জগৎ তাঁহার সুচারু ও সুশৃঙ্খল নিয়মতন্ত্রের অধীন। যেমন চন্দ্র সূর্য্য গ্রহগণ তাঁহার সুনির্দ্দিষ্ট নিয়মে ব্যোমমার্গে ঘুরিতেছে, তেমনি তাঁহার সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়মানুসারে মানবের "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে সুখানি চ দুঃখানি চ।" যিনি যে বিষয়ের যে নিয়ম পালন করিবেন, তিনি তদনুরূপ সুখভোগ করিবেন; আর যিনি যে বিষয়ের যে নিয়ম লঙ্ঘন করিবেন, তাঁহাকে তদনুরূপ দুঃখ পাইতে হইবে।

দেখ, যিনি শারীরিক নিয়ম বিধিমতে পালন করেন, তিনি চিরদিন স্বাস্থ্য

সুখে সুখী হন, আর যিনি উহাদিগকে নানাপ্রকারে লঙ্ঘন করেন, তাঁহাকে বিবিধ রোগে জর্জ্জরীভূত হইতে হয়। এইরূপ জগতে নানাবিষয়ে নানা প্রাকৃতিক নিয়ম চলিতেছে; তাহা লঙ্ঘন করিলে আমাদিগকে দুঃখের ভাগী হইতে হয়। বৃক্ষারোহণ করিবার সময় পদস্খলিত হইলে ভূপতিত হইয়া হস্তপদ ভগ্ন হইয়া যায় ও নানা কষ্ট পাইতে হয়। সর্পবিবরে হস্ত দিলে, সর্পদষ্ট হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিতে হয়। সন্তরণ না জানিলে জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে হয়। এই প্রকারে প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে আমাদের সুখদুঃখ অশেষ প্রকারে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। ভূয়োদর্শন গুণে এসকল বিষয়ে আমরা স্বতঃ পরতঃ সাবধান হইতে চেষ্টা পাই।

প্রাকৃতিক নিয়মের পর সামাজিক নিয়মাবলি আমাদের সুখদুঃখ বিধিমতে নিয়ন্ত্রিত করে। যে দেশে অর্থোপার্জ্জনের জন্য যে সকল সদুপায় প্রতিষ্ঠিত আছে, সে সকল উপায় যিনি পরিশ্রম ও যত্ন পূর্ব্বক অবলম্বন করেন, তাঁহার প্রচুর অর্থাগম হয় ও সমাজে সম্মান বৃদ্ধি পায়; আর যিনি তদর্থে অসদুপায় অবলম্বন করেন বা সদুপায় অগ্রাহ্য করেন, তিনি রাজদ্বারে দণ্ডিত হন ও স্বসমাজে নিন্দনীয় হন বা অর্থাভাবে কষ্ট পান।

যিনি শাসনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠিত আইন কানুনাদি অমান্য করেন, তিনি রাজদ্বারে দণ্ডভোগ করেন। সেইরূপ সমাজের রীতিনীতি সকলকে পালন করিতে হয়। যিনি তাহা লঙ্ঘন করেন, তিনি সমাজে নিন্দনীয় ও দণ্ডার্হ হন। ইহাতে বুঝা উচিত, আমাদের সুখদুঃখ প্রাকৃতিক ও সামাজিক নিয়মতন্ত্রের অধীন।

ভবসংসারের সুখদুঃখের প্রকৃত কারণতত্ত্বনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা অনেক সময়ে দেখিতে পাই, প্রাকৃতিক নিয়মাবলি পালন না করিয়াও আমরা সুখের ভাগী হই এবং অনেক সময়ে উহাদিগকে বিধিবৎ পালন করিয়াও দুঃখের ভাগী হই। আবার দেশের আইনকানুন অমান্য করিয়াও আমরা দুঃখের ভাগী হই না। দেখ অনেকে সামান্যরূপ লেখাপড়া শিখিয়া প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিতেছে; আবার অনেকে সরস্বতীর বরপুত্র হইয়া কমলার অনুগ্রহ পান না। অনেকে সামান্য চেষ্টায় বা বিনা চেষ্টায় লক্ষপতি হন; আবার অনেকে সহস্র চেষ্টা করিয়াও নিজের সংসার চালাইতে

না পারিয়া পরের গলগ্রহ হন। সংসারের সুখদুঃখের প্রকৃত কারণ আদৌ ঠিক করা যায় না। সেজন্য সকল দেশের জনসাধারণ এক অদৃষ্ট বা ভাগ্য মানিয়া চলে। উহার কথা পরে লিখিতেছি।

অদৃষ্টবাদ।

সকল দেশে মানবধর্ম্ম অদৃষ্টবাদ প্রচার করিয়া আছে। সকল জাতির ভিতর এই উৎকৃষ্ট মতটী প্রচলিত দেখা যায়। ঈশ্বরে বিশ্বাসের ন্যায় ইহাও সর্ব্ববাদিসম্মত; তন্মধ্যে প্রাচ্যজগৎ ইহার যতদূর আদর করে, পাশ্চাত্য জগৎ তৎদুর করে না।

অদৃষ্ট বা ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইলে লোকে পরম সুখে কালাতিপাত করে। তৎকালে জীবনের যাবতীয় ঘটনা তাহাদিগকে সুখ হইতে সুখান্তরে লইয়া যায়। সেইরূপ অদৃষ্ট বা ভাগ্য কুপিত হইলে তাহারা সংসারে নানাবিধ কষ্ট ভোগ করে। তৎকালে তাহাদের চতুর্দ্দিকস্থ ঘটনাবলি দুঃখের পর দুঃখ ও কষ্টের পর কষ্ট আনয়ন করে।

জনসাধারণের বিশ্বাস,বিদ্যোপার্জ্জন অর্থোপার্জ্জন, স্ত্রীরত্ন, পুত্ররত্ন, শরীরের স্বাস্থ্য, সমাজে মানসম্ভ্রম, কার্য্যসিদ্ধি প্রভৃতি সংসারের যে যে বিষয় লইয়া আমরা সুখের ভাগী হই, তৎসমুদয় একমাত্র শুভাদৃষ্টবশতঃ লাভ করি। সেইরূপ মূর্খতা, দারিদ্র্য, প্রিয়জনবিয়োগ, শরীরের রোগযন্ত্রণা, সংসারের বিপদ-আপদ, রাজদণ্ড, সমাজে অখ্যাতি, প্রভৃতি যে সকল বিষয় হইতে আমরা দুঃখের ভাগী হই, তৎসমুদয় একমাত্র দুরদৃষ্টবশতঃ ভোগ করি।

অদৃষ্টদেবী আমাদের যাবতীয় সুখদুঃখের মূলকারণ। তাঁহার অনুগ্রহে বা প্রসাদে আমরা সর্ব্ববিধ সুখভোগ করি এবং তাঁহার ক্রোধে আমরা সর্ব্ববিধ দুঃখভোগ করি। তাঁহার চক্রের ঘূর্ণন হেতু আমরা কখন সুখসাগরে ভাসি, কখন বা দুঃখসাগরে নিমগ্ন হই। তিনি কখন আমাদিগকে স্বর্গে তোলেন, কখন বা নরকে ডুবান। তাঁহার ক্রিয়াকলাপ কে বুঝিতে পারে? কোথা হইতে আচম্বিতে তিনি কাহার উপর কিরূপ অমৃতবর্ষণ করিবেন, তাহা কে বুঝিতে পারে? আবার কোথা হইতে আচম্বিতে তিনি ক্রোধপরবশ হইয়া কাহার উপর কিরূপ গরল বর্ষণ করিবেন, তাহাও কে বুঝিতে পারে? তাঁহার

লীলা বুঝা ভার। তিনি আমাদের সঙ্গে কেবল লুকোচুরি খেলিতেছেন। একমাত্র তাঁহার কৃপায় পথের কাঙ্গাল রাজাধিরাজ হয় এবং সামান্য মুদি ক্রোড়পতি জমীদার হয়। তাহার কোপে রাজাধিরাজও পথের কাঙ্গাল হন এবং ক্রোড়পতিও কপর্দ্দকশূন্য হন। যে নেপোলিয়ানের বীরদর্পে ও কামানের বজ্রনির্ঘোষে সমগ্র মেদিনী একসময়ে প্রকম্পিত হইত, তিনিও জীবনের শেষ দশায় সেণ্টহেলেনা দ্বীপে বন্দীভাবে কালাতিপাত করেন। সেদিনকার ইউরোপের মহাকুরুক্ষেত্রে এমন যে রুশের সম্রাট্ যাহার সামান্য অঙ্গুলি হেলনে পৃথিবী প্রকম্পিত হইত, তিনিও প্রথমে সিংহাসনচ্যুত হইয়া সাইবিরিয়ায় নির্ব্বাসিত হন, পরে দেশের বিচারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। এমন যে জার্ম্মানি বাদসাহ কাইসর, তিনিও সিংহাসন ত্যাগ করিয়া দীনহীন বেশে হলণ্ডে গিয়া বাস করেন। কাহার অদৃষ্টনেমি কি ভাবে ঘূর্ণ্যমান হইবে তাহা কে বলিতে পারে? কাহার ভাগ্যে কখন কি ঘটিবে, তাহাই বা কে জানে?

সংসারে একই ঘটনা হইতে কাহার সর্ব্বনাশ ও কাহার বা পৌষমাস উপস্থিত হয়। দেখ, সাপুড়ের পেটীকামধ্যে সর্প অবরুদ্ধ। অনাহারে জীর্ণ ও শীর্ণ। হঠাৎ একটা মূষিক তথায় আসিয়া ভাবিতে লাগিল, পেটীকায় তণ্ডুল আছে; এমনি সে কাটিতে আরম্ভ করিল। কাটিয়াই সে তন্মধ্যে প্রবেশ করিল। তৎক্ষণাৎ অনাহারে মৃতপ্রায় সর্প উহাকে ভক্ষণ করিয়া উদর পূর্ণ করিল এবং মূষিককর্ত্তিত পথ দিয়া পেটীকার অভ্যন্তর হইতে বহির্গত হইয়া গেল। এস্থলে মূষিকের সর্ব্বনাশ হইল, কিন্তু সর্পের অদৃষ্ট ফিরিল।

এইরূপ সংসারের প্রত্যেক ঘটনাতে কাহারও বা ইষ্ট, কাহারও বা অনিষ্ট ঘটিতেছে; কাহারও সর্ব্বনাশ, কাহারও পৌষ মাস আসিতেছে। প্রত্যেক ঘটনা পূর্ব্বাপর তন্ন তন্ন করিয়া অনুধাবন করিলে বুঝিতে পারা যায়, ইহাতে কত লোকের ইষ্ট ও কত লোকের অনিষ্ট ঘটিতেছে।

অদৃষ্টদেবী আমাদের চতুর্দ্দিকস্থ অবস্থাপরম্পরার যোগাযোগ ঘটাইয়া নানা সুফল বা কুফল উৎপাদন করেন। যখন তিনি উহাদের শুভযোগ ঘটাইয়া নানা সুফল প্রদান করেন, তখন উহা আমাদের শুভাদৃষ্ট বা সৌভাগ্য আর যখন তিনি উহাদের অশুভ যোগ ঘটাইয়া নানা কুফল উৎপাদন করেন,

তখন উহা আমাদের দুরদৃষ্ট বা দুর্ভাগ্য। এই সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য আমাদের যাবতীয় সুখদুঃখের বা সম্পত্তিবিপত্তির মূলকারণ।

অদৃষ্টবাদ দ্বারা সংসারের মহোপকার সাধিত হইয়াছে। এক অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া আমরা ভবসংসারের ক্লেশরাশি ও বিপদরাশি অনেক সময়ে নীরবে ও অম্লানবদনে বহন করি। যখন কোন অপ্রতিকরণীয় বিপদে পতিত হই, তখন আমরা অদৃষ্টকে স্মরণ করিয়া হৃদয়ের নিভৃত স্থলে রোদন করিতে থাকি। যখন কোন অসহ্য রোগশোকে জর্জ্জরীভূত হই, তখন আমরা হায় রে অদৃষ্ট! এই বলিয়া অদৃষ্টদেবীর নিকট, ঈশ্বরের নিকট রোদন করিতে থাকি। যথার্থ বলিতে কি, এই পাপতাপময় ভবসংসারে মানবধর্ম্ম যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়া মানবের দগ্ধহৃদয়ে সান্ত্বনাবারি অভিষিঞ্চন করে, তন্মধ্যে অদৃষ্টবাদ ইহার সর্ব্বপ্রধান উপায়। এই অদৃষ্টবাদ আমাদের সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্য বর্দ্ধন করে এবং ইহার সত্যকথায় বিশ্বাস করিয়া আমরা অনেক সময়ে সংসারের শোকদুঃখ অল্পকালের মধ্যে বিস্মৃত হই। রে অদৃষ্টবাদ! তুমি আমাদের প্রকৃত বন্ধু। তুমি আমাদের ভবার্ণবের ভেলাস্বরূপ। তোমাকে আশ্রয় করিয়া আমরা ইহার উত্তাল তরঙ্গমালা ও নানা ঝঞ্ঝাবাত উত্তীর্ণ হই।

ভাগ্য, অদৃষ্ট, কপাল, দৈব, বিধিনির্বন্ধ, বিধাতৃবিহিত মার্গ প্রভৃতি সকল কথার তাৎপর্য্য এক। যে সকল ভবিষ্যৎ ঘটনাবলি আমাদের সুখদুঃখ আনয়ন করে, উহারা আমাদের ভাগে পতিত, সেজন্য উহাদের সমষ্টি আমাদের ভাগ্য। এই সকল ঘটনা আমাদের অজ্ঞাত বা অদৃষ্ট কর্ম্মের ফল, অথবা উহারা কোথা হইতে ঘটিতেছে, তাহা আমরা কিছুই জানিনা, সেজন্য উহাদের সমষ্টি আমাদের অদৃষ্ট। আমাদের বিশ্বাস, জন্মগ্রহণ কালে বিধাতা উহাদিগকে কপালে লিখিয়া দেন এবং ইহার রেখা দেখিয়া উহাদিগকে স্থির করা যায়, সেজন্য উহাদের সমষ্টি আমাদের কপাল। উহারা চিরদিন সূক্ষ্মজগৎস্থ দেবগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত, এজন্য উহারা আমাদের নিকট দৈবঘটনা। উহারা চিরদিন আমাদিগকে অপরিহার্য্যরূপে নিয়ন্ত্রিত করে এবং উহাদের হইতে কিছুতে আমাদের নিষ্কৃতি নাই, এজন্য উহারা আমাদের নিয়তি। এ সকল

বিধাতা কর্ত্তৃক বিহিত, স্থিরীকৃত ও সর্ব্বতোভাবে অখণ্ডনীয়, এজন্য উহারা আমাদের বিধিনির্ব্বন্ধ বা বিধাতৃবিহিত মার্গ।

অনেকের মতে অদৃষ্ট কর্ম্মফল বা প্রাক্তন কর্ম্মফল হইতে অদৃষ্ট শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন, যে সকল কারণপরম্পরা হইতে আমাদের সুখদুঃখ সমুৎপন্ন হয়, তাহা আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, অদৃষ্ট ও অশ্রুত, সেজন্য উহাদের সমষ্টিকে আমরা অদৃষ্ট বলি। ইহাতে প্রাক্তন কর্ম্মফল, ইহজন্মের কর্ম্মফল ও চতুর্দ্দিকস্থ অবস্থাপরম্পরার সংযোগ ও বিয়োগ সকলই বুঝায়।

আমাদের যাবতীয় সুখদুঃখ যে সকল কারণে উৎপন্ন হউক না কেন, আমরা এক অদৃষ্টকে উহাদের একমাত্র মূলকারণ জ্ঞান করি। যেমন আমাদের অন্ধবিশ্বাসে বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতিসংহারের একমাত্র আদিকারণ জগৎপিতা জগদীশ্বর, সেইরূপ আমাদের অন্ধবিশ্বাসে আমাদের যাবতীয় সুখদুঃখের আদিকারণ অদৃষ্ট কর্ম্মফল বা অদৃষ্ট। ইহা আমাদের স্বভাবসিদ্ধ, যে বিষয়ে কারণপরম্পরার অনুসন্ধানে আমরা প্রবৃত্ত হইনা কেন, নিজ মনের প্রকৃত্যনুসারে আমরা সে বিষয়ে একমাত্র আদিকারণে উপনীত হইতে চেষ্টা পাই। এই প্রকার অনুচিন্তন করিতে করিতে আমাদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়া যায়, আমাদের যাবতীয় সুখদুঃখের একমাত্র আদিকারণ অদৃষ্ট। অনেকের মতে অদৃষ্টবাদ জগতে এই প্রকারে উত্থিত হইয়াছে।

হিন্দুধর্ম্মমতে মানবের প্রাক্তন কর্ম্মফল তাঁহার ভাগ্যকে স্থিরীকৃত করে এবং জন্মলগ্নানুসারে গ্রহাদির স্থিতি ও সঞ্চার ইহাকে আজীবন নিয়ন্ত্রিত ও চালিত করে। যাঁহারা পূর্ব্বজন্ম বা পরজন্ম মানেন না, তাঁহাদের মতে মানব ইহসংসারে যে অবস্থাপরম্পরার দাস, উহাদের যোগাযোগ তাঁহার ভাগ্য। যখন উহাদের শুভযোগ ঘটে, তখন তাঁহার সৌভাগ্য উদয় হয়; যখন উহাদের অশুভযোগ ঘটে, তখন তাঁহার দুর্ভাগ্য দেখা দেয়।

প্রকৃতিজগৎ যেমন কতকগুলি অপরিবর্ত্তনীয় ভৌতিক নিয়মাবলি দ্বারা পরিচালিত, সেইরূপ প্রত্যেক মানবের ভাগ্য কতকগুলি অখণ্ডনীয় আধিদৈবিক নিয়মাবলি দ্বারা পরিচালিত হয়। "কদাচ মনে করিও না, অন্ধ দৈব (blind chance) এ সকল ঘটায় অথবা ইহারা আচম্বিতে ও খামখেওয়াল

মতে (Accidentally or by haphazard) এ সকল ঘটিতেছে। যদি তাহাই হইবে, সংসারে এমন বিশ্বজনীন সামঞ্জস্য কোথা হইতে আসিবে? দেবগণ উপর হইতে যেমন কল টেপেন, এ জগতে তেমনি ঘটে। তুমি আমি কেমন করিয়া তাহা বুঝিব? সকলই সুনির্দ্দিষ্ট আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক নিয়মানুসারে ঘটিতেছে। পাশ্চাত্য জগতে নববিজ্ঞান ভৌতিক নিয়মাবলি ক্রমশঃ আবিষ্কার করিতেছে, আর প্রাচ্য জগতে জ্যোতিষ শাস্ত্রাদি কিয়ৎ পরিমাণে আধিদৈবিক নিয়মাবলি আবিষ্কার করিয়াছে।

দৈববল ও পুরুষকার।

দৈববল দ্বারা লোকের অদৃষ্ট বা ভাগ্য বুঝায়। পুরুষকার দ্বারা তাঁহার উদ্যম, স্বাবলম্বন, অধ্যবসায়, যত্ন ও পরিশ্রম বুঝায়। এখন প্রাচ্যজগৎ অদৃষ্টবাদী ও পাশ্চাত্যজগৎ পুরুষকারবাদী। এই দুই মতের গুণাগুণ এস্থলে বিচার্য্য।

অদৃষ্টবাদী বলেন :—

ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র, ন চ বিদ্যা ন চ পৌরুষং।

"সকল স্থলে আমাদের একমাত্র ভাগ্য ফলাফল প্রদান করে। বিদ্যায় ও পৌরুষে কিছুমাত্র হয় না।" তুমি যত বড় পণ্ডিত হও না, বা যত বড় বীর হও না, যদি তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন না হয়, তোমার পাণ্ডিত্য ও পৌরুষ কোন কাজের হইবে না। কপাল মন্দ হইলে কোন লোক একমাত্র পুরুষকার বলে সংসারে কিছুই করিতে পারে না। আর যদি দৈববল বা দেবানুগ্রহ থাকে, যৎসামান্য চেষ্টায় আপনাপনি সকলই জুটিবে।

পুরুষকারবাদী বলেন :—

উদ্যোগীনাং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।
দৈবং নিহত্য কুরুপৌরুষমাত্মশক্ত্যা
যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোহত্র দোষঃ।

(হিতোপদেশঃ)

"উদ্যমশীল পুরুষদিগের মধ্যে যিনি যত্নে ও অধ্যবসায়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, লক্ষ্মী তাঁহাকেই প্রাপ্ত হন। তিনি উদ্যম ও অধ্যবসায়গুণে ধনদৌলতাদি লাভ

করেন। যাহারা সংসারে কাপুরুষ, যাহাদের উদ্যমশীলতা আদৌ নাই, তাহারা বলে, একমাত্র অদৃষ্টবলে সকল লাভ করা যায়। দৈবকে সংহার করিয়া বা দৈবশক্তিকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করিয়া সকল বিষয়ে নিজের পৌরুষ বা কৃতিত্ব দেখাও। মন্ত্রের সাধন বা শরীরের পতন, এই ভাবিয়া যিনি অসাধ্য সাধনে অগ্রসর হইবেন, তাঁহার নিকট অসাধ্যও কালে সাধ্য হইবে। আন্তরিক যত্ন পূর্ব্বক কার্য্য করিলে, তাহাতে যদি সিদ্ধিলাভ না হয়, তাহাতে তোমার কি দোষ? তুমি ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিলে, এখন যদি কার্য্যগতিকে তাহাতে সিদ্ধিলাভ না হইল, তাহাতে কে তোমার দোষ দিবে?"

এই শ্লোক দ্বারা শাস্ত্রকার সকলকে পুরুষকার দেখাইতে প্রোৎসাহিত করিতে গিয়া মনে কিঞ্চিৎ সংশয় রাখিয়া দিয়াছেন। ইহাতে বুঝা উচিত, একমাত্র পুরুষকার বলে বা একমাত্র দৈববলে কোন কার্য্য সিদ্ধিলাভ করা যায় না; পরন্তু উহাদের সম্মিলনে প্রকৃত সিদ্ধিলাভ ঘটে। যেমন প্রকৃতি ও পুরুষের সঙ্গম ব্যতীত জীবসৃষ্টি অসম্ভব, সেইরূপ পুরুষকার ও দৈবের মিলন ব্যতীত কোন কার্য্যে সিদ্ধিলাভও অসম্ভব।

যেমন জীবোৎপাদনে পুরুষ নিজবীর্য্য প্রদান করিয়া স্বয়ং উদাসীন ভাবে দূরে থাকে এবং প্রকৃতি সমস্ত পরিবর্ত্তন ঘটায়, সেইরূপ কার্য্যকালে দৈব নিজ অনুশাসন প্রদান করিয়া স্বয়ং উদাসীনভাবে দূরে থাকে এবং লোকের পুরুষকার বা উদ্যম সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ও সকল হাঙ্গাম পোয়াইয়া কার্য্য করিতে থাকে, ইহাতে প্রকৃত সিদ্ধিলাভ হয়। কার্য্যসিদ্ধির জন্য যে সুযোগ আবশ্যক, তাহা দৈব ঘটাইয়া দেয়। অতএব মনে রাখিবে, দৈব ও পুরুষকারের মিলন ব্যতীত কার্য্যসিদ্ধি এ সংসারে অসম্ভব। এজন্য শাস্ত্রকার বলেন, যত্ন করিলেও যদি কার্য্যে সিদ্ধিলাভ না হয়, তাহাতে তোমার দোষ কি?

সংসারে অর্থোপার্জ্জনের জন্য অনেকে যথাশক্তি পুরুষকার দেখায় ও প্রাণপণে চেষ্টা করে। কিন্তু যাহার যেমন অদৃষ্ট, তাহার ভাগ্যে তেমনি অর্থাগম হইয়া থাকে। অদৃষ্ট প্রসন্ন থাকিলে তাহার পুরুষকার ভালরূপ স্ফূর্ত্তি পাইবে এবং সকল কার্য্যে সিদ্ধিলাভ ঘটিবে; যাহাতে হাত দিবে, তাহাতে সোণা ফলিবে। আর যদি অদৃষ্ট কুপিত থাকে, তুমি যতই কেন পুরুষকার দেখাও না, তোমার সে পুরুষকার ব্যর্থ হইবে, সকল কার্য্যে নানা বাধা বিঘ্ন আসিবে, কোন কাজে

সুবিধা হইবে না এবং ভবসাগরে তুমি হাবুডুবু খাইবে ও আকুমাকু করিবে।

সংসারে সকলে চতুর্দ্দিকস্থ অবস্থাস্রোতে পিপীলিকাবৎ ভাসিতেছে। যেমন বিন্দু বিন্দু সলিলকণা লইয়া জলরাশি গঠিত হয়, সেইরূপ লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা লইয়া এই অবস্থাস্রোত ঘটিয়াছে। দৈব ইচ্ছা ব্যতীত কেহ পুরুষকার বলে বা স্বাধীন ইচ্ছায় এ স্রোতের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারে না। ইহা সর্ব্বথা দৈবায়ত্ত; কিন্তু যিনি ইহার সুযোগ ও কুযোগ,সুটান ও কুটান এবং উজান ও ভাটী বুঝিয়া চলিতে পারিবেন, তিনি নিজ কার্য্যে সুফল পাইবেন এবং সকলে তাঁহার শুভাদৃষ্টের সুখ্যাতি করিবে।

আমরা দৈবশক্তি দ্বারা নানা বিষয়ে চালিত হই। কেবলই যে আমাদের চতুর্দ্দিকস্থ অবস্থাপরম্পরার উপর দৈবের অনুশাসন পূর্ণভাবে চলিতেছে, তাহা নহে। অন্যান্য বিষয়েও ইহার অনুশাসন ভালরূপ দৃষ্ট হয়। যে বুদ্ধিবলে (Common sense. আক্কেল) তুমি হিতাহিত বিবেচনা করিয়া সংসারে সকল কাজ করিবে, তাহা কি তোমার প্রকৃতিদত্ত বা দৈবদত্ত জ্ঞানশক্তি নহে? যে প্রতিভাবলে তুমি সংসারে মহৎ কার্য্য করিয়া যশস্বী হইবে, তাহা কি তোমার দৈবদত্ত গুণ নহে? যে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বলে তুমি সংসারে নানা পুণ্যকর্ম্ম করিয়া সুখের ভাগী হইবে তাহা কি তোমার দৈবদত্ত গুণ নহে? যে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রবলতাবশতঃ তুমি সংসারে নানা অসৎকার্য্য করিয়া দুঃখের ভাগী হইবে, তাহা কি তোমার প্রকৃতিদত্ত অগুণ নহে? এই প্রকারে আমরা নানা বিষয়ে দৈবশক্তি দ্বারা চালিত হই

সত্য বটে, দৈববল ও পুরুষকারের সম্মিলনে কার্য্যসিদ্ধি ঘটে, তথাচ ভালরূপ অনুধাবন করিলে বুঝা যায়, পুরুষকার অপেক্ষা দৈববলের অনুশাসন অধিক বলবৎ।

এই যে কৃষিজীবীরা সমস্ত দিবস অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া ঘর্ম্মাক্তকলেবরে ক্ষেত্রে চাষবাস করে, উহারা কি প্রতি বৎসর সমান ফলভোগ করে? কোন কোন বৎসর অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি, অসাময়িক বৃষ্টি ও পঙ্গপাল দ্বারা ক্ষেত্রের, শস্য নষ্ট হইয়া যায়। উহারা ত কোন বৎসর যত্ন ও পরিশ্রমের কিছুমাত্র ত্রুটি করে না, পুরুষকার সমভাবে দেখায়। তবে কেন উহাদের ভাগ্যে ফল সমভাবে

জুটে না? উহাদের কিছুমাত্র দোষ নাই। এস্থলে যত দোষ উহাদের ভাগ্যের। এই যে কলেজের ছাত্রগণ দিবারাত্র প্রগাঢ় পরিশ্রম করিয়া অধ্যবসায় ও স্বোদ্যমবলে বিশ্ববিদ্যালয়ের মহৎ মহৎ উপাধি পাইয়া আপনাদিগকে সার্থকজন্মা জ্ঞান করে, পরে সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে দেখিতে জঠর যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া সামান্য চাকরী করিয়া দিনপাত করে, তাহাতেই বা উহাদের কি দোষ? এস্থলে যত দোষ উহাদের ভাগ্যের।

এই যে হীনবেশ ইংরাজগণ যৎসামান্য বিদ্যাশিক্ষা করিয়া এ দেশে আসিয়া বড় বড় হাউসের অধ্যক্ষ হন বা বড় বড় সরকারী চাকরী পান এবং নবাবী করেন, তাহাতেই বা তাঁহাদের কতদূর প্রশংসা করা উচিত? এস্থলে প্রশংসা যত, তাহা তাঁহাদের ভাগ্যের। এই যে কুতবুদ্দিন, হোসেন গঙ্গু প্রভৃতি রাজাধিরাজগণ সামান্য ক্রীতদাসরূপে কর্ম্মজীবন আরম্ভ করিয়া সাহস, বীরত্ব ও উদ্যম বলে রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন, তাঁহারা কি কেবল পুরুষকারবলে এতদূর উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন? ইহাতে কি তাঁহাদের ভাগ্যলক্ষ্মীর কোনরূপ হাত ছিল না? এই যে সেনাপতি লর্ড ক্লাইব পলাসীক্ষেত্রে মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া নবাবের বহুসংখ্যক সৈন্যকে পরাস্ত করিয়া ভারতে ব্রীটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনের সূত্রপাত করিলেন, তিনি কি কেবল পুরুষকারবলে এই সুমহৎ কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন? তাঁহার স্বাধীন ইচ্ছার প্ররোচনায় তিনি কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া আম্রকাননে পদচালনা করিতেছিলেন। কিন্তু ব্রীটিশ ভাগ্যলক্ষ্মী তৎকালে তাঁহাকে উত্তেজিত করিয়া তাঁহাকে অগ্রসর হইতে আদেশ দিয়াছিলেন।

উপরোক্ত কয়েক দৃষ্টান্ত হইতে সিদ্ধান্ত করা উচিত, সংসারে কার্য্যসিদ্ধির জন্য দৈববল ও পুরুষকার সমভাবে আবশ্যক হইলেও প্রথমোক্ত শেষোক্তকে চালনা করে। যে স্থলে দৈববল থাকে, কার্য্যসিদ্ধির জন্য যে উদ্যমশীলতা ও অবস্থার যোগাযোগ আবশ্যক, তাহা স্বতঃ আসিবে। সে স্থলে লোকে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া পুরুষকার বলে অসাধ্যসাধনে ব্রতী হইবে। কিন্তু অবস্থার যোগাযোগ কোথা হইতে ঘটে, তাহা কেহ বুঝিতে পারে না। সেজন্য বলা উচিত, পুরুষকারের কার্য্যকলাপ আমাদের সম্পূর্ণ নয়নগোচর হইয়া থাকে; কিন্তু দৈবের কার্য্যপ্রণালী একেবারে আমাদের অজ্ঞাত বা অদৃষ্ট থাকে।

নববিজ্ঞানের কল্যাণে আজকাল পাশ্চাত্য জগতের নূতন ভাগ্যোদয় দেখা যায়। তত্রত্য জনসাধারণ উত্তমশীল, অধ্যবসায়ী ও উচ্চাভিলাষী। তাঁহারা পৃথিবীময় সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়া আপনাদের সুখের পথ, উন্নতির পথ পরিষ্কার করিয়া লইতেছেন। তথায় কেবলই পুরুষকারের সমাদর অধিক। তাঁহারা বলেন, অদৃষ্টবাদ মানিলে লোকে অলস ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে। সেজন্য ইহাকে না মানাই শ্রেয়। কিন্তু প্রাচ্যজগৎ ভাবে, তাঁহাদের ভাগ্যবল এত অধিক, যে ধুলার মুঠা ধরিলে সোণার মুঠা হইবে। কিন্তু পরাধীন ভারতের উপর দৈব অনেক দিন হইতে প্রকুপিত; তুমি আমি পুরুষকার বলে এখন কিছুই করিতে পারি না। সময় হইলে সকলই ঘটিবে।

বিজ্ঞানের মতে সুখদুঃখের কারণপরম্পরা।

মানবজীবন ভালরূপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বিজ্ঞান নির্দ্দেশ করে, মন শরীরের সহিত যেরূপ ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্বদ্ধ, শরীরও সেইরূপ বাহ্য জগতের সহিত অশেষ প্রকারে সম্বদ্ধ আছে। আবার লোকালয়ে বসবাস করাতে মানব যেরূপ পরিবারবর্গের সহিত সম্বদ্ধ, সাধারণ সমাজের সহিতও তিনি অশেষ প্রকারে সম্বদ্ধ আছেন। এই সকল বিবিধ সম্বন্ধের বিবিধ যোগাযোগ হইতে তাঁহার জীবনের বিবিধ সুখদুঃখ সমুৎপন্ন হয়। ইহাদের যোগাযোগ যেরূপ জটিল হইতে জটিলতর, তাঁহার সুখদুঃখও সেইরূপ জটিল ভাবে চিরদিন পরিচালিত হইতেছে।

এই সকল সম্বন্ধের বিবিধ যোগাযোগ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নির্ণয় করা অনেক সময়ে দুঃসাধ্য। এজন্য সংসারের যাবতীয় সুখদুঃখের প্রকৃত কারণ আমাদের নিকট চিরদিন রহস্যময়। এত রহস্যময় বলিয়া মানবধর্ম্ম সকল দেশে অদৃষ্ট-বাদ প্রচার করিয়া সকলকে স্তোক দিয়া থাকে।

প্রথমতঃ দেখ, শরীরের সহিত মনের কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ! তোমার সুখ-দুঃখ শরীরের স্বাস্থ্যাস্বাস্থ্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। যখন সকলে বিবিধ রোগযন্ত্রণায় অস্থির হয়, তখন "বাবাগো মাগো গেলাম গো" বলিয়া উহাদিগকে আর্ত্তনাদ ছাড়িতে হয়। তখন কোথায় বা মনের সুখ, কোথায় বা ঐশ্বর্য্যের গর্ব্ব, সকলই জাহান্নমে চলিয়া যায়। তখন একমাত্র চিন্তা, কি প্রকারে

রোগযন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া প্রাণ বাঁচাইব? তখন কোথায় ডাক্তার, কোথায় কবিরাজ, আত্মীয় স্বজনেরা কেবল তাঁহাদের সন্ধান করিতে থাকে।

রোগের জ্বালাযন্ত্রণা, কি রাজাধিরাজ, কি পথের ভিখারী, সকলকে সমভাবে ভুগিতে হয়। রক্তমাংসের শরীর ধারণ করিলেই বিবিধ রোগ নানা কারণে স্বতঃ আইসে। শারীরিক নিয়মাবলি রীতিমত পালন কর, রোগাদি আসিবে না সত্য, কিন্তু যতই কেন সাবধান হওনা, কোন্ রোগের কোন্ বীজ বা কীটাণু কোন্ দুর্লক্ষ্য সূত্র অবলম্বন করিয়া শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবে, তাহা কেহ জানেন না।

অগাধ পর্য্যবেক্ষণাদি বলে বিজ্ঞান এখন নানা ব্যাধির নানা কীটাণুবীজ আবিষ্কার করিতেছে ও তন্নিবারণার্থ নানা উপায় উদ্ভাবন করিতেছে। কিন্তু চিরদিনই অনেকে নানা রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। জন্মপরিগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মৃত্যুবীজ শরীরে রোপিত হয় এবং উহাই কালে পরিণতি পাইয়া আমাদিগকে মৃত্যুমুখে পাতিত করে। যেমন দুর্য্যোধনের একমাত্র উরুদেশ শরীরের মধ্যে ভঙ্গপ্রবণ ছিল, সেইরূপ প্রত্যেক মানবের শরীরস্থ কোন না কোন যন্ত্র দুর্ব্বল থাকে এবং উহাই তদীয় মৃত্যুর প্রধান কারণ হইয়া থাকে। রাবণের মৃত্যুবাণের ন্যায় সকলের মৃত্যুবাণ শরীরাভ্যন্তরে নিহিত আছে।

মনে কর, এক ব্যক্তি সুখস্বচ্ছন্দে আহার বিহার করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। হঠাৎ একদিন বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সে ব্যক্তি এ পৃথিবী হইতে চিরবিদায় লইয়া গেল। এস্থলে সাধারণে বলিবে, দুরদৃষ্টবশতঃ আয়ুঃক্ষয় হওয়াতে ঐ লোক অকালে কালগ্রাসে পতিত হইল। এ কথা শ্রবণে চিকিৎসাবিজ্ঞান হাস্য সম্বরণ না করিয়া বলিবে, যে একটা কথার কথা আয়ুঃক্ষয় লইয়া মূর্খ লোকে স্বীয় মনকে প্রবোধ দেয় বটে; কিন্তু উহার মৃত্যুর অনেক বৈজ্ঞানিক কারণ আছে। প্রথমতঃ শারীরিক দৌর্ব্বল্যবশতঃ বহির্জ্জগৎস্থ বিসূচিকাবিষ বা কীটাণু পানীয় যোগে বা অন্য কোন দুর্লক্ষ্য সূত্রে শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ লাভ করিয়া অন্ত্রের যান্ত্রিক পরিবর্ত্তন আনয়ন পূর্ব্বক উহাকে বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত করিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ ধাতুগত দৌর্ব্বল্যবশতঃ অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ সেবন সত্ত্বেও ঐ রোগ

তদীয় শরীরের শোণিত ও হৃদয়াদি যন্ত্রের এরূপ ক্রিয়াবৈলক্ষণ্য আনয়ন করিলে যে উহার প্রাণধারণ প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে অনুপযুক্ত হওয়ায় সে ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

এখন যে ধাতুগত দৌর্ব্বল্যের দোহাই দিয়া বিজ্ঞান নানাবিষয়ের কারণ দর্শায়, সে ধাতুগত দৌর্ব্বল্য কোথা হইতে আইসে, তাহার কোন সন্তোষজনক কারণ বিজ্ঞান কি দিতে পারে? কেন এত লোক থাকিতে সেই ব্যক্তি বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইল এবং কেন সেইবা মৃত্যুমুখে পতিত হইল, ইহারও কোন সন্তোষজনক কারণ বিজ্ঞান কি দিতে পারে? যথার্থ বলিতে কি, প্রত্যেক রোগের প্রকৃত কারণতত্ত্ব এখনও যথার্থরূপে আবিষ্কৃত হয় নাই। যখন চিকিৎসাশাস্ত্রমাত্রেই এ বিষয়ে অন্ধকারে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা পায়, তখন যদি লোকে এক অদৃষ্টের দোহাই দিয়া স্বীয় মনকে প্রবোধ দেয়, তাহাতে সমাজের কি ক্ষতি, বরং মহালাভ।

যাহা হউক, শরীরের স্বাস্থ্যাস্বাস্থ্য সম্বন্ধে আমরা যেমন কতকগুলি বিষয় বুঝিতে পারি, তেমনি অপর গুলি আদৌ বুঝিতে পারি না। এজন্য উহাদের হইতে সমুৎপন্ন মনের সুখদুঃখের কারণপরম্পরাও আমরা অনেক সময়ে ভালরূপ নির্ণয় করিতে পারি না।

দ্বিতীয়তঃ। শরীরের পর নিজের পরিজনবর্গ তোমার সুখদুঃখ অধিক পরিমাণে পরিচালিত করে। উহাদের সকলের অশন বসনের জন্য তুমি সদা চিন্তিত থাক এবং প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জ্জন কর। নিজ শরীর ব্যাধিগ্রস্ত হইলে তুমি যেরূপ যন্ত্রণায় অস্থির হও, পরিবারস্থ কোন লোককে সেইরূপ যন্ত্রণাগ্রস্ত দেখিলে তুমিও মনোকষ্টে অস্থির হইয়া থাক। সমাজের গঠনপদ্ধতি অনুসারে তোমার পুত্রকলত্র তোমার শরীরের একরূপ অঙ্গীভূত। উহাদের স্বাস্থ্যাস্বাস্থ্যের উপর তোমার মনের সুখদুঃখ অধিক পরিমাণে নির্ভর করে। অপত্যস্নেহ ও দাম্পত্যপ্রেম হৃদয়ে বলবৎ বলিয়া তুমি স্ত্রীপুত্রবিয়োগে এত কাতর ও শোকাতুর হও।

যখন তুমি নিজ শরীরের অনেক বিষয় বুঝিতে পার না, তখন পরিবারবর্গের শরীর সম্বন্ধে ত নৈবচ। তুমি না হয় মোটামুটি স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলি জান, তাহাতে কি সকল সংকুলান হইবে? সকলকে হাজার সাবধান করিয়া

দেও না, কোথা হইতে আচম্বিতে কোন ব্যাধি বা বিপদ কোন্ পরিজনের উপর পতিত হইবে, তাহা কি তুমি পূর্ব্বাহ্লে ঠিক করিতে পার? রোগোপশমের জন্য তুমি অকাতরে অর্থব্যয় করিবে বটে; কিন্তু অনেক সময়ে প্রকৃতির অপরিহার্য্য নিয়তির সমক্ষে তোমায় নিজ মস্তক অবনত করিতেই হইবে।

মনে কর, তোমার প্রাণসম পুত্র রোগশয্যায় শায়িত হইয়া যন্ত্রণায় ছট্‌পট্ করিতেছে। তুমিও তাহার অসহ্য যন্ত্রণা দর্শনে ক্ষুণ্ণমনে চিকিৎসকের বাটী ধাবমান হইলে এবং কাকুতি মিনতি করিয়া তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ নিজ বাটীতে আনয়ন করিলে; তিনিও অবস্থোচিত সুব্যবস্থা করিয়া গেলেন। কিন্তু দেখিতে দেখিতে দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে পুত্রের মুখপদ্ম পরিশুষ্ক ও নয়নদ্বয় নিমীলিত হইয়া গেল। তুমিও অসহ্য পুত্রশোকে হাহাকার করিতে করিতে নিজ অদৃষ্টকে সহস্র ধীৎকার দিতে লাগিলে। পুত্রশোকে কাতর হইলেই বা কি হইবে? ক্রন্দন করিয়াই বা কি করিবে? প্রকৃতির অপরিহার্য্য নিয়তি বা অখণ্ডনীয় নিয়ম কেহ কি উল্টাইতে পারে? তোমার ভোলা মন মানে না, তাই তুমি এমন করিয়া কাঁদ ও দীর্ঘনিশ্বাস ফেল।

যাহা হউক, স্ত্রী পুত্র কন্যা লইয়া আমরা যেমন একদিকে অশেষ সুখে সুখী, তেমনি অপর দিকে অশেষ দুঃখে দুঃখী। এই সকল দুঃখের কারণ নানা বিষয় হইতে উত্থিত হয়। এ সকল নিবারণ করা কোন ২ স্থলে সাধ্য, আবার কোন কোন স্থলে একেবারে অসাধ্য।

তৃতীয়তঃ। স্বশরীর ও স্বপরিবারের পর স্বসমাজের বিবিধ সম্বন্ধও তোমার সুখদুঃখ বিধিমতে পরিচালিত করে। তুমি যে সমাজের অন্তর্ভুক্ত, সে সমাজের গঠনপদ্ধতি, রীতিনীতি, দেশাচার ও শাসনতন্ত্র তোমার সুখদুঃখ সম্যক নিয়ন্ত্রিত করে। তুমি যেমন সমাজের সহিত অসংখ্য রূপে সম্বন্ধ, তোমার জীবনের সুখদুঃখও সেইরূপ উহাদের দ্বারা অসংখ্যরূপে পরিচালিত হয়। প্রকৃতিক নিয়মের ন্যায় সামাজিক নিয়মও তোমার বিধিবৎ পালনীয়। এই সকল নিয়ম পালন করিয়া তুমি কখন সুখসলিলে ভাসিতে থাক, কখনও বা দুঃখানলে

দগ্ধ হইতে থাক। দেখ, হিন্দুসমাজের সধবারা যেমন সৌভাগ্যবতী, বিধবারা তেমনি অভাগিনী।

সভ্যজগতের প্রথানুসারে অর্থ আমাদের যাবতীয় অভাব ও অনাটন পূরণ করে। সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য ইহা যেমন আবশ্যক, সমাজে মানসম্ভ্রম রক্ষা করিবার জন্য ইহা তেমনি আবশ্যক। যেমন শরীরস্থ প্রত্যেক যন্ত্রের জীবাণুগণ রুধির হইতে আহার্য্য গ্রহণ করিয়া স্বকার্য্য সাধন করে, সেইরূপ অর্থও সমাজদেহের রুধিরস্বরূপ। এই অর্থ উপার্জ্জন করিয়া সমাজস্থ প্রত্যেক লোক নিজ নিজ অভাব পূরণ করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে।

কি রাজা ও প্রজা, কি ধনবান ও দরিদ্র, কি কৃষক ও বণিক, কি পণ্ডিত ও মূর্খ, সকলেই একমাত্র অর্থোপার্জ্জন করিতে সদা ব্যগ্র। সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে জীবনসংগ্রাম যেমন আয়াসসাধ্য হইয়া উঠিতেছে, সকলেই অর্থোপার্জ্জনকে প্রধান জীবনব্রত জ্ঞান করে। ইহার প্রাচুর্য্যে তুমি আপনাকে ভাগ্যবান মনে কর এবং ইহার অভাবে দৈন্যদশায় পতিত হইয়া তুমি সংসারে নানা ক্লেশ পাও। সাধারণের মত, যিনি যেমন অর্থোপার্জ্জন করেন, তিনি তেমনি সৌভাগ্যশালী। এ বিষয়ে কাহাকেও কিছুমাত্র উপদেশ দিতে হয় না। বিজ্ঞানের মতে প্রচীন কালে মানবসমাজ প্রাকৃত অবস্থায় ছিল। তৎকালে বৈষয়িক তারতম্য বা অন্য কোন প্রকার ভেদাভেদ সমাজে আদৌ উদ্ভূত হয় নাই। তৎকালে লোকের সুখদুঃখ সমভাবে বণ্টিত ছিল। উহাদের সুখের ভার যেমন অল্প, দুঃখের ভাগও তেমনি অত্যল্প ছিল। পরে জ্ঞানোদয়ে সভ্যতার সূত্রপাত হইলে, ইহা অপ্রাকৃত অবস্থায় থাকিতে আরম্ভ করে। সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সামাজিক সম্বন্ধ ক্রমশঃ জটিল হইতে জটিলতর হইতে থাকে। এই প্রকারে যাবতীয় বৈষয়িক তারতম্য ও নানাবিধ ভেদাভেদ সমাজে উত্থিত হইয়াছে। ইহার অনিবার্য্য ফলস্বরূপ মানবের সুখদুঃখ এখন অসমভাবে বণ্টিত দেখা যাইতেছে এবং এক প্রকার ঘটনা হইতে কেহ বা দুঃখী কেহ বা সুখী হইতেছে।

ধনবান, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র যে তিন শ্রেণীতে সমাজ এখন বিভক্ত, মানব পুরাকাল হইতে স্বার্থপ্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হইয়া স্বয়ং উহাদিগকে প্রবর্ত্তন

করিয়াছেন। সকলে সংসারে রিক্ত হস্তে আইসে ও রিক্ত হস্তে চলিয়া যায়। সামাজিক ভেদাভেদ সর্ব্বথা মানবকৃত, আদৌ প্রাকৃতিক নহে। স্বোপার্জ্জিত ধন পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগদখল করিবার মানসে তিনি নিজের সুবিধামত দায়ভাগাদির নিয়মাবলি চালিত করিয়া সমাজের উপরোক্ত বিভাগ করিয়া লইয়াছেন। একদিনে বা শতবর্ষে ঐ সকল তারতম্য উত্থিত হয় নাই। কিন্তু বহুকাল ব্যাপিয়া দায়ভাগাদির নিয়মাবলি চালিত হইতে হইতে ঐ সকল ভেদাভেদ সমাজে স্বতঃ উত্থিত হইয়াছে। সমাজে থাকিতে হইলে তুমি ঐ সকল ভেদাভেদবশতঃ সুখদুঃখের ভাগী হইবে। রাজপুত্র হও, রাজার হালে থাকিবে; ভিক্ষুকপুত্র হও, কাঙ্গাল বেশে থাকিবে। বিজ্ঞান বলে, তবে কেন তুমি এখন ভাগ্যের কথা তুলিয়া নিজ মনকে বৃথা প্রবোধ দিতেছ?

বিজ্ঞান অদৃষ্টবাদের উপর উপহাস করে। উহার মতে ইহা মনের বৃথা স্তোকবাক্য। দেখ, স্বাধীন ইচ্ছা সত্ত্বেও তুমি স্বকীয় অবস্থাপরম্পরার দাস। সংসাররূপ মহাসমুদ্রে চতুর্দ্দিকস্থ অবস্থাস্রোত তোমায় যে ভাবে চালিত করে, তুমি চিরদিন সেইভাবে চালিত হও; অথচ সকল বিষয়ে তুমি স্বীয় স্বাধীন ইচ্ছা চালনা করিবার অবসর পাইয়া থাক। যখন তুমি স্বাধীন ইচ্ছায় সেই অবস্থাস্রোতের সুটান বুঝিয়া চলিবে, তখন তোমার সৌভাগ্য আসিবে; আর যখন উহা না বুঝিয়া আকুমাকু করিবে, বা কুটানে পড়িয়া হাবুডুবু খাইবে, তখন তোমার দুর্ভাগ্য আসিবে। ইহার মতে জীবনের যাবতীয় সুখদুঃখ স্বাধীন ইচ্ছা ও অবস্থাস্রোত, উভয়ের সঙ্ঘাতফল (Resultant)। মনে করিলেই যে তুমি স্বাধীন ইচ্ছা বলে স্বীয় সুখের পথ পরিষ্কার করিতে পারিবে, তাহা নহে। কিন্তু এ বিষয়ে তোমার পারিপার্শ্বিক অবস্থাস্রোত অধিক পরিমাণে চালায়। উহার উজানভাটি বুঝিয়া চলিলে তুমি সংসারে ভাগ্যবান বলিয়া পরিচিত হইবে।

এখন আবার সমাজের কথাবলি। যে সকল সামাজিক রীতিনীতি ও আচার ব্যবহার দ্বারা সকলের সুখদুঃখ অসংখ্যরূপে পরিচালিত হয়, তাহাও মানব নিজের সুবিধামত সমাজে প্রবর্ত্তন করেন। আমাদের প্রপিতামহগণ সমাজের মঙ্গলের জন্য যে সকল রীতিনীতি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহার

ফলাফল এখন আমরা ভোগ করিতেছি এবং আমরা এখন যাহা প্রবর্ত্তন করিতেছি, আমাদের ভবিষ্য বংশধরেরা তাহার ফল ভোগ করিবে। সমাজে থাকিতে হইলে ইহার রীতিনীতি সকলকে যথাবিধি পালন করিতে হয়; তজ্জন্য উহারা নানাপ্রকারে সুখদুঃখের ভাগী হয়।

স্বদেশের শাসনতন্ত্র সকলের সুখদুঃখ বিধিমতে নিয়ন্ত্রিত করে। যে দেশের রাজা ঘোর অত্যাচারী, সে দেশের প্রকৃতিপুঞ্জ নানা অত্যাচারে ব্যতিব্যস্ত। যে দেশের রাজা ন্যায়বিচারী ও প্রজারঞ্জক, সে দেশের প্রজাবর্গ অশেষ প্রকারে সুখী। যে দেশ স্বাধীন, সে দেশ অনন্ত সুখে সুখী; আর যে দেশ পরাধীন, সে দেশের কপাল পুড়িয়া যায়। তত্রত্য জনসাধারণ এই বলিয়া সদা কাঁদে—

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে,
কে বাঁচিতে চায়"
(হেমচন্দ্র বন্দ্যো)

অধীনতা পাশে বাঁধা যাদের চরণ
কে আর অসুখী বল তাদের মতন।

(সদ্ভাবশতক)।

সেইরূপ সমাজবিপ্লব, রাষ্ট্রবিপ্লব, দিগ্বিজয় প্রভৃতি সামাজিক দুর্ঘটনা দ্বারা সমাজস্থ সকল লোকের সুখদুঃখ সময়ে সময়ে অশেষরূপে নিয়ন্ত্রিত হয়। এই সকল আপদ বিপদে কত গ্রাম ও নগর লুণ্ঠিত ও দগ্ধ হয়, কত লোকজন বিনষ্ট হয়, কত ধনবান নির্ধন হয়, দেশের কত অনিষ্ট সাধন হয়, তাহার কিছুমাত্র ইয়ত্তা নাই। শান্তিপ্রিয় রাজন্যবর্গ দেশে শান্তিরক্ষার্থ বিধিমতে চেষ্টা পান বটে, কিন্তু কোথা হইতে সামান্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উত্থিত হইয়া সমগ্র দেশ দাবানলে দগ্ধ করিবে, তাহা কেহ জানেন না।

চতুর্থতঃ। শরীর ও সমাজের ন্যায় বাহ্যজগতের বিবিধ সম্বন্ধ আমাদের সুখদুঃখ বিধিমতে পরিচালিত করে। ভূমিকম্প, ঝটিকা, জলপ্লাবন, অনাবৃষ্টি,

অতিবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা ঘটিলে, দেশময় হাহাকার উঠে এবং অনেকে মারা যায়। ইহাদের উপশম ও প্রতীকারের জন্য অনেকে নানা উপায় অবলম্বন করে বটে, তথাচ এই সকল সার্ব্বভৌম বিপদের সম্মুখে, প্রকৃতিজগতের অনিবার্য্য নিয়তির সমক্ষে অনেককে মস্তক অবনত করিতে হয়।

এই প্রকারে বিজ্ঞান স্পষ্ট নির্দ্দেশ করে, শরীর, পরিবার, সমাজ ও বাহ্য-জগতের বিবিধ সম্বন্ধবশতঃ তোমার সুখদুঃখ পদে পদে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। যেমন উহাদের সম্বন্ধ অসংখ্য, তোমার সুখদুঃখও উহাদের দ্বারা অসংখ্যরূপে পরিচালিত হইতেছে। কখন উহাদের শুভ যোগাযোগবশতঃ তুমি বিবিধ সুখের ভাগী হও, কখনও বা উহাদের অশুভ যোগাযোগ বশতঃ তুমি নানা বিষয়ে নানা দুঃখ ভোগ করিতে থাক। এই প্রকারে মানবজীবনে "চক্রবৎ পরিভ্রমন্তে সুখানি চ দুঃখানি চ" এখন যদি তুমি প্রকৃতির নিয়মাবলী না বুঝিয়া এক অদৃষ্টের দোহাই দিয়া বা একেশ্বরে অর্পণ করিয়া মনকে প্রবোধ দেও, তাহাতে প্রকৃতির কি ক্ষতি? প্রকৃতি নিজের অখণ্ড্য নিয়মাবলীর বশবর্ত্তী হইয়া স্বোদ্দেশ্য সাধন করিবেই করিবে।

যদি তুমি বিজ্ঞানকে জিজ্ঞাসা কর, সুখদুঃখবিধানকারী ঐ সকল সম্বন্ধের বিবিধ যোগাযোগ কি প্রকারে সংঘটিত হয়? তখন ইহার একমাত্র উত্তর, অন্ধদৈব (Blind Chance) এ সকল ঘটাইয়া সকলের সুখদুঃখ বিধান করে। দৈববশাৎ ইহাদের বিভিন্ন যোগাযোগ ঘটিতেছে এবং দৈববশাৎ সংসারে কেহ কাঁদিতেছে ও কেহ হাসিতেছে।

বলি, বিজ্ঞানের কথাই কি সত্য? মানবজীবন কি কেবল অন্ধদৈব কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে? তবে কেন জীবনের সময়বিশেষে লোকবিশেষ সুখের পর সুখ ভোগ করে এবং সময়বিশেষে দুঃখের পর দুঃখ ভোগ করে? তবে কি আমাদের ধর্ম্মাধর্ম্ম ও পাপপুণ্য সকলই মিথ্যা? উহাদের সহিত আমাদের সুখদুঃখের কি কোনরূপ সম্বন্ধই নাই? যথার্থ বলিতে কি, বিজ্ঞান সংসারের সুখদুঃখের প্রকৃত কারণতত্ত্ব নির্ণয় করিতে পারে নাই, উহার বাহ্যস্তরটী বিশ্লেষণ করে মাত্র। অতএব উহার কথা দূরে প্রক্ষেপ করিয়া আইস,

আমরা আধ্যাত্মবিজ্ঞানের সুমধুর ও স্বর্গীয় কথা শ্রবণ করিয়া কর্ণদ্বয় জুড়াই।

আধ্যাত্মবিজ্ঞানমতে কর্ম্মফলই সুখদুঃখের প্রকৃত কারণ।

ইহার মতে জীবাত্মার কর্ম্মফলই ইহসংসারে যাবতীয় সুখদুঃখের মূলীভূত কারণ এবং সুখদুঃখরূপ বিভিন্ন মায়াজন্য অবস্থায় পতিত হইয়া ইহা প্রকৃত রূপ শিক্ষা পায় ও অনন্ত উন্নতির পথে অগ্রসর হয়।

এই কর্ম্মফল বিধানের জন্য ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি সংসারে ত্রিগুণের অনন্ত লীলা দেখাইয়া সকল বিষয়ে অনন্ত বৈষম্য ও বৈচিত্র্য আনয়ন করে। এজন্য সমাজের এত বৈষয়িক তারতম্য ও ভেদাভেদ দেখা যায়। এই মায়া জীবাত্মাকে মনের সহিত পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের পঞ্চ ফাঁদে এমন করিয়া বাঁধে যে, ইন্দ্রিয়গণ বহির্জগৎস্থিত ভোগ্য বিষয়গুলি উপভোগ করিয়া উহাকে সুখদুঃখের ভাগী করে এবং উহার কর্ম্মফল প্রদান করে।

এখন কর্ম্মফল শব্দের প্রকৃত অর্থ কি? অনেকে মনে করেন, ইহার অর্থ অতীব সহজ। সংসারে যিনি যেমন কর্ম্ম করিবেন, তিনি তেমনি ফল পাইবেন, ইহাই কর্ম্মফলের প্রকৃত অর্থ। কেহ বলেন, আমরা ইহজীবনে প্রাক্তন কর্ম্মফল ভোগ করিতেছি এবং পরজন্মে ইহজীবনের ফল ভোগ করিব। কিন্তু কর্ম্মফল দ্বারা সাধারণতঃ প্রাক্তন কর্ম্মের ফল বুঝায়। কিন্তু অধ্যাত্মবিজ্ঞান মতে ইহাতে আরও কিছু গূঢ়ত্ব আছে, তাহা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য।

কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা মানব যাহা কিছু করেন এবং মনদ্বারা যাহা কিছু ভাবেন, তদ্দ্বারা সূক্ষ্মজগতে, প্রকৃতিজগতে ও সমাজজগতে কতকগুলি পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। এখন ঐ সকল পরিবর্ত্তন উপরোক্ত ক্রিয়ার অপরিহার্য্য প্রতিক্রিয়া বা পরিণামবশতঃ কালক্রমে স্বতঃ প্রশমিত হইয়া যায়।

কোনরূপ ক্রিয়া দ্বারা প্রকৃতির যে অংশটুকু ক্ষোভিত, আন্দোলিত, বিকৃত বা রূপান্তরিত হইল, ক্রিয়ার অপরিহার্য্য পরিণামবশতঃ সেই অংশটুকু পুনরায় কালক্রমে স্থিরীকৃত ও সমঞ্জসীকৃত হইয়া পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইবে। এখন ক্রিয়ার অপরিহার্য্য প্রতিক্রিয়া বা পরিণামবশতঃ প্রকৃতির যে সমঞ্জসীকরণ বা পূর্ব্বাবস্থাপ্রাপ্তি ঘটে, তাহাই এ সংসারে প্রকৃত কর্ম্ম-ফল।

যেমন জলাশয়ে একখণ্ড প্রস্তর নিক্ষিপ্ত হইলে তরঙ্গের পর তরঙ্গ উত্থিত হইয়া সমস্ত জলাশয়কে আন্দোলিত ও আলোড়িত করে, পরে তরঙ্গগুলি প্রাকৃতিক কারণে অল্পসময়ের মধ্যে প্রশমিত ও লীন হইয়া যায়; সেইরূপ মানবকৃত প্রত্যেক কর্ম্মও তরঙ্গের পর তরঙ্গ উত্থাপন করত স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎ যুগপৎ আন্দোলিত করে। এই দৃশ্যমান স্থূলজগতে ইহার প্রত্যেক তরঙ্গের ঘাতপ্রতিঘাতে কত লোকের মঙ্গলামঙ্গল সম্পাদিত হয় বা কত লোক হাসে ও কাঁদে, তাহা নির্ণয় করা যায় না। কালক্রমে বাহ্যজগতে সেই সকল তরঙ্গ প্রাকৃতিক প্রতিক্রিয়াবশতঃ প্রশমিত হইয়া যায়। কিন্তু সূক্ষ্মজগতের আকাশপটে ইহা চির দিনের জন্য অঙ্কিত হইয়া থাকে।

যেমন এক একটী শব্দ মুখবিবর হইতে নিঃসৃত হইবার পর আকাশে তরঙ্গের পর তরঙ্গ উত্থাপন করত কর্ণকুহরের পটাহে বিদ্ধ হইয়া মস্তিষ্কের শব্দজ্ঞান জন্মায়, সেইরূপ মানবকৃত কর্ম্মও সূক্ষ্মজগতে তরঙ্গের পর তরঙ্গ উত্থাপন করিয়া যেমন ইহাকে আলোড়িত করিতে থাকে, উহারা তেমনি বিধাতার গোচর হইয়া পড়ে এবং তিনি কোন না কোন জন্মে সে কর্ম্মের উচিতমত দণ্ড দিয়া থাকেন। এরূপ না হইলে কি প্রকারে এই বিশ্বসংসারে এমন বিশ্বজনীন সামঞ্জস্য ও সুশৃঙ্খলতা স্থাপিত হইতে পারে?

প্রকৃতির সার্ব্বভৌম নিয়মানুসারে ক্রিয়ামাত্রেরই প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী। উত্তাপ অধিক হয়, শীতলতা স্বতঃ আসিবে। আবার শীতলতা অধিক হয়, উত্তাপ স্বতঃ আসিবে। দেখ না, বিসূচিকা রোগে প্রথমে শীতলতা

বা অবসাদ (Collapse) আইসে, পরে উত্তাপ ও উত্তেজনা (Reaction) দেখা দেয়। উন্নতি হইলেই পতন হয়; আবার পতন হইলেই উন্নতি হয়। পাপকর্ম্ম কর, দুঃখ ভোগ স্বতঃ হইবে; আবার পুণ্যকর্ম্ম কর, সুখ ভোগ স্বতঃ হইবে। কোন বিষয়ে প্রগাঢ় পরিশ্রম ও যত্ন কর, সিদ্ধিলাভ তদনুরূপ হইবে। দীর্ঘসূত্রী ও অলস হও, ফলও সেইরূপ হইবে। পাঁচ জনের মন্দ করিতে যাও, নিজের মন্দ আগে হইবে। পাঁচ জনের ভাল করিতে যাও, নিজের ভাল আগে হইবে।

"যিনি খান দুধচিনি, তাঁহাকে যোগান চিন্তামণি"। তুমি কোন কাজে আন্তরিক চেষ্টা কর, ভগবান তোমার সহায় হইবেন। কোন বিষয়ে অধিক দর্প কর, দর্পহারী মধুসূদন তোমার দর্প অগ্রে চূর্ণ করিবেন। কোন বিষয়ে অতিরিক্ত আশা কর। ভগবান সে গুড়ে শীঘ্রই বালি ধরিয়া দিবেন। যে জাতি অস্ত্রবলে ধরাকে শরার ন্যায় জ্ঞান করে, সে জাতির উপর কালে ভগবানের সুদর্শন চক্র পতিত হইবে। কর্ম্মফল দ্বারা সংসার চিরদিন এই রূপে শাসিত হইতেছে।

সংসারে কর্ম্মফলের বিরাম নাই, বিচ্ছেদ নাই; ইহা চিরদিন সমভাবে ও নিঃশব্দে চলিতেছে। শতবৎসর পূর্ব্বে যে কর্ম্ম জগতে সংঘটিত হইয়াছিল, আজ তাহার ফল ভোগ হইতেছে এবং আজ যাহা সংঘটিত হইতেছে, হয়ত শত বৎসর পরে তাহার ফল ভালরূপ ভোগ হইবে। যে মুসলমানজাতি কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে বীর দর্পে দর্পিত হইয়া সমগ্র জগৎ কম্পিত করিয়াছিল, সে জাতি আজ অনেক দেশে খৃষ্টান জাতির পদানত হইয়াছে। আজ যে খৃষ্টান জাতির শৌর্য্যবীর্য্যে পৃথিবী কম্পিত হইতেছে, পঞ্চশতাব্দী পরে হয়ত সে জাতি অন্য কোন পরাক্রান্ত জাতির পদানত হইবে। আজ যে আর্য্যজাতি ভারতে পরাধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া অপর জাতির পদদলিত হইতেছে, সে জাতি কালে সমুন্নত হইয়া জগতে স্বীয় কীর্ত্তিধ্বজা উড়াইবে। আজ যে প্রজাপীড়ক নিষ্ঠুর জমীদার প্রজাবর্গের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিতেছে, হয়ত কয় পুরুষ পরে তাহার বংশধরেরা দরিদ্র হইয়া যাইবে ও অপরের অত্যাচার সহ্য করিবে।

বিধি বা কর্ম্মদেবী পক্ষপাতশূন্য হইয়া সকলের কর্ম্মফল বা সুখদুঃখ বিতরণ করেন। তিনি স্বহস্তে তুলাদণ্ড লইয়া পাপের দণ্ড ও পুণ্যের পুরস্কার প্রদান করেন। সংসারে যে স্থলে যে কর্ম্মের যে ফল ফলিলে, জগতের সামঞ্জস্য বজায় থাকিবে, তিনি স্বহস্তে তাহাই সে স্থলে বিধান করেন। তাঁহার দয়া নাই, মমতা নাই, তিনি সদা কঠোর ও ন্যায়বান; প্রকৃতির অখণ্ডনীয় নিয়মানুসারে তাঁহার কার্য্যকলাপ চলিতেছে। কি পথের ভিখারী, কি রাজাধিরাজ, সকলের প্রতি তাঁহার সমান দৃষ্টি। কি কীটাণু-কীট, কি তিমি মৎস্য, সকল জীবের প্রতি তাঁহার সমান দৃষ্টি। এরূপ না হইলে কি এমন বিশ্বজনীন সামঞ্জস্য সর্ব্বত্র সমভাবে স্থাপিত হইতে পারে?

বিধির বিচার কি চমৎকার ও সূক্ষ্ম! এ বিচার দেখিলে বলিহারি যাইতে হয়। এ বিচারে উকিল, মোক্তার ও সালিসী কেহই নাই। এ বিচারে দুধ এক দিকে, জল এক দিকে পৃথক হইতেছে। তুমি মনের সাধে স্বার্থসিদ্ধির জন্য পাপকর্ম্ম করিতেছ, আর পরিত্রাতা ঈশা তোমায় সকল পাপ হইতে মুক্ত করিবেন বা ঈশ্বরের পাঁচবার নামাজ পড়িয়া বা ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী জপ করিয়া সকল পাপ হইতে মুক্ত হইবে, তাহা একবারও মনে ভাবিও না। পাপ কর, পুণ্য কর যাহা করিবে তাহার ফল কোন না কোন সময়ে নিশ্চয় পাইবে। এজন্মে হউক, পরজন্মে হউক, নিজ জীবদ্দশায় হউক বা পুত্রপৌত্রাদিগের সময় হউক, তাহার ফল নিশ্চয় ফলিবে। নিভৃতে দুষ্কর্ম্ম করিয়া তুমি মনে মনে ভাবিতেছ, বন্ধু বান্ধব কেহ জানিতে পারে নাই, কেহই গঞ্জনা দিবে না কিন্তু তুমি বিধির চক্ষে কদাচ ধূলি প্রদান করিতে পার না। যদি কেহ চুরি ডাকাতি করিয়া পুলিসে ধরা পড়ে, অর্থ ব্যয় করিয়া দেশের আইনকে ফাঁকি দিতে পারে; কিন্তু কেহ কখন বিধিকে ফাঁকি দিতে পারেনা। যথাসময়ে তিনি তাহার পাপের সমুচিত দণ্ড দিয়া থাকেন।

এই যে একজন বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া অপরের যথাসর্ব্বস্ব লইয়া ভোগ করিতেছে এবং শেষোক্ত দেশের আইনের নিকট সুবিচার না পাইয়া অন্তর্য্যামী ঈশ্বরের নিকট ক্রন্দন করিতেছে ও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছে, এ পাপের কি

কোনরূপ ফল ফলিবে না? যথাসময়ে বিধি নিশ্চয় ইহার ফল দিবেন। এই যে লক্ষপতি জমিদার অম্লানবদনে অসহায় দরিদ্র ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্র কাড়িয়া লইয়া উহার উপর ঘোর অত্যাচার করিতেছে, জমীদারের লোমোৎপাটন করিবার ক্ষমতা উহার নাই; কিন্তু ঐ ব্যক্তি কেবল অন্তর্য্যামী ঈশ্বরের নিকট ক্রন্দন করিতেছে ও দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছে, এ পাপের কি কোনরূপ ফল ফলিবে না? যথাসময়ে বিধি নিশ্চয় ইহার ফল দিবেন। এস্থলে ভক্ত তুলসীদাসের মহৎবাক্য স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখা উচিত "হায়; গরীবন্ কি শ্বাস মরে চামকী ধুক্‌নীসে লোহা ভস্ম হোযায়।" যেমন একখণ্ড মরা চাবের নির্ম্মিত হাপরের ধুক্‌নীতে লৌহ দগ্ধ হইতে হইতে ভস্ম হইয়া যায়, সেইরূপ গরীব লোকের দীর্ঘনিশ্বাসে বড় বড় লোকের সর্ব্বনাশ হইয়া থাকে।

এই যে নরাধম দস্যু দশবার লুণ্ঠনাদি করিতে করিতে একবার ধরা পড়িয়া রাজদ্বারে দণ্ডিত হইতেছে, সেইবারে বিধি আসল সুদ সমেত আদায় করিয়া দিতেছেন। এই যে দারোগারা অনেককে উৎপীড়ন করিয়া উৎকোচ লইতেছে,পরে যখন লোকের অভিসম্পাতে উহাদের স্ত্রী পুত্র অকালে কালগ্রাসে পতিত বা উহাদের ভিটে মাটি চাটি হয়, তখন বিধি উহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করান। এই যে একজন নরহন্তা বিস্তর অর্থব্যয় করিয়া দেশের আইনকে ফাঁকি দিয়া হত্যাপরাধ হইতে নিষ্কৃতি পাইতেছে, পরে যখন বিধির বিচারে ঐব্যক্তি সর্প দংশনে বা বজ্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করে, তখনই উহার সুবিচার হয়।

এই যে পারস্যাধিপতি নাদীর সা দিল্লীনগরী লুণ্ঠন করিতে করিতে রক্তগঙ্গা প্রবাহিত করাইলেন, পরে যখন গুপ্ত ঘাতকের তরবারির আঘাতে তদীয় প্রাণ-বায়ু বহির্গত হইল, তখন বিধি তাঁহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাইলেন। এই যে সামান্যরূপ পিতৃদ্রোহী ও ভ্রাতৃহন্তা সাজাহান দিল্লীর রত্নখচিত সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া মহাসমারোহে ভারত সাম্রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন, পরে যখন নিজ পিতৃদ্রোহী ও ভ্রাতৃহন্তা পুত্র কর্ত্তৃক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন, তখন বিধি তাঁহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাইলেন। এই যে পান্নাধিপতি মহারাজ মাধবসিং উপপত্নীর পরামর্শে নিজ নিরপরাধ পিতৃব্যকে হত্যা করাইলেন,

পরে যখন ইংরাজরাজের সুবিচারে সিংহাসনচ্যুত হইলেন, তখন বিধি তাঁহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাইলেন। এইরূপ এ সংসারে কেহ পাপকর্ম্ম করিয়া বিধির সুবিচার হইতে অব্যাহতি পায় না। সত্য বটে, অনেক স্থলে ও অনেক সময়ে হাতে হাতে পাপের ফল ঘটে না; কিন্তু যথাসময়ে বিধি সকল পাপের শাস্তি দিয়া থাকেন।

যিনি এ জন্মে ঘোর অত্যাচারী ও নরপিশাচ, তিনি পরজন্মে পরের অত্যাচারে ব্যতিব্যস্ত হইবেন। যিনি এ জন্মে ঘোর সুদখোর, তিনি পরজন্মে ঋণের দায়ে জ্বালাতন হইবেন। যিনি এ জন্মে মহাশঠ ও প্রবঞ্চক, তিনি পরজন্মে পদে পদে প্রতারিত হইয়া বিষম কষ্ট পাইবেন। যিনি এ জন্মে দীনদরিদ্র অথচ বিশেষ ধর্ম্মপরায়ণ, তিনি পরজন্মে ধন-পুত্রে লক্ষ্মী লাভ করিবেন। যিনি এজন্মে ধনবান অথচ ঘোর পাপাচারী ও অত্যাচারী, তিনি পরজন্মে দীনদরিদ্র হইয়া নানা কষ্ট পাইবেন। যে সধবা এ জন্মে পতিব্রতাধর্ম্মে স্খলিতা, তিনি পরজন্মে বৈধব্য দশায় পতিত হইয়া নানা কষ্ট পাইবেন। এইপ্রকারে বিধি পাপাচারীর দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন।

যে সকল আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক নিয়ম দ্বারা সংসারের যাবতীয় কর্ম্ম নিজ নিজ পরিণাম প্রাপ্ত হয়, তাহা বুঝা ভার। আবার কোন্ কর্ম্ম কোন্ সময়ে ফলোন্মুখ হইবে, তাহাও কেহ বলিতে পারেন না।' তন্মধ্যে কতকগুলি কর্ম্ম ইহজন্মে ও কতকগুলি কর্ম্ম পরজন্মে ফলোৎপাদন করে; আবার কতকগুলি কর্ম্ম তোমার জীবদ্দশায় না ফলিয়া তোমার সন্তানসন্ততির সময় ফলোৎপাদন করিয়া উহাদিগকে সুখদুঃখের ভাগী করে। ইহাতে সিদ্ধান্ত করা উচিত, তুমি ইহজন্মে যেমন প্রাক্তন কর্ম্মফল ভোগ করিতেছ, তেমনি কিয়ৎপরিমাণে নিজকৃত বা পূর্ব্বপুরুষকৃত ঐহিক কর্ম্মফলও ভোগ করিতেছ, আবার সেইসঙ্গে পরজন্মে ভোগ করিবার জন্য কালক্ষেত্রে নূতন নূতন কর্ম্মবীজ রোপণ করিয়া যাইতেছ।

যেমন বীজ রোপিত ও সিঞ্চিত হইলে প্রথমে অঙ্কুরিত ও কালক্রমে বৃক্ষে পরিণত হইয়া ফলপুষ্পাদি ধারণ করে, সেইরূপ যে কর্ম্মবীজ আজ কালক্ষেত্রে রোপিত হইতেছে, তাহাও কালে বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়া সুখ-দুঃখরূপ বিবিধ

ফলপুষ্পে ও কণ্টকে শোভিত হইবে। এখন কর্ম্মবৃক্ষ কোন্ সময়ে সুখ দুঃখরূপ ফলাদি উৎপাদন করিবে, তাহা কেহ জানেন না। আমরা এই পর্য্যন্ত জানি, কোন না কোন জন্মে ইহার ফলভোগ করিতে হইবে।

মা ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটী শতৈরপি

অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভং।

কোটী কোটী কল্পে ফলভোগ না হইলে কোন কর্ম্ম কদাচ ক্ষয় পায় না। শুভাশুভ যাহা কিছু করিবে, তাহার ফল কোন না কোন সময়ে অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে।" তন্মধ্যে যেগুলি অত্যুৎকট পাপপুণ্য, তাহাদের ফল ইহজন্মে ভোগ করিতে হয়।

অত্যুৎকটৈঃ পুণ্যপাপৈরিহৈব ফলমশ্নুতে

ত্রিভির্বর্ষৈস্ত্রিভির্মাসৈস্ত্রিভিঃ পক্ষৈস্ত্রিভির্দিনৈঃ।

(হিতোপদেশঃ)

"যেগুলি অত্যুৎকট পাপপুণ্য, উহাদের ফল ইহজীবনে তিন বৎসরে, তিন মাসে, তিন পক্ষে ও তিন দিনে ভোগ করিতে হয়।" যাহা হউক, যে যাহা করে, তাহা তাহার তোলা থাকে। কোন না কোন সময়ে তাহার ফলভোগ করিতে হইবে।

কর্ম্মবিষয়ক নিয়মাবলি বিজ্ঞানোক্ত অন্ধদৈব কর্ত্তৃক পরিচালিত হয় না। সূক্ষ্মজগৎস্থ দেবগণ উহাদিগকে চিরদিন পরিচালিত করিতেছেন। যদি উহারা অন্ধদৈব কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইত, এমন সর্ব্বাঙ্গীন ও সর্ব্বজনীন সামঞ্জস্য ও সুশৃঙ্খলতা কি কদাচ জগতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত? লোকের কর্ম্মফলানুসারে সূক্ষ্মজগৎস্থ দেবগণ শরীর, সমাজ ও বাহ্যজগতের যাবতীয় সম্বন্ধকে পরিচালিত করিয়া সকলের ভাগ্যলিপি সুচারুরূপে চালান। যেমন জগতের ঐ সকল সম্বন্ধ অসংখ্য, দেবতারাও সেইরূপ উহাদের অসংখ্যরূপ সংযোগ ও বিয়োগ সংঘটনপূর্ব্বক সমগ্র মানবজাতির সুখদুঃখ অসংখ্যরূপে বিধান করিতেছেন। এই সকল দেবতারা আমাদের প্রকৃত ভাগ্যবিধাতা এবং তাঁহাদের সমষ্টি আমাদের বিধি বা বিধাতা।

যেরূপ দেবতারা একদিকে শারীরিক ও প্রাকৃতিক নিয়মাবলি চালিত করিয়া তোমায় বিবিধ সুখদুঃখের ভাগী করেন, সেইরূপ তাঁহারা অপরদিকে

তোমার হৃদয়স্থ চিন্তারাশিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া বিবিধ কর্ম্মে প্রেরণ করত প্রাক্তন কর্ম্মানুসারে তোমায় বিবিধ সুখদুঃখের ভাগী করিতেছেন। এস্থলে কদাচ ভাবিওনা, তোমার হৃদয়স্থ চিন্তারাশি একমাত্র তোমার স্বাধীন ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। ইহার উপর দৈব ইচ্ছার অনুশাসন যথেষ্টরূপ চলিতেছে।

ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, আমাদের চিন্তারাশি স্বাধীন ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত বলিয়া আমরা কালক্ষেত্রে নূতন নূতন কর্ম্মবীজ রোপণ করি এবং ইহার উপর দৈবের অনুশাসন অধিক বলিয়া আমরা প্রাক্তন কর্ম্মফল ভোগ করি। যে পাপপুণ্যের জন্য আমরা দায়ী এবং যাহার ফলাফল আমাদিগকে কোন না কোন জন্মে ভোগ করিতে হইবে, উহার জন্য আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার অনুশাসন হৃদয়স্থ চিন্তারাশির উপর বলবৎ। কিন্তু সংসারে কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বা লোকবর্গের প্রাক্তন কর্ম্মফল দিবার জন্য স্বাধীন ইচ্ছা উল্লিখিত হইয়া দৈবইচ্ছা বলবৎ হইয়া থাকে। নিজ নিজ জীবনের অতীত ঘটনাবলি অনুধাবন কর, এ কথার সত্যতা ভালরূপ বুঝিতে পারিবে।

কথকদিগের প্রমুখাৎ সকলেই শ্রবণ করেন, যখন অযোধ্যাপতি রাজা দশরথ রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবার উদ্যোগ করেন, তৎকালে সরস্বতী দেবী জগতের মহৎ কার্য্য সাধনার্থ দেবগণ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া মন্থরার কণ্ঠদেশে অধিষ্ঠিতা হন। দেখ, কত বড় মহৎ কার্য্যের জন্য দেবগণ কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিলেন? যদি পাপীয়সী মন্থরা কৈকেয়ীর কর্ণ-কুহরে কুমন্ত্রণারূপ মহাগরল উদ্গীরণ না করিত, শ্রীরামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনার্থ চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসে গিয়া সত্যের মাহাত্ম্য জগতে প্রচার করিতেন না, লঙ্কাধিপতি রাবণ সীতাদেবীকে হরণ করিয়া সবংশে নিধন প্রাপ্ত হইত না এবং রামায়ণও সংসারে রচিত হইত না। এ স্থলে ভাবা উচিত, এক সামান্য প্রস্তরখণ্ড নিক্ষিপ্ত হওয়াতে কত শত শত পক্ষী যুগপৎ নিহত হইল।

সংসারের নানাকর্ম্মে দেবগণ কোন্ দুর্লক্ষ্য সূত্র অবলম্বন করিয়া নানা লোকের বা নানা জাতির ভাগ্যলিপি কিরূপে পরিবর্ত্তন করিয়া থাকেন, তাহা কীটাণুকীট মানব কি বুঝিবে? দেখ অষ্ট্রীয়ার যুবরাজ সার্ভিয়া দেশের কয়েকটী ছাত্র দ্বারা সস্ত্রীক নিহত হইলেন। কিন্তু এই সামান্য হত্যা হইতে সমগ্র ইউরোপে কি ভীষণ দাবানল প্রজ্বলিত হইল? এই মহাকুরুক্ষেত্রে কত সমৃদ্ধ

নগরী ধূলিসাৎ হইল, কত অর্থরাশি ক্ষয় ও কত অগণ্য লোকক্ষয় হইল, জগতের কত পরিবর্ত্তন হইল, কত রাজাধিরাজের পক্ষে কি দুর্দ্দশা ঘটিল! এস্থলে ভাবা উচিত, এক সামান্য প্রস্তর নিক্ষেপে কত সহস্র সহস্র পক্ষী যুগপৎ নিহত হইল।

আমেরিকা ও ভারতের সমুদ্রপথ আবিষ্কৃত হইবার পর চারি শতাব্দী ব্যাপিয়া ইউরোপীয় জাতিবর্গ বাহুদর্পে দর্পিত হইয়া পৃথিবীর দুর্ব্বল জাতি বর্গকে শস্ত্রবলে পরাস্ত করিয়া ও নানাদিকে নানা রাজ্য কাড়িয়া লইয়া যে অভিসম্পাত কুড়ায়, তাহার কিঞ্চিৎ ফল একদিনে ফলিল। প্রায় সকলেই এমন অনর্থকর সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছিল। যাহা হউক ভগবদিচ্ছায় পরিশেষে ধর্ম্ম ও সাধারণতন্ত্রের জয় হইয়াছে। এই প্রকারে মানবজাতির কর্ম্মফল বা নিয়তি গূঢ়ভাবে চিরদিন চালিত হইতেছে।

The great Karmic Laws of Nature act in that inscrutable way.

Secret doctrine.

এস্থলে দৃষ্টান্ত দ্বারা কর্ম্মফল বুঝান আবশ্যক। মনে কর, অন্ধকারে যাইতে যাইতে সর্পদষ্ট হইয়া একব্যক্তি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। এখন তাহার মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া কেহ বলিবেন, অসাবধানতা তাহার মৃত্যুর প্রকৃত কারণ, কেন সে ব্যক্তি আলোক না লইয়া অন্ধকারে আসিল? কেহ বলিবেন, দুরদৃষ্ট তাহার অপঘাত মৃত্যুর প্রধান কারণ; যে হেতু দুরদৃষ্টবশতঃ সে ব্যক্তি আলোক না লইয়া অন্ধকারে আসিয়াছিল, সর্প তথায় উপস্থিত ছিল এবং উহার লেজের উপর পা দিয়াছিল। আবার কেহ বলিবেন, দৈববশতঃ (by chance) সর্প তথায় ছিল এবং উহার দংশনে তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে; অতএব তদীয় মৃত্যু কেবল দৈববশাৎ ঘটিয়াছে। যাহাহউক, এ ঘটনার কারণপরম্পরা অনুসন্ধান করিলে স্পষ্ট প্রতীতি হইবে, অসাবধানতার জন্য ঐ ব্যক্তি দোষী হইলেও ইহা তাহার মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নহে, কারণ সে ব্যক্তি আজীবন আলোক না লইয়া ঐরূপ অন্ধকারে বেড়াইয়াছে; আবার সর্পের উপর পা দিলেও কখন কখন লোকে উহা দ্বারা দষ্ট হয় না এবং কখন কখন দষ্ট হইয়াও মৃত্যুমুখে পতিত হয় না। এস্থলে সর্প দংশন তদীয় মৃত্যুর নিমিত্ত কারণ

হইলেও তাহার প্রাক্তন কর্ম্মফল ইহার প্রধান কারণ। যে যে অবস্থার যোগাযোগে ঐ ব্যক্তি পঞ্চত্ব পাইল, তদীয় কর্ম্মফল সেই সকল অবস্থার পূর্ণ যোগাযোগ ঘটাইয়া দিয়াছে এবং তাহার বিনাশাভিপ্রায়ে সর্পকে নিয়োজিত করিয়াছে।

মনে কর, একব্যক্তি জন্মান্ধ হইয়া সংসারে অশেষ কষ্ট পাইতেছে। এ স্থলে এ ব্যক্তির জন্মান্ধ হইবার প্রকৃত কারণ কি? শরীরতত্ত্ব বলিবে, যে সকল পরিবর্ত্তনপরম্পরা দ্বারা নেত্রদ্বয় জরায়ুগর্ভে পূর্ণভাবে বিকশিত হয়, উহাদের ত্রুটি হওয়ায় সে জন্মান্ধ হইয়াছে। এ ব্যক্তির নেত্রস্ফুরণে কেন তাদৃশ ব্যতিক্রম ঘটিল? এস্থলে বোধ হয়, যে সকল অবস্থার যোগাযোগে উহার নেত্রদ্বয় পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয় নাই, উহার প্রাক্তন কর্ম্মফল সেই সকল অবস্থার পূর্ণ যোগাযোগ ঘটাইয়া উহাকে জন্মান্ধ করিয়াছে। এখন যদি জিজ্ঞাসা কর, পূর্ব্ব জন্মের কোন্ মহাপাপ হইতে সে ব্যক্তি জন্মান্ধ হইয়াছে, তাহা কেহ বলিতে পারেনা। আমরা এই পর্য্যন্ত জানি, কর্ম্মফল আমাদের যাবতীয় সুখদুঃখের মূলীভূত কারণ। কিন্তু কোন পাপপুণ্যে কি ফল ভোগ করিতে হয়, তাহা আমরা কেমন করিয়া বুঝিব?

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, মহাত্মা বুদ্ধদেব প্রাচ্যজগতে কর্ম্মফল প্রথমে প্রচার করেন। কিন্তু ইহা প্রাচীনকালের অধ্যাত্মবিজ্ঞানের মত। আমাদের পরম পূজনীয় শ্রীকৃষ্ণদেব তাঁহার সহস্রবৎসর পূর্ব্বে জগতে এই শ্রেষ্ঠমত প্রচার করিয়া যান।

খৃষ্টধর্ম্ম ঐহিক কর্ম্মফল ভালরূপ মানে বটে; কিন্তু ইহা আদৌ প্রাক্তন কর্ম্মফল মানে না। ইহার মতে এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের কর্ম্মের জন্য অবিনশ্বর আত্মাকে স্বর্গে ও নরকে বাস করিতে হয়। পুণ্যকর্ম্মের জন্য ইহা স্বর্গে যায়; আর পাপকর্ম্মের জন্য ইহা নরকে বাস করে। যাহারা জন্মান্ধের ন্যায় সংসারে অকারণ কষ্ট পায়, তাহারা স্বর্গে পুরস্কৃত হইবে বলিয়া এ ধর্ম্মসকলকে প্রবোধ দেয়। যাহাহউক খৃষ্ট ধর্ম্ম সংসারের সুখদুঃখের প্রকৃত কারণ বুঝিতে পারে নাই।

এখন জিজ্ঞাস্য, প্রাক্তন কর্ম্মফল জীবাত্মাকে কি প্রকারে চালিত করে? এ সংসার যেমন ইহার এক কর্ম্মক্ষেত্র; সেইরূপ ইহার নানা কর্ম্মক্ষেত্র আছে। এখানে যেমন ইহা মন, ইন্দ্রিয় ও স্থূলদেহযোগে বাহ্য জগতের সহিত সম্বন্ধ

হইয়া বিবিধ বিষয় উপভোগ করিতে করিতে বিবিধ সুখদুঃখের ভাগী হয়, সেইরূপ অন্যান্য লোকে ইহা বিভিন্ন অবস্থায় পতিত হইয়া বিভিন্ন প্রকার সুখদুঃখের ভাগী হইবে। কিন্তু সকল লোকে জীবাত্মা নিজকৃত কর্ম্মানুসারে কর্ম্মদেহ লাভ করিয়া কর্ম্মফল ভোগ করিবে।

যে মন ও শরীর লইয়া জীবাত্মা ইহসংসারে প্রবেশ করে, তাহাও ইহার প্রাক্তন কর্ম্মানুসারে স্থিরীকৃত হইয়া থাকে এবং ইহার সেই জন্য দেহ বাহ্য জগতের সহিত যেরূপ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ ও জড়িত হয়, তাহাও ইহার কর্ম্মানুসারে স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। এজগতের নিয়মানুসারে পুরুষনিষিক্ত বীর্য্যের সহিত স্ত্রীশোণিতের মিলন হইলে জীব সংসারে ব্যক্ত হয়। এই জীব মোটা-মুটি পিতামাতার শারীরিক ও মানসিক গুণাগুণ উত্তরাধিকার করিয়া নিজ দেহ ও মন প্রাপ্ত হয়। যে জীবাত্মা এখন জীবরূপ সংসারে ব্যক্ত, ইহা জন্ম পরিগ্রহের জন্য উপযুক্ত পিতামাতার যোগাযোগ প্রাপ্ত হয়। এজন্য প্রাক্তন কর্ম্মানুসারে এসংসারে কেহ রাজপুত্র, কেহ বা ভিক্ষুকপুত্র হয়। অন্ধদৈব কর্ত্তৃক চালিত হইয়া কেহ রাজকুলে বা ভিক্ষুককুলে জন্মগ্রহণ করে না। আরও দেখ, এক পিতামাতার সন্তানদিগের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি লইয়া বিস্তর প্রভেদ দৃষ্ট হয়। এ বিষয়ও উহাদের প্রাক্তন কর্ম্মানুসারে অনুশাসিত হইয়া থাকে। যিনি পূর্ব্বজন্মে বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সম্বন্ধে যেমন উন্নতিলাভ করেন, ইহজন্মে তাহা তাঁহার সহজাত হইয়া থাকে। এজন্য এক পিতামাতার সন্তান দিগের মধ্যে এতৎ সম্বন্ধে বিস্তর প্রভেদ দেখা যায়।

অধ্যাত্মবিজ্ঞানমতে সুখদুঃখের যথার্থ প্রকৃতি।

এই মায়াময় সংসারে আমাদের যাবতীয় সুখদুঃখ কেবল মায়াজন্য ও অনিত্য। মিছে মায়ায় মুগ্ধ হইয়া আমরা ইহাদিগকে অনুক্ষণ ভোগ করিতেছি।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেন :—

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত।

(গীতা)

"শীত ও উষ্ণ, কর্কশ আলোক ও অন্ধকার, স্বরূপ ও কুরূপ, মধুর ও তিক্ত স্বাদ, মধুর ও কর্কশ স্বর, সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ, প্রভৃতি সংসারের যে সকল দ্বন্দ্বজ ভাব হইতে আমাদের সুখদুঃখজ্ঞান জন্মে, উহারা পঞ্চেন্দ্রিয়ের সহিত উহাদের ভোগ্য বিষয়গুলির সংযোগবশতঃ উৎপন্ন হয়। এ সকল ভাব সর্ব্বথা অনিত্য, একবার আসিতেছে ও পুনরায় চলিয়া যাইতেছে। তথাচ যতদিন জীবন ধারণ করিবে, ততদিন, উহাদিগকে পুনঃ পুনঃ ভোগ করিতে সকলেই বাধ্য।" ইহারা মায়াজন্য ও অনিত্য হইলেই বা কি হইবে? ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়া হইতে কাহারও ত কিছুতে নিষ্কৃতি নাই; সে জন্য জীবদ্দশায় সকলে ইহাদিগকে অনুক্ষণ ভোগ করিতেছে। এই প্রকারে মন ও ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়াবশতঃ জীবাত্মার সুখদুঃখজ্ঞান জন্মিতেছে। এই জ্ঞান জন্মাইয়া মায়া ইহাকে প্রাক্তন কর্ম্মফল ভোগ করায়।

মানব প্রকৃত অবস্থায় থাকুন বা অপ্রাকৃত অবস্থায় থাকুন, তিনি অসভ্য হউন বা সুসভ্য হউন, তিনি যে অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করুন না, তাঁহার কোন অবস্থা প্রকৃতির ত্রিগুণের ক্রিয়ার বহির্ভূত নহে। এই ত্রিগুণের অসংখ্য সংযোগ ও বিয়োগ বশতঃ সংসারের প্রত্যেক ঘটনাতেও প্রত্যেক বস্তুতে সুখদুঃখের তারতম্য ঘটিতেছে। সংসারে যে বস্তু যত উৎকৃষ্ট, সে বস্তু আবার তত নিকৃষ্ট; যে বস্তু যত সুখদায়ক সে বস্তু তত দুঃখদায়ক; তাহার সাক্ষ্য দেখ, ইংরাজরাজের ভারতশাসন যেমন এক দিকে উৎকৃষ্ট, তেমনি অপরদিকে মহা অপকৃষ্ট।

সংসারের নানা বিষয় ভালরূপ পর্য্যবেক্ষণ কর, উপরোক্ত কথার সত্যতা বুঝিতে পারিবে। চন্দ্রে কলঙ্ক, কমলে কণ্টক, কুসুমে কীট, মধুতে তীব্রতা ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। যে ঔষধ এক দিকে অশেষ রোগনাশক বলিয়া অমৃতস্বরূপ, তাহাই আবার সংসারে প্রাণনাশক মহাবিষ। স্নেহের পুত্তলি যে পুত্রকে দেখিয়া তুমি অপার আনন্দে উৎফুল্ল হও, সেই পুত্রের বিয়োগে তুমি জগৎ অন্ধকার দেখ ও হাহাকার কর।

এই ত্রিগুণের ক্রিয়াবশতঃ কি মানব, কি ইতরজন্তু কেহই সুখদুঃখের হাত হইতে অব্যাহতি পায় না। ইতর জীবজন্তুগণ প্রাকৃত অবস্থায় আছে। উহাদের সুখের ভাগ যেমন অল্প, দুঃখের ভাগও তেমনি অল্প। মানব

অপ্রাকৃত অবস্থায় আছেন। তাঁহার সুখৈশ্বর্য্য যেমন একদিকে বাড়িতেছে, তেমনি অপর দিকে তাঁহাকে নানা কষ্ট ও দুঃখ ঘিরিতেছে। যে বাষ্পীয় রথ ও ট্রামকার আমাদের গমনাগমনের অশেষ সুবিধা করে, তাহাই আবার আমাদিগকে পঙ্গু করিয়া ফেলে। আমরা যেমন নানা যন্ত্রাদি উদ্ভাবন করিয়া আমাদের সুখবর্দ্ধন করিব দুঃখও তেমনি উহার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িবে। সংসারে দুঃখ ছায়ার ন্যায় সুখের অনুগমন করে। সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে মানবের সুখরাশি যেমন একদিকে বাড়িতেছে, তেমনি দুঃখরাশিও অপরদিকে সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে থাকিবে। যে বাষ্পীয় কল অত্যল্প সময়ে বস্ত্র বয়ন করিয়া উহাকে সুলভ মূল্যে বিক্রয় করিয়া লোকের সুখ বর্দ্ধন করে, তাহাই আবার সহস্র সহস্র তন্তুবায়কে নিরন্ন করিয়া ফেলে। সুখদুঃখ সম্বন্ধে প্রকৃতির এইরূপ অখণ্ডনীয় নিয়ম চলিতেছে।

সংসারের যাবতীয় দুঃখ ও ক্লেশ আত্মার অশেষ মঙ্গলের জন্য পরিকল্পিত। দুঃখ ভোগ না করিলে জীবাত্মার যথার্থ শিক্ষা ও উন্নতিলাভ হয় না। দুঃখানলে দগ্ধ না হইলে কেহ নিজশ্রেয় বুঝিতে পারে না। যেমন অগ্নিতে দগ্ধ হইলে স্বর্ণ দ্বিগুণ ঔজ্জ্বল্য লাভ করে, সেইরূপ দুঃখানলে দগ্ধ হইয়া জীবাত্মাও ধর্ম্মপথে অধিক অগ্রসর হয়। শোকের আর্ত্তনাদ, হাহাকার রোদন ও দীর্ঘনিশ্বাসের ভিতর আত্মা যেরূপ সুশিক্ষা পায়, সুখের ক্রোড়-দেশে চিরদিন পালিত হইলে, সে শিক্ষার শতাংশের একাংশও হয় না। যিনি জীবনে যত দুঃখ ও কষ্ট পান, তাঁহার আত্মার ততোধিক শিক্ষা-লাভ হয়। সকলেই সুখে থাকিতে একান্ত অভিলাষী বটে; কিন্তু আমাদের অশেষ মঙ্গলের জন্য করুণাময় পরমেশ্বর আমাদিগকে সময়ে সময়ে নানারূপ যন্ত্রণা ও কষ্ট দেন। বিপদে পতিত হইয়া বা রোগশোকে জর্জ্জরিত হইয়া যখন আমরা "কোথায় মা দুর্গে দুর্গতিনাশিনি" বলিয়া প্রাণভরে ডাকিতে থাকি, তখন মা দুর্গার অপত্যস্নেহ তাপিততনয়ের জন্য উথলিয়া পড়ে এবং আমাদের আত্মাও সেই প্রেমপীযুষ পান করিতে করিতে আধ্যাত্মিক পথে অধিক অগ্রসর হইতে থাকে।

সংসারের এত জ্বালাযন্ত্রণা, এত রোগশোক, এত বিপদ আপদ, আত্মার মঙ্গলের জন্য জানিবে। ইহারা ত যথার্থতঃ উহার কর্ম্মদণ্ডের জন্য

নিহিত। রাজাধিরাজ ও পথের কাঙ্গাল, পণ্ডিত ও মূর্খ, সকলের উপর সমান বিপদ আপদ ও রোগশোক পতিত আছে। সকলেরই মস্তকের উপর ডিমোক্লাইটিসের তরবারি চিরদিন ঝুলিতেছে।

সংসাররূপ মহানাট্যশালায় সকলে বিবিধ সাজে সজ্জিত হইয়া নিজ নিজ পালা গাইতে আইসেন। কেহ রাজা সাজেন, কেহ বা ভিক্ষুক সাজেন; কেহ পণ্ডিত সাজেন, কেহ বা মূর্খ সাজেন; কেহ উকিল সাজেন, কেহ বা ডাক্তার সাজেন। এক কর্ম্মফল সকলকে ভিন্ন ভিন্ন সাজে সজ্জিত করে এবং বিধাতা সকলের কর্ম্মদণ্ড দেন। বঙ্গের রত্নাকর কবি গান—

মুটে মজুর কি রাজা
এ সংসারে সব সংসাজা।
যার যেমন কাজ, তার তেমন সাজ
বিধি দেন সাজা।

রাজাধিরাজ হও, পথের কাঙ্গাল হও কর্ম্মদণ্ড হইতে কাহারও নিস্তার নাই। এ সংসারে সকলকেই সমভাবে নিজ কর্ম্মদণ্ড ভুগিতে হয়।

এই যে রাজাধিরাজ রত্নখচিত সিংহাসনে রত্নখচিত রাজমুকুট ধারণ করিয়া উপবিষ্ট আছেন, যাঁহার মুখারবিন্দের একটী কথা শ্রবণ করিবার জন্য লক্ষ লক্ষ লোক সদা উদ্‌গ্রীব, যাঁহার সামান্য কৃপাকটাক্ষপাত পাইবার জন্য উহারা সদা হুড়াহুড়ি করে, তিনি কি নিজের কর্ম্মদণ্ড ভোগ করেন না? যখন গভীর নিশীথ রাত্রে তিনি রাজকার্য্যের চিন্তায় অস্থির হইয়া কাতর কণ্ঠে নিদ্রাদেবীকে আহ্বান করিতে থাকেন, তখন তাঁহার কিরূপ অবস্থা হয়, তুমি কি তাহা একবার ভাবিতে চেষ্টা করিবে? তখন কোথায় বা তাঁহার বাহ্য আড়ম্বর! কোথায় বা তাঁহার রাজমুকুট! কোথায় বা তাঁহার জরিসাচ্চার পোষাক। কোথায় বা তাঁহার ধ্বজাপতাকা! তিনি ভাবেন, এ সকল গঙ্গার জলে প্রক্ষেপ কর। আমি যদি গরীবের ঘরে জন্মিতাম, আজ আমায় এত কষ্ট পাইতে হইত না। এই প্রকারে তিনি নিজের দুঃখ প্রকাশ করিবেন।

এই যে একজন মজুর ঈশ্বরদত্ত হস্তপদের রাজা হইয়া সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছে ও দিনান্তে শাকান্ন গলাধরণ করিয়া নিদ্রাদেবীর ক্রোড়দেশে সুখে শয়ন করিতেছে ইহাকে দেখিয়া সাধারণে বলিবে, ইহার মত অভাগা

সংসারে আর কেহ নাই। কিন্তু একজন রাজা বলিবেন, লোকে তপস্যাবলে গরীবের গৃহে জন্ম গ্রহণ করে। যাহা হউক, এ সংসারে সকলেই নিজ নিজ কর্ম্মদণ্ড ভোগ করিতেছে।

এ জগতে সুখ ত্রিবিধ, যথা :—

(১) সাত্ত্বিক।

(২) রাজসিক।

(৩) তামসিক।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেন :—

যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামে মধুরং
তৎসুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্।
(গীতা)

"যাহা অগ্রে বিষতুল্য, পরিণামে মধুর এবং যাহা আত্মপ্রসাদ ও জ্ঞানানুশীলন হইতে জন্মে, তাহাই আমাদের সাত্ত্বিক সুখ।" যে কার্য্যে নানা বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হয় এবং আমাদিগকে নানাকষ্ট পাইতে হয়, পরিশেষে কার্য্যোদ্ধার হইলে যে বিমল আনন্দ ভোগ করা যায়, তাহাই আমাদের সাত্ত্বিক সুখ। বিবিধ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া মনে যে আত্মপ্রসাদ লাভ করা যায় এবং জ্ঞানানুশীলন করিতে করিতে যে বিমল আনন্দভোগ করা যায়, তাহাই আমাদের সাত্ত্বিক সুখ। সুখের মধ্যে ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

বিষয়েন্দ্রিয়যোগাদ্‌যত্তদগ্রেঽমৃতোপমং
পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসংস্কৃতং।
(গীতা)

"যৎকালে ইন্দ্রিয়গণ উহাদের ভোগ্য বিষয় ভোগ করিতে থাকে, তখন যাহা প্রথমে অমৃততুল্য, পরে বিষতুল্য হয়, তাহা আমাদের রাজসিক সুখ।" মেঠাই মণ্ডা খাইতে বড় সুখ; কিন্তু অতিরিক্ত খাইলে পীড়া উৎপাদন করে। রাত্রিজাগরণ করিয়া থিয়েটার দেখায় বড় আমোদ; কিন্তু তদ্দ্বারা পীড়া জন্মিতে পারে; এজন্য উহারা আমাদের রাজসিক সুখ। সংসারে ঈদৃশ সুখ মধ্যম।

যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতং।

(গীতা)

"যাহা অগ্রে এবং যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ সুখদায়ক এবং আত্মাকে মোহিত করিয়া রাখে এবং যাহা নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ হইতে উৎপন্ন হয়, সেই প্রকার নিকৃষ্ট সুখকে তামসিক সুখ বলে। স্ত্রী সহবাস, মদ্যপান, নিদ্রা আলস্য প্রভৃতিতে এইরূপ সুখ ভোগ হয়।

সংসারে আমাদের দুঃখও ত্রিবিধ। যথা—

(১) মানসিক।

(২(শারীরিক।

(৩) দৈবিক।

যে কোন বিষয় হইতে আমাদের মনে কষ্ট উপস্থিত হয়, তাহাই আমাদের মানসিক কষ্ট। সংসারে অসংখ্য বিষয় হইতে ইহা উৎপন্ন হয়। শরীরে নানা-বিধ রোগযন্ত্রণা হইতে যে কষ্ট পাওয়া যায়, তাহাই আমাদের শারীরিক দুঃখ। আর দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি দৈবঘটনা হইতে আমাদের যে সকল বিপদ আপদ ও কষ্ট হয়, তাহাই আমাদের দৈবিক দুঃখ।

এই প্রকারে আমরা সংসারে ত্রিবিধ সুখদুঃখের বশীভূত হইয়া কর্ম্মফল ভোগ করিতেছি।

জন্মলগ্নানুসারে মানবের সুখদুঃখ।

জরায়ুগর্ভে বর্দ্ধিত হইয়া জরায়ুজীবন অবসান হইবার সময় জীব আত্মার প্রাক্তন কর্ম্মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন লগ্নে ভূমিষ্ট হয়। ধাত্রীবিদ্যা (Midwifery) কোন্ মুহূর্ত্তে মানবশিশু ভূমিষ্ঠ হইবে, তাহা বলিতে পারে না। এ শাস্ত্র এই পর্য্যন্ত জানে, জরায়ু হইতে পুষ্প (Placenta) যখন পৃথক হইবার উপক্রম হয়, তখন মাতার প্রসববেদনা আরম্ভ হয়।

এখন যে লগ্নে বা মুহূর্ত্তে মানবশিশু ভূমিষ্ঠ হইবে, তাহা তদীয় জীবনে সর্ব্ব-প্রধান ও অত্যাবশ্যক মুহূর্ত্ত; কারণ এই জন্মলগ্নানুসারে ইহার যাবতীয় সুখদুঃখ নবগ্রহ কর্ত্তৃক যথাবিধি নিয়মিত হয়। জন্মলগ্নে নবগ্রহ ও নক্ষত্রাদি রাশিচক্রের

যে গৃহে যে ভাবে অবস্থিতি করে, উহারা আজীবন তাহাকে তদনুরূপ ফলাফল প্রদান করিবে এবং লগ্নানুসারে যখন গ্রহাদির যেরূপ সঞ্চার হইবে, তখন উহারা তাহাকে তদনুরূপ অবস্থোচিত সুখদুঃখের ভাগী করিবে।

আমাদের সুশিক্ষিত বান্ধবগণ মনে করেন, ফলিত জ্যোতিষ পুরাকালীন কুসংস্কারের ভগ্নাবশেষ মাত্র। সুসভ্য ইউরোপখণ্ডে ইহার তাদৃশ সমাদর নাই দেখিয়া তাঁহারা ঐরূপ ভাবেন। তাঁহাদের মনে রাখা উচিত, যেমন সংস্কৃত দেবভাষা, সনাতন হিন্দুধর্ম্ম, ষড়্দর্শন ও আয়ুর্ব্বেদ আমাদের পূর্ব্বতন জাতীয় গৌরবের অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ, সেইরূপ ফলিতজ্যোতিষও আর্য্যজাতির বিদ্যাবুদ্ধির সম্যক্ পরিচায়ক। এই সোণার ভারত হইতে এ শাস্ত্র অন্যান্য দেশে নীত ও প্রচারিত হইয়াছে।

বল দেখি, যে শাস্ত্র গণনা দ্বারা জীবনের ভবিষ্যৎ ঘটনাবলি পূর্ব্বাহ্নে নির্দ্ধারিত করে এবং যাহার গণনা প্রায়ই হুবহু সত্য ঘটনায় পরিণত হয়, সে শাস্ত্রকে অলীক ও কাল্পনিক বলিয়া কি কদাচ ঘৃণা করা উচিত? সত্য বটে, আজকাল হিন্দুসমাজে রাজার উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষণের অভাবে ইহার বিস্তর অনাদর ও অবনতি দেখা যায়, তথাচ যখন ইহা এতকাল ব্যাপিয়া সমাজে চলিয়া আসিতেছে, তখন ইহাকে কদাচ অলীক ও কাল্পনিক বলিয়া অবজ্ঞা করা উচিত নয়। পরন্তু ইহার উন্নতিকল্পে সাধ্যমত চেষ্টা করা উচিত। কালগতিকে ইহাতে যে সকল দোষ ও ভ্রম আসিয়া পড়িয়াছে, উহাদের সংশোধন করা একান্ত আবশ্যক। এখন ভারতে জয়পুরের সেই হিতৈষী জয়সিংহের ন্যায় রাজা নাই, যিনি এতদর্থে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিবেন।

জ্যোতিষ শাস্ত্র ভারতে অতি প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। অনেকের বিশ্বাস, রোমকপুরনিবাসী যে অসুর ময়দেব সূর্য্যদেবের নিকট এ শাস্ত্র শিক্ষা করেন, তিনি আধুনিক পৃথিবীর মানব নন। যৎকালে ইহাতে দীর্ঘকায় অসুরগণ বিচরণ করিত, তিনি সেই সময়ে প্রাদুর্ভূত হন। কেহ কেহ বলেন, পুরাকালে যোগসিদ্ধ মহর্ষিগণ যোগবলে এ শাস্ত্রের জ্ঞানলাভ করেন। যদি যোগবলে ইহার প্রাপ্তি অস্বীকার কর, ইহা যে আয়ুর্ব্বেদের ন্যায় অগাধ পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার চরম ফল, সে বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ নাই।

বেশ জানিবে,জ্যোতিষ শাস্ত্রের উন্নতির সঙ্গে গ্রহনক্ষত্রাদির সঞ্চার ও স্থিতি ভালরূপ পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে এবং সেইসঙ্গে বহুকাল ধরিয়া লক্ষ লক্ষ মানবের জীবনী তন্ন তন্ন করিয়া আদ্যোপান্ত ও একাদিক্রমে অনুসন্ধান করিতে করিতে এ শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত ও নিয়মাবলি বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে।

পাশ্চাত্য জগতে ফলিতজ্যোতিষের আদর নাই। তথায় জনসাধারণকে পুরুষকার বলে আধিভৌতিক উন্নতিসাধনে প্রোৎসাহিত করিবার জন্য ইহার এত অনাদর করা হয়। অনেকে বলেন, এ শাস্ত্র মানিয়া চলিলে, লোকে স্বতঃ উদ্যমবিহীন ও কাপুরুষ হইয়া পড়ে। যাহার অদৃষ্ট ভাল হইবে; তিনি ত স্বতঃ পুরুষকার বলে আত্মোন্নতি সাধন করিবেন। তবে কেন এ শাস্ত্রের দোষ-দাও?

ফলিত জ্যোতিষদ্বারা বুঝা যায়, জীবনের ঘটনাবলি যতই কেন রহস্যময় হউক না,উহারা গ্রহাদির সঞ্চারবশতঃ ঘটিতেছে এবং উহারা পূর্ব্বাহ্নে স্থিরীকৃত থাকে। ইহাতে বোধ হয়, মানবের স্বাধীন ইচ্ছা অনেক সময়ে দৈব ইচ্ছা দ্বারা চালিত হইতেছে। জীবনের কর্ম্মফল, গ্রহাদির শুভাশুভ দৃষ্টি, দৈব ইচ্ছা ও বিধাতার কার্য্য সকলই এক সূত্রে গ্রথিত। মানবের বুদ্ধি বা স্বাধীন ইচ্ছা উহাদের সম্পূর্ণ অধীন।

এ শাস্ত্রের বিরুদ্ধে একটা মহৎ কথা সময়ে সময়ে উত্থিত হইয়া থাকে। যদি ইষ্টকালের গ্রহাদির স্থিতি সঞ্চারদর্শনে সমস্ত জীবনের ফলাফল নির্দ্ধারিত করা যায়, তবে একলগ্নে জাত রাজপুত্র ও ভিক্ষুকপুত্র, উভয়ের জীবনীসম্বন্ধে কেন এত পার্থক্য দেখিতে পাও? ইহার কয়েকটী কারণ বুঝিতে পারা যায়। প্রথমতঃ যদ্যপি উভয়েই এক মুহূর্ত্তে জন্মগ্রহণ করে, তথাপি নিমেষ, কাষ্ঠা, কলা ও ক্ষণ লইয়া উহাদের ইষ্টকালের কিছু না কিছু পার্থক্য হইয়া পড়ে, যাহাতে উহাদের জীবনের সুখদুঃখ এত বিভিন্ন হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ এ সংসারে সকলেই নিজ নিজ অবস্থানুসারে সুখদুঃখের ভাগী হয়। এক রাজকুমার দেশবিদেশ জয় করিয়া বা বনের এক ব্যাঘ্র শিকার করিয়া যেরূপ আনন্দে উৎফুল্ল হন, এক ভিক্ষুকপুত্র একখণ্ড নববস্ত্র পাইয়া বা একটা কোলাব্যাঙ্ মারিয়া সেইরূপ আনন্দ উপভোগ করে। একজন শেতাঙ্গ মাসে সহস্র মুদ্রা উপার্জ্জন করিয়া যেরূপ সুখী, একজন কৃষ্ণাঙ্গ মাসে শতমুদ্রা

উপার্জ্জন করিয়া সেইরূপ সুখী; আবার একজন শ্রমজীবী মাসে দশটী মাত্র মুদ্রা উপার্জ্জন করিয়া সেইরূপ সুখী। বাহ্যদর্শনে উহাদের অবস্থা যেরূপ হউক না কেন, মনের সুখদুঃখ তিনজনের প্রায় সমান। গ্রহগণ মনের সুখদুঃখই নিয়ন্ত্রিত করে। যাহার যাহাতে সুখদুঃখের বর্দ্ধন হইবে, উহারা সেই সকল অবস্থার যোগাযোগ ঘটায়।

এ শাস্ত্রের বিরুদ্ধে আর একটা কথা সময়ে সময়ে উত্থিত হইয়া থাকে। গ্রহনক্ষত্রগণ অচেতন জড়পিণ্ড মাত্র; উহাদের দ্বারা আমাদের ভাগ্য বা নিয়তি কি প্রকারে নিয়ন্ত্রিত হইবে? জড়বিজ্ঞান না হয় সপ্রমাণ করে, চন্দ্র সূর্য্যের আকর্ষণ বশতঃ সমুদ্রের জোয়ারভাঁটা ঘটিতেছে। তাহাতেই বা আমরা কি প্রকারে সিদ্ধান্ত করিব, গ্রহনক্ষত্রাদির সঞ্চার বশতঃ আমাদের চতুর্দ্দিকস্থ অবস্থাপরম্পরার, বিবিধ নূতন যোগাযোগে উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে বিবিধ সুখদুঃখের ভাগী করিতেছে।

আরও দেখ, চন্দ্রসূর্য্যগ্রহনক্ষত্রগণ পৃথিবী হইতে বহুদূরে অবস্থিত। এতদূর হইতে উহারা আমাদের ভাগ্যলিপি কিপ্রকারে চালাইবে? উহারা যতদূরে থাকুকনা কেন, যে অনন্ত ব্যোমাকাশ সকলের নিকট বিরাট্ শূন্যময় বোধ হয়, সেই সূক্ষ্ম আকাশের মধ্যদিয়া উহাদের অধিষ্ঠাত্রী লোকপালগণ নিজ নিজ লোকের সঞ্চার, স্থিতি ও সম্বন্ধ অনুসারে আমাদের ভাগ্যলিপি চালাইতেছেন। তাঁহারা আমাদের ন্যায় ক্ষণে রুষ্ট, ক্ষণে তুষ্ট হন না। তাঁহারা বিশ্বনিয়ন্তা বিশ্বেশ্বরের মহাজ্ঞায় তৎপ্রতিষ্ঠিত সার্ব্বভৌম নিয়মানুসারে সকলের ভাগ্যলিপি চালাইয়া জগতে এমন বিশ্বজনীন সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়াছেন। দেবলীলা অদ্ভুত ও বিচিত্র, কীটাণুকীট মানব কি তাহা বুঝিতে পারে? আমরা এই পর্য্যন্ত জানি, যেমন দেবাধিষ্ঠিত ভৌতিক শক্তিনিচয় অপরিবর্ত্তনশীল নিয়মাবলি দ্বারা চালিত হইয়া জগতে অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য ও সুশৃঙ্খলতা স্থাপন করে, সেইরূপ গ্রহাধিষ্ঠাতৃ লোকপালগণ নিজ নিজ জ্যোতিষ্ক মণ্ডলের স্থিতি ও সঞ্চার অনুসারে কতকগুলি অখণ্ড্য আধিদৈবিক নিয়মানুসারে সকলের ভাগ্যলিপি চালাইয়া সমাজজগতেও অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য ও সুশৃঙ্খলতা স্থাপন করেন।

জগতের ইহা একটী অমোঘ সত্য যে, গ্রহাদির বিবিধ সঞ্চার ও ভাব বশতঃ যাবতীয় লোকের ভাগ্যলিপি বা সুখদুঃখ অধিক পরিমাণে চালিত হয়।

শুভ গ্রহের শুভযোগ বশতঃ তুমি সংসারে নানাদিকে অশেষ সুখভোগ কর এবং কুগ্রহের কুযোগ বশতঃ তুমি নানাদিকে নিগৃহীত হইয়া অশেষ কষ্ট পাও।

একাদশ বৃহস্পতিতে জন্মগ্রহণ করিয়া তুমি ধনপুত্রে লক্ষ্মীলাভ কর। আবার শনির দশায় পতিত হইয়া তুমি সর্ব্বস্বান্ত হও বা প্রাণান্ত কষ্ট পাও! যাহার ধনস্থানে শনি থাকে, তাঁহার অর্থ চিরদিন উড়িতে থাকে এবং অনেক সময় বৃথা কাজে ব্যয় হয়। যাহার ধনস্থানে শনি ও রাহু দুই পাপগ্রহ থাকে, তাঁহাকে আজীবন ঋণ পরিশোধ করিতে হয় এবং তিনি কখন রূপচাঁদের চাঁদবদনখানি দেখিতে পান না। যাহার পঞ্চম পুত্রের ঘরে শনি থাকে, তাঁহাব পুত্র জন্মায় না, জন্মিলেও অধিকদিন বাচে না। যাহার ঐ ঘরে বৃহস্পতি থাকে, তাঁহার অনেকগুলি সুসন্তান জন্মগ্রহণ করে এবং তাঁহাদের দ্বারা তিনি অশেষ সুখে সুখী হন। যাহার সপ্তম জায়াগৃহে শনি থাকে, তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ হইতে থাকে এবং তিনি কদাচ স্ত্রী লইয়া সুখী হইতে পারেন না। যাহার ঐ গৃহে বৃহস্পতি থাকেন, তিনি পরমাসুন্দরী ও অশেষ গুণবতী ভার্য্যা পাইয়া অশেষরূপে সুখী হন। এইরূপে জন্মকুণ্ডলীর ভিন্ন ভিন্ন গৃহে শুভাশুভ গ্রহ থাকিয়া সকলের সুখ দুঃখ অশেষরূপ নিয়ন্ত্রিত করে।

যেমন বার্ষিকগতি বশতঃ বিভিন্ন ঋতুর আবির্ভাব হওয়াতে পৃথিবী কোন সময়ে বিবিধ ফল পুষ্পে শোভিত হইয়া রমণীয় মূর্ত্তি ধারণ করে, কোন সময়ে শীতগ্রীষ্মের আতিশয্যবশতঃ ভীষণমূর্ত্তি প্রদর্শন করে, সেইরূপ শুভাশুভ গ্রহাদির সঞ্চারবশতঃ প্রত্যেক মানবের জীবন কোন না কোন সময়ে অশেষ সুখে পূর্ণ হয় বা কোন না কোন সময়ে নানা দুঃখেও বিপদে আকীর্ণ হয়।

রাশিচক্রের সম্বন্ধানুসারে শুভাশুভ গ্রহগণ শরীরের স্বাস্থ্যাস্বাস্থ্যের উপরও পূর্ণ অনুশাসন চালায়। কেন নানাব্যাধি আরোগ্যলাভ করিতে সপ্ত, দ্বিসপ্ত, বা চতুঃসপ্ত দিবস লাগিয়া থাকে? অনেকের বিশ্বাস, শরীরের উপর চন্দ্রের আকর্ষণ বা অনুশাসন বশতঃ ঐরূপ ঘটে। কেহ কেহ বলেন, দেহস্থ যন্ত্র-বিশেষের উপরও গ্রহবিশেষের পূর্ণ অনুশাসন চলিতেছে। এজন্য পাপগ্রহের সংযোগ বশতঃ শরীরের যন্ত্রবিশেষ বিকৃত হইয়া রোগবিশেষ উৎপাদন করে।

কেন চিকিৎসাবিজ্ঞান সকল ব্যাধির প্রকৃত কারণতত্ত্ব নির্ণয় করিতে পারে না? ঠাণ্ডা লাগিলে কাহার সর্দ্দিকাশ, কাহার ফুস্‌ফুসপ্রদাহ (Pneumonia) কাহার যকৃৎপ্রদাহ, কাহার বা বাতজ্বর হয়। কেন এরূপ ঘটে? যন্ত্রগুলির ধাতুগত দৌর্ব্বল্যবশতই কি ঐরূপ ঘটিয়া থাকে? বিজ্ঞান যাহাই বলুক না কেন, অনেকের ধারণা দেহস্থ যন্ত্রগুলির উপর গ্রহাদির অনুশাসনবশতঃ সকলে নানা সময়ে নানা পীড়ায় আক্রান্ত হয়।

আরও দেখ, রাশিচক্রের গননানুসারে গ্রহবিশেষ মানববিশেষের মৃত্যুপতি বা মারকেশ হইয়া থাকে। যখন এই কুগ্রহ আইসে এবং সেই সঙ্গে তেমনি নানা কুযোগ ঘটিয়া যায়, তখন তুমি সহস্র উপায় কেন অবলম্বন কর না, সহস্র কেন অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ সেবন কর না, তখন কিছুতেই নিয়তির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি নাই এবং রবিসুতের দূত তোমায় হিঁচড়ে টানিয়া লইয়া যাইবে। কেন চিকিৎসাবিজ্ঞান এত অসম্পূর্ণ? কেন সংসারে নানা বিধ চিকিৎসোপায় প্রচলিত আছে? দুর্ব্বল মানব নিজের যন্ত্রণালাঘবের জন্য নানা উপায় অবলম্বন করেন বটে; কিন্তু প্রকৃতিদেবী তাঁহার এই সকল অনর্থক চেষ্টার উপর বিদ্রূপ করেন; তাঁহার সকল চেষ্টা অখণ্ড্য নিয়তির সমক্ষে ব্যর্থ হইয়া যায়।

সংসারের সুখদুঃখ কি প্রকার।

বৈষয়িক তারতম্যবশতঃ সংসারের সুখদুঃখ সম্বন্ধে যে ভেদাভেদ দেখা যায়, তাহা আপাতদর্শনে অধিক বোধ হইলেও বস্তুতঃ উহা অধিক নহে। দেখ, এ সংসারে কেহ পলান্ন, কেহ বা শাকান্ন খাইতেছে; কেহ মেঠাই মণ্ডা, কেহ বা দধি চিড়া খাইতেছে; কিন্তু সকলেরই উদর পূর্ণ ও ক্ষুধা তৃপ্ত হইতেছে। কেহ ঢাকাই মস্‌লিন, কেহ বা খদ্দর পরিতেছে; কিন্তু সকলেরই ত লজ্জা নিবারিত হইতেছে। শীতকালে কেহ কাশ্মীরি শাল, কেহ বা মোটা চাদর গায়ে দিতেছে; কিন্তু সকলেরই ত শীত নিবারিত হইতেছে। কেহ রৌপ্য পাত্রে, কেহবা মৃণ্ময় পাত্রে জলপান করিতেছে, কিন্তু সকলেরই ত পিপাসা শান্ত হইতেছে। কেহ পরমাসুন্দরী

স্ত্রী, কেহ বা কুরূপা স্ত্রী সম্ভোগ করিতেছে, কিন্তু সকলেরই কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ হইতেছে। তবে সংসারে সুখের তারতম্য কোথায়?

সকলে নিজ নিজ অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতে চেষ্টা পান। যিনি যে অবস্থায় পতিত হউন না কেন, অভ্যাসবশতঃ তিনি তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন এবং শুভাশুভ গ্রহাদির সঞ্চার বশতঃ তাহাতে তিনি সুখদুঃখের পথ দেখিতে পান। এজন্য কারাগারে অশেষ যন্ত্রণার মধ্যেও লোকে সুখের পথ দেখিতে পায় এবং রাজপ্রাসাদে অতুল সুখৈশ্বর্য্যের ভিতরও লোককে দুঃখে থাকিতে ভুগিতে দেখা যায়। তবে সংসারে সুখের তারতম্য কোথায়?

সুন্দর যানারোহণ বা পলান্ন ভোজন করিলে, তুমি যে সুখী হইবে, আর পদব্রজে হাঁটিলে বা শাকান্ন ভোজন করিলে তুমি যে দুঃখী হইবে, এরূপ ধারণা যেন কদাচ তোমার মনে উদয় হয় না। মোটরকার॰ করিয়া ধনবানকে বিস্ফারিত হৃদয়ে যাইতে দেখিলে তোমার মন যেন কিছুতে বিচলিত না হয়। তুমি ঈশ্বরদত্ত দুই হস্ত ও দুই পদের রাজা; নিজের হস্তপদ চালাইয়া বাহালতবীয়াতে ও সুস্থশরীরে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাক, ইহাতেই তোমার পরম আনন্দ ও পরম শান্তি।

কি শীতপ্রধান, কি গ্রীষ্মপ্রধান, কি নাতিশীতোষ্ণ, সকল দেশে লোকে বিশেষ বিশেষ সুখদুঃখ ভোগ করে; সেইরূপ কি ধনবান, কি মধ্যবিত্ত, কি দরিদ্র, সকল অবস্থায় লোকে বিশেষ বিশেষ সুখদুঃখের ভাগী হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি নিতান্ত দীনদরিদ্র, সে ব্যক্তি সারাদিন কঠোর কায়িক পরিশ্রম করিয়া শাকান্নে দগ্ধোদর পূরণ করিয়া যে বিমল নিদ্রাসুখ ভোগ করে, তাহা একজন রাজাধিরাজের ভাগ্যেও ঘটে না। আর যিনি লক্ষ লক্ষ লোকের অধীশ্বর, তিনি বাহ্যাড়ম্বরে ও ভোগবিলাসে আপনাকে বেষ্টিত করিয়া ও তপ্তকাঞ্চনবৎ নিজ শরীর সযত্নে পালন করিয়া সংসারে যে অনির্ব্বচনীয় সুখ ভোগ করেন, তাহা অন্য কাহারও ভাগ্যে ঘটে না সত্য; কিন্তু তাঁহার হৃদয়রাজ্য অন্বেষণ কর, বুঝিতে পারিবে, অরুন্তুদ চিন্তাকীট অহরহঃ তাঁহার মর্ম্মগ্রন্থী দংশন করিতেছে। অসীম রাজচিন্তা সাগরে তদীয় হৃদয় সদা উদ্বেলিত ও আলোড়িত হইতেছে। তাঁহার মনের প্রকৃত সুখ ও শান্তি কোথায়? সাধারণ লোকে মনে করে, পূর্ব্ব জন্মের তপস্যার বলে তিনি

রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন; কিন্তু যখন তিনি অসহ্য চিন্তাবিষে জর্জ্জরিত হন, তখন তিনি ভাবেন, আমার ন্যায় অধম মানব দেবতাদিগের অভিসম্পাতে রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া থাকে।

যদি তিনি জরাক্রান্ত হন, সেই গাত্রদাহ, সেই শিরঃপীড়া, সেই অসহ্য পিপাসা, সেই শরীরবেদনা প্রভৃতি সকল প্রকার যন্ত্রণায় তিনি অস্থির হন এবং এপাস, ওপাস করিতে থাকেন। চিরদিন সুখাভ্যস্ত বলিয়া ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা কাহাকে বলে, তাহা তিনি জীবনে আদৌ শিক্ষা করেন নাই। এজন্য পীড়ার সময় তাঁহাকে ততোধিক যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়। আর যিনি আজীবন কষ্টে লালিত ও পালিত, তাঁহার সহিষ্ণুতা ততোধিক; তিনি জরজ্বারিতে ভ্রূক্ষেপ করেন না।

যিনি শিবিকারোহণে বা যানারোহণে চিরাভ্যস্ত যে দিন তাঁহাকে পদব্রজে হাঁটিতে হয়, সে দিন তিনি সমূহ বিপদে পতিত হন। আর যিনি চিরদিন পদব্রজে হাঁটেন, বিশ ক্রোশ হাঁটিতে হইলেও তাঁহার কিছুমাত্র কষ্টবোধ হয় না। তিনি মনের আনন্দে গাইতে গাইতে এবং পা বাড়াইতে বাড়াইতে বিশ ক্রোশ হাঁটিয়া যান।

একবার ভাব দেখি, যখন শিবিকাবাহকেরা স্বপ্রভুকে "শালা বড় ভারি, শালা বড় ভারি, হুঁ, হুঁ হুঁ" এই সুমধুর বোল ছাড়িতে ছাড়িতে চারি ক্রোশ লইয়া যায়, পরে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে নিজের ক্লান্তির দিকে দৃকপাত না করিয়া তালবৃন্ত লইয়া তাঁহাকে বাতাস করিতে বসে, তখন তাহাদের মনের অবস্থা কিরূপ? যিনি প্রভু, তিনি ত শিবিকার অন্তরে থাকিয়া গ্রীষ্মে হাঁসফাঁস করিতে ছিলেন, এজন্য বাহকেরা তাঁহার কষ্ট দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে বাতাস করিতে বসে; আর উহারা যে এমন ভারাবস্তু এতদূর বহন করিয়া আনিল, তাহাতে তাহাদের কিছুমাত্র কষ্ট বোধ নাই।

শরীরের নাম মহাশয়
যা সহাবে তাই সয়।

যাহার যাহা অভ্যাস, তাঁহার তাহাতে সুখ এবং তৎব্যতিক্রমে তাঁহার নানা অসুখ ও অস্বস্তি। যিনি প্রত্যহ গাঢ় পরিশ্রম সহকারে নানা কার্য্য করেন, তাঁহাকে যদি একদিন আলস্যে কাটাইতে হয়, সেদিন তাঁহার অসুখের সীমা

থাকে না। যিনি সারাদিন অলস হইয়া বসিয়া থাকেন, যদি কোন দিন অধিক পরিশ্রম করিতে হয়, সে দিন তাঁহার অসুখের সীমা থাকে না। প্রত্যহ তুমি যে খাদ্য ভোজন কর, উহার ব্যতিক্রম হইলে, তোমার সুখের ও ব্যতিক্রম ঘটে। এইরূপ সংসারের নানাবিষয়ে দেখা যায়।

সংসারে কেহ সর্ব্বসুখে সুখী হয় না বা চিরদুঃখে দুঃখী হয়না; একদিকে যেমন তাঁহার নানাদিকে নানাসুখ, তেমনি অপর দিকে নানা বিষয় লইয়া তাঁহার নানা দুঃখও দেখা যায়। ভাগ্যনেমির বিঘূর্ণনে তুমি এক সময়ে উহার উপরে উঠিয়া সুখের পর সুখ ভোগ কর। আবার আর এক সময়ে উহার পেষনে পিষিত হইয়া নানা কষ্ট পাও। এসংসারে সকলেই ঘুরিতেছে, সেই সঙ্গে তোমার ভাগ্যচক্রও ঘুরিতেছে। মা কমলা চিরচঞ্চলা; তিনি কাহাকেও চিরদিন সমভাবে অনুগৃহীত করেন না।

সংসারে তুমি যে হও সে হও, নিজের কর্ম্মফলানুসারে সুখদুঃখের ভাগী হইবে। নিরবচ্ছিন্ন সুখ কাহারও ভাগ্যে ঘটে না। সংসারের নিয়ম, যিনি এক দিকে যত সুখী, তিনি আবার অপর দিকে তত দুঃখী। তুমি জজিয়তী করিতেছ, কিন্তু গৃহে স্ত্রীপুত্রের জ্বালায় অস্থির। তুমি আজ লক্ষপতি, কিন্তু মধুমেহের জ্বালায় অস্থির। যিনি সংসারে ধনপুত্রে লক্ষ্মীলাভ করেন, আমরা তাঁহাকে বাহ্যদর্শনে যতদূর সুখী মনে করি, বস্তুতঃ তিনি ততদূর সুখী নন। অগাধ সুখৈশ্বর্য্যের মধ্যে তাঁহার যে সামান্য চিন্তার কারণ আছে, তাহাই তাঁহাকে অশেষ দুঃখ দিতে থাকে। যাঁহাকে ইচ্ছা, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর, সকলেই সমস্বরে বলিবে, এসংসারে কেহই সর্ব্বসুখে সুখী নন। প্রকৃতির মহাকবি কালিদাস বলেন—

প্রায়েণ সামগ্রবিধৌ গুণানাং
পরাঙ্মুখী বিশ্বসৃজঃ প্রবৃত্তিঃ।

(কুমারসম্ভবং)

"বিধাতা কাহাকেও সর্ব্বগুণে গুণান্বিত বা সর্ব্বসুখে সুখী করেন না।"

সংসারের অতুল ঐশ্বর্য্য ও অতুল বিভব কেবল যাদুকরের যাদুমাত্র। ইহাতে মনের প্রকৃত সুখও নাই, শান্তিও নাই, স্বস্তিও নাই, আছে মাত্র

কেবল জ্বালা, যন্ত্রণা ও মনের চির অশান্তি। যে অর্থের উপার্জ্জনে নানাবিধ কষ্ট, যাহা রক্ষণে সেইরূপ কষ্ট, যাহার ব্যয়েও নানা কষ্ট, এবং যাহার নাশে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কষ্ট, সে অর্থের জন্য কেন এত তাড়াহুড়ি ও দৌড়াদৌড়ি? পোড়া পেট মানে না, পোড়া মান মানে না, তাই টাকা টাকা করিয়া সকলকে মরিতে হয়। ভগবান যে অবস্থায় রাখেন, তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া থাক; ইহাতেই প্রকৃত সন্তোষলাভ ও শান্তিলাভ হইবে।

এস্থলে মহাত্মা সোলন লিডিয়াধিপতি ক্রেশাসকে যে সদুপদেশ দেন, তাহা সকলের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। অতুল ঐশ্বর্য, অতুল বৈভব, অসংখ্য সৈন্যসামন্ত ও মণিমাণিক্যের মধ্যে তিনি ক্রেসাসকে ঘোর অসুখী ও অভাগা বলেন। তদীয় বাক্যে মর্ম্মাহত হইয়া ঐশ্বর্য্যমদে উন্মত্ত লিডিয়াধিপতি লাঞ্ছনা করিয়া তাঁহাকে নিজ রাজধানী হইতে তাড়াইয়া দেন। পরে যখন পারস্যরাজ কর্ত্তৃক পরাজিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া জীবন্ত দাহনার্থ চিতায় স্থাপিত হইলেন, তখন সেই মহাত্মার মহৎ বাক্য তদীয় হৃদয়াকাশে উদিত হইয়া তাঁহাকে ঘোর অনুতাপানলে দগ্ধ করে এবং তিনিও প্রাণভয়ে কাতর কণ্ঠে কোথায় সোলন! কোথায় সোলন! বলিয়া সেই আসন্ন মৃত্যুকালে চীৎকার করিতে থাকেন। ইহাতে পারস্যরাজ দয়ার্দ্রচিত্তে তাঁহাকে মুক্ত করিয়া পুনরায় সিংহাসনে স্থাপিত করেন। জগতের ইতিহাসে সোলনের মহৎবাক্য জলন্তাক্ষরে সংসারের ক্ষণ-ভঙ্গুর ঐশ্বর্য্যের অসারত্ব চিরদিন বিঘোষিত করিতেছে।

ধন, মান, গৃহ, দারা ও পুত্র সকলেই ভবের খেলনা মাত্র। ভবে এসে ইহাদের লইয়া খেল্‌তে হইবে। ইহারা অনিত্য ও অসার। রিক্তহস্তে এসেছ, রিক্তহস্তে চলে যাবে, শেষ সম্বল ১গজ কাপড়, একটা বাঁশের খাট ও একটা কলসী। ষড়রিপুর সর্দ্দার হইয়া ভবে পঞ্চভূত ও পঞ্চতন্মাত্র লইয়া খেলতে এসেছ। যতদিন পার, উহাদের লইয়া খেল্‌তে থাক। খেলা সাঙ্গ হলে পঞ্চভূতের দেহ পঞ্চভূতে মিলিবে। দারাপুত্র সকলই পড়িয়া থাকিবে। তুমি একলা এসেছ, একলাই যাবে; কোথায় যাবে, তা ত জান না। ধনদৌলত যার জন্য এত কাটাকাটি, মারামারি ও হুড়াহুড়ি, সে ত চোখের ভেল্‌কী মাত্র। চক্ষু বুজিলেই সব অন্ধকার।

ওহে রম্যহর্ম্ম্যবাসী ধনাঢ্য প্রধান
ধনী বলে করো না মনে অভিমান।
এ ধন ত চিরদিন কভু তব নয়
রাখিতে নারিবে ধন নিধনসময়।
এই যে ভবন তব শোভার ভাণ্ডার
এতেই ত্যজিবে তব প্রাণ দেহাগার।
যে দ্বারে রেখেছ তুমি দ্বারী বসাইয়া
আসিবে কালের দূত সেই দ্বার দিয়া।
ত্যজিয়া এ শ্রমার্জ্জিত বিপুল বিভবে
সে সময় তোমায় একাই যেতে হবে।

(সদ্ভাবশতক)

ইতিহাস পাঠে জানা যায়, গিজনীর সুলতান মামুদ দ্বাদশবার ভারত লুণ্ঠন করিয়া অপর্য্যাপ্ত ধনরাশি ও মণিমাণিক্যাদি নিজরাজধানীতে লইয়া যান। মৃত্যুকালে সমস্ত ধনদৌলত সম্মুখে রাখিয়া সতৃষ্ণ নয়নে দেখিতে দেখিতে ও কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি দেহত্যাগ করেন। এই প্রকারে এ সংসারে কত রাজা-রাজড়া, কত ক্রোড়পতি অসার ধনদৌলতের জন্য কাঁদিয়া গিয়াছেন! কাঁদিয়া বা কে কি করিতে পারে? যবে কালের দূত কসে বাঁধে, তখন কোথায় বা ধন-দৌলত, আর কোথায় বা দারাপুত্র? সকলের সামনে টেনে হিঁচড়াইয়া লইয়া যায়, আর সকলে হাহাকার করিতে থাকে।

এ ভবে সকলে কাঁদিতে আইসে, কাঁদিয়া চলিয়া যায়। সকলেই বলে আমি যদি না কাঁদিব, কে আর এ সংসারে কাঁদিবে, বল? জীবনে কত দুঃখ, কত ক্লেশ, কত যন্ত্রণা ও কত শোক পাইতে হয়, তাহার কি কোন হিসাব আছে? যে আশায় বুক বাঁধিয়া তুমি কোন কার্য্যের জন্য দূরদেশে যাইতেছ, পথি মধ্যে কত প্রকার বিপদে পড়িয়া সে আশায় জলাঞ্জলি দিবে, তাহা কি তুমি পূর্ব্বাহ্নে জানিতে পার? "তুমি যাচ্ছ বঙ্গে, তোমার অদৃষ্ট যাবে সঙ্গে সঙ্গে"। তুমি মাণিক পাইবার আশায় সাগর জল ছেঁচিতেছ, মাণিক পাবে, না গরল পাবে, তাহা কি তুমি জানিতে পার? তোমার জীবনতরি মৃদুমন্দ হিল্লোলে হেলিতে দুলিতে চলিছে; কোথা হইতে অকস্মাৎ আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া

প্রবল বাত্যা আনয়ন করিবে ও তোমার তরি ডুবাইবে,তাহা কি তুমি জানিতে পার? বিপদ আপদ তোমার পদে পদে, ক্লেশ ও দুঃখ তোমার পদে পদে। যতই সাবধান হও না কেন, বিপদের সময় বুদ্ধি হারাইবে ও হাবুডুবু খাইবে।

সংসারে দেখিবে "যার ধন তার ধন নয়, নেপে মারে দই"। তুমি প্রাণপণ করিয়া আপনাকে বিপন্ন করিয়া সংসারে একটা মহৎ কার্য্য করিলে, ফলভোগের সময় তুমি হয়ত বাণের জলে ভাসিয়া যাইবে এবং অপরে আসিয়া তোমার প্রাপ্য ফলভোগ করিবে। তুমি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া হাট বসাইলে, উদ্যান করিলে, বা বিষয় সম্পত্তি খরিদ করিয়া প্রজা বসাইয়া আবাদ করিলে, ফল ভোগের সময় তুমি বাণের জলে ভাসিয়া যাইবে এবং অপরে আসিয়া তোমার প্রাপ্য ফলভোগ করিতে থাকিবে। কার্য্যে সিদ্ধিলাভ বা ফলভোগ একমাত্র অদৃষ্টসাপেক্ষ।

সংসারের অশেষ দুঃখ দেখিয়া অনেকে বলেন, "কাঁদিতে এসেছ ভবে, কেঁদে চলে যাবে"। কর্ম্মভোগ করিতে এসেছ, কর্ম্মভোগ করে যাবে। ভূতের বেগার খাটিতে এসেছ, ভূতের বেগার খেটে যাবে। কাজ করতে এসেছ, কাজ করে যাবে, ফলও চাহিও না, সুখও চাহিও না। যে আশা কর্ব্বে, তাহা কদাচ পূর্ণ হবে না। তুমি যাহা ভাবিতেছ, তাহা কদাচ ঘটিবে না। তুমি ভাব একপ্রকার, ভগা ঘটান অন্য প্রকার (Man proposes, but God disposes) মন্দ যাহা ভাব, তাহা অগ্রে ঘটিবে; আর ভাল যাহা ভাব, তার বিপরীত ঘটিবে। সংসারে দুকুড়ি সাতের খেলা রাখিবে, ছক্কাপাঞ্জা করিতে যাইও না; আর পড়তা পড়ে ছক্কাপাঞ্জা আপনাআপনি হইবে।

হিন্দুধর্ম্মের আদেশ, সুখে উৎফুল্ল হইও না, দুঃখেও কাতর হইও না। সকল অবস্থায় ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক অবিচলিত থাকিতে চেষ্টা পাইবে। যাঁহারা নানা বিপদ আপদে পতিত হইয়া সুশিক্ষা পান, তাঁহারা ভবসাগরের অশেষ ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যে পর্ব্বতের ন্যায় স্থির থাকেন। সুখে থাক বা দুঃখে থাক, চিরদিন মনে রাখিবে, "এসা দিন নেহি রহেগা"।

প্রথম ভাগ সমাপ্ত।

বশতঃ হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত শৈবাদি ভিন্ন ২ সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহারা তাঁহার সগুণ মায়ারূপ ও পূজাপদ্ধতি সম্বন্ধে ভিন্ন ২ মত ও পন্থা অবলম্বন করিয়াছে।

ধর্ম্মবিষয়ক মতামত সম্বন্ধে এ ধর্ম্ম সেবকমণ্ডলীর ভিতর সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করে, এমন কি, এ বিষয়ে বিশেষ শৈথিল্য দেখায়। বাল্য কাল হইতে যাঁহার সংস্কার, শিক্ষা ও দীক্ষা যেরূপ হইবে, তিনি নিজ মনের আকাঙ্ক্ষা ও বিশ্বাসমত কোন না কোন মার্গ বা সম্প্রদায় আশ্রয় করিলে এ ধর্ম্ম কোনরূপ আপত্তি উত্থাপন করিবে না। সকল সম্প্রদায়ের উপর ইহা নিজের সুশীতল ছায়া সমভাবে বিতরণ করিতেছে। সত্য বটে, সম্প্রদায়গুলি নানাকারণে যুগে ২ উত্থিত হইয়াছে ও বিদ্বেষানলে কলুষিত হইতেছে, কিন্তু প্রত্যেক সম্প্রদায়ই মনের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা পাইতেছে।

যে সম্প্রদায় পরমাত্মার যে নামাক্ত লইয়া বা মনের যে ভাব লইয়া তাঁহার আরাধনা করে, তাহাতেই সে সম্প্রদায় ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা দেখায় ও সেই ভাবের সম্যক স্ফূর্তি করিতে চেষ্টা পায়। এজন্য এ ধর্ম্মের সকল পন্থা যথার্থ ভক্তি-ভাবে অনুসৃত হইলে সমভাবে সুফল প্রদান করে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেন:—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ।

(গীতা)

"যাহারা আমাকে যে ভাবে পাইতে চায়, আমি তাহাদিগকে সেই ভাবে অনুগৃহীত করি। হে পার্থ; সকল মনুষ্য কেবল আমার প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিতেছে।" এ কারণ সনাতন হিন্দুধর্ম্ম অন্য কোন ধর্ম্মের উপর বিদ্বেষ করে না, যে হেতুক ধর্ম্ম মাত্রেই সেই পরমেষ্ঠীপদ প্রাপ্তির অভিলাষী। এজন্য এ ধর্ম্ম কস্মিনকালে তরবারি বা গাথা হস্তে লইয়া অন্য দেশে নিজ মত প্রচার করিতে যায় নাই।

ধর্ম্মরূপে যেমন ইহার উদার ও শিথিল ভাব, সামাজিক রূপে তেমনি ইহার অনুদার ভাব ও অশেষ কড়াক্রান্তি বিচার। এ বিষয়ে এ ধর্ম্ম কাহাকেও অনুমাত্র স্বাধীনতা প্রদান করে না। যে সকল আচারব্যবহার সামাজিক নির্ব্বাচনে

সমগ্র হিন্দুসমাজের অশেষ মঙ্গলদায়ক ও পরমকল্যাণকর বলিয়া প্রতিপাদিত অথবা যে সকল রীতি প্রাচীনকাল হইতে ইহার অস্থিমজ্জায় নিহিত, তাহা উল্লঙ্ঘন করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। জাতিভেদপ্রথা যাহার উপর এ সমাজের মূলভিত্তি প্রোথিত এবং জীবনের বিবাহাদি সংস্কার, যাহা গৃহস্থমার্গের একান্ত আবশ্যক, তাহা উল্লঙ্ঘন করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। শৈব, শাক্ত, ও বৈষ্ণব, যিনি যে সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হউন না, রাজাধিরাজ, মধ্যবিত্ত ও পথের কাঙ্গাল, যিনি যে অবস্থায় থাকুন না কেন, হিন্দুধর্ম্মের সামাজিক রূপ উলঙ্ঘন করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। সত্য বটে, সম্প্রদায় বিশেষ জাতিভেদ প্রথা অমান্য করে, কিন্তু তাহারা মুষ্টিমেয় দলে নিবদ্ধ হইলেও স্বসম্প্রদায়স্থ লোকবর্গকে জগতে বিশিষ্ট রাখিতে সাধ্যমত চেষ্টা পায়, যেমন শিখ ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়।

পরাক্রান্ত কৃত্রিম ধর্ম্মের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া হিন্দুধর্ম্ম নিজের জাতীয়তা রক্ষা করিবার জন্য স্বজাতিকে অন্যান্য জাতি হইতে জগতে বিশিষ্ট রাখিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া সামাজিকরূপে এত কঠোর ভাব ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। যে জাতিধর্ম্ম ধর্ম্মাত্মা হিন্দুর নিকট প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর, যাহা রক্ষা করিবার জন্য তিনি অম্লানবদনে যথাসর্ব্বস্ব, এমন কি, নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত হন না, সেই জাতিধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য এধর্ম্ম সামাজিক বিষয়ে এত কড়াক্রান্তি বিচার করিতে বাধ্য হইয়াছে। এ বিষয়ে এধর্ম্ম যদি কিছুমাত্র শৈথিল্য প্রদর্শন করিত, তুমি কি আজ সপ্ত শতাব্দী ব্যাপিয়া পরাধীনতায় থাকিয়া পবিত্র হিন্দুনামের গৌরব করিতে পারিতে বা তোমার শিরায় পবিত্র আর্য্যশোণিত বহমান হইত? নিশ্চয় ভারতে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়া বৌদ্ধ বা মুসলমান ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইত। তখন কোথায় বা বেদবেদান্ত! কোথায় বা রামায়ণ ও মহাভারত! সকলই অনন্ত কালের অনন্ত স্রোতে ভাসিয়া যাইত। অতএব স্থিরনিশ্চয় জানিবে, সুমহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এধর্ম্ম সামাজিক বিষয়ে এত কঠোর ভাব ধারণ করিয়াছে।

আর এককথা চির দিন মনে রাখিবে, বৈদিক সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত যত ধর্ম্ম বা সম্প্রদায় সনাতন ধর্ম্ম হইতে উত্থিত হইয়াছে, উহারা সকলই

যতই কেন বিভিন্ন হউক না, সনাতন ধর্ম্মের অন্তর্গত। বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, বৈষ্ণব নানাপন্থী, ব্রাহ্ম, আর্য্যসমাজ প্রভৃতি সকল ধর্ম্ম শৈব, বৈষ্ণব ও শাক্তের ন্যায় সেই সনাতন ধর্ম্মের শাখা।

হিন্দুধর্ম্মের মাহাত্ম্য।

আজ পরাধীন ভারত বিজাতীয় শিক্ষা পাইয়া নিজের ধর্ম্ম ভুলিতে বসিয়াছে। কি পরিতাপের বিষয়! সুশিক্ষিত নব্য সম্প্রদায় স্বধর্ম্মের প্রকৃত মাহাত্ম্য ও মর্য্যাদা বুঝিতে পারেন না বা বুঝিতে চেষ্টাও করেন না। পাশ্চাত্য গুরুগৃহে সুশিক্ষা পাইয়া তাঁহারা ভাবিতেছেন, এ ধর্ম্ম অসার, অপদার্থ পৌত্তলিকতা মাত্র। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে বেদান্তধর্ম্মের ভূয়সী প্রশংসা করেন বটে, কিন্তু আধুনিক হিন্দুধর্ম্মকে তাঁহারা পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম বলিয়া ঘৃণাচক্ষে অবলোকন করেন। তাঁহাদের ভ্রান্তি দূরীকরণার্থ এ ধর্ম্মের কিঞ্চিৎ মাহাত্ম্য বর্ণন করা আবশ্যক।

আশৈশব আমরা প্রতিদিন সূর্য্যদেবের উদয়াস্ত দর্শন করিয়া থাকি, অথচ উহার প্রকৃত গৌরব কি, তাহা আমরা জানি না। সেইরূপ বাল্যকাল হইতে আমরা হিন্দুধর্ম্মে লালিত ও পালিত; ইহার দোল দুর্গোৎসবাদিতে চিরদিন আমোদ প্রমোদ করিতে রত, সমাজের যে সকল আচার ব্যবহার আছে, হাত পা বাঁধা বলিয়া উহাদের পালন তৎপর, অথচ উহাদের প্রকৃত মাহাত্ম্য কি, উহাদের দ্বারা আমরা এ সংসারে কতদূর উপকৃত, তাহা আমরা একবারও ভাবিতে চেষ্টা করি না।

দুর্ভাগ্যবশতঃ বিজাতীয় শিক্ষার কুহকে পড়িয়া অনেকে এখন বিজাতীয় ধর্ম্ম, বিজাতীয় আবভাব ও বিজাতীয় রীতিনীতি মনোরম জ্ঞান করিয়া উহাদিগকে গ্রহণ করিতে ব্যগ্র; এরূপ অবস্থায় স্বধর্ম্মের প্রকৃত মাহাত্ম্য বুঝিয়া উহাতে আন্তরিক শ্রদ্ধাবান্ হওয়া হিন্দুমাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য।

পক্ষপাতশূন্য হইয়া স্থিরচিত্তে অন্যান্য ধর্ম্মের সহিত তুলনা করিয়া দেখ, বুঝিতে পারিবে, তোমার হেয়, অপদার্থ পৌত্তলিকধর্ম্ম উহাদের অপেক্ষা এ জগতে কত মহোচ্চ ও শ্রেষ্ঠ

প্রথমতঃ। যে ধর্ম্ম পঞ্চদশ শতাব্দী ব্যাপিয়া রাজন্যবর্গপৃষ্ঠপোষিত বৌদ্ধ ও মুসলমান ধর্ম্মের সহিত মহাদ্বন্দ্বে লিপ্ত হইয়া পরিশেষে জয়লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে, সে ধর্ম্ম এ সংসারে নিঃসন্দেহ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যে ধর্ম্ম সপ্ত শতাব্দী ব্যাপিয়া এত সুদীর্ঘ কাল পরাধীনতায় থাকিয়াও নিজের অস্তিত্ব ও জাতীয়তা পূর্ণভাবে বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছে, সে ধর্ম্ম এ জগতে নিঃসন্দেহ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। জগতের ইতিহাস তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান কর, কোন দেশে কোন জাতির ভিতর এমন অলৌকিক দৃশ্য তোমার নয়নপথে পতিত হইবে না। এত সুদীর্ঘ কাল পরাধীনতায় থাকিয়া কোন জাতি এ জগতে নিজের ধর্ম্ম ও জাতীয়তা রক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই। ইহাতে এ ধর্ম্মের অলৌকিক মাহাত্ম্য প্রকাশ পাইতেছে।

দ্বিতীয়তঃ।—এ ধর্ম্মের কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, জীবনের সংস্কারাদি, সমাজের মহোৎসবাদি, সকলই এ জগতে অতুলনীয়। সকল বিষয়ে এ ধর্ম্ম অলৌকিক পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। উহাদের দ্বারা সমগ্র হিন্দুসমাজ কতদূর উপকৃত, ইহার মঙ্গল কতদূর সাধিত, ইহার সাত্বিক ভাব কতদূর স্ফুরিত ও আধ্যাত্মিকতা কতদূর বর্দ্ধিত, তাহা কি তোমরা একবার ভাবিয়া দেখিবে?

আমরা গললগ্নীকৃতবাসে সাষ্টাঙ্গে পূজ্য দেবতার সমক্ষে অপার ভক্তিভাবে যেরূপ প্রণত হই, এমন কোন্ ধর্ম্ম এ জগতে শিখায়, বল? আমাদের পরমহংসগণ যোগাভ্যাস ও তপশ্চরণ করিয়া পরব্রহ্মের প্রকৃত বার্ত্তা ও পরমার্থ জ্ঞান যেরূপ ভাবে অর্জ্জন করিতে চেষ্টা পান, এমন কোন্ ধর্ম্ম এ জগতে শিখায়, বল? আমাদের সেই দেবদেবীর পূজার্চ্চনাবিধি, সেই অঙ্গন্যাস, জপ ও প্রাণায়ামাদি, যদ্দ্বারা আমরা নির্গুণ পরব্রহ্মের স্থূলমায়ারূপকে আমাদের মায়ামুগ্ধ মনের ভাব্য করি, যদ্দ্বারা আমরা সেই মায়ারূপের ধ্যান ও ধারণা করিতে করিতে ধর্ম্মপথে ক্রমশঃ অগ্রসর হই, এমন কোন্ ধর্ম্ম এ জগতে শিখায়, বল?

আমাদের সেই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম যদ্দ্বারা মনের প্রকৃত আধ্যাত্মিক ও মানসিক শিক্ষা হইত, যদ্দ্বারা ভারত পুরাকালে সভ্যতাসোপানে আরূঢ় হইয়া নিজ সভ্যতাজ্যোতি ভূমণ্ডলে বিকীর্ণ করিয়াছে এবং ত্রিংশ শতাব্দী ব্যাপিয়া সেই সভ্যতা সগৌরবে ভোগ করিয়াছে; এমন কোন ধর্ম্ম এ জগতে শিখায়, বল?

আমাদের সেই উপনয়নাদিসংস্কারনিচয়, যদ্দ্বারা আমাদের এই পতিত মানব-জীবন কয়েকবার ধর্ম্মকর্ত্তৃক মন্ত্রপূত ও সংস্কৃত হওয়ায় আমরা যথার্থ আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য প্রস্তুত হই, এমন কোন্ ধর্ম্ম এ জগতে শিখায়, বল? আমাদের সেই সামাজিক মহোৎসবগুলি যদ্দ্বারা আমরা এই পাপতাপপূর্ণ ভবসংসারে অপার আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া জীবনের শোকরাশি ও দুঃখরাশি অনেক সময়ে বিস্মৃত হই, এমন কোন্ ধর্ম্ম এ জগতে শিখায়, বল?

আমাদের বেদান্তে মায়াতীত গুণাতীত পরব্রহ্মের যেরূপ যথার্থ স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট, পুরাণাদিগ্রন্থে মায়ামুগ্ধ মানবমনের ধারণার জন্য তাঁহার যেরূপ মায়াময় সগুণরূপ পরিকল্পিত, ভগবৎগীতায় যেরূপ বিশ্বাশ্চর্য্য অশেষ উন্নতিসাধক প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্ব স্বর্ণাক্ষরে লিখিত, এমন কোন্ধর্ম্ম এ জগতে শিখায়, বল? আমাদের সেই যোগাভ্যাস ও তপশ্চরণ যদ্দ্বারা এই অপকৃষ্ট কলিযুগের অধঃপতিত মানবমন, স্থূলের উপর সূক্ষ্মের জয়লাভের জন্য,শরীরের স্থূলত্ব বা আধিভৌতিকতা নাশ করিয়া আত্মার আধ্যাত্মিক শক্তিবর্দ্ধন মানসে উহার অষ্টসিদ্ধি স্ফুরণের জন্য যে সকল ক্রিয়াযোগ অবলম্বন করে, এমন কোন্ ধর্ম্ম এ জগতে শিখায়, বল?

আমাদের সেই অশেষ পূজ্য রামাবতার, যদ্দ্বারা আমরা গার্হস্থ্য ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা শিক্ষা করিয়া পরিজনবর্গ লইয়া মানবজীবন পরমসুখে অতিবাহিত করি, এমন কোন্ ধর্ম্ম এ জগতে শিখায়, বল? আমাদের আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মের সেই আনন্দরূপ, প্রেমরূপ শ্রীকৃষ্ণাবতার, যাঁহার প্রেমাদির অনন্ত লীলা শ্রবণ করিয়া আমরা এই পাপতাপপূর্ণ ভবসংসারে মনের অশেষ সাত্ত্বিকভাব স্ফুরণ করত দুবাহু তুলিয়া হরিসঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে ব্রহ্মানন্দে তাথৈ তাথৈ নৃত্য করি, এমন কোন্ ধর্ম্ম এ জগতে শিখায়, বল? রে হিন্দুধর্ম্ম! তুমিই এ জগতে একমাত্র সত্য সনাতন ধর্ম্ম। তোমার সকলই অলৌকিক ও স্বর্গীয়। হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যে না তোমার অপার মাহাত্ম্য বুঝিবে, তার জনম বৃথা, তার জীবনে শতধিক্!

যথার্থ বলিতে কি, এধর্ম্মের ন্যায় এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, এমন সর্ব্বগ্রাহী ও বিশ্বগ্রাহী ধর্ম্ম জগতে আর নাই। ইহার মহৎগুণ এই যে, যিনি যেমনটী চাহিবেন, তিনি তেমনটী ইহাতে পাইবেন। আস্তিক ও নাস্তিক, অদ্বৈতবাদী

ও দ্বৈতবাদী, নিরাকারোপাসক ও সাকারোপাসক, একেশ্বরবাদী ও বহ্বীশ্বরবাদী সকলেই নিজমনের আকাঙ্ক্ষানুযায়ী মতামত দেখিতে পাইবেন। তুমি ঈশ্বরকে যে ভাবে পূজিতে চাহ বা পাইতে চাহ, সেইভাবটী এধর্ম্মে পূর্ণ মাত্রায় পাইবে। তুমি তাঁহাকে পিতৃ ভাবে বা মাতৃভাবে বা পতিপুত্র ভাবে পূজিতে চাহ, সকল ভাব এধর্ম্মে চির জাজ্বল্যমান আছে। ভাইরে ভাই! এ ধর্ম্মকে পৌত্তলিক বলিয়া অবজ্ঞা করিও না। ইহার প্রকৃত মাহাত্ম্য হিন্দু ব্যতীত আর কেহ এ সংসারে জানেনা।

পাঠক; তুমি আজ বিংশ শতাব্দীর সমগ্র বিজ্ঞানশাস্ত্র পাঠ করিয়া লৌকিক ঈশ্বর মানিতে চাহ না, হিন্দুধর্ম্ম তোমায় সাদরে নিজ অঙ্কদেশে স্থাপন পূর্ব্বক বলিবে "রে বৎস! যোগসিদ্ধ কপিল মুনি ঈশ্বর মানেন নাই, অথচ এধর্ম্মে তাঁহার কত সন্মান দেখ? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলেন, "সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ"। তুমি লৌকিক ঈশ্বর বা অন্যান্য দেবদেবী মান, আর নাই মান, তাহাতে আমার কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মকে বিশুদ্ধ রাখিবার জন্য, স্বীয় জাতীয়তা রক্ষা করিবার জন্য যে সকল আচারব্যবহার আবহমান কাল লোকপরাম্পরায় চলিয়া আসিতেছে, উহাদিগকে বিধিবৎ পালন করিতে হইবে, তবে তুমি হিন্দুসমাজের যোগ্য হইবে। (নাস্তিক দিগের প্রতি এ ধর্ম্মের উক্তি)

পাঠক? তুমি আজ অশেষ পাশ্চাত্য বিদ্যায় বিশারদ হইয়া বিবিধ ধর্ম্ম-শাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্র মন্থন পূর্ব্বক শাস্ত্রোক্ত সকল দেবদেবী অগ্রাহ্য করিয়া এক মেবাদ্বিতীয়ং এর উপাসক হইতে চাহ, হিন্দুধর্ম্ম তোমায় সাদরে নিজ ক্রোড়-দেশে স্থাপন পূর্ব্বক বলিবে "রে বৎস? আমার বেদান্তে ও উপনিষদে মায়া-তীত ও গুণাতীত পরব্রহ্মের স্বরূপ ও পরমার্থজ্ঞান সম্বন্ধে তুমি যেরূপ মহোচ্চ উপদেশ পাইবে, কোন দেশের কোন ধর্ম্ম সেরূপ উপদেশ কস্মিনকালে দিতেপারে নাই। আমার ভগবৎ-গীতায় ধর্ম্ম সম্বন্ধে যেরূপ মহোপদেশ পাইবে, কোন দেশের কোন ধর্ম্মগ্রন্থ এরূপ উপদেশ কস্মিনকালে দিতে পারে নাই। তবে কেন "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ", এই গীতোক্ত মহৎ বাক্য স্মরণ করিয়া তুমি কেন অন্য অপকৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে যাইবে? কিন্তু হিন্দুসমাজে থাকিতে হইলে ইহার রীতিনীতি বিধিবৎ পালন করিতে হইবে। (এই প্রকৃতির সুশিক্ষিত লোকের জন্য ব্রাহ্মসমাজ ও আর্য্যসমাজ স্থাপিত)

হিন্দুধর্ম্ম স্বসমাজস্থ সকল সেবকবৃন্দকে আহ্বান পূর্ব্বক সমস্বরে বলিবে, "ওহে প্রিয় বৎসগণ! তোমাদের ধর্ম্মসাধনার জন্য, তোমাদের অবিনশ্বর আত্মার প্রকৃত উন্নতিসাধনের জন্য, মনের বিবিধ সাত্ত্বিক ভাবের সম্যক স্ফূর্ত্তির জন্য আমি বিবিধ মার্গ ও সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করিয়াছি এবং ভগবানের বিবিধ অবতারের বিবিধ সাংসারিক লীলা বিশদভাবে উপদেশ দিতেছি। নিজ শিক্ষা দীক্ষা ও সংস্কারের অভিমত মদ্বিহিত কোন না কোন মার্গ বা সম্প্রদায় অবলম্বন কর এবং অশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সহিত আমার যাবতীয় উপদেশ ও আদেশ পালন কর, ইহাতেই তোমাদের যথার্থ শ্রেয়োলাভ হইবে। কিন্তু স্বসমাজকে অন্য সমাজ হইতে বিশিষ্ট রাখিবার জন্য, স্বীয় জাতিধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য স্মরণাতীত কাল হইতে প্রতিষ্ঠিত জাতিভেদাদি প্রথা ও অন্যান্য দেশাচার যত্নপূর্ব্বক পালন করিতে হইবে। যদি যথেচ্ছাচারী হইয়া উহাদিগকে উল্লঙ্ঘন কর, পবিত্র হিন্দুনামকে, পবিত্র হিন্দু জাতিকে অগাধ জলধিগর্ভে ডুবাইয়া দেও ও সকলকে রসাতলে প্রেরণ কর।"

অশিক্ষিত জনসাধারণকে সম্বোধন করিয়া এ ধর্ম্ম গুরুগাম্ভীর্য্যস্বরে বলিবে, "দেখ, অন্যান্য ধর্ম্ম কেবল অসার নিরাকারোপাসনা উপদেশ দিয়া তোমাদিগকে সাধনপথে, ধর্ম্মপথে পশ্চাৎপদ করিয়া রাখে; আমি কেবল তোমাদের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের জন্য কলিকালের উপযোগিতানুসারে সাকার দেবদেবীর পূজার্চ্চনা বিধিবদ্ধ করিয়াছি এবং পুরাণাদি গ্রন্থে উহাদের অনন্ত লীলা বর্ণন করিয়া উপাখ্যানচ্ছলে যথার্থ ধর্ম্মোপদেশ দিতেছি। তোমরা অপার ভক্তির সহিত আমার এই সরল, সহজ ও সুগম মার্গ চিরদিন অনুসরণ কর; এক পুরুষে পার, পাঁচ পুরুষে পার, ভক্তিপ্রেম প্রভৃতি মনের সাত্ত্বিক ভাবাবলির সম্যক্ অনুশীলন ও স্ফুরণ করিয়া জাতীয় আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনে একাগ্রচিত্ত হও। ইহাতেই তোমাদের মানবজীবনের যথার্থ শ্রেয়োলাভ হইবে।"

এই প্রকারে হিন্দুধর্ম্ম যে সকল পরম কল্যাণকর আদেশ চিরদিন প্রদান করিতেছে, তাহা হিন্দুমাত্রেরই সর্ব্বান্তঃকরণে পালনীয়। আমাদের প্রপিতামহগণ এই সকল আদেশ বিধিবৎ পালন করিয়া পবিত্র হিন্দুনামের প্রকৃত গৌরব রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। আজ কিনা আমারা পাশ্চাত্য শিক্ষার কুহকে পতিত হইয়া স্বধর্ম্মের প্রকৃত মর্য্যাদা বুঝি না এবং কেহ এ ধর্ম্মের

প্রশংসাবাদ করিলে আমরা কর্ণমূলে অঙ্গুলি প্রদান করি। ধিক্! আমাদের বিদ্যাশিক্ষায়।

আরও দেখ, হিন্দুর ধর্ম্মপিপাসা এত অধিক প্রবল, যে তিনি অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর ন্যায় ঈশ্বরকে একভাবে ভাবিয়া, একভাবে আরাধনা করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারেন না। তাঁহার মন অকৃতার্থ হইয়া থাকে। কৃত্রিম ধর্ম্মমাত্রেই ঈশ্বরকে এক ভাবে ভজনা করিতে বলে। চিরকালই উহারা একঘেয়ে ও একভাবে চলিতেছে ও চলিবে। উহাদের আদৌ উন্নতি নাই। কিন্তু সনাতন হিন্দুধর্ম্মের প্রধান গৌরব এই, মানবহৃদয়ে যতপ্রকার বিভিন্ন ভাব আছে, সকলপ্রকার ভাবযোগে এ ধর্ম্ম ঈশ্বরকে ভাবিতে বলে এবং তাঁহার শ্রীচরণ কমলের অনুগ্রহে উহাদের অনুশীলন ও স্ফুরণ করিতে বলে। এজন্য কালে ২ এ ধর্ম্মের এমন ক্রমোন্নতি হইতেছে।

মনের ভিন্ন ২ ভাবে ঈশ্বর ভাবিবার জন্য এধর্ম্ম তাঁহার ভিন্ন ২ রূপ দেখায়। যাহারা মনে করে, ঈশ্বরের নানারূপ দেখাইয়া এ ধর্ম্ম তাঁহার প্রকৃত অবমাননা করে, তাহারা ইহার মহোচ্চভাব আদৌ বুঝিতে পারে না। হরিহর, রামকৃষ্ণ, দুর্গাকালী সকলই নির্গুণ পরব্রহ্মের ভিন্ন ২ সগুণ রূপ। মনের ভিন্ন ২ ভাবে তাঁহাকে ভাবিবার জন্য ঐ সকল সাকাররূপ শাস্ত্রে দেখান হইয়াছে।

হৃদয়স্থ ভাবাবলির বা প্রেম-বাৎসল্যাদির সম্যক্ স্ফূর্ত্তি করিয়া হিন্দুজাতিকে ভাবপ্রধান করাই পৌরাণিক ধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য। ইহাদের স্ফূর্ত্তির জন্য, আমাদের নিকট শ্রীকৃষ্ণ পরব্রহ্মের পূর্ণ অবতার বা তিনি পূর্ণব্রহ্ম সনাতন। পক্ষপাতশূন্য হইয়া সকল ধর্ম্ম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা কর, বুঝিতে পারিবে হিন্দুধর্ম্মের এই স্বর্গীয় ভাব অন্য কোন ধর্ম্মে দেখা যায় না। অন্য কোন ধর্ম্ম ঘুণাক্ষরেও এ মহোচ্চ ভাব ভাবিতে পারে নাই। অন্যান্য দেশে জনসাধারণ কাব্যনাটকাদি পাঠ করিয়া হৃদয়ের ভাবাবলি স্ফুরণ করিতে চেষ্টা পায়। তাহাতে উহারা ভাববিষয়ে পূর্ণ শিক্ষা পায় না, তাদৃশ আনন্দ উপভোগ করে না ও তাদৃশ উন্নতি করিতে পারে না।

অপর পক্ষে ধর্ম্মাত্মা হিন্দু ধর্ম্মের নামে, ঈশ্বরের নামে প্রেমবাৎসল্যাদির অনুশীলন করিয়া উহাদের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি করিতে চেষ্টা পান। তিনি প্রকৃত মনুষ্যত্বলাভের জন্য হৃদয়ের সকল ভাবে এক মাত্র ঈশ্বর খোঁজেন, দেখেন ও

ভাবেন এবং তাঁহার অবতার বিশেষের লীলাদি শ্রবণ করিয়া সর্ব্ববিধ ভাবে গদ্গদ হইয়া আনন্দাশ্রু ও শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে ২ ধর্ম্মময় জীবন অতিবাহিত করেন। ইহার জন্য তিনি সাত্ত্বিক ভাবরসে আকণ্ঠ নিমগ্ন হইয়া ভবসাগর সুখে পার হন। যে স্থলে খৃষ্টাদিধর্ম্ম নিরাকার ঈশ্বরকে সকল উৎকৃষ্ট গুণের আদর্শ ভাবিয়া উহাদের স্ফুরণ করিতে চেষ্টা পায়, সে স্থলে আমরাও শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তি প্রেমবাৎসল্যাদির পূর্ণ আদর্শ ভাবিয়া উহাদের স্ফুরণ করিতে চেষ্টা পাই। যে ধর্ম্ম যেরূপ বুঝিতে পারে, সে ধর্ম্ম সেরূপ চাল চলে।

খৃষ্ট ও মুসলমানধর্ম্ম ঈশ্বরকে এক মাত্র জগতের পিতাস্বরূপ মানিতে বলে এবং ধর্ম্মাত্মা খৃষ্টান ও মুসলমানের নিকট তাঁহাদের গড় ও আল্লা কেবলমাত্র পরম পিতা পরমেশ্বর ও জগৎপাতা জগদীশ্বর। কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম মনের সকল ভাবের সম্যক স্ফূর্ত্তির জন্য তাঁহাকে পিতা, মাতা, পতি, বন্ধু,পুত্র প্রভৃতি সকল ভাবে ডাকিতে, মানিতে ও পূজিতে বলে এবং ধর্ম্মাত্মা হিন্দুর নিকট তিনি যেমন পূজ্যপাদ পিতা, তেমনি তিনি স্নেহময়ী মাতা, যেমন তিনি প্রেমময় প্রাণপতি, তেমনি তিনি করুণাময় দীনবন্ধু ও বাৎসল্যময় পুত্র। তবে, কি অপরাধে এ ধর্ম্মকে অপরে অসার অপদার্থ পৌত্তলিক জ্ঞানে ঘৃণা করে? উহারা ইহার মহোচ্চভাব বুঝিতে না পারিয়া অকারণ দোষারোপ করে মাত্র।

যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মে ঈশ্বরকে পিতৃভাবে অপার পিতৃভক্তির সহিত পূজা করিতে চান, তাঁহারা তাঁহাকে শিবশঙ্কররূপে পূজা করেন। শৈব সম্প্রদায় ভারতের নানা অঞ্চলে পিতৃভাবে ঈশ্বরের আরাধনা করিতেছে। এখনও 'বাবা তারকনাথ' 'বাবা বিশ্বেশ্বর' বলিতে ধর্ম্মাত্মা হিন্দুর পিতৃভক্তি উথলিয়া পাড়িতেছে। দেখিতে পাওয়া যায়, ঈশ্বরকে একমাত্র পিতৃভাবে পূজা করিয়া ভক্তের হৃদয় সম্পূর্ণ তৃপ্তি বোধ করে না। উহা অকৃতার্থ হইয়া থাকে। ভগবানের একমাত্র পিতৃভাবে পূজনের এই মহৎ দোষ।

এখন ঈশ্বরের মাতৃভাবে পূজন বা মা জগদম্বার পূজন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বুঝিতে চেষ্টা কর। সংসারে ভূমিষ্ঠ হইয়া আমরা যে স্নেহময়ী মাতার সুকুমার ক্রোড়দেশে তদীয় অমৃতায়মান স্তনপীযূষ পান করিতে করিতে বর্দ্ধিত হই, যিনি অপার স্নেহ ও যত্নের সহিত আমাদিগকে লালন পালন করেন ও নানাবিপদে রক্ষা করেন, যাঁহার অঞ্চল ধরিয়া আমরা প্রথম হাঁটিতে শিখি এবং যাঁহাকে

আমরা প্রথমেই আধ আধ স্বরে মা! মা! বলিয়া ডাকিতে শিখি, এখন ভাব দেখি, সেই স্নেহময়ী জননীকে আমরা যাবজ্জীবন কত প্রাণভরে, কত স্নেহভরে, কত ভক্তিভাবে মা! মা! বলিয়া ডাকি। এখন যে মহামায়ারূপিণী প্রকৃতিদেবী পরম পূজনীয়া জগদম্বাস্বরূপা পার্থিব মাতা অপেক্ষা অধিক স্নেহের সহিত আমাদিগকে অনন্তকাল লালন পালন করিতেছেন ও নানা বিপদ আপদে চিরদিন রক্ষা করিতেছেন, তাঁহাকে কি আমরা প্রাণভরে মা! মা! বলিয়া ডাকিয়া মনের অশেষ তৃপ্তি সাধন করিব না? যদি তাঁহাকে মা! মা! বলিয়া না ডাকিতে পাইলাম? জগতে আসিয়া আমরা কি করিয়া গেলাম? রে হিন্দুধর্ম! ধন্য তোমার ব্যবস্থা! লৌকিক ঈশ্বরকে ছাড়িয়া দেও, পরমাত্মার মহাশক্তি যে মহামায়া সৃষ্টিস্থিতিসংহারের মূলকারণ, তাঁহাকে তুমি জগদম্বারূপে মা! মা! বলিয়া ডাকিতে শিখাও। ধন্য তোমার উপদেশ!

এ সংসারে পিতৃস্নেহ যেমন হউক না, মাতৃস্নেহ নিঃস্বার্থ, অকপট ও অতুলনীয়; এজন্য পিতা অপেক্ষা মাতা পুত্রের নিকট অধিক স্নেহময়ী ও পূজনীয়া হন। সংসারে কুপুত্র ও কুপিতা হয়, কিন্তু কদাচ কুমাতা হয় না। তবে দেখ, ঈশ্বরকে জগদম্বারূপে ডাকা ও পূজা করা আমাদের অধিক শ্রেয়স্কর। ইহার জন্য হিন্দুধর্ম্ম তোমার নয়নসমক্ষে মহিষাসুরনাশিনী দশভুজা কাত্যায়নী মহাদেবীর রমণীয় মূর্ত্তি ধারণ করে এবং তুমিও 'কোথা মা দুর্গে দুর্গতিনাশিনী'! 'কোথা মা তারা তারিণি!' বলিতে বলিতে ভক্তিরসে বিহ্বল হইয়া তদীয় পাদপদ্মে নিজদেহ বিলুণ্ঠিত কর। এখন বল দেখি, এক পৌরাণিক ধর্ম্ম ব্যতীত জগতের কোন্ ধর্ম্ম মাতৃভক্তির এমন স্বর্গীয় ভাব স্ফুরণ করিতে পারে? এখন যে সকল পুরাণ, উপপুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্র জগদম্বার অপার মহিমা ও লীলা কীর্ত্তন করিয়া ঈশ্বরের প্রতি তোমার অশেষ মাতৃভক্তি উদ্রেক করে, মনের সাধে উহাদের প্রতি গালি বর্ষণ কর।

এখন বৈষ্ণব ধর্ম্মের গূঢ় রহস্য বুঝিতে চেষ্টা কর। যে প্রেমময় প্রাণপতি সতী সাধ্বী নারীর সর্ব্বস্বধন, যাহার জন্য তদীয় হৃদয়ে প্রেমের ফোয়ারা ছুটিতে থাকে, সেই প্রাণাধিক পতিকে তিনি কিরূপ অনন্ত প্রেম ও ভক্তির সহিত ভাল বাসেন এবং হৃদয়ের শোণিত দিয়াও তাঁহার কিরূপ সেবা শুশ্রূষা করেন। এখন

যে জগন্নাথ ঈশ্বর নিখিল জগতের প্রেমময় পতিস্বরূপ এবং যিনি অনন্ত কালের জন্য সকলের একমাত্র ভর্ত্তা, তাঁহাকে কি আমরা হরি। হরি! বলিতে বলিতে অপার প্রেমরসে ও ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া ডাকিব না? ইহার জন্য হিন্দুধর্ম্ম তোমার নয়নসমক্ষে ত্রিভঙ্গমুরারি শ্রীকৃষ্ণের মোহন মূর্ত্তি ধারণ করে এবং তুমিও হরি! হরি! বলিতে বলিতে উর্দ্ধবাহু হইয়া ব্রহ্মানন্দে নৃত্য করিতে থাক। বল দেখি পাঠক! জগতের কোন্ ধর্ম্ম প্রেমের এমন স্বর্গীয় ভাব স্ফূরণ করিতে পারে? এখন যে সকল পুরাণ ও উপপুরাণ শ্রীকৃষ্ণের অপার মহিমা ও প্রেমলীলা বর্ণন করিয়া ঈশ্বরকে প্রেমভাবে পূজা করিতে উপদেশ দেয়,উহাদিগকে মনের সাধে গালি বর্ষণ কর ও কর্ম্মনাশার জলে প্রক্ষেপ কর।

সেইরূপ পুত্রের ন্যায় বাৎসল্য ভাবে ঈশ্বরের পূজা ও সেবা করিতে চাহ, তবে যশোদার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের বালগোপাল মূর্ত্তির আরাধনা কর। বিদ্যো-পার্জ্জন, অর্থোপার্জ্জন, সিদ্ধিলাভ, সন্তানলাভ প্রভৃতি সংসারে বিবিধ ইষ্টলাভের জন্য তাঁহার পূজা করিতে চাহ, স্বরস্বতী, লক্ষ্মী, গণেশ ও কার্ত্তিক রূপে তাঁহার পূজা কর। যে ভাবে যে দেবদেবীর পূজা করি না কেন, সকলের পূজার দ্বারা আমরা সেই একমেবাদ্বিতীয়ং পরমাত্মা বা ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া থাকি। তবে কেন এ ধর্ম্মের উপর অকারণ পৌত্তলিক বলিয়া দোষারোপ করিতেছ?

ধর্ম্মাত্মা হিন্দু একমাত্র মনের উৎকৃষ্ট ভাবাবলি দ্বারা ঈশ্বরের পূজা করিয়া নিশ্চিন্ত হন নাই, তিনি ইহার অপকৃষ্ট ভাবাবলি দ্বারা তাঁহার পূজা করিতে চেষ্টা পান। ইহার জন্য তন্ত্রশাস্ত্রে বীরাচার উপদিষ্ট হইয়াছে।

যদি কেহ বেশ্যালয়ের উপযুক্ত পঞ্চ মকার (মৎস্য, মাংস, মদ্য, মৈথুন ও মুদ্রা) লইয়া আমোদপ্রমোদ করত নিকৃষ্ট সুখভোগে রত হয়, ও পাপপথে ধাবমান হয়, হিন্দুধর্ম্ম তাহার প্রতি সকরুণ দৃষ্টিপাত ও প্রিয় সম্ভাষণ করিয়া বলিবে, রে বৎস! তুমি কলিযুগের মানব, যুগধর্ম্মে তুমি স্বভাবতঃ শিশ্নোদরপরায়ণ ও নিকৃষ্ট সুখভোগে রত; তুমি এখন নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য সদা লালায়িত। তুমি কি কেবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইবে এবং চির-দিনের জন্য মানবজীবনের প্রধান শ্রেয়োলাভে বঞ্চিত হইবে? যখন তুমি

উহাদের আতিশয্য বশতঃ পাপপথ পরিত্যাগ করিতে পার না, তখন আমি যথাবিধি উহাদিগকে চরিতার্থ করাইব, অথচ তোমায় ধর্ম্মপথের পথিক করাইব। এখন মদ্‌বিহিত বীরাচারানুসারে কুলক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া মদ্য মাংস ভোজন কর, স্ত্রীসম্ভোগ কর, তোমার ধর্ম্মসাধন হইবে অথচ তোমার নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিও সেই সঙ্গে চরিতার্থ হইবে এবং অন্তে তুমি সিদ্ধপুরুষ হইবে।

বল দেখি, যে ধর্ম্ম প্রকাশ্যভাবে সুরাপানাদি পাপকর্ম্মের অনুমোদন করে, সে ধর্ম্মের মত বীভৎস ধর্ম্ম আর কি হইতে পারে? কোথায় ধর্ম্ম সকল বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপদেশ দিয়া আমাদিগকে ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রোৎসাহিত করিবে, না ধর্ম্মই আমাদিগকে পাপপঙ্কে ডুবাইতেছে? এ সকল ভাবিলে কি এ ধর্ম্মের কোনরূপ সুখ্যাতি করিতে ইচ্ছা হয়? অপর দিকে ভাব দেখি, কত অসংখ্য পাপিষ্ঠ নরাধম নিকৃষ্ট সুখভোগে রত হইয়া কিরূপ অধঃপাতে যায়? উহাদের প্রকৃত মঙ্গলের জন্য হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় সর্ব্বগ্রাহী ধর্ম্ম কি কোনরূপ সদুপায় অবলম্বন করিবে না? উহাদের মঙ্গলের জন্য পতিতপাবন অধমতারণ হিন্দু ধর্ম্ম বীরাচার উপদেশ দেয়। এখন হিন্দুসমাজের মঙ্গলের জন্য কুলক্রিয়ার অনুষ্ঠানগুলি রহিত হইয়া গিয়াছে।

পরিশেষে বক্তব্য স্বধর্ম্মের প্রকৃত মাহাত্ম্য, গৌরব ও মর্য্যাদা বুঝিয়া উহাতে আন্তরিক শ্রদ্ধাবান্ হওয়া আমাদের একান্ত আবশ্যক। প্রত্যেক বিধিব্যবস্থায়, প্রত্যেক অনুষ্ঠানে ইহার যে কি মহৎ উদ্দেশ্য বা গূঢ় রহস্য, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করা সকলের একান্ত কর্ত্তব্য।

হিন্দুধর্ম্মের তথা-কথিত কুসংস্কার।

কতযুগের পর যুগ অতীত হইল, সনাতন হিন্দুধর্ম্ম জগতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। কত কাল হইতে চলিল, এধর্ম্ম ভারতে প্রবল হইয়াছে। এত কাল কত কোটী কোটী মানব ইহার সুশীতল ছায়ামূলে বিশ্রামসুখ সেবন করিয়া জীবনের যথার্থ শ্রেয়োলাভ করিতেছেন। এত কাল কত লক্ষ লক্ষ ধর্ম্মাত্মা ও পুণ্যাত্মা ইহার ধর্ম্মামৃত পান করিয়া নিজ নিজ জীবন বরীয়ান ও মহীয়ান করিতেছেন। এতকাল কত সহস্র সহস্র পরমহংস যোগবলে অলৌকিক ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া অন্তে দেবতায় পরিণত হইতেছেন। আজ

কি না সুশিক্ষিত নব্যসম্প্রদায়ের মুখে শুনিতে পাই, এ ধর্ম্ম কেবল কুসংস্কারে পরিপূর্ণ, ইহা সুশিক্ষিত অত্যুন্নত মানবমনের সর্ব্বতোভাবে অনুপযুক্ত।

তাঁহারা ভাবেন, যে ধর্ম্ম নিরাকার ঈশ্বরের পরিবর্ত্তে কতকগুলি মাটির পুতুল পূজা করিতে বলে, সেধর্ম্ম কুসংস্কার নয়, তবে আর কি? যে ধর্ম্ম গাভী, বৃক্ষ, সর্প, নদী প্রভৃতি নানা জঘন্য জড় বস্তুর পূজা করিতে বলে, সে ধর্ম্ম কুসংস্কার নয়, তবে আর কি? যে ধর্ম্ম জাতিভেদ মানে, নীচ জাতিকে অস্পৃশ্য জ্ঞান করিতে বলে, বিধবাদিগের পুনঃসংস্কার করায় না ও মহিলাগণকে অন্তঃপুরে আবদ্ধ করিয়া রাখে, সে ধর্ম্ম কুসংস্কার নয়, তবে আর কি? তাঁহাদের মতে এ ধর্ম্মের সকলই কুসংস্কার এবং সকলই অনাচার। এই প্রকারে একদিকে নব্য সম্প্রদায় হিন্দুধর্ম্মের নানা কুসংস্কার লইয়া চীৎকার করিতেছেন, অপরদিকে পুরাতন সম্প্রদায় সনাতন ধর্ম্ম গেল, গেল, রসাতলে যাইবার আর বাকী নাই, ঘোর কলি আসিতেছে, এই বলিয়া তাঁহারাও চীৎকার করিতে ছাড়েন না।

ওহে সুশিক্ষিত পাঠকবর্গ! সত্য সত্যই কি তোমরা স্বধর্ম্মকে কুসংস্কার ব্যতীত আর কিছুই মনে কবনা? অগাধ বিদ্যা শিক্ষা করিয়া তোমাদের মনে কি শেষে এই ধারণা হইল? এই যে সেদিন তোমাদের নয়নসমক্ষে একজন সামান্য অশিক্ষিত পূজারি ব্রাহ্মণ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব মা কালীর সাধন করিয়া সিদ্ধ হইলেন এবং তাঁহার ধর্ম্মোপদেশ শুনিবার জন্য তোমরা দলে দলে আসিয়া তাঁহার পদসেবা করিতে লাগিলে। এই যে সেদিন তাঁহার এক প্রধান চেলা বিবেকানন্দস্বামী চিকাগো সহরের ধর্ম্মমণ্ডলে বেদান্তধর্ম্মের কয়েকটী মহাসত্য প্রচার করাতে সমগ্র পশ্চাত্য জগৎ স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইল। বলি, যে ধর্ম্মের বলে বলীয়ান হইয়া তাঁহারা এত দূর করিতে সক্ষম হইলেন, সে ধর্ম্মকে কেন তোমরা সামান্য কুসংস্কার জ্ঞান কর? যে ধর্ম্মের বলে যোগসিদ্ধ হইয়া তৈলঙ্গস্বামী প্রভৃতি মহাত্মাগণ কলিকালেও আড়াই শত বৎসর জীবিত ছিলেন এবং নানা প্রকার অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন পূর্ব্বক সমগ্র হিন্দুজগৎকে মোহিত করিয়াছিলেন, সে ধর্ম্মকে কেন তোমরা সামান্য কুসংস্কার জ্ঞান কর? যে ধর্ম্মের বলে যোগসিদ্ধ হইয়া লোকে একমাস ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়াও জীবন ধারণ করিতে পারে, খড়ম পায়ে দিয়া মা গঙ্গার

বক্ষোপরি যাতায়াত করিতে পারে ও শূন্যে উত্থিত হইতে পারে, সে ধর্ম্মকে কেন তোমরা সামান্য কুসংস্কার জ্ঞান কর? যে ধর্ম্মের বলে বলীয়ান হইয়া প্রাতঃস্মরণীয় মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব হরিসঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে সমগ্র বঙ্গদেশ মাতান, সে ধর্ম্মকে কেন তোমরা সামান্য কুসংস্কার জ্ঞান কর?

সংসারের নিয়ম এই, সকলেই নিজ নিজ সংস্কারকে সুসংস্কার জ্ঞান করে এবং যাহা উহার বিপরীত, তাহাকে কুসংস্কার মনে করে। একমাত্র শিক্ষার তারতম্যবশতঃ যাহা তোমার সুসংস্কার, তাহা অপরের নিকট কুসংস্কার এবং যাহা অপরের সুসংস্কার তাহা তোমার নিকট কুসংস্কার। তাহার সাক্ষ্য, যে সোমনাথ হিন্দুর অশেষ পূজ্য, তাহাকে গিজনীর বিধর্ম্মী মামুদ পদাঘাত করিতে ছাড়েন নাই। যদি তুমি একমাত্র হিন্দুশাস্ত্র পাঠ করিতে, তুমি কি এ ধর্ম্মকে কুসংস্কার মনে করিতে? পাশ্চাত্য শিক্ষায় ব্যামোহিত হইয়া তুমি ইহাকে কুসংস্কার মনে কর মাত্র এবং ইহার উপর আন্তরিক বিশ্বাস হারাইয়া ইতোভ্রষ্ট ও ততোনষ্ট হও।

ওহে সুশিক্ষিত পাঠক! তোমার মন ত আজ পাশ্চাত্য বিদ্যার সুবিমল জ্যোতি পাইয়া শারদীয় পৌর্ণমাসীর নির্ম্মল জ্যোৎস্নায় যেন পরিপ্লুত। যদি তুমি পল্লীগ্রামের একজন বৃদ্ধকে কথকঠাকুরের প্রমুখাৎ রামায়ণকথা শ্রবণ করিতে করিতে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে দেখ, তুমি দয়ার্দ্রচিত্তে বলিবে, যদি এব্যক্তি পাশ্চাত্য বিদ্যার কিছুমাত্র আস্বাদ পাইত, এ কি আজ এরূপ কুসংস্কার জালে জড়িত হইয়া সামান্য উপকথা শ্রবণে এমন করিয়া কাঁদিত? তখন তোমার মনে হইবে, আর কতদিনে এসকল কুসংস্কার হিন্দুসমাজ হইতে দূরীভূত হইবে? কিন্তু বল দেখি, রামায়ণ কথা শ্রবণে ভাবে গদ্গদ হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করাই কি একটা মহৎ কুসংস্কার? আর অর্থোপার্জ্জনের জন্য সভ্যদেশোচিত শঠতা অবলম্বন করাই কি প্রকৃত সুসংস্কার?

পাঠক। বোধ হয়, মদ্যপান বিষয়ে তোমার কিছুমাত্র কুসংস্কার নাই। তুমি ত বেশ জান, অতিরিক্ত মদ্যপানে স্বাস্থ্যের ক্ষতি, অর্থের ক্ষতি ব্যতীত অন্য কোন প্রকার ক্ষতি নাই। শাস্ত্রানুসারে ইহাতে যে মহাপাপ, সে কথা ত তুমি এক তুড়িতে উড়াইয়া দিবে। তুমি হয়ত কোন না কোন দিন বন্ধুবর্গের অনুরোধে এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে যৎসামান্য পান করিয়া পর মুহূর্ত্তে

নিজ মনের দুর্ব্বলতা দর্শনে আপনাকে শত ধিক্কার দিয়া থাকিবে। কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলের একজন দীনদরিদ্র ব্রাহ্মণসন্তান, যাহার মন অমানিশার ন্যায় ঘোরান্ধকারে আচ্ছন্ন, তাহাকে যৎসামান্য মদ্য পান করিতে বল, হয়ত সে ব্যক্তি ইহার দোষগুণ কিছুই জানেনা, এই মাত্র জানে ব্রাহ্মণের পক্ষে ইহাতে মহাপাপ জন্মে, তখন প্রাণ যায়, সেও স্বীকার, তথাপি সে ব্যক্তি এক বিন্দু সুরা অঙ্গুলিতে স্পর্শও করিবে না।

পাঠক! এস্থলে তুমি কি দেখিতেছ? তোমার যত বিদ্যার গৌরব,সব বালির বাঁধ মাত্র। এক ঢেউয়ে কোথায় ভাসিয়া গেল, তাহা দেখিতে পাইলে না। কিন্তু কুসংস্কারে শিক্ষিত মন পর্ব্বতোপরিনির্ম্মিত দুর্গের ন্যায় অটল ও অচল। সে মন কি সামান্য কথায় ভোলে বা অর্থের লোভে বশীভূত হইতে পারে? উহা চিরদিন ধ্রুবতারার ন্যায় স্বলক্ষ্যে স্থির থাকে। কোথায় হে শিবজীপুত্র ধর্ম্মাত্মা শম্ভুজি! তুমি বিধর্ম্মী আরঙ্গজেবের আদেশে জিহ্বা কর্ত্তন করাইয়া অম্লান বদনে স্বর্গধামে চলিয়া গেলে, তথাচ স্বধর্ম্ম কিছুতেই ত্যাগ করিলে না। তোমার মনও হিন্দুধর্ম্মের এই কুসংস্কারে শিক্ষিত হইয়াছিল। কোথায় হে শিখগুরো তেগ বাহাদুর! তুমিও অম্লান বদনে নিজ শির দিয়াছিলে, কিন্তু সের না দিয়া স্বধর্ম্ম ত্যাগ কর নাই। তোমার মনও এই কুসংস্কারে শিক্ষিত হইয়াছিল।

মনে কর, মধ্যভারতের এক দীনদরিদ্র লোক পদব্রজে অশেষ কষ্ট সহ্য করিতে করিতে দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বতাদি অতিক্রমপূর্ব্বক শ্রীক্ষেত্রের জগন্নাথদেবের মন্দিরে উপস্থিত হইল এবং উহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া মনে মনে বলিল, প্রভো! আজ তোমার শ্রীচরণকমল দর্শন পাইয়া আমার মানবজীবন সার্থক হইল। বল দেখি, পাঠক! সেই মুহূর্ত্তে তাহার কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভক্ত হৃদয়ে যেরূপ বিমল আনন্দ উত্থিত হইবে, তাহা কি তুমি একবার স্বপ্নেও ভাবিতে পার? তুমি হয়ত জগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরে গমন করিয়া উহার নির্ম্মাণ কৌশলাদি দেখিয়া প্রশংসা করিবে; কিন্তু তীর্থস্থলের প্রকৃত মাহাত্ম্য কি, কেন লোকে এত কষ্ট স্বীকার করিয়া ও এত অর্থ ব্যয় করিয়া তথায় গমনাগমন করে, তাহা তুমি আদৌ বুঝিতে পারিবে না। তুমি হয়ত সে ব্যক্তির কুসংস্কার দর্শনে হিন্দুধর্ম্মের শত নিন্দাবাদ করিবে এবং যে স্বর্গীয়বিদ্যা তোমায় ঐ সকল

কুসংস্কার হইতে মুক্ত করিয়াছ, তাহারই শতমুখে প্রশংসা করিবে। কিন্তু তুমি কি একবার ভাবিয়া দেখিবে, সেই বিদ্যা তীর্থভ্রমণজনিত কিরূপ পরমানন্দ হইতে তোমার সুশিক্ষিত মনকে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত করিয়াছে।

রে পাশ্চাত্যবিদ্যে! ভারতের মঙ্গলের জন্য তুমি ইহার একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইতেছ। তোমাকে পাইবার জন্য এখন সকলে একান্ত উদ্গ্রীব ও প্রাণান্তপরিশ্রমশীল। ত্বৎপ্রদত্ত সভ্যতাজ্যোতি ও প্রসাদ পাইবার জন্য উহারা অতীব ব্যগ্র। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের জাতীয় হৃদয়মন্দিরে যে সকল দেবমূর্ত্তি এতকাল সুপ্রতিষ্ঠিত, যাহাদের উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আমাদের জীবন এতকাল প্রকৃত শান্তিসুখে সুখী, সে সকল দেবমূর্ত্তি তুমি নিজ কুহকজাল বিস্তার করিয়া ধীরে ধীরে ভগ্ন করিতেছ এবং তৎপরিবর্ত্তে নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাস বা নাস্তিকমত প্রচার করিতেছ, ইহাতে আমাদের সনাতন হিন্দুধর্ম্ম অচিরে রসাতলে যাইবে। জনসাধারণের মনে যে সকল পরমকল্যাণকর সুসংস্কার এতকাল বদ্ধমূল, সে সকল সুসংস্কার আজ তুমি কুসংস্কার বলিয়া প্রতিপাদন করিয়া দিতেছ, ইহাতে হিন্দুসমাজের ঘোর অনিষ্টোৎপত্তি হইবে। সবেমাত্র কলির সন্ধ্যা, এখনও যথেষ্ট সময় পুরোভাগে রহিয়াছে। এইবেলা হইতে সাবধান না হইলে সকলকে ঘোর অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে হইবে। পরে যখন পাশ্চাত্য হলাহলে হিন্দুসমাজ জর্জ্জরিত হইবে, তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া সকলকে বৃদ্ধাঙ্গুলিটি চুসিতে হইবে। যে পাশ্চাত্য কালস্রোত খরবেগে সমাজে বহমান, তাহা প্রত্যাবর্ত্তন করা আমাদের সাধ্যাতীত। বিপদভঞ্জন মধুসূদনই আমাদের একমাত্র সহায়।

হিন্দুধর্ম্মের যোগসাধন।

বিশ্বনিয়ন্তা বিশ্বেশ্বরের বিশ্বজনীন নিয়মানুসারে সৃষ্টিপ্রক্রিয়ায় সূক্ষ্ম জগৎ যেরূপে স্থূলজগতে পরিণত, ইহার অধিবাসিগণও সেইরূপ সূক্ষ্মরূপধারী দেবমূর্ত্তি হইতে স্থূলচর্ম্মাবৃত মানবদেহে বিবর্ত্তিত হয় এবং পরমাত্মার অংশীভূত জীবাত্মা সর্ব্বজ্ঞ ও অনন্তশক্তির আধার হইলেও স্থূলদেহে নিবদ্ধ হইয়া ইহার স্বাভাবিক জ্ঞান ও শক্তি হারাইয়া বসে।

সংসারে স্থূলত্ববর্দ্ধনের সঙ্গে একদিকে আত্মার অবনতি, অপরদিকে মনে জ্ঞানশক্তির উন্মেষ হয় এবং ইহা প্রকৃতিদত্ত মায়াজাল পাইয়া অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে। এইপ্রকারে যুগধর্ম্মানুসারে মানবজাতির প্রকৃত অধঃপতন ঘটিয়াছে এবং অশেষ পাপতাপ সংসারে প্রবেশ করিয়াছে। বাইবেলে সয়তানের প্রলোভনে নিষিদ্ধ জ্ঞানবৃক্ষের ফলাস্বাদন করাতে আদিমানব আদামের যে পতন উল্লিখিত আছে, তাহাতেও উপরোক্ত মানবজাতির অধঃপতন ও আত্মার অবনতি জানায়। এখন অধঃপতিত মানবজাতির উদ্ধারার্থে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম অতিপ্রাচীনকাল হইতে যোগাভ্যাস ও তপশ্চরণ উপদেশ দিয়া আসিতেছে।

শাস্ত্রপাঠে অবগত হওয়া যায়, সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগে দেবাসুরগণ, বৈদিক যুগে মহর্ষি ও রাজর্ষিগণ, বৌদ্ধযুগে অর্হৎগণ, পৌরাণিকযুগে পরমহংস ও সাধুসন্ন্যাসীগণ অনন্তশক্তিসম্পন্ন আত্মার অনন্তশক্তিস্ফুরণের জন্য যোগাভ্যাস করিয়া আসিয়াছেন। যুগধর্ম্মানুসারে যাহাদের শরীরে স্থূলত্বের যেরূপ বিকাশ ঘটিয়াছিল, তাঁহারা যোগবলে শরীরের সেই স্থূলত্ব নাশ করিয়া আত্মার আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা পাইয়াছেন,। আজকাল পরমহংস ও যোগীরা যোগাভ্যাস করিয়া নিজ নিজ জীবন বরীয়ান ও মহীয়ান করিতেছেন।

এখন যোগসাধনের গূঢ় রহস্য বুঝিবার জন্য তৎসম্বন্ধে নানা কথা জানা আবশ্যক। সে সকল কথা একে একে নিম্নে লিখিতেছি, যথা :—

(১) দেহে দুই প্রকার স্নায়ুপ্রবাহ চলিতেছে। প্রথম প্রবাহ হইতে মনের ইচ্ছামত ক্রিয়াগুলি সম্পন্ন হইতেছে। ইহার প্রধান যন্ত্র মস্তিষ্ক, যাহাকে তন্ত্রে সহস্রার বা সহস্রদলপদ্ম বলে। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের যাবতীয় কার্য্য জীবের ইচ্ছামত সম্পন্ন হইতেছে। এই সকল কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য মস্তিষ্ক হইতে মেরুমজ্জা দিয়া জ্ঞানাত্মক ও গত্যাত্মক (Sensory and Motor) স্নায়ুশিরা সমগ্র দেহে অভিব্যাপ্ত আছে। এই সকল শিরায় যে স্নায়ুপ্রবাহ (Neural current) চলিতেছে, উহার ক্রিয়া বশতঃ মন মস্তিষ্ক হইতে সমগ্র দেহের প্রত্যেক অংশ অনুভব করে ও তত্রত্য মাংসপেশী চালিত করিয়া আবশ্যকমত কার্য্য করে। এই প্রকারে স্পর্শেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের

কার্য্য চলিতেছে। আর দর্শন, শ্রবণ ঘ্রাণ ও রসনেন্দ্রিয়ের কার্য্যের জন্য মস্তিষ্ক হইতে বিশেষ বিশেষ স্নায়ু আছে, ইহারা উপরোক্ত চারি আভ্যন্তরিক জ্ঞানেন্দ্রিয়ের যন্ত্রের সঙ্গে সংলগ্ন আছে, যেমন Optic nerve, Auditory nerve প্রভৃতি।

(২) দ্বিতীয়প্রকার স্নায়ুপ্রবাহ সহানুভূতিক মণ্ডলী (Sympathetic system) দিয়া মনের অগোচরে ও অজ্ঞাতসারে চলিতেছে। যে সকল যন্ত্রের ক্রিয়া জীবনধারণের জন্য অত্যাবশ্যক, উহাদের ক্রিয়া মনের অজ্ঞাতসারে অনুক্ষণ চলিতেছে, যেমন ফুসফুসের শ্বাস প্রশ্বাস, হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচন, অন্ত্রের খাদ্যদ্রব্য পাক, শোষণ ও শোণিতে পরিণতি ইত্যাদি। তুমি জাগ্রত থাক বা নিদ্রা যাও ইহাদের ক্রিয়া চলিবেই চলিবে। বস্তি, উদর ও বক্ষ গহ্বরের যন্ত্রগুলির উপর এই সহানুভূতিক মণ্ডলীর একমাত্র অনুশাসন চলিতেছে এবং সহজ অবস্থায় মনের কিছুমাত্র অনুশাসন নাই; কিন্তু উহাদের ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য ঘটিলে, মন উহাদিগকে যন্ত্রণারূপে অনুভব করে এবং মন বিকৃত হইলে উহাদের ক্রিয়ার কিছু না কিছু বৈলক্ষণ্য ঘটে, ইহাতে সিদ্ধান্ত করা উচিত, স্থলবিশেষে কোনরূপ প্রক্রিয়া বলে মন উহাদের উপর নিজের ক্ষমতা চালাইতে পারে।

(৩) যোগীদের ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই তিনটী নাড়ী ও শরীরাভ্যন্তরস্থ ষটচক্র ঐ সহানুভূতিক মণ্ডলীর অন্তর্গত। ইড়ানাড়ী বা নাড়ীপ্রবাহ মেরুমজ্জার বামদিক দিয়া যাইতেছে, পিঙ্গলানাড়ী বা নাড়ীপ্রবাহ উহার দক্ষিণ দিক দিয়া যাইতেছে। মেরুমজ্জার যে জ্ঞানাত্মক ও গত্যাত্মক স্নায়ুশিরার উপর মনের অনুশাসন পূর্ণভাবে চলিতেছে, ইড়া ও পিঙ্গলা উহাদের হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। সুষুম্নানাড়ী বা নাড়ীপ্রবাহ মেরুমজ্জার মধ্য দিয়া যাইতেছে। নিম্নদেশে ইহার মুখবদ্ধ থাকে। এই নাড়ীর অভ্যন্তরে চিত্রানাড়ী অবস্থিত। এই চিত্রানাড়ী ব্রহ্মরন্ধ্রকে বেষ্টন করিয়া আছে। এই ব্রহ্মরন্ধ্র মস্তিষ্কের পঞ্চগুহা (Ventricles of the Brain) ভেদ করিয়া মেডুলা অবলঙ্গেটা ও মেরুমজ্জার ঠিক মধ্য দিয়া আসিতেছে।

(৪) শরীরাভ্যন্তরস্থ ষটচক্র নিম্নদেশ হইতে যথাক্রমে এইভাবে অবস্থিত :—

বস্তিদেশে দুইচক্র—

(১) কুলকুণ্ডলিনী (Ganglia impar)

(২) স্বাধিষ্ঠান পদ্ম। (Sacral plexus)

(৩) উদরগর্ভে ১টি চক্র

মণিপুর চক্র (Abdominal plexus)

(৪) বক্ষঃস্থলে অনাহত চক্র (Cardiac plexus)

(৫) গ্রীবাদেশে বিশুদ্ধ চক্র (Medulla oblongata)

(৬) মস্তিষ্কে আজ্ঞাচক্র (Frontal plexus)

(৫) খাদ্য হইতে সংগৃহীত সৌরশক্তি শরীরের ভিতর দুইস্থানে, মস্তিষ্কে ও কুলকুণ্ডলিনীতে সঞ্চিত থাকে। মস্তিষ্কে যে শক্তি সঞ্চিত থাকে, তদ্দ্বারা মানসিক ক্রিয়া ও দেহের ঐচ্ছিক ক্রিয়াগুলি সম্পন্ন হয়; আর যে শক্তি কুলকুণ্ডলিনীতে সঞ্চিত থাকে, তদ্দ্বারা সহানুভূতিক মণ্ডলীর যাবতীয় ক্রিয়া জীবন ধারণের জন্য সম্পন্ন হয়। এই দুইপ্রকার শক্তি পৃথকভাবে কার্য্য করে। যোগীরা যোগবলে সুষুম্নার দ্বার উদ্ঘাটন করত কুলকুণ্ডলিনীকে জাগরিত করিয়া সহানুভূতিক মণ্ডলীর যাবতীয় ক্রিয়ার উপর মনের আধিপত্য স্থাপন করিতে চান। ইহাই যোগীদের প্রধান লক্ষ্য। সহানুভূতিক স্নায়ুমণ্ডলীর উপর মনের আধিপত্য বিস্তৃত হইলে, এখন যে সকল ক্রিয়া ইহার অজ্ঞাতসারে চলিতেছে, উহারা ইচ্ছাশক্তির আয়ত্ত হইয়া থাকে। দেখ, বাহ্যজগৎ হইতে মুখবিবর দিয়া আহার্য্য গ্রহণ করিবার সময় মন রসনা দ্বারা চালিত হইয়া ইচ্ছামত উহাকে গ্রহণ করে এবং মলদ্বার দিয়া মলত্যাগ করিবার সময় মন ইচ্ছামত উহাকে নিঃসরণ করে। কিন্তু খাদ্যদ্রব্য পাকাশয়ে ও অন্ত্রে জীর্ণ ও শোষিত হইয়া কিরূপে শোণিতে পরিণত হয়, তাহা মন সহজ অবস্থায় বুঝিতে পারে না। বিকৃত অবস্থায় অজীর্ণ ও শূলাদি পীড়া জন্মিলে মন ভালরূপ অনুভব করে! উদরাভ্যন্তরস্থ মণিপুর চক্রের (Abdominal Plexus) ক্রিয়াবশতঃ পাকাশয় ও অন্ত্রের ক্রিয়া চলিতেছে। যদি সহজাবস্থায় মণিপুর চক্রের উপর মনের অনুশাসন চালান যায়, মন ইচ্ছামত উহার ক্রিয়াগুলি স্বায়ত্ত করিতে পারে, ইচ্ছামত আহার করিয়া ভালরূপ জীর্ণ করিতে পারে এবং ইচ্ছামত দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারে।

(৬) যোগীরা বলেন, মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে তৃতীয় জ্ঞাননেত্র অবস্থিতি করে। এই তৃতীয় নয়ন জাগরিত হইলে,অতীন্দ্রিয়দর্শনাদি অদ্ভুত ক্ষমতা জন্মে।

সেজন্য যোগীরা ধ্যান বলে তৃতীয় নয়নের উদ্বোধনার্থ সাধ্যমত চেষ্টা পান। থিওসফি বলে, মস্তিষ্কের তলদেশে যে পিনীয়াল গ্লাণ্ড (Pineal Gland) অপগত ভাবে দেখা যায়, তাহাই পূর্ব্বতন যুগের প্রকৃত তৃতীয় নয়ন এবং ইহার অপগমনে মানবের আধ্যাত্মিক শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়াছে। যোগবলে এই তৃতীয় নয়ন স্ফুরিত হইলে অদ্ভুত ক্ষমতা লাভ করা যায়। যেমন কুলকুণ্ডলিণীর জাগরণ হটযোগীদের প্রধান লক্ষ্য, তেমনি তৃতীয় জ্ঞাননেত্রের স্ফুরণ রাজযোগীদের প্রধান উদ্দেশ্য।

(৭) শরীরস্থ সকল রস ও শক্তির সার ওজ। ইহা অণ্ডকোষে শুক্রের সহিত উৎপন্ন হয়। শুক্র মূত্রাধারের পার্শ্বস্থ শুক্রাধারে (Vesiculæ Seminalis) সঞ্চিত থাকে, আর ওজ রক্তের সহিত সঞ্চারিত হইতে হইতে মস্তিষ্কে ও ষটচক্রে সঞ্চিত হয়। সহবাস কালে শুক্র শুক্রাধার হইতে নিঃসৃত হইয়া যায়। ইহা অণ্ডকোষে অনুক্ষণ ক্ষরিত হইতেছে। যাহার যেরূপ অভ্যাস, শুক্রাধার হইতে ইহা সেইরূপ নিঃসৃত হয়। যখন শুক্রাধার ভরিয়া যায়, স্ত্রীসহবাস না হইলে, উহা স্বপ্নযোগে নিঃসৃত হয়। অতিরিক্ত রেতপাত হইলে, শরীরের ওজ হ্রাস পায়। এই ওজ স্নায়ুমণ্ডলীর প্রধান খাদ্যস্বরূপ। যেমন রুধির সমস্ত শরীরের পুষ্টিকারক, ওজ সেইরূপ স্নায়ুমণ্ডলীর পুষ্টিকারক। যাহার মস্তিষ্কের ওজ অধিক, তাঁহার ইচ্ছাশক্তি প্রবল, তিনি অল্পে অনেককে বশীভূত করিতে পারেন এবং তাঁহার মন সহজে একাগ্রতা লাভ করে। এজন্য রেতধারণ বা ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন সকলের পক্ষে একান্ত আবশ্যক এবং যোগীরা উর্দ্ধরেতা হইয়া থাকেন।

(৮) যে শ্বাসপ্রশ্বাস অনুক্ষণ চলিতেছে, যাহা ৫মিনিটের জন্য বন্ধ হইলে সমস্ত শরীর নীলবর্ণ হইয়া প্রাণবায়ু দেহ হইতে বহির্গত হইয়া যায়, তাহা সহানুভূতিক স্নায়ুমণ্ডলীর কার্য্য; ইহার কেন্দ্র মেরুমজ্জায় অবস্থিতি করে এবং বক্ষঃস্থলস্থ অনাহত চক্র দ্বারা সম্পন্ন হয়। সহানুভূতিক স্নায়ুমণ্ডলীর ক্রিয়া হইলেও মন ইচ্ছাশক্তি দ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাসকে কিয়ৎ পরিমাণে সংযত করিতে পারে, কারণ মস্তিষ্কের নিম্নে গ্রীবাদেশে মেডুলা অবলঙ্গেটা হইতে নিমোগ্রাষ্ট্রীক স্নায়ু ফুসফুসে অতিব্যাপ্ত আছে এবং এই স্নায়ু দ্বারা মন শ্বাসপ্রশ্বাসকে জাগ্রত অবস্থায় ইচ্ছামত সংযত করিয়া থাকে। সহানুভূতিক

মণ্ডলীর যে ক্রিয়াটী আমরা ধরিতে পারি, সেই ক্রিয়া ধরিয়া ইহার অন্যান্য ক্রিয়াগুলি স্বায়ত্ত করিতে চেষ্টা পাই। এজন্য যোগীরা শ্বাসপ্রশ্বাসকে সংযত করিবার জন্য প্রণায়াম বা প্রাণবায়ুর নিরোধ অভ্যাস করেন এবং এই প্রকারে অন্যান্য ক্রিয়ার উপর মনের অনুশাসন চালাইতে শিক্ষা করেন।

(৯) যে বায়ু আমরা নিশ্বাস যোগে ফুস্‌ফুসে আকর্ষণ করি, তাহা অম্লজানে পূর্ণ এবং যে বায়ু প্রশ্বাস যোগে বাহিরে প্রক্ষেপ করি,তাহা কার্ব্বনিক এসিডে পূর্ণ। বায়ু ফুসফুসের বায়ুকোষে (Air calls) গিয়া কৈশিকনাড়ী প্রবাহিত অবিশুদ্ধ কৃষ্ণবর্ণ রক্তের কার্ব্বনিক এসিড গ্রহণপূর্ব্বক অম্লজান দ্বারা উহাকে বিশুদ্ধ করত লোহিতবর্ণ করে। রক্তের লালকণিকাগুলি অম্লজানকে ধমনী ও কৈশিকনাড়ী (Capillaries) যোগে সমস্ত শরীরে অভিব্যাপ্ত করে এবং তথায় অম্লজান প্রত্যেক যন্ত্রের ক্রিয়াসম্পাদনে সাহায্য করে। ইহাতে সিদ্ধান্ত করা উচিত, যদিও বায়ু সর্ব্বশরীরে প্রবেশ করে না, ইহার অম্লজান শরীরস্থ প্রত্যেক যন্ত্রের জীবাণুগুলিকে অনুপ্রাণিত করে। বায়ু কেবল ফুসফুসে প্রবেশ করে এবং উহা হইতে নিঃসৃত হয়। শ্বাসপ্রশ্বাস কালে উদরের মাংসপেশী উঠানামা করে বলিয়া মনে করিও না, যে বায়ু ফুসফুসের ন্যায় উদরে প্রবেশ করে ও উহা হইতে বহির্গত হয়।

(১০) সহজ অবস্থায় বাহ্যজগতের বায়ু দুই নাসারন্ধ্র দিয়া প্রবেশ করে না বা নিঃসৃত হয় না। এক নাসারন্ধ্র বায়ু আকর্ষণ করে এবং অপর নাসারন্ধ্র উহাকে নিঃসরণ করে। এইরূপে শ্বাসপ্রশ্বাস তালে তালে দিবারাত্র উভয় নাসারন্ধ্র দিয়া পর্য্যায়ক্রমে চলিতেছে। যোগাভ্যাস দ্বারা এই সহজ শ্বাসপ্রশ্বাসকে নিয়মিত করা হয়।

যখন যোগীরা প্রাণায়াম করেন, তখন তাঁহারা সহজ শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়ার পূর্ণতা লাভ করিতে চেষ্টা পান,কেবল কুম্ভকের সময় ক্রমশঃ বাড়াইতে থাকেন। এইপ্রকারে তাঁহারা নাসারন্ধ্রস্থ ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীকে উত্তেজিত করত বক্ষঃস্থলের অনাহত চক্রের উপর নিজ অনুশাসন চালাইতে সক্ষম হন। বহুদিবস ধরিয়া প্রাণায়াম সাধন করিতে করিতে প্রাণ ও অপান বায়ু বা উপরিস্থ ও নিম্নস্থ স্নায়ুপ্রবাহ মিশ্রিত হইয়া যায় এবং কুণ্ডলিনী ও তৃতীয় জ্ঞানচক্ষুর শক্তি জাগরিত হইয়া পড়ে।

(১১) আয়ুর্ব্বেদে স্নায়ুমণ্ডলীর স্নায়ুপ্রবাহকে বায়ু বলা হয়। বাহ্যজগতের বায়ুর সহিত দেহাভ্যন্তরস্থ স্নায়ুপ্রবাহের যে কিরূপ সম্বন্ধ, তাহা এখনও নিরূপিত হয় নাই। যখন যোগসিদ্ধ মহর্ষিগণ স্নায়ুপ্রবাহকে বাত বলিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই বাহ্যজগৎস্থ বায়ুর সহিত উহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। বোধ হয়, যেমন বায়ুর অম্লজান শোণিতের উপর কার্য্য করিয়া শরীরের পোষণাদি বিষয়ে সবিশেষ সাহায্য করে, তেমনি ইহার যবক্ষারজান (Nitrogen) স্নায়ুমণ্ডলের পোষণাদি করিয়া থাকে। যোগশাস্ত্রে পাঠ করা যায়, যখন বহুদিবস প্রাণায়াম করিতে করিতে বায়ু ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রবেশ করে, তখন কুণ্ডলিনী জাগরিত হয়।

(১২) জীবজগতে দেখিতে পাওয়া যায়, ভেক, সর্প ও অন্যান্য সরীসৃপ শীতকালে শ্বাসরোধ করিয়া ৩।৪ মাস আহারাদি না করিয়া জীবন ধারণ করে। তৎকালে উহাদের দেহে প্রাণটী বর্ত্তমান থাকেমাত্র, কেবল হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া অত্যল্প মাত্রায় চলিতে থাকে। তদ্ভিন্ন দেহের যাবতীয় জৈবনিক ক্রিয়া প্রায় রহিত হইয়া যায়। ক্ষুধা তৃষ্ণা কিছুই থাকে না; উহারা নিস্পন্দ ভাবে পড়িয়া থাকে। একে ত উহারা শীতলশোণিতবিশিষ্ট (Cold blooded) জীব। তজ্জন্য উষ্ণশোণিত জীবের স্বাভাবিক উত্তাপ রাখিবার জন্য যে পরিমাণে আহার্য্যের প্রয়োজন, উহাদের তাহা আবশ্যক করে না। সেজন্য কিছুমাত্র আহার না করিয়া উহারা অনায়াসে ৩।৪ মাস নিস্পন্দভাবে পড়িয়া থাকে। তৎকালে ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়া একপ্রকার স্থগিত থাকে। জিহ্বা উল্টাইয়া কণ্ঠদেশে স্থাপন করাতে শ্বাসক্রিয়া বন্ধ থাকে।

ইতরজন্তুদিগের এই সকল ক্রিয়াকলাপ পর্য্যালোচনা করিয়া পুরাকালের যোগীরা যোগক্রিয়ার উন্নতিসাধন করিয়া যান। তাঁহারা উহাদের ন্যায় খেচরী মুদ্রার অনুষ্ঠান করিয়া জিহ্বার মূলদেশ কর্ত্তন করত ইহাকে উল্টাইয়া কণ্ঠদেশে স্থাপনপূর্ব্বক শ্বাসক্রিয়াকে একেবারে বন্ধ করিতে শিক্ষা করিতেন। এইপ্রকারে তাঁহারা একমাস বা দুইমাস ভূগর্ভে প্রোথিত হইলেও জীবনধারণ করিতে সমর্থ হইতেন এবং উন্নত বিজ্ঞানকে অঙ্গুষ্ঠা দেখাইতেন। অনেকের বিশ্বাস, যে যোগক্রিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে তদানীন্তন পৃথিবীর অধিবাসীদিগের ভিতর বহুকাল প্রচলিত ছিল, সেই প্রক্রিয়া প্রকৃতি এখন শীতলশোণিতবিশিষ্ট সরীসৃপজীবদিগের মধ্যে চিরস্থায়ী করিয়া দিয়াছে; এজন্য শীতকালে উহারা

নৈসর্গিক সংস্কারবশতঃ একপ্রকার যোগসাধন করিয়া থাকে; কিন্তু আধ্যাত্মিক শক্তিবিরহিত বলিয়া উহারা ঐ ক্রিয়াদ্বারা শরীরের উপর সামান্য সুফল পায় মাত্র।

(১৩) মানবমন পদ্মপত্রস্থিত জলের ন্যায় সদা চঞ্চল ও অস্থির। পাগলা ঘোড়ার ন্যায় মন সদা লাফাইতেছে,। ইহাকে লাগাম দিয়া বাগিয়া রাখাই দায়। জীবনে একজনকে কত কাজ ও কত চিন্তা করিতে হয়, তাহার কি কিছু মাত্র ঠিকানা আছে? জীবনের কথা ছাড়িয়া দাও, এক দিনে কত কাজ ও কত চিন্তা করিতে হয়, তাহার কি ঠিকানা আছে? যখন কোনরূপ কাজকর্ম্ম থাকে না, মন ত বসিয়া থাকে না, নানা চিন্তা করিতে থাকে। একবার ভাব দেখি, স্বার্থসিদ্ধির জন্য কত ফন্দি খাটাইতেছ, কত চক্রান্ত করিতেছ, কত জোরেবরাব্রি করিতেছ! এই মনকে একাগ্র করা আমাদের জীবনের এক মহৎ উদ্দেশ্য। মনের একাগ্রতা ব্যতীত সংসারে কোন কার্য্য সিদ্ধ হয় না। বিদ্যানুশীলনে যেরূপ, ধর্ম্মানুশীলনেও তদ্রূপ। তোমার মন যদি উড়ু উড়ু করে, তুমি কি পঠদ্দশায় কিছু শিখিতে পার? ধর্ম্মানুষ্ঠানে তুমি যদি ব্রহ্মে একনিষ্ঠ না হইতে পার, তোমার মন সদা পাপপথে ধাবিত হইবে। ধ্যানবলে মনকে সম্পূর্ণ একাগ্র করাই যোগসাধনের প্রধান উদ্দেশ্য। মনের একাগ্রতা বর্দ্ধিত হইলে ইচ্ছাশক্তি বর্দ্ধিত হয় এবং অনেককে বশীভূত করা যায়।

(১৪) যে আত্মা পরমাত্মার অংশ, ইনি সর্ব্বজ্ঞ ও অনন্তশক্তিতে বিভূষিত হইলেও যতদিন জীবদেহে নিবদ্ধ থাকিয়া জীবাত্মারূপে প্রকাশ পান, ততদিন ইনি দেহের পঞ্চেন্দ্রিয় ও মনের বিবিধ ফাঁদে পতিত হইয়া সব হারাইয়া বসেন অথবা প্রকৃতিদত্ত মায়াঠুলি পরিয়া অজ্ঞানে আচ্ছন্ন ও সর্ব্বথা সীমাবদ্ধ থাকেন। জীবাত্মার বাহ্য আবরণ বা খোলস দূরীভূত করিতে পারিলে (অর্থাৎ) ইন্দ্রিয়-গণের সহিত মনের লয়সাধন করিতে পারিলে ইহার আধ্যাত্মিক শক্তি পূর্ণভাবে প্রস্ফুটিত হয়। এজন্য যোগীরা প্রত্যাহার অনুষ্ঠান করিয়া ইন্দ্রিয়গণকে যথাসাধ্য সংযত করিতে চেষ্টা পান, এমন কি উহাদের লয়সাধন করিয়া প্রকৃতিদত্ত মায়াঠুলি পরিহার করিতে চেষ্টা পান। বিষয়ানুভূতি হইতে সম্পূর্ণ দূরে রাখিয়া তাঁহারা উহাদিগকে ক্রমশঃ নাশ করিতে চেষ্টা পান। এই

প্রকারে সমাধির অবস্থায় বাহ্য জ্ঞানেন্দ্রিয় লয় পাইলে অভ্যন্তরীণ তৃতীয় জ্ঞানেন্দ্র উন্মীলিত হয় ও অতীন্দ্রিয় দর্শনাদিক্ষমতা জন্মে। ইহাই যোগীদের প্রধান লক্ষ্য।

এখন অষ্টাঙ্গ যোগ ও ইহার অষ্টসিদ্ধি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস দিতেছি। যোগ দুইপ্রকার, হটযোগ ও রাজযোগ। হটযোগীরা চৌরাশি প্রকার বসিবার কায়দা বা আসন অনুষ্ঠান করিয়া প্রাণায়াম করিতে২ দেহের সহানুভূতিক স্নায়ুপ্রবাহের উপর মনের পূর্ণ অনুশাসন চালাইয়া জীবনধারণের জন্ত যে সকল যান্ত্রিক ক্রিয়া আমাদের অজ্ঞাতসারে চলিতেছে, উহাদিগকে ইচ্ছাধীন করিতে চেষ্টা পান। এ সকল ক্রিয়া ইচ্ছাধীন হইলে, যোগী ইচ্ছামত ফুসফুস ও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া চালাইবেন, ইচ্ছামত আহার করিবেন ও ইচ্ছামত দীর্ঘজীবন লাভ করিবেন। এজন্য যোগীরা অনায়াসে আড়াই শত বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতেন।

মৌখিক উপদেশ দ্বারা যোগ শিক্ষা করা যায় না। সমস্ত অনুষ্ঠানগুলি গুরুদেবের নিকট হাতে হেতড়ে শিখিতে হইবে। যেমন চেরাফাড়ি হাতে হেতড়ে শিখিতে হয়, যোগসাধনও তদনুরূপ। সদ্গুরুর কৃপা ব্যতীত কেহ যোগাভ্যাস করিতে পারেন না।

হটযোগে চৌরাশি প্রকার আসনের মহৎ উদ্দেশ্য আছে। যেমন শ্বাসরোধ করিয়া ডন্ ফেলা শরীরের মহোপকারী ব্যায়াম, সেইরূপ প্রত্যেক আসনের অনুষ্ঠান এবং সেই সঙ্গে প্রাণায়ামসাধন শরীরের মহোপকারী ব্যায়াম। ইহাতে স্থলবিশেষের সহানুভূতিক স্নায়ুপ্রবাহকে উত্তেজিত করিয়া শরীরের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নানা সুফল পাওয়া যায়।

হটযোগে বস্তি ধৌতাদি ষট্ কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা দেহস্থ নবদ্বারের দূষিত আম নষ্ট করিয়া শরীরের রোগপ্রবণতা দূর করা হয়। যেমন ডাক্তারেরা অজীর্ণরোগে নল দ্বারা পাকাশয় ধৌত করেন এবং কোষ্ঠ বদ্ধে গুহ্যদেশে পিচকারী দিয়া অন্ত্র ধৌত করেন, যোগীদের ষটকর্ম্মও প্রায় সেইরূপ, অথবা উহাদের অপেক্ষা অধিক কার্য্যকর।

প্রাণায়াম দ্বারা ইচ্ছামত শ্বাসপ্রশ্বাসকে রোধ করিতে শিখিলে কিছু কাল পরে নাসারন্ধ্রস্থ ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীদ্বয়ের স্নায়ুপ্রবাহ নিয়ন্ত্রিত করত বক্ষঃস্থলস্থ

অনাহত চক্রকে মনের ইচ্ছাধীন করিতে পারা যায়। ইহাতে দেহের শ্বা প্রশ্বাসক্রিয়া ও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া যোগীর আয়ত্তাধীন হইতে থাকে। প্রাণা মের সঙ্গে এক ২ চক্রের উপর মনের পূর্ণ ধ্যান চালান আবশ্যক। ধ্যান শ বুঝা উচিত, ধেয় বস্তুর উপর মনের ইচ্ছাশক্তি পূর্ণভাবে চালাইতে হইবে যাহাতে শেষোক্ত মনের আয়ত্বাধীন হইয়া পড়ে। এই প্রকারে হঠযো আসন, প্রাণায়াম ও ধ্যান করিতে ২ বহুদিন পরে ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রাণবায়ু প্রবে করাইতে সক্ষম হন। ইহাতে সুষুম্নার দ্বার উদ্ঘাটিত হয় এবং কুলকুণ্ডলি জাগরিত হইয়া মেরুমজ্জা দিয়া মস্তিষ্কের সহস্রদলপদ্মের সহিত মিলিত হই যায়; তখন মন সমগ্র সহানুভূতিক স্নায়ুপ্রবাহের উপর নিজ ইচ্ছাশ চালাইয়া দেহের অনৈচ্ছুক (Involuntary) ক্রিয়ার উপর নিজ প্রতা চালাইবে ও ইচ্ছামত দীর্ঘ জীবন লাভ করিবে। ইহাই হঠযোগে চরমোৎকর্ষ।

রাজযোগের অঙ্গ বা সোপান আট প্রকার, যথা—যম, নিয়ম, আস প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। যম শব্দে অহিংসা, সত্যবাদিতা অচৌর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ বুঝায় এবং নিয়ম শব্দে তপ, স্বাধ্যায়, সন্তোষ শৌচ ও ঈশ্বরারাধনা বুঝায়। যোগাভ্যাস করিবার পূর্ব্বে ইহাদিগকে বহুদি ধরিয়া অবলম্বন করত মনকে প্রস্তুত করিতে হইবে। সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় অহিংসাপর ও সদাচারী হইয়া কাম ক্রোধ লোভকে জয় করত সর্ব্বতোভাবে বিশুদ্ধ চরিত্র গঠন করিতে হইবে এবং ভগবানে মনপ্রাণ সমর্পণ পূর্ব্বক কায় মনোবাক্যে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে হইবে। তবে তুমি যোগসাধনের উপযুক্ত হইবে। মনে কোনরূপ কুটিলতা বা পাপচিন্তা থাকিলে যতই কেন তুমি মন্ত্র জপ ও প্রাণায়াম করনা, সকলই ব্যর্থ হইবে এবং সাধন পথে তুমি আদৌ অগ্রসর হইতে পারিবে না।

যোগাভ্যাস করিবার পূর্ব্বে উপযুক্ত আসনে এইরূপ ভাবে উপবেশন করিবে, যাহাতে বক্ষঃস্থল, গ্রীবা ও মস্তক সমভাবে রাখিয়া শরীরকে বহুক্ষ স্বচ্ছন্দভাবে রাখিতে পারা যায়। তৎপরে প্রাণায়াম বা শ্বাসপ্রশ্বাসের নিরোধ অভ্যাস করিবে এবং সেই সঙ্গে চক্ষুদ্বয় নিমীলিত করিয়া হৃৎপদ্মে কালিকা মূর্ত্তি বা রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া একাগ্রমনে উহার ধ্যান করিতে থাকিবে।

প্রাণায়ামের তিন অঙ্গ যথা—পূরক, কুম্ভক ও রেচক। যখন তুমি বক্ষঃ দেশ স্ফীত করিতে ২ বাহ্য জগতের বায়ু এক নাসারন্ধ্রে আকর্ষণ করিতে থাকিবে, তাহাই পূরক। যখন তুমি আকৃষ্ট বায়ুকে ভিতরে রাখিয়া বক্ষঃ দেশ স্ফীত করিয়া রাখিবে, তাহাই কুম্ভক। যখন তুমি বক্ষঃ দেশ সঙ্কুচিত করিয়া নিরুদ্ধ বায়ুকে অপর নাসারন্ধ্র দিয়া ছাড়িয়া দিবে, তাহাই রেচক।

প্রাণায়াম আবার তিনপ্রকার, উত্তম, মধ্যম ও অধম।

অধমে—১২ সেকেণ্ড পূরণ
মধ্যমে—২৪ " "
উত্তমে—৩৬ " "

রেচক কালে প্রশ্বাস বায়ু যত অল্প দূরে নিক্ষিপ্ত হইবে, তত প্রাণায়ামের উৎকর্ষ বুঝা যাইবে। সেইরূপ কুম্ভকের কাল ১ মিনিট হইতে ১০ মিনিট পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করিলে, ইহার উৎকর্ষ বুঝা যাইবে। শুনা গিয়াছে, কোন ২ যোগী ২০ মিনিট কাল পর্য্যন্ত শ্বাস বন্ধ করিয়া থাকিতে পারেন। জিহ্বার মূলদেশ কর্ত্তন করিয়া ইহাকে কণ্ঠদেশে উল্টাইয়া রাখিতে পারিলে, কণ্ঠনলীর মুখে যে এপিগ্লটিস পরদা আছে, উহাকে রুদ্ধ করিয়া ফেলে এবং শ্বাস বায়ু আদপে ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করিতে পারে না। ইহার নাম খেচরী মুদ্রা এবং যোগীরা সমাধির অবস্থায় এই মুদ্রা অনুষ্ঠান করত শ্বাসপ্রশ্বাসকে একেবারে সংযত করিয়া রাখেন। ইহাই প্রাণায়ামের চরমোৎকর্ষ।

প্রাণায়াম ও ধ্যান কালে ইন্দ্রিয়গণের প্রত্যাহার সাধন করিতে হয়। ধ্যেয় বস্তুতে মনকে প্রগাঢ়রূপ একাগ্র করিবার জন্য ইন্দ্রিয়গণের বৃত্তি রোধ করিতে হয়। এজন্য নয়নদ্বয় নিমীলিত করিয়া ধ্যান করা উচিত, যাহাতে বাহ্য জগতের কোনরূপ দৃশ্য মনকে আদৌ বিচলিত করিতে না পারে। অনেকে কর্ণমূলে তুলা দিয়া রাখে, পাছে বাহিরের কোনরূপ শব্দ ধ্যানকালে মনকে বিচলিত করে। সমাধির অবস্থায় যখন শ্বাসপ্রশ্বাস চলে না, ক্ষুৎপিপাসা থাকে না এবং ইন্দ্রিয়গণ অসাড় ও নিস্পন্দ হওয়ায় উহাদের কোনরূপ কার্য্য থাকে না, তখন যথার্থতঃ ইন্দ্রিয়গণ নাশ পায়; ইহাই প্রত্যাহারের চূড়ান্ত।

এইরূপে বহুদিন ধরিয়া প্রাণায়াম ও ধ্যান করিতে ২ যোগী সাধনপথে বহুদূর অগ্রসর হন। তৎকালে তাঁহার শরীর ও মনের বিলক্ষণ পরিবর্ত্তন ঘটে।

তিনি বিভিন্ন নাদ শ্রবণ করিতে থাকেন। যে ইউষ্টেকিয়ান্ নল মধ্যম কর্ণ হইতে কণ্ঠদেশে বিস্তৃত, যাহা বিকৃত হইলে লোকে নানাবিধ শব্দ কর্ণকুহরে শ্রবণ করে, সেই নল বায়ু দ্বারা স্ফীত হইয়া যোগীকে নানাবিধ শব্দ শ্রবণ করায়। তৎকালে সহানুভূতিক স্নায়ুমণ্ডলীর ক্রিয়াগুলি, যাহা সচরাচর অজ্ঞাত-সারে চলিতেছে, উহারা মনের ইচ্ছাধীন হয়। যে উদরের মণিপুর চক্র (Abdominal plexus) আমাদের ক্ষুৎপিপাসাদি দেহের প্রয়োজনানুসারে চালায়, সেই চক্রের স্নায়ুপ্রবাহ মন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়াতে যোগী ক্ষুধাতৃষ্ণাকে আপনার ইচ্ছামত চালান এবং অনেক দিন আহারাদি না করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারেন। রণজিৎসিংহের দরবারে যে যোগী দুইমাস প্রোথিত হইয়াও পুনরুজ্জীবিত হন, তিনি উপরোক্ত সত্য সপ্রমাণ করিয়াছেন। সেইরূপ বস্তিদেশের অপান বায়ু বা স্নায়ুপ্রবাহ নিয়ন্ত্রিত হইলে কুলকুণ্ডলিনী জাগরিত হইয়া নিজের ওজশক্তি মস্তিষ্কে প্রদান করতঃ মনকে নবশক্তিতে বিভূষিত করে এবং সহানুভূতিক স্নায়ুমণ্ডলীর উপর উহার আধিপত্য বিস্তার করে।

প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণবায়ু ভালরূপ নিয়ন্ত্রিত হইলে যোগীর দেহ লঘু হইতে লঘুতর হয়। এই প্রকারে তিনি শূন্যে উত্থিত হইতে পারেন, পদ্মাসন করিয়া জলের উপরিভাগে ভাসিতে পারেন, খড়ম পায়ে দিয়া নদনদী পার হইতে পারেন। এ সকল ক্রিয়া তোমার আমার পক্ষে অসম্ভব হইলেও পরম যোগীর পক্ষে সহজসাধ্য।

প্রাণায়াম ও ধ্যান বলে মন ক্রমশঃ একাগ্রতা লাভ করিতে থাকে। ইহাতে ইহার ইচ্ছাশক্তি সম্যক বৃদ্ধি পায়, অনেককে, এমন কি, হিংস্র শ্বাপদকেও বশীভূত করা যায়, অপরের মনের কথা বলিয়া দিবার ক্ষমতা জন্মে, বাক্‌সিদ্ধি লাভ হয়, যাহাকে যাহা বলেন তাহা হুবহু সত্য হয়; যাহাকে যাহা দেন, তাহাতে তাহার রোগ আরোগ্য লাভ করে।

যেমন কুণ্ডলিনীশক্তি জাগরিত করিয়া সহানুভূতিক স্নায়ুমণ্ডলীর উপর মনের আধিপত্য বিস্তার করত ইচ্ছামত দীর্ঘজীবন লাভ করা হট্‌যোগের প্রধান সিদ্ধিলাভ, তেমনি যুগধর্ম্মানুসারে যে পিনীয়াল গ্লাণ্ড নামক তৃতীয় জ্ঞাননেত্রের অপগমনে আত্মার স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক শক্তি ক্রমশঃ নষ্ট হইয়াছে, যোগবলে বাহ্য ইন্দ্রিয়গুলির ক্রিয়া নষ্ট হইলে সেই পিনীয়াল গ্লাণ্ডের ক্রমশঃ

স্ফূর্ত্তি হইতে থাকে এবং আত্মা ইহার স্বাভাবিক শক্তি পুনরায় প্রাপ্ত হয়। যে আত্মা এ সংসারে মন ও ইন্দ্রিয় দ্বারা সীমাবদ্ধ বা মায়াঠুলি পরিয়া অজ্ঞানে আচ্ছন্ন, ইহাদের নাশে বা লয়সাধনে উহার শক্তি পূর্ণভাবে বিকশিত হইতে থাকে। ইহাই যোগসাধনের মুখ্য উদ্দেশ্য।

সমাধি যোগের চরম অবস্থা। এ অবস্থায় পৌছিলে যোগী সাধনার পরাকাষ্ঠা লাভ করেন এবং জীবন্মুক্ত হন। যেমন সুষুপ্তির অবস্থায় মন প্রগাঢ় নিদ্রাভিভূত হওয়ায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়, সেইরূপ সমাধির অবস্থায় যোগী বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া থাকেন। ধ্যানস্তিমিত নেত্রে উপবিষ্ট বটে, কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট, নিস্পন্দ ও অসাড়; প্রহার কর, কর্ত্তন কর, কিছুই তিনি উপলব্ধি করিবেন না, অতিকষ্টে তাঁহাকে চেতন করিতে পারিবে। দেহের দশ ইন্দ্রিয় লোপ পায় এবং মনও সেইসঙ্গে মূলপ্রকৃতিতে লীন হইয়া যায়। ঐ সকল লয় পাওয়াতে অনন্তশক্তির আধার আত্মার অনন্তশক্তি স্ফুরিত হয় এবং যোগের অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি লব্ধ হয়। তৎকালে জীবাত্মা পরমাত্মায় মিলিত হইয়া পূর্ণ ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন থাকে। ইহলোকের মায়াজন্য সুখদুঃখ, জ্ঞানাজ্ঞান সকলই চিত্তাকাশে মিলিয়া যায়। এ অবস্থায় পৌছিলে তিনি নির্ব্বাণপদ প্রাপ্ত হন এবং জন্মমৃত্যুর ধার ধারেন না।

রে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম! ধন্য তোমার ব্যবস্থা! ধন্য তোমার উপদেশ! যোগসাধন শিক্ষা দিয়া তুমি সাধনার কিরূপ অলৌকিক পরাকাষ্ঠা শিক্ষা দিয়াছ! কোন দেশে কোন ধর্ম্ম কোন কালে সাধনার এমন পরাকাষ্ঠা শিক্ষা দিতে পারে নাই।

হিন্দুধর্ম্মের তপঃসাধন।

শাস্ত্রে সকলেই পাঠ করেন, পুরাকালে তপোবনে অসাধ্য সাধন হইত এবং সুদুর্লভ বস্তুও অনায়াসে লভ্য হইত। এখন তপস্যা কাহাকে বলে? শরীরকে বিধিমতে ও অশেষপ্রকারে ক্লিষ্ট করার নাম কৃচ্ছ্রব্রত বা তপস্যা। যেমন আজকাল অসাধ্য ব্যাধি হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য কেহ কেহ তারকেশ্বর প্রভৃতি নানা দেবমন্দিরে হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকে, সেইরূপ পুরাকালে তপস্বিগণ আত্মার আধ্যাত্মিক স্ফূর্ত্তির জন্য অধোমুখে ও ঊর্দ্ধপদে থাকিয়া দারুণ

গ্রীষ্মে চতুর্দ্দিকে প্রজ্বলিত অগ্নির মধ্যে ও দারুণশীতে জলাশয়ে আকণ্ঠ অবস্থিতি পূর্ব্বক পরব্রহ্মের ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন। শরীরকে এতদূর যন্ত্রণা ও ক্লেশ দিবার উদ্দেশ্য কি?

এস্থলে সুশিক্ষিত সম্প্রদায় বলিবেন, ধর্ম্ম মনের বিশ্বাসমাত্র, শরীরকে অযথা কষ্ট দিয়া জীর্ণ শীর্ণ করিলে কি প্রকারে ধর্ম্মসাধন হইবে? কেন মহাত্মা বুদ্ধদেব হিন্দু তপস্বীদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া তপস্যার এত অনাদর করিয়া গেলেন? ধর্ম্ম মানবের সুখের জন্য রচিত। এখন যদি সেই ধর্ম্ম নিজের ভ্রমবশতঃ শরীরকে অশেষ যন্ত্রণা দিতে বলে, কে উহার কথায় বিশ্বাস করিবে? অসহ্য গ্রীষ্মে কোথায় খসখসের টাট্টি বা ইলেকট্রিক ফ্যান, না কোথায় পঞ্চাগ্নির মধ্যে অবস্থিতি! দুরন্ত শীতে কোথায় কম্বললেপাদি ব্যবহার, না কোথায় আকণ্ঠ জলাশয় বাস! ওহে জ্ঞান-গরিষ্ঠ মহর্ষিগণ! কেন তোমরা ধর্ম্ম সাধনার জন্য এমন নিষ্ঠুর বিধান দিয়াছ, যাহা ভাবিলেও আমাদের এখন হৃৎকম্প উপস্থিত হইতেছে?

এস্থলে হিন্দুধর্ম্মের গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করা আবশ্যক। স্থূলের উপর সূক্ষ্মের প্রকৃত জয়লাভের জন্য, যুগধর্ম্মে বর্দ্ধিষ্ণু আধিভৌতিকতা সঙ্কুচিত করিয়া তৎপরিবর্ত্তে আধ্যাত্মিকতার পূর্ণ স্ফূর্ত্তির জন্য এ ধর্ম্ম এ সকল কঠোর বিধান দিয়াছে। স্থূলদেহকে অশেষ কষ্ট দিয়া জীর্ণ ও শীর্ণ না করিতে পারিলে স্থূলদেহনিবদ্ধ আত্মা কিরূপে স্ফূর্ত্তি পাইবে? স্থূলদেহের স্থূলত্ব ও জড়ত্ব নষ্ট হইলে অনন্ত শক্তির আধার আত্মার অনন্ত শক্তি প্রকাশ পায়। অতএব জানিবে, আত্মার প্রকৃত উৎকর্ষসাধনের জন্য তপস্যাদি লোমহর্ষণ ব্যাপার শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে।

হিন্দুধর্ম্মের মহৎ গুণ এই যে, যাহা আত্মা, মন, শরীর ও সমাজের অশেষ কল্যাণকর, সে বিষয়ে ইহা চূড়ান্ত উপদেশ দিয়া থাকে। অন্যান্য ধর্ম্ম ততদূর কল্পনাও করিতে পারে না। তাহার সাক্ষ্য দেখ, সতীত্বধর্ম্ম সমাজের অশেষ মঙ্গলদায়ক। সতীত্ব ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা শিক্ষা দিবার জন্য কোন্ ধর্ম্ম সতীদাহরূপ লোমহর্ষণ ব্যাপার উপদেশ দিতে পারে?

যাহা হউক, প্রাচীনকালের ঘোর তপস্যা এই অপকৃষ্ট কলিযুগের ধর্ম্ম নয়। এখন জনসাধারণ ক্ষীণবীর্য্য, অল্পায়ু, আয়াসপ্রিয় ও ভোগবিলাসী। তপস্যার

নামে উহারা শিহরিয়া উঠে। উহাদের জন্য এ-ধর্ম্ম এখন শারীরিক, মানসিক ও বাঙ্ময় তপ উপদেশ দেয় ও উপবাসাদি বিধিবদ্ধ করে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় উপদেশ দেন :—

দেবদ্বিজগুরু প্রাজ্ঞ পূজনং শৌচমার্জ্জবং
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসাচ শারীরং তপউচ্যতে।
অনুদ্বেগকরণং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চযৎ
সাধ্যায়াভ্যাসনং চৈব বাঙ্ময় তপউচ্যতে।
মনপ্রসাদঃ সৌমত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ
ভাবশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানস মুচ্যতে।

"দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু ও পণ্ডিতদিগের পূজা, বাহ্যাভ্যন্তরশুদ্ধি, সরলতা ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা, এ সকল এখন আমাদের শারীরিক তপ বলিয়া খ্যাত। সত্য, হিত ও প্রিয়কথা বলা মর্ম্মভেদী কথা না বলা ও পাঠাভ্যাস, ইহারা এখন আমাদের বাঙ্ময় তপ। মনের প্রসন্নতা, সকলকে সমভাবে দর্শন, মৌনাবলম্বন, ইন্দ্রিয়সংযম ও ভাবশুদ্ধি, ইহারা এখন আমাদের মানসিক তপ।" অতএব ধর্ম্মের আদেশানুসারে পূরাকালীন তপস্যার পরিবর্ত্তে গৃহস্থমার্গে থাকিয়া উপরোক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান কর, ইহাতেই তোমাদের পরম শ্রেয়োলাভ হইবে।

এখন আমাদের কালোচিত তপঃসাধন কি? কায়মনোবাক্যে তন্ মন ধনসে (শরীর, মন ও ধন দিয়া) যাহা করা যায়, তাহাই আমাদের মহৎ তপঃসাধন। শরীরের পতন কিম্বা মন্ত্রের সাধন এই ভাবিয়া স্কুলকলেজের ছাত্রগণ অশেষ বিদ্যায় বিশারদ হইবার জন্য যে প্রাণান্ত পরিশ্রম করিতেছে, তাহাই ছাত্রজীবনের ঘোর তপস্যা। এই বৈজ্ঞানিক যুগে যাহারা বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কারের জন্য প্রাণান্ত পরিশ্রম করিতেছেন, তাহাই তাঁহাদের কর্ম্মজীবনের ঘোর তপস্যা। যাহারা বিজাতীয় ভাষায় বাগ্মীবর হইয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়কে দেশের হিতানুষ্ঠানে প্রোৎসাহিত করিতেছেন, তাহাই তাঁহাদের ঘোর তপস্যা। স্বর্গাদপি গরীয়সী মাতৃভূমির মঙ্গলের জন্য যাহারা জেলে যাইতেছেন বা অম্লানবদনে রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেছেন, তাহাই তাহাদের মহৎ তপস্যা। এই কৃষিপ্রধান দেশে কৃষককুল রৌদ্রে পুড়িয়া বৃষ্টিতে ভিজিয়া চাসবাস করত যে দেশের লোককে খাওয়াইতেছে, তাহাই তাহাদের

সামান্য জীবনের একপ্রকার তপস্যা। এই দুর্মূল্য সময়ে কাচ্চা বাচ্চা প্রতি-পালনের জন্য দরিদ্র ও মধ্যবিত্তগণ যে প্রাণান্ত পরিশ্রম করিতেছে, তাহাই তাহাদের একপ্রকার তপস্যা।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

হিন্দুধর্ম্মের বিবিধ মার্গ।

এই অপকৃষ্ট কলিযুগে পতিত মানবের ধর্ম্মসাধনার জন্য সনাতন হিন্দুধর্ম্ম তিনটী মার্গ উপদেশ দেয়, যথা:—

(১) কর্ম্মমার্গ বা ক্রিয়াযোগ।

(২) জ্ঞানমার্গ বা জ্ঞানযোগ।

(৩) ভক্তিমার্গ বা ভক্তিযোগ।

বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ড ও তন্ত্রোক্ত বিবিধ অনুষ্ঠান লইয়া কর্ম্মমার্গ উপদিষ্ট হইয়া থাকে। বৈদিক ক্রিয়াকলাপ এখন ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, মধ্য ভারত, মধ্য প্রদেশ ও দাক্ষিণাত্যে প্রবল; আর তান্ত্রিক অনুষ্ঠান ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলে ও উত্তরাঞ্চলে প্রবল।

বৈদিক ক্রিয়াকলাপ অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতে চলিয়া আসিতেছে। বিবিধ যাগযজ্ঞ ও জীবনের বিবিধ সংস্কার অনৈতিহাসিক সময়ে আর্য্যসমাজে প্রথম উদ্ভূত হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে ইহারা চারি বা পঞ্চ সহস্র বৎসর হইল, ভারতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বোধ হয়, বৈদিক যুগে আর্য্য-সমাজের অশেষ জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে ইহারা কালবশে উত্থিত হইয়াছিল। যে সময়ে ইহারা প্রবর্ত্তিত হউক না, ইহা সুনিশ্চিত, যে অশেষপূজ্য ভীম-পরাক্রমশালী আর্য্যজাতি আর্য্যাবর্ত্তে নিজ জয়পতাকা উড্ডীয়মান করেন ও

সভ্যতাজ্যোতি বিকীর্ণ করেন এবং যাঁহাদের পবিত্র বিশুদ্ধ ও অবিমিশ্রিত শোণিত এখনও আমাদের শিরায় শিরায় বহমান, তাঁহারাই ভারতে বিবিধ যাগযজ্ঞ ও সংস্কার প্রবর্ত্তন করিয়া যান। আমরা যেমন তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র বংশে উদ্ভূত, আমরাও সেইরূপ তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত সংস্কারাদি ক্রিয়াকলাপ বিস্ফারিতহৃদয়ে এখনও অনুষ্ঠান করিয়া নিজ জীবন পবিত্র করিতেছি এবং যতদিন হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুজাতি ভারতে দেদীপ্যমান থাকিবে, ততদিন ঐসকল ক্রিয়াকলাপ সমভাবে অনুষ্ঠিত হইবে। অতীতের উপর এতদূর শ্রদ্ধা ও ভক্তি এজগতে এক হিন্দু ব্যতীত অপর কোন জাতি দেখাইতে পারে নাই। এ কারণ আমাদের হিন্দুধর্ম্ম জগতের সনাতন ধর্ম্ম।

পরে আর্য্যসমাজে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইবার পর মহৎ ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হইল। ইহাতে অহিংসা পরম ধর্ম্মের প্রবল বন্যায় অনেক বৈদিক যাগযজ্ঞ ভাসিয়া গেল! কিন্তু হিন্দুসমাজে কতকগুলি যাগযজ্ঞ পরিবর্ত্তিত হইয়া স্থায়ী হইল এবং জীবনের সংস্কারগুলি বৈদিক নিয়মানুসারে চলিতে লাগিল। বৌদ্ধধর্ম্মের অন্তিম দশায় যখন ভারতের একদিকে পৌরাণিক ধর্ম্ম ও অপর দিকে তান্ত্রিক ধর্ম্ম প্রবল হইতে থাকে, তখন বিবিধ পুরাণ ও তন্ত্র স্ব স্ব পূজ্য দেবতার মাহাত্ম্য ও পূজার্চ্চনাবিধি সম্যক স্ফুরণ করে। ইহাদের পূজার্চ্চনা লইয়া সমাজে যে সকল ক্রিয়াকলাপ ও অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা কর্ম্মমার্গের আধুনিক অংশ। এস্থলে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, প্রত্যেক অনুষ্ঠানের মূলপ্রকৃতি বজায় রাখিয়া সময়ের উপযোগিতানুসারে উহার কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে মাত্র।

হিন্দুধর্ম্মের জ্ঞানমার্গ বেদের জ্ঞানকাণ্ড হইতে গৃহীত। ইহাই সেই প্রাচীন কালের ব্রহ্মবিদ্যা বা অধ্যাত্মবিজ্ঞান। পুরাকালে যোগসিদ্ধ মহর্ষিগণের সমাধিস্থ আত্মায় ইহার জ্ঞান সম্যক প্রতিভাত হইত। কলিযুগবর্দ্ধনের সঙ্গে ব্রহ্মবিদ্যা সাধারণ সমাজে লুপ্ত হইয়া যায় এবং ইহার ভগ্নাবশেষ আজকাল বেদান্তে ও উপনিষদে দৃষ্ট হয়। দার্শনিক যুগে পণ্ডিতগণ বেদোক্ত অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের কিছু কিছু সত্যের আভাস পাইয়া জ্ঞানমার্গের পুষ্টিসাধন করিয়া যান। পরিশেষে পৌরাণিকগণ দর্শনশাস্ত্র হইতে জ্ঞানযোগ শিক্ষা করিয়া সাধারণ সমাজে প্রচার করেন। এই প্রকারে জ্ঞানমার্গ কলিকালে যতদূর

সম্ভব সময়ের উপযোগিতানুসারে প্রস্ফুরিত হইয়াছে। ধর্ম্মবিপ্লবহেতু কর্ম্ম-মার্গের যেরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, জ্ঞানমার্গের সেরূপ আদৌ ঘটে নাই। পৌরাণিক যুগে শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ইহার সম্যক পুষ্টিসাধন করিয়াছেন।

হিন্দুধর্ম্মের ভক্তিমার্গ সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক। ইহা পুরাণাদিগ্রন্থে সম্যক স্ফুরিত। ইহাতে এ ধর্ম্মের চরমোৎকর্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে। যে ধর্ম্মাত্মা হিন্দু যুগধর্ম্মে বাধ্য হইয়া যোগাভ্যাস ও তপশ্চরণ করিয়া নির্গুণ পরব্রহ্মের উপাসনা করিতে পারেন না, যিনি নিরাকারবাদী ও একেশ্বরবাদীর ন্যায় নিরাকার সগুণ ঈশ্বর ভজনা করিয়া মনে আদৌ তৃপ্তি বোধ করিতে পারেন না এবং মনের সাত্ত্বিক ভাবাবলি সম্যক স্ফুরণ করিতে পারেন না, তিনি সাকারবাদী ও বহ্বীশ্বরবাদী হইয়া ঈশ্বরের ভিন্ন ২ অবতারের মানবোচিত বিবিধ লীলা শ্রবণ করত ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া নিজ মনের যাবতীয় সাত্ত্বিক ভাবের সম্যক স্ফূর্ত্তি করিতে চেষ্টা পান। এই ভক্তিমার্গের অনুশীলন দ্বারা তাঁহার হৃদয়ের ভক্তি ও প্রেম উথলিয়া পড়িতেছে। এই মার্গ অনুসরণ করাতে তিনি অন্য ধর্ম্মাবলম্বী অপেক্ষা ধর্ম্মপথে অধিক অগ্রসর। বৌদ্ধ, খৃষ্ট ও মুসলমান, সকল ধর্ম্মই ইহার কাছে হার মানিয়াছে। পঞ্চদশ শতাব্দী ধরিয়া ইহার সম্যক্ পুষ্টি সাধন হইতেছে।

হিন্দুধর্ম্মের কি ভক্তিযোগ, কি জ্ঞানযোগ, কি কর্ম্মযোগ, ইহাদের প্রত্যেকটী ধর্ম্মসাধনার পরাকাষ্ঠা ও ধর্ম্মজগতে অতুলনীয়। পরাভক্তি, পরপ্রেম, পরমার্থ জ্ঞান ও নিখিল ধর্ম্মানুষ্ঠান, ইহাদের লইয়া এধর্ম্ম যেরূপ মহোচ্চ ও স্বর্গীয় ভাব দেখায়, এমন অন্য কোন ধর্ম্ম দেখাইতে পারে নাই। অন্যান্য ধর্ম্ম ইহাদের লইয়া একটা খিচুড়ি পাকায় মাত্র। পরাভক্তি ও পরমার্থজ্ঞান কাহাকে বলে, তাহা উহারা জানে না; ধর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্যে জানে, নিরাকার ঈশ্বরের মৌখিক উপাসনা মাত্র। ইহাতে উহাদের পরাভক্তি ও পরমার্থজ্ঞান ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। বেশ জানিবে, এই তিন মার্গের শ্রেষ্ঠত্ববশতঃ এই সোণার ভারত চিরদিন ধর্ম্মের পবিত্র ক্ষেত্র। বুদ্ধ বল, ঈশা বল, অনেকেই ভারতের সনাতন হিন্দুধর্ম্মের নিকট সুশিক্ষা পাইয়া যোগসিদ্ধ হন।

ধর্ম্মাত্মা হিন্দুর উচ্চাভিলাষ যেরূপ মহোচ্চ, তাঁহার সাধনবিধিও এ সংসারে সেইরূপ মহোচ্চ। যিনি অন্তে ভগবানের ন্যায় ষড়ৈশ্বর্য্যশালী হইতে চান, তাঁহার সাধনবিধিও তদনুরূপ; তজ্জন্য তিনি এ সংসারে অপার ভক্তি ও প্রেম-বলে ভক্তবৎসল হরির তন্ময়ত্ব লাভের প্রত্যাশী। যে হিন্দু অন্তে পূর্ণব্রহ্ম হইয়া নির্ব্বাণপদ লাভের অভিলাষী, তিনি এ সংসারে পরব্রহ্ম হইবার জন্য বা তাঁহার পরম ধামে যাইবার জন্য কেবল পরমার্থজ্ঞানের অন্বেষণে একান্ত তৎপর। যে হিন্দু যুগধর্ম্মে দেহের স্থূলত্বপরিবর্দ্ধন বশতঃ সূক্ষ্ম অধ্যাত্মজগৎ হইতে, দেবমণ্ডলী হইতে বহুদূরে পতিত, তিনি অশেষ সাধন বলে অধঃপতিত আত্মার আধ্যাত্মিক শক্তির সম্যক স্ফূর্ত্তি করিয়া পরম ধাম পাইবার জন্য সদা লালায়িত। বস্তুতঃ এ জগতে এক হিন্দু ব্যতীত অপর কোন ধর্ম্মের সেবক সাধনার এতদূর পরাকাষ্ঠা কল্পনা করিতে পারে নাই।

সাহঙ্কারে বলা উচিত, উপরোক্ত তিনটী শ্রেষ্ঠ সাধনবিধি উপদেশ দেওয়াতে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম এ জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও স্বর্গীয়। পক্ষপাতশূন্য হইয়া স্থিরচিত্তে একবার ভাব দেখি, উহাদের দ্বারা আমাদের কিরূপ উপকার সাধিত, মনের সাত্ত্বিকভাব কিরূপ স্ফুরিত, আত্মার আধ্যাত্মিকতা কিরূপ পরিবর্দ্ধিত, শরীরের স্বাস্থ্য কিরূপ বর্দ্ধিত এবং সমগ্র সমাজ ধর্ম্মবন্ধনে বদ্ধ হইয়া কিরূপ ধর্ম্মপথে অগ্রসর!

বৌদ্ধ, খৃষ্ট ও মুসলমান, সকল ধর্ম্মই স্বসেবকদিগকে ধর্ম্মপরায়ণ করিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করে ও নানা সদুপদেশ প্রদান করে। তাহার সাক্ষ্য, খৃষ্টধর্ম্ম স্বসমাজের ধর্ম্মোন্নতির জন্য খৃষ্টানদিগকে প্রত্যহ ঈশ্বরের আরাধনা করিতে বলে এবং সমাজবন্ধনের জন্য সপ্তম দিবসে রবিবাসরে সকলকে গির্জ্জায় একত্রিত করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করায় ও ধর্ম্মযাজক মুখে ধর্ম্মোপদেশ শুনায়। মুসলমানধর্ম্ম স্বসেবকদিগকে প্রত্যহ পাঁচবার ঈশ্বরের নামাজ পাঠ করিতে বলে ও সমাজবন্ধনের জন্য শুক্রবারে সকলকে মস্‌জিদে একত্রিত করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করায় ও বৎসরের মধ্যে ২ মহরমাদি উৎসব করায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, উহাদের সকল চেষ্টাই অনেক সময়ে ব্যর্থ হইয়া পড়ে। উহাদের ভিতর জনসাধারণ প্রকৃত ধর্ম্মপরায়ণ হয় না; তাহাদের মন যেন নরককুণ্ডস্বরূপ। ঐ সকল ধর্ম্মের প্রধান দোষ, মানবমনে যে সকল

সাত্বিক ভাবাবলি অনুক্ষণ উত্থিত হইতেছে, যাহারা আমাদের পরমানন্দের উৎস, তাহাদের অনুশীলনে উহাদের আদৌ দৃষ্টি নাই।

অপর পক্ষে তোমার শ্রেষ্ঠ সনাতন হিন্দুধর্ম্ম মনের একাগ্রতা লাভের জন্য সামান্য নিরাকারোপাসনার পরিবর্ত্তে গায়ত্রী ও ইষ্টমন্ত্র জপ ও প্রাণায়াম উপদেশ দেয় ও সমাজবন্ধনের জন্য মধ্যে মধ্যে দেবমন্দিরে দেবোৎসব করাইয়া সকলকে একত্রিত করে এবং উহাদের ধর্ম্মভাব বর্দ্ধিত করে। ইহার ক্রিয়াযোগ ও ভক্তিযোগের গুণে এ দেশের জনসাধারণ কত ধর্ম্মভীরু, ধর্ম্মপরায়ণ ও ভাব-প্রধান এবং সাধকগণও কেমন পরমানন্দে নৃত্য করিতে থাকেন!

এস্থলে একেশ্বরবাদী সুশিক্ষিত পাঠক বলিবেন, যে পৌত্তলিক ধর্ম্ম অসভ্যোচিত দেবদেবীর পূজা করে, সেই অপকৃষ্ট ধর্ম্মের কেন এরূপ অযথা প্রশংসা করিতেছ? দেখ, সভ্যদেশ মাত্রেই সুশিক্ষিত লোকেরা সপরিবারে গির্জ্জায় একত্রিত হইয়া কেমন আদবকায়দার সহিত, কেমন ভক্তিপূর্ব্বক ঈশ্বরের উপাসনা করেন, মেয়েরা কেমন মধুর বামাকণ্ঠে ঈশ্বরের স্তুতিগান করেন এবং উঁহারা সুশিক্ষিত পাদরিসাহেবের মুখে ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া কেমন আত্মোন্নতিসাধন করেন। আর এ দেশে কিনা একজন মূর্খ পূজারি ব্রাহ্মণ এক সামান্য প্রস্তরখণ্ডকে বা একটা সামান্য মাটীর পুতুলকে অবোধ্য মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক পূজা করে। এ ব্যক্তি সামান্য চাউল কলার লোভে, পেটের দায়ে পূজা করে। ঘণ্টা নাড়িয়া নমঃ নমঃ বলিলেই পূজা করা হয়। কোথায় বা উহার দেবভক্তি? কোথায় বা উহার শাস্ত্রজ্ঞান? উহাকে দেখিলে কাহার মনে ভক্তির উদ্রেক হইবে? আর ঐ যে আরক্তলোচন উন্মত্তপ্রায় জটাধারী পুরুষ নগরের উপকণ্ঠে বা দেবালয়ে ভস্মাবৃতদেহে গঞ্জিকা সেবন করিতেছেন, উনি বা কে জান? উনি হিন্দুধর্ম্মের একজন আদর্শপুরুষ। এই ভণ্ডতপস্বীকে, এই বকধার্ম্মিককে দেখিলে কি আমাদের শরীর আপাদ মস্তক জলিয়া উঠে না? তবে কেন নিজের বুদ্ধিভ্রংশ বশতঃ মুমূর্ষু পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মের এমন অযথা সুখ্যাতি করিতেছ?

এ ধর্ম্ম মুমূর্ষু হউক বা অধঃপতিত হউক, একবার ভাব দেখি, নিরাকার ঈশ্বরের উদ্দেশে কতকগুলি অসার বাক্যসমষ্টি উচ্চারণপূর্ব্বক জানু পাতিয়া মস্তক অবনত করিলেই কি তাঁহার প্রতি যথার্থ ভক্তি প্রদর্শন করা হইবে?

আর তাঁহার কোন সাকার মূর্ত্তিকে ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া উহার সমক্ষে গললগ্নীকৃতবাসে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলে তাঁহার প্রতি কি কোনরূপ ভক্তি দেখান হইবে না? যে ধর্ম্ম যে পদ্ধতি উৎকৃষ্ট মনে করে, সে ধর্ম্ম সেই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছে; ইহাতে হাসি বিদ্রূপের কোন কথা নাই। কিন্তু হিন্দু-ধর্ম্মের পদ্ধতি অধিক ভক্তিব্যঞ্জক, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

যদি ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ উপাসনার এক প্রধান উদ্দেশ্য হয়, সামান্য কথায় তাঁহার স্তুতি অপেক্ষা কতকগুলি উৎকৃষ্ট দ্রব্যের আয়োজন করিয়া কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তাঁহার শ্রীচরণকমলে নিবেদন করা কি শ্রেয়স্কর নয়? যে পূজার বাহ্যাড়ম্বর দর্শনে দেবভক্তি বা ঈশ্বরভক্তি শতধারে উথলিয়া পড়ে, সে পূজা কি সামান্য আরাধনা অপেক্ষা শ্রেয়স্কর নয়? এমন পূজাকে কি কুসংস্কার বলিয়া উড়াইতে হয়!

ওহে সুশিক্ষিত পাঠক! এখন তোমার মনের ধ্রুব বিশ্বাস যে গির্জ্জায় পাদরি সাহেবের মুখে বা সমাজে আচার্য্য মহাশয়ের মুখে ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিলে যথার্থ আত্মোন্নতি সাধন হইবে। কিন্তু বল দেখি, এদেশে ধর্ম্ম শিক্ষার জন্য যে সকল সদুপায় আছে, উহাদের সহিত উপরোক্ত ধর্ম্মোপদেশের কি তুলনা হইতে পারে? এরূপ উপদেশ লোকে যেমন এককর্ণ দিয়া শ্রবণ করে, এমনি উহা অপর কর্ণ দিয়া বহির্গত হইয়া যায়, মনের উপর উহার কোন স্থায়ী চিহ্ন থাকে না। অপর পক্ষে কথকঠাকুরের প্রমুখাৎ ভগবানের অমৃতময়ী অবতার লীলা শ্রবণ করিলে, নাট্যশালায় ও যাত্রাদলে অভিনীত দেবচরিত শ্রবণ করিলে এবং রামলীলা ও রাসলীলা দর্শন করিলে, হাসিতে হাসিতে ও কাঁদিতে কাঁদিতে মনের যেরূপ সুশিক্ষা হইবে, তাহা বর্ণনাতীত। ইহাদিগকে শুনিতে শুনিতে আমাদের মাধুর্য্যাদি রস শত সহস্র ধারে উথলিয়া পড়ে এবং আমরাও সেই প্রেমপীযুষ পান করিতে করিতে ধর্ম্মপথে অধিক অগ্রসর হই।

খৃষ্ট ও মুসলমান ধর্ম্ম যেরূপ ঈশ্বরের উপাসনাপদ্ধতি অবলম্বন করে, হিন্দু-ধর্ম্ম কেন সেরূপ পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করে নাই? যেধর্ম্ম নানাযোগেশ্বরপ্রকটিত, সে ধর্ম্ম ভালরূপ জানে, এরূপ উপাসনার তাদৃশ সুফল হয় না, মনের সাত্ত্বিক ভাবাবলির কিছুমাত্র স্ফূর্ত্তি হয় না। অনেকেই ত সংসারে বিপদে আপদে

পতিত হইয়া প্রাণভরে ঈশ্বরকে ডাকিতেছে। ইহাতে মনের যেরূপ সুশিক্ষা হয়, তাহা সামান্য উপাসনা অপেক্ষা অধিক প্রশস্ততর।

যে সত্য সনাতনধর্ম্ম যোগাভ্যাস ও তপস্যাকে ধর্ম্মসাধনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ বলিয়া চিরদিন উপদেশ দেয়, যে ধর্ম্ম যোগাভ্যাসের প্রথম সোপান রূপ প্রাণায়াম ভালরূপ উপদেশ দেয়, সে ধর্ম্ম কি নিরাকারোপাসকদিগের হৃদ্‌বরল অসার উপাসনাপদ্ধতিকে ঘৃণা চক্ষে দেখিবে না? সেজন্য কি বৈদিক যুগ, কি স্মার্ত্ত যুগ, কি পৌরাণিক যুগ, কোন সময়ে এ ধর্ম্ম ঐরূপ নিষ্ফল পদ্ধতি অবলম্বন করে নাই। যথার্থ বলিতে কি, ইহার কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগের সমক্ষে নিরাকারোপাসনা সর্ব্বথা অসার ও অকিঞ্চিৎকর।

সমদর্শী বৌদ্ধ, খৃষ্ট ও মুসলমান ধর্ম্ম স্ব স্ব সেবকদিগকে জাতিনির্ব্বিশেষে ও অবস্থানির্ব্বিশেষে সমান অধিকার দেয়। শাস্ত্রগ্রন্থপাঠে ও ঈশ্বরের আরাধনায় সকলের সমান অধিকার। এ স্থলে কেহ বলিবেন, যে হিন্দুধর্ম্ম পক্ষপাত দোষে দূষিত হইয়া স্বসেবকমণ্ডলীর ভিতর একমাত্র ব্রাহ্মণজাতির অধিকার ও সত্ব অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অধিক করে, সেই অপকৃষ্ট ধর্ম্মের কি কোনরূপ সুখ্যাতি করা উচিত? দেখ এ ধর্ম্ম ব্রাহ্মণ-জাতির পদগৌরব কত দূর বর্দ্ধন করিয়াছে? তাঁহারা এ সংসারে সাক্ষাৎ দেবতাস্বরূপ; তাঁহাদিগকে দেখিলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে হইবে এবং তাঁহাদের পদরজ মস্তকে ধারণ করিয়া আশীর্ব্বাদপ্রার্থী হইতে হইবে। যাবতীয় শাস্ত্রগ্রন্থে তাঁহাদেরই পূর্ণ অধিকার। স্বয়ং ভগবান শ্রীবিষ্ণু ব্রাহ্মণের পদচিহ্ন বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া কৃতার্থ হন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ব্রাহ্মণজাতির পাদপ্রক্ষালনে নিযুক্ত ছিলেন। ব্রহ্মশাপে রাজা পরীক্ষিত সর্পদংশনে নিহত হন, ত্রৈলক্যাধিপতি ইন্দ্র সহস্রাক্ষ হন ও যদুবংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

দেখ, হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণজাতির পদমর্য্যাদা কত অধিক। অন্য লোকের কথা ছাড়িয়া দেও, যিনি রাজাধিরাজ, তিনিও ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের ভয়ে সদা শশব্যস্ত, তাঁহার আশীর্ব্বাদ পাইবার জন্য সদা ব্যগ্র। রে পক্ষপাতী হিন্দুধর্ম্ম! তোমার এ কি অবিচার, এ কি অনাচার! কেন তুমি যোগ্যপাত্রে সম্মান প্রদর্শন করিতে শিখাও নাই? যে স্বার্থপর ব্রাহ্মণকে দেখিলে আমাদের আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠে, তাহাকে কেন তুমি এত পূজ্য করিলে?

এ বিষয়ে ধর্ম্মের গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করা আবশ্যক। মানবসমাজের গঠনপদ্ধতি যেরূপ, তাহাতে একদল শাসন করে এবং অপর দল শাসিত হয়। রাজ্যশাসনে যেরূপ, ধর্ম্মরাজ্যশাসনেও তদনুরূপ। যেমন দেশের অধিপতি ও তদীয় কর্ম্মচারিবর্গ জনসাধারণের শাসনসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় তত্ত্বাবধান করিয়া রাজ্যশাসন করেন, সেইরূপ ধর্ম্ম বিষয়ে একজন অধিপতি নিযুক্ত হন এবং তদীয় অধীনস্থ কর্ম্মচারিবর্গ জনসাধারণের ধর্ম্মবিষয়ে তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। মুসলমান জগতে খলিফার ও খৃষ্টজগতে পোপের ক্ষমতা এইরূপ।

কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম ধর্ম্মরাজ্য শাসনে একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতির প্রভুত্ব ও প্রাধান্য স্বীকার করে এবং কোন লোকবিশেষকে ধর্ম্মরাজ্যের অধীশ্বর নিযুক্ত না করিয়া উক্ত শ্রেষ্ঠ জাতির ভিতর একপ্রকার সাধারণতন্ত্র (Republio form) প্রতিষ্ঠিত করে। যে স্থলে সর্ব্বসাধারণের মতামত গ্রাহ্য হয়, তাহাই সাধারণ তন্ত্র। যখন এদেশে পুরোহিতবর্গ ও অধ্যাপকগণের মতামত সকল স্থলে ও সকল বিষয়ে গ্রাহ্য হয়, তখন তাঁহারাই ধর্ম্মবিষয়ক সাধারণতন্ত্রের কর্ম্ম-চারিবর্গ। যদি রাজ্যশাসনে রাজতন্ত্র অপেক্ষা সাধারণতন্ত্র শ্রেষ্ঠতর হয়, এ দেশের ধর্ম্মরাজ্যশাসনে ব্রাহ্মণজাতিপরিচালিত সাধারণতন্ত্রও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

যে হিন্দুধর্ম্ম সমাজের অশেষ মঙ্গলের জন্য প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে কুল-পরম্পরাগত জাতিভেদ প্রথা পূর্ণ মাত্রায় বজায় রাখিবার জন্য প্রত্যেক জাতির জাতীয় ব্যবসায় সম্যক নির্দ্ধারিত করে, সে ধর্ম্ম ইহার মঙ্গলের জন্যই একমাত্র ব্রাহ্মণজাতিকে ধর্ম্মবিষয়ে অন্যান্য জাতির অধিনায়ক নিযুক্ত করে। যে দেশে ক্ষত্রিয়জাতি রাজ্যশাসনে, রাজ্যরক্ষণে, রাজ্যবর্দ্ধনে ও যুদ্ধব্যবসায়ে সদা ব্যাপৃত এবং অপরাপর জাতি সমাজের বিবিধ অনাটন পূরণার্থ নানা কর্ম্মে সদা নিরত, সে দেশে সকল জাতিবর্গকে ধর্ম্মপথে চালাইবার জন্য এক শ্রেষ্ঠ শিক্ষিত জাতির আবশ্যক। সুতরাং হিন্দুধর্ম্ম এ বিষয়ে ব্রাহ্মণ জাতিকে অধিনায়ক করে, সমাজের মঙ্গলের জন্য এ জাতিকে ইহার শীর্ষস্থানে স্থাপিত করে এবং যথাযোগ্য মানসম্ভ্রমে সুশোভিত করে। কি শাসনতন্ত্র, কি ধর্ম্মতন্ত্র, সকল প্রকার তন্ত্র নিজ নিজ কর্ম্মচারিবর্গকে অন্যান্য লোকের নিকট অধিক পূজ্য ও সম্মানার্হ করে। তবে কেন হিন্দুধর্ম্মের দোষ দেও ?

যখন এ প্রথা এতকাল লোকপরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে, তখন ইহা

হিন্দুসমাজে সামাজিক নির্ব্বাচনে প্রতিষ্ঠিত এবং ব্রাহ্মণজাতির অধিনায়কত্ব একপ্রকার প্রকৃতিসিদ্ধ। অতএব স্থিরনিশ্চয় জানিবে, এ জাতিকে জ্ঞান ও ধর্ম্মবিষয়ে সমাজের অধিনায়ক করাতে ও তদুপযুক্ত মানসম্ভ্রমে বিভূষিত করাতে হিন্দুধর্ম্ম কোনরূপ পক্ষপাতদোষে দূষিত হয় নাই। তোমরাই নিজ শিক্ষা দোষে এখন ইহাকে পক্ষপাতী মনে কর।

যে ব্রাহ্মণজাতি আবহমানকাল হিন্দুসমাজের অধিনায়ক, তাঁহারা শমদমাদি ও উৎকৃষ্ট শিক্ষাপদ্ধতি অবলম্বন করিয়া আপনাদিগকে কিরূপ আদর্শপুরুষ করিতেন, প্রায়শ্চিত্তাদি বিধান দিয়া স্বসমাজকে কিরূপ সাত্ত্বিক ভাবে শাসন করিতেন এবং যে সকল অনুষ্ঠান সমাজের মঙ্গলদায়ক, তাহা পুণ্যভাবে করাইয়া ইহার কত মঙ্গল সাধন করিতেন। জ্ঞানধর্ম্মের অনুশীলন করিয়া তাঁহারাই ভারতকে সভ্যতাজ্যোতিতে উদ্ভাসিত করেন এবং ত্রিংশ শতাব্দী ব্যাপিয়া ইহা সগৌরবে রক্ষা করেন। আবার দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহাদের দোষে ভারত এখন এত অবনত, এত অধঃপতিত ও এতকাল পরাধীন! তাঁহারাও ক্রমশঃ অধঃপাতে যাইতে বসিয়াছেন।

যাগযজ্ঞ, পূজামহোৎসব, জীবনের বিবিধ সংস্কার প্রভৃতি যাবতীয় ধর্ম্মানুষ্ঠানে সকল জাতির সমান অধিকার। পুরোহিত মহাশয় এই সকল পুণ্যকর্ম্ম সম্পাদন করাইয়া আমাদের পুণ্যবর্দ্ধন করান এবং সমাজের মঙ্গল করেন। তৎপরিবর্ত্তে তিনি আমাদের নিকট যৎসামান্য দক্ষিণা পাইয়া নিজের ভরণ-পোষণ চালান। এখন যদি তোমরা নিজ নিজ পুরোহিত মহাশয়কে সামান্য দক্ষিণা দিতে নারাজ হও, উঁহাদের অস্তিত্ব অচিরে লুপ্ত হইবে এবং সেই সঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দুজাতির অস্তিত্ব জগতীতলে লুপ্ত হইবে।

কর্ম্মমার্গ।

অনেকে মনে করেন, হিন্দুধর্ম্মের কর্ম্মমার্গ দ্বারা প্রাচীন বৈদিক সময়ের যাগযজ্ঞ ও আধুনিক সময়ের দেবদেবীর পূজার্চ্চনা বুঝায়। বস্তুতঃ ইহার অর্থ এতদূর সঙ্কীর্ণ নহে। গৃহস্থমার্গে থাকিতে হইলে যে সকল ক্রিয়াকলাপ দ্বারা আত্মা, মন, শরীর, পরিবার ও সমাজের অশেষ মঙ্গল সাধিত হয়, সকলই ইহার অন্তর্গত। এমন কি, লোকযাত্রানির্ব্বাহের জন্য জনসাধারণ

যে-সকল বৃত্তি অবলম্বন করে, তাহাও ইহার অন্তর্গত। এক কথায়, ইহাতে জুতা সেলাই হইতে চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত বুঝায়। ইহার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ এই প্রকারে নির্দ্দেশ করা যায়, যথা :—

(১) যোগসাধন ও তপশ্চরণ	কর্ম্মমার্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ, গৃহস্থমার্গের অনুপযুক্ত।
(২) আধুনিক পূজাপদ্ধতি জপ প্রাণায়াম অঙ্গন্যাস প্রভৃতি	যোগের অপভ্রংশ, গৃহস্থ মার্গের উপযুক্ত।
(৩) উপবাসাদি ব্রত পালন	তপস্যার অপভ্রংশ, গৃহস্থের উপযুক্ত।
(৪) বৈদিক যাগযজ্ঞ। তান্ত্রিক ও পৌরাণিক দেবোৎসব। দ্বাদশ মাসের ত্রয়োদশ পর্ব্ব। বিবাহাদি দশবিধ জীবনের সংস্কার বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম	কর্ম্ম মার্গের অন্তর্গত সামাজিক ধর্ম্মের অঙ্গ। গৃহস্থের উপযুক্ত।
(৫) সমাজস্থ প্রত্যেক জাতির জাতীয় ব্যবসায়, যাহা পালন করিয়া সকলে শ্রেয়োলাভ করে।	সামাজিক ধর্ম্ম।

(বৈদিক যাগযজ্ঞ বৈদিকধর্ম্ম নামক প্রবন্ধে লিখিত হইবে এবং সামাজিক ধর্ম্মগুলি তৃতীয় ভাগে বর্ণিত হইবে)।

যোগসাধন ও তপশ্চর্য্যার গূঢ় উদ্দেশ্য পূর্ব্ব অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছি। যাঁহারা সংসারে একান্ত বিব্রত বা ন্যাতা জোবড়া, তাঁহারা উপরোক্ত অনুষ্ঠান-গুলি অবলম্বন করিতে পারিবেন না। তাঁহাদের মঙ্গলার্থে হিন্দুধর্ম্ম সকলকে জপ প্রাণায়াম ভালরূপ শিক্ষা দেয়। এ বিষয়ে ধর্ম্মের কি গূঢ় উদ্দেশ্য, তাহা বুঝা একান্ত আবশ্যক।

দেহ ধারণ করিয়া কেহ জাগ্রতাবস্থায় ক্ষণমাত্র কোনরূপ কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেন—

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ,
কার্য্যতেহবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বে প্রকৃতিজৈ গুণৈঃ।

(গীতা)

"এ সংসারে কেহ ক্ষণমাত্র কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। স্বভাবতঃ বা প্রকৃতিসম্ভূত ত্রিগুণের ক্রিয়াবশতঃ সকলে অবশ হইয়া অনুক্ষণ কাজ করিতে বাধ্য হইতেছে।" নিদ্রিত অবস্থা ব্যতীত সকলকে সকল সময়ে কাজ-কর্ম্ম করিতে হয়। কাজ-কর্ম্ম না থাকে নানারূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া কাল কাটাইতে হইবে। কু-চিন্তা হউক, সুচিন্তা হউক, অবকাশমত কোন না কোন রূপ চিন্তা করিতেই হইবে। কুচিন্তা করিলে পাপপথে মন স্বতঃ ধাবিত হইবে এবং সুচিন্তা করিলে ইহা ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইবে। ইহার জন্য বৈষ্ণব ধর্ম্ম জপমালা হস্তে দিয়া অবকাশ মত হরিনাম জপ করিতে বলে।

যে মন স্বভাবতঃ এত চঞ্চল, উহার স্থৈর্য্য কি প্রকারে সম্পাদিত হইতে পারে? যে কোন বিষয়ে ইহাকে সংযুক্ত করা যায়, তাহাতেই ইহার অল্পাধিক একাগ্রতা লব্ধ হয়। বিষয়ভেদে এরূপ মনঃযোগ ত্রিবিধ; যথা তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক।

(১) নির্দ্দোষ ক্রীড়া কৌতুক—তামসিক উপায়

(২) গৃহস্থের বিবিধ কর্ম্মানুষ্ঠান ও বিদ্যানুশীলন } রাজসিক উপায়

(৩) প্রাণায়াম।
(৪) মন্ত্রজপ।
(৫) ইন্দ্রিয়-সংযম।
(৬) ধ্যান বা ঈশ্বরচিন্তা।

} সাত্ত্বিক উপায়

মনের একাগ্রতা লাভের প্রকৃত অর্থ কি? যেমন একজন ছাত্র গ্রন্থবিশেষ স্বায়ত্ত করিবার সময় একমনে, এক ধ্যানে, প্রগাঢ় মনঃসংযোগ পূর্ব্বক উহাতে নিজ মন একাগ্র করিয়া উহার প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করে, সেইরূপ ধর্ম্মানুশীলনেও সংসারের যাবতীয় কর্ম্মের মধ্যে ব্রহ্মে একনিষ্ঠ বা ঈশ্বরে তদ্গতচিত্ত হওয়ার নাম মনের একাগ্রতালাভ। ঈশ্বরে একাগ্র হইবার প্রয়োজন কি? যেমন অনুক্ষণ সাধুসহবাসে থাকিলে মন সর্ব্ব প্রকারে সাধু ও পবিত্র হইতে থাকে, সেইরূপ যিনি সর্ব্ব পবিত্রতার মূলাধার, তাঁহার বিষয় অনুক্ষণ চিন্তা করিলে ইহাও সর্ব্বথা পবিত্র হইয়া থাকে। যে চঞ্চল চিত্ত অবকাশ মত নানা চিন্তায় রত হয়, উহাকে শ্রীহরির পাদপদ্মে স্থির রাখিয়া যদি তুমি তাঁহার নামে সংসারের যাবতীয় কার্য্য করিতে থাক, তুমি পাপচিন্তা হইতে দূরে থাকিবে, ধর্ম্মপথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইবে, বিশুদ্ধ ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিবে এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য করিয়া সংসারে ধন্য হইবে।

দুইটি দৃষ্টান্ত দিয়া এই বিষয়টী আরও বিশদভাবে বুঝাইতেছি। যেমন নর্ত্তকী মস্তকে বর্ত্তন রাখিয়া নাচিবার কালে নিজমন বর্ত্তনে সংলগ্ন রাখে, পাছে উহা পড়িয়া যায়, অথচ তদীয় হস্তপদ তালে তালে নাচিতে থাকে, সেইরূপ তুমিও সংসারের বিবিধ কাজকর্ম্ম লইয়া তালে তালে নাচিবে, কিন্তু তোমার মনটী সদা ঈশ্বরে সংলগ্ন রাখিবে। যেমন নবপ্রসূতা গাভী ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া মুখে ঘাস চিবাইতেছে, অথচ উহার মনটী বৎসের উপর পড়িয়া থাকে; সেইরূপ যাঁহারা ঈশ্বরে মন প্রাণ সমর্পণ পূর্ব্বক সংসারের বিবিধ কাজ করেন, তাঁহারা তাঁহার তন্ময়ত্ব লাভ করিয়া মনকে একাগ্র করিতে সক্ষম হন।

জপ প্রাণায়াম দ্বারা মনের একাগ্রতা ভালরূপ লব্ধ হয়। যে শ্বাসপ্রশ্বাস অনুক্ষণ মনের অজ্ঞাতসারে চলিতেছে, উহাকে প্রাণায়াম দ্বারা নিরোধ করিতে হইলে চঞ্চল মনকে ঐদিকে স্থির রাখিতে হইবে, তবে তুমি উহাকে মনের ইচ্ছানুসারে ক্রমশঃ সংযত করিতে শিখিবে। সেইরূপ গায়ত্রী, ইষ্টমন্ত্র ও বীজ-

মন্ত্র জপিবারকালে চঞ্চলমনকে ভালরূপ স্থির রাখিতে হইবে, তবে তুমি ভগবানের মন্ত্র জপ করিতে পারিবে। এইপ্রকারে অস্থির মনকে স্থির রাখিতে রাখিতে ইহার একাগ্রতা ক্রমশঃ লাভ করা যায়।

প্রাণায়ামদ্বারা শরীরের মহোপকার সাধিত হয়। যে প্রাণবায়ু শ্বাসযোগে ফুস্‌ফুসে অনুক্ষণ প্রবেশ করিতেছে, উহার সহিত জীবনীশক্তির সম্বন্ধ অতীব ঘনিষ্ঠ। প্রাণবায়ুকে ইচ্ছামত নিরুদ্ধ করিতে শিখিলে, দেহের জীবনীশক্তি নিয়ন্ত্রিত হয়; এজন্য প্রাণায়াম দ্বারা নিম্নলিখিত সুফল পাওয়া যায়—

(১) দীর্ঘায়ুলাভ।

(২) ফুস্‌ফুসের তেজবৃদ্ধি।

(৩) ইহার রোগপ্রবণতা দূরীকরণ।

(৪) দেহের অযথাক্ষয়নিবারণ।

ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, যে যোগাভ্যাস দ্বারা শরীর ও মনের স্থূলত্ব নাশ করিয়া আত্মার অনন্ত শক্তি স্ফুরণ করা যায়, যদ্দ্বারা অতীন্দ্রিয়দর্শনাদি শক্তি জন্মে, যদ্দ্বারা সমাধি অবস্থায় জীবাত্মায় ও পরমাত্মায় মিলন ঘটাইয়া প্রকৃত ব্রহ্মদর্শন করা যায়, তাহাই এ সংসারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনবিধি। ইহার সহিত তুলনা করিলে আধুনিক একেশ্বরবাদীদিগের নিরাকারোপাসনা নিতান্ত অসার ও অপদার্থ। এরূপ উপাসনায় ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উন্নতিসাধন হইতে পারে বটে, কিন্তু আত্মার আধ্যাত্মিক শক্তি বর্দ্ধিত হয় না। অতীন্দ্রিয়দর্শনাদি শক্তি আদৌ জন্মে না এবং মনের সাত্বিক ভাবাবলির কিছু মাত্র স্ফূর্ত্তি হয় না।

যে যোগাভ্যাস এ কলিকালে আয়াসপ্রিয় জনসাধারণ আদৌ অবলম্বন করিতে পারে না, তাহাদের মঙ্গলের জন্য হিন্দুধর্ম্ম যোগের প্রধান অঙ্গ জপপ্রাণায়াম ভালরূপ শিক্ষা দেয়। এখন বিচার করিয়া দেখা উচিত, আমাদের জপপ্রাণায়াম ও খৃষ্টাদি ধর্ম্মের ঈশ্বরের মৌখিক উপাসনা, ইহাদের মধ্যে কোন্ পদ্ধতি শ্রেষ্ঠতর? সত্য বটে, ধর্ম্মমাত্রেই পরমেষ্ঠীপদ প্রাপ্তির অভিলাষী হইয়া যে পদ্ধতিকে সহজ ও সুগম মনে করে, তাহাই অবলম্বন করে; কিন্তু হিন্দুধর্ম্মানুসৃত মার্গ অধিক ফলপ্রদ। যে জপপ্রাণায়াম রীতিমত আজীবন অনুষ্ঠিত হইলে মনকে একাগ্র করিয়া সিদ্ধির পথে, সাধনার পথে ক্রমশঃ অগ্রসর করা যায় এবং যদ্দ্বারা শরীরের আয়ুর্ব্বল বর্দ্ধিত হইতে থাকে,

তাহাই শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি। একারণ সনাতন হিন্দুধর্ম্ম আধুনিক সভ্যযুগের অসার নিরাকারোপাসনাকে চিরদিন ঘৃণাচক্ষে অবলোকন করিয়া সাধারণের মঙ্গলের জন্য ইষ্টমন্ত্র জপ ও প্রাণায়াম উত্তমরূপ শিক্ষা দেয়। ওহে সুশিক্ষিত পাঠক! এখন বুঝিয়া দেখ, তোমার হেয়, অপদার্থ পৌত্তলিক ধর্ম্মের জপপ্রাণায়াম খৃষ্ট ও মুসলমান ধর্ম্মের সামান্য মৌখিক উপাসনা অপেক্ষা কত উৎকৃষ্ট!

ইন্দ্রিয় সংযম দ্বারা মনের একাগ্রতা কি প্রকারে লাভ করা যায়? ইন্দ্রিয়গণ মনরূপ রথের বাহন; উহারা সুখের আশায় মনকে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে লইয়া যায় এবং অনেক সময়ে ক্ষিপ্ত অশ্বের ন্যায় ইহাকে কণ্টকাকীর্ণ পথে লইয়া গিয়া সারথিকে বিপন্ন করে। তুমি যদি কশাঘাত করিয়া উচ্ছৃঙ্খল অশ্বদিগকে নিজবশে রাখিতে পার, উহারা তোমার বশীভূত হইবে এবং কোনরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা দেখাইবে না। উদ্দাম ষড়রিপুর প্ররোচনায় তুমি যত অধিক ইন্দ্রিয়গণকে চালনা করিবে, তত তুমি মনকে ঈশ্বরে একাগ্র করিতে না পারিয়া পাপপথে ধাবিত হইবে। কিন্তু যদি ইন্দ্রিয়গণ নিজ ২ বিষয় ভোগে সংযত থাকে, তুমি ঈশ্বরে মন একাগ্র করিয়া ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইবে। এজন্য ধর্ম্মমাত্রেই উপদেশ দেয়, ইহাদিগকে কদাচ আস্কারা দিবে না; পরন্তু উহাদিগকে যথাসাধ্য বশে রাখিতে চেষ্টা পাইবে। এ সংসারে জিতেন্দ্রিয় না হইলে কেহ কখন ধার্ম্মিক হইতে পারেন না। অতএব যদি ভগবানে মনপ্রাণ সমর্পণ পূর্ব্বক একাগ্র হইতে চাও, অগ্রে ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত কর।

রীতিমত বা অবকাশমত ঈশ্বরের ধ্যানধারণা করিলে চঞ্চল মনকে সহজে একাগ্র করা যায়। কিন্তু নিরাকার ঈশ্বরে মনকে ভালরূপ ধারণ করিতে পারা যায় না। যখন তুমি নিরাকার ঈশ্বরের যথার্থরূপ ধ্যান করিতে যাও, তখন তুমি নিরাধার ও নিরবলম্বন হইয়া বায়ুবেগে কর্ণধারবিহীন নৌকার ন্যায় সদা বিঘূর্ণিত হও এবং হৃদয়াভ্যান্তরে কোন্ বস্তু ধারণ করিয়া ধ্যান করিবে বুঝিতে না পারিয়া অস্থিরচিত্ত হও; এজন্য সনাতন হিন্দুধর্ম্ম তোমার নয়নসমক্ষে হরির মোহন মূর্ত্তি বা মা কালীর ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করে, যাহাতে উহাদের তদ্গতচিত্তে ধ্যান করিতে ২ ভগবানে মন সহজে একাগ্র করিতে পারিবে। ইহার জন্য এ ধর্ম্ম সাকার মূর্ত্তি পূজন বিধিবদ্ধ করিয়াছে।

মনের একাগ্রতা লাভ হইলে আমাদের কোন্ ২ মহোপকার সাধিত হয়? যেমন বিদ্যানুশীলনে মন একাগ্র হইলে, মেধা ও বুদ্ধিশক্তি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং অন্তে জীবাত্মার সাথের সাথী হইয়া পরজন্মে ইহাকে প্রতিভাশালী করে; সেইরূপ ভগবানে যথার্থরূপ একাগ্র হইলে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি-গুলি সম্যক স্ফূর্ত্তি লাভ করে এবং অন্তে জীবাত্মার সাথের সাথী হইয়া পরজন্মে উহাকে আধ্যাত্মিক পথে, ধর্ম্মের পথে ও মুক্তির পথে অগ্রসর করায়। এখন বুঝিয়া দেখ, কেন হিন্দুধর্ম্ম জপপ্রাণায়াম শিখাইয়া মনকে ভগবানে একাগ্র করিতে চায়? এ কথা যদি মিথ্যা হয়, জগৎ মিথ্যা, ঈশ্বর মিথ্যা ও সকলই মিথ্যা।

আরও দেখ, মানবমন চিরদিন অভ্যাসের দাস। ইহাকে যে বিষয়ে অধিকদিন অভ্যস্ত করাইবে, তাহা ইহা আনন্দের সহিত, প্রীতির সহিত সম্পাদন করিবে। তোমার মন কাব্যগ্রন্থপাঠে অভ্যস্ত, কাব্যরসাস্বাদন ব্যতীত তোমার উদরান্ন জীর্ণ হইবে না। যে কর্ম্ম যত দুষ্কর, অভ্যাসবশতঃ সে কর্ম্ম তত সুকর হয়। এজন্য সকলে বলে, Habit is the second nature। সন্ধ্যা, আহ্নিক ও তর্পণ, যাহা ব্রাহ্মণ জাতির দৈনন্দিন কর্ম্ম বলিয়া উপদিষ্ট, ইষ্টমন্ত্রজপ ও জপমালা লইয়া হরিনাম জপ, এ সকল কর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য কি? বৃথা কালক্ষেপের জন্য ইহারা কি বৃথা উপদিষ্ট হইয়াছে? ইহারা কি স্বধর্ম্মের কুসংস্কার? যদি কুসংস্কার না হইবে, তবে কেন তোমরা আজ ঐ সকল ত্যাগ করিয়া ভগীরথের ন্যায় সপ্তপুরুষ উদ্ধার করিয়াছ বলিয়া এত আস্ফালন করিবে?

ওহে নবযুগের শিক্ষিত নব্যসম্প্রদায়! তোমরা কি একবার গায়ত্রী ও হরিনাম জপের মহৎ উদ্দেশ্য বুঝিতে চেষ্টা পাইবে? না উহাদিগকে ধর্ম্মের কুসংস্কার বলিয়া চিরদিন গোটেহেল করিবে? দেখ, এই অপকৃষ্ট কলিযুগে অল্পায়ু, ক্ষীণবীর্য্য, শিশ্নোদরপরায়ণ লোকে যোগাভ্যাসাদি ধর্ম্মের উচ্চ অঙ্গগুলি অবলম্বন করিতে পারে না। হিন্দুধর্ম্মও যুগধর্ম্মে বাধ্য হইয়া ঐ সকল শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রথম সোপান জপপ্রাণায়ামাদি উত্তমরূপ শিক্ষা দেয়।

এখন এই সকল নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াগুলি প্রগাঢ় ভক্তির সহিত আজী-বন বা বহুকাল ধরিয়া প্রত্যহ রীতিমত অনুষ্ঠিত হইলে, অভ্যাসবশতঃ মানবমন সাধনপথে কতদূর অগ্রসর হইবে, ইহার একাগ্রতা কতদূর লব্ধ হইবে, আত্মার কতদূর আধ্যাত্মিক স্ফূর্ত্তি হইবে, তাহা কি তোমরা একবার ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিবে? মনে কর, শাস্ত্রের কথা, আজীবন জপমালা লইয়া হরিনাম জপ করিলে অন্তিমকালে হরিনামবলে মোক্ষ লাভ হয়, মনে কর শাস্ত্রের এ কথা বৃথা স্তোকবাক্য মাত্র, তথাচ হরিনাম জপ করিলে, মন ক্রমশঃ একাগ্রতা লাভ করিবে ও অনন্ত সাধনপথে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবে, এ কথাও কি তোমাদের বিশ্বাসযোগ্য হয় না? যদি না হয়, তবে চিকিৎসাবিজ্ঞানের কথা মন দিয়া শ্রবণ কর।

চিকিৎসাবিজ্ঞান স্পষ্ট নির্দ্দেশ করে, শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়া রীতিমত সংযত হইলে, শরীরের অযথাক্ষয় নিবারিত হয়, আয়ুর্ব্বল বর্দ্ধিত হয় এবং অনেক সময়ে উৎকট রোগ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়! অতএব যে জপপ্রাণায়াম দ্বারা আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়া রীতিমত সংযত হইতেছে, তাহা আমাদের শারীরিক স্বাস্থ্যের পক্ষে মহোপকারী। এখন একবার ভাব দেখি, তোমার হেয় অপদার্থ পৌত্তলিক ধর্ম্ম তোমায় জপমালা ঠক্‌ঠকাইয়া হরিনাম জপ করিতে শিখায়, ইহাতে তুমি যে কেবল ভগবানকে ডাকিতেছ, তাহা নহে; কিন্তু সেই সঙ্গে তোমার শরীরের অশেষ উপকার সাধন হইতেছে। তবে বুঝিয়া দেখ, অসার নিরাকারোপাসনা অপেক্ষা আমাদের জপপ্রাণায়াম কত উৎকৃষ্ট!

যোগীগণ যে দীর্ঘজীবন লাভ করিতেন, তাহা এ বিষয়ে পূর্ণ সাক্ষ্য দিতেছে। যে সকল ক্রিয়াযোগ দ্বারা তাঁহারা অনায়াসে ২০০।২৫০ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতেন, সেই সকল অনুষ্ঠানের প্রথম সোপান অবলম্বন করিলে যদি তোমরা সোত্তর আশী বৎসর পর্য্যন্ত পরমায়ু লাভ করিতে পার, তাহাও কি তোমাদের পরমলাভ নহে? মনে কর, জপপ্রাণায়াম দ্বারা মনের একাগ্রতালাভ ধর্ম্মের একটা মহৎ ভ্রান্তি, এবং ভগবানকে ডাকাও সংসারে মিথ্যা, তথাচ যদি তোমরা এ সকল নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া দ্বারা কিঞ্চিৎ পরমায়ু বর্দ্ধন করিতে পার বা কোন উৎকট রোগ হইতে অব্যাহতি

পাও, তাহাও কি তোমাদের পরম লাভ নহে? তবে কেন তোমরা নিজ বুদ্ধির দোষে ঐ সকল পরমকল্যাণকর ক্রিয়াকলাপ ত্যাগ করিয়া দিনে দিনে অল্পায়ু হইতে চলিলে?

অন্যান্য উপায়ে শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়াকে রীতিমত সংযত করিলে শরীরের মহোপকার সাধিত হয়। ইহার জন্য বাল্যকালে আমরা শ্বাসরোধ করিয়া চুচুকাটি খেলি এবং যৌবনকালে ডন ফেলি, বৈঠক করি, মুগুর ও ডাম্বেল ভাঁজি। অনেকে জানে না, কেন শ্বাসরোধ করিয়া আমরা এ সকল ব্যায়াম করি? এরূপ করাতে বক্ষঃস্থল প্রসারিত হয় এবং ফুসফুসের কোনরূপ পীড়া হইতে পারে না। সমাজের মহৎ দোষ এই, যাহারা ছাত্রজীবনে এ সকল ব্যায়ামক্রিয়া অভ্যাস করে, তাহারা গৃহস্থমার্গে প্রবিষ্ট হইয়া সর্ব্বাগ্রে এ সকল ত্যাগ করিয়া বসে। ব্রাহ্মণজাতির সন্ধ্যা আহ্নিকের ন্যায় এ সকল আজীবন রীতিমত প্রত্যহ অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। লোকলজ্জাভয় হয়, গোপনে করিবে। ইহাদের সমক্ষে দুইক্রোশ প্রাতঃভ্রমণ বাটায় লাগে না। যদি এ সকল ব্যায়াম আজীবন করিতে থাক, তোমার মাংসল শরীরের বন্ধন ভালরূপ থাকিবে, তুমি নীরোগ শরীরে দীর্ঘজীবন লাভ করিবে এবং সোত্তর বৎসর বয়সেও তুমি যুবকের ন্যায় কার্য্যক্ষম ও বলিষ্ঠ থাকিবে। অতএব স্থিরনিশ্চয় জান, জপ-প্রাণায়াম দ্বারা শরীরের যে সকল সুফল পাওয়া যায়, শ্বাসরোধ করিয়া ডন ফেলিলেও ডাম্বেল ভাঁজিলে সেইরূপ সুফল পাইবে। যদি সুস্থ শরীরে বাহাল তবীয়াতে অশীতি বর্ষ পর্য্যন্ত বাঁচিতে চাও, তবে এ সকল সদনুষ্ঠান রীতিমত আজীবন অভ্যাস করিবে।

হিন্দুধর্ম্মের আদেশ, ভগবৎগীতার আদেশ, নিজ নিজ কর্ত্তব্যপালনে একাগ্র ও যত্নবান হও। ইহাই তোমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। ইহাই তোমার শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মমার্গ। সত্য বটে, শাস্ত্রানুসারে যাবতীয় ধর্ম্মানুষ্ঠান ও পুণ্যকর্ম্ম করিয়া নিজ জীবন বরীয়ান করিবে, কিন্তু নিজের কর্ত্তব্যপালনে কদাচ অবহেলা করিও না। মানবজন্ম গ্রহণ করাতে তুমি আত্মা, মন, শরীর, পরিবার ও সমাজ লইয়া যে সকল অবশ্যপ্রতিপাল্য কর্ত্তব্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে, উহাদের সম্যক প্রতিপালনই তোমার জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য। ঐ সকল কর্ত্তব্য বিধিবৎ পালন করিলে শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মমার্গ ভালরূপ অনুসরণ করা হয়। আর যদি তুমি কর্ত্তব্য

কর্ম্মে অবহেলা কর, সহস্র কেন তুমি ঈশ্বরের উপাসনা, নামাজ বা সন্ধ্যা আহ্নিক কর না, সকলই ব্যর্থ হইবে। তিনি তোমার উপর প্রসন্ন হইবেন না।

কুরুক্ষেত্র মহাসমরে যখন অর্জ্জুন জ্ঞাতিবর্গকে পুরোভাগে দর্শন করত বিষম সমস্যায় পতিত হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হন, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে মহৎ বাক্য উপদেশ দেন, তাহা স্মরণ করিয়া নিজ কর্ত্তব্যপালনে একান্ত অবহিত হওয়া উচিত। দেখ, কর্ত্তব্যপরায়ণ ইংরাজজাতি একমাত্র কর্ত্তব্য পালন করিতে করিতে এত মহোচ্চ পদবী প্রাপ্ত হইয়াছেন। সেই ইংরাজ এখন তোমাদের শিক্ষাগুরু। উহাদের কর্ত্তব্যপরায়ণতা পূর্ণাংশে অনুকরণ করিয়া কর্ত্তব্যপরায়ণ হইতে সাধ্যমত চেষ্টা পাইবে।

পরিশেষে বক্তব্য, দেশের মঙ্গলের জন্য যে মহৎ কার্য্যে ব্রতী হইবে, যথা-সর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি দিতে হয়, সেও স্বীকার, জেলে গিয়া অনশনে মরিতে হয়, সেও স্বীকার, প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হয়, সেও স্বীকার, তথাপি নিজের কর্ত্তব্য হইতে অণুমাত্র বিচলিত হইবে না। নিজ নিজ কর্ত্তব্যপালনই এ সংসারে সকল ধর্ম্মের সার।

জ্ঞানমার্গ।

জ্ঞানমার্গ দ্বারা হিন্দুধর্ম্ম আমাদিগকে পরমার্থজ্ঞান অনুশীলন করত জীবনের শ্রেয়োলাভ করিতে উপদেশ দেয়। সংসারে জ্ঞান দুইপ্রকার, পার্থিব ও পরমার্থ। পার্থিব জ্ঞান ইহসংসারের কাজে লাগে এবং মৃত্যুকালে লয় পায়। কিন্তু পরমার্থজ্ঞান জীবাত্মার চিরসহচর। ইহার তারতম্য বশতঃ জন্মে জন্মে উহার আধ্যাত্মিক শক্তির তারতম্য ঘটিয়া থাকে। জনসাধারণ পার্থিব জ্ঞানার্জ্জনে যেরূপ বিব্রত, পরমার্থজ্ঞানলাভে ততদূর মনোযোগী না হইলেও নিজ নিজ শাস্ত্রানুসারে ইহার কিঞ্চিৎ শিক্ষা করে। কেবল পরমহংস ও যোগীগণ এই পরমার্থ জ্ঞানলাভের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা পান।

যেমন শাস্ত্রোক্ত বিবিধ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা মনের একাগ্রতা লাভ করিয়া ব্রহ্মে একনিষ্ঠ হওয়া যায়; সেইরূপ পরব্রহ্মও বিশ্বসম্বন্ধে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বিবিধ

তত্ত্বজ্ঞানানুশীলন করিতে করিতে সংসারে প্রকৃত বৈরাগ্য জন্মে এবং ব্রহ্মে আরও অধিক একনিষ্ঠ হওয়া যায়।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেন :—

লোকেঽস্মিন দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরাপ্রোক্তা ময়ানঘ
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগীনাম্

হে অনঘ! আমি তোমায় পূর্ব্বে বলিয়াছি এসংসারে দুই প্রকারে শ্রেয়োলাভ করা যায়। জ্ঞানীব্যক্তিরা সাংখ্য যোগাদি অনুশীলন করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন, আর নৈষ্ঠিক গৃহস্থগণ কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। ইহাদের মধ্যে কর্ম্মযোগ অপেক্ষা জ্ঞানযোগ শ্রেষ্ঠতর।

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাদ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।

(গীতা)

"হে পরন্তপ! দ্রব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষা সংসারে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। পদার্থের আয়োজন করিয়া যে যজ্ঞ করা যায়, তাহা অপেক্ষা পরমার্থ জ্ঞানানুশীলনরূপ মহৎ যজ্ঞ শ্রেষ্ঠতর। ধর্ম্মনির্দ্দিষ্ট নিখিল কর্ম্মের চরমফল তত্ত্বজ্ঞানলাভ।"

এখন পরমার্থজ্ঞান কাহাকে বলে? যে জ্ঞান দ্বারা আত্মার যথার্থ শ্রেয়োলাভ হয়, যদ্দ্বারা ইহা পরমেষ্ঠীপদ প্রাপ্ত হয়, তাহাই এ সংসারে পরমার্থজ্ঞান। সত্য বটে, দেহনিবদ্ধ জীবাত্মা পঞ্চেন্দ্রিয়ের পঞ্চ ফাঁদে পতিত হইয়া সর্ব্বদা সীমাবদ্ধ, মায়াঠুলী পরিয়া ইহা এখন অজ্ঞানে আচ্ছন্ন, প্রকৃতি পদার্থনিচয় ইহাকে যেমন দেখায়, ইহা তেমনি দেখে, শুনে ও জানে, সেজন্য ইহা কোন বিষয়ের বাস্তবজ্ঞান জানে না এবং মায়াজনিত মিথ্যাজ্ঞান লইয়া সদা বিব্রত, তথাচ যে ব্রহ্মবিদ্যা বা অধ্যাত্মবিজ্ঞান পুরাকালে মহর্ষিগণ অনুশীলন করিতেন, যাহা কলিযুগবর্দ্ধনের সঙ্গে লোকসমাজে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, যাহার মহাসত্যগুলি সাংখ্য যোগ বেদান্ত প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রে বিক্ষিপ্ত আছে, সেই মহাবিদ্যার মহাসত্য পাইবার জন্য বিবিধ ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করিলে পরমার্থ জ্ঞান কিয়ৎ পরিমাণে লাভ করা যায়। আর যিনি সাধনবলে ও যোগবলে সমাধিস্থ হইয়া অতীন্দ্রিয়দর্শনাদি অলৌকিক ক্ষমতা প্রাপ্ত হন, তিনি ইহসংসারে প্রকৃত পরমার্থজ্ঞান লাভ করেন।

এ স্থলে জিজ্ঞাস্য, ব্রহ্মজ্ঞান শব্দের প্রকৃত অর্থ কি? অনেকে বলিবেন, গ্রন্থবিশেষ আয়ত্ত করা পরিশ্রমসাপেক্ষ ও কঠিন; কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান বা ঈশ্বর-বিষয়ক জ্ঞান অতি সহজ ও অনায়াসলভ্য। ইহা ত আমাদের নৈসর্গিক সংস্কার। আমরা ত সকলে বাল্যকাল হইতে শিক্ষা করি, ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা ও পালনকর্ত্তা, তিনি আমাদের সাধারণ পিতা, আমরা তাঁহার পুত্র স্বরূপ, তিনি জগতে সর্ব্বত্র বিদ্যমান, তিনি অন্তর্যামী এবং তিনি আমাদের সুখদুঃখের একমাত্র নিয়ন্তা। অজ্ঞানাচ্ছন্ন বলিয়া যদিও আমরা তাঁহাকে চর্ম্মচক্ষে দেখিতে পাই না; কিন্তু জ্ঞানচক্ষে আমরা তাঁহাকে বুঝিতেছি।

যথার্থ বলিতে কি ইহাকে ব্রহ্মজ্ঞান বলে না, ইহা ত ব্রহ্মজ্ঞানের অপভ্রংশ মাত্র। যে মায়াঠুলি ধারণ করিয়া অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হয়েছ, তাহা ভেদ করিয়া কস্মিন কালে ওঁতৎসৎ বুঝিতে পারিবে না। এজন্য সাধক শ্রেষ্ঠ মনোদুঃখে গান—" খুলে দে মা মায়াঠুলি, একবার দেখি তোর পাদ-পদ্ম "। তুমি কি জান না, এ মায়াময় জগতে, এ কলিকালে প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায় না? যদি একদিনে এক মুহূর্ত্তে এক জন্মে প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান লব্ধ হইল, তবে অনন্তকাল ব্যাপিয়া জীবাত্মা কোন্ জ্ঞানলাভ করিবে? যে ব্রহ্মজ্ঞান পাইয়া ইহা অন্তে নির্ব্বাণপদ পাইবে বা পূর্ণব্রহ্ম সনাতন হইবে, তাহা কি এত সহজে লাভ করা যায়?

বেদবেদান্ত পাঠ করিয়া কি পরব্রহ্মের পূর্ণজ্ঞান পাওয়া যায়? বিশ্ব ব্রহ্মময় বা ব্রহ্ম বিশ্বময় এ কথা জানাতে তুমি ব্রহ্মের কি জানিলে, বল? সেই নিত্য-নিরঞ্জন, সত্যসনাতন, পরাৎপর পরব্রহ্ম মায়াযোগে বর্দ্ধিত হইয়া এই বিশ্ব প্রপঞ্চে পরিণত, এ কথা জানাতে তুমি ব্রহ্মের কি জানিলে বল? তুমিও ব্রহ্ম আমিও ব্রহ্ম এবং সকলই ব্রহ্ম, এ কথা ভাবাতে তুমি ব্রহ্মের কি বুঝিলে, বল? মায়াময় অসম্পূর্ণ মানবমনের কতকগুলি অসম্পূর্ণ গুণাবলি নির্গুণ পরব্রহ্মে আরোপ করিয়া তাঁহাকে ঈশ্বরনাম প্রদান পূর্ব্বক সসীম ও সগুণ ভাবাতে তুমি নির্গুণ পরব্রহ্মের কি জানিলে, বল? তুমি কি বুঝিতে পার না, তোমার মায়াময় মনের প্রকৃত্যনুযায়ী নির্গুণ পরব্রহ্মের স্থলে সগুণ নিরাকার ঈশ্বর গঠিত করিয়া তুমি নিজ হৃদয়মন্দিরে স্থাপন কর মাত্র? আর যাহারা সাকার মূর্ত্তি পূজন করেন, তাঁহারাও অপরিজ্ঞেয় পরব্রহ্মের স্থলে নিজ স্থূল শরীরের

প্রকৃত্যনুযায়ী এক এক স্থূলমূর্ত্তি গঠিত করিয়া নিজ হৃদয়মন্দিরে স্থাপন করেন। তুমি যেমন করিয়া ভাব নাই কেন, যে দিক দিয়া ভাব না কেন, যে পন্থা অবলম্বন কর না কেন, ব্রহ্মসম্বন্ধে তুমি যে তিমিরে, চিরদিন সে তিমিরে থাকিবে। এজন্য প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা এ সংসারে চিরদিন অসাধ্য।

যে মাহাত্মা সংযমনিয়মাদি সাধনোপায় অবলম্বন পূর্ব্বক যোগাভ্যাস করিতে করিতে স্থূলদেহের স্থূলত্ব ও জড়দেহের জড়ত্ব নাশ করত সমাধিস্থ হন এবং চব্বিশ তত্ত্বের সহিত নিজ মনকে মূলপ্রকৃতিতে লীন করেন, তিনি স্বীয় জীবাত্মাকে পরমাত্মায় সংযুক্ত করিয়া প্রকৃত ব্রহ্মদর্শন করেন ও ব্রহ্মজ্ঞানের আভাস পান। এসংসারে তিনি প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী। যিনি মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের ন্যায় নিমীলিতাক্ষ হইয়া ঈশ্বরকে একপ্রাণে, একমনে ও এক ধ্যানে ডাকিতে ডাকিতে তন্ময়ত্ব লাভ করিয়া তাঁহাকে হৃদয়কন্দরে জ্যোতি-স্বরূপ দেখিতে পান, তিনি কালোচিত ব্রহ্মজ্ঞানী। সেইরূপ যিনি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ন্যায় মা কালীর ধ্যান করিতে করিতে তন্ময়ত্ব লাভ করিয়া তদীয় রূপ হৃদয়মন্দিরে প্রতিবিম্বিত দর্শন করেন, তিনিও কালোচিত ব্রহ্মজ্ঞানী।

পরমার্থজ্ঞান এ জগতে অনন্ত। কীটাণুকীট মানব এই নগণ্য মেদিনীর একটী মাত্র রহস্য বুঝিতে পারে না ; অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত রহস্য কতদিনে বুঝিবে, তাহা কে জানে ? যখন জীবাত্মা জন্মজন্মান্তর বাদ, কল্পকল্পান্তর বাদ ভিন্ন ভিন্ন লোকের মায়াজ্ঞান লাভ করিতে করিতে ক্রমোন্নত হইবে এবং অশেষ আধ্যাত্মিক শক্তির স্ফুরণ করিয়া ব্রহ্মাদি দেবতাদিগের ন্যায় পরম ধামে থাকিয়া পরমব্রহ্মের সন্নিকটস্থ হইবে, তখন ইহা প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবে।

স্থূলসূক্ষ্ম যাবতীয় জগৎ কি প্রকারে উদ্ভূত, কি প্রকারে ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক নিয়মাবলি দ্বারা উহারা পরিচালিত, উহাদের পরস্পর সম্বন্ধ ও সামঞ্জস্য কি প্রকার, উহাদের অধিবাসীগণ কি প্রকার, যে কর্ম্মফল দ্বারা তাহারা সকলে নিজ নিজ লোকে চালিত, তাহার নিয়মাবলি কি প্রকার, ইত্যাদি নানা রহস্য বুঝিতে পারিলে যথার্থ পরমার্থ জ্ঞান আত্মায় উদিত হয়। এই সকল পরমার্থজ্ঞানলাভে জীবাত্মার অনন্ত কাল ব্যতীত হইবে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেন :—

"নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহবিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি।

(গীতা)

"পরমার্থ জ্ঞানের সমান স্বর্গীয় ও পবিত্র জ্ঞান এ সংসারে আর কিছুই নাই। যিনি সাধনবলে যোগসিদ্ধ হন, তিনি বহুকালপরে নিজ আত্মায় এই জ্ঞান লাভ করেন।"

ইহ সংসারে প্রকৃত পরমার্থজ্ঞান লাভ করা যায় না বলিয়া যোগেশ্বর শ্রীহরি জ্ঞানানুশীলনের উপায় ও ফলকে পরমার্থজ্ঞান বলিয়া প্রশংসা করেন, যাহাতে কি গৃহস্থ, কি সাধু সন্ন্যাসী, সকলেই এই সকল উপায় অবলম্বন করিয়া পরমার্থ জ্ঞানলাভের পথে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইবে।

অমানিত্বমদাম্ভিকত্বমহিংসাচ ক্ষান্তিরার্জ্জবম্
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্য মনহঙ্কার এব চ
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধি দুঃখ দোষানুদর্শনং।
অনাসক্তি রনভিষঙ্গ পুত্রদারাগৃহাদিষু
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোৎপত্তিষু।
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী
বিবিক্ত দেশসেবিত্বমুরতি জনসংসদি।
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনং
এতজ্ জ্ঞানমিতি প্রোক্তংজ্ঞানং যদতো অন্যথা।

(গীতা)

"মানাপমান জ্ঞান রহিত ও দম্ভশূন্য, অহিংসাপরায়ণ, ক্ষমাশীল, সরলচিত্ত ও বাহ্যাভ্যন্তরশুদ্ধ হইবে; কায়মনোবাক্যে গুরুর সেবা করিবে; ইন্দ্রিয়গুলির বিষয়সমূহে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া উহাদিগকে যথাসাধ্য সংযত করিতে চেষ্টা পাইবে; জন্ম, মৃত্যু, জরা ব্যাধি ও বিবিধ ক্লেশে কোনরূপ দোষ দেখিবে না; স্ত্রীপুত্র গৃহাদিতে অনাসক্ত হইয়া ইষ্টানিষ্টে মনকে অবিচলিত রাখিবে; অচলা-ভক্তির সহিত ভগবানের আরাধনা করিবে; নির্জ্জনে থাকিয়া ঈশ্বরের ধ্যান

করিবে; সভায় যাইয়া নিজের বাক্ চপলতা দেখাইবে না; সদা যথাসম্ভব পরমার্থজ্ঞান লাভের চেষ্টা পাইবে এবং সকল বিষয়ে তত্ত্বদর্শী হইবে। এ সংসারে এ সকলই প্রকৃত জ্ঞান বা জ্ঞানলাভের উপায় স্বরূপ। এতদ্ব্যতীত আর যাহা কিছু আছে, সকলই অজ্ঞান বলিয়া জানিবে।"

শ্রীকৃষ্ণের মুখারবিন্দ হইতে যে সকল মহাসত্য নিঃসৃত হইয়াছে, উহাদের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝা আবশ্যক। যাহারা গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া উপরোক্ত সদনুষ্ঠানগুলি সর্ব্বান্তঃকরণে অবলম্বন করেন, তাঁহারা স্বজীবনে জ্ঞানমার্গের অনুসরণ ফল প্রাপ্ত হন।

হিন্দুধর্ম্মের জ্ঞানমার্গ ধর্ম্মসাধনার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি। যোগী, তপস্বী, মহর্ষি ও পরমহংসগণ এই জ্ঞানমার্গের সম্যক্ অনুশীলন করিয়া নিজ নিজ জীবন বরীয়ান ও মহীয়ান করেন। যোগবলে ও তপোবলে জীবাত্মায় পরমাত্মার আবির্ভাব হয়। সমাধির অবস্থায় যখন মনের সহিত ইন্দ্রিয়গণের লয় হয়, তখন আত্মা আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মের আনন্দময় রূপ দর্শন করিয়া পরমানন্দে নিমগ্ন হয়। তুমি আমি সামান্য ইন্দ্রিয়সুখে রত; আমরা সে ব্রহ্মানন্দ কল্পনা করিতে পারি না।

এ সংসারে এক হিন্দু ব্যতীত অপর কোন জাতি অশেষ জ্ঞানানুশীলন করিতে করিতে পরমার্থজ্ঞান লাভের এতদূর প্রত্যাসী হয় নাই। চাক্ষুষ জ্ঞান হউক, অতীন্দ্রিয় জ্ঞান হউক, পার্থিব জ্ঞান হউক, আধ্যাত্মিক জ্ঞান হউক, দার্শনিক জ্ঞান হউক, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান হউক, ধর্ম্মাত্মা হিন্দু সকল প্রকার জ্ঞানের মধ্যে একমাত্র পরব্রহ্মের বার্ত্তা লইতে চেষ্টা পান। দেখ, পাশ্চাত্য জগতে লোকে দুইপৃষ্ঠা বাইবেল পাঠ করিয়া ঈশ্বরতত্ত্ব জানিতে চেষ্টা পায়। কিন্তু ধর্ম্মাত্মা হিন্দু ইন্দ্রিয়লব্ধ চাক্ষুষ পার্থিব জ্ঞানের ভিতর পরব্রহ্মের প্রকৃত বার্ত্তা না পাইয়া যোগবলে অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের স্ফুরণ করিয়া পরমার্থ জ্ঞান পাইতে যত্নবান হন। ব্রহ্ম সম্বন্ধে তাঁহার অনুসন্ধিৎসা ও ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষা এত অধিক ও প্রবল বলিয়া হিন্দুসমাজে রাশি রাশি ধর্ম্মগ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে। এই সকল শাস্ত্র পাঠ করিতে করিতে তিনি ভগবানের প্রেমে গদগদ হইয়া তাঁহার বার্ত্তা লন। যথার্থ বলিতে কি, হিন্দুর ন্যায় ধর্ম্মপিপাসা এ জগতে কোন জাতির নাই।

জ্ঞানমার্গের সদনুষ্ঠানগুলি অবলম্বন করিলে মানব ইহসংসারে প্রকৃত দেবতা হন। তাঁহার হৃদয় অপূর্ব্ব শান্তির নিকেতন। তাঁহার জীবন সকল সময় আনন্দময়, প্রেমময় ও শান্তিময়। সংসারের কোনরূপ জ্বালাযন্ত্রণা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তাঁহার শরীর অপূর্ব্ব জ্যোতিতে পূর্ণ; প্রত্যেক লোমকূপ দিয়া সেই স্বর্গীয় জ্যোতির আভা বহির্গত হয়। যাঁহারা রামকৃষ্ণপরমহংসদেবকে দেখিয়াছেন, তাঁহারা এ কথার যথার্থতা বুঝিতে পারিবেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানমার্গের এইরূপ প্রশংসা করেন :—

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি, সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ।

(গীতা)

"যাহাতে সকলে নিদ্রা যায়, তাহাতে যোগী জাগ্রত থাকেন। যাহাতে সকলে জাগ্রত থাকে, তাহাতে তিনি নিদ্রা যান।" সকলে ক্ষণভঙ্গুর ধনসম্পদ ও পুত্রকলত্র লইয়া বিব্রত। পরমার্থ জ্ঞানের প্রতি আদৌ দৃষ্টি নাই। কিন্তু যিনি পরমযোগী, তিনি সদা পরব্রহ্ম লইয়া বিব্রত, সংসারের মিছে মায়ায় বদ্ধ নন। সকলে টাকা টাকা ও ছেলে ছেলে করিয়া মরে; কিন্তু তিনি হরি হরি করিয়া মরেন।

বহুকাল ধরিয়া জ্ঞানমার্গের অনুশীলন করিতে করিতে পরমার্থজ্ঞান ক্রমশঃ মনে উদিত হইবে এবং এইরূপে জন্মে জন্মে পরমার্থজ্ঞান লাভ করিতে করিতে প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানও আত্মায় প্রকাশিত হইবে।

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ
তেষামাদিত্যবৎ জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরং।

(গীতা)

"যাঁহাদের মায়াজন্য মিথ্যাজ্ঞান পরমার্থজ্ঞান দ্বারা দূরীভূত হয়, তাঁহাদের সেই জ্ঞান পরমাত্মাকে সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশিত করিয়া দেয়।" এখন জন্ম জন্মান্তরে কত সাধন বলে সেরূপ পরমার্থজ্ঞান জীবাত্মায় উদিত হইবে, তাহা কে বলিতে পারে?

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে,

(গীতা)।

"নানালোকে অনেক জন্ম ব্যতীত হইবার পর জীবাত্মা প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হয়।"

মনুষ্যানাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিৎ মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ।

(গীতা)

"হাজার হাজার লোকের মধ্যে কদাচিৎ কেহ প্রকৃত সিদ্ধিলাভের জন্য যত্নবান হন; আবার অসাধ্যসাধন করিতে করিতে যাঁহারা প্রকৃত সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন, তাঁহাদের মধ্যে কদাচিৎ কেহ আমার যথার্থ তত্ত্ব অবগত হন।" ইহাতে বুঝা উচিত, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা কিরূপ দুষ্কর। তবে কেন সম্প্রদায় বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানী বলিয়া বড়াই করে?

পরমার্থজ্ঞানের চরমফল মোক্ষলাভ। যখন জীবাত্মার সমস্ত কর্ম্মফল নাশ পাইবে, তখন ইহা মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইবে। এখন পরমার্থজ্ঞান আমাদের সমস্ত কর্ম্মফল নাশ করিয়া দিয়া থাকে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেন:—

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নি ভস্মাসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা।

(গীতা)

"যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি কাষ্ঠরাশিকে ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ পরমার্থজ্ঞানরূপ মহাগ্নি জীবাত্মার নিখিল কর্ম্মকে ভস্মসাৎ করিয়া দেয়।" প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলে জীবাত্মার সমস্ত কর্ম্মফল নষ্ট হইয়া যায়; তখন ইহাকে পুনরায় কোন লোকে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না এবং মোক্ষপদ পাইয়া ব্রহ্মাদি দেবগণের ন্যায় অনন্ত ঐশ্বর্য্যে বিভূষিত হইয়া ব্রহ্মলোকে অবস্থিতি করে। এখন কত জন্ম জন্মান্তরবাদ ও কিরূপ সাধনবলে জীবাত্মায় পরমার্থজ্ঞান উদিত হইবে, তাহা কে জানে?

এখন যে পরমার্থজ্ঞান ধর্ম্মজগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পূজিত ও আদৃত, যাহার আভাস পাইবার জন্য সনাতন হিন্দুধর্ম্ম নানা দুঃসাধ্য সাধনবিধির ব্যবস্থা করে,

তাহার উপর পাশ্চাত্য বিজ্ঞান উপহাস করিয়া ধর্ম্মান্ধকে বলে—"রে অবোধ! কেন তুমি অর্দ্ধোন্মত্ত বিকৃতমস্তিষ্ক ধর্ম্মধ্বজিগণের প্রলাপ বাক্যে কর্ণপাত কর? তুমি কি বুঝিতে পার না, সমাজের এই সকল অপোগণ্ডকগণ এতকাল নিজ বুদ্ধির দোষে কল্পনাবলে একটী অপরূপ জ্ঞানব্যূহ রচনা করিয়া আপনাদিগকে উহাতে জড়ীভূত করে? কেন তুমি উহাদের স্তোকবাক্যে বিশ্বাস করিয়া চাক্ষুষ জ্ঞান উপেক্ষা করত কতকগুলি কাল্পনিক জ্ঞানে বিভোর হও? কোথায় বা তোমার পরব্রহ্ম! কোথায় বা তোমার আত্মা! কোথায় বা তোমার আধ্যাত্মিক উন্নতি! ইহারা উদ্‌ভ্রান্ত ধর্ম্মের উদ্‌ভ্রান্ত প্রলাপ মাত্র। চক্ষু বুঁজিলে সবই অন্ধকার, তুমিও চিরদিনের জন্য লয় পাও। তবে কেন তুমি ঐ সকল ছাই ভস্ম শিখিতে এত ব্যস্ত? মৎপ্রদত্ত জ্ঞানজ্যোতির সমক্ষে লোকে এখনও ধর্ম্মের ঐ সকল বুজরুকিতে বিশ্বাস করে? কোমত, মিল, স্পেনসার, কাণ্ট ডারউইন, ফারেডে প্রভৃতি যে সকল মহাত্মাগণের প্রতিমূর্ত্তি আমার যশোমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত এবং যাঁহারা আজ জ্ঞানজগতে ষোড়শোপচারে পূজিত, তাঁহাদের উপদেশ শ্রবণ কর, তুমি ইহসংসারে প্রকৃত শ্রেয়োলাভ করিবে এবং জ্ঞানবলে পরমেষ্ঠীপদ পাইবে।"

বিজ্ঞানের ব্যঙ্গোক্তি শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মাত্মা হিন্দুর মনে কিরূপ ভাবোদয় হইয়া থাকে? যিনি কি পার্থিব জ্ঞান, কি আধ্যাত্মিক জ্ঞান, সর্ব্ববিধ জ্ঞান অনুশীলন করিতে করিতে একমাত্র পরব্রহ্মের বার্ত্তা লন, তিনি কি আজকালের সর্ব্বোচ্চ পার্থিব জ্ঞান উপেক্ষা করিবেন? তিনি বিবিধ বিজ্ঞানশাস্ত্র আলোচনা করিতে করিতে উহাদের ভিতর পরমার্থজ্ঞান লাভ করিতে সচেষ্ট হইবেন। যেস্থলে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বিজ্ঞানানুশীলন করিতে করিতে স্বধর্ম্মে বীতশ্রদ্ধ হইয়া নাস্তিকতার দিকে ধাবমান, সে স্থলে প্রাচ্য পণ্ডিতগণ জড়বিজ্ঞান অনুশীলন করিতে করিতে উহাকে অধ্যাত্মবিজ্ঞানের সুবিমল জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করিয়া সুপথে লইয়া যাইতে চেষ্টা পাইবেন। তাঁহারা বিজ্ঞান সাহায্যে প্রকৃতি পুস্তক তন্ন তন্ন করিয়া বুঝিতে বুঝিতে ব্রহ্মের অপার মহিমা কীর্ত্তন করিবেন ও ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইবেন। তাহার সাক্ষ্য দেখ না, যিনি শারীরস্থানবিদ্যা ভালরূপ অধ্যয়ন করেন, তিনি মানবদেহে ঈশ্বরের নির্ম্মাণকৌশল যতদূর বুঝিবেন, অপরে তাহার শতাংশের একাংশও বুঝিতে পারিবে না। সেইরূপ

প্রত্যেক বিজ্ঞানশাস্ত্র বিশ্বনিয়ন্তা বিশ্বেশ্বরের অপার মহিমা ও অপূর্ব্ব নিয়মতন্ত্র প্রচার করিতেছে।

ভক্তিমার্গ

ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি বৈদিকযুগে আর্য্যসমাজে হিন্দুধর্ম্মের কেবল কর্ম্মমার্গ ও জ্ঞানমার্গ প্রচলিত ছিল। পরে বৌদ্ধযুগের অন্তিম দশায় আধুনিক পৌরাণিক ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই পৌরাণিক যুগেই এ ধর্ম্মের ভক্তিমার্গ পূর্ণভাবে প্রকটিত হইয়াছে। রামানুজপ্রমুখ সংস্কারকবৃন্দ এই মার্গের সম্যক উন্নতিসাধন করিয়া যান এবং যাবতীয় পুরাণ,উপপুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্র এতৎ সম্বন্ধে ভালরূপ উপদেশ দিতেছে।

ভক্তিমার্গ দ্বারা হিন্দুধর্ম্ম গৃহাশ্রমী পারিবারিক মানবের মনের আকাঙ্ক্ষানুযায়ী ঈশ্বরকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে, পিতৃমাতৃ পতিপুত্রভাবে আরাধনা করিতে উপদেশ দেয়। এই প্রকার আরাধনা দ্বারা ইহা হৃদয়ের নানা সাত্ত্বিকভাবের সম্যক স্ফুরণ করিয়া স্বসেবকদিগকে জগতে ভাবপ্রধান করিতে চায়। ঈশ্বরকে বা পরব্রহ্মকে নানা ভাবে পুজিবার জন্য এ ধর্ম্ম তাঁহার নানারূপ দেখায় এবং তাঁহাকে ভক্তিভাবে ভালরূপ পুজিবার জন্য তাঁহার সাকার মূর্ত্তিপূজন বিধিবদ্ধ করে।

এই ভক্তিযোগ উপদেশ দেওয়াতে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম পার্থিব হইলেও এ সংসারে প্রকৃত স্বর্গীয় ধর্ম্ম, উৎকৃষ্ট হইলেও ইহা এখন সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। যে ধর্ম্ম যুগে যুগে সমুন্নত ভাব ধারণ করিয়া আসিতেছে, ইহাই সে ধর্ম্মের চূড়ান্ত সময়। ইহাই সে ধর্ম্মের কালোপযোগী সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধনবিধি। এমন সহজ, সুগম ও সিদ্ধিপ্রদ আরাধনাপদ্ধতি কোন কালে কোন্ ধর্ম্ম এ জগতে ভাবিতে পারে নাই।

পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সকল ধর্ম্ম পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ, বুঝিতে পারিবে, ভক্তিযোগের ন্যায় ধর্ম্মের এমন সুমনোহর দৃশ্য, এমন সহজ সাধনবিধি কোথাও তোমার নয়নপথে পতিত হইবে না। কলিকালের শিশ্নোদরপরায়ণ ও আয়াসপ্রিয় মানবকে অতি সহজে যথার্থ ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য ভক্তিযোগ যেমন সুকর, এমন আর কিছুই দেখা যায় না। এই অশেষ পাপতাপপূর্ণ সংসারে

তাঁহাকে পরমানন্দে উৎফুল্ল করিয়া প্রকৃত ধর্ম্মপথের পথিক করিবার জন্য এ মার্গ যেমন সুকর, এমন আর কিছুই দেখা যায় না। সংসারের অশেষ জ্বালাযন্ত্রণার মধ্যে মনের বিবিধ সাত্ত্বিক ভাবের সম্যক্ উৎকর্ষ সাধন করিয়া তাঁহাকে ভাব-প্রধান করত ভবপারাবারে সাহায্য করিবার জন্য এ মার্গ যেমন সুকর, এমন আর কিছুই দেখা যায় না। ভক্তিযোগই সাধনবিধির কালোচিত চরমোৎকর্ষ। ঈশ্বরের প্রতি পরাপ্রীতি ও পরাভক্তি শিক্ষা দিবার জন্য সাধারণের পক্ষে ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সুগম উপায়।

সত্য বটে, হিন্দুধর্ম্মের জ্ঞানমার্গ ধর্ম্মসাধনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিধি; কিন্তু দুঃখের বিষয়, জনসাধারণ ইহা দ্বারা কিছুমাত্র উপকার বোধ করে না। উহারা যতই কেন চেষ্টা করুক না, উহারা জ্ঞানমার্গ বা বেদান্তধর্ম্ম আদৌ বুঝিতে পারিবে না। উহাদের পক্ষে নির্গুণ পরব্রহ্মের বা নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা বিড়ম্বনা মাত্র। ইহাতে উহাদের মনে আদৌ তৃপ্তিবোধ হয় না। আবার জ্ঞানমার্গের আদেশ, সংসারের মায়া মমতা ত্যাগ করিয়া নিভৃতে যোগাভ্যাস ও তপশ্চরণ করিতে ২ ব্রহ্মোপাসনা করিবে। গৃহস্থ জনসাধারণ কি সেরূপ দুঃসাধ্য সাধন-বিধি অবলম্বন করিতে পারে? উহারা চিরদিন এরূপ কঠোর ব্রত হইতে দূরে আছে। উহাদের যথার্থ মঙ্গলের জন্য আধুনিক ভক্তিমার্গ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

এস্থলে জিজ্ঞাস্য, যে বৈদিক ধর্ম্ম কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ উপদেশ দেয় এবং যে পৌরাণিক ধর্ম্ম ভক্তিযোগ উপদেশ দেয়, উহাদের মধ্যে কোন্ ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ? আমাদের সুশিক্ষিত বান্ধবগণ বলিবেন, যে বেদান্তধর্ম্ম চিরদিন নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা উপদেশ দিতেছে, যাহাতে জঘন্য পৌত্তলিকতার নামগন্ধ নাই, তাহাই আধুনিক পৌরাণিক ধর্ম্ম অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ। তাঁহাদের মতে এই পৌরাণিক ধর্ম্ম বা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম সনাতন ধর্ম্মকে ছারে খারে লইয়া গিয়াছে এবং ভারতের এমন জাতীয় অধঃপতন ও দুর্দ্দিন আনয়ন করিয়াছে।

এখন এ বিষয়টী ভালরূপ বিচার করিয়া দেখা উচিত। দেখ, বেদের কর্ম্মকাণ্ড দ্বারা বা যাগযজ্ঞাদি কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম্মের সমাজবন্ধনরূপ মহদুদ্দেশ্য যেরূপ সংসিদ্ধ হয়, উহা দ্বারা মনের তাদৃশ উৎকর্ষ সাধন হয় না। যদি তুমি হোতা, অধ্বর্য্যু প্রভৃতি আহ্বান করিয়া বহু অর্থ ব্যয় করিয়া একটা মহৎ যজ্ঞ করাও, সত্য বটে. তাহাতে তুমি মহোৎসব করিয়া সমাজের অনেক

লোক অন্ন খাওয়াইবে, তোমার পুণ্যলাভ হইবে, এমন কি তোমার মনোবাঞ্ছাও পূর্ণ হইবে; কিন্তু ইহাতে তোমার মনের কি কোনরূপ উৎকর্ষ সাধন হইতে পারে? ইহাতে ইহার নৈতিক উন্নতি বা ধর্ম্মবিষয়ক উন্নতি ঘটিবে না, হৃদয়ের সাত্ত্বিক ভাবাবলির কোনরূপ উৎকর্ষ সাধন হইবে না।

আবার বেদের জ্ঞানকাণ্ড বা বেদান্তধর্ম্ম মহর্ষিগণ নিভৃতে বনজঙ্গলে অনুশীলন করিতেন। ইহাতে যোগাদি সাধনোপায় দ্বারা আত্মার আধ্যাত্মিক শক্তিবৃদ্ধি পাইত বটে, কিন্তু মনের সাত্ত্বিক ভাবাবলির কোনরূপ উৎকর্ষ সাধন হইত না। এজন্য বৈদিক যুগে বৈদিক ধর্ম্ম দ্বারা আর্য্যসমাজে মনের ধর্ম্ম-প্রবৃত্তিবিষয়ক বা নৈতিক উন্নতি ঘটে নাই এবং হৃদয়ের ভাবাবলিরও কোনরূপ উৎকর্ষসাধন হয় নাই। এই প্রকারে বৈদিক ধর্ম্ম কালক্রমে অবনত হইয়া পড়ে এবং জনসাধারণ যজ্ঞে বলিদিতে ২ হিংসাপরায়ণ ও অধার্ম্মিক হইতে থাকে।

পরে যখন মহাত্মা বুদ্ধদেব সকলের পক্ষে সামাজিক ও পারিবারিক ধর্ম্মপালন প্রকৃতমনুষ্যত্বপরিচায়ক বলিয়া দুন্দুভিস্বরে নীতিবিষয়ক ধর্ম্ম উপদেশ দেন, তখন সকলে তাঁহার মত সাদরে গ্রহণ করিয়া সাধারণ সমাজের নৈতিক উন্নতি সাধন করিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, হিন্দুসমাজের একমহৎ অনাটন দূরীভূত হইল না। বৌদ্ধধর্ম্ম দ্বারা লোকে ধর্ম্মনীতি শিক্ষা করিল, কারুণ্যাদিরসে আর্দ্র হইল বটে, কিন্তু মনের সাত্ত্বিক ভাবাবলির, ভক্তি প্রেমবাৎসল্যাদির কিছুমাত্র স্ফূর্ত্তি বা উন্নতি হইল না। ইহার অন্তিমদশায় আধুনিক পৌরাণিক ধর্ম্ম হিন্দুসমাজে প্রচারিত হয়। এধর্ম্ম ভক্তিযোগ শিক্ষা দিয়া সাধারণ সমাজের ভক্তি, প্রেম প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাবাবলির সম্যক স্ফূর্ত্তি করে, সমাজের চিরন্তন অভাব দূরীভূত করে এবং বৌদ্ধধর্ম্মকে পরাস্ত করিয়া দেয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্যাসনারদসংবাদে সকলেই পাঠ করেন, মহর্ষি ব্যাসদেব বেদবেদান্ত, মহাভারত ও আদি পুরাণ রচনা করিয়া কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, ধর্ম্মের চতুর্ব্বর্গফল প্রভৃতি নানা বিষয় বর্ণন করিয়াও মনে কিছুমাত্র তৃপ্তি বোধ করেন নাই। এতদূর ধর্ম্ম বর্ণন করিয়াও তাঁহার মন অকৃতার্থ ছিল। পরে দেবর্ষি নারদের উপদেশানুসারে আধুনিক পৌরাণিক ভক্তিযোগ

উপদেশ দেওয়াতে তাঁহার মন কৃতার্থ হয় এবং তিনিও আপনাকে ধন্য মনে করেন। শাস্ত্রের এ কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? ইহাতে আমাদের বুঝা উচিত, পুরাকালের বৈদিক ধর্ম্ম আদৌ এ কালের উপযুক্ত নয়, পৌরাণিক ধর্ম্ম আজ কালের উপযুক্ত ধর্ম্ম এবং বৈদিক ধর্ম্ম অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। ইহাতে মনের আকাঙ্ক্ষানুযায়ী সকলের ধর্ম্মপিপাসা সম্যক চরিতার্থ হইতেছে এবং সহজে ধর্ম্মোন্নতি সাধন হইতেছে।

পাশ্চাত্য গুরুগৃহে সুশিক্ষা পাইয়া তুমি যতই কেন বেদান্তধর্ম্মের সুখ্যাতি কর না, তোমার একটী কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। যখন ইতিহাস ভালরূপ সাক্ষ্য দিতেছে, বৌদ্ধধর্ম্ম বৈদিক ধর্ম্মকে পরাস্ত করে এবং পৌরাণিক ধর্ম্ম আবার বৌদ্ধধর্ম্মকে ভারতে সমূলে নাশ করে, তখন পৌরাণিক ধর্ম্ম যে বৈদিক ধর্ম্ম অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ ও কালোচিত, সে বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ করা উচিত নয়। যে পৌরাণিক ধর্ম্মকে প্রবলপ্রতাপান্বিত মুসলমান ধর্ম্ম পঞ্চশতাব্দীতে তরবারি বলে নাশ করিতে পারে নাই, সে কি একটা সামান্য ধর্ম্ম? যে ধর্ম্ম প্রেমভক্তির পূর্ণ আদর্শ দেখাইয়া ঈশ্বরকে পিতৃ মাতৃ ভাবে, পতিপুত্র ভাবে ডাকিতে ও অর্চ্চনা করিতে শিখায়, এবং মনের ভক্তি প্রেম প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাবের পূর্ণ স্ফূর্ত্তি করিতে চেষ্টা পায়, সে কি একটা সামান্য ধর্ম্ম?

বল দেখি, জগতের কোন ধর্ম্ম ঈশ্বরকে বা তদীয় আদ্যাশক্তি মহামায়াকে মা! মা! বলিয়া ডাকিতে শিখায় এবং ঈশ্বরের নামে আমাদের মাতৃভক্তি সহস্রধারে উথলিয়া দেয়? কোন্ ধর্ম্ম তাঁহাকে পতিভাবে পূজিয়া হৃদয়ে প্রেমরসের অপূর্ব্ব ফোয়ারা ছুটায়? যদি সংসারের অশেষ শোকতাপের মধ্যে মানবকে যথার্থ সুখে সুখী করা ধর্ম্মমাত্রেরই মহৎ উদ্দেশ্য হয়, এদেশের পৌরাণিক ধর্ম্ম মনের সাত্ত্বিক ভাবের সম্যক স্ফূর্ত্তি করিয়া তাঁহাকে পরমানন্দে উৎফুল্ল করত যেরূপ যথার্থ সুখে সুখী করে, অন্য কোন ধর্ম্ম ততদূর করিতে পারে না। জগতের কোন ধর্ম্ম এ মহোচ্চভাব, এ স্বর্গীয় ভাব আদৌ বুঝিতে পারে নাই, কেহ এ দিক দিয়া যায় নাই। সেজন্য বলা উচিত, পৌরাণিক ধর্ম্ম জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

এস্থলে একেশ্বরবাদিগণ নিজ ২ নাসিকা সঙ্কুচিত করিয়া বলিলেন, কেন জঘন্য পৌত্তলিক ধর্ম্মের এমন অযথা প্রশংসাবাদ করিতেছ? যে ধর্ম্মের

পূজাপদ্ধতি, আচারব্যবহার সকলই ন্যক্কারজনক, সে ধর্ম্মের অযথা প্রশংসাবাদ করিয়া কেন লেখনী অপবিত্র করিতেছ? তাঁহাদের ভ্রান্তি দূর করিবার জন্য পৌরাণিক ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম আরও বিশদরূপে উদ্ঘাটন করা আবশ্যক।

দেখ, যে মায়াতীত ও গুণাতীত পরব্রহ্ম সৃষ্টিস্থিতি সংহারের মূলাধার, তিনি মায়াময় মানবমনের কদাচ ভাব্য নন; তিনি কদাচ আমাদের আয়ত্ত হইতে পারেন না এবং তাঁহার প্রতি কোনরূপ ভক্তি দেখান যায় না। তৎপরিবর্ত্তে সগুণ নিরাকার ঈশ্বরে মনের অসম্পূর্ণ গুণরাশি আরোপ করিয়া তাঁহার গুণানুবাদ ও গুণকীর্ত্তন করিলেও আমরা প্রকৃত তৃপ্তি বোধ করি না। তুমি যদি তোমার ঈশ্বরকে সর্ব্বশক্তিমান, দয়াময় ও সর্ব্বমঙ্গলময় বলিয়া ভাব, তাহাতে কি তোমার মন সম্যক চরিতার্থ হইবে? জনসাধারণ কি তাঁহাকে ঐরূপ ভাবে ভাবিয়া নিজ নিজ মনের উৎকর্ষ সাধন করিতে পারিবে?

খৃষ্ট, মুসলমান ও বৌদ্ধধর্ম্ম কেন ঈশা, মহম্মদ ও বুদ্ধদেবের লোকাতিগ গুণরাশি বর্ণন করে এবং রোমান কাথলিক ও গ্রীক চার্চ্চ সম্প্রদায় কেন ঈশা ও মেরীর প্রতিমূর্ত্তি ও আলেখ্য সকলের সম্মুখে ধারণ করে? যদি উহারা কেবল নিরাকার ভজনা করিয়া মনে যথার্থ তৃপ্তি বোধ করিত, সাকারদিকে উহাদের মন কি এত স্বল্পপরিমাণে ধাবিত হইত? এস্থলে সাকারবাদী হিন্দু ধর্ম্মের কি অপরাধ? এ ধর্ম্ম উহাদের অপেক্ষা আরও একপদ অগ্রসর হইয়া আমাদের প্রকৃত মঙ্গলের জন্য নির্গুণ পরব্রহ্মের কয়েকটী স্থূল মায়ারূপ দেখায় এবং তাঁহাদের অনন্ত লীলা ও গুণরাশি বর্ণন করিয়া তাঁহাকে আমাদের অসম্পূর্ণ মনের সম্যক আয়ত্ত করিতে চেষ্টা পায়। মনের প্রকৃত শিক্ষার জন্য ব্রহ্মকে যে ভাবে ভাবিবে বা যাহা বলিয়া ডাকিবে, তাহাতেই আমাদের অশেষ মঙ্গল।

ব্রহ্মাবিষ্ণু মহেশ্বর, রামকৃষ্ণ ও দুর্গাকালী সকলই আমাদের নিকট সেই পরাৎপর নির্গুণ পরব্রহ্মের সগুণ মায়ারূপ মাত্র। তাঁহার প্রতি মনের যথার্থ ভক্তি দেখাইবার জন্য ঐ সকল স্থূল মায়ারূপ মায়ামুগ্ধ মানবকে দেখান হয়, যাহাতে তিনি ঐ সকল স্থূলরূপের ভাবনা করিয়া পরব্রহ্মের কিঞ্চিৎ আভাসমাত্র পাইতে পারেন। যোগেশ্বরগণ সমাধির অবস্থায় দিব্যচক্ষে যে সকল দেবমূর্ত্তি দেখিয়াছেন, তাহাই শাস্ত্র বর্ণন করিতেছে। উহারা কদাচ কল্পনা-প্রসূত নহে।

সমাজে পরিজনবর্গ লইয়া চিরদিন বসবাস করাতে হৃদয়ে যে সকল সাত্ত্বিক ভাব উত্থিত হইতেছে, উহাদের অনুশীলন ও স্ফুরণ একান্ত কর্ত্তব্য। গৃহস্থাশ্রমে থাকিতে হইলে ইহাদের স্ফুরণ একান্ত আবশ্যক; কারণ ইহারা সম্যক স্ফুরিত হইলে আমরা পুত্রকলত্রাদি লইয়া সদা সুখসলিলে ভাসিতে থাকি এবং প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করি।

ধর্ম্মবিজ্ঞান বলে, মানবমনের উৎকর্ষসাধনের জন্য ঈশ্বর আমাদের পূর্ণ আদর্শস্বরূপ। আমরা যেমন দয়াদাক্ষিণ্যাদি ধর্ম্মপ্রবৃত্তিগুলির উন্নতিসাধনের জন্য ঈশ্বরকে পূর্ণ আদর্শ জ্ঞান করি, সেইরূপ মনের সাত্ত্বিক ভাবের সম্যক স্ফূর্ত্তির জন্য তাঁহাকেই পূর্ণ আদর্শ জ্ঞান করা উচিত। ইহার জন্য হিন্দুধর্ম্ম নিজপুরাণে পরব্রহ্মের পূর্ণ অবতার শ্রীকৃষ্ণকে দেখায় এবং তাঁহার অনন্ত লীলা বর্ণন করিয়া সকলের মনে সাত্ত্বিক ভাব স্ফুরণ করিতে সাধ্যমত চেষ্টা পায়। এই সকল সাত্ত্বিক ভাবের মধ্যে ভক্তি ও প্রেম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণে ভক্তিযোগ ও প্রেমযোগ সম্যক বর্ণিত হইয়াছে।

শাস্ত্রোল্লিখিত অবতারদিগের অলৌকিক লীলা শ্রবণ, পঠন ও মনন করিয়া আমরা যেরূপ অপার ভক্তিরসে আপ্লুত হই এবং সেই সঙ্গে হৃদয়স্থ ভাবাবলীর যেরূপ অনুশীলন ও উৎকর্ষসাধন হইয়া থাকে, এমন কিছুতে সম্ভব নয়। কত আনন্দের সহিত আমরা রামলীলা ও রাসলীলা দেখি! কথকঠাকুরের শ্রীমুখাৎ ভাগবৎলীলা শ্রবণ করিয়া আমরা কত হাসিতে ও কাঁদিতে থাকি। এই হাসিকান্নার মধ্যে আমাদেব প্রকৃত ভাবশিক্ষা ও ধর্ম্মশিক্ষা হইয়া থাকে। জগতের কোন্ ধর্ম্ম স্বসেবকদিগকে ঈশ্বরের নামে এতদূর হাসাইতে ও কাঁদাইতে পারে, বল?

যখন হৃদয়ের সমস্ত ভাবগুলি বা মনপ্রাণ ঈশ্বরে বা তদীয় অবতারবিশেষে অর্পিত হয়, তখন তাঁহার প্রতি আন্তরিক ভক্তি দেখান হয়। প্রগাঢ় ভক্তি ব্যতীত মনের প্রকৃত শিক্ষা ও উন্নতি হয় না। ভক্তিপ্রকাশই মনের প্রকৃত উন্নতির প্রথম ও চরম সোপান। কথায় বলে ভক্তিতে মুক্তি। ঈশ্বর ও দেব দেবীর উপর তোমার যেমন বিশ্বাসও ভক্তি হইবে, তুমি উহাদের আরাধনা দ্বারা সেইরূপ ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইবে।

সত্যবটে, মানবধর্ম্মমাত্রেই ঈশ্বরের বা তদীয় প্রতিনিধির উপর প্রগাঢ় ভক্তি দেখায়; কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম পৌরাণিক ভক্তিযোগ প্রকাশ করাতে এ বিষয়ে চরমোৎকর্ষ দেখাইতেছে। তাহার সাক্ষ্য, মুখে কতকগুলি অসার বাক্য-সমষ্টয় উচ্চারণ পূর্ব্বক নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা করাতে তাঁহার প্রতি যে ভক্তি প্রদর্শিত হয়, তাহা যৎসামান্য ও অকিঞ্চিৎকর। আর তাঁহার এক প্রতিমূর্ত্তি গঠন করিয়া ষোড়শোপচারে উহার পূজা করাতে অথবা সংসারের বিবিধ মনোরম বস্তু একত্রিত করিয়া উহার পূজা করাতে তাঁহার প্রতি যে ভক্তি প্রদর্শিত হয়, তাহাই প্রকৃত ভক্তি।

এ সংসারে কথা কথামাত্র, কাজ কাজই। কথার আবার মূল্য কি? কাজেরই প্রকৃত মূল্য আছে। যাহাতে কিছুমাত্র বায়ভূষণ নাই, তাহা কি কদাচ মনে লাগে? অন্য ধর্ম্মের লোকেরা যে ভক্তি সামান্য কথায় প্রকাশ করে, ধর্ম্মাত্মা হিন্দু ষোড়শোপচারে প্রতিমূর্ত্তি পূজন করিয়া সেই ভক্তি কাজে দেখান। এজন্য ভাবপ্রিয় ভাবুক হিন্দু ঈশ্বরের প্রতি নিজ মনের যথার্থ ভক্তি প্রদর্শন করিবার জন্য চিরদিন নিরাকার ঈশ্বরের মৌখিক উপাসনা অবজ্ঞা করিয়া তাঁহার প্রতিমূর্ত্তিপূজন অবলম্বন করিয়াছেন। অতএব বেশ জানিবে, যাহার জন্য অন্য ধর্ম্মের লোকেরা এ ধর্ম্মের যথার্থ ভাব ও প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া ইহাকে অসার পৌত্তলিকতা জ্ঞানে ঘৃণা করিতেছে, তাহাতেই ইহার চরমোৎকর্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতেই ইহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে। সেজন্য বলি, ওহে সুশিক্ষিত পাঠকগণ। ঘরের পৈতৃক হীরা-খান সামান্য কাঁচ জ্ঞানে আর পায়ে ঠেলিও না।

এস্থলে পুনরায় সাহঙ্কারে বলিতেছি, যাঁহারা সাকার দেবদেবীর পূজার্চ্চনা করেন, তাঁহাদের ঈশ্বরভক্তি যেরূপ ভাবে প্রস্ফুরিত হয়, নিরাকারোপাসকদিগের ততদূর হইতে পারে না। তাহার সাক্ষ্য, ভক্তি শব্দের ইংরাজি প্রতিবাক্য (Devotion) লইয়া বিচার করিয়া দেখ, ভক্তি কথায় আমাদের মনে যে সকল ভাবের উদয় হইবে, ইংরাজি কথায় কি উহার শতাংশের একাংশ হইতে পারে? আমরা গলায় বস্ত্র দিয়া সাষ্টাঙ্গে ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তির সমক্ষে যেরূপ অপার ভক্তিভাবে প্রণত হই, একজন খৃষ্টান বা মুসলমান কি ততদূর ভক্তি কদাচ অনুভব বা প্রকাশ করিতে পারে? উহারা জানুর উপর উপবেশন

করিয়া মস্তক অবনত করিয়া মনের অস্ফুট ভক্তি অস্ফুট ভাবে ব্যক্ত করে। কিন্তু ভক্তি শব্দে আমরা সচরাচর যাহা বুঝিয়া থাকি, তাহা উহারা আদৌ মনে অনুভব করিতে পারিবে না।

পূজ্য দেবদেবীকে এতকাল কায়মনোবাক্যে আন্তরিক ভক্তি করাতে আমাদের মনের ভক্তি কিরূপ স্ফুরিত, বল দেখি? পিতামাতাগুরুজন, রাজা ও সমাজনেতৃ ব্রাহ্মণগণ আমাদের কিরূপ ভক্তির পাত্র! আমরা অন্তরের সহিত তাঁহাদের প্রতি কিরূপ ভক্তি প্রদর্শন করি! কিন্তু বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, সমাজের সে ভক্তিভাব এখন কোথায়? এখন আমরা ইংরাজদিগের অসদনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়া পিতামাতাগুরুজনের প্রতি পূর্ব্বের ন্যায় ভক্তি প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হই। কি পরিতাপের বিষয়! এখন আমরা অন্তরের ভক্তি প্রদর্শনকেও ধর্ম্মের একটা কুসংস্কার মনে করি। গলায় বস্ত্র দিয়া প্রণাম করিতে আমরা শিখি নাই। মাথা হেঁট করাও আমাদের এখন দুর্ব্বহ ভার। হায়! হায়! সমাজের কি হৃদয়বিদারণ অধঃপতন উপস্থিত!

আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা না থাকিলে মনের প্রকৃত উন্নতিলাভ হয় না। হৃদয়ের সকল ভাবগুলি ভক্তি দ্বারা চালিত হইলে মনে বিমল আনন্দ উত্থিত হয় এবং ইহা ধর্ম্মপথে অধিক অগ্রসর হয়। যাহার প্রতি মনের প্রগাঢ় ভক্তি জন্মে, তাঁহার গুণানুকীর্ত্তনে ও গুণানুকরণে ইহা স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়। গুণানুকীর্ত্তনে যেমন ইহার অপার আনন্দ, গুণানুকরণেও তেমনি ইহার অশেষ উন্নতি। মানবমনে যথার্থ ঈশ্বরভক্তি উদ্রেক করিবার জন্য শাস্ত্রে অবতারদিগের এত গুণানুকীর্ত্তন দেখা যায়। সেই গুণানুকীর্ত্তন পাঠ ও শ্রবণ করাতে মন কিরূপ আনন্দনীরে অভিষিক্ত হয় ও কতদূর ধর্ম্মপথে অগ্রসর হয়, তাহা কি শিক্ষিত সম্প্রদায় একবার ভাবিয়া দেখিবেন?

তাঁহারা ত ভালরূপ জানেন, শাস্ত্র অতিরঞ্জিত ও উপকথায় পূর্ণ এবং হিন্দুধর্ম্ম লোকবর্গকে ভগবৎ লীলা শ্রবণ করাইয়া কেবল কুসংস্কারজালে জড়িত করিয়া রাখে। বাস্তব হউক বা অবাস্তব হউক, কাল্পনিক হউক বা অকাল্পনিক হউক, শাস্ত্রের যে সকল অমৃতময়ী কথা শ্রবণে ভক্তি প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাবাবলি মনে শতধারে উথলিয়া পড়ে, তাহা কি ধর্ম্মের কুসংস্কার? আর তাহাই যদি

ধর্ম্মের কুসংস্কার হইল, তবে সংসারে কোন্‌টী সুসংস্কার,' বল? যে সকল ভগবৎ কথাশ্রবণে কোটী ২ মানব এতকাল আনন্দাশ্রু ও শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে ২ মনের সাত্ত্বিক ভাব স্ফুরণ করত ধর্ম্মপথে অধিক অগ্রসর, আজ কি না তোমরা উহাদের উপর উপহাস করিতে বসিলে? তোমাদের পাশ্চাত্য শিক্ষায় ধিক্!

বিশ্বাস, ভক্তি ও সাধনা এই তিনটী ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। উহাদের ভিতর এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, একের অভাবে অপর দুইটী আদৌ স্ফূর্ত্তি পায় না। ইহাদের ভিতর বিশ্বাসই ধর্ম্মের মূলাধার। বিশ্বাস হইতে ভক্তি আইসে; ভক্তি জন্মিলে মন সাধনার দিকে স্বতঃ ধাবিত হয়, পরে সাধনা হইতে ক্রমশঃ সিদ্ধিলাভ ঘটে। যখন ঐ তিন অঙ্গ একাধারে মিলিত হইয়া সম্যক্ অনুষ্ঠিত হয়, তখন প্রকৃত ধর্ম্মভাব মনে জাগরিত হয়। বহু দিবস ধরিয়া ইহাদের অনুশীলন করিলে মন একাগ্রতালাভের পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হয়, এবং সেই সঙ্গে সংসারে বৈরাগ্যোদয় ও তত্ত্বজ্ঞানের আবির্ভাব হয়। এই প্রকারে আমরা শাস্ত্রোক্ত ভক্তিমার্গ দ্বারা শ্রীহরি বা ঈশ্বরের তন্ময়ত্ব লাভ করিয়া জীবনের প্রধান শ্রেয়োলাভ করি।

সনাতন হিন্দুধর্ম্ম পদ্মপলাসলোচন শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ বিষ্ণুর যে মোহনমূর্ত্তি বা জগদম্বার যে দালালভরা প্রতিমা তোমার নয়ন সমক্ষে ধারণ করে, অগ্রে সেই মূর্ত্তির উপর আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন কর ও অপার ভক্তি প্রদর্শন কর, তবে তুমি সেই মূর্ত্তির ধ্যান ও ধারণা করিয়া ক্রমশঃ নিজ মনের একাগ্রতা লাভ করিতে শিখিবে। আর যদি তোমার মনের এরূপ সংস্কার হয় যে, এ সকল মূর্ত্তি কাল্পনিক, উহাদের প্রতি তোমার মনের আন্তরিক বিশ্বাস ও ভক্তি একবারে উড়িয়া যাইবে এবং তুমিও উহাদের পরিবর্ত্তে নিরাকার ঈশ্বর ভজনা করিয়া পরিতৃপ্ত হইবে। এখন যদি নিরাকার ঈশ্বরের প্রতি তোমার মনের একান্ত বিশ্বাস ও ভক্তি না থাকে, তুমি নাস্তিক হইয়া দেবদেবীও ঈশ্বর সকলকে গোটেহেল করিয়া বসিবে। অতএব দেখ, ধর্ম্মবিষয়ে বিশ্বাসই মূলাধার; বিশ্বাস হইতে ভক্তি আইসে, শেষে একমাত্র ভক্তিতে মুক্তিলাভ হয়।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেন :—

সুদর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ।
নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া
শক্যঃ এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি যন্মম
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যোঽহমেবং বিধোর্জ্জুন
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ।
মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ
নির্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব।

(গীতা)

"হে অর্জ্জুন! তুমি আজ আমার যে মনোরম বিরাট মূর্ত্তি দিব্যচক্ষে দর্শন করিলে এ মূর্ত্তি দেবতারাও সদা দেখিতে অভিলাষ করেন। এ মূর্ত্তি যে সে কেহ সহজে দেখিতে পায় না। যে মায়াঠুলি পরিয়া আছ, তাহাতে ইহা কেমন করিয়া দেখিবে? সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিয়া, ঘোর তপস্যা করিয়া, আজীবন জ্ঞানযোগ অনুশীলন করিয়া ও বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া কেহ আমার এ সুন্দর মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে না। একমাত্র অনন্যভক্তি দ্বারা সকলে আমাকে এই রূপে জানিতে, দেখিতে ও আমার নিগূঢ় তত্ত্ব জানিয়া আমাতে প্রবেশ করিতে বা আমার তন্ময়ত্ব লাভ করিতে সক্ষম হইবে। আমার প্রিয় কার্য্য কর, মদ্গতপ্রাণ হও, আমা ব্যতীত সংসারে আর কিছুই জানিও না, আমার একান্ত ভক্ত হও, সকল বিষয়ে আসক্তিশূন্য হও, মৎসৃষ্ট কোন জীবে হিংসা করিও না বা শত্রুতা করিও না, তাহা হইলে তুমি অন্তে আমাকে পাইবে।"

এস্থলে বেশ বুঝা যায়, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ অপেক্ষা ভক্তিযোগকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ করিতেছেন। বস্তুতঃ এ কলিযুগে গৃহাশ্রমের পক্ষে ভক্তিযোগ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও অতি সহজ সাধনোপায়। আজকাল মানবমাত্রেই ভক্তিযোগ অনুশীলন করিয়া সাধনপথে, ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে পারে। অপার ও অনন্যভক্তি ব্যতীত ঈশ্বরারাধনা বা দেবার্চ্চনা কদাচ সম্ভব নয়। অনন্ত ভক্তিই সকল ধর্ম্মসাধনার মূলাধার।

ভক্তিযোগ সকলের পক্ষে যেমন সহজ ও সুগম, তেমনি সিদ্ধিপ্রদ। ইহাতে দেহপাত করিতে হয় না, কোনরূপ শারীরিক ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় না, বনজঙ্গলে যাইতে হয় না; কেবল হরিনাম জপ, হরিরূপ ধ্যান, হরিগুণ গান, হরিসঙ্কীর্ত্তন, হরিকথাশ্রবণ ও হরিকথাপাঠ, আর মুখে সদা হরিধ্বনি। সংসারযাত্রা বা দেহযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যাহা২ আবশ্যক, স্বচ্ছন্দে তাহা করিতে থাক, তাহাতে ধর্ম্মের কিছুমাত্র আপত্তি নাই। কিন্তু ঘোর সা সারিকের ন্যায় পুত্রকলত্রাদিতে আদৌ মজিবে না, মজিবে একমাত্র হরির প্রেমে ও হরির সুমধুর নামে। তবে তোমার জীবন ধর্ম্মময় ও সুমধুর হইবে এবং অন্তে পরমেষ্ঠী পদ পাইবে। এইরূপে অহোরাত্র হরির প্রেমে মজিয়া তাঁহার প্রিয় কার্য্য করত সংসারে বৈরাগ্য অবলম্বন করা ও তন্ময়ত্ব লাভ করা ভক্তিযোগের প্রধান উদ্দেশ্য।

দেখ, ভক্তিযোগ শাস্ত্রে কেমন বিশদভাবে বর্ণিত আছে। ধর্ম্মাত্মা হিন্দু কবিগণ প্রত্যেক রাজচরিতে, প্রত্যেক কথায় হরিভক্তির কেমন অপূর্ব্ব ফোয়ারা ছুটাইয়াছেন। ধ্রুবচরিত, প্রহ্লাদচরিত, সুরথ উদ্ধার, বামনভিক্ষা, গয়াসুরের হরিপাদপদ্মলাভ প্রভৃতি সকল পৌরাণিক কথাতে তাঁহারা ভক্তি যোগের পরাকাষ্ঠা উপদেশ দিয়াছেন। পঞ্চমবর্ষীয় দুগ্ধপোষ্য বালক ধ্রুবের মুখারবিন্দ হইতে পদ্মপলাসলোচন শ্রীহরির প্রতি প্রগাঢ় ভক্তির কথা উল্লেখ করিয়া, পরমভক্ত প্রহ্লাদের অপার হরিভক্তি বর্ণন করিয়া, কি প্রকারে তিনি একমাত্র হরিভক্তি বলে নৃশংস পিতার ঘোর অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পান, এ সকল কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহারা আমাদিগকে ভক্তবৎসল হরির প্রতি যেরূপ পরাভক্তি উপদেশ দিতেছেন, তাহা ধর্ম্মজগতের অমূল্য নিধি। বাস্তব হউক, অবাস্তব হউক, সে সকল অমূল্য নিধি আমাদের জাতীয় হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে চিরাঙ্কিত আছে। এ সকল অমূল্য কথা শ্রবণ করিয়া আমাদের হরিভক্তি চিরদিন শতসহস্রধারে উথলিয়া পড়িবে।

ভক্তিযোগ যেমন সহজ, তেমনি পরমপ্রীতিকর। ইহাতে আমরা আনন্দ-স্বরূপ পরব্রহ্মের আনন্দময় রূপ দর্শন করিয়া কেবল আনন্দনীরে অভিষিক্ত হই। ইহাতে আমরা ত্রিভঙ্গমুরারির নর্ত্তন দর্শন করিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া ত্রিভঙ্গে নৃত্য করি। যতদিন না তুমি হরিপ্রেমে মজিয়া তন্ময়ত্ব লাভ করিবে,

ততদিন তোমার হরিসাধন অসম্পূর্ণ। কোথায় হে প্রাতঃস্মরনীয় বৈষ্ণবকুলতিলক পূজ্যপাদ চৈতন্যদেব! তুমি বঙ্গমাতাকে কিরূপ হরিপ্রেমে মাতাইয়া গিয়াছ। ধন্য তোমার হরিভক্তি! ধন্য তোমার অপার শ্রীকৃষ্ণপ্রেম! এমন ভক্তি কে কোথায় দেখেছে? এমন প্রেম কে কোথায় শিখেছে, বল?

আহা! ভক্তের হৃদয় কিরূপ অপূর্ব্ব স্বর্গীয় ভাবে পূর্ণ! সে হৃদয় ভক্তবৎসল হরির গুণকীর্ত্তনে কিরূপ আনন্দ ভোগ করে! সে আনন্দের উচ্ছাস দেখিলে কাহার না হৃদয়ে আনন্দের লহরী বহিবে? যেমন হরিনাম এ সংসারে সুমধুর, এ নাম কোথায় ছিল, কে আনিল, তেমনি ভক্তের জীবনও সুমধুর। তিনি অহোরাত্র হরিগুণ গাইয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করেন, শয়নে স্বপনে ও জাগরণে কেবল হরিমূর্ত্তি দেখেন। কখনও বা তিনি হরিনাম করিয়া রোদন করেন, কখনও বা হাস্য করেন। হরিসঙ্কীর্ত্তন শুনিলে তিনিও দুবাহু তুলিয়া আনন্দে নাচিতে থাকেন। হরিসুধা পান করিয়া তাঁহার জীবন কেমন সুধাময়! দীনহীন হইলেও হরিধন পাইয়া তিনি লক্ষপতি। পুত্রকলত্র লইয়া তিনি ঘোর সংসারিক হইলেও হরির প্রেমের গুণে তিনি প্রকৃত বৈরাগী। সংসারে যেরূপ জ্বালাযন্ত্রণা আসুক না কেন, যেরূপ আপদবিপদ পতিত হউক না কেন, সকল অবস্থায় ভক্তবৎসল হরির প্রেমের গুণে তিনি নির্ব্বিকার। ভবকাণ্ডারী হরিকে পাইয়া তিনি ভবসাগর সুখে পার হন।

যেদিন তোমার হৃদয়ে হরিভক্তি উদয় হইবে, সেই দিন হইতে তোমার নবজীবন আরম্ভ হইবে। তুমি জগৎ হরিময় দেখিবে, সকল কর্ম্ম কেবল হরির নাম করিবে, হৃদয়ের কদম্বমূলে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি দেখিবে এবং সেই মূর্ত্তি ধ্যান করিতে ২ হাসিবে, কাঁদিবে ও নাচিবে। সংসারের সকল জ্বালাযন্ত্রণা তোমার নিকট হইতে দূরে পলায়ন করিবে। তখন তোমার জীবন প্রকৃত ব্রহ্মময় হইবে।

মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে,
স গুণান্ সমতীত্যৈতান ব্রহ্মভূয়ায়কল্পতে।

(গীতা)

"যিনি আমাকে অচলা ও অনন্যা ভক্তির সহিত আরাধনা করেন, তিনি মায়ার ত্রিগুণ অতিক্রম করেন (অর্থাৎ) মায়ার ত্রিগুণের ক্রিয়াবশতঃ সুখদুঃখের ভাগী হন না এবং তদীয় জীবন প্রকৃত ব্রহ্মময় হয়।"

রে হিন্দুধর্ম্ম! ধন্য তোমার ব্যবস্থা! ধন্য তোমার স্বর্গীয় উপদেশ। তুমি যেমন করিয়া আমাদিগকে হরির প্রেমে মজাও ও হরিনামসুধা পান করাও, এমন কোন্ ধর্ম্ম এজগতে শিখায়, বল?

এখন একবার ভাব দেখি, যে ধর্ম্ম হরির মোহন মূর্ত্তি নয়ন সমক্ষে ধরিয়া আমাদিগকে ঈশ্বরের প্রতি অনন্ত প্রেমে ও অনন্ত ভক্তিতে মজায়, যে ধর্ম্ম অন্য ধর্ম্মের ন্যায় ঈশ্বরকে মধ্যে ২ বা দিনে ২।৪ বার স্মরণ করাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া জপমালা হস্তে দিয়া অনুক্ষণ সেই নাম জপ ও সেইরূপ ধ্যান করিতে শিখায়, সে ধর্ম্ম কি সংসারে অপকৃষ্ট ধর্ম্ম? সে ধর্ম্ম কি অর্দ্ধসভ্য ভারতের অসার পৌত্তলিকতা মাত্র? সে ধর্ম্ম কি একমাত্র সত্য, সনাতন ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নয়? বেশ জানিবে, নিরাকারবাদীদিগের অসার ঈশ্বরভক্তি আমাদের পরাভক্তির সহিত তুলনা হইতে পারে না।

নিষ্কাম ধর্ম্ম।

যখন কুরুক্ষেত্র মহাসমরে মহাবীর অর্জ্জুন সম্মুখে জ্ঞাতিবর্গকে আততায়ী-ভাবে স্থিত দেখিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হন ও নিজ গাণ্ডীব ধনুক ত্যাগ করেন, তৎকালে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নিজ কর্ত্তব্যপালনে প্রোৎসাহিত করিবার জন্য গীতোক্ত অমৃতময় ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। ভাষামাত্রেই নানা ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচলিত আছে; কিন্তু গীতার ন্যায় এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, এমন উৎকৃষ্ট ধর্ম্মশাস্ত্র কুত্রাপি নয়নগোচর হয় না। কি বুদ্ধদেব, কি ঈশা, কি মহম্মদ, কেহই এ জগতে এমন স্বর্গীয় ধর্ম্মোপদেশ দিতে পারেন নাই। যেমন ভারতের সনাতন হিন্দুধর্ম্ম জগতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম, তেমনি গীতাও জগতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্মশাস্ত্র। ত্রিপিটক, বাইবেল কোরাণ, সকলেই ইহার নিকট হার মানে। কি ক্রিয়াযোগ, কি জ্ঞানযোগ, কি ভক্তিযোগ, সকল যোগের সার নিষ্কামধর্ম্ম; তাহাই ইহার ছত্রে ছত্রে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

এখন নিষ্কাম ধর্ম্মের প্রকৃত অর্থ কি? সংসারে অশেষ কাজকর্ম্মের মধ্যে সকল বিষয়ে কামনাশূন্য বা নিস্পৃহ হইয়া কাজ করার নাম নিষ্কামধর্ম্ম। দেখ, সকলেই এ সংসারে কোন না কোন অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য কর্ম্ম করে। সকল কর্ম্মেরই কোন না কোন উদ্দেশ্য থাকে। ফললাভ ব্যতীত কেহ কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না। তুমি দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেছ, সংসার প্রতিপালন করিয়া সুখী হইবার জন্য। তুমি অগাধ পরিশ্রম করিয়া বিদ্যোপার্জ্জন করিতেছ, ভবিষ্যতে দুপয়সা আনিয়া সুখী হইবার জন্য। সেইরূপ কোন না কোন ইষ্টলাভের জন্য সকলে সংসারে বিবিধ কার্য্য করিয়া থাকে।

এখন কোনরূপ ফললাভের বাঞ্ছা ত্যাগ করিয়া নিঃস্বার্থ ভাবে কাজ করার নাম নিষ্কাম ধর্ম্ম। যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও না কেন, তাহাতে যে কিছুমাত্র অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে, এ সব কুচিন্তা মন হইতে একেবারে দূরীভূত করিয়া কাজ করার নাম নিষ্কামধর্ম্ম। ইষ্ট হউক, বা অনিষ্ট হউক, যাহা হউক না কেন, কোনরূপ ফললাভের দিকে আদৌ দৃষ্টিপাত না করিয়া এক মনে, এক ধ্যানে সর্ব্বান্তঃকরণে, এমন কি, কায়মনোবাক্যে কাজ করার নাম নিষ্কাম ধর্ম্ম।

গায়কশ্রেষ্ঠ গান:—

ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে
আমার স্বভাব এই তোমা বই জানিনে।

ইহা যেমন নিঃস্বার্থ ভালবাসার চূড়ান্ত জ্ঞান, সেইরূপ যখন কোন কাজে তোমার মনে এইরূপ নিঃস্বার্থ ভাব আসিবে, ফললাভ হউক ভাল, না হউক ভাল, এ কাজ আমায় করিতেই হইবে, তখন সে কাজে তুমি মনপ্রাণ সমর্পণ করিবে এবং কায়মনোবাক্যে তাহা করিবে; ইহাই তোমার নিষ্কাম ধর্ম্ম। মন্ত্রের সাধন বা শরীরের পতন, এই ভাবিয়া যে কাজ করিবে, তাহাই তোমার নিষ্কাম ধর্ম্ম। সমস্ত স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া সমাজের যে হিতকর কার্য্য করিবে, তাহাই তোমার নিষ্কাম ধর্ম্ম।

এই যে একজন বিদ্যালয়ের ছাত্র অমূল্য বিদ্যাধন পাইবার জন্য অহোরাত্র অধ্যয়ন করিতে করিতে সোণার দেহ পাত করিতেছে, এমন নিঃস্বার্থভাবে উহাতে মনঃসংযোগ করে বলিয়া সে ছাত্রকালে সরস্বতীর বরপুত্র হইয়া থাকে। এই যে একজন যোদ্ধা জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষার্থ বা উদ্ধারার্থ রণক্ষেত্রে অকা-

তরে প্রাণবিসর্জ্জন করিতেছে, সে ব্যক্তি কি স্বদেশের মঙ্গলের জন্য নিষ্কামধর্ম্ম আচরণ করে না?

পুণ্যলাভের জন্য নিঃস্বার্থভাবে যাহা করা যায়, তাহাই আমাদের নিষ্কাম ধর্ম্ম। পরোপকার, অতিথিসৎকার, গ্রামের মঙ্গলের জন্য পুষ্করিণীখনন, চতুষ্পাঠী স্কুল, দাতব্যচিকিৎসালয়াদি স্থাপন, এ সকল কার্য্য যদি পুণ্যলাভের জন্য নিঃস্বার্থভাবে করা যায়, উহারা আমাদের নিষ্কামধর্ম্ম।

যথার্থ বলিতে কি, নিঃস্বার্থভাবে একমনে একধ্যানে প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া যে কর্ত্তব্য পালন করা যায়, তাহাও আমাদের নিষ্কাম ধর্ম্ম। এস্থলে কর্ত্তব্য-পালনে যদি কোনরূপ স্বার্থ থাকে, ধর্ম্ম উহাকে নিজের নিঃস্বার্থে পরিণত করিতেছে। এই যে একজন চাষা রৌদ্রে পুড়িয়া বৃষ্টিতে ভিজিয়া শীতে হি হি করিতে করিতে ক্ষেত্রে চাসবাস করিতেছে ও সামান্যরূপ চাউলগম আনিতেছে, নিজে একমুঠা খায়, আর কাচ্চাবাচ্চাকে খাওয়ায়, ইহা কি তাহার নিষ্কামধর্ম্ম নয়? এই যে তুমি সমস্ত দিবস অফিসে কালি কলম লইয়া যুদ্ধ করিয়া দুই পয়সা আনিতেছ, নিজে একমুঠা খাও, আর পাঁচজনকে খাওয়াও, ইহাও কি তোমার নিষ্কামধর্ম্ম নয়?

সংসারে তুমি যে হও, সে হও, তুমি একজন নগদা মুটে মাত্র। কেবল টাকার ছালা বহিতে সংসারে আসিয়াছ; কাহারও ছালা ভারী, কাহারও হাল্‌কা, প্রভেদ এইমাত্র। রিক্তহস্তে আসিয়াছ, রিক্তহস্তে যাইবে। পাঁচজনকে খাওয়াইয়া ও দানধ্যান করিয়া যে সম্বল করিবে, তাহা একমাত্র সঙ্গে যাইবে। দেখ, খাজাঞ্চি হাতে কত টাকা নাড়িতেছেন, কিন্তু নিজে যে সামান্য বেতন পান, তাহাই তাঁহার নিজস্ব। তুমিও কত টাকা কত দিকে উপায় করিতেছ; কিন্তু নিজে যাহা খাইতেছ, তাহাই তোমার নিজস্ব। ধর্ম্মবলে পাঁচজনকে খাওয়াইয়া যে সম্বল করিতেছ, তাহাই তোমার নিজস্ব। এখন বুঝিয়া দেখ, নিষ্কাম ধর্ম্মের প্রকৃত অর্থ কি?

এ সংসারে কোন বিষয়ে কোনরূপ স্পৃহা বা কামনা করিতে নাই। কাজ কর্‌তে এসেছ, কাজ করে যাও, ফল চাহিও না। ফল চাহিলেই বিষম গোল-যোগ বাঁধিবে এবং তুমিও নানাপ্রকারে দুঃখের ভাগী হইবে; এজন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেন:—

কর্ম্মণ্যে বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন
মা কর্ম্মফল হেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি

(গীতা)

"কর্ম্মে তোমার পূর্ণ অধিকার আছে। (ইচ্ছামত তুমি সকল কাজ করিতে পার)। কিন্তু কাজের ফললাভে তোমার কিছু মাত্র অধিকার নাই। ফললাভ যেন তোমার কোন কার্য্যের মূলীভূত কারণ না হয়। ফল পাইবে না বলিয়া যেন কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বসিও না।"

যাঁহারা সংসারে কেবল ফল লাভের জন্য কর্ম্ম করেন, অনেক সময়ে অনেক কাজে তাঁহাদের ঈপ্সিত ফললাভ হয় না বলিয়া মনে নানা কষ্ট উপস্থিত হয়। যে কর্ম্মে যিনি যত অধিক আশা করিবেন, সংসারের নিয়ম এই, তিনি সে কাজে তত অধিক নিরাশ হইবেন। দর্পহারী ভগবান সকলের দর্প অগ্রে চূর্ণ করেন। অতএব ফললাভের বাঞ্ছা ত্যাগ করিয়া বা কোনরূপ আশা না করিয়া কাজ কর্ম্ম করিলে কোন বিষয়ে আমাদিগকে নিরাশ হইতে হইবে না এবং মনের শান্তি ও সন্তোষ কিছুতে নষ্ট হইবে না। এজন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেন :—

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাং শ্চরতি নিস্পৃহঃ
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তি মধিগচ্ছতি।

(গীতা)

"যে পুরুষ সকল বিষয়ে স্পৃহা, মমতা ও অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া কাজ করেন, তাঁহার জীবন প্রকৃত শান্তিময় হইয়া থাকে।" সংসারের কোন বিষয়ে অধিক মায়ামমতা দেখাইতে নাই। যত মায়া বাড়িবে, তত দুঃখের ভাগী হইতে হইবে। কোন বিষয়ে আমি করিলাম বলিয়া বাহাদুরী দেখাইবে না; তাহা হইলে পদে পদে ঠকিতে হইবে। যে কাজে অল্পমাত্র অহঙ্কার দেখাইবে, সে কাজটি দহে পড়িয়া যাইবে।

বিষয়বাসনা সকলের মনে স্বভাবতঃ বলবতী। ইহা সকলকে বিবিধ দুঃখের ভাগী করে। ঈপ্সিত ফললাভ হইলে আমরা যেমন সুখার্ণবে

ভাসমান হই, ফললাভ না হইলে তেমনি দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হই। এই বিষয়-বাসনাকে সংযত করিতে পারিলে আমরা সংসারে ক্ষণস্থায়ী দ্বন্দ্বজ সুখদুঃখের হাত হইতে অধিক পরিমাণে অব্যাহতি পাইতে পারিব। সকল বিষয়ে স্পৃহা শূন্য হওয়া প্রকৃত শান্তি ও সন্তোষ লাভের প্রধান উপায়। সংসারে যাহার অভাব ও অনাটন অল্প, তাঁহার হৃদয় অপূর্ব্ব শান্তির নিকেতন, আর যাহার অভাব যত অধিক, তাঁহার হৃদয় তেমনি অশেষ জ্বালাযন্ত্রণায় দগ্ধ হয়। যিনি বিষয়বাসনাকে সংযত করিয়া ও ষড়রিপু দমন করিয়া সংসারধর্ম্ম করেন, তিনি প্রকৃত মহাপুরুষ। এজন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেন :—

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি
শুভাশুভ পরিত্যাগী ভক্তিমান যঃ স মে প্রিয়ঃ।
সম শত্রৌ মিত্রে চ তথামানাপমানয়োঃ
শীতোষ্ণ সুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ
তুল্যনিন্দাস্তুতি মৌনী সন্তুষ্টোযেন কেনচিৎ
অনিকেতঃ স্থিরমতিঃ ভক্তিমান সে প্রিয় নরঃ।

(গীতা)

"যিনি ইষ্টলাভে হৃষ্ট হন না, অথচ কোন বিষয়ে বিরক্তি প্রকাশ করেন না, (ইষ্টানিষ্ট সকলই ঘাড় পাতিয়া লন) যিনি শোকের কারণ উপস্থিত হইলে, শোকাতুর হন না এবং সংসারের কোন বিষয়ে আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা রাখেন না, যিনি সংসারের যাবতীয় শুভাশুভ মনে ২ ত্যাগ করেন এবং যিনি আমার পরমভক্ত, তিনি এ সংসারে আমার প্রিয়। কোন বিষয়ে আসক্তি না থাকাতে শত্রুমিত্র, মানাপমান, শীতোষ্ণ, সুখদুঃখ, যশাযশ যাঁহার নিকট সমান, যিনি অল্পে স্বল্পে সন্তুষ্ট হন, যিনি অধিক বাচাল নন, যাহার ঘরদোর থাকিলেও যা, না থাকিলেও তা, যিনি আমার পরমভক্ত এবং যাঁহার আমাতে অচলা মতি, তিনি এ সংসারে আমার প্রিয়।" ভগবানের এই মহৎ বাক্যে কি সাধুসন্ন্যাসী, কি ঘোর সংসারিক, সকলেই সমভাবে আশ্বাসিত হইতেছেন। অতএব বিষয়-বাসনা সংযত করিয়া মনে যথার্থ বৈরাগ্য আনয়ন করা নিষ্কাম ধর্ম্মের মহৎ গুণ।

নিষ্কামধর্ম্মাচরণ দ্বারা বৈরাগ্য অবলম্বন করাতে মন যেমন ব্রহ্মে একনিষ্ঠ হইয়া একাগ্রতা লাভ করে, জীবাত্মার কর্ম্মবন্ধন ক্রমশঃ শিথিল হইতে থাকে। বিষয়বাসনা পুনঃ ২ জন্মপরিগ্রহের মূলকারণ। এখন যাহাতে বিষয়বাসনা ক্রমশঃ সংযত হইতে থাকে, তাহাতে জীবাত্মার কর্ম্মবন্ধন সূত্র শিথিল হইয়া পড়ে। এজন্য ভগবান বলিতেছেন :—

কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তাহিফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ
জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ং।

(গীতা)

"যে সকল মহাত্মা ব্রহ্মে একনিষ্ঠ হইয়া সকল বিষয়ে কর্ম্মফলের স্পৃহা ত্যাগ করেন, যে কর্ম্মবন্ধনবশতঃ সকলে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য,তাহা হইতে তাঁহারা মুক্তিলাভ করিয়া কৈবল্য প্রাপ্ত হন।"

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দাতীতো বিমৎসরঃ
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্যাপি ন নিবধ্যতে।

(গীতা)

"যিনি যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট, দ্বন্দ্বজ সুখদুঃখে নির্ব্বিকার থাকাতে একপ্রকার দ্বন্দ্বাতীত, সকল বিষয়ে মায়ামমতাশূন্য এবং কার্য্যসিদ্ধি ও কার্য্যহানি যাঁহার নিকট সমান, তিনি সকল কাজ করিয়াও কর্ম্ম বন্ধনসূত্রে আবদ্ধ হন না।"

জ্ঞেয়ো স নিত্যং সন্ন্যাসী যোন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে।

(গীতা)

"যিনি সংসারের কোন বিষয়ে আন্তরিক আসক্তি ও বিরক্তি দেখান না, তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী ; তিনি সকল কাজ কর্ম্ম করিয়াও মনে মনে উহাদিগকে ত্যাগ করেন। এই প্রকারে যিনি দ্বন্দ্বজ সুখদুঃখের হাত হইতে অব্যাহতি পান, তিনি কর্ম্মবন্ধনসূত্র হইতে মুক্তিলাভ করেন।" সংসারাশ্রম ত্যাগ করিলেই কেহ প্রকৃত সন্ন্যাসী হন না, কিন্তু যিনি সংসারে থাকিয়া মনে মনে সকল বিষয়ে অনাসক্ত ও নির্ব্বিকার হন, তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী।

হিন্দুশাস্ত্রের প্রতিছত্রে দেখা যায়, নিষ্কাম ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা বিষয়বাসনা সংযত হইলে জীবাত্মার অশেষ শ্রেয়োলাভ ও মঙ্গললাভ হইয়া থাকে। কিন্তু কলিযুগে বিষয়বাসনা স্বভাবতঃ সকলের এত প্রবল, যে ইহাকে সংযত করা বড় কঠিন। এজন্য সনাতন হিন্দুধর্ম্ম নিষ্কামধর্ম্ম ও সন্ন্যাসধর্ম্মের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া আমাদের মনে বৈরাগ্যভাব স্ফুরণ করিতে সাধ্যমত চেষ্টা পায়। যিনি সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হন, তাঁহার পক্ষে নিষ্কামধর্ম্মাচরণ অতি সহজ বটে; কিন্তু যিনি ঘোর সাংসারিক হইয়া মনে ২ সকল বিষয়ে প্রকৃত বৈরাগ্য অবলম্বন করেন, তাঁহারই বৈরাগ্যাবলম্বন এ সংসারে অধিক প্রশংসনীয়। যে সন্ন্যাসী বাহ্যদর্শনে কামিনী-কাঞ্চন হইতে দূরে থাকিয়া সর্ব্বদা উহাদের বিষয় চিন্তা করেন, তিনি কি ভণ্ড তপস্বী নন? আর যে গৃহস্থ কামিনীকাঞ্চনের মধ্যে লিপ্ত থাকিয়া মনে ২ উহাদের সম্বন্ধে নির্লিপ্ত, অবিকৃত ও বিরাগী, তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী।

এজন্য ভগবান বলেন :—

সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিশ্রেয়স্করাবুভৌ
তয়োস্তু কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগোবিশিষ্যতে

(গীতা)

"সন্ন্যাসধর্ম্ম ও কর্ম্মযোগ উভয়েতেই শ্রেয়োলাভ করা যায়। তন্মধ্যে সন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগ অধিক প্রশংসনীয়।" বস্তুতঃ সংসারের অশেষ প্রলোভনের মধ্যে পরীক্ষিত হইয়া জীবাত্মা যে ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিবে, তাহাতেই ইহার প্রকৃত শ্রেয়োলাভ হইয়া থাকে।

নিষ্কামধর্ম্মের যে কত গুণ, তাহা একমুখে বর্ণন করা যায় না। ইহাতে যেমন মনের অশেষ শান্তি ও সন্তোষ, জীবনও তেমনি সুমধুর ও সুখময় হইয়া থাকে। সংসারের জ্বালাযন্ত্রণা, বাধাবিঘ্ন, আপদবিপদ, আধিব্যাধি, সকলই ইহার সম্মুখে অদৃশ্য হইয়া যায়। যিনি নিষ্কামধর্ম্মবলে বলীয়ান, তিনি যে অবস্থায় থাকুন না, যেরূপ বিপদে পতিত হউন না, সকল অবস্থায় একমাত্র ভগবানকে স্মরণ করিয়া বলিবেন, তোমারই ইচ্ছা এ জীবনে পূর্ণ হউক। এমন শান্তিময় জীবন কে কোথায় পাইবে? এমন স্বর্গোপম হৃদয় কে কোথায় পাইবে?

যখন মনে নিষ্কামধর্ম্ম সম্যক স্ফুরিত হইবে, তখন কি লোষ্ট্রকাঞ্চন, কি শত্রুমিত্র, কি ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, কি সুখদুঃখ, কি বিষ্ঠাচন্দন, কিছুতেই কোনরূপ ভেদাভেদ থাকিবে না। তখন তিনি পর্ণকুটীরে থাকিয়া মনে করিবেন, আমি রাজপ্রসাদে আছি, রাজপ্রাসাদে থাকিয়া মনে করিবেন, এই আমার পর্ণকুটীর। ভূতলে শয়ন করিয়া মনে ভাবিবেন, আমি দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিতেছি। তখন তিনি চণ্ডালকে দেখিয়া ঘৃণা করিবেন না, এবং ব্রাহ্মণকে দেখিয়াও নমস্কার করিবেন না। গাত্রে বিষ্ঠা লাগিলে মনে করিবেন, এই আমার চন্দন, এবং চন্দন মাখিয়া মনে করিবেন, ইহা ত বিষ্ঠার মত।

আহা! নিষ্কামধর্ম্মের কত গুণ! এক গীতাই সকলকে এই স্বর্গীয় ধর্ম্ম শিখাইয়াছে। মহাত্মা ঈশা উপদেশ দেন, যদি কেহ তোমার বাম গণ্ডস্থলে চপেটাঘাত করে, তুমি তাহার দিকে দক্ষিণ গণ্ডস্থল ফিরাইয়াদিবে। এই উপদেশ শুনিয়া অনেকে Christian Charityইর ভূয়সী প্রসংশা করেন। বল দেখি, নিষ্কামধর্ম্ম সম্বন্ধে গীতা যাহা উপদেশ দেয়, তাহার সহিত কি ইহার তুলনা হইতে পারে? যিনি নিষ্কামধর্ম্মপরায়ণ, তাঁহাকে পাদুকা প্রহার করিলেও তাঁহার ক্রোধোদয় হইবে না, কেবল তিনি প্রহর্ত্তার দুর্বুদ্ধির জন্য দুঃখিত হইবেন এবং তাঁহার জন্য ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন। দেখ, যখন রত্নাকর দস্যু সাধুপুরুষকে হত্যা করিবার জন্য বৃক্ষে বন্ধন করেন, তখন সাধু দস্যুকে কিরূপ মহৎ উপদেশ দিলেন, যাহার গুণে দস্যু রত্নাকর ভারতের কবিরত্নাকর হইলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

হিন্দুধর্ম্মের মূলবিশ্বাস ও ত্রিমূর্ত্তি।

ধর্ম্মের মৌলিক মতামত লইয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ দেখা যায়।

প্রথমতঃ। পাশ্চাত্য জগৎ অধ্যাত্মবিজ্ঞানোক্ত মায়াবাদ ও মায়াতীত

পরব্রহ্ম আদৌ বুঝে না, বুঝে মায়াময় মানবমনের প্রকৃত্যনুসারে সগুণ নিরাকার ঈশ্বর।

দ্বিতীয়তঃ। যে ঈশ্বর বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতিসংহারকর্ত্তা, তিনি ইহার অন্তরালে বসিয়া, ইহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে থাকিয়া ঐ সকল কার্য্য সম্পাদন করেন।

তৃতীয়তঃ। সেই লৌকিক ঈশ্বর মানবমনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণে গুণান্বিত, এজন্য তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বমঙ্গলময়, দয়াময়, ন্যায়বান্ ইত্যাদি নানা বিশেষণে বিভূষিত।

চতুর্থতঃ। প্রকৃতি দ্বিগুণাত্মিকা, সৎ ও অসৎ; সতের রাজা ঈশ্বর ও অসতের রাজা সয়তান বা আহিরমন্। ঈশ্বর সংসারের মঙ্গলরাশির বিধাতা, আর সয়তান ইহার অমঙ্গলরাশির কর্ত্তা। যত আপদবিপদ ও রোগশোক সব সয়তান আনয়ন করে এবং ঈশ্বর আমাদিগকে ঐ সকল হইতে রক্ষা করেন। অতএব তিনিই একমাত্র পূজ্য। তাঁহারই প্রসাদে আমরা সকল বিপদ হইতে উদ্ধার পাই।

পঞ্চমতঃ। পাশ্চাত্য জগৎ ঈশ্বরকে কেবল দ্বৈতভাবে দেখে ও ভাবে। ইহার মতে বিশ্ব ও সৃষ্টিকর্ত্তা পরস্পর বিভিন্ন পদার্থ; অদ্বৈতভাবের উপর ইহা বড় নারাজ।

অপরপক্ষে প্রাচ্যজগৎ সম্পূর্ণ বিভিন্ন মতামত অবলম্বন করে।

প্রথমতঃ। আধ্যাত্মবিজ্ঞানের সুবিমল জ্যোতি পাইয়া ইহা মায়াবাদ ও মায়াতীত পরব্রহ্ম সম্যক বুঝিয়া ভালরূপ জানিতেছে, তিনি তাঁহার আদ্যা শক্তি মায়াযোগে বিবর্দ্ধিত হইয়া এই মায়াময় বিশ্বপ্রপঞ্চে পরিণত হন।

দ্বিতীয়তঃ। এই পরিদৃশ্যমান্ জগতের যাবতীয় ব্যাপার পরব্রহ্মের মায়াদেবীর ত্রিগুণের ক্রিয়ামাত্র; এজন্য মায়াতীত, গুণাতীত পরব্রহ্ম মায়ার ত্রিগুণানুসারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই ত্রিমূর্ত্তিতে মায়াজগতে বিভক্ত।

নমস্ত্রিমূর্ত্তয়ে প্রাক্‌সৃষ্টে কেবলাত্মনে
গুণত্রয়বিভাগায় পশ্চাৎ ভেদমুপেয়ুষে।

(কুমারসম্ভবম্)

"সৃষ্টির পূর্ব্বে তুমি একমেবাদ্বিতীয়ং ছিলে, পরে গুণত্রয়ের বিভাগের জন্য ত্রিমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছ, তোমায় নমস্কার।"

তৃতীয়তঃ। প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা। সংসারের যাবতীয় মঙ্গলামঙ্গল, পাপপুণ্য, সুখদুঃখ ও শোকতাপ একমাত্র মায়ার ত্রিগুণ হইতে উদ্ভূত। কিন্তু মায়াতীত পরব্রহ্ম মায়ার ত্রিগুণে নির্লিপ্ত। তিনি সংসারের মঙ্গলামঙ্গলের বিধাতা নন। তিনি ইহাদের জন্য আদৌ দায়ী নন।

চতুর্থতঃ। পরব্রহ্ম এ কলিযুগে অধঃপতিত মানবমনের আদৌ বোধগম্য না হওয়াতে তাঁহার স্থানে তাঁহার আদ্যাশক্তি মহামায়া অথবা তাঁহার মায়াময়ী ত্রিমূর্ত্তির কোন না কোন মূর্ত্তি সম্প্রদায়বিশেষে পূজিত হয়। শৈবদিগের ভিতর শিবই পরাৎপর পরব্রহ্ম। তাঁহার আজ্ঞায় ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু ইহার পালন করেন এবং তিনি নিজে ইহার সংহার করেন। বৈষ্ণবদিগের ভিতর শ্রীবিষ্ণু পরাৎপর পরব্রহ্ম। তাঁহার আজ্ঞায় ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করেন, শিব ইহার সংহার করেন এবং তিনি নিজে ইহার পালন করেন। শাক্তদিগের ভিতর আদ্যাশক্তি মহামায়া পরাৎপর পরব্রহ্ম। তাঁহার আজ্ঞায় ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু ইহার পালন করেন এবং শিব ইহার সংহার করেন। বস্তুতঃ মায়াতীত পরব্রহ্ম কলিকালে মায়াময় মানবমনের আদৌ ভাব্য না হওয়াতে সকলে ঐরূপ ভাবিতে ও পূজিতে বাধ্য হয়।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, পাশ্চাত্য জগৎ কেন নির্গুণ পরব্রহ্ম আদৌ বুঝে নাই? যে ধর্ম্ম সবেমাত্র সেদিন জগতে উত্থিত ও মায়াবাদ বুঝিতে অক্ষম, যে ধর্ম্ম পুরাকালীন পৌত্তলিক ধর্ম্মের (Paganism) রাশি রাশি ধর্ম্মগ্রন্থ দগ্ধ করিয়া নববিধান (New Dispensation) নামে জগতে প্রচারিত, সে ধর্ম্ম মানবমনের আধ্যাত্মিক অধঃপতনবশতঃ কি প্রকারে নির্গুণ পরব্রহ্ম বুঝিতে সক্ষম হইবে? কিন্তু প্রাচ্যজগতে অতি প্রাচীনকাল হইতে যোগসিদ্ধ মহর্ষিগণের সমাধিস্থ আত্মায় নির্গুণ পরব্রহ্ম চিরদিন প্রতিভাত

হইত এবং প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান মহাত্মাগণের ভিতর নিবদ্ধ ছিল। জাতীয় দ্বাপর যুগে মহাত্মা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব ব্রহ্মজ্ঞানের কিঞ্চিৎ আভাস বেদান্তে ও উপনিষদে প্রচার করিয়া যান। তদবধি নির্গুণ পরব্রহ্মের জ্ঞান প্রাচ্য জগতে প্রকৃত জ্ঞানীদিগের ভিতর প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু আধুনিক পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম যুগধর্ম্মানুসারে নির্গুণ পরব্রহ্মের স্থলে তাঁহার আত্মাশক্তি মহামায়া ও ত্রিমূর্ত্তি ভাবরূপ বুঝে এবং সাধারণের সাত্ত্বিক ভাবাবলির সম্যক স্ফূর্ত্তির জন্য তাঁহার সত্ত্বপ্রধান বিষ্ণুরূপের পূজার্চ্চনা বিধিবদ্ধ করে।

যেমন খৃষ্টাদি ধর্ম্ম একেশ্বরে মানবমনের শ্রেষ্ঠ গুণাবলি আরোপ করিয়া উহাদের সম্যক স্ফূর্ত্তি করিতে চেষ্টা পায়, সেইরূপ হিন্দুধর্ম্মও পরব্রহ্মের সাত্ত্বিক রূপের পূজার্চ্চনা বিধিবদ্ধ করিয়া সকলের মনে সাত্ত্বিক ভাবের স্ফূর্ত্তি করিতে সাধ্যমত চেষ্টা পায়। এস্থলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতের উদ্দেশ্য একরূপ। সেজন্য উহাদের ঈশ্বর, আর আমাদের বিষ্ণু এক, প্রভেদ কিছুমাত্র নাই।

প্রথম ভাগে উল্লেখ করিয়াছি, বিজ্ঞানের মতে ঈশ্বরজ্ঞান আমাদের সহজ বা নৈসর্গিক জ্ঞান নহে। তাহার সাক্ষ্য, এখনও জগতে অনেক অসভ্য জাতি আছে, যাহারা ভুতপ্রেতাদি বুঝে, কিন্তু ঈশ্বর আদৌ বুঝে না। জীবজগতে এক মানব ব্যতীত অন্য কোন জীবজন্তু ঈশ্বর জানে না। ইহার মতে বাল্যকালে অন্যান্য সংস্কারের সহিত আমরা ঈশ্বরজ্ঞান লাভ করি। খৃষ্ট ও মুসলমান ধর্ম্মের অভ্যুত্থানের সহিত আধুনিক একেশ্বর বাদ (Monotheism) জগতে সাধারণ ভাবে প্রচারিত হইয়াছে। তদবধি সকল দেশের জনসাধারণ লৌকিক ঈশ্বরে অপার ভক্তি দেখাইয়া চলিতেছে। যথার্থ বলিতে কি, এই লৌকিক ঈশ্বর (Personal Anthromorphic God) যিনি স্বর্গের একান্তে বসিয়া এই বিশ্বসংসার সৃষ্টি ও পালন করেন, তিনি মনঃকল্পিত বা মনগড়া। তুমি অবলম্বন ব্যতীত, আধার ব্যতীত এই দুস্তর ভবসাগর পার হইতে পার না বলিয়া মানবধর্ম্ম সকল দেশে তোমার মঙ্গলের জন্য তোমার মনের প্রকৃত্যানুসারে ভেলাস্বরূপ ঈশ্বর দেখায়। এই পাপতাপপূর্ণ সংসারে দুর্ব্বল, অসহায় মানবের গত্যন্তর নাই বলিয়া তিনি সকল দেশে নিজমনের অভিমত এক মনগড়া ঈশ্বর মানিয়া চলেন।

আস্তিক ও নাস্তিক, যিনি যাহাই বলুন না কেন, বিশ্বসম্বন্ধে বিজ্ঞানের অজ্ঞেয় আদিকারণ ও বেদান্তের নিগুর্ণ পরব্রহ্ম, যিনি বাক্, মন ও ইন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণ অগোচর, তিনিই এ সংসারে মহাসত্য। কস্মিন কালে এ মহাসত্যের খণ্ডন হইবে না। যাবচ্চন্দ্রদিবাকর এ মহাসত্য জগতে দেদীপ্যমান থাকিবে। ওঁতৎসৎ যে পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অসংখ্য যোগী, ঋষি মহাত্মা ও পরমহংস নিজ নিজ জিহ্বা পবিত্র করিতেছেন, তাহাই অধ্যাত্মবিজ্ঞানের জলন্ত সত্য। আধুনিক উন্নত জড়বিজ্ঞান তথা-কথিত লৌকিক ঈশ্বরের উপর খড়্গ হস্ত, কিন্তু অধ্যাত্মবিজ্ঞানপ্রতিপাদিত পরব্রহ্মের নিকট ইহা চিরদিন নতশির থাকিবে। কেন আজ সভ্যতম আমেরিকার বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ খৃষ্টধর্ম্মের অনাদর করিয়া আমাদের বেদান্তপ্রতিপাদিত পরব্রহ্ম সাদরে গ্রহণ করিতেছেন? যেদিন পূজ্যপাদ বিবেকানন্দস্বামী চিকাগোসহরের ধর্ম্মমণ্ডলে দুন্দুভিস্বরে বেদান্তের পরব্রহ্মের বার্ত্তা প্রচার করেন, কেন পাশ্চাত্য জগতের মহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ তাঁহার কণ্ঠে জয়মালা সমর্পণ পূর্ব্বক তদীয় মত সাদরে গ্রহণ করিলেন?

আরও দেখ, আমরা এ জগতে মায়াজ্ঞানে অভিভূত বলিয়া মায়াতীত পরব্রহ্ম আদৌ বুঝিতে পারি না। যেমন সাধর্থ্য বলদের চক্ষে ঠুলি দিয়া ঘানিগাছে ঘোরায়, আমরাও সেইরূপ চক্ষে মায়াঠুলি পরিয়া ভবের হাটে ঘুরিতেছি। এ অবস্থায় আমরা কেমন করিয়া পরব্রহ্ম বুঝিব? সুতরাং অনন্যোপায় হইয়া আমরা মায়াময় মনের আদর্শে নিগুর্ণ পরব্রহ্মের স্থলে এক মনগড়া ঈশ্বর কল্পনা করিয়া তাঁহাকে হরি, গড, আল্লা প্রভৃতি সুমধুর নামে ডাকিয়া থাকি। বস্তুতঃ তোমার ঈশ্বরে ও পরব্রহ্মে বিস্তর প্রভেদ। তোমার ঈশ্বর তোমার নিকট তোমার মায়াময় মনের অভিমত কতকগুলি শ্রেষ্ঠ গুণে বিভূষিত, অর্থাৎ মায়াগুণে গুণান্বিত; কিন্তু যিনি পরব্রহ্ম, তিনি মায়াতীত ও গুণাতীত, (অর্থাৎ) মায়াগুণে নির্লিপ্ত! তিনি তোমার মায়াময় মনের কদাচ ভাব্য নন।

পরব্রহ্ম জগতের চিৎশক্তির সমষ্টি ও ইহার উপাদান সমষ্টি। তাঁহার একাংশ স্থূলসূক্ষ্ম জগতের উপাদানসমষ্টি তাঁহার অপরাংশ চিৎশক্তি যোগে বিবর্ত্তিত ও বিকসিত হইয়াছে। তিনি নিরুপাধি বা উপাধিবিহীন। সূক্ষ্ম

জগৎস্থ দেবগণ তাঁহার চিৎশক্তির উপাধি বা প্রকাশক এবং স্থূলসূক্ষ্ম জগতের উপাদানসমষ্টি তাঁহার অপরাংশের উপাধি।

অদ্বৈতবাদমতে সাংখ্যতন্ত্রের প্রকৃতি ও পুরুষ, পুরাণের প্রধান ও পুরুষ এবং বিজ্ঞানের জড় ও শক্তি সেই নিরুপাধি ব্রহ্মের উপাধি মাত্র এবং ইহার মতে বিশ্ব ও ব্রহ্ম একই পদার্থ ও উহাদের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। কিন্তু দ্বৈত-বাদমতে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর স্বর্গের একদেশবাসী বা জগতের অন্তরালবাসী এবং উপাদান ও নির্ম্মাতা বা বিশ্ব ও স্রষ্টা সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ। খৃষ্টাদিধৰ্ম্ম ঈশ্বরকে কেবলমাত্র দ্বৈতভাবে দেখে বলিয়া উহারা ঈশ্বর সম্বন্ধে মহৎ ভ্রমে পতিত। কিন্তু সনাতন হিন্দুধর্ম্মের প্রধান গৌরব এই যে, ইহা পরব্রহ্মকে সকল ভাবে দেখে, অদ্বৈতভাবে যেমন দেখিতেছে, দ্বৈতভাবেও সেইরূপ দেখিতেছে। এজন্য পরব্রহ্মের স্বরূপনির্দ্দেশে এ ধৰ্ম্ম অন্যান্য ধৰ্ম্ম অপেক্ষা এত অধিক অগ্রসর।

ঈশ্বরের স্বরূপ নির্দ্দেশে পাশ্চাত্য জগৎ মহৎ বিভ্রাটে পতিত দেখা যায়। তাঁহারা মানবমনের অসম্পূর্ণ ও বিরুদ্ধ গুণাবলি ঈশ্বরে আরোপ করিয়া পরব্রহ্মের প্রকৃত অবমাননা করেন। দেখ, তাঁহাদের ঈশ্বর তাঁহাদের নিকট সর্ব্বশক্তিমান, অথচ মঙ্গলময়, দয়াময়, অথচ ন্যায়বান। এইরূপ মনের বিরুদ্ধ গুণাবলি ঈশ্বরে আরোপ করিয়া তাঁহারা তাঁহার প্রতি একরূপ বিদ্রূপ করিতে-ছেন। তাঁহাদের ভ্রমবশতঃ তাঁহাদেরই পূজ্যতম উন্নত জড়বিজ্ঞান এখন তাঁহাদের সেই ঈশ্বরের স্বরূপ ও অস্তিত্ব প্রকাশ্যভাবে খণ্ডন করে। কিন্তু সনাতন হিন্দুধর্ম্মের প্রধান গৌরব এই যে, এ ধৰ্ম্ম অসম্পূর্ণ মানবের কতকগুলি অসম্পূর্ণ গুণ পরব্রহ্মে আরোপ করিয়া তাঁহার কোনরূপ অবমাননা করে না। হিন্দুর নিকট এ জগতের যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ ও মহামহিম, তাহাই ব্রহ্মের বিভূতিজ্ঞানে পূজিত হয়।

যদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব
তত্তদেবাগচ্ছ ত্বং মম তেজোংশসম্ভবম্।

(গীতা)

"এ সংসারে যাহা কিছু ঐশ্বর্য্যান্বিত, শ্রীমৎ ও প্রভাবান্বিত, তাহাই আমার তেজোংশে সম্ভূত জানিবে।"

এ কারণ হিন্দুধর্ম্ম লোকশিক্ষার জন্য, সাধারণের মঙ্গলের জন্য অলৌকিক-গুণসম্পন্ন মানবকে ঈশ্বরাবতার জ্ঞানে চিরদিন পূজা করে এবং তাঁহাকে সকলের আদর্শস্বরূপ দেখায়। যেস্থলে খৃষ্টাদি ধর্ম্ম লোকশিক্ষার জন্য অসম্পূর্ণ মানবগুণ অনন্ত গুণিত করিয়া ঈশ্বরে আরোপ করত তাঁহাকে সকলের আদর্শ করে, সে স্থলে পৌত্তলিক হিন্দুধর্ম্ম লোকবিশেষে অসাধারণ গুণের বিকাশ দর্শনে তাঁহার গুণরাশি নিজ গ্রন্থে আরও সম্যক প্রকাশ করিয়া সাধারণের নিকট তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া পূজা করে। এস্থলে সমাজের মঙ্গলের জন্য যে ধর্ম্ম যে পথ বুঝিতে পারে, সে ধর্ম্ম স্বসেবকবৃন্দকে সেই পথে লইয়া যায়। এ বিষয়ে সকল ধর্ম্মের উদ্দেশ্য সমান হইলেও হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব এই যে, ইহার প্রদর্শিত পথ সহজ, সুগম ও সর্ব্বথা সিদ্ধিপ্রদ।

সেইরূপ যে স্থলে নিরাকারবাদী খৃষ্টাদি ধর্ম্ম অসম্পূর্ণ মানবমনের কতকগুলি অসম্পূর্ণ গুণ লইয়া নিরাকার ঈশ্বরের নিরাকার মূর্ত্তি নিজ মনের আদর্শে নির্ম্মাণ করত তাঁহাকে মনোগ্রাহ্য করিতে চেষ্টা পায়, সে স্থলে সাকারবাদী হিন্দুধর্ম্ম জড়জগতের কতকগুলি মনোরম বস্তু লইয়া ঈশ্বরের সাকার মূর্ত্তি নিজ শরীরের আদর্শে নির্ম্মাণ করত তাঁহাকে সম্যক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা চর্ম্মচক্ষুর বিষয়ীভূত করিতে চেষ্টা পায়। এস্থলেও সমাজের মঙ্গলের জন্য যে ধর্ম্ম যে পথ বুঝিতে পারে, সে ধর্ম্ম স্বসেবকবৃন্দকে সেই পথে লইয়া যায়। এ বিষয়েও সকল ধর্ম্মের উদ্দেশ্য সমান হইলেও হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব এই যে, ইহার প্রদর্শিত পথ সকলের পক্ষে সহজ, সুগম ও অশেষ সিদ্ধিপ্রদ।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেন :—

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্ত চেতসাম্
অব্যক্তাহি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে।

(গীতা)

"এ কলিযুগে মানব-প্রকৃতি যেরূপ, তাহাতে যাঁহারা অব্যক্ত নির্গুণ পরব্রহ্মের উপাসনায় বা সগুণ নিরাকার ঈশ্বরের আরাধনায় রত হন, তাঁহাদের ঐরূপ সাধন অতি কষ্টকর; কারণ স্থূলদেহ ধারণ করিয়া লোকে অতি কষ্টে নির্গুণ ব্রহ্ম বা নিরাকার ঈশ্বর পাইবে।" এ কারণ যুগধর্ম্মে বাধ্য হইয়া

তোমার সনাতন হিন্দুধর্ম্ম সাকারমূর্ত্তিপূজন অবলম্বন করে এবং তোমার নয়ন সমক্ষে হরির মোহন মূর্ত্তি ও জগদম্বার লালনাভরা প্রতিমা ধারণ করে।

ইতি পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, পাশ্চাত্য জগতে প্রকৃতি দ্বিগুণাত্মিকা, মঙ্গলের রাজা ঈশ্বর, অমঙ্গলের রাজা সয়তান। শুনিতে পাই, সয়তান ঈশ্বরের চিরশত্রু এবং উভয়ে চিরদিন ঘোরতর সংগ্রামে লিপ্ত। পরিশেষে সয়তান ঈশ্বর কর্ত্তৃক স্বর্গরাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া তাঁহার নবসৃষ্ট পৃথিবীতে অশেষ শোকতাপ আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহার শান্তিরাজ্য ধ্বংস করে। বোধ হয়, দুর্দ্দান্ত সয়তানের ভয়ে ঈশ্বর বেচারা চিরদিন ভীত ও ত্রস্ত। সংসারে অমঙ্গলরাশি অধিক, এজন্য সয়তান ঈশ্বর অপেক্ষা বলবান ও ক্ষমতাশালী। জগতে পরিশেষে ধর্ম্মের জয় হয়; ইহাতে বোধ হয়, ঈশ্বরবেচারা দীনহীন ধার্ম্মিকের ন্যায় অতি সন্তর্পণে ও সাবধানে চলেন, তাহাতেই তিনি জয়লাভ করেন। বোধ হয়, পাপিষ্ঠ সয়তানের দুষ্কর্ম্ম বশতঃ ঈশ্বরবেচারার শান্তি নাই, স্বস্তি নাই ও আরাম নাই; চিরদিন তিনি সয়তানকে পরাস্ত করিবার জন্য অশেষ চিন্তায় চিন্তিত। যাহা হউক, সয়তানের অস্তিত্ব মানাতে পাশ্চাত্যজগৎ ঈশ্বরের যে কিরূপ অবমাননা করে, তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন।

অপর পক্ষে প্রাচ্য জগৎ (হিন্দু ও বৌদ্ধগণ) এ বিষয়ে অধ্যাত্মবিজ্ঞানের সুবিমল জ্যোতি পাইয়া কোনরূপ বিভ্রাটে পতিত হয় নাই। পরব্রহ্ম, যিনি বিশ্বের অজ্ঞেয় আদিকারণ, যিনি আমাদের মন, বাক্ ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর, তিনি মায়াতীত ও গুণাতীত। তাঁহার আদ্যাশক্তি মায়ার ত্রিগুণের ক্রিয়াবশতঃ এ ভবসংসার এরূপ মঙ্গলামঙ্গলে, সুখদুঃখে ও পাপপুণ্যে পরিপূর্ণ। পরব্রহ্মের সহিত উহাদের কিছুমাত্র সংস্রব নাই, তিনি উহাদের হইতে অনেক দূরে আছেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেন :—

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ।

(গীতা)

"ঈশ্বর কাহারও পাপও গ্রহণ করেন না, পুণ্যও গ্রহণ করেন না। সকলে মায়াজ্ঞানে অভিভূত বা অজ্ঞানে আচ্ছন্ন বলিয়া যথার্থ তত্ত্ব নিরূপণ করিতে

পারে না।" একজন্য যাঁহারা ভাবেন, ঈশ্বর আমাদের সুখদুঃখের নিয়ন্তা ও সংসারের মঙ্গলামঙ্গলের বিধাতা, তাঁহারাও ভ্রান্ত; আর যাহারা ভাবেন ঈশ্বর এ সংসারে মঙ্গলরাশির কর্ত্তা এবং সয়তান অমঙ্গলরাশির কর্ত্তা, তাঁহারাও ভ্রান্ত। কর্ম্মফলের সার্ব্বভৌম নিয়মানুসারে এ সকল ঘটিতেছে। এ পর্য্যন্ত জানি, তাঁহার নিয়ন্ত্ দেবতারাই এ সকল ঘটাইতেছেন।

যাহা হউক, সনাতন হিন্দুধর্ম্ম পরব্রহ্ম সম্বন্ধে যে সকল মহাসত্য চিরদিন উপদেশ দেয়, তাহা ধর্ম্মজগতের অমূল্যনিধি। জ্ঞানশক্তি থাকে, স্বধর্ম্মের ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিয়া নিজের জ্ঞানশক্তি চরিতার্থ কর। বোধশক্তি থাকে, স্বধর্ম্মোপদিষ্ট তত্ত্বজ্ঞান বুঝিয়া মানবজন্ম সার্থক কর। এখন একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, তোমার হেয় অপদার্থ পৌত্তলিক ধর্ম্ম এ জগতে কত শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট! কি পরিতাপের বিষয়! আজকাল শিক্ষিত সম্প্রদায় স্বধর্ম্মের প্রকৃত মাহাত্ম্য বুঝেন না।

হিন্দুধর্ম্মে যে ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বর পরব্রহ্মের মায়াময়ী ত্রিমূর্ত্তি দেখা যায়, উহাদের সম্বন্ধে কিরূপ ভাবা উচিত? উহারা কি জগতের অমোঘ সত্য, না অমূলক? কেন অন্যান্য ধর্ম্মে উহাদের নামগন্ধ নাই? পরব্রহ্ম যেমন অধ্যাত্মবিজ্ঞানের মহাসত্য, তাঁহার আদ্যাশক্তি মহামায়াও ইহার ত্রিগুণও তেমনি অনন্ত সত্য। নবোত্থিত খৃষ্টাদি একদেশদর্শী ধর্ম্মগুলি এ সকল তথ্য বুঝিতে পারে না বলিয়া সনাতন ধর্ম্মের কথা কদাচ অমূলক হইতে পারে না।

দেখ, মায়াতীত পরব্রহ্ম তাঁহার আদ্যাশক্তি মহামায়া যোগে যে কেবল বিবর্ত্তিত ও বিবর্দ্ধিত হইয়া বিশ্বপ্রপঞ্চে পরিণত, তাহা নহে; তিনি একমাত্র মায়াযোগে এ সংসারে স্বপ্রকাশিত, অথচ অপ্রকাশিত; এজন্য আমরা তাঁহাকে বুঝিয়াও আদৌ বুঝি না। এই মায়াশক্তি আবার ত্রিগুণানুসারে এ জগতে ত্রিশক্তিতে বিভক্ত। সৃষ্টি স্থিতি সংহার এই ত্রিবিধ ক্রিয়াই সংসারের চরমাদ্য ও প্রধান ক্রিয়া। এই ত্রিবিধ ক্রিয়া ব্যতীত অন্য কোন প্রকার ক্রিয়া সংসারে দেখা যায় না। এই পরিবর্ত্তনশীল ও মরজগতে যে সকল পরিবর্ত্তন ও বিবর্ত্তন ঘটিতেছে, উহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার। এই ত্রিবিধ ক্রিয়াসম্পাদনে পরব্রহ্মের মহামায়ার ত্রিশক্তি সদা নিযুক্ত। তন্মধ্যে জগতের সৃষ্টিতে পরব্রহ্মের সৃষ্টিশক্তি, ইহার পালনে তাঁহার স্থিতিশক্তি এবং ইহার নাশে তাঁহার

সংহারিকা শক্তি নিযুক্ত। আবার ইহার সৃষ্টিতে মায়ার রজোগুণ, স্থিতিতে সত্ত্বগুণ ও নাশে তমোগুণ প্রকাশিত হয়। অতএব রজঃপ্রধান সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা পরব্রহ্মের সৃষ্টিশক্তির প্রতিনিধি অথবা যে সকল দেবতা সৃষ্টিপ্রক্রিয়ায় নিযুক্ত, উহাদের সমষ্টিই সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা; সত্ত্বপ্রধান পালনকর্ত্তা বিষ্ণু পরব্রহ্মের স্থিতি শক্তির প্রতিনিধি. অথবা যে সকল দেবতা বিশ্বপালনে নিযুক্ত, উহাদের সমষ্টিই পালনকর্ত্তা বিষ্ণু। সেইরূপ তমঃপ্রধান শিব পবব্রহ্মের সংহারিকা শক্তির প্রতিনিধি, অথবা যে সকল দেবতা সংহারক্রিয়ায় নিযুক্ত, উহাদেব সমষ্টি সংহারকর্ত্তা মহাদেব।

যেস্থলে একেশ্বরবাদী খৃষ্ট ও মুসলমান ধর্ম্ম উপরোক্ত ত্রিশক্তির ক্রিয়া-পরম্পরা একেশ্বরে অর্পণ করিয়া বিশ্বের অজ্ঞেয় আদিকারণকে আমাদের বোধ-গম্য করায়,সে স্থলে সনাতন হিন্দুধর্ম অধ্যাত্মবিজ্ঞানোক্ত মায়ার ত্রিগুণানুসারে মায়াতীত পরব্রহ্মকে ত্রিমূর্ত্তিতে বিভক্ত করিয়া তাঁহাকে আমাদের মায়াময় মনের ভাবা করিতে চেষ্টা পায়। যে ধর্ম্মের মতে "বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুং অসাম্প্রতং" বিষবৃক্ষকে বর্দ্ধিত করিয়া নিজহস্তে কুঠার দ্বারা ছেদন করা যায় না, সে ধর্ম্ম কি প্রকারে সৃষ্টিস্থিতি সংহার এই ত্রিবিধ ক্রিয়া এক দেবতায় আরোপ করিতে পারে? একেশ্বরবাদিগণ ঐ ত্রিবিধ ক্রিয়া একেশ্বরে আরোপ করিয়া একপ্রকার ঘাড়েগর্দ্দানে মিলায় বটে; কিন্তু উহারা ঈশ্বরের গুণপ্রকাশের সময় মহৎ বিভ্রাটে পতিত হয়। এবং বাধ্য হইয়া তাঁহার প্রতি-দ্বন্দ্বী সয়তানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে।

সকল ধর্ম্মে ত্রিমূর্ত্তি পাওয়া যায়, যথা:—

হিন্দুধর্ম্ম।

Imitial Trinity—নর-নরী-বিরাজ।

Manifested Trinity—অগ্নি-বায়ু সূর্য্য।

Creative Trinity—ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব।

খ্রীষ্টধর্ম্ম।

পিতা পরমেশ্বর	পুত্র পরমেশ্বর	কপোতেশ্বর
God the father	God the Son	Holy ghost

বৌদ্ধধর্ম্ম।

বুদ্ধ—ধর্ম্ম—সঙ্ঘ।

প্রাচীন পারস্যের ত্রিমূর্ত্তি।

অহুরমেজ—মিথ্র—আহিরমান।

প্রাচীন কাল্ডীয়ার ত্রিমূর্ত্তি।

Bel saturn, Jupiter Bel, Baal chome,

প্রাচীন মিসরের ত্রিমূর্ত্তি।

Empht, Eicton, Phta,

প্রকৃতি ত্রিমূর্ত্তিতে বিভক্ত।

প্রকৃতি—পুরুষ—বিশ্ব।
মাতা—পিতা—পুত্র।
শব্দব্রহ্ম—পরব্রহ্ম—বিরাজ।
শক্তি—জড়—বিশ্ব।

দেহ ত্রিমূর্ত্তিতে বিভক্ত।

সূক্ষ্মশরীর—লিঙ্গশরীর—স্থূলশরীর।
আত্মা—মন—দেহ।

কাল ও পরিমাণের ত্রিমূর্ত্তি।

ভূত—বর্ত্তমান—ভবিষ্যৎ।
দৈর্ঘ্য—প্রস্থ—বেধ।

অতএব মায়াতীত পরব্রহ্ম এ সংসারে মায়াময়ী ত্রিমূর্ত্তিতে বিভক্ত।

The deity is one, because it is infinite. It is triple, because it is ever-manifesting,

Secret Doctrine,

"পরব্রহ্ম অনন্ত, এজন্য তিনি একমেবাদ্বিতীয়ং, তিনি সদা প্রকাশমান ও পরিবর্ত্তনশীল, এজন্য তিনি ত্রিমূর্ত্তিধারী।"

প্রত্যেক ধর্ম্ম নিজ ২ উপাস্য ত্রিমূর্ত্তির ভিন্ন ২ অর্থ করে। কিন্তু যখন ত্রিমূর্ত্তি প্রায় সকল ধর্ম্মে দেখা যায়, তখন ইহা যে জগতের এক মহাসত্য, তদ্বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ করা উচিত নয়। অতএব হিন্দুধর্ম্মের ত্রিমূর্ত্তি পরব্রহ্মের ন্যায় জগতের এক অমোঘ সত্য।

এস্থলে যদি একেশ্বরবাদী বলেন, জগতে ঈশ্বর একমাত্র সত্য, তদ্ভিন্ন দেবতা মাত্রেই মিথ্যা; অতএব হিন্দুধর্ম্মের ত্রিমূর্ত্তিও মিথ্যা। ইহার উত্তরে বলা উচিত, পাশ্চাত্য জগতের ঈশ্বর ও সয়তান যেরূপ সত্য, প্রাচ্য জগতের ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরও তেমনি সত্য। তথায় যেমন লোকে ঈশ্বর ও সয়তানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিয়া উহাদিগকে জীবন্ত ও জাগ্রত জ্ঞানে সত্য ভাবে, আমরাও সেইরূপ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের অস্তিত্বে পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া উহাদিগকে জীবন্ত ও জাগ্রত জ্ঞানে চিরদিন সত্য ভাবিব। যাহা লোকপরম্পরায় বহুকাল চলিয়া আসিতেছে এবং যাহা সকলের আপ্তবাক্য, তাহাতেই সকলে বিশ্বাস করিয়া থাকে।

যাহা হউক, খৃষ্টানদিগের ঈশ্বর ও সয়তান তাঁহাদের নিকট যেরূপ সত্য, আমাদের ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর আমাদের নিকট তেমনি সত্য। তাঁহাদের ঈশ্বর তাঁহাদের নিকট যেরূপ সত্য, আমাদের পরব্রহ্ম সকলের নিকট তদপেক্ষা অধিক সত্য। তাঁহাদের সয়তান যদি আমাদের নিকট মিথ্যা হয়, আমাদের ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও তাঁহাদের নিকট মিথ্যা হইতে পারে, তাহাতে আমাদের কি ক্ষতি?

যাঁহারা হিন্দুদর্শন ও হিন্দুধর্ম্মের মহোচ্চ ও স্বর্গীয় ভাব বুঝিতে পারেন না, তাঁহারাই এ ধর্ম্মের ত্রিমূর্ত্তি অবিশ্বাস করিবেন। সকল কথার সার কথা এই,

এ কলিযুগে আত্মার আধ্যাত্মিক পতন বশতঃ মায়াতীত, গুণাতীত পরব্রহ্ম আদৌ বুঝা যায় না বলিয়া পাশ্চাত্য জগৎ তাঁহার পরিবর্ত্তে একটা মনগড়া ঈশ্বর মানিয়া থাকে এবং প্রাচ্য জগৎ তাঁহার পরিবর্ত্তে মায়ার ত্রিগুণানুসারে ত্রিমূর্ত্তি মানিয়া থাকে। যথার্থ বলিতে কি, সকল ধর্ম্মই এক পথের পথিক এবং সকলেই একোদ্দেশ্য সাধনের জন্য তৎপর। কেবল মাত্র উহারা বিভিন্ন মার্গ দিয়া গন্তব্য স্থানে পৌছিতে চেষ্টা পায়।

হিন্দুধর্ম্মে দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি যে সকল দেবীর পূজা চলিতেছে এবং যাহাদিগকে অন্য কোন ধর্ম্মে দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহারা কি জগতের অমোঘ সত্য? এ স্থলেও সনাতন হিন্দুধর্ম্ম অন্যান্য ধর্ম্ম অপেক্ষা সত্যপথে অধিক অগ্রসর। আমরা বিশ্বের আদিকারণ পরব্রহ্ম বুঝিও না, জানিও না ভগবানকে ডাকি এই মাত্র। আর দেখিতে পাই, স্ত্রীপুরুষের সঙ্গম বশতঃ সংসারে সন্তান উৎপন্ন হইতেছে। ইহাতে অনুমান করি, প্রকৃতিপুরুষের সংযোগে এ সংসার উৎপন্ন; ইহাদের মধ্যে চিৎশক্তিসম্পন্ন পরব্রহ্ম পুরুষরূপে উদাসীন এবং মহামায়ারূপিণী প্রকৃতি সকল হাঙ্গাম পোয়াইয়া বিশ্ব উৎপাদন করে। এজন্য হিন্দুশাস্ত্র বলে

ত্বামামনন্তি প্রকৃতিং পুরুষার্থপ্রবর্ত্তিনীং।
তদ্দর্শিনমুদাসীনং ত্বামেব পুরুষং বিদুঃ॥

(কুমারসম্ভবং)

"যে প্রকৃতি পুরুষের ইচ্ছানুসারে সকল কাজ করে, তুমিই সেই প্রকৃতি এবং যে পুরুষ উদাসীন ভাবে প্রকৃতির সকল কাজ দেখিতেছেনমাত্র, তুমিই সেই পুরুষ।"

যে স্থলে অন্যান্য ধর্ম্ম ঈশ্বররূপে উদাসীন পুরুষের একমাত্র আরাধনা করে, সে স্থলে হিন্দুধর্ম্ম পুরুষরূপে হরিহরের পূজা করে এবং দুর্গা কালীরূপে প্রকৃতির পূজা করে। যে স্থলে অন্যান্য ধর্ম্ম একমাত্র পরমেশ্বরের উপাসনা করিয়া একদেশদর্শী, সে স্থলে হিন্দুধর্ম্ম পরমেশ্বরপরমেশ্বরীর পূজা বিধিবদ্ধ করিয়া সকল দিকে সর্ব্বদর্শী ও সত্যপথে অধিক অগ্রসর।

দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ।

ধর্ম্মজগতে এই দুইটি মত চিরদিন প্রচলিত আছে। ইহাদের জন্য ধর্ম্মের মতামত লইয়া এত বিবাদবিসম্বাদ, এত তর্কবিতর্ক, এত মারামারি ও এত কাটাকাটি সংসারে চলিতেছে। প্রথম মতটি খৃষ্টান প্রভৃতি নিরাকারবাদিগণের এবং দ্বিতীয় মতটি হিন্দুপ্রভৃতি সাকারবাদিগণের।

দ্বৈতবাদিগণের মতে ঈশ্বর বা স্রষ্টা বিশ্ব বা সৃষ্টি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ এবং তিনি বিশ্বের অন্তরালে বসিয়া উহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ থাকিয়া ইচ্ছা ও বুদ্ধিশক্তিযোগে কতকগুলি উপাদান লইয়া বিশ্ব রচনা করিয়াছেন। যেমন কুম্ভকার মৃত্তিকাদি লইয়া ঘটাদি প্রস্তুত করে, সেইরূপ ঈশ্বরও কতকগুলি উপাদান লইয়া স্বেচ্ছায় এ জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। উহাদের মতে ঈশ্বরের সহিত বিশ্বের কদাচ তুলনা হইতে পারে না; কোথায় অসীমবুদ্ধিশালী, অনন্তগুণান্বিত ও অনন্তজ্যোতিঃস্বরূপ পরাৎপর পরমেশ্বর, আর কোথায় তৎসৃষ্ট একটা হেয় অপদার্থ অচেতন জড়পদার্থ! ইহাদের তুলনা কি কদাচ সম্ভব? আকাশ পাতাল প্রভেদ বলিলেও ইহাদের পার্থক্য সম্যক্ ব্যক্ত করা হয় না। তাহার সাক্ষ্য দেখ, কোথায় অশেষ কৌশলোদ্ভাবিনী মানববুদ্ধি, আর কোথায় সেই বুদ্ধিবিরচিত একটা যৎসামান্য ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতম যন্ত্রবিশেষ! কোন্ মূর্খ বলিবে, সেই যন্ত্রের পূজা করিলে যন্ত্রনির্ম্মাতার পূজা করা হইবে?

যেমন দেহনিবদ্ধ আত্মা ও স্থূলদেহ উভয়েই সম্পূর্ণ পৃথক্ পদার্থ; একটি অবিনশ্বর, অতীন্দ্রিয়, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চৈতন্যস্বরূপ, অপরটি নশ্বর, স্থূল, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও সামান্য জড়পদার্থে নির্ম্মিত; সেইরূপ চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মার সহিত এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূলজগতের সম্বন্ধ। যে সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর এক সামান্য কটাক্ষপাতে এমন কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিতে পারেন, তাঁহার সহিত কি এই নগণ্য পৃথিবীর একখণ্ড শিলার তুলনা হইতে পারে? অথবা একখণ্ড শিলা দিয়া কি তাঁহাকে ব্যক্ত করা যাইতে পারে? যে চৈতন্যময় পরমপিতা পরমেশ্বর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে দেদীপ্যমান থাকিয়া ইহাকে এমন সামঞ্জস্য ও সুশৃঙ্খলতার সহিত চালাইতেছেন, তাঁহার সঙ্গে কি একটা তুচ্ছ জড়পদার্থের তুলনা হইতে পারে? অতএব একখণ্ড জড়পদার্থকে সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর ভাবিয়া

পূজা করা কি মূর্খতার কর্ম, কি অজ্ঞতার কর্ম? যাহারা নির্বুদ্ধিতাবশতঃ ঐরূপ পূজা করেন, তাঁহারা যে কেবল ঐশী শক্তি খর্ব্ব করিয়া ঈশ্বরের অবমাননা করেন, তাহা নহে; ইহাতে তাঁহারা আরও ঘোর পাপভাগী হন। একারণ দ্বৈতবাদিগণ চিরদিন নিরাকারোপাসক এবং তাঁহারা সাকারোপাসনাকে অপদার্থ পৌত্তলিক জ্ঞান করিয়া চিরদিন অন্তরের সহিত ঘৃণা করেন।

অপরপক্ষে যাহারা অদ্বৈতবাদী, তাঁহারা ভাবেন, ব্রহ্মে ও বিশ্বে, স্রষ্টায় ও সৃষ্টিতে কিছুমাত্র ভেদাভেদ নাই। একই ব্রহ্ম বর্দ্ধিত হইয়া বা প্রপঞ্চীকৃত হইয়া বিশ্বরূপে প্রস্ফুটিত হন। তাঁহাদের মতে অনন্ত বিশ্বই পরব্রহ্মের বিরাট রূপ। এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎ সেই অব্যক্ত, অপরিজ্ঞাত নির্গুণ পরব্রহ্মের অনন্তবৈচিত্র্যবিশিষ্ট দেহমাত্র। জগতের প্রত্যেক পদার্থে ও জীবে পরব্রহ্মের অনন্ত চিৎশক্তির কণা যে কেবল অন্তর্নিহিত আছে, তাহা নহে; জগতের প্রত্যেক পরমাণুতে ও জীবাণুতে যে কেবল ঐশী শক্তির পূর্ণবিকাশ দেখিতেছ, তাহা নহে; কিন্তু জগতের প্রত্যেক পদার্থ ও জীব সেই অব্যক্ত পরব্রহ্মের ব্যক্তরূপ বা মূর্ত্তি। অতএব তাঁহাদের মতে একটা যৎসামান্য জড় পদার্থকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করায় কিছুমাত্র দোষ নাই; অথবা যে পদার্থে, জীবে ও মানবে ঐশী শক্তির পূর্ণ বিকাশ দেখা যায়, উহাকে পরব্রহ্ম ভাবিয়া পূজা করায়ও কিছুমাত্র দোষ নাই। দ্বৈতবাদিগণ আপনাদের বুদ্ধিভ্রংশবশতই ভাবেন, এরূপ করাতে পরব্রহ্মের অবমাননা করা হয় ও তাঁহার ঐশী শক্তি খর্ব্ব করা হয়।

এখন বিচার করিয়া দেখা উচিত, উপরোক্ত দুই মতের মধ্যে কোন্ মতটি অধিক প্রশস্ত ও যুক্তিসঙ্গত? অধ্যাত্মবিজ্ঞান চিরদিন অদ্বৈতবাদ প্রচার করে এবং দ্বৈতবাদকে লৌকিক মত বলিয়া উপেক্ষা করে, ইহার প্রিয়শিষ্য বেদান্ত দর্শনও অদ্বৈতবাদেরই সম্যক পোষকতা করে। বিজ্ঞান যেমন লৌকিক ঈশ্বরের উপর খড়্গাহস্ত, যে লৌকিক দ্বৈতবাদ হইতে লৌকিক ঈশ্বর উদ্ভূত, উহার উপরও ইহা তেমনি খড়্গহস্ত।

মানবমনের প্রকৃতি যেরূপ, তাহাতে আমরা সচরাচর ভাবিয়া থাকি, মন ও শরীর স্বতন্ত্র বস্তু। মন সূক্ষ্ম ও চৈতন্যময়, আর শরীর স্থূল ও অচেতন।

চৈতন্যময় মন বা আত্মা যতদিন জীবদেহে বর্ত্তমান থাকে, ততদিন দেহ চৈতন্য-ময় হইয়া সংসারের নানাকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকে। যে দিন আত্মা শরীর হইতে বিচ্যুত হয়, শরীরও সেইদিন জড়পদার্থের ন্যায় অচেতন হইয়া পড়িয়া থাকে। এই লৌকিক সংস্কারবশতঃ আমরা সচরাচর ভাবি, যে স্থূল অচেতন জড়জগৎ আমাদের চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ, শরীরস্থ আত্মার ন্যায় উহারও এক চৈতন্যময় অধিষ্ঠাতা পুরুষ আছেন। তিনিই আমাদের পরমপিতা পরমেশ্বর। তিনিই ইহার একমাত্র স্রষ্টা ও পাতা। যেমন আত্মা শরীর হইতে পৃথক্, ঈশ্বরও সেইরূপ জগৎ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। অতএব দ্বৈতবাদী ভাবেন, জগদীশ্বর জগতের অন্তরালে বসিয়া ইহার সৃষ্টি ও পালন করেন এবং তাঁহাকে তিনি নিজ মনের প্রকৃত্যনুযায়ী ভাবিয়া মনে করেন, তিনি সত্যপথে অধিক অগ্রসর।

এখন জিজ্ঞাস্য, মন ও শরীর আপাতদর্শনে পৃথক্ বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও, উহারা কি বস্তুতঃ পৃথক্? প্রকৃতিপুস্তক অধ্যয়ন করিলে আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি, প্রকৃতিজগতে জড় ও শক্তি অবিভাজ্যরূপে সম্মিলিত ও একী-ভূত; জড় ব্যতীত শক্তির অস্তিত্ব নাই, বিকাশ নাই; উহারা কদাচ পৃথক্‌ভাবে অবস্থিতি করে না। সেইরূপ জীবদ্দশায় মন ও দেহ অবিভাজ্যরূপে ও অভিন্নভাবে জড়িত ও মিলিত; দেহ ব্যতীত মনের অস্তিত্ব নাই, স্ফূর্ত্তি নাই, বিকাশ নাই। স্থূল মস্তিষ্কই সূক্ষ্ম মনের যন্ত্র এবং মস্তিষ্ক হইতে ইহা উপজাত; সেইরূপ বিশ্ব ও ব্রহ্ম চিরদিন অবিভাজ্যরূপে ও অভিন্নভাবে মিলিত ও একী-ভূত। যদি বিশ্ব ব্রহ্মের উপাদান সমষ্টি বা বিরাটরূপ হয় এবং ব্রহ্ম বিশ্বের চিৎশক্তির সমষ্টি হন, উভয়েই যে পরস্পর অবিভাজ্যরূপে ও অভিন্নভাবে জড়িত ও মিলিত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং লৌকিক দ্বৈতবাদ অপেক্ষা অদ্বৈতবাদ অধিক যুক্তিসঙ্গত।

আরও দেখ, জগতের যাবতীয় পদার্থ অন্তর্নিহিত শক্তি বলে চিরদিন পরিবর্ত্তিত, বিবর্ত্তিত, বিকসিত ও স্ফুরিত হইতেছে, কদাচ বহির্দ্দেশস্থ চিৎশক্তি ইহাকে বহির্দ্দেশ হইতে পরিচালিত করে না। অতএব আমাদের ইহা কদাচ ভাবা উচিত নয় যে, বহির্দ্দেশস্থ বা অন্তরালস্থ ঈশ্বর বহির্দ্দেশ হইতে জগৎ পরিচালন করিতেছেন। অতএব যে দ্বৈতবাদী ভাবেন, ঈশ্বর স্বর্গ হইতে এ জগৎ সৃষ্টি ও পালন করেন, তিনি প্রকৃততত্ত্বজ্ঞ নন।

Extracosmic anthromorphic God is what human Philosophy rejects, (Secret Doctrine) "বহির্দ্দেশবাসী মূর্ত্তিমান ঈশ্বরকে মানবের দর্শনশাস্ত্র একেবারে অগ্রাহ্য করিতেছে।"

অধ্যাত্মবিজ্ঞান চিরদিন উপদেশ দেয়, যিনি বর্দ্ধিত হইয়া এই বিশ্বপ্রপঞ্চে পরিণত, তিনিই ব্রহ্ম। তিনি ইহার উপাদানসমষ্টি, আবার তিনিই ইহার চিৎশক্তির আধার। তাঁহারই একাংশ বা উপাদানসমষ্টি তাঁহারই অপরাংশ চিৎশক্তিযোগে বিবর্ত্তিত ও স্ফুরিত। ব্রহ্ম ব্যতীত জগতে আর কিছুই নাই। স্থূল বা সূক্ষ্ম বল, জড় বা শক্তি বল, জ্ঞান বা অজ্ঞান বল, সকলই ব্রহ্ম। অতএব ইহার মতে ব্রহ্মে ও বিশ্বে কিছুমাত্র ভেদাভেদ নাই এবং যাহা বিশ্ব বা প্রকৃতি, তাহাই ব্রহ্ম। ইহার মতে অদ্বৈতবাদ (Pantheism) জগতের অমোঘ সত্য এবং সাধারণপ্রচলিত দ্বৈতবাদ (Dualism) লৌকিক মত মাত্র। আমাদের বেদান্তদর্শন অধ্যাত্মবিজ্ঞানের জ্যোতি পাইয়া অদ্বৈতবাদই চিরদিন হিন্দুজগতে প্রচার করিয়া আসিতেছে।

অদ্বৈতবাদ অধ্যাত্মবিজ্ঞানের মহাসত্য বলিয়া ধর্ম্মাত্মা হিন্দু আপনাকে 'সোহহং' এবং তোমাকে 'তত্ত্বমসি' বলেন এবং যোগী আপনাকে হংস বা অহংস বলেন। অদ্বৈতবাদ অধ্যাত্মবিজ্ঞানের মহাসত্য বলিয়াই ধর্ম্মাত্মা হিন্দু যে স্থলে ঐশী শক্তির অধিক বিকাশ দেখেন, সেই স্থলেই তিনি ভক্তিভাবে প্রণত হন; যে মানবে ঐশী শক্তির অধিক বিকাশ দেখেন, তাঁহাকেই ঈশ্বরাবতার বলিয়া তিনি নিজ জীবনের আদর্শপুরুষ করেন। অদ্বৈতবাদ অধ্যাত্মবিজ্ঞানের মহাসত্য বলিয়াই তিনি একখণ্ড শিলাকে ব্রহ্মজ্ঞানে পূজা করুন বা মৃত্তিকাদি লইয়া তাঁহার প্রতিমা গঠন করিয়া পূজা করুন, কিছুতেই তিনি দোষের ভাগী হন না; বরঞ্চ এইরূপ করিয়াই তিনি মনের আন্তরিক ব্রহ্মভক্তি সম্যক প্রকাশ করেন। ইহাতে নিরাকারবাদিগণ যতই কেন তাঁহার উপর উপহাস ও বিদ্রূপ করুন না, তিনি কদাচ তাঁহাদের কথায় দৃকপাত করিবেন না; মনে জানেন, তিনিই তাঁহাদের অপেক্ষা সত্যপথে অধিক অগ্রসর।

দার্শনিক পণ্ডিতগণ বলেন, দ্রষ্টা ও দৃশ্য পৃথক্ হইলেও বস্তুতঃ উহারা এক। দৃশ্যটী দ্রষ্টার চৈতন্যের বিকার বা রূপান্তর মাত্র (Subjective Idealism)। প্রকৃতিসিদ্ধ অধ্যাস বশতঃ আমরা উহাকে স্বতন্ত্র দেখি বটে,

কিন্তু বস্তুতঃ উহা ও আমি এক পদার্থ। যে বৃক্ষটী তুমি নিজ চক্ষে দেখিতেছ, উহা তোমার চৈতন্যের বিকার মাত্র; কিন্তু প্রাকৃতিক বা মায়াজন্য অধ্যাসবশতঃ তুমি উহাকে মন হইতে স্বতন্ত্র দেখিতেছ। পঞ্চেন্দ্রিয়ের মহাফাঁদে পতিত হইয়া আমরা সকলে এ সংসারে মায়ামুগ্ধ; সেজন্য আমরা ঐরূপ দেখিতে চিরদিন বাধ্য।

জগতের যাবতীয় বস্তুর এইরূপ অধ্যাস জীবমাত্রেরই প্রকৃতিসিদ্ধ। এই প্রকৃতিসিদ্ধ অধ্যাসবশতঃ আত্মার আমিত্বজ্ঞান বৈশেষিক এবং জগতের যাবতীয় পদার্থের জ্ঞানও উহা হইতে স্বতন্ত্র। এই প্রকারে আমাদের স্বভাবতঃ জ্ঞান জন্মে, আমি যেমন জগৎ হইতে পৃথক্, ব্রহ্ম তেমনি বিশ্ব হইতে স্বতন্ত্র। কিন্তু যথার্থ ভাবিতে গেলে, ব্রহ্ম ও বিশ্ব এক পদার্থ; উহাদের ভিতর কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। অতএব অদ্বৈতবাদই জগতের অমোঘ সত্য।

যাহা হউক, অদ্বৈতবাদ সত্য হউক বা দ্বৈতবাদ সত্য হউক, হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত মাহাত্ম্য এই যে, এ ধর্ম্ম ব্রহ্মকে অদ্বৈতভাবে যেমন দেখে, দ্বৈতভাবেও সেইরূপ দেখে। ধর্ম্মাত্মা হিন্দু ব্রহ্মকে দ্বৈতভাবে দেখেন বলিয়া তাঁহার সাত্ত্বিকরূপ বিষ্ণুরূপী ঈশ্বর বৈকুণ্ঠবাসী বা গোলোকবাসী। তিনি ব্রহ্মকে অদ্বৈতভাবে দেখেন বলিয়া অন্তে পূর্ণব্রহ্ম হইয়া নির্ব্বাণপদলাভই তাঁহার ধর্ম্মসাধনার চরমফল এবং ইহজীবনে তিনি অপারভক্তিযোগে তন্ময়ত্বলাভের একান্ত প্রয়াসী। এখন বুঝিয়া দেখ, যে সকল দ্বৈতবাদী নিরাকারোপাসকগণ হিন্দুধর্ম্মকে অসার পৌত্তলিক বলিয়া অন্তরের সহিত ঘৃণা করে, উহারা কি ইহার মহোচ্চ ও স্বর্গীয় ভাব বুঝিতে সক্ষম?

সাকার ও নিরাকার উপাসনা।

পৃথিবীতে এখন দুইপ্রকার উপাসনাপদ্ধতি প্রচলিত আছে; তন্মধ্যে খৃষ্ট ও মুসলমান ধর্ম্ম নিরাকারোপাসক এবং বৌদ্ধ ও হিন্দু সাকারোপাসক। প্রথমোক্তেরা ঈশ্বরের কোনরূপ প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ না করিয়া মুখের কথায় তাঁহার উপাসনা করেন, আর শেষোক্তেরা তাঁহার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া নৈবেদ্যাদি প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার পূজা করেন।

এখন এই দুই উপাসনাপদ্ধতির গুণাগুণ বিচার করিবার পূর্ব্বে উপাসনার প্রধান উদ্দেশ্য কি, ইহা দ্বারা কি ২ মহোপকার সাধিত হয়, তাদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা উচিত।

প্রধানতঃ উপাসনার চারিটী মুখ্য উদ্দেশ্য আছে, যথা :—

(১) ঈশ্বরের গুণকীর্ত্তন।

(২) ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ।

(৩) আত্মা ও মনের উন্নতিসাধন।

(৪) সমাজবন্ধন।

প্রথমতঃ। ঈশ্বরের গুণানুকীর্ত্তনের উদ্দেশ্য কি? কীটাণুকীট মানবের কি সাধ্য, যে তিনি ভগবানের গুণানুকীর্ত্তন করিবেন? তবে কেন সকলে তাঁহার এত স্তবস্তুতি করে? যাঁহাকে আন্তরিক ভক্তি করা যায়, তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন না করিয়া থাকা যায় না। ভক্তি হইতে গুণানুকীর্ত্তন স্বতঃ আইসে। গুণানুকীর্ত্তন করিবার জন্য সকলে ভগবানের উপাসনা, স্তব, স্তুতি ও পূজা করে। আবার ভক্তবর এক নামে ডাকিয়া সন্তুষ্ট হন না। তিনি সহস্রবার সহস্র নামে তাঁহাকে ডাকিতে থাকেন কি বলিয়া ও কেমন করিয়া ভগবান্‌কে ডাকিতে হইবে, তাহা আমরা জানি না বলিয়া ধর্ম্মশাস্ত্র যে পথ দেখাইয়া দেয়, তাহাই আমরা চিরদিন অনুসরণ করি।

কেহ ২ মনে করেন, যেমন একজন নিজের প্রশংসা শুনিলে হর্ষোৎফুল্ল হইয়া চাটুকারের প্রতি সদয় হয়, ঈশ্বর বুঝি, উপাসকের মুখে নিজের গুণানুবাদ শ্রবণে তাহার প্রতি সকরুণ দৃষ্টিপাত করত নানা বিপদ আপদ হইতে উদ্ধার করিবেন ও নানাসুখে সুখী করিবেন। যাঁহারা এই ভাবিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিবেন, তাঁহারা পদে ২ বঞ্চিত হইবেন।

এস্থলে একজন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত বলিবেন, যখন এ সংসার অখণ্ডনীয় ও অপরিবর্ত্তনশীল নিয়মাবলি দ্বারা পরিচালিত, তখন ঈশ্বরের গুণানুকীর্ত্তন বা স্তবস্তুতি করিবার কি প্রয়োজন? যখন তিনি সংসারে সাক্ষীগোপালমাত্র, তখন তাঁহাকে ডাকাও মিছে। আর যদি তাঁহার গুণানুবাদ করিতে ইচ্ছা হয়, সামান্য কথায় গুণানুবাদ করিবার কি প্রয়োজন? প্রকৃতিজগতে তাঁহাকে যথার্থভাবে অন্বেষণ কর, বিজ্ঞানাদি পাঠ করিয়া তাঁহার অনন্ত মহিমা ও

মাহাত্ম্য বুঝিতে চেষ্টা কর, ইহাই তোমার যথার্থ ঈশ্বরোপাসনা। তাঁহার মতে "To write an Anatomy is offering the best hymn to God."

"একখানি শারীরস্থানবিদ্যাবিষয়ক পুস্তক লেখাই ঈশ্বরের যথার্থ স্তুতিবাদ।" এই প্রকারে তিনি সাধারণপ্রচলিত উপাসনাপদ্ধতির উপর উপহাস করিয়া থাকেন।

যিনি যাহাই বলুন না কেন, মানব এ সংসারে যেরূপ দুর্ব্বল ও অসহায় এবং তাহার চতুর্দ্দিকে বিপদরাশি অনুক্ষণ যেরূপ ঘনীভূত হইতেছে, তাহাতে দীনবন্ধু ঈশ্বরকে বা দয়াল হরিকে প্রাণ ভরিয়া ডাকা ব্যতীত তাঁহার উপায়ান্তর নাই। এজন্য সকলেই জানেন, তিনি নিজের মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের উপাসনা করেন বা দেবতাদিগের আরাধনা করেন।

এস্থলে যিনি ভগবানের পরমভক্ত সাধক, তিনি বলিবেন, তাঁহাকে কি বলিয়া ডাকিতে হইবে, তাহা ত আমি জানি না। আমি যে সামান্য কথায় ডাকি, তাহাতে তিনি প্রসন্ন হউন, আর না হউন, আমি ত চিরদিনই তাঁহাকে ডাকিব। ভবপারাবারে তিনিই সকলের কাণ্ডারী। ঈশ্বরকে ডাক, আর মা কালীকে ডাক, প্রাণভরে একান্তমনে যে নাম ধরিয়া ডাকিবে, সেই পরব্রহ্মকে ডাকা হইবে এবং তিনি তোমার প্রার্থনায় কর্ণপাত করিবেন। সেই সর্ব্বমঙ্গলা কোন্ দিক দিয়া তোমার মঙ্গল করিবেন, তাহা ও তুমি জান না। তুমি কদাচ সেই ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা ভেদ করিতে পার না। কেবল তাঁহাকে প্রাণভরে ডাকিতে থাক, ডাকিলেই তোমার সর্ব্বদিকে মঙ্গল হইবে।

দ্বিতীয়তঃ। হৃদয়ের কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ উপাসনার এক প্রধান উদ্দেশ্য। সংসারের নিয়ম এই, যাঁহার নিকট আমরা কোনরূপ মহোপকার পাই, তাঁহার নিকট আমরা স্বতঃ কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকি এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারি না। সংসারে কৃতঘ্নের মত পাপিষ্ঠ নরাধম আর নাই। এখন দেখ, যে পরম কারুণিক পরমেশ্বর বা যে সকল দেবতা হইতে সংসারের অশেষ ভোগ্য বস্তু লাভ করিয়া আমরা পরমসুখে কালাতিপাত করি, তাঁহার বা তাঁহাদের নিকট আমরা কতদূর কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। মনের যথার্থ কৃতজ্ঞতা দেখাইবার জন্য আমরা তাঁহার উপাসনা করি বা তাঁহাদের পূজার্চ্চনা করি।

এ স্থলে নিরাকারোপাসকেরা মনের প্রকৃতানুযায়ী কতকগুলি উৎকৃষ্ট গুণ লইয়া নিরাকার ঈশ্বরের নিরাকার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক কতকগুলি ভক্তিব্যঞ্জক কথায় তাঁহার উপাসনা করে, আর সাকারোপাসকেরা নিজ শরীরের প্রকৃত্যনুযায়ী পূজ্য দেবতাদিগের মনোভিমত মূর্ত্তি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক নানা উৎকৃষ্ট দ্রব্যের আয়োজন করিয়া অপার ভক্তির সহিত ইঁহাদের পূজার্চ্চনা করেন। দেখ সকলেই নিজ নিজ মনের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বটে, কিন্তু যাহারা সামান্য কথা অপেক্ষা কার্য্যতঃ কৃতজ্ঞতা দেখায়, তাহাদের কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ অধিক প্রশংসনীয়। উপকারী ব্যক্তিকে কথায় ধন্যবাদ দিলে ভাল দেখায়, না অর্থাদি দিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলে ভাল দেখায়? রাজকর্ম্মচারীকে কথায় তোষামোদ করিলে অধিক প্রসন্ন হইবেন, না ভেটাদি দিলে তিনি অধিক প্রসন্ন হইবেন? যদি বল, ঈশ্বর বা দেবগণ কাহারও কোন দ্রব্য নিজে গ্রহণ করেন না, অপরে তাঁহাদের পরিবর্ত্তে গ্রহণ করে, তবে নামমাত্র তাঁহাদিগকে ঐ সকল নিবেদন করিবার কি প্রয়োজন? যখন পূজ্য পুরোহিত মহাশয়, বা ব্রাহ্মণরূপী নারায়ণ তাহা গ্রহণ করেন, তখন তাহা ঈশ্বরেরই গ্রহণ করা হইল। এ স্থলে দেবতার নামে ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে দিয়া সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণ-জাতি আমরা রক্ষা করি ও সমাজের সেবা করি।

তৃতীয়তঃ। মনের আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন উপাসনার আর এক মহৎ উদ্দেশ্য। যে মানব সংসারে চতুর্দ্দিকে অশেষ পাপতাপের মধ্যে অবস্থিত, যাহার দুর্ব্বল মন সদা পাপপ্রলোভনে প্রলোভিত এবং বিবিধ জ্বালায় ও যন্ত্রণায় প্রপীড়িত, তিনি মধ্যে মধ্যে ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া বা ভগবান্‌কে ডাকিয়া নিজ মনকে ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ করেন ও সংসারের পাপতাপের যুদ্ধে জয়লাভ করিতে চেষ্টা পান। এ বিষয়ে নিরাকারোপাসক যতদূর কৃতকার্য্য হন, সাকারোপাসককে তদপেক্ষা অধিক কৃতকার্য্য হইতে দেখা যায়। নিরাকারোপাসনা দ্বারা ভক্তি দয়া প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রবৃত্তিগুলির যেরূপ উন্নতি সাধিত হয়, সাকারোপাসনা দ্বারা তদপেক্ষা অধিক ফল লাভ করা যায়। আবার ভগবানের অবতারদিগের সাংসারিক লীলা শ্রবণে সাত্ত্বিক ভাবাবলির যেরূপ স্ফূর্ত্তি হয়, এমন কিছুতে সম্ভব নয়।

চতুর্থতঃ। যে সমাজে বসবাস করিয়া মানব এতদূর জাতীয় উন্নতি সাধন

করিতে সমর্থ হন, সেই সমাজের বন্ধন উপাসনার আর এক মহৎ উদ্দেশ্য। পাঁচজনে ধর্ম্মমন্দিরে একত্রিত হইয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিলে যেমন দৃষ্টান্ত দ্বারা উহাদের মনে ধর্ম্মভাব সম্যক স্ফুরিত হয়, তেমনি এরূপ পদ্ধতি দ্বারা সমস্ত সমাজ ধর্ম্মবন্ধনে প্রকৃষ্টরূপ আবদ্ধ হইয়া থাকে। পাশ্চাত্যজগতে যেস্থলে খৃষ্টাদি একেশ্বরবাদী ধর্ম্ম সপ্তাহে সপ্তাহে স্বসেবকদিগকে গির্জ্জাদিতে একত্রিত করত ঈশ্বরের উপাসনা করাইয়া উহাদের মনে ধর্ম্মভাব প্রস্ফুরিত করে, সে স্থলে প্রাচ্যজগতে হিন্দু প্রভৃতি সাকারবাদী ধর্ম্ম বৎসরের মধ্যে মধ্যে মন্দিরে পুরোহিত দ্বারা দেবদেবীর পূজার্চ্চনা করাইয়া সকলের ভক্তি প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রবৃত্তিগুলির উৎকর্ষ সাধন করে ও স্বসমাজকে দৃঢ়রূপে বন্ধন করে। উভয় প্রথার উদ্দেশ্য এক। সমাজোন্নতির জন্য যে ধর্ম্ম যে প্রথা ভাল বিবেচনা করে, সে ধর্ম্ম সেই প্রথা অবলম্বন করে। তন্মধ্যে সাকারোপাসকের প্রথা অতি সহজ ও ফলদায়ক।

অনেকে বলিয়া থাকেন, রীতিমত ঈশ্বরের উপাসনা করিলে তিনি আমাদের উপর সন্তুষ্ট হন এবং আমরা ধর্ম্মপথে অগ্রসর হই; অতএব তাঁহার উপাসনা করা সকলের একান্ত কর্ত্তব্য। আর যাঁহারা ভাবেন, জগৎ অখণ্ড্য নিয়মতন্ত্রের অধীন, ঈশ্বর আদৌ খামখেয়ালি নন, তাঁহারা বলেন, তাঁহার উপাসনা করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। দিবারাত্রি তাঁহার প্রিয়কার্য্য কর এবং পাঁচজনের ভাল কর, ইহাই তোমার শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মানুষ্ঠান। ইহাতে সামান্য মৌখিক উপাসনা অপেক্ষা অধিক ফল পাওয়া যায়। দেখ, যিনি ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী জপেন, সদা জপমালা ঠক্‌ঠকান বা প্রত্যহ পাঁচবার নামাজ পড়েন, অথচ মনে মনে সদা পরের অনিষ্ট চিন্তা করেন, তিনি কেমন ধার্ম্মিক? যে সন্ন্যাসী দিবারাত্রি কামিনীকাঞ্চনের বিষয় ভাবেন, তিনি কি ভণ্ড তপস্বী নন?

বিজ্ঞান সকল ধর্ম্মের উপর উপহাস করিয়া বলিবে, ঈশ্বরোপাসনা বা দেবার্চ্চনা সমাজের একটা পরম্পরাপ্রচলিত পদ্ধতি বা কায়দামাত্র (formality)। ইহাতে মনের উপকার হউক বা না হউক, ইহা দ্বারা সমাজ ধর্ম্মবন্ধনে প্রকৃষ্টরূপ আবদ্ধ হয় মাত্র। এজন্য সুশিক্ষিত সম্প্রদায় আজকাল ভক্তিপূর্ব্বক ঈশ্বরোপাসনা বা দেবার্চ্চনা করিতে চান না। কিন্তু তাঁহাদের স্মরণ রাখা

কর্ত্তব্য, যেমন সলিল বিনা মৎস্য জীবিত থাকে না, সেইরূপ ধর্ম্ম বিনা কোন সমাজ স্থায়ী হয় না। বিজ্ঞানের কথায় কি আসিয়া যায়?

সনাতন হিন্দুধর্ম্ম মনের প্রকৃত উন্নতিসাধনের জন্য দুই প্রকার উপাসনা পদ্ধতি উপদেশ দেয়। যথা:—

(১) সাকার দেবদেবীর পূজন।

(২) নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা।

প্রথমটী দ্বিতীয়টির সোপান বা পথদর্শক। প্রথমে আজীবন সাকার দেবদেবীর পূজার্চ্চনা করিয়া নিজ মনকে সুসমাহিত ও একাগ্র করিতে চেষ্টা পাও, তবে তুমি বহুকাল পরে নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনার উপযুক্ত হইবে। এক লম্ফে বৃক্ষের শীর্ষদেশে আরোহণ করা যায় না। আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে যথাক্রমে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে হয়।

কলিকালে জীবাত্মার আধ্যাত্মিক অধঃপতন বশতঃ প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনা এখন সকলের পক্ষে দুঃসাধ্য। সে জন্য যে স্থলে খৃষ্টাদি ধর্ম্ম ব্রহ্মোপাসনার পরিবর্ত্তে মনের প্রকৃতানুযায়ী সগুণ-নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা বিধিবদ্ধ করে, সেস্থলে তোমার শ্রেষ্ঠ সনাতন হিন্দুধর্ম্ম তোমার অশেষ মঙ্গলের জন্য নির্গুণ পরব্রহ্মের স্থানে বা সগুণ নিরাকার ঈশ্বরের স্থানে সাকার দেবদেবীর পূজা উপদেশ দেয় এবং সহজ উপায়ে তোমার চঞ্চল মনকে একাগ্র করিতে সাধ্যমত চেষ্টা পায় ও অনন্য ভক্তি উদ্রেক করাইয়া ঈশ্বরের তন্ময়ত্ব লাভে সাহায্য করে।

হিন্দুধর্ম্মের নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা এ জগতে অতুলনীয়। ইহাই সাধনার পরাকাষ্ঠা এবং ইহাই এ সংসারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপাসনাপদ্ধতি। ইহার সহিত কোন ধর্ম্মের কোনরূপ উপাসনার তুলনা হইতে পারে না। ইহার সহিত তুলনা করিলে আধুনিক সভ্যযুগের নিরাকারোপাসনা সর্ব্বথা অসার ও অপদার্থ।

মায়াতীত ও গুণাতীত পরব্রহ্ম দুইপ্রকারে জানা যায়, স্বরূপলক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ দ্বারা। যখন যোগসিদ্ধ মহাত্মাগণ সমাধিবলে প্রকৃতিদত্ত মায়াঠুলি পরিহার করিয়া অর্থাৎ পঞ্চেন্দ্রিয় ও মনকে মূলপ্রকৃতিতে লীন করিয়া জীবাত্মাকে পরমাত্মায় সংযোজিত করেন, তখন তাঁহারা পরব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ

প্রাপ্ত হন। তাঁহারা প্রকৃতরূপ ব্রহ্মদর্শন করেন এবং তাঁহাদের আত্মায় অণিমাদি যোগের অষ্টসিদ্ধি স্ফুরিত হয়। তাঁহারা যোগবলে ত্রিকালজ্ঞ, সর্ব্বজ্ঞ ও অনন্তশক্তিশালী হন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কলিযুগবর্দ্ধনের সঙ্গে এরূপ যোগসাধন ক্রমশঃ দুঃসাধ্য হইতেছে। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যাহা ছিল, এখন তাহা আর নাই। এখন যাহা আছে, সহস্র বৎসর পরে তাহাও থাকিবে না।

আজকাল পরমহংসগণ সাধনবলে পরব্রহ্মের তটস্থ বা বাহ্যলক্ষণ বুঝিতে পারেন। যুগধর্ম্মানুসারে যদবধি মানবের তৃতীয় জ্ঞানচক্ষু অপগত হওয়ায় তাঁহার সহজাত যোগবল হ্রাস পাইয়াছে, তদবধি তাঁহার ব্রহ্মদর্শনক্ষমতাও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখন এ কলিযুগে পরমহংসগণ হঠযোগাদি প্রক্রিয়াগুলি অবলম্বন করিয়া ইন্দ্রিয়সংযম করত ধ্যানধারণাবলে পরব্রহ্মে একনিষ্ঠ হইতে চেষ্টা পান। তাঁহারা বিবিধ আসন, অঙ্গন্যাস, প্রাণায়াম, ব্রহ্মমন্ত্র জপ, ধ্যান-ধারণা প্রভৃতি নানা উপায় অবলম্বন করিয়া পূতাত্মা হন ও সদা ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন থাকেন। কলিযুগে তাঁহারাই প্রকৃত ব্রহ্মোপাসক।

দুঃখের বিষয়, উপরোক্ত ব্রহ্মোপাসনা আজকাল গৃহস্থ জনসাধারণের পক্ষে নিতান্ত দুঃসাধ্য ও ক্লেশকর। এজন্য খৃষ্টানদিগের ভিতর ঈশাদেব ও মুসলমানদিগের ভিতর মহম্মদদেব কলিকালের মানবমনের প্রকৃত্যনুযায়ী সগুণ নিরাকার ঈশ্বরের আরাধনা বিধিবদ্ধ করিয়া দুষ্কর ব্রহ্মোপাসনা কথঞ্চিৎ সহজ ও কালোচিত করিয়া যান। এ দেশেও রামমোহন রায়প্রমুখ সংস্কারক-গণ কালোচিত ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্ত্তিত করিয়া ইহাকে কথঞ্চিৎ সহজ করিয়া গিয়াছেন॥

যদি এরূপ ঈশ্বরের উপাসনা সাধারণের পক্ষে সহজ, তবে কেন পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম এরূপ সহজ প্রথা অবলম্বন করে নাই? যে সনাতন ধর্ম্ম যুগযুগান্তর ব্যাপিয়া জগতে প্রচলিত, যে ধর্ম্ম পূর্ব্বতন যুগের ব্রহ্মোপাসনার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝে, সে ধর্ম্ম কি প্রকারে উহার পরিবর্ত্তে নিরাকার ঈশ্বরের এরূপ সামান্য আরাধনায় সন্তুষ্ট হইতে পারে? ইহাতে কি মনের সকল আকাঙ্ক্ষা ও ধর্ম্ম-পিপাসা প্রকৃতরূপ শান্ত হইতে পারে? ইহাতে কি জনসাধারণ ধর্ম্মপথে পশ্চাৎপদ হয় না? এই সকল দেখিয়া শুনিয়া হিন্দুধর্ম্মকে আরও সহজ ও

ফলদায়ক পন্থা অবলম্বন করিতে হইয়াছে। তাহাই ইহার সাকার দেবদেবীর পূজার্চ্চনা।

ইতিপূর্ব্বে অনেক স্থলে উল্লেখ করিয়াছি, মায়াতীত ও গুণাতীত পর-ব্রহ্মের পরিবর্ত্তে সগুণ নিরাকার ঈশ্বরের ভজনা করিলে ঘাড়েগর্দ্দানে এক প্রকার ব্রহ্মোপাসনা করা যায় বটে; কিন্তু ইহাতে প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনার অবমাননা করা হয়। কোথায় ইহার প্রধান উপকরণ, যোগসাধন ও তপশ্চরণ, আর কোথায় ঈশ্বরোদ্দেশে মুখ হইতে গুটিকয়েক কথা উচ্চারণ মাত্র?

তাহার সাক্ষ্য দেখ—

Hallowed be thy name glory to thee, thy kingdom come.

আলোক হইতে অন্ধকারে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া যাও। ইত্যাদি—

এরূপ কতকগুলি অসার বাক্যসমন্বয় ঈশ্বরোদ্দেশে উচ্চারণ করিলে মনের কি উন্নতিসাধন হইবে? ইহাতে প্রেমবাৎসল্যাদি সাত্ত্বিক ভাবাবলির কি-রূপ স্ফূর্ত্তি হইবে? চঞ্চল মনের যে একাগ্রতা ও বৈরাগ্যলাভ দ্বারা জীবাত্মার মহোপকার সাধিত হয়, তাহা কি এরূপ মুখের সামান্ত উপাসনায় সম্ভব? ঐ সকল কথা যেমন একদিকে মুখ হইতে নিঃসৃত হইতেছে, তেমনি অপর দিকে উহারা আকাশে বিলীন হইয়া যাইতেছে। মনের উপর উহাদের কোন স্থায়ী কার্য্য থাকে না। তুমি না হয়, অশেষ কায়দাকারণ করিয়া ভক্তি পূর্ব্বক ঐ সকল কথা উচ্চারণ করিলে, তাহাতেই বা অধিক কি ফল পাইবে? এজন্য প্রকৃততত্ত্বদর্শী হিন্দুধর্ম্ম সকলের মঙ্গলের জন্য অসার নিরাকারোপাসনাকে অবজ্ঞা করিয়া আধুনিক ভক্তিযোগ প্রকটিত করে, চঞ্চল মনের একাগ্রতা লাভের জন্য হরিব মোহনমূর্ত্তি সকলের সমক্ষে ধারণ করে এবং যোগসাধনের প্রথম সোপান, জপপ্রাণায়ামাদি দেবার্চ্চনায় ভালরূপ উপদেশ দেয়। ইহাতে মন ক্রমশঃ একাগ্রতা লাভ করিতে থাকে এবং পরব্রহ্মে একনিষ্ঠ হয়।

নিরাকারোপাসনা যে কেবল অসার ও অকিঞ্চিৎকর, তাহা নহে। ইহা জনসাধারণের পক্ষে অতীব ক্লেশকর। যখন তুমি যথার্থরূপে নিরাকার ঈশ্বরের রূপ ধ্যান করিতে যাও, তখন তুমি মনোমধ্যে বিরাট শূন্য দর্শনে ব্যথিতচিত্ত হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইবে, তখন তুমি হৃদয়ের গাঢ়ান্ধকার দর্শনে অস্থিরচিত্ত হইবে। নিরাকার ঈশ্বরকে পাঁচজনে মনে মনে যে ভাবে ডাকে, তুমিও

সেইরূপ মনে মনে ভাবিতে পার; কিন্তু তিনি নিরাকার বা অরূপ বলিয় তাঁহার যথার্থ ধ্যান ধারণা করিতে পারিবে না।

হৃদয়ের গাঢ় অন্ধকার দূর করিয়া তোমার মনকে সুস্থির করিবার জন্য তোমার শ্রেষ্ঠ সনাতন ধর্ম্ম তোমার হৃদয়মন্দিরে হরির মোহনমূর্ত্তি বা মা কালীর ভীষণ মূর্ত্তি স্থাপন করে। তুমিও সেই মূর্ত্তি দেবমন্দিরে ভক্তিভাবে দর্শন করিয়া বা হৃদয়মন্দিরে মনে ২ ধ্যান করিয়া একাগ্রচিত্ত হইতে সতত যত্নবান্ হও। অতএব মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা উচিত, জনসাধারণের সুবিধার জন্য, সমাজের অশেষ মঙ্গলের জন্য এ ধর্ম্ম সাকার দেবদেবীর পূজার্চ্চনা বিধিবদ্ধ করিয়াছে। ধর্ম্মসাধনার এমন সহজ ও সুগম উপায় কোন দেশের কোন ধর্ম্ম কোনকালে ভাবিতে পারে নাই।

নিরাকারোপাসনায় তোমরা কি দেখিতে পাও? কতকগুলি লোক বেশভূষা করিয়া ধর্ম্মমন্দিরে একত্রিত হইয়াছে ও মুখে ঈশ্বরের উপাসনা বা নামাজ করিতেছে। অর্গান বাজিতেছে, বিবিজানেরা বামাকণ্ঠে ঈশ্বরের গান করিতেছে এবং ধর্ম্মযাজক মহাশয় মুখে ধর্ম্মোপদেশ দিতেছেন। আর সাকারোপাসনায় তোমরা কি দেখিতে পাও? ধর্ম্মমন্দিরে ঈশ্বরের এক বিগ্রহ বা সাকারমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। পুরোহিত মহাশয় ষোড়শোপচারে উহার পূজা করিতেছেন। ধূপধূনা ও দীপ জ্বলিতেছে, ঘণ্টা ও বাদ্য বাজিতেছে, মঙ্গলারতি হইতেছে, বালকগণ আনন্দে নৃত্য করিতেছে ও মহিলাগণ সতৃষ্ণনয়নে দেখিতেছে। বড়ই ধুমধাম ব্যাপার! সকলই এ জগতে মনোরম ও হৃদয়গ্রাহী। সে দৃশ্য দেখিলে কাহার না মন আনন্দসলিলে ও ভক্তিরসে আপ্লুত হইবে?

সাকার মূর্ত্তিপূজনে হিন্দুধর্ম্মের গূঢ় রহস্য আরও বিশদভাবে ব্যাখান করা আবশ্যক। মানবমন এতদূর অসম্পূর্ণ যে, ইহার দ্বারস্বরূপ পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীত ইহা কোন বিষয় ভালরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না। যাহা তুমি চক্ষে দর্শন কর, তাহার অঙ্কন মানসপটে ভালরূপ পতিত হয় এবং তাহা তুমি ভালরূপ উপলব্ধি কর। যাহা তুমি চক্ষে দেখিতে পাও না, উহার বিষয় শিক্ষা করিয়া ও শিক্ষানুযায়ী ভাবিয়া চিন্তিয়া উহার একপ্রকার মনগড়া রূপ ঠিক করিতে পার; কিন্তু তাহা অসম্পূর্ণ ও অতৃপ্তিকর। অসম্পূর্ণ মনকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিবার জন্য প্রত্যেক বিষয়কে পঞ্চেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত করা আবশ্যক।

ভূমণ্ডলের সম্যক্ জ্ঞানলাভের জন্য ছাত্রগণ কেন ভূচিত্রাবলি দর্শন করিয়া ভূগোল পাঠ করে? যেমন সুবিশাল ভূমণ্ডল সামান্য মানচিত্রে অঙ্কিত হইলে, উহা সকলের প্রকৃতরূপ আয়ত্ত হয়; সেইরূপ অনন্ত ব্রহ্মকে সসীম আকারে বা মানবাকারে পরিণত করিয়া দেখিলে ও ভাবিলে তিনিও অতি সহজে আমাদের অসম্পূর্ণ মনের সম্যক্ আয়ত্ত হইবেন। সত্য বটে, শিক্ষানুযায়ী অনুচিন্তন ও অভ্যাসবশতঃ তুমি ঈশ্বরকে নিরাকার মনের প্রকৃতি অনুসারে নিরাকার ভাবে ভাবিতে ও ডাকিতে শিক্ষা কর; কিন্তু এরূপ অসম্পূর্ণ ভাবে ঈশ্বর ভাবনা করিয়া আমরা আদৌ তৃপ্তিবোধ করি না এবং আমাদের মন অকৃতার্থ হইয়া থাকে।

যদি অনন্ত ব্রহ্মকে যথার্থভাবে ভাবিতে ইচ্ছা কর, যে অনন্ত বিশ্ব তাঁহার বিরাট রূপ, যাহাতে তিনি সদা দেদীপ্যমান, সেই অনন্ত বিশ্বকে ভাবা উচিত। যে অনন্ত মহাশক্তির মহালীলায় এই অনন্ত বিশ্বের অনন্ত ব্যাপার ঘটিতেছে, সেই মহাশক্তিকে, সেই মা জগদম্বাকে যদি ভাবিতে চাহ, তবে অনন্তবৈচিত্র্য-বিশিষ্ট অনন্তগুণোদ্ভাসিত অনন্তবিশ্বকে দেখা উচিত। অনন্তবিশ্ব লইয়া আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি কি করিতে পারে? ইহা যদি বিশ্বকে ভাবিতে যায়, ইহা পদে ২ বিঘূর্ণিত হইবে। তবে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের কথা ছাড়িয়া দেও। এখন ইহার একখণ্ড লইয়া ব্রহ্মকে ভাবিয়া দেখ। ইহাতে আমাদের মন সুস্থির হইবে এবং হর্ষোদ্রেক হইবে।

যে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের বিরাট্ রূপ দর্শন করিয়া স্তম্ভিত ও ব্যথিতচিত্ত হন, তিনিই আবার তাঁহার সৌম্য শান্ত মানবরূপ দেখিয়া সুস্থির হন।

দৃষ্টেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন
ইদানী মস্মি সংবৃত্তঃ সচেতঃ প্রকৃতিং গতঃ।

(গীতা)

"হে জনার্দ্দন! এক্ষণে তোমার প্রশান্ত মানবরূপ দর্শন করিয়া আমি প্রকৃতিস্থ ও প্রশান্তচিত্ত হইলাম।" সুতরাং নির্গুণ ব্রহ্মকে সগুণ মানবরূপে ভাবা উচিত এবং হিন্দুধর্ম্ম সাকারমূর্ত্তিপূজন বিধিবদ্ধ করিয়া আমাদিগকে একটা অসার পথ দেখায় নাই।

যেমন বিদ্যালয়ের একজন ছাত্র ভূমণ্ডলের মানচিত্র দর্শনে ইহার জ্ঞান সম্যক্ আয়ত্ত করে, সেইরূপ যিনি ব্রহ্মের পরম ভক্ত, তিনি অনন্ত ব্রহ্মকে স্বীয় ক্ষুদ্র বুদ্ধির সম্যক্ আয়ত্ত করিবার জন্য তাঁহাকে স্বমূর্ত্তিতে গঠিত করিবেন এবং নিজ মনের সন্তোষার্থ বিশ্বসংসার অন্বেষণ করিয়া সেই মূর্ত্তিকে মনোভিমত আভরণে ভূষিত করিবেন। এজন্য তাঁহার ভগবান পদ্মপলাশলোচন, শঙ্খচক্র-গদাপদ্মধারী শ্রীবিষ্ণু। ব্রহ্মে মনের একান্ত ভক্তি দেখাইবার জন্য তিনি সেই ব্রহ্মমূর্ত্তির শ্রীচরণকমলে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইবেন এবং নিজ দেহ বিলুণ্ঠিত করিবেন। এই প্রকারে তিনি পরব্রহ্মের প্রতি মনের আন্তরিক ভক্তি দেখাইয়া থাকেন। অতএব তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি দেখাইবার জন্য সাকারমূর্ত্তিপূজন একান্ত আবশ্যক।

ওহে সুশিক্ষিত পাঠক! এখনও যদি তোমার এরূপ সংস্কার মনে বদ্ধমূল থাকে যে, সাকারোপাসনা অপেক্ষা নিরাকারোপাসনা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ, তথাচ স্বধর্ম্মের সাকারোপাসনাকে অবজ্ঞা করিবার কিছুমাত্র কারণ নাই। মনে স্থিরনিশ্চয় করিয়া রাখ, স্বধর্ম্মপ্রতিষ্ঠিত সাকার দেবদেবীর পূজার মূলে সেই সত্য সনাতন, নিত্য নিরঞ্জন পরব্রহ্মের উপাসনা বা নিরাকার ঈশ্বরের আরাধনা ভালরূপ নিহিত আছে। যখন একজন হিন্দু দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া ষোড়শো-পচারে উহার পূজা করেন, তখন তিনি সেই জড়মূর্ত্তিতে ঐশীশক্তি কল্পনা করিয়া উহাতে হরিহরাদিরূপবিশিষ্ট ঈশ্বরের প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও আবাহন করত উহাকে পূর্ণব্রহ্মসনাতন ভাবিয়া পূজা করেন। সত্য বটে, সেই জড়মূর্ত্তি তাঁহার চর্ম্মচক্ষের বিষয়ীভূত, কিন্তু তিনি স্বহৃদ্‌পদ্মে বিশ্বাসানুযায়ী পরব্রহ্মের রূপ সন্দর্শন করত তদীয় পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দেন। এস্থলে তিনি নিজের অসম্পূর্ণ মনের প্রবোধের জন্য নির্গুণ পরব্রহ্মের একটী সগুণ স্থূলরূপ কল্পনা করিয়া তাঁহাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করত অপার ভক্তি ভাবে পূজা করেন। এই প্রকারে অনন্য ভক্তির সহিত ব্রহ্মমূর্ত্তির পূজা করিয়া তিনি অশেষ শ্রেয়োলাভ করেন।

শাস্ত্রমতে দেবদেবীর পূজা দ্বিবিধ, বাহ্যিক ও মানসিক। যখন একজন হিন্দু শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি সম্মুখে রাখিয়া উহার পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দেন, তখন তিনি স্থূল দেবমূর্ত্তির বাহ্যিক পূজা করেন বটে, কিন্তু সেই সময়েই আবার তিনি মনো-মধ্যে কৃষ্ণরূপধারী ভগবানের শ্রীচরণকমলে ভক্তিরূপ পুষ্পাঞ্জলি দিয়া তাঁহার

প্রকৃত মানসিক পূজা করিতে থাকেন। যখন তিনি দেবমূর্ত্তির সমক্ষে গললগ্নী কৃতবাসে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন, তখন তিনি নিজ মনোমন্দিরপ্রতিষ্ঠিত ঈশ্বরের সমক্ষে যথার্থ ভক্তিভাবে প্রণত হন।

মৃন্ময়ী বা পাষাণময়ী দেবমূর্ত্তি লইয়া পাদ্য অর্ঘ্যদানে পূজা করার নাম বাহ্যিক পূজা; আর কোনরূপ দেবমূর্ত্তি না লইয়া মনোমন্দিরে তাঁহার মূর্ত্তি স্থাপন পূর্ব্বক ধ্যান ধারণাবলে পূজা করার নাম মানসিক পূজা। ইহাতে বাহ্যিক কোন দ্রব্যের আয়োজন করিতে হয় না। ইহাতে পুষ্পের পরিবর্ত্তে অনন্ত বিশ্বাস এবং চন্দনের পরিবর্ত্তে অনন্যভক্তি ঢালিয়া দিতে হয়। যাহা হউক, উভয় প্রকার পূজাপদ্ধতিতে সমান ফল পাওয়া যায়।

হিন্দুধর্ম্ম পূজ্য দেবদেবীকে অপার ভক্তিভাবে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতে বলে।

জানুভ্যাঞ্চ তথা পদ্ভ্যাং পাণিভ্যামুরসা ধিয়া
শিরসাবচসা দৃষ্ট্যা প্রণামোঽষ্টাঙ্গ ঈরীতঃ।

"জানুদ্বয়, পদদ্বয়, হস্তদ্বয়, বক্ষঃস্থল, মন, শির, বাক্ ও দর্শনশক্তি দ্বারা যে প্রণাম করা যায়, তাহার নাম সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। হাটু গাড়িয়া, হাত পা গুটাইয়া মস্তক ও বুক মাটিতে মিশাইয়া, চক্ষুদ্বয় ও মনকে নত করিয়া এবং কথায় অশেষ নম্রতা দেখাইয়া যে প্রণাম করা যায়, তাহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম বলে।" এতদূর ভক্তিভাবে ভগবানকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতে কোন দেশের কোন ধর্ম্ম কোন কালে শিখায় নাই। এমন ঈশ্বরভক্তির পরাকাষ্ঠা কোনধর্ম্ম এজগতে দেখাইতে পারে নাই।

তুমি অপার ভক্তিপূর্ব্বক যে দ্রব্য দিয়া দেবমূর্ত্তির পূজা করিবে, ভক্তবৎসল হরি তাহাই সাদরে গ্রহণ করিবেন। এস্থলে বহুমূল্য দ্রব্যের আয়োজন চাই না, চাই কেবল হৃদয়ের অনন্ত ভক্তি, অনন্ত বিশ্বাস ও অনন্ত প্রেম। দেখ, যে শ্রীকৃষ্ণ দুর্য্যোধনপ্রদত্ত পলান্ন ভোজন করিয়া তৃপ্তি হন নাই, তিনি কিনা বিদুরের ক্ষুদকুড়া খাইয়া অশেষ রূপে পরিতৃপ্ত হন। ভগবানের নিকট ধনবান ও নির্ধন, ক্রোড়পতিও কাঙ্গাল সকলই সমান।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেন :—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যে মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃত মশ্নাতি প্রযতাত্মনঃ।

(গীতা)।

"যে সেবক অশেষ ভক্তিভাবে আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল ও জল যাহা কিছু প্রদান করে, আমি সেই পরমভক্তের প্রদত্ত দ্রব্য সাদরে গ্রহণ করি।" ঈশ্বর স্বয়ং কিছু গ্রহণ করেন না সত্য, কিন্তু যখন তাহার সৃষ্ট জীব উহা সেবন করে, তখন ভাবা উচিত, তাঁহারই সেবণ করা হইল।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেন :—

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতা স্তে মে যুক্ততমা মতাঃ।

(গীতা)

"যাঁহারা অপার ভক্তি ও শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আমাতে মনসংযোগ করিয়া নিত্য উপাসনা করেন, তাঁহারা আমার পরম ভক্ত ও তাঁহারা শ্রেষ্ঠ যোগী"। অতএব যাঁহারা অশেষ ভক্তিপূর্ব্বক নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা করেন বা সাকার দেবদেবীর পূজার্চ্চনা করেন, সকলেই ভগবানের পরমভক্ত সেবক। ইহাতে বুঝা উচিত, সাকার ও নিরাকার উপাসনায় কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। সকলেই এক গন্তব্য স্থলে উপস্থিত হইবার জন্য ব্যগ্র হইলেও ভিন্ন ২ পথ অবলম্বন করে মাত্র।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলেন :—

সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে (গীতা)

"যাঁহারা এক মনে ও এক ধ্যানে অশেষ যত্নপূর্ব্বক আমার গুণকীর্ত্তন করেন ও ভক্তিভাবে সদা নমস্কার করেন, তাহারা আমাতে একনিষ্ঠ ও একাগ্র হইয়া আমার উপাসনা করেন।" অতএব বিবিধ বিজ্ঞানশাস্ত্র অনুশীলন করিতে ২ প্রকৃতিজগতে ঈশ্বরের অপার মহিমা ও মাহাত্ম্য [বুঝিয়া তাঁহার অশেষ গুণ কীর্ত্তন কর অথবা শাস্ত্রোল্লিখিত তাঁহার অপার লীলা শ্রবণ করিতে ২ অশেষ

ভক্তিভাবে তাঁহাকে অনুক্ষণ ডাকিতে থাক, যেমন করিয়া তাঁহাকে ডাক না কেন বা স্মরণ কর না কেন, তাহাই তোমার পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপাসনা।

এতকাল হিন্দুসমাজে নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা এবং সাকার দেবদেবীর মানসিক ও বাহ্যিক পূজা প্রবর্ত্তিত ছিল। আজকাল কোন ২ সুশিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতর একেশ্বরবাদীদিগের অনুকরণে সগুণ নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা প্রবর্ত্তিত হইতেছে। তাঁহারা হিন্দুদর্শন ও হিন্দুধর্ম্মের মহোচ্চ স্বর্গীয় ভাব বুঝিতে না পারিয়া ম্লেচ্ছধর্ম্মের প্রশংসা করত উপরোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করিতেছে।

পরিশেষে বক্তব্য, ঈশ্বরের নিরাকারোপাসনা কর বা সাকারোপাসনা কর, তাঁহাকে অন্তরের সহিত অপার ভক্তি ও শ্রদ্ধা পূর্ব্বক ডাকিতে থাক, ইহাতেই তোমার সামান্য উপাসনা সার্থক হইবে এবং তুমিও ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইবে। যিনি সামান্য স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভগবানকে ডাকিবেন, তাঁহার স্বার্থ সিদ্ধ হইবে না। তাঁহাকে নিঃস্বার্থভাবে ডাকাই শ্রেয়।

হিন্দুধর্ম্মের দেবদেবী

দেবদেবী কতদূর সত্য ?

হিন্দুধর্ম্মে একব্রহ্ম বা একেশ্বর আছেন, আবার নানা দেবদেবীও আছেন। বেদে তেত্রিশ, পুরাণে তেত্রিশ কোটী দেবতা দেখা যায়। বলি, ইহারা কি কবির কল্পনা, না সত্য সত্যই দেবলোকে আছেন? অসভ্যযুগে কল্পনাপ্রিয় অশিক্ষিত মানব যে সকল দেবতায় বিশ্বাস করিত, ইহারা কি সেই অসভ্য যুগের কুসংস্কার, না সত্য সত্যই সূক্ষ্মজগৎ বা স্বর্গ হইতে এ জগৎ চালাইতেছেন ?

সভ্যদেশমাত্রেই সুশিক্ষিত একেশ্বরবাদী আজকাল পুরাকালের দেবদেবীকে সর্ব্বথা কাল্পনিক বলিয়া উড়ান। তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস, একমাত্র ঈশ্বরই জগতের স্রষ্টা ও পাতা এবং তিনিই আমাদের যাবতীয় সুখদুঃখের একমাত্র নিয়ন্তা। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতবর ঈশ্বর ও দেবতা কিছুই মানেন না; তিনি সকলকে এক খাদে গাড়েন। তিনি বেশ জানেন, যাহা ইন্দ্রিয়ের অগোচর, তাহার আদৌ অস্তিত্ব নাই, তাহা আকাশকুসুমের ন্যায় সর্ব্বৈব

অলীক। অতএব দেবতায় তিনি কি প্রকারে বিশ্বাস করিবেন? পুরাকালে যখন সমগ্র মেদিনী অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, তখন লোকে দেবতায় বিশ্বাস করিত। এখন কোন্ সুশিক্ষিত উহাদিগকে সত্য বলিয়া মানিবে?

এস্থলে একেশ্বরবাদী ও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের কথায় কর্ণপাত করিলে চলিবে না। এ বিষয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রের আদেশ শিরোধার্য্য করা উচিত। যে সকল শাস্ত্র যোগেশ্বরপ্রকটিত, উহাদের কথাই শুনা উচিত। যাঁহারা যোগবলে সমাধিস্থ হইয়া সূক্ষ্মজগৎস্থ দেবগণকে দিব্যচক্ষে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করা উচিত। তাঁহারা ভালরূপ জানেন, দেবগণ মহেন্দ্রাদি সূক্ষ্ম দেবলোকে কিরূপে বিদ্যমান আছেন।

কলিযুগে জীবাত্মার অধঃপতন ও স্থূলজগতের স্থূলত্ববর্দ্ধনবশতঃ এখন আমরা দেবগণকে চর্ম্মচক্ষে দেখিতে পাই না এবং দৈববাণীও কর্ণে শুনিতে পাই না।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলেন :—

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব চক্ষুষা
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্। (গীতা)

"তুমি আমাকে এই চর্ম্মচক্ষে দেখিতে পাইবে না; সেজন্য আমি তোমায় দিব্যচক্ষু দিতেছি (এই দিব্যচক্ষু পুরাকালীন মনুপুত্রগণের তৃতীয় নয়ন)। এই দিব্যচক্ষে তুমি আমার ঐশ্বরিক যোগ সন্দর্শন কর, (অর্থাৎ) আমি কি প্রকারে সংসারের প্রত্যেক পদার্থে সংযুক্ত ও জড়িত হইয়া সর্ব্বত্র বিরাজমান, তাহা ভালরূপ দেখ।" বস্তুতঃ এ কলিযুগে দেবগণকে চর্ম্মচক্ষে দেখা যায় না বলিয়া কি শাস্ত্রের কথা অমান্য করিতে হইবে?

আধ্যাত্মবিজ্ঞান চিরদিন উপদেশ দেয়, এই প্রত্যক্ষপরিদৃশ্যমান স্থূল জগতের মূলে সূক্ষ্ম জগৎ বর্ত্তমান এবং এ জগৎ অন্যান্য সূক্ষ্ম জগতের সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্রবে সম্বদ্ধ। আমরা যাহাকে স্বর্গ ভাবি, তাহাই এই সকল সূক্ষ্ম জগৎ এবং দেবগণ তথায় অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহারা স্বর্গ হইতে এ জগতের যাবতীয় ব্যাপার অতি সুচারুরূপে, অতি সুশৃঙ্খলতার সহিত অলৌকিক নিয়মতন্ত্রের অধীন হইয়া পরিচালন করিতেছেন। তাঁহারা মায়াতীত পরব্রহ্মের চিৎশক্তির উপাধি বা প্রকাশক এবং তাঁহার আজ্ঞাবহ দাস।

দিক্‌পালগণ, লোকপালগণ, গ্রহাধিষ্ঠাতৃ ও ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবগণ প্রভৃতি অসংখ্য দেবতা আছেন। যে সকল নৈসর্গিক জড়শক্তি আমাদের চতুর্দ্দিকে লীলাময় সংসারক্ষেত্রে অনন্ত লীলা প্রদর্শন করিতেছে, উহাদেরও অধিষ্ঠাতৃ দেবতা আছেন। এই সকল দেবগণ পরব্রহ্মপ্রতিষ্ঠিত সর্ব্বজনীন নিয়মানুসারে চালিত হইয়া একই উদ্দেশ্য সাধন করত জগতে বিশ্বজনীন সামঞ্জস্য ও সুশৃঙ্খলতা স্থাপন করিয়াছেন। ইহারা কর্ম্মফলানুসারে আমাদের সুখদুঃখের নিয়ন্তা এবং আধিদৈবিক বিপদআপদের বিধাতা।

দেবগণকে চর্ম্মচক্ষে দেখা যায় না বলিয়া উহাদিগকে অবিশ্বাস করিবার কিছুমাত্র কারণ নাই। ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় ব্যাপার এতদূর গূঢ়াতিগূঢ় যে, উহাদিগকে একেশ্বরের কার্য্য মনে কর, অথবা নানা দেবতার কার্য্য মনে কর, মনের একটা প্রবোধ মাত্র, কিন্তু কিছুতে প্রকৃত রহস্য মীমাংসা করিতে পারিবে না। সে স্থলে একেশ্বরবাদী হও বা বহ্বীশ্বরবাদী হও একই কথা। তবে মায়াতীত গুণাতীত পরব্রহ্ম এ মায়াজগতে নানা মায়ারূপী দেবগণ দ্বারা সকল কার্য্য করাইতেছেন, এ কথায় অবিশ্বাস করিবার কিছুমাত্র কারণ নাই।

হিন্দুশাস্ত্রে যে সকল দেবতার উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে দেখা যায়—প্রথমতঃ পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্বন্তরে যে সকল দেবরূপী অযোনিসম্ভব মনুপুত্রগণ জগতে বিচরণ করিয়া যান এবং যাঁহারা শাপভ্রষ্ট হইয়া আধুনিক মানবরূপে দেখা দেন।

দ্বিতীয়তঃ। মায়াময় মানবমনের ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পরব্রহ্মকে ভাবিবার জন্য তাঁহার নানা মায়াময় রূপ দেখান হয়।

তৃতীয়তঃ। তাঁহার সাত্ত্বিক রূপের দশ অবতার এবং তাঁহার আদ্যাশক্তি মহামায়ার দশ মহাবিদ্যা।

চতুর্থতঃ। ধর্ম্মাত্মা হিন্দু আপনাকে চিরদিন দেবমণ্ডলীতে পরিবৃত জ্ঞান করেন। তাঁহার নিকট চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু সাগর, নদী, পর্ব্বত, বৃক্ষ, জীবজন্তু প্রভৃতি অসংখ্য পদার্থ চিরদিন সমধিক পূজ্য।

ইহাদিগকে পূজিবার প্রকৃত কারণ কি? বাস্তবিক কি ঐ সকল জড় পদার্থের এক এক অধিষ্ঠাতৃ দেবতা আছেন? না ঐ সকল পদার্থে ঐশী শক্তির পূর্ণ বিকাশ দর্শনে ধর্ম্মাত্মা কবিগণ উহাদিগকে দেবতা জ্ঞান করিয়া

যান? না উহারা অসভ্য যুগে মনে ভীতিসংবলিতবিস্ময় উৎপাদন করিত বলিয়া এখনও উহারা দেবতা জ্ঞানে পূজিত হইতেছে?

কেহ কেহ বলেন, ভক্তি প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রবৃত্তিগুলির সম্যক স্ফূর্ত্তির জন্য নৈষ্টিক হিন্দু আপনাকে দেবমণ্ডলীতে পরিবৃত রাখেন। তাঁহার নানা গ্রাম্য দেবতা ও গৃহদেবতা আছে। গ্রামের নানাস্থানে শিবমন্দির ও কালীমন্দির আছে। গৃহে নারায়ণজিউ প্রতিষ্ঠিত আছে। গ্রামে পঞ্চাননতলা, ষষ্ঠীতলা, মনসাতলা প্রভৃতি সকলই আছে। সকলকেই তিনি অপার ভক্তি-ভাবে প্রণাম করিতেছেন। অশ্বত্থ, বট, বেল, তুলসী, মনসা প্রভৃতি বৃক্ষগুলি, গাভী প্রভৃতি জন্তুগুলি, গঙ্গা যমুনা প্রভৃতি নদীগুলি; হিমালয় বিন্ধ্যাচল প্রভৃতি পর্ব্বতগুলি তাঁহার নিকট চিরদিন পূজ্য। চতুর্দ্দিকস্থ নানা দেবদেবী এইরূপে চিরদিন তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন এবং তিনিও সকলের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক নিরাপদে ও নিশ্চিন্ত মনে জীবন অতিবাহিত করিতেছেন।

যখন বিশ্ব ব্রহ্মের বিরাট রূপ, তখন তিনি ঐ সকল জড়পদার্থে ব্রহ্মের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়া উহাদের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিমান হন। এ স্থলে একজন একেশ্বরবাদী বলিবেন, দেখ এক অসভ্য সাঁওতালী আপনাকে চতুর্দ্দিকে ভূতপ্রেতাদি দ্বারা পরিবৃত ভাবিয়া সদা জড়জগতের ভয়ে অস্থির হয়। ইহা যেমন উহার কুসংস্কার, চতুর্দ্দিকে দেবমণ্ডলী দ্বারা পরিবৃত ভাবাও হিন্দুর পক্ষে তেমনি কুসংস্কার। তিনি আরও বলিবেন, অন্তর্যামী ঈশ্বর সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিয়া সকলকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন, ইহাই তাঁহার নিঁখুৎ সুসংস্কার। কিন্তু নবযুগের নববিজ্ঞান তাঁহার উপর টিটকারী করিয়া বলিবে, এরূপ ঈশ্বর ভাবনাও মনের দুর্ব্বলতাপরিচায়ক কুসংস্কারমাত্র। এখন কাহার ভাবনাকে সুসংস্কার বলা উচিত, তাহা পাঠকগণ মীমাংসা করিবেন।

কেহ কেহ বলেন, যে হিন্দু অতীতের উপর সমধিক আস্থাবান্, তিনি পুরাকালের কোন দেবতাকে ত্যাগ করেন নাই। অসভ্য যুগে হউক, সভ্য যুগে হউক, যে দেবতার পূজা সমাজে প্রচলিত হইয়া শাস্ত্রে বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা তিনি কস্মিন কালে ত্যাগ করেন নাই। বৈদিক সময়ের সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, বরুণ, যম, স্মার্ত্তযুগের ব্রহ্মাবিষ্ণু মহেশ্বর, সূর্য্য ও গণেশ, পৌরাণিক

যুগের হরগৌরী, সীতারাম, রাধাকৃষ্ণ, মাগঙ্গা সকলকে তিনি সমভাবে পূজা করিতেছেন। এই প্রকারে তাঁহার দেবগণের সংখ্যা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া আসিয়াছে এবং সকলের উপর তিনি সমভাবে ভক্তিমান আছেন।

আবার কেহ কেহ বলেন, হিন্দুধর্ম্মের তেত্রিশ কোটী দেবতা প্রকৃতির অনন্তত্বজ্ঞাপক। যে হিন্দু অনন্ত বিশ্বে অনন্ত ব্রহ্মের বিরাট রূপ মনে করেন, যিনি অনন্ত বিশ্বের একখণ্ড জড়পদার্থ লইয়া ব্রহ্মমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করত পূজা করেন, তিনি আবার অনন্ত ব্রহ্মের অনন্তত্ব সম্যক্ প্রকাশ করিবার জন্য তাঁহার তেত্রিশ কোটী সগুণ রূপ কল্পনা করিতে বাধ্য হন। যিনি ভালরূপ বুঝিতে পারেন, অনন্ত ব্রহ্ম অনন্ত বিশ্বে অনন্ত রূপে ও অনন্ত শক্তিতে ব্যক্ত, সেই অনন্ত ব্রহ্মকে সম্যক্ বুঝিবার জন্য তিনি কি তাঁহার তেত্রিশ কোটি রূপ কল্পনা করিবেন না?

যে প্রকৃতি সংসারে অনন্ত রূপে নিজ গুণ ও শক্তি প্রকাশ করে, সকল বিষয়ে কেবল অনন্ত বৈচিত্র্য দেখায়, সে প্রকৃতির অধিষ্ঠাতৃ দেবকে অনন্ত রূপে, অনন্ত গুণে ও অনন্ত শক্তিতে বিভূষিত না করিয়া কি একটা সামান্য মূর্ত্তি গড়িয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায়? যিনি প্রকৃত ভাবুক ও প্রকৃতির যথার্থ উপাসক, তিনি প্রকৃতির অনন্তত্ব দর্শনে অনন্ত ব্রহ্মের অনন্ত রূপ কল্পনা না করিয়া থাকিতে পারেন না। সেজন্য ধর্ম্মাত্মা হিন্দু যে স্থলে মহাশক্তির অদ্ভুত বিকাশ দেখেন, সেই স্থলেই দেবতা কল্পনা করিয়া তিনি ভক্তিভাবে নিজ মস্তক অবনত করেন; যে স্থলে কোন গুণের অদ্ভুত বিকাশ দেখেন, সেই স্থলে দেবভাব স্বীকার করিয়া তিনি ভক্তিভাবে নিজ মস্তক অবনত করেন। যাঁহারা সূক্ষ্মজগৎস্থ দেবগণের অস্তিত্ববিষয়ে অজ্ঞ, তাঁহারা স্বধর্ম্মের তেত্রিশকোটী দেবতা সম্বন্ধে উপরোক্ত কারণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

দেবদেবী সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতামত।

যাঁহারা একেশ্বরবাদী ও নিরাকারবাদী, তাঁহারা ত আমাদের অশেষ পূজ্য দেবদেবী দেখিয়া অশ্রদ্ধা ও বিদ্রূপ করিবেন। তাঁহারা ভাবেন, এ সকল দেবদেবী সর্ব্বথা অলীক ও কাল্পনিক। হিন্দুজাতি মূর্খতাবশতঃ এতকাল ইহাদিগকে পূজা করিয়া আসিতেছে। তাঁহারা সমগ্র শাস্ত্র মন্থন করিয়া যে সকল মন্তব্য জাহির করেন, তাহা শুনিলে আমাদের কর্ণে অঙ্গুলি দিতে হয়।

যাহা হউক, এস্থলে তাঁহাদের দুই চারি কথা উল্লেখ করিতেছি, পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন।

তাঁহারা বলেন, এই সকল দেবদেবীর উপর বিশ্বাস বহুকাল হইতে হিন্দু-সমাজে চলিয়া আসিতেছে। বৈদিক সময়ের কতকগুলি দেবতা পৌরাণিক যুগে বিভিন্ন আকার ধারণ করেন। এই পৌরাণিক যুগে ভক্ত সাধকগণ সাধারণসমাজপ্রচলিত উপাস্য দেবতাদিগের প্রতিমূর্ত্তি কল্পনা করিয়া পৌত্তলিকতার সম্যক্ স্ফূর্ত্তি করেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, দুর্গা, কালী, সরস্বতী, লক্ষ্মী, গণেশ, কার্ত্তিক প্রভৃতি পূজ্য দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি ক্রমবিকাশে হিন্দু-জাতির মানসক্ষেত্রে উদিত হয়। সাধকগণের হৃদয়ে দেবোদ্দেশে ভক্তি যেরূপ স্ফুরিত হইতে থাকে, ভক্তিসূচক উপাদান লইয়া পূজ্য দেবতাদিগের রূপও তেমনি ধীরে ধীরে পরিকল্পিত ও গঠিত হয়। তাহার সাক্ষ্য দেখ, বৈদিক যুগের সামান্য পদের অধিষ্ঠাতৃদেব বিষ্ণু পৌরাণিক যুগে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, পদ্মপলাশলোচন চতুর্ভুজ দেবতা হইয়া পরব্রহ্মের সাত্ত্বিকরূপ শ্রীবিষ্ণু হন। বৈদিক যুগের পবনরূপী রুদ্রদেব পৌরাণিক যুগে বৃষবাহন পঞ্চানন শিবশঙ্কররূপ ধারণ করিয়া পরব্রহ্মের তমঃপ্রধান সংহারকর্ত্তা শ্রীমহাদেবে পরিণত হন। সেইরূপ বৈদিক যুগের অম্বা, অম্বালিকা পৌরাণিক যুগে গৌরী ও কালিকায় পরিণত হন।

তাঁহাদের মতে শত যোজনব্যাপী অভ্রভেদী হিমগিরির যে কৈলাসশিখর শিবভূমি বলিয়া খ্যাত, সেই পর্ব্বতের আদর্শে শিবমূর্ত্তি পরিকল্পিত। ঐ পর্ব্বত সতত বরফাবৃত, এজন্য মহাদেব শ্বেতকায়; ইহার কণ্ঠদেশ সতত সঞ্চরমাণ জলধরপটলসংযোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় আবৃত, এজন্য তিনি নীলকণ্ঠ। ইহার শিখরদেশ স্তূপীকৃত বরফরাশি দ্বারা স্তরে স্তরে আবৃত, এজন্য তিনি জটামৌলি। কোন ভাবপ্রধান কবি ইহার শিখরোপরি চন্দ্রদেবকে দেখিয়া তাঁহার শশিমৌলি আখ্যা প্রদান করেন। হিমাদ্রির মস্তকোপরি গঙ্গাদেবী বহমানা, এজন্য তিনি ঐ নদী মস্তকে ধারণ করেন। পুরাকালে পাশুপত প্রভৃতি ধর্ম্মাত্মা শৈবগণ নিবৃত্তি মার্গে থাকিয়া ভস্মাবৃতদেহে দিগম্বর সাজিয়া নির্গুণ লিঙ্গের ধ্যানে নিমগ্ন হইতেন। লোকে যে অবস্থাকে স্বীয় সাধনার প্রধান উদ্দেশ্য ভাবেন, তাঁহারা ব্রহ্মের সাকার মূর্ত্তিতে সেই অবস্থা আরোপ

করিয়া থাকেন; এজন্য মহাদেবও শ্মশানবাসী, ভস্মাবৃতদেহ, দিগম্বর বা অজিনবাসা, বিজয়পানোন্মত্ত, ধ্যানমগ্ন, ব্যোম ভোলানাথ।

তাঁহাদের মতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তিও ধর্ম্মাত্মা সাধক কবিগণের কল্পনাবলে ক্রমস্ফুরিত। মথুরাবাহিনী কালিন্দী নদীর যে সলিল কৃষ্ণবর্ণ, উহার আদর্শে তাঁহার নাম ও বর্ণ পরিকল্পিত। প্রেমোন্মত্ত ভক্ত সাধকগণ ঈশ্বরপ্রেমে গদ্গদ হইয়া নৃত্য করিবার জন্য তাঁহার মুরলীধর ত্রিভঙ্গ মুরারিরূপ কল্পনা করেন। যৎকালে ঈশাদেব খৃষ্ট উপাধিতে (Christ The Anointed) বিভূষিত হইয়া পাশ্চাত্য জগতে পুত্র-পরমেশ্বর রূপে পূজিত হন, তৎকালে এদেশেও খৃষ্ট নামের অনুকরণে শ্রীকৃষ্ণ প্রধান পূজনীয় দেব হইয়া উঠেন।

আমাদের দেবমণ্ডলীর উগ্র ও সৌম্য মূর্ত্তি দেখিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কিছু কিছু কারণ নির্দ্দেশ করিতেছেন। যেমন এদেশে প্রকৃতি কোন স্থলে উগ্র, কোন স্থলে সৌম্য মূর্ত্তি ধারণ করে, ভাবপ্রধান হিন্দুও সেইরূপ পূজ্য দেবতাদিগের সৌম্য ও উগ্র মূর্ত্তি কল্পনা করিতে বাধ্য হন।

দেখ, এ দেশে কত জায়গায় প্রকৃতির কেমন ভয়াবহ রূপ প্রকটিত হইতেছে। উত্তরে হিমগিরি চিরতুষারাবৃত অভ্রভেদী শৃঙ্গগুলি মস্তকে ধারণ করিয়া শত শত যোজন ব্যাপিয়া বিস্তারিত আছে, তদ্দর্শনে কাহার না শরীর আতঙ্কে কম্পমান ও রোমাঞ্চিত হইবে? দক্ষিণে অগাধ মহাসাগরের ফেনিল নীলাম্বুরাশি সদা উত্তালতরঙ্গে তরঙ্গায়িত ও উদ্বেলিত হইতেছে, তদ্দর্শনে কাহার না মন ভয়ে ও বিস্ময়ে বিহ্বল হইবে?

কোথাও জলপ্লাবন ঘটিলে, প্রভূত জলস্রোত গগনভেদিরবে দিক্‌দিগন্ত আপূরণ পূর্ব্বক গ্রামের পর গ্রাম, ক্ষেত্রের পর ক্ষেত্র ভাসাইতে ভাসাইতে এবং অসংখ্য লোক ও ইতর জন্তুদিগের প্রাণনাশ করিতে করিতে ধাবিত হইতেছে। কোথাও ভীষণ জলরাশি ভীষণ শব্দে শৈলের পর শৈল উল্লঙ্ঘন করিতে করিতে বা ভূধর মধ্যে বিশালগর্ত্তে পতিত হইয়া অনন্তবেগে ছুটিতেছে। কোথাও অসীম বালুকারাশি প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপে তাপিত হইয়া মধ্যে মধ্যে ঘূর্ণী বায়ুবশে ব্যোমমার্গে উত্থিত হইয়া দিঙ্‌মণ্ডল অন্ধকারাচ্ছন্ন করিতেছে। কোথাও অগাধ নিবিড় জঙ্গলরাশি শত শত যোজন বিস্তীর্ণ হইয়া ব্যাঘ্রাদি হিংস্র শ্বাপদকুল ও

অজগরাদি মহাসর্পগণকে আশ্রয় দিতেছে এবং উহারা কালরূপ ধারণ পূর্ব্বক সকলকে যমসদনে প্রেরণার্থ লোলজিহ্ব হইয়া মুখব্যাদান করিতেছে।

কোথাও বেগবতী স্রোতস্বতী প্রভৃত জলরাশি লইয়া সাগরের দিকে ছুটিতেছে এবং তত্রত্য মকরকুম্ভীরাদি দর্শনে সকলে ভয়ে ও আতঙ্কে কম্পিত হইতেছে। কোথাও প্রবল ঝটিকা মুহূর্ত্তের মধ্যে উত্থিত হইয়া শত শত বিশাল পাদপ ও রম্য কুটীরকে ভূমিসাৎ করিতেছে। কোথাও নিবিড় ঘনঘটা ব্যোমমার্গে উত্থিত হইয়া মূসলধারে বারি বর্ষণ পূর্ব্বক ক্ষণমাত্রে সমস্তই জলময় করিতেছে। কোথাও ভূমিকম্প ক্ষণমাত্রে মেদিনীমণ্ডল প্রবলবেগে কম্পায়মান পূর্ব্বক রম্য জনপদকে মরুভূমিতে, জলকে স্থলে এবং স্থলকে জলে পরিণত করিতেছে।

এই সকল ভয়াবহ প্রাকৃতিক দৃশ্যপটল ভাবপ্রধান হিন্দু চিরদিন ভয়বিহ্বলচিত্তে দেখিয়া আসিতেছেন। ইহারা তদীয় জাতীয় জীবনের গভীরতম প্রদেশ অধিকার করিয়া আছে। তিনি প্রকৃতির ভয়াবহ ও উগ্র মূর্ত্তি দর্শন করিয়া উহার অধিষ্ঠাতৃ দেবেরও উগ্র মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু গ্রীশ প্রভৃতি দেশে, যে স্থলে প্রকৃতি সদা সৌম্য ও শান্ত মূর্ত্তিতে বিরাজিত, তথায় পূর্ব্বে লোকে দেবদেবীর সৌম্য মূর্ত্তি কল্পনা করিত।

এই প্রকারে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আমাদের অশেষপূজ্য দেবদেবীর উপর নানা মন্তব্য জাহির করিয়া উহাদের প্রতিমূর্ত্তির উপর বিদ্রূপ করেন এবং সেই সঙ্গে হিন্দুসমাজের বিশ্বাস ও ভক্তি মন্দীভূত করিতে চেষ্টা পান। কি পাপ! কি পাপ! এ সকল পাপকথা হিন্দুর শ্রবণ না করাই ভাল। এসকল শুনিলে আমাদের মহাপাপ হয়। আমাদের কি দুরদৃষ্ট? হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া এ সকল পাপকথা লেখনী হইতে নিঃসরণ করিতে হইল। হা হত বিধে! সূক্ষ্মজগৎস্থ যে সকল দেবতা পরব্রহ্মের চিৎশক্তির উপাধি, যাঁহাদের রূপ যোগসিদ্ধ মহর্ষিগণ ধ্যানস্তিমিত নেত্রে ও দিবচ্যক্ষে সমাধির অবস্থায় সন্দর্শন করিতেন, তাঁহাদের উপর এতদূর বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গোক্তি; আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস মহর্ষিগণ সমাধিস্থ হইয়া দেবদেবীর যে রূপ দেখিয়াছেন, তাহা পুরাণাদিতে বর্ণিত হইয়াছে এবং তাহা এখনও চিত্রে আলেখিত হইতেছে ও প্রতিমায় উদ্ভাসিত হইতেছে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে এ সকল দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি সর্ব্বথা অলীক ও কাল্পনিক। তাঁহারা বলেন, শাস্ত্রকারেরা কতকগুলি শ্রেষ্ঠ উপাদান লইয়া মনের কল্পনানুযায়ী উহাদের মূর্ত্তি গঠন করিয়াছেন। বলি, পদ্মপলাশলোচন, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ শ্রীবিষ্ণু কি আজ কবির কল্পনা হইল? নৃমুণ্ড-মালিনী করালবদনা লোলজিহ্বা মহাকালীও কি আজ কবির কল্পনা হইল? রে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ! আর অধিক বিদ্যা ফলাইবার প্রয়োজন নাই। তোমরা সনাতন হিন্দুধর্ম্মের যথেষ্ট অনিষ্ট করিতেছ। হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যাঁহারা তোমাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া ঐরূপ ভাবিবেন, তাঁহারা হিন্দুকুলের কুলাঙ্গার। যখন তাঁহাদের কালামুখ হইতে ঐরূপ পাপকথা নিঃসৃত হইবে, তখন তাঁহাদের জিহ্বা শতধা বিদীর্ণ হইবে, মস্তকোপরি শত বজ্রপাত হইবে।

পাশ্চাত্যপণ্ডিতদিগের মতখণ্ডন

জগতের নিয়ম এই, যাহা স্মরণাতীত কাল হইতে প্রচলিত হইয়া সমাজে বদ্ধমূল হয়, তদ্বিষয়ক সংস্কার বাল্যকাল হইতে সকলের মন দৃঢ়ভাবে অধিকার করিয়া থাকে এবং তাহা অবাস্তব হইলেও সকলের নিকট প্রকৃত বাস্তব বা অমোঘ সত্য বলিয়া বিবেচিত হয়। এই যে পাশ্চাত্য জগতের লোকে ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী অমঙ্গলের রাজা সয়তানের অস্তিত্বে এতকাল বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে, তাহা কি আমাদের নিকট বাস্তব? এই যে উহারা এতকাল ঈশাদেবকে আপনাদের মুক্তিদাতা ও পরিত্রাতা জ্ঞান করে, তাহাও কি আমাদের নিকট সত্য? তবে কি প্রকারে আমাদের দেবদেবী তাঁহাদের নিকট বাস্তব বা সত্য হইতে পারে? তাঁহারা যদি উহাদের উপর বিদ্রূপ করেন, আমরাও তাঁহাদের সয়তান ও ঈশার উপর বিদ্রূপ করিব। আমাদের যদি কিছু গলদ থাকে, তাঁহাদেরও ততোধিক গলদ আছে।

মনে কর, ঐ সকল দেদেবীর অস্তিত্ব আদৌ নাই এবং উহাদের প্রতিমূর্ত্তি সর্ব্বথা কাল্পনিক, তাহাতেই বা হিন্দুসমাজের কি ক্ষতি? যখন সমাজের যাব-তীয় লোক অতি পুরাকাল হইতে উহাদের উপর আন্তরিক বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও

ভক্তি প্রদর্শন করিয়া আসিতেছে, তখন উহারা অপরের নিকট মিথ্যা হইলেও তাহাদের নিকট অলন্ত, জীবন্ত ও জাগ্রত সত্য, কদাচ মিথ্যা হইতে পারে না।

যে বিশ্বাস লোকপরম্পরায় সমাজে বহুকাল চলিতেছে, তাহাই সকলের আপ্তবাক্য। এই যে অশ্বত্থ বৃক্ষটি সম্মুখে দর্শন করিয়া তুমি উহাকে অশ্বত্থ বৃক্ষ বলিয়া সকলের নিকট পরিচয় দেও, তাহাও তোমার সহজ নৈসর্গিক জ্ঞান নহে, লোকপরম্পরাগত বিশ্বাসমাত্র। সেইরূপ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ শ্রীবিষ্ণু যে মায়াতীত অপরিজ্ঞেয় পরব্রহ্মের মায়ারূপ, তাহাও তোমার লোক-পরম্পরাগত বিশ্বাস মাত্র। সেইরূপ জনসাধারণের ঈশ্বরজ্ঞানও উহাদের লোকপরম্পরাগত বিশ্বাস মাত্র। উহারা বিশ্বের আদিকারণ মায়াতীত পরব্রহ্ম আদৌ বুঝিতে পারে না বলিয়া তাঁহার স্থানে একটা মনগড়া ঈশ্বর মানিয়া নিজ মনকে প্রবোধ দেয়। তবে একেশ্বর মান অথবা তাঁহার ত্রিমূর্ত্তি মান একই কথা।

আরও দেখ, এ মায়াজগতে আমরা আজীবন যে জ্ঞানলাভ করি, তাহা আমাদের মায়াজ্ঞান বা মিথ্যাজ্ঞান। আমরা এ জগতে এই মিথ্যাজ্ঞান লইয়া বিমুগ্ধ থাকি। এখন যদি আমরা বিশ্বের আদিকারণ সেই মায়াতীত, গুণাতীত পরব্রহ্মের কয়েকটি মায়ারূপ কল্পনাবলে পার্থিব উপাদানে গঠিত করিয়া উহাদিগকে পরব্রহ্মজ্ঞানে আরাধনা করি, তাহাতে কি আমাদের ব্রহ্ম-ভাবনা বা ব্রহ্ম সাধনা হইবে না? ব্রহ্মকে নিরাকার ঈশ্বররূপে ভাবিলে প্রকৃত ব্রহ্মভাবনা হইবে, আর অন্য উপায়ে হইবে না, এ ধারণা তোমার কোথা হইতে আসিল?

ওহে একেশ্বরবাদিগণ! তোমরা আজ আমাদের অশেষ পূজ্য দেবমূর্ত্তি দর্শনে নাসিকা সঙ্কুচিত কর বটে, কিন্তু তোমরা যে নিরাকার একমেবা দ্বিতীয়ং ঈশ্বর ঈশ্বর বলিয়া গগনভেদিরবে চীৎকার করিতেছ এবং যে ঈশ্বর-জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া তোমরা আজ বিস্ফারিত হৃদয়ে ভাবিতেছ "যদৃচ্ছয়া চোপ-পন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতং" (স্বর্গের দ্বারদেশ তোমাদের জন্য ভালরূপ উন্মুক্ত) সেই ঈশ্বরজ্ঞান কি পরব্রহ্ম সম্বন্ধে তোমাদের যথার্থ বাস্তব জ্ঞান? ইহা কি তোমাদের মিথ্যা মায়াজ্ঞান নহে? সেই ঈশ্বরের স্বরূপ তোমরা কল্পনাবলে মনোমন্দিরে যেরূপ স্থির করিতেছ, তাহাই কি মায়াতীত পরব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপ?

ইহা তোমাদের নিকট সর্ব্বথা বাস্তব হইলেও তোমরা কি প্রকারে জানিলে, ইহাই পরব্রহ্মের বাস্তব রূপ?

তবে কেন তোমরা আমাদের দেবমূর্ত্তি দর্শনে এত অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেছ? যে কালাগ্নিতে আমাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ হইতেছে, সেই কালাগ্নিতে ও তোমাদের তপ্তকাঞ্চনবৎ মুখমণ্ডল আরও পরিদগ্ধ জানিবে। মনে রাখিবে, যে স্থলে তোমরা অসম্পূর্ণ মানবমনের অসম্পূর্ণ গুণাবলি লইয়া নিরাকার ঈশ্বরের নিরাকার মূর্ত্তি গঠন করিয়া তাঁহাকে মনোগ্রাহ্য করত তাঁহার উপাসনা কর, সে স্থলে আমরা জগতের কতকগুলি মনোরম বস্তু লইয়া তাঁহার সাকার মূর্ত্তি গঠন করিয়া তাঁহাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করত সম্যক্ মনোগ্রাহ্য করি ও সম্যক ভক্তি প্রদর্শন করি হায়! হায়! আমাদের এখন কি দুর্ভাগ্য! এই প্রকারে লিখিয়া আজ আমাদিগকে স্বধর্ম্মের দেবমণ্ডলীর পক্ষ সমর্থন করিতে হইতেছে। ঈশ্বরই ভাব আর ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরই ভাব, হরে দরে সবই হাঁটুজল, সকলেই যে তিমিরে সে তিমিরে এবং সকলেরই এক প্রকার ব্রহ্মভাবনা হইতেছে।

দুর্গা ও কালিকা মূর্ত্তির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা

শাস্ত্রমতে মা দুর্গা হিমালয়ের কন্যা। ইহাতে তাঁহাকে ভারতমাতা বুঝা উচিত। যে আর্য্যাবর্ত্ত মহাদেশ হিমগিরি হইতে উত্থিত নানা নদনদীর পলি পড়িয়া এতদূর অত্যুর্ব্বর, যে জন্য এ দেশ চিরদিন স্বর্ণময়ী ভারতভূমি বলিয়া খ্যাত, সেই ভারতমাতাকে শাস্ত্রকারেরা পরোক্ষভাবে পার্ব্বতী বলিতেছেন। আবার তিনি পরব্রহ্মের আদ্যাশক্তি মহামায়া, এজন্য তিনি সৃষ্টি-স্থিতিসংহারকারিনী জগদম্বা। যেমন স্নেহময়ী জননী সন্তানের প্রসব, প্রতি-পালন ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি সকল বিষয়ে সকল হাঙ্গাম পোয়ান, সেইরূপ মা দুর্গাও ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি ও রক্ষণাবেক্ষণে অশেষ হাঙ্গাম পোয়াইতেছেন, আর পরব্রহ্ম সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্টভাবে উদাসীন আছেন। জগতের মধ্যে একমাত্র সনাতন হিন্দুধর্ম্মই মহামায়ারূপ জগদম্বাকে অশেষ ভক্তিপূর্ব্বক মা! মা! বলিয়া ডাকিতে শিখায়। অন্য কোন ধর্ম্ম মাতৃভক্তির এতদূর পরাকাষ্ঠা ঘুণাক্ষরেও ভাবিতে পারে নাই।

শাস্ত্রকারেরা তাঁহার যে বিশ্বাচার্য্যরূপ প্রতিমা আমাদের সমক্ষে ধারণ করিতেছেন, উহার গূঢ় অর্থ কি? এই অর্থ প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে প্রতিমা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ লেখা আবশ্যক।

মহাদেবী কাত্যায়নীর দালানভরা প্রতিমা, দর্শনে কাহার না মাতৃভক্তি শতসহস্র ধারে উথলিয়া পড়িবে? কোন যোগসিদ্ধ মহাত্মা দিব্যনয়নে এ দেব-মূর্ত্তি দর্শন করিয়া সংসারের অশেষ উপকারার্থে জগদম্বার এমন অলৌকিক রূপ শাস্ত্রে বর্ণন করিয়াছেন।

ওহে সুশিক্ষিত পাঠক। যদি তোমার এরূপ ধারণা হয় যে, এ মূর্ত্তিও কবির কল্পনামাত্র, তথাচ একবার ভাব দেখি, যে ভাবুক ধর্ম্মাত্মা কবি বিশ্ব-সংসার অন্বেষণ করিতে করিতে এমন ভক্তিব্যঞ্জক উপাদান ও মনোরম বস্তু লইয়া সেই দশভুজা কাত্যায়নী দেবীর প্রতিমূর্ত্তি মনোমধ্যে প্রথম কল্পনা করিলেন, তিনি কি একজন সামান্য মানব? যে প্রতিমা দর্শন করিয়া আমরা জগদম্বাকে মা! মা! বলিয়া প্রাণভরে ডাকি ও অশেষ ভক্তিরসে আপ্লুত হই, যে প্রতিমা দর্শন করিয়া আমরা ক্ষণমাত্রে সংসারের যাবতীয় শোকতাপ বিস্মৃত হই, যে প্রতিমা পূজন করিয়া অধম বঙ্গবাসী আজ ধর্ম্মজগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সে প্রতিমা যিনি মন মধ্যে প্রথম কল্পনা করিলেন, তিনি কি সামান্য মানব?

মহাদেবীর ঐশ্বর্য্য, গুণ ও মহিমা কীর্ত্তন করিবার জন্য শাস্ত্রকারেরা যে সকল কথা উল্লেখ করিতেছেন, তাহা তোমার মনে পৌরাণিক উপকথা হইতে পারে এবং তুমি মনে করিতে পার, কাত্যায়নী দেবী বিগত মন্বন্তরে ঐরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মহিষাসুর বধ করেন নাই, তথাচ দশভুজা মহাদেবী মহিষাসুর দলনে একপদ সিংহোপরি, অপর পদ অসুরোপরি স্থাপন পূর্ব্বক দণ্ডায়মানা এবং তাঁহার একদিকে মা লক্ষ্মী ও সিদ্ধিদাতা গণেশ, অপরদিকে মা সরস্বতী ও দেবসেনাপতি কার্ত্তিক বিরাজমান, এ প্রতিমার ভালরূপ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে।

যেমন সংসারের ঘোর জীবনসংগ্রামে প্রকৃতিদেবী দশদিক হইতে অসুররূপী সয়তানরূপী জগতের অমঙ্গলরাশির সহিত পশুরাজরূপ পাশববলের সংঘর্ষ ঘটাইয়া উভয়কে পাদমূলে স্থাপন পূর্ব্বক জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতে-ছেন, সেইরূপ প্রকৃতিরূপিনী দশভুজা কাত্যায়নী মহাদেবী মহিষাসুরকে

নিজবাহন সিংহ দ্বারা আক্রান্ত করাইয়া উঁহাকে বর্শাঘাত করত উভয়ের উপর সগৌরবে দণ্ডায়মানা। যেমন জীবনসংগ্রামে বিদ্যাবল, অস্ত্রবল ও অর্থবল থাকিলে নানা প্রকারে ও নানাবিষয়ে জয়লাভ করা যায়; সেইরূপ মা দুর্গা একদিকে বিদ্যাদেবী সরস্বতী ও অস্ত্রবলরূপী দেবসেনাপতি কার্ত্তিককে লইয়া এবং অপরদিকে ধনের অধীশ্বরী দেবী লক্ষ্মী ও সিদ্ধিদাতা গণেশকে লইয়া সগৌরবে বিরাজমানা।

আবার ভারতমাতারূপিনী মা দুর্গার প্রতিমা আমাদিগকে চিরদিন স্মরণ করাইয়া দিতেছে, পুরাকালে ভারতমাতা অসুররূপী নিজ শত্রু অনার্য্যজাতি-বর্গকে সিংহরূপিনী অমিততেজস্বিনী বাহিনী দ্বারা পরাস্ত করিয়া জ্ঞানবিজ্ঞানে উদ্ভাসিত ও কৃষিশিল্পবাণিজ্যাদি দ্বারা অতুল ধনসম্পত্তিতে সুশোভিত হইয়া দেবসেনাপতি কার্ত্তিকের ন্যায় নিজের সুসন্তানবর্গকে অসীম বলবীর্য্যে দৃপ্ত করিয়া কিরূপ বহুকাল সুখৈশ্বর্য্য ভোগ করিয়াছেন। যদিও সেই সৌভাগ্যবতী ভারতমাতা দৈববিড়ম্বনায় কিছুকালের জন্য নিজের স্বাধীনতা হারাইয়া দুঃখের অতল জলধিগর্ভে নিমগ্না, তথাচ তদীয় সন্তানসন্ততিবর্গ যদি সর্ব্বান্তঃকরণে মা দুর্গার প্রতিমা চিরদিন পূজা করিয়া ভারতমাতার যথার্থ সেবা করেন, তিনি পুনরায় নিজ সিংহবাহিনী দ্বারা অসুর হনন করিয়া জ্ঞানবিজ্ঞানে, ধনদৌলতে ও অস্ত্রবলে উদ্ভাসিত হইবেন এবং তাঁহার দুঃখের দিন অবসান হইবে। ইহার জন্য শাস্ত্রকারেরা মা জগদম্বার অপরূপ প্রতিমা দেখান এবং চিরদিন উহার পূজা করিতে বলেন। ওহে ভারতমাতার অধম সন্তানবর্গ! বোধশক্তি থাকে, প্রতিমার গূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিয়া মাতার সুসন্তান হইতে সাধ্যমত চেষ্টা পাও।

এখন কেবল আতপতণ্ডুল ও বস্ত্র দিয়া মায়ের পূজা দিলে চলিবে না। সমগ্র দেশকে জ্ঞানবিজ্ঞানে উদ্ভাসিত করিয়া সুসভ্য কর, কৃষিশিল্পবাণিজ্যের উন্নতি সাধন করিয়া দেশকে ধনশালী কর, সংগ্রামবিদ্যা শিক্ষা দিয়া দেশবাসীকে সুসজ্জিত কর, ইহাই এখন ষোড়শোপচারে মায়ের পূজা।

মহাদেবোপরি করালবদনা লোলজিহ্বা নৃমুণ্ডমালিনী খড়্গহস্তা মহা-কালীর মহানৃত্যেরও ভালরূপ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে। এস্থলেও কালিকা-মূর্ত্তিকে প্রকৃতিদেবী ও ভারতমাতা জ্ঞান করা উচিত।

কার্ত্তিক মাসে ঘোর অমানিশায় তাঁহার মহাপূজা বিধিবদ্ধ, ইহারও মহৎ উদ্দেশ্য আছে। যেমন সংসারের বহুসংখ্যক লোক ঐ মাসে নানা উৎকট রোগে আক্রান্ত হইয়া যমসদনে প্রেরিত হয় এবং উহার দক্ষিণ দ্বারদেশ উদ্ঘাটিত থাকে, হিন্দুধর্ম্মও সেইরূপ ঐ মাসে প্রকৃতিদেবীর ভয়াবহ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার পরিতোষের জন্য ষোড়শোপচারে পূজা করিতে উপদেশ দেয়। উদাসীনবৎ নিশ্চেষ্ট ভাবে শায়িত পরমাত্মারূপ মহাদেবের বক্ষোপরি তদীয় অর্দ্ধাঙ্গরূপিনী মহাশক্তি মহাকালী কিরূপে সহস্র সহস্র নরবধ করিতে করিতে নৃমুণ্ডমালায় বিভূষিত হইয়া জগতবাসীজনকে সন্ত্রাসিত করেন, তাহাই তন্ত্রকল্পিত কালিকামূর্ত্তিতে সম্যক্ প্রকাশ পাইতেছে। যেমন স্নেহময়ী জননীর ভ্রূকুটিদর্শনে সন্তান ভীত ও ত্রস্ত হয়, সেইরূপ স্নেহময়ী জগদম্বার সেই ভীষণ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আমরা ভীত ও ত্রস্ত হইয়া তদীয় শ্রীচরণকমলে স্বতঃ প্রণত হই।

রণক্ষেত্রের ভীষণ দৃশ্য প্রকৃতিদেবীর কালিকামূর্ত্তিতে সম্যক্ প্রকাশ পায়। যৎকালে আগ্নেয়াস্ত্রাদি হইতে প্রভূত পরিমাণে ধূম নির্গত হইয়া রণক্ষেত্রকে অন্ধকারাবৃত করে, চতুর্দ্দিকে গোলাগুলি বর্ষিত হইতে থাকে, শাণিত অসি ঝন ঝন করিতে থাকে ও সহস্র সহস্র সৈন্য নিহত হইতে থাকে, তৎকালে চতুর্দ্দিকে রক্তগঙ্গা প্রবাহিত হয়, অসংখ্য লোকের মৃতদেহ ভূমিতে বিলুণ্ঠিত হয়। কি ভয়ানক দৃশ্য! সেই ভীষণ ক্ষেত্রের ভীষণ দৃশ্য মা কালীর মূর্ত্তিতে সম্যক্ প্রকাশ পাইতেছে। আমাদের স্বতঃ মনে হয়, রণরঙ্গবেশে মহাকালী তথায় তাণ্ডব নৃত্য করিতেছেন। তিনি মানবশোণিতে স্বদেহ রঞ্জিত করিয়া নৃমুণ্ডমালা কণ্ঠদেশে ধারণ পূর্ব্বক মানবাঙ্গুলির মেখলা কটিদেশে পরিধান করিয়া শোণিত-পানার্থ জিহ্বা লক্ লক্ করিতে করিতে অসিহস্তে মহানৃত্য করিতেছেন এবং তদীয় পতি শঙ্কররূপী মহেশ্বর শবরূপে উদাসীনবৎ তাঁহার পদমূলে পড়িয়া আছেন; তৎকালে তাঁহার কিছুই করিবার শক্তি নাই।

শুম্ভনিশুম্ভের যুদ্ধে গৌরাঙ্গিনী মা দুর্গা ভীষণ কালিকামূর্ত্তি ধারণ করিয়া জগৎ সংহার করিতে উদ্যত হন। তৎকালে তিনি যে স্থলে পদবিন্যাস করেন, তাহাই পাতালগামী হইতে থাকে। সৃষ্টি রক্ষাহেতু মহাদেব শবরূপ ধারণ করিয়া তদীয় অর্দ্ধাঙ্গিনীর পুরোভাগে পতিত হন। মহাকালী রণরঙ্গবেশে

নিজ স্বামীর উপর পদক্ষেপ করিয়া বসেন। ইহাতে তিনি জিহ্বা নিঃসরণ করিয়া সকলকে নিজের লজ্জা দেখান।

এ স্থলে জিজ্ঞাস্য, শাস্ত্রকারেরা কেন শ্বেতাঙ্গিনী গৌরীকে কৃষ্ণাঙ্গিনী কালিকা মূর্ত্তি ধারণ করান এবং তদীয় পতি শ্বেতকায় মহাদেবকে তাঁহার চরণতলে পাতিত করেন? শাস্ত্রকারেরা যোগসিদ্ধ বা সিদ্ধপুরুষ। তাঁহাদের প্রত্যেক কথার গূঢ় তাৎপর্য্য আছে। সে তাৎপর্য্য বোধগম্য না হইলেও তাঁহাদের প্রত্যেক কথা অন্ধবিশ্বাসের সহিত মানা উচিত।

বিশেষ অনুধাবন করিলে বুঝা যায়, এ স্থলে কালিকা মূর্ত্তি দ্বারা কৃষ্ণাঙ্গিনী ভারতমাতা বুঝায় এবং তিনি চিরদিন শ্বেতকায় জাতিকে পতিত্বে বরণ করিয়া আসিতেছেন, পরিশেষে উহাকে নিজ পাদমূলে রাখিয়া দিতেছেন।

এখন কালিকা মূর্ত্তির গূঢ় তাৎপর্য্য শ্রবণ করুন। এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশের জলবায়ুর এমনি গুণ, যে জাতি এ দেশে বহুকাল বাস করিবে, উহাদের বংশধরেরা কালে কৃষ্ণাঙ্গ হইয়া যাইবে। এমন যে শ্বেতকায় ইংরাজ জাতি, উহারা যদি এ দেশে বহুকাল বসবাস করে, উহাদের বংশধরেরা বহুকালে কথঞ্চিৎ কৃষ্ণবর্ণ হইবে। আবার এ দেশের বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্যের বহু-সংখ্যক অধিবাসী কৃষ্ণাঙ্গ। এ জন্য ভারতমাতা শাস্ত্রে কৃষ্ণাঙ্গিনী মা কালী রূপে ব্যক্ত।

ভারতের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে বুঝা যায়, ভারতমাতা চিরদিন শ্বেতকায় জাতিকে পতিত্বে বরণ করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু তিনি কোন জাতিকে মৌরসী পাট্টা দেন না। বৈদিক যুগে আর্য্য ক্ষত্রিয় জাতির অভ্যুত্থান ও পতন, বৌদ্ধ যুগে শক্ হুন ও সিথিয়ান জাতির অভ্যুত্থান ও পতন, পৌরাণিক যুগে রাজপুত জাতির অভ্যুত্থান ও পতন, মুসলমান যুগে পাঠান ও মোগল বংশের অভ্যুত্থান ও পতন, পরে মহারাট্টা জাতির অভ্যুত্থান ও পতন, আজকাল ইংরাজ জাতির অভ্যুত্থান এ বিষয়ে পূর্ণ সাক্ষ্য দিতেছে। এত যে রাজবংশের উত্থান ও পতন হইয়াছে, কোন বংশ কোন প্রদেশে তিন শত বৎসরের অধিক রাজত্ব করিতে পারে নাই।

একেত ভারতের নিবীর্য্যকারী জলবায়ুর গুণে অনেকে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তাহার উপর রাজন্যবর্গ চিরদিন বিলাসসাগরে ভাসিতে ভাসিতে নিস্তেজ

হইয়া থাকেন ; এ কারণ সকল বংশ কালে রাজশক্তি হারাইয়া বসেন এবং তদীয় বংশধরেরা নির্বীর্য্য হইয়া শবরূপে ভারতমাতার চরণতলে গড়াগড়ি দিতেছেন বা ভারতের একধারে পড়িয়া আছেন। এজন্য মহাকালী নিজ স্বামী শ্বেতকায় মহাদেবের উপর চিরদিন নৃত্য করিতেছেন।

শাস্ত্রের লিখন, যে যুগে যে জাতি ভারতে যত বড় সুবিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করুন না, মা কালী রণরঙ্গবেশে তাহা চূর্ণ বিচূর্ণ করিবেন। যে জাতি ভারত মাতার উপর অত্যাচার করিবে, তাহাদের পতন অবশ্যম্ভাবি, তাহার সাক্ষ্য দেখ, আর্য্যক্ষত্রিয়জাতি ও রাজপুতজাতি ব্রাহ্মণদিগের কুপরামর্শে জিত অনার্য্য জাতিবর্গকে শূদ্র নামে অভিহিত করিয়া চিরদিন উহাদিগকে নীচ শ্রেণিস্থ করিয়া রাখেন এবং কখন মস্তক উত্তোলন করিতে দেন নাই। এই পাপে তাঁহারা রাজশক্তি হারাইয়া বসেন। মুসলমান জাতি ভারতের ধর্ম্মের উপর ঘোর অত্যাচার করেন ; এই পাপে তাঁহারা নিজ সাম্রাজ্য হারান। মহারাষ্ট্র জাতি চৌথ আদায়ের জন্য নানা প্রদেশের প্রজাবর্গের উপর অযথা অত্যাচার করেন ; এই পাপে তাঁহারাও রাজশক্তি হারান।

এখন শ্বেতকায় ইংরাজ জাতি বিধিনির্ব্বন্ধে ভারতমাতার অধিপতি। তাঁহারা সভ্যদেশোচিত নানা সদনুষ্ঠান প্রবর্ত্তন করিয়া ভারতকে যেরূপ নানাবিষয়ে সুশিক্ষা দিতেছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহারা ভারতকে অযথা শোষণ করিতেছেন এবং আমাদের ধনদৌলতের উপর অত্যাচার করিতেছেন। আমরা রাজভক্ত প্রজা হইয়া তাঁহাদের কোনরূপ অমঙ্গল প্রার্থনা করিব না। কিন্তু বিধাতার ভবিতব্য, কেহ খণ্ডাইতে পারিবে না। তাঁহাদের পতন কালে অবশ্যম্ভাবি এবং মা কালী তাঁহাদিগকেও নিজ পাদমূলে রাখিয়া দিবেন। অতএব বুঝিয়া দেখ, কি জন্য তিনি রণরঙ্গবেশে নিজ স্বামীর উপর চিরদিন নৃত্য করিতেছেন।

ওহে ভারতবাসিগণ! আইস, আমরা চিরদিন ভারতমাতাকে মা কালী-রূপে পূজা করি এবং তাঁহার পরমভক্ত সেবক ও সুসন্তান হইতে সর্ব্বান্তঃকরণে চেষ্টা পাই। এখন তোমরা সামান্য ছাগ বলি দিয়া তাঁহার পূজা কর বটে ; কিন্তু তিনি ইহাতে আদৌ সন্তুষ্ট হন না। যখন তোমরা বীরদর্পে দর্পিত

হইয়া সংগ্রামক্ষেত্রে তদীয় যূপকাষ্ঠে নিজ নিজ প্রাণ উৎসর্গ করিবে, তখনই তিনি তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হইবেন। যখন তোমরা দেশের মঙ্গলের জন্য রাজকার্য্যে অম্লানবদনে প্রাণ বিসর্জ্জন করিবে, তখনই তিনি তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হইবেন। আরও এ কথা চিরদিন মনে রাখিবে, যে দিন ভারতের বিভিন্ন জাতিবর্গ জাতিবিদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া একচিত্তে সাধারণতন্ত্র স্থাপন করিবে, সেইদিন আমরা মাকালীর পূজার পূর্ণাহুতি দিব এবং তিনি সকলকে নিজ ক্রোড়দেশে আশ্রয় দিবেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

পৌরাণিক কথাপ্রসঙ্গ।

প্রথম অংশ।

পুরাণ কতদূর সত্য ?

যে সকল স্তূপাকার গ্রন্থরাশি পুরাণ ও উপপুরাণ নামে হিন্দুসমাজে প্রচলিত, যাহাদের তথা-কথিত একমাত্র রচয়িতা মহর্ষি ব্যাসদেব, ইহারাই হিন্দুধর্ম্মের ভক্তিমার্গ পূর্ণভাবে প্রকটিত করিয়া এ ধর্ম্মকে আধুনিক আকারে আনয়ন করিয়াছে। আমাদের সুশিক্ষিত বান্ধবগণ বলিবেন, পুরাণগুলি কেবল অলীক উপকথায় ও কাল্পনিক উপাখ্যানে পরিপূর্ণ; উহাদের কিছুমাত্র সারবত্তা নাই, উহারা শিখাধারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের পাঠ্য এবং মূর্খ শ্রমজীবী ও মহিলাগণের শ্রাব্য। উহারা সুধীসমাজে কদাচ আদরণীয় হইবার যোগ্য নহে। বস্তুতঃ তাঁহাদের যে রুচি আজ স্পেনসার, ডার্বিন, কাণ্ট পড়িয়া

সুমার্জ্জিত, সে রুচির নিকট উহারা কি কদাচিৎ পাঠ্য হইতে পারে? তাঁহাদের ধ্রুববিশ্বাস, বৌদ্ধযুগের পর এই সকল অপদার্থ গ্রন্থরাশি হিন্দুসমাজে প্রচলিত হইয়া আমাদের জাতীয় অধঃপতন আনয়ন করিয়াছে, পরিশেষে দেশকে পরাধীনতারূপ নিগড় শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছে। অতএব এক পদাঘাতে উহাদিগকে কর্ম্মনাশার জলে প্রক্ষেপ করাই শ্রেয়।

এখন পুরাণগুলি উপকথায় পূর্ণ হউক, অতিরঞ্জিত হউক, বা মার্জ্জিত রুচির নিকট যতই কেন অপাঠ্য হউক না, ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে, সত্যানুসন্ধিৎসু পাঠকগণ উহাদের ভিতর প্রচুর পরিমাণে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও ঐতিহাসিক সত্য দেখিতে পাইবেন।

Myths as Pocoke ably expresses it, are now proved false just in proportion as we misunderstand them ; they are truths in proportion as they were once understood.

(Isis unveiled)

"পোকোক সাহেব বলেন, পুরাণকাহিনী যতদূর বুঝিতে না পারা যায়, উহারা মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়। যখন উহারা যে পরিমাণে বুঝা যাইত, তখন উহারা সেই পরিমাণে সত্য বলিয়া বিবেচিত হইত।"

ভৌতত্ত্বিক যুগসমূহে, অতি প্রাচীন কালে, অনৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিক সময়ে যে সকল মহৎ মহৎ প্রাকৃতিক ও সামাজিক ঘটনা সংঘটিত হয়, সেই সকল অত্যাবশ্যকীয় ঘটনা এবং দর্শনজ্যোতিষপ্রতিপাদিত মহাসত্যগুলি যাহাতে জনসাধারণ সহজে বুঝিতে পারে, তজ্জন্য উহারা পুরাণাদি গ্রন্থে রূপক ভাবে উপাখ্যানচ্ছলে বর্ণিত হইয়াছে। রূপক ভেদ করিয়া উহাদের অন্তর প্রবেশ করিতে চেষ্টা পাও, বুঝিতে পারিবে, অলীক উপাখ্যানের ভিতরও যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক সত্য নিহিত আছে।

পুরাণোক্ত যে সকল ঘটনা আমাদের নিকট এখন অলৌকিক, অসম্ভব ও অতিপ্রকৃত বোধ হইতেছে, উহারা শাস্ত্রকারদিগের আদৌ কল্পনা-প্রসূত বা গেঁজেলি নয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে বা মন্বন্তরে যখন দেবাসুরদৈত্যরূপী মনুপুত্রগণ তদানীন্তন পৃথিবীতে বিচরণ করেন, তৎকালে সংসারে যে সকল ভৌতিক নিয়মাবলি প্রচলিত ছিল, কলিকালে উহাদের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে;

এজন্য ঐ সকল ঘটনা এখন আমাদের নিকট অতিপ্রকৃত বলিয়া বোধ হইতেছে।

ঐতিহাসিক ঘটনা হউক বা অনৈতিহাসিক ঘটনা হউক, ধর্ম্মাত্মা হিন্দু সকল ঘটনায় পূজ্য দেবতার অপার মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের পরাজয় দেখাইয়া যথার্থ ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম্মের ধ্বংস সাধন করিয়া আধুনিক পৌরাণিক ধর্ম্ম সর্ব্বত্র প্রচার করিবার জন্য এ সকল গ্রন্থ রচিত হয়। সেজন্য মূর্খ জনসাধারণকে হিন্দুধর্ম্মের সত্য ও উপদেশ ভালরূপ বুঝাইবার জন্য নানা কথা উপাখ্যানচ্ছলে বর্ণিত হইয়াছে। এখন শিক্ষিত সম্প্রদায়, যাঁহারা উহাদিগকে কাল্পনিক বলিয়া উড়ান, তাঁহারা নানা ফুলের মধু সংগ্রহের ন্যায় পুরাণোক্ত উপাখ্যানগুলির সত্য বুঝিতে সচেষ্ট হইবেন। কিন্তু যে পুরাণের আভ্যন্তর যোগেশ্বরপ্রকটিত, উহার প্রকৃত তাৎপর্য্য কে বুঝিতে পারে? সে স্থলে উহার অনেক কথা অন্ধ বিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করা উচিত।

পুরাণাদি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে বুঝা যায়, উহাদের ভিতর তিনটী স্তর বিদ্যমান, যথাঃ—

(১) আদি পুরাণ।	(১) আদি রামায়ণ।	(১) আদি মহাভারত।
(২) মধ্য পুরাণ।	(২) মধ্য রামায়ণ।	(২) মধ্য মহাভারত।
(৩) আধুনিক পুরাণ।	(৩) আধুনিক রামায়ণ।	(৩) আধুনিক মহাভারত।

আদিপুরাণ নামে কোন ধর্ম্মশাস্ত্র এখন ভারতে প্রচলিত নাই বটে; কিন্তু ইহাই আধুনিক পুরাণগুলির যোগেশ্বরপ্রকটিত আভ্যন্তর। বোধ হয়, আদি পুরাণ যোগসিদ্ধ মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসকর্ত্তৃক প্রথম সংগৃহীত ও প্রচারিত হইয়াছিল। তিনি স্বশিষ্য লোমপাদের নিকট ইহা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহাতে সৃষ্টি, মন্বন্তরাদি ও প্রাচীনকালের মহৎ মহৎ ঘটনা বর্ণিত ছিল। এ সকল বিষয়ের গূঢ় রহস্য যোগসিদ্ধ মহর্ষিগণের হৃদয়াকাশে প্রতিভাত হইত, অথবা প্রাচীন কালের অধ্যাত্মবিজ্ঞান হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। গঙ্গোত্রী-নিঃসৃত পবিত্র গঙ্গোদকের ন্যায় এ সকল জ্ঞাননিচয় তৎকালে বিশুদ্ধ ছিল; কিন্তু মানবের আধ্যাত্মিক অধঃপতন বশতঃ ইহারা কলিকালে কলুষিত হইয়া গিয়াছে।

বোধ হয়, যখন যোগসিদ্ধ মহর্ষি ব্যাসদেব আদিপুরাণ স্বশিষ্য লোমপাদের নিকট বলেন, তৎকালে তিনি ইহার বিকৃত অর্থ করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন অথবা কাল সহকারে তাঁহার উপদিষ্ট সত্যের বিকৃত অর্থ হইয়া গিয়াছে। এ কলিযুগে অধ্যাত্মবিজ্ঞানের মহৎ মহৎ সত্য সংগোপন করিবার জন্য সকল দেশের মহাত্মাগণ সাধ্যমত চেষ্টা পাইয়াছেন। এজন্য প্রত্যেক ধর্ম্মশাস্ত্রের স্থলবিশেষ সাধারণের নিকট এত দুর্ব্বোধ্য ও জটিল। যাহা হউক, ব্যাসরচিত আদিপুরাণ কতকাল হিন্দুসমাজে প্রচলিত ছিল এবং কোন্ সময়ে ইহা লুপ্ত বা রূপান্তরিত হইল, তাহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইহাকে আধুনিক পুরাণগুলির অস্থিপঞ্জর স্বরূপ জ্ঞান করা যাইতে পারে।

মধ্যপুরাণগুলি পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত। কেহ কেহ বলেন, ইহারা খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে অমরসিংহের সময় বা তৎপূর্ব্বে হিন্দুসমাজে প্রচারিত হয়। সর্গ, বিসর্গ, মন্বন্তর, বংশবৃত্তান্ত ও বিখ্যাত লোকের জীবনচরিত ঐ সকল পুরাণে বর্ণিত ছিল। বোধ হয়, হিন্দুসমাজে ধর্ম্মবিষয়ক মতামতের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে ইহারা লুপ্ত হইয়া যায়, অথবা রূপান্তরিত হইয়া আধুনিক পুরাণে পরিণত হয়। যৎকালে মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন ছিল না, তখন বিবিধ গ্রন্থ সহজে রূপান্তরিত করা যাইত। তাহার সাক্ষ্য, রামায়ণে ও মহাভারতে এখন নানা শ্লোক প্রক্ষিপ্ত দেখা যায়।

আধুনিক পুরাণগুলি দশলক্ষণাক্রান্ত। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, ইহারা অষ্টম শতাব্দীর পর হিন্দুসমাজে প্রচারিত হয়। ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম নির্ম্মূল হইবার পর, ইহারা পৌরাণিক ধর্ম্মের সম্যক পোষণ ও বর্দ্ধন করে। ইহারা সম্প্রদায়বিশেষের দেবদেবীর মাহাত্ম্যকথন, পূজার্চ্চনাবিধি, দেবোৎসব ব্রত-পালন, প্রায়শ্চিত্তবিধানাদি নানা কথায় পূর্ণ। তদ্ভিন্ন প্রাচীন কালের পুরাণের নানা কথা ঐ সকল গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।

যেমন অকৃত্রিম সনাতন হিন্দুধর্ম্ম হিন্দুসমাজে জ্ঞানবিজ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতির সঙ্গে কালসহকারে ক্রমবিকসিত ও স্তরে স্তরে নির্ম্মিত, ইহার পুরাণাদি ধর্ম্মগ্রন্থগুলিও সেইরূপ কালসহকারে সাধারণসমাজের ধর্ম্মবিষয়ক মতামতের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে ক্রমবিকসিত ও স্তরে স্তরে রচিত বলা উচিত। শ্রুতি, স্মৃতি ও সূত্র গ্রন্থগুলির কোনরূপ পরিবর্ত্তনদেখা যায় না বটে, কিন্তু অপরাপর গ্রন্থের

নানা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। রামায়ণ বল, মহাভারত বল, অষ্টাদশ পুরাণ বল, ইহারা আমাদের জাতীয় গ্রন্থ ও জাতীয় সম্পত্তি। মহর্ষি বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করেন বটে; কিন্তু আমরা আজকাল যে রামায়ণ পাঠ করি, তাহা আদি রামায়ণ হইতে কথঞ্চিৎ বিভিন্ন; কারণ প্রথমোক্ত রামায়ণে নানা শ্লোক নানা স্থানে প্রক্ষিপ্ত আছে। ভারত মহাসাগরের বালী দ্বীপে যে রামায়ণ প্রচলিত, তাহা এ দেশের রামায়ণ হইতে বিভিন্ন। সেইরূপ মহাভারতেও নানা স্থানে নানা শ্লোক প্রক্ষিপ্ত আছে।

অষ্টাদশ মহাপুরাণের রচয়িতা কে? যে সকল পুরাণ শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিদ্বেষসূচক মতামতে পূর্ণ, উহারা কি প্রকারে এক বেদব্যাসরচিত হইতে পারে? সাধারণে যাহাই বিশ্বাস করুক না, সত্যের খাতিরে বলা উচিত, বেদসংগৃহীতা ব্যাসদেব উহাদের রচয়িতা নন। তাঁহার সময়ে আর্য্যসমাজে পৌরাণিক ধর্ম্ম আদৌ প্রচলিত হয় নাই। ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত, তিনি আদিপুরাণের রচয়িতা। যখন আধুনিক পুরাণগুলি (উহাদের লেখক যাঁহারা হউন না) পরোক্ষভাবে সেই আদিপুরাণের শেষ সংস্করণ, তখন কি শৈব, কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব, যদি প্রত্যেক সম্প্রদায় সাধারণের অন্ধবিশ্বাস উৎপাদনার্থ নিজ নিজ পুরাণ গুলিকে সেই ব্যাসরচিত বলিয়া প্রচার করেন, তাহাতে হিন্দুসমাজের মঙ্গল ব্যতীত কোনরূপ অমঙ্গল নাই। যখন বাইবেলও কোরাণ সামান্য মানবরচিত হইলেও খৃষ্টানেরা ও মুসলমানেরা উহাদিগকে ঈশ্বরপ্রকটিত বলিয়া স্পর্দ্ধার সহিত প্রচার করিতেছে, তখন পৌরাণিক ধর্ম্মের প্রধান গ্রন্থগুলিকে যোগসিদ্ধ ব্যাসদেবপ্রণীত বলাতে আমরা কি দোষের ভাগী হইলাম?

এক সময়ে পুরাণ পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত, অপর সময়ে দশলক্ষণাক্রান্ত হইবার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, উহারা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতবর্গ দ্বারা বিরচিত হইয়াছে এবং সমাজের সাধারণ বিশ্বাসানুযায়ী কালক্রমে পরিবর্ত্তিত ও রূপান্তরিত হইয়াছে। দেখ, যে কপিলদেব সাংখ্যযোগ প্রচার করিয়া জগৎ-বিখ্যাত হন এবং যাঁহার সময়ে ভক্তিযোগ হিন্দুধর্ম্মে আদৌ প্রচলিত হয় নাই, তিনি শ্রীমদ্ভাগবতে স্বীয় মাতা দেবহূতিকে সাংখ্যযোগ ও ভক্তিযোগ উপদেশ দিতেছেন। এস্থলে সাধারণের মনে ভক্তিযোগ সম্যক্ বদ্ধমূল করিবার জন্য

ভাগবৎরচয়িতা (ব্যোপদেব) কপিলদেবের মুখারবিন্দ হইতে ঐ সকল অসাধারণ ভক্তিযোগের কথা নিঃসরণ করাইতেছেন। এইরূপে ধর্ম্মগ্রন্থের যে পরিবর্ত্তন করা হয়, তাহা প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় সংঘটিত বলা উচিত।

যে অকৃত্রিম ধর্ম্ম পুরাতন বনিয়াদের উপর নূতন হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছা করে অথবা পুরাতন মত সম্যক বজায় রাখিয়া নূতন মত প্রচার করিতে চাহে, সে ধর্ম্ম এই প্রকারে স্বীয় গ্রন্থের পরিবর্ত্তন বা নূতন সংস্করণ করিয়া থাকে। আর যে কৃত্রিম ধর্ম্ম পুরাতন মতামতের বিলোপ সাধন করিয়া নূতনমত প্রচার করিতে চাহে, সে ধর্ম্ম পুরাতন ধর্ম্মগ্রন্থরাশির উচ্ছেদসাধনার্থ উহাদিগকে দগ্ধ করিয়া বসে। এইরূপে খৃষ্ট ও মুসলমান ধর্ম্ম জগতে প্রাচীন ধর্ম্মের রাশি রাশি গ্রন্থ নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে।

এখন পুরাণোক্ত কতকগুলি উপাখ্যানের রূপক ভেদ করিয়া উহাদের বৈজ্ঞানিক অর্থ প্রকাশ করিতে সচেষ্ট হইব।

(১) ভগবানের মৎস্যাবতার।

(ইহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা)

ভগবান মৎস্য অবতার গ্রহণ করিয়া খণ্ডপ্রলয়ে পৃথিবী জলপ্লাবনে বিনষ্ট হইলে পরমধার্ম্মিক সত্যব্রত বা বৈবস্বত মনুকে সবংশে রক্ষা করেন এবং হয়গ্রীব দৈত্যকে সংহার করিয়া বেদ রক্ষা করেন। একটা সামান্য শফরী রাজা সত্যব্রত দ্বারা প্রাণে রক্ষিত হইয়া সমুদ্রে স্থাপিত হয়। তথায় ইহা ক্রমশঃ দীর্ঘকায় হইতে হইতে যোজনব্যাপী দেহ ধারণ করে। প্রলয়ের সাত দিবস পূর্ব্বে প্রাণদাতা সত্যব্রতকে প্রলয়ের বার্ত্তা অবগত করায় এবং পৃথিবী জলপ্লাবিত হইলে একখানি নৌকা পাঠাইয়া তাঁহাকে সবংশে রক্ষা করে। পরমধার্ম্মিক রাজর্ষি সত্যব্রত নিজ পুণ্য বলে পর মন্বন্তরে বৈবস্বত মনু হন। সেই খণ্ডপ্রলয়ে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা নিদ্রিত হইলে হয়গ্রীব দৈত্য তাঁহার নিকট হইতে বেদ অপহরণ করিয়া জলধিগর্ভে নিমগ্ন হইয়া যায়। উহাকে সংহার করিয়া মৎস্যরূপী ভগবান বেদ উদ্ধার করেন।

এই পৌরাণিক উপাখ্যানের ভিতর কি কোনরূপ বৈজ্ঞানিক বা ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে? ইহা কি অলীক পুরাণের অলীক উপকথা মাত্র? আমরা কি অন্ধবিশ্বাসের সহিত এ সকল উপকথা স্বধর্ম্মের মহাসত্যজ্ঞানে পূজা করিব?

এখন আমরা যেরূপ পাশ্চাত্য শিক্ষায় বিভূষিত, তাহাতে উহাদের বিজ্ঞানসম্মত বা যুক্তিসঙ্গত অর্থ না করিলে উহাদের উপর আমাদের আস্থা হইবে না। অতএব উহাদের কিঞ্চিৎ বৈজ্ঞানিক অর্থ করা কর্ত্তব্য।

খৃষ্টানদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র পুরাতন বাইবেল পাঠে অবগত হওয়া যায়, পূর্ব্বে সমগ্র মেদিনী জলপ্লাবিত হইলে যাবতীয় জীবজন্তু ও উদ্ভিজ্জ নষ্ট হইয়া যায়। সেই জলপ্লাবনে একমাত্র পরমধার্ম্মিক নোয়া সবংশে রক্ষা পান। তিনি নিজ অর্ণবপোতে যাবতীয় উদ্ভিজ্জের বীজ ও নানা জীবজন্তুর দম্পতি রাখিয়া সৃষ্টি রক্ষা করেন। সেইরূপ প্রাচীন পারসীকদিগের অবস্তু ভাষায় জরথুস সেই মহাজলপ্লাবনে রক্ষা পান। অন্যান্য প্রাচীন জাতির শাস্ত্রেও এ কথা পাওয়া যায়।

সত্য সত্যই কি সমগ্র মেদিনী জলমগ্ন হওয়াতে ইহার যাবতীয় জীবজন্তু এক কালে বিনষ্ট হইয়াছিল? উন্নত বিজ্ঞান এ কথায় বিশ্বাস করিতে পারে না। ভূবিদ্যামতে অতীত ভৌতত্ত্বিক যুগসমূহে ধরিত্রী আধুনিক আকার ধারণ করিবার পূর্ব্বে নানা খণ্ডপ্রলয় অতিক্রম করে। এইরূপে নানাদেশ সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন হইয়া যায় এবং সমুদ্রের তলদেশ নানা স্থানে উত্থিত হইয়া নানাদেশ গঠন করে। এইরূপে নানা জীবজন্তু নষ্ট ও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; কিন্তু বিজ্ঞান কোনরূপ সর্ব্বব্যাপী জলপ্লাবনের কথা উল্লেখ করে না।

থিয়সফিক্যাল পুস্তক পাঠে অবগত হওয়া যায়, পৃথিবীর মহাদেশ বা দেশ বিশেষ দুইবার জলপ্লাবনে বিনাশ পাইবার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রথমতঃ। চতুর্থ মূল জাতির সময়, যখন আট্‌লান্টিস মহাদ্বীপ দীর্ঘকায় দৈত্যজাতির আবাসভূমি ছিল, তৎকালে ভৌতত্ত্বিক বিপ্লবে সমগ্র মহাদেশ অধিবাসী দৈত্যগণের সহিত জলমগ্ন হইয়া যায় এবং আধুনিক আটলান্টিক মহাসাগর তদুপরি বহমান হইতেছে। এই বিপ্লব সম্বন্ধে কিম্বদন্তি প্লেটোর সময় পর্য্যন্ত ছিল। আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে সন্ধান লইতেছেন। কেহ কেহ অনুমান করেন, ভাগবতে যে রাজা সত্যব্রতের কথা উল্লিখিত আছে, তিনি সেই খণ্ডপ্রলয়ে রক্ষিত হন। তৎকালে দীর্ঘকায় মহামৎস্য জাতি মহাসাগরে বিচরণ করিত।

দ্বিতীয়তঃ। আধুনিক বৈবস্বত মন্বন্তরে এক মহাজলপ্লাবন আদিম আর্য্যজাতির ভিতর সংঘটিত হয়। এসিয়ায় মধ্যভূভাগে, যে স্থলে আজকাল গবী মরুভূমি ও তুর্কীস্থান বিস্তৃত, তথায় পুরাকালে আর্য্যজাতির বসবাস ছিল। ভৌতত্ত্বিক বিপ্লবে ঐ দেশ জলমগ্ন হইয়া সমুদ্রে পরিণত হয়। বহুকাল পরে তিব্বতদেশের উত্তরে অবস্থিত সমুদ্রখণ্ড ভৌতত্ত্বিক বিপ্লবে পুনরায় উত্থিত হইয়া গবী মরুভূমি গঠন করে। সেইরূপ তুর্কীস্থানস্থিত সমুদ্রখণ্ড উত্থিত হইয়া প্রথমে শকদ্বীপ, পরে আধুনিক তুর্কীস্থান গঠন করে এবং কাস্পীয়ান ও আরল হ্রদ উক্ত সাগরের ভগ্নাবশেষ।

যাহা হউক, যে জলপ্লাবন বা ভৌতত্ত্বিক বিপ্লব দ্বারা এসিয়ার মধ্যখণ্ড জলমগ্ন হইয়া সমুদ্রে পরিণত হয়, তাহাতে আর্য্যজাতির অধিকাংশ লোক বিনাশ পাইয়াছিল। কিন্তু যাহারা উহার দক্ষিণাঞ্চলে বাস করিত, তাহাদের বংশাবলি কালক্রমে ভিন্ন ২ দেশে অভিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। এজন্য ঐ সকল দেশে জলপ্লাবন সম্বন্ধে একপ্রকার কিম্বদন্তি প্রচলিত দেখা যায়। ইহুদিদিগের ভিতর নোয়া, পারসীকদিগের ভিতর জরথুস, এবং হিন্দুদিগের ভিতর বৈবস্বত মনু সেই জলপ্লাবনে রক্ষিত হন। সকল জাতিই এই মহৎ ঘটনাটী নিজ ২ দেশের ঘটনা বলিয়া বর্ণন করিতেছে।

প্রচীনকালের যে সকল প্রস্তরফলক ভারতে পাওয়া গিয়াছে, উহাদের খোদিত লিপি পাঠ করিয়া বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিতেছেন, যে মৌ মহাদ্বীপ প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত ছিল, ১৮ হাজার বৎসর হইল ঐ মহাদ্বীপ একমুহূর্ত্তে সমস্ত অধিবাসীদের সহিত সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া যায়। অনেকে অনুমান করেন, সকল দেশের প্রাচীন শাস্ত্র এই জলপ্লাবন সম্বন্ধে উল্লেখ করিতেছে।

রাজা সত্যব্রত একটী ক্ষুদ্র মৎস্যের প্রাণরক্ষা করিয়া সমুদ্রে রাখেন। তথায় ইহা কালে যোজনব্যাপী দেহ ধারণ করে। শাস্ত্রের এ কথায় আমাদের বুঝা উচিত, অতি প্রাচীনকালে দীর্ঘকায় মহামৎস্যজাতি মহাসাগরে বিচরণ করিত। এ বিষয়ে বিজ্ঞানও যথেষ্ট প্রমাণ দিতেছে। ভৌতত্ত্বিক ডিভোনিয়ান যুগে বৃহদাকার মহামৎস্যজাতি জগতে আবির্ভূত হইয়াছিল। উহারা কালে লুপ্ত হইয়াছে, অথবা অপগত হইয়া ক্ষুদ্রকায় ধারণ করিয়াছে।

বৃহদাকার তিমি মৎস্য নহে, কিন্তু স্তন্যপায়ী জীব। প্রাচীনকালে তিমির ন্যায় বৃহদাকার মৎস্যজাতি মহাসাগরে বিহার করিত।

ভগবান মৎস্যাবতারে হয়গ্রীব দৈত্যকে সংহার করিয়া বেদরক্ষা করেন, এ কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? অনেকে অনুমান করেন, যৎকালে আট্‌লাণ্টিস মহাদ্বীপ ভৌতদ্বিক বিপ্লব দ্বারা অধিবাসী দৈত্যগণের সহিত আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরে পরিণত হইয়া যায়, তৎকালে হয়গ্রীব নামক দৈত্যকুল সেই সঙ্গে জলধিগর্ভে নিমগ্ন হইয়া বিনাশ পায়। দৈত্যদিগের ভিতর বেদানুশীলন ভালরূপ ছিল। হিন্দুশাস্ত্রে দেখা যায়, দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যদেব বেদে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। দৈত্যকুল জলপ্লাবনে নিধন প্রাপ্ত হইলে উহাদের গ্রন্থরাশি জলমগ্ন হইয়া যায়। তৎকালে বৃহদাকার মৎস্যজাতি ঐ সকল গ্রন্থ মুখে লইয়া তীরে প্রক্ষেপ করে। ইহাতে প্রাচীন কালের বেদ বা জাতীয় জ্ঞানভাণ্ডার সংসারে রক্ষা পায়। এজন্য হিন্দুধর্ম্ম আমাদিগকে উপকথাচ্ছলে শিখায়, মৎস্যরূপী ভগবান হয়গ্রীব দৈত্যকে সংহার করিয়া সংসারে বেদ রক্ষা করেন।

(২) ভগবানের কূর্ম্মাবতার

বা সাগরমন্থনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা

পুরাকালে দেবাসুরগণ মিলিত হইয়া ক্ষীরোদসাগর মন্থন করেন। যেমন গোপকন্যা ভাণ্ডে দুগ্ধ বা দধি রাখিয়া মন্থনদণ্ডে রজ্জু বেষ্টন করিয়া মন্থন করিতে২ নবনীত প্রস্তুত করে, সেইরূপ দেবাসুরগণ ক্ষীরোদসাগর মন্থন করিতে২ নানাবিধ রত্ন উৎপাদন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মন্থনকালে সুবিশাল মন্দর পর্ব্বত মন্থনদণ্ডের কার্য্য করে, মহাসর্প বাসুকী মন্থনরজ্জু হইয়া সেই পর্ব্বত বেষ্টন করে এবং ভগবান শ্রীবিষ্ণু মহাকূর্ম্মরূপ ধারণ করিয়া নিজ পৃষ্ঠোপরি সেই পর্ব্বত স্থাপিত করেন। একটা কচ্ছপের উপর রহিল একটা পাহাড়; একটা বৃহৎ সাপ সেই পাহাড়কে বেষ্টন করিয়া রহিল; আর দেবাসুরগণ সেই সাপের ল্যাজ ধরিয়া 'দে টান দে টান' বলিতে২ পাহাড়কে ঘুরাইতে লাগিলেন। কি গেঁজেলি! কি গেঁজেলি! গাঁজার দম অধিক দিয়া বামুনঠাকুরেরা এইরূপ অজগরি গপ্‌, মগজ্‌ হইতে বাহির

করিয়াছেন। বলিহারি তাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধিতে! এমন ছাই পাঁশ শিখাইবার কি প্রয়োজন?

তাঁহারা আরও বলেন, যৎকালে দেবাসুরগণ ক্ষীরোদসাগর মন্থন করিতে থাকেন, তৎকালে সপ্তবিধ রত্ন সাগর হইতে উত্থিত হইয়াছিল। পরিশেষে দেববৈদ্য ধন্বন্তরীদেব অমৃতভাণ্ড লইয়া উত্থিত হইলে দেবাসুরগণ সুধাপানার্থ কড়াকড়ি করিতে ২ তুমুল সংগ্রামে লিপ্ত হইলেন। বহুকাল এ সংগ্রাম চলিল। পরে বিষ্ণু স্বয়ং মোহিনীরূপ ধারণ করিয়া সকলের সমক্ষে দেখা দিলেন। বিবাদভঞ্জনার্থ তিনি সুধা বণ্টন করিতে আরম্ভ করিলেন। অসুরেরা তাঁহার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া সুধাপান করিতে বিস্মৃত হইল। কিন্তু দেবতারা সুধা পান করিয়া অমরত্ব লাভ করিলেন।

বলি, হিন্দুশাস্ত্র কি কেবল ছাই পাঁশে ভরা? যোগসিদ্ধ মহর্ষিগণ যে শাস্ত্র লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা আজ আমাদের নিকট ছাইপাঁশ হইল। একমাত্র বুদ্ধির দোষে বা শিক্ষার দোষে শাস্ত্রের এই সকল অমূল্য রত্নও আমাদের নিকট ছাই পাঁশ বোধ হইতেছে। সকলেই ইহাকে সামান্য উপকথা বলিয়া উড়াইয়া দিবেন; কিন্তু আধুনিক উন্নত বিজ্ঞান কি বলে, তাহার খপর কি কেহ রাখেন?

একজন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত এই সামান্য শ্রুতিমনোহর উপাখ্যানের ভিতর নানা বৈজ্ঞানিক সত্য দেখিতে পাইবেন। অতীত ভৌতত্ত্বিক যুগের নানা প্রাকৃতিক ঘটনা এই সামান্য উপাখ্যানে একত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহা দ্বারা নিম্নলিখিত ঘটনাপরম্পরা বুঝাইতেছে।

(১)দেবাসুরদিগের বিচরণকালে তদানীন্তন পৃথিবী লবণাক্ত নীলাম্বুর পরিবর্ত্তে শ্বেতাম্বু ক্ষীরোদসাগরে পূর্ণ ছিল। এজন্য তাঁহারা ক্ষীরোদসাগর মন্থন করেন।

(২) তৎকালে সিলিকেট ও কর্ব্বনেটভরা ক্ষীরোদসাগর হইতে বৃহৎ ২ পর্ব্বতশ্রেণী উত্থিত হয় এবং উহারা বৃষ্টির জলে ধৌত হইয়া মৃত্তিকাদি গঠন করে। এ জন্য মন্থনকালে মন্দর পর্ব্বত মন্থনদণ্ডস্বরূপ হয়।

(৩) তৎকালে বৃহদাকার মহাকূর্ম্ম ও মহাসর্প প্রভৃতি সরীসৃপগণ আবির্ভূত হয়। এজন্য মন্থনকালে মহাকূর্ম্মের পৃষ্ঠোপরি মন্দরপর্ব্বত স্থাপিত এবং বাসুকি মন্থনরজ্জুস্বরূপ হয়।

তৎকালে মহাগাভী, মহাঘোটক, মহাহস্তী, মহাবৃক্ষ প্রভৃতি বৃহদাকার জন্তু ও উদ্ভিজ্জ ভূপৃষ্ঠে আবির্ভূত হয়। এজন্য সাগরমন্থনে বিবিধ রত্ন উত্থিত হইয়াছিল।

(৫) তৎকালে উদ্ভিজ্জ জীবসমূহ কালসহকারে স্ত্রীপুরুষে বিভক্ত হওয়াতে আধুনিক মৈথুনধর্ম্ম সংসারে প্রবর্ত্তিত হয়। এ জন্য বিষ্ণু স্বয়ং মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করেন।

এইরূপ জগতের নানা মহৎ মহৎ ঘটনা উক্ত সামান্য উপাখ্যানে একাধারে সন্নিবেশিত আছে।

এখন উন্নত বিজ্ঞান পর্য্যবেক্ষণাদি বলে কিরূপ সিদ্ধান্ত করে, তাহার সন্ধান লওয়া উচিত। ইহার মতে পৃথিবী সর্ব্বপ্রথমে বাষ্পময়ী ছিল। অতিরিক্ত উত্তাপ বশতঃ তৎকালে যাবতীয় পদার্থ বাষ্পাকারে ছিল। তৎকালে ইহাতে কোন উদ্ভিদ্ বা জীবজন্তুর আবির্ভাব হয় নাই। পরে ইহার বাহ্যস্তরের অন্তর্নিহিত উত্তাপরাশি বিকিরণ দ্বারা (By radiation) কালক্রমে কথঞ্চিৎ শীতল হইলে, ইহার বাহ্যস্তর তরল পদার্থে পূর্ণ হইয়া যায়। ইহার যাবতীয় পদার্থ তরল অবস্থায় পরিণত হয়। তৎপরে ইহার উত্তাপরাশি আরও যত শীতল হইতে থাকে, ইহা স্থানে স্থানে কঠিন ত্বকে আবৃত হয়; কিন্তু ইহার অভ্যন্তর ভাগ তরল পদার্থে পূর্ণ রহিয়া যায়। ভূগর্ভে প্রতি শতফুটে ১ ডিগ্রী উত্তাপ বাড়ে এবং পৃথিবীর ব্যাস ৮০০০ মাইল, ইহাতে বুঝা উচিত, ইহার অভ্যন্তর ভাগ এখনও কিরূপ উত্তপ্ত। এই উত্তপ্ত অবস্থায় যাহা ভূপৃষ্ঠে কঠিন, তাহা অভ্যন্তরে তরল।

যৎকালে ভূপৃষ্ঠ তরল জলীয় পদার্থে পূর্ণ হইতে থাকে, তৎকালে দীর্ঘকায় মহামৎস্য প্রভৃতি জলচর জন্তুগুলি ক্রমশঃ আবির্ভূত হয়। যৎকালে ভূপৃষ্ঠ স্থানে স্থানে কঠিন ত্বকে আবৃত হওয়াতে স্থলভাগ দেখা দেয়, তৎকালে তরল গলিত ধাতু স্থানে স্থানে ঘনীভূত হইয়া পর্ব্বতাদি উৎপাদন করে এবং উহারা ভূপৃষ্ঠে স্তরে স্তরে বিন্যস্ত হইয়া ক্রমশঃ উত্থিত হইতে থাকে; পরে বৃষ্টির জলে ক্রমশঃ ধৌত হইতে হইতে মৃত্তিকা গঠন করে। ডিভোনিয়ান যুগে বৃহদাকার মহামৎস্য জাতি ভূপৃষ্ঠে আবির্ভূত হয়। অঙ্গারবাহিযুগে (carboniferous period) বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বতশ্রেণী, মহাকূর্ম্ম, মহাভেক প্রভৃতি উভচর জন্তু ও সুবিশাল

মহাপাদপ সকল দেখা দেয়। ক্রীটেসাস যুগে বৃহৎ বৃহৎ মহাসর্পজাতি উদ্ভূত হয়। মৎস্যজাতির যে সকল বংশধর ক্রমবিবর্ত্তনে বিবর্ত্তিত হইয়া কালক্রমে বৃহদাকার মহাকূর্ম্মে পরিণত হয়, পর্ব্বতসমাকীর্ণ কঠিন বাহ্যাবরণসংযুক্ত পৃথিবীতে (জলে ও স্থলে) জীবনধারণোপযোগী করিবার জন্য উহাদের পৃষ্ঠদেশ প্রস্তরের ন্যায় কঠিন ত্বকে আবৃত হয়। উহাদের অপগত বংশধরদিগের (আধুনিক কচ্ছপজাতির) পৃষ্ঠদেশে খোলা দেখা যায়। যুগধর্ম্মে মহামৎস্য, মহাকূর্ম্ম, মহাসর্প ও মহাবৃক্ষ সকল অপগত হইয়া ক্ষুদ্রকায় হইয়া গিয়াছে।

এখন সৃষ্টির এই সকল মহৎ মহৎ ঘটনা সংঘটিত হইতে কত যুগ যুগান্তর বা কত লক্ষ লক্ষ বৎসর অতীত হইয়াছে,তাহা অসম্পূর্ণ বিজ্ঞান এখনও স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিতে পারে নাই। যাহা হউক, ইহা আমাদের পরম গৌরবের বিষয়, আজকাল উন্নত বিজ্ঞান অসাধারণ পর্য্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান বলে যে সকল মহৎ মহৎ তত্ত্ব আবিষ্কার করিতেছে, সেই সকল মহৎ তত্ত্ব সনাতন হিন্দুধর্ম্ম এতকাল আমাদিগকে সামান্য উপকথাচ্ছলে শিক্ষা দিয়া আসিতেছে। যোগেশ্বরপ্রকটিত বলিয়া ইহার এত গৌরব ও মাহাত্ম্য।

এখন সাগরমন্থনের গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করিতে চেষ্টা পাইব। ভূপৃষ্ঠে লবণাক্ত নীলাম্বুরাশি আবির্ভূত হইবার পূর্ব্বে ইহা ক্ষীরোদসাগরে পূর্ণ ছিল। ইহাতে বুঝা উচিত, আজকাল ভূপৃষ্ঠে যেমন লবণাক্ত মহাসাগর বহমান, অতি পুরাকালে, কে-জানে-কোন-সময়ে, বোধ হয় লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে ইহা গলিতধাতুমিশ্রিত শ্বেতবর্ণ তরল পদার্থে পূর্ণ ছিল। ইহাতে সিলিকেট ও কার্ব্বনেট অধিক পরিমাণে থাকায় ইহার বর্ণ কিয়ৎ পরিমাণে দুগ্ধবৎ ছিল। এ জন্য তদানীন্তন পৃথিবীর মহাসাগর শাস্ত্রে ক্ষীরোদসাগর বলিয়া খ্যাত। যোগসিদ্ধ মহর্ষিগণ যোগবলে এ সকল তত্ত্ব অবগত হন। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা অনুসন্ধানবলে এখনও এ সকল তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন নাই। সুদূর ভবিষ্যতে কি হইবে, বলা যায় না।

থিওসফি পাঠে অবগত হওয়া যায়, আধুনিক পৃথিবীতে বা জম্বুদ্বীপে আধুনিক মানবজাতি বা বৈবস্বত মনুপুত্রগণ আবির্ভূত হইবার পূর্ব্বে তদানীন্তন পৃথিবীতে (অর্থাৎ) সুমেরু মহাদ্বীপে দেবরূপী মনুপুত্রগণ এবং লিমুরিয়া ও আটলাণ্টিস মহাদ্বীপদ্বয়ে দৈত্যাসুররূপী মনুপুত্রগণ বিচরণ করিয়া যায়। ভূপৃষ্ঠ

জলে ও স্থলে বিভক্ত হইয়া আধুনিক আকার ধারণ করিবার পূর্ব্বে তাঁহারা বসুন্ধরা ভোগ করিয়াছেন। এ বিষয়ে বিজ্ঞান এখনও কিছুমাত্র প্রমাণ পায় নাই। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্র দেবাসুরদিগের সাগরমন্থন উল্লেখ করিয়া পরোক্ষভাবে ইহার সমর্থন করিতেছে।

যেমন দুগ্ধমন্থনকালে নবনীত তক্রের উপর ভাসিয়া উঠে, সেইরূপ দেবাসুরদিগের সাগরমন্থন কালে বা তাঁহাদের বিচরণকালে যাহা উত্তরকালে ভূপৃষ্ঠে স্থলরূপে পরিণত হয়, তাহা নবনীতের ন্যায় ক্ষীরোদ সাগরের উপরে ভাসিয়া উঠে। ইহাতে বুঝা উচিত, শ্বেতাম্বুসদৃশ সিলিকেট ও কার্ব্বনেটভরা ধাতুদ্রব কালসহকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া তক্রের ন্যায় লবণাক্ত জলে ও নবনীতের ন্যায় কঠিন মৃত্তিকাও পর্ব্বতাদিতে পরিণত হয়। এই প্রকারে ভূপৃষ্ঠ জলে ও স্থলে বিভক্ত হইয়া আধুনিক আকার ধারণ করিতে থাকে। এখন ক্ষীরোদসাগরের সিলিকেট ও কার্ব্বনেটরাশি নানা পর্ব্বতশ্রেণীর লালবালিপ্রস্তর Redsandstone) প্রভৃতি নির্ম্মাণে ব্যয়িত হইয়া কি প্রকারে সোডিয়াম ক্লোরাইড ভরা লবণাক্ত নীলাম্বুরাশিতে পরিণত হইল, তাহা বুঝা অতীব সুকঠিন। ধরিত্রীর পৃষ্ঠদেশের পরিবর্ত্তন-পরম্পরা কে বুঝিতে পারে? আমরা এই পর্য্যন্ত বুঝিতে পারি, গলিতধাতু বা ধাতুদ্রব স্থানে স্থানে ঘনীভূত হইয়া পর্ব্বতাদি উৎপাদন করে, উহারা কি স্থলে, কি জলে সর্ব্বত্র স্তরে স্তরে বিন্যস্ত হয় এবং বৃষ্টির জলে ধৌত হইয়া কালে মৃত্তিকাদি উৎপাদন করে।

যৎকালে ভূপৃষ্ঠে ঐ সকল পরিবর্ত্তন ঘটিতেছিল, তৎকালে বিশাল পর্ব্বতশ্রেণীর সহিত মহাবৃক্ষ, মহাকূর্ম্ম ও মহাসর্পজাতি আবির্ভূত হয়। এজন্য হিন্দুশাস্ত্র উপকথাচ্ছলে শিখায়, ক্ষীরোদসাগরমন্থনকালে কূর্ম্মের উপর মন্দরপর্ব্বত স্থাপিত হইয়া মন্থনদণ্ডের কাজ করে এবং বাসুকি উহার মন্থন রজ্জু হয়। বিজ্ঞানের মতে মহাবৃক্ষ সকল কালে পাথুরিয়া কয়লায় পরিণত হইয়াছে এবং মহাসর্প ও মহাকূর্ম্ম কালে অপগত হইয়া ক্ষুদ্রকায় হইয়া গিয়াছে।

সাগর মন্থনকালে সপ্তবিধ রত্ন উদ্ভূত হয়, যথা—

প্রথম রত্ন। সুরভি গাভী বা দেবগাভী। ইহারা আধুনিক গাভীজাতির আদিপুরুষ। তৎকালে দীর্ঘকায় ছিল। দেবাসুরগণ ইহাদের দুগ্ধ সেবন করিয়া যান। আধুনিক গাভীজাতি ইহাদের অপগত বংশধর।

দ্বিতীয় রত্ন। উচ্চৈঃশ্রবা মহাঘোটক। ইহারাও দীর্ঘকায় ছিল এবং আধুনিক ঘোটক জাতির আদিপুরুষ।

তৃতীয় রত্ন। ঐরাবত মহাহস্তী। ইহারা আধুনিক হস্তীজাতির আদি-পুরুষ। তৎকালে ইহারা আরও দীর্ঘকায় ছিল। ভৌতত্ত্বিক তৃতীয় যুগে (Tertiary Period) মহাকায় স্তন্যপায়ী জীবসমূহ জগতে আবির্ভূত হয়। ইহাদের পঞ্জরাস্থির পূর্ণ নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের অস্তিত্ববিষয়ে এখন কোনরূপ সন্দেহ নাই। উচ্চৈঃশ্রবা ঘোটক ও ঐরাবত হস্তী দেবাসুর-গণ ভোগ করেন; এজন্য ইহারা শাস্ত্রে দেবরাজ ইন্দ্রের বাহন বলিয়া খ্যাত। (শাস্ত্রের প্রত্যেক কথায় গূঢ় তাৎপর্য্য আছে)।

চতুর্থ রত্ন। কৌস্তুভাদি মণি। এখনও মুক্তা প্রবালাদি নানা রত্ন সমুদ্রে পাওয়া যায় এবং সমুদ্রের নাম রত্নাকর।

পঞ্চম রত্ন। দেবভোগ্য পারিজাত পুষ্প। আধুনিক পুষ্প ইহার অপগত বংশধর।

ষষ্ঠ রত্ন। অপ্সরা, যাহারা সংসারে নৃত্যগীত প্রবর্ত্তন করেন। ইহাতে নৃত্য ও সঙ্গীতের সৃষ্টি বুঝায়। ইহাতে বুঝা উচিত, নৃত্যগীত সংসারে অতি প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে।

সপ্তম রত্ন। লক্ষ্মী দেবী সংসারে ধনদৌলতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। দেবাসুরদিগের সময়ে স্বর্ণ রোপ্যাদি বহুমূল্য দ্রব্য আবিষ্কৃত হয়। সমুদ্রের জলে স্বর্ণ ও রৌপ্য অতি সূক্ষ্ম ভাবে মিশ্রিত আছে। এই সকল মহারত্ন দেবাসুরগণ ভোগ করিয়া যান। এজন্য হিন্দুধর্ম্ম সপ্তম রত্ন মা লক্ষ্মীকে বিষ্ণুর অর্দ্ধাঙ্গিনী করে এবং কৌস্তুভ মণি তাঁহার বক্ষঃস্থলে ঝুলায়।

কোন কোন শাস্ত্রকার বলেন, সাগরমন্থনকালে চন্দ্রদেবও উত্থিত হন। কোন কোন ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত অনুমান করেন, যে স্থলে আজ সুগভীর ও সুবিশাল প্রশান্ত মহাসাগর বহমান, ঘূর্ণায়মান পৃথিবীর ঐ স্থলের উপাদানরাশি ব্যোম মার্গে উৎক্ষিপ্ত হইয়া উক্ত উপগ্রহ গঠিত করে। ইহাতে চন্দ্রের উৎপত্তি বিষয়ে বিজ্ঞান ও শাস্ত্রের মধ্যে কিঞ্চিৎ সামঞ্জস্য দেখা যাইতেছে।

এখন অমৃতভাণ্ড লইয়া ধন্বন্তরিদেবের উত্থান, সুধাপানার্থ দেবাসুর-দিগের তুমুল সংগ্রাম, বিষ্ণুর মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ, এই তিন ঘটনার গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করা আবশ্যক। ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, প্রথম পৃথিবী

সুমেরু মহাদ্বীপে সত্যযুগে যে দেবরূপী মনুপুত্রগণ বিচরণ করেন (প্রথম ভাগের মানবসৃষ্টি নামক প্রবন্ধ দেখ) তাঁহারা অযোনিসম্ভব ও অমর ছিলেন। পরে কালসহকারে লিমুরিয়া ও আর্টলান্টীস মহাদ্বীপে যে সকল অসুর ও দৈত্যজাতি আবির্ভূত হয়, উহারা দেবতাদিগের ইন্দ্রত্ব ও অমরত্ব লাভ করিবার জন্য তাঁহাদের সহিত তুমুল সংগ্রামে লিপ্ত হয়।

আজ পাশ্চাত্য গুরুকুলে শিক্ষা করি, বেদে ও পুরাণে দেবাসুরের যুদ্ধ আর কিছুই নয় কেবল ধর্ম্মবিষয়ক মতামত লইয়া পারসীকদিগের সহিত পাঞ্জাব-বাসী আর্য্যজাতির যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাই জ্ঞাপন করে। এজন্য অবস্ত ভাষার দেববাচক অসুর শব্দ সংস্কৃত ভাষায় অসুর এবং সংস্কৃতের দেবশব্দ অবস্তায় দৈত্যপ্রতিপাদক। যে খৃষ্টধর্ম্ম ও বিজ্ঞান দেবাসুরদিগের অস্তিত্ব আদৌ জানে না, উহাদের প্রমাণ লইয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ দেবাসুরের যুদ্ধ একেবারে উড়াইয়া দেন। কিন্তু থিওসফি, বৌদ্ধধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্ম পূর্ব্বতন যুগের দেবাসুরের কথা ভালরূপ নির্দ্দেশ করিতেছে।

এ স্থলে হিন্দুধর্ম্ম আমাদিগকে সামান্য উপকথাচ্ছলে শিখায়, যে সুধা পান করিয়া দেবতারা অমরত্ব লাভ করেন, সেই সুধার ভাণ্ড লইয়া যখন ধন্বন্তরিদেব সাগর মন্থনকালে উত্থিত হন, তৎকালে দেবাসুরগণ সুধাপানার্থ কাড়া-কাড়ি ও মারামারি করিতে করিতে তুমুল সংগ্রামে লিপ্ত হন। বহুকাল এ যুদ্ধ স্থায়ী হয়। সৃষ্টি রসাতলে যাইবার উপক্রম। উহাদের বিবাদভঞ্জনার্থ স্বয়ং বিষ্ণু মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সকলের সমক্ষে দেখা দেন। সুধা বণ্টনকালে অসুরেরা মোহিনীরূপে মুগ্ধ হইয়া সুধা পান করিতে ভুলিয়া যায় এবং সংসারে মরণশীল হইয়া পড়ে। কিন্তু দেবতারা মোহিনী মূর্ত্তিতে আদৌ মুগ্ধ না হইয়া সুধা পান করেন এবং অমরত্ব লাভ করেন।

এখন বিষ্ণুর মোহিনী মূর্ত্তি ধারণে সংসারে স্ত্রীজাতির উৎপত্তি বুঝায়। যে মনমোহিনী নারী জাতির মূর্ত্তিতে ত্রিভুবন বিমুগ্ধ, যে রূপ দেখিলে মুনিঋষির মন পর্য্যন্ত টলে, সেই মোহিনী মূর্ত্তি বিশ্বপালনকর্ত্তা শ্রীবিষ্ণু দেবাসুরদিগের যুদ্ধ নিবারণার্থ প্রথম ধারণ করেন। থিওসফি পাঠে বুঝা যায়, দ্বাপর যুগের মধ্যভাগে লিমুরিয়া মহাদ্বীপে যে সকল অসুর জাতি বাস করিত, উহাদের ভিতর স্ত্রীজাতি প্রথম উদ্ভুত হয়; এজন্য হিন্দুধর্ম্ম উপকথাচ্ছলে শিখায়, বিষ্ণু মোহিনী

মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অসুরদিগকে প্রথম ছলনা করেন। এই সকল অসুরেরা আধুনিক মানবজাতির আদিপুরুষ। তদবধি সংসারে অপরাপর যত জীবজন্তু উদ্ভূত হয়, সকলেই স্ত্রীপুরুষে বিভক্ত হইয়াছে। তির্য্যক জন্তুদিগের মধ্যে সরীসৃপ, পক্ষিজাতি ও স্তন্যপায়ী জীবমাত্রেই স্ত্রীপুরুষে বিভক্ত। এই প্রকারে সংসারে মৈথুনধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

এই মৈথুনধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের সঙ্গে জগতে স্থূলত্বের পরিবর্দ্ধন, মানবমনে জ্ঞান শক্তি ও কামপ্রবৃত্তির উন্মেষ আরম্ভ হয় এবং যাবতীয় জীবজন্তু মরণশীল হইয়া পড়ে। এজন্য হিন্দুধর্ম্ম আমাদিগকে সামান্য উপকথাচ্ছলে শিখায়, যে সুধা পান করিয়া দেবগণ অমর হন, সেই সুধা পান করিবার জন্য অসুরগণ দেবতাদিগের সহিত মহা সংগ্রামে লিপ্ত হয়, কিন্তু মোহিনী মূর্ত্তি পাইয়া উহারা সুধা পান করিতে ভুলিয়া গেল ও মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

এখন বুঝিয়া দেখ, ক্ষীরোদসাগরমন্থনরূপ সামান্য উপকথায় হিন্দুধর্ম্ম জগতের কি মহৎ মহৎ ঘটনা একাধারে সন্নিবেশিত করিয়াছে। জগতে স্থলভাগ ও পর্ব্বতসমূহের উৎপত্তি, মহাবৃক্ষ মহাকূর্ম্ম, মহাসর্প মহাকায় স্তন্যপায়ী জীবগণের উৎপত্তি, সংসারে মৈথুনধর্ম্ম প্রবর্ত্তন, সকল জীবজন্তুর নশ্বরত্ব প্রভৃতি নানা ঘটনা এই সামান্য উপকথা দ্বারা বুঝা উচিত!

পৌরাণিক কথাপ্রসঙ্গ।

দ্বিতীয় অংশ।

(৩) ভগবানের বরাহঅবতার।

হিন্দুশাস্ত্রমতে ভগবান বিষ্ণু মহাবরাহরূপ ধারণ করিয়া প্রলয়পয়োধি জলমগ্না ধরিত্রীকে স্বীয় দন্ত দ্বারা উত্তোলন করেন ও হিরণ্যাক্ষ দৈত্যকে সংহার করেন। একটা বৃহৎ শূকর নিজ দন্ত দ্বারা জলমগ্না পৃথিবীকে সমুদ্র হইতে তুলিয়া ফেলিল, ইহা কি কদাচ সম্ভব? এক খণ্ড প্রস্তর তুলিতে পারে, পৃথিবী তুলিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধনধারণ যেরূপ অসঙ্গত, মহাবরাহের পৃথিবী উত্তোলনও সেইরূপ অসঙ্গত বোধ হইতেছে। তবে ইহা কি অলীক পুরাণের অলীক উপকথা মাত্র?

এখন বিজ্ঞান কি বলে, তাহা সকলে শ্রবণ করিলে,বুঝিতে পারিবেন, শাস্ত্রের কথা আদৌ অমূলক নহে। বিজ্ঞান স্পষ্ট নির্দ্দেশ করে, আধুনিক পৃথিবীর অধিকাংশ ভূভাগগুলি জলধিগর্ভে নিমগ্ন ছিল এবং নানা ভৌতত্ত্বিক বিপ্লব দ্বারা উহারা ক্রমশঃ উত্থিত হইয়া আধুনিক মহাদ্বীপদ্বয়ে পরিণত হইয়াছে। (প্রথম ভাগের অতীত যুগে ধরিত্রীর পরিবর্ত্তন নামক প্রবন্ধ দেখ)। ইউরোপের দক্ষিণাংশ, আফ্রিকার উত্তরাংশ, এসিয়ার পশ্চিম ও মধ্য খণ্ড প্রভৃতি নানাদেশ টিদীস্ নামক মহাসাগর হইতে উত্থিত হয়। হিমালয়, আল্পস, পিরীনিজ প্রভৃতি পর্ব্বতশ্রেণী সকল উক্ত সাগর হইতে উত্থিত হয়। এখনও হিমালয়ের অত্যুচ্চ শৃঙ্গগুলিতে শম্বুকাদিও মহাকূর্ম্মের কঙ্কাল পাওয়া যায়।

জগতের নিয়ম এই,যখন যে জীবদ্বারা প্রকৃতির মহৎ উদ্দেশ্য সাধন হইবে, তখন সেই জীব অসংখ্য পরিমাণে সৃষ্ট হয়। পৃথিবীতে নানা পর্ব্বতশ্রেণী গঠিত হইবে, অসংখ্য ফোরামিনিফেরা (foraminefera) নামক জীব সৃষ্ট হইয়া জলরাশির সিলিকেট ও কার্ব্বনেট লইয়া নানাস্থানে পর্ব্বত শ্রেণী সকল নির্ম্মাণ করিল। সেইরূপ যৎকালে পৃথিবীর অধিকাংশ ভূভাগগুলি জলধিগর্ত্ত হইতে ক্রমশঃ উত্থিত হইতে থাকে, তৎকালে প্রকৃতি উত্তোলন কার্য্য সুকর করিবার জন্য অসংখ্য স্তন্যপায়ী মহাবরাহ উৎপাদন করে এবং ইহারা বৃহৎ বৃহৎ দন্ত দ্বারা মৃত্তিকা উত্তোলন পূর্ব্বক ধরিত্রীর উত্থানে সাহায্য করে। এজন্য হিন্দু-ধর্ম্ম সামান্য উপকথাচ্ছলে আমাদিগকে শিখায়, ভগবান মহাবরাহরূপে জলমগ্না পৃথিবীকে উত্তোলন করেন। দেখ, ঐ মহাবরাহ জাতির আধুনিক ক্ষুদ্রকায় বংশধরেরা চিরাগত সংস্কারবশতঃ এখনও দন্ত দ্বারা মৃত্তিকা উত্তোলন করিতেছে।

যদিও বিজ্ঞান ধরিত্রীর উত্থান সম্বন্ধে বরাহজাতির উৎপত্তি স্বীকার করে না, তথাচ যে শাস্ত্র যোগেশ্বরপ্রকটিত, তাহা কদাচ মিথ্যা হইতে পারে না।

যাহা আজ সামান্য উপকথা বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহাই সুদূর ভবিষ্যতে সত্য বলিয়া সপ্রমাণিত হইবে।

মহাবরাহরূপে ভগবান শ্রীবিষ্ণু হিরণ্যাক্ষ দৈত্য বধ করিয়া পৃথিবী নিষ্কণ্টক করেন। এ কথার তাৎপর্য্য কি ? যৎকালে মহাবরাহজাতি সৃষ্ট হইয়া জলমগ্ন ভূভাগগুলির উত্তোলনে সাহায্য করিতে থাকে, তৎকালে তদানীন্তন পৃথিবীর

অধিবাসী হিরণ্যাক্ষ নামক দৈত্যকুল উহাদের দ্বারা বিনষ্ট হয়। ইহাও সৃষ্টি বিষয়ক এক মহৎ ঘটনা।

(৪) ভগবানের নৃসিংহাবতার।

প্রহ্লাদচরিত সকলেই পড়েন ও জানেন। পরমধার্ম্মিক ও পরমভক্ত প্রহ্লাদ ধর্ম্মের জন্য নিষ্ঠুর পিতার নিকট যেরূপ নিগ্রহ ভোগ করেন, তাহা ভাবিলে কাহার না চক্ষে জল আসিবে? তদীয় পিতা পরম অধার্ম্মিক নৃশংস হিরণ্যকশিপু তাঁহার প্রাণনাশার্থ অগ্নিতে দগ্ধ করে, উচ্চ পর্ব্বত হইতে নিক্ষেপ করে, সাগরজলে ডুবায় ও হাতীর পদতলে ফেলিয়া দেয়। এই সকল ঘোর বিপদে একমাত্র শ্রীহরি তাঁহার প্রাণ রক্ষা করেন। ধর্ম্মের এ সকল অমূল্য কাহিনী শ্রবণ করিয়া আমরা চিরদিন কাঁদিতেছি ও কাঁদিব।

এখন সেই পরমভক্ত প্রহ্লাদকে রক্ষা করিবার জন্য ভগবান নৃসিংহরূপ ধারণ করিয়া তদীয় পিতা হিরণ্যকশিপুর বক্ষঃস্থল নখরদ্বারা বিদীর্ণ করিয়া উহার প্রাণবধ করেন।

এস্থলে জিজ্ঞাস্য, শাস্ত্রকারেরা কেন ভগবানকে নৃসিংহরূপ ধারণ করান? ইহা মানবসৃষ্টিবিষয়ক একটী মহৎ ঘটনা। আধুনিক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মানবজাতি সংসারে আবির্ভূত হইবার পূর্ব্বে অর্দ্ধনরাকৃতি ও অর্দ্ধসিংহাকৃতি ধারণ করিয়া এক অপূর্ব্ব জাতিবিশেষ সংসারে সৃষ্ট হয়। যখন আটলান্টীস মহাদ্বীপে দৈত্য-কুল দানবীয় সভ্যতায় উন্মত্ত হইয়া সংসারে ঘোর অত্যাচার আরম্ভ করে, তখন উক্ত নৃসিংহজাতি জগতে আবির্ভূত হইয়া দৈত্যকুলের ধ্বংস সাধন করে। এজন্য হিন্দুশাস্ত্র আমাদিগকে সামান্য উপকথাচ্ছলে শিখায়, পরম ভক্ত প্রহ্লাদকে রক্ষা করিবার জন্য ভগবান নৃসিংহরূপ ধারণ করিয়া দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর প্রাণবধ করেন।

যদিও নৃসিংহজাতির কোন জীব বা উহাদের কঙ্কাল কোথাও পাওয়া যায় নাই, তথাচ শাস্ত্রের কথা কখনও অমূলক হইবার নয়। প্রশান্ত মহাসাগরে অর্দ্ধনরাকৃতি ও অর্দ্ধ মৎস্যাকৃতি মারমিয়ন জীব পাইবার পূর্ব্বে কে ভাবিত, এইরূপ জীব সংসারে আছে।

এখন দেখ, শাস্ত্রকারেরা প্রহ্লাদচরিত লিখিয়া আমাদিগকে কিরূপ ভক্তি-

যোগ শিখাইতেছেন! ভক্তবৎসল শ্রীহরি ভক্তের জন্য কি না করেন, তাহা দেখাইয়া তাঁহারা আমাদের হরিভক্তি শতসহস্রধারে উথলিয়া দিতেছেন।

(৫) ভগবানের বামন অবতার ও ত্রিবিক্রমের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা।

যৎকালে দৈত্যরাজ বলি দেবগণকে পরাস্ত করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব বল পূর্ব্বক গ্রহণ করেন ও ত্রিভুবনে একাধিপত্য স্থাপন করেন, তৎকালে বিষ্ণু দেবকার্য্য সাধনার্থ বামনরূপ ধারণ করিয়া দানবাব বলিরাজার নিকট ত্রিপাদ-ভূমি প্রার্থনা করেন। দৈত্যবাজ বলি ভিক্ষুক ব্রাহ্মণকে ত্রিপাদভূমি দানে স্বীকৃত হইলে, বামনরূপী বিষ্ণু নিজদেহ বর্দ্ধন করিয়া প্রথম পাদ স্বর্গরাজ্যে স্থাপনপূর্ব্বক তাঁহার স্বর্গবাজ্য গ্রহণ করেন এবং দ্বিতীয় পাদ মর্ত্ত্যে স্থাপনপূর্ব্বক তাঁহার মর্ত্ত্যরাজ্য অধিকাব করেন। তৎপরে বিষ্ণু নিজ কটিদেশ হইতে তৃতীয় পাদ নিঃসরণ পূর্ব্বক উহাকে বলিরাজার মস্তকে স্থাপন করিয়া তাঁহাকে পাতালে লইয়া যান ও তথায় চিরদিনের জন্য আবদ্ধ করিয়া রাখেন। এই প্রকারে বামনরূপী বিষ্ণু প্রবলপ্রতাপান্বিত অতিদর্পী বলি রাজার ত্রিভুবনবিস্তৃত সুবিশাল রাজ্য ধ্বংস করেন।

এই শ্রুতিমনোহর উপাখ্যানের কিরূপ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হওয়া উচিত? অনেকে শাস্ত্রোক্ত বামনের ত্রিবিক্রম লইয়া নানারূপ জল্পনা ও কল্পনা করিতেছেন। সূর্য্যদেব অদিতির পুত্র আদিত্য এবং বামনও অদিতির পুত্র আদিত্য। ইহা দেখিয়া তাঁহারা ভাবেন, সূর্য্যদেবের প্রাতরুত্থান, অস্তগমন ও আকাশের মধ্যদেশে আরোহণ শাস্ত্রে বামনের ত্রিবিক্রমরূপ রূপকে লিখিত হইয়াছে। যাহা হউক, এস্থলে সে সকল বাজে কথার প্রয়োজন নাই। ইহার যুক্তিসঙ্গত অর্থ করা উচিত।

ইতিপূর্ব্বে থিওসফির মতানুসারে অনেক স্থলে উল্লেখ করিয়াছি, প্রথমে দেবগণ, পরে দীর্ঘকায় দৈত্যাসুরগণ, তৎপরে খর্ব্বকায় মানবজাতি নিজ নিজ রাজ্য বিস্তার করিয়া এই বসুন্ধরা ভোগ করিয়া আসিতেছেন। সত্যযুগে দেব-রূপী মনুপুত্রগণ পৃথিবীর সুমেরু মহাদ্বীপে আবির্ভূত হইয়া স্বর্গরাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তৎকালে সুমেরু মহাদেশ আজকালের ন্যায় চিরনীহারে

আবৃত ছিল না; তথায় চিরবসন্ত বিরাজ করিত। তথায় দেবগণ অমরাবতী ও নন্দনকানন স্থাপন করেন। তাঁহাদের কীর্ত্তিকলাপ এখন বরফরাশির নিম্নে লুক্কায়িত।

ত্রেতা ও প্রথমার্দ্ধ দ্বাপরযুগে লিমুরিয়া ও আট্‌লান্টীস মহাদ্বীপদ্বয়ে দীর্ঘকায় কিম্ভূতকিমাকার দৈত্যাসুরগণ আবির্ভূত হইয়া দৈত্যরাজ্য স্থাপনপূর্ব্বক দেবতাদিগের পরিবর্ত্তে বসুন্ধরা ভোগ করিয়াছিলেন। এজন্য হিন্দুধর্ম্ম উপকথা চ্ছলে আমাদিগকে শিখায়, দৈত্যরাজ বলি দেবগণকে সমরে পরাস্ত করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব বলপূর্ব্বক গ্রহণ করে। লিমুরিয়া মহাদ্বীপ ভারত মহা সাগরে নিমগ্ন এবং আট্‌লান্টীস মহাদ্বীপও আট্‌লান্টিক মহাসাগরে নিমগ্ন; এজন্য দৈত্যাসুরদিগের সভ্যতার কোন স্থায়ি নিদর্শন এখনও বিজ্ঞানের পর্য্য-বেক্ষণে আইসে নাই।

দ্বাপরযুগের শেষার্দ্ধ হইতে আধুনিক পৃথিবীতে বা জম্বুদ্বীপে বৈবস্বত মনু বংশীয় বা আদামজাতীয় মানবগণ আবির্ভূত হইয়া দেবাসুরদিগের পরিবর্ত্তে বসুন্ধরা ভোগ করিতেছেন। ইঁহারা দৈত্যাসুরবংশসম্ভূত। প্রকৃতির অপরি-হার্য্য পরিণাম বশতঃ দৈত্যাসুরদিগের বংশধরেরা যুগধর্ম্মে খর্ব্বাকৃতি ধারণ করিতে করিতে আধুনিক ক্ষুদ্রকায় মানবজাতিতে পরিণত হইয়াছে। এজন্য তাঁহাদের বংশোদ্ভূত মানব তাঁহাদের তুলনায় বামনরূপী। এখন যে মানবের দেহ সার্দ্ধত্রিহস্ত, পুরাকালে দৈত্যদিগের দেহ চতুর্দ্দশহস্তপরিমিত ছিল। এ জন্য হিন্দুধর্ম্ম বিষ্ণুর বামনরূপ ধারণের কথা উল্লেখ করিতেছে।

যদিও মানবদেহ যুগধর্ম্মে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইতেছে; কিন্তু তাঁহার মনে জ্ঞানশক্তির উন্মেষ হওয়াতে তাঁহার বুদ্ধিশক্তি ক্রমশঃ প্রখর হইতে প্রখরতর হইতেছে এবং তিনিও শঠতা ও প্রবঞ্চনায় বিশেষ নিপুণ হইতেছেন। এই জ্ঞানশক্তিবলে তিনি জগতে একাধিপত্য স্থাপন করিতে সক্ষম হন। এ জন্য হিন্দুধর্ম্ম আমাদিগকে সামান্য উপকথাচ্ছলে শিখায়, ভগবান বামনরূপে দৈত্যরাজ বলিকে ত্রিপাদভূমি প্রার্থনা করিয়া ছলনা করেন এবং ধূর্ত্ততার সহিত তাহার বিশালরাজ্য ধ্বংস করেন।

দৈত্যদিগের আবাসভূমি আট্‌লান্টিস মহাদেশ ভৌতত্ত্বিক বিপ্লববাত্যায় দৈত্য-গণের সহিত জলধিগর্ভে এককালে নিমগ্ন হইয়া যায়। এজন্য হিন্দুধর্ম্ম আমা-

দিগকে শিখায়, দৈত্যরাজ বলি চিরদিনের জন্য পাতালে নিবদ্ধ আছেন। শুনিতে পাই, তাঁহার রাজপ্রসাদ আটলাণ্টিক মহাসাগরের তলদেশে বিদ্যমান। আবার কেহ কেহ বলেন, দক্ষিণ আমেরিকার বলিভিয়া দেশ তাঁহার রাজ্য।

এখন ত্রিবিক্রমের গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করা আবশ্যক। শাস্ত্রে ভগবানের তিনবার পদক্ষেপের কথা শুনি না। কিন্তু তিনি তাঁহার তিনপাদ তিনস্থানে রাখেন; প্রথম পাদ স্বর্গে, দ্বিতীয় পাদ মর্ত্ত্যে, আর তৃতীয়পাদ নূতন বাহির করিয়া বলিরাজার মস্তকে রাখেন। এই তৃতীয় পাদটী কি, যাহা তাঁহার কটিদেশ হইতে নিঃসৃত হয়? ভালরূপ অনুধাবন করিলে বুঝা যায়, ইহা পুরুষের পুংজননেন্দ্রিয় বা শিশ্ন ব্যতীত আর কিছুই নয়।

জগতে মৈথুনধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে দীর্ঘকায় উভলিঙ্গ দৈত্যজাতি দ্বিপাদবিশিষ্ট ছিল। পরে যখন যুগধর্ম্মে কালক্রমে উহাদের বংশধরদিগের দেহ খর্ব্বাকৃতি ধারণ করিতে থাকে, তাহাদের কটিদেশ হইতে তৃতীয় পাদস্বরূপ পুংজননেন্দ্রিয় ক্রমশঃ নিসৃত হয়। এই প্রকারে মানবজাতির উভলিঙ্গ আদি-পুরুষগণ যুগধর্ম্মে একলিঙ্গ হইয়া স্ত্রীপুরুষে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এজন্য হিন্দু-ধর্ম্ম আমাদিগকে শিখায়, ভগবান বামনরূপে দৈত্যরাজ বলির নিকট ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করেন এবং নিজ কটিদেশ হইতে তৃতীয় পাদ নিঃসরণ পূর্ব্বক উহাকে দৈত্যরাজের মস্তকে রাখিয়া পাতালে লইয়া যান। এই প্রকারে ভগবান দৈত্যরাজ্য ধ্বংস করিয়া আধুনিক পৃথিবীতে মানবরাজ্য বিস্তার করেন। এ কথা শুনিয়া অনেকে হাসিবেন সত্য, কিন্তু ত্রিবিক্রমের অন্য কোনরূপ যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতে পারে না।

এখন একবার ভাব দেখি, হিন্দুধর্ম্মের কি অপার মহিমা! সৃষ্টিবিষয়ক মহৎ মহৎ ঘটনা ভগবানের অবতারতত্ত্বে জলন্তাক্ষরে লিখিয়া ইহা আমাদিগকে উপকথাচ্ছলে জগতের কিরূপ অমোঘ সত্য চিরদিন উপদেশ দিতেছে!

(৬) বিনতানন্দন গরুড় পক্ষী।

মহাভারতে গজকচ্ছপের যুদ্ধ সকলেই পাঠ করেন। তাঁহারা ভাবেন, এই অদ্ভুত গল্পটী অধিক মাত্রায় গঞ্জিকাসেবনের একমাত্র ফল। একটা পর্ব্বতাকার স্থলচর মহাহস্তী একটা মহাকায় জলচর মহাকূর্ম্মের সহিত বহুকাল ধরিয়া

ঘোরতর বিবাদে লিপ্ত ছিল। একদিন যখন উভয়ে মহাসংগ্রামে প্রবৃত্ত, তখন গরুড় পক্ষী কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া উভয়কে নিজ নখরে ধরিয়া লইয়া গেল এবং সুবিশাল বটবৃক্ষের শাখায় বসিতে গিয়া উহাকে মড় মড় শব্দে ভাঙ্গিয়া ফেলিল। ঐ শাখায় অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ বালখিল্য ঋষিগণ ঘোর তপস্থায় রত ছিলেন। পাছে উহারা ভূতলে পড়িয়া মারা যান, এই ভয়ে পক্ষী বিশাল শাখাটী চঞ্চুপুটে লইয়া পর্ব্বতশিখরে গিয়া মনের সাধে গজ ও কচ্ছপ ভক্ষণ করিতে লাগিল।

একটা পাখী গজকচ্ছপকে নখরে লইয়া গিয়া খাইতে পারে, একটা বিশাল বটবৃক্ষের বিশাল শাখা স্বায় চঞ্চুপুটে লইয়া যাইতে পারে, এ সকল অসম্ভব কথায় কে বিশ্বাস করিবে? তোমরা না হয় আরব্য উপন্যাসে পাঠ করিয়াছ, নাবিক সিন্দবাদ রক পক্ষীর পদে নিজ দেহ বন্ধন করিয়া এক স্থান হইতে স্থানান্তরে উড়িয়া যান; আরও সংবাদপত্রে পাঠ করিয়া থাক, বিলাতের ঈগলপক্ষী মেষশাবক ও শিশুসন্তানকে ছোঁ মারিয়া লইয়া যায়। গরুড় পক্ষীর যে আলেখ্য সচরাচর দেখা যায়, তাহাতে শাস্ত্রের কথা একেবারে অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতেছে। তবে কি শাস্ত্রকারেরা বিষ্ণুবাহন গরুড় পক্ষীর মাহাত্ম্য বর্দ্ধনার্থ একটা আষাঢ়ে গল্প ফাঁদিয়া গিয়াছেন?

এখন জড়বিজ্ঞান অসাধারণ অনুসন্ধান ও পর্য্যবেক্ষণাদি বলে অতীত যুগের জীবজন্তু সম্বন্ধে যাহা উল্লেখ করে, তাহা মনোনিবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ কর, তোমাদের সকল ভ্রম দূর হইবে এবং শাস্ত্রের কথা যে সর্ব্বথা সত্য, তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে। ভূধরশায়ী কঙ্কালরাশি পর্য্যালোচনা করিয়া কঙ্কালবিদ্যা (Paleontology) ও ভূবিদ্যা স্পষ্ট নির্দ্দেশ করে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভৌতত্ত্বিক যুগে লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে অতি বৃহদাকার জীবজন্তু বা পশুপক্ষী ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করিত। (প্রথম ভাগের যুগধর্ম্ম নামক প্রবন্ধ দেখ)। দীর্ঘকায় পতত্রবিশিষ্ট গোধা (Plaurosorius), মহাকূর্ম্ম, মহাহস্তী, মহাকুম্ভীর, মহাঘোটক প্রভৃতি জীবজন্তুদিগের স্থায়ী নিদর্শন এখন পূর্ণভাবে পাওয়া গিয়াছে। এ সকল কথা আজকাল জ্ঞানজগতের অমোঘ সত্য।

আজকাল একমাত্র তিমি ব্যতীত সেরূপ বৃহদাকার জন্তু কুত্রাপি নয়নগোচর হয় না। সেই প্রাচীনকালের বৃহদাকার জন্তুগুলি এখন ভূপৃষ্ঠে লুপ্ত। আজ

কাল যাহারা দীর্ঘকায়, উহারাও কিছু কালের মধ্যে লোপ পাইবে। গণ্ডার ও হস্তী সংসারে ক্রমশঃ লোপ পাইতে চলিল। ইহাতে সিদ্ধান্ত করা উচিত, মহাভারতের কথা সম্পূর্ণ সত্য।

কি উদ্ভিজ্জজগৎ, কি প্রাণিজগৎ, পূর্ব্ব-পূর্ব্ব যুগে সকলই বৃহদাকার ছিল। এখন যুগধর্ম্মে কলিকালে তদীয় বংশধরেরা ক্রমশঃ খর্ব্বকায় হইতেছে। সেই-রূপ মানবও পুরাকালে দীর্ঘকায় ছিলেন। চতুর্দ্দিকস্থ প্রাকৃতিক প্রতিদ্বন্দ্বী-বর্গের সহিত জীবনসংগ্রামে জয়লাভ করিবার জন্য তিনিও দীর্ঘকায়ও তদনুরূপ শারীরিক বলে সুশোভিত ছিলেন। এজন্য হিন্দুশাস্ত্র আমাদিগকে শিখায়, মানবদেহ সত্যযুগে একবিংশহস্তপরিমিত, ত্রেতাযুগে চতুর্দ্দশহস্তপরিমিত ও দ্বাপরযুগে সপ্তহস্তপরিমিত ছিল। এখন এ কলিযুগে ইহা সার্দ্ধত্রিহস্ত এবং কলির শেষে তিন লক্ষ বৎসর পরে ইহা এত ক্ষুদ্র হইবে, তখন সকলকে বেগুন গাছে আঁকসী দিতে হইবে।

এখন গরুড় পক্ষী শ্রীবিষ্ণুর বাহন, শাস্ত্রের এ কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? শাস্ত্রের প্রতি কথার মূল্য অধিক। কোন কথা অনর্থক লিখিত হয় নাই। আজকাল আমরা যেমন হস্তী, ঘোটক, উষ্ট্র প্রভৃতি জন্তুবর্গকে বাহনস্বরূপ ব্যবহার করি, সেইরূপ পুরাকালে দীর্ঘকায় মনুপুত্রগণ আপনাদের গমনাগমনের সুবিধার জন্য দীর্ঘকায় পক্ষী সকল পালন করিত এবং উহাদের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অন্যত্র গমনাগমন করিত। পূর্ব্বতন যুগের এই প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ করিবার জন্য হিন্দুশাস্ত্র গরুড়পক্ষীকে শ্রীবিষ্ণুর বাহন করিয়াছে।

পুরাকালে যে পুষ্পকরথ করিয়া অনেকে আকাশমার্গে গমনাগমন করিত, তাহা আজকালের বেলুনযন্ত্র বা এরোপ্লেন নহে। ইহা আদৌ কবিদিগের কল্পনা নহে। মন্ত্রশক্তিতে বা যোগবলে এরূপ শূন্যমার্গে গমনাগমন করিত, তাহাও নহে। অনেকের বিশ্বাস, দীর্ঘকায় পক্ষীজাতির (পতত্রবিশিষ্টগোধা) পৃষ্ঠদেশে রথ বা হাওদা বসাইয়া সকলে আকাশ মার্গে গমনাগমন করিত। কালক্রমে সেই সকল পক্ষীজাতি সংসারে লোপ পাইলে পুষ্পকরথের ব্যবহারও স্বতঃ রহিত হইয়া গিয়াছে।

রামায়ণে পাঠ করি, যৎকালে লঙ্কাধিপতি দুর্দ্ধর্ষ দশানন সীতাদেবীকে হরণ করিয়া লইয়া যায়, তৎকালে দীর্ঘকায় জটায়ু পক্ষী তদীয় পুষ্পকরথ আক্রমণ

করে। বোধ হয়, যে দীর্ঘকায় পক্ষী রাবণের রথ বহন করিতেছিল, উহাকে জটায়ু আক্রমণ করে। হাতী যে আমাদের বাহন, সহস্র বৎসর পরে যখন এ জাতি সংসারে লোপ পাইবে, তখন কেহ বিশ্বাস করিবে না।

(৭) হরগৌরীর তৃতীয় নয়ন।

আমরা দেবতাদিগের ললাটদেশে তৃতীয় নয়ন অঙ্কিত দেখি। এখন আমরা জগতে মানব ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ জন্তুবর্গকে দ্বিনয়নবিশিষ্ট দেখিতেছি। তবে তৃতীয় নয়ন কোথায় ছিল? ইহা কি কবির কল্পনা মাত্র? কেহ কেহ বলেন, তৃতীয় নয়ন আর কিছুই নয়, ইহা কেবল জ্ঞানচক্ষু বা দিব্য নয়ন, যাহার বলে প্রকৃত তত্ত্ব নিরূপণ করা যায়।

মানবমস্তিষ্ক ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখা যায়, ইহার নিম্নদেশে পিনিয়াল গ্লাণ্ড (pineal gland) নামক এক স্নায়ুগ্রন্থি অপগত ভাবে আছে। ইহা দ্বারা পূর্ব্বে কোন্ কর্ম্ম সম্পন্ন হইত, তাহা শরীরতত্ত্ব আদৌ নির্দ্দেশ করিতে পারে না। মহাত্মাগণের বিশ্বাস, ইহাই পূর্ব্বতন যুগের তৃতীয় নয়নের ভগ্নাবশেষ (ব্র্যাভান্বির মত)। ইহা অপগত হওয়াতে নিকটস্থ অপটিক (optic thalmus) থালমাস প্রভৃতি যন্ত্রগুলি অধিক বিবর্দ্ধিত হয়। ইহাতে কলিকালে আধ্যাত্মিকতা হ্রাস পাইয়া আধিভৌতিকতা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এই তৃতীয় নয়ন, জ্ঞানচক্ষু বা দিব্যচক্ষু মস্তিষ্কের অভ্যন্তরীণ যন্ত্র।

সত্যযুগে যখন সংসারে ধর্ম্ম চতুষ্পাদবিশিষ্ট ছিল, তৎকালে দেবরূপী মনুপুত্রগণের তৃতীয় নয়ন পূর্ণভাবে বিকসিত ছিল। তাঁহাদের আধ্যাত্মিকতা সম্যক স্ফুরিত ছিল। তাঁহারা যোগাভ্যাস করিয়া আত্মার অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি অনায়াসে লাভ করিতেন। এজন্য হিন্দুধর্ম্ম তোমার নয়নসমক্ষে ত্রিনেত্রশালী দেবতাদিগের ধ্যানমগ্ন রূপ দেখায়। ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে দৈত্যাসুরদিগের তৃতীয় নয়ন কলিকালের মানব অপেক্ষা অধিক স্ফুরিত ছিল। উহারাও যোগবলে অলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন করিত। এজন্য শাস্ত্রোক্ত দৈত্যাসুরদিগের ক্রিয়াকলাপ এখন আমাদের নিকট অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতেছে। কলিযুগে মানবের তৃতীয় নয়ন অপগত হওয়াতে একদিকে তাঁহার আধ্যাত্মিকতা হ্রাস পাইয়াছে, অপরদিকে তাঁহার জ্ঞানশক্তি ক্রমস্ফুরিত হইতেছে। এজন্য ধর্ম্ম আজকাল সংসারে একপাদবিশিষ্ট।

এই তৃতীয় নয়ন অপগত হওয়াতে মানব বাহ্যপঞ্চেন্দ্রিয় যোগে যে জ্ঞান লাভ করেন, তাহাই তাঁহার যথার্থ জ্ঞান। এখন তিনি বাহ্য স্থূল পদার্থ দর্শন করিয়া স্থূলজগতের বিষয় যেরূপ অবগত হন, সূক্ষ্মজগৎ সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানিতে পারেন না। এখন তিনি সূক্ষ্ম বা ইন্দ্রিয়াতীত, ব্যবহিত, দূরস্থ ও অভ্যন্তরীণ কোন পদার্থ দর্শন করিতে পারেন না। পঞ্চেন্দ্রিয়ের ফাঁদে পড়িয়া হাত, পা ও মন চালাইয়া যতদূর তিনি যাইতে পারেন, ততদূর তিনি যাইতেছেন; অধিক যাইবার উপায় বা শক্তি কিছুই নাই। পঞ্চেন্দ্রিয় ব্যতীত তিনি কোথায় যাইবেন? সমস্তই যে তাঁহার নিকট গাঢ় তমিস্রায় আবৃত। এ তমিস্রা ভেদ করা তাঁহার সাধ্য নয়। পঞ্চেন্দ্রিয়ের মহাফাঁদে পতিত হইয়া তিনি এখন সব হারাইয়া বসিয়াছেন।

এই তৃতীয় নয়ন অপগত হওয়াতে মানব এখন নিগুণ পরব্রহ্ম আদৌ বুঝিতে পারেন না, ব্রহ্মোপাসনা বা ব্রহ্মদর্শন কিছুই করিতে পারেন না; মনে মনে নিরাকার ঈশ্বর ভজনা করিয়াও তিনি প্রকৃত সন্তোষ লাভ করিতে পারেন না। সেজন্য তোমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সনাতন হিন্দুধর্ম্ম তোমার অসম্পূর্ণ মনও ইন্দ্রিয়গণের পরিতোষের জন্য তোমার নয়নসমক্ষে পরব্রহ্মের কয়েকটী সাকার মূর্ত্তি ধারণ করে এবং উহাদের পূজন বিধিবদ্ধ করে।

এই তৃতীয় নয়ন যোগীদের দিব্যচক্ষু। যোগসাধনের প্রধান উদ্দেশ্য, এই অপগত তৃতীয় নয়নের শক্তি কি প্রকারে কথঞ্চিৎ স্ফুরিত হইবে। যোগাভ্যাস দ্বারা বাহ্য পঞ্চেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া নাশ করিয়া অভ্যন্তরীণ জ্ঞানেন্দ্রিয় সম্যক স্ফুরিত হইলে অপগত তৃতীয় নয়নের শক্তি কথঞ্চিৎ স্ফুরিত হয়। তন্ত্রোক্ত ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া যাঁহারা সিদ্ধ হইতে চান, তাঁহারা আজ্ঞা চক্রের তৃতীয় নয়ন স্ফুরিত করিতে সাধ্যমত চেষ্টা পান।

যাঁহারা যোগবলে অতীন্দ্রিয়দর্শন, অতীন্দ্রিয়শ্রবণ, পরকায়প্রবেশাদি অলৌকিক ক্রিয়া দেখান, তাঁহাদের তৃতীয় নয়ন জনসাধারণ অপেক্ষা অধিক স্ফুরিত হইয়া থাকে। যাঁহাদের এ নয়ন স্বভাবতঃ অধিক স্ফুরিত, তাঁহারা সংসারে অসাধ্য-সাধন করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, ঈশা, মহম্মদ, শঙ্করাচার্য্যদেব প্রভৃতি মহাত্মাগণের তৃতীয় নয়ন স্বভাবতঃ স্ফুরিত থাকায় তাঁহারা অনায়াসে যোগসিদ্ধ হইয়া অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ দেখাইয়া গিয়াছেন। যে মহাত্মা তোমায়

দেখিয়া তোমার মনের কথা খুলিয়া বলিতে পারেন, তাঁহার তৃতীয় নয়ন তোমা অপেক্ষা অধিক স্ফুরিত জানিবে।

(৮) ধরিত্রী শেষনাগোপরি অধিষ্ঠিতা।

পুরাণ পাঠে অবগত হওয়া যায়, বাসুকি মহাসর্প নাগলোক বা পাতাল হইতে সহস্র ফণা বিস্তার করিয়া পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছে এবং যখন ইহা ফণা পরিবর্ত্তন করে, তখন দেশবিশেষে ভূমিকম্প উপস্থিত হয়। এ কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য কি?

আজকাল বিজ্ঞানের কল্যাণে সকলেই জানে, চন্দ্র সূর্য্য ও গ্রহগণের মাধ্যাকর্ষণ বশতঃ ভূমণ্ডল শূন্যমার্গে অবস্থিত ও অমিতবেগে ঘূর্ণ্যমান এবং যখন কোন দেশের ভূগর্ভস্থ আভ্যন্তরিক স্তরের দ্রবীভূত ধাতু উত্তপ্ত জলরাশির সহিত মিশ্রিত হইয়া সশব্দে রাসায়নিক উৎপাত (Explosion) ঘটায়, তখন উপরিস্থ স্তর কম্পিত হইতে থাকে। ইহার নাম ভূমিকম্প।

এখন পুরাণকাহিনীর কিরূপ অর্থ করা উচিত? অনেকে বলেন, শেষ নাগ যদুপরি পৃথিবী স্থাপিতা, তাহা আর কিছু নয়, কেবল অনন্ত তাড়িৎ শক্তি, যাহা অনন্ত প্রকারে, অনন্তদিকে ও অনন্ত মুখ হইতে নির্গত হইয়া ইহাকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া আছে এবং ইহার অনন্তকার্য্য সম্পাদন করিতেছে। সূর্য্যের আলোক, মেঘের গর্জ্জন, বজ্রপাত, সৌদামিনী, ভূমিকম্প, বাত্যা প্রভৃতি নানা প্রাকৃতিক ঘটনার মূলে তাড়িৎ শক্তি বর্ত্তমান। কোন স্থানে বজ্রপাত হইলে তাড়িৎ পাতালগামী হয়। ইহাতে বোধ হয়, পাতাল বা নাগলোক তাড়িতের আধার। ইহাতে সিদ্ধান্ত করা উচিত, শাস্ত্রকারেরা যথার্থই বলিতেছেন, বাসুকি নাগলোক হইতে পৃথিবী ধরিয়া আছে। মেঘে যে বিদ্যুৎ দেখা যায়, তাহা সর্পের ফণার মত। ইহাতেও সিদ্ধান্ত করা উচিত, তাড়িৎশক্তি সহস্রফণা বাসুকির ন্যায়। যাহা হউক, পুরাণ কেবল রূপকে ভরা।

(৯) শাস্ত্রোক্ত রাক্ষস ও বানর।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে শাস্ত্রোক্ত দৈত্য, দানব, অসুর, রাক্ষস ও বানর প্রভৃতি জাতিবর্গ ভারতের আদিমনিবাসিপরিচায়ক। দেশের নানা

স্থলে উপনিবেশ স্থাপন করিতে গিয়া শ্বেতকায়, সুন্দর, সুসভ্য আর্য্যজাতি যে সকল কুৎসিৎ অসভ্য আদিমনিবাসীদিগের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হন, উহারা শাস্ত্রে ঐসকল অবজ্ঞাসূচক নামে অভিহিত।

রামায়ণোক্ত শ্রীরামচন্দ্রের বানরবাহিনী ও লঙ্কাধিপতি রাবণের রাক্ষসগণ দাক্ষিণাত্য ও লঙ্কার আদিমনিবাসী অসভ্য জাতি হইলেও হইতে পারে; কিন্তু দৈত্য, দানব ও অসুরগণ ভারতের আদিমনিবাসী নহে। ইতিপূর্ব্বে অনেক স্থলে উল্লেখ করিয়াছি, যুগধর্ম্মে মানব আধুনিক খর্ব্বাকৃতি ও সুন্দর গঠন পাইবার পূর্ব্বে ঐ সকল কিম্ভূতকিমাকার জাতিবর্গ পূর্ব্ব ২ যুগে পৃথ্বীতলে বিচরণ করিয়া গিয়াছে।

রামচন্দ্রের বানরবাহিনী আজকালের বানর বা হনুমান নহে। উহারা মাইসোরের নিকটস্থ প্রদেশের বর্ব্বর জাতিবিশেষ। সেইরূপ লঙ্কার রাক্ষসগণ তথাকার আদিমনিবাসী। মনুষ্যখাদক বলিয়া উহারা রাক্ষস নামে অভিহিত হয় নাই। দেহাকৃতির বৈলক্ষণ্য ও বিরূপত্ব বশতঃ উহারা শাস্ত্রে ঐ নিঘৃণ্য ও হেয় উপাধিতে পরিচিত।

কেহ ২ অনুমান করেন, লঙ্কাদ্বীপ প্রাচীনকালের অসুরদিগের আবাসভূমি লিমুরিয়া মহাদেশের অন্তর্গত ছিল। যখন লিমুরিয়া মহাদ্বীপ ভারতমহাসাগরে নিমগ্ন হইয়া যায়, তৎকালে লঙ্কাদ্বীপও রাক্ষসগণের সহিত সাগরে নিমগ্ন হইয়াছে। আধুনিক লঙ্কা বা সিংহল উহারই ভগ্নাবশেষ। অষ্ট্রেলিয়া ও অন্যান্য দ্বীপপুঞ্জ ভারতমহাসাগর হইতে পুনরুত্থিত হইয়াছে। সেজন্য যোগসিদ্ধ বাল্মীকি লঙ্কাবাসীদিগকে রাক্ষস নামে অভিহিত করিতেছেন।

এখন মানব যদিও খর্ব্বকায়; কিন্তু তিনি গঠনও আকৃতিতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। গঠন ও আকৃতিতে তাঁহার এরূপ সৌন্দর্য্য পাইবার পূর্ব্বে প্রকৃতিদেবী সংসারে নানা অপরূপ মানবরূপ গড়েন ও ভাঙ্গেন। সেজন্য অতীত যুগসমূহে ভূপৃষ্ঠে অসুর, দৈত্য, দানব, নরবানর ও রাক্ষস আবির্ভূত হইয়াছে। তাহার সাক্ষ্য এখনও স্থলবিশেষে রাক্ষস (Monster) ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে এবং উহাদের দুই বা ততোধিক মস্তক দেখা যায়। এ স্থলে প্রকৃতি নিজের প্রমাদ বশতঃ পূর্ব্বাভিনয় করিয়া আমাদিগকে জানায়, পুরাকালে এইরূপ কিম্ভূতকিমাকার জাতিগুলি ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করিয়া গিয়াছে।

(১০) অর্জ্জুনের সম্মোহন বাণ বা জৃম্ভক অস্ত্র।

মহাভারতে সকলে পাঠ করেন, বিরাট রাজার উত্তর গোগৃহে যখন কুরুসৈন্য গোধন হরণ করিতে যায়, তখন অর্জ্জুনের সম্মোহন বাণে উহারা সকলে এককালে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল। যখন তিনি ইন্দ্রদত্ত সম্মোহন বাণ মন্ত্রপূত করিয়া নিক্ষেপ করিলেন, তখন সমগ্র কুরুসৈন্য মৃতপ্রায় হইয়া নিস্পন্দভাবে নিদ্রিত হইয়া পড়িল। সত্য বটে, অসভ্য কাফ্রী বিষাক্ত বাণ প্রয়োগ করিয়া লোকবিশেষকে ক্ষণমাত্রে অজ্ঞান করিতে পারে, তথাচ এক সময়ে যে এত লোক একবাণে অজ্ঞান হইয়া পড়িতে পারে, ইহা এতকাল আমাদের নিকট কবির কল্পনা বোধ হইত। কিন্তু যখন সে দিন ইউরোপের মহাকুরুক্ষেত্রে বিজ্ঞানবিশারদ জার্ম্মানজাতি শ্বাসরোধকারী গ্যাস Asphyc-siating gas) ব্যবহার করিয়া বিপক্ষ দলের সৈন্যগণকে এককালে মূর্চ্ছিত করিল, তখন আর কি শাস্ত্রোক্ত ঘটনা কাল্পনিক মনে করা উচিত? একজন মন্ত্রশক্তিতে করেন, অপরেরা বিজ্ঞানবলে করেন, প্রভেদ এই মাত্র।

(১১) কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের জন্মবৃত্তান্ত।

মহাভারতে সকলে পাঠ করেন, যৎকালে যোগসিদ্ধ পরাশর মুনিবর নদীর উপর নৌকায় মৎস্যগন্ধার সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া কামবাণে প্রপীড়িত হন, তৎকালে তিনি যোগবলে নৌকার উপর কুজ্ঝটিকা বিস্তার করিয়া আরোহীদিগের অজ্ঞাতে মৎস্যগন্ধার সহিত সহবাস করেন। ইহাতে তিনি গর্ভবতী হইয়া ব্যাসদেবকে জন্ম দেন। আমরা এতদিন শাস্ত্রের এ কথাকে উপকথা মনে করিতাম। কিন্তু যখন ইউরোপের মহাকুরুক্ষেত্রে জার্ম্মনজাতি একপ্রকার গোলা ব্যবহার করিয়া সকলের সমক্ষে কুজ্ঝটিকা প্রস্তুত করিতে লাগিল, তখন শাস্ত্রের কথা কেন মিথ্যা হইবে? যাহা পুরাকালে যোগবলে সিদ্ধ হইত, তাহা এখন বিজ্ঞানবলে সিদ্ধ হইতেছে।

(১২) ভীমের অসাধারণ পরাক্রম।

মহাভারতে সকলে পবননন্দন ভীমের অসাধারণ পরাক্রমের বিষয় পাঠ করেন। তিনি হিড়ম্বাদি বধ করিয়া অসাধারণ শারীরিক বলের পরিচয় দেন।

সেইরূপ প্রাচীন গ্রীকদিগের ভিতর হার্কুলিস ও ইহুদি দিগের ভিতর সাম্‌সন অদ্ভুত পরাক্রমের জন্য বিখ্যাত। আমরা এতদিন মনে করিতাম, এ সকল কথা অতিরঞ্জিত। কিন্তু যখন মাদ্রাজবাসী রামচন্দ্র নাইডু আমাদের নয়নসমক্ষে নিজের বুকের উপর হাতী নাচান—এবং চলন্ত মোটরকারের গতিরোধ প্রভৃতি অত্যাশ্চর্য্য ক্রিয়া-কলাপ দেখান, তখন আর কেন আমরা শাস্ত্রোক্ত ভীমের পরাক্রমে অবিশ্বাস করিব?

(১৩) ইন্দ্রজিতের মেঘের অন্তরাল হইতে আকাশযুদ্ধ।

রামায়ণে সকলে পাঠ করেন, রাবণনন্দন মহাবীর ইন্দ্রজিৎ আকাশমার্গে উঠিয়া মেঘের অন্তরাল হইতে যুদ্ধ করিতেন। এ কথায় আমরা এতদিন অবিশ্বাস করিতাম। কিন্তু ইউরোপের মহাকুরুক্ষেত্রে জার্ম্মাণজাতি জেপেলিন যোগে ব্যোমমার্গ হইতে বোমাদি নিক্ষেপ করিয়া কত সুরম্য হর্ম্ম্যাদি ভগ্ন করিলেন ও কত লোকক্ষয় করিলেন, তাহা শুনিয়া কি আর ইন্দ্রজিতের আকাশযুদ্ধে অবিশ্বাস করা উচিত? যদি বল, তৎকালে ত বিজ্ঞানের এত উন্নতি হয় নাই এবং জেপেলিনাদি প্রস্তুত হয় নাই, তবে সে কথা কি বিশ্বাসযোগ্য? পক্ষিরাজবাহিত পুষ্পকরথে চড়িয়া তিনি আকাশযুদ্ধ করিতেন, এ কথায় কি বিশ্বাস হয় না? যাহা হউক, বিজ্ঞানবিৎ জার্ম্মান-জাতি আমাদের পুরাণোক্ত নানা কথা সত্য সপ্রমাণিত করিতেছেন।

ধ্রুবচরিত, সাবিত্রীসত্যবানের উপাখ্যান, নলদময়ন্তী, রাজা হরিশ্চন্দ্র, দাতাকর্ণ, শ্রীবৎস প্রভৃতি যে সকল রাজাদিগের উপাখ্যান পুরাণাদি গ্রন্থে পাওয়া যায়, তাহা অশেষ ধর্ম্মোপদেশে পূর্ণ। সে সকল ধর্ম্মোপদেশ শুনিয়া আমরা চিরদিন ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইব।

পরিশেষে বক্তব্য, পুরাণাদি গ্রন্থ যতই কেন কাল্পনিক ও অতিরঞ্জিত হউক না, উহাদের ভিতর যে সকল বৈজ্ঞানিক সত্য বিক্ষিপ্ত আছে, তাহা কালে আবিষ্কৃত হইবে। তখন সকলে বুঝিতে পারিবেন, জ্ঞান গরিষ্ঠ, যোগসিদ্ধ মহর্ষিগণ সামান্য উপকথাচ্ছলে জগতের কি অমোঘ সত্য আমাদিগকে শিখাইয়া গিয়াছেন?

পৌরাণিক অবতারতত্ত্ব।

হিন্দুধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক মাহাত্ম্য

পুরাণের অবতারতত্ত্ব অনেকে বুঝিতে পারেন না। শিক্ষিত সম্প্রদায় ইহাকে সামান্ত উপকথা মনে করেন। কিন্তু একজন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত ইহাকে কি ভাবে লইতে পারেন, তাহাই এ প্রবন্ধে দেখাইব।

হিন্দুশাস্ত্রমতে বিশ্বপালনকর্ত্তা শ্রীবিষ্ণু মৎস্ত, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধদেব এই নয় অবতার গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মরক্ষা-হেতু সংসারে যুগে যুগে অলৌকিক লীলা দেখাইয়াছেন। শেষোক্ত চারি অবতার মানবসমাজে আবির্ভূত হওয়ায়, আমাদের স্বতঃ মনে হয়, অসাধারণ গুণের বিকাশ দর্শনে লোকেরা উহাদিগকে ঈশ্বরের স্থানে পূজা করিতে শিখিয়াছে। জিজ্ঞাসা করি, প্রথমোক্ত পাঁচ অমানুষিক অবতার নির্দ্দেশ করিয়া শাস্ত্রকারেরা ঈশ্বরের কোন্ ঐশ্বর্য্য বা মাহাত্ম্য বর্ণন করিলেন? সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর কি না জগতে অত্যদ্ভুত লীলা দেখাইবার জন্য অধমাধম মৎস্ত, কূর্ম্ম, বরাহ রূপ ধারণ করিয়াছেন? এ সকল কি শাস্ত্রকারদিগের কেবল অর্ব্বাচীনতা নহে?

এখন যদি আপনারা পৌরাণিক অবতারতত্ত্ব বিজ্ঞানের সাহায্যে বুঝিতে চেষ্টা করেন, ভালরূপ বুঝিতে পারিবেন, ইহাতে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের অপার বৈজ্ঞানিক মাহাত্ম্য চিরদিন প্রকাশ পাইতেছে। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন, পুরাণের অবতারতত্ত্বে উচ্চ বিজ্ঞানের উচ্চ বিবর্ত্তবাদ অক্ষরে অক্ষরে নিহিত আছে। যে বিবর্ত্তবাদ (Theory of Evolution) ডার্ব্বিন-প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদিগের সুমহৎ কীর্ত্তিস্তম্ভ, যাহা তাঁহাদের অগাধ বিদ্যাবুদ্ধির সম্যক্ পরিচায়ক, তাহাই পুরাণের সামান্য উপকথায় চিরদিন জাজ্বল্যমান্ রহিয়াছে।

এখন একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, যে স্থলে জ্ঞানাভিমানে ও সভ্যতাভি-মানে উন্মত্ত ইউরোপখণ্ডের উৎকৃষ্ট সভ্য খৃষ্টধর্ম্ম ঈশ্বরকে সপ্ত দিবসে বিশ্ব রচনা করাইয়া ঐশ্বরিক ক্ষমতা খর্ব্ব করে ও প্রকৃত সত্যের অপলাপ করে, সে স্থলে এই অর্দ্ধসভ্য অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন ভারতের অপকৃষ্ট অমূলক পৌত্তলিক ধর্ম্ম এতকাল সৃষ্টি বিষয়ে কত যুগযুগান্তর নির্দ্দেশ করিয়া প্রকৃত বিবর্ত্তবাদ প্রচার

ফলতঃ যে বৈজ্ঞানিক মহাসত্যের জয় সকলের অজ্ঞাতসারে এতদিন ঘোষণা করিতেছে, তাহা ভাবিলে কি আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয় আনন্দে বিস্ফারিত হয় না?

এখন পুরাণের অবতারতত্ত্ব বুঝিতে সাধ্যমত চেষ্টা করুন। মানবের জাতীয় ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিলে, অথবা মানববিশেষের জীবনবৃত্তান্ত জরায়ুগর্ভে ভ্রূণের প্রথম অঙ্কুরোদ্গম হইতে সাময়িক মৃত্যু পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনা ভালরূপ পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, যে তাঁহার জাতীয় জীবনে অতি প্রাচীন কাল হইতে আধুনিক সময় পর্য্যন্ত কতগুলি ভিন্ন ভিন্ন স্তর নিহিত আছে। যেমন পর্ব্বত ও মৃত্তিকা স্তরের পর স্তর বিগুস্ত হইতে হইতে ক্রমশঃ গঠিত ও উত্থিত হয়, সেইরূপ জীবজন্তুও স্তরের পর স্তর অতিক্রম করিতে করিতে নানারূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া আধুনিক আকার ধারণ করে। ভূপৃষ্ঠে মানবজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে যে সকল স্তর দৃষ্ট হয়, উহারা প্রথমে প্রাণীজগতে বিদ্যমান্ ছিল এবং তাঁহার জাতীয় উন্নতি সম্বন্ধে যে সকল স্তর দেখা যায়, তাহা মানবসমাজে বিদ্যমান আছে। প্রথমোক্ত স্তরগুলি জানায়, অতি নিকৃষ্ট জীব প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন দ্বারা চালিত হইয়া ভূপৃষ্ঠে কি প্রকারে ক্রমবিবর্ত্তনে বিবর্ত্তিত হইতে হইতে আধুনিক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মানবরূপ ধারণ করে; শেষোক্ত স্তরগুলি জানায় নিকৃষ্টজীবোৎপন্ন, বনবিহারী বর্ব্বর মানব সামাজিক নির্ব্বাচন দ্বারা চালিত হইয়া বিদ্যাবুদ্ধির অনুশীলন করিতে করিতে কি প্রকারে স্বকীয় অবস্থার ক্রমোন্নতি সাধন করত আজকাল অশেষ বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন ধর্ম্ম-বলে বলীয়ান্ সুসভ্য মানবে পরিণত হন।

শাস্ত্রের অবতারতত্ত্ব ভালরূপ বুঝিবার জন্য জীবতত্ত্ব, ভূবিদ্যা, ভ্রূণতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি নানা বিজ্ঞানশাস্ত্র ভালরূপ অধ্যয়ন করা আবশ্যক। ঐ সকল বিজ্ঞানশাস্ত্রের আবিষ্কৃত মহৎ মহৎ সত্য লইয়া অবতার-তত্ত্বের সুমীমাংসা করিয়া দেখুন, বুঝিতে পারিবেন, আমাদের যোগসিদ্ধ মহর্ষিগণ যাহা যোগবলে প্রাপ্ত হন, এখন উন্নত বিজ্ঞান অসাধারণ অনুসন্ধান ও পর্য্যবেক্ষণাদি বলে তাহার আভাসমাত্র পাইতেছে। বিবর্ত্তবাদী বিজ্ঞান সাহঙ্কারে বলে, মানব জগতে স্বতন্ত্রভাবে একদিনে ঈশ্বরকর্ত্তৃক সৃষ্ট হন নাই; কিন্তু তিনি নিকৃষ্ট জীবের ক্রমবিবর্ত্তনে ভূপৃষ্ঠে কালসহকারে

আবির্ভূত হন এবং বহুকাল ব্যাপিয়া জাতীয় সাধনার গুণে তাঁহার বুদ্ধিশক্তি ক্রমবিকশিত হইতে হইতে তিনি স্বকীয় অবস্থার উন্নতি সাধন করিয়া জগতের উপর একাধিপত্য স্থাপন করিতে সমর্থ হন।

শাস্ত্রোক্ত নয় অবতারের মধ্যে প্রথম পাঁচটী অমানুষিক অবতার ভূপৃষ্ঠে মানবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে তদীয় জাতীয় জীবনে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন স্তর দেখা গিয়াছিল, তাহাই জ্ঞাপন করে এবং শেষোক্ত চারিটী মানুষিক অবতার তাঁহার জাতীয় জীবনের সামাজিক স্তরগুলি জ্ঞাপন করে। মানব স্বীয় জাতীয় জীবনে প্রাণিজগৎ ও সমাজ-জগতের যে সকল স্তর অতিক্রম করিতে ২ আধুনিক অবস্থা প্রাপ্ত হন, যোগসিদ্ধ মহর্ষিগণ সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন স্তর ভগবানের ভিন্ন ভিন্ন অবতারের উল্লেখ করিয়া শাস্ত্রে জলন্তাক্ষরে ও স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি ভূপৃষ্ঠে যখন যে ভাবে যে মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিচরণ করেন, তখন তিনি নিজ স্রষ্টাকে সেই ভাবে সেই মূর্ত্তিধারী মনে করেন। যখন তিনি ভূমণ্ডলে মৎস্যরূপী, তাঁহার স্রষ্টাও তৎকালে মৎস্যরূপী ভগবান্। যখন তিনি ভূমণ্ডলে ভক্তিমান, প্রেমময় ও আনন্দময়, তাঁহার ঈশ্বরও তৎকালে ভক্তবৎসল, প্রেমময় ও আনন্দময় কৃষ্ণরূপধারী ভগবান।

শাস্ত্রোক্ত প্রথম পাঁচটী অমানুষিক অবতারের উল্লেখ দেখিয়া আমাদের সিদ্ধান্ত করা উচিত যে, মানব স্বীয় জাতীয় জীবনে প্রথমতঃ মৎস্যরূপী হইয়া জলময় ভূপৃষ্ঠে জলচর হন। দ্বিতীয়তঃ তিনি মহাকূর্ম্মরূপ ধারণ করিয়া স্থলজলময় ও পর্ব্বতসমাকীর্ণ ভূপৃষ্ঠে উভচর হন। তৃতীয়তঃ মহাবরাহরূপ ধারণ করিয়া তিনি ভূপৃষ্ঠের উত্থিত সমতল স্থলভাগে স্থলচর ও স্তন্যপায়ী হন। চতুর্থতঃ নৃসিংহরূপ ধারণ করিয়া তিনি অর্দ্ধনরাকৃতি ও অর্দ্ধসিংহাকৃতি অসুররূপে বিচরণ করেন। পঞ্চমতঃ তিনি দীর্ঘকায় অসুর হইতে ক্রমশঃ খর্ব্বাকৃতি ধারণ করিতে করিতে আধুনিক বামনরূপী মানবে পরিণত হন। এই স্থলেই আধুনিক জ্ঞানশক্তিসম্পন্ন মানবের উৎপত্তি জানিবে।

শাস্ত্রোক্ত শেষের চারিটী মানুষিক অবতার দেখিয়া আমাদের সিদ্ধান্ত করা উচিত, মানব সমাজের আদিম অবস্থায় মাতৃহন্তা পরশুরামের ন্যায় পাশববলে বলীয়ান্ ও অতি বর্ব্বর ছিলেন। পরে বহুকাল সমাজে পরিবার মধ্যে বসবাস করিতে করিতে পারিবারিক ভাবাবলি তদীয় হৃদয়ে কথঞ্চিৎ স্ফুরিত হইলে

উঁহাদের সম্যক্ স্ফূর্ত্তির জন্য অশেষগুণশালী শ্রীরামচন্দ্রকে নিজ জীবনের আদর্শপুরুষ জ্ঞান করেন। পরে ভক্তিপ্রেমবাৎসল্যাদি হৃদয়ের সাত্বিক ভাবাবলির অনুশীলনে ও স্ফুরণে প্রকৃত মনুষ্যত্বলাভ হইবে বুঝিতে পারিয়া নিষ্কামধর্ম্মোপদেষ্টা বিশ্বপ্রেমে প্রেমিক ও নবরসের পূর্ণঅভিনায়ক শ্রীকৃষ্ণকে স্বজীবনের প্রধান আদর্শ জ্ঞান করেন। অপর দিকে দর্শন ও বিজ্ঞানশাস্ত্রের সম্যক্ অনুশীলন করিতে করিতে যখন তাঁহার বুদ্ধিশক্তি ক্রমশঃ প্রখরতর হইতে থাকে, তৎকালে তাঁহার মনও নাস্তিকতার দিকে ধাবিত হয়। সমাজের এই অবস্থা জানাইবার জন্য শাস্ত্রকারেরা নিরীশ্বরবাদী বুদ্ধদেবকে আমাদের আদর্শপুরুষ দেখান।

এখন জীবতত্ত্বাদি বিজ্ঞানশাস্ত্র হিন্দুধর্ম্মের উপরোক্ত মতামতের কতদূর পোষকতা করিতেছে, তাহার সন্ধান লওয়া উচিত।

জীবতত্ত্ব (Zoology) নির্দ্দেশ করে, জীবজগতের প্রথম জীব আমিবা (Amoeba) হইতে সৃষ্টির চরমপরিণতি মানব পর্য্যন্ত ভূমণ্ডলে যত প্রকার অমেরুদণ্ডীয় (Invertebrata) ও মেরুদণ্ডীয় (Vertebrata) জীবজন্তু আছে, উহাদের শ্রেণিবিভাগ লইয়া পরস্পর পরস্পরের সহিত এত অধিক ঘনিষ্ঠতা দৃষ্ট হয় যে, একটী উৎকৃষ্ট জীব উহার অব্যবহিত নিকৃষ্ট জীবের ক্রমবিবর্ত্তনে উদ্ভূত হওয়া ব্যতীত অন্য প্রকার সিদ্ধান্ত করা যায় না। ইহার মতে কূর্ম্মাদি উভচর জন্তুগুলি জলচর মৎস্যের ক্রমবিবর্ত্তনে ভূপৃষ্ঠে আবির্ভূত; আবার কূর্ম্মাদি জন্তুগুলি একদিকে পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তন অতিক্রম করিতে করিতে পক্ষিজাতিতে পরিণত, অপরদিকে অশেষরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া স্তন্যপায়ী জীব উৎপাদন করে। জীবতত্ত্বের এই সকল সিদ্ধান্ত আজকাল জ্ঞানজগতে প্রায় অখণ্ডনীয়।

ভূবিদ্যা (Geology) বলে, মানবের বাসোপযোগী হইবার পূর্ব্বে পৃথিবী প্রথমে বাষ্পময়ী, পরে জলময়ী হইয়া কত স্তরের পর স্তর, কত পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তন অতিক্রম করিতে করিতে আধুনিক আকার ধারণ করে, তাহার কিছুমাত্র ইয়ত্তা নাই। সেইরূপ অতীত যুগসমূহে ইহার কত দেশ দেশান্তর একবার জলধিগর্ভে নিমগ্ন, পুনরায় উত্থিত হইতে হইতে ইহার আধুনিক ভৌগোলিক সংস্থান সম্পূর্ণ হয়, তাহাও কেহ জানেন না। ভূমণ্ডলের এমন

অবস্থা গিয়াছে, যে সময়ে এক মৎস্য ব্যতীত অন্য কোন মেরুদণ্ডীয় উৎকৃষ্ট জীব ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করে নাই। সেই মৎস্য জাতির ক্রমবিবর্ত্তনে অন্যান্য উৎকৃষ্ট জীবজন্তুর ন্যায় মানবও কাল সহকারে আবির্ভূত হন। দেখ, প্রশান্ত মহাসাগরে মারমিয়ন নামক অর্দ্ধ নরাকৃতি ও অর্দ্ধ মৎস্যাকৃতি এক অদ্ভুত জীব পাওয়া গিয়াছে। এই জীব সপ্রমাণ করে, মৎস্য কি প্রকারে নরাকৃতিতে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। ভূবিদ্যা আরও বলে, পর্ব্বতের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে ভিন্ন ভিন্ন জীবজন্তুর কঙ্কালরাশি পাওয়া যায়। ইহাতেও সিদ্ধান্ত করা উচিত, মৎস্য হইতে কূর্ম্ম, কূর্ম্ম হইতে স্তন্যপায়ী জীব সংসারে উদ্ভূত হইয়াছে।

ভ্রূণবিদ্যা (Embryology) নির্দ্দেশ করে, যে উৎকৃষ্ট জীব অতি নিকৃষ্ট জীব হইতে আরম্ভ করিয়া লক্ষ লক্ষ বৎসর ব্যাপিয়া যে সকল পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তন অতিক্রম করিতে করিতে আধুনিক আকার ধারণ করে, উহার বংশধরেরা মাতৃগর্ভে ভ্রূণাবস্থায় সেই সকল জাতীয় পরিবর্ত্তনগুলি অল্প দিনের ভিতর সহ্য করিয়া স্বদেহ প্রস্ফুরিত করে। এইরূপে প্রকৃতি সকল জীবজন্তুর দেহ নির্ম্মাণে জাতীয় পরিবর্ত্তনগুলি পুনরভিনয় করে। ইহাই জীবদেহ নির্ম্মাণে প্রকৃতির মূলমন্ত্র। মাতৃগর্ভে ঈশ্বর যে জীবকে যে ভাবে গঠিত করেন, আমরা সেই জীবকে সংসারে সেই ভাবে দেখি, এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিলে চলিবেনা। সকল বিষয়ে প্রকৃতিদেবীর অখণ্ডনীয় নিয়ম চলিতেছে।

ভ্রূণবিদ্যা আরও বলে, মানব ভ্রূণাবস্থার প্রথমে মৎস্যরূপী হন, এজন্য সে অবস্থায় তদীয় গ্রীবাদেশে কয়েকটী ছিদ্র দেখিতে পাওয়া যায়। এই ছিদ্রগুলি মৎস্যে স্থায়িভাবে আছে। ইহাদিগকে মাছের কান্‌কো কহে। এইরূপ যে যে অবস্থা মৎস্যাদি নিকৃষ্ট জীবসমূহে স্থায়ি ভাবে দেখা যায়, সেই সেই অবস্থা এখন মাতৃগর্ভে মানবভ্রূণে ক্ষণস্থায়িরূপে দেখা যাইতেছে।

আরও দেখ, সরীসৃপ জীবদেহে শোণিত যেরূপে বহমান হয়, মাতৃগর্ভে ভ্রূণদেহে মাতৃশোণিত নালী দ্বারা সেইরূপে বহিতে থাকে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র উহার প্রথম রোদনের সঙ্গে ফুস্‌ফুসের শ্বাসক্রিয়া আরম্ভ হয়; তৎকালে শোণিতও অন্যরূপে বহিতে আরম্ভ করে। যে নালী (Umbilical cord) দ্বারা জরায়ুজীবনে মাতৃশোণিত বহিতে থাকে, তাহা ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া যায়। সংসারে মানবভ্রূণ কখন কূর্ম্মরূপে, কখন বা বরাহরূপে, কখন

বা নৃসিংহ রাক্ষস রূপে ভূমিষ্ঠ হয়। ইহাতেও সিদ্ধান্ত করা উচিত, নিকৃষ্ট জীব কিরূপ পরিবর্ত্তনপরাম্পরা অতিক্রম করিতে করিতে আধুনিক মানবরূপ ধারণ করে।

যাহা হউক, হিন্দুধর্ম্ম পরোক্ষভাবে ও বিজ্ঞান সাক্ষাৎসম্বন্ধে বলে, মানব জগৎস্রষ্টা ঈশ্বর কর্তৃক মানবরূপে সৃষ্ট হন নাই। মৎস্যরূপ অতি নিকৃষ্ট জীবের ক্রমবিবর্ত্তনে তাঁহার উৎপত্তি। অতএব তাঁহার জাতীয় জীবনে মৎস্যরূপ প্রথমস্তর এবং শাস্ত্রে মৎস্যরূপ ভগবানের প্রথম অবতার। অতি প্রাচীন কালে কে-জানে-কোন-সময়ে মৎস্য জাতির কতকগুলি বংশধর প্রকৃতির পরিবর্ত্তনরূপ মহাবর্ত্তে পতিত হইয়া উভচর হয়। অতএব মানবের জাতীয় জীবনে কূর্ম্মরূপ দ্বিতীয় স্তর এবং শাস্ত্রে ভগবানের কূর্ম্মরূপ দ্বিতীয় অবতার। পুনরায় উভচর জীবের কতকগুলি বংশধর লক্ষ লক্ষ বৎসরে পারিপার্শ্বিক অবস্থার ব্যতিক্রমের সঙ্গে স্বীয় বাহ্যাকৃতি পরিবর্ত্তন করিতে করিতে স্তন্যপায়ী জীবে পরিণত হয়। অতএব মানবের জাতীয় জীবনে স্তন্যপায়ী বরাহরূপ তৃতীয় স্তর এবং শাস্ত্রে ভগবানের বরাহরূপ তৃতীয় অবতার।

পুনরায় বরাহজাতির কতকগুলি বংশধর কালক্রমে অশেষরূপে পরিবর্ত্তিত হইতে হইতে নৃসিংহরূপধারী কিম্ভূতকিমাকার অসুররূপে পরিণত হয়। অতএব মানবের জাতীয় জীবনে অসুরাকৃতি নৃসিংহরূপ চতুর্থ স্তর এবং শাস্ত্রে ভগবানের নৃসিংহরূপ চতুর্থ অবতার। এ স্থলে স্মরণ রাখিবেন, যদিও বিজ্ঞান এখনও নৃসিংহরূপ জীব বা উহার কঙ্কাল না পাইয়া উহার কথা উল্লেখ করে না, তথাচ যোগেশ্বরপ্রকটিত হিন্দুশাস্ত্র কদাচ মিথ্যা হইবার নয়। পুনরায় নৃসিংহরূপী দীর্ঘকায় অসুরগণ কালক্রমে প্রকৃতির পরিণাম বশতঃ খর্ব্বাকৃতি ও অঙ্গসৌষ্ঠব ধারণ করিতে করিতে আধুনিক বামনরূপী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মানবরূপে পরিণত হয়। অতএব মানবের জাতীয় জীবনে বামনরূপ পঞ্চম স্তর এবং শাস্ত্রে ভগবানের বামনরূপ পঞ্চম অবতার। এই স্থলে ভূপৃষ্ঠে আধুনিক জ্ঞানশক্তিসম্পন্ন মানবজাতির উৎপত্তি। বিজ্ঞানের মতে ভৌতত্ত্বিক চতুর্থ যুগে এই ঘটনা সংঘটিত হয়।

এখন ভূপৃষ্ঠে মানবরূপে আবির্ভূত হইবার পর তাঁহার জাতীয় জীবনের

সামাজিক স্তরগুলি পর্য্যালোচনা করিতেছি। ব্যক্তিবিশেষের জীবনবৃত্তান্ত জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত ভালরূপ পর্য্যবেক্ষণ কর অথবা ভূমণ্ডলে যতপ্রকার মানবজাতি আছে, কেহ অসভ্য, কেহ অর্দ্ধসভ্য, কেহ সুসভ্য, উহাদের বিষয় ভালরূপ অনুসন্ধান কর, বুঝিতে পারিবে, মানব ভূমণ্ডলে কত পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তন অতিক্রম করিতে করিতে জাতীয় উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হন।

তিনি আদিম অবস্থা হইতে সমাজবদ্ধ হইয়া আছেন। কিন্তু আদিম সমাজের অবস্থা অতীব ভয়ঙ্কর। তখন তিনি বস্ত্রাভাবে, গৃহাভাবে ও অন্নাভাবে নানাবিধ কষ্ট পাইয়া ইতর জন্তুর ন্যায় বনে বনে বিচরণ করত সহজাত বন্য ফলমূলে বা অন্য কোন জন্তুর আম-মাংসে উদর পূর্ণ করিতেন। তখন সমাজে কোথায় বা জ্ঞান! কোথায় বা ধর্ম্ম! মানবমনে কিছুই অঙ্কুরিত হয় নাই। তখন তিনি নিকৃষ্ট জন্তুর ন্যায় একমাত্র নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া নিকৃষ্ট জীবন নিকৃষ্ট সুখভোগে অতিবাহিত করিতেন। আণ্ডামান, ফিজি প্রভৃতি দ্বীপের অধিবাসীদিগকে নিরীক্ষণ কর, আদিম সমাজের সেই ভীষণ অবস্থা কথঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম হইবে। তখন মানবসমাজে মনোভাব ব্যক্ত করিবার জন্য কোনরূপ ভাষা উদ্ভূত হয় নাই। তখন তিনি নিকৃষ্টজন্তুরবের ন্যায়, মানবশিশুরোদনের ন্যায় কতকগুলি অস্ফুট অবোধ্য শব্দ উচ্চারণ করিয়া মনোভাব ব্যক্ত করিতেন। পরে বহুকাল ব্যাপিয়া জাতীয় সাধনার গুণে তিনি নিজের মনোভাব বাক্য কথন ভাষায় ব্যক্ত করিতে শিক্ষা করেন। এই ভাষাসৃষ্টি ও অগ্ন্যুৎপাদন তাঁহার জাতীয় উন্নতির প্রথম সূত্রপাত।

দেখ, একটী দুগ্ধপোষ্য শিশুসন্তান কি প্রকারে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে মা মা বলিতে বলিতে মাতৃভাষা শিক্ষা করে। মানবের জাতীয় জীবনে যে ঘটনা সহস্র সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া অশেষ সাধনার গুণে সংসাধিত হইয়াছিল, সে ঘটনা আজকাল ৪।৫ বৎসরে সংঘটিত হইতেছে। বাল্যকালে আমাদের জ্ঞানোদয় হয়; কিন্তু আমরা জানি না, কোন্ দিন হইতে আমাদের জ্ঞানোদয় আরম্ভ হইল। সেইরূপ মানবের জাতীয় জীবনের বাল্যকালে সমাজে জ্ঞানোদয় হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু কত সহস্র সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া জাতীয় সাধনার গুণে সমাজে প্রথম জ্ঞানোন্মেষ হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। এই

পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায়, জাতীয় জীবনের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে মস্তিষ্কের স্ফূর্ত্তির সহিত তদীয় জ্ঞানশক্তি ক্রমস্ফুরিত ও ক্রমবর্দ্ধিত হওয়ায় তিনি জাতীয় উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হন। কিন্তু এই জাতীয় উন্নতিসাধনে কত যুগ যুগান্তর ব্যতীত হইয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে?

প্রত্নতত্ত্ব বলে, মানবের জাতীয় জীবনের প্রথম অবস্থাকে কয়েক যুগে বিভক্ত করা হয়:—

(১) প্রস্তরযুগ।
(২) ব্রঞ্জযুগ।
(৩) লৌহযুগ।

প্রস্তরযুগে অশিক্ষিত বর্ব্বর মানব প্রস্তরনির্ম্মিত অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করে। লৌহাস্ত্রের সহিত উহার কোনরূপ সম্পর্ক নাই। লৌহ ধাতু কি, উহা জানে না।

ব্রঞ্জযুগে অসভ্য মানব ব্রঞ্জনির্ম্মিত অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করে। ইউরোপের অসভ্য জাতিবর্গ এক সময়ে ঐরূপ অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করিত বলিয়া ঐরূপ নির্দ্দেশ করা হয়। কিন্তু অন্যান্য দেশে ইহার কোনরূপ নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। লৌহযুগে লৌহধাতুর পরিচয় পাইয়া মানব লৌহাস্ত্র ব্যবহার করিতে শিক্ষা করেন। এই লৌহাস্ত্র ব্যবহারের সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে তাঁহার সভ্যতার সূত্রপাত হয়।

অসভ্যযুগে মানবের শারীরিক বল তাঁহার প্রধান সহায় ও সাধনোপায় ছিল। যে স্থলে আজ সুসভ্য মানবের বুদ্ধিবল, জ্ঞানবল, অর্থবল, শাস্ত্রবল ও ধর্ম্মবল দেখা যায়, সে স্থলে পূর্ব্বে অসভ্য মানবের শরীরের পাশববল একমাত্র চালিত হইত। সমাজের এই অসভ্য অবস্থা বা প্রথম স্তর জ্ঞাপন করিবার জন্য হিন্দুধর্ম্ম পরশুরামরূপ ভগবানের ষষ্ঠ অবতার দেখায়। এজন্য তিনি মাতৃমাতৃ হত্যা করিয়া ও একবিংশতিবার পৃথিবী নিক্ষত্রিয়া করিয়া পাশব বলের পূর্ণ পরিচয় দিয়া যান।

এস্থলে কেহ ২ বলিতে পারেন, যে যোদ্ধাগ্রগণ্য জামদগ্ন্য পরশুরাম ক্ষত্রিয় জাতির সহিত তুমুল সংগ্রাম করিয়া স্বজাতির প্রভুত্ব আর্য্য সমাজে স্থাপন করেন, তাঁহার প্রতি বিশেষ সম্মান দেখাইবার জন্য ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে চিরদিন

ঈশ্বরাবতার মনে করিতেছেন। তবে শাস্ত্রকারেরা কেন তাঁহাকে দিয়া মাতৃহত্যা করাইয়া ঘোর পাপপঙ্কে লিপ্ত করাইলেন? তাঁহাদের কি এই উদ্দেশ্য, মাতা অপেক্ষা পিতা অধিক পূজনীয়, সংসারে ইহা দেখাইবার জন্য পিত্রাদেশে পরশুরামকে দিয়া প্রত্যক্ষদেবতাস্বরূপা স্নেহময়ী মাতার শিরশ্ছেদ করান? যদি তাঁহার গুণকীর্ত্তন করাই তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হইত, তাঁহারা কি উপরোক্ত বীভৎস ঘটনা আদৌ উল্লেখ করিতেন? এস্থলে বোধ হয়, তাঁহাদের উদ্দেশ্য অন্যরূপ। যে অসভ্য বর্ব্বর মানব পিতামাতা গুরুজন পীড়িত হইলে উহাদিগকে কর্ত্তন করিয়া ভক্ষণ করে, উহার পিতৃমাতৃ ভক্তি কোথায়? সে অনায়াসে কুঠার দ্বারা মাতার শিরশ্ছেদ করিতে পারে? সমাজের এই অসভ্য অবস্থা জ্ঞাপনার্থ হিন্দুশাস্ত্র পরশুরামের মাতৃহত্যা ব্যাপার উল্লেখ করিতেছে।

সমাজের দ্বিতীয় স্তরে মানব বহুকাল হইতে পরিবারের মধ্যে আত্মীয় স্বজন লইয়া বসবাস করাতে যেমন একদিকে পারিবারিক ভাব তদীয় মনে ক্রমস্ফুরিত হইতে থাকে, তেমনি অপরদিকে অনুশীলন দ্বারা বিদ্যাবুদ্ধির ক্রমোন্নতিসাধন হওয়াতে তিনি সভ্যতার পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হন। এ অবস্থায় পারিবারিক গার্হস্থ্য ধর্ম্ম ভালরূপ শিক্ষা দিয়া ও নিজ কর্ত্তব্য পালনে অবহিত করিয়া সংসার মাঝে তাঁহাকে অশেষ সুখে সুখী করিবার জন্য হিন্দুধর্ম্ম অশেষ গুণশালী আদর্শপুত্র, আদর্শরাজা ও আদর্শমানব শ্রীরামচন্দ্রকে ভগবানের সপ্তম অবতার-রূপে দেখায়। অসভ্য অবস্থা হইতে উন্মুক্ত হইবার পর সামাজিক ও পারিবারিক ধর্ম্মপালন সমাজবিশেষের উন্নতিলাভের প্রধান উপায়। এজন্য হিন্দুধর্ম্ম এ বিষয়ে শ্রীরামচন্দ্রকে আমাদের পূর্ণ আদর্শ দেখাইতেছে।

সমাজের তৃতীয় স্তরে মানব জাতীয় উন্নতিলাভের সঙ্গে সামাজিক ও পারিবারিক ধর্ম্মপালনের আবশ্যকীয় সদ্গুণে বিভূষিত হইয়া নিজ আত্মার আধ্যাত্মিক স্ফূর্ত্তির জন্য, নিজ মনের সাত্ত্বিক ভাবাবলির স্ফূর্ত্তির জন্য লালায়িত হন। এ অবস্থায় নিষ্কামধর্ম্ম, পরাভক্তি, পরপ্রেম ও মাধুর্য্যাদি রস ভালরূপ শিক্ষা দিয়া তাঁহাকে প্রকৃত ব্রহ্মানন্দে উৎফুল্ল করাইবার জন্য হিন্দুধর্ম্ম বিশ্বপ্রেমে প্রেমিক, নবরসের পূর্ণ অভিনায়ক শ্রীকৃষ্ণকে ভগবানের অষ্টম প্রেমাবতাররূপে দেখাইতেছে। ইহাই হিন্দুধর্ম্মের চূড়ান্ত সময়। এই সময় হইতে ধর্ম্মাত্মা হিন্দু

ঈশ্বরপ্রেমে উন্মত্ত ও ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া দুবাহু উত্তোলন পূর্ব্বক ব্রহ্মানন্দে নৃত্য করিতে শিক্ষা করেন।

সমাজের চতুর্থ স্তরে সুশিক্ষিত ও সুসভ্য মানবের বুদ্ধিশক্তি পূর্ণভাবে বিকসিত হইতে থাকে। এই সময়ে তিনি দর্শনবিজ্ঞানাদি নানা শাস্ত্র রচনা করিয়া ও নানা বিদ্যায় বিশারদ হইয়া তর্কবলে ও যুক্তিবলে ঈশ্বরের স্বরূপ জানিতে গিয়া পরাস্ত হন এবং সংসারে নাস্তিক মত প্রচার করেন; এজন্য পুরাকালে কপিলাদি দার্শনিক পণ্ডিতগণ এবং আজকালের বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ জগতে নাস্তিকবাদ প্রচার করিতেছেন। সমাজের এই অবস্থা জ্ঞাপনার্থ হিন্দু-ধর্ম্ম নিরীশ্বরবাদী বুদ্ধদেবকে ঈশ্বরের নবম নাস্তিক অবতাররূপে দেখাইতেছে।

যে প্রাতঃস্মরণীয় অশেষপূজ্য বুদ্ধদেব সামাজিক ও নৈতিক ধর্ম্ম বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপদেশ দেন, যিনি যোগের নিয়মাবলি ভালরূপ প্রচার করেন এবং যাঁহাকে জগতের তৃতীয়াংশ লোক ঈশ্বর স্থানে পূজা করে, তাঁহাকে এদেশের শাস্ত্রকারেরা কেন নাস্তিক বলিয়া অবজ্ঞা করিলেন? বৌদ্ধধর্ম্ম কালক্রমে ভারতে পৌরাণিক ধর্ম্মের নিকট পরাস্ত হইয়া যায়; এজন্য তাঁহাকে হিন্দুদিগের নিকট অপদস্থ করিবার জন্য কি তাঁহারা ঐরূপ বলিলেন? তাঁহাদের উদ্দেশ্য যাহাই হউক না কেন, ধর্ম্মপ্রাণ বুদ্ধদেব অন্যান্য মহৎগুণে বিভূষিত হইলেও যখন তিনি সাধারণের নিকট ঈশ্বর স্বীকার করেন নাই এবং তাঁহাকে আরাধনা করিতেও বলেন নাই, তখন তাঁহারা সমাজের যে অবস্থায় নাস্তিক মতামত প্রবল হয়, তাঁহাকে সেই অবস্থার আদর্শপুরুষ জ্ঞান করিতেছেন।

মানবসমাজের যে চতুর্ব্বিধ অবস্থা, যাহা হিন্দুধর্ম্মের অবতারতত্ত্বে জ্বলন্তাক্ষরে লিখিত, তাহা জগতের অমোঘ সত্য এবং তাহা প্রত্যেক দেশে জাজ্বল্যমান্। এজন্য সমাজমাত্রেই দেখা যায়, একস্থলে সামরিক বল বা পাশব বল, অন্যস্থলে নিষ্কামধর্ম্ম, এক স্থলে নরশোণিতলোলুপ জিঘাংসু আততায়ী, অন্যস্থলে ধর্ম্মাত্মা সাধু সন্ন্যাসী, একস্থলে অসাধারণ বুদ্ধিবিকাশের সঙ্গে নাস্তিকবাদ, অন্য স্থলে অনন্তভক্তি-সংবলিত ঈশ্বরপ্রেম, একস্থলে অসাধারণ পিতৃমাতৃভক্তি ও সৌভাত্র, অন্য স্থলে উহাদের সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব দেখা যায়।

পৌরাণিক অবতারতত্ত্ব কবিদিগের কল্পনাও নহে, কুসংস্কারও নহে।

ইহাতে বিংশশতাব্দীর উচ্চবিজ্ঞানের মহোচ্চ সত্য নিহিত আছে। যে বিবর্ত্তবাদ প্রচার করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আজ জ্ঞানজগতে জ্ঞানগরিমায় গৌরবান্বিত, তাহাই ইহার অক্ষরে ২ ধিকি ২ জ্বলিতেছে, কিন্তু ভস্মাচ্ছাদিত রহিয়াছে। এখন তালবৃন্তযোগে ভস্মরাশি উড়াইতে চেষ্টা পাইলাম। অগ্নি-স্ফুলিঙ্গও ঈষৎ দেখা দিয়াছে। এখন পাঠক! তোমার দর্শনশক্তি থাকে, স্বধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক মাহাত্ম্য দেখিয়া নয়ন সার্থক কর। তোমার বোধশক্তি থাকে, তাহা বুঝিয়া নিজের বোধশক্তি চরিতার্থ কর যাঁহার মন প্রকৃত বিজ্ঞানালোকে আলোকিত হইবে, তিনি এ ধর্ম্মকে কদাচ ঘৃণাচক্ষে অবলোকন করিবেন না। দেখ অন্যান্য ধর্ম্মের সহিত বিজ্ঞানের কত বিরোধ ও কত বিবাদবিসম্বাদ! এমন কি উহাদের মূলোৎপাটনে বিজ্ঞান আজ দৃঢ়ব্রত। যদি এ সংসারে কোন ধর্ম্ম বিজ্ঞানানুমোদিত হয়, তাহা এই হিন্দুধর্ম্ম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পাশ্চাত্যজগৎ এখনও এ ধর্ম্মের প্রকৃত তাৎপর্য্য ও প্রকৃত মাহাত্ম্য বুঝিতে পারে নাই। যেদিন প্রাতঃস্মরণীয় বিবেকানন্দস্বামী চিকাগো সহরের ধর্ম্মমণ্ডলে বেদান্তধর্ম্মের কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করেন, সেদিন পাশ্চাত্যজগৎ স্তম্ভিত হইয়া যায়। যেদিন দ্বিতীয় বিবেকানন্দস্বামী পৌরাণিক ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্মও মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করিবেন, সে দিন পাশ্চাত্যজগৎ আরও স্তম্ভিত হইবে। অগ্নি কতদিন ভস্মাচ্ছাদিত থাকিবে?

পঞ্চম অধ্যায়।

রামাবতার।

বিষ্ণুর সপ্তম রামাবতার দ্বারা হিন্দুধর্ম্ম আমাদিগকে গার্হস্থ্য ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা শিক্ষা দিতেছে। পরিবারবর্গের মধ্যে বনবাস করিয়া আমরা কি প্রকারে পিতামাতা, ভ্রাতাভগিনী ও স্ত্রীপুত্র লইয়া অশেষ সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিব, কাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়া আমরা জীবনের প্রকৃত

শ্রেয়োলাভ করিব, তাহাই এধর্ম্ম রামচরিত দ্বারা আমাদিগকে প্রকৃষ্ট পদ্ধতিতে শিক্ষা দেয়। ইহাতে পিতৃমাতৃভক্তি, পিতৃমাতৃস্নেহ, ভ্রাতৃভক্তি, ভ্রাতৃস্নেহ, দম্পতিপ্রেম, পতিপরায়ণতা, রাজধর্ম্ম প্রভৃতি গৃহস্থাশ্রমের যাবতীয় ধর্ম্ম কেমন সুচারু রূপে শিক্ষা করা যায়।

রামায়ণের গুণকীর্ত্তন।

যে রামায়ণে রামাবতারের কথা লিখিত, তাহা আমাদের নিকট চিরদিনের জন্য পূজ্য। আজ ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত, হিমালয় হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র রামায়ণ সমভাবে পূজিত হইতেছে। যতদিন ভারতে হিন্দুধর্ম্ম দেদীপ্যমান থাকিবে, ততদিন রামায়ণ এইভাবে সর্ব্বত্র পূজিত হইবে। যে দেশে রামায়ণ উদ্ভূত, সে দেশ জগতে ধন্য! যে জাতি রামায়ণ পাঠে ও শ্রবণে উপকৃত, সে জাতি জগতে ধন্য! যে ভাষায় রামচরিত বর্ণিত, সে ভাষা জগতে ধন্য! আর যিনি রামচরিত শ্রবণ করিয়া নিজ জীবন তদনুসারে গঠিত করেন, তিনিও সংসারে অশেষ ধন্য!

ভাষা মাত্রেই বিবিধ কাব্যগ্রন্থে পূর্ণ। কিন্তু রামায়ণের ন্যায় এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, এমন মনোহর মহাকাব্য কোন দেশের কোন ভাষায় দেখা যায় না। ঈলিয়াড বল, ওডেসী বল, সাদী বল উহারা ইহার সমক্ষে অকিঞ্চিৎকর।

রামায়ণ ভারতের চির রত্নাকর এবং যাঁহার পিতামাতা সাধ করিয়া রত্নাকর নাম রাখেন, তিনিই সকলের জন্য এ রত্নাকর খনন করিয়া যান। এ আকর কিরূপ অমূল্য মণিমুক্তায় পূর্ণ, তাহা এক হিন্দু ব্যতীত অপর কেহ জানেন না। অন্নপূর্ণার হস্তস্থিত স্থালীর ন্যায় ইহা চিরদিন সমভাবে পূর্ণ; কদাচ ইহার হ্রাস হয় না। ভারতের কত কোটী কোটী মানব এতকাল এই আকরের অমূল্য রত্ন ভোগ করিয়া আসিতেছে, অথচ ইহা যেমন, তেমনি আছে এবং চিরদিন তেমনি থাকিবে। যে অমূল্য ধর্ম্মোপদেশ রামায়ণে পাওয়া যায়, তাহার সহিত কি অকিঞ্চিৎকর মণিমুক্তার তুলনা হইতে পারে? পার্থিব রত্ন ক্ষণভঙ্গুর পার্থিব দেহকে সুশোভিত করে; কিন্তু রামায়ণের স্বর্গীয় রত্ন অবিনশ্বর আত্মার স্বর্গীয় আভরণ।

কোথায় হে আদিগুরো বাল্মীকি! এক রামচরিত লিখিয়া তুমি ভারতকে কিরূপ পুণ্যক্ষেত্র, কিরূপ ধর্ম্মক্ষেত্র করিয়া গিয়াছ! এক রামচরিত শ্রবণ

করাইয়া ভারতের কোটী কোটী মানববৃন্দকে এতকাল কিরূপ ধর্ম্মামৃত পান করাইতেছ! এক রামচরিত বর্ণন করিয়া তুমি ভারতকে কিরূপ ঋণজালে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছ! রামোপাখ্যান সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, তুমি যে অলৌকিক রামচরিত বর্ণন করিয়া সমগ্র ভারতবাসীকে অলৌকিক ধর্ম্মোপদেশ দিতেছ, তজ্জন্য তোমার শ্রীচরণারবিন্দে কোটী কোটী প্রণাম। কোথায় হে কবিরত্নাকর! তুমি যে অলৌকিক রামচরিত অলৌকিক তুলিতে অঙ্কিত করিয়া গিয়াছ, যে অলৌকিক দৃশ্যপটল সকলের সমক্ষে ধারণ করিয়া চিরদিনের জন্য সকলকে অলৌকিক সহানুভূতিশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছ, তজ্জন্য তোমার চরণারবিন্দে কোটী কোটি প্রণাম। যে দেশে ও যে ভাষায় শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় আদর্শমানব, আদর্শপুত্র ও আদর্শরাজা, সীতার ন্যায় আদর্শনারী ও লক্ষ্মণের ন্যায় আদর্শভ্রাতা বর্ণিত, সে দেশ ও সে ভাষা এ সংসারে ধন্য! আর যিনি অত্যদ্ভুত কৌশলবলে অগাধ কল্পনাবলে সেই আদর্শ স্ত্রীপুরুষদিগের ক্রিয়াকলাপ বর্ণন করিয়া জাতীয় হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে চিরাঙ্কিত করত জাতীয় জীবন চিরদিন গঠন করিতেছেন, তিনিও এ সংসারে কত ধন্য।

আজ ইংরাজগুরুগৃহে এক অপরূপ কথা শুনিতেছি। তাঁহারা রামায়ণ অধ্যয়ন করিয়া সিদ্ধান্ত করেন, রামায়ণে রামরাবণের যুদ্ধ আর্য্যজাতি দ্বারা দাক্ষিণাত্যবিজয় এবং সীতাদেবীর অপহরণ ও লঙ্কায় আনয়ন লাঙ্গল দ্বারা দাক্ষিণাত্যে কৃষিকার্য্যের প্রচার বুঝায়। তাঁহারা আরও বলেন, রামায়ণোক্ত বানর ও রাক্ষস দ্বারা দাক্ষিণাত্যনিবাসী অসভ্য অনার্য্যজাতিবর্গ বুঝায়। বলি এই সকল সিদ্ধান্ত করাতেই কি রামায়ণের প্রকৃত গৌরব আমাদের নিকট লাঘব হইয়া গেল? আমরা কি ঐসকল অপরূপ সত্য জানিবার জন্য রামায়ণ পাঠ করিব? ঐতিহাসিক সত্য সংগ্রহ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু ঈশ্বরের অবতার শ্রীরামচন্দ্রের কীর্ত্তিকলাপ জানিবার জন্য আমরা ভক্তিভাবে রামায়ণ পাঠ করি, যাহাতে আমরা তাঁহাকে জীবনের পূর্ণ আদর্শ করিয়া সকল বিষয়ে তাঁহারই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিব।

ওহে সুশিক্ষিত সম্প্রদায়! তোমরা এখন ইংরাজিতে নানা সাহিত্য, কাব্য, নাটক, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞানশাস্ত্র পাঠ করিয়া বিস্ফারিতহৃদয়ে স্বীয়

অভূতপূর্ব্ব বিদ্যার গৌরব করিতেছ বটে, কিন্তু বল দেখি, বাল্যকালে রামায়ণ পাঠ করিয়া যে উপদেশ পাইয়াছিলে, সেরূপ উপদেশ আর কোথায় পাইবে? বিজ্ঞানশাস্ত্রের আবিষ্কৃত কতকগুলি প্রাকৃতিক সত্য জানিলে বা ইতিহাসের কতকগুলি যুদ্ধের বিবরণ পাঠ করিলে কোন্ শ্রেয়োলাভ হইবে? কিন্তু যে পুস্তক পাঠ করিলে তোমার চরিত্র বিশুদ্ধ হইবে, তোমার হৃদয় কারুণ্যাদিরসে আর্দ্র হইবে, তুমি সংসারে পরের জন্য ত্যাগ স্বীকার করিতে শিখিবে, সেই শিক্ষাই সকলের প্রকৃত শিক্ষা। ইহার বলে তুমি ভবসাগরের নানা ঝঞ্ঝাবাত উত্তীর্ণ হইবে। এখন একবার ভাব দেখি, রামায়ণ কিরূপ উৎকৃষ্ট পদ্ধতিতে সে সকল অমূল্য উপদেশ দিতেছে!

রামায়ণ পাঠ করিয়া সকলকে কাঁদিতে হয়। রাজাধিরাজ বল, পথের কাঙ্গাল বল, রামায়ণের কথা শুনিয়া সকলের হৃদয় বিগলিত হইয়া কাঁদিতে থাকিবে। যখন স্নেহের পুত্তলি রামচন্দ্র চীরবল্কল ধারণ করিয়া বনগমনার্থ স্নেহময়ী মাতার নিকট বিদায় গ্রহণ করেন, তখন শোকাতুরা কৌশল্যাদেবীর ক্রন্দন শুনিয়া আমাদের বক্ষঃস্থল চিরদিন অশ্রুজলে প্লাবিত হইতেছে। যখন পুত্র শোকাতুর বৃদ্ধ রাজা দশরথ অন্ধমুনিপুত্রের হত্যার জন্য গতানুশোচনায় দগ্ধ হইয়া অসহ্য পুত্রশোকে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন; তখন তাঁহার শোকে ও দুঃখে আমাদের বক্ষঃস্থল চিরদিন অশ্রুজলে প্লাবিত হইতেছে। যখন জানকী দেবী দুর্বৃত্ত দশানন কর্ত্তৃক অপহৃতা হন, তখন রামচন্দ্র বনমধ্যে প্রাণপ্রেয়সী হারাইয়া শোকে বিহ্বল হইয়া যেরূপ ক্রন্দন করেন, তাঁহার সেই ক্রন্দনধ্বনিতে আমাদের বক্ষঃস্থল চিরদিন অশ্রুজলে প্লাবিত হইতেছে। যখন বিদেশ বিভুয়ে সেই কাল সমরে প্রাণের ভাই লক্ষণ শক্তিশেলে বিদ্ধ হইয়া প্রাণ হারাইতে বসেন, তখন রামচন্দ্র তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া ভ্রাতৃশোকে উচ্চৈঃস্বরে যেরূপ আর্ত্তনাদ করেন, তাঁহার সেই আর্ত্তনাদে আমাদের বক্ষঃস্থল চিরদিন অশ্রুজলে প্লাবিত হইতেছে। যখন বাল্মীক আশ্রমে দেবর লক্ষ্মণ সীতাদেবীর নিকট আর্য্যপুত্রের কঠোর বনবাসাদেশ শ্রবণ করান, তখন তিনি অসহ্য স্বামী শোকে অভিভূত হইয়া শিরে করাঘাত করিতে করিতে যেরূপ হাহাকার করিতে থাকেন, তাঁহার সেই হাহাকারে আমাদের বক্ষঃস্থল চিরদিন অশ্রুজলে প্লাবিত হইতেছে। হে আদিগুরো বাল্মীকিদেব। এইরূপ কত্তজাঃগায় তুমি

আমাদিগকে চিরদিনের জন্য কাঁদাইয়াছ। আমরাও চিরদিন কাঁদিতেছি ও কাঁদিব। এ দুঃখের সংসারে ক্রন্দনেই আত্মার উন্নতি, মনের উন্নতি ও সমাজের উন্নতি।

শ্রীরামচন্দ্রের অলৌকিক পিতৃভক্তি ও স্বার্থত্যাগ।

রামচন্দ্র নিজ জীবনে অসাধরণ পিতৃভক্তির কি জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখান! পিতৃসত্যপালনার্থ কে কোথায় অতুল সম্পদ, অতুল ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসে যাইতে পারে? কে কোথায় কণ্টকাকীর্ণ হিংস্রজন্তুসমাকুল বনজঙ্গলের অশেষ কষ্টরাশি এত সুদীর্ঘকাল অম্লানবদনে নিজমস্তকে বহন করিতে পারে? কে কোথায় বিমাতার সামান্য কথায় পৈতৃক রাজসিংহাসন ও অসমার্জ্জিত নিজ সত্ত্ব ত্যাগ করিয়া জগতে এমন স্বার্থত্যাগের জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারে? যে ক্ষত্রিয়জাতি বাল্যকাল হইতে শিক্ষা করে, "বীরভোগ্যা বসুন্ধরা," সেই ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ও হরধনুভঙ্গকারী বাহুবীর্য্যে সুশোভিত হইয়া যিনি পরমপূজনীয় পিতৃদেবকে প্রতিশ্রুত সত্য হইতে উদ্ধার করিবার জন্য স্বেচ্ছায় চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসে যান, তাঁহারই স্বার্থত্যাগ জগতে অতুলনীয়।

যে রামচন্দ্র মনে করিলেই অনায়াসে সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া বিলাসসাগরে ভাসিতে ভাসিতে স্বীয় মাতা ও ভার্য্যাকে অশেষ সুখে সুখিনী করিতে পারিতেন, যাঁহাকে অধীশ্বর করিবার জন্য রাজ্যের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই এত উদগ্রীব ছিল, তিনিই কি না কিছুমাত্র বাক্যব্যয় না করিয়া পিতৃসত্যপালনার্থ চীরবল্কল ধারণ পূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে বনবাসে গেলেন! স্বার্থত্যাগের এমন সুমনোহর দৃষ্টান্ত কোন্ দেশের কোন্ ভাষায় বা কোন্ গ্রন্থে দেখিতে পাও?

এস্থলে একজন পাশ্চাত্যরাজনীতিজ্ঞ মহাপণ্ডিত বলিবেন, কি! মুখের একটা সামান্য কথার জন্য সংসারে কে এমন নির্ব্বোধ, যে নিজের পৈতৃক সিংহাসন ত্যাগ করিয়া বনবাসে যাইবে? রামচন্দ্র সংসারে কি নির্ব্বোধ! কি নির্ব্বোধ! রাজকুলে তাঁহার জন্মগ্রহণ করাই বৃথা! যে পাপীয়সী বিমাতা তাঁহার সুখের পথে এমন কণ্টক বপন করিল, উহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেই ত সব গোলযোগ মিটিয়া যাইত; এ বুদ্ধিটুকুও কি তাঁহার ঘটে আইসে নাই?

দেখ, আরঙ্গজেব তৃতীয় পুত্র হইয়া পিতৃদেবকে কারারুদ্ধ করিয়া দিল্লীর ময়ূরতক্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন। আর নির্ব্বোধ রাম কি না এক অবলা বিমাতার সামান্য ধমকানিতে পৈতৃক সিংহাসন ত্যাগ করিয়া বিতাড়িত পশুর ন্যায় বনবাসে চলিয়া গেল। কে বলে ইহা রামের স্বার্থত্যাগ? ইহা ত তাঁহার ঘোর নির্বুদ্ধিতা ও কাপুরুষতা। এমন লোকের আবার সুখ্যাতি করিতে আছে? এই প্রকারে যাঁহারা রামের নিন্দা করেন, তাঁহাদের ক্ষুরে দণ্ডবৎ করা উচিত।

এখন বল দেখি, রামচন্দ্রের এই অসাধারণ পিতৃভক্তি দেখাইয়া হিন্দুধর্ম্ম আমাদিগকে কতদূর পিতৃভক্ত করিতেছে এবং এতকাল কত অসংখ্য ধর্ম্মাত্মা হিন্দু পরমপূজনীয় পিতৃদেবের জন্য কিরূপ স্বার্থত্যাগ করিয়া আসিতেছেন! বস্তুতঃ হিন্দুধর্ম্ম আমাদিগকে যতদূর পিতৃভক্তি উপদেশ দেয়, এমন কোন ধর্ম্ম এ জগতে দিতে পারে না।

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বে দেবাঃ॥

"পিতৃসেবাই আমাদের স্বর্গলাভের উপায়, পিতৃসেবাই আমাদের পরম ধর্ম্ম এবং পিতৃসেবাই আমাদের মহৎ তপস্যা। পিতা পুত্রের উপর সন্তুষ্ট হইলে সকল দেবতাই সেই সুপুত্রের উপর সন্তুষ্ট হন।" এই শ্লোক পাঠ করিয়া কাহার না হৃদয় পিতৃভক্তিতে উথলিয়া উঠিবে? ইহার জন্য পুরোহিতগণ এই পুণ্য শ্লোক শ্রাদ্ধে পাঠ করান। এমন পিতৃভক্তিপ্রদায়ি শ্লোক কোন্ দেশের কোন্ ভাষায় দেখিতে পাও?

যে সমাজকে হিন্দুধর্ম্ম এতকাল রামচরিত শ্রবণ করাইয়া এতদূর পিতৃভক্ত করিল, সে সমাজের অবস্থা আজকাল কিরূপ শোচনীয়! সুশিক্ষিত সুসভ্য সন্তানগণ আজকাল পিতামাতাগুরুজনকে ওল্ড ফুল (Old Eools) বলেন, স্থলবিশেষে তাঁহাদের পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হন এবং বিবিজানের সুপরামর্শে তাঁহাদের গ্রাসাচ্ছাদন রহিত করিয়া আশীর্ব্বাদভাজন হন। এ সকল দেখিয়া শুনিয়া কি চক্ষে জল আইসে না? বা হৃদয় বিদীর্ণ হয়না?

রামচন্দ্রের অলৌকিক প্রজারঞ্জন

তিনি স্বজীবনে রাজধর্ম্মের কি পরাকাষ্ঠা দেখান! প্রজারঞ্জন রাজার

সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য, ইহা ত সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু বল দেখি, কোন্ রাজা কোন্ সময়ে কেবলমাত্র প্রজাবর্গের সন্তোষের জন্য প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা ভার্য্যাকে অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় ত্যাগ করিয়া বনবাসে প্রেরণ করিতে পারেন? তারপর কি তিনি রাজমদে মত্ত হইয়া ভার্য্যান্তর গ্রহণ করিলেন? যে সীতার স্বর্ণময়ী প্রতিমূর্ত্তি তদীয় হৃদয়াসনে প্রতিষ্ঠিতা, তাহাই আজীবন সমভাবে পূজিত হইতে লাগিল। কেবল রাজধর্ম্ম দেখাইবার জন্য তিনি সীতার বাহ্যদেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন মাত্র।

এস্থলে কেহ কেহ বলিবেন, যে সীতাকে তিনি এতদূর ভালবাসেন, যাঁহাকে হারাইয়া তিনি বনে বনে কাঁদিতে কাঁদিতে দিন কাটান, যাঁহাকে পাইবার জন্য তিনি রাবণবংশ ধ্বংস করেন, যাঁহাকে তিনি অগ্নিপরীক্ষা করিয়া পুনঃ গ্রহণ করেন, যাঁহার গর্ভে তাঁহার ভবিষ্য বংশধর অবস্থিতি করিতেছে, সেই সীতাকে তিনি কেমন করিয়া জঙ্গলের বাঘভালুকের মুখে প্রক্ষেপ করিলেন? ইহা অপেক্ষা নৃশংস কাজ সংসারে আর কি হইতে পারে? যে সীতাকে তিনি মনে মনে সতী সাধ্বী ও একান্ত পতিব্রতা বলিয়া জানিতেন, এক কুলটা রজকপত্নীর সামান্য কথায় সেই অশেষ গুণবতী ভার্য্যার উপর এমন নৃশংস অত্যাচার। কোন্ দেশের ধর্ম্মনীতি বা সমাজনীতি এরূপ পাশব অত্যাচারের পোষকতা করিবে?

সংসারের নিয়ম এই, ভাল কর বা মন্দ কর, কোন কার্য্য দ্বারা সকলকে খুসী করা যায় না। তখন রাজাধিরাজ রামচন্দ্র এত বড় বুদ্ধিমান হইয়া একজন খান্‌কি ধোপানীর কথায় এমন গর্হিত কাজ করিয়া বসিলেন। কুলটা স্ত্রীকে পরিত্যাগ কর, তোমার উপর কেহই দোষারোপ করিবেন না। কিন্তু যে স্ত্রীকে তুমি সতী সাধ্বী বলিয়া ভালরূপ জান, তাঁহাকে কি বলিয়া ত্যাগ করিবে? অতএব রামচন্দ্রের সীতাবর্জ্জন সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্ম ও নীতিবিবর্জ্জিত ও বীভৎস। প্রাচ্য জগতের মূর্খ লোকেরা তাঁহার এই নিষ্ঠুরতাকে লোকাতিগ গুণ বলিয়া প্রশংসা করুক ও তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া পূজা করুক; কিন্তু পাশ্চাত্য জগতের কোন লোক এমন নৃশংস ব্যবহারের আদৌ পোষকতা করিবে না; বরং তাঁহাকে নরপিশাচ বলিয়া চিরদিন অভিশপ্ত করিবে।

পাশ্চাত্য জগৎ যাহাই ভাবুক না কেন, প্রাচ্য জগৎ চিরদিন বলিবে, যিনি

কোন বিষয়ের আদর্শ, তাঁহাকে সে বিষয়ের পূর্ণ আদর্শ (Ideal perfection) দেখান উচিত। যখন শাস্ত্রমতে রামচন্দ্র আদর্শরাজা বা রাজন্য বর্গের পূর্ণ আদর্শ, তখন তিনি রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া জগৎকে দেখাইবেন না কি প্রকারে প্রজারঞ্জন করিয়া প্রজাপালন করা উচিত? সে প্রজা যেই হউক না কেন, যখন তাহারা তাঁহার কোন বিষয়ে নিন্দা করিতেছে, তখন তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য, সে বিষয় সংশোধন করিয়া তাহাদের মনস্তুষ্টি করা। যদি প্রজাবর্গ রাবণগৃহে বসবাসের জন্য সীতাদেবীর নিন্দা করে, সে স্থলে সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া নিন্দার মূলকারণ উৎপাটন করা আবশ্যক। এজন্য তিনি কাহারও পরামর্শ না শুনিয়া সীতাবর্জ্জন করিয়াছিলেন।

যে রামচন্দ্র রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মনে মনে ভাবিতেন:—

স্নেহং দয়াং সৌখ্যং যদি বা জানকীমপি
প্রজানামরাধনায় মুঞ্চতো নাস্তি মে ব্যথা।

(উত্তরচরিতং)

"সংসারে স্নেহ, দয়া ও মমতা নিজের সুখসম্ভার, এমন কি প্রিয়তমা জানকী পর্য্যন্ত যদি প্রজাবর্গের সন্তোষার্থ আমাকে ত্যাগ করিতে হয়, তাহাতে আমার কিছুমাত্র দুঃখ নাই।" তিনি যদি প্রজারঞ্জনার্থ প্রিয়তমা জানকীকে ত্যাগ করিয়া থাকেন, কেন তাঁহার উপর দোষারোপ করিতেছ? এস্থলে যদি তিনি প্রজাবর্গের কথায় কর্ণপাত না করিয়া সাধারণ রাজার ন্যায় নিজের সুখ দেখিতেন, তিনি কি জগতে আদর্শরাজা হইতে পারিতেন? কিরূপে প্রজাবর্গকে অশেষরূপে সন্তুষ্ট করিয়া রাজ্য পালন করা উচিত, তাহাই জগৎকে দেখাইবার জন্য তিনি ঐরূপ অলোকসামান্য ব্যবহার করিয়াছেন। হিন্দুধর্ম্মও তাঁহাকে চিরদিন আদর্শরাজা ও ঈশ্বরাবতার বলিয়া পূজা করিতেছে। ইহার গুণে এতকাল কত সহস্র ২ রাজাধিরাজ রামচরিত শ্রবণ করিয়া প্রজারঞ্জনার্থ কত স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন এবং পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিয়া স্ব স্ব রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিয়াছেন। একি প্রজারঞ্জক ইংরাজরাজ, যে লক্ষ ২ প্রজার ঘোর আপত্তি থাকিলেও নিজের জিদ বজায় রাখিবেই রাখিবে?

এই সকল অলৌকিক কার্য্য করাতে রামচন্দ্র আমাদের নিকট ঈশ্বরাবতার এবং যতদিন ভারতে হিন্দুধর্ম্ম দেদীপ্যমান থাকিবে, ততদিন হিন্দুসমাজ

তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার জ্ঞানে পূজা করিবে। বস্তুতঃ যিনি এমন অলৌকিক স্বার্থত্যাগ, এমন অলৌকিক আত্মোৎসর্গ করিয়া নিজ জীবনে ধর্ম্মের এমন জলন্ত ও জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেখান, যিনি ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বর্দ্ধনার্থ নিজ জীবন অনন্ত দুঃখে কাটান, তিনি ঈশ্বরস্থানে কেন না পূজিত হইবেন বা আমাদের আদর্শপুরুষ হইবেন?

ঈশা ও বুদ্ধদেবের সহিত রামচন্দ্রের তুলনা।

ঈশাদেব খৃষ্টজগতে, বুদ্ধদেব বৌদ্ধজগতে ও রামচন্দ্র হিন্দুজগতে চিরদিন পূজিত হইতেছেন। তিন মহাত্মাই স্বার্থত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখান। ঈশা ধর্ম্মের জন্য ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বর্দ্ধনার্থ নিজ জীবন উৎসর্গ করেন, এজন্য তিনি পতিত মানবের পরিত্রাতা বলিয়া পূজিত হন এবং তাঁহার অনুকরণ করিয়া সহস্র সহস্র ধর্ম্মাত্মা খৃষ্টান ধর্ম্মের জন্য নিজ ২ দেহ অগ্নিতে আহুতি প্রদান পূর্ব্বক ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিয়া যান। মহাত্মা বুদ্ধদেবও ধর্ম্মের জন্য, পার্থিব দুঃখনিবারণার্থ অতুল সম্পদ ও অতুল বিভব ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করেন। এজন্য বৌদ্ধজগতে তাঁহার অনুকরণ করিয়া শত শত রাজকুমার ও শেঠপুত্র অতুল বিভব ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মপ্রচারার্থ সন্ন্যাসব্রত ধারণ করিয়াছেন এবং শিলাদিত্যাদি নৃপতিবৃন্দ প্রয়াগের সন্তোষক্ষেত্রে বা অন্যান্য স্থলে যথাসর্ব্বস্ব দান করত কৌপীনধারী হইয়া ধর্ম্মের অনন্ত মহিমা কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। আমাদের পরমপূজ্য রামচন্দ্রও পিতৃসত্য পালনার্থ ধর্ম্মের জন্য অতুল সম্পদ ত্যাগ করিয়া চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসে যান এবং রাজধর্ম্ম দেখাইবার জন্য প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা প্রেয়সীকে বিসর্জ্জন করেন। এজন্য তাঁহার অনুকরণ করিয়া হিন্দুমাত্রেই অশেষ পিতৃভক্ত এবং রাজামাত্রেই অশেষ প্রজাবৎসল হইয়াছেন।

ঈশা ও বুদ্ধদেব উভয়েই শিষ্যমণ্ডলী একত্রিত করিয়া গগনভেদিরবে স্বীয় শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মমত প্রচার করিয়া জগৎবিখ্যাত হন। কিন্তু আমাদের পরমপূজ্য শ্রীরামচন্দ্র শিষ্যমণ্ডলী একত্রিত করিয়া কোন নূতন ধর্ম্মমত প্রচার করিয়া যান নাই। সেজন্য বলা উচিত, যে স্থলে ঈশা ও বুদ্ধদেব সন্ন্যাস ব্রত অবলম্বন করিয়া কথায় ধর্ম্মোপদেশ দেন, সে স্থলে শ্রীরামচন্দ্র সংসারাশ্রমে থাকিয়া কার্য্যতঃ তাহা দেখাইয়া যান। যে স্থলে অলৌকিক ধর্ম্মমত প্রচার

করাতে প্রথমোক্ত মহাত্মারা পূজিত, সে স্থলে অলৌকিক ধর্ম্মানুষ্ঠান করাতে শেষোক্ত দেবমানব জগতে পূজিত হইতেছেন। যাঁহারা কথায় ধর্ম্মোপদেশ দেন, অন্যান্য কৃত্রিম ধর্ম্ম তাঁহাদের পূজা করিতে পারে; কিন্তু সনাতন অকৃত্রিম হিন্দুধর্ম্ম তাঁহাদের প্রতি ততদূর ভক্তি প্রদর্শন করে না, যেহেতুক কথায় ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া অতি সহজ; পরন্তু যাঁহারা অলৌকিক ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য, অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের জন্য বিখ্যাত, এ ধর্ম্ম চিরদিন তাঁহাদিগকে সম্যক সম্মান করিয়া সকলের আদর্শস্বরূপ দেখায়।

ঈশা ও বুদ্ধদেব কালোচিত উৎকৃষ্ট ধর্ম্মমত প্রচার করিয়া নিজ ২ ধর্ম্ম জগতে প্রবর্ত্তন করেন। আবার উভয়েই স্বার্থত্যাগের জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া জগতে যথার্থ ধর্ম্মোপদেশ দিয়া যান। ঈশা ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বর্দ্ধনার্থ নিজ জীবন উৎসর্গ করেন; আর মহাত্মা বুদ্ধদেব ধর্ম্মের জন্য, সংসারে দুঃখনিবৃত্তির জন্য অতুল রাজসম্পদ ত্যাগ করেন। তন্মধ্যে ঈশার স্বার্থত্যাগ অপেক্ষা বুদ্ধদেবের স্বার্থত্যাগ অধিক প্রশংসনীয়। সমাজ প্রচলিত সাধারণ ধর্ম্মের অনিষ্টসাধন করাতে ঈশাকে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া হত্যা করা হয়, অর্থাৎ পরের অত্যাচার বশতঃ তিনি নিজ জীবন বিসর্জ্জন করিতে বাধ্য হন। এরূপ ক্ষেত্রে সকলের ভাগ্যে একরূপই ঘটিয়া থাকে। দেশস্থ লোকের অত্যাচারে মহাত্মা সক্রেটিশও নিজ জীবন বিসর্জ্জন করেন এবং মহম্মদও জন্মভূমি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

ঈশাদেবের হত্যাকাণ্ড বা তদীয় জীবনোৎসর্গ তাঁহার পরমভক্ত শিষ্যগণ দ্বারা অলৌকিক ব্যাপারে পরিণত। তাঁহারা উক্ত ঘটনাকে পতিত মানব জাতির উদ্ধারের উপায়স্বরূপ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ইহাতেই তিনি আজ পাশ্চাত্যজগতে মানবের পরিত্রাতা বলিয়া পূজিত হইতেছেন এবং তাঁহার ধর্ম্মমত এতদূর সাদরে গৃহীত হইতেছে। যাহা হউক, তিনি যে জীবন উৎসর্গ করেন, তাহা আদৌ স্বেচ্ছায় নহে, তাহা পরের অত্যাচার বশতই ঘটে। পাশ্চাত্যজগৎ যাহাই বলুক না কেন, ইহা আমাদের মতে আত্মোৎসর্গ নহে। কিন্তু যে বুদ্ধদেব রাজকুমার হইয়া পৃথিবীর দুঃখরাশি বিদূরিত করিবার জন্য স্বেচ্ছায় অতুল সম্পদ ও অতুল বিভব ত্যাগ করেন, তাঁহারই স্বার্থত্যাগ অধিক প্রশংসনীয় ও শ্লাঘনীয়।

এখন একবার ভাব দেখি, আমাদের সেই ঈশ্বরাবতার শ্রীরামচন্দ্র নিজ জীবনে কেমন অলৌকিক স্বার্থত্যাগ বা আত্মোৎসর্গ দেখান। যখন তিনি রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইতে যাইতেছেন, যখন বিশাল কোশলরাজ্যের রাজলক্ষ্মী তাঁহার করতলস্থ হইবার উপক্রম, সেই মুহূর্ত্তে তিনি অতুল সম্পদ ও অতুল বিভব ত্যাগ করিয়া ও চীরবল্কল পরিধান করিয়া পিতৃসত্য পালনার্থ অম্লানবদনে হাসিতে হাসিতে চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনবাসে যান। একবার ভাব দেখি, রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া সুখৈশ্বর্য্যের ক্রোড়দেশে পালিত হইয়া অশেষ প্রলোভনের মধ্যে এরূপ স্বার্থত্যাগ করা কিরূপ দুরূহ ব্যাপার! যিনি সত্যকথার মাহাত্ম্য বর্দ্ধনার্থ অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগে জলাঞ্জলি দিয়া এমন সুদীর্ঘকাল বনবাসের অশেষ ক্লেশরাশি নিজ মস্তকে বহন করেন, যাঁহাকে তদীয় ভ্রাতা ভরত অশেষ কাকুতি মিনতি করিয়াও বনজঙ্গল হইতে ফিরাইতে পারেন নাই এবং যিনি রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া রাজধর্ম্ম দেখাইবার জন্য প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণীকে বনবাসে প্রেরণ করিয়া চিরদিন নিজের সুখের পথে কণ্টক বপন করেন, তাঁহারই আত্মোৎসর্গ জগতে অতুলনীয়, তিনিই জগতে প্রত্যক্ষ দেবতা এবং হিন্দুধর্ম্মও তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার জ্ঞানে চিরদিন পূজা করিতেছে।

সীতাদেবীর অলৌকিক পতিপরায়ণতা।

রামায়ণে নারীজাতি পতিপরায়ণতার পরাকাষ্ঠা শিক্ষা করে। এমন পাতিব্রত্যধর্ম্মের জলন্ত দৃষ্টান্ত কোন দেশের কোন ভাষায় কেহ কখন দেখিতে পাইবেন না। এখন একবার ভারতের সেই চিরপূজিতা চিরদুঃখিনী আদর্শসতী সীতার কথা ভাব দেখি। যে অসূর্য্যম্পশ্যা রমণী রাজার কন্যা, রাজার বধূ ও রাজার রাণী হইয়া অতুল ভোগৈশ্বর্য্যে লালিতা ও পালিতা, যিনি দুগ্ধফেননিভ শয্যা শয়নে চিরাভ্যস্তা, তিনি কি না যৌবনে পরমারাধ্য প্রাণপতির শ্রীচরণকমলসেবার জন্য অতুল ঐশ্বর্য্যভোগে জলাঞ্জলি দিয়া শ্বাপদসমাকুল কণ্টকাকীর্ণ বনজঙ্গলে চলিয়া গেলেন ও স্থণ্ডিলশায়িনী হইলেন। পতিসেবার জন্য কে কোথায় এমন সুদীর্ঘকাল বনবাসের অশেষ ক্লেশরাশি মস্তকে বহন করিতে পারে? কেবলই কি বনবাসের কষ্ট? আবার সেই প্রাণপতি হইতে বিয়োজিতা হইয়া পরগৃহে নীতা, পালিতা ও অশেষ

প্রলোভনে প্রলোভিতা হইলেন। এমন বিপদ রাশির মধ্যেও তিনি একমাত্র ভগবানকে স্মরণ করিয়া নিজের সতীত্বধর্ম্ম পূর্ণাংশে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহারই অনুকরণ করিয়া আবহমান কাল হিন্দুসমাজে কত সহস্র সহস্র মনস্বিনী সীমন্তিনী নরপিশাচদের সমক্ষে সতীত্বধর্ম্মের যূপকাষ্ঠে অম্লানবদনে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া যাইতেছেন।

আহা! বল দেখি, সীতার জীবনে কিরূপ দুঃখের ছবি অঙ্কিত হইয়াছে! তাঁহার চিরজীবন কিরূপ অসহ্য দুঃখানলে দগ্ধ হইয়াছে! তাঁহার সুকোমল হৃদয়ে সময়ে সময়ে দারুণ শোকদুঃখের কিরূপ অসহ্য তুষানল প্রজ্বলিত হইয়াছে! অভাগিনী সীতার জীবনবৃত্তান্ত ভাবিলে কাহার না শোকসাগর উথলিয়া উঠিবে? শৈশবকালে তিনি স্নেহময়ী মাতার স্নেহ ও মমতা জানেন না। বিবাহের পর কিছুদিনমাত্র স্বামীসহবাসে রাজপ্রাসাদে সুখভোগে ছিলেন। যখন পরমারাধ্য প্রাণপতি পিতৃসত্যপালনার্থ চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসী হন, তিনিও তাঁহার দুঃখে দুঃখিনী হইয়া স্বেচ্ছায় বনগমন করিলেন এবং বনবাসের অশেষ ক্লেশরাশি ঘাড় পাতিয়া লইলেন। পঞ্চবটীবনে তিনি কয়েক বৎসর স্বামীসহবাসে সুখে ছিলেন। কিন্তু নিষ্ঠুর বিধাতা তাঁহার এই সামান্য সুখেও বাদ সাধিলেন। দুর্ব্বৃত্ত দশানন তাঁহাকে অপহরণ করিয়া লঙ্কাপুরে লইয়া গেল। তথায় তিনি অসহ্য জ্বালা যন্ত্রণা পাইয়া কিরূপ দুঃসহ ক্লেশে দিন অতিবাহিত করিলেন। স্বর্গের দেবতারা যে দশাননের পদানত, তাঁহারই সমক্ষে তিনি এক অবলা হইয়া নিজের সতীত্বধর্ম্ম রক্ষা করেন।

রাবণ বংশ ধ্বংস হইবার পর, তিনি অগ্নি পরীক্ষা দিয়া স্বামীর সহিত অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করেন। রাজসিংহাসনে উপবেশন করিয়া তিনি স্বল্প কাল পরম সুখে কালাতিপাত করেন মাত্র। তাঁহার দুর্ভাগ্যবশতঃ পরগৃহে থাকিবার জন্য কোন কোন অযোধ্যাবাসী তাঁহার নিন্দাবাদ করিতে লাগিল। ইহা শুনিয়া রামচন্দ্র রাজধর্ম্ম দেখাইয়া প্রজারঞ্জন করিবার জন্য সীতাদেবীকে অন্তঃস্বত্ত্বাবস্থায় বনবাসে প্রেরণ করিলেন। বনজঙ্গলে তিনি বাল্মীকির আশ্রমে পালিতা হন। তথায় তিনি পুত্রদ্বয় প্রসব করিয়া ইক্ষ্বাকু বংশ রক্ষা করেন। দ্বাদশ বৎসরের পর পুত্রদ্বয়কে স্বামীহস্তে সমর্পণ করিয়া তিনি বসুন্ধরামাতার ক্রোড়দেশে দুঃখের জীবন অবসান করেন।

বল দেখি, অভাগিনী সীতার জীবন কিরূপ দুঃখময়! রাজরাণী হইয়া কে কোথায় এতদূর শোকোচ্ছাস ফেলিতে ফেলিতে জীবন অতিবাহিত করিয়াছে? কিন্তু বাল্মীকির গুণে, হিন্দুধর্ম্মের গুণে সেই অভাগিনী সীতার স্বর্ণময়ী প্রতিমূর্ত্তি আজ হিন্দুমাত্রেরই হৃদয়মন্দিরে স্থাপিতা ও পূজিতা হইতেছে। যুগ যুগান্তে কত কোটী কোটি নরনারী সেই দুঃখের জীবন পাঠ ও শ্রবণ করিয়া কিরূপ অশ্রুজলে ধরাতল অভিসিঞ্চন করিতেছে! সহৃদয় পাঠকগণ! এই নয়নবারি কি এতকাল হিন্দুসমাজে অনর্থক বিগলিত হইতেছে? মানবহৃদয় কি ইহাতে কারুণ্যাদি রসে আর্দ্র ও ভাবে গদগদ হইয়া কোনরূপ উচ্চশিক্ষা পাইতেছে না?

লক্ষ্মণ ও ভরতের অলৌকিক ভ্রাতৃভক্তি।

রামায়ণে সকলেই ভ্রাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা শিক্ষা করেন! ভ্রাতৃভক্তির এমন অত্যুজ্জ্বল ছবি কোন দেশের কোন ভাষায় দেখা যায় না। লক্ষ্মণ কায়মনোবাক্যে আজীবন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার যেরূপ সেবা করেন, যেরূপ প্রাণপণে তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করেন, তাঁহার বিপদে যেরূপ বিপন্ন ও তাঁহার দুঃখে যেরূপ দুঃখী এবং ভরতও ভ্রাতৃভক্তি দেখাইবার জন্য যেরূপ স্বার্থত্যাগ করেন, তাহা ভাবিলে কাহার না শরীর রোমাঞ্চিত হইবে?

কোথায় হে পরমপূজনীয় আদর্শভ্রাতা লক্ষ্মণজী! বাল্যকাল হইতে তুমি জ্যেষ্ঠভ্রাতার দক্ষিণ হস্ত ও চিরসহচর। তাঁহারই সুখে সুখী; তাঁহারই ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যবান ও বিপদে বিপন্ন। তোমার নিজের সুখদুঃখ তুমি কিছুই জানিতে না। সংসারে কেবল ভ্রাতৃভক্তি দেখাইবার জন্য তোমার জন্মপরিগ্রহ এবং একমাত্র ভ্রাতৃসেবায় তুমি নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়াছ। বলি, রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনার্থ সস্ত্রীক বনে গমন করিলেন; কেন তুমি নিজের স্নেহময়ী জননী, প্রাণপ্রেয়সী ও রাজপ্রাসাদের ভোগবিলাস ত্যাগ করিয়া তাঁহার অনুগমন করিলেও বনবাসের অশেষ ক্লেশ রাশি ঘাড় পাতিয়া লইলে? কেন তুমি সেই কাল সময়ে শক্তিশেলে বিদ্ধ হইয়া প্রাণ হারাইতে বসিলে? তুমি কি মনে করিলে রাজভবনে থাকিয়া অতুল ঐশ্বর্য্যভোগে ও পরমানন্দে দিন যাপন করিতে পারিতে না? তবে কেন তোমার এমন দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিল, যে এক শত্রুসম বৈমাত্রেয় ভ্রাতার জন্য বনবাসী হইয়া এত কষ্ট ভোগ করিলে?

হে লছ্মনজী! ধন্য তোমার পবিত্র জীবন! ধন্য তোমার ভ্রাতৃভক্তি ও ভ্রাতৃসেবা! তুমি নিজ জীবনে ভ্রাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া সংসারের কোটি কোটি মানবকে কিরূপ সৌভ্রাত্র শিখাইতেছ! তোমার নিকট সুশিক্ষা পাইয়া এতকাল ভারতের কত সহস্র সহস্র রাজকুমার অন্তরের সহিত জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতার একান্ত অনুগত থাকিয়া তাঁহার রাজ্যশাসনে সাহায্য করতঃ দেশ শান্তিময় করিয়াছেন এবং মুসলমান ভ্রাতাদিগের ন্যায় সামান্য সিংহাসনের জন্য তুমুল সংগ্রামে লিপ্ত হইয়া নরশোণিতে সমগ্র দেশ প্লাবিত করেন নাই। তোমার নিকট সুশিক্ষা পাইয়া এতকাল কত কোটি কোটি ভারতবাসী জ্যৈষ্ঠভ্রাতার একান্ত অনুগত থাকিয়া একান্নে শান্তিসুখে জীবন কাটাইতেছে!

কোথায় হে পূজ্যপাদ রামভক্ত ভরত! তুমিও নিজজীবনে ভ্রাতৃভক্তির যেরূপ পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছ, তাহাতে তোমারও পবিত্র জীবন ধন্য। কে কোথায় শুনেছে, কে কোথায় দেখেছে, এক বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার খাতিরে কনিষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃদত্ত সিংহাসন ভোগ করে নাই? কে কোথায় শুনেছে, জ্যেষ্ঠভ্রাতার পাদুকাদ্বয় সিংহাসনোপরি স্থাপন পূর্ব্বক উহার নিকটে যোড়হস্ত হইয়া তাঁহার পরমভক্ত সেবকস্বরূপ তদীয় রাজ্যের তত্ত্বাবধান করিয়াছে? অনেক দেশের অনেক ইতিহাস পাঠ করিয়াছি, কিন্তু কোথাও ভ্রাতৃভক্তির এমন জলন্ত দৃষ্টান্ত, ইহার জন্য এতদূর স্বার্থত্যাগ দেখি নাই। কোথায় হে পূজনীয় ভরতজী! তোমার এ কিরূপ বিবেচনা ও ব্যবহার, যে স্নেহময়ী জননী অদ্ভুত উপায়ে রাজসিংহাসন তোমার জন্য লাভ করিলেন, তুমি তাঁহার উপর আদৌ কৃতজ্ঞ হইলে না? পরন্তু যে মাতার কুব্যবহারে পূজ্য পিতা দেহত্যাগী হন ও পূজ্য ভ্রাতা দেশত্যাগী হন, সেই পাপীয়সী মাতার দুর্ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়া তাঁহার মুখাবলোকন করিলে না এবং রাজধানীতে নিজের কালামুখ দেখাইলে না; পরিশেষে ভ্রাতাকে বনবাস হইতে ফিরাইয়া আনিতে না পারিয়া নিজেব বনবাস স্বরূপ নন্দীগ্রামে গিয়া বাস করিল। এই প্রকারে সংসারে ধর্ম্মের প্রকৃত মাহাত্ম্য দেখাইতে হয়।

এখন হিন্দুধর্ম্ম ভরত ও লক্ষ্মণের অপার ভ্রাতৃভক্তি দেখাইয়া এতকাল ব্যাপিয়া যে সমাজকে পরম ভ্রাতৃভক্ত কবিল, সে সমাজের অবস্থা আজকাল কিরূপ শোচনীয়! যে পাশ্চাত্য কালস্রোত সমাজে খরবেগে বহমান, উহার

সমক্ষে পুরাতন সকলই ভাসিয়া যাইবে, ভ্রাতৃভক্তি কেন থাকিবে? যে সহোদর ভ্রাতা এতকাল পরম বন্ধু ও সকল বিপদ আপদে প্রধান সহায়, তিনি হন এখন পর ও স্থলবিশেষে পরম শত্রু। এখন ভ্রাতায় ভ্রাতায় সদ্ভাব নাই, একের বিপদে অপরে ঘাড় পাতে না, এমন কি, একবারও উঁকি মারে না; এমনও দেখা যায়, ভ্রাতায় ভ্রাতায় বাক্যালাপও নাই। এখন এক ভ্রাতা কিছু উপার্জ্জন করিতে পারিলে, সর্ব্বাগ্রে অপর ভ্রাতাগণকে একান্ন হইতে পৃথক করিয়া দেন, পাছে উহারা তদীয় উপার্জ্জিত সম্পত্তির ভাগীদার হইয়া বসে। দেশের লোক পাশ্চাত্য শিক্ষা পাইয়া কেবল দিশেহারা ও জ্ঞানহারা হইতেছে। ভগবানই জানেন উহাদের প্রকৃত জ্ঞানোদয় হইবে কি না?

রামচন্দ্র কেন ঈশ্বরের অবতার।

আমাদের সুশিক্ষিত বান্ধবগণ বলিবেন, যখন অশেষগুণশালী মানবের জীবনচরিত পাঠে মহোপকার পাওয়া যায়, তখন অশেষগুণসম্পন্ন রামচন্দ্রকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পূজিবার কি প্রয়োজন? তাঁহাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, গুণশালী মানবের জীবনচরিত ও ভগবানের লীলা, ইহাদের ভিতর আকাশ পাতাল প্রভেদ। সামান্য নীতি শিখিবার জন্য আমরা প্রথমটী পাঠ করি, আর অনন্ত কালের শ্রেয়োলাভ ও পুণ্যলাভের জন্য আমরা দ্বিতীয়টি পাঠ করি। ইহাতেই উহাদের পার্থক্য বুঝা যাইতেছে।

এখন মহর্ষি বাল্মীকি শ্রীরামকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া প্রতিপাদন করুন, অথবা উত্তরকালে রামভক্ত কবিগণ তাঁহার অলৌকিক গুণরাশি দর্শনে মুগ্ধ হইয়া ঈশ্বরত্বপ্রতিপাদক শ্লোকগুলি রামায়ণে প্রক্ষেপ করিয়া সকলের নিকট তাঁহাকে ভগবান বলিয়া ধারণ করুন; যাঁহারা করুন না। কেন, এরূপ করাতে সমগ্র হিন্দুসমাজের অশেষ মঙ্গল সাধিত হইয়াছে। জনসাধারণকে ভালরূপ গার্হস্থ্যধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য অলৌকিকগুণসম্পন্ন রামচন্দ্র ঈশ্বরাবতার বলিয়া পূজিত হইতেছেন, যাহাতে সকলে রামচরিত অতীব শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত শ্রবণ করিয়া তদনুসৃত মার্গ অবলম্বন করিতে স্বতঃ প্রোৎসাহিত হইবে, ইহাই শাস্ত্রকারদিগের গূঢ় উদ্দেশ্য। বস্তুতঃ হিন্দুযুবকের অপার পারিবারিক সুখ, তাঁহার অসাধারণ পিতৃমাতৃভক্তি, সৌভ্রাত্র ও দম্পতিপ্রেম এবং হিন্দুমহিলার অলৌকিক পতিপরায়ণতা ও পতিসেবা একমাত্র রামায়ণ হইতে উদ্ভূত জানিবে।

অন্যান্য দেশে লোকে কাব্যনাটকাদি পাঠ করিয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্ম শিক্ষা করে। কিন্তু সে শিক্ষা তাদৃশ ফলবতী হয় না। তাহার সাক্ষ্য, গ্রীশদেশে জগৎ-বিখ্যাত হোমারও বাল্মীকির ন্যায় মহাকাব্য ইলিয়াড রচনা করিয়াছেন। কিন্তু বল দেখি, কয়জন লোক ইলিয়াড পাঠে যথার্থ উপকার বোধ করে? ইলিয়াড কাব্যবিশেষ; কাব্যপাঠে যে উপকার পাওয়া যায়, ইলিয়াডপাঠে সকলের তাহাই ঘটে। কিন্তু রামায়ণ আমাদের এক প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্র এবং সমাজের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই ইহা পাঠ করিয়া ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতেছে। যদি শাস্ত্রকারেরা রামচন্দ্রকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া আমাদের পূজ্য না করিতেন, রামায়ণের এতাদৃশ গৌরব বৃদ্ধি হইত না এবং হিন্দুসমাজও এতকাল ইহা পাঠ করিয়া এতদূর উপকার পাইত না।

রামায়ণের যে কি মহৎ গুণ, নিম্নলিখিত কবিতাপাঠে তাহা বুঝিতে পারিবেন—

রামসম সত্যবান ন্যায়বান নরে
লক্ষ্মণ ভরত সম অনুজ নিকরে।
সীতাসম সতীতে হইয়া সুগঠিত
ভারতের প্রতিগৃহ হউক শোভিত।
(শিশুরঞ্জন রামায়ণ)

শ্রীকৃষ্ণাবতার।

প্রথম অংশ।

কৃষ্ণাবতার সম্বন্ধে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন মতামত।

শ্রীকৃষ্ণের নাম উত্থাপন করিবামাত্র কেহ কেহ নাসিকা সঙ্কুচিত করিয়া বলিবেন, আর ছ্যা! লম্পটশিরোমণি, ধূর্ত্ত, শঠ গোপপুত্রের কথা কেন এই বিংশ শতাব্দীতে উত্থাপন করিতে বসিলে? বহুদিন হইতে চলিল, যে সকল কথা অশ্লীল বলিয়া সুশিক্ষিত সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ অশ্রোতব্য, আজ আবার সে সকল পাপকথা কেন মুখে আনিতেছ? যিনি কৈশোরে ষোড়শ সহস্র গোপিনী লইয়া প্রকাশ্য হাটবাজারে ও কুঞ্জবনে রঙ্গরস ও প্রেমবিহার করেন, যিনি লজ্জার

মাখা খাইয়া উহাদিগকে উলঙ্গ করতঃ মজা দেখেন, যিনি যৌবনে যেখানে পরমা সুন্দরী রমণী দেখিতে পান, তাহাকে হরণ করিয়া বিবাহ করেন, পরিশেষে ষোড়শ সহস্র রাণী ও অষ্টপাটরাণী লইয়া প্রেমলীলা করেন, তাহারই কি পাপকথা শ্রবণ করিয়া কর্ণদ্বয় অপবিত্র করিতে হইবে?

রে অপদার্থ হিন্দুধর্ম্ম! তোমায় শতধিক! যিনি বাল্যকালে কেবল ননীমাখন চুরি করিয়া কাল কাটান, রাখালবেশে গরু চরান, আর বংশী বাজাইয়া কুলস্ত্রী মজান, তিনি হইলেন তোমার পরব্রহ্মের পূর্ণ অবতার! সকল বিষয়ে চাতুর্য্যপ্রকাশ যাহার রাজনীতির মূলমন্ত্র, যাহার হৃদয় কেবল শঠতায় পূর্ণ, তিনি হইলেন তোমার পূর্ণব্রহ্মসনাতন। তোমার কি ঘটে লেশমাত্র বিবেচনা নাই? কি বলিয়া তুমি এমন অধম পুরুষকে পুরুষোত্তম বলিয়া সকলের পূজ্য করিলে? যিনি জরাসন্ধভয়ে মথুরাপুরী ত্যাগ করিয়া গুজরাটের উপকূলে দ্বারকায় গিয়া বাস করেন, যিনি এমন কুরুক্ষেত্র মহাসমরে অর্জ্জুনের সামান্য কোচমানি করেন, তিনি হইলেন তোমার বিবেচনায় ক্ষত্রিয়জাতির আদর্শ পুরুষ। বলিহারি তোমার বিবেচনা?

ওহে উপন্যাসলেখক শাস্ত্রকারগণ! তোমাদের বিদ্যাবুদ্ধিতেও শতধিক! তোমরা কি না গেঁজেলী উপন্যাস রচনা করিয়া জগৎশুদ্ধ লোককে ব্যামোহিত করিয়া গিয়াছ? কে কোথায় শুনেছে এক অপোগণ্ড ছোকরা কিনা একটা পর্ব্বত (গোবর্দ্ধন) উত্তোলন পূর্ব্বক সাত সাত দিন দিবারাত্র হস্তে ধারণ করিয়া রহিল? দেখা যায়, গঞ্জিকার মাত্রা অধিক হইলে এমন অজগবি গপ্ মগজ হইতে বাহির হয়। তোমাদের বিশ্বাস, অসুর না মারিলে কেহ দেবতা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। সেজন্য শৈশবকালেই তোমরা কৃষ্ণকে দিয়া অঘাসুর, বৎসাসুর, বকাসুর প্রভৃতি নানা অসুর বধ করাইয়াছ। এমন ছাই পাঁশ মাথামুণ্ড লিখিয়া কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব প্রতিপাদন করিবার কি প্রয়োজন ছিল? যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের ঘোর বিদ্বেষী, তাঁহারাই এই প্রকারে শাস্ত্র ও শ্রীকৃষ্ণের নিন্দাবাদ করেন। তাঁহাদিগকে এ ধর্ম্মের বিপ্লবপন্থী (Anarchists) জ্ঞান করা উচিত।

সুশিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতর যাহারা মধ্যপন্থী (Noderatists), তাঁহারা মহাভারত, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণাদি নানা গ্রন্থ

পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পাঠ করিয়া সিদ্ধান্ত করেন, মহাভারতের আদ্যস্তরে কৃষ্ণ চরিত যেরূপ দেখা যায়, তাহাতে তাঁহাকে একজন আদর্শধর্ম্মাত্মা, সনাতন ধর্ম্মের প্রধান সংস্কারক, আদর্শবীর, আদর্শধর্ম্মযোদ্ধা, ধর্ম্মরাজ্যস্থাপয়িতা, বেদবেদাঙ্গবিৎ, সদাশয় মিষ্টভাষী, জিতেন্দ্রিয়, ক্ষমাবান ও রাজনীতিজ্ঞ মহা পুরুষ জ্ঞান করা উচিত। যে রাজনীতিজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধি ও মন্ত্রণাবলে পাণ্ডবগণ দুস্তর কুরুক্ষেত্র মহাসমরে জয়লাভ করেন, যাঁহার গুণরাশি ও অদ্ভুত ক্রিয়া-কলাপে মুগ্ধ হইয়া ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণজাতি বহুকাল অশেষ প্রশংসা কীর্ত্তন করিতে থাকেন, তিনি কালবশে মহাভারতের দ্বিতীয় স্তরে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া পূজিত হন। পরিশেষে ইহার তৃতীয় স্তরে আধুনিক মহাভারতে (যাহা পৌরাণিক যুগে পুনরায় লিখিত হয়) তাহাতে তিনি পূর্ণব্রহ্মসনাতন রূপে দেখা দিয়াছেন।

পরবর্ত্তী পুরাণগুলিতে উপরোক্ত যথার্থ কৃষ্ণচরিতের চতুর্দ্দিকে নানা জঞ্জাল, আবর্জ্জনা ও কণ্টক রাশীকৃত হইয়া তাঁহার প্রকৃত গুণরাশিকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিয়াছে। একদিকে নানা অলৌকিক অতিপ্রকৃত ঘটনাবলি বর্ণন করিয়া তাঁহার পূর্ণব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করা হইতেছে, অপরদিকে তাঁহাকে ধূর্ত্ত, কূটরাজনীতিজ্ঞ ও পারদারিক বলিয়া হাস্যাস্পদ করাও হইতেছে। মধ্যপন্থীগণ বলেন, ভাগবতোক্ত শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলাদি কাব্যজগতে অতুলনীয় হইলেও উহারা কৃষ্ণচরিতের আবর্জ্জনামাত্র। পৌরাণিক যুগে ধর্ম্মের অবনতির সঙ্গে সকলে আদর্শমানব শ্রীকৃষ্ণের গুণরাশি ভুলিয়া গিয়া গোপিনিগণের সহিত তাঁহার রাসলীলা ও প্রেমলীলা, উহাদের বস্ত্রহরণ প্রভৃতি অশ্লীল ঘটনাবলী বর্ণন করিয়া জাতীয় চরিত্র কলুষিত করিতে করিতে সমাজের অধঃপতন আনয়ন করিয়াছে।

কেহ কেহ বলেন, যে মথুরানগরী বৌদ্ধধর্ম্মের এক প্রধান কেন্দ্র ছিল, তথায় ঐ ধর্ম্মকে পরাস্ত করিবার জন্য উত্তরকালে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলাদি মানবমনের অশেষ প্রীতিকর ঘটনাবলী বর্ণিত হইয়াছে। যেমন কাশীতে শৈবধর্ম্ম প্রবল হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মকে পরাস্ত করে, সেইরূপ বৈষ্ণবধর্ম্ম মথুরায় প্রবল হইয়া ঐ ধর্ম্মকে নির্ম্মূল করে। তাঁহারা বলেন, ব্রজলীলা বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় সর্ব্বৈব কাল্পনিক। বৃন্দাবনে শ্রীরাধাও জন্মগ্রহণ করেন নাই, ষোড়শ সহস্র গোপিনীও

শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে আসক্ত হয় নাই। এ সকল কবির কল্পনা মাত্র। দেখ, তাহার সাক্ষ্য, মহাভারতে গোপিনিগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা নাই, ভাগবতে শ্রীরাধার কাহিনী নাই, কেবল ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে তাঁহার কাহিনী পূর্ণমাত্রায় পাওয়া যায়।

তাঁহারা আরও বলেন, শাস্ত্রকারেরা শ্রীকৃষ্ণকে দিয়া অল্পবয়সে যে সকল অসুর নিধন করান ও অলৌকিক ক্রিয়া দেখান, তাহা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নহে। এজন্য কৃষ্ণচরিত্রের অধিকাংশ ভাগ কাল্পনিক উপাখ্যানে পূর্ণ। তথাচ এত জঞ্জাল ও আবর্জ্জনীর মধ্যে তাঁহার জীবনচরিত আমাদের নিকট অত্যুজ্জ্বল ভাবে প্রকাশ পাইতেছে। যিনি গীতারূপ সমুজ্জ্বল রত্নখনি খনন করিয়া যান, তিনি পাশ্চাত্য জগতের ঈশা অপেক্ষা, প্রাচ্য জগতের বুদ্ধদেব অপেক্ষা আমাদের নিকট অধিক পূজনীয়, এমন কি ঈশ্বরের প্রধান অবতার বলিয়া সকলের পূজা করা উচিত।

সাধারণ হিন্দুসমাজের বিশ্বাস, শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্মসনাতন, তিনিই পরমেশ্বর এবং তিনিই নারায়ণ। ভক্তবৃন্দের উদ্ধারার্থে ভক্তবৎসল শ্রীহরি গোলকধাম ত্যাগ করিয়া মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ হন এবং মথুরা ও বৃন্দাবনে তাঁহার অপূর্ব্ব প্রেমলীলা দেখান। তিনি আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মের পূর্ণ আনন্দরূপ; এজন্য তাঁহার প্রত্যেক লীলায় হাসির এমন গটুরা পাড়িয়া যায়। শাস্ত্রে তাঁহার ক্রিয়াকলাপ যেরূপভাবে বর্ণিত আছে, সকলে উহাদিগকে অন্ধবিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করে এবং কোন বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ করে না।

যিনি নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব, খোলে চাঁটি পড়িলেই তিনি দুবাহু তুলিয়া নাচিতে থাকেন এবং সদা শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে গলেই আছেন। হরিসঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে বা শুনিতে শুনিতে তাঁহার ক্ষুধা তৃষ্ণা কোথায় চলিয়া যায়। তিনি মুখে সদা হরি! হরি! বলিতে বলিতে দিন কাটান। সেই নাম তাঁহার একমাত্র ধ্যান, সেই নাম তাঁহার একমাত্র মন্ত্র, সেই নাম তিনি সদা মালায় জপেন এবং তাঁহারই সুমধুর লীলা পাঠ ও শ্রবণ করিতে করিতে সদা পরমানন্দে উৎফুল্ল থাকেন।

যখন রাধাবিনোদিনী শ্রীকৃষ্ণবিরহে মনের অশেষ খেদ প্রকাশ করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণবিরহে তাঁহারও চক্ষে জল আসিতে থাকে এবং দীর্ঘনিশ্বাস পতিত হইতে থাকে। যখন তিনি গোপিনিগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা

দেখেন, তখন তিনিও ভগবানের প্রতি প্রেমরসে মগ্ন হইয়া হাসিতে ও নাচিতে থাকেন। যখন যশোদামাতা নীলমণির জন্ত কাঁদেন, তিনিও সেই সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের জন্ত কেঁদে ভাসান। যখন বালসুহৃদ সুদাম শ্রীকৃষ্ণবিরহে ক্রন্দন করিতে থাকে, তিনিও সেই সঙ্গে দীনবন্ধুর বিরহে কাঁদিতে থাকেন। এই প্রকারে যিনি পূর্ণব্রহ্মসনাতন, তাঁহাকে অহরহঃ জীবনের সাথের সাথী করিয়া তিনি শ্রীহরির তন্ময়ত্ব লাভ করিতে চেষ্টা পান। এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণরূপ ভগবানের প্রেমাবতারের পূর্ণ আস্বাদ ও মজা তিনিই ইহজীবনে পূর্ণমাত্রায় ভোগ করেন; অপরে কেবল এরণ্ড ভাজেন।

কৃষ্ণলীলা কিরূপ?

কৃষ্ণলীলা বুঝা ভার। আমরা কি সংসারে সেই মহাচক্রীর চক্র বুঝিতে পারি? তবে কি প্রকারে তাঁহার পূর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণের লীলার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিব? দেখ, এ সংসার ধর্ম্মাত্মা ও পাপাত্মা, পণ্ডিত ও মূর্খ ধনবান ও দরিদ্র নানাবিধ লোকে পূর্ণ। সকলকে লইয়া ভগবান কি খেলা খেলিতেছেন, একজনের কর্ম্মদণ্ড অপরের দ্বারা কি প্রকারে দিতেছেন, তাহা কি বুঝিতে পারা যায়? তাঁহার অঘটনঘটনপটীয়সী মায়া সংসারে কিরূপে খেলিতেছে, তাহা কি বুঝিতে পারা যায়? তাঁহার প্রকৃতির ত্রিগুণ চতুর্দ্দিকে যে অনন্ত কেলি দেখাইতেছে, তাহা কি বুঝিতে পারা যায়? যে সাধারণ নিয়মতন্ত্রের অধীন হইয়া সংসারচক্র চলিতেছে, ফিরিতেছে ও ঘুরিতেছে, তাহা কি ভালরূপ বুঝিতে পারা যায়? সেইরূপ পূর্ণব্রহ্মসনাতন শ্রীকৃষ্ণের লীলার অন্ত পাওয়া যায় না।

দেখ, তিনি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, অথচ তাঁহার ভুবনমোহন রূপে সমগ্র জগৎ আলোকিত ও বিভাসিত, যে দেখে, সেই ভুলে! সংসারে অমঙ্গলরাশি দেখাইবার জন্ত তাঁহার রূপ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ; কিন্তু সংসারের যাবতীয় অমঙ্গল একমাত্র মঙ্গলে পরিণত; এজন্য সেই কৃষ্ণবর্ণের সহিত অলৌকিক মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্য মিশ্রিত। তিনি পরভৃৎ কোকিলের ন্যায় পরান্নে পালিত এবং উহার ন্যায় কলকণ্ঠ; তাঁহার সুমধুর বংশীধ্বনিতে স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ বিমোহিত, যেমন ভগবানের মধুর নামে নিখিল সংসার চিরদিন বিমুগ্ধ। যতদিন তিনি শ্রীবৃন্দাবনে ছিলেন, ততদিন তত্রত্য আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকে নিজ

মায়ায় ভুলাইলেন ও নাচাইলেন; আবার যখন মথুরায় গেলেন, তখন সকলকে চিরদিনের জন্ম কাঁদাইলেন, অথচ অল্লাধিক দূরে থাকিয়াও কাহারও প্রতি একবারও উঁকি মারিলেন না, এই বা তাঁহার কিরূপ লীলা?

যিনি গীতার ন্যায় সংসারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্মোপদেশ দেন, তিনি কিনা কৈশোরে অসংখ্য নারী লইয়া রঙ্গরস ও প্রেমবিহার করেন, এই বা তাঁহার কিরূপ লীলা? যিনি মানবারি কংস, জরাসন্ধ, শিশুপালাদি বধ করিয়া ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করেন, তিনি আবার কুরুক্ষেত্র মহাসমরে কুপরামর্শ দিয়া ধার্ম্মিকবর ভীষ্ম দ্রোণাদির প্রাণবধ করান, এই বা তাঁহার কিরূপ লীলা? যিনি অসংখ্য সন্তান উৎপাদন করত যদুবংশ বর্দ্ধন করেন, তিনিই আবার স্বজীবনে সকলকে নাশ করাইয়া স্বয়ং ব্যাধবাণে নিহত হন, এইবা তাঁহার কেমন লীলা।

কৃষ্ণলীলার অন্ত পাওয়া ভার। তদীয় জীবনে ত্রিগুণের অনন্ত লীলা ও নবরসের পূর্ণ অভিনয় দেখা যায়; এজন্য তিনি পরদারিক হইয়াও ধার্ম্মিকবর, মহাবীর হইয়াও জরাসন্ধ ভয়ে ভীত এবং কূটরাজনীতিজ্ঞ হইয়াও পরহিতৈষী ও পরম ন্যায়বান। তিনি হৃদয়ের নানা রসের পূর্ণ অভিনায়ক; এজন্য বাল্যে তিনি ননীচোর ও ডানপিটে, কৈশোরে গোপিনিগণের সহিত প্রেমোন্মত্ত ও কেলিপরায়ণ এবং যৌবনে বহুদারপরিনেতা ও ধার্ম্মিক। তাই বলি, তাঁহার অনন্ত লীলা বুঝা ভার।

কৃষ্ণচরিত কি কাল্পনিক?

সত্য বটে, আমাদের সুশিক্ষিত বান্ধবগণ কৃষ্ণচরিতে নানা অলৌকিক ও অতিপ্রকৃত ঘটনাবলি দেখিয়া উহাতে অবিশ্বাস করিবেন; কিন্তু নৈষ্ঠিক হিন্দুর নিকট যোগেশ্বর শ্রীহরির সকল ক্রিয়াকলাপ সম্ভব; তিনি কোনটীতে অবিশ্বাস করিবেন না। কৃষ্ণচরিত কাল্পনিক হউক বা অকাল্পনিক হউক, ইহা হিন্দুজাতির জাতীয় হৃদয়ে স্তরে ২ রচিত হইয়াছে। সাধারণ হিন্দুসমাজে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেম ও ভক্তি যে ভাবে বিকসিত হইতে থাকে, কৃষ্ণচরিতও ভিন্ন ২ শাস্ত্রে সেই ভাবে ক্রমবিকসিত ও ক্রমস্ফুরিত হইয়াছে। এজন্য ঐ সকল শাস্ত্রে ইহার ভিন্ন ২ স্তর দেখা যায়।

তাহার সাক্ষ্য, মহাভারতের অভ্যন্তরে কৃষ্ণচরিত্র যেরূপ, ইহার দ্বিতীয় স্তরে তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ পৃথক, পরিশেষে ইহার তৃতীয় স্তরে আরও অধিক পৃথক। মহাভারতে যেরূপ, ভাগবতে তাহা হইতে পৃথক এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে তাহা হইতে আরও অধিক পৃথক। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণকার ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপিনিগণের রাসলীলা দেখিয়া তৃপ্ত হন নাই। তিনি শ্রীরাধার কাহিনী উদ্ভাবন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রেম আরও অধিক বর্ণন করিলেন ও সমাজকে আরও প্রেমোৎফুল্ল করিয়া যান। যে ধর্ম্ম প্রকৃতির অকৃত্রিম ধর্ম্ম, সে ধর্ম্ম নিজ উপাস্য দেবতার মূর্ত্তি এই প্রকারে স্তরে স্তরে রচিত করিয়া থাকে। যেমন প্রতিমা প্রথমে একমেটে, পরে দোমেটে, তার পর খড়ি ও বঙ দেওয়া হয়, পরিশেষে সাজান হয়, সেইরূপ কৃষ্ণচরিত্রও সমাজের জ্ঞানোন্নতি ও ধর্ম্মোন্নতির সহিত কালবশে ক্রমস্ফুরিত হইয়াছে। হিন্দুসমাজের এমন দিন গিয়াছে, যে সময় শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা ও রাধার মানভঞ্জন কেহ জানিত না।

মনে কর, কৃষ্ণচরিতের ব্রজলীলা অংশটী কাল্পনিক, তাহাতেই বা হিন্দু-সমাজের কি ক্ষতি? কাল্পনিক হউক বা অকাল্পনিক হউক, যখন সাধারণ হিন্দুসমাজ এতকাল ইহাকে অপার ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে এবং ইহার অনুশীলন করিয়া প্রেমানন্দে ও ব্রহ্মানন্দে উৎফুল্ল হইতেছে, তখন ইহা কাল্পনিক হইলেও সকলের নিকট আপ্তবাক্য স্বরূপ প্রকৃত অকাল্পনিক বা মহাসত্য। ওহে সুশিক্ষিত বান্ধবগণ! তবে কেন তোমরা ব্রজলীলাকে কাল্পনিক বলিয়া সমগ্র হিন্দুসমাজের সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইতেছ? পাশ্চাত্য শিক্ষার যে কালানলে তোমাদের কালামুখ পুড়িতেছে, সেই কালানলে কি সমস্ত দেশ ছারখার করিতে চাহ?

আরও দেখ, যাহা কোন বিষয়ের পূর্ণ আদর্শ (Ideal Perfection) তাহা বাস্তব জগতে নয়নগোচর হয় না। সকল দেশে প্রকৃতির মহাকবিগণ কল্পনাজগৎ হইতে তাহা গ্রহণ করিয়া সকলের সমক্ষে ধারণ করেন। তাঁহারা কাব্যনাটকাদি রচনা করিয়া ভাবাদি বিষয়ে সকলকে যাহা শিক্ষা দেন, তাহাও তাঁহারা কল্পনাজগৎ হইতে গ্রহণ করেন। সেইরূপ এ দেশে ধর্ম্মাত্মা কবি-গণ কল্পনাজগৎ হইতে ব্রজলীলা বর্ণন করিয়া প্রেমধর্ম্মের পূর্ণ আদর্শ

আমাদিগকে দেখাইয়াছেন। তবে কেন ইহাকে কাল্পনিক বলিয়া দেশের সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছ ?

সয়তানের সহিত ঈশ্বরের মহাযুদ্ধ কাল্পনিক হইলেও খৃষ্টজগতে যেমন মহাসত্য, শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলাও হিন্দুজগতে আমাদের নিকট তেমনি মহাসত্য। অন্যান্য দেশে যে সকল কাব্যনাটকাদি রচিত হইয়া ভাববিষয়ে লোকবর্গকে কথঞ্চিৎ শিক্ষা দেওয়া হয়, সে সকল পুস্তক তথাকার জ্ঞানজগতের অমূল্য নিধি; সেইরূপ এ দেশে যে সকল পুরাণাদি গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলাদি বর্ণন করিয়া ভাববিষয়ে আমাদিগকে ভালরূপ শিক্ষা দেয়, সে সকল আমাদের ধর্ম্মজগতের অমূল্য নিধি। অতএব যে ব্রজলীলাদি পাঠ করিয়া হিন্দুসমাজ এতকাল আনন্দে উৎফুল্ল ও শোকে বিহ্বল হইয়া ভাব শিক্ষা করিতেছে, সমাজের অশেষ মঙ্গল ভাবিয়া উহাকে কাল্পনিক বলা। সর্ব্বথা অনুচিত। এখন একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, যদি ব্রজলীলা কাল্পনিক বলিয়া উহাকে ভাগবত হইতে উঠাইয়া দেওয়া হয় এবং কৃষ্ণবিষয়ক সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন কালে সমাজে রহিত হইয়া যায়, সমগ্র ভারতের কিরূপ সর্ব্বনাশ ঘটিবে ? সে সর্ব্বনাশের সহিত তুলনা করিলে দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ ও কনৌজাধিপতি জয়চন্দ্র পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হইয়া ভারতকে যবনমুখে প্রক্ষেপ করাতে ইহার যেরূপ অনিষ্ট সাধন করিয়াছিলেন, তাহা অতি তুচ্ছ বোধ হইবে।

যে সকল অলৌকিক ও অতিপ্রকৃত ঘটনা উল্লেখ করিয়া শাস্ত্রকারেরা শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন, সুশিক্ষিত সম্প্রদায় উহাদিগকে কৃষ্ণচরিতের জঞ্জালস্বরূপ জ্ঞান করেন ও কাল্পনিক বলিয়া উড়ান। তাঁহারা কি কোথাও শুনেন্ নাই, সংসারে যোগবলে অসাধ্য সাধন হইতে পারে ? যাঁহারা যোগসিদ্ধ ও যোগেশ্বর, তাঁহাদের নিকট সকলই সম্ভব। যদি যোগবল অস্বীকার করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে তোমার আমার ন্যায় সাধারণ মানব জ্ঞান কর, তাঁহার প্রতি তোমার এতদূর আন্তরিক বিশ্বাস ও ভক্তি হইবে কেন ? তিনি কি তোমার পূর্ণ আদর্শ হইবেন ? জনসাধারণের স্বভাব এই, যে স্থলে কিছু অলৌকিকত্ব ও অসাধারণত্ব দেখে, সেই স্থলেই সকলে পদানত হইয়া মস্তক অবনত করে। সেজন্য স্মরণ রাখা উচিত, সাধারণ সমাজের মঙ্গলার্থে শাস্ত্র-

কারেরা পূর্ণব্রহ্মসনাতন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও ভক্তি উদ্রেক করাইবার জন্য ঐ সকল অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ উল্লেখ করিয়াছেন।

জগতের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে বুঝা যায়, শ্রীরাম বল, শ্রীকৃষ্ণ বল, বুদ্ধদেব বল, ঈশাদেব বল, সকলের উপর অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ আরোপ করা হইয়াছে। এরূপ না করিলে, জনসাধারণ কেমন করিয়া তাঁহাদিগকে ঈশ্বরের রূপ বা প্রতিনিধি জ্ঞান করিতে পারে? দেখ বাইবেল মতে ঈশা কত অন্ধ ও খঞ্জ আরোগ্য করেন, গ্যালিলিও হ্রদের উপর দিয়া চলিয়া যান ও তথাকার ঝটিকা শান্ত করেন। সেইরূপ হিন্দুশাস্ত্রমতে শ্রীকৃষ্ণও গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করেন, কালিয় দমন করেন, কুব্জাকে পরমাসুন্দরী করেন, ইত্যাদি। এস্থলে আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, যিনি যোগেশ্বর, যাহার তৃতীয় নয়ন অধিক স্ফুরিত বলিয়া যোগবল সহজাত, তিনি সংসারে অসাধ্য সাধন করিতে পারেন। তবে কেন তোমরা শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপে অবিশ্বাস করিতেছ? কাল্পনিক হউক, অতিরঞ্জিত হউক, ধর্ম্মের খাতিরে, শাস্ত্রের খাতিরে উহাদিগকে অন্ধ বিশ্বাসের সহিত মানা উচিত। না মান, তোমরা হিন্দুসমাজের অমঙ্গল সাধন করিবে।

কৃষ্ণাবতারের গূঢ় উদ্দেশ্য কি?

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে কৃষ্ণাবতারের গূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা এক কুসংস্কারের দোহাই দিয়া সকলই উড়ান। অধিক আর কি বলিব, হিন্দুধর্ম্মের যে স্থলটী তাঁহারা অতীব অশ্লীল মনে করিতেছেন, সেই স্থলেই ইহার সর্ব্বোচ্চ স্বর্গীয় ভাব ও চরমোৎকর্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে। এক কৃষ্ণাবতার কল্পনা করিয়াই হিন্দুধর্ম্ম পার্থিব হইলেও যথার্থ স্বর্গীয় ধর্ম্ম এবং সকল ধর্ম্মের মধ্যে একমাত্র শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

দেখ ঈশ্বরের উপাসনা সম্বন্ধে নানা মুনির নানামত। কেহ বলেন, ইহা একান্ত আবশ্যক; কেহ বলেন, ইহার কোনরূপ আবশ্যকতা নাই। কিন্তু ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত, প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইলে, মনের বিবিধ সাত্ত্বিক ভাবের স্ফূর্ত্তি করা একান্ত আবশ্যক। ঈশ্বরের মৌখিক উপাসনা দ্বারা মনের বিবিধ সাত্ত্বিক ভাবের স্ফূর্ত্তি হয় না। এজন্য একেশ্বরবাদিগণ কাব্য-

নাটকাদি পাঠ করিয়া ভাবশিক্ষা করিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয়, ইহাতে তাঁহাদের ভাবশিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকে। অপর পক্ষে হিন্দুধর্ম্ম ভালরূপ ভাবশিক্ষা দিয়া স্বসেবকবর্গকে ভাবপ্রধান করিতে সাধ্যমত চেষ্টা পায়। ভাব শিক্ষার জন্য এক পূর্ণ আদর্শ (Ideal Perfection) আবশ্যক। এ স্থলে শাস্ত্রকারেরা সকল রসের রসিক ও সকল ভাবের পূর্ণ অভিনায়ক শ্রীকৃষ্ণকে আমাদের প্রধান আদর্শ দেখাইতেছেন। তাঁহার লীলা পাঠ করিয়া ভাববিষয়ে আমাদের পূর্ণ শিক্ষা হইতেছে। হিন্দুর মত ভাবপ্রধান জাতি জগতে আর দ্বিতীয় নাই বলিলেই হয়।

অতএব স্থির নিশ্চয় জানিবে, মানবমনের প্রকৃত উৎকর্ষ সাধনের জন্য, ইহার সর্ব্ববিধ সাত্ত্বিক ভাবের সম্যক স্ফূর্ত্তির জন্য, ইহাকে পরাভক্তি ও পরাপ্রীতি শিক্ষা দিয়া ব্রহ্মানন্দে উৎফুল্ল করিবার জন্য সনাতন হিন্দুধর্ম্ম আমাদিগকে শ্রীকৃষ্ণাবতার দেখায়। ইহার জন্য শ্রীকৃষ্ণ আমাদের নিকট পরব্রহ্মের পূর্ণ অবতার বা পূর্ণব্রহ্মসনাতন। কোন দেশের কোন ধর্ম্ম কোন কালে ঈশ্বরের এমন আনন্দময়, প্রেমময় ও ভক্তবৎসল রূপ কল্পনা করিতে পারে নাই। এক কৃষ্ণাবতার দেখাইয়া এ ধর্ম্ম স্বসমাজকে এতকাল ব্রহ্মানন্দে ও প্রেমানন্দে উৎফুল্ল করিতেছে। ইহাতে যেমন একদিকে পূর্ণ আনন্দের লহরী উঠিতেছে, তেমনি অপর দিকে শোকের উচ্ছাস ও দুঃখের দীর্ঘনিশ্বাস বহিতেছে।

রামাবতারে হিন্দুধর্ম্ম আমাদিগকে যেরূপ কাঁদায়, কৃষ্ণাবতারে ইহা তেমনি হাসায়। প্রথমোক্তে ইহা যেমন হৃদয়ের শোকসাগর উথলিয়া দেয়, শেষোক্তে ইহা তেমনি প্রেমসাগরে ও হর্ষসাগরে নাচায়। প্রথমোক্তে ইহা যেমন গাহস্থ্য ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা শিক্ষা দেয়, শেষোক্তে ইহা তেমনি ভক্তি ও প্রেমের ফোয়ারা ছুটায়। প্রথমোক্তে ইহা যেমন কাঁদাইতে কাঁদাইতে ধর্ম্মপথে লইয়া যায়, শেষোক্তে ইহা তেমনি হাসাইতে হাসাইতে ধর্ম্মপথের সুপথিক করিয়া দেয়।

কৃষ্ণাবতারে হিন্দুধর্ম্ম আমাদিগকে যাহা শিখায়, তাহা অন্যান্য ধর্ম্ম আদৌ জানে না, বুঝে না বা ঘুণাক্ষরেও ভাবে না। এই দুঃখের ভবসংসারে মানবকে ভগবানের প্রেমে উন্মত্ত করাইয়া তাঁহাকে চিরদিন হাসাইব ও তাঁহার অশেষ

শোকদুঃখ নাশ করিব অথচ তাঁহার মনে ভগবানের উপর পরপ্রেম ও পরাভক্তি স্ফুরণ করতঃ তাঁহাকে যথার্থ ধর্ম্মপথের সুপথিক করিব, ইহাই কৃষ্ণাবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য। যে অপার ভক্তিযোগ দ্বারা ধর্ম্মাত্মা হিন্দু ভক্তবৎসল হরির তন্ময়ত্ব লাভের অভিলাষী, তাঁহার প্রতি যে অনন্য ভক্তি দ্বারা তিনি নিজ আত্মা ও মনের উন্নতিসাধনে একান্ত ব্যগ্র, তাহাই কৃষ্ণাবতারে ভালরূপ দেখান হইয়াছে।

মনের বিবিধ সাত্ত্বিক ভাবের স্ফূর্ত্তি করাই মানবধর্ম্মের এক প্রধান উদ্দেশ্য। ভক্তি, বাৎসল্য, প্রেম, দাস্য,সখ্য প্রভৃতি যতগুলি সাত্ত্বিকভাব হৃদয়ে সদা উত্থিত হইতেছে, উহাদের স্ফূর্ত্তির জন্য এক পূর্ণ আদর্শ আবশ্যক। এস্থলে ঈশ্বরকে পূর্ণ আদর্শ করা উচিত এবং তাঁহার শ্রীচরণকমলের অনুগ্রহে উহাদের সম্যক অনুশীলন করিতে করিতে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হওয়া উচিত। এখন ঐ সকল সাত্ত্বিক ভাবের সম্যক স্ফূর্ত্তির জন্য তোমার শ্রেষ্ঠ হিন্দুধর্ম্ম তোমায় শ্রীকৃষ্ণরূপ ভগবানের প্রেমাবতার দেখায় এবং তাঁহার অপার প্রেমলীলা, রাসলীলা ও ক্রিয়াকলাপ কবিদিগের সুললিত কণ্ঠে গান করাইয়া তোমার কর্ণকুহরে অমৃত সিঞ্চন করায়। শ্রীকৃষ্ণের এক ব্রজলীলায় মনের বিবিধ সাত্ত্বিক ভাবের পূর্ণ অভিনয় দেখা যায়। যাঁহারা কেবল নিরাকার ঈশ্বর ভজনা করেন, তাঁহারা কি এ ধর্ম্মের এই স্বর্গীয় ভাব, এই মহোচ্চ ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন?

কলিযুগে শিশ্নোদরপরায়ণ মানব পুত্রকলত্রাদি অনিত্য বস্তু লইয়া সদা বিব্রত। তজ্জন্য কখন বা তিনি সুখসাগরে ভাসেন, কখন বা দুঃখসাগরে নিমগ্ন হন। সেই কলিকলুষিত মানব যাহাতে ঈশ্বরের মধুর নামে কেবল অপার আনন্দে উৎফুল্ল হইবেন এবং যাহাতে হৃদয়ের মাধুর্য্যাদি রস সেই মধুর নামে উথলিয়া উঠিবে, তজ্জন্য এ ধর্ম্ম তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণরূপ ভগবানের প্রেমাবতার দেখায়। এই শ্রীকৃষ্ণের নামে তিনি আজ দুবাহু তুলিয়া ব্রহ্মানন্দে নৃত্য করিতেছেন। এই শ্রীহরির নামে তাঁহার হৃদয়ের মাধুর্য্যাদি রস শতসহস্রধারে উথলিয়া পড়িতেছে।

রে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম! ধন্য তোমার উপদেশ! ধন্য তোমার ব্যবস্থা! তুমি আজ আমাদিগকে হরির মধুর নামে যে ভাবে হাসাও ও কাঁদাও, এমন কোন্ ধর্ম্ম এ জগতে হাসাইতে ও কাঁদাইতে পারে, বল? তুমি আমাদিগকে

ঈশ্বরের প্রতি যেরূপ অনন্ত ভক্তি প্রদর্শন করিতে শিখাও, এমন কোন্ ধর্ম্ম এ জগতে শিখায়, বল? দেখ, হৃদয়ের যে স্বাভাবিক প্রেম স্ত্রীসম্ভোগাদি অশ্লীল কর্ম্মে প্রযুক্ত হওয়ায়, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির মধ্যে পরিগণিত, সেই নিকৃষ্ট প্রেমকে তুমি ভগবানে অর্পণ করাইয়া উহার কিরূপ অপূর্ব্ব স্বর্গীয় ভাব স্ফুরণ কর এবং সকলের অপরিহার্য্য ও দুষ্পূরণীয় প্রেমপিপাসাকে ভগবানের নামে তৃপ্ত করাইয়া উহাদিগকে কিরূপ ধর্ম্মপথের পথিক কর! হৃদয়ের যে বাৎসল্যভাব সাধারণতঃ সন্তানদিগের লালন পালনে প্রযুক্ত হয়, সেই বাৎসল্যভাব ভগবানে অর্পণ করাইয়া তুমি আমাদিগকে তাঁহার কিরূপ সেবা করিতে শিক্ষা দেও?

ঐহিক বস্তুমাত্রেই ভালমন্দে মিশ্রিত ও সুখদুঃখে জড়িত। প্রেম ও বাৎসল্য ঐহিক পদার্থে অর্পিত হইলে উহারা ক্রমশঃ কলুষিত হইয়া পড়ে এবং আমাদিগকে সুখদুঃখের ভাগী করে। কিন্তু ঐ সকল ভাব ঈশ্বরে অর্পিত হইলে উহারা স্বর্গীয় ভাব ধারণ করে এবং আমাদিগকে অপার ব্রহ্মানন্দে নৃত্য করায়। এজন্য হিন্দুধর্ম্ম আমাদিগকে ঈশ্বরের নামে হরির প্রেমে উন্মত্ত করায় এবং বাৎসল্য ভাবে তাঁহার সেবা করিতে উপদেশ দেয়।

পৌরাণিক যুগে অর্দ্ধভূমণ্ডলবিস্তৃত নীতিপ্রধান বৌদ্ধধর্ম্মকে পরাস্ত করিবার জন্য হিন্দুসমাজে প্রথম শৈবধর্ম্ম, তৎপরে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রবল হয়। শৈবধর্ম্ম দ্বারা আমরা শিবশঙ্করকে পিতাস্বরূপ ও তদীয় অর্দ্ধাঙ্গিনী দুর্গাকে জগন্মাতা-স্বরূপ জ্ঞান করিয়া অপার ভক্তিভাবে আরাধনা করি। ইহাতে এক ভক্তি ব্যতীত মনের অন্যান্য সাত্ত্বিক ভাবের আদৌ স্ফূর্ত্তি হয় নাই। ইহাদের সম্যক স্ফূর্ত্তির জন্য কালক্রমে সত্ত্বপ্রধান বিষ্ণুর পূজা হিন্দুসমাজে প্রবর্ত্তিত হয়। এই বৈষ্ণবধর্ম্ম দ্বারা সমগ্র হিন্দুসমাজ বিবিধ সাত্ত্বিক ভাবে গদগদ হইয়া হরির পূজা করিতেছে।

পিতামাতাকে আমরা যে ভাবে ভক্তি করি, তাহাতে আমাদের ভক্তি যতই কেন প্রগাঢ় ও আন্তরিক হউক না, মনের ভিতর অনেক সঙ্কোচ ও দ্বিধা থাকে এবং মনও তাদৃশ আনন্দে উৎফুল্ল হয় না। কিন্তু সতী সাধ্বী নারী নিজ প্রাণপতির প্রতি যে ভালবাসা দেখান, তাহা এ জগতে অতুলনীয়, তাহা অনন্ত প্রেম, তাহা অনন্তভক্তিমিশ্রিত, তাহাতে হৃদয়ের কোনরূপ সঙ্কোচ নাই, দ্বিধা নাই, লজ্জা নাই, কোনরূপ কুটিলতা নাই। সতী সাধ্বী

স্বামীর উপর নিজের মন, প্রাণ ও দেহ, এমন কি যথাসর্ব্বস্ব ঢালিয়া দেন। সেই পরপ্রেম দ্বারা তিনি স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী হন এবং সহজে তন্ময়ত্ব লাভ করেন। এজন্য অতি সহজ উপায়ে ঈশ্বরের তন্ময়ত্ব লাভ করিবার জন্ত, তাঁহার প্রতি অনন্ত ভক্তি ও প্রেম প্রদর্শন করিবার জন্য তোমার শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম তোমায় শ্রীকৃষ্ণরূপ ভগবানের প্রেমাবতার দেখাইতেছে।

যদি তুমি জগৎপিতা জগদীশ্বরকে কেবল পিতৃভাবে অপার ভক্তির সহিত আরাধনা কর, তোমার ধর্ম্মানুষ্ঠান হইবে, এবং তুমিও ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইবে সত্য; কিন্তু তোমার মন ফাঁকা ফাঁকা থাকিবে। তুমি যতই কেন ঈশ্বরকে ভক্তি কর না, তোমার মন অকৃতার্থ হইবে। কিন্তু যদি তুমি জগন্নাথ ঈশ্বরকে পতিস্বরূপ জ্ঞান করিয়া দিবারাত্র তাঁহার ধ্যান ও অনুচিন্তন কর এবং শাস্ত্রোক্ত তাঁহার অনন্ত প্রেমলীলাদি পাঠ ও শ্রবণ করিয়া হৃদয়ের সমস্ত প্রেম ও ভক্তি তাঁহার উপর ঢালিয়া দেও, তুমি প্রকৃত ব্রহ্মানন্দে উৎফুল্ল হইবে এবং তাঁহাকে প্রেমডোরে বাঁধিয়া পতিভাবে পাইবে। এজন্য ভাগবতাদি পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলা এমন সুললিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এখন বুঝিয়া দেখ, কৃষ্ণাবতারের মূল উদ্দেশ্য কি?

ব্রজলীলা কৃষ্ণচরিতের কি আবর্জ্জনী?

আজকাল কাহারও কাহারও মুখে এই অপরূপ কথা শুনিতে পাই। তাঁহারা ইহার মহোচ্চ ভাব বুঝিতে না পারিয়া এইরূপে ইহার নিন্দাবাদ করিয়া থাকেন। কিন্তু বিশেষ অনুধাবন করিলে বুঝা যায়, ইহাই কৃষ্ণচরিতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অংশ এবং ভাবশিক্ষা বিষয়ে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা সিদ্ধিপ্রদ।

কৃষ্ণভক্ত কবিগণ সুললিত কণ্ঠে ও বিবিধ তাল মানে ব্রজলীলা গান করিয়া ধর্ম্মাত্মা হিন্দুর হৃদয়াভ্যন্তরে যে মধুর শ্রীবৃন্দাবন স্থাপন করিয়াছেন, উহার কদম্ব মূলে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি সদা নৃত্য করিতেছে, সাধক ও সেই সঙ্গে তালে তালে নৃত্য করিতেছেন। বংশীধরের সুমধুর বংশীধ্বনি শুনিয়া সাধকও শ্রীরাধার ন্যায়, গোপিনিগণের ন্যায় কুলমান ত্যাগ করিয়া উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছেন। এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণরূপ ভগবানের প্রেমাবতারের অপার প্রেমে আমরা চিরদিন উন্মত্ত ও বিহ্বল। এখন যে ব্রজলীলা আমাদিগকে এরূপ উন্মত্ত করে, তাহা কি কৃষ্ণচরিত্রের আবর্জ্জনী, না মণিমুক্তা?

নন্দালয়ে শ্রীকৃষ্ণ শৈশবে ও বাল্যে যে খেলা খেলেছেন, তাহা ভারতের ঘরে ঘরে চিরদিন হিন্দুশিশু ও বালকগণ খেলিতেছে। নন্দের গোষ্ঠে গোষ্ঠ বেহারী গাভী চরাইতে চরাইতে যে খেলা খেলেচেন, ভারতের গোষ্ঠে রাখাল-বালকগণ চিরদিন সেই খেলা খেলিতেছে। নন্দের ব্রজে ব্রজাঙ্গনাগণ ব্রজনাথকে লইয়া যে খেলা খেলেছেন, ভারতের ঘরে ঘরে প্রত্যেক দম্পতি সেই খেলা চিরদিন খেলিতেছে। নন্দের ব্রজে মুরলীধর যে সুমধুর মুরলীধ্বনি করেছেন, তাহা চিরদিন হিন্দুর ঘরে ঘরে ও মন্দিরে মন্দিরে বাজিতেছে। এই সুমধুর বংশীধ্বনি শুনে কেহ স্থির থাকিতে পারেন না, সকলেই আত্মহারা হন। শুনেছি পুরাণে, এই বংশীধ্বনি শুন্‌বার জন্য মা যমুনা উজান বহিতেন। এ কথা আদৌ অমূলক নহে। এ সুমধুর রব শুনিলে সকলের মনপ্রাণ উজান বহিতে থাকে। একদিকে সংসারের ঘোর মায়া, অপরদিকে ভগবানের মধুর নাম সেই মায়া কাটাইয়া নিজের প্রেমে মজাইতে থাকে। যে ব্রজলীলার এত গুণ, তাহা কি কৃষ্ণচরিতের আবর্জ্জনী, না মণিমুক্তা?

প্রাণপতি সতীর হৃদয়ের ধন, ও একমাত্র সম্বল। তিনি তদ্গতপ্রাণা হইয়া সদাই পতির বিষয় ধ্যান করেন। সেইরূপ শ্রীহরি আমাদের হৃদয়ের ধন ও একমাত্র সম্বল। আমরা তদ্গতপ্রাণে অনুক্ষণ তাঁহাকেই ডাকিতেছি। তাঁহার জীবনের ভিন্ন ভিন্ন লীলা পাঠ ও শ্রবণ করিয়া সদা প্রেমানন্দে ও ব্রহ্মানন্দে উৎফুল্ল হইতেছি। আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মের এমন আনন্দরূপ কোন দেশের কোন ধর্ম্ম কোন কালে কল্পনা করিতে পারে নাই। বিশ্বপ্রেমে প্রেমিক শ্রীকৃষ্ণ ষোড়শ সহস্র গোপিনী লইয়া শ্রীরাধার সহিত বংশী বাজাইতে বাজাইতে জগৎময় প্রেম বিতরণের জন্য ত্রিভঙ্গে নৃত্য করিতেছেন, আর ভক্ত সাধকগণও সেই সঙ্গে নাচিতেছেন। আহা! মরি! মরি! ধর্ম্মাত্মা কবির কি অদ্ভুত ভাবাভিনয় রে! যে ব্রজলীলার এত গুণ, তাহা কি কৃষ্ণচরিতের আবর্জ্জনী, না মণিমুক্ত?

রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি দর্শনে কাহার না হৃদয়ে অতুল প্রেম উথলিয়া পড়িবে? কাহার না আনন্দোচ্ছ্বাস বহিতে থাকিবে? দেখ, এই জাতীয় অধঃপতনের দিনে, এই ঘোর দুর্দ্দিনে কেবল মাত্র রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি পাইয়া সমগ্র হিন্দুসমাজ আজ অপার প্রেমে ও আনন্দে বিভোর। যে ভারতমাতার

পদযুগল পরাধীনতারূপ নিগড়শৃঙ্খলে আবদ্ধ, তাঁহারই মস্তকোপরি রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি স্থাপিতা; তজ্জন্য তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া নৃত্য করিতেছেন ও দুঃখের দিন বিস্মৃত হইয়াছেন। যে ব্রজলীলার এতগুণ, তাহা কি কৃষ্ণচরিতের আবর্জ্জনী, না মণিমুক্তা?

বেশ জানিবে, শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা কাব্যজগতের ও ধর্ম্মজগতের অমূল্য নিধি। ইহাতে স্বর্গের মণিমুক্তা ছড়ান আছে। শ্রীহরি গোলকধাম ত্যাগ করিয়া মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ হন এবং বাৎসল্য, প্রেম, সখ্য, দাস্য ও শান্ত এই পঞ্চ রসের পূর্ণ অভিনয় দেখাইয়া সকলকে ভবপারাবারে যাইবার সাহায্য করিতেছেন।

চরণ তরণী কৃষ্ণ আপনি কাণ্ডারী
ভক্ত সকলে পার করেন যত্ন করি।

এক ভারত ব্যতীত কোন দেশের কোন ভাষায় কেহ এমন মণিমুক্তমালা দেখিতে পাইবেন না। একবার ভাগবত খুলিয়া দেখ, পড়িতে পড়িতে তোমার মন হাসিবে, নাচিবে ও কাঁদিবে। একাধারে পঞ্চরসের এমন সুমধুর মিলন কেহ কোথাও দেখিতে পাইবেন না।

সুমধুর ব্রজলীলা কে বর্ণিতে পারে,
গোলক ত্যজিয়া হরি আনন্দে বিহরে।
শান্ত, দাস্য, সখ্য, আর বাৎসল্য মধুর,
পঞ্চভাব একস্থানে শুনিতে মধুর।

একজন দীনদরিদ্র হিন্দুবালক সামান্য মাদুরে বসিয়া ব্রজলীলা পড়িতে পড়িতে যে সুখ ভোগ করিবে, তাহার সহিত তুলনা করিলে দিল্লীশ্বর সাজিহান রত্নখচিত ময়ূরতক্ত সিংহাসনে উপবেশন পূর্ব্বক দরবার করিতে করিতে যে সুখ পাইয়াছিলেন, তাহাও অতি তুচ্ছ। আজ সুশিক্ষিত সম্প্রদায় মিলটন সাহেবের Paradize lost and Regained. পড়িয়া শতমুখে উহার প্রশংসা করিতেছেন; কিন্তু ঘরের পৈতৃক ভাগবতকে সামান্য কাঁচ জ্ঞানে অবজ্ঞা করিয়া থাকেন। যদি তাঁহারা ইহার স্বর্গীয় ভাব বুঝিতেন, তাঁহারা কি ব্রজলীলাকে কৃষ্ণচরিতের আবর্জ্জনী বলিতেন?

যথার্থ বলিতে কি, কৃষ্ণচরিতের এক ব্রজলীলা কল্পনা করিয়া হিন্দুধর্ম্ম এ

সংসারে ধর্ম্মবিষয়ে চরমোৎকর্ষ দেখাইতেছে। যিনি ব্রজলীলা ভালরূপ বুঝিবেন, তিনি ইহাতে চিরদিনের জন্য মজিবেন। ধর্ম্মসাধনার এমন সহজ উপায় তুমি কোথাও দেখিতে পাইবে না। সমগ্র জগৎ অন্বেষণ কর, সকল ধর্ম্ম তন্ন তন্ন করিয়া পর্য্যালোচনা কর, কোথাও ধর্ম্মের এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সুমনোহর দৃশ্য, সাধনার এমন সহজ উপায় তোমার নয়নপথে পতিত হইবে না। খৃষ্টধর্ম্ম বল, মুসলমানধর্ম্ম বল, বৌদ্ধধর্ম্ম বল, সকল ধর্ম্মই এক ব্রজলীলার জন্য হিন্দুধর্ম্মের নিকট সুদূরে পরাহত। জগতের কোন ধর্ম্ম মানবকে ঈশ্বরের মধুর নামে এমন প্রেমোন্মত্ত, এমন আনন্দোন্মত্ত করিতে পারে নাই বা এতদূর হাসাইতে পারে নাই। শ্রীকৃষ্ণের এক ব্রজলীলায় হৃদয়ের যাবতীয় রস শত সহস্র ধারে বিগলিত, ক্ষরিত ও নিঃসৃত হইতেছে। যে ব্রজলীলার এত গুণ, তাহা কি কৃষ্ণচরিতের আবর্জ্জনী, না মণিমুক্তা?

কোথায় হে বৈষ্ণবগুরো পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্যদেব! কোথায় হে কলিকালের গৌরাঙ্গ অবতার! তোমারই গুণে বঙ্গদেশ চিরদিন হরির প্রেমে মাতিতেছে। তোমারই গুণে এতকাল হরির প্রেমরসে "শান্তিপুর ডুবু ডুবু, নদে ভেসে যায়"। ধন্য তোমার অপার হরিভক্তি! ধন্য তোমার হরিপ্রেমোচ্ছাস! ধন্য তোমার প্রেমোন্মাদন হরিসংকীর্ত্তন! এমন সঙ্গীত কে কোথায় শুনেছে! এমন নর্ত্তন কে কোথায় দেখেছে! যে দিন তুমি হরিভক্তির ধ্বজা উড়াইয়া খোল খত্তাল বাজাইতে বাজাইতে ও সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে হরির প্রেমে দেশ মাতাইয়াছিলে, সেইদিন হইতেই লোকে তোমার চরণামৃত পান করিয়া হরিভক্তি শিক্ষা করিতেছে। তোমার মত বঙ্গমাতার এমন সুসন্তান আর কে আছে?

ওহে সুসভ্য ইংরাজ! তুমি আমাদের অসভ্য হরিসঙ্কীর্ত্তন শুনিয়া হাস্য সম্বরণ করনা। তোমার নয়নে তোমার বল (Ball) সর্ব্বপ্রেমোন্মাদক। যখন তুমি বিবিজানের সহিত ত্রিভঙ্গে নৃত্য করিতে থাক, তখন তুমি সঙ্গিনীর অপরূপ রূপদর্শনে কামোৎফুল্ললোচনে অপার আনন্দ-নীরে অভিষিক্ত হও। আমাদের ঈশ্বরপ্রেমে নর্ত্তন, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে নর্ত্তন তোমার চক্ষে কেন ভাল লাগিবে? তুমি একটা নারীরূপ মাংসপিণ্ড লইয়া নৃত্য কর; কিন্তু আমরা ভুবনমোহনরূপধারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ লইয়া নৃত্য করি। তুমি আমাদের হরিসংকীর্ত্তনের মহিমা কি বুঝিবে? যদি সংসারের কোন বস্তুতে পাষাণ দ্রবীভূত

হয় বা বজ্র বিদীর্ণ হয়, সে এই হরি সংকীর্ত্তনে। এমন করুণারসোদ্দীপক, এমন প্রেমোন্মাদন সঙ্গীত কোন জাতি কোন কালে কল্পনা করিতে পারে নাই।

কোথায় হে কোম্‌তদেব (Auguste Compte) তুমি তোমার প্রত্যক্ষবাদী বৈজ্ঞানিক ধর্ম্মে প্রেমের স্ফূর্ত্তির জন্য স্ত্রীজাতির আরাধনা করিতে উপদেশ দেও। কোথায় হে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ! তোমরাও আজ প্রেমের স্ফূর্ত্তির জন্য স্ত্রী জাতির সহিত অবাধ প্রেমলীলা অনুমোদন কর। ছি! ছি! একটা সামান্য ঐহিক অনিত্য বস্তুতে এত ভালবাসা দেখাইলে কি তোমাদের প্রেম যথার্থরূপে স্ফুরিত হইবে? ইহাতে তোমরা বাহ্যিক চাকচিক্যময় স্ত্রীসৌন্দর্য্যসাগরে ডুবিবে এবং নিকৃষ্ট কামপ্রবৃত্তিকে অযথা চরিতার্থ করিয়া আপনাদিগকে পশুর অধম করিয়া ফেলিবে। যে অধর্ম্মরূপিনী নারীজাতি এখন তোমাদের পরমারাধ্যা দেবী ও যাহাদের শ্রীপাদপদ্মে প্রীতিপুষ্পাঞ্জলি দিবার জন্য তোমরা সদা লালায়িত, সেই নারীজাতির উপর অপার প্রেম দেখাইলে কি তোমরা পশুর সমান হইবে না? ক্ষুদ্র হৃদয়ের সেই অপার প্রেমরাশি ঈশ্বরের উপর অর্পণ কর, ভগবানের উপর ঢালিয়া দেও, তোমরা ইহসংসারে স্বর্গের দেবতা হইবে। কলিযুগ বর্দ্ধনের সঙ্গে যে নিকৃষ্ট প্রেম হৃদয়ে এখন বর্দ্ধিষ্ণু, যাহা অনুশীলন করিয়া আমরা সদা পশুতুল্য, সেই প্রেম হিন্দুধর্ম্ম ভগবানে ঢালিয়া দিয়া আমাদিগকে দেবতুল্য করিতে চাহে। ইহাই এ ধর্ম্মের অপরাধ, ইহাই ব্রজলীলার মুখ্য উদ্দেশ্য। এখন স্বচ্ছন্দে মনের সাধে ইহাকে কৃষ্ণচরিতের আবর্জ্জনী বলিয়া উড়াও।

কৃষ্ণাবতার।

দ্বিতীয় অংশ।

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও বাল্যলীলা।

শ্রীকৃষ্ণ খৃঃ পূঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে বুদ্ধদেবের এক হাজার, ঈশার দেড় হাজার ওমহম্মদের দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মতে কুরুক্ষেত্র মহাসমর খৃঃ পূঃ ১৪৩০ অব্দে সংঘটিত হয়।

ইহাতে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত করা হইতেছে। তিনি বসুদেবের ঔরসে কংসভগিনী দৈবকীর গর্ভে মথুরায় জন্মগ্রহণ করেন।

অনেকে মনে করেন, কৃষ্ণ শব্দে যেমন কৃষ্ণবর্ণ বুঝায়, তেমনি ইহাতে পূতাত্মাও বুঝায়। তাঁহাদের মতে কৃষ্ণ শব্দের অনুকরণে পাশ্চাত্য জগতে খৃষ্ট শব্দও (Christ the Anointed) উৎপন্ন হইয়াছে। যৎকালে শ্রীকৃষ্ণ প্রাচ্য জগতে পূজিত হন, তাঁহার নামানুসারে ঈশা বা যীসু পাশ্চাত্য জগতে খৃষ্ট উপাধি প্রাপ্ত হন। বেশ বুঝা যাইতেছে, খৃষ্টজগতের খৃষ্ট শব্দে ও হিন্দুজগতের কৃষ্ণশব্দে একই অর্থ বুঝায়। প্রভেদের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগৎ শিক্ষা-দীক্ষার তারতম্যানুসারে নিজ নিজ আরাধ্য দেবতার চরিত্রাদি বিভিন্নরূপে গঠন করিয়া লইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন, পাশ্চাত্য জগতের খৃষ্ট নামানুসারে হিন্দুজগতে কৃষ্ণ শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। এ বিষয় মীমাংসা করা এখন সুকঠিন।

দিল্লীশ্বর আকবর পিতামাতার অতি দুঃসময়ে জন্মগ্রহণ করিয়া সংসারে অশেষ কীর্ত্তিকলাপ রাখিয়া যান। সেইরূপ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ পিতামাতার অতি দুঃসময়ে জন্মগ্রহণ করিয়া সংসারে অপূর্ব্ব কীর্ত্তিকলাপ দেখাইয়া যান। যখন মথুরাধিপতি কংস দৈববাণীযোগে শুনিতে পান, দৈবকীর গর্ভজাত সন্তান তাঁহার প্রাণবিনাশ করিবে, তখন তিনি নিজ ভগিনী ও ভগিনীপতিকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন এবং উঁহাদের সন্তানগুলি একে একে নষ্ট করিতে থাকেন। অষ্টমবারে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন; তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়াই পিতাকে বলেন, আমাকে বৃন্দাবনে রাখিয়া আসুন। যিনি প্রকৃত যোগেশ্বর, তিনি ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র এইরূপে কথা কহিতে পারেন, ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। যদি শাস্ত্রের কথায় অবিশ্বাস হয়, মনে কর, কংসের অত্যাচার ভয়ে বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে মথুরা হইতে ব্রজপুরে নন্দালয়ে রাখিয়া আইসেন।

নিশীথ রাত্রে সেপাই লোক নিদ্রিত হইলে বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে লইয়া কারাগার হইতে বহির্গত হন এবং যমুনা পার হইয়া যান। শুনেছি পুরাণে, তৎকালে মা যমুনা দ্বিধা হইয়া পড়েন এবং এক শৃগাল তাঁহাদের পথদর্শক হয়। ইংরাজদিগের বাইবেলে পাঠ করি, ইহুদিজাতি প্যালেষ্টাইন হইতে মিসর যাত্রাকালে লোহিতসাগর দ্বিধা হইয়াছিল। যদি বাইবেল মতে

একটা সমুদ্র দ্বিধা হইতে পারে, হিন্দুশাস্ত্র মতে কি একটা সামান্য নদী দ্বিধা হইতে পারে না? যদি ইহা উপকথা হয়, মনে করা উচিত, ভাদ্রমাসের সেই নিশীথ রাত্রে বসুদেব নৌকাযোগে বা অন্য কোন প্রকারে ভরা যমুনা পার হইয়াছিলেন। সেই রাত্রে নন্দরাণী যশোদা এক কন্যা সন্তান প্রসব করিয়া নিদ্রাভিভূতা ছিলেন। বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার কোলে দিয়া কন্যা সন্তান লইয়া প্রস্থান করিলেন। এই প্রকারে কৃষ্ণ নন্দালয়ে আনীত হইয়া প্রতিপালিত হইতে থাকেন।

অনেকে মনে করেন, বসুদেব কংসের ভয়ে নিজ বন্ধু বা আত্মীয় নন্দের গৃহে শ্রীকৃষ্ণকে গোপনে রাখিয়া আইসেন এবং তদীয় পত্নী যশোদা তাঁহার প্রতিপালন করেন। সংসারে এইরূপ অনেক স্ত্রীলোক অনেক কুড়ান ছেলে প্রতিপালন করিয়া থাকে। ইহাতে শাস্ত্রকারেরা দেখান, যাঁহারা সংসারে মহৎ কার্য্য করিবেন, তাঁহাদিগকে বাল্যজীবন অতি কষ্টে কাটাইতে হয়।

যাহা হউক, হিন্দুধর্ম্মের কি অপার মহিমা! ভগবানের এই সামান্য প্রতিপালনে হিন্দুকবিগণ বাৎসল্যরসের কি অপূর্ব্ব ফোয়ারা ছুটাইয়াছেন! কোন দেশের কোন কবি কোন ভাষায় এতদূর বাৎসল্যভাব বর্ণন করিতে পারিবেন না। একবার ভাগবত খুলিয়া দেখ, পড়িতে পড়িতে তোমার মন বাৎসল্যভাবে গদগদ হইয়া হাসিতে, নাচিতে ও কাঁদিতে থাকিবে। বেশ জানিবে, একমাত্র ভগবানের নামে বাৎসল্যরস এতদূর ক্ষরিত ও নিঃসৃত হইয়াছে। যদি শাস্ত্রকারেরা শ্রীকৃষ্ণকে সামান্য মানব জ্ঞান করিতেন, তাঁহারা কদাচ এতদূর বাৎসল্যভাব প্রকাশ করিতে পারিতেন না।

শ্রীকৃষ্ণের শৈশব ও বাল্যলীলায় স্নেহ ও বাৎসল্যরসের পূর্ণ অভিনয় দেখান হইয়াছে। প্রকৃতির মহাকবি যথাশক্তি কল্পনা ও বর্ণন করিয়াছেন। নন্দালয়ে শ্রীনন্দনন্দন বা যশোমতীর সোণার যাদু সেই নবঘনশ্যাম নীলমণি কিরূপ বাল্যোচিত অনন্ত ক্রীড়াকৌতুক দেখাইয়া স্নেহময়ী মাতার মন অশেষপ্রকারে আকর্ষণ করেন এবং তদীয় মাতাও অপার বাৎসল্যরসে পরিপ্লুত হইয়া অশেষ স্নেহ ও যত্নের সহিত তাঁহার লালনপালন করিতে করিতে কিরূপ আনন্দনীরে অভিষিক্ত হন এবং তাঁহার জন্য অল্পকারণে ভীত হইয়া

কিরূপ চিন্তান্বিতা হন ও অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে থাকেন, তাহাই তাঁহার বাল্যলীলায় ভালরূপ দেখান হইয়াছে।

সকলের ঘরে দুরন্ত ছেলেপিলে কি না দৌরাত্ম্য করে? মাতাও দুরন্ত ছেলেদের শাসন করিতে ছাড়েন না। এজন্য ধর্ম্মাত্মা কৃষ্ণভক্ত কবিগণ শ্রীকৃষ্ণকে বালসুলভচপলতা বশতঃ দধিভাণ্ড ভঞ্জন পূর্ব্বক নবনীত চুরি করাইয়া মাতার রজ্জুতে বন্ধন করান, কিন্তু দেখান, সামান্য রজ্জুতে কেহ ভগবানকে বাঁধিতে পারিবেন না, একমাত্র ভক্তিডোরে তাঁহাকে বাঁধা যায়।

নন্দালয়ে শ্রীকৃষ্ণ ডাঙ্গপীটে বালকের ন্যায় দুরন্তপনার চূড়ান্ত দেখান এবং ননী মাখন চুরি করিয়া নিজে খান ও অপরকে খাওয়ান। কিন্তু ধর্ম্মাত্মা কবিগণের গুণে আজ সমগ্র হিন্দুসমাজ তাঁহাকে ননীচোরা বলিতে উন্মত্ত। যে সকল সামান্য ঘটনা গৃহস্থের ঘরে অহরহ ঘটিতেছে, উহাদিগকে ভগবানে অর্পণ করিয়া ভাবুক কবিগণ উহাদের স্বর্গীয় ভাব স্ফুরণ করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে সমাজকে অপার আনন্দে উৎফুল্ল করাইয়াছেন।

মা যশোদার অপত্যস্নেহ এ জগতে অতুলনীয়। এমন স্নেহ ও বাৎসল্য কেহ কখন দেখে নাই বা দেখিবে না। আজ কবিদিগের গুণে ভারতের আবালবৃদ্ধবনিতা সেই বাৎসল্যরসের পূর্ণ অভিনয় দেখিয়া ভাবে গদগদ হইয়া আনন্দে ও শোকে বিহ্বল হইতেছে। কোথায় হে ভাগবতকার মহাকবি! ধন্য তোমার কবিত্বশক্তি! ধন্য তোমার কল্পনা! তুমি ভগবানের উপর যশোদার অপার অপত্যস্নেহ দেখাইয়া জগদ্বাসিজনকে কিরূপ অলৌকিক বাৎসল্যভাব শিক্ষা দিতেছ? ত্বৎপ্রদর্শিত বাৎসল্যভাব দেখিয়া আজ ভারতের কোটী কোটী নরনারী আনন্দে নৃত্য করিতেছে ও ভগবানকে বাৎসল্য-ভাবে পূজা করিতেছে।

এস্থলে কেহ কেহ বলিতে পারেন, ঈশ্বরাবতার শ্রীকৃষ্ণকে ননীচোরা বলিয়া বর্ণন করা ভাল হয় নাই। যিনি পূর্ণব্রহ্ম সনাতন, তিনি কিনা এক সামান্য গোয়ালার ঘরে ননীচুরি করিয়া খান এবং বৃন্দাবনে এমন দুরন্তপনা করেন, তজ্জন্য সকলে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠে। ইহাতে ঈশ্বরের কোন্ ঐশ্বর্য্য দেখান হইল? সর্ব্বধর্ম্মের মূল ও আদর্শ ঈশ্বর কিনা গোয়ালার ঘরে ননীচুরি করিয়া

খাইলেন? এমন কথাও কি ঈশ্বর সম্বন্ধে লিখিতে আছে? কবি কিরূপ বেল্লিক! তাঁহার কি কিছুমাত্র বোধ-শক্তি নাই? আর দেশের মূর্খ লোকেরা এই সব কথা লইয়া কত হাসিতেছে ও নাচিতেছে! উহারা কি বুঝিতে পারে না, এরূপ করাতে সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের উপর ঘোর বিদ্রূপ করা হইতেছে? এস্থলে শাস্ত্রকারের উদ্দেশ্য সুমহৎ। যিনি আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মের পূর্ণ আনন্দরূপ, তৎসম্বন্ধে যত হাসির কথা উল্লেখ করা যায়, ততই সমাজের মঙ্গল। যিনি সর্ব্বরসের রসিক চূড়ামণি, যিনি সকল ভাবের পূর্ণ অভিনায়ক, তিনি কি বাল্যে বালোচিত দুরন্তপনার পূর্ণ অভিনয় দেখাইবেন না? আরও সাধককে ভগবানের নামে ভালরূপ হাসাইবার জন্যই কবি বাল্যকালের দুরন্তপনার পূর্ণ অভিনয় দেখাইয়াছেন। বেশ জানিবে, সর্ব্বসাধারণকে হাসির গট্‌রায় ফেলিয়া ধর্ম্মপথে লইয়া যাইবার জন্য, উহাদিগকে ভালরূপ ভাবশিক্ষা দিবার জন্য শাস্ত্রে ঐ সকল হাস্যোদ্দীপক ঘটনা উল্লিখিত হইয়াছে। বেশ জানিবে, হাসি ও কান্নার মধ্যে আমাদের প্রকৃত ভাবশিক্ষা হইয়া থাকে।

আবার কেহ কেহ বলেন, সমগ্র উপনিষদ নিগড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণ গীতারূপ অক্ষয় জ্ঞানভাণ্ডার লোকসমাজে প্রচার করেন। এস্থলে উপনিষদ্ পয়স্বিনী গাভী ও গীতা উহার ননী স্বরূপ। এজন্য শাস্ত্রে তিনি ননীচোরা বলিয়া খ্যাত।

এ বয়সে পুতনাবধ, শকটভঞ্জন, তৃণাবর্ত্তবধ, যমলার্জ্জুন ভঞ্জন, বৎসাসুরবধ, বকাসুরবধ, অঘাসুরবধ, কালীয়দমন, দাবাগ্নিপান, গোবর্দ্ধনধারণ প্রভৃতি যে সকল অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ তিনি সম্পাদন করেন, তাহাতে তাঁহার যোগেশ্বরত্ব পূর্ণভাবে প্রকটিত হইয়াছে। যাঁহাদের যোগবল সহজাত, তাঁহারাই সংসারে ঐরূপ অলৌকিক ক্রিয়া দেখাইতে পারেন। পাশ্চাত্য শিক্ষায় বিভূষিত হইয়া যদি তুমি তাঁহার যোগেশ্বরত্বে সন্দিহান হও, তুমি এই বলিয়া আপনার মনকে প্রবোধ দিবে :—

(১) পুতনাবধ আর কিছুই নয়, শ্রীকৃষ্ণ আঁতুড়ঘরে পেঁচয় পাওয়া হইতে রক্ষা পান। যে ছেলে খুব স্তন পান করে, তাহাকে পেঁচয় পায় না। সেজন্য পুতনারাক্ষসীকে উহার স্তনপান করিয়াই তিনি মারিয়া ফেলেন।

(২) শকটভঞ্জন আর কিছুই নয়, শৈশবকালে কেবল তাঁহার পাছোড়া-

নির চোটে গাড়ীখান আপনাপনি ভাঙ্গিয়া পড়ে; কিন্তু ইহাতে তাঁহার শরীরের কোন স্থানে কিছুমাত্র আঘাত লাগে নাই।

(৩) তৃণাবর্ত্ত আর কিছুই নয়, একপ্রকার ঘূর্ণীবায়ু। যখন তিনি অঙ্গনে হামাগুড়ি দিতেছিলেন, তৎকালে ঘূর্ণীবায়ু উত্থিত হইয়া তাঁহাকে কিছু দূর শূন্যে উত্তোলন করিয়া ফেলে। কিন্তু তিনি তাহাতে বাঁচিয়া যান, হাত পা ভাঙ্গে না।

(৪) যমলার্জ্জুন শব্দে কুরচীবৃক্ষ বুঝায়। ননী চুরি করিয়া খাইবার জন্য যখন মাতা তাঁহাকে রজ্জু দিয়া উদখুলে বন্ধন করেন, তখন তাহা হিচড়াইয়া লইবারকালে দুইটা ছোট কুরচিবৃক্ষ ভাঙ্গিয়া পড়ে।

(৫) বৎসাসুর আর কিছুই নয়, কেবল একটা হরিণ শিশু; বকাসুর ও একটা সামান্য বক। বাল্যকালে খেলিতে খেলিতে তিনি উহাদিগকে মারিয়া ফেলেন।

(৬) কালীয়দমন আর কিছুই নয়, যমুনাকুলে একটা কালসর্পকে মারিয়া গর্ত্ত হইতে তিনি তাড়াইয়া দেন।

(৭) বনে দাবাগ্নি প্রজ্বলিত হইলে তিনি কয়েক জন বালসুহৃৎ লইয়া তাহা নির্ব্বাপিত করেন। ইহাই দাবাগ্নি পান।

(৮) আর গোবর্দ্ধন পর্ব্বত দেখিলে বোধ হয়, ইহা অল্পদিন হইল, ভূগর্ত্ত হইতে উত্থিত হইয়াছে। এখনও উহাতে উত্তোলনচিহ্ন দেখ যায়। এই সামান্য চিহ্ন দেখিয়া শাস্ত্রকারেরা বর্ণন করিয়াছেন, যৎকালে বৃন্দাবনে মুষলধারে কয়েক দিন অতিবৃষ্টি পতিত হওয়াতে সকলে ব্যতিব্যস্ত হয়, তৎকালে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন পর্ব্বত উত্তোলন পূর্ব্বক উহাদিগকে বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহার নাম গিরিধারী। সেইরূপ বৃন্দাবনের সন্নিকটস্থ চরণ পাহাড়ে মনুষ্য ও গরুর পদচিহ্ন ভালরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণে বলে, এ সকল শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার গরুর পদচিহ্ন। এই চরণ পাহাড় অল্পদিন হইল ভূগর্ত্ত হইতে উত্থিত হইয়াছে। যখন ইহার প্রস্তরগুলি গলিত অবস্থায় ছিল, তখন লোকে উহাদের উপর যাতায়াত করিত; সেই সকল পদচিহ্ন এখন দেখা যায়। ওহে নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবগণ! শাস্ত্রের অপলাপ হইল বলিয়া আপনারা আমাদের ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। আর ওহে সুশিক্ষিত পাঠকগণ! এখন সকল হাঙ্গাম

মিটিয়া গেল। আমাদিগকে অধিক বাক্যব্যয় করিতে হইল না। আপনারাও নিশ্চিন্ত হইলেন, আমরাও নিশ্চিন্ত হইলাম।

এই বাল্যলীলানুসারে শ্রীকৃষ্ণের বালগোপালমূর্ত্তি নানা স্থানে পূজিত হইতেছে। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য কি? হৃদয়ের যে নৈসর্গিক বাৎসল্যভাব মানবমাত্রেই পুত্রকন্যার উপর দেখাইয়া উহাদের ভালরূপ লালনপালন করে, হিন্দুধর্ম্ম বলে সেই বাৎসল্যভাব ভগবানের উপর ঢালিয়া দিয়া তাঁহার অশেষ সেবা শুশ্রূষা কর; ইহাতে অন্তে তাঁহাকে পাইবে। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের বালগোপালমূর্ত্তিকে আদর্শ করিয়া এ ধর্ম্ম নৈসর্গিক বাৎসল্য ভাব দ্বারা ভগবানের সেবা ও পূজা করিতে উপদেশ দেয়। কিন্তু হায়! ইহাই এখন এ ধর্ম্মের অপরাধ, ইহাই এখন ইহার মহৎ কুসংস্কার।

পূজ্যপাদ স্বামী বল্লভাচার্য্যদেব ধর্ম্মের এই মহোচ্চভাব স্ফুরণ করিয়াছেন; এজন্য তাঁহার নিকট ভারত চির ঋণে আবদ্ধ আছে। জগতের কোন ধর্ম্ম ঈশ্বরকে বাৎসল্য ভাবে পূজিতে শিক্ষা দেয় নাই। বল্লভাচারিগণ মঙ্গলারতি, বালভোগাদি দ্বারা বালগোপালমূর্ত্তির পূজার্চ্চনা করিতেছেন। এই প্রকারে ভগবানকে বাৎসল্য ভাবে পূজার্চ্চনা করিয়া তাঁহারা তাঁহার প্রতি অপার ভক্তি দেখাইতেছেন।

ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভুত শ্রীকৃষ্ণ বাল্যকালে গোপগৃহে পালিত হন। এজন্য ঐ জাতির জাতীয় ব্যবসায় তিনি গোপবালকের ন্যায় অল্প বয়সেই আরম্ভ করেন। বৃন্দাবনে তিনি রাখালবেশে প্রথমে গোবৎস, পরে গাভী চরান। তথায় তিনি দীন হীন রাখালবেশে গরু চরান নাই। যেমন তাঁহার ভুবনমোহন রূপ, তেমনি তদীয় মাতা তৎকালে তাঁহার ভুবনমোহিনী সজ্জা করিয়া দিতেন। এই ভুবনমোহন রূপে এবং এই ভুবনমোহিনী সজ্জায় তিনি হিন্দুসমাজে চিরদিন পরিচিত ও পূজিত হইতেছেন। তাঁহার এই ভুবনমোহন রূপ ও সজ্জা চিত্রে চিরদিন উদ্ভাসিত ও প্রতিমূর্ত্তিতে প্রতিফলিত হইতেছে।

চন্দনচর্চ্চিত নীলকলেবর পীতবসন বনমালী
কেলিচলন্মণিকুণ্ডলমণ্ডিত গণ্ডযুগস্মিতশালী।
চন্দ্রকচারু ময়ুরশিখণ্ডকমণ্ডলবলয়িতং কেশং
প্রচুরপুরন্দরধনুরনুরঞ্জিত মেদুর মেদুর সুবেশং

শ্যামলবিমলকলেবর মণ্ডনমধিগত গৌর দুকুলং
নীলনলিনমেব পীতরাগপটলভরবলয়িত মূলং।

(গীতগোবিন্দ)

"তোমার নীল কলেবর চন্দনে চর্চ্চিত, তোমার পরিধানে পীত বসন এবং গলে বনমালা। তুমি যখন কেলি কর, তখন তোমার কর্ণে যে মণিকর কুন্তল আছে, তাহা নড়িতে থাকে; সেই চঞ্চল কুন্তলে তোমার গণ্ডদ্বয়ের অপূর্ব্ব শোভা হয় এবং তোমার বদনে সর্ব্বদাই মধুর মৃদুহাস্য।

সুন্দর চিহ্নযুক্ত ময়ূর পুচ্ছে তোমার কেশ সুশোভিত, যেন স্নিগ্ধ মেঘে নানা বর্ণে চিত্রিত ইন্দ্র ধনুর উদয় হইয়াছে।

নির্ম্মল শ্যামল কলেবরে পীতবসন শোভা পাইতেছে, যেন নীলপদ্ম পীতবর্ণ পরাগে ধূসরিত হইয়াছে।" এখন একবার ভাবিয়া দেখ, তাঁহার কিরূপ ভুবনমোহন রূপ ও বেশভূষা!

কানাই ও বলাই দুই ভাই বংশী ও শৃঙ্গ বাজাইতে বাজাইতে বালসখাদের সহিত নাচিতে নাচিতে গোষ্ঠে গরু চরাইতে যাইতেন। আজকাল যেমন লোকে গোরার বাদ্য করিয়া বর যাত্রা যাইতে দেখিলে আহ্লাদে পুলকিত হয় এবং দেখিবার জন্য হুড়াহুড়ি করে; সেইরূপ তৎকালেও বৃন্দাবনের গোপ-গোপিনিগণ গোষ্ঠবিহারীর গোষ্ঠে গমন করিতে দেখিয়া অতুল আনন্দে বিভোর হইত। দীনহীন রাখাল বালকের গোষ্ঠে গমন, আর গোলকবিহারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠে গমন কদাচ সমান হইতে পারে না। প্রকৃতির মহাকবিও উপযুক্ত স্থলে উপযুক্ত রূপ বর্ণন করিয়া জগৎ মাতাইয়া গিয়াছেন।

বংশীধরের বংশীধ্বনির সমক্ষে গোরার বাদ্য বা থিয়েটরের ঐকতান বাদ্য কোথায় লাগে? কলকণ্ঠ কোকিলের কুহুধ্বনির ন্যায় মুরলীধরের সেই মুরলীধ্বনিতে ত্রিভুবন মোহিত হইত। নরনারী, স্থলচর ও জলচর যাবতীয় তির্য্যক প্রাণীর মধ্যে যে শুনিত, সেই ভুলিত; এমন কি, যমুনা পর্য্যন্ত সেই বংশীরব শুনিবার জন্য উজান বহিত। যমুনাপুলিনে বা গোষ্ঠে শ্রীকৃষ্ণকে কোন গাভীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতে হইত না। যেখানে তিনি থাকুন না কেন, একবার বংশী বাজাইলেই সকল গাভী ও বৎস তাঁহার সম্মুখে হাজির।

বৃন্দাবনের কি নরনারী, কি ইতর জন্তু, সকলকেই তিনি নিজ মায়ায় ভুলাইয়াছিলেন। রে হিন্দুধর্ম্ম! বলিহারি তোমারি! গোলকবিহারী শ্রীহরি বৃন্দাবনে গরু চরান, ইহাতে তুমি দীনদরিদ্র লোকবর্গকে, সমাজের বৈশ্যগণকে গোপালনে কত প্রোৎসাহিত করিতেছ। ইহাতে হিন্দুসমাজের কত মঙ্গল সাধিত হইতেছে, বল দেখি!

তৎকালে শ্রীদামাদি ১২ জন গোপবালকের সহিত শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে যাইতেন। বাল্যকালে সরল চিত্তে সরলপ্রকৃতি বালকদিগের মধ্যে যে সৌহৃদ্য ও প্রণয় জন্মে, তাহা অকপট ও নিঃস্বার্থ, তাহা সখ্য ভাবের পরাকাষ্ঠা। সেই বয়সে এক সঙ্গে ক্রীড়াদি করিয়া সকলে যে সুখভোগ করে, তাহাও অকপট। মানবমাত্রেই বালসুহৃদদিগকে চিরদিন মনে করে। শ্রীদামাদি বালসুহৃদ্‌দিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণ বাল্যকালে যে সকল লীলা করেন, তাহাতে সখ্য ভাবের পূর্ণ অভিনয় দেখান হইয়াছে। এই সকল লীলা পাঠ করিয়া আমাদের সখ্য ভাব শত সহস্র ধারে উথলিয়া পড়িতেছে। এই প্রকারে আমরা দীনবন্ধু ভগবানকে সখ্যভাবে আরাধনা করিতে শিক্ষা করি।

শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর লীলা।

এইবার ব্রজাঙ্গনাদের পালা। তাঁহারা পরস্ত্রী হইয়াও শ্রীকৃষ্ণকে পতিভাবে আরাধনা করেন। মানবহৃদয়ে যে নৈসর্গিক প্রেম প্রবল, সেই প্রেমের পুষ্পাঞ্জলি দিয়া তাঁহারা ভগবানকে প্রেমভাবে পূজিতে চেষ্টা পান।
নন্দের ব্রজে ব্রজাঙ্গনাগণ পরব্রহ্মের পূর্ণ অবতার নবঘনশ্যাম কিশোরবয়স্ক সেই শ্রীকৃষ্ণের ত্রিভুবনমোহিনী বংশীধ্বনিতে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পতিভাবে আরাধনা করিবার জন্য ব্যগ্র হন, তজ্জন্য তাঁহারা একমাস ধরিয়া কাত্যায়নী ব্রত করেন। তৎকালে তাহাদের মনের ভাব এইরূপ ছিল—

যে বংশী শুনিতে এসে দেবের রমণী।
যে বংশী শুনিতে ধায় বনের হরিণী।
যে বংশী শুনিয়া পশু পক্ষী আদি ভুলে।
যে বংশী শুনিয়া সখি সারা হয়েছিলে।

প্রতিদিন শ্রবণেতে শুনিব সে বাঁশী
কুলশীল তেয়াগিয়া হব তাঁর দাসী।
শ্যামচাঁদ হতে কিছু বড় নহে কুল
কৃষ্ণের লাগিয়া প্রাণ হতেছে ব্যাকুল।
ধনমানপ্রাণ তাহার চরণেতে দিব
জনমের মত তাঁর পদে বিকাইব।
যায় যাবে জাতিকুল ভয় নাহি করি,
সবে বল যেন কৃপা করেন শ্রীহরি।
কুলশীলে থাকিলে কি কৃষ্ণ পাওয়া যায়।
কুলশীল ত্যজিয়া বিকাব কৃষ্ণ পায়।
লাজভয় থাকিলে কি মিলে কৃষ্ণধন,
ঘর আর সকলি করিতে হয় বন॥
শুনিব কৃষ্ণের বাঁশী যে বলুক যাহা,
যদি কেহ মন্দ কয় না শুনিব তাহা।
দিবানিশি সদা শুনিব সে বাঁশী
তাহে কুল যায়, যাক হয়ে রব দাসী।
তথাপি ভেটিব আমি নন্দের কুমারে
তাহে হবে আমার সে শ্যাম দয়া করে।
ঘর হবে বন, বন হবে ঘর,
পর হবে আপন, আপন হবে পর। (ভাগবত)

এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের সুমধুর বংশীধ্বনিকে ভগবানের সুমধুর নাম ভাবা উচিত। একমাত্র তাঁহারই নামে ও গুণে সমগ্র জগৎ বিমোহিত। কুলমান ও ঘর দোর যথার্থ মনুষ্য মনে ত্যাগ না করিলে কেহ ব্রহ্মে একনিষ্ঠ হইতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণের আরোধনায় গোপিনিগণ তাহাই ভাবিয়াছিলেন।

তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে দাস্য ও প্রেমভাবে আরাধনা করেন। হিন্দুরমণী মাত্রেই নিজ প্রাণপতিকে দাস্য ও প্রেমভাবে পূজা করিয়া থাকেন। কিন্তু পাশ্চাত্য রমণী আপনাকে স্বামীর দাসী কদাচ মনে করেন না। তিনি জানেন, পুরুষই তাঁহার চিরানুগত দাসানুদাস।

গোপিনিগণের বস্ত্রহরণ।

কাত্যায়নী ব্রতের পর তাঁহাদের বস্ত্রহরণ করা হয়। তাঁহারা দেশাচার-মতে নিজ নিজ বস্ত্র কূলে রাখিয়া অবগাহনার্থ যমুনায় প্রবেশ করিলেন। এমন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ কোথা হইতে আসিয়া তাঁহাদের বস্ত্রগুলি লইয়া বৃক্ষে আরোহণ করেন; পরে অনেক সাধ্য সাধনায় তাঁহাদের অম্লান সতৃষ্ণ নয়নে দর্শন করিবার পর বস্ত্রগুলি ফেরৎ দেন। একটা ডাকপিটে বদ্‌মাইস ছোক্‌রা মজা দেখিবার জন্য যাহা করে, এস্থলে শ্রীকৃষ্ণ তাহাই করিলেন। অনেকে বলিবেন, এমন বদ্‌মাইস্ ছোকরাকে ২।৪ ঘা বেত মারিয়া সিধা করা উচিত ছিল। কিন্তু শাস্ত্রকারেরা এই নীতি-বিগর্হিত ও অশ্লীল ঘটনা উল্লেখ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মহৎ লীলা দেখাইতেছেন। এই প্রকারে জাতীয় চরিত্র ক্রমশঃ কলুষিত হওয়াতে জাতীয় অধঃপতন ঘটিয়াছে।

যে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ কুরুসভায় দ্রৌপদির বস্ত্রহরণকালে অলৌকিক উপায়ে তাঁহার লজ্জা ও মানসম্ভ্রম রক্ষা করেন, তিনিই কি না আবার কৈশোরে ব্রজলীলায় ব্রজাঙ্গনাদের বস্ত্রহরণ করিয়া সকলকে বিবস্ত্র ও নির্লজ্জ করিলেন, এই বা তাঁহার কিরূপ লীলা? প্রকৃতির মহাকবি যে স্থলে যেমন আবশ্যক, সে স্থলে সেইরূপ বর্ণন করিয়াছেন। কৈশোর বয়সে প্রথম কামোদয়ে অধিকাংশ লোকের চরিত্র চপলতাদোষে দূষিত হয়। রক্তমাংসের শরীর ধারণ করিয়া নিখিল সংসারের সেই আদর্শপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ কি মানবের স্বাভাবিক বয়স দোষ দেখাইবেন না? ইহার জন্য গোপিনিগণের বস্ত্রহরণ শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। যদি বিজ্ঞান যোনি প্রভৃতির বিষয় স্পষ্টরূপে লিখিয়া অশ্লীলতা দোষে দূষিত না হয়, মনের প্রাকৃতিক উদ্বেগ স্পষ্টরূপে লেখাতে কবিকেও কি অশ্লীল বলা উচিত?

বস্ত্রহরণের উদ্দেশ্য আরও গূঢ়। আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মের আনন্দরূপের মহৎ লীলা দেখাইতে হইলে ভক্ত সাধকবর্গকে পদে পদে হাসান উচিত, যাহাতে তাঁহারা প্রেমোন্মত্ত হইয়া হাসিতে হাসিতে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে অধিক মজিয়া যাইবেন। ইহার জন্য শাস্ত্রে এমন হাস্যোদ্দীপক ঘটনার উল্লেখ দেখা যায়।

আরও লজ্জা স্ত্রীলোকের সর্ব্বোৎকৃষ্ট আভরণ। উহারা অবলীলাক্রমে

প্রাণ ত্যাগ করিতে পারে; কিন্তু কুলটা স্ত্রী ব্যতীত কেহই সহজে লজ্জা ত্যাগ করিতে চাহে না। এক প্রাণপতি ব্যতীত উহারা লজ্জা ত্যাগ করিয়া কাহারও নিকট উলঙ্গ হয় না। গোপিনিগণের মন পরীক্ষা করিবার জন্য উহারা শ্রীকৃষ্ণকে পতিভাবে পূজিতে কতদূর প্রস্তুত, তাহা দেখাইবার জন্য উহাদের বস্ত্রহরণ করা হয়। কেহ কেহ বলেন, অষ্টপাশের মধ্যে লজ্জাপাস ভাঙ্গিয়া দিয়া উহাদিগকে নিজ প্রেমে অধিক উন্মত্ত করিবার জন্য উহাদের বস্ত্রহরণ করা হয়।

রাসলীলা।

বস্ত্রহরণ করিবার পর যখন শ্রীকৃষ্ণ বুঝিলেন, গোপিনিগণ তাঁহাকে একমনে ও একধ্যানে পতিভাবে পূজিতে একান্ত ব্যগ্র, তখন তিনি সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া বলেন, পূর্ণিমার রাত্রে তোমরা সকলে নিকুঞ্জ বনে আসিবে, আমি সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিব। নির্দ্ধারিত রাত্রে সকলে অপরূপ বেশভূষা করিয়া নিকুঞ্জ বনে উপস্থিত হইলেন। তিনি প্রথমে সকলকে উপদেশ দেন, গৃহে গিয়া পতিপুত্রের সেবা কর, ইহাই তোমাদের পরমধর্ম্ম, আমার কাছে আসিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। ইহাতেও যখন তাহাদের মন ফিরিল না, তখন তিনি তাহাদিগকে লইয়া কিছুক্ষণ রাসলীলা করেন, পরে অদৃশ্য হইয়া যান। গোপিনিগণ শ্রীকৃষ্ণবিরহে একান্ত সন্তপ্ত হইয়া তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করেন। পরে যখন তিনি দেখিলেন, তাঁহারা তদীয় বিরহানলে দগ্ধ হইয়া নানাবিধ বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছে, তখন তিনি পুনরায় সকলের সমক্ষে দেখা দেন এবং যোগমায়াবলে অসংখ্য নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রত্যেক গোপিনীর সহিত কেলি ও নর্ত্তন করিতে থাকেন।

রাস লীলার প্রকৃত অর্থ কি? রহস্যে বা নিভৃতে যে লীলা করা যায়, তাহার নাম রাসলীলা। এই লীলা করিয়া ব্রজের গোপিনিগণ শ্রীকৃষ্ণকে পতিভাবে পূজা করেন ও তদীয় শ্রীপাদপদ্মে প্রেমপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। পতিভাবে পূজিতে গেলে রতিক্রিয়া আবশ্যক। সেজন্য কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণ কি গোপিনিগণের সহিত রতিক্রিয়া করেন? তিনি কি

তাঁহাদের সতীত্ব নাশ করিয়া চির কলঙ্কিনী করেন ও পাপপঙ্কে ডুবান? যিনি সকল ধর্ম্মের আদর্শপুরুষ, যাহাকে সকলে মনে করেন :—

যতঃকৃষ্ণ স্ততোধর্ম্মঃ
যতোধর্ম্ম স্ততোজয়ঃ।

তিনি কিনা স্ত্রীলোক পাইয়া সামান্য পশুর ন্যায় নিজের পাশববৃত্তি চরিতার্থ করিলেন? দ্বাদশ বৎসরের এক দুধের বালক, যাহার গোডিম এখনও ভাঙ্গে নাই, সহস্র সহস্র নারীর সহিত তাহার রতিক্রিয়া কি সম্ভব?

দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা করেন, ইহাতে বুঝা উচিত, বালক বালিকাগণের বৌ বৌ খেলার ন্যায় তিনি ব্রজে গোপিনিগণ লইয়া এক অলৌকিক প্রেমলীলা দেখান,তাহাতে উহারা তাঁহাকে পতিভাবে আরাধনা করেন। কেহ কেহ বলিতে পারেন, শ্রীকৃষ্ণ না হয় অল্পবয়স্ক বালক, গোপিনিগণ ত বালিকা নন, উহারা যে বয়োজ্যেষ্ঠা বিবাহিতা স্ত্রীলোক। কি বলিয়া বালকের সহিত উহারা বাল্যলীলায় রত হইল? শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে ইহা বাল্যলীলা বটে, কিন্তু গোপিণিগণের পক্ষে ইহা মহালীলা,ইহার উপর সকলের মোক্ষলাভ নির্ভর করিতেছে। যিনি যোগসিদ্ধ যোগেশ্বর, তিনি যে এমন অল্প বয়সে সহস্র সহস্র নারীকে নিজের ভুবনমোহন বংশীধ্বনিতে মোহিত করিয়া এতদূর প্রেমোন্মত্ত করান ও সকলের সাহত এমন প্রেমবিহার করেন, যদ্দারা কোটী কোটি মানব ভগবানের প্রেমে উন্মত্ত হইয়া পতিভাবে তাঁহার আরাধনা করিয়া ভবপারাবারে চলিয়া যাইতেছে, ইহা তাঁহার কোন্ বিচিত্র কথা?

যদি যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বরিক ক্ষমতায় সন্দেহ কর এবং তাঁহার ব্রজলীলাকে কাল্পনিক মনে কর, তথাচ শাস্ত্রকারদিগের গূঢ় উদ্দেশ্য বুঝা আবশ্যক। যদি একেশ্বরবাদিগণ ঈশ্বরকে সর্ব্বশক্তিমান, মঙ্গলময়, ও দয়াময় বলাতে (অর্থাৎ) অসম্পূর্ণ মানবগুণ অনন্ত গুণিত করিয়া তাহাতে আরোপ করাতে দোষভাজন না হন, আমরাও সেইরূপ অসম্পূর্ণ মানবের অসম্পূর্ণ প্রেম অনন্ত গুণিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণে আরোপ করাতেও কোনরূপ দোষভাজন হই না। সেই অসম্পূর্ণ প্রেম অনন্ত গুণিত করিয়া প্রকাশ করিবার জন্য শাস্ত্রকারেরা শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর ষোড়শ সহস্র গোপিনীদের সহিত এবং যৌবনে ষোড়শ সহস্র রাণীর সহিত অদ্ভুত প্রেমলীলা বর্ণন করিয়াছেন।

রাসলীলার গূঢ়রহস্য।

নন্দের ব্রজে ব্রজাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণের রূপে, গুণে ও বংশীধ্বনিতে মোহিত হইয়া তাঁহাকে পতিভাবে পূজিবার জন্য যে সকল প্রেমলীলা ও প্রেমবিহার করেন, তাহা পাঠ, শ্রবণ ও মনন করিলে ভগবানের নামে আমাদের হৃদয়ের প্রেমধারা যে কেবল শত সহস্রধারে উথলিয়া উঠে, তাহা নহে; কিন্তু তাহাতে আমরা ভগবানকে প্রেমভাবে, পতিভাবে পাই এবং তাঁহাকে প্রেমডোরে বাঁধিয়া সহজে তন্ময়ত্ব লাভ করি।

ধন্য কৃষ্ণভক্ত কবিগণ! ধন্য তোমাদের কল্পনাশক্তি! তোমরা শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত প্রেমলীলা বর্ণন করিয়া সমগ্র হিন্দুসমাজকে কিরূপ হরিপ্রেমে মাতাইতেছ এবং সকলকে ধর্ম্মপথে কিরূপ অগ্রসর করাইতেছ? তোমাদের গুণে আজ সমগ্র ভারত কৃষ্ণসঙ্গীতে ও সঙ্কীর্ত্তনে কিরূপ মুখরিত ও কিরূপ আনন্দে উৎফুল্ল! কোন দেশের কোন কবি এমন প্রেমলীলা বর্ণন করিতে পারেন নাই। বাইরণ, সেক্ষপিয়র প্রভৃতি অনেক প্রকৃতির কবি নিজ নিজ ভাষায় শ্রুতিমনোহর প্রেমসঙ্গীত সুললিত কণ্ঠে গান করিয়াছেন বটে; কিন্তু কেহই হিন্দুকবিগণের ন্যায় প্রেমের এমন স্বর্গীয় ভাব স্ফুরণ করিতে পারেন নাই।

একবার ভাব দেখি, যে নিকৃষ্ট প্রেম স্ত্রীপুরুষের মনের একটা দুর্ব্বলতা মাত্র, যে নিকৃষ্ট প্রেম একটা নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির মধ্যে গণ্য, যে নিকৃষ্ট প্রেম স্ত্রীজাতি হউক, পুরুষজাতি হউক, সকলেই নিকৃষ্ট জন্তুর ন্যায় অনুসরণ করিয়া মনকে হেয় ও অপবিত্র করিয়া ফেলে, সেই নিকৃষ্ট প্রেমকে হিন্দু কবিগণ ভগবানে অর্পণ করিয়া ও ষোড়শ সহস্র গোপিনীদের সহিত তাঁহার অনন্ত প্রেমবিহার ও রাসলীলা বর্ণন করিয়া উহার স্বর্গীয় ও মহোচ্চ ভাব যে কেবল স্ফুরণ করেন, তাহা নহে; কিন্তু তাঁহারা সেই নিকৃষ্ট প্রেমকে ঈশ্বরারাধনার উপায় স্বরূপ করেন এবং মনের উৎকর্ষ সাধনের প্রয়াস পান। যে নিকৃষ্ট প্রেম কলিযুগ বর্দ্ধনের সঙ্গে হৃদয়ে এখন এত বলবৎ, যে কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য সকলে এত উদ্গ্রীব, সেই নিকৃষ্ট প্রেমকে ধর্ম্মাত্মা হিন্দু নারীজাতির সৌন্দর্য্যোপভোগে না লইয়া গিয়া ঈশ্বর প্রাপ্তির উপায়স্বরূপ করেন ও আপনাকে ধর্ম্মপথে অগ্রসর করান। ইহাই রাসলীলার প্রধান ও গূঢ় উদ্দেশ্য। এখন মনের সাধে ব্রজলীলা কৃষ্ণচরিত্রের আবর্জ্জনী বলিয়া ভাগবতকে গঙ্গার জলে নিক্ষেপ কর।

কেহ কেহ বলিবেন, যে নিকৃষ্ট প্রেম দ্বারা মানবহৃদয় সদা কলুষিত, তাহা ঈশ্বরে বা তদীয় অবতারবিশেষে অর্পণ করিলে তাঁহাকে হাস্যাস্পদ করা হয়। যিনি মঙ্গল ও অমঙ্গল, উভয়ের রাজা ও বিধাতা, যাহা হইতে পাপপুণ্য,সুখদুঃখ সকলই নিঃসৃত, তাঁহার উপর নিকৃষ্ট প্রেম অর্পণ করিলে উহা উৎকৃষ্ট ভাব ধারণ করিবে। যেমন সমুদ্রমন্থনে যে গরল উত্থিত হয়, তাহা পান করিয়া মহাদেব নীলকণ্ঠ হন ও গরলরাশি দূরীভূত করেন, সেইরূপ প্রেমের যাহা অপকৃষ্ট অংশ, তাহা ঈশ্বরে বা তদীয় অবতারে আরোপ করিলে, উহার নীচত্ব নষ্ট হইবে এবং উৎকৃষ্ট অংশ আরও দ্বিগুণ ঔজ্জ্বল্য ধারণ করিবে। ইহার জন্য শাস্ত্রকারেরা গোপিনীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের অশেষ প্রেমলীলা বর্ণন করিতেছেন। ঈশ্বরকে দয়াময় দয়াময় বলিয়া ডাকিলেই কি তাঁহার যথার্থ গুণপ্রকাশ করা হইবে, আর তাঁহাকে প্রেমময় বলিয়া ডাকিলে কি তাঁহার গুণপ্রকাশ করা হইবে না? এখন যদি শাস্ত্রকারেরা তাঁহার অনন্ত প্রেম প্রকাশ করিবার জন্য তাঁহার পূর্ণ অবতার শ্রীকৃষ্ণকে কৈশোরে ষোড়শ সহস্র গোপিনীদের সহিত প্রেমলীলা করান, তাহাতে কি আমরা তাঁহার অনন্ত প্রেমের পূর্ণ পরিচয় পাইব না? ঈশ্বরের অনন্ত প্রেম প্রকাশ করিবার জন্য মানবপ্রেমকে অনন্ত গুণিত করিয়া প্রকাশ করাই শ্রেয়।

রাসলীলার আধ্যাত্মিক ব্যাখান।

এই রাসলীলায় পূর্ণব্রহ্ম সনাতন শ্রীকৃষ্ণকে পরব্রহ্মের অসীম ও অনন্ত চিৎশক্তি জ্ঞান করা উচিত। এই চিৎশক্তি বিশ্বব্যাপী ও সর্ব্বব্যাপী। ইহা আকাশের ন্যায় সর্ব্বগ ও সর্ব্বময়। জগতের প্রত্যেক বস্তুতে ও প্রত্যেক জীবে ইহা জাজ্জ্বল্যমান; আর ষোড়শ সহস্র গোপিনিগণকে অনন্ত প্রকৃতির অনন্ত শক্তিনিচয় জ্ঞান করা উচিত। এই সকল প্রাকৃতিক শক্তিগুলির ক্রিয়াপরম্পরায় ও ঘাতপ্রতিঘাতে জগতের যাবতীয় ব্যাপার ঘটিতেছে। উহারা অন্ধ জড়শক্তি হইলেও একমাত্র পরব্রহ্মের চিৎশক্তি দ্বারা চালিত হইতেছে। এই চিৎশক্তি উহাদের সহিত অনন্ত লীলা ও কেলি করিতে করিতে জগৎ চালাইতেছে। পরব্রহ্মের এ রাসলীলা কেহ জানেন না বা বুঝেন না। দার্শনিক পণ্ডিত হও বা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত হও,এ রাসলীলা বুঝিতে পারিবে না। যোগসিদ্ধ মহাত্মা-

গণ ইহার কিঞ্চিৎ আভাস পান। প্রাকৃতিক শক্তিগুলির সহিত পরব্রহ্মের এই অপরূপ লীলা লোকাচারে দেখাইবার জন্য গোপিনিগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাস লীলা শাস্ত্রে দেখান হইয়াছে। তাঁহার চিৎশক্তি প্রাকৃতিক নানা ভৌতিক শক্তির সহিত মিলিয়া মিশিয়া সংসারে কিরূপ মহালীলা করিতেছে, তাহাই ইঙ্গিতে দেখাইবার জন্য রাসলীলা শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। এই রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়াবলে অসংখ্য নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া গোপিনিগণের সহিত কেলি করেন। সেইরূপ পরব্রহ্মের অনন্ত চিৎশক্তি অনন্তরূপ ধারণ করিয়া অনন্ত ভৌতিক শক্তিনিচয়ের সহিত মিলিয়া মিশিয়া উহাদিগকে নাচাইতেছে। এখন তুমি চর্ম্মচক্ষে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা দেখিয়া জ্ঞানচক্ষে পরব্রহ্মের মহালীলা কিঞ্চিৎ বুঝিতে চেষ্টা পাইবে। এখন যাহারা এই রাসলীলার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে পারদারিক বলেন, তাঁহারা সংসারে কিরূপ গণ্ডমূর্খ!

কৃষ্ণাবতার।

তৃতীয় অংশ।

রাধারাণী।

নন্দের ব্রজে ব্রজাঙ্গনাদের মধ্যে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আসক্ত হন। শুনিতে পাই, ইনি আয়েন ঘোষের পরিণীতা ভার্য্যা। তবেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকট পরপুরুষ। এই পরপুরুষ লইয়া ইনি প্রেমোন্মত্তা হওয়াতে প্রকৃত কুলটা হন। এস্থলে আমাদের সুশিক্ষিত বান্ধবগণ এই নীতিবিগর্হিত ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ কাজের জন্য শাস্ত্রকারদিগের উপর ঘোর নারাজ, এমন কি, খড়্গহস্ত। তাঁহারা বলিবেন, শাস্ত্রকারদিগের কি বিবেচনা? তাঁহারা যাঁহাকে ঈশ্বরাবতার জ্ঞানে সকলের আদর্শ করিলেন, তাঁহাকেই তাঁহারা পরের পরিণীতা ভার্য্যার উপর প্রেমাসক্ত বর্ণন করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। বলিহারি, তাঁহাদের বুদ্ধি!

তাঁহারা আরও বলিবেন, ওহে নির্ব্বোধ আয়েন ঘোষ! তোমার কি ঘটে কিছুমাত্র বিবেচনা ছিল না? তোমার পরিণীতা ভার্য্যা একটা লম্পট ছোকরা লইয়া দিবারাত্র মজা করিতেছে, তুমি তাহা চক্ষে দেখিয়াও দেখিলে না ও কিছু

বলিলে না! এমন কুলটা স্ত্রীকে এলোকেশীর ন্যায় বঁটি দিয়া কাটিয়া ফেল নাই কেন? তুমি কি মনুষ্যত্ববিবর্জ্জিত, না নপুংসক? ওহে রাধারাণী! তোমারও বা এ কিরূপ বিবেচনা? তুমি কি না বিবাহিত পতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া পরপুরুষের প্রেমে মজিলে ও কলঙ্কের ডালি মাথায় করিলে? আর ওহে শ্রীকৃষ্ণ! তোমারও এ কিরূপ বিবেচনা? তুমি কি না পরস্ত্রী লইয়া দিবারাত্র মজা করিলেও সংসারে নিন্দনীয় হইলে? তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত, যখন শাস্ত্রকারেরা দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ব্রজাঙ্গনাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলা দেখাইতেছেন, তখন তাঁহাদের সাতখুন মাপ। বেশ জানিবে, ব্রজলীলায় প্রেমের কদর্য্য অংশ আদৌ অভিনীত হয় নাই; কিন্তু ইহার উৎকৃষ্ট অংশ পূর্ণভাবে অভিনীত হইয়াছে।

রাধাকৃষ্ণ যুগলমূর্ত্তির পূজনে হিন্দুধর্ম্মের গূঢ় রহস্য আছে। লোকাচারে ও সামাজিক নিয়মে শ্রীরাধা আয়েন ঘোষের পরিণীতা ভার্য্যা হইলেও তিনি শাস্ত্রমতে গোলকবিহারিণী লক্ষ্মীস্বরূপা বা স্বয়ং লক্ষ্মী। শ্রীকৃষ্ণ যেমন পরব্রহ্মের বা বিষ্ণুর পূর্ণ অবতার, অথবা তিনি যেমন পূর্ণব্রহ্ম সনাতন, তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গিনীস্বরূপা শ্রীরাধাও তেমনি প্রকৃতির আদ্যাশক্তি মহামায়া। তাঁহাদের মিলনে প্রকৃতপুরুষের সংযোগ দেখা যায়। প্রকৃতির যে আদ্যাশক্তি মহামায়ার সহিত পরব্রহ্মের চিৎশক্তির মহালীলাবশতঃ এ ব্রহ্মাণ্ড সমুৎপন্ন, শ্রীরাধাই সেই আদ্যাশক্তি মহামায়া। তাঁহাদের মহালীলা রূপকভাবে লোকাচারে দেখাইবার জন্য শাস্ত্রকারেরা শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত প্রেমলীলা বর্ণন করিতেছেন। সংসারে ঐশ্বরিক যোগ বা প্রকৃতিপুরুষের মহালীলা কিরূপে চলিতেছে, তাহা কে বুঝিতে পারে?

কেহ কেহ বলেন, রাধা শব্দের প্রকৃত অর্থ, যিনি আরাধনা করেন, তিনিই রাধা। ভক্তের হৃদয়ই এস্থলে রাধা নামে পরিচিত। শ্রীহরির প্রতি অনন্ত বিশুদ্ধ প্রেম শিক্ষা দিয়া জগৎবাসীজনকে প্রেমানন্দে, ব্রহ্মানন্দে উৎফুল্ল করাইবার জন্য শ্রীরাধার প্রেম শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। তুমিও আজ রাধার ন্যায় অন্তরে সর্ব্বস্বত্যাগী হইয়া নিজ ক্ষুদ্র হৃদয়ের যৎসামান্য প্রেমটুকু সেই অনন্ত প্রেমাধারে, সেই শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ কর, তাঁহার প্রেমে বিভোর হও, সেই নাম মন্ত্র,

সেই নাম যন্ত্র, সেই নাম জ্ঞান, সেই নাম জপ করিতে করিতে তন্ময়ত্ব লাভ কর, তুমি ইহসংসারে স্বর্গের দেবতা হইবে।

মনে কর, রাধা একজন সামান্য ব্রজাঙ্গনা মাত্র; তথাচ তিনি শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে এতদূর আসক্ত হন যে, নিজের পার্থিব পতি ত্যাগ করিয়া পরব্রহ্মের সেই পূর্ণ অবতার শ্রীকৃষ্ণের সদা সাথের সাথী হন ও তাঁহার সহিত অনুক্ষণ প্রেমবিহার করেন। এ জগতে শ্রীরাধার প্রেম অপরিসীম ও অতুলনীয়। যিনি ঈশ্বরকে পতি ভাবে পাইবার জন্য ও পূজিবার জন্য নিজ মনে পার্থিব পতি ত্যাগ করেন ও তিন কুলে কালী দিয়া সর্ব্বস্বত্যাগিনী হন, তাঁহারই প্রেম এ জগতে অতুলনীয়। এজন্য রাধারাণী কি জয়! রাধারাণী কি জয়! আজ ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্বরে বিঘোষিত হইতেছে এবং রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি ভারতের গৃহে গৃহে পূজিত হইতেছে।

এস্থলে যিনি ভাবিবেন, শ্রীরাধা নিজ স্বামী পরিত্যাগ করিয়া পরপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে আসক্ত হওয়াতে প্রকৃত কুলটা হন, তিনি সংসারে ঘোর গণ্ডমূর্খ। শ্রীরাধা কৃষ্ণকে পরপুরুষ ভাবিতেন, না পূর্ণব্রহ্ম সনাতন জ্ঞান করিতেন? দেখ, যিনি নিখিল সংসারের পতি, যিনি অনন্ত কালের জন্য সকলের পতি, তাঁহার সহিত কি ক্ষণবিধ্বংসী পার্থিব পতির তুলনা হইতে পারে? শ্রীরাধা যদি শ্রীকৃষ্ণরূপ সেই বিশ্বনাথকে প্রেমভাবে পূজিবার জন্য পার্থিব পতির অনাদর করিয়া হৃদয়ের যৎসামান্য প্রেমটুকু সেই অনন্ত প্রেমাধারে ঢালিয়া দেন, তজ্জন্য তিনি কিপ্রকারে কুলটা ও কলঙ্কিনী হইলেন? যে ব্রজাঙ্গনাগণের সৌভাগ্যক্রমে সেই জগন্নাথ গোলকধাম পরিত্যাগ করিয়া সশরীরে ব্রজে অবতীর্ণ হন এবং তথাকার ধূলি পর্য্যন্ত পবিত্র করেন, তাঁহারা যদি তাঁহাকে পতিভাবে পূজিবার জন্য তাঁহার সহিত অনন্ত প্রেমলীলা করেন, তাঁহারা কিপ্রকারে কুলটা হইলেন? কে সংসারে মোক্ষলাভের এমন সুযোগ ত্যাগ করিতে পারে? যদি সতী সাধ্বী নারী ভগবানকে পতিভাবে আরাধনা করেন এবং পার্থিব পতিকে তাঁহার রূপ জ্ঞান করেন, তিনি কি কুলটা হন? তবে শ্রীরাধা অল্পবয়স্ক শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রেমলীলা করিয়া কি প্রকারে কলঙ্কিনী হইলেন? বেশ জানিবে, শ্রীরাধা ভক্ত সাধকগণের পূর্ণ আদর্শ। উহারা তাঁহার ন্যায় সংসারে সর্ব্বত্যাগী হইয়া শ্রীকৃষ্ণে মনপ্রাণ অর্পণ করিয়া থাকেন।

মনে কর, শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার নন, তোমার আমার ন্যায় সামান্য মানব মাত্র। তবে আয়েন ঘোষের স্ত্রী রাধা তাঁহার নিকট পরস্ত্রী। কেন শাস্ত্রকারেরা একপুরুষের সহিত পরস্ত্রীর প্রেমলীলা বর্ণন করিয়া শাস্ত্র অপবিত্র করিলেন? কৃষ্ণের ত অনেক পরিণীতা ভার্য্যা ছিল; উহাদের সহিত তাঁহার প্রেমলীলা বর্ণন করিলে কোন গোলযোগ থাকিত না এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তাঁহাকে পারদারিক বলিয়া উপহাস করিতেন না।

এ বিষয়ে শাস্ত্রকারদিগের গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। সংসারে পরপুরুষ ও পরস্ত্রী লইয়াই প্রেমের যথার্থ স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। "যার সঙ্গে যার মজে মন, কিবা হাড়ী কিবা ডোম"। তাদৃশ প্রেম লোকাচারে অপবিত্র ও নিন্দনীয় হইলেও তাহাতেই মনের অপার আনন্দ, স্ফূর্ত্তি ও উন্মত্ততা জন্মে: দেখ না, সংসারে কত লোক বেশ্যা ও পরস্ত্রী লইয়া কিরূপ উন্মত্ত হয় এবং কত কুলটা নারী পরপুরুষ লইয়া উন্মত্তা হয়! যাঁহারা প্রকৃতির মহাকবি, তাঁহারা প্রকৃত ঘটনাই উল্লেখ করিবেন। এজন্য তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে দিয়া কৈশোরে ব্রজাঙ্গনারূপ পরনারীদের সহিত অশেষ প্রেমলীলা দেখান। আর তিনি অল্পবয়স্ক ছিলেন বলিয়া কেবল রাসলীলা করেন; কিন্তু প্রেমের নিকৃষ্ট অংশ আদৌ অভিনয় করেন নাই।

হিন্দুসমাজের নিয়মানুসারে পরিনীতা ভার্য্যা আমাদের সহধর্ম্মিণী মাত্র। আমরা তাঁহাকে লইয়া কেবল সংসারধর্ম্ম করি ও বংশ রক্ষা করি। প্রেম-বিহারের জন্য হৃদয়ে যে একটা স্বাভাবিক পিপাসা থাকে, তাহা পরিণীতা ভার্য্যার সহিত অনেক সময় পরিতৃপ্ত হয় না। সত্য বটে, এদেশেও যুবকযুবতীরা প্রথম বয়সে প্রেমতরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে প্রেমের তরী প্রেমসাগরে ভাসান; কিন্তু তাহাতেও আমাদের প্রাকৃতিক প্রেমপিপাসা ভালরূপ চরিতার্থ হয় না। ইউরোপীয় সমাজে কোর্টসিপ (Courtship) ও হনিমুনাদি (Honeymoon) ভোগ করিয়া তত্রত্য জনসাধারণ আপনাদের প্রেমপিপাসা শান্ত করে। এ দেশের অভাবপূরণার্থ শাস্ত্রকারেরা ব্রজাঙ্গনাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত প্রেম-লীলা বর্ণন করিয়া আমাদের নৈসর্গিক প্রেমপিপাসা শান্ত করিতেছেন এবং উহাকে ঈশ্বরোন্মুখী করিয়া তাঁহাকে প্রেমভাবে পূজা করিতে বলিতেছেন।

আরও দেখ, পরিণীতা ভার্য্যার সহিত আমাদের সংসারধর্ম্ম যেমন চলে,

হৃদয়ের প্রেমরস তেমন সকল সময় উথলিয়া উঠে না। যে মানবের স্বভাব "নূতনে পাইলে চাহে নাকো পুরাণে" সে মানব নিত্য নিত্য নূতনই চান। নূতন পাইলেই তাঁহার প্রেমভাব সম্যক স্ফূর্ত্তি পায়।

আবার যখন দেখি, স্ত্রী বয়োজ্যেষ্ঠা হইলে স্বামী রমণকালে অপরের সুন্দরী স্ত্রীর বিষয় ভাবিতে ২ রেতস্খলন করে, তখনই বা কি প্রকারে বলিব, পরিণীতা ভার্য্যার সহিত সকলের প্রেমলীলা পূর্ণভাবে চলিতে পারে। দেশাচার মতে হিন্দুবিবাহে প্রেমের কাব্যাংশ (Poetic portion) আদৌ অভিনীত হয় না। এই কাব্যাংশের পূর্ণ অভিনয় দেখাইয়া সমগ্র হিন্দুসমাজকে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে বা ভগবানের প্রেমে উৎফুল্ল করাইবার জন্য শাস্ত্রে পরস্ত্রী ব্রজাঙ্গনাদের সহিত তাঁহার অনন্ত প্রেমলীলা এমন সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে।

এস্থলে শাস্ত্রকারদিগের আর একটী গূঢ় উদ্দেশ্য রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা লইয়া সংসারে তাঁহার পূজা চলিতেছে। তাঁহার যৌবন লীলার সঙ্গে ইহার কোনরূপ সংস্রব নাই। এজন্য রাধা ও গোপিনিগণের সহিত তাঁহার অনন্ত প্রেমলীলা শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে এবং রুক্মিণী প্রভৃতি বিবাহিতা রাণাদের সহিত তাঁহার কিরূপ সাংসারিক লীলা ঘটিয়াছিল, সে কথার কিছু-মাত্র উল্লেখ নাই।

বিরহ ও মিলন ব্যতীত হৃদয়ের প্রেম ভালরূপ স্ফূর্ত্তি পায় না। শাস্ত্র-কারেরাও শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদে শ্রীরাধার বিরহানল ও শোকসন্তাপ কতদূর প্রজ্বলিত হয়, তাহা সুন্দররূপে বর্ণন করিয়া আমাদিগকে চিরদিনের জন্য কাঁদাইতেছেন। শ্রীকৃষ্ণবিরহে রাধার খেদোক্তি শুনিয়া আমাদের মনপ্রাণ চিরদিন আকুল হইতেছে ও শোকসাগর উথলিয়া উঠিতেছে। তাঁহার ক্রন্দন শুনিয়া ভক্ত হিন্দুও শ্রীকৃষ্ণের বিরহে প্রাণভরে কাঁদিতে থাকেন। যেমন তাঁহার শোকোচ্ছাস ও দীর্ঘনিশ্বাস পতিত হয়, ভক্তবর ভাবে গদগদ হইয়া শ্রীকৃষ্ণবিরহে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে থাকেন। এই বিরহসন্তাপ শুনিয়া কত পতিবিরহিতা অবলা হৃদয়ের বিরহসন্তাপ চিরদিন দূর করিতেছে।

শ্রীরাধার মানভঞ্জন ব্রজলীলার একটা প্রধান পালা। স্ত্রীলোক মাত্রেই অল্পাধিক কারণে স্বামীর উপর কুপিত হইয়া অভিমানে মান করিয়া বসিয়া থাকেন। সে স্থলে স্বামীকে অনেক সাধ্য সাধনা, অনেক কাকুতি মিনতি

করিয়া, এমন কি পায়ে পড়িয়াও উঁহার মানভঞ্জন করিতে হয়। নারীজাতি তাঁহাদের এই প্রভুত্বটুকু সকল সমাজে পুরুষজাতির উপর চিরদিন চালাইতেছেন। কৃষ্ণভক্ত কবিও দেখান,পরব্রহ্মের সেই পূর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণস্বয়ং মানভরা মানিনী শ্রীরাধার পাদমূলে পতিত হইয়া বলিতেছেন "দেহি পদপল্লবমুদারম্"। আহা! মরি! মরি! এ দৃশ্য দেখিয়া কে না হর্ষসাগরে ভাসিবে ও ভাবিবে, সকলেই স্ত্রীজাতির নাতিঝাটা খেয়ে থাকে,ভগবানও খেয়েছেন। এ দৃশ্য দেখিয়া কোন্ মহিলা না আনন্দার্ণবে ভাসিবে ও ভাবিবে, আমরা সংসারে কেমন বাহাদুর! ভগবান পর্য্যন্ত সকলেই আমাদের পায়ে গড়াগড়ি দিয়াছেন। যে দৃশ্যটী সকলের ঘরে নিভৃতে ও নির্জ্জনে অর্দ্ধরাত্রে কদাচিৎ কখন সংঘটিত হয়, রসিকচূড়ামণি কবি তাহাই ঈশ্বরে আরোপ করিয়া উহার স্বর্গীয়ভাব স্ফুরণ করেন, সকলকে হর্ষসাগরে ভাসান এবং সেই সঙ্গে দেখান, হিন্দুসমাজে দাসীভাবাপন্না নারীজাতির পদমর্য্যাদা কত মহোচ্চ!

এস্থলে কেহ ২ বলিবেন, যে ঘটনাটী পুরুষজাতির দুর্ব্বলতাপরিচায়ক, সে ঘটনা ঈশ্বরাবতারে আরোপ করিয়া তাঁহাকে হাস্যাস্পদ করা হইয়াছে। বেশ জানিবে, প্রেমোন্মত্ত সাধককে হর্ষসাগরে নিমগ্ন করাইবার জন্য এইরূপ হাস্যোদ্দীপক ঘটনা শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রকারে আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মের আনন্দরূপ ভালরূপ দেখান হইয়াছে। কোথায় হে পূজ্যপাদ জয়দেবস্বামী! ধন্য তোমার শ্রীকৃষ্ণপ্রেম! বঙ্গদেশে তোমার জন্ম হওয়াতে আমাদের দুঃখিনী বঙ্গমাতা চিরদিন জগতে গৌরবান্বিতা। তোমার সাধের গীতগোবিন্দ ভারতের সর্ব্বস্থলে চিরদিন সমভাবে পূজিত হইতেছে।

এস্থলে কেহ ২ বলিতে পারেন, শাস্ত্রকারেরা শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলা ও রাসলীলা যেরূপভাবে বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে জনসাধারণের চরিত্র ক্রমশঃ কলুষিত হইতে থাকে। বল দেখি, যে ধর্ম্ম স্বীয় আদর্শপুরুষকে প্রকাশ্যভাবে পরনারীর সহিত প্রেমাসক্ত বর্ণন করে, সে ধর্ম্মের মত বীভৎস ধর্ম্ম আর কি হইতে পাবে? কোথায় ধর্ম্ম অশেষ সদুপদেশ দিয়া সমাজে ব্যভিচার দোষ যথাসাধ্য নিবারণ করিবে? না ধর্ম্মই স্বীয় আদর্শপুরুষকে ব্যভিচারে লিপ্ত করাইয়া প্রকাশ্যভাবে উহার প্রশ্রয় দিতেছে? এ বিষয়ে হিন্দুধর্ম্মের কি অপরাধ? যে নিকৃষ্ট প্রেম সকলে নারীজাতির উপর দেখাইয়া নিকৃষ্ট আমোদ

প্রমোদে রত হইয়া আপনাদিগকে পশুতুল্য করে, এ ধর্ম্ম সেই নিকৃষ্ট প্রেমকে অশেষ প্রেমাধারে সেই ভগবানে ঢালিয়া দিয়া উহাদিগকে দেবতুল্য করিতে চাহে। সকলকে ঈশ্বরপ্রেমে উন্মত্ত করিয়া নির্ম্মল ব্রহ্মানন্দে বিভোর করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের এমন হাস্যোদ্দীপক, এমন প্রেমোন্মাদন রাসলীলা শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

বল দেখি, যিনি পরব্রহ্মের সেই পূর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পরপ্রেমে ও পরাভক্তিতে মজিবেন, তিনি কি অস্থিমেদমাংসপিণ্ডজড়িতা পরনারীকে ঘৃণাচক্ষে দেখিবেন না? যে ধর্ম্মিষ্ঠা মহিলা রাধার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে মজিবেন, তিনি কি পরপুরুষকে পাপনয়নে দেখিবেন? তিনি মনে ২ শ্রীকৃষ্ণকে প্রাণপতি পাইয়া পার্থিব পতিকে তদীয় রূপ জ্ঞান করত উভয়ের প্রেমে বিভোর হইবেন। যদি তিনি বৈধব্যদশায় পতিত হন, প্রাণপতি শ্রীকৃষ্ণের সহবাসে দিন কাটাইবেন এবং পত্যন্তরগ্রহণের আবশ্যকতা অনুভব করিবেন না। যে ধর্ম্মাত্মাপুরুষ রাধাকৃষ্ণের প্রেমে মজিবেন, তিনি নিজ পত্নীকে রাধা জ্ঞান করিয়া তদীয় প্রেমে বিভোর হইবেন অথবা আপনাকে রাধা জ্ঞান করিয়া অপার প্রেমের সহিত শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিবেন। এই প্রকারে তাঁহাদের জীবন অশেষ প্রেমময় ও শান্তিময় হইবে।

যে সকল কাব্যনাটকে প্রেমরস ভালরূপ বর্ণিত আছে, তাহা পাঠ করিলে মন ক্রমশঃ কলুষিত ও বিকৃত হইয়া পড়ে। বাইরণ, সেক্ষপীয়র পড়, তোমার মন ক্রমশঃ কলুষিত হইবে। কিন্তু ভাগবতোক্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলা দিবারাত্র পাঠ, শ্রবণ ও অনুচিন্তন করিলে মানবমন ঈশ্বর প্রেমে মজিয়া সদা ঈশ্বর চিন্তা করিবে এবং তাঁহাকে প্রেমভাবে পাইতে চেষ্টা পাইবে; এই প্রকারে ক্রমশঃ ঈশ্বরের তন্ময়ত্ব লাভ করিয়া জীবনের যথার্থ শ্রেয় লাভ করিতে পারিবে। যেমন মোদক মিষ্টান্নের সুগন্ধ অনুক্ষণ ঘ্রাণ করিতে ২ মিষ্টান্নভোজনের ইচ্ছা আদৌ অনুভব করে না; সেইরূপ যিনি শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে মজিয়া তদীয় প্রেমলীলা অনুক্ষণ ধ্যান করেন, তিনি ক্ষণভঙ্গুর দেহের ক্ষণস্থায়ী কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে তত ব্যগ্র হন না। সত্য বটে, দেহযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য তিনি পতি বা পত্নী লইয়া সংসারাশ্রমে থাকেন; কিন্তু তাঁহার মন সদা

বৈকুণ্ঠস্থ শ্রীহরির পাদপদ্ম স্মরণ করে এবং তদীয় প্রেমলীলা ধ্যান করিতে ২ ব্রহ্মানন্দে বিভোর হয়।

As some cliff that lifts its awful form
Swells from the vale and midway leaves the Storm.
Though round its breast the rolling Clouds are spread
Eternal sunshine setlles onits head,

Deserted Village.

"যেমন কোন অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গ উপত্যকা হইতে ভীষণ দেহ উত্তোলন করত মধ্যভাগে মেঘমালা রাখিয়া ব্যোমমার্গে শিরোদেশ উন্নত রাখে; যদিও ইহার বক্ষঃস্থলে ঝড়, বাতাস ও মেঘরাশি প্রবাহিত হইতেছে, কিন্তু ইহার শিরোদেশ চিরদিন সূর্য্যোত্তাপে উত্তপ্ত থাকে।" সেইরূপ কৃষ্ণভক্ত ধর্ম্মাত্মার মন সংসারাশ্রমে পুত্রকলত্র লইয়া নানা চিন্তায় চিন্তান্বিত হইলেও তদীয় আত্মা ধর্ম্মের পরম জ্যোতিতে, শ্রীকৃষ্ণের প্রেমজ্যোতিতে চিরদিন উদ্ভাসিত থাকে।"

ওহে কৃষ্ণভক্ত ধর্ম্মাত্মা কবিগণ! তোমরা শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা অলৌকিক তুলিতে চিত্রিত করিয়া আমাদিগকে চিরদিনের জন্য কিরূপ অলৌকিক সহানুভূতিশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছ! তোমরা আমাদিগকে যেমন হাসাইতেছ, আবার তেমনি কাঁদাইতেছ। ইহাতে মধুর ও করুণারসের পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাই। যৎকালে শৈশবে দুগ্ধপোষ্য শ্রীকৃষ্ণের উপর কোনরূপ আপদ বিপদ পতিত হইত, তৎকালে তাঁহার জন্য স্নেহময়ী মাতা যশোদা মর্ম্মাহত হইয়া যেরূপ ক্রন্দন ও খেদোক্তি করিতেন, তাহা শুনিয়া চিরদিন আমাদের শোকসাগর উথলিয়া উঠিতেছে। যৎকালে অক্রুর কংসাদেশে শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজপুর হইতে মথুরায় লইয়া যাইবার জন্য আসিলেন, তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ ছাড়িয়া কেমন করিয়া থাকিব এই সব ভাবিয়া যশোমতী যেরূপ ক্রন্দন করেন, সে ক্রন্দনধ্বনিতে আমাদের শোক-সাগর চিরদিন উথলিয়া উঠিতেছে। যখন মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ নিজ পিতামাতা ও

আত্মীয় স্বজনকে পাইয়া ব্রজধামে আর যাইবেন না বলিয়া নন্দাদিকে চিরবিদায় দিলেন, তৎকালে নন্দের ক্রন্দন, যশোদার জন্য তাঁহার অশেষ ভাবনা, বাল সুহৃদ সুদামের ক্রন্দন প্রভৃতি শুনিয়া আমাদের শোকসাগর চিরদিন উথলিয়া উঠিতেছে। যখন নন্দ শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় ছাড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ব্রজপুরে ফিরিয়া আসিলেন, তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ হারাইয়া যশোমতীর হাহাকার, মূর্চ্ছা, রোদন ও খেদোক্তি, এবং গোপিনিগণের কৃষ্ণবিরহে রোদন ও ক্রন্দন শুনিয়া আমাদের শোকসাগর চিরদিন উথলিয়া উঠিতেছে। যখন উদ্ধব ব্রজবাসীদের সংবাদ লইবার জন্য বৃন্দাবনে আসিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণকে হারাইয়া ব্রজপুরীর কি দুর্দ্দশা হইয়াছে, তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া তিনি যেরূপ ক্রন্দন করেন এবং তাঁহার নিকট নন্দ নন্দরাণীর ক্রন্দন, গোপিনিগণের ক্রন্দন, শ্রীরাধার ও শ্রীদামের ক্রন্দন, এ সব শুনিয়া আমাদের শোকসাগর চিরদিন উথলিয়া উঠিতেছে। এইরূপ তোমরা ব্রজলীলায় আমাদিগকে কত জায়গায় কাঁদাইয়াছ! আমরাও চিরদিন কাঁদিতেছি ও কাঁদিব। এমন করিয়া না কাঁদাইলে কেমন করিয়া আমাদের ভাবশিক্ষা হইতে পারে?

শ্রীকৃষ্ণাবতার।

চতুর্থ অংশ।

শ্রীকৃষ্ণের যৌবন লীলা।

দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন হইতে মথুরায় নীত হন। এই স্থলেই তাঁহার ব্রজলীলা খতম হইল এবং আমরাও হাপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। তাঁহার যৌবন লীলায় অতিপ্রকৃত ঘটনাবলি উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। যাহা বিশ্বাসযোগ্য, তাহাই এস্থলে উল্লেখ করিতেছি।

যে শ্রীকৃষ্ণ অবস্থাবৈষম্যে পতিত হইয়া বৃন্দাবনে কেবল গরু চরান এবং মা সরস্বতীর সহিত যাহার আদৌ ভেট হয় নাই, তিনি উপনয়নের পর বেনারসে গিয়া শিক্ষাগুরুর নিকট অশেষ বেদবেদান্ত ও ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন। এখন তিনি ৬৪ প্রকার বিদ্যা ৬৪ দিনে শিক্ষা করুন, বা ৬৪ মাসে শিক্ষা করুন, সে কথায় আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। যখন দেখি,

ঐতিহাসিক সময়ে যোগসিদ্ধ শঙ্করাচার্য্যদেব ত্রয়োদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে বেদবেদান্তে অসাধারণ পণ্ডিত হন, তখন যোগসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণও যে অত্যল্প কাল মধ্যে কালোচিত অখিল বিদ্যায় পারদর্শী হন, সে বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ করা উচিত নয়। এই বিদ্যাবলে তিনি চাণক্য অপেক্ষা অধিক রাজনীতজ্ঞ হইয়া স্বসময়ে আর্য্যসমাজে যুগান্তর আনয়ন করেন এবং ঈশা ও বুদ্ধদেব অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর উপদেশ দিয়া যান।

শাস্ত্রে সকলেই পাঠ করেন, শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় আসিয়া দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে দুর্বৃত্ত কংসকে নিধন করিয়া পিতামাতা ও জ্ঞাতিবর্গকে উদ্ধার করেন এবং উগ্রসেনকে মথুরার রাজসিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। অনেকে এ কথায় অবিশ্বাস করিয়া বলেন, কিছুদিন কংসের অন্নে প্রতিপালিত হইয়া বিদ্যাশিক্ষা করিয়া আসিবার পর তিনি কংসকে নিধন করেন। যাহা হউক, তিনি নিজ মাতুলকে হত্যা করিয়া জগতের মহোপকার সাধন করিয়াছিলেন। যে দুর্বৃত্ত নরাধম নিজ পিতৃদেবকে কারারুদ্ধ করিয়া তদীয় সিংহাসন বল-পূর্ব্বক গ্রহণ করে এবং যাদবদিগকে ঘোর অত্যাচারে ব্যতিব্যস্ত করে, যিনি যদুকুলধুরন্ধর, তিনিই উহাকে নিধন করিয়া উহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাইবেন। যে নরপিশাচ শ্রীকৃষ্ণের পিতামাতাকে আজীবন কারাগারে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া অশেষ যন্ত্রণা দেয় এবং ভ্রাতাগণকে ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র নিধন করে, সে লোক মাতুল হউক আর যেই হউক, তাঁহার সম্পূর্ণ বধার্হ। এ স্থলে আদর্শ ধর্ম্মাত্মা নিজ মাতুলকেও নিধন করিয়া পৃথিবী নিষ্কণ্টক করেন। রাবণের কালনেমি মামা, দুর্য্যোধনের শকুনি মামা, আর শ্রীকৃষ্ণের কংস মামা, এই তিন মামায় মিলিয়া সংসারে ত্র্যহস্পর্শ আনয়ন করে এবং উহাদের ব্যবহারে মামার প্রতি ভাগিনেয়ের অশ্রদ্ধা জন্মে।

কংস নিহত হইবার পর তদীয় পত্নীদ্বয়ের ভ্রাতা মগধাধিপতি জরাসন্ধ অগণ্য সৈন্য সামন্ত লইয়া মথুরাপুরী অবরোধ করিলেন। এখন তিনি একবার, না অষ্টাদশবার ঐ পুরী অবরোধ করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের জানিবার প্রয়োজন নাই। আমাদের পক্ষে ইহা জানা যথেষ্ট, যিনি আদর্শ রাজনীতিজ্ঞ, তিনি অল্পসংখ্যক যাদবসেনা লইয়া এক সম্রাটের অগণ্য সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করা অপরিণামদর্শিতা ভাবিয়া প্রজাবর্গ লইয়া সুদূরে গুজরাটের উপকূলে

দ্বারকায় উপনিবেশ স্থাপন করিতে বাধ্য হন। এই আদর্শ রাজনীতিজ্ঞের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া অনৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিক সময়ে ক্ষত্রিয় বীর পুরুষগণ অন্য পরাক্রান্ত অধীশ্বর দ্বারা স্বরাজ্য হইতে বিতাড়িত হইলে ভারতের নানা স্থলে গিয়া স্বরাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তাহার সাক্ষ্য, মুসলমান দিগের ভারত বিজয়ের পর, দিল্লী, কনৌজ প্রভৃতি জনপদবর্গের অসমসাহসিক ক্ষত্রিয়গণ মরুময় রাজপুতনায় ও পর্ব্বতজঙ্গলময় মধ্যভারতে গিয়া নানা রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন।

দ্বারকায় গিয়া শ্রীকৃষ্ণ রাজসিংহাসন অধিরূঢ় হন নাই, উগ্রসেনই রাজা ছিলেন। কিন্তু তিনি আজকালের দেওয়ানের ন্যায় রাজকার্য্য পরিচালন করিতে থাকেন এবং কার্য্যতঃ তিনি দ্বারকাধিপতি হন। তাঁহারই বুদ্ধি ও রাজনীতির গুণে দ্বারকা অত্যল্প সময়ে সুখসমৃদ্ধিতে পূর্ণ হয় এবং যদুবংশ তথায় ফলফুলে শোভা পায়। এই প্রকারে স্বরাজ্যের অশেষ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করাতে রাজ্যপালন বিষয়ে তিনি ক্ষত্রিয় জাতির আদর্শপুরুষ হন।

শাস্ত্রে সকলেই পাঠ করেন, দ্বারকায় থাকিতে থাকিতে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহের ধুম পড়িয়া যায়। এখানে তিনি ষোড়শ সহস্র একশত রাণী ও অষ্ট পাটরাণী লইয়া বিহার করেন। বোধ হয়, শাস্ত্রকরেরা তাঁহাকে ঈশ্বরের প্রেমাবতার দেখাইবার জন্য এত বহুসংখ্যক বিবাহের উল্লেখ করিয়াছেন। নরকাসুর বধ করিয়া তদীয় গৃহে যে ষোড়শ সহস্র একশত রাজকুমারী কারারুদ্ধ ছিল, সকলকে বিবাহ করিয়া তিনি দ্বারকায় প্রেরণ করেন, এ গেঁজেলী কথা পাঠকবর্গ ছাড়িয়া দিবেন। তাঁহার অষ্ট পাঠরাণী ছিল। উহাদের লইয়া তিনি প্রেমবিহার ও বংশবৃদ্ধি করেন।

পুরাকালে আর্য্যসমাজে ক্ষত্রিয় জাতির ভিতর স্বয়ম্বর সভা হইতে পরমাসুন্দরী রাজকন্যা হরণ করা এক মহৎ গৌরবের বিষয় ছিল। এজন্য শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণী প্রভৃতি হরণ করিয়া নিজের কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে যদুবংশ যেরূপ বৃদ্ধি পায়, এমন কোন রাজবংশ কোন সময়ে বৃদ্ধি পায় নাই। যাহারা সংসারে ভাগ্যবান ও পুণ্যবান, তাঁহাদের ঔরসে বহু সংখ্যক সন্তান জন্ম গ্রহণ করে।

বহুবিবাহ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ রাজন্যবর্গকে বহু দারপরিগ্রহ করিতে

প্রোৎসাহিত করিয়া যান। দেখিতেছি, এস্থলে আমাদের সুশিক্ষিত বান্ধবগণ তাঁহার উপর অযথা গালিগালাজ করিবেন। কিন্তু তাঁহাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, যৎকালে সমাজে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি একান্ত আবশ্যক, তৎকালে বহু বিবাহ সমাজে স্বতঃ প্রচলিত হইয়া থাকে।

তৎপরে তিনি পাণ্ডবদিগের সংস্রবে থাকিয়া যে সকল অলোকসামান্য কার্য্য করেন, একমাত্র তাঁহারই সুপরামর্শে ও বুদ্ধিবলে কুরুক্ষেত্র মহাসমরে পাণ্ডবগণ যেরূপে জয়লাভ করেন এবং এই সময়ে তিনি যে সকল ধর্ম্মোপদেশ দেন, তাহাতে তিনি গণ্য, মান্য ও সর্ব্বাধিক পূজ্য হন, এমন কি জগৎ-মান্য হন। তাহার অলৌকিক কীর্ত্তিকলাপ কবির সুললিত কণ্ঠে গাদি মহাভারতে গীত হওয়াতে তিনি উত্তর কালে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া হিন্দুসমাজে চিরদিন পূজিত হইতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক গুণগ্রাম।

এখন তাঁহার জীবনীর অত্যুজ্জ্বল অংশের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

তাঁহার অলৌকিক ধর্ম্মোপদেশ।

তাঁহার ন্যায় এমন উৎকৃষ্ট ধর্ম্মোপদেশ, এ জগতে কেহ কখন দিতে পারে নাই। তদুপদিষ্ট ধর্ম্মের মতামত গীতায় স্বর্ণাক্ষরে ও জলন্তাক্ষরে লিখিত আছে। বুদ্ধ বল, ঈশা বল, মহম্মদ বল, কেহই এমন অলৌকিক ধর্ম্মোপদেশ দিয়া যান নাই। তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ সকল পাঠ কর এবং উহাদের সহিত গীতার তুলনা করিয়া দেখ, বুঝিতে পারিবে, এই অর্দ্ধসভ্য ভারতের ভগবদ্গীতা উহাদের অপেক্ষা ধর্ম্মজগতে কত শ্রেষ্ঠ ও মহোচ্চ! সকল ধর্ম্মই মানবকে ধর্ম্মপরায়ণ করিতে সাধ্য মত চেষ্টা পায়; কিন্তু গীতার ন্যায় ধর্ম্মোপদেশ কোন দেশের কোন ভাষায় দেখিতে পাইবে না। যোগসিদ্ধ যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সেই প্রাচীন কালের অধ্যাত্মবিজ্ঞানে সম্যক বিশারদ হইয়া এমন শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মোপদেশ দিয়া যান। গীতা অধ্যাত্মবিজ্ঞানের নিচোড় বা সারসঙ্কলন। ইহাতে বাজে কথা কিছুই নাই; আছে কেবল সনাতন ধর্ম্মের কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, নিষ্কাম ধর্ম্ম, কর্ত্তব্যপরায়ণতা ও যোগসাধন। যদি কখন পৌরাণিক ধর্ম্ম ভারতে লুপ্ত হইয়া যায়, তথাচ গীতা ধর্ম্মজগতে অতুলনীয় থাকিবে এবং ইহার মাহাত্ম্য চির-দিন ভারতে সমস্বরে বিঘোষিত হইবে।

সত্য বটে, শ্রীকৃষ্ণ ঈশা ও বুদ্ধদেবের ন্যায় শিষ্যবর্গ একত্রিত করিয়া ধর্ম্ম বিষয়ে সাধারণভাবে লেকচার (Lecture) দেন নাই; কিন্তু যাহা তিনি নিভৃতে বলিয়া গিয়াছেন, তাহা চিরদিন ধর্ম্মজগতের অমূল্যনিধি থাকিবে। আর তিনি কি কেবল ধর্ম্মোপদেশ দেন, তাহা নহে? তিনি কার্য্যক্ষেত্রে অসাধারণ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া দৃষ্টান্ত দ্বারা উত্তমরূপ শিক্ষা দিয়া যান। যাহারা কেবল কথায় ধর্ম্মোপদেশ দেন, অন্যান্য ধর্ম্ম তাঁহাদের আদর ও পূজা করিতে পারে। কিন্তু যিনি স্বজীবনে অলৌকিক ধর্ম্মানুষ্ঠান দেখান, হিন্দুধর্ম্ম তাঁহারই সম্যক সমাদর ও পূজা করে এজন্য এ ধর্ম্ম শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণকে এতকাল পূজা করিয়া আসিতেছে।

যাহারা বুদ্ধ ও ঈশার ন্যায় সন্ন্যাস মার্গ অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মোপদেশ দেন, তাঁহারা আমাদের প্রকৃত আদর্শ পুরুষ নন। সংসার ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া বা ধর্ম্মানুষ্ঠান করা অতি সহজ কথা। কিন্তু সংসারের অশেষ প্রলোভনের মধ্যে থাকিয়াও বিভিন্ন অবস্থায় পতিতহইয়া যিনি অলৌকিক ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া সকলকে ভালরূপ দৃষ্টান্ত দেখান, তিনিই আমাদের প্রকৃত আদর্শ পুরুষ। এ জন্য হিন্দুধর্ম্মও শ্রীকৃষ্ণকে আমাদের প্রধান আদর্শ স্বরূপ দেখায় এবং তাঁহার কার্য্যকলাপ চিরদিন জলন্তাক্ষরে ঘোষণা করে।

দেখ, বুদ্ধদেব আর্য্যসমাজে আবির্ভূত হইয়া চতুর্ব্বেদ ও জাতিভেদ প্রথার মস্তকে পদাঘাত করত পুরাতন মিটাইয়া স্বীয় কালোচিত ধর্ম্মমত প্রচার করেন। কিন্তু আমাদের পূজনীয় শ্রীকৃষ্ণ হাজার বৎসর পূর্ব্বে চতুর্ব্বেদ ও জাতি-ভেদপ্রথা সম্পূর্ণরূপে মান্য করিয়া ও পুরাতন বজায় রাখিয়া প্রাচীনকালের অধ্যাত্মবিজ্ঞানসম্মত ধর্ম্মোপদেশ দিয়া যান। বুদ্ধদেব জনসাধারণকে নির্গুণ ব্রহ্ম বা সগুণ ঈশ্বর কিছুই দেখান নাই, কেবল পরব্রহ্মস্থলে আপনাকে "সোঽহম্" আমি সেই মহাপুরুষ বলিয়া যান। তিনি সামাজিক ও পারিবারিক ধর্ম্ম, অহিংসা পরম ধর্ম্ম ও যোগসাধন শিক্ষা দেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সকলকে নির্গুণ ব্রহ্ম ও সগুণ ঈশ্বর উভয়ই দেখান, কেবল নির্গুণ পরব্রহ্ম স্থলে আপনাকে "সোঽহম্" বলিয়া যান। ইহাতে তিনি বৌদ্ধজগতে বুদ্ধদেবের ন্যায় হিন্দু-জগতে পরব্রহ্ম স্থলে পূজিত হইতেছেন।

এস্থলে কেহ কেহ বলিতে পারেন, যে ঈশা ও মহম্মদ অলৌকিক ধর্ম্মোপদেশ দিয়া জগতের মহোপকার সাধন করেন, তাঁহারা ত কেহই আপনাকে স্বয়ং ঈশ্বর বলিতে সাহস বা স্পর্দ্ধা করেন নাই। কিন্তু প্রাচ্যজগতে শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধদেব রক্তমাংসের শরীর ধারণ করিয়া কেমন করিয়া আপনাদিগকে পরব্রহ্ম বলিয়া প্রচার করিলেন? দেখ, গীতায় শ্রীকৃষ্ণ পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন,

মন্মনাভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসিমে।
সর্ব্বধর্ম্মং পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচ।

(গীতা)

"আমাতে মনপ্রাণ সমর্পণ পূর্ব্বক একনিষ্ঠ হও, আমার পরমভক্ত হও, আমার যজ্ঞ কর, আমাকে ভক্তিভাবে নমস্কার কর। তুমি আমার একান্ত প্রিয়। আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি, এরূপ করিলে তুমি অন্তে আমাকে পাইবে। সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তুমি একমাত্র আমাকে ভজনা কর, আমার শরণ লও; আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব, মনে কিছুমাত্র দুঃখ করিও না।"

এই শ্লোকের প্রকৃত অর্থ কি? শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়সুহৃৎ অর্জ্জুনকে যাহা বলিতেছেন, তাহা পরমাত্মা জীবাত্মাকে বলিবে। যে প্রাচ্যজগতে অদ্বৈতবাদ প্রবল, তথায় জন্মগ্রহণ করিয়া যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধদেব আপনাদিগকে পরব্রহ্ম বলিয়া গেলেন! কিন্তু তদীয় পরমভক্ত শিষ্যগণ লৌকিক দ্বৈতবাদানুসারে উভয়কে মূর্ত্তিমান ব্রহ্ম বা তাঁহার অবতার জ্ঞানে পূজা করিয়া আসিতেছে।

সুশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা ইংরাজিভাবে আকণ্ঠ পরিপূর্ণ, তাঁহারা বলিবেন, পুরাকালে যখন সমাজে শৌর্য্যবীর্য্যের সম্যক সমাদর ছিল, যাঁহারা শৌর্য্যবীর্য্যের জন্য খ্যাতি লাভ করিতেন. তাঁহাদের কীর্ত্তিকলাপ লোকমুখে গীত হওয়ায় তাঁহারা সমাজে বীর বলিয়া পূজিত হইতেন। উত্তরকালে তাহাদের গুণগ্রাম অতিরঞ্জিত ভাবে প্রচারিত হওয়াতে সকলে তাঁহাদিগকে ঈশ্বরাবতার জ্ঞান করিতে আরম্ভ করে। এই প্রকারে শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ হিন্দুসমাজে পূজিত হইতেছেন। অধ্যাত্ম রামায়ণোক্ত ধর্ম্মোপদেশ রামচন্দ্র দেন নাই,

তাঁহার উপর আরোপ করা হয়, সেইরূপ গীতোক্ত ধর্ম্মোপদেশও শ্রীকৃষ্ণ দেন নাই, তাঁহার উপর আরোপ করা হয় মাত্র। কে বিশ্বাস করিবে, কুরুক্ষেত্র মহাসমরে অসির ঝন ঝণার মধ্যে, রণকোলাহলের মধ্যে, রণবাদ্যের মধ্যে তিনি কিনা প্রিয় সখা অর্জ্জুনকে ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ দিতে গেলেন? যাহারা এই প্রকারে শাস্ত্রের নিন্দাবাদ করেন, তাঁহারা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত। তাঁহাদের কথা ছাড়িয়া দেও। তাঁহারা কি বলিতে পারেন, কেন পবননন্দন মহাবীর হনুমান ও বীর বৃকোদর সমাজে পূজিত হইলেন না?

সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন, গীতোক্ত ধর্ম্মোপদেশই শ্রীকৃষ্ণের জীবনীর অক্ষয় ও অত্যুজ্জ্বল কীর্ত্তি। এ কীর্ত্তিস্তম্ভ কস্মিন কালে লয় পাইবার নয়। যেমন ঈশাদেব অলৌকিক ধর্ম্মোপদেশের জন্য পাশ্চাত্য জগতে মানবের পরিত্রাতা বলিয়া পূজিত হন, শ্রীকৃষ্ণ তেমনি হিন্দুজগতে অলৌকিক ধর্ম্মোপদেশ দেওয়াতে চিরদিন পূজিত হইতেছেন। যিনি যোগেশ্বর, তিনিই গীতার ন্যায় এমন সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্মোপদেশ দিতে পারেন এবং যাঁহারা যোগসিদ্ধ, তাঁহারাই ইহার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারেন। এই ধর্ম্মোপদেশ দেওয়াতে শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মোপদেষ্টা ব্রাহ্মণজাতির চিরদিন আদর্শপুরুষ।

সনাতন ধর্ম্মের সংস্কার।

যেমন ঐতিহাসিক সময়ে শঙ্করাচার্য্যদেব বেদান্তাদির নূতন ব্যাখ্যা ও হিন্দুধর্ম্মের কালোচিত সংস্কার করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মকে পরাস্ত করাতে জগৎমান্য হন; সেইরূপ অনৈতিহাসিক সময়ে শ্রীকৃষ্ণও প্রাচীন সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে সু-মহৎ কার্য্য করাতে জগতে পূজিত হইতে থাকেন। কলিযুগারম্ভের সঙ্গে প্রাচীন কালের যে অধ্যাত্মবিজ্ঞান লোকসমাজে লুপ্ত হইয়া যায়, সহজাত যোগ বলে তাহাতে সুপণ্ডিত হইয়া তিনি ইহার মহৎ মহৎ সত্য জনসমাজে প্রচার করিয়া যান এবং ইহার সার সঙ্কলন এখন গীতায় দেখা যায়। তিনি যোগ-সাধনপ্রণালী আর্য্যসমাজে পুনঃ প্রবর্ত্তিত করেন। তাঁহার প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া পুরাকালে মুনি ঋষিগণ যোগাভ্যাস করিয়া যোগসিদ্ধ হন। যেমন পারসিক সমাজে জরথুস অগ্ন্যুপাসনা প্রবর্ত্তিত করাতে চিরদিন পূজিত হইতেছেন, সেইরূপ প্রাচীন আর্য্য সমাজে শ্রীকৃষ্ণ সনাতন ধর্ম্মের সংস্কার ও

পুনঃ প্রবর্ত্তন করাতে জগৎমান্য হইয়াছেন। এই সকল সুমহৎ কার্য্যের জন্য তিনি পুরুষোত্তম উপাধি প্রাপ্ত হন। দুঃখের বিষয়, তাঁহার জীবনীর এই মহৎ কার্য্য শাস্ত্রে ভস্মাচ্ছাদিত রহিয়াছে।

সত্য বটে, ঈশা ও বুদ্ধদেবের ন্যায় তিনি জগতে নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিয়া নিজের লোকাতিগ কৃতিত্ব দেখান নাই; কিন্তু তিনি নির্জ্জনে যাহা উপদেশ দেন ও করিয়া যান, তৎপ্রদর্শিত মার্গ অনুসরণ করিয়া বুদ্ধদেব ও ঈশা যোগ-সিদ্ধ হন এবং যোগবলে অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন পূর্ব্বক জগতে নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিয়া যান। অতএব মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে, আমাদের শ্রীকৃষ্ণই পৃথিবীস্থ যাবতীয় ধর্ম্মের মূলাধার এবং শাস্ত্রেও চিরদিন বিঘোষিত হইতেছে—

যতঃ কৃষ্ণ স্ততো ধর্ম্মঃ যতোধর্ম্ম স্ততোজয়ঃ।

এত বড় মহৎ কার্য্য করাতে কৃষ্ণশব্দ ঈশ্বরবাচক এবং এই নামানুকরণেও পাশ্চাত্য জগতে খৃষ্ট (Christos the anointed) উপাধি চলিতেছে।

তাঁহার অলৌকিক বলবিক্রম।

ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি ক্ষত্রিয়োচিত অসাধারণ বাহুবীর্য্যে বিভূষিত ছিলেন। ইহাতে শাস্ত্রকারেরা দেখান, ক্ষত্রিয়ের দেহে কিরূপ বলবীর্য্য থাকা উচিত। মথুরাধিপতি কংসের সিংহদ্বারে যে কুবলয়পীড় নামে এক মহা-হস্তী ছিল, তিনি দন্তোৎপাটন করিয়া উহাকে নিধন করেন। ইহাতে তাঁহার বাহুবীর্য্যের সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। যাঁহারা এ কথায় অবিশ্বাস করিবেন, তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত, বঙ্গবিজেতা বাকৃথিয়ার খিলিজি এক হস্তীর শুণ্ড তরবারি বলে কর্ত্তন করাতে দিল্লীশ্বর কুতাবউদ্দীনের প্রিয়পাত্র হন। আরও তিনি কংস ও তদীয় মল্লদ্বয়কে মল্লযুদ্ধে নিহত করেন। ইহাতেও তিনি অসা-ধারণ বাহুবীর্য্যের সম্যক পরিচয় দেন। এইরূপ বাহুবীর্য্যে ভূষিত হওয়ায় তিনি ক্ষত্রিয় জাতির পূর্ণ আদর্শ।

তাঁহার অলৌকিক সমাজধর্ম্ম পালন।

যিনি রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া গ্রহবৈলক্ষণ্যে গোপগৃহে পালিত হন, তিনি বাল্যকালে গোপবালকের ন্যায় গরু চরান। ইহাতে তিনি বৈশ্য

জাতির পূর্ণ আদর্শ হন এবং জগৎকে দেখান, কি প্রকারে গোপালন ও গো সেবা করিতে হইবে। যিনি এক রাজ্যের রাজমন্ত্রী হইয়া নিজগুণে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে অর্ঘ পাইয়া চক্রবর্ত্তী অধীশ্বরের ন্যায় সম্মানিত হন, তিনি সমাজ ধর্ম্ম দেখাইবার জন্য হিন্দুসমাজের অধিনায়ক ব্রাহ্মণজাতির পাদপ্রক্ষালনে নিযুক্ত হন। ইহাতে তিনি জগৎকে দেখান, ব্রাহ্মণ জাতির কিরূপ সম্মান রক্ষা করা উচিত। দেখ, বুদ্ধদেব ব্রাহ্মণজাতিকে অমান্য করিয়া যে ধর্ম্ম ভারতে প্রচার করিলেন, তাহা কালে ভারত হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া গেল; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সনাতন ধর্ম্ম ভারতে চিরদিন প্রবল আছে এবং ব্রাহ্মণ জাতিও চিরদিন হিন্দুসমাজের অধিনায়ক আছেন।

তাঁহার অলৌকিক স্বার্থত্যাগ।

যখন তিনি দুর্বৃত্ত কংসকে নিধন করিয়া তদীয় কারারুদ্ধ পিতা উগ্রসেনকে কারাগার হইতে আনাইয়া মথুরার রাজসিংহাসনে বসান, তখন তিনি রাজ ধর্ম্মের প্রকৃত মাহাত্ম্য দেখাইলেন। মনে করিলেই, তিনি নিজ পিতাকে মথুরার সিংহাসনে বসাইতে পারিতেন বা নিজে বসিতে পারিতেন। কিন্তু আদর্শধর্ম্মাত্মা শ্রীকৃষ্ণ সকল স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া যাঁহার রাজ্য তাঁহাকে দিয়া রাজধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন।

যখন তিনি কারারুদ্ধ রাজন্যবর্গের উদ্ধারার্থে মগধরাজধানী গিরিব্রজে গিয়া মগধাধিপতি জরাসন্ধকে ভীম দ্বারা মল্লযুদ্ধে বিনাশ করান, তখন তিনি মনে করিলেই মগধের স্বর্ণসিংহাসনে নিজে উপবেশন করিতে পারিতেন। কিন্তু আদর্শ ধর্ম্মাত্মা শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধপুত্র সহদেবকে পৈতৃক সিংহাসনে বসাইয়া রাজধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন। যদি তিনি পাশ্চাত্য রাজনীতিজ্ঞ মহাপুরুষ হইতেন, অনায়াসে সেই বিশাল সাম্রাজ্য গ্রাস করিয়া বিলাসসাগরে ভাসিতেন। দেখ, যে জরাসন্ধ তাঁহাকে বিবিধমতে উত্যক্ত করিলেন, যাহার ভয়ে তিনি মথুরা পুরী ত্যাগ করিয়া সুদূরবর্ত্তী গুজরাটের উপকূলে গিয়া রহিলেন, তাঁহাকে মারিয়া, তাঁহার রাজ্য গ্রহণ করিলেন না, এই বা কেমন কথা? কিন্তু ধর্ম্মরাজ্যস্থাপয়িতা শ্রীকৃষ্ণ পুত্রকে পৈতৃক সিংহাসনে বসাইয়া ধর্ম্মের মাহাত্ম্য রাখিলেন। এস্থলে সহদেবও পিতৃহত্যাকারীর মিষ্টভাষিতা, সদাশয়তা ও সৌহৃদ্যে

মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত চিরমিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হন। এই মহৎ কার্য্য করাতে তাঁহার যশসৌরভ চতুর্দ্দিকে অভিব্যাপ্ত হয় এবং কারামুক্ত রাজন্যবর্গ দেশে দেশে চিরদিন তাঁহার অশেষ প্রশংসা কীর্ত্তন করিতে থাকেন। এই প্রকারে নানা-বিষয়ে তিনি স্বার্থত্যাগ করিয়া ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিয়া যান।

তাঁহার অলৌকিক সম্মান।

যিনি রাখালবেশে গরু চরাইয়া বাল্যজীবন কাটান, যিনি যৌবনে নানা বিদ্যায় বিশারদ হইয়া এক রাজনীতিজ্ঞ মহাপুরুষ হন ও একরাজ্যের মন্ত্রীস্বরূপ হন, যিনি সনাতন ধর্ম্মের সংস্কার, ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন নিজ জীবনের মুখ্য ব্রত করেন, তিনি যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে চক্রবর্ত্তী অধীশ্বরের ন্যায় স্রকচন্দন পাইয়া অলৌকিক সম্মানে বিভূষিত হন। যিনি ভগবানের অবতার, যাহার গুণে সমগ্র জগৎ বিমুগ্ধ, তিনিই রাজসূয়যজ্ঞে ঈদৃশ সম্মান পাইবার উপযুক্ত। যথার্থ বলিতে কি, শ্রীকৃষ্ণ এতকাল হিন্দুর ঘরে ঘরে ও মন্দিরে মন্দিরে যে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি পাইয়া আসিতেছেন, তাহার সহিত তুলনা করিলে ইন্দ্রপ্রস্থে রাজসূয় দরবারের সম্মান অতি তুচ্ছ বোধ হয়।

তাঁহার অলৌকিক দয়া।

তিনি অসাধারণ দয়াগুণে বিভূষিত বলিয়া যুদ্ধে লোকক্ষয় করিতে এত নারাজ ছিলেন। ইহার জন্য তিনি মথুরাপুরী ত্যাগ করিয়া দ্বারকায় গিয়া বাস করেন এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের উপক্রমে যুদ্ধ নিবারণার্থ স্বয়ং দূতবেশে হস্তিনাপুরে যান। যখন তিনি দেখিলেন যুদ্ধ অনিবার্য্য, দুর্বৃত্ত দুর্য্যোধন সূচ্যগ্র মেদিনী বিনাযুদ্ধে পাণ্ডবদিগকে দিবেন না, তখন আদর্শ-ধর্ম্মাত্মা নিরস্ত্র হইয়া অর্জ্জুনেররথে নীচসারথ্য স্বীকার করিলেন, পাছে অস্ত্রপ্রয়োগ করিয়া নরবধ করিতে হয়। ইহাতে তিনি জগৎকে দেখান, যথাসাধ্য সকলে রণক্ষেত্রে লোকক্ষয় করিতে পরাঙ্মুখ থাকিবে।

তাঁহার অলৌকিক ক্ষমা।

যখন চেদিরাজ শিশুপাল রাজসূয়যজ্ঞে তাঁহার অর্ঘপ্রাপ্তিতে ঈর্ষাপরবশ হইয়া অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করিতে লাগিলেন, তখন তিনি প্রথমে নীরবে

সকল সহ্য করেন। পরে যখন দেখিলেন, দুর্ব্বৃত্ত শিশুপাল অন্যান্য রাজাদের সহিত চক্রান্ত করিয়া যজ্ঞ নাশ করিতে উদ্যত, তখন তিনি উহাকে আর ক্ষমা করিলেন না এবং সুদর্শন চক্রদ্বারা তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া যজ্ঞে শান্তি স্থাপন করিলেন। কংস বল, জরাসন্ধ বল, শিশুপাল বল, কেবল দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য তিনি অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। এমন না হইলে কেন তিনি ঈশ্বরাবতার বলিয়া ভারতে চিরদিন পূজিত হইবেন ও ক্ষত্রিয় জাতির আদর্শ পুরুষ হইবেন?

তাঁহার অলৌকিক সৌহৃদ্য।

বাল্যকালে বাল্যসুহৃৎ শ্রীদামাদির কথা ছাড়িয়া দেও, তিনি যৌবনে পাঠ্য সুহৃৎ সুদামা ও প্রিয়সখা অর্জ্জুনের সহিত যেরূপ সদ্ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সৌহৃদ্যের সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। বন্ধুত্বের খাতিরে স্বয়ং রাজ-রাজেশ্বর হইয়া কে কোথায় রথের সারথ্য করিতে যায়? কে কোথায় এক দীন দরিদ্র ব্রাহ্মণের ক্ষুদকুড়ো খাইয়া অশেষ পরিতোষ লাভ করত তাঁহার গৃহদ্বার নির্ম্মাণ করাইয়া সংসার চিরদিনের জন্য সচ্ছল করিয়া দেয়? এমন না করিলে কেন তিনি দীনবন্ধু ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পূজিত হইবেন?

তাঁহার অলৌকিক ভক্তবাৎসল্য।

যখন তিনি দূতবেশে হস্তিনাপুরে যান, তৎকালে তিনি দুর্য্যোধনের রাজভোগ ত্যাগ করিয়া পরমভক্ত বিদুরের গৃহে খুদকুড়া খাইয়া অশেষ পরিতোষ লাভ করেন। ইহাতে তিনি জগৎকে দেখান, দীনদরিদ্র হও, পথের কাঙ্গাল হও, তুমি অনন্য ভক্তির সহিত ভক্তবৎসল হরিকে যাহা দিবে, তাহাই তিনি সাদরে গ্রহণ করিবেন। সকলে তাঁহাকে একমাত্র ভক্তি ও প্রেমডোরে বাঁধিতে পারে।

যেমন শ্রীহরি গোলকধাম হইতে পরমভক্ত প্রহ্লাদকে নানা বিপদে রক্ষা করিয়া ভক্ত বাৎসল্যের পরাকাষ্ঠা দেখান; সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণও দ্বারকা হইতে পরম ভক্তিমতী দ্রৌপদীকে এক মহাসঙ্কটে উদ্ধার করিয়া ভক্তবাৎসল্যের পূর্ণ পরিচয় দিয়াছেন। যৎকালে কুরুসভায় পাণ্ডবগণ শকুনির সহিত দ্যূত ক্রীড়ায় দ্রৌপদীকে পরাস্ত হন, তৎকালে দুর্য্যোধনের আদেশে দুঃশাসন

রজস্বলা একবস্ত্রা দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক সভায় আনয়ন করিয়া বিবস্ত্রা করিবার জন্য তদীয় বস্ত্র আকর্ষণ করিতে থাকে। সতী সাধ্বী নারীর সতীত্ব নাশ ও লজ্জানাশ এক মহাসঙ্কট। এই মহাসঙ্কটে বিপদভঞ্জন মধুসূদনই তাঁহার একমাত্র সহায়। যখন দ্রৌপদী দেখিলেন, তাঁহার পঞ্চস্বামী মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় নির্বীর্য্য হইয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন, তখন তিনি অনন্যোপায় হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রাণভরে কাতরকণ্ঠে ডাকিতে থাকেন। তদীয় আর্ত্তনাদের তরঙ্গমালা মুহূর্ত্ত মধ্যে সূক্ষ্ম জগতের আকাশ ভেদ করিয়া দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞানকর্ণপটাহে বিদ্ধ হইল এবং তিনি তৎক্ষণাৎ তথা হইতে যোগবলে দ্রৌপদীর বস্ত্র অন্নপূর্ণার স্থালীর ন্যায় অক্ষয় করিয়া দেন। ইহাতে পাপাত্মা দুঃশাসন বিফলমনোরথ হইয়া পড়িল এবং সভাস্থ সকলে শ্রীকৃষ্ণের মহাচক্রে লজ্জায় অভিভূত হইল। যে পাপিষ্ঠ নরাধম অবলা নারীর উপর পাশব অত্যাচার করে, তাহার মস্তকোপরি চক্রীর সুদর্শন চক্র নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে।

কুরুক্ষেত্র মহাসমরে পাণ্ডবদিগের সহায়তা।

এই মহাযুদ্ধে তিনি পাণ্ডবদিগের পক্ষ অবলম্বন করেন এবং তাঁহারই সুপরামর্শে উঁহারা এই দুস্তর মহাসাগর উত্তীর্ণ হইয়া জয়লাভ করেন। এ যুদ্ধ অষ্টাদশ দিবস স্থায়ী হয়। ইহাতে অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী সৈন্য নিহত হয় ও পৃথিবী বীরশূন্যা হইয়া যায়। যে ভূভার হরণের জন্য তিনি ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হন, এই প্রকারে তাহা সাধন করিয়া যান।

এ স্থলে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া ও অসাধারণ বাহুবীর্য্যে সুশোভিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ কেন এমন মহাসমরে উদাসীন ভাবে রহিলেন ও অর্জ্জুনের সামান্য সারথ্য করিলেন? তিনি মনে করিলে কি পাণ্ডবগণের সেনানীপদে অধিরূঢ় হইয়া নিজশৌর্য্যে পৃথিবী প্রকম্পিত করিতে পারিতেন না? তবে কেন তিনি এমন যুদ্ধক্ষেত্রে যেখানে সকলের হাত নিষ-পিষ করে, সেখানে তিনি বৃদ্ধ জরদ্গবের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন? ইহাতে শাস্ত্রকারদিগের গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। এই সংসাররূপ মহাকুরুক্ষেত্রে, এই বিশ্বজনীন জীবনসংগ্রামে ঈশ্বর কি স্বহস্তে কোন কার্য্য করেন? আমরাই হস্তপদ চালাইয়া সমস্ত কাজ করি; কিন্তু ঈশ্বর হৃদ্দেশে থাকিয়া মনের গভীর-

চিন্তারাশি চালাইয়া আমাদিগকে বিবিধ কর্ম্মে প্রেরণ করেন। প্রকৃতির এই গূঢ় রহস্য জানাইবার জন্য শাস্ত্রকারেরা কুরুক্ষেত্র মহাসমরে ভগবানের পূর্ণ অবতার শ্রীকৃষ্ণকে এমন নিশ্চেষ্ট ভাবে রাখিয়া দিলেন। অর্জ্জুন নপুংসক শিখণ্ডীকে সম্মুখে রাখিয়া পিতামহ ভীষ্মদেবকে নিরস্ত্র করিলেন, পরে রথ হইতে অবতারিত করিয়া শরশয্যায় শায়িত করিলেন। পুত্র অভিমন্যু নিহত হইবার পর জয়দ্রথবধে প্রতিশ্রুত হইয়া অর্জ্জুন একমাত্র তাঁহারই চেষ্টায় নিজ প্রতিজ্ঞা পালন করিতে সমর্থ হন। এস্থলে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ অল্প বেলা থাকিতে যোগমায়ায় সূর্য্যদেবকে আচ্ছন্ন করিয়া কাল্পনিক সন্ধ্যা আনায়ন করেন, (অর্থাৎ) সর্ব্বগ্রাস গ্রহণে যেরূপ দেখায়, তদবস্থায় সূর্য্যকে রাখিয়া দেন, পরে যখন অর্জ্জুন প্রাণ বিসর্জ্জনার্থ চিতায় অরোহণ করিতে প্রস্তুত হন, তৎকালে জয়দ্রথ প্রভৃতি সকলেই তাঁহার মৃত্যু দেখিতে আইসেন। সময় বুঝিয়া শ্রীকৃষ্ণ হঠাৎ সূর্য্যের আবরণ মুক্ত করিয়া দেন, ইহাতে অধিক বেলা আছে দেখিয়া অর্জ্জুন জয়দ্রথকে বধ করিলেন। অনেকে এ ঘটনাকে অতিপ্রকৃত ও অসম্ভব মনে করেন। তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত, সংসারে যোগবলে অসম্ভব সম্ভব হইয়া থাকে। ঈশাদেব গ্যালিলিয়ো হ্রদের ঝটিকা শান্ত করেন, একথা যখন খৃষ্টানেরা বিশ্বাস করে, তখন আমরা কেন উপরোক্ত ঘটনায় অবিশ্বাস করিব?

এইরূপ তাঁহার পরামর্শানুসারে অশ্বত্থামার তথা-কথিত মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে প্রায়োপবিষ্ট দ্রোণাচার্য্যকে ধৃষ্টদ্যুম্ন সংহার করেন, অর্জ্জুন কর্ণকে বিনাশ করেন এবং ভীম গদাযুদ্ধে দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ করিয়া প্রাণনাশ করেন। অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রপ্রয়োগে উত্তরার গর্ভপাতের সূত্রপাত হইলে শ্রীকৃষ্ণ অদ্ভুত উপায়ে তাহা ব্যর্থ করিয়া পাণ্ডববংশ রক্ষা করেন। এইরূপে দুরাচার কুরুবংশীয়েরা নিহত হইলে পর তিনি যুধিষ্ঠিরকে রাজসিংহাসনে বসাইয়া ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করেন।

শ্রীকৃষ্ণের অন্তিম দশা।

ব্রহ্মশাপে যদুবংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। দুর্বিনীত যদুবংশীয়েরা প্রভাসতীর্থে সুরাপানে মত্ত হইয়া আপনাপনি কাটাকাটি করাতে সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এইরূপ নানা উপায়ে ভূভার হরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ জরাব্যাধের বাণে নিজ

দেহ বিসর্জ্জন করিয়া বৈকুণ্ঠে চলিয়া যান। যেমন ঈশাদেব ক্রুসে বিদ্ধ হইয়া অপঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়া সলিঙ্গশরীরে স্বর্গধামে যান, সেইরূপ আমাদের পরমপূজ্য শ্রীকৃষ্ণও অপঘাতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া বৈকুণ্ঠে চলিয়া যান।

শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন।

আমাদের নিকট তিনি মায়াতীত গুণাতীত পরব্রহ্মের পূর্ণ অবতার; এজন্য শাস্ত্রে তিনি পূর্ণব্রহ্মসনাতন। আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মের তিনি প্রকৃত আনন্দরূপ এবং অনন্তপ্রেমময় ভগবানের প্রেমাবতার। তিনি মূর্ত্তিমান শঙ্খ-চক্রগদাপদ্মধারী শ্রীবিষ্ণু এবং পদ্মপালাশলোচন যোগেশ্বর শ্রীহরি। তিনি নিখিল সংসারের পতি ও নিয়ন্তা। তাঁহার তৃতীয় নয়ন স্বভাবতঃ স্ফুরিত থাকাতে যোগবল সহজাত ছিল; এজন্য তিনি সংসারে অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ দেখান, অল্পকালে সমগ্র বেদ বেদান্তে সুপণ্ডিত হন, অলৌকিক ধর্ম্মোপদেশ দেন ও সনাতন ধর্ম্মের সংস্কার করিয়া যান।

জীবনের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যে সকল ভাব হৃদয়ে স্বতঃ উত্থিত হয়, তাহা তিনি স্বজীবনে পূর্ণভাবে অভিনয় করিয়া সকল বিষয়ে আমাদের পূর্ণ আদর্শ-স্বরূপ (Ideal porfection) হন। কি বাল্য, কি কৈশোর, কি যৌবন, কি বার্দ্ধক্য, মানবজীবনের সকল সময়ের পূর্ণভাব অভিনয় করিয়া যিনি ভাবশিক্ষা বিষয়ে আমাদের পূর্ণ আদর্শ, তিনিই এ সংসারে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন। যিনি স্বজীবনে হৃদয়স্থ বিবিধ রসের পূর্ণ অভিনয় দেখাইয়া সকলকে ভবপারাবারে সাহায্য করেন, তিনিই এ সংসারে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন। যিনি স্বজীবনে অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ ও ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া সকল জাতির ও সকল অবস্থাপন্ন লোকের পূর্ণ আদর্শ, তিনিই এ সংসারে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন।

কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, সমাজের সকল জাতি যাঁহাকে সকল বিষয়ে পূর্ণ আদর্শ জ্ঞান করে, তিনিই ভগবানের পূর্ণ অবতার। কি দরিদ্র, কি মধ্যবিত্ত, কি ধনাঢ্য, যাঁহাকে সকলে নিজ নিজ জীবনের পূর্ণ আদর্শ জ্ঞান করে, তিনিই ভগবানের পূর্ণ অবতার। শ্রীকৃষ্ণের জীবনে ব্রাহ্মণের পক্ষে যেমন অলৌকিক ধর্ম্মোপদেশ ও একাগ্রতা, ক্ষত্রিয়ের জন্য যেমন অলৌকিক শৌর্য্যবীর্য্য, ধর্ম্মযুদ্ধ ও রাজনৈতিক পটুতা, বৈশ্যের জন্য যেমন অলৌকিক

গোপালন দেখা যায়, এমন সদগুণের একত্র সমাবেশ কোন দেশের কোন ধর্ম্মের আদর্শ পুরুষে দেখা যায় না। খৃষ্ট ও বৌদ্ধধর্ম্ম সন্ন্যাসী ধর্ম্মোপদেশককে আপনাদের আদর্শ পুরুষ জ্ঞান করিতে পারে। কিন্তু যে হিন্দুধর্ম্ম জীবনের ও সমাজের সকল অনুষ্ঠানে নিজের প্রীতিকর অনুশাসন পূর্ণভাবে চালায়, তাহাকে তদনুরূপ আদর্শ ঠিক করিতে হয়। এজন্য বিশ্বপ্রেমে প্রেমিক সর্ব্বরসের পূর্ণ অভিনায়ক, সকল ধর্ম্মের মূলাধার শ্রীকৃষ্ণ আমাদের নিকট পূর্ণব্রহ্ম সনাতন। এখন এস একবার তাঁহাকে প্রাণভরে ডাকি—

(নমঃ) মাধব যাদব পাবন পাবনং
নিয়তি নিরঞ্জন সাঞ্জন ভানং।
চঞ্চলচাবরচিক্কণ চিকুরং
শিখিপুচ্ছ বিরাজিত গুণধরং
মকরন্দ বিনিন্দিত চারু দৃশং
প্রণমামি ব্রজগোপবেশধরং।
কামচাপপরাভবং সুভ্রুতটং
শুকচঞ্চু বিলাঞ্ছিত নাশাপুটং
মৃগমদমদহর অলিবাগং
প্রণমামি পরমেশ প্রেমপরং
সুমণ্ডল কুণ্ডল মণ্ডিত গণ্ডং
কুন্দাভরদনং তারাপতিখণ্ডং
বিম্বঅধরং রতিরসপূরিতং
প্রণমামি পরমেশ প্রেমপরং।
মতিমালবিমণ্ডিতং গ্রীবাতটং
পীতধটীপট পরিধানপরং।
বনমালবিলম্বিতং ঔরদেশং
প্রণমামি পরমেশ প্রেমপরং।
মোহনফলাফলং কুশলবেণুং
বাদয়তে মৃদু চারয়তি ধেনুং।

কৃষ্ণাবতার।

নবনীরদনিন্দিত নীলদেহং
প্রণমামি পরমেশ প্রেমপরং।
কলকলকলাপং বেণু আলাপং
জনিতং যমুনা কূলকূলনাদং।
মনসিজম্লানং উপজাতকামং
প্রণমামি পরমেশ প্রেমপরং।
মুখরিত মঞ্জিরমত বিভাষং
নখরুচি কৌমুদিচন্দ্রমাহাসং
পাবক পাবক জগদমল নাশং
প্রণমামি পরমেশ প্রেমপরং।
যোগাযোগ জ্ঞানতপঃ পারগতং
ভোগাভোগবিভোগ বিশেষযুতং।
অভিসাররতং প্রেমপাশগতং
প্রণমামি গোবিন্দং মমৈকনাথং।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

তীর্থভ্রমণ

তীর্থভ্রমণ বা ধর্ম্মার্থে দেশপর্য্যটন চিরদিন সনাতন হিন্দুধর্ম্মের এক প্রধান অঙ্গ। কি বৈদিক, কি বৌদ্ধ, কি পুরাণিক, সকল যুগে ধর্ম্মাত্মা হিন্দু ধর্ম্মের জন্য তীর্থভ্রমণ করিয়া আসিতেছেন। বৈদিক যুগে বানপ্রস্থগণ দেশে দেশে পর্য্যটন করিয়া অন্যান্য দেশের বিষয় অবগত হইতেন। বৌদ্ধযুগে ধর্ম্মপ্রচারকগণ ধর্ম্মপ্রচার করিবার জন্য অন্যান্য দেশে গমন করিতেন। মহাভারতে এমন অনেক তীর্থস্থলের উল্লেখ আছে, যাহা এখন ভারতে দেখা যায় না। ইহাতে সিদ্ধান্ত করা উচিত, পুরাকালে ভারতবাসিগণ নানাদেশে পর্য্যটন করিয়া ভারতীয় জ্ঞানজ্যোতি বিকীর্ণ করিতেন। যে ভারতের অধিপতিগণ কস্মিনকালে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন নাই, সে ভারতের তীর্থযাত্রী-

রাই অন্যান্য দেশে ভারতীয় সভ্যতাজ্যোতি বিস্তীর্ণ করিয়াছে। যে ইংরাজ গর্ব্ব করিয়া বলেন, প্রথমে তাঁহাদের বাণিজ্যপোত, পরে সমরপোত যায়, তৎপরে দেশজয় ও সাম্রাজ্যবিস্তার হয়, সে ইংরাজ ভারতের কথা শুনিয়া হাসিবেন।

শাস্ত্রের আদেশ, তীর্থভ্রমণে মানবের অশেষ পাতকনাশ ও পুণ্যলাভ হইবে। সমাজস্থ যাবতীয় লোকের জন্য ইহা বিহিত। কি মহোপাধ্যায় পণ্ডিত বা গণ্ডমূর্খ, কি রাজাধিরাজ বা পথের ভিখারী, কি ধর্ম্মাত্মা বা পাপাত্মা, কি সাধুসন্ন্যাসী বা গৃহস্থ, সকলের জন্য এ ধর্ম্ম তীর্থভ্রমণ চিরদিন উপদেশ দিতেছে। কলিকালে গঙ্গাস্নানের ন্যায় তীর্থভ্রমণ আমাদেব এক প্রধান ধর্ম্মানুষ্ঠান।

তীর্থস্থলের মাহাত্ম্য।

যে স্থলে কোন অত্যাশ্চর্য্য প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখা যায়, যে স্থলে কোন মহাত্মার আবির্ভাব বা কোন জাগ্রত দেবতার অধিষ্ঠান হয়, সেই সেই স্থলকে হিন্দুধর্ম্ম তীর্থ বলিয়া চিবদিন প্রচার কবে এবং শাস্ত্রে উহাদের অপার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া সাধারণের সমক্ষে উহাদিগকে চিরদিনের জন্য পূজ্য ও পবিত্র করে।

ধর্ম্মাত্মা হিন্দুর নয়নে তীর্থস্থলের মাহাত্ম্য ও মহিমা অপার ও অপরিসীম। তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস, ধর্ম্মের সেই পীঠস্থান দর্শন করিলে, সেখানকার পূজ্য দেবতার পাদপদ্মে প্রণত হইলে, সেখানকার পুণ্যসলিলে অবগাহন করিলে, তাঁহার অসার মানবজীবন সার্থক হইবে এবং অশেষ পাপক্ষয় ও পুণ্যলাভ হইবে।

ধর্ম্মের সেই পীঠস্থলে যেরূপ সুরম্য ও বিশাল মন্দির প্রতিষ্ঠিত, যেরূপ পুণ্যতোয়া প্রসন্নসলিলা নদী বহমানা, যেরূপ অপূর্ব্ব সাধুসম্মিলন, শাস্ত্রালাপ ও মানবসমাগম, যেরূপ পণ্যদ্রব্যের অপূর্ব্ব ক্রয় বিক্রয়, সকলই তীর্থযাত্রীর নিকট অলৌকিক ও মনোরম। ইহার জন্য সকলে এতকাল শত শত রজত মুদ্রা ব্যয় করিয়া ঐ সকল পীঠস্থল দর্শন করত নিজ নিজ জীবন সার্থক করিতেছে।

সমাজে ধর্ম্মোন্নতির জন্য তীর্থস্থলগুলি প্রতিষ্ঠিত জানিবে। ইহারা ধর্ম্মরাজ্যের রাজধানীস্বরূপ। যেমন শাসনতন্ত্র শাসনপ্রণালী সুকর করিবার জন্য স্থানে স্থানে নিজ কেন্দ্র স্থাপন করে, সেইরূপ তীর্থস্থলগুলি ধর্ম্মরাজ্যের কেন্দ্রস্বরূপ। এই সকল কেন্দ্র হইতে ধর্ম্মভাব সমাজের চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতেছে। যেমন রাজা নিজ রাজধানীকে সুরম্য সৌধমালায় ও প্রশস্ত রাজবর্ত্মে সুশোভিত করিয়া উহার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করেন, সেইরূপ হিন্দুধর্ম্ম ও তীর্থস্থলগুলিকে অপূর্ব্ব দেবমন্দিরে ও সদাব্রতে সুশোভিত করিয়া উহাদের অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য বর্দ্ধন করিয়াছে। যেমন বিদ্যালয়ে বিবিধ ছাত্রদিগের সম্মিলনে উহাদের ভালরূপ বিদ্যাশিক্ষা হয়, সেইরূপ তীর্থস্থলে নানাদেশের ধর্ম্মাত্মা সাধুদিগের একত্র সমাগমে সকলের ধর্ম্মভাব সম্যক বর্দ্ধিত হইতেছে।

সুশিক্ষিত সম্প্রদায় তীর্থভ্রমণকে ধর্ম্মের একটা মহৎ কুসংস্কার মনে করেন। তাঁহারা ভাবেন, মূর্খ জনসাধারণের একি কুসংস্কার, যে উহারা শীত গ্রীষ্মে দারুণ কষ্ট ভোগ করিয়া ও অর্থরাশি অনর্থক ব্যয় করিয়া ঐ সকল তীর্থস্থল দেখিতে যায়? হে জগদীশ! কবে উহাদের সুমতি হইবে ও সুশিক্ষা হইবে? রে অপদার্থ হিন্দুধর্ম্ম! তোমার একি বিড়ম্বনা। কোথায় বদ্রীনারায়ণ ও রামেশ্বরসেতুবন্ধ! কোথায় হরিদ্বার ও গঙ্গাসাগর! কোথায় শ্রীক্ষেত্র ও দ্বারকা! কোথায় মথুরা ও বেনারস! এত দূরবর্ত্তী স্থলগুলিকে তীর্থ করাতে তোমার কোন্ অভীষ্ট সিদ্ধ হইতেছে? যে অন্তর্যামী ঈশ্বর সকলের হৃদয়ে সদা বিরাজমান, ঘরে বসিয়া কি তাঁহার আরাধনা চলে না? তবে কেন তুমি সকলকে দূরদেশে গিয়া তাঁহার অন্বেষণ করিতে বল?

দেখ, লোকে তীর্থভ্রমণের জন্য কত না কষ্ট সহ্য করিতেছে? কত দীন-দরিদ্র সমস্ত জীবনের পুঁজি পাটা তীর্থস্থানে অনর্থক ব্যয় করিয়া কিরূপ নিঃসম্বল হইতেছে? তত্রত্য পাণ্ডারাও কত নিষ্ঠুর ভাবে যাত্রিবর্গ হইতে প্রচুর অর্থ নিষ্পীড়ন করিয়া আপনাদের ভোগবিলাস চরিতার্থ করিতেছে। পূর্ব্বে সহস্র সহস্র যাত্রী দুর্গম পথে দস্যু কর্ত্তৃক সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হইয়া কিরূপ ধনপ্রাণে মারা যাইত! আজ যদিও ব্রীটিশসিংহের কল্যাণে ঐ সকল দূরবর্ত্তী স্থান অনায়াসগম্য হইয়াছে, তথাচ এক স্থানে লক্ষাধিক লোকের সমাগম হওয়াতে ওলাদেবীর অনুগ্রহে বহুসংখ্যক যাত্রী যমসদনে প্রেরিত হইতেছে। এই

সকল ভাবিলে কি স্বধর্ম্মের কোনরূপ প্রশংসা করিতে ইচ্ছা হয়? এমন অপদার্থ ধর্ম্ম সংসারে আর দ্বিতীয় নাই বলিলেই হয়।

আরও দেখ, সুসভ্য ইউরোপ ও আমেরিকাখণ্ডে এখন কেহ তীর্থভ্রমণে বহির্গত হয় না। জ্ঞানালোক ও সভ্যতালোক পাশ্চাত্য সমাজে যত বিকীর্ণ হইতেছে, ধর্ম্মের এ কুসংস্কার ততই ক্রমশঃ লুপ্ত হইতেছে। কিন্তু অর্দ্ধসভ্য প্রাচ্যজগতে ধর্ম্মের এ কুসংস্কার এখনও বলবৎ রহিয়াছে। সুখের বিষয়, পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তৃতির সঙ্গে ইহা অচিরে দূরীভূত হইবে।

যাঁহারা তীর্থভ্রমণের মহোপকারিতা আদৌ বুঝিতে পারেন না, ইহাতে লোকবিশেষের ও সমগ্রদেশের যে কত মহোপকার সাধিত হইতেছে, তাহা যাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ, তাঁহারাই এই প্রকারে স্বধর্ম্মের নিন্দা করিয়া থাকেন। মনে কর, তীর্থস্থলের যে অপরূপ মাহাত্ম্য শাস্ত্রে দেখা যায় এবং যাহা এখন অনেকের মনে বদ্ধমূল, তাহা তোমার সুশিক্ষিত মনের নিকট সর্ব্বৈব অমূলক; মনে কর, যে পাপক্ষয় ও পুণ্যলাভের জন্য সকলে তীর্থ দর্শন করে, তাহা তাহাদের অশিক্ষিত মনের একটা ভ্রান্তিমাত্র, তথাচ তীর্থভ্রমণ দ্বারা ব্যক্তিগত ও সমাজগত যে কত মহোপকার সাধিত হইতেছে, তাহা যদি তোমরা একবার ভাবিয়া দেখ, তোমরা কদাচ হিন্দু-ধর্ম্মের নিন্দা করিবে না।

পুরাণে সকলেই পাঠ করেন, দক্ষযজ্ঞে তদীয় কন্যা সতী পতিনিন্দা শ্রবণে প্রাণত্যাগ করিবার পর তদীয় দেহ একান্নভাগে খণ্ডিত হইয়া ভারতের একান্ন স্থানে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। ঐ সকল স্থল কালে ধর্ম্মের পীঠস্থল বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। সুশিক্ষিত পাঠকগণ পুরাণের এ কথায় অবিশ্বাস করিয়া বলিবেন, বৌদ্ধধর্ম্মের সুসময়ে জ্যোতিষ শাস্ত্রের উন্নতিকল্পে কালসম্মিলনের জন্য ভারতের যে সকল ভিন্ন ভিন্ন নগরে মানমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, উহারা পৌরাণিক যুগে তীর্থস্থল বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছে; পরে দেবদেবীর মন্দিরাদি নির্ম্মিত হইয়া উহাদের গৌরব ও মাহাত্ম্য বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই প্রকারে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আমাদের তীর্থস্থলগুলির মাহাত্ম্য ও গৌরব হ্রাস করিতে চেষ্টা পান। যখন লক্ষ লক্ষ লোক পুণ্যলাভের জন্য ঐ সকল পুণ্যক্ষেত্রে

বৎসরে বৎসরে গমন করিতেছে, তখন পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের কথায় কি বা আসিয়া যায়?

তীর্থভ্রমণ দ্বারা ব্যক্তিগত মহোপকার।

কোন দেশ স্বচক্ষে দর্শন করিলে লোকের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায়। ঐ দেশের রীতিনীতি, চালচলন ও আবভাব স্বচক্ষে দর্শন করিলে যে জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহা পূর্ণজ্ঞান। আর স্বগৃহে ভূচিত্রাদি দেখিয়া ভূগোল ও ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পাঠ করিলে যে জ্ঞানলাভ করা যায়, তাহা অসম্পূর্ণ জ্ঞান। এস্থলে দেশপর্য্যটনের সহিত ভূগোলপাঠের তুলনা হইতে পারে না। সমাজের যে অবস্থায় ভূগোলাদি গ্রন্থের অপ্রচলন থাকে, সে সময়ে লোকে তীর্থভ্রমণ বা দেশ পর্য্যটন করিয়া দেশবিশেষের জ্ঞানলাভ করে ও স্বসমাজে তাহা প্রচার করে। দেখ না এখনও যে অশিক্ষিত লোক তীর্থভ্রমণ হইতে প্রত্যাগমন করে, সে ব্যক্তি নিজ অশিক্ষিত সমাজে অন্যদেশ সম্বন্ধে কত কথা ও কত গল্প উত্থাপন করিয়া থাকে।

আজ পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণে আমরা বাল্যকালে ভূগোল পড়িয়া ভূমণ্ডলের মোটামুটি জ্ঞানলাভ করি বটে, তথাচ তীর্থভ্রমণ করিয়া স্বদেশের পূর্ণজ্ঞান লাভ করা আবশ্যক। তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইয়া যেমন আমরা দেশ দেশান্তর দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হই, তৎকালে ভূগোলপঠিত সহরাদি দেখিয়া মনে কিরূপ বিমল আনন্দ উত্থিত হইতে থাকে। যেদিন বারাণসীধামের অপূর্ব্ব শোভা গঙ্গার পরপার হইতে প্রথম সন্দর্শন করি, সেদিন মন কিরূপ আনন্দ-সলিলে নিমগ্ন হইয়াছিল?

তীর্থস্থলের যে সকল দেবদেবীর অপার মাহাত্ম্য আমরা বাল্যকাল হইতে সকলের মুখে শ্রবণ করিয়া আসিতেছি, সেই সকল দেবদেবী স্বচক্ষে দর্শন করিলে হৃদয়ে কিরূপ বিশুদ্ধ আনন্দের উদ্রেক হয়! যেদিন মহাপ্রভু চৈতন্য-দেব সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া হরিসঙ্কীর্ত্তনে দেশ মাতাইতে মাতাইতে শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত হন ও গোপীনাথের শ্রীচরণকমলে প্রণত হন, সেদিন তাঁহার ভক্ত হৃদয়ে ব্রহ্মানন্দের ফোয়ারা কিরূপ ছুটিয়াছিল, তাহা কি তোমরা একবার ভাবিয়া দেখিবে? সে আনন্দের সহিত তুলনা করিলে বঙ্গবিজেতা সেনাপতি লর্ড ক্লাইবের পলাসী যুদ্ধের পর জয়োল্লাসও অতি তুচ্ছ বোধ হইবে।

গৃহে দেবদর্শনে বা ঈশ্বরের আরাধনায় আনন্দোদয় হয় বটে; কিন্তু ইহা মানবের স্বভাবসিদ্ধ, যে বিষয়ে যত কষ্ট পাওয়া যায়, সে বিষয়ে কার্য্যসিদ্ধির পর তত সুখানুভব হইয়া থাকে। এস্থলে কষ্টের পরিমাণ দেখিয়া সুখেরও পরিমাণ ভাবা উচিত। তাহার সাক্ষ্য দেখ, যিনি দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, এক মনে এক ধ্যানে পদব্রজে যাইতে যাইতে শীত গ্রীষ্মের দারুণ কষ্টে দৃক্‌পাত না করিয়া পর্ব্বত জঙ্গলাদি অতিক্রম করিতে করিতে তীর্থস্থলে উপস্থিত হন, তাঁহার মন যেরূপ আনন্দনীরে অভিষিক্ত হইবে, সে আনন্দের সহিত তুলনা করিলে, তুমি বাষ্পীয় শকটযোগে একদিনে কাশীর বিশ্বেশ্বর বা শ্রীক্ষেত্রের জগন্নাথদেব দর্শন করিয়া যে সুখ অনুভব করিবে, তাহা অতি তুচ্ছ। যে বস্তু অনায়াসলভ্য, তাহার আবার মূল্য কি? তাহাতে সুখবোধ বা কিরূপ? যথার্থ বলিতে কি, তীর্থস্থলগুলি এখন অনায়াসগম্য হওয়াতে উহাদের প্রকৃত মাহাত্ম্য ও গৌরব আমাদের নিকট ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে এবং তত্রত্য দেব দর্শনে তাদৃশ পুণ্যও নাই, তাদৃশ আনন্দও নাই। ইহাতে ধর্ম্মের মহৎ উদ্দেশ্য কিয়ৎপরিমাণে বিফল হইতেছে।

তীর্থস্থলের প্রাকৃতিক অত্যাশ্চর্য্য দৃশ্যপটল সন্দর্শনে কাহার না মন স্বতঃ ঈশ্বরের উপর ভক্তিরসে আপ্লুত হইবে? প্রয়াগে শ্বেতাম্বু গঙ্গা ও কৃষ্ণাম্বু যমুনার সঙ্গম, গঙ্গাসাগরে শ্বেতাম্বু গঙ্গা ও নীলাম্বু সাগরের সঙ্গম, জ্বালামুখীর ও চন্দ্রনাথের অগ্নিনিঃসরণ, সীতাকুণ্ডের উষ্ণপ্রস্রবণ প্রভৃতি অত্যাশ্চর্য্য প্রাকৃতিক দৃশ্যপটল দর্শনে কাহার না মনে ঈশ্বরভক্তি উথলিয়া পড়িবে? হরিদ্বার ও বদ্রীনারায়ণের অভ্রভেদী হিমাদ্রির অতুল শোভা সন্দর্শনে কাহার না মন ভয়ে বিস্মিত ও আনন্দে পুলকিত হইবে? হরিদ্বারের সেই বরফবিগলিত শীতল সলিলে বা শ্রীক্ষেত্রের সেই উত্তাল তরঙ্গ মধ্যে অবগাহন করিলে কাহার না মন আনন্দে বিভোর হইবে? এস্থলে কেহ কেহ বলিবেন, প্রাকৃতিক অত্যাশ্চর্য্য দৃশ্যপটল দেখিয়া ঈশ্বরের অপার মহিমা জানিতে চাহ; তবে নায়াগ্রা ও ভিক্টোরিয়া নায়েনজার জলপ্রপাত, ভিসুভিয়াসের অগ্ন্যুৎপাত, আইসল্যাণ্ডের উষ্ণপ্রস্রবণ প্রভৃতি দেখিয়া নয়ন সার্থক কর, ঘরের কানাচায় সামান্য দৃশ্য দেখিয়া কি হইবে?

অলোকসামান্য মহাত্মাগণের জন্মভূমি বা লীলাভূমি দেখিলে মনে

অননুভূতপূর্ব্ব ভাবোদয় ও সুশিক্ষা হইয়া থাকে। যাঁহারা জ্ঞানজগতে অসাধারণ প্রতিভাবলে যশোমন্দিরের উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন, তাঁহাদের জন্মভূমি দেখিবার জন্য বিদ্বজ্জনমাত্রেই সদা সমুৎসুক হন। সেইরূপ যাঁহারা ধর্ম্মজগতে অলৌকিক ধর্ম্মোপদেশ দিয়া সর্ব্বসাধারণকে ভবপারাবারে সাহায্য করিয়াছেন, ধর্ম্মাত্মামাত্রেই তাঁহাদের জন্মভূমি দেখিবার জন্য স্বতঃ ব্যগ্র হন। যে পুণ্যক্ষেত্র হইতে তাঁহারা দুন্দুভিস্বরে ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিয়াছেন, সেই পীঠস্থল দর্শন করিলেও অভূতপূর্ব্ব ভাবোদয় ও সুশিক্ষা হইবে। একারণ খৃষ্টজগতে জেরুজিলাম, মুসলমানজগতে মক্কা ও মদিনা, বৌদ্ধজগতে বুদ্ধগয়া, হিন্দুজগতে মথুরা, বৃন্দাবন, অযোধ্যা প্রভৃতি স্থল চির দিনের জন্য ধর্ম্মের পবিত্র ক্ষেত্র।

এইরূপ নানাপ্রকারে লোকবিশেষ তীর্থভ্রমণ দ্বারা সদা উপকৃত হইতেছে। এই সকল ব্যক্তিগত উপকার ভালরূপ অনুধাবন করিলে বুঝা যায়, তীর্থভ্রমণ দ্বারা হিন্দুধর্ম্ম কি মহদুদ্দেশ্য সাধন করিতেছে। যেস্থলে সুসভ্য দেশে আজকাল সকলে বিদ্যা ও অর্থের খাতিরে, স্বার্থসিদ্ধির খাতিরে দেশ পর্য্যটন করে, সেস্থলে এই অর্দ্ধসভ্য ভারতের পৌত্তলিক হিন্দুধর্ম্ম ধর্ম্মের খাতিরে, নিষ্কামপরার্থসিদ্ধির খাতিরে তীর্থভ্রমণ বা দেশপর্য্যটন উপদেশ দেয়।

এস্থলে কেহ কেহ বলিবেন, সভ্যদেশে কি সকলেই স্বার্থসিদ্ধির জন্য দেশপর্য্যটন করে? যে কলম্বস আজীবন কষ্টরাশি ভোগ করিয়া আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কার করতঃ জীবনব্রত উদ্‌যাপন করেন, যে ভাসকোডিগামা আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করিয়া ভারতের নূতন পথ ইউরোপবাসীদের জন্য প্রথম আবিষ্কার করেন, যে মাঙ্গোপার্ক, লিভিংষ্টোন প্রভৃতি পর্য্যটকগণ আফ্রিকা মহাদেশের নানাস্থান আবিষ্কার করেন, তাঁহারা কি একমাত্র স্বার্থসিদ্ধির জন্য এত কষ্টরাশি মস্তকে বহন করিয়াছিলেন? জগতের মহোপকারের জন্যই তাঁহাদের এত কষ্ট স্বীকার ও ত্যাগস্বীকার; এজন্য তাঁহাদের দেশপর্য্যটন সামান্য তীর্থভ্রমণ অপেক্ষা অধিক পুণ্যদায়ক। এই যে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ নানাদেশ পর্য্যটন করিয়া নানা সত্য আবিষ্কার করিতেছেন, তাঁহাদের পর্য্যটন কি তীর্থভ্রমণ অপেক্ষা অধিক পুণ্যদায়ক নহে? এই যে শিক্ষিত সম্প্রদায় ভারতের মঙ্গলের জন্য নানাদেশ দেশান্তর হইতে আগমন করিয়া জাতীয়

সমিতিতে যোগদান করিতেছেন, এরূপ পর্য্যটন কি তীর্থভ্রমণ অপেক্ষা অধিক পুণ্যদায়ক নহে?

তীর্থভ্রমণ দ্বারা সমাজের মহোপকার।

বিদ্যা বল, শিল্প বল, রীতিনীতি বল, ধর্ম্মের মতামত বল, সকলই তীর্থ যাত্রীরা এক দেশ হইতে দেশান্তরে লইয়া যায় ও বহুবিস্তৃত করে। এই প্রকারে তীর্থভ্রমণ দ্বারা জাতীয় ও সামাজিক উন্নতি অনায়াসে সাধিত হইতেছে। যে সময়ে মুদ্রাযন্ত্র উদ্ভাবিত হয় নাই, সে সময়ে তীর্থভ্রমণ বা ধর্ম্মোদ্দেশে দেশ-পর্য্যটনই সামাজিক উন্নতির সর্ব্বপ্রধান উপায়। মধ্যযুগে প্যালেষ্টাইনে ইউরোপবাসিগণ তীর্থভ্রমণ করাতে ও তদ্রক্ষার্থ কয়েকবার ধর্ম্মযুদ্ধে লিপ্ত হওয়াতে সমগ্র ইউরোপের যে সকল মঙ্গল সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহা ইতিহাস-পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন।

পূর্ব্বে তীর্থস্থলে ভারতের নানা প্রদেশ হইতে পণ্ডিতমণ্ডলী একত্রিত হইয়া স্ব স্ব বিরচিত পুস্তক লোকসমাজে প্রচার করিতেন। তাহাতে ঐ সকল গ্রন্থ নানাদেশে নীত ও গুণানুসারে আদৃত হইত। পূজ্যপাদ জয়দেবস্বামী গীত-গোবিন্দ পুস্তকখানি শ্রীক্ষেত্রে প্রচার করিয়াই মহারাষ্ট্রে ও দাক্ষিণাত্যে প্রচার করিয়া যান। তজ্জন্য এখনও ঐ সকল দেশে ঐ পুস্তকের এত সমাদর ও প্রতিপত্তি। এখনও জগন্নাথদেবের মন্দিরে তাঁহার গীতাবলি প্রত্যহ গীত হইতেছে।

এই পুণ্যভূমি তীর্থক্ষেত্রে ভারতের পণ্ডিতগণ দর্শনশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র, আয়ুর্ব্বেদ ও জ্যোতিষ প্রভৃতি যাবতীয় বিদ্যাসম্বন্ধে নিজ নিজ শ্রেষ্ঠ মতামত প্রকাশ করিয়া সমগ্র হিন্দুস্থানে প্রচার করিতেন। এজন্য কাশী, নাসিক প্রভৃতি তীর্থস্থলগুলি চিরদিন হিন্দুজগতে বিদ্যানুশীলনের প্রধান কেন্দ্রস্থল। এই পুণ্যভূমি তীর্থক্ষেত্রে এ ধর্ম্মের প্রধান প্রধান সংস্কারকগণ ধর্ম্মসম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ মতামত প্রকাশ করিয়া সমগ্র হিন্দুস্থানে প্রচার করিতেন। শঙ্করাচার্য্যদেব, রামানুজস্বামী, রামানন্দ-স্বামী, বল্লভাচার্য্য, কবীর, চৈতন্যদেব প্রভৃতি মহাত্মাগণ তীর্থক্ষেত্রে আপনাদের উৎকৃষ্ট ধর্ম্মমত ব্যক্ত করিয়া সমগ্র হিন্দুস্থানে প্রচার করিয়া যান। যেমন আজ কাল মুদ্রাযন্ত্রযোগে কলিকাতা প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগরী সর্ব্ববিধ আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল, সেইরূপ পূর্ব্বে তীর্থক্ষেত্ররূপ কেন্দ্র হইতে বিদ্যা ও ধর্ম্ম

সম্বন্ধে নানা আন্দোলনতরঙ্গ উত্থিত হইয়া সমগ্র হিন্দুসমাজে অভিব্যাপ্ত হইত। এজন্ত বলা উচিত, তীর্থস্থলগুলি ধর্ম্মরাজ্যের রাজধানী স্বরূপ।

তীর্থস্থলে বহু লোকের সমাগম হওয়াতে চিরদিন নানাদিক্ দেশ হইতে পণ্য ও শিল্প দ্রব্য বিক্রয়ার্থ তথায় আনীত হইতেছে। ইহাতে এক দেশের শিল্পিগণ অন্য দেশের উদ্ভাবিত শিল্পকৌশল ও কারুকার্য্য অনায়াসে শিক্ষা করিয়া নিজ নিজ জাতীয় ব্যবসায়ের উন্নতি সাধন করিতেছে। পূর্ব্বে যে সকল উপায়ে ভারতীয় শিল্পের এত উন্নতি সাধন হইয়াছিল, তন্মধ্যে তীর্থভ্রমণ একটী প্রধান উপায়। যে স্থলে আজকাল ব্যয়বহুল জাতীয় প্রদর্শনী (Exhibition) স্থাপন করিয়া শিল্পাদিবিষয়ে লোকবর্গকে সুশিক্ষা দেওয়া হয়, সে স্থলে অর্দ্ধসভ্য ভারতের পৌত্তলিক হিন্দুধর্ম্ম জনসাধারণকে তীর্থভ্রমণে প্রোৎসাহিত করিয়া তীর্থক্ষেত্রে শিল্পদ্রব্য একত্রিত করত স্বল্পব্যয়ে সকলকে সুচারুরূপে শিক্ষা দিতেছে।

তীর্থদর্শনোদ্দেশে লোকে নানা দেশ পর্য্যটন করে এবং উহারা যে দেশে যে কোন উৎকৃষ্ট রীতিনীতি ও শিল্পদ্রব্য দেখিতে পায়, তাহা উহারা নকল করিয়া নিজ নিজ দেশে প্রবর্ত্তন করিতে চেষ্টা পায়। এইরূপে তীর্থভ্রমণ দ্বারা এক জাতি অপর জাতির সহিত ভালরূপ সংস্রবে আইসে, নানাবিষয়ে উহাদের পরস্পর সহানুভূতি ও সুশিক্ষা বর্দ্ধিত হয় এবং সেই সঙ্গে উহাদের জাতীয় উন্নতি সহজে সংসাধিত হয়। দিগ্বিজয় দ্বারাও এক জাতি অপর জাতির সংঘর্ষে আনীত হইয়া উহাদের জাতীয় উন্নতিসাধন ঘটে। কিন্তু ইহার ভীষণ নরহত্যা, শোণিতপাত ও নগর লুণ্ঠন প্রভৃতি ভাবিলে ইহাকে জাতীয় উন্নতিসাধনের তামসিক উপায় বলা উচিত। পরন্তু যে তীর্থভ্রমণে কোথাও বিন্দুমাত্র শোণিত-পাত হয় না ও একখানি পর্ণকুটীর দগ্ধ বা লুণ্ঠিত হয় না, অথচ সকলের ভিতর নানাবিষয়ে সহানুভূতি সম্যক বর্দ্ধিত হয়, তাহাই জাতীয় উন্নতিসাধনের সাত্ত্বিক বা উৎকৃষ্ট উপায়। এজন্য সাত্ত্বিক হিন্দুধর্ম্ম চিরদিন দিগ্‌বিজয়ের অনাদর করিয়া তীর্থভ্রমণের এত প্রশংসা করিতেছে এবং ইহাতে এত পুণ্য নির্দ্দেশ করিতেছে।

এস্থলে পূর্ব্বাপর ভালরূপ অনুধাবন করিয়া দেখিলে, আমাদের স্পষ্ট প্রতীতি হইবে, তীর্থভ্রমণ দ্বারা সমগ্র ভারতের ব্যক্তিগত ও সমাজগত নানা মহোপকার সাধিত হইতেছে। যখন তীর্থভ্রমণ এতকাল হিন্দুসমাজে প্রচলিত এবং আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলেই তীর্থে যাইতে ব্যগ্র,তখন নিশ্চয়ই ইহা দ্বারা ভারত চিরদিন

সম্যক্ উপকৃত হইতেছে। প্রকৃতির স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম এই, যাহা সমাজবিশেষের মঙ্গলদায়ক, তাহা সামাজিক নির্ব্বাচনে সে সমাজে বহুকাল স্থায়ী হইবে। এজন্য স্মরণাতীত কাল হইতে তীর্থভ্রমণ হিন্দুসমাজে চলিতেছে এবং লোকে আগ্রহের হিত যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া তীর্থ দর্শন করিয়া থাকে।

আমাদের সুশিক্ষিত বান্ধবগণ বলিবেন, এখন আমরা পাশ্চাত্য সুশিক্ষা াইয়া সুসভ্য হইতেছি; এখন আমরাও সুসভ্য জাতির ন্যায় তীর্থভ্রমণকে মাজ হইতে পোটেহেল করিব; এখন ইহার কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই। াথ, আমাদের ভিতর সংবাদপত্রাদি মুদ্রিত হওয়াতে যাবতীয় আন্দোলন ক্ষণ াত্রে দেশময় অভিব্যাপ্ত হইতেছে। এখন তীর্থভ্রমণ রহিত হইলে দেশের কানরূপ অমঙ্গল নাই; কিন্তু তাঁহারা জানেন না, তাঁহারাই পরোক্ষভাবে তীর্থ ।মণ করিয়া থাকেন। দেশের মঙ্গলের জন্য যে দেশপর্য্যটন করা যায়, তাহাই তীর্থভ্রমণ। যে স্থলে জনসাধারণ ভারতের মঙ্গলের জন্য ধর্ম্মের খাতিরে দেশ-পর্য্যটন করে, সে স্থলে তাঁহারা ভারতের মঙ্গলের জন্য রাজনীতির খাতিরে দেশপর্য্যটন করিতেছেন। এই যে তাঁহারা বহু দূরদেশ হইতে আসিয়া বহু অর্থ ব্যয় করিয়া ও অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়া জাতীয় সমিতির বৈঠকে যোগদান করিতেছেন, ইহা কি তাঁহাদের তীর্থভ্রমণ নয়? ধর্ম্মোক্ত তীর্থভ্রমণের সঙ্গে ইহার প্রভেদ এই যে, তাঁহারা দেবদেবীর পূজার পরিবর্ত্তে ভারতমাতার শ্রীপাদপদ্মে প্রীতিপুষ্পাঞ্জলি দিতেছেন এবং রাজনৈতিক আন্দোলনই তাঁহাদের পূজার মূলমন্ত্র। সমগ্র ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহাদের মন্ত্র আগ্রহপূর্ব্বক পাঠ ও শ্রবণ করে। ভারতমাতার মুখ উজ্জ্বল করিবার জন্য বৎসরে বৎসরে তাঁহাদের এরূপ বৈঠক বসিতেছে এবং সকলেই মাতার শুভাশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইতেছেন।

তীর্থভ্রমণে কেন এত পুণ্যনির্দ্দেশ?

যে তীর্থভ্রমণ দ্বারা হিন্দুসমাজের এত মহোপকার সাধিত হইতেছে, শাস্ত্র-কারেরা কেন উহার সামাজিক উপকারের কথা উল্লেখ না করিয়া উহাতে কেবল অশেষ পাতকনাশ ও পুণ্যলাভ হইবে, এরূপ নির্দ্দেশ করিলেন? কেন তাঁহারা কতকগুলি তথা-কথিত কুসংস্কার শিক্ষা দিয়া সকলকে কুসংস্কারজালে জড়িত

করিয়া রাখিলেন? তাঁহাদেরই বা অপরাধ কি? তাঁহারা ত সুবুদ্ধির কাজ করিয়া গিয়াছেন। যখন তীর্থভ্রমণ দ্বারা হিন্দুসমাজের এত মহোপকার, তখন যদি তাঁহারা লোকবর্গকে ধর্ম্মের নামে, পরার্থসিদ্ধির নামে পুণ্যলাভের প্রলোভন দেখাইয়া দেশপর্য্যটনে প্রোৎসাহিত করিবার জন্য কতকগুলি কুসংস্কারও শিক্ষা দেন, সমাজের অশেষ মঙ্গল ভাবিয়া সে সকল সংস্কারকে কি কদাচ কুসংস্কার বলা উচিত? তোমার বিকৃত মস্তিষ্কের নিকট উহারা কুসংস্কার হইতে পারে। কিন্তু যথার্থ বলিতে কি, উহারাই সমাজের যথার্থ সুসংস্কার। যাহাতে সমাজের অশেষ মঙ্গল, তাহা কুসংস্কার হইলেও প্রকৃত সুসংস্কার, তাহা মহাপাতক হইলেও মহাপুণ্য জানিবে।

তীর্থভ্রমণে অশেষ পাতকনাশ ও অক্ষয় পুণ্যলাভ নির্দ্দেশ করিয়া হিন্দুধর্ম্ম আমাদের হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে আঘাত করিয়াছে। এ ধর্ম্ম সমাজের মঙ্গলামঙ্গল বুঝে না; বুঝিলেও তাহা আদৌ ব্যক্ত করিবে না; ব্যক্ত করিলেও কিছুমাত্র ফলোদয় নাই। জনসাধারণ আদৌ সে দিকে পা দিবে না। দেখ, মানব সংসারে কিরূপ ঘোর স্বার্থপর! স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তিনি যেরূপ সদা লালায়িত, তিনি সেইরূপ পরশ্রীকাতর ও পরের জন্য এক কপর্দ্দক ব্যয় করিতে সেইরূপ কুণ্ঠিত। যদি শাস্ত্রকারেরা স্পষ্ট উপদেশ দিতেন যে, তীর্থভ্রমণ দ্বারা সমাজের অশেষ মঙ্গল সাধিত হইবে, অতএব তীর্থভ্রমণ করা সকলের একান্ত কর্ত্তব্য। কে, বল, সমাজের খাতিরে, পরের জন্য তীর্থভ্রমণে এক কপর্দ্দক ব্যয় করিত বা ইহার জন্য এত কষ্ট সহ্য করিত? কিন্তু যে মানব এ সংসারের তীব্র তাড়নায় সদা প্রপীড়িত ও ব্যতিব্যস্ত, যিনি ইহজীবনে প্রকৃত সুখশান্তি ভোগ করিতে পান না, যদি তিনি বুঝিতে পারেন বা যদি তাঁহার এরূপ বিশ্বাস জন্মে, এই শুভ কর্ম্মটি সম্পাদন করিলে, তাঁহার অক্ষয় পুণ্যলাভ হইবে, তিনি জীবনের পাপরাশি হইতে মুক্ত হইবেন, তিনি ইহলোকে ও পরলোকে অনন্ত সুখে সুখী হইবেন, তখন তিনি সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, সেই শুভ কর্ম্মে মনপ্রাণ সমর্পণ করিবেন, এমন কি, যদি উহাতে তাঁহার সর্ব্বস্ব নাশ হইয়া যায়, তথাচ তিনি উহা অসঙ্কুচিত চিত্তে ও অশেষ প্রীতির সহিত সম্পাদন করিবেন। ইহার জন্য তীর্থভ্রমণে এত পুণ্যলাভ, এত পাতকনাশ, এত ইষ্টলাভ ও এত শ্রেয়োলাভ শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে

এ বিষয়ে হিন্দুধর্ম্মের আরও গূঢ় রহস্য আছে। ধর্ম্মজগতের নিয়ম এই "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" যাঁহার যেরূপ মনের ভাবনা, তাঁহার সেইরূপ সিদ্ধিলাভ হইবে। যাঁহার মনে এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাস জন্মে, যে তীর্থস্থানের দেবদর্শন করিলে বা পুণ্যসলিলে অবগাহন করিলে অক্ষয় পুণ্যলাভ হইবে, অশেষ পাতকনাশ হইবে বা কোন অসাধ্য ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ হইবে,তিনি তথায় দেবদর্শন ও স্নান করিয়া অপার আত্মপ্রসাদ পাইবেন, অক্ষয় পুণ্যলাভ করিবেন এবং হয়ত কোন অসাধ্য ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করিবেন। এইরূপ ঐকান্তিক বিশ্বাস-হইতে তাঁহার শারীরিক স্বাস্থ্যলাভ, পুণ্যলাভ ও পাতকনাশ হইবে। এস্থলে বিশ্বাসে ভক্তি ও ভক্তিতে মুক্তি।

দেখ, যে মা গঙ্গা আমাদের পতিতপাবনী ও অধমতারিণী, সেই পুণ্যতোয়া গঙ্গার জলে ধর্ম্মাত্মা হিন্দু অবগাহন করিয়া যে ফল পাইবেন, একজন পাষণ্ড ম্লেচ্ছ তাহা কি কদাচ পাইতে পারে? যেমন উহাদের মনের ভাব সম্পূর্ণ বিভিন্ন, ফলও তেমনি বিভিন্ন হইয়া থাকে।

দেখ হিন্দুশাস্ত্র তীর্থভ্রমণে কত সুফল নির্দ্দেশ করিতেছে! ইহাতে পুনঃজন্ম পর্য্যন্ত হয় না। বস্তুতঃ কলিকালে তীর্থভ্রমণ আমাদের এক প্রধান ধর্ম্মসাধন।

প্রকৃতির মহাকবি কালিদাস বলেন—

সমুদ্রপত্ন্যো র্জলসন্নিপাতে
পূতাত্মানামত্র কিলাভিষেকাৎ।
তত্ত্বাববোধেন বিনাপিভূয়ঃ
তনুত্যজাং নাস্তি শরীরবন্ধঃ।

(রঘুবংশং)

"সমুদ্রের পত্নীদ্বয়, গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলে অবগাহন করিয়া যাঁহাদের শরীর ও মন অশেষ প্রকারে বিশুদ্ধ ও পবিত্র হইতেছে, তত্ত্বজ্ঞান না জন্মিলেও তাঁহাদিগকে আর পুনঃজন্ম ভোগ করিতে হইবে না।" বল দেখি, শাস্ত্রের এরূপ উৎসাহবাণী শ্রবণ করিয়া কোন নৈষ্ঠিক হিন্দু প্রয়াগের বেনিঘাটে স্নান করিতে না যাইবেন?

তীর্থভ্রমণ দ্বারা ভারতের মঙ্গল সাধন।

যে হিন্দুধর্ম্ম সর্ব্বত্র জাতিভেদপ্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া সমাজস্থ যাবতীয়

লোককে এক রজ্জুতে আবদ্ধ করিয়াছে, সে ধর্ম্ম আবার ভারতের চতুষ্কোণে চারিটী মহামঠ ও মধ্যে মধ্যে অন্যান্য তীর্থ স্থাপন করিয়া সমগ্র দেশকে এক সূত্রে গ্রথিত করত সকলকে সুশাসনে রাখিতেছে। এ কারণ বিভিন্নভাষাসংবলিত, বিভিন্ন জাতিবিশিষ্ট ভারতভূমিতে এতকাল এ ধর্ম্ম এমন অক্ষুণ্ণপ্রতাপে ও অপ্রতিহতপ্রভাবে প্রচলিত আছে। এ দেশের ভৌগোলিক সংস্থান পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট বুঝা যায়, যে, প্রকৃতি মধ্যে মধ্যে পর্ব্বতাদি দুর্লঙ্ঘ্য অবরোধ ব্যবহিত করিয়া ইহার এক প্রদেশকে অন্য প্রদেশ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক রাখে। এজন্য অতি পুরাকাল হইতে ভারত বিভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত এবং প্রত্যেক রাজ্যে এক এক প্রাকৃত ভাষা কালক্রমে উত্থিত। এই সকল বিভিন্ন রাজ্যের লোকবর্গ ধর্ম্মোদ্দেশে তীর্থস্থলে একত্রিত হইলে উহাদের ভিতর পরস্পর সহানুভূতি ও সৌহার্দ্দ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইবে এবং উহাদের জাতীয়উন্নতি অনায়াসে সাধিত হইবে; এ জন্য তীর্থভ্রমণ চিরকাল হিন্দুধর্ম্মের এক প্রধান অঙ্গ।

আজকাল যেমন জাতীয় সমিতিতে (National Congress) ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সুশিক্ষিত বিদ্বজ্জন একস্থলে একত্রিত হইয়া রাজনৈতিক আন্দোলন করাতে সকলের ভিতর সহানুভূতি বর্দ্ধিত ও জাতীয় একতা কথঞ্চিৎ স্থাপিত হইতেছে, সেইরূপ চিরদিন তীর্থস্থলে নানা প্রদেশের শিক্ষিত ও অশিক্ষিত নানা লোক ধর্ম্মোদ্দেশে একত্রিত হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করাতে সকলের ভিতর সহানুভূতি বর্দ্ধিত হইতেছে এবং জাতীয় একতা স্থাপিত হইতেছে।

যথার্থ বলিতে কি, হিন্দুধর্ম্ম এক তীর্থভ্রমণ উপদেশ দিয়া সমগ্র হিন্দুজগৎকে চিরদিন সমভাবে সুশাসনে রাখিয়াছে এবং ইহার বিভিন্ন প্রদেশে প্রায় এক প্রকার রীতিনীতি স্থাপন করিয়াছে। যথার্থ বলিতে কি, তীর্থযাত্রীরা বদ্রীনারায়ণ হইতে রামেশ্বরসেতুবন্ধ পর্য্যন্ত, দ্বারকা হইতে শ্রীক্ষেত্র পর্য্যন্ত ভারতের বিভিন্নভাষাভাষী নানাজাতির ভিতর হিন্দুধর্ম্মের জয়পতাকা উড্ডীয়মান করিতেছে। এইযে সন্ন্যাসীদিগের এক এক আখড়া ধ্বজপতাকা উড়াইতে উড়াইতে ও ভেরী বাজাইতে বাজাইতে নানাদেশ দিয়া গমন করিতেছে, পরে প্রয়াগে, হরিদ্বারে বা শ্রীক্ষেত্রে একত্রিত হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছে, উহাদের তীর্থভ্রমণের কি কোনরূপ মহৎ উদ্দেশ্য নাই? বেশ জানিবে, উহারা দেশে দেশে হিন্দুধর্ম্মের জয়পতাকা উড়াইতেছে ও ইহার বিজয়ভেরী বাজাইতেছে।

যদি তীর্থভ্রমণ ধর্ম্মের এক প্রধান অঙ্গ না হইত, ভারতে এ ধর্ম্ম এতকাল এমন অক্ষুণ্ণ প্রভাপে দেদীপ্যমান থাকিত না। হয়ত এ ধর্ম্ম মুসলমানযুগে কালের কঠিন হস্তে পতিত হইয়া ভারতে লুপ্ত হইয়া যাইত। তখন কোথায় বা বেদবেদান্ত, কোথায় বা রামায়ণ মহাভারত! সকলই অনন্ত কালের অনন্ত স্রোতে ভাসিয়া যাইত।

যে সকল রাজা মহারাজ তীর্থস্থলে সুবিশাল মন্দির নির্ম্মাণ করেন, সদাব্রত ও অন্নছত্র খোলেন এবং যে সকল সেট সাওকার যাত্রীদের সুবিধার জন্য তীর্থস্থলে ধর্ম্মশালা স্থাপন করেন, তাঁহারা অক্ষয় কীর্ত্তি ও পুণ্যলাভ করিতেছেন। তাঁহারাই অর্থের যথার্থ সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন। কোথায় হে জমিদারকুল-তিলক স্বর্গীয় লালাবাবু! এক ধীবরপত্নীর সামান্য কথায় (বেলা যে গেল বাবু) তোমার প্রাণে এমন আঘাত লাগে, যে তুমি সেই মুহূর্ত্তে রাজপ্রসাদ ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে গিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়াছিলে এবং তথায় যে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছ, তাহাতে তোমার নাম ভারতে চিরস্মরণীয় হইবে।

এখন একবার ভাবিয়া দেখ, তীর্থভ্রমণ দ্বারা হিন্দুসমাজের কত মহোপকার সাধিত হইতেছে। ইহাতে লোকবিশেষের যেমন ঐহিক মঙ্গল, তাঁহার সেইরূপ পারত্রিক মঙ্গল। ইহাতে তাঁহার শরীরের যেমন স্বাস্থ্যলাভ, তাঁহার আত্মারও তেমনি আত্মপ্রসাদলাভ ও পুণ্যলাভ। ইহাতে দেশবিশেষের যেমন মঙ্গল, সমগ্র ভারতেরও তেমনি মঙ্গল। ইহাতে সম্প্রদায়বিশেষের যেমন মঙ্গল, সমগ্র হিন্দুসমাজেরও তেমনি মঙ্গল। তবে কেন আমরা ধর্ম্ম ও নীতিবিবর্জ্জিতা পাশ্চাত্য শিক্ষার দোষে এমন মঙ্গলদায়ক অনুষ্ঠানকে ধর্ম্মের কুসংস্কার মনে করি। অহহ! আমাদের কি দুর্বুদ্ধি! আমরা এখন নানা সদনুষ্ঠানকে ধর্ম্মের কুসংস্কার মনে করি। আর কোথায় হে জ্ঞানগরিষ্ঠ মহর্ষিগণ! ধন্য তোমাদের অগাধ সমাজতত্ত্বজ্ঞান! তোমরা তীর্থভ্রমণাদি অনুষ্ঠানের যে সকল ফলাফল নির্দ্দেশ করিয়াছ, তাহা শুনিয়া জনসাধারণ কত উৎসাহ, কত আগ্রহ ও কত প্রীতির সহিত ঐ সকল সদনুষ্ঠান পুণ্যলাভার্থ সম্পাদন করিয়া পরোক্ষভাবে সমাজের অশেষ মঙ্গল সাধন করিতেছে! আর আমাদের পাশ্চাত্য শিক্ষায় ধিক্! আমাদের পাশ্চাত্য সভ্যতালাভে ধিক্! আমরা তীর্থভ্রমণের সামাজিক মঙ্গল বুঝিতে পারিলেও উহার জন্য এক কপর্দ্দক ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত

হইব! কিন্তু ভোগবিলাস চরিতার্থ করিবার জন্য অনায়াসে শত মুদ্রা ইংরাজ দোকানদারের পাদপদ্মে ঢালিয়া দিব।

উপবাসাদি ব্রতপালন

উপবাসে ধর্ম্মের উদ্দেশ্য।

সনাতন হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রোক্ত কতকগুলি ব্রতপালনের জন্য আমাদিগকে মধ্যে মধ্যে উপবাস করিতে আদেশ দেয়। জনসাধারণ এখনও সকল প্রদেশে অশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত ঐ সকল ব্রত পালন করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতেছে। মুসলমান ও বৌদ্ধধর্ম্ম সেইরূপ স্বসেবকদিগকে মধ্যে মধ্যে উপবাস করিতে আদেশ দেয়! কিন্তু সুসভ্য ইউরোপের সুসভ্য খৃষ্টধর্ম্ম এখন কাহাকেও উপবাস করিতে বলে না। ইহা দেখিয়া দেশের সুশিক্ষিত সম্প্রদায় ধর্ম্মের এই কঠোর বিধানের উপর অতীব নারাজ। তাঁহারা ভাবেন, ধর্ম্ম মনের বিশ্বাস মাত্র। শরীরের সহিত ইহার কোনরূপ সম্বন্ধ নাই। উহাকে অযথা কষ্ট দিলে কি প্রকারে ধর্ম্মসাধন হইবে? ঈশ্বরের নিয়মিত উপাসনা করিয়া ধর্ম্মপ্রবৃত্তির স্ফূর্ত্তি কর, পাপপথ হইতে সদা বিরত থাক, সাধ্যানুসারে পরের উপকার কর, ইহাই ত সকলের সর্ব্ববাদিসম্মত ধর্ম্মকর্ম্ম। তবে কেন অপদার্থ পৌত্তলিক হিন্দুধর্ম্মের আদেশ অনুসারে উপবাস করিয়া তোমার বরবপুকে অনর্থক ক্লেশ দিবে।

তাঁহারা আরও বলেন, এ বিষয়ে উন্নত চিকিৎসাবিজ্ঞানের কথানুযায়ী চলা উচিত। মিতাহারী হইয়া প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে আহার বিহার কর, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, বিশুদ্ধ ভোজন ও বিশুদ্ধ পানীয় জল পান কর, আর রীতিমত কায়িক পরিশ্রম কর, ইহাই ত স্বাস্থ্যরক্ষার প্রধান উপায়। তবে কেন সকলে মুমূর্ষু হিন্দুধর্ম্মের কথায় কর্ণপাত করিয়া একটা কুসংস্কারের প্রশ্রয় দিতেছে? এ ধর্ম্মের মহৎ ভ্রম এই যে, ইহা শরীরের উপর অযথা হস্তক্ষেপ করে। এইটী ইহার অনধিকারচর্চ্চা মাত্র।

এস্থলে ধর্ম্মের গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করা আবশ্যক। অবনীমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া নীরোগ শরীরে জীবন অতিবাহিত করা আমাদের একটী মহৎ ব্রত। এই ব্রত পালনে সকল দেশের সকল লোক সমভাবে তৎপর ও মনোযোগী।

ধনসম্পদ বল, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বল; সমাজে মানসম্ভ্রম বল, পুত্র কলত্র বল, জীবনের যাবতীয় ভোগ্য বস্তু একমাত্র স্বাস্থ্য ব্যতিরেকে অসার ও অকিঞ্চিৎকর। এজন্য সকল শাস্ত্রে দেখা যায়, "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং" শরীরের স্বাস্থ্যরক্ষা ধর্ম্মের প্রধান সাধন। আমরা কি উপায়ে শরীরের প্রকৃত স্বাস্থ্যরক্ষা করিয়া সর্ব্বসুখে সুখী হইব, কি উপায়ে আমরা উৎকট ব্যাধি হইতে নিস্কৃতি পাইয়া দীর্ঘ জীবন লাভ করিব, তদ্বিষয়ে সকল ধর্ম্মের বিশেষতঃ হিন্দুধর্ম্মের প্রখর দৃষ্টি। সংসারে অশেষ দুঃখের মাঝারে প্রকৃত সুখবর্দ্ধন করা যে ধর্ম্মের মূল উদ্দেশ্য, সে ধর্ম্ম কি সকল সুখভোগের মূলীভূত কারণ স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় নির্দ্দেশ করিবে না? যে ধর্ম্ম সংসারের যাবতীয় অনুষ্ঠানের উপর স্বীয় প্রাতিপদ অনুশাসন পূর্ণভাবে চালাইয়া আমাদিগকে যথার্থ ধর্ম্মপথের পথিক করিতে চাহে, সে ধর্ম্ম কি অশেষ সুখের নিদান স্বাস্থ্য রক্ষার উপায় নির্দ্দেশ করিবে না? তবে কেন বল এরূপ নির্দ্দেশ ধর্ম্মের অনধিকার চর্চ্চা মাত্র। ভালরূপ জানিবে, স্বাস্থ্যবর্দ্ধন দ্বারা শরীরধর্ম্ম পালন করিবার জন্য হিন্দুধর্ম্ম আমাদিগকে মধ্যে মধ্যে উপবাস করিতে বলে।

দেখিতেছি, এস্থলে সুশিক্ষিত সম্প্রদায় আমাদের উপর ঘোর নারাজ হইতেছেন। উপবাস দ্বারা শরীরের স্বাস্থ্যবর্দ্ধন কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? কোথায় উপবাস করিলে নিয়মিত সময়ে আহারাদি না পাইয়া পাকস্থলী বিকৃত হইবে "পিত্তি পড়ে হবে পীড়ে," না উপবাস দ্বারা শরীরের স্বাস্থ্য বর্দ্ধিত হইবে, এ যে অপরূপ কথা শুনিতেছি! এ কথা ত আদৌ বিজ্ঞান-সম্মত নয়। আজকাল চিকিৎসাবিজ্ঞান রোগের সময়েও কাহাকে নিরাট লঙ্ঘন করিতে বলে না, তৎপরিবর্ত্তে ইহা পুষ্টিকারক ও বলকারক পথ্যের সুবন্দোবস্ত করে। তবে দেখ, এসব কথা কি ধর্ম্মের প্রলাপ বলিয়া বোধ হইতেছে না?

উপবাসের মহৎ গুণ।

রোগের সময় প্রকৃতি কোন্ উপায় অবলম্বন করিয়া স্বভাবতঃ রোগের উপশম করিতে চেষ্টা পায়? কেন নানারোগে প্রকৃতি ক্ষুধামান্দ্য আনয়ন পূর্ব্বক সকলের স্বাভাবিক লঙ্ঘন করায়? কেন ইতর জন্তুগণ রোগাক্রান্ত হইলে স্বতঃ উপবাস করিয়া থাকে? উপবাস বা লঙ্ঘন সকল ঔষধের মধ্যে

প্রকৃতিদত্ত একটী মহৌষধ। এক উপবাস করাইয়া প্রকৃতি অনেক সময়ে নানা রোগের শান্তি করে। একমাত্র লঙ্ঘন দ্বারা নানা উৎকট রোগের উপশম হইয়া থাকে। পশ্চিমাঞ্চলের বহুদর্শী কবিরাজগণ একমাত্র লঙ্ঘন দিয়া বাতশ্লেষ্ম, জরবিকার প্রভৃতি নানা উৎকট রোগ আরাম করিতেছেন। উপবাসের এতগুণ দেখিয়া প্রকৃতি-সেবক হিন্দুধর্ম্ম রোগ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে সকলকে সময়ে সময়ে উপবাস করাইয়া রোগাক্রান্ত হইতে দেয় না। অতএব যে রক্তমাংসের শরীর বিবিধ ব্যাধির মন্দির, সেই শরীরের রোগপ্রবণতা দূরীকরণ উপবাসের প্রথম ফল।

শরীরের কোন যন্ত্র ক্রিয়াঘটিত বিকার প্রাপ্ত হইলে (Funotional disoder) শারীরিক প্রকৃতির স্বাভাবিক রোগপ্রশমনশক্তি দ্বারা (Recuperative power of nature) উহা ক্রমশঃ দূরীভূত হয়। যাহার শরীরের রোগপ্রশমনশক্তি যেরূপ বলবতী, তিনি সেইরূপ উৎকট রোগ হইতে অল্লাধিক সময়ে অব্যাহতি পান। যাহার এ শক্তি নানা কারণে মন্দীভূত হইয়া থাকে, তিনি উৎকট রোগে আক্রান্ত হইলে কালগ্রাসে পতিত হন। নানা ব্যাধির আরোগ্যলাভে প্রকৃতির এই রোগ-প্রশমনশক্তি অধিকপরিমাণে কার্য্যকারিকা। উৎকট রোগে আক্রান্ত হইলে তুমি অর্থবলে শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসিত হইলেই যে তুমি সেই রোগ হইতে অব্যাহতি পাইবে, তাহা মনে করিও না; কিন্তু তোমার শারীরিক প্রকৃতির রোগপ্রশমনশক্তি যেরূপ বলবতী হইবে, তুমিও সেইরূপ অত্যুৎকট রোগ হইতে অব্যাহতি পাইবে। এজন্য শরীরের নৈসর্গিক রোগপ্রশমনশক্তি যেরূপে বর্দ্ধিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইলেই যে এ শক্তি বৃদ্ধি পাইবে, তাহা নহে। বলিষ্ঠ লোকের কলেরা হইলে দুই তিন দাস্তে কর্ম্ম সাবাড়। কিন্তু পাত্‌লা ছিপ্‌ছিপে লোক অনেকদিন জুঝিতে পারে। যাঁহাদের শরীর উপবাস দ্বারা বজ্রতুল্য, তাঁহাদের স্বাভাবিক রোগপ্রশমনশক্তি অধিক বলবতী।

যেমন প্রকৃতি স্বয়ং উপবাস করাইয়া নানা রোগের স্বাভাবিক উপশম করিতে চেষ্টা পায়, সেইরূপ প্রকৃতি-সেবক হিন্দুধর্ম্মও সময়ে সময়ে সকলকে উপবাসে

রাখিয়া শরীরের রোগপ্রশমনশক্তি বর্দ্ধন করে। অতএব শারীরিক প্রকৃতির রোগপ্রশমনশক্তি বর্দ্ধন উপবাসের দ্বিতীয় ফল।

শ্বাসসংযম করিয়া আজীবন নিত্য জপপ্রাণায়াম করিলে অথবা শ্বাস রোধ করিয়া আজীবন ডন্ ফেলিলে যেমন, ফুস্ফুসের শক্তি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয় এবং ইহা কোন উৎকট রোগে আক্রান্ত হয় না; সেইরূপ আজীবন মধ্যে মধ্যে উপবাস করিলে পাকাশয়ের পাচিকাশক্তি বর্দ্ধিত হইবে, শরীরের দূষিত রস অভ্যন্তরে পরিপাক পাওয়ায় ইহার রোগপ্রশমনশক্তি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইবে। এ দেশের বিধবাদিগের প্রতি নেত্রপাত কর, এ বিষয়টী ভালরূপ বোধগম্য হইবে। তাঁহারা উপবাস করিয়া যেমন নিজের শরীরকে বজ্রতুল্য করেন, তাঁহারা তেমনি সচরাচর নীরোগ শরীরে দীর্ঘজীবন ভোগ করিতে থাকেন এবং কোন উৎকট রোগে আক্রান্ত হইলে সহজে উহা হইতে অব্যাহতি পান। চিকিৎসকমাত্রেই অবগত আছেন, যে কঠিন রোগে একজন সধবা মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, সেই রোগে বিধবা অনায়াসে আরোগ্য লাভ করিবে। দীর্ঘকালব্যাপী উপবাসই ইহার একমাত্র কারণ।

আজকাল পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞান নানা উৎকট রোগের (Germs or bacilloe) আবিষ্কার করিতেছে। এই সকল কীটাণু শরীরাভ্যন্তরে, লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও বিবর্দ্ধিত হইয়া যান্ত্রিক বিকার আনয়ন পূর্ব্বক নানাবিধ রোগ উৎপাদন করে। যখন ইহারা শরীরের ভিতর বিবর্দ্ধিত হয়, তখন যন্ত্র-বিশেষকে বিষাক্ত করিয়া রোগ উৎপাদন করে। ইহাকে ইংরাজিতে (Toximia) বলে। যখন শরীরের রোগপ্রশমনশক্তি অধিক থাকে, তখন Antitoxin উৎপন্ন হইয়া ঐ রোগের বীজাণু নাশ করিয়া ফেলে? এখন ঐ সকল কীটাণুদিগের বিবর্দ্ধন (Culture) বশতঃ উৎকট রোগ উৎপন্ন হউক বা অন্য কোন অজ্ঞাত কারণে উৎপন্ন হউক, ইহা সুনিশ্চিত, মধ্যে মধ্যে উপবাস দ্বারা শরীরের ধাতুগত তেজ বর্দ্ধিত হইলে ও ইহার দূষিত রস পরিপাক পাইলে রোগের বীজস্বরূপ ঐ সকল কীটাণু বা অন্য কোন অজ্ঞাত কারণ বলবৎ হইতে পায় না এবং ইহার রোগপ্রশমনশক্তি বর্দ্ধিত হওয়ায় ঐ সকল কারণ অনায়াসে দূরীভূত হইয়া যায়।

দুই দিবস উপবাস করিলে ও একবার রেচক ব্যবহার করিলে প্রায়

সমান ফল পাওয়া যায়। যাহা রেচক দ্বারা সম্পাদিত হয়, তাহাই আবার লঙ্ঘন দ্বারা উত্তমরূপে সম্পাদিত হইয়া থাকে। কবিরাজগণ বলেন, নিত্য আহার বিহার করিতে করিতে শরীরে রোগোৎপাদক রস সঞ্চিত হয়। যে স্থলে রেচক সেই দূষিত আমরসকে শরীর হইতে নিঃসরণ করায়, সে স্থলে উপবাস উহাকে অভ্যন্তরে পরিপাক করাইয়া দেয়। কিন্তু ফলাফল সম্বন্ধে বিস্তর পার্থক্য দেখা যায়। মধ্যে মধ্যে উপবাস করিলে পাকাশয় ও অন্ত্রের খাদ্যপাচিকা শক্তি বর্দ্ধিত হয়। যেমন ক্ষেত্রকে মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম দিলে ইহার উৎপাদিকাশক্তি ক্রমশঃ বলবতী হইতে থাকে, সেইরূপ মধ্যে মধ্যে পাকাশয়কে ইহার নিয়মিত কার্য্য হইতে অবসর প্রদান করিলে ইহারও তেজ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কিন্তু রেচক ব্যবহার দ্বারা ইহার প্রকৃত অনিষ্টোৎপত্তি হইয়া থাকে। এতদ্দ্বারা ইহা ক্রমশঃ ক্ষীণবীর্য্য হইয়া পড়ে।

প্রকৃতি-সেবক হোমিওপ্যাথী কেন রেচক আদৌ ব্যবহার করে না? আর এলোপ্যাথী (এলোপাতাড়ী) কেন ইহার অপব্যবহার করিয়া সহস্র সহস্র লোকের স্বাস্থ্য নষ্ট করে। সূক্ষ্মদর্শী হোমিওপ্যাথি রেচক ব্যবহারের অপকারিতা ভালরূপ বুঝিতে পারে; আর স্থূলদর্শী এলোপ্যাথী ইহার ভবিষ্যৎ অপকার বুঝিতে পারে না এবং আশু উপকারদর্শনে বিমুগ্ধ হয়। আজ কাল অনেকে আজীবন রেচকের অপব্যবহার করিয়া মন্দাগ্নি, উদরাময়, গ্রহিণী প্রভৃতি নানারোগে আক্রান্ত হন। এজন্য বিজ্ঞলোকেরা আদৌ রেচকের পক্ষপাতী নন, তৎপরিবর্ত্তে উপবাস করেন।

শরীরের উপর উপবাসের অশেষ গুণ দেখিয়া ধর্ম্মমাত্রেই সকলকে উপবাস করিতে আদেশ দেয়। এখন জিজ্ঞাস্য, যে দেশে ধর্ম্মসাধনার্থ উপবাস আদৌ প্রচলিত নাই, তথাকার লোকেরা কি দীর্ঘজীবন ভোগ করে না বা কোন উৎকট রোগে আক্রান্ত হইলে তাহাতে আরোগ্য লাভ করে না? তাহার সাক্ষ্য, দেখ, খৃষ্টজগতে উপবাস আদৌ প্রচলিত নাই। অথচ তথায় লোকে দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া কেমন স্বাস্থ্যসুখে কালাতিপাত করিতেছে। উহারা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের সদুপদেশ পাইয়া শারীরিক নিয়ম পালন করত কেমন সুখে দীর্ঘজীবন ভোগ করিতেছে! তবে কেন উপবাসের এমন অযথা প্রশংসাকীর্ত্তন করিতেছ?

এস্থলে সকলের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, শীতপ্রধান দেশে জলবায়ুরগুণে জনসাধারণ স্বভাবতঃ দীর্ঘায়ু ও বলিষ্ঠ হইয়া থাকে, আর গ্রীষ্মপ্রধান দেশে উহারা স্বভাবতঃ অল্পায়ু ও ক্ষীণবীর্য্য হইয়া পড়ে। শেষোক্ত স্থানে দীর্ঘজীবন লাভ করিতে হইলে উপবাসাদি বিশেষ আবশ্যক। শাস্ত্রকারেরা অগাধ পর্য্যবেক্ষণ ও ভূয়োদর্শনের গুণে উপবাসের সুফল ভালরূপ বুঝিতে পারিয়া উহা হিন্দুসমাজে প্রবর্ত্তন করিয়া যান। তাঁহাদের সুব্যবস্থা কি হাসিয়া উড়াইয়া দিবার যোগ্য? যাঁহারা পাশ্চাত্য সুশিক্ষা পাইয়া পাশ্চাত্য আদর্শে জীবন গঠন করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক কেন দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারেন না? দেখা যায়, অনেকে অতিরিক্ত ভোগবিলাসের জন্য অকালে কালগ্রাসে পতিত হন।

মনের উপর উপবাসের সুফল।

শরীরের উপর ইহার উপকার পরোক্ষভাবে সাধিত হয়; কিন্তু মনের উপর ইহার সুফল প্রত্যক্ষভাবে অনুভূত হইয়া থাকে। উপবাস দ্বারা মন ক্রমশঃ সংযত হয়; ইহার একাগ্রতা, ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও তিতিক্ষা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয় এবং দুর্দ্দম্য কামপ্রবৃত্তির তেজ কথঞ্চিৎ মন্দীভূত হয়।

উপবাস মনকে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা উত্তমরূপ শিক্ষা দেয়। যেমন কামরিপু যত অল্প চালনা করা যায়, ইহার দুর্দ্দম্য তেজ তত হ্রাস পায়; সেইরূপ মধ্যে মধ্যে ক্ষুধাগ্নিকে দমন করিলে মনের ধৈর্য্যগুণ সম্যক বর্দ্ধিত হইতে থাকে। সামান্য মুখের কথায় ইহা বাড়ে না। কিন্তু যে সকল ক্রিয়াযোগ দ্বারা ইহা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়, তন্মধ্যে উপবাস একটী প্রধান উপায়। যে দুঃখের সংসারে আমাদের চতুর্দ্দিকে বিপদ আপদ অনুক্ষণ ঘনীভূত হইতেছে, সে সংসারে ধৈর্য্যগুণ থাকা কত আবশ্যক! ঐ এক মহৎ গুণে বিভূষিত হইলে আমরা সংসারের যাবতীয় বিপদ আপদকে তুচ্ছজ্ঞান করিতে শিখি। এখন যে উপবাস দ্বারা আমাদের সেই ধৈর্য্যগুণ সম্যক বর্দ্ধিত হইবে, তাহা আমাদের কত মহোপকারী! ইহার জন্য হিন্দুধর্ম্ম উপবাসকে ধর্ম্মসাধনার এক প্রধান অঙ্গস্বরূপ করে ও নানা ব্রতের উপদেশ দেয়।

আজকাল অনেকে নিয়মিত সময়ে আহার না পাইলে অধিক কষ্ট বোধ

করেন, এমনকি ক্রোধে অন্ধ হইয়া পড়েন। আহারে এক ঘণ্টা বিলম্ব হইলে তাঁহারা চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখেন। উপবাসে অভ্যস্ত থাকিলে কি এমন ধৈর্য্যচ্যুতি হইবার সম্ভাবনা থাকিত? এখন কালগতিকে সুস্থশরীরে উপবাস করা আমাদের পক্ষে একরূপ দুঃসাধ্য। এখন আমরা উপবাসের নামে শিহরিয়া উঠি। ১০টায় ও ৪টায় স্কুল করিয়া এবং ১০টায় ও ৫টায় অফিস করিয়া আমাদের জঠর বিগড়াইয়া গিয়াছে এবং সেই সঙ্গে মনও বিগড়াইয়াছে। বিবাহের দিন সকলকে উপবাসে থাকিতে হয়। আজকাল সুশিক্ষিত যুবকদল গোপনে সেই দিন ডান হাতের ব্যাপার সারিয়া পুরোহিত মহাশয়কে অষ্টরম্ভা দেখান।

কলিযুগে মানব নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির একান্ত দাস, এমন কি কামরিপু চরিতার্থতার জন্য তিনি সদা লালায়িত। এই অত্যুগ্র কামপ্রবৃত্তি যাহাতে কথঞ্চিৎ মন্দীভূত হইতে পারে, ইহার দুর্দম্য তেজ কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস পাইবে, তদ্বিষয়ে সকল ধর্ম্মশাস্ত্র সাধ্যমত চেষ্টা পাইয়া উপবাসের আদেশ দিতেছে। যে শুক্রদেবের অপচয়ে শরীর ক্রমশঃ ক্ষীণ হয় ও আয়ুর্ব্বল হ্রাস পায়, সেই শুক্রদেবকে যতই শরীরে রক্ষা করা যায়, ততই ইহার মঙ্গল। এখন যে উপবাস দ্বারা কামরিপুর স্বাভাবিক তেজ হ্রাস হইতে পারে, তাহাতে অভ্যস্ত হইয়া উহার সুফল লাভ করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। যেমন একদিকে বহু দিবস ধরিয়া আমিষ অথবা লঙ্কা ও পলাণ্ডু ভোজন করিলে মন ক্রমশঃ কোপনস্বভাব ও উগ্র এবং কামরিপু উদ্রিক্ত হইতে থাকে, সেইরূপ অপরদিকে বহুদিবস ধরিয়া নিরামিষ ভোজন করিলেও মধ্যে ২ রীতিমত উপবাস করিলে কামরিপুর স্বাভাবিক তেজ মন্দীভূত হয়। এদেশের বিধবা স্ত্রীলোকদিগের প্রতি নেত্রপাত কর, এ বিষয়টী ভালরূপ বোধগম্য হইবে।

উপবাসে ভোজনসুখ বর্দ্ধিত হয়। প্রতিদিন যথাসময়ে ভোজন করিলে ক্ষুধাতৃপ্ত্যনুযায়ী সুখবোধ হইবে বটে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে উপবাস করিলে ভোজন সুখ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইবে। সংসারের নিয়ম এই, যাহাতে যত কষ্ট, তাহাতে তত সুখ। একদিকে উপবাসে যেমন কষ্ট, অপরদিকে উপবাসান্তে ভোজনে তেমনি সুখ। যাহারা মধ্যে মধ্যে উপবাস করেন, তাঁহাদেরই ভাগ্যে এরূপ সুখবোধ ঘটিয়া থাকে। আর যাহারা উপবাসে অনভ্যস্ত ও এরূপ সুখের সহিত

অপরিচিত, তাঁহাদের ভাবা উচিত, জরজ্বারি আরোগ্য হইবার পর প্রথম অন্নপথ্য করিয়া তাঁহারা কিরূপ সুখবোধ করেন অথবা পিতামাতার আদ্য শ্রাদ্ধের পর নিয়ম ভঙ্গের দিন জ্ঞাতিবর্গের সহিত অন্নব্যঞ্জন ভোজন করিয়া তাঁহারা কিরূপ সুখ অনুভব করেন।

উপবাসে জীবাত্মারও অনেক উপকার। যাহা তুমি অপার ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত পালন কর, তাহাতে বিমল আত্মপ্রসাদ লাভ হইয়া থাকে। যাহাতে আত্মপ্রসাদ লাভ, তাহাতেই জীবাত্মার পুণ্যলাভ ও পারত্রিক মঙ্গললাভ। অতএব যাহারা উপবাসাদি ব্রতপালন করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করিতেছেন, অন্তে তাঁহাদের সদগতি হইবে।

এখন দেখ, যে উপবাসে শরীর, মন ও আত্মার অশেষ মঙ্গললাভ, কেন হিন্দুধর্ম্ম তাহাতে একমাত্র পুণ্যলাভের কথা নির্দ্দেশ করিল? যে উপবাসে এত শারীরিক কষ্ট, কলিযুগের অন্নগতপ্রাণ ও আয়াসপ্রিয় মানব কি সহজে সেই উপবাস করিতে চাহিবেন? নিঃস্বার্থ ধর্ম্মের নামে সেই পরমকল্যাণকর ক্রিয়া সম্পাদনে তাঁহাকে স্বতঃ প্রোৎসাহিত করিবার জন্য মানবমনের গূঢ়রহস্যজ্ঞ মহর্ষিগণ কেবল ইহার পুণ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এখন যদি তোমার সুশিক্ষিত মনের নিকট ইহা ধর্ম্মের কুসংস্কার বলিয়া বোধ হয়, তবে কোনটী সমাজের সুসংস্কার? যে কাজে প্রভূত শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক মঙ্গললাভ, তাহা কি কদাচ কুসংস্কার হইতে পারে? তবে কেন তোমরা আজ কুশিক্ষা বশতঃ ঐ সকল কল্যাণকর অনুষ্ঠানকে ধর্ম্মের কুসংস্কার বলিয়া উড়াইতেছ? তোমরা কি এখনও বুঝিতে পার নাই, এ সকল অনুষ্ঠানকে ত্যাগ করাতে তোমরা দিনে দিনে অল্পায়ু ও ক্ষীণবীর্য্য হইতে চলিলে?

এখন দেখ, যে উপবাসে আমাদের শরীর, মন ও আত্মার এত মঙ্গললাভ, তাহাতে হিন্দুধর্ম্ম আমাদিগকে কিরূপ প্রোৎসাহিত করিতেছে! কি বিবাহ, কি শ্রাদ্ধ, কি দেবপূজা, কি ব্রতপালন, সকল ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রথমে ইহা আমাদিগকে উপবাস করিতে আদেশ দিতেছে।

বিবাহোৎসব। যে দিন তুমি সুপাত্রীর সহিত মন্ত্রপূত হইয়া পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইবে ও সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিবে, সেই দিন এ ধর্ম্ম পুরোহিত বেশে তোমার নিকট আসিয়া বলিবে, সমস্ত দিবস উপবাসে থাকিয়া দেহ মন

পবিত্র করিয়া তুমি মন্ত্রপূত হও ও বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হও, ইহাতেই তোমাদের পরম কল্যাণ ও অশেষ পুণ্যলাভ। যে দিন তুমি স্নেহের পুত্তলী কন্যাকে সুপাত্রে অর্পণ করিয়া বা সুপাত্রীর সহিত প্রিয়পুত্রের বিবাহ দিয়া নিজ দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইবে, সে দিন এ ধর্ম্ম পুরোহিত বেশে তোমার নিকট আসিয়া বলিবে, সমস্ত দিবস উপবাসে থাকিয়া দেহ মন পবিত্র করিয়া সম্প্রদানাদি শুভকার্য্য সম্পাদন কর, ইহাতেই তোমাদের পরম কল্যাণ ও পুণ্যলাভ।

শ্রাদ্ধোৎসব। তুমি আজ মৃত পিতামাতার আদ্যশ্রাদ্ধে বৃষোৎসর্গ ব্যাপার অনুষ্ঠান করিয়া ও ব্রাহ্মণভোজনাদি করাইয়া পিতৃমাতৃ ঋণ হইতে উদ্ধার পাইবে, এ ধর্ম্ম পুরোহিত বেশে তোমার নিকট আসিয়া বলিবে, সমস্ত দিবস উপবাসে থাকিয়া দেহমন পবিত্র করিয়া তাঁহাদের প্রেতাত্মার উদ্দেশে পিণ্ডদানাদি সম্পাদন কর, ইহাতেই তোমাদের পরম কল্যাণ ও পুণ্যলাভ হইবে এবং তাঁহাদেরও অক্ষয় স্বর্গবাস হইবে।

দেবোৎসব—আজ তোমার গৃহে কোন দেবদেবীর পূজা হইবে বা কোন ব্রতোৎসব হইবে; এ ধর্ম্ম বলিবে, পূজা বা ব্রত সমাপন পর্য্যন্ত উপবাসে থাকিয়া দেহমন পবিত্র করিয়া দেবতাদিগের শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান কর ও শান্তি-সলিলে নিজ দেহ অভিষিঞ্চন কর, ইহাতেই তোমাদের পরম কল্যাণ ও পুণ্য-লাভ হইবে।

আজ জন্মাষ্টমী, আজ শিবরাত্র, এ সকল পর্ব্বোপলক্ষে তোমার ধর্ম্মানুষ্ঠান একান্ত আবশ্যক। এ ধর্ম্ম তোমায় বলিবে, সমস্ত দিবস উপবাসে থাকিয়া দেহ মন পবিত্র করিয়া শাস্ত্রোক্ত ব্রত পালন কর, ইহাতেই তোমাদের অশেষ কল্যাণ ও পুণ্যলাভ হইবে। এইরূপ প্রত্যেক ধর্ম্মানুষ্ঠানে হিন্দুধর্ম্ম আমাদিগকে উপবাসে প্রোৎসাহিত করে এবং এইরূপে মধ্যে মধ্যে উপবাস করাইয়া আমাদের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক মঙ্গল সম্পাদন করে।

একাদশী ব্রত।

শাস্ত্রের আদেশ, হিন্দুবিধবাগণ একাদশী তিথিতে নিরম্বু উপবাস করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন। তাঁহারা সেদিন জলস্পর্শ পর্য্যন্ত করিবেন না, ফলাহার ত দূরের কথা! কেহ কেহ যৎসামান্য ফলাহার করিয়া দিন কাটান। সমস্ত দিবস অনাহারে থাকাতে তাঁহাদের মুখখানি কিরূপ মলিন হইয়া যায়! তাহা

দেখিয়া কাহার না প্রাণ কাঁদিবে! এক জন সুশিক্ষিত পাঠক বলিবেন, ধর্ম্মের এ কি অত্যাচার! একেত পত্যন্তর গ্রহণ করিতে না দিয়া এ ধর্ম্ম বিধবাদিগকে একপ্রকার মেরে রাখে। আবার গোদের উপর বিষফোড়া! এ ধর্ম্ম উহাদিগকে না খাইতে দিয়া মারিতে চায়। রে নিষ্ঠুর হিন্দুধর্ম্ম! তোর এ কি অবিচার! কেন তুই ননীর পুতুলদিগকে এত কষ্ট দিতেছিস্! হে জগদীশ! কবে এ সকল উঠিয়া যাইবে, আমরাও প্রাণে বাঁচিব।

এ বিষয়ে ধর্ম্মের গূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিতে চেষ্টা করা উচিত। যে ধর্ম্ম দম্পতি মিলনে নারীজাতিকে চিরদিনের জন্য পুরুষজাতির অর্দ্ধাঙ্গিনী করে এবং উহাদের প্রাণে প্রাণে, অস্থিতে অস্থিতে ও ত্বকে ত্বকে সর্ব্বাঙ্গীন মিলন ঘটায়, সে ধর্ম্ম কি প্রকারে বিধবাদিগকে পত্যন্তর গ্রহণ করাইবে? সে ধর্ম্ম পরমারাধ্য পতির মৃত্যুতে দুঃখিনী বিধবাকে যাবতীয় সুখভোগে জলাঞ্জলি দেওয়াইয়া পতির প্রতি অনন্ত প্রেমের খাতিরে দুর্জ্জয় কামপ্রবৃত্তি সংযমার্থ তাঁহাকে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করাইবে এবং সংসারাশ্রমে প্রকৃত সন্ন্যাসিনী ও যোগিনী সাজাইয়া নানা ধর্ম্মানুষ্ঠানে ও পরসেবায় প্রোৎসাহিত করিবে। তাঁহারই প্রকৃত ধর্ম্ম সাধনের জন্য, প্রকৃত মনঃ সংযমের জন্য, দুর্জ্জয় কামপ্রবৃত্তি দমনের জন্য নিরম্বু উপবাস একাদশী তিথিতে আদিষ্ট হইয়া থাকে। পক্ষে পক্ষে এইরূপ উপবাস করাতে তাঁহার শরীর ক্রমশঃ বজ্রতুল্য হইয়া উঠে ও কামপ্রবৃত্তি সম্যক মন্দীভূত হইতে থাকে। নিজের কষ্টরাশি বহন করিবার জন্য, পরসেবার জন্য তাঁহার ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা সম্যক বর্দ্ধিত হয়। এই প্রকারেই তাঁহার প্রকৃত তপঃসাধন, ধর্ম্মসাধন ও পুণ্যলাভ হইয়া থাকে।

দারুণ গ্রীষ্মে দারুণ পিপাসায় কণ্ঠতালু শুষ্কপ্রায় ও বক্ষঃস্থল বিদীর্ণপ্রায়, অথচ একবিন্দু জলস্পর্শ নাই। ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার এমন মহোচ্চ দৃষ্টান্ত কোন্ ধর্ম্ম এ জগতে দেখাইতে পারে, বল? রে ধার্ম্মিকা বিধবাগণ! ধন্য তোমাদের তিতিক্ষা! তোমরা নিজ নিজ গুণে হিন্দুসংসার পবিত্র ও উজ্জ্বল করিতেছ। তোমরা ইহজীবনে যে ধর্ম্মের জন্য এত কষ্টরাশি বহন করিতেছ, সেই ধর্ম্ম পরজন্মে তোমাদিগকে অনন্ত সুখে সুখিনী করিবে। যাহাদের জন্য তোমরা সংসারে প্রকৃত যোগিনী সাজ, তাঁহাদেরই প্রেতাত্মা ও দেবগণ তোমাদের উপর চিরদিন পুষ্পবৃষ্টি করিতেছেন।

একাদশী তিথিতে উপবাস করিতে হইবে, ইহাতে শাস্ত্রকারদিগের গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। একাদশী তিথি হইতে জোয়ারের জল বর্দ্ধিত হইতে আরম্ভ হয় এবং চতুর্থীর পর হ্রাস পায়। অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে সমুদ্রের জোয়ার অধিক বর্দ্ধিত হওয়ায় পৃথিবী সবিশেষ রসময়ী হয়। তৎকালে শরীরের রস অধিক দূষিত হওয়ায় অনেক ব্যাধি উগ্র মূর্ত্তি ধারণ করে। এজন্য শাস্ত্রকারেরা উপরোক্ত দুই তিথিতে শরীর অধিক বিকৃত হইবার পূর্ব্বে একাদশী তিথিতে নিরম্বু উপবাস করাইয়া শরীরের স্বাভাবিক দোষ খণ্ডন করিতে চেষ্টা পান।

যাহা হউক, একাদশী ব্রত দ্বারা হিন্দুধর্ম্ম বিধবাদিগের শারীরিক স্বাস্থ্য যে কেবল রক্ষা ও বর্দ্ধন করে, তাহা নহে; ইহা দ্বারা তাঁহাদের ভালরূপ ধর্ম্মসাধনও করায়। দেখ এস্থলে ধর্ম্মের কি অপার মহিমা! উপবাসে অশেষ পুণ্যলাভ নির্দ্দেশ করিয়া ইহা শরীরের স্বাস্থ্যরক্ষা রূপ সামান্য স্বার্থকে ধর্ম্মের নিঃস্বার্থে পরিণত করে।

পরিশেষে বক্তব্য, যদি এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে দীর্ঘ জীবন ভোগ করিয়া স্বাস্থ্যসুখে সুখী হইতে চান, শাস্ত্রোক্ত ব্রতপালনে যত্নবান হইবেন। একাদশী তিথিতে নিরম্বু উপবাস না করিতে পারেন, নিদেনপক্ষে ফলাহার করিবেন। অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতেও সেইরূপ সামান্য ফলাহার করিবেন। ইহাতে শরীর নীরোগ হইবে ও আয়ুর্ব্বল বর্দ্ধিত হইবে।

গাভীপূজা।

গাভীপূজনে ধর্ম্মের মহৎ উদ্দেশ্য।

বল দেখি, হিন্দুধর্ম্ম কতদূর অসার ও অপদার্থ। একটা সামান্য চতুষ্পদ জন্তুকেও এ ধর্ম্ম পূজা করিতে বলে। যে ধর্ম্মের নিকট প্রস্তর, সর্প, বৃক্ষাদি সকলই পূজ্য, সে ধর্ম্ম যে একটা চতুষ্পদ জন্তুকে পূজা করিতে বলিবে না, ইহাই উহার পক্ষে বিচিত্র কথা।

সুশিক্ষিত পাঠক বলিবেন, কৃষিপ্রধান ভারতে গোজাতির দ্বারা অনেক উপকার হইতেছে বটে, তথাচ উহাদের পূজা করিবার প্রয়োজন কি? উষ্ট্র আরব দেশের কত মহোপকারী জীব! অথচ তথাকার কোন লোক উহার পূজা করে না। তবে ভারতে কেন এমন অনাচার দেখিতে পাই। যদি মনে কর, সেবা শুশ্রূষার জন্য উহারা এদেশে পূজিত হইতেছে; তাই বা কেমন

করিয়া বলিব ? হিন্দুরা গরুর সেবা করিতে জানে না। উহাদের গৃহে গাভী ও বলদ প্রায় রোগা ও মড়া থাকে। কেমন করিয়া যত্ন করিতে হয়, তাহ উহারা জানে না। তবে গাভীকে মা ভগবতী বলিয়া পূজিবার কি প্রয়োজন ?

তাঁহাদের কথা তাঁহাদের কাছে থাক্। এখন গাভীপূজনে ধর্ম্মের গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করা আবশ্যক। বৃক্ষের ভিতর নারিকেল যেমন, চতুষ্পদ জন্তুর ভিতর গোজাতি আমাদের সেইরূপ মহোপকারী। নারিকেলের প্রত্যেক অংশ, এমন কি ছোবড়া পর্য্যন্ত আমাদের অনেক কাজে লাগে। গাভীর দুগ্ধ, মূত্র, গোময়, অস্থি, চর্ম্ম, শৃঙ্গ সকলই আমাদের অনেক ব্যবহারে আইসে। আমরা নারিকেল বৃক্ষকে ব্রাহ্মণ জ্ঞান করি এবং ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইব, এই ভয়ে জীবিতবস্থায় উহাকে ছেদন করি না। সেইরূপ গাভীকে মা ভগবতী বলিয়া পূজিয়া থাকি এবং গোহত্যায় মহাপাতক জ্ঞান করি।

গোদুগ্ধের মত পুষ্টিকর খাদ্য সংসারে আর দ্বিতীয় নাই। আমাদের বিবিধ খাদ্যে যে সকল পুষ্টিকর উপাদান আছে, তৎসমুদায় একাধারে দুগ্ধে অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। বিজ্ঞানের মতে এই সকল উপাদান তিন শ্রেণিতে বিভক্ত, যথাঃ—

(১) শ্বেতসারজাতীয় (Farinaceous)
(২) চর্ব্বীজাতীয় (Oleaginous)
(৩) যবক্ষার-জান-জাতীয় (Nitogenous)

দুগ্ধের শর্করা প্রথম জাতীয়, চর্ব্বি বা নবনীত দ্বিতীয় জাতীয়, কেসিন ও অল্বুমেন তৃতীয় জাতীয়।

বিজ্ঞান মাতৃদুগ্ধ ও গোদুগ্ধের এইরূপ পার্থক্য দেখায়—

(শতকরা)	মাতৃদুগ্ধ	গোদুগ্ধ
জল	৮৮	৮৭
চর্ব্বী	৩½	৩¾
কেসিন	১	৩
আলবুমেন্	¼	½
শর্করা	৬¾	৪¾
লবণ	¼	¾

গোদুগ্ধে জল ও শর্করার অংশ কিছু কম বলিয়া শিশুকে খাওয়াইবার সময় উহাতে জল ও চিনি মিশ্রিত করিয়া লইতে হয়।

সংসারে ভূমিষ্ঠ হইবার পর আমরা শৈশবকালে স্নেহময়ী মাতার স্তনদুগ্ধ পান করিয়া বর্দ্ধিত হই; কিন্তু আজীবন আমরা গোদুগ্ধ পান করিয়া শরীর পোষণ করি এবং বিবিধ পীড়ায় আমরা ইহাকে প্রধান পথ্য জ্ঞান করি। সেস্থলে গাভীকে মাতার ন্যায় পূজনীয়া জ্ঞান করা উচিত। এজন্য হিন্দুধর্ম্ম ইহাকে মা ভগবতী বলিয়া পূজা করিতে আদেশ দেয়। ইহাই গাভীপূজনে এ ধর্ম্মের প্রথম উদ্দেশ্য।

গোদুগ্ধ হইতে দধি, তক্র মাখন, ঘৃত, ক্ষীর, ছানা প্রভৃতি নানা সুখাদ্য প্রস্তুত হইতেছে। যেমন পাশ্চাত্য বিজ্ঞান দধি ও তক্রের অশেষ গুণ আবিষ্কার করিল, এমনি শিক্ষিত সম্প্রদায় উহা খাইতে ব্যগ্র হইলেন। কিন্তু ভারতে উহাদের ব্যবহার চিরদিন চলিতেছে। ঘৃত হইতে লুচি মেঠাই পলান্ন প্রভৃতি নানা মুখরোচক সুখাদ্য প্রস্তুত হইতেছে। ছানা হইতে নানাপ্রকার সন্দেশ, রসগোল্লা প্রভৃতি রসনার অশেষ তৃপ্তিকর সুখাদ্য প্রস্তুত হইতেছে। এক গোমাতার দুগ্ধ পাইয়া আমরা বুদ্ধিবলে ঐসকল প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছি। এক গোমাতার কল্যাণে আমরা ঐ সকল অমৃতোপম বস্তু পাইয়াছি। সত্যবটে, গব্যঘৃতের অভাবে আমরা এখন ভয়সা ঘৃত ব্যবহার করি, তথাচ বিশুদ্ধ গব্যঘৃতপক্ক ও ভয়সাঘৃতপক্ক উভয়ের পার্থক্য অধিক।

গাভীর যে দুগ্ধ উহার বৎসপোষণের জন্য বিহিত, তাহা আমরা অবলার নিকট হইতে একপ্রকার বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া পান করি বা পুত্রকন্যাদিগকে পান করাই। বল দেখি, আমরা স্বার্থপরতার বশীভূত হইয়া অবলা জাতির প্রতি কিরূপ নিষ্ঠুর আচরণ করি! উহাদের বৎসগুলিকে জীর্ণ ও শীর্ণ করিয়া উহাদের দুগ্ধ যথাসাধ্য নিচোড়িয়া লই। উহাদের অধিকাংশ পুংবৎসগুলিকে নপুংসক বলীবর্দ্ধ বা বলদ করিয়া ক্ষেত্রের কৃষিকার্য্য সম্পাদন করি; তাহাতেই আমরা এ সংসারে এক মুষ্ঠা অন্ন খাইতে পাই অথবা শকটে যোজিত করিয়া পণ্যদ্রব্য বহনে নিযুক্ত করি। উহারাও সবংশে ও সসন্ততিতে চিরদিন আমাদের নানা সেবা শুশ্রূষা করিয়া আসিতেছে।

অন্যান্য জন্তুদিগের যে বিষ্ঠা দেখিলে আমাদের স্বতঃ ঘৃণার আইসে, গোজাতির সে বিষ্ঠা আমাদের নিকট পবিত্র, বিশুদ্ধ গোময়। ইহাতে আমরা অনেক ঔষধ শোধন করি, ঘরদ্বার লেপন ও পরিষ্কার করি। কার্ব্বলিক এসিডের ন্যায় ইহা পচননিবারক ও দুর্গন্ধনাশক। বৈদিক সময় হইতে ইহা চিরদিন এইরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। এই গোময় শুষ্ক করিয়া ঘুঁটে প্রস্তুত হয়, তাহা জ্বালানি কাষ্ঠের কাজ করে। পচা গোবর ক্ষেত্রের উৎকৃষ্ট সার। এই প্রকারে জীবদ্দশায় উহারা আমাদের বিধিমতে সেবা করিতেছে। মৃত্যুর পর উহাদের চর্ম্ম পাদুকাদি নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হইতেছে এবং ক্ষুর, অস্থি ও শৃঙ্গ নানাকাজে লাগিতেছে।

যে গোধন আমাদের এত কাজে লাগে, উহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা উচিত? উহাকে চিরদিন মস্তকে রাখা উচিত। মাথায় রাখিবার জন্য এ ধর্ম্ম উহাদের পূজা করিতে বলে। ইহাই গাভীপূজনে ধর্ম্মের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য।

ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, এই অবলাজাতির প্রতি আমরা স্বার্থসাধনোদ্দেশে অশেষ নিষ্ঠুরতাচরণ করিয়া থাকি। এরূপ নিষ্ঠুর আচরণ করিয়া আমরা কি পাপপঙ্কে লিপ্ত হইব না? সেজন্য বলা উচিত, যে ধর্ম্মাত্মা হিন্দু সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য গোজাতির প্রতি কার্য্যতঃ অশেষ নিষ্ঠুরতাচরণ করিতে বাধ্য, তিনি আবার নিজ মন হইতে নিষ্ঠুর ভাব সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করিবার জন্য গাভীর সম্মুখে করযোড়ে দণ্ডায়মান হন। যে ধর্ম্মাত্মা হিন্দু গোজাতির প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করাতে মহাপাতকে লিপ্ত হইবার ভয় করেন, তিনিই আবার নিজকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ গাভীকে পাদ্য ও অর্ঘ দিয়া পূজা করিতে শিখিয়াছেন। ইহাই গাভীপূজনে এ ধর্ম্মের তৃতীয় উদ্দেশ্য।

যে গোবংশ আমাদের এত মহোপকারী, উহাদের প্রতি আমাদের কিরূপ কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত? অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার জন্য এ ধর্ম্ম আমাদিগকে আদেশ দেয়, উহাদের পাদমূলে ভক্তিভাবে প্রণত হও, যথাবিধি উহাদের সেবা শুশ্রূষা কর, উহাদের প্রতি আদৌ নিষ্ঠুরতাচরণ করিও না এবং কদাচ কোন কারণে গোহত্যা করিও না। বল দেখি, এস্থলে আন্তরিক কৃতজ্ঞতার কি স্বর্গীয় ভাব স্ফুরিত হইতেছে? এক ভাবপ্রধান হিন্দু ব্যতীত

জগতের কোন্ জাতি কৃতজ্ঞতার এমন স্বর্গীয় ভাব স্ফুরণ করিতে পারে? অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশই গাভীপূজনে এ ধর্ম্মের চতুর্থ উদ্দেশ্য।

যে গোবংশ আমাদের এত মহোপকারী, যাহাদের উপর আমরা প্রাণ ধারণের জন্য সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করি, সে জাতির কিরূপ সেবা শুশ্রূষা করা উচিত? অকপট ও নিঃস্বার্থভাবে সেবা ব্যতীত কি সে জাতির ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে বা উহার জাতীয় উন্নতি সাধন করিতে পারিবে? স্বার্থসিদ্ধির জন্য যাহার সেবা করিবে, স্বার্থের বিপর্য্যয় ঘটিলে সেবারও বিপর্য্যয় ঘটিবে। কিন্তু নিঃস্বার্থভাবে কায়মনোবাক্যে যাহার সেবা করিবে, স্বার্থের বিপর্য্যয় ঘটিলে সেবার কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য ঘটিবে না। এজন্য নিঃস্বার্থভাবে ও ধর্ম্মভাবে এ জাতির অশেষ সেবা শুশ্রূষা করিয়া উহাদের জাতীয় উন্নতিসাধনের জন্য এ ধর্ম্ম সমাজের অশেষ মঙ্গলোদ্দেশে উহাদের পূজা করিতে আদেশ দিতেছে এবং গোহত্যায় মহাপাতক নির্দ্দেশ করিতেছে। অতএব নিঃস্বার্থভাবে সেবা শুশ্রূষা করাই গাভীপূজনে এ ধর্ম্মের পঞ্চম উদ্দেশ্য।

নিঃস্বার্থ ধর্ম্মভাবে যে সেবা করা যায়, তাহাই প্রকৃত সেবা, তাহাই এ সংসারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সেবা। যে গাভী ভালরূপ দুগ্ধ প্রদান করে, উহার সেবা সকলেই করিয়া থাকে। কিন্তু যে গাভী দুগ্ধ প্রদান করে না, নিঃস্বার্থ ধর্ম্মভাবে সে গাভীর সেবা এক হিন্দু ব্যতীত জগতের অন্য কোন জাতি করে না।

যে গোজাতি দ্বারা সকলের এত উপকার, সকল দেশে উহাদের যথাবিধি সেবা ও শুশ্রূষা চলিতেছে। অন্যান্য দেশে কেবল স্বার্থসাধনোদ্দেশে উহাদের সেবা শুশ্রূষা করা হয় এবং যে স্থলে স্বার্থের বিপর্য্যয় ঘটে, সে স্থলে গাভীটী প্রায় হত হয়। ম্লেচ্ছ জাতিবর্গ যে গাভীর দুগ্ধ পান করে বা যে বলদ দ্বারা ক্ষেত্রের কৃষিকার্য্য করায়, সে গাভী বা বলদ বৃদ্ধ হইয়া অকর্ম্মণ্য হইলে, উহাকে জবাই করিয়া পাঁচ জনে মিলিয়া ভক্ষণ করে অথবা বাজারে উহার মাংস বিক্রয় করিয়া বেশ দু পয়সা আনে। কিন্তু ইহা আমাদের পরম গৌরবের বিষয়, আমরা কদাচ সেরূপ পৈশাচিক ব্যবহার স্বপ্নেও ভাবিতে পারি না। অতএব বুঝিয়া দেখ, হিন্দুধর্ম্ম আমাদিগকে গাভীপূজা করিতে শিক্ষা দিয়া কি উদার, মহোচ্চ ও স্বর্গীয় ভাব প্রদর্শন করিতেছে! এস্থলে ভাবপ্রধান ধর্ম্মাত্মা হিন্দু নিজের সামান্য স্বার্থকে ধর্ম্মের নিঃস্বার্থে পরিণত করেন, গোপালনরূপ সমাজের

একটা সামান্য কর্ত্তব্যকে ধর্ম্মের মহাপুণ্য করেন এবং গোহত্যারূপ সমাজের অমঙ্গলকে মহাপাতক করেন। কি পরিতাপের বিষয়! আমরা আজকাল কুশিক্ষাবশতঃ ধর্ম্মের এ সকল মহোচ্চ ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না এবং সকলই এক কুসংস্কারের দোহাই দিয়া উড়াইতে চেষ্টা পাই।

গাভীপূজন দ্বারা ভারতের মঙ্গলসাধন।

বৈদিকযুগে আর্য্যসমাজে মধ্যে মধ্যে গোমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত এবং শুনিতে পাই, আর্য্যজাতিও গোমাংস ভক্ষণ করিতেন। অভ্যাগত অতিথি আসিলে তৃপ্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে উপরোক্ত মাংস ভোজন করান হইত। ইহাতে সমাজের ঘোর অমঙ্গল সাধিত হইয়াছিল। এজন্য গোবংশের উন্নতি দ্বারা দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধনের জন্য উত্তরকালে গাভীপূজা ভারতে প্রবর্ত্তিত হয় এবং গোহত্যায় মহাপাতক সকল শাস্ত্রে উপদিষ্ট হয়।

যখন বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের সঙ্গে অহিংসাপরমধর্ম্মের জয় সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইতে থাকে, তখন কৃষিপ্রধান ভারতের অশেষ মঙ্গলার্থে সেই অহিংসাপরমধর্ম্ম হিন্দুসমাজে একমাত্র গোধনরক্ষণে পূর্ণমাত্রায় প্রযুক্ত হইল। অন্যান্য জীবজন্তুর প্রতি হিন্দুরা যেরূপ ব্যবহার করুন না, গোজাতির প্রতি তাঁহাদের সমবেদনা পূর্ণভাবে প্রকটিত হইল এবং সেই সঙ্গে গাভীপূজা সর্ব্বত্র প্রচলিত হইল।

যেমন জাতিভেদপ্রথার প্রধান উদ্দেশ্য, সংসারের যাবতীয় দ্রব্য অতি সুলভ মূল্যে ও অধিক পরিমাণে সরবরাহ করিয়া যাহাতে জনসাধারণের জীবনসংগ্রাম অনায়াসসাধ্য হওয়ায় উহারা সুখস্বচ্ছন্দে জীবন অতিবাহিত করিতে পারে; সেইরূপ গাভীপূজনের প্রধান উদ্দেশ্য, স্বল্পব্যয়ে গোজাতির সম্যক উন্নতিসাধন করিয়া যাহাতে জনসাধারণ বিনা মূল্যে বা স্বল্পব্যয়ে অপর্য্যাপ্ত দধিদুগ্ধ ঘৃত পান করিয়া স্বাস্থ্যসুখে সুখী হইবে ও প্রভূত বলবীর্য্যবান হইবে।

এই গাভীপূজন দ্বারা হিন্দুসমাজের যে কত মঙ্গল সম্পাদিত হইয়াছে, তাহা বর্ণনাতীত। ইহার গুণে চিরদিন হিন্দুসমাজে অপর্য্যাপ্ত দধি, দুগ্ধ, ছানা ও ঘৃত উৎপন্ন হইয়া আসিতেছে এবং বিবিধ যাগযজ্ঞে এতকাল

অপর্য্যাপ্ত ঘৃত অগ্নিতে আহুত হইত। ইহার গুণে ভারতবাসী পূর্ব্বে ঘৃতপক্ক অন্নব্যঞ্জনাদি ভোজন করিয়া ভীমপরাক্রমশালী ও বলবীর্য্যদৃপ্ত ছিলেন। ইহার গুণে তাঁহার বুদ্ধিশক্তি ও ধর্ম্মভাব এতদূর স্ফুরিত হইয়াছিল। ইহার গুণে তিনি এতকাল স্বল্পব্যয়ে ঘৃতপক্ক অন্নাদি ও মিষ্টান্নাদি ভোজন করিয়া স্বাস্থ্যসুখে সুখী ও দীর্ঘজীবী ছিলেন। যথার্থ বলিতে কি, এক গোবংশের উন্নতি দ্বারা কৃষিপ্রধান ভারতভূমি চিরদিন ধনধান্যে ও সুখসমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ ও সভ্যতাজ্যোতিতে উদ্ভাসিত। এক গোবংশের উন্নতিই অনন্তরত্নপ্রভবা ভারতভূমির সকল ঐশ্বর্য্যের মূলীভূত কারণ। এজন্য হিন্দুধর্ম্ম আমাদিগকে চিরদিন গাভীপূজা করিতে বলে। কিন্তু হায়! ইহাই এখন এধর্ম্মের অপরাধ! ইহাই এখন এধর্ম্মের কুসংস্কার!

স্বাধীন ভারতের সুসমৃদ্ধ সময়ের কথা ছাড়িয়া দেও, শতাব্দী পূর্ব্বে ইহার অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা একবার ভাবা উচিত। তৎকালে পল্লীগ্রামস্থ প্রত্যেক গৃহস্থ পালে পালে গোধন পালিত, এবং গোধন দেখিয়া সকলে তাহার ধনসম্পত্তি অনুমান করিত। তৎকালে জলের ন্যায় দুগ্ধ ও তক্রের মূল্য আদৌ ছিল না এবং এক গোপজাতি ব্যতীত অন্যান্য জাতির পক্ষে দুগ্ধাদি বিক্রয় সমাজে বড় নিন্দনীয় ছিল। ইহাতে বুঝা উচিত, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কিরূপ গব্যরস ও গব্যঘৃত পান করিয়া গিয়াছেন! কিন্তু হায়! সে ভারতের এখন কিরূপ শোচনীয় অবস্থা!

গোহত্যায় মহাপাতক।

হিন্দুধর্ম্মের আদেশ, ব্রহ্মহত্যায় যেরূপ মহাপাতক, গোহত্যায়ও সেইরূপ মহাপাতক হইবে। যে নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ দেবতার ন্যায় পূজনীয়, যাঁহার পদরজঃ স্বয়ং বিষ্ণু বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া, কৃতার্থ হন, তাঁহার হত্যায় আমাদের যেরূপ মহাপাতক হইয়া থাকে, যে গাভীকে আমরা মা ভগবতী বলিয়া পূজিয়া থাকি, উহার বধে আমাদের সেইরূপ মহাপাতক হইবে। দণ্ডবিধির আদেশ, চণ্ডাল হত্যায় যেরূপ দণ্ড, ব্রহ্মহত্যায়ও সেইরূপ দণ্ড; এক ছাগহত্যায় যেরূপ দণ্ড নাই, গোহত্যায়ও সেইরূপ কিছুমাত্র দণ্ড নাই, পাপপুণ্য ত মনের একটা সংস্কার মাত্র। ইহাতে কোন কোন হিন্দুহাকিমের মনে কিঞ্চিৎ দ্বিধাবোধ হইতে পারে বটে, কিন্তু হিন্দুমাত্রেরই মনের আবেগ অন্যরূপ।

এখন একবার ভাব দেখি, গোহত্যায় মহাপাতক নির্দ্দেশ করাতে শাস্ত্র সমাজধর্ম্মের কি অলস্ত সত্য উপদেশ দিতেছে! যে ধর্ম্ম ছাগগুলিকে দেবতার সমক্ষে বলিদান দিয়া ভোজন করিতে আদেশ দেয়, সে ধর্ম্ম কেন গোহত্যায় মহাপাতক নির্দ্দেশ করিল? যে ছাগ দ্বারা ছাগবংশের বৃদ্ধি ব্যতীত সমাজের আর কিছু উপকার নাই, যাহার কোমল পুষ্টিকর মাংস ভোজন করিলে শরীরের স্বাস্থ্য বর্দ্ধিত হয়, উহাকে দেবতাকে নিবেদন করিয়া তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন কর, ইহাতে তোমার কিছুমাত্র পাপ নাই। কিন্তু যে গোবংশ কৃষিপ্রধান ভারতে জীবনযাত্রানির্ব্বাহের জন্য একান্ত আবশ্যক, যাহার গব্যরসে ও গব্যঘৃতে এতকাল সকলে লালিত ও পালিত, উহাদের হত্যা সমগ্র সমাজের কতদূর অনিষ্টকারক ও অপকারক! যে বৃক্ষশাখায় তুমি উপবিষ্ট, কুঠার দ্বারা সেই শাখা ছেদন করা যেরূপ, গোহত্যা করাও তদনুরূপ। যে কুক্কুটী স্বর্ণ অণ্ড প্রসব করে, উহার উদর ছেদন করিয়া অণ্ড বাহির করা যেরূপ, গোহত্যা করাও তদনুরূপ। ইহার জন্য হিন্দুধর্ম্ম গোহত্যায় মহাপাতক নির্দ্দেশ করিতেছে।

এইরূপে সমাজের মহোপকারী বিষয়ে মহাপুণ্য ও অনিষ্টকারী বিষয়ে মহাপাতক নির্দ্দিষ্ট হওয়াতে জনসাধারণ কত শ্রদ্ধা, কত ভক্তি ও কত আগ্রহের সহিত ঐ সকল পালন করিতে প্রোৎসাহিত হইতেছে এবং তদ্দ্বারা সমাজের কত মঙ্গল স্বতঃ পরতঃ সাধিত হইতেছে! যদি শাস্ত্রকারেরা গোজাতির উপকারিতা-দর্শনে উপদেশ দিতেন, বিধিমতে ইহাদের সেবা করা উচিত ও ইহাদের নিধন সর্ব্বতোভাবে অনুচিত, সমাজের কয় জন ব্যক্তি তদনুসারে ইহাদের প্রকৃতরূপ সেবা করিত ও গোহত্যা করিত না। কিন্তু আজ হিন্দুধর্ম্মের গুণে, শাস্ত্রকারদিগের গুণে গোপালনে মহাপুণ্য ও গোহত্যায় মহাপাতক উপদিষ্ট হওয়াতে আমরা কিরূপ নিঃস্বার্থ ধর্ম্মভাবে ইহাদের সেবা করি ও গোহত্যায় কিরূপ অন্তরের সহিত সঙ্কুচিত হই। এস্থলে ধর্ম্ম গোহত্যায় মহাপাতক নির্দ্দেশ করিয়া জাতীয় হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে আঘাত করিতেছে এবং স্ত্রীলোকের সতীত্বনাশে আমরা যেরূপ উত্তেজিত হই, গোহত্যাদর্শনেও আমরা স্বতঃ উত্তেজিত ও মর্ম্মাহত হইয়া থাকি।

গোহত্যার কথা ছাড়িয়া দাও, অবলা জাতির উপর সামান্য অস্ত্রাঘাত দেখিলে আমাদের প্রাণ কাঁদিয়া উঠে।

আজকাল কোন কোন সুশিক্ষিত লোক ইংরাজবন্ধুগণের সহিত মিলিত হইয়া হোটেলে গমন পূর্ব্বক অম্লান বদনে গোমাংস ভোজন করিতেছেন বটে; কিন্তু বল দেখি, যদি পল্লীগ্রামস্থ কোন হিন্দুর ঘরে দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ গোহত্যা ঘটে, উহার মন কিরূপ আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হইতে থাকে এবং যতক্ষণ না প্রায়শ্চিত্ত সম্পন্ন হয়, ততক্ষণ উহার মন কিছুতে শান্তি লাভ করে না।

আজকাল কেহ কেহ হোটেলে গিয়া গোপনে গোমাংস ভোজন করিতেছেন। কিন্তু অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে এ দৃশ্য হিন্দুসমাজে স্বপ্নের অগোচর ছিল। কোথায় হে শব্দকল্পদ্রুমপ্রণেতা রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর! তোমার এক দৌহিত্র সুখচারের উদ্যানবাটীতে এক গোবৎস হত্যা করাইয়া সবান্ধবে উহার মাংস ভোজন করত আমোদ আহ্লাদ করে, ইহাতে তুমি মর্ম্মাহত হইয়া মনোদুঃখে কলিকাতার রাজবাটী জন্মের মত ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনবাসী হইয়াছিলে এবং তথায় পৌত্রকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলে। ধন্য তোমার সুশিক্ষা! ধন্য তোমার হৃদয়ের উদ্বেগ!

গোহত্যার কথা ছাড়িয়া দেও, সে পাপকথা মুখে আনিবার প্রয়োজন নাই। গোহত্যা দর্শন করিলেও আমাদের মহাপাপ হয় এবং যে স্থলে গোহত্যা ঘটে, সে স্থল আমাদের নয়নে মহা অপবিত্র, সে স্থল নরক অপেক্ষা ভীষণতর। সে দৃশ্য দেখিলে আমাদের মনপ্রাণ স্বতঃ কাঁদিয়া উঠে, হৃদয়-শোণিত জমাট বাঁধিয়া যায় এবং নয়নদ্বয় স্বতঃ নিমীলিত হইয়া পড়ে। হিন্দু-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া কেহ সে দৃশ্য দেখিতে পারেন না!

আজকাল নানাস্থানে গোহত্যা লইয়া হিন্দু-মুসলমান বিবাদ বিসম্বাদে লিপ্ত হইতেছে এবং রাজপুরুষগণ উহাদের যথাবিধি দণ্ড বিধান করিতেছেন। ওহে ন্যায়বিচারী রাজপুরুষগণ! দেখ যে সকল হিন্দু গোহত্যা দর্শনে দিশেহারা ও উন্মত্ত হইয়া বিধর্ম্মীদের সহিত বিবাদে লিপ্ত হইতেছে, রাজ্যের শান্তি স্থাপনার্থ তোমরা উহাদিগকে কারাগারে নিক্ষেপ করিতেছ বটে, কিন্তু ইহাতে কি তোমরা আমাদের জাতীয় হৃদয়োদ্বেগ নিবারণ করিতে পারিবে? মহানদী বালীর বাঁধে বাঁধা যায়, দুই জনকে জেলে

খুরিয়া জাতীয় হৃদয়োদ্বেগ রোধ করা যায় না। গোবধ দেখিলে হিন্দুর মন কিরূপ বিচলিত হয়, তাহা তোমরা বুঝিতে পার না বলিয়া এরূপ কঠোর শাস্তি বিধান করিয়া থাক। যাহা হউক হিন্দু মুসলমানের ভিতর প্রকৃত একতা স্থাপিত হইলে এ বিষম সমস্যা কালে মীমাংসিত হইবে।

গোহত্যার বিষময় ফল।

যেমন কৃষিজাত গম চাউল বিদেশে অধিক রপ্তানি হইলে, দেশের লোক খাইতে পায় না, দুর্মূল্যতা হু হু শব্দে বাড়িয়া যায় এবং ঘন ঘন দুর্ভিক্ষপতন হয়, সেইরূপ দেশে অতিরিক্ত গোহত্যা হইলে জনসাধারণ দুগ্ধ ও ঘৃত চক্ষে দেখিতে পায় না, উহাদের মূল্য ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে, গোজাতি ক্রমশঃ নির্ম্মূল হইতে বসে এবং যদিও দুর্ভিক্ষের মত দেশময় হাহাকার উঠে না, তথাচ নানাদিকে নানা অনিষ্টোৎপত্তি আরম্ভ হয়।

এ বিষয়ে স্বাধীন ভারতের যেমন সুসময় গিয়াছে, পরাধীন ভারতের তেমনি দুঃসময় পড়িয়াছে। যে গব্যঘৃত আজ এত মহার্ঘ, যাহা এখন ডুমুর ফুলের ন্যায় আমাদের চক্ষের অগোচর, সেই ঘৃত পুরাকালে মণ মণ হিসাবে যজ্ঞাদিতে আহুত হইত। সমাজের খরচান্তে অবশিষ্ট ভাগই যজ্ঞাদিতে ব্যবহৃত হইত। ইহাতে বুঝা উচিত, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কিরূপ মনের সাধে গব্যরস ও ঘৃত পান করিতেন। এখন একবার পরাধীন ভারতের দিকে নেত্রপাত কর, দেখিবে সেই সোণার ভারত, সেই প্রমদোদ্যান এখন কিরূপ শ্মশানে পরিণত। যে ভারতে জলের ন্যায় দুগ্ধ ও তক্রের মূল্য ছিল না এবং জনসাধারণ ইচ্ছামত দুগ্ধ ও ঘৃত পান করিয়া বলবীর্য্যশালী ছিল, সে ভারতে আজ টাকায় তিন সের দুধ এবং গব্য ঘৃতের অভাবে ভয়সাঘৃত ব্যবহৃত হইতেছে, তাহাও আবার নানা মৃতজন্তুর চর্ব্বিমিশ্রিত, যাহা আঘ্রাণ করিলে আমাদের স্বতঃ নাকার আইসে। যদি গোমাংসের ন্যায় মহিষমাংস ম্লেচ্ছ জাতির খাদ্য হইত, ভয়সা ঘৃতও চক্ষে দেখিতে পাইতে না। হা হতবিধে? তুমি ভারতের ভাগ্যে কি লিখিয়াছ? যে জাতি পরাধীন, সে জাতির এতদূর অধঃপতন কি সম্ভব! সে জাতির কপাল কি এমন করিয়া ভাঙ্গে, যে উহারা ক্রমশঃ ক্ষীণবীর্য্য ও অল্পায়ু হইবে এবং উহাদের শিশুসন্তানগণ দুগ্ধাভাবে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইবে!

বিগত সপ্তশতাব্দী স্বর্ণময়ী ভারতভূমি বিধিনির্ব্বন্ধে ও দৈবাধীনে বিধর্ম্মী-দিগের করতলস্থ হওয়ায় উহারা অপরিমেয় গোহত্যা করিয়া মনসুখে গোমাংস ভক্ষণ করিতেছে ও দেশের সর্ব্বনাশ করিতেছে। মুসলমান রাজত্বের প্রারম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতে যে কত কোটী কোটী গোহত্যা হইয়াছে, তাহার কি কিছুমাত্র ইয়ত্তা আছে? এখন যে আমরা, ইচ্ছামত মনসুখে দধি দুগ্ধ ঘৃত পান করিতে পাই না, ইহার একমাত্র কারণ গোখাদক ম্লেচ্ছজাতি কর্ত্তৃক অপরিমেয় গোহত্যা বশতঃ গোজাতি ভারতে নির্ম্মূল হইতে চলিল এবং আমরাও ঘৃতদুগ্ধাভাবে ক্রমশঃ ক্ষীণবীর্য্য ও অল্পায়ু হইতে বসিলাম। এখনও এক টাকায় তিনসের জলোদুধ পাওয়া যায়। মনে রাখিবেন, কিছুকাল পরে এক টাকায় অর্দ্ধসের দুধ খরিদ করিতে হইবে। তখন সকলে সন্তানাদি লালন পালন করিয়া মনসুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন। তবে কেন সকলে মোহনিদ্রায় নিদ্রিত ও গোহত্যানিবারণের উপায় অন্বেষণ করে না?

এই যে মা লক্ষ্মীর নিবাসভূমি কলিকাতা মহানগরী, ইহার অবস্থা কিরূপ শোচনীয়, তাহা একবার ভাব, দেখি। যাঁহাদের উপর কমলার কৃপাদৃষ্টি আছে, তাঁহারা না হয় অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়া ইচ্ছামত ঘৃতদুগ্ধ পান করেন। কিন্তু সহরের পোনর আনা লোক দুগ্ধ চক্ষে দেখিতে পায় না, কায়ক্লেশে যৎ সামান্য যাহা খরিদ করে, তাহা অপোগণ্ড শিশুদিগকে খাওয়াইয়া কুলাইতে পারে না। যদি কোন দিন উহাদের ভাগ্যে সামান্য দুধ মিলে, গোঁপে তাহা লাগাইয়া বন্ধুবর্গকে দেখায় আজ কি শুভদিন? আবার গোদের উপর বিষ ফোড়া। সহরের সকল দ্রব্যই ভেজাল। এই ভেজাল দ্রব্য খাইয়া অনেকে অজীর্ণাদি নানা রোগে ভুগিতে ভুগিতে কঙ্কালসার হইতেছে। অনেকের শিশুসন্তান একমাত্র বিশুদ্ধ দুগ্ধাভাবে যকৃতাদি নানা রোগে ভুগিতে ভুগিতে মারা যাইতেছে। যদি দধি দুগ্ধ, ঘৃত ও তৈল এরূপ ভেজাল না হইত, সমাজের এরূপ দারুণ দুরবস্থা ঘটিত না। যখন দেশের অবস্থা ক্রমশঃ এতদূর শোচনীয় হইতেছে, তখন সকলে কেন মোহনিদ্রায় নিদ্রিত ও গোহত্যা নিবারণের উপায় অন্বেষণ করে না?

দুগ্ধ-সম্বন্ধে কলিকাতা ও অন্যান্য মহানগরীর এখন যেরূপ দারুণ দুরবস্থা, তাহাতে গোহত্যা আর কিছুকাল এই হারে চলিলে, সমগ্র ভারতের অবস্থা

আরও শোচনীয় হইবে। তখন সকলেই মনের সাধে দধিদুগ্ধ পান করিবেন, মিঠাইমণ্ডা খাইবেন ও শিশুসন্তানদিগের লালন পালন করিবেন। এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশের জলবায়ুর গুণে একেত ভারতবাসী ক্রমশঃ নির্বীর্য্য হইতেছে, তাহার উপর ঘৃত দুগ্ধাভাবে আরও দুর্ব্বল হইবে। অতএব গোহত্যার শেষ পরিণাম, হিন্দুজাতি ও হিন্দুধর্ম্ম জগতে লোপ পাইবে। তবে কেন এখনও সকলে মোহনিদ্রায় নিদ্রিত ও গোহত্যা নিবারণের উপায় অন্বেষণ করে না?

এ বিষয়ে কলিকাতাবাসী গোপবংশীয় কুলাঙ্গারেরা হিন্দুসমাজের প্রভূত অনিষ্ট সাধন করিতেছে। এই নরাধমেরা নানাস্থানে গাভী খরিদ করিয়া বৎসগুলি প্রথমে কসাইহস্তে বিক্রয় করে, ফুঁকো দিয়া (গোযোনিতে বাঁশের নল দিয়া ফুঁ দেওয়াতে) গরুর দুগ্ধ প্রচুর পরিমাণে নিঃসরণ করাইয়া লয়, পরিশেষে কসাইহস্তে উহাকে বিক্রয় করিয়া ফেলে। এই ফুঁকো দেওয়া দুধ খাইয়া সহরের শিশু সন্তানগণ যকৃতাদি রোগে ভুগিতে ভুগিতে অকালে মারা যাইতেছে। আর যে গরুর ফুঁকো দিয়া একবার দুগ্ধ নিঃসরণ করান হয়, সে গরু কস্মিন্ কালে পুনরায় গাবিন হয় না, অগত্যা কসাই হস্তে বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়।

রে নৃশংস পাপাত্মা গোপগণ! তোমাদের কি কিছুমাত্র ধর্ম্মভয় নাই? দেশের যে কত সর্ব্বনাশ করিতেছ, তাহা কি তোমরা একবার ভাবিয়া দেখিবে? যে গোমাতার উপর তোমরা এতদূর নিষ্ঠুর আচরণ করিতেছ, তাহার অভিসম্পাতে তোমরা ক্রমশঃ নির্ব্বংশ হইতে চলিলে এবং কালে তোমাদের জাতীয় ব্যবসায় লোপ পাইবে।

গোজাতির উন্নতিসাধন।

এ জাতির উন্নতিসাধনের জন্য নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করা অত্যাবশ্যক।

(১) দেশের গোহত্যানিবারণ।

(২) গ্রামে গ্রামে গোরক্ষিণী সভাস্থাপন।

(৩) গোরক্ষণার্থ স্থানে স্থানে পিজরাপোল স্থাপন।

(৪) গোদুগ্ধ সুলভ করিবার জন্য প্রত্যেক সহরের উপকণ্ঠে যৌথকারবার দ্বারা আবশ্যক মত কয়েকটি ডেরী হাউস বা গোশালা স্থাপন।

(৫) গ্রামে গ্রামে যথেষ্ট গোচারণ ভূমি রাখা।

(৬) গাভীর বৈজ্ঞানিক পূজা।

এখন দেশের সকলেই গোহত্যার বিষময় ফল দেখিতেছে ও ভুগিতেছে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, কেহই ইহার নিবারণার্থ কোনরূপ উপায় অন্বেষণ করে না; মনে জানে, যাঁহারা রক্ষক, তাঁহারাই ভক্ষক। তাঁহাদের কাছে আবেদন করাও বৃথা, মাথা কুটিলেও কোনরূপ প্রতীকার পাইবার আশা নাই। যে ইংরাজ দাসত্ব প্রথা রহিত করিয়া ও ভারতে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান করিয়া জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়াছেন, যে জাতি ক্লাইব ও হেষ্টিংকে ভারতে অত্যাচারের জন্য অভিযুক্ত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, সে জাতি নৈতিকঅবনতিবশতঃ এখন অধিক স্বার্থপর এবং প্রজাবর্গের কাতরোক্তিতে কর্ণপাত করিবেন না। সে স্থলে নিজেদের ভিতর ইহার উপায় অন্বেষণ করা আবশ্যক।

ভারতে প্রত্যহ যে পরিমাণে গোহত্যা হইতেছে, উহার জন্য ভারতবাসিগণই প্রকৃত দায়ী। আমরা কসাইহস্তে গরু বিক্রয় করি, তবে ত উহারা সেই সকল গরু জবাই করে। বিদেশ হইতে ইহাদের আমদানি হয় না। লোকে না খাইতে পাইয়া গোধন বিক্রয় করে। তাহা আবার ঘুরিতে ঘুরিতে কসাইহস্তে পতিত হয়। যে হিন্দু কসাইহস্তে গরু বিক্রয় করে, সে যদি জাতিচ্যুত হইত, যদি সমাজ তাহাকে ভালরূপ শাসন করিত, গোহত্যা অল্পদিনে ভারত হইতে উঠিয়া যাইত। কিন্তু ইংরাজিনবীশ সমাজনায়কগণ জাতিভেদের শাসন একেবারে উঠাইতে চান, সে জন্য সেরূপ সমাজশাসনের কথা উল্লেখ করা এখন বৃথা।

যদি মাড়য়ারীদিগের অনুকরণে দেশময় নানা পিঞ্জরাপোল স্থাপিত হয় এবং তথায় নানাবিধ পশু রক্ষিত হয়, গোহত্যা অচিরে বন্ধ হইয়া যায়। যদি জমিদার ও প্রজাবর্গ একত্র মিলিত হইয়া চাঁদা তুলিয়া এই সকল পিঞ্জরাপোল স্থাপিত করেন, দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে, অনেক গোধন রক্ষা পাইবে এবং দুধও খুব সস্তা হইবে। স্বেচ্ছাসেবকদল এরূপ কাজে নিঃস্বার্থভাবে ব্রতী হইলে, দেশের প্রভূত মঙ্গল হইবে।

বঙ্গদেশে গোদুগ্ধ সর্ব্বত্র অধিক মাত্রায় ব্যবহৃত হয়। অতিরিক্ত গোহত্যা বশতঃ সমস্ত দেশময় গোদুগ্ধ ক্রমশঃ মহার্ঘ হইতেছে। বঙ্গদেশে গোহত্যা নিবারণ ও গোজাতির উন্নতির জন্য গ্রামে গ্রামে গোরক্ষিণী সভা স্থাপন করা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু দুঃখের বিষয়, হুজুগে বাঙ্গালী কেবল হুজুগ লইয়া থাকে। গোহত্যানিবারণ ও গোজাতির উন্নতির জন্য এখনও দেশে কোনরূপ হুজুগ উঠে নাই। যখন হুজুগ উঠিবে, তখন উহারা মনপ্রাণ সমর্পণ পূর্ব্বক ঐ কাজে যোগদান করিবে। এখন আমাদের অরণ্যে রোদন মাত্র।

প্রত্যেক সহরে দুগ্ধ যেরূপ মহার্ঘ ও দুষ্প্রাপ্য হইতেছে, তাহাতে উহার মূল্য হ্রাস না করাইতে পারিলে সাধারণের কষ্ট আদৌ লাঘব হইবে না ও দেশের প্রকৃত মঙ্গল হইবে না। যে সহরে যেমন আবশ্যক, সে সহরে সেইরূপ সহরবাসীদের ভিতর অংশবিক্রয় করিয়া ১০।১২ হাজার টাকার মূলধনে যৌথ কারবার স্থাপন করিয়া উপকণ্ঠে কয়েকটী গোশালা নির্ম্মাণ কর ও উৎকৃষ্ট গাভী প্রতিপালন কর। এই সকল গোশালার প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, খরচ বাদ যাহাতে দুগ্ধ সুলভ মূল্যে বিক্রীত হইতে পারে এবং বৎসগুলি হৃষ্ট পুষ্ট করিয়া গোবংশের ক্রমশঃ উন্নতি সাধন করা যায়। অতিরিক্ত লাভের আশা ত্যাগ করিতে হইবে। এইটুকু স্বার্থত্যাগ করিলে অনেকের গৃহ পুনরায় দধি দুগ্ধে ও ঘৃতমাখমে ভোরপুর হইবে এবং গোমাতার কল্যাণে অনেক নিরন্ন লোকের অন্নের সংস্থান হইবে! ইংরাজদিগের গোলামী করিয়া ও নাতিঝাটা খাইয়া কি হইবে? স্বাধীন ব্যবসায় চালাও, তোমরাও সুখস্বচ্ছন্দে থাকিবে। যদি তোমাদের এরূপ সংস্কার হয়, গোপালন অতি নীচকর্ম্ম, গোয়ালার কাজ, সে কাজে কি অন্য শ্রেষ্ঠ জাতির হস্তক্ষেপ করা উচিত? দেশের মঙ্গলের জন্য মেতরের কাজ করিলেও পুণ্য আছে।

এই বৈজ্ঞানিক যুগে বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম্মমতে গাভীর কিরূপ পূজা হওয়া উচিত? এখন কি নবদূর্ব্বাদল খাইতে দিয়া কপালে সিন্দুর মাখাইয়া বরণডালা দিয়া বরণ করিলে আমাদের গাভী পূজা করা হইবে? যেরূপ কাল পড়িয়াছে, তাহাতে এরূপ সামান্য উপকরণে পূজা করিলে আমাদের গাভীপূজা সিদ্ধ হইবে না এবং গোমাতাও আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিবেন না। এখন বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিজ্ঞানসম্মত অশেষ পুষ্টিকর উপকরণ খাওয়াইয়া বিধিমতে

গোজাতির অশেষ সেবা শুশ্রূষা করিতে হইবে, যাহাতে উহাদের দুগ্ধ সম্যক বর্দ্ধিত হয়, এমন কি এক একটা গাভী আধমণ দুধ দিতে পারে এবং যাহাতে উহাদের জাতীয় উন্নতি সম্যক সাধিত হয়। ইহাই আমাদের কালোচিত গাভীপূজা।

সুইজারলণ্ড, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে গোজাতির ভালরূপ সেবা হয়। তথায় উহারা প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ প্রদান করে। কোমর বাঁধিয়া ঐ সকল দেশে চলিয়া যাও। সেখানে সামান্য দীন হীন রাখাল বেশে তৎ তৎ দেশবাসীদের সহিত গরুর সেবা কর এবং সকল বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া হাতে হেতড়ে শিখিয়া আইস। এদেশে নানা গোশালা স্থাপন করিয়া কায়-মনোবাক্যে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে গোজাতির অশেষ সেবা কর। ইহাতে তোমাদের প্রচুর অর্থাগম হইবে, দেশের অশেষ মঙ্গল হইবে এবং সেই সঙ্গে গোজাতিরও সবিশেষ উন্নতি সাধন হইবে। এ কাজে কিছুমাত্র সঙ্কোচ, দ্বিধা বা লজ্জা বোধ করিও না। শাস্ত্রের আদেশ, স্বয়ং পূর্ণব্রহ্মসনাতন শ্রীকৃষ্ণ বাল্যকালে রাখালবেশে শ্রীবৃন্দাবনে গরু চরান। তাঁহার নিকট, তুমি আমি কোন্ ছার! তবে কেন শিক্ষাদোষে সকলে গোপালনকে সমাজের একটা হেয় নীচ কর্ম্ম জ্ঞান করে?

বৃষোৎসর্গ।

এদেশে মৃত পিতামাতার আদ্যশ্রাদ্ধে ব্যয়বহুল বৃষোৎসর্গ ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহাতে ধর্ম্মের উদ্দেশ্য সুমহৎ। গোবংশের উন্নতি সাধন করিয়া হিন্দুসমাজের প্রকৃত মঙ্গলসাধন করা এ অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য। যেস্থলে উৎকৃষ্ট খৃষ্ট ও মুসলমানধর্ম্ম পিতামাতার মৃত্যুকালে উহাদের স্মরণার্থ সমাধি নির্ম্মাণ করাইয়া সাধারণ সমাজের কোনরূপ মঙ্গলসাধন করে না, সেস্থলে তোমার অপকৃষ্ট হিন্দুধর্ম্ম পিতামাতার ঋণপরিশোধার্থ কতকগুলি অনুষ্ঠান বিধিবদ্ধ করিয়াছে, যদ্দ্বারা পরোক্ষভাবে সমাজের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইতেছে। শ্রাদ্ধে একটা বৃষ বা পুংবৎস জ্বলন্ত লৌহশলকা দ্বারা চিহ্নিত হইয়া গ্রামে উন্মোচিত হইল। ধর্ম্মের ষাড় গ্রামস্থ সকল কৃষকের

ক্ষেত্রে অবাধে চরিতে থাকে। এই প্রকারে চরিয়া খাইয়া ইহা বিশেষ হৃষ্ট পুষ্ট হয় এবং গ্রামের যাবতীয় গাভীর গর্ভাধান করে। ইহাতে হৃষ্ট পুষ্ট গোবৎস উৎপন্ন হইয়া গোবংশের স্বতঃ উন্নতিসাধন হইতেছে। এখন একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, হিন্দুধর্ম্ম কোন্ বিষয়ে কোন্ অনুষ্ঠানের আদেশ দিয়া সমাজের কতদূর মঙ্গলসাধন করিতেছে!

যাহা সমাজের মঙ্গলদায়ক, তাহা ধর্ম্মভাবে, নিঃস্বার্থভাবে অনুষ্ঠিত হইলে ইহার যে কত মঙ্গল, তাহা বর্ণনাতীত। এজন্য শাস্ত্রকারেরা সমাজের অত্যাবশ্যকীয় সকল কর্ম্মে ধর্ম্মের পূর্ণ অনুশাসন দিয়াছেন, অর্থাৎ এ কর্ম্মে মহাপুণ্য, আর এ কর্ম্মে মহাপাতক, এরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এরূপ করাতে সমাজের অশেষ মঙ্গল স্বতঃ পরতঃ সাধিত হইতেছে। যদি তাঁহারা ঐ সকল কর্ম্মের ফলাফল স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিতেন, লোকে কদাচ এতদূর অন্ধ বিশ্বাসের সহিত উহাদিগকে পালন করিত না এবং যেগুলি বহুব্যয় সাপেক্ষ ও কষ্টসাধ্য, সেগুলি অগ্রে ত্যাগ করিয়া বসিত। ইহাতে শাস্ত্রকারদিগের অগাধ বুদ্ধিকৌশল ভালরূপ প্রকাশ পাইতেছে। জনসাধারণকে সৎপথে চালিত করিয়া সমাজের অশেষ মঙ্গলসাধন করাই তাঁহাদের যাবতীয় সদনুষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য। কোথায় হে জ্ঞান-গরিষ্ঠ মহর্ষিগণ! ধন্য তোমাদের সমাজতত্ত্বজ্ঞান! ধন্য তোমাদের সদুপদেশ! আর আমাদের বিদ্যাশিক্ষায় শতধিক্। আমরা কিনা দুই পৃষ্ঠা ইংরাজী পড়িয়া ঐ সকল অমূল্য রত্নকে পায়ে ঠেলিতে বসিলাম! হায়! হায়! দেখ দেখি সমাজের কতদূর অধঃপতন হইয়াছে! আজকাল কোন কোন স্থানে এই সকল ধর্ম্মের যাঁড় জবাই করা হয়। কোন কোন স্থলে মিউনিসিপ্যালিটীর ময়লা গাড়ী টানিতে নিযুক্ত করা হয়—কমিসনারদিগের দোষে এরূপ ঘটিতেছে।

নদ্যুপাসনা।

ভারতে যতগুলি নদনদী আছে, তন্মধ্যে গঙ্গা সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক পূজনীয়া। ধর্ম্মাত্মা হিন্দু চিরদিন এই পুণ্যতোয়া নদীকে পতিত-পাবনী অধমতারিণী মাতা বলিয়া পূজা করেন এবং মাতৃ-গঙ্গে এই নামে তাঁহার ভক্তিরস শতসহস্র ধারে উথলিয়া পড়ে। ইহার পুণ্য সলিলে তাঁহার যাবতীয় ধর্ম্মকর্ম্ম সম্পন্ন হয় এবং মৃত্যুর পর তাঁহার চিতাভস্ম ইহাতেই প্রক্ষিপ্ত হয়।

যে পবিত্র নদী শ্বেতাম্বুরাশি লইয়া দেশদেশান্তরে প্রবাহিতা, যাহার নির্ম্মল স্নিগ্ধ সলিলে অবগাহন করিলে মনের যেমন আনন্দ-লাভ, ও শরীরেরও তেমনি স্বাস্থ্যলাভ, সেই পবিত্র নদী দর্শনে বা উহার নামোচ্চারণে কাহার না হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত হইবে? শাস্ত্রে মাগঙ্গার মাহাত্ম্য যত অধিক বর্ণিত আছে, তিনি ইহার পুণ্য সলিলে অবগাহন করিতে ততোধিক প্রোৎসাহিত হন এবং অবগাহন করিয়া ততোধিক আনন্দনীরে অভিষিক্ত হন। দেখ, এখনও অর্দ্ধোদয় প্রভৃতি নানা যোগ উপলক্ষে দূরদেশ হইতে অসংখ্য লোক কত উৎসাহ ও আনন্দের সহিত গঙ্গাস্নান করিতে আসিতেছে এবং গঙ্গাস্নান করিয়া কেমন অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করিতেছে।

নদনদী পূজনে একেশ্বরবাদিগণ আমাদিগকে জড়োপাসক বলিয়া নিন্দা করেন। বলি, মাগঙ্গার পূজা করিয়া আমরা কি অসভ্য জাতির ন্যায় প্রকৃত জড়োপাসক হইলাম? আমাদের গঙ্গামায়ীর পূজন কি সেই পুরাকালীন জড়োপাসনার ভগ্নাবশেষ মাত্র? হায়! হায়! তাঁহাদের মুখে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের এ কিরূপ লাঞ্ছনা! তাঁহারা ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে পারেন না বলিয়া ইহার এতদূর নিন্দা করিয়া থাকেন।

যে অদ্বৈতবাদী হিন্দু বিশ্বকে পরব্রহ্মের বিরাটরূপ ভাবিয়া অনন্ত ভক্তির সহিত ইহার প্রত্যেক স্থলে ও প্রত্যেক পদার্থে একমাত্র

পরব্রহ্মের বার্ত্তা লইতে চেষ্টা পান, তিনি যে স্থলে কিছু অলৌকিক দেখিবেন, সেই স্থলে ব্রহ্মরূপ কল্পনা করিয়া উঁহার নিকট ভক্তিভাবে মস্তক অবনত করিবেন। এজন্য যে সকল বৃহৎ বৃহৎ নদী প্রভূত জলরাশি লইয়া ভারতের মধ্যে মধ্যে প্রবাহিতা, যাহাদের শ্বেতাম্বু বা নীলাম্বুদর্শনে তাঁহার হৃদয় সদা ভক্তিরসে আপ্লুত, যাহাদের নির্ম্মল স্নিগ্ধ সলিলে অবগাহন করিলে তাঁহার শরীর ও মন সর্ব্বতোভাবে স্নিগ্ধ ও পুত, সে সকল নদী কেন না তাঁহার নিকট পূজনীয় হইবে? শাস্ত্রকারেরাও উহাদের অপার মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া সকলের নিকট আরও অধিক পূজনীয় করিয়াছেন। আমরাও মাতগঙ্গে! মাতর্যমুনে! মাতনর্ম্মদে! বলিতে বলিতে অপার ভক্তিরসে আপ্লুত হই এবং উহাদের পবিত্রোদকে অবগাহন করিলে আপনাদিগকে সার্থকজন্মা জ্ঞান করি। এস্থলে মনের বিশ্বাস যতদূর দৃঢ় হইবে, ভক্তিও ততদূর প্রগাঢ় হইবে এবং অবগাহন করিয়া শরীর ও মনের ততদূর উপকার হইবে। তাহার সাক্ষ্য দেখ না, একমাত্র গঙ্গাস্নান করিয়া কতলোক কত দুঃসাধ্য ব্যাধি হইতে অব্যাহতি পাইতেছে।

পাশ্চাত্যচিকিৎসা বিজ্ঞান স্নানের অশেষ গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকে। ইহা দ্বারা লোমকূপ পরিষ্কৃত হওয়ায় ভালরূপ স্বেদোদগম হয়, শরীর স্নিগ্ধ হয় এবং ক্ষুধা বর্দ্ধিত হইয়া পরিপাকশক্তি বৃদ্ধি পায়। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত, সাধারণ জলে স্নান অপেক্ষা স্রোতের জলে ও সমুদ্রের জলে স্নান ততোধিক বলকারক, স্বাস্থ্যবর্দ্ধক, রোগনাশক, ও আয়ুষ্কর।

বলি, গঙ্গোদকের কেন এত মাহাত্ম্য ও মহিমা শাস্ত্রে বর্ণিত হইল? স্রোতের জল বলিয়া কি ইহার এত গৌরব? ভারতেত অনেক স্রোতস্বতী আছে। তবে উহাদের মধ্যে একমাত্র গঙ্গানদীর এত মাহাত্ম্য কেন? জ্ঞান-গরিষ্ঠ মহর্ষিগণের উদ্দেশ্য বুঝা ভার। তাঁহারা অন্যান্য স্রোতের জল অপেক্ষা গঙ্গোদকের গুণ অধিক বুঝিয়া

ইহার এত গৌরব বর্দ্ধন করিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, ইহার মহৎ গুণ এই যে, অনেক দিন রাখিয়া দিলে ইহাতে কীটাণু জন্মে না; সেজন্য নানা রোগের কীটাণু ইহাতে বিবর্দ্ধিত হইতে পারে না। ইহাতে সিদ্ধান্ত করা উচিত, পবিত্র গঙ্গোদকের রোগনাশিকা ও স্বাস্থ্যবর্দ্ধিকা শক্তি অধিক বলবতী। সেজন্য ইহার এত মাহাত্ম্য।

শিক্ষিত নব্যসম্প্রদায়ের মুখে শুনিতে পাই, ভারতে যে সকল নদনদী বহমান, উহাদের গুণে এদেশ চিরদিন সুখসমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ; উহাদের গুণে ভারতভূমি চিরদিন সুজলা, সুফলা ও শস্যশ্যামলক্ষেত্রা। উহাদের নিকট আমরা জাতীয় গৌরবের জন্য অশেষ কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ। মনের কৃতজ্ঞতা দেখাইবার জন্য উহারা এতকাল হিন্দুসমাজে পূজিত হইতেছে।

দেখ, এক মাগঙ্গা দ্বারা আমরা চিরকাল কিরূপ উপকৃত! এই মহানদী পুরাকালে আর্য্যজাতিকে সভ্যতাসোপানে আরূঢ় করায়। যে সকল প্রদেশের মধ্য দিয়া উহা সমুদ্রাভিমুখে প্রবাহিত, সে সকল প্রদেশ চিরদিন ধনধান্যে ও সুখসমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ। ইহার উভয় পার্শ্বে চিরদিন সৌধমালাসুশোভিত সমৃদ্ধ নানামহানগরী ও বিটপিশ্রেণীযুক্ত নানা গ্রাম অবস্থিত। বৎসরে বৎসরে এই মহানদী অনন্তরত্নপ্রসূ হিমাদ্রির অধিত্যকা ও উপত্যকা হইতে ক্ষাররাশি প্রধৌত করিয়া পার্শ্বস্থ ভূখণ্ডে পলিরূপে প্রক্ষেপ করত অপর্য্যাপ্ত শস্য উৎপাদন করে এবং নিজ বক্ষঃস্থল দিয়া জলযানযোগে ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্যরাশি সমৃদ্ধ বন্দরে লইয়া যায়। এই প্রকারে এই নদী আমাদের অতুল সুখৈশ্বর্য্যের মূলীভূত কারণ। আমরাও উহার নিকট চিরঋণে আবদ্ধ। স্নেহময়ী মাতার ন্যায় মাগঙ্গা আমাদিগকে চিরদিন প্রতিপালন করিতেছেন বলিয়া শাস্ত্রকারেরা উহাকে মাতা বলিয়া পূজা করিতে বলেন।

তাঁহাদের মুখে আরও শুনিতে পাই, স্রোতের জলে স্নান শরীরের অশেষ স্বাস্থ্যবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, বলকারক ও রোগনাশক। এ জন্য চিরস্রোতময়ী মা গঙ্গার নির্ম্মল সলিলাবগাহনে জনসাধারণকে ধর্ম্মের নামে নিঃস্বার্থভাবে প্রোৎসাহিত করিবার জন্য ইহার এত মাহাত্ম্য শাস্ত্রে দেখা যায় এবং ইহার অবগাহনে এত পুণ্য নির্দ্দিষ্ট হয়।

সুশিক্ষিত সম্প্রদায়ের কথা সর্ব্বৈব সত্য মনে কর; কিন্তু নৈষ্ঠিক হিন্দুর নিকট ইহারা পাপকথা। যে বিশ্বাস হিন্দুসমাজে স্মরণাতীত কাল হইতে বদ্ধমূল, যদ্দ্বারা ইহা সুখের পথে, ধর্ম্মের পথে অগ্রসর, যে সকল কথায় সমাজের সেই চিরন্তন বিশ্বাস কথঞ্চিৎ মন্দীভূত হইতে পারে, তাহা কি পাপকথা নহে? তাহাতে কি সাধারণের অমঙ্গল ঘটিবে না?

দেখ, নৈষ্ঠিক হিন্দু এতকাল পাপক্ষয় ও পুণ্যলাভেরজন্য গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতেছেন এবং ধর্ম্মভাবে ও ভক্তিভাবে এই ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া তিনি ইহার শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক, সকল প্রকার উপকার পূর্ণাংশে ভোগ করিতেছেন। এখন যদি তাঁহাকে বলা যায়, গঙ্গাস্নান করিয়া যে পুণ্যলাভ ও পাপক্ষয় হয়, তাহা কেবল ধর্ম্মের বুজরুকি মাত্র; ইহাতে শরীরের স্বাস্থ্যবর্দ্ধন হইয়া থাকে। তিনি কি আর সামান্য শরীরের স্বাস্থ্যের খাতিরে গঙ্গাস্নান করিতে এতদূর ব্যগ্র হইবেন বা গঙ্গাস্নান করিয়া এতদূর আনন্দনীরে অভিষিক্ত হইবেন? তবে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যে কথাতে সমাজের এতদূর অমঙ্গল ঘটিতে পারে, তাহা কি পাপকথা নয়? যে পাশ্চাত্য শিক্ষার হলাহল পান করিয়া তাঁহারা স্বয়ং গঙ্গাস্নানে বীতশ্রদ্ধ, তাহা কি সাধারণের ভিতর প্রচার করা উচিত?

বলি, যে মা গঙ্গা আমাদিগকে স্নেহময়ী জননীর ন্যায় চিরদিন প্রতিপালন করিতেছেন, এবং যিনি আমাদের অতুল সম্পদের মূলীভূত কারণ, তাঁহার প্রতি মনের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা দেখাইবার জন্য

কি তিনি আমাদের পূজনীয়া ও পতিতপাবনী হইলেন ? যে মা গঙ্গার পবিত্র উদক দেবতাদিগের পূজায় ব্যবহৃত হয়, যাহার বিশুদ্ধ বারি পান করিলে শরীর নীরোগ ও পবিত্র হয়, তাঁহার এই পবিত্রতার জন্য তিনি কি আমাদের পূজনীয়া ও পতিতপাবনী হইলেন ? যে গঙ্গোদক কীটাণুরহিত বা যাহাতে নানারোগের কীটাণু ভালরূপ বিবর্দ্ধিত হইতে পায় না, যাহাতে অবগাহন করিলে শরীরের স্বাস্থ্য ভালরূপ বর্দ্ধিত হয় ও ইহার নানারোগ সময়ে সময়ে উপশমিত হয়, তিনি কি শরীরের এই সামান্য উপকারের জন্য আমাদের পূজনীয়া ও পতিতপাবনী ? নৈষ্ঠিক হিন্দু কি শরীরের সামান্য স্বাস্থ্যলাভের জন্য গঙ্গাস্নান করিবেন ?

এস্থলে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের উদ্দেশ্য সুমহৎ। এ বিষয়ে এ ধর্ম্ম স্বর্গীয় ও মহোচ্চ ভাব প্রদর্শন করিতেছে। ইহাতে এ ধর্ম্ম মানবের একটা সামান্য স্বার্থকে ধর্ম্মের নিঃস্বার্থে পরিণত করে, স্বাস্থ্যবর্দ্ধনরূপ শরীরের সামান্য কল্যাণলাভকে মহাপুণ্য করে ও জীবাত্মার উন্নতি সাধনের উপায়স্বরূপ করে। যে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অবগাহন শরীরের স্বাস্থ্যলাভের পক্ষে একান্ত আবশ্যক এবং যে দেশে স্রোতের জলে অবগাহন করিলে নানা সুফল পাওয়া যায়, সে দেশে যদি ধর্ম্ম গঙ্গানদীর ন্যায় পবিত্র নির্ম্মল স্রোতজলের অবগাহনে সকলকে স্বতঃ প্রোৎসাহিত করিবার জন্য উহাতে মহাপুণ্য নির্দ্দেশ করে, তাহাতে সে ধর্ম্মের কি অপরাধ ? যাহাতে শরীরের মহোপকার, তাহাতে যদি সে ধর্ম্ম মন ও আত্মার উন্নতিসাধনের জন্য মহাপুণ্য নির্দ্দেশ করে, তাহাতেই বা ইহার কোন্ অপরাধ ?

ধর্ম্মজগতের নিয়ম এই, যাহার যাহাতে বিশ্বাস, তিনি বিশ্বাসানুযায়ী ফলভোগ করেন। যখন তোমার অন্তরের বিশ্বাস, পবিত্র গঙ্গোদকে স্নান করিলে অক্ষয় পুণ্যলাভ হইবে, তখন তুমি গঙ্গোদকে স্নান করিয়া প্রকৃত আত্মপ্রসাদ লাভ করিবে। যাহাতে আত্মপ্রসাদ

লাভ হয়, তাহাতে পুণ্যলাভ ও শ্রেয়োলাভ হইয়া থাকে। এজন্য হিন্দুধর্ম্ম মা গঙ্গার এত মাহাত্ম্য বর্দ্ধন করে এবং ইহার পুণ্যসলিলে অবগাহনে এত পুণ্যনির্দ্দেশ করে। ইহাই গঙ্গাস্নানের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং শরীরের স্বাস্থ্যলাভ ইহার গৌণ উদ্দেশ্য মাত্র। নৈষ্ঠিক হিন্দু শরীরের স্বাস্থ্যলাভের দিকে আদৌ নজর দেন না; তিনি তদ্দ্বারা কেবল পাতকনাশ ও পুণ্যলাভের জন্য ব্যগ্র হন। এখন যদি তুমি পাশ্চাত্য শিক্ষায় বিভূষিত হইয়া পুণ্যলাভের কথায় অবিশ্বাস কর, তুমি না হয় স্বাস্থ্যলাভের জন্য গঙ্গাস্নান করিবে। কিন্তু গঙ্গাস্নানকে ধর্ম্মের একটা কুসংস্কার বলিয়া উড়াইও না।

এখন মা গঙ্গার উৎপত্তি বিষয়ে যে পুরাণ-কাহিনী শাস্ত্রে দেখা যায়, তাহা কতদূর সত্য? ইক্ষ্বাকুবংশীয় সগর রাজা শতবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। তদীয় ষষ্টি সহস্র পুত্রগণ অশ্বরক্ষণে নিযুক্ত রহিলেন। শেষবারে শতক্রতু ইন্দ্র ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া অশ্ব হরণ পূর্ব্বক পাতালে কপিল মুনির আশ্রমে বাঁধিয়া রাখেন। এই সংবাদশ্রবণে রাজকুমারগণ অগস্ত্যমুনির গণ্ডূষপানানন্তর পরিশুষ্ক সাগরভূমি খনন করত পাতালে প্রবেশ করেন। তথায় কপিলমুনির কোপানলে পতিত হইয়া সকলে ভস্মীভূত হন; পরে তদীয় বংশে ভগীরথ জন্মগ্রহণ করিয়া ঘোর তপস্যাবলে সুরধুনীকে প্রসন্ন করিয়া মর্ত্ত্যে আনয়ন পূর্ব্বক পূর্ব্বপুরুষদিগের উদ্ধারসাধন করেন। এই প্রকারে মা গঙ্গা পতিত মানবজাতির উদ্ধারের জন্য মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ হন।

বলি, মা গঙ্গার মাহাত্ম্য ও পতিতপাবনী শক্তি সপ্রমাণ করিবার জন্য কি-শাস্ত্রকারেরা উপরোক্ত উপন্যাস রচনা করিয়া যান? না ইহার ভিতর কোন ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে? সত্য সত্যই কি মহারাজ ভগীরথ মা গঙ্গাকে আর্য্যাবর্ত্তে প্রথম প্রবাহিত করান? উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত পাঠকগণ এ কথায় কতদূর বিশ্বাস করিবেন, বলিতে পারি না।

তাঁহারা ভালরূপ জানেন, বঙ্গোপসাগর, আরবসাগর ও ভারত মহাসাগর হইতে যে প্রভূত বাষ্পরাশি বর্ষে বর্ষে উত্থিত হইতেছে, তাহা মেঘাকারে পরিণত হইয়া সমগ্র ভারতভূমিতে বর্ষিত হয় এবং অত্যুচ্চ হিমালয় পর্ব্বতশ্রেণী অতিক্রম করিতে না পারিয়া পার্ব্বত্য প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে বর্ষিত হয়। আবার তুষারমণ্ডিত হিমাদ্রির শৃঙ্গস্থ বরফরাশি সূর্য্যোত্তাপে কথঞ্চিৎ বিগলিত হইয়া ইহার অধিত্যকা প্রদেশে পতিত হয়। এই সকল জলরাশি হিমালয়ের উচ্চপ্রদেশে মন্দাকিনী অলকনন্দা প্রভৃতি কয়েক স্রোতে প্রবাহিত হইয়া হরিদ্বারে আর্য্যাবর্ত্তের সমতলক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হয় ও এক বিস্তৃত নদী গঠন করে। পরে নানা প্রদেশ দিয়া পূর্ব্বদক্ষিণদিকে প্রবাহিত হইতে ২ নানা উপনদী উত্তর দক্ষিণদিক হইতে আগত হইয়া ইহার কলেবর বর্দ্ধন করে। পরিশেষে ইহা পদ্মা নাম ধারণ পূর্ব্বক শতসহস্র শাখায় বিভক্ত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইতেছে। সকল দেশে নদনদী প্রাকৃতিক কারণে উদ্ভূত, পরিবর্ত্তিত ও সাগরাদিতে পতিত হয় ভূগোলে এই সকল তথ্য পাঠ করিয়া তাঁহারা শাস্ত্রোক্ত গঙ্গোপাখ্যানকে অলীক মনে করিবেন।

ভূতত্ত্বপাঠে জানা যায়, যুগ যুগান্তর পূর্ব্বে যে টিদীস মহাসাগর পৃথিবীর মধ্যভাগ বেষ্টন করিয়া ইহার উত্তরাংশকে দক্ষিণাংশ হইতে পৃথক করিতেছিল, উহার একবাহু আর্য্যাবর্ত্তের উপর দিয়া প্রবাহিত ছিল (অর্থাৎ) ইহা জলধিগর্ভে নিমগ্ন ছিল। পরে ভৌতিক বিপ্লব দ্বারা ইহা হিমাদ্রির সহিত সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থিত হয়। বোধ হয়, এই প্রাকৃতিক ঘটনা প্রকাশ করিবার জন্য শাস্ত্রকারেরা উল্লেখ করেন, অগস্ত্যমুনি গণ্ডূষ পান করিয়া সমুদ্র শোষন করিয়াছিলেন। শুষ্ক হইবার পর আর্য্যাবর্ত্ত বহুকাল অনুর্ব্বর ভাবে পড়িয়া থাকে। পরে কালক্রমে হিমাদ্রি হইতে সিন্ধু, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং উহাদের উপনদগুলি উত্থিত হইয়া পলিদ্বারা আর্য্যা-

বর্ত্তকে অত্যুর্ব্বর করিয়া ফেলে। এই প্রকারে ভারতের উত্তরাংশের সৃষ্টি হয়।

ভূতত্ত্বপাঠে আমরা আরও অবগত হই, ঐতিহাসিক যুগে পূর্ব্ববঙ্গের অধিকাংশ ভূভাগ গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের পলি পড়িয়া সমুদ্র হইতে ক্রমশঃ উত্থিত হয়। যৎকালে শাস্ত্র মাগঙ্গার মাহাত্ম্য প্রথম প্রচার করে, তৎকালে পদ্মা ও ইহার শাখাগুলি সৃষ্ট হয় নাই। তৎকালে গঙ্গা ভাগিরথী (আধুনিক হুগলী) দিয়া সমুদ্রে পতিত হইত। এজন্য পদ্মা গঙ্গার প্রধান স্রোত হইলেও ইহার কিছুমাত্র মাহাত্ম্য নাই এবং পূর্ব্ববঙ্গের লোকেরা কলিকাতায় আসিয়া আদিগঙ্গায় স্নান করে।

এখন মহাত্মা ভগীরথ তপোবলে গঙ্গাদেবীকে সুপ্রসন্ন করিয়া মর্ত্ত্যে আনয়ন করেন, এ কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? অনেকে মনে করেন, ইহা একটী ঐতিহাসিক ঘটনা। একথা সপ্রমাণ করিবার জন্য কপিলমুনির আশ্রম কোথায়, তাহা নিদ্ধারিত করা উচিত। এখন কপিলমুনির আশ্রম, গঙ্গাসাগরে সগরদ্বীপে, যে স্থানে প্রতিবৎসর মেলা হয়। যশোহর জেলায় এক কপিলাশ্রম আছে, যে স্থলে পূর্ব্বে মেলা হইত। অনেকের ধারণা, এই আশ্রম হরিদ্বারের নিকট। ইহাতে সিদ্ধান্ত করা উচিত, সগররাজার পুত্রগণ ঐ পার্ব্বত্য প্রদেশ খনন করাইয়া গঙ্গানদীকে হিমালয় হইতে আর্য্যাবর্ত্তে প্রবাহিত করাইতে চেষ্টা পান। তাঁহারা সফলকাম হইতে পারেন নাই। পরে তদীয় বংশে ভগীরথ জন্মগ্রহণ করিয়া উপরোক্ত কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করেন। এজন্য শাস্ত্রকারেরা তাঁহাকে দিয়া গঙ্গাদেবীকে মর্ত্ত্যে আনয়ন করান।

যদি ইংরাজরাজপুরুষগণ কলিকাতার দক্ষিণে আদিগঙ্গার স্রোত হ্রাস পাইলে কতকভূমি খনন করাইয়া সুবৃহৎ কাটীগঙ্গা প্রবাহিত করান, অথবা হরিদ্বারে গঙ্গার একস্রোত রুড়কীর খালে চালাইয়া

উহাকে তেজস্বী করিয়া থাকেন, তবে মহারাজ ভগীরথ হরিদ্বারের নিকট কতকভূমি খনন করাইয়া গঙ্গানদীকে আর্য্যাবর্ত্তে বহুবিস্তৃত ভাবে প্রথম প্রবাহিত করান, এ কথা কেন অবিশ্বসনীয় হইবে? হরিদ্বার দেখিলে এইরূপ ভাবনা অনেকের মনে উদয় হয়।

আবার কেহ কেহ বলেন, ইক্ষ্বাকুবংশীয় মহারাজ ভগীরথ পুরাকালে গঙ্গার উপকূল পর্য্যন্ত কোশলরাজ্য বিস্তৃত করত নিজ নামানুসারে গঙ্গার নাম ভাগীরথী রাখেন এবং ঐ নদীর মাহাত্ম্য আর্য্যসমাজে প্রথম প্রচার করেন। তদবধি মাগঙ্গার মাহাত্ম্য ও গৌরব হিন্দুসমাজে একাদিক্রমে চলিয়া আসিতেছে। মহারাজ ভগীরথ সর্ব্বপ্রথম এ নদীর মাহাত্ম্য প্রচার করেন বলিয়া শাস্ত্রকারেরা তাঁহাকে দিয়া মাগঙ্গাকে মর্ত্ত্যে আনান।

যাহা হউক, গঙ্গোপাখ্যান সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, যখন আমরা স্বচক্ষে দেখিতেছি, যে স্থলে সুসভ্য ইউরোপের সুসভ্য খৃষ্টধর্ম্ম যে ধর্ম্মাত্মা মানব জগতে একেশ্বরবাদ প্রচার করাতে শত্রুবর্গ কর্তৃক ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া হত হন, তাঁহার মাহাত্ম্য বর্দ্ধনার্থ মৃত্যুর তৃতীয় দিবসে তাঁহাকে সশরীরে স্বর্গে আরোহণ করায় ও পতিত মানবজাতির পরিত্রাতা বলিয়া স্থিরসিদ্ধান্ত করে, সেস্থলে যদি অর্দ্ধ সভ্য ভারতের পৌত্তলিক হিন্দুধর্ম্ম যে স্রোতস্বতীর দ্বারা এ দেশ অলৌকিক ভাবে উপকৃত, যাহার পুণ্যসলিলে অবগাহন করিলে শরীর ও মন সর্ব্বতোভাবে নীরোগ ও পূত হয়, সেই পবিত্র পুণ্য-তোয়া নদীর মাহাত্ম্য বর্দ্ধনার্থ ও পতিতপাবনী শক্তি প্রচারার্থ যদি এ ধর্ম্ম সগর রাজার ষষ্টিসহস্র পুত্রগণকে যোগসিদ্ধ কপিলমুনির শাপে ভস্মীভূত করায়, পুণ্যাত্মা ভগীরথ দ্বারা মা গঙ্গাকে মর্ত্ত্যে আনয়ন পূর্ব্বক উহাদের উদ্ধার সাধন করায় এবং আবহমানকাল নিঃস্বার্থ ধর্ম্মের নামে সকলকে গঙ্গাস্নানে স্বতঃ প্রোৎসাহিত করায়, তাহাতে ইহার কোন্ অপরাধ বা শাস্ত্রকারদিগের কোন্ অপরাধ?"

শুনিতে পাই, কলির পঞ্চসহস্র বৎসর অতীত হইলে মাগঙ্গা আর মর্ত্ত্যলোকে থাকিবেন না। এ কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? সত্য সত্যই কি মাগঙ্গা একেবারে শুষ্ক হইয়া যাইবেন? কলিযুগের পাঁচ হাজার বৎসর অতীত হইয়াছে, অথচ মাগঙ্গা পূর্ব্বের ন্যায় বহিতেছেন। তবে শাস্ত্রের কথা কি অলীক?

যেমন অযোধ্যা আছে, সরযু আছে, শ্রীরামচন্দ্র নাই, আবার যেমন মথুরা আছে, যমুনা আছে, শ্রীকৃষ্ণ নাই; সেইরূপ গঙ্গানদী থাকিবে, এত কাল ইহার স্রোত যেমন বহিতেছে, তেমনি বহিবে; কিন্তু ইহার মাহাত্ম্য ও পতিতপাবনী শক্তি থাকিবে না। হিন্দু সমাজে যে পাশ্চাত্য কালস্রোত খরবেগে বহমান, উহার সমক্ষে সকলই ভাসিয়া যাইবে, মাগঙ্গার মাহাত্ম্য কেন থাকিবে? বোধ হয়, দুই এক শতাব্দী পরে কেহ গঙ্গাস্নানে আর পুণ্য ভাবিবেন না। তখন মাগঙ্গার মাহাত্ম্য প্রকৃতরূপে লোপ পাইবে এবং ইহার পুণ্য স্রোত হৃদয়রাজ্যে পরিশুষ্ক হইয়া যাইবে। ইহাই শাস্ত্রকারদিগের গূঢ় উদ্দেশ্য।

ওহে সুশিক্ষিত পাঠকগণ! তোমরা গঙ্গাস্নানকে কদাচ ধর্ম্মের কুসংস্কার ভাবিও না। যে গঙ্গাস্নান দ্বারা শরীর, মন ও আত্মা অশেষরূপে উপকৃত, মনে কর, উহার পাতকনাশ একটা কথার কথা মাত্র, তথাচ যদ্দ্বারা শরীরের অশেষ স্বাস্থ্যবর্দ্ধন হয়, তাহা কি ধর্ম্মের কুসংস্কার? শরীরের স্বাস্থ্যবর্দ্ধনও কি তোমাদের পরম লাভ নহে? তবে কেন তোমরা গঙ্গাস্নানে এতদূর অবহেলা করিয়া থাক? মাগঙ্গাকে নমস্কার করিয়া তদীয় পবিত্র উদকে অবগাহন কর, তোমাদের দেহ, মন ও আত্মা বিশুদ্ধ হইবে, তোমরা স্বাস্থ্যসুখে সুখী হইবে এবং দীর্ঘজীবন লাভ করিবে। কলিযুগে গঙ্গাস্নান আমাদের একটী প্রধান ধর্ম্মানুষ্ঠান, ; ধর্ম্মের এমন সহজ বিধি ত্যাগ করা উচিত নয়। কালে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানও গঙ্গোদকের নানা গুণ আবিষ্কার করিবে।

অতিথিসৎকার ও দানধর্ম্ম।

ধর্ম্মশাস্ত্রের আদেশ অতিথিসৎকারে মহাপুণ্য লাভ হয় এবং নৈষ্ঠিক হিন্দু চিরদিন অতিথিসৎকার করিয়া পুণ্যলাভ করিতেছেন। কেন ইহাতে এত পুণ্য নির্দ্দিষ্ট হইল? সংসারের নিয়ম এই, নানালোকে নানাসময়ে নানাকর্ম্মোপলক্ষে গ্রামান্তর, নগরান্তর ও দেশান্তর যাইতে বাধ্য হয়। পুরাকালে যাতায়াতের ভালরূপ সুবিধা ও থাকিবার সরাই প্রভৃতি না থাকায় পথিকগণ সূর্য্যাস্তের পর লোকালয়ে থাকিতে বাধ্য হইত। নিঃস্বার্থ ধর্ম্মভাবে উহাদের সেবা শুশ্রূষার জন্য শাস্ত্র অতিথিসৎকারে এত পুণ্য নির্দ্দেশ করিতেছে। সমাজের অশেষ মঙ্গলের জন্য শাস্ত্রাদেশ এইরূপ।

অতিথিসৎকারে প্রোৎসাহিত করিবার জন্য হিন্দুধর্ম্ম বলে—

অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে
স তস্মৈ দুষ্কৃতংদত্ত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি।
উত্তমস্যাপি বর্ণস্য নীচোঽপি গৃহমাগতঃ
পূজনীয়ো যথাযোগ্যং সর্ব্বদেবময়োঽতিথিঃ।

(হিতোপদেশম্)

"অতিথি যে গৃহস্থের বাটী হইতে ভগ্নমনোরথ হইয়া চলিয়া যান, তিনি সেই গৃহস্থকে নিজের পাপরাশি দিয়া উহার পুণ্যরাশি লইয়া প্রস্থান করেন। যদি নীচলোক উচ্চ জাতির গৃহে আইসে, তথাপি তাহারও যথাবিধি অতিথিসৎকার করিবে। কারণ সকল দেবতা পূজনে যে পুণ্যলাভ হইয়া থাকে, একমাত্র অতিথিসৎকারে তাহা পাওয়া যায়।" ইহার গুণে নৈষ্ঠিক হিন্দু চিরদিন অতিথিপরায়ণ এবং অতিথিসৎকারে বিশেষ যত্নবান। পূর্ব্বে গৃহস্থের বাটীতে অতিথি আসিলে, তিনি কত আনন্দ ও উৎসাহের সহিত উহার সৎকার করিতেন। কিন্তু সময়গুণে সমাজের সে আতিথেয়তা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। এখন আমরা একজন অজ্ঞাতকুলশীলকে আদৌ

আশ্রয় দিতে ইচ্ছা করি না। কৃত্রিম সভ্যতাসুলভ চৌর্য্য ও প্রতারণা অধিক হওয়াতে অনেকের ধারণা এইরূপ হইতেছে। এখন বাটীতে আত্মীয় স্বজন বা বন্ধুবান্ধব আসিলে আমরা উহাদিগকে অতিথি জ্ঞান করি; কিন্তু এরূপ অতিথিসৎকারে আমাদের কিছুমাত্র পুণ্য নাই, উহাদের সৎকার আমাদের কর্ত্তব্য।

এরূপ অবস্থা ত মন্দের ভাল। সমাজের আরও ভীষণ পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে। বড় বড় সহরে অপরিচিত অতিথির কথা ছাড়িয়া দেও, আত্মীয় স্বজন বাড়ীতে আসিলে হুকা পায় না এবং এক মুঠা ভাতও পায় না। বাবু যখন বেগতিক দেখেন, হোটেল দেখাইয়া খরচের দায় হইতে অব্যাহতি পান। কন্যা শ্বশুর বাড়ী হইতে বাপের বাড়ী আসিলে চাউল ও ডাল আঁচলে বাঁধিয়া আনে। আরও যে ভগবান কত কি দেখাইবেন, তাহা জানি না। পাশ্চাত্য সমাজের সংঘর্ষে আমাদের কি অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন! যাহা হউক, এখন আমরা সুসভ্য হইতেছি, আর কিছু দিন পরে সভ্যতার আগডালে চড়িব।

দানধর্ম্ম।

ধর্ম্মমাত্রেই দানের ভূয়সী প্রশংসা করে এবং ইহাতে অক্ষয় পুণ্য-লাভ নির্দ্দেশ করে। যে পৃথিবীতে অনেকে কষ্টে সৃষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ করে এবং অন্ধ, খঞ্জ প্রভৃতি সমাজের কিয়দংশ লোক গ্রাসাচ্ছাদনোপার্জ্জনে একেবারে অসমর্থ, সে পৃথিবীতে দানধর্ম্ম, পরোপকার ও পরদুঃখবিমোচন আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। যিনি পরদুঃখে কাতর হইয়া পরের জন্য কাঁদেন এবং যথাসাধ্য উহার উপকার করেন, যিনি নারায়ণরূপী দরিদ্র দেখিয়া কাঁদেন ও উহার সেবা করেন, তিনি এ সংসারে ধন্য। আর যিনি ধনমদে মত্ত হইয়া নিজের অর্থ দ্বারা পরের অনিষ্ট সাধন করিয়া বেড়ান, তিনি সংসারে

নরপিশাচ ও সয়তান। এইরূপ লোকে দেহান্তে কেবল নরক গুলজার করিবে।

এই যে নানা দীন দরিদ্র লোক ভবের হাটে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, ইহারা কে জান? ইহারা সকলেই নারায়ণের রূপ; স্বয়ং নারায়ণ দীন হীন বেশে তোমার দয়া পরীক্ষার জন্য ঘুরিতেছেন। যদি তুমি ইহাদের উপর কিঞ্চিৎ বিরূপ হও, স্বয়ং ভগবান তোমার উপর বিরূপ হইবেন। শাস্ত্রের আদেশ এ জন্মে যিনি যত ধন দান করিবেন, পরজন্মে তিনি তত ধন দৌলত পাইবেন। এই বুঝিয়া সকলের চলা উচিত।

দয়া মনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্মপ্রবৃত্তি। যিনি দয়াগুণে যত বিভূষিত, তিনি তত ধর্ম্মপরায়ণ ও দেবতুল্য। দয়াগুণের সম্যক স্ফুর্ত্তির জন্য আমরা ঈশ্বরকে দয়াময় দয়াময় বলিয়া ডাকি। এই পাপতাপময় ভবসংসারে আমাদের চতুর্দ্দিকে বিপদ আপদ অনুক্ষণ এরূপ ঘনীভূত হইতেছে, যে পরস্পর দয়াপ্রকাশ ব্যতীত আমাদের সংসার একরূপ অচল। এজন্য সকল দেশে প্রাকৃতিক ধর্ম্ম দয়াপ্রকাশকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মানুষ্ঠান বলিয়া উপদেশ দিতেছে। মানবও সকল দেশে বিপন্নের বিপদ উদ্ধার করিতে, রুগ্নের যন্ত্রণা দূর করিতে ও দরিদ্রের দুঃখ বিমোচন করিতে স্বতঃ প্রবৃত্ত হন।

এই যে সভ্য দেশে অনাথাশ্রম, হাঁসপাতাল, দাতব্যচিকিৎসালয়, অন্ধাশ্রম, কুষ্ঠাশ্রম প্রভৃতি নানা সদনুষ্ঠান দেখিতেছ; এই যে এদেশে ধর্ম্মশালা সদাব্রত, অন্নছত্র, পুষ্করিণীখনন ঘাটনির্ম্মাণ, কূপখনন ও মুষ্টিভিক্ষা প্রভৃতি নানা সদনুষ্ঠান দেখিতেছ, এ সকল সদনুষ্ঠান কোথা হইতে আসিল? ইহারা হৃদয়স্থ দয়ার প্রধান কীর্ত্তিস্তম্ভ (Monument) এবং পরোপকার ও দেশের মঙ্গলসাধনই ইহাদের মূলমন্ত্র।

যাহার উপচিকীর্ষা যত বলবতী, তিনি সেইরূপ পরোপকার ব্রতে

ব্রতী হইবেন। পরের উপকার করিতে গিয়া তিনি নিজের স্বার্থের দিকে আদৌ নজর দিবেন না, এমন কি অনেক সময়ে প্রাণের মমতা পর্য্যন্ত ত্যাগ করিবেন। কত শত পুণ্যাত্মা জলমগ্নকে বাঁচাইতে গিয়া নিজপ্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন। কত শত বীরপুরুষ আশ্রিত দুর্ব্বলকে রক্ষা করিতে গিয়া আততায়ীহস্তে নিজ প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন। যাহারা দয়ার যূপকাষ্ঠে এইরূপে নিজপ্রাণ বলি দিবেন, তাঁহাদের জীবন ধন্য হইবে, তাঁহারা স্বর্গরাজ্যে মহোচ্চ স্থান অধিকার করিবেন।

ধর্ম্মমাত্রেই সমাজের মঙ্গলোদ্দেশে মানবকে দয়াপ্রকাশে ও দান-ধর্ম্মানুষ্ঠানে স্বতঃ প্রোৎসাহিত করিবার জন্য উহাতে অক্ষয় পুণ্যলাভ নির্দ্দেশ করে। কিন্তু নীতিশাস্ত্র উহাকে সামাজিক মানবের প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া উপদেশ দেয়। যাহারা কর্ত্তব্যপরায়ণ, তাঁহারা নীতি শাস্ত্রের কথানুযায়ী দয়া প্রকাশ করিয়া নিজের কর্ত্তব্য পালন করেন। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের বিশেষত্ব এই, যে কোন সদনুষ্ঠান সমাজের অশেষ মঙ্গলদায়ক, তাহাতে এধর্ম্ম মহাপুণ্য নির্দ্দেশ করিয়া সকলকে ধর্ম্মভাবে ও নিঃস্বার্থভাবে তৎসম্পাদনে প্রণোদিত করে। এ দেশের জনসাধারণ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ভালরূপ বুঝেনা; কিন্তু যাহাতে পুণ্যলাভ হইবে, তাহা উহারা প্রীতির সহিত, আগ্রহের সহিত সম্পাদন করে। এজন্য মানবমনের গূঢ়রহস্যজ্ঞ শাস্ত্রকারেরা সকল সদনুষ্ঠানে কেবল মহাপুণ্য নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

এ সংসারে নানা প্রকারে পরের উপকার করা যায়। কোন দেশহিতকর সদনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া তুমি তোমার দানশীলতার সম্যক পরিচয় দিতে পার। গ্রামে বিদ্যালয়, চতুষ্পাঠী, চিকিৎসালয়, পুস্তকালয়, জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিয়া তুমি তোমার অর্থের সদ্ব্যবহার করিতে পার। যাঁহাদের উপর কমলার কৃপাদৃষ্টি আছে, তাঁহারা মনে করিলেই ঐ সকল সৎকর্ম্ম অনায়াসে সম্পাদন করিতে

পারেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অনেক স্থলে দেখা যায়, যাঁহাদের ইচ্ছা আছে, তাঁহাদের সামর্থ্য নাই এবং যাঁহাদের সামর্থ্য আছে, তাঁহাদের ইচ্ছা নাই।

আরও সামান্য সামান্য কার্য্যে তুমি তোমার দানশীলতার পুর্ণ পরিচয় দিতে পার। গরীব বালকের বিদ্যাশিক্ষায়, গরীব ব্রাহ্মণ বালকের উপনয়নে, কন্যাদায়গ্রস্ত লোকের কন্যার বিবাহে, গরীব লোকের পিতামাতার আদ্যশ্রাদ্ধে ইত্যাদি নানা পুণ্য কর্ম্মে কিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য দান করিয়া পুণ্যোপার্জ্জন ও উহাদের আশীর্ব্বাদ লাভ করিতে পার। কোথায় হে প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্রবিদ্যা-সাগর! ধন্য তোমার পবিত্র জীবন। তুমি যেমন মা স্বরস্বতীর বরপুত্র হইয়া বিদ্যার সাগর হইয়া ছিলে, সেইরূপ দয়ার সাগরও ছিলে। পরের দুঃখ দেখিলেই তোমার কোমল প্রাণ কাঁদিত! তুমি নিজের অর্থদ্বারা কত সহস্র সহস্র দায়গ্রস্ত লোকের দায় উদ্ধার করিয়াছিলে। তোমার মত বঙ্গমাতার আর কে এমন সুসন্তান হইবে?

যাঁহার যেমন সামর্থ্য, তিনি সেইরূপ দান করিবেন। যাহা দক্ষিণ হস্তে দান করিবে, বামহস্ত তাহা যেন জানিতে না পায়। যাহা দান করিবে, তাহা কদাচ মুখে আনিয়া ঢাক বাজাইবে না। মুখে আনিলেই উহার অর্দ্ধ পুণ্য উড়িয়া যাইবে। শ্রদ্ধার সহিত মিষ্ট কথায় এক কপর্দ্দক দান করিলে যে ফল, বিরক্তির সহিত সহস্র মুদ্রা দানেও সে ফল নাই। শ্রীকৃষ্ণ বিদুরের ক্ষুদকুঁড়া খাইয়া যে তৃপ্তিলাভ করেন, দুর্য্যোধনের পলান্ন ভোজন করিয়াও তাহা পান নাই।

সুপাত্র দেখিয়া দান করা উচিত। অপাত্রে দান, আর উষর ক্ষেত্রে বীজবপন, উভয়েই সমান। এখন দানের সুপাত্র কাহারা? সকলে মনে করিবেন, পথের কাঙ্গাল, অন্ধ ও খঞ্জ, যাহারা অতি-

কষ্টে পেটের ভাত জোগাড় করে, তাহারা দানের সুপাত্র। তাহাদিগকে দান করিলেই যথার্থ পুণ্য হইবে।

দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয় মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনং
ব্যাধিতস্যৌষধং পথ্যং নীরুজস্য কিমৌষধৈঃ।

(হিতোপদেশঃ)

"হে কৌন্তেয়! দীনদরিদ্রলোকদিগকে প্রতিপালন কর। ধনবানে কদাচিৎ ধনদান করিও না। যাহারা রোগগ্রস্ত, তাহাদের ঔষধ প্রয়োজন; নীরোগ শরীরে ঔষধের কি বা প্রয়োজন?"

শাস্ত্রমতে দান তিন প্রকার, যথা—

(১) সাত্ত্বিক।
(২) রাজসিক।
(৩) তামসিক।

দাতব্যমিতে যদ্দানং দীয়তে অনুপকারিণে
দেশে কালেচ পাত্রেচ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতং।

(গীতা)

"যিনি তোমার কখন উপকার করেন নাই, তাঁহাকে দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করিয়া যে দান করিবে এবং দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া যে দান করিবে, তাহা তোমার সাত্ত্বিক দান।"

উপকারের খাতিরে যাহা দান করা যায়, তাহা উৎকৃষ্ট দান নহে। তাহা তুমি করিতে বাধ্য। সেরূপ দান সকলই করিয়া থাকে। কিন্তু যিনি তোমার আদৌ উপকার করেন নাই এবং যাঁহার নিকট উপকার পাইবার কিছুমাত্র আশা নাই, তাঁহাকে যাহা কিছু দান করিবে, তাহাই তোমার সাত্ত্বিক দান। অন্ধ, খঞ্জ, পথের ভিখারী, গরীব ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সুপাত্র দেখিয়া যাহা দান করিবে, তাহা তোমার সাত্ত্বিক দান। দেশের মঙ্গলের জন্য, দুর্ভিক্ষাদি দুঃসময়ে যাহা দান করিয়ে, তাহা তোমার সাত্ত্বিক দান।

যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতং।

(গীতা)

"যদি কেহ তোমার উপকার করে, তাহার প্রত্যুপকারের জন্য তুমি যে দান করিবে, তাহা তোমার রাজসিক দান। ভবিষ্যতে কোনরূপ সুফল পাওয়া যাইবে এবং দেশের লোক সুখ্যাতি গাইবে, এই মনে করিয়া তুমি যে দান করিবে, তাহা তোমায় রাজসিক দান। রাজার নিকট উপাধি পাইবার আশায় বা দেশে সুনাম কিনিবার আশায় ধনাঢ্যগণ সদনুষ্ঠানের জন্য যে প্রভূত ধনরাশি ইংরাজ পাদ-পদ্মে ঢালিয়া দেন, তাহা তাঁহাদের রাজসিক দান। অতিকষ্টে ও বিরক্তির সহিত যাহা দান করিবে, তাহাও রাজসিক দান।

অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্।

(গীতা)

"কালাকাল, স্থানাস্থান ও পাত্রাপাত্র বিবেচনা না করিয়া অকালে, অস্থানে ও অপাত্রে যাহা দান করিবে, তাহা সকলের তামসিক বা সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট দান। অবজ্ঞাপূর্ব্বক বা কটুবাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক যাহা দান করিবে, তাহাও তোমার তামসিক দান।"

হিন্দুধর্ম্মের গুণে ভারত চিরদিন দানধর্ম্মের পবিত্র ক্ষেত্র। হিন্দুজাতির ন্যায় দানশীল জাতি অন্যত্র দেখা যায় না। যে ধর্ম্মাত্মা হিন্দু পিতামাতার শ্রাদ্ধোপলক্ষে, পুত্রকন্যার বিবাহোপলক্ষে ও তীর্থস্থানে অকাতরে অজস্র অর্থ ব্যয় করেন, তিনি এ সংসারে কত দানশীল! যে ধর্ম্মাত্মা হিন্দু জীবনের অনেক সময়ে বন্ধুবান্ধব, জ্ঞাতিবর্গ ও ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া ফতুর, তিনি এসংসারে কত দানশীল! যিনি স্বজীবনে দানসাগর ও তুলাদানরূপ মহা

যজ্ঞ সম্পাদন করেন, তাঁহার মত এ সংসারে কে দানশীল? বাল্যকাল হইতে দাতাকর্ণের কথা শুনিয়া দানধর্ম্মের মর্ম্ম আমাদের হাড়ে হাড়ে বিদ্ধ হইয়া থাকে।. মহারাজ শিলাদিত্য প্রয়োগের সন্তোষক্ষেত্রে তিন মাস ধরিয়া সর্ব্বস্ব-দানোৎসব সম্পাদন করিয়া কৌপীনধারী ভিখারী সাজিতেন, এমন দানের কথা কোন্ দেশের ইতিহাসে পাওয়া যায়? শিলাদিত্যের ন্যায় কত সহস্র সহস্র দানবীর মহারাজা এ দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহার কিছুমাত্র ইয়ত্তা নাই।

পুরাকালে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, বানপ্রস্থাশ্রম ও সন্ন্যাসাশ্রমের লোকেরা একমাত্র গৃহস্থাশ্রম দ্বারা প্রতিপালিত হইত। ইহাতে বুঝা উচিত, গৃহাশ্রমিগণ কিরূপ দানশীল ছিলেন। তৎকালে বসুন্ধরা ধনধান্যে পরিপূর্ণা, ভোগবিলাস আদৌ সমাজে প্রবেশ করে নাই। লোকে কেবল দানধ্যান করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতেন। দেখ না এখনও পশ্চিমাঞ্চলে সহস্র সহস্র সাধুসন্ন্যাসিগণ জনসাধারণের একমাত্র দানের উপর নির্ভর করিয়া তীর্থভ্রমণাদি করিতেছে!

যে ভারত এমন দানশীলতার জন্য বিখ্যাত, আজকাল সে ভারতের কি শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত। যে পাশ্চাত্য কালস্রোত সমাজে বহমান, উহার সম্মুখে সকলই রসাতলে যাইবে, একমাত্র দানধর্ম্ম কেন থাকিবে? কুশিক্ষা বশতঃ এখন আমরা ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞানহারা। দান ধ্যান করিতে কি ইচ্ছা হয়? সমাজে যেমন একদিকে হিন্দুয়ানী ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে, অপরদিকে বাবুয়ানা পুরাদমে বাড়িতেছে। আবার প্রজাবৎসল ইংরাজরাজের কল্যাণে এখন আমরা উদরান্নের জন্য লালায়িত। পেটে খাইতে পাই না, দান ধ্যান করিব কেমন করিয়া? বাবুগিরির কত ফ্যাসান (fashion) কতদিকে দেখা দিতেছে! মান বাঁচাইবার জন্য বাবুগিরির বেলায় বেশ পয়সা জুটে, দান ধ্যানের বেলায় সমুদ্র শুকাইয়া যায়।

ব্রাহ্মণভোজনে কেন এত পুণ্যনির্দ্দেশ।

এইবার দেখিতেছি, শিক্ষিত সম্প্রদায় আমাদের উপর নারাজ হইবেন। ব্রাহ্মণভোজনে যে কিছুমাত্র পুণ্য আছে, এ ধারণা ত তাঁহাদের মন হইতে অনেক দিন হইল উঠিয়া গিয়াছে। তাঁহারা জানেন, যদি পুংক্তিতে ভোজনে কিছুমাত্র পুণ্য থাকে, সে কেবল কাঙ্গালী ভোজনে। তেলা মাথায় তেল দিলে কি হইবে? যে ভণ্ড মূর্খ শিখাধারী ব্রাহ্মণগণ সমাজকে কতকগুলি কুসংস্কার শিক্ষা দিয়া জাগ্রত হইতে দেয় না, যাহারা নিজের উদরপূরণ ও স্বার্থসিদ্ধি ব্যতীত আর কিছু জানে না, যাহারা জাতীয় ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া যে যেদিকে পারে, অর্থোপার্জ্জন করিয়া নিজের গৃহ সচ্ছল করিতেছে, তাহাদিগকে দক্ষিণা দিয়া ভোজন করাইলে মহাপুণ্য হইবে, ইহা অধর্ম্ম নয় ত আর কি? যাহাদিগকে দেখিলে আমাদের আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া উঠে, তাহাদিগকে কি ভক্তিপূর্ব্বক নমস্কার করিতে হইবে ও অর্থ দিয়া তাহাদের পদযুগল পূজিতে হইবে? রে অপদার্থ হিন্দুধর্ম্ম! তোমার একি অবিচার? কেন তুমি এমন অধর্ম্ম শিক্ষা দেও? কেন তুমি এমন অযোগ্যপাত্রে সম্মান দেখাইতে বল? সুখের বিষয়, এখন আমরাও আর তোমার কথায় ভুলি না এবং ব্রাহ্মণ দেখিয়া মাথা হেট করি না।

এস্থলে হিন্দুধর্ম্মের গূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটন করা আবশ্যক। জগতের নিয়ম এই, যে দেশে সমাজের অনাটন পূরণ করিয়া জ্ঞানধর্ম্মানুশীলনের জন্য লোকের যত অবকাশ থাকিবে, সে দেশ জ্ঞান ধর্ম্মানুশীলন করিয়া সভ্যতার তত উচ্চ পদবীতে অধিরূঢ় হইবে। এই নিয়মানুসারে হিন্দুধর্ম্ম সমাজের যাবতীয় অনাটন পূরণার্থ অন্যান্য জাতিকে নানাকর্ম্মে ব্যাপৃত রাখিয়া কেবল ব্রাহ্মণজাতিকে জ্ঞানধর্ম্মের অনুশীলনে নিযুক্ত করে এবং উহাদিগকে যথেষ্ট অবকাশ দিবার জন্য উহাদের ভরণপোষণের ভার অন্যান্য জাতির স্কন্ধে অর্পন করে।

অতএব বলা উচিত, হিন্দুসমাজের অশেষ মঙ্গলের জন্য হিন্দুধর্ম্ম ব্রাহ্মণভোজনে ও দক্ষিণাদানে এত পুণ্য নির্দ্দেশ করিয়াছে।

যে পূজ্য ব্রাহ্মণ জাতির অস্তিত্বের সহিত হিন্দুধর্ম্মের অস্তিত্ব, হিন্দুজাতির অস্তিত্ব অপরিহার্য্যরূপে জড়িত, যে বাহ্মণজাতি লোক-পরম্পরায় সমাজের অধিনায়ক হইয়াও সামান্য ভিক্ষোপজীবী, যে জাতি হিন্দুসমাজের মঙ্গলের জন্য যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপ-নাদি নানাকর্ম্মে সদা ব্যাপৃত, সে জাতির ভালরূপ প্রতিপালনের জন্য যদি হিন্দুধর্ম্ম ব্রাহ্মণভোজনে ও দক্ষিণাদানে মহাপুণ্য নির্দ্দেশ করত সমাজস্থ সকল জাতিকে উহাতে নিঃস্বার্থ ধর্ম্মাভাবে স্বতঃ প্রোৎসাহিত করে, তাহাতে এ ধর্ম্মের কোন্ অপরাধ দেখিতেছ?

যে পূজ্য ব্রাহ্মণজাতি হিন্দুসমাজের শীর্ষস্থানীয়, যাঁহারা আমাদের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের জন্য সদা চিন্তিত, যাঁহারা না থাকিলে আমরা শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াকলাপ করিতে অসমর্থ, যাঁহাদের ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া আমরা ধর্ম্মপথে, সাধনপথে এত অধিক অগ্রসর, তাঁহারা ব্যতীত আমাদের দানের সুপাত্র কে হইতে পারে? অন্ধ বল, খঞ্জ বল, পথের ভিখারী বল, উহারা সমাজের অপোগণ্ডকমাত্র। কিন্তু যে ব্রাহ্মণজাতি সমাজ হইতে কিঞ্চিন্মাত্র দক্ষিণা পাইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করত আপনাদের অস্তিত্ব, হিন্দু-ধর্ম্মের অস্তিত্ব বজায় রাখিতেছেন, তাঁহারা কি সমাজের অপোগণ্ডক? অতএব কাঙ্গালীভোজন অপেক্ষা ব্রাহ্মণভোজনে অধিক পুণ্য নির্দ্দেশ করাতে হিন্দুধর্ম্ম কোনরূপ দোষের ভাগী হয় নাই।

আরও দেখ, ইউরোপে খৃষ্টধর্ম্মোপদেষ্টা পাদরির যে কাজ, এদেশে হিন্দুধর্ম্মোপদেষ্টা ব্রাহ্মণদিগের সেই কাজ। খৃষ্টজগতে লোকে কায়মনোবাক্যে পাদরি প্রতিপালন করে। তবে কেন আমরা কুশিক্ষাবশতঃ ব্রাহ্মণভোজনে ও সামান্য দক্ষিণাদানে কাতর হই? আজ আমরা রাজার হুকুম মত ব্যারিষ্টার, উকিল, মোক্তার ও

ডাক্তার সকলকে স্বেচ্ছায় যথাযোগ্য পারিশ্রমিক দিয়া থাকি ; কিন্তু ব্রাহ্মণঠাকুরদের বেলায় যত কমে সারিতে পারি, তাহার চেষ্টা পাই। এই প্রকারে মান্ধাতার আমলে তাঁহারা যাহা পাইতেন, এখনও তাই পান এবং এই দুর্মূল্য সময়ে সংসার চালাইতে পারেন না। কাজেই ছেলেপীলেদিগকে অন্যান্য কাজে লাগান ; পেটের দায় যে মহাদায়। এই প্রকারে পুরোহিতকুল ক্রমশঃ সমাজে লোপ পাইতেছে। হিন্দুসমাজ যদি ইহার প্রতীকার করে, তবে দেশের মঙ্গল ; নতুবা হিন্দুধর্ম্ম অচিরে লোপ পাইবে।

মুষ্টিভিক্ষা।

এই প্রথা ভারতে চিরপ্রচলিত। নগরে নগরে ও গ্রামে গ্রামে সর্ব্বত্র এই প্রথা দেখা যায়। ভিক্ষুকগণ ভিক্ষার ঝুলি লইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে করিতে দিনের খোরাক জোগাড় করে। সকলেই পুণ্যভাবে উহাদিগকে মুষ্টিভিক্ষা দিয়া থাকে। গরীব লোকও এরূপ দানে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হয় না।

ইংরাজের দেখাদেখি, আজকাল অনেকে মুষ্টিভিক্ষার উপর নারাজ। তাঁহারা ভাবেন, এরূপ প্রথা অতি জঘন্য, ইহা কেবল দারিদ্র্য ও আলস্যের প্রশ্রয় দেয়। যাহারা মজুরী করিয়া খাটিয়া খাইতে পারে, তাহারাও কখন কখন মুষ্টিভিক্ষায় রত হয়। এরূপ লোককে দিলে পুণ্য, না পাপ ? আবার দেখা যায়, ভিক্ষুকদের ভিতর অনেকে চোর ও ডাকাত। উহারা ভিক্ষা করিতে আসিয়া গৃহস্থের সন্ধানাদি লইয়া যায়। এরূপ স্থলে মুষ্টিভিক্ষা রহিত হইলে দেশের মঙ্গল। কলিকাতা প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগরীতে এ প্রথা লুপ্তপ্রায়। ইহার পরিবর্ত্তে দরিদ্রনিবাস প্রভৃতি স্থাপন করিলে দেশের প্রভূত মঙ্গল। সুসভ্যদেশে যে প্রথা দেখা যায়, এদেশে তাহাই প্রচলিত করা উচিত।

তাঁহাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের ন্যায় যে

দেশে জনসাধারণ ধনাঢ্য, যে দেশে বহুবিস্তৃত বাণিজ্যবশতঃ পৃথিবীর ধনরাশি একস্থানে রাশীকৃত হইতেছে, সে দেশে সমাজের অপোগণ্ডকদিগের প্রতিপালনের জন্য দরিদ্রনিবাসাদি স্থাপন সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রথা। কিন্তু ভারতের ন্যায় যে দেশের জনসাধারণ দীন-দরিদ্র ও কৃষিজীবী, তথায় অপোগণ্ডকদিগের প্রতিপালনের জন্য মুষ্টিভিক্ষা সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি। এজন্য এদেশে আবহমানকাল মুষ্টিভিক্ষা চলিতেছে। এখন যে মহীরুহ এতকাল সতেজে বর্দ্ধিত হইতেছে, উহাকে উৎপাটন করিয়া বিদেশী এক কলম রোপণ করিবার কি প্রয়োজন?

দুর্ভিক্ষ।

আজকাল দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া যেরূপ নানা অঞ্চলে ঘন ঘন পতিত হইতেছে, তাহাতে দানধর্ম্ম ব্যতীত আমাদের উপায়ান্তর নাই। শুনিতে পাই ও কাগজকলমে দেখিতে পাই, প্রজাবৎসল ইংরাজরাজের আমলে ভারত অপূর্ব্ব সুখৈশ্বর্য্যে পূর্ণ ও ইহার লোকসংখ্যা হু হু শব্দে বাড়িতেছে। কেমন পাকারাস্তা! কেমন রেল! কেমন টেলিগ্রাফ! কেমন স্কুল ও কলেজ! কেমন ডাকঘর! কেমন আদালত! এ সব থাকিলে কি হয়? দুরদৃষ্টক্রমে আমরা এখন পেটের দায়ে অস্থির। অন্নচিন্তাই আমাদের প্রধান চিন্তা। ভারতের অর্দ্ধাংশ লোক একাহারী। যাবতীয় খাদ্যদ্রব্য ভীষণ দুর্মূল্য। ইহাতে অল্পকারণে নানাস্থানে দুর্ভিক্ষ পতিত হয়।

এই দুর্ভিক্ষপতন ইংরাজরাজের ভারতশাসনের প্রধান কলঙ্ক এবং ইতিহাস তাঁহাদের এ কলঙ্ক জ্বলদক্ষরে ঘোষিত করিবে। কত লক্ষ লক্ষ নরনারী এই দুর্ভিক্ষানলে প্রাণাহুতি দিয়াছে ও দিতেছে, তাহার কি নিকাশ আছে? ইহার দুইটী প্রধান কারণ দেখা যায়।

(১) অর্থাভাব।

(২) অন্নাভাব।

ভারতের পূর্ব্বতন শ্রমশিল্পাদি ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। ইহাতে দেশ ক্রমশঃ দরিদ্র হইতেছে। এক বিলাতী বস্ত্রের আমদানিতে তাঁতি, জুগি ও জোলা প্রায় নিরন্ন। শুনিতে পাই, ইহাতে বৎসরে সোত্তর কোটি টাকা বিলাতে চলিয়া যায়। ইংরাজরাজের অর্থ শোষণ নীতি বশতঃ ভারত ক্রমশঃ দরিদ্র হইতেছে। ভাতের সঙ্গে লবণ খাইবে,ইংরাজকে টেক্স দিয়া ;কাপড় পরিবে টেকস দিয়া ; বিলাতী ঔষধ সেবন করিবে, টেক্স দিয়া, সকল দিকেই পরোক্ষভাবে টেক্স দিতে হইতেছে। যিনি যাই করুন না, সকলই যায় ইংরাজের ঘরে। ইহাতে দেশে যথেষ্ট অর্থাভাব ঘটিতেছে। অপরদিকে দুর্মূল্যতা ক্রমশঃ বাড়িতেছে। ঘরে টাকা নাই ; কি দিয়া জিনিষ পত্র খরিদ করিবে ? কাজেই অনেকে অনশনে মারা যাইতেছে।

উদারনীতিপরায়ণ ইংরাজের অবাধ বাণিজ্যবশতঃ ভারতের কৃষি জাত দ্রব্যের অধিকাংশ অন্যান্য দেশে রপ্তানি হইতেছে ; ইহাতে গম চাউল দেশে মজুৎ থাকিতে পায় না। এই অন্নাভাবই দুর্ভিক্ষ পতনের মূলীভূত কারণ। যে ভারতমাতা পূর্ব্বে কেবলমাত্র নিজের সন্তানবর্গের আহার যোগাইতেন, এখন তাঁহাকে অন্যান্য দেশের কু-পোষ্য পালন করিতে হইতেছে। ইহাতে যে বৎসর কোন অঞ্চলে অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি দরুণ শস্য নষ্ট হইয়া যায়, তথাকার দীনদরিদ্রেরা অগ্রে মারা পড়ে ও দেশে হাহাকার উঠে।

যাহা হউক ? যে কোন অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ পতন হউক না, প্রজাবৎসল ইংরাজরাজ এ দৈব দুর্ব্বিপাক শান্ত করিবার জন্য যথাসাধ্য উপায় অবলম্বন করেন। অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টির বিষময় ফল দূরীভূত করি-বার জন্য নানা অঞ্চলে নানা খাল কাটাইরা জল সেচনের ও জল নিঃসরণের সুবন্দোবস্ত করেন। দুর্ভিক্ষ পতিত হইলে তাঁহারা নানা

স্থানে দরিদ্রাশ্রম খুলিয়া আতুর লোকবর্গকে অন্ন জল দেন, মজুরীর জন্য নানাস্থানে সরকারী কাজকর্ম্ম খোলেন ও তাকাবী দেন। এই প্রকারে তাঁহারা নানাদুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজাকে রক্ষা করিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা স্বজাতিপ্রিয়তাবশতঃ দুর্ভিক্ষ পতনের মূলীভূত কারণ অপনোদনে কিছুমাত্র চেষ্টা পান না এবং শস্যরপ্তানি বন্ধ করেন না। মনে করিলে তাঁহারা সামান্য এক কলমের আচড়ে শস্য রপ্তানি বন্ধ করিয়া দুর্মূল্যতা দূর করত ভারতের ভাগ্যলিপি পরিবর্ত্তন করিতে পারেন। কিন্তু বাণিজ্যপ্রিয় ইংরাজ কি তাহা করিবেন? কান্নাকাটী যতই কর না কেন, কেহই তোমায় কথায় কর্ণপাত করিবে না।

সপ্তম অধ্যায়

হিন্দুজাতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

যে ভারত অতি প্রাচীন কাল হইতে, কে-জানে-কোন্-সময় হইতে অন্ততঃ খৃঃ পূঃ তিন সহস্র বৎসর হইতে অপূর্ব্ব সভ্যতা জ্যোতিতে উদ্ভাসিত,যে ভারত সমগ্র পৃথিবীর জ্ঞানধর্ম্মের আকর, সে ভারতের প্রকৃত ইতিহাস নাই, ইহা কি কম দুঃখের বিষয়? আমরা কিনা আজ পরের মুখে শুনিয়া ভারতের পূর্ব্ব গৌরব, পূর্ব্ব কীর্ত্তি ও পূর্ব্ব সভ্যতার কথা অবগত হইতেছি। রে ধর্ম্মান্ধ ব্রাহ্মণগণ! তোমরা এ কি করিয়া গিয়াছ, যাহার জন্য আমাদের মস্তক আজ জগতের নিকট হেঁট হইতেছে? এমন যে মহৎ অশোক, যাহার কীর্ত্তিধ্বজা সাইবিরিয়া হইতে যাভা দ্বীপ পর্য্যন্ত এবং পেলেষ্টাইন হইতে চীন

পর্য্যন্ত উড্ডীয়মান ছিল, যাঁহার অনুশাসনপত্র ভারতের নানা পর্ব্বতে ও লৌহস্তম্ভে এখনও খোদিত দেখা যায়, তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ তোমরা কিছুমাত্র উল্লেখ কর নাই। এমন যে নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয়,যেখানে দশ সহস্র ছাত্র সকল সময়ে বিনা ব্যয়ে অধ্যয়ন করিত, তাহার কথাও তোমরা কিছু মাত্র উল্লেখ কর নাই। এমন যে মাসিডনাধিপতি মহৎ আলেকজাণ্ডারের পাঞ্চাব আক্রমণ ও পুরুরাজের বিক্রম প্রদর্শন, তাহাও তোমরা উল্লেখ কর নাই। তোমরা কেবল ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া আমাদের মাথাটি খাইয়া গিয়াছ এবং ভারতকে জাঁহান্নমে দিয়াছ!

রাজবংশাবলি, রাজচরিত ও যুদ্ধবিবরণ প্রভৃতি ঐতিহাসিক ঘটনানিচয় আর্য্যসমাজে প্রথমে সূতমুখে, পরে পৌরাণিক যুগে ভাট ও চারণ মুখে রাজসভায় গীত হইত। তাঁহারা পূর্ব্বপুরুষদিগের কীর্ত্তিকলাপ স্মরণ করাইয়া রাজন্যবর্গকে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পালনে চিরদিন প্রোৎসাহিত করিতেন। তাঁহারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রাকৃতভাষায় কাব্যাকারে যে রাজচরিত ও যুদ্ধবিবরণ লিখিতেন, তাহা তাঁহারা রাজদরবারে পাঠ করিতেন। কিন্তু হস্তলিপি কাহাকেও দেখাইতেন না। এই প্রকারে তাহাদের হস্তলিখিত গ্রন্থ নিজ নিজ বংশলোপের সহিত হিন্দুসমাজে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আবার যখন কোন দেশে নূতন রাজবংশ উত্থিত হইয়াছে, লুপ্তবংশের কীর্ত্তিকলাপ রাজদরবারে গীত হইত না। এইপ্রকারে ভারতে নানা রাজবংশের প্রকৃত ইতিহাস লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

এইরূপ নানাকারণবশতঃ কোন প্রদেশের ধারাবাহিক ইতিহাস এখন আমাদের চক্ষে পতিত হয় না। কেবলমাত্র কাশ্মীরের ইতিহাস রাজতরঙ্গিণী দেখা যায়। ইহাও আবার স্থানে স্থানে কাল্পনিক উপাখ্যানে পূর্ণ!

যাঁহারা জ্ঞানধর্ম্মের অনুশীলন করাতে সমাজের প্রকৃত অধি-

াায়ক, যাঁহারা চিরদিন এক সংস্কৃত দেবভাষা আলোচনা করিয়া াাসিতেছেন, তাঁহারা ঐতিহাসিক জ্ঞাননিচয় পাইয়া সমাজের ধর্ম্মো-ািতির জন্য উহাদিগকে কথঞ্চিৎ বিকৃতভাবে পুরাণাদি গ্রন্থে লিখিয়া াান। এজন্য জাতীয় ইতিহাসের যৎকিঞ্চিৎ এখন যাহা বিদ্যমান, াাহা কেবল ধর্ম্মশাস্ত্রে পাওয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অধিকাংশ র্ম্মশাস্ত্র অতিরঞ্জিত ও কাল্পনিক উপাখ্যানে পূর্ণ। উহাদের ভিতর হইতে ঐতিহাসিক সত্য সংগ্রহ করা অতীব দুঃসাধ্য। যুদ্ধের াধ্যে রামায়ণে রামরাবণের যুদ্ধ, মহাভারতে কুরুপাণ্ডবদিগের যুদ্ধ, আর নানা পুরাণে দেবাসুরদিগের যুদ্ধ, এই মাত্র দেখিতে পাই। আর পাঁচ হাজার বৎসরের ভিতর ভারতের নানা প্রদেশে যে সকল াথার্থ যুদ্ধ ঘটে, উহাদের কিছু মাত্র উল্লেখ নাই। অধ্যাপকবর্গ আসল কথা ভুলিয়া গিয়া কেবল কল্পনাজগৎ লইয়া চিরদিন ব্যস্ত। এজন্য তাঁহাদের কথায় আমাদের তত দূর আস্থা হইতেছে না।

অপরপক্ষে মোক্ষমুলারপ্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সমগ্র হিন্দু-শাস্ত্র, আবস্তিক, চীন, গ্রীক প্রভৃতি নানা ভাষা মন্থন করিয়া ভারতের অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে যে সকল সিদ্ধান্ত করিতেছেন, তাহাও যে অভ্রান্ত ও সর্ব্ববাদিসম্মত, তাহা আমরা এখন স্বীকার করিতে পারি না। কালক্রমে নূতন নূতন আবিষ্কারের সঙ্গে তাঁহা-দের অনেক মতামত খণ্ডিত হইবে। কিন্তু প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা নানা অঞ্চলের ভূগর্ভ খনন করিয়া যাহা আবিষ্কার করিতেছেন, তাহা অখণ্ডনীয়। যাহা হউক, এস্থলে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতামত অনুসরণ করা কর্ত্তব্য।

ভারতে আর্য্যজাতির আগমনের পূর্ব্বে ইহা অনার্য্যজাতিতে পূর্ণ ছিল। উহারা পশ্চিমোত্তর ও পূর্ব্বোত্তর পথ দিয়া ভারতে প্রবেশ করে এবং কোন্ সময়ে প্রবেশ করে, ইতিহাস এখনও তাহার কোন সন্ধান পায় নাই। আধুনিক কোল, ভীল, সাঁওতাল ও দ্রাবিড়

জাতিগণ উহাদের বংশধর। দাক্ষিণাত্যের অনার্য্যজাতিবর্গ কথঞ্চিৎ সভ্যতাসোপানে আরূঢ় ছিল, এজন্য শাস্ত্রে দেখা যায়, লঙ্কায় রাবণের স্বর্ণপুরী। কিন্তু উত্তরাংশের অনার্য্যজাতিবর্গ চিরদিন অসভ্য অবস্থায় আছে। উহাদের ব্যবহৃত প্রস্তরাস্ত্র ভারতের নানাস্থলে এখনও পাওয়া যায়। উহারা আর্য্যজাতি কর্ত্তৃক বিজিত ও বিতাড়িত হইয়া পর্ব্বতজঙ্গল আশ্রয় করে এবং তথায় চিরদিন অসভ্য অবস্থায় আছে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনৈতিহাসিক সময়ে আর্য্যসভ্যজাতির প্রথম নিদর্শন পান। এই আর্য্যজাতি হইতে হিন্দু,পারসিক,গ্রীক, রোমান, জার্ম্মান ও ইংরাজ প্রভৃতি জাতিবর্গ সমুদ্ভূত। এ জাতির আদিম নিবাস কোথায় ছিল, তদ্বিষয়ে নানামুনির নানামত চলিতেছে। তিলক মহোদয় বলেন,সুমেরু মহাদ্বীপ তাঁহাদের আদিম নিবাসস্থল। কেহ বলেন, এসিয়ার মধ্যভূভাগ মঙ্গোলিয়া দেশ তাঁহাদের আদিম নিবাসস্থল। যে স্থলে বাস করুন না, তাঁহারা সমাজে বিবাহাদি প্রথা চালিত করিয়া গোমেষাশ্বপালন কৃষিকার্য্য, বস্ত্রবয়ন, গৃহনির্ম্মাণ, নৌকাগঠন,লৌহাস্ত্র ব্যবহার প্রভৃতি সভ্যদেশোচিত সমাজের অত্যাবশ্যকীয় অনুষ্ঠানগুলি উদ্ভাবন করত কালসহকারে সভ্যতাসোপানে আরূঢ় হন। কিন্তু লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সেই অনুর্ব্বর দেশে জীবনসংগ্রাম আয়াসসাধ্য হওয়াতে তদীয় বংশধরেরা কয়েক শতাব্দীর ভিতর অন্যান্য উর্ব্বরদেশে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে থাকে।

এই প্রকারে এ জাতির কয়েকদল ভারতবর্ষ,পারস্য,গ্রীশ, ইটালী প্রভৃতি দেশে উপনিবেশ স্থাপনপূর্ব্বক তত্রত্য আদিম নিবাসীদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া আপনাদের রাজ্য বিস্তার করেন। আর্য্যজাতির এই সকল ভিন্ন ভিন্ন শাখা ভিন্ন ভিন্ন দেশে রোপিত হইয়া প্রকৃতিদেবীর আনুকূল্যবিশেষ প্রাপ্ত হইয়া কালক্রমে উন্নতি সাধন করত সভ্যতাসোপানে অগ্রসর হইতে থাকে এবং পূর্ব্বপুরুষদিগের মূল ভাষাকে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করত ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় পরিণত

করে। এইপ্রকারে এক জাতির বংশধরেরা ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন জাতিতে পরিণত হইয়া পূর্ব্বতন আত্মীয়তা একেবারে বিস্মৃত হইয়া যান। কিন্তু আধুনিক শব্দবিদ্যার কি অপার মহিমা! ধন্য ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলি! ধন্য তোমাদের গবেষণা! তোমরা আজ সেই বহুকাল বিস্মৃত জাতীয় সম্পর্ক আবিষ্কার করাতে সকলের ধন্যবাদার্হ।

হিন্দুজাতিও সেই আর্য্যজাতি হইতে উদ্ভূত। তাঁহারাই জগতে আপনাদিগকে প্রথম আর্য্য বলিয়া পরিচয় দেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিত দিগের মতে তাঁহারা ভারতের আদিম নিবাসী নন। কিন্তু কোন হিন্দুশাস্ত্রে এ কথার কিছুমাত্র উল্লেখ নাই। যাহা হউক,অতি প্রাচীন কাল হইতে খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত এসিয়ার মধ্যস্থল হইতে ভিন্ন ভিন্ন জাতি শীতপ্রধান দেশের স্বভাবজ বলদর্পে দর্পিত হইয়া এই অত্যুর্ব্বর, স্বর্ণময় ভারতের প্রথিতধনেপ্সায় কেহ বা লুণ্ঠনের জন্য, কেহ বা বসবাসের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এ দেশে আসিয়াছে। তন্মধ্যে আর্য্যজাতি সর্ব্বাগ্রগামী।

প্রথমতঃ এ জাতির একদল বেলুরত্যাগ ও মুসরত্যাগ পর্ব্বতদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী উর্চ্চ ভূখণ্ড হইতে আগমন করিয়া সিন্ধুনদীর পূর্ব্বপারে উপনিবেশ স্থাপন করে। কালসহকারে উহাদের বংশবৃদ্ধি হওয়ায় এবং তজ্জাতীয় কয়েক দল পরে যোগ দেওয়ায় উহারা ক্রমশঃ পূর্ব্ব দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে এবং সমস্ত পাঞ্জাবে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এই প্রকারে উপনিবেশ স্থাপন করিতে গিয়া উহারা আদিম নিবাসী অনার্য্য জাতির সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে কতকগুলি অনার্য্য যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পলায়নপূর্ব্বক পর্ব্বত জঙ্গল আশ্রয় করে এবং অপর কতকগুলি অনার্য্য আর্য্যসমাজভুক্ত হইয়া উহাদের সেবায় নিযুক্ত হইয়া পড়ে। এরূপ ঘটনা উত্তরকালে ভারতের সকল প্রদেশে ঘটিয়াছে।

এখন সুসভ্য আর্য্যজাতি কি ভারতের আদিমনিবাসী এবং এদেশ হইতে তাঁহারা বেবিলন, মিসর প্রভৃতি দেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন, অথবা তাঁহারা কি পশ্চিমোত্তর হইতে আসিয়া মুসলমান জাতির ন্যায় ভারত বিজয় করেন, এ সকল কথা ভবিষ্যৎ ইতিহাস লেখকেরা মীমাংসা করিবেন। এ স্থলে আমাদিগকে পাশ্চাত্য পণ্ডিত দিগের মতামত গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পরবর্ত্তী সময়ের ঘটনাবলি তাঁহারা যেরূপ নির্দ্দেশ করেন, তাহা আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য, উহার পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের ঘটনাবলি তাঁহারা যেরূপ নির্দ্দেশ করেন, তাহাতে আমাদের তাদৃশ আস্থা প্রদর্শন করা উচিত নয়। পণ্ডিতবর মোক্ষমূলার সাহেব বলুন, আর যিনি বলুন না কেন, তাঁহাদের সকল কথায় বিশ্বাস করা উচিত নয়। তাহার সাক্ষ্য, যোগসিদ্ধ মহর্ষিগণ আর্য্যসমাজের কৃষক যোদ্ধা এবং ঋক্‌বেদের মন্ত্র আর্য্য কৃষকদিগের ভীতিসংবলিত গীত মাত্র, এ সকল কথায় কোন্ হিন্দু বিশ্বাস করিবেন?

প্রথম ভাগের যুগধর্ম্ম নামক প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি, আর্য্যজাতি যত কাল ভারতে আসিয়াছেন, সেই কালকে তাঁহারা সৃষ্টির চতুর্যুগানুসারে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগে বিভক্ত করেন। তন্মধ্যে ত্রেতাযুগে পরশুরাম ও শ্রীরাম অবতীর্ণ হন, দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধদেব আবির্ভূত হন এবং কলিযুগে পৌরাণিক ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়। বুদ্ধদেব খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধ খৃঃ পূঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে (১৪৩০ খৃঃ পূঃ) সংঘটিত হয়। অনেক পণ্ডিতের মত, খৃঃ পূঃ ৩৫০০ বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যজাতি পাঞ্জাবে প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেন। অতএব এরূপ সিদ্ধান্ত করা উচিত, খৃঃ পূঃ ৩৫০০ হইতে খৃঃ পূঃ ২৫০০ পর্য্যন্ত জাতীয় সত্যযুগ, খৃঃ পূঃ ২৫০০ হইতে খৃঃ পূঃ ১৫০০ পর্য্যন্ত জাতীয় ত্রেতাযুগ, খৃঃ পূঃ ১৫০০ হইতে খৃঃ পূঃ ৫০০ পর্য্যন্ত জাতীয় দ্বাপর

যুগ; তৎপরে জাতীয় কলিযুগের প্রবর্ত্তন হইয়াছে। এই সময় হইতে আধুনিক পৌরাণিক ধর্ম্ম ভারতে প্রচারিত হইয়াছে।

এখন প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা পাঞ্জাব ও সিন্ধুদেশের ভূগর্ভ খনন করিয়া পাঁচহাজার বৎসরের ইষ্টকনির্ম্মিত সহর, মন্দির, পয়ঃ প্রণালী খোদিত প্রস্তরফলক প্রভৃতি আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহাতে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের নানা মত খণ্ডিত হইয়া যাইবে। বৈদিক যুগে মন্দিরাদি ছিল না; তবে কি প্রকারে বলি, পাঁচ হাজার বৎসর হইল আর্য্যজাতি ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন? কালে আরও যে কত নূতন নূতন বিষয় আবিষ্কৃত হইবে, তাহা কেহ জানেন না।

পাঞ্জাবে উপনিবেশ স্থাপন করিবার পর আর্য্যজাতি ভিন্ন ভিন্ন সমাজে বিভক্ত হইয়া ঐ প্রদেশের নানা অঞ্চলে অধিষ্ঠিত হন। সর্ব্বত্র রাজতন্ত্র প্রথা প্রচলিত হওয়াতে প্রত্যেক সমাজ এক একটী ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত হয়। কয়েক শতাব্দীর ভিতর তদীয় বংশধরেরা পাঞ্জাবের আনুকূল্যবিশেষ প্রাপ্ত হইয়া আদিম আর্য্যভাষা ও আর্য্যধর্ম্মের উন্নতিসাধন করত সভ্যতাসোপানে অধিক অগ্রসর হইতে থাকে। ঐ প্রদেশের সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীদ্বয়ের মধ্যগত ব্রহ্মাবর্ত্ত অঞ্চলে বৈদিক ধর্ম্মের সবিশেষ উন্নতি সাধন ঘটিয়াছিল।

আমাদের প্রপিতামহ অমিতবলশালী সুসভ্য আর্য্যসন্তানগণ চতুরঙ্গবলে বেষ্টিত হইয়া পাঞ্জাব হইতে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন এবং ক্রমশঃ আর্য্যাবর্ত্তের নানাস্থান জয় করিয়া বৃহৎ বৃহৎ রাজ্য স্থাপন করেন। এইরূপে খৃঃ পূঃ দ্বাবিংশ শতাব্দীর পর তাঁহারা একদিকে মিথিল, অন্যদিকে নর্ম্মদা পর্য্যন্ত অভিব্যাপ্ত হইয়া অনার্য্য জাতিবর্গকে পার্ব্বত্যদেশে তাড়িত করত অযোধ্যা, মথুরা, কাশী, কেকয়, পাঞ্চাল, মৎস্য, হস্তিনাপুর, অবন্তী, বিদর্ভ, মিথিল, মগধ, দ্বারকা প্রভৃতি কয়েকটী ধনধান্যে পরিপূর্ণ, সমৃদ্ধিশালী রাজ্য স্থাপন করেন

এবং চন্দ্র, সূর্য্য, যদু প্রভৃতি রাজবংশের কীর্ত্তিধ্বজা ভারতগগনে উড্ডীয়মান করেন।

জাতীয় সত্যযুগে কুলপরম্পরাগত জাতিভেদপ্রথা আদৌ প্রচলিত ছিল না। তৎকালে আর্য্যসমাজ আর্য্য ও অনার্য্য এই দুই জাতিতে বিভক্ত ছিল। পরে সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সমাজে যে নূতন জ্ঞানরাশি সঞ্চিত হইতে থাকে, তাহা শ্রুতিপরম্পরায় পুরুষানুক্রমে শিষ্যানুক্রমে চালিত হওয়াতে ব্রাহ্মণজাতি গঠনের সূত্রপাত হয়। সেইরূপ রাজন্যবর্গের চতুষ্পার্শ্বে অসমসাহসিক যোদ্ধৃবর্গ একত্রিত হইয়া পুরুষানুক্রমে শৌর্য্যবীর্য্যের অনুশীলন করাতে ক্ষত্রিয়জাতি গঠনের সূত্রপাত হয়। আর্য্যজাতির অধিকাংশ লোক কৃষিপ্রধান ভারতের কৃষিকার্য্যে ও গোপালনে মনোনিবেশ করাতে বৈশ্যজাতি গঠনের সূত্রপাত হয়। পরন্তু অনার্য্যগণ আর্য্যসমাজভুক্ত হইয়া উপরোক্ত তিন শ্রেষ্ঠ জাতির সেবায় নিযুক্ত হওয়াতে শূদ্র জাতিগঠনের সূত্রপাত হয়। তৎকালে আর্য্যসমাজে বৈদিক ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল এবং যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান ধীরে ধীরে প্রবর্ত্তিত হইতে ছিল।

জাতীয় ত্রেতাযুগে খৃঃ পূঃ বিংশ শতাব্দীর পর আর্য্যসমাজে লিখনার্থ লিপিবিদ্যা প্রচলিত হইলে শ্রুতিপরম্পরাগত বেদের ভাষ্য-স্বরূপ ব্রাহ্মণভাগ গদ্যাকারে বিরচিত হইতে আরম্ভ হয় এবং যজ্ঞানুষ্ঠানব্যাপারও ক্রমশঃ জটিল হইতে জটিলতর হইতে থাকে। এই সময়ে গুণকর্ম্মের বিভাগ লইয়া কুলপরম্পরাগত জাতিভেদপ্রথা আর্য্যসমাজে বদ্ধমূল হইতে থাকে। এই সময়ে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতির যে বিবাদানলে আর্য্যসমাজ বহুকাল হইতে কলুষিত হইতে ছিল, তাহা পরশুরামের শস্ত্রবলে ও ব্রাহ্মণজাতির আত্মোৎসর্গে চিরদিনের জন্য নির্ব্বাপিত হইয়া যায় এবং ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণজাতিকে সমাজের অধিনায়ক স্বীকার করেন। তদবধি ভারতের রাজন্যবর্গ ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদপ্রার্থী হন। এই সময়ে অযোধ্যাপতি

রামচন্দ্র পিতৃসত্যপালনার্থ চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসে গমন করিয়া দাক্ষিণাত্যে আর্য্যজাতির বিজয়ভেরি বাজান এবং তথায় আর্য্যধর্ম্ম বিস্তার ও রাজ্যস্থাপনের পথ প্রদর্শন করিয়া যান। সেই সময়ে বাল্মীকিবিরচিত তদীয় কীর্ত্তিকলাপ লোকমুখে গীত হওয়ায় উত্তর-কালপ্রচলিত রামায়ণের সূত্রপাত হয়।

জাতীয় দ্বাপর যুগে খৃঃ পূঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর পর সত্যবতীনন্দন ব্যাসদেব সমগ্র বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া উহাকে শৃঙ্খলা-বদ্ধ করিয়া যান এবং যোগেশ্বরপ্রকটিত পুরাণকাহিনী আদি-পুরাণে লিখিয়া লোকপ্রখ্যাত করেন। এই সময় আর্য্যজাতির যশসৌরভ দিগ্‌দিগন্ত অভিব্যাপ্ত হয় এবং কুরুক্ষেত্র মহাসমর সংঘটিত হয়। এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন, ভীম, দুর্যোধন, ভীষ্ম, দ্রোণ, জরাসন্ধ প্রভৃতি যোদ্ধৃবর্গের বীরত্বকাহিনী লোকমুখে গীত হওয়াতে উত্তরকালপ্রচলিত মহাভারতের সূত্রপাত হয়। এই সকল বীর-পুরুষদিগের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ অলৌকিক গুণগ্রামের জন্য সমাজে অধিক পূজিত হন।

এই সময়ে বৈয়াকরণিকেরা বৈদিক ভাষার ব্যাকরণঘটিত নিয়মাবলি শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে করিতে বৈদিক ভাষাকে ক্রমশঃ আধুনিক সংস্কৃত ভাষায় পরিণত করিতে থাকেন। যদিও তাঁহাদের গ্রন্থাবলির কোনরূপ নিদর্শন এখন পাওয়া যায় না, তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া পাণিনি খৃঃ পূঃ অষ্টম শতাব্দীতে স্বব্যাকরণ রচনা করিয়া জগৎবিখ্যাত হন। এই সময়ে বৈদিক ভাষা দেশবিশেষে অনার্য্যভাষামিশ্রণে প্রথমে গাথা, পরে প্রাকৃত পালি ভাষায় পরিণত হইতে থাকে। ইহাতে বৈদিক ভাষা সাধারণ সমাজে ক্রমশঃ দুর্বোধ্য হইয়া পড়ে।

তৎপরে খৃঃ পূঃ অষ্টম শতাব্দীর পর গ্রীকদের ভারত আক্রমণের পূর্ব্বে চারি শতাব্দীর মধ্যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে ভারতে

আর্য্যসভ্যতার চূড়ান্ত সময় আইসে। এই সময়কে তাঁহারা সূত্রযুগ বলেন এবং এই সময়ের যাবতীয় সূত্রগ্রন্থ এখন পাওয়া যায়।

এই সূত্রযুগে আর্য্যজাতি নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া সমগ্র হিন্দুস্থানে অভিব্যাপ্ত হন এবং ভারত মহাসাগরের সুদূরবর্ত্তী যব ও বালী দ্বীপ পর্য্যন্ত স্বধর্ম্ম প্রচার করেন। এই সময়ে সমগ্র হিন্দুস্থানে নানা হিন্দুরাজ্য স্থাপিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। রাজন্যবর্গের রাজসভা ও রাজধানী অতুল সৌন্দর্য্যে, অতুল শোভায়ও অতুল সমৃদ্ধিতে সুশোভিত হয়। এই সময়ে দাক্ষিণাত্যের সাধারণ অনার্য্যজাতিবর্গ হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া ক্রমশঃ হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার অবলম্বন করে এবং কালে ঐ ধর্ম্মের নৈষ্টিক সেবক হইয়া উঠে।

যে বঙ্গদেশের অধিবাসিবর্গ আজ ইংরাজরাজের কল্যাণে ভীরু ও কাপুরুষ বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেই বঙ্গদেশের সুসন্তান, বিজয়সিংহ পিতৃদেব কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া স্বজনবর্গের সহিত লঙ্কায় পলায়ন করেন এবং ঐ দ্বীপ জয় করিয়া তথায় নিজ রাজ্য স্থাপন করেন। তদীয় বংশধরেরা সহস্র বৎসর তথায় সগৌরবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই সিংহবংশের নামানুসারে লঙ্কার নাম সিংহল হইয়াছে।

এই সময়ে হিন্দুজাতি বৃহৎ বৃহৎ অর্ণবপোত নির্ম্মাণ করিয়া একদিকে আরব, আফ্রিকা, মিসর, গ্রীশ ও রোম, অপরদিকে চীন ও আমেরিকা পর্য্যন্ত সমুদ্রপথে গমনাগমন করিতেন। কোথাও তাঁহারা উপনিবেশ স্থাপন করেন, কোথাও বা নিজ বাণিজ্য বিস্তার করেন। অনেকের মত, প্রাচীন মিসরবাসী, গ্রীক ও রোমানেরা ভারতের আর্য্যজাতির বংশধর। প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, ব্যাবিলনের সিমেরিয়া জাতি ভারত হইতে গমন করিয়া তথায় বসবাস করিয়াছিল।

ভারতের ভিন্ন ভিন্ন আর্য্যসমাজকে এক প্রকার ধর্ম্মপথে চালাইবার জন্য উহাদিগকে এক আদর্শে গঠিত করিবার জন্য

ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রভৃতি আর্য্যজাতির সভ্যতম জনপদবিশেষের সদাচার ও সদনুষ্ঠানগুলি বিধিবদ্ধ হইয়া এই সময়ে মনুস্মৃতি রচিত হয়।

এই সূত্রযুগে শৌনক, সাংখ্যায়ন, অশ্বালয়ন, কাত্যায়ন, যাগ্যবল্ক প্রভতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ কল্পসূত্রাদি প্রণয়ন করিয়া জগৎ-বিখ্যাত হন। তাঁহাদের গ্রন্থাবলি চিরদিন হিন্দুসমাজে সমভাবে চলিতেছে। মহর্ষিগণ অতি প্রাচীন কাল হইতে বনের ফলমূল খাইয়া যে পরমার্থজ্ঞান এতকাল নিভৃতে অনুশীলন করিতেন, তাহা এখন বেদান্তসূত্রে বিধিবদ্ধ হইয়া বহু প্রচারিত হয়। যোগসিদ্ধ মহর্ষি কপিলদেব সৃষ্টিরহস্যের মূলোচ্ছেদ করত যে বিশ্বাশ্চর্য্যরূপ সাংখ্যদর্শন বহুপূর্ব্বে ব্যক্ত করেন, তাহা এখন সূত্রাকারে লিখিত হইয়া বহু প্রচারিত হয়। যে আয়ুর্ব্বেদবিজ্ঞান উত্তরকালে পৃথিবীস্থ যাবতীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানের আদিগুরু ও পথপ্রদর্শক, যে বিজ্ঞানের ঔষধাদির রাসায়নিক মিলনপদ্ধতি দেখিয়া পাশ্চাত্য জগৎ আজ বিস্মিত ও স্তম্ভিত, সেই আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের চরকাদি দ্বারা এই সময়ে সবিশেষ উন্নতি সাধিত হয়।

এই সময়ে মহাত্মা বুদ্ধদেব ও মহাবীর বেদের কর্ম্মকাণ্ড অমান্য করিয়া ও সমাজের জাতিভেদ প্রথার মস্তকে পদাঘাত করত সকলকে সাম্যমন্ত্রে দীক্ষিত করিবার জন্য বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্ম ভারতে প্রচার করেন। ইহাতে হিন্দুসমাজে মহৎ ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হইল। এই সময়ে তক্ষক প্রভৃতি কতকগুলি পরাক্রান্ত জাতি পশ্চিমোত্তর হইতে আগমন করিয়া ক্রমে ক্রমে আর্য্যসমাজভুক্ত হইতে থাকে।

তৎপরে খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রীক যবনেরা কয়েকবার ভারত আক্রমণ করাতে উভয় জাতির ভিতর ঘনিষ্ঠতা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়। উহারা হিন্দুজাতির নিকট যেমন আয়ুর্ব্বেদও দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা করে, এ জাতিও উহাদের নিকট জ্যোতিষ শাস্ত্র ভালরূপ শিক্ষা করিয়া ইহার উন্নতি সাধন করে। এই সময়ে মৌর্য্যবংশীয় মগধাধি

পতি মহৎ অশোক বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া স্বধর্ম্মপ্রচারার্থ কোথায় মিসর ও তুরস্ক, কোথায় চীন ও তাতার, নানাদেশে বৌদ্ধভিক্ষুক প্রেরণ করেন। সুবিশাল সম্রাজ্যের সাধারণ প্রজাবর্গকে নীতিধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য তিনি নানাস্থানে লৌহস্তম্ভ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক ধর্ম্ম বিষয়ক অনুশাসনপত্র খোদিত করিয়া যান। এই সকল লৌহস্তম্ভ দর্শনে প্রাচীন ভারতেব সভ্যতার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়।

এই সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম দাক্ষিণাত্যে প্রচারিত হইতে আরম্ভ হয়। দাক্ষিণাত্য হইতে এ ধর্ম্ম কালে লঙ্কাদ্বীপে, লঙ্কাদ্বীপ হইতে বর্ম্মায়, শ্যামদেশে ও ভারতমহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে বিস্তৃত হয়। এই সময়ে পাতঞ্জলি পানিনির মহাভাষ্য ও যোগসূত্র প্রণয়ন করিয়া জগৎবিখ্যাত হন। এই সময়ে শক, হুন প্রভৃতি কয়েক বলবান জাতি পশ্চিমোত্তর হইতে আগমন করিয়া ভারতের উত্তরাঞ্চলে কয়েক সমৃদ্ধ রাজ্য স্থাপন করেন। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কাশ্মীরাধিপতি মহাত্মা কনিষ্ক দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে ভারতের উত্তরাঞ্চলে রাজত্ব করেন এবং বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতিকল্পে দ্বিতীয় সভা আহ্বান করেন। তিনি শকাব্দ প্রবর্ত্তন করিয়া যান।

তৎপরে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারত হইতে চীন তিব্বত প্রভৃতি নানা দেশে ধীরে ধীরে প্রচারিত হয়। এই বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে ভারতের সভ্যতাজ্যোতি প্রাচ্য জগতে বিকীর্ণ হইয়াছে। জাপান, চীন, ব্রহ্ম, শ্যাম প্রভৃতি নানাদেশ ইহার জন্য ভারতের নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ আছে। এই সময়ে বৌদ্ধ নরপতিগণ দেশে দেশে বৌদ্ধবিহার, বৌদ্ধস্তূপ, বৌদ্ধ মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়া ভারতে স্থপতিবিদ্যার সম্যক উন্নতিসাধন করিয়া যান।

এই সময়ে হিন্দুদিগের ভিতর ন্যায়, বৈশেষিকাদি দর্শন-শাস্ত্র এবং বৌদ্ধদিগের ভিতর ত্রিপিটকের নূতন সংস্করণ, বিবিধ তন্ত্র, সলিত

বিস্তর প্রভৃতি স্তূপাকার গ্রন্থ রচিত হয়। এই সময়ে ত্রিকোণমিতি, জ্যামিতি, বীজগণিত প্রভৃতি অঙ্কশাস্ত্রের সম্যক উন্নতি সাধন হয় এবং কালক্রমে পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যজাতিবর্গ আর্য্যজাতির নিকট ঐ সকল বিদ্যা শিক্ষা করে। এই বৌদ্ধযুগে নানা প্রদেশে নানা চিকিৎসালয় স্থাপিত হওয়ায় আয়ুর্ব্বেদের সম্যক উন্নতি সাধন হইয়াছিল।

এই সময়ে মগধরাজ্যে মৌর্য্যবংশের পতনের পর প্রথমে অন্ধ্র-বংশ, তৎপরে গুপ্তবংশ ভারতের রাজচক্রবর্ত্তিত্ব প্রাপ্ত হয়। এই সময়ে ভুবনবিখ্যাত কবীশ্বর কালিদাস উজ্জয়িনীর অধিপতি যশো-ধর্ম্ম বিক্রমাদিত্য মহারাজার রাজসভায় থাকিয়া বা মগধের দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য মহারাজার রাজসভায় থাকিয়া সুললিত ও সুমধুর কাব্য রচনা করিয়া জগৎ বিমোহিত করিয়া যান। শুনিতে পাই, বিক্রমাদিতা মহারাজার রাজসভায় যে নবরত্ন ছিলেন, তাঁহারা সসমকালীন লোক নহে। হিন্দুরা কালিদাস, ববাহমিহির, ধন্বন্তরি, অমর প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতদিগের অসাধারণ গবেষণায় মুগ্ধ হইয়া উহাদিগকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হিন্দুরাজার নবরত্ন বলিয়া প্রচার করিতেছে। যাহা হউক, এ সকল কথা ভারতের ভবিষ্যৎ ইতিহাস লেখকেরা মীমাংসা করিবেন।

শক, হুন সিথিয়ান প্রভৃতি যে সকল পৌত্তলিক পরাক্রান্ত জাতি পশ্চিমোত্তর হইতে সসৈন্যে আগমন করিয়া ভারতের উত্তরাঞ্চলে নিজ নিজ রাজ্যস্থাপন করিতে সক্ষম হয়, উহারা কালক্রমে হিন্দু-দিগের আচার ব্যবহার অবলম্বন পূর্ব্বক পুরাতন ক্ষত্রিয় জাতির সহিত বিবাহাদি সূত্রে আবদ্ধ হইয়া নূতন ক্ষত্রিয় জাতি গঠন করিতে থাকে। উহাদের বংশধরেরা কালক্রমে আপনাদিগকে রাজপুত্র বা রাজপুত বলিয়া পরিচয় দিতেছে।

বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতে সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া প্রচলিত ছিল। পরে

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পর ব্রাহ্মণজাতি মগধের চক্রবর্ত্তী গুপ্তবংশের সহায়তা ও নূতন ক্ষত্রিয় জাতির সহানুভূতি ও সাহায্য পাইয়া প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্ম্মের বিলোপসাধনে যত্নবান হন এবং তিন শতাব্দীর ভিতর উহাকে ভারত হইতে চিরনির্ব্বাসিত করিয়া দেন।

খৃষ্টীয় পঞ্চ শতাব্দীর পর পুরাণ ও তন্ত্রাদি রাশি রাশি শাস্ত্রগ্রন্থ ভারতের নানা অঞ্চলে রচিত হইয়া আধুনিক পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ধর্ম্মের জয় দেশে দেশে ঘোষণা করে ও বৌদ্ধধর্ম্মকে নির্মূল করিয়া দেয়। এই সময়ে বহির্দেশস্থ মুসলমান জাতি ধর্ম্মবলে বলীয়ান ও নবোৎসাহে উৎসাহান্বিত হইয়া স্বধর্ম্ম প্রচারোদ্দেশে কয়েকবার ভারত আক্রমণ করে; কিন্তু ক্ষত্রিয় জাতির কুলোচিত শৌর্য্যবীর্য্যের নিকট পরাস্ত হইয়া বিফলমনোরথ হয়।

পরে দুই শতাব্দীর ভিতর উহারা কথঞ্চিৎনির্বীর্য্য হইয়া পড়িলে গিজনীর মামুদ পাঞ্জাব আক্রমণ করিয়া উহাকে স্বাধিকারভুক্ত করেন এবং দ্বাদশবার ভারতে অসিয়া নানাস্থান লুণ্ঠন করত ইহার অপর্য্যাপ্ত ধনরাশি নিজ রাজধানীতে লইয়া যান। দুইশত বৎসরের ভিতর ভারতে ক্ষত্রিয় জাতি আরও নিবীর্য্য হইলে মুসলমানেরা ক্রমে দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইতে থাকে এবং গৃহবিবাদে লিপ্ত রাজন্যবর্গকে একে একে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া আর্য্যাবর্ত্তে এক বিশাল সম্রাজ্য স্থাপন করে। হিন্দু রাজাগণ স্ব স্ব রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া স্বজনবর্গের সহিত পর্ব্বত, জঙ্গল ও মরুভূমি আশ্রয় করত তত্রত্য অনার্য্য জাতিবর্গকে পরাস্ত করিয়া তথায় আপনাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেন। এইরূপে আর্য্যাবর্ত্তের সমতল ক্ষেত্রে হিন্দুজাতির গৌরবসূর্য্য বহুকালের জন্য অস্তমিত হইয়া গেল।

মুসলমানযুগে পাঠান ও মোগল বংশ পঞ্চ শতাব্দীকাল দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপে ভারতে রাজত্ব করেন। সম্রাটদিগের পরাক্রান্ততা বা দুর্ব্বলতাবশতঃ সাম্রাজ্য কখনও বা বহুবিস্তীর্ণ, কখনও বা সঙ্কীর্ণ

হইয়া পড়ে এবং অধীনস্থ সুবেদারেরা কখনও বা দিল্লীশ্বরের সম্পূর্ণ বশে থাকিয়া, কখনও বা স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন করেন। হিন্দু রাজন্যবর্গ কখনও বা সম্রাটের সম্পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করিয়া, কখনও বা স্বাধীনভাবে থাকিয়া নিজ নিজ রাজ্য শাসন করেন। ধর্ম্মান্ধ মুসলমানজাতি নানা প্রদেশের অনেক হিন্দুপরিবারকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া ও অনেক দেবালয় ও দেবমূর্ত্তি ভগ্ন করিয়া হিন্দুধর্ম্মকে নানাদিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া যায়। ইহার গুণে সমগ্র ভারতে ষষ্ঠাংশ লোক এখন মুসলমান দেখা যায়। হিন্দুধর্ম্মের উপর অত্যাচারই মুসলমানশাসনের ঘোর কলঙ্ক।

এই সময়ে রামানন্দ, কবীর, বল্লভাচার্য্য, নানক প্রভৃতি মহাত্মাগণ হিন্দুসমাজে আবির্ভূত হইয়া নূতন ২ সম্প্রদায় স্থাপন করত হিন্দুধর্ম্মকে নবোৎসাহে উৎসাহান্বিত করেন এবং ভারতে মুসলমানধর্ম্মের পরাজয় সাধন করেন। ইহার গুণে মহারাষ্ট্র, শিখ, রাজপুত প্রভৃতি জাতিবর্গ মুসলমান সম্রাজ্যের ধ্বংস সাধন করিতে সমর্থ হন॥ বিশেষতঃ মহারাষ্ট্রজাতি শিবাজীপ্রদত্ত মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বীরদর্পে দর্পিত হইয়া উঠে এবং কয়েক সমৃদ্ধ রাজ্য স্থাপন পূর্ব্বক দেড় শতাব্দীকাল ভারতের ভাগ্যলিপি চালায়। পরে তৃতীয় পাণিপতের যুদ্ধে পরাস্ত হওয়াতে ভারতে সাম্রাজ্যস্থাপনের মহৎ আশা সুদূরে পরাহত হইয়া যায়। এইরূপে হিন্দুজাতির ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্ন হইয়াও হয় নাই এবং ভারতের ভাগ্যনেমি বিভিন্নরূপে পরিবর্ত্তিত হয়।

মোগলসাম্রাজ্যের সুসময়ে ইংরাজজাতি দীনহীন বণিকবেশে জলপথে এদেশে আইসেন এবং দেড়শতাব্দীকাল বিলাতি পণ্য দ্রব্য লইয়া বাণিজ্য করিবার পর এ দেশের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারেন। মোগল সাম্রাজ্যের অন্তিম দশায়, যখন সমগ্র ভারত অশান্তি ও অরাজকতায় পূর্ণ ছিল, তখন তাঁহারা এদেশের লোককে

ইংরাজি সংগ্রামবিদ্যা শিক্ষা দিয়া ইহার রাজনৈতিকগগনে দেখা দেন। তাঁহাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হওয়াতে তাঁহারা পলাসীর যুদ্ধে জয়লাভ করেন। ইহাতে তাঁহাদের সাম্রাজ্য স্থাপনের সূত্রপাত হয়।

প্রতিদ্বন্দ্বী ফরাসী জাতির ক্ষমতা দাক্ষিণাত্যে খর্ব্ব করিয়া তাঁহারা দেশীয রাজন্যবর্গের রাজনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করত অস্ত্রবলে ও বুদ্ধিবলে প্রদেশের পর প্রদেশ অধিকার করিতে ২ অর্দ্ধশতাব্দীর ভিতর সমগ্র হিন্দুস্থানে এক অভূতপূর্ব্ব সুবিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। ত্রিকোণ ভারতের তিন কোণ হইতে তাঁহাদের সাম্রাজ্য বিস্তৃতি লাভ করে। মুসলমান, মহারাষ্ট্র ও শিখ জাতিবর্গকে কযেক যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাঁহারা ভারতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভূভাগগুলি ভোগ করিতেছেন এবং পর্ব্বতারণ্য-মরুময় প্রদেশগুলি দেশীয় রাজন্যহস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পদানত করিয়া রাখিয়াছেন। সিপাইবিদ্রোহ শান্ত হইবার পর ভারতসাম্রাজ্য কোম্পানি বাহাদুরেব হস্ত হইতে ইংলণ্ডেশ্বরীর খাস দখলে আইসে।

সুসভ্য ইংরাজরাজের উৎকৃষ্ট ও উন্নত শাসনগুণে আজ সমগ্র ভারতে অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব্ব শান্তি স্থাপিত, প্রজাবর্গেব ধনপ্রাণ সর্ব্বথা নিরাপদ এবং উহারা নানা দিকে সুখী ও সন্তুষ্ট। তাঁহারা সভ্য দেশোচিত শাসন ও বিচার প্রণালী ডাক, পূর্ত্ত, পুলিস, রেল, চিকিৎসা প্রভৃতি নানাবিধ বিভাগ খুলিয়া সাম্রাজ্যের সুখসমৃদ্ধি বর্দ্ধন করিতেছেন। স্বদেশের শিক্ষাপ্রণালী আপামর বিস্তীর্ণ করিয়া ভারতকে পুনরায় সভ্যতাসোপানে আরোহণ করাইতেছেন। এত সুখশান্তির মধ্যে খাদ্যদ্রব্যের দুর্মূল্যতা ও ঘন ঘন দুর্ভিক্ষপতন তাঁহাদের সুশাসনের ঘোর কলঙ্ক।

ভারতের ইতিহাস আমাদিগকে কি কি শিক্ষা দিতেছে—

(১) পর্ব্বতার্ণববেষ্টিত ভারতে একভাষা ও এক সাম্রাজ্য না হইয়া চিরদিন ইহা ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত এবং ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃত ভাষা কালে উত্থিত। রাজন্যবর্গ চিরদিন বিবাদ বিসম্বাদে লিপ্ত; এজন্য ভারত চির অশান্তির নিকেতন।

(২) যখন কোন রাজ্যের অধীশ্বর শৌর্য্যবীর্য্যবলে চক্রবর্ত্তিত্ব প্রাপ্ত হইতেন, তদীয় সাম্রাজ্য বহুবিস্তৃত হইয়াছিল। কিন্তু তদীয় বংশের ক্ষমতা খর্ব্ব হইলে, পুনরায় সে সাম্রাজ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িত; এজন্য নানা প্রদেশে নানা রাজবংশের উত্থান ও পতন চলিয়া আসিয়াছে। কোন রাজবংশ কোন প্রদেশে তিনশত বৎসরের অধিক রাজত্ব করিতে পারে নাই।

(৩) ভারতের জলবায়ুর এমনি গুণ, যে জাতি এদেশে দুই তিন শতাব্দী বসবাস করিবে, সে জাতি বিলাসসাগরে ভাসিতে ভাসিতে ক্রমশঃ নির্বীর্য্য হইয়া পড়িবে এবং অন্য পরাক্রান্ত জাতি দ্বারা অনায়াসে পরাস্ত হইবে। আর্য্যক্ষত্রিয় জাতির পতন, রাজপুতদিগের উত্থান ও পতন, মুসলমান জাতির উত্থান ও পতন এ বিষয়ে পূর্ণ সাক্ষ্য দিতেছে।

(৪) রাজন্যবর্গের ভিতর একতাভাবই ভারত পরাধীন হইবার মূলীভূত কারণ।

(৫) ইংরাজরাজ ভালরূপ দেখাইতেছেন, এই সুবিশাল ভারতকে একছত্র করিয়া কি প্রকারে সুশাসনে রাখিতে হইবে, আভ্যন্তরিক ও বাহ্য শত্রু হইতে কি প্রকারে ইহাকে রক্ষা করিতে হইবে, সভ্যদেশোচিত নানা সদনুষ্ঠান প্রবর্ত্তন করিয়া কি প্রকারে প্রজাবর্গের সুখৈশ্বর্য্য বর্দ্ধন করিতে হইবে।

যে হিন্দুজাতির ইতিহাসের আভাস মাত্র দেওয়া হইল, সে জাতি কিরূপে গঠিত হইল? পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, আধুনিক হিন্দু-

জাতি এক বিমিশ্র জাতি। প্রাচীন আর্য্যজাতি হইতে এ জাতি উদ্ভূত হইলেও অন্যান্য জাতির সহিত কালক্রমে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। মুসলমানযুগের পূর্ব্বে যখন জাতিভেদের সীমা আজকালের ন্যায় প্রকৃষ্টরূপ নির্দ্ধারিত ছিল না, তখন আর্য্যজাতির পর তক্ষক, নাগ, শক, হুন, সিথিয়ান, জ্যাট প্রভৃতি যে সকল পৌত্তলিক জাতি পশ্চিমোত্তর হইতে আগমন করিয়া সময়ে সময়ে ভারতে প্রবেশ করিয়াছে, উহারা হিন্দুজাতির আচার ব্যবহার অবলম্বন করিয়া কালসহকারে হিন্দু-সমাজভুক্ত হইয়া গিয়াছে। অতএব তাঁহাদের মতে আধুনিক হিন্দু-জাতি পুরাকালীন আর্য্যজাতি, আর্য্যসমাজভুক্ত অনার্য্যজাতি এবং অন্যান্য পৌত্তলিক জাতির বিমিশ্রণে উদ্ভূত। তাঁহারা যাহাই বলুন না কেন, আমরা চিরদিন সাহঙ্কারে বলিব, যে সুসভ্য আর্য্যজাতি ভারত হইতে অর্দ্ধভূমণ্ডলে নিজ জ্ঞানধর্ম্ম ও সভ্যতাজ্যোতি বিকীর্ণ করেন, সেই আর্য্যজাতির বিশুদ্ধ শোণিত আমাদের শিরায় শিরায় বহমান এবং আমরা তাঁহাদেরই একমাত্র বংশধর। সত্যবটে, দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ ও বিধিনির্ব্বন্ধে আজ আমরা জগতে স্বাধীনতা হারাইয়া পরের পদানত হইয়াছি, কিন্তু 'কালস্য কুটিলা গতিঃ' জাতিধর্ম্ম রক্ষা করিয়া ও সুসভ্য জাতির নিকট সুশিক্ষা পাইয়া আমরা আবার পূর্ব্বপুরুষদিগের কীর্ত্তিধ্বজা জগতে উড়াইব।

বৈদিক ধর্ম্ম।

এখন যে সকল বেদবেদাঙ্গ প্রচলিত দেখা যায়; উহাদের সম্যক আলোচনা করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যাহা নির্দ্দেশ করিতেছেন, তাহাই যে অভ্রান্ত ও চিরদিন সত্য জ্ঞানে পূজিত হইবে, এমন বিশ্বাস আমরা কদাচ করিতে পারি না। নূতন নূতন আবিষ্কারের সঙ্গে এবং নূতন নূতন সত্য সংগ্রহের সঙ্গে তাঁহাদের অনেক মতা-মত কালে খণ্ডিত ও পরিবর্ত্তিত হইবে। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত, বৈদিক ধর্ম্ম উন্নত জড়োপাসনামাত্র। আর্য্যজাতি আদিম অবস্থায়

আধুনিক অসভ্য জাতির ন্যায় জড়োপাসক ছিল; সেজন্য উহারা জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ মেঘ, সূর্য্য, চন্দ্র; নক্ষত্র, পৃথিবী প্রভৃতি প্রত্যেক নৈসর্গিক দৃশ্যে এক এক দেবতা কল্পনা করতঃ তাহাদের পরিতোষের জন্য প্রথমে স্তবাদি পাঠ, পরে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতে শিক্ষা করিয়াছিল। তাঁহাদের এই মতটী কতদূর যুক্তিসঙ্গত, তাহা পরে বিবেচনা করিব। এখন তাঁহাদেরই মত অনুসরণ করিতেছি।

যৎকালে সমগ্র আর্য্যজাতি উহাদের আদিম নিবাসস্থলে বাস করিত, তৎকালে উহারা বরুণ, দৌষ্পিতৃ, মাতঃপৃথিবী, বায়ু প্রভৃতি কতকগুলি দেবতার উপাসক ছিল এবং দেবোদ্দেশে সরল স্তোত্রাদি পাঠ করিয়া নিজ মনকে প্রবোধ দিত। তৎকালে আর্য্যসমাজে যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত হয় নাই। এই অবস্থাই আধুনিক হিন্দুধর্ম্মের আদিম অবস্থা। বরুণ সর্ব্বপ্রধান দেবতা বলিয়া ইহাই ইহার বরুণ যুগ।

যখন আর্য্যজাতি ভারতের উত্তর খণ্ডে উপনিবেশ স্থাপন করিতে থাকে, উহারা কয়েক শতাব্দী স্বজাতীয় ইরানীদিগের সহিত ঘনিষ্ঠ সখ্যভাবে আবদ্ধ ছিল, এমন কি উভয় জাতির জাতীয় উন্নতি প্রথমে পরস্পরের সম্মিলনে ও সাহায্যে সংঘটিত হইয়াছিল। এই সময়ে আর্য্যবংশোদ্ভূত রাজন্যবর্গ পাঞ্জাব, সিন্ধু, গান্ধার (কান্দাহার), বাহ্লিক, নাদ (media) প্রভৃতি কয়েক দেশে রাজত্ব করিতেন। ভিন্ন ভিন্ন দেশে থাকিয়াও এই উভয় জাতির এত ঘনিষ্ঠ সংস্রব ছিল যে, এখন বৈদিক ভাষায় ও পারস্যদেশের প্রাচীন আবস্তিক ভাষায় অনেক সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। এই সময়ে উভয় জাতির ভিতর দেবোদ্দেশে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত হয় এবং উভয় জাতির ভিতর যজ্ঞাদির অনুষ্ঠাতা ব্রাহ্মণ ও মেজাই (magii) পুরোহিতবর্গ কালক্রমে কুলপরম্পরাগত বিশিষ্ট জাতিতে পরিণত হয়।

এস্থলে সকলের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, যখন সমগ্র পারস্যদেশ অষ্টম শতাব্দীতে মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হয়, তৎকালে খোরাসানের মুষ্টিমেয় পারসীক নিজ ধর্ম্মগ্রন্থ লইয়া ভারতে আশ্রয় লয় বলিয়া আজ আবস্ত ভাষা পাঠ করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বৈদিকধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক তথ্য আবিষ্কার করিতেছেন। সেইরূপ যদি ধর্ম্মান্ধ মুসলমানেরা নানাদেশের পূর্ব্বতন রাশি রাশি ধর্ম্মগ্রন্থ দগ্ধ করিয়া না ফেলিত, আজ প্রাচীনকাল সম্বন্ধে অনেক ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কৃত হইত এবং আমাদের পুরাণোক্ত পূর্ব্বতন যুগের অনেক ঘটনা সত্য বলিয়া সপ্রমাণিত হইত।

ভারতের আর্য্যজাতি ও পারসীকদিগের ভিতর একপ্রকার দেবোপাসনাপদ্ধতি প্রচলিত ছিল এবং সমসংখ্যক তেত্রিশটী দেবতা পূজিত হইত। তৎকালে আর্য্যদিগের ভিতর যেমন বরুণদেব, পারসীকদিগের ভিতর অহুরমজ্দ সর্ব্বপ্রধান দেবতা ছিলেন। প্রথমোক্তদিগের মিত্র, বায়ু, সোম, অরমতি অর্য্যমান, নরাশংস, শেষোক্তদিগের মিথ্র, বয়ু, হোম, অরমইতি অইর্য্যমানঃ, নরয়োশঙ্ঘ বলিয়া বিবেচিত হয়। বৈদিক জ্যোতিষ্টোম, যজ্ঞ, মন্ত্র, যম, ভগ, বৃত্রহন শব্দগুলি আবস্তিক ইয়েযনে যশ্ন, মন্থ্র, যিম, বগ, বেরেথেঘ্ন বলিয়া বিবেচিত হয়। এখনও উভয়জাতির পুরোহিতবর্গ যজ্ঞোপবীত ধারণ করে, পবিত্রতার জন্য গোময় ব্যবহার করে এবং বিবাহাদি সংস্কারে প্রায় একরূপ অনুষ্ঠান অবলম্বন করে।

প্রথমে ইরানিসমাজে অগ্ন্যুপাসনা প্রবর্ত্তিত হয়। তদ্দৃষ্টে অঙ্গিরস ঋষি আর্য্যসমাজেও অগ্নিদেবের পূজা প্রবর্ত্তিত করেন এবং তদ্বংশজাত ঋষিগণ ঐ দেবের উপাসনা বহুবিস্তৃত করিবার মানসে অথর্ব্ববেদীয় মন্ত্রগুলি আবস্তিক ভিন্দিদাদ অনুসারে রচিত করিয়া যান। উত্তরকালে যখন ঐ সকল মন্ত্র অথর্ব্ববেদে সঙ্কলিত হইয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়, তখন ঐ বেদ ম্লেচ্ছপ্রকটিত বলিয়া হিন্দু

সমাজে প্রসিদ্ধ হইল এবং অপর তিন বেদের ন্যায় তাদৃশ প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে নাই।

অতঃপর কৃষিপ্রধান ভারতে আর্য্যজাতি কালক্রমে বহুবিস্তৃত হইলে অনেকে কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করে এবং সেই সঙ্গে আর্য্য সমাজে বারিবর্ষণকারী ইন্দ্রদেবের পূজা ও যজ্ঞানুষ্ঠান বহুপ্রচারিত হইতে থাকে। এদিকে পারসিকদিগের ভিতর জরথুস জাতীয় ধর্ম্ম সংশোধন করত অগ্নিদেবের উপাসনা বহুবিস্তৃত করেন। অগ্নি প্রধান পূজ্য দেবতা বলিয়া অগ্নিসংযোগে অপবিত্র মৃতদেহের সৎকার রহিত হইয়া গেল। মঘোবা সম্প্রদায় ক্রমে ক্রমে সোম যাগানুষ্ঠানে ও সোমরস পানে নিবৃত্ত হইলেন। এইরূপ নানাকারণে উভয়জাতির ভিতর ধর্ম্মসংক্রান্ত ঘোরতর বিবাদ বিসম্বাদ আরম্ভ হইল। এই ধর্ম্মসংক্রান্ত বিরোধই উভয় জাতির চিরবিচ্ছেদের মূলীভূত কারণ।

এ কারণ উভয়জাতিই নিজ নিজ ধর্ম্মশাস্ত্রে পরস্পর পরস্পরের দেবদেবীর ভূয়সী নিন্দা করিয়া যান। তাহার সাক্ষ্য, সংস্কৃত ভাষার দেবশব্দ অবস্তায় দৈত্যপ্রতিপাদক। অবস্তার দেব শব্দ (অহুর) সংস্কৃতে দৈত্যপ্রতিপাদক। আর্য্যদিগের পূজ্য দেবতা ইন্দ্র, শর্ব্ব, নাশত্য পারসীকদিগের দৈত্যবিশেষ।

পারসিকদিগের সহিত বিরোধ ঘটিবার পর আর্য্যজাতি পাঞ্জাবের অন্তঃপাতী সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রদেশে আপনাদের বৈদিক ধর্ম্ম নির্ব্বিবাদে প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। এজন্য সরস্বতী তটে নৈমিষারণ্য চিরকালই হিন্দুদিগের ভিতর এক প্রধান ধর্ম্মক্ষেত্র। বৈদিক যুগে অগ্নি, সূর্য্য ও ইন্দ্র আর্য্যধর্ম্মের ত্রিমূর্ত্তি এবং উহাদের উদ্দেশেই অধিকাংশ বৈদিক মন্ত্র বিরচিত হইয়াছে। তৎকালে আর্য্যসমাজস্থ লোকেরা ধনপুত্রকামনায় ও

শক্রুদমনেচ্ছায় পূজ্যদেবতাদিগের উদ্দেশে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করাইত।

চতুর্ব্বেদের মধ্যে ঋক্‌বেদ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং ইহার মন্ত্র গুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সংগৃহীত হয়। ইহার দশম মণ্ডল সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক।

মণ্ডল			কোন্ ঋষি দ্বারা রচিত।
দ্বিতীয় মণ্ডল	...	...	গৃৎসামদ।
৩য় মণ্ডল	...	...	বিশ্বামিত্র।
৪র্থ "	...	...	বামদেব।
৫ম "	...	...	অত্রী।
৬ষ্ঠ "	...	...	ভরদ্বাজ।
৭ম "	...	...	বশিষ্ঠ।
৮ম "	...	...	কনব।
৯ম "	...	...	অঙ্গীরস।

বৈদিকযুগের প্রথম অবস্থায় যখন আর্য্যসমাজে যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত হয় নাই, তৎকালে গৃহস্থগণ দেবোদ্দেশে সরল স্তোত্র পাঠ করিতেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে তাঁহারাই মহর্ষি। তাঁহারা যেমন একদিকে হলচালনাদি গৃহস্থের নানাকার্য্যে রত ছিলেন, তেমনি অপর দিকে সময়ে সময়ে প্রতিবেশী অনার্য্যজাতির সহিত তুমুল সংগ্রামে লিপ্ত হইয়া অসি চালনাও করিতেন। আবার তাঁহারাই নিজে স্তবস্তোত্রাদি রচনা করিয়া দেবোদ্দেশে আবৃত্তি করিতেন। যেমন সমাজের আদিম অবস্থায় প্রত্যেক লোককে জুতা সেলাই হইতে চণ্ডী পাঠ পর্য্যন্ত সমস্ত কাজ করিতে হয়, সেইরূপ আর্য্যসমাজেও তৎকালে প্রত্যেক লোক কৃষক, যোদ্ধা ও পুরোহিতের কাজ করিত। এবংবিধ লোককে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মহর্ষি জ্ঞান করিতেছেন।

এই সকল তথা-কথিত মহর্ষিগণের স্তবস্তোত্রাদি উত্তরকালে ঋকবেদসংহিতায় মন্ত্ররূপে সংগৃহীত হয়। এই সকল মন্ত্র বহুকাল আর্য্যসমাজে শিষ্যানুক্রমে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে শ্রুতিপরম্পরায় প্রচলিত ছিল। জাতীয় ত্রেতাযুগে আর্য্যজাতির ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যখন যাগযজ্ঞাদি বহু প্রচলিত হইতে থাকে, তখন বংশবিশেষ সিদ্ধিপ্রদ উৎকৃষ্ট মন্ত্রের অধিকারী হওয়াতে সমাজবিশেষে প্রতিপত্তি লাভ করে। তৎকালে এই সকল মন্ত্র ব্রহ্ম নামে কথিত হইত এবং যাঁহারা ঐ সকল মন্ত্র ব্যবহার করিতেন, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ উপাধি পাইতেন। এই প্রকারে জাতীয় ত্রেতাযুগে যাগযজ্ঞের বহু প্রচলনের সঙ্গে কুলপরম্পরাগত ব্রাহ্মণজাতি আর্য্যসমাজে উত্থিত হয়। তাঁহাদের দেখাদেখি, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন জাতিও সমাজে গঠিত হইতে থাকে।

কালক্রমে যজ্ঞানুষ্ঠাতা ব্রাহ্মণগণ অনুষ্ঠানের সৌকর্য্যার্থে আপনাদিগকে হোতা, উদ্গাতা, অধ্বর্য্য, দ্বারপালাদি নানাশ্রেণিতে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক যজ্ঞকে বহুব্যাপারবিশিষ্ট করিয়া সমাজে স্বীয় প্রভুত্ব বদ্ধমূল করিতে লাগিলেন। হোতাদিগের জন্য ঋকবেদসংহিতা, উদ্গাতাদিগের জন্য সামবেদ এবং অধ্বর্য্যদিগের জন্য যজুর্ব্বেদ সঙ্কলিত হইয়াছে।

জাতীয় ত্রেতাযুগে সংহিতাগুলি সংগৃহীত হইতেছিল এবং জাতীয় দ্বাপরযুগে উহারা লিপিবদ্ধ হইয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছিল এবং উহাদের ভাষ্যস্বরূপ ব্রাহ্মণভাগও বিরচিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণগুলির শেষভাগ আরণ্যক নামে প্রসিদ্ধ এবং উপনিষদ আরণ্যকের অন্তর্গত।

ঋকবেদের—দুই ব্রাহ্মণ—আত্রেয়ী ও কুশীতক।
সামবেদের—দুই ব্রাহ্মণ—তাণ্ড্য ও ছন্দোগ্য।
কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ—এক „ তৈত্রেয়ী।
শ্বেত যজুর্ব্বেদ—এক „ শতপথ।
অথর্ব্ববেদ—এক „ গোপথ।

ঋকবেদের অত্রেয়ী ও কুশিতক আরণ্যক, কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের অত্রেয়ী আরণ্যক। সামবেদ ও অথর্ব্ববেদের আরণ্যক নাই।

উপনিষদ গুলি—

ঋকবেদের—অত্রেয়ী ও কুশিতক।

সামবেদের—ছন্দোগ্য ও তলবাকার।

শুক্ল যজুর্ব্বেদের—বাজসনেহি ও বৃহৎ আরণ্যক।

কৃষ্ণ যজুর্বেদের—তৈত্রেয়ী, কঠ, শ্বেতাশ্বতর।

অথর্ব্ব বেদের—মুণ্ডুক, প্রশ্ন, মাণ্ডুক্য।

যৎকালে পারসীকদিগের সহিত আর্য্যজাতির বিরোধ উপস্থিত হয়, সেই সময় হইতে ঋকবেদের দশম মণ্ডল ও যজুর্ব্বেদের শত-পথ ব্রাহ্মণ রচিত হওয়া পর্য্যন্ত এই কালকে হিন্দুধর্ম্মে ইন্দ্রযুগ বলা উচিত, কারণ এই সময়ে আর্য্যসমাজে ইন্দ্রদেব সর্ব্বপ্রধান দেবতা বলিয়া পুজিত হন ও ত্রিদশাধিপতি হন। তদবধি তিনি চিরদিন শাস্ত্রে দেবরাজ বলিয়া উক্ত হইতেছেন। স্মার্ত্তধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের পর তাঁহার পদমর্য্যাদা হিন্দুসমাজে ক্রমশঃ লাঘব হইতে থাকে। পৌরাণিক যুগে তিনি নিকৃষ্ট দেবগণের মধ্যে পরিগণিত হন এবং অসুরেরা তাঁহার ইন্দ্রত্ব অনেক বার কাড়িয়া লয়। আকাশে রাত্রি-কালে অসংখ্য তারার উদয় হয়; এজন্য পৌরাণিক যুগে আকাশরূপী ইন্দ্র, গুরুপত্নী অহল্যাকে হরণ করাতে গুরুদেবের অভিসম্পাতে সহস্রাক্ষ হইলেন। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমবাসী ছাত্রগণকে গুরুপত্নী হরণ করিতে নিষেধ করিবার জন্যই ঐরূপ বীভৎস ঘটনা ইন্দ্রসম্বন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাতে ছাত্রগণকে যতদূরসম্ভব সাবধান করা হইল, অথচ ইন্দ্রদেবেরও যৎপরোনাস্তি অপমান করা হইল।

বৈদিক যুগ সার্দ্ধদ্বিসহস্র বৎসর ব্যাপিয়া আর্য্যসমাজে প্রচলিত ছিল। এই সময়ে পুরাণোক্ত শিব রুদ্ররূপী পবনদেব, বিষ্ণু আদিত্য

বিশেষ ও গায়ত্রী সূর্য্যদেবের স্তব মাত্র। এই সময়ে ধনবান গৃহস্থেরা সমারোহে বিবিধ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করাইতেন এবং রাজন্যবর্গও অশ্বমেধাদি মহৎ যজ্ঞ মহাসমারোহে সম্পাদন করাইতেন। এই সকল ধর্ম্মানুষ্ঠানে ব্রাহ্মণজাতি চিরদিন সমাজের অধিনায়ক। এ স্থলে আমাদের শিক্ষিত বান্ধবগণ স্বার্থপরতার জন্য ব্রাহ্মণজাতিকে দোষ দিবেন। সেই পুরাকালেও আপনাদের ক্ষমতা ও আধিপত্য সম্পূর্ণ বজায় রাখিবার জন্য তাঁহারা প্রত্যেক যজ্ঞকে বহুব্যাপারবিশিষ্ট করিয়া জটিল হইতে জটিলতর করিতে সাধ্যমত চেষ্টা পান। স্বার্থপরতার বশীভূত হইয়াই তাঁহারা চিরদিন ধর্ম্মগ্রন্থগুলি প্রাকৃত ভাষায় না লিখিয়া দুর্বোধ্য সংস্কৃত ভাষায় লিখিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের স্বার্থপরতার সীমা নাই বলিলেই হয়। যে শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধধর্ম্ম সহস্র বৎসর সগৌরবে ভারতে প্রচলিত ছিল, যে ধর্ম্ম অর্দ্ধ ভূমণ্ডলে ভারতীয় সভ্যতাজ্যোতি বিকীর্ণ করিয়াছিল, সে ধর্ম্ম কেবলমাত্র বেদ ও জাতিভেদের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয় বলিয়া ব্রাহ্মণজাতি দ্বারা এ দেশ হইতে বিতাড়িত হইয়াছে।

এই প্রকারে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বৈদিক ধর্ম্মসম্বন্ধে নানা অপরূপ সিদ্ধান্ত করিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা ঋকবেদের প্রাচীনতম সূক্ত গুলিতে এক ব্রহ্মের পূর্ণ নিদর্শন পাইয়া বলেন—

Arya Rishis in Reg Veda passed from Nature upto Nature's God.

R. C. Dutt.

"ঋকবেদে আর্য্যঋষিগণ প্রকৃতি হইতে প্রকৃতির ঈশ্বরকে বুঝিতে পারেন।"

এখন জিজ্ঞাস্য, বৈদিক ধর্ম্ম কি উন্নত জড়োপাসনা মাত্র? আর আর্য্য ঋষিগণ কি মূর্খ কৃষকযোদ্ধা? উহারা কি অসভ্যযুগের অসভ্য মানবের ন্যায় ভয়াবহ প্রাকৃতিক দৃশ্যপটল দর্শনে ভীত ও চকিত

হইয়া ঐ সকল দৃশ্যে দেবতা কল্পনা করত তাঁহাদের পরিতোষের জন্য স্তব-স্তুতি পাঠ করিয়া আপনাদের দুর্ব্বল মনকে সান্তনা করিত? পরে স্বার্থপর ব্রাহ্মণঠাকুরেরা আর্য্যসমাজে আপনাদের প্রভুত্ব স্থাপনার্থ সকলকে যজ্ঞানুষ্ঠান শিক্ষা দিয়া প্রভূত অর্থরাশি কি অনর্থক ব্যয় করিত? অহো! আমাদের প্রপিতামহ মহর্ষিগণের কি দুর্বুদ্ধি? তাঁহারা কি নিজের বুদ্ধির দোষে নিজের অজ্ঞানতা বশতঃ লক্ষ লক্ষ মণ বিশুদ্ধ গব্যঘৃত অগ্নিতে আহুতি দিয়া ও যজ্ঞস্থলে আর্য্যকৃষককুলের সামান্য স্তুতি সপ্তস্বরে গান করিয়া সকলকে কেবল ব্যামোহিত করিত? আর কোথায় হে মহামহোপাধ্যায় পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ! আপনারা এই সকল ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কার করাতে আমাদের প্রকৃত ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

এখন তাঁহাদের মত ছাড়িয়া দিয়া বৈদিক ধর্ম্মকে একবার হিন্দুর নয়নে দেখা উচিত। যিনি প্রকৃত হিন্দু, তিনি মনে করেন, চতুর্ব্বেদ ব্রহ্মার শব্দ-ব্রহ্মের রূপ মাত্র এবং ইহারা তাঁহারই চতুর্ম্মুখ হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছে। তাঁহার মানস পুত্র বশিষ্টাদি মহর্ষিগণ ইহার মণ্ডলগুলি জগতে প্রকাশ করিয়াছেন। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে সত্য, ত্রেতা দ্বাপর ও কলি এই চতুর্যুগ ব্যাপিয়া বেদ জগতে প্রচলিত আছে। কলিযুগে মানবের আধ্যাত্মিক অধঃপতন বশতঃ প্রকৃত বেদ (ব্রহ্মবিদ্যা বা অধ্যাত্মবিজ্ঞান) জগতে ঈষৎ প্রকাশিত এবং বেদের মন্ত্রশক্তি লুপ্তপ্রায়।

হিন্দুর নিকট বেদ চিরপবিত্র, স্ত্রীশূদ্রের ইহাতে আদৌ অধিকার নাই। তিনি ইহার অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করেন না। তিনি জানেন, ইহার অর্থ দুই প্রকার, বাহ্যিক ও গূঢ়। সচরাচর লোকে ইহার যে অর্থ করে, তাহা ত বাহ্যিক অর্থ, কেবল মাত্র মহাত্মা ও মহর্ষিগণ ইহার গূঢ় অর্থ বুঝিতে পারেন। সয়নাচার্য্য যাঁহার টীকা ও টীপ্পনী দেখিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বেদ অধ্যয়ন করেন ও ইহার

উপর বিবিধ সামলোচনা করেন, তিনি কি ইহার গূঢ় অর্থ বুঝিয়াছিলেন? যাহা হউক, বাহ্যিক অর্থ দেখিয়া বেদের উপর সমালোচনা করা অনেক সময় বিড়ম্বনা মাত্র। ইহাতে ইহার যথার্থ অর্থপ্রকাশ পায় না।

জগতের প্রাচীন গ্রন্থমাত্রেই দুর্ব্বোধ্য। দেখ, সেদিনকার খৃষ্টধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেলের অর্থ কত জায়গায় গূঢ় ও দুরূহ। মহাত্মারাই সে অর্থ ভালরূপ বুঝিতে পারেন। গীতার অর্থ অনেক স্থলে অতীব গূঢ় ও দুরূহ। তবে কে-জানে-কোন্-সময়ের অতি প্রাচীনকালের বেদের অর্থ একমাত্র সয়নাচার্য্যের টীকা দেখিয়া কিপ্রকারে সম্যক বোধগম্য হইবে? যেস্থলে পণ্ডিতগণ প্রাচীন গ্রন্থ বুঝিতে না পারেন, তাঁহারা উহার মনোভিমত অর্থ করিয়া লন। ঋকবেদের এইরূপ নানা স্থলে মনোভিমত অর্থ করিয়াই ত পণ্ডিতেরা বৈদিক ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানা অপরূপ মতামত প্রচার করিতেছেন। দেখ, একবিংশ শতাব্দীতে বেদ সম্বন্ধে আবার কিরূপ অপূর্ব্ব মতামত প্রকাশ হইয়া পড়ে।

তাঁহাদের মুখে তিনটী অপরূপ কথা শুনিতে পাই।

(১) বৈদিক সময়ে আর্য্যজাতি সুসভ্য, অথচ জড়োপাসক; আবার তাঁহারা জড়জগৎ অন্বেষণ করিতে করিতে একেশ্বরও বুঝিতে পারেন।

(২) যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান উন্নত জড়োপাসনার পরিচায়ক।

(৩) আর্য্য ঋষিগণ সাধারণতঃ কৃষকযোদ্ধা এবং ঋকবেদের মন্ত্রগুলি আর্য্য কৃষককুলের সরল গীত মাত্র। এই সকল কথা শুনিলে হিন্দুমাত্রেরই হাস্যোদ্রেক হইয়া থাকে। তিনি ভাবেন, হনুমানহস্তে জানকীপ্রদত্ত মুক্তমালা যেরূপ সমাদৃত হইয়াছিল, পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের হস্তে আমাদের চতুর্ব্বেদও সেইরূপ সমাদৃত

হইতেছে। দেখ, হীরকখণ্ডও মেষশৃঙ্গে পতিত হইলে চূর্ণ হইয়া যায়। "পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে টুটে হীরার ধার।"

এখন তাঁহাদের প্রত্যেক কথা খণ্ডন করা আবশ্যক। কতকগুলি কুসংস্কার তাঁহাদের মনে বদ্ধমূল বলিয়া তাঁহারা ঐরূপ অপরূপ সিদ্ধান্ত করিতেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল যে, গ্রীশ ও রোমের পূর্ব্বে জগতের কোন জাতি সভ্যতা সোপানে আরূঢ় হয় নাই। এখন তাঁহাদের বিশ্বাস, গ্রীশ ও রোমের পূর্ব্বে মিসর, আসিরিয়া, ব্যাবিলন, ভারত ও চীন সভ্যতা লাভ করে এবং উহাদের পূর্ব্বে সমগ্র জগৎ এতকাল ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। পূর্ব্বতন যুগের সভ্যতার কোনরূপ নিদর্শন না পাইয়াই তাঁহারা ঐরূপ সিদ্ধান্ত করিতেছেন। কিন্তু আর্য্যজাতির পূর্ব্বে জগতে কোন্ জাতি সভ্যতা লাভ করিয়া অদ্ভুত লীলা দেখায়, তাহা কালে আবিষ্কৃত হইবে। তাঁহাদের মনে আর একটী কুসংস্কার এই যে, আজ জাতিবিশেষ যেরূপ সুসভ্য, এরূপ সভ্যতা কস্মিন কালে জগতের কোন জাতি লাভ করিতে পারে নাই; আর প্রাচীনকালের অতি বর্ব্বর অবস্থা হইতে মানব ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া আসিতেছে। যদি হিন্দুশাস্ত্র সত্য হয়, তাঁহাদের এ সকল কথা কালে খণ্ডিত হইবে।

এখন জগতে যে সকল জাতি অসভ্য, উহারাই জড়োপাসক। উহারা জড়জগতের নানা বস্তুতে দেবতা কল্পনা করত তাঁহাদের পরিতোষের জন্য মন্ত্রাদি পাঠ করে। অতএব যে আর্য্যজাতি অন্যান্য বিষয়ে সুসভ্য হইলেও জড়জগতের নানা দৃশ্যপটলে দেবতা কল্পনা করতঃ তাঁহাদের পরিতোষের জন্য মন্ত্রাদি পাঠ করিত, উহারাও জড়োপাসক। যে আর্য্যজাতি লৌহাস্ত্র ব্যবহার করিত এবং অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া সমুদ্রে যাতায়াত করিত, সে জাতি যে সুসভ্য, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যে জাতি সুসভ্য, সে

জাতি কি প্রকারে জড়োপাসক হইল? যদি জড়োপাসক না হইবে, বৈদিক ধর্ম্মে কোথা হইতে ইন্দ্র, অগ্নি, সূর্য্য, পবন প্রভৃতি দেবতা আসিল?

আজকাল যে সকল জাতি জড়োপাসক, উহাদের মধ্যে ত যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান প্রচলিত নাই। তবে কি প্রকারে বলিব, যজ্ঞানুষ্ঠাতা আর্য্যজাতি জড়োপাসক ছিলেন? উহারা পঞ্চদশ শতাব্দী ব্যাপিয়া যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছে। যে সময় বুদ্ধদেব ভারতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন, সেই সময়টী আর্য্যসভ্যতার চূড়ান্ত সময়। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের পর যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান ক্রমশঃ সমাজে রহিত হইয়া যায়। ইহার পূর্ব্বে সভ্য আর্য্যজাতি যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া জড়োপাসনা করিত, এ কথায় কে বিশ্বাস করিবে?

যথার্থ বলিতে কি, আজকাল পাশ্চাত্য জগতের সভ্য জাতিবর্গ যেমন একেশ্বরবাদী, পুরাকালে প্রাচ্য জগতের সভ্যজাতিবর্গ তেমনি পৌত্তলিক ছিল এবং তৎপূর্ব্বে ভারতের সভ্য আর্য্যজাতি তেমনি যজ্ঞানুষ্ঠাতা ছিলেন; কিন্তু আধুনিক অসভ্যজাতির ন্যায়, কাফরী জাতির ন্যায় উহাদিগকে জড়োপাসক বলিয়া ঘৃণা করিও না। কলিকালে মস্তিষ্কের স্ফূর্ত্তির সহিত মানবের জ্ঞানশক্তি যেভাবে স্ফুরিত হইতেছে, তাহাতে তিনি কালোচিত ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া আসিতেছেন। একেশ্বরবাদ বল, পৌত্তলিকতা বল, যজ্ঞানুষ্ঠান বল, এই তিনপ্রকার ধর্ম্মমতই মানবের উন্নতাবস্থাসূচক। কেবলমাত্র কালভেদে তাঁহার বুদ্ধিশক্তি ও শিক্ষার কিঞ্চিৎ তারতম্যবশতঃ তিনি উপরোক্ত কোন না কোন মার্গ অবলম্বন করিয়া আসিতেছেন; অতএব বৈদিকধর্ম্মনির্দ্দিষ্ট যজ্ঞানুষ্ঠান কোনমতে জড়োপাসনা হইতে পারে না।

বেদের নানাস্থানে যে এক ব্রহ্মের কথা উল্লিখিত আছে, যাহা

দেখিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ স্থির করিতেছেন, কৃষকযোদ্ধা আর্য্য ঋষিগণ বৈদিকসময়ে প্রকৃতিজগৎ অন্বেষণ করিতে করিতে একেশ্বর বুঝিতে পারেন, তাহা কি আধুনিক সুসভ্যজাতিদের অসার একেশ্বর-বাদ, না সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগের মায়াতীত, গুণাতীত পরব্রহ্মের উপাসনার ভগ্নাবশেষ মাত্র? পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে দেবাসুরমহর্ষিগণ যোগাভ্যাস ও তপশ্চরণ দ্বারা যে পরব্রহ্মের উপাসনা করিতেন, সেই পরব্রহ্মের কথাই বেদে উক্ত হইয়াছে। আর আজকাল কলিযুগে মানবের আধ্যাত্মিকপতনবশতঃ যে লৌকিক সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাস সর্ব্বত্র প্রচলিত দেখা যায়, তাহার বিষয় বেদে আদৌ লিখিত হয় নাই।

অনেকে মনে করেন, পরব্রহ্ম ও ঈশ্বর, উভয়ে এক। বস্তুতঃ তাহা নহে। উহাদের ভিতর বিস্তর প্রভেদ (প্রথমভাগের ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও স্বরূপ নামক প্রবন্ধ দেখ)। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই প্রভেদটুকু ভালরূপ বুঝিতে পারেন না বলিয়া বৈদিকধর্ম্ম সম্বন্ধে মহৎভ্রমে পতিত হন এবং সনাতন হিন্দুধর্ম্মের আভ্যন্তর কোথায়, তাহা তাঁহারা নিরূপণ করিতে পারেন না।

আর্য্য ঋষিগণ কি কৃষকযোদ্ধা, একথারও উত্তর দেওয়া আবশ্যক। প্রথমভাগে উল্লেখ করিয়াছি, সত্যযুগে যখন দেবরূপী মনুপুত্রগণ সুমেরু পৃথিবীতে বিচরণ করেন, তৎকালে প্রকৃত বেদ বা অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান দৈববাণীযোগে দেবমণ্ডলীর ভিতর প্রথম প্রকটিত হয়। সৃষ্টির সত্য ত্রেতা দ্বাপরযুগে দেবাসুরগণ সহজাত যোগবলে এই অধ্যাত্মবিজ্ঞানে ব্যুৎপন্ন হইয়া সিদ্ধিলাভ করিতেন। ইহারই জন্য খৃষ্টধর্ম্ম বলে, জ্ঞানবৃক্ষের ফলাস্বাদন করিয়া পতিত হইবার পূর্ব্বে আদিমানব আদাম ও ঈভ ঈডেন উদ্যানে সর্ব্বথা পূতাত্মা ও ধর্ম্মাত্মা ছিলেন। পরে যুগধর্ম্মানুসারে মানবদেহে যেরূপ স্থূলত্বের পরিবর্দ্ধন ও আধ্যাত্মিক অপগমন হইতে থাকে, অধ্যাত্মবিজ্ঞান বা প্রকৃত

বেদ সংসারে লুপ্ত হইয়া মহাত্মামণ্ডলীর ভিতর নিবদ্ধ হইয়া যায়। আর্য্যজাতির মহর্ষিগণ ঐ সকল মহাত্মাদিগের বংশজাত। তাঁহারা পুরাকালের ব্রহ্মবিদ্যা অনুশীলন করিয়া সমস্ত অবগত হইতেন। তাঁহারা যোগবলে অসাধারণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইতেন। তাঁহারাই ত্রিকালজ্ঞ, ত্রিভুবনজ্ঞ, যোগসিদ্ধ মহর্ষি। এই সকল জ্ঞানগরিষ্ঠ মহাত্মাগণ বনের ফলমূল খাইয়া যে জ্ঞানজ্যোতি বিকীর্ণ করিয়াছেন, তাহা এখনও ভারতশ্মশানমাঝে চিতাভস্মে ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে। তাঁহাদিগকে আর্য্যজাতির পরাক্রান্ত কৃষকযোদ্ধা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে।

শাস্ত্রমতে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার চতুর্ম্মুখ হইতে চতুর্ব্বেদ নিঃসৃত হইয়াছে। তাঁহার মানসপুত্র বশিষ্ঠাদি মহর্ষিগণ ঋকবেদের এক এক মণ্ডল ব্রহ্মার মুখ হইতে শ্রবণ করিয়া আর্য্যসমাজে প্রচার করিয়াছেন। মনে কর, শাস্ত্রের এই সকল কথা সর্ব্বৈব কাল্পনিক, তাহাতেই বা কি আসিয়া যায়? হিন্দুধর্ম্মের আদ্যগ্রন্থ চতুর্ব্বেদের প্রাচীনত্ব জ্ঞাপনার্থ শাস্ত্রকারেরা ঐরূপ নির্দ্দেশ করিতেছেন।

যথার্থ বলিতে কি, সংসারে যাহা বেদ বলিয়া খ্যাত, যাহা এখন গলিতে গলিতে ছড়াছড়ি যাইতেছে, যাহা ম্লেচ্ছ পণ্ডিতদিগের হস্তে ক্রমশঃ কলুষিত হইতেছে, তাহা প্রকৃত বেদ বা ব্রহ্মবিদ্যা নহে, তাহা যথার্থ বেদের অপভ্রংশ মাত্র। সমাজনেতা ব্রাহ্মণগণ মহাকালের করাল বদন হইতে কলিযুগে সমাজের প্রয়োজনমত যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানের জন্য যে সকল মন্ত্র রক্ষা করিতে সমর্থ হন, তাহাই এখন বেদ নামে খ্যাত। ইহার শ্রেষ্ঠ অংশগুলি কালে লুপ্ত হইয়াছে বা গোপন করা হইয়াছে। যে বুদ্ধদেব ব্রহ্মবিদ্যায় অসাধারণ পণ্ডিত হইয়া যোগেশ্বর হন, তিনি কেন ব্রাহ্মণদিগের পৃষ্ঠপোষিত এই বেদের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইলেন? যদি ইহা প্রাচীনকালের যথার্থ বেদ বা ব্রহ্মবিদ্যা হইত, তিনি কদাচ ইহার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইতেন

না। সেইরূপ এখন যাহা উপনিষদ নামে খ্যাত, তাহাও প্রকৃত উপনিষদ নহে, পুরাকালীন উপনিষদের অপভ্রংশ মাত্র। ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধধর্ম্ম খণ্ডন করিবার জন্য শাস্ত্রে যাহা লেখা আবশ্যক বোধ করিয়াছিলেন, তাহাই এখন উপনিষদে দেখা যাইতেছে। (ব্ল্যাভাস্কির মত)

ঋকবেদ ইন্দ্রাদি দেবতাদিগেব উদ্দেশে বিবিধ স্তবস্তুতিতে পরিপূর্ণ। এই সকল স্তোত্র কি সরল আর্য্যকৃষককুলের ভীতি-সংবলিত গীত মাত্র? উহারা কি হলচালনাকালে ঐ সকল সরল সঙ্গীত গান করিতে করিতে আপনাদের পরিশ্রমের লাঘব করিত? এই সকল সঙ্গীত শ্রুতিপরম্পরায় আর্য্যসমাজে বহুকাল চালিত হওয়ায় উত্তর কালে কি স্বার্থপর ব্রাহ্মণঠাকুরেরা আপনাদের উদারান্ন সংস্থানের জন্য যজ্ঞস্থলে বিবিধ দ্রব্যের আয়োজন করতঃ ইহাদিগকে মন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করিয়া সপ্তস্বরে গান করিতে করিতে সকলকে কেবল ব্যামোহিত করিতেন? আজকাল যেমন ওঝারা সাপের বিষ নামাইবার সময় বা ভূত ঝাড়াইবার সময় হাতমুখ নাড়িতে নাড়িতে ও নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গি করিতে করিতে মন্ত্র আওড়ায় ও মূর্খ লোকদিগকে প্রতারণা করে, সেইরূপ পুরাকালে কি ব্রাহ্মণঠাকুরেরা বিবিধ অঙ্গভঙ্গির সহিত বেদমন্ত্র সপ্তস্বরে গাহিতে গাহিতে সকলকে প্রতারিত করিত? প্রাচীন কালে আর্য্য কৃষককুল অগ্নির প্রচণ্ড তেজ, ঝটিকা বজ্রনাদ প্রভৃতি অসাধারণ নৈসর্গিক দৃশ্যপটল দর্শনে ভয়ে ও বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া উহাদিগকে দেবতা জ্ঞান করত পরিতোষের জন্য কি বিবিধ স্তবস্তুতি পাঠ করিত? মূর্খ বর্ব্বর জড়োপাসক যেমন আকাশের মেঘগর্জ্জনশ্রবণে ভীত হইয়া গিরিগুহায় প্রবেশ করে, পুরাকালে আর্য্যকৃষকেরা কি সেইরূপ মেঘগর্জ্জন শ্রবণে ভীত হইয়া ঐ সকল স্তবস্তুতি আওড়াইত? পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বৈদিক ধর্ম্ম সম্বন্ধে যাহাই বলুন না কেন, আমরা তাঁহাদের অনেক কথা আদৌ গ্রাহ্য করিতে পারি না।

তাঁহারা ঋকবেদ পাঠে সিদ্ধান্ত করেন, যে সময়ে আর্য্যজাতির ভিতর বরুণ সর্ব্বপ্রধান দেবতা বলিয়া পরিগণিত, সেই সময়ের মতামত হিন্দুধর্ম্মের আগুন্তর। তাঁহাদের একথাও আমরা আদৌ গ্রাহ্য করিতে পারি না। সমগ্র হিন্দুশাস্ত্র মন্থন করিয়া আমাদের ধ্রুববিশ্বাস জন্মে, সৃষ্টির সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগে দেবরূপী ও দৈত্যাসুররূপী মনুপুত্রগণের ভিতর যে নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা, যোগাভ্যাস ও তপশ্চরণ প্রচলিত ছিল, তাহাই সনাতন হিন্দুধর্ম্মের আগুন্তর। যিনি যাহাই বলুন, ইহাই জগতের অমোঘ সত্য।

বেশ জানিবে, হিন্দুধর্ম্মের আগুন্তর যোগেশ্বরপ্রকটিত। আর যাঁহারা মনে করেন, ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান কেবল বেদান্ত ও উপনিষদ লিখিবার সময় আর্য্যসমাজে প্রথম উদ্ভাবিত হয় এবং পাতঞ্জলির যোগসূত্র প্রণয়ণের সময় যোগাভ্যাসক্রিয়া সমাজে প্রথম আরম্ভ হয়, তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের বিন্দুবিসর্গ বুঝেন নাই। এ ধর্ম্মের আগুন্তর যোগেশ্বরপ্রকটিত বলিয়াই ইহার আগুগ্রন্থ ঋকবেদেও পরব্রহ্মের কথা নানা স্থানে উল্লিখিত আছে। আমরা কদাচ স্বীকার করিতে পারি না, যে জড়োপাসক আর্য্যজাতি জড়জগৎ অন্বেষণ করিতে করিতে বহুদিন পরে যুক্তিবলে একেশ্বরজ্ঞান লাভ করে। সেইরূপ এক পারসীকদিগের সহিত আর্য্যজাতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, তাহাও আমরা স্বীকার করিতে পারি না। মিসর, এসিরিয়া ব্যাবিলন, ক্যাণ্ডিয়া প্রভৃতি দেশের সহিত প্রচীন ভারতের কিরূপ সংস্রব ছিল, তাহাও কালে ভালরূপ নির্ণীত হইবে।

এখন বৈদিক ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া কর্ত্তব্য। সাধারণতঃ বেদ দুইভাগে বিভক্ত, জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড। মহর্ষিগণ জ্ঞানকাণ্ডের অনুশীলন করিয়া নিভৃতে যোগাভ্যাস ও পরব্রহ্মের উপাসনা করিতেন। জনসাধারণ কর্ম্মকাণ্ডানুসারে বিবিধ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া পুণ্যোপার্জ্জন করিত। সমাজের অধিনায়ক ব্রাহ্মণ-

গণ যজ্ঞের বেদিনির্ম্মাণ, দ্রব্যাদির ব্যবস্থাপত্র, মন্ত্রাদিপাঠ, হোম প্রভৃতি নানা কর্ম্ম সম্পাদন করিতেন।

বৈদিক সময়ে আর্য্যসমাজের যজ্ঞানুষ্ঠান একটী বিরাট ব্যাপার ছিল। আজকালের বৃষোৎসর্গ ও দুর্গোৎসবের ন্যায় ইহাও কালোচিত মহানন্দদায়ক ব্যাপার ছিল। আমরা পরাধীন ভারতমাতার অধমাধম সন্তান হইয়া স্বাধীন ভারতের সেই সুমনোহর দৃশ্য এখন কল্পনায় আনিতে পারি না। ইহার সমারোহ, উৎসব, আড়ম্বর, অর্থরাশিব্যয় ও ভোজনব্যাপার সকলই এ জগতে অতুলনীয় ছিল। একদিকে জ্ঞানগরিষ্ঠ পলিতকেশ মহর্ষিগণের সমাগম, অপরদিকে নিমন্ত্রিত দর্শকবৃন্দের কোলাহল, একদিকে অগ্নিতে আহুতিপ্রদান, সামবেদগান, যজুর্ব্বেদের মন্ত্রপাঠ, বলিদান ও বাদ্যধ্বনি, অপরদিকে ভোজনকালে দীয়তাম, ভুজ্যতাম শব্দে দিকমণ্ডল মুখরিত, সকলই এ জগতে মনোরম ও রমণীয়। এ দৃশ্য দেখিলে কাহার না মন আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিবে? বলি, অসভ্য আর্য্যসন্তানগণ এ সকল ব্যয়ভূষণ কি অনর্থক করিতেন? তাঁহাদের আর কোন কাজ ছিল না বলিয়াই কি তাঁহাবা ব্রাহ্মণদের পাদপদ্মে এই অর্থরাশি ঢালিতেন? যদি ভালরূপ বিবেচনা করিয়া দেখ, বেশ বুঝিতে পারিবে, ইহাতে দেশের ও সমাজের নানাদিকে অশেষ মঙ্গল সাধিত হইত।

বৈদিক দেবতাগুলি কিরূপ? কদাচ মনে ভাবিও না, ইহারা অসভ্য মানবের কল্পনা-প্রসূত। দেখ, মায়াতীত, গুণাতীত পরব্রহ্মের চিৎশক্তি এই মায়াময় জড়জগতে সূক্ষ্মজগৎস্থ দেবগণ দ্বারা চিরদিন প্রকটিত। অধ্যাত্মবিজ্ঞানের মতে এই সকল দেবতা যাবতীয় জড়শক্তির মূলদেশে অধিষ্ঠিত হইয়া পরব্রহ্মের আজ্ঞাবহ দাসস্বরূপ একোদ্দেশ্য সাধনের জন্য সুশৃঙ্খলতার সহিত এ জড়জগৎ চালাইতেছেন। আজকাল সুসভ্য দেশের সুসভ্য মানব বিশ্বের যাবতীয় ব্যাপার

একেশ্বরে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন; তিনি পুরাকালের ন্যায় দেবতাদিগের অস্তিত্বে আদৌ বিশ্বাস করেন না বটে; কিন্তু অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান চিরদিন উপদেশ দিতেছে, দেবমণ্ডলী জাগ্রত ও জীবন্ত, উহারা কদাচ মিথ্যা হইতে পারে না। এ কলিযুগে নির্গুণ পরব্রহ্ম আদৌ ভাব্য না হওয়াতে জড়শক্তিনিচয়ের মূলদেশে যে সকল দেবতা অধিষ্ঠিত আছেন, উহাদের স্তবস্তুতি করিলে সেই নির্গুণ পরব্রহ্মের স্তবস্তুতি করা হয়। এখন ঐ সকল দেবতা কিরূপে স্তবনীয় ও পূজনীয় হওয়া উচিত, তাহাই বেদে ভালরূপ দেখান হইয়াছে। এজন্য চতুর্ব্বেদ ইন্দ্রাদি দেবগণের উদ্দেশে নানা স্তবস্তুতিতে পরিপূর্ণ।

বৈদিক মন্ত্রের শক্তি কিরূপ? অনেকেই শাস্ত্রে পাঠ করেন, বৈদিক সময়ে লোকে যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া মন্ত্রশক্তিবলে আপনাদের মনোরথ সিদ্ধ করিতেন। যাঁহার যাহা মনোবাঞ্ছা হইত, এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেই, তাহা যথাসময়ে সিদ্ধ হইত। ইহা কি ব্রাহ্মণদের বুজরুকি? বেদের মাহাত্ম্যবর্দ্ধনার্থ কি তাঁহারা ঐরূপ বলিতেছেন? সংসারে মন্ত্রশক্তি স্বীকার করা উচিত। মন্ত্রশক্তিতে অনেকের অসহ্য বেদনা লাঘব হইতে দেখা যায়। কথার মূল্য অধিক। চক্ষের সমক্ষে দেখিতেছ, আদালতে সামান্য কথার মার পেঁচে ডিগ্রীডিস্‌মিস্ হইতেছে ও আসামী খালাস পাইতেছে বা ফাঁসি যাইতেছে। প্রত্যেক কথার, এমন কি, প্রত্যেক শব্দের শক্তি সূক্ষ্ম জগতে ভালরূপ প্রকাশ পায়। বৈদিক মন্ত্রগুলি সপ্তস্বরে গীত হইলে, উহাদের দ্বারা সূক্ষ্মজগতে নানারূপ ক্রিয়া ঘটিত। ইহাতেই সকলের মনোরথ পূর্ণ হইত।

এস্থলে আমাদের সুশিক্ষিত বান্ধবগণ বলিবেন, যখন সুসভ্য আর্য্যজাতি ভীমপরাক্রমশালী এবং অনার্য্যজাতি অপেক্ষা অধিক সভ্য ও বিদ্যাবুদ্ধিতে অধিক উন্নত এবং বসুন্ধরাও অত্যুর্ব্বরা, সুজলা ও সুফলা, তখন অনেকেরই মনোরথ অনায়াসে সিদ্ধ হইবে, এমন

কি, ধূলার মুঠা ধরিলে তাহা সোণার মুঠা হইবে। তবে কেন মন্ত্রশক্তির এত বড়াই করিতেছ? দৈববল ব্যতীত সংসারে একমাত্র পুরুষকার বলে সকল কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করা যায় না। মনেকর, বৈদিক মন্ত্র আর্য্যজাতিকে দৈববলে বলীয়ান করিত এবং তাঁহাদের মনে সৎসাহস প্রদান করিত। ইহাতেই তাঁহাদের সিদ্ধিলাভ হইত।

আরও শুনিতে পাই, কলিকালে বেদের মন্ত্রশক্তি লুপ্তপ্রায়। মনেকর, ব্রাহ্মণেরা বেদের মাহাত্ম্য বর্দ্ধনার্থ ঐরূপ বলিতেছেন; কিন্তু যখন আমরা দেখিতে পাই, কলিকালে পৃথিবীর উর্ব্বরাশক্তি ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে, মানবের আয়ুর্ব্বল ও শারীরিক বল ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে, তখন বেদের মন্ত্রশক্তি লুপ্তপ্রায়, এ কথায় কেন আমরা অবিশ্বাস করিব?

যজ্ঞানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য কি এবং ইহা দ্বারা কোন্ কোন্ মহোপকার সাধিত হইত?

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেন :—

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষঃ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্।
দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ।
ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ
তৈর্দত্তান্ প্রদায়ৈভ্যো ন যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ।
যজ্ঞাশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ
ভুঞ্জতে স্বয়ং পাপং যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ।
অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো: যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ।
কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবং
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্মনিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতং। (গীতা)

'পুরাকালে যজ্ঞের সহিত বা যজ্ঞদ্রব্যের সহিত প্রজা সৃষ্টি করিয়া প্রজাপতি বলিলেন, ওহে প্রজাগণ! তোমরা যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে করিতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাও এবং এক যজ্ঞই তোমাদের যাবতীয় ইষ্ট ফল প্রদান করিবে। তোমরা যজ্ঞাংশ প্রদান করিয়া দেবতাদিগকে সংবর্দ্ধন কর বা তাঁহাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি দেখাও; তাঁহারাও বারিবর্ষণাদি দ্বারা অন্নোৎপাদন করিয়া তোমাদের অশেষ মঙ্গল করিবেন। এইরূপ পরস্পর পরস্পরের সহিত আদান প্রদান করিলে তোমরা সংসারে পরম শ্রেয় লাভ করিবে। যজ্ঞ দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া দেবতারা ঈপ্সিত ভোগ্য বস্তু সকল দান করত তোমাদিগকে সুখী করিবেন। যে ব্যক্তি দেবদত্ত ভোগ্যবস্তু দেবতাদিগকে নিবেদন না করিয়া ভোগ করে, সে ব্যক্তি সংসার মাঝে অধম তস্কর। যজ্ঞাবশিষ্টভোজী হইলেই সকল পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। যাহারা কেবল আপনাদের জন্য রন্ধন করে, সেই পাপাত্মাগণ কেবল পাপই ভোজন করে অর্থাৎ সেরূপ অন্ন ভোজন করিয়া কেবল পাপের ভাগী হয়। সংসারে অন্ন হইতে প্রাণিগণ, মেঘ হইতে অন্ন, যজ্ঞ হইতে মেঘ, কর্ম্ম হইতে যজ্ঞ উৎপন্ন হইতেছে। (অর্থাৎ) যে স্থলে প্রচুর অন্ন পাওয়া যায়, তথায় লোকসংখ্যা স্বতঃ হু হু শব্দে বৃদ্ধি পায়। যে দেশে নিয়মিত বারি-বর্ষণ হয়, তথায় প্রচুর অন্ন স্বতঃ উৎপন্ন হয়। যে স্থলে যজ্ঞ করা হয়, তথায় নিয়মিত বর্ষণ হইবে। যে দেশে লোকে দেবকর্ম্ম করিতে চাহিবে, তথায় উহারা যজ্ঞ করিতে ব্যগ্র হইবে। দেবকার্য্য গুলি বেদে লিখিত আছে; বেদ স্বয়ং ব্রহ্মার-বচন বা শব্দব্রহ্ম। অতএব সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম নিয়ত যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন। যজ্ঞ করিলেই ভগবানকে ডাকা হইবে এবং তোমরাও সর্ব্বসুখে সুখী হইবে।"

ইহাতে যজ্ঞের মহৎ উদ্দেশ্য ও উপকার ভালরূপবুঝা যাইতেছে। দেশের লোকসংখ্যাবর্দ্ধন ও শ্রীবৃদ্ধিসাধন ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য।

যেমন রাজা প্রজাবর্গের নিকট যৎসামান্য কর আদায় করিয়া উহাদের ধনপ্রাণ বিধিমতে রক্ষা করেন ও দেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করেন; সেইরূপ দেবতারাও লোকের নিকট যজ্ঞাংশ পাইয়া উহাদের গৃহ ধনধান্যে পরিপূর্ণ করেন ও দৈব আপদ বিপদে উহাদিগকে রক্ষা করেন। এ স্থলে আমাদের সুশিক্ষিত বান্ধবগণ বলিবেন, যখন জগৎ নিয়মতন্ত্রের সম্পূর্ণ অধীন এবং কোন প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যত্যয় নাই, তখন কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব, যজ্ঞাংশ পাইলেই দেবতারা আমাদের উপর অধিক প্রসন্ন হইয়া আমাদিগকে নানা বিপদ আপদে রক্ষা করিবেন?

এস্থলে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের কথা ছাড়িয়া দেও। বিজ্ঞান কি অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ভূমিকম্প প্রভৃতি দৈব ঘটনার মূল কারণ নির্ণয় করিতে পারিয়াছে? বিজ্ঞান এ পর্য্যন্ত জানে, এ সকল কেবল অন্ধ জড়শক্তির ক্রিয়ামাত্র; ইহাদের সংঘটনে দৈবশক্তির কোন রূপ অনুশাসন নাই। এ স্থলে বিজ্ঞান ভ্রান্ত, আর বেদ অভ্রান্ত, ইহাই আমাদের মনে করা উচিত। মনে কর, যজ্ঞানুষ্ঠানে সকলকে স্বতঃ প্রোৎসাহিত করিবার জন্য শাস্ত্রকারেরা ঐ রূপ লিখিয়া গিয়াছেন; তথাচ আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, যে সকল দেবতাদের নিকট হইতে আমরা সংসারের যাবতীয় ভোগ্য বস্তু লাভ করি, তাঁহাদের প্রতি আমাদের একান্ত কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। মনের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা দেখাইবার জন্যই দেবতাদিগের উদ্দেশে যজ্ঞাংশ হবি নিবেদন করা হইত।

আরও দেখ, পাঁচ জনকে দিয়া বা পাঁচ জনের সহিত মিলিয়া মিশিয়া যাহা আমরা ভোগ করি, তাহাই আমাদের যথার্থ ভোগ। দশ জনকে খাওয়াইয়া যে অন্ন আমরা ভোজন করি, তাহাই আমাদের যথার্থ ভোজন। এখন যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা সমাজের দশজনকে ভাল রূপ খাওয়ান দেওয়ান যায়। ইহাতে ধর্ম্মের সমাজবন্ধনরূপ

মহৎ উদ্দেশ্য ভালরূপ সংসিদ্ধ হইয়াছে। পাঁচ জনের উপকারার্থ বা পালনার্থ যাহা করা যায়, তাহাতেই সমাজের মঙ্গল। কদাচ মনে করিও না, স্বার্থপর ব্রাহ্মণজাতি আপনাদের উদারান্নসংস্থানের জন্য আর্য্যসমাজে বিবিধ যজ্ঞ প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। সমাজের অশেষ মঙ্গলের জন্যই তাঁহারা এই সকল যাগযজ্ঞ চালাইয়াছিলেন।

এ স্থলে আমাদের সুপরিচিত বান্ধবগণ বলিবেন, এই যে ব্রাহ্মণ-ঠাকুরেরা এতকাল অপর্য্যাপ্ত ঘৃত অগ্নিতে আহুতি দিয়া আসিতেছেন, ইহা কি তাঁহাদের ভস্মে ঘৃত ঢালা হয় নাই? আগুণে ঢালাও যা, ভস্মে ঢালাও তা, জলে ঢালাও তা। কে বিশ্বাস করিবে, ভবিভুর্ক্ অগ্নি কিনা ঘৃত খাইয়া হজম করে? তাঁহাদের কিছু মাত্র বিবেচনা নাই, তাই তাঁহারা এমন করিয়া বহুমূল্য ঘৃতের অপচয় করিয়াছেন। তাঁহাদের ঘটে যদি বুদ্ধি থাকিত, তাঁহারা ঐ ঘৃত বিদেশে রপ্তানি করিয়া বেশ দুপয়সা লাভ করিতেন ও আমোদ আহ্লাদ করিতেন।

অগ্নিতে ঘৃতাহুতির কি ফল? কেন তাঁহারা বিশুদ্ধ গব্যঘৃত অগ্নিতে ঢালিতেন? যোগসিদ্ধ মহর্ষিগণ আর্য্যসমাজে ইহা প্রবর্ত্তন করিয়া যান। তাঁহারাই বুঝিতেন, সূক্ষ্ম জগতে ইহার কিরূপ ফলোদয় হইবে। তুমি আমি কদাচ ইহা বুঝিতে পারিব না।

আরও দেখ, যেমন সূর্য্যদেব পৃথিবী হইতে অপর্য্যাপ্ত বারিবাষ্প শোষণ করিয়া বৃষ্টি দ্বারা উহাকে শস্যশালিনী করেন, সেইরূপ দেবতারা আমাদের নিকট যজ্ঞাংশ পাইয়া আমাদিগকে অপর্য্যাপ্ত ভোগ্যবস্তু প্রদান করিতেছেন। সূর্য্য আমাদের চক্ষের সমক্ষে যাহা করিতেছে, দেবগণ আমাদের চক্ষের অন্তরালে বা অগোচরে তাহাই করিতেছেন। যোগসিদ্ধ মহর্ষিগণ এই সকল কথা ভালরূপ বুঝিয়া আর্য্যসমাজে যাগযজ্ঞ প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন নির্ব্বোধ আমরা তাঁহাদেরই দোষ দিতেছি।

কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যজ্ঞ হইতে কি প্রকারে

মেঘোৎপত্তি হইত? মনে কর বেদের মন্ত্রশক্তি ইন্দ্রদেবকে সুপ্রসন্ন করাইয়া যথাসময়ে মেঘোৎপাদন করিত, একথা আৰ্য্যসমাজের কুসংস্কার মাত্র, তথাচ যখন পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে, ব্যোম-মার্গে ডাইনামাইট দ্বারা প্রভূত ধুম উৎপাদন করিলে, সেই ধুম-রাশি মেঘাকারে পরিণত হইয়া বারিবর্ষণ করে, তখন যে যজ্ঞে প্রচুর পরিমাণে ঘৃত অগ্নিতে আহুত হওয়াতে যথেষ্ট ধুম উৎপন্ন হইত, তাহাতে নিশ্চয়ই বারিবর্ষণের ভালরূপ সুবিধা হইয়াছিল। তবে কেন তোমরা যজ্ঞ হইতে মেঘোৎপত্তিবিষয়ে সন্দেহ করিতেছ?

যাহা হউক, যখন যজ্ঞানুষ্ঠান এতকাল আৰ্য্যসমাজে প্রচলিত ছিল, তখন ইহার দ্বারা ভারত সম্যক উপকৃত হইয়াছে। সমাজের উপকার ব্যতীত কোন অনুষ্ঠান এতকাল (পঞ্চদশ শতাব্দী) ব্যাপিয়া স্থায়ী হইতে পারে না। সত্য বটে, লোকের শিক্ষা দীক্ষা ও ধৰ্ম্ম-ভাব পরিবর্ত্তিত হওয়াতে ইহা কালক্রমে হিন্দুসমাজে রহিত হইয়া গিয়াছে, তথাচ ইহা যে কালোচিত অত্যুন্নত ধৰ্ম্মানুষ্ঠান, সে বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ করা উচিত নয়।

আরও দেখ, যে যজ্ঞের বেদি নির্ম্মাণ হইতে জ্যামিতি ও ত্রিকোণমিতি সংসারে উদ্ভূত, যে যজ্ঞের কাল নির্ণয় হইতে জ্যোতিষ শাস্ত্রের উন্নতি সম্যক সাধিত, যে যজ্ঞের হত পশুর শব-ব্যবচ্ছেদ দ্বারা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের বিশেষ রূপ উন্নতি সাধিত, সে যজ্ঞ কি কদাচ বর্ব্বরসমাজোচিত জড়োপাসনার পরিচায়ক হইতে পারে? যে যজ্ঞ হইতে ঐ সকল উৎকৃষ্ট শাস্ত্রের উন্নতি সাধিত হওয়াতে ভারত ঐ সকল বিষয়ে সমগ্র জগতের আদিগুরু, সে যজ্ঞ কি জড়োপাসনার চিহ্ন? আফ্রিকার কাফরীজাতিবর্গ এতকাল জড়োপাসনা করিয়া আসিতেছে, অথচ উহাদের কোন প্রকার উন্নতি দেখা যায় না। তবে কেমন করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বৈদিক ধৰ্ম্মকে জড়োপাসনা মনে করিতেছেন? অতএব আমরা তাঁহাদের

মত খণ্ডন করিয়া চিরদিন সাহঙ্কারে বলিব, যজ্ঞানুষ্ঠান সমাজের উন্নতাবস্থাসূচক এবং বৈদিক ধর্ম্ম কালোচিত উন্নত ধর্ম্মমত, ইহা কদাচ জড়োপাসনা হইতে পারে না। আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, জ্যোতিষ, ষড়দর্শন, ইতিহাস ও পুরাণ, সকল শাস্ত্রের মূলাধার যে চতুর্ব্বেদ, উহাকে কি জড়োপাসনার গ্রন্থ বলা উচিত?

বৈদিক ধর্ম্মের মহৎ দোষ কি? এ জগতের নিয়ম এই, যাহা অত্যুৎকৃষ্ট, তাহাই আবার অতি নিকৃষ্ট। ইহাতে নিম্নলিখিত দোষগুলি দেখা যায়।

প্রথমতঃ। যে বৈদিক ধর্ম্ম ব্রহ্মোপাসনা ও যোগাভ্যাসের মত মানবধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ উপদেশ দেয়, সেই ধর্ম্মের যাগযজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া জনসাধারণ বিবিধ পশু হত্যা করাতে কালে হিংসাপরায়ণ হইয়া উঠে। ইহাতে উহাদের জিঘাংসাবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া উহাদিগকে নিষ্ঠুর ও নির্ম্মম করিয়া ফেলে। যদি লোকে এতদূর নিষ্ঠুর না হইত, বুদ্ধদেব কেন অহিংসা পরম ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিবেন?

দ্বিতীয়তঃ। যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম্মের সমাজবন্ধন উদ্দেশ্যটী সম্যক সংসিদ্ধ হইলেও উহা দ্বারা সাধারণ লোকের কোনরূপ চরিত্রগত নৈতিক উন্নতিসাধন হয় নাই। যে সামাজিক ও পারিবারিক ধর্ম্মপালন এ জগতে আমাদের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বা প্রধান কর্ত্তব্য, সে ধর্ম্মপালনে বৈদিক ধর্ম্ম কোনরূপ উৎসাহ প্রদান করে নাই বা কোনরূপ উপদেশ বিধিবদ্ধ করে নাই। এজন্য বৈদিক ধর্ম্ম কালক্রমে সমাজের অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে।

মনে কর, তুমি নিজের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য হোতা, উদ্গাতা ও অধ্বর্য্যু ডাকাইয়া এক প্রধান যজ্ঞ করাইলে এবং সমাজের দশজনকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইলে, তাহাতে তোমার মনের ধর্ম্মভাব বা চরিত্রের নৈতিক ভাব কি প্রকারে স্ফূর্ত্তি পাইবে? ইহাতে

তোমার পিতৃমাতৃ ভক্তি, সৌহার্দ্দ্য, পতিপরায়ণতা, দম্পতিপ্রেম, দয়াদাক্ষিণ্যাদি কিছুই স্ফূর্ত্তি পাইবে না। এজন্য বৈদিক ধর্ম্ম দ্বারা সমাজের চরিত্রগত নৈতিক উন্নতি আদৌ ঘটে নাই। বৌদ্ধধর্ম্মই সমাজের এ অভাব দূর করত সকলকে চরিত্রবান করে।

তৃতীয়তঃ। ভক্তি, প্রেম, বাৎসল্য প্রভৃতি যে সকল সাত্ত্বিক ভাব মানবমনে অনুক্ষণ উত্থিত হইতেছে, যাহারা ঈশ্বরের নামে ভালরূপ অনুশীলিত ও স্ফুরিত হইলে আমরা ইহসংসারে দেবতুল্য হই, বৈদিক ধর্ম্ম সে সকল সাত্ত্বিক ভাবের স্ফূর্ত্তিতে আদৌ হস্তক্ষেপ করে নাই। আজ আমরা শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে গদগদ হইয়া দুবাহু তুলিয়া যেরূপ ভাবে নৃত্য করি, বৈদিক সময়ে সেরূপ ভাবে ঈশ্বরপ্রেমে নৃত্য করিতে কেহ জানিত না। আধুনিক পৌরাণিক ধর্ম্ম সমাজের এ অভাব পূরণ করিয়াছে। এইরূপ নানা কারণে বৈদিক ধর্ম্ম কালক্রমে আর্য্য সমাজে অবনত ভাব ধারণ করিয়া ছিল।

এখন সূত্রযুগের কিঞ্চিৎ বিবরণ দিতেছি। পাশ্চাত্য পণ্ডিত-দিগের মতে এই সময়টী আর্য্যসভ্যতার চূড়ান্ত সময়। এই সূত্র-যুগের অধিকাংশ গ্রন্থ এখন পাওয়া যায়। ইহারা সূত্রাকারে লিখিত। বোধ হয়, অল্পায়াসে শাস্ত্রোক্ত কথা কণ্ঠস্থ করিবার জন্য সূত্রগ্রন্থগুলির চিরদিন সমাদর ও প্রতিপত্তি। বেদের ব্রাহ্মণভাগ রচিত হইবার অনেক পরে কল্পসূত্র রচিত হয়। ইহাতে ব্রাহ্মণোক্ত ক্রিয়াকলাপ সুপ্রণালীতে ও সুশৃঙ্খলতার সহিত লিখিত আছে।

কল্পসূত্র তিন প্রকার :

(১) শ্রৌত—ইহাতে বৈদিক প্রধান প্রধান যজ্ঞের বিবরণ লিখিত।

(২) গৃহ্যসূত্র—ইহাতে জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত জীবনের যাবতীয় সংস্কার লিখিত।

(৩) ধর্ম্মসূত্র—ইহাতে চতুরাশ্রমধর্ম্ম ও রাজনীতিবিষয়ক ব্যবস্থাপত্র সন্নিবেশিত।

বৈদিক যুগে মানবজীবনসম্বন্ধে আর্য্যসমাজে যে সকল সংস্কার প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা চিরদিন সমভাবে চলিতেছে। যেদিন এই সকল সংস্কার রহিত হইবে, সেইদিন জানিবে, হিন্দুধর্ম্ম জগতে লুপ্ত হইল। এই সময়ে চতুরাশ্রমধর্ম্মও প্রবর্ত্তিত হয় এবং ইহার নিয়মাবলি বিধিবৎ পালন করিয়া দ্বিজাতিবর্গ অশেষ উন্নতি লাভ করে। যেমন একদিকে যাগযজ্ঞ বহুকাল অনুষ্ঠিত হওয়াতে ইহার কুফল সমাজে দৃষ্ট হইতেছিল, তেমনি অপরদিকে চতুরাশ্রমধর্ম্ম পালন করিয়া আর্য্যসমাজ সভ্যতার পথে, উন্নতির পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে থাকে। এই উন্নতিবশতঃ হিন্দুসমাজ অন্তর্নিহিত শক্তিবলে এত বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও নিজের অস্তিত্ব ও জাতীয়তা জগতীতলে বজায় রাখিতে সমর্থ হয়। এই সময়ে আদিরামায়ণ ও আদিমহাভারত সাধারণসমাজে গীত হওয়ায় শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ ক্রমশঃ পূজ্য হইতে থাকেন।

বৈদিক যুগের অন্তিমদশায় ইন্দ্রাদি দেবগণের পদগৌরব লোকের মনে ক্রমশঃ খর্ব্ব হইতে থাকে এবং তৎপরিবর্ত্তে ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরের পদবৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হয়। এই সময়ে অনেকে বৈদিক যাগযজ্ঞের উপর ক্রমশঃ বীতশ্রদ্ধ হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মকে সাদরে আলিঙ্গন করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে।

বেদান্ত ধর্ম্ম।

সনাতন হিন্দুধর্ম্ম জগতের মধ্যে যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, তাহা এক বেদান্তধর্ম্ম জ্বলন্তাক্ষরে ও স্বর্ণাক্ষরে সপ্রমাণ করিতেছে। ইহাই একেশ্বরবাদের পরাকাষ্ঠা। কোন কালে কোন ধর্ম্ম এমন স্বর্গীয় নিখুঁত একেশ্বরবাদ প্রচার করিতে পারে নাই। খৃষ্টধর্ম্ম বল, মুসল-

মানধর্ম্ম বল, কোন ধর্ম্ম মায়াতীত, গুণাতীত পরব্রহ্ম বা পরমাত্মা আদৌ বুঝে নাই; উহারা মায়াময় মানবমনের প্রকৃত্যনুসারে সগুণ ঈশ্বর বুঝে মাত্র। এজন্য পরব্রহ্মে ও ঈশ্বরে যে কি পার্থক্য, তাহা উহাদের আদৌ বোধগম্য নাই। একমাত্র জগতে বেদান্তধর্ম্ম মায়াবাদ প্রচার করিয়া পরব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতেছে।

সকলেই জানেন, যিনি ব্রহ্ম, তিনি আমাদের মন,বাক্ ও ইন্দ্রিয়গণের অগোচর। আমরা কস্মিন্ কালে তাঁহাকে দেখিতে পাইব না। আমরা পঞ্চেন্দ্রিয়রূপ প্রকৃতিদত্ত মায়াঠুলি পরিয়া ভবের হাটে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। প্রকৃতি আমাদিগকে যাহা দেখিতে দিয়াছে, তাই দেখিতেছি মাত্র, আর কিছু দেখিবার আমাদের সাধ্য নাই। সেজন্য আমরা পরব্রহ্ম দেখি না, বুঝি না, সূক্ষ্ম জগৎ ও দেবগণও চক্ষে দেখি না। মনে মনে বুঝি এই মাত্র যে, এ জগতের এক আদিকারণ আছে, তিনিই ব্রহ্ম এবং তিনিই ঈশ্বর। এ জগৎ কেমন করিয়া হইল বা কি প্রকারে চলিতেছে, তাহাও আমরা জানি না। জানি এই মাত্র, নিয়মানুসারে সকলই চলিতেছে। বিজ্ঞান এখন ঐ সকল নিয়ম অনুসন্ধান করিতেছে। ধর্ম্ম বলে, সকলই সে জনার ইচ্ছায় হইতেছে। তাঁহার যা ইচ্ছা, তাই প্রকৃতির নিয়ম। তাঁহার ইচ্ছা মানবের ইচ্ছার ন্যায় খামখেয়াল নহে। ইহার ব্যত্যয় নাই, ইহা অখণ্ডনীয়। অনেক স্থলে ইহা গূঢ়াতিগূঢ়। সেজন্য শাস্ত্র বলে চক্রীর চক্র বুঝা ভার।

যেমন বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য বিশুদ্ধ চরিত্রগঠন ও অন্তে নির্ব্বাণলাভ এবং পৌরাণিক ধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য ভক্তিযোগ দ্বারা মনের সাত্ত্বিক ভাবাবলির সম্যক স্ফূর্ত্তি ও ভগবানের তন্ময়ত্ব লাভ, সেইরূপ বেদান্তধর্ম্মের চরম উদ্দেশ্য আত্মার আধ্যাত্মিক স্ফূর্ত্তি ও পরমাত্মালাভ। কোন কালের কোন ধর্ম্ম এমন আধ্যা-

ত্মিক উন্নতির বিষয় কল্পনায় আনিতে পারে নাই। সকল ধর্ম্মই মনের ধর্ম্মপ্রবৃত্তিগুলির উৎকর্ষ সাধন করিয়া স্বসেবককে ধর্ম্মাত্মা করিতে চাহে। কিন্তু কোন ধর্ম্ম আত্মার অষ্টসিদ্ধি স্ফুরণ করিয়া উহাকে দেবোপম করিতে জানে না। জগতীতলে একমাত্র সনাতন হিন্দুধর্ম্ম যোগবলে ও তপোবলে আত্মার অনিমাদি অষ্টসিদ্ধির স্ফুরণ করিয়া উহাকে দেবোপম করিতে জানে; এজন্য শতমুখে ইহার সুখ্যাতি করা উচিত।

যে আত্মা পরমাত্মার অংশ, ইনি পরমাত্মার ন্যায় মায়াতীত, গুণাতীত ও সর্ব্বশক্তিতে বিভূষিত। কিন্তু দেহনিবদ্ধ হইলে ইনি বুদ্ধির সহিত যুক্ত হইয়া জীবাত্মা বা পুরুষ নাম ধারণ পূর্ব্বক দেহের রাজা হন এবং যতদিন দেহনিবদ্ধ থাকেন, ততদিন মন ও ইন্দ্রিয়গণ সংযোগে মায়ার ত্রিগুণ দ্বারা জড়িত ও চালিত হন।

এখন যে সাধনবলে জীবাত্মাকে মায়াতীত ও গুণাতীত করিতে পারা যায়, তাহাই ধর্ম্মসাধনার পরাকাষ্ঠা। ইহাকে মায়াতীত করিতে হইলে মায়ার বন্ধন ছেদন করা কর্ত্তব্য। আমরা দুইপ্রকার মায়ায় আবদ্ধ, প্রথমতঃ সংসার মায়ায় আমরা স্বতঃ বদ্ধ; পুত্রকলত্রাদি লইয়া আমরা সংসারে জড়িত। গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিলে আমরা এ মায়ার বন্ধন পরিহার করিতে পারি। এজন্য বেদান্তধর্ম্ম সংসার ত্যাগ করিয়া বনজঙ্গলে গিয়া পরব্রহ্মে একাগ্রচিত্ত হইতে উপদেশ দেয়। আমাদের ভিতর সাধু সন্ন্যাসিগণ এইরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে-ছেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেন, যাহারা গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া মনে মনে সর্ব্বত্যাগী হন ও ব্রহ্মে একনিষ্ঠ হন, সন্ন্যাসধর্ম্ম অপেক্ষা তাঁহা-দের ধর্ম্মাচরণ অধিক প্রশংসনীয়। ইহাতে বুঝা উচিত, সংসার ত্যাগ না করিয়াও আমরা প্রকৃত সন্ন্যাসী হইতে পারি।

দ্বিতীয়তঃ আত্মাকে প্রকৃত মায়াতীত করিতে হইলে যে মহা-মায়ার পঞ্চেন্দ্রিয়রূপ মায়াঠুলি পরিয়া জীবমাত্রেই এ সংসারে বিচরণ

করে, সেই মায়াঠুলি খুলিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে। অসাধারণ যোগবলে পঞ্চেন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকলাপ রহিত করিয়া বিষয়বাসনা মন হইতে একেবারে দূরীভূত করিয়া যখন উহাদের নাশসাধন করা যায়, তখন আত্মার আধ্যাত্মিক শক্তি পূর্ণভাবে স্ফুরিত হয় এবং ইহার অষ্টসিদ্ধি লব্ধ হয়। শাস্ত্রমতে ইহাই ধর্ম্মসাধনার চূড়ান্ত আদর্শ। যাঁহারা যোগবলে এরূপ সাধনে কৃতকার্য্য হন, তাঁহারা প্রকৃত ব্রহ্মদর্শন করেন, সকল বিষয়ে তত্ত্বদর্শী হইয়া ভূতাদি শাসন করেন ও প্রকৃত ব্রহ্মস্বরূপ হন। তাঁহারাই এ সংসারে প্রকৃত জীবন্মুক্ত।

কলিযুগে মানবের আধ্যাত্মিক অধঃপতন বশতঃ উপরোক্ত ধর্ম্ম সাধন বা নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা জনসাধারণের পক্ষে অতীব দুরূহ; এজন্য অদ্বৈতবাদী শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধদেব বলেন, আমায় ভজ, অন্য কাহাকে ভজনা করিবার প্রয়োজন নাই; ঈশাদেব বলেন, আমি যে পরম পিতা পরমেশ্বরের পুত্র, আমায় মধ্যস্থ রাখিয়া তাঁহাকে ভজ এবং মহম্মদ বলেন, আমি যাহার প্রিয়সখা, আমার মতানুসারে তাঁহাকে ভজ। এই প্রকারে প্রাচীন কালের প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনা দেশে দেশে লৌকিক ঈশ্বরের আরাধনায় পরিণত হইয়াছে। যে সময়ে যাহা সাধারণের মনোমত হয়, তাহাই সকলে গ্রহণ করে। এজন্য খৃষ্ট ও মুসলমান ধর্ম্মের এত বিস্তৃতি আজকাল দেখা যায়।

সন্ন্যাসব্রত ধারণ, যোগাভ্যাস ও তপশ্চরণ এই তিনটী চিরদিন নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনার প্রধান অঙ্গ। বৈদিকযুগে মুনি ঋষিগণ বন জঙ্গলে থাকিয়া বেদান্তধর্ম্মের অনুশীলন করিতেন; জনসাধারণ ইহার বিষয় অবগত ছিল না।

বেদান্তধর্ম্মের মতামত সূত্রযুগে সূত্রাকারে লিখিত হইয়া বেদান্ত-সূত্র নাম ধারণ করে। ইহাতে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মনে করেন, বৈদিক যুগে আর্য্য ঋষিগণ প্রকৃতিজগৎ অন্বেষণ করিতে করিতে

প্রকৃতির ঈশ্বর বুঝিতে পারেন। কিন্তু যখন চতুর্ব্বেদের নানাস্থানে পরব্রহ্মের কথা উল্লিখিত আছে, তখন তাঁহাদের উপরোক্ত সিদ্ধান্ত খণ্ডিত হইয়া যাইতেছে। সমগ্র হিন্দুশাস্ত্র মন্থন করিলে স্পষ্ট বুঝা যায়, নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা অতি প্রাচীন কাল হইতে আর্য্যসমাজে প্রচলিত ছিল। তবে কেন ইহার বিষয় বেদের শেষ ভাগে লিখিত হইল? কেহ কেহ মনে করেন, যাহা সাধারণের ভিতর প্রচলিত ছিল না, যাহা নিভৃতে মহর্ষিগণ অনুশীলন করিতেন, উহার গৌরব লাঘবার্থ ব্রাহ্মণগণ বেদের শেষ ভাগে লিখিয়া রাখিয়াছেন।

যাহা হউক, বৈদিক যুগের শেষভাগে ও বৌদ্ধ যুগে এ ধর্ম্মের প্রতিপত্তি হ্রাস পাইয়া যায়। পৌরাণিক যুগে শঙ্করাচার্য্যদেব বেদান্তসূত্রাদির নূতন ভাষ্যাদি লিখিয়া বেদান্তধর্ম্মের উন্নতিসাধন করিয়া যান। বৌদ্ধধর্ম্ম খণ্ডন ও স্বপ্রবর্ত্তিত সন্ন্যাসীকুলের উপকারার্থ তিনি ঐ সকল গ্রন্থ রচনা করিয়া বহু প্রচারিত করেন। তদবধি বেদান্তধর্ম্মের গ্রন্থাবলি হিন্দুসমাজে চলিয়া আসিতেছে।

আজকাল সুশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা পৌরাণিক ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম না বুঝিয়া উহাতে বীতশ্রদ্ধ হন এবং একেশ্বরবাদ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের মঙ্গলের জন্য রামমোহনরায়প্রমুখ সংস্কারকবৃন্দ বেদান্তমতানুসারে ব্রহ্মোপাসনা স্থানে স্থানে প্রচার করিয়াছেন। তাঁহারাও গুণাতীত মায়াতীত পরব্রহ্মের স্থানে সগুণ লৌকিক ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া থাকেন।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যাহাই বলুন না কেন, আমরা চিরদিন সাহঙ্কারে বলিব, এই বেদান্তধর্ম্ম প্রাচীনকালের অধ্যাত্মবিজ্ঞানসম্মত একমাত্র সত্য সনাতন ধর্ম্ম। সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগের দেবাসুর দৈত্যরূপী মনুপুত্রগণ এই ধর্ম্মের অনুশীলন করিয়া যান। এ কলিযুগে মহাত্মা, মহর্ষি ও পরমহংসগণ এই ধর্ম্মের অনুশীলন করিতেছেন।

এই ধর্ম্মই সনাতন হিন্দুধর্ম্মের চরমাদ্য স্তর। বৈদিক যুগে যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান ও জ্ঞানকাণ্ডের অনুশীলন, বৌদ্ধযুগে একদিকে বুদ্ধদেবের পূজন ও অহিংসা পরমধর্ম্ম, অপরদিকে স্মার্ত্তধর্ম্মানুসারে পঞ্চদেবতার পূজন, পৌরাণিক যুগে পৌত্তলিক ধর্ম্মের বিস্তৃতি ও সাত্ত্বিক ভাবাবলির স্ফূর্ত্তি, আজকাল বেদান্তমতানুসারে ব্রাহ্ম ও আর্য্যসমাজ সৃষ্টি; ইহারা সনাতন ধর্ম্মের কালোচিত ভিন্ন ভিন্ন স্তর বা বেশপরিবর্ত্তন মাত্র। সেজন্য হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, নানাপন্থী ব্রাহ্ম ও আর্য্য সমাজ, সকলই সেই সনাতন ধর্ম্মের সম্প্রদায়মাত্র।

বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধযুগে হিন্দুধর্ম্ম।

খৃঃ পূ ৫০০ হইতে খৃঃ ৫০০, ১০০০ বৎসর।

বৈদিক যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান বহুকাল আর্য্যসমাজে প্রচলিত থাকাতে জনসাধারণ যথার্থ ধর্ম্ম ভুলিয়া গিয়া অধর্ম্মপরায়ণ ও হিংসাপর হইয়া উঠে। তৎকালে দয়ার অবতার বুদ্ধদেব ভারতে অবতীর্ণ হইয়া কালোচিত শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মমত প্রচার করিয়া জগতের মহোপকার সাধন করেন। যেমন তাঁহার সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আমাদের অশেষ পূজ্য শ্রীকৃষ্ণ প্রাচীন যুগের অধ্যাত্মবিজ্ঞানে বিশারদ হইয়া ব্রহ্মোপাসনা, যোগসাধন, নিষ্কামধর্ম্ম প্রভৃতি ধর্ম্মের উচ্চ অঙ্গগুলি প্রচার করিয়া ভারতে পূজিত হন, সেইরূপ বুদ্ধদেবও সামাজিক মানবের পক্ষে সমাজধর্ম্মপালন, পরিবারধর্ম্মপালন ও বিশুদ্ধ নৈতিক জীবন অত্যাবশ্যক ভাবিয়া ঐ সকল বিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ দিয়া যান।

ধন্য বুদ্ধদেব! ধন্য তোমার ধর্ম্মোপদেশ! ধন্য তোমার দয়াময় জীবন! তোমারই উপদিষ্ট ধর্ম্মামৃত পান করিয়া আজ জগতের তৃতীয়াংশ লোক নিজ নিজ জীবন বরীয়ান ও মহীয়ান করিতেছে। ভারতে তোমার জন্ম হওয়াতে এদেশ চিরদিনের জন্য ধর্ম্মের পবিত্র ক্ষেত্র ও পীঠস্থল। কৃতঘ্ন ব্রাহ্মণজাতি তোমার পবিত্র ধর্ম্মকে এদেশ

হইতে তাড়িত করিয়াছে এবং তোমায় নাস্তিক বলিয়া চিরদিন ঘৃণা করিতেছে বটে; কিন্তু আমরা বিস্ফারিতহৃদয়ে চিরদিন তোমার মহিমা কীর্ত্তন করিব।

বুদ্ধদেব।

খৃ' পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে বুদ্ধদেব নেপালের দক্ষিণস্থ কপিলাবস্তু নগরে শাক্যবংশে মহারাজ শুদ্ধোদনের ঔরসে ও মায়াদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। শাক্যবংশে জন্ম বলিয়া তাঁহার নাম শাক্যমুনি এবং নিজধর্ম্ম জগতে প্রচার করিবার পূর্ব্বে তিনি বুদ্ধগয়ায় বোধিসত্ত্ব-বৃক্ষের তলদেশে বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন; এজন্য তাঁহার নাম বুদ্ধদেব এবং তৎপ্রচারিত ধর্ম্মের নাম বৌদ্ধধর্ম্ম।

বাল্যকাল হইতে তাঁহার মন অতিশয় চিন্তাশীল ছিল। একে ত প্রতাপান্বিত রাজার একমাত্র পুত্র, তাহার উপর সুখৈশ্বর্য্যের ক্রোড়-দেশে লালিত ও পালিত, তথাচ রাজপ্রাসাদের বিলাসিতা তাঁহার মনকে আদৌ মুগ্ধ করিতে পারে নাই। তিনি সদা সর্ব্বদা সংসারের শোকতাপ, আধিব্যাধি ও জরামৃত্যুর বিষয় চিন্তা করিতেন। তাঁহার মনকে ফিরাইবার জন্য তদীয় পিতা কত চেষ্টা করিলেন, এমন কি বিবাহ পর্য্যন্ত দিলেন। কিন্তু যে দিন তাঁহার পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে, সেই দিন সংসারের সকল মায়া মমতা কাটাইয়া অর্দ্ধরাত্রে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া চীরবল্কল ধারণ পূর্ব্বক বনবাসে চলিয়া যান। তিনি রাজগৃহে যাইয়া সন্ন্যাসীদিগের সহিত ঘোর তপস্যা করেন; কিন্তু তাহাতে তাঁহার মনে আদৌ শান্তিলাভ না হওয়াতে তিনি গয়ায় চলিয়া যান। তথায় তাঁহার মনে যথার্থ জ্ঞানোদয় হয় এবং তিনি বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, রাজপুত্র হইলেও তিনি একজন প্রাকৃত লোক এবং কালোচিত শিক্ষা পাইয়া সংসারের বিবিধ শোক তাপ দর্শনে ব্যথিতহৃদয় হইয়া বৈরাগ্যাবলম্বন করত শান্তিলাভার্থ,

রাজপ্রসাদ, দারাপুত্র সকলই ত্যাগ করেন এবং নিজ বুদ্ধিবলে কালোচিত শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মমত প্রচার করিয়া যান। যখন সমগ্র আর্য্য সমাজে বেদ সর্ব্বত্র পূজিত ও কুলপরম্পরাগত জাতিভেদপ্রথা প্রবল, তখন তিনি উভয়ের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়া সামাজিক ও পারিবারিক ধর্ম্মসম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ উপদেশ দিয়া জগতে নৈতিক ধর্ম্ম প্রচার করেন। যৎকালে জনসাধারণ ব্রাহ্মণজাতি দ্বারা চালিত হইয়া বিবিধ যজ্ঞে পশু হত্যা করিতে করিতে হিংসাপর হইয়া উঠে, তৎকালে তিনি অহিংসা পরম ধর্ম্মের জয় সর্ব্বত্র ঘোষণা করিয়া যান। ইহাতে সিদ্ধান্ত করা উচিত, সমাজের নিম্নলিখিত তিনটী ঘটনা তাঁহার প্রাণে বিশেষ আঘাত করিয়াছিল—

(১) যজ্ঞে পশুহত্যা।

(২) সাধারণসমাজের নৈতিক অবনতি।

(৩) শূদ্রনামে অভিহিত অনার্য্য জাতির উপর আর্য্যজাতির ঘোর অত্যাচার।

অনেকের মতে, তিনি প্রকৃত মহাত্মা, যোগসিদ্ধ যোগেশ্বর। যোগবল ব্যতীত কোন মহাত্মা জগতে অলৌকিক শক্তি দেখাইতে পারেন না এবং অলৌকিক শক্তি না দেখাইতে পারিলে সাধারণ লোকেও মুগ্ধ হয় না। উহাদিগকে মুগ্ধ না করিতে পারিলে ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া একপ্রকার বৃথা। শ্রীকৃষ্ণ, ঈশাদেব, মহম্মদ, শঙ্করাচার্য্যদেব প্রভৃতি সকল মহাত্মাই প্রকৃত যোগেশ্বর ছিলেন। তাঁহারা যোগবলে সকলকে মুগ্ধ করিয়া ধর্ম্মজগতে অলৌকিক উপদেশ দেন ও অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ দেখান।

তাঁহারা বলেন, তিনি সংসারের অশেষ পাপতাপের মধ্যে শান্তির পথ, সুখের পথ, যথার্থ ধর্ম্মের পথ দেখাইবার জন্য অতুল বিভব, অতুল সম্পদ, দারা পুত্র সকলই ত্যাগ করিয়া কৌপীনধারী সন্ন্যাসী সাজেন এবং অবনত মানবধর্ম্মের সংস্কার করিয়া যান। অধ্যাত্মবিজ্ঞানের যে

সকল গূঢ় প্রাচীন শাস্ত্র হইতে যোগসিদ্ধ মহর্ষিগণ ও শ্রীকৃষ্ণাদি মহাত্মাগণ মহাসত্য প্রাপ্ত হইয়া সনাতন ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করেন, বুদ্ধদেবও সেই সকল গূঢ় শাস্ত্রে ভালরূপ বিশারদ হইয়া যোগসিদ্ধ হন ও কালোচিত শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মমত প্রচার করেন।

তৎপ্রচারিত নির্ব্বাণ, কর্ম্মফল, ধ্যানযোগ, বিশ্বমৈত্রীভাব, নিষ্কামধর্ম্ম প্রভৃতি ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ অঙ্গগুলি সেই প্রাচীন কালের অধ্যাত্মবিজ্ঞান হইতে গৃহীত। আর যাঁহারা ভাবেন, তিনি ঐ সকল ধর্ম্মমত জগতে প্রথম প্রচার করেন, তাঁহারা মহৎ ভ্রমে পতিত জানিবে। কলিকালে মানবসমাজে অধ্যাত্মবিজ্ঞানসম্বন্ধে যাহা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য, তাহাই তিনি সাধারণভাবে প্রচার করেন। তদ্ভিন্ন ইহার গূঢ় বিষয়গুলি দুই এক প্রিয় শিষ্যের নিকট গোপনে ব্যক্ত করেন। তৎপ্রচারিত ধর্ম্মেরও দুইটী রূপ, ব্যক্ত ও অব্যক্ত। ব্যক্ত বা বাহ্যরূপে (Exoteric form) ইহা সাধারণ হিন্দুধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কিন্তু অব্যক্ত বা গূঢ় রূপে (Isoteric form) ঐ ধর্ম্মের গূঢ় অঙ্গের সহিত ইহার কিছুমাত্র প্রভেদ নাই।

কথিত আছে, যে সময়ে তিনি নিজ ধর্ম্মমত জনসমাজে প্রচার করিতে আরম্ভ করেন, সেই সময়ে তিনি বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন। এস্থলে বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির প্রকৃত অর্থ কি? ইহাতে কি এই বুঝা উচিত, এই সময়ে তিনি যোগসিদ্ধ হইয়া যথার্থ পরমার্থজ্ঞান লাভ করিলেন? না যে ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার করিয়া তিনি জগতের মহোপকার করেন, তাহা এই সময়ে তদীয় মানসপটে প্রথম উদিত হইল? তাঁহার বুদ্ধত্ব-প্রাপ্তি সম্বন্ধে কেহ কেহ অনুমান করেন, যেমন তিনি স্বসমাজপ্রচলিত ধর্ম্মমতের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হন, এমন যে চিরপবিত্র বেদও জাতি-ভেদপ্রথা, উহাদের উপর তিনি যেমন খড়্গহস্ত হন, তাঁহার উপদেশের উপর জনসাধারণের অন্ধবিশ্বাস উৎপাদনার্থ তদীয়

শিষ্যবর্গ জগতে প্রচার করিয়াছেন, ধর্ম্মোপদেশ দিবার পূর্ব্বে তিনি যোগসিদ্ধ হইয়া বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন, (অর্থাৎ) তাঁহার মন তৎকালে স্বর্গীয় জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হয় এবং এখন হইতে তাঁহার শ্রীমুখ-পঙ্কজ হইতে যাহা নিঃসৃত হইবে, তাহাই জগতের অমোঘ সত্য। কেন কোরাণে একথা লিখিত হইল, মহম্মদ খোদার প্রিয় সুহৃৎ? কেন অষ্টাদশ পুরাণ যাহাদের দ্বারা লিখিত হউক না, এক বেদব্যাস-প্রণীত বলিয়া প্রচারিত হইল? সকলেরই তাৎপর্য্য এক।

যদিও বেদের কর্ম্মকাণ্ড বা বৈদিক যাগযজ্ঞ ও জাতিভেদের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হওয়াতে তিনি হিন্দুশাস্ত্রে নাস্তিক বলিয়া উক্ত হন, তথাচ তিনি আদৌ নাস্তিক ছিলেন না; দোষের মধ্যে তিনি কপিল মুনির ন্যায় লৌকিক ঈশ্বর মানেন নাই। তিনিও শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় মায়াতীত পরব্রহ্মের উপাসক ছিলেন এবং আপনাকে সোঽহং বলিয়া প্রচার করিয়া যান। তদীয় শিষ্যোপশিষ্যগণ তাঁহার উপদেশের যথার্থ মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে পরব্রহ্মস্থানে পূজা করিতে আরম্ভ করে। তাহার সাক্ষ্য, জৈনেরা স্বধর্ম্মোপদেশক তীর্থঙ্করদিগকে ঈশ্বর স্থানে পূজা করে। এদেশে আজকাল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে রামকৃষ্ণপরমহংসদেবকে ঈশ্বর স্থানে পূজা করিতেছেন। সেইরূপ যে ঈশাদেব আপনাকে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া পরিচয় দেন, তদীয় শিষ্যবর্গ তাঁহার উপদেশের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া অথবা গুরুর প্রতি অসাধারণ ভক্তি দেখাইবার জন্য তাঁহাকে পুত্রপরমেশ্বর জ্ঞানে পূজা করিতেছে।

বুদ্ধদেব যেরূপ উৎসাহে ও দুন্দুভিস্বরে প্রাকৃত পালি ভাষায় বক্তৃতা দিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট নিজ ধর্ম্মমত প্রচার করেন এবং তদীয় শিষ্যবর্গ তৎপ্রদর্শিত সন্ন্যাসমার্গ অবলম্বন করিয়া গাইতে গাইতে তাঁহার ধর্ম্মমত যেরূপভাবে সর্ব্বত্র প্রচার করেন, তাহাতে বৌদ্ধধর্ম্ম অচিরে ভারতের নানাস্থানে প্রচারিত হইয়া পড়ে।

এবং নানা প্রদেশের রাজন্যবর্গ ইহাতে দীক্ষিত হন। তাঁহাদের অদম্য উৎসাহ দর্শনে ব্রাহ্মণগণ হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন।

যেমন এক সময়ে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া ও ধর্ম্মের ধ্বজা উড়াইয়া গ্রামে গ্রামে হরিসঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে বঙ্গদেশকে মাতান, সেইরূপ বুদ্ধদেবের ধর্ম্মাত্মা সন্ন্যাসিগণ গুরুদত্ত মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ও ধর্ম্মের ধ্বজা উড়াইয়া গাইতে গাইতে তাঁহার ধর্ম্মমত গ্রামে গ্রামে প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের অসীম উৎসাহবশতঃ কয়েক শতাব্দীর ভিতর এধর্ম্ম কোথায় চীন ও তাতার, কোথায় সিংহল ও বর্ম্মা, কোথায় ভারতমহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ, সর্ব্বস্থলে ক্রমশঃ প্রচারিত হইতে থাকে।

হিন্দুশাস্ত্রগুলি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হওয়াতে ব্রাহ্মণজাতি ব্যতীত অন্যান্য জাতির নিকট উহাদের দ্বারদেশ অবরুদ্ধপ্রায়। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের গ্রন্থগুলি তৎকালীন প্রাকৃত পালী ভাষায় লিখিত হওয়াতে এ ধর্ম্ম অত্যল্প কাল মধ্যে সাধারণ সমাজের যথেষ্ট সহানুভূতি প্রাপ্ত হইল এবং দলে দলে অনেকে উক্ত ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। যে আর্য্যসমাজ এতকাল স্বার্থপর ব্রাহ্মণজাতির কঠোর শাসনে শাসিত হইয়া ধর্ম্মবিষয়ে মোহনিদ্রায় নিদ্রিত ছিল, সেই আর্য্যসমাজই গুরুদত্ত নবোৎসাহে উৎসাহান্বিত হইয়া দলে দলে সর্ব্বস্বত্যাগী সন্ন্যাসব্রতধারী ভিক্ষুভিক্ষুণী উৎপাদনকরত দেশ দেশান্তরে দিক্‌দিগন্তে নূতনধর্ম্মের কীর্ত্তিধ্বজা রোপিত করিল এবং অসংখ্য বর্ব্বর সমাজে ভারতীয় সভ্যতার্জ্যোতি বিকীর্ণ করিল।

কোথায় হে পূজ্যপাদ বুদ্ধদেব! ধন্য তোমার সন্ন্যাসব্রতধারণ! ধন্য তোমার উৎসাহান্বিত ধর্ম্মোপদেশ! কোথাও একবিন্দু শোণিতপাত না করিয়া তোমার ধর্ম্মাত্মা অধ্যবসায়ী সন্ন্যাসিগণ ধীরে ধীরে ত্বৎপ্রচারিত ধর্ম্মকে অর্দ্ধভূমণ্ডলে বিস্তীর্ণ করিয়াছে। তোমার মত এমন সুসন্তান ভারতমাতার আর কে আছে? কৃতঘ্ন ব্রাহ্মণজাতি

তোমায় নাস্তিক বলিয়া অবজ্ঞা করত তোমার ধর্ম্মকে এদেশ হইতে তাড়িত করিয়াছে সত্য; কিন্তু ভগবানের কি ইচ্ছা, তাহাও কেহ জানে না। হয়ত সুদূর ভবিষ্যতে ভারতমাতা পুনরায় তোমাকে মস্তকে ধারণ করিয়া নৃত্য করিবেন।

আজকাল যেমন সুসভ্য ইউরোপখণ্ডের মিসনরিগণ দারুণ শীত গ্রীষ্মে আদৌ দৃকপাত না করিয়া নানাবিধ কষ্ট স্বীকার করিয়া দেশে দেশে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, সেইরূপ এক সময়ে এই সুসভ্য ভারত হইতে বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণ অশোকাদি ধর্ম্মাত্মা নৃপতিবৃন্দের সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষণ পাইয়া কোথায় পেলেষ্টাইন, সাইবীরিয়া ও যবদ্বীপ এই অর্দ্ধভূমণ্ডলে স্বধর্ম্ম যেরূপ উৎসাহের সহিত প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে আমাদের এই কঙ্কালসার দেহের ক্ষুদ্র হৃদয় গর্ব্বে স্ফীত হইয়া উঠে, ধমনীও বেগে স্পন্দিত হইতে থাকে। ধন্য অশোকাদি নৃপতিবৃন্দ! ধন্য তোমাদের পৃষ্ঠপোষণ ও উৎসাহ! তোমাদের গুণে ভারতের সনাতন ধর্ম্ম জগতের যাবতীয় ধর্ম্মের আদিগুরু এবং তোমাদের গুণে ভারতীয় সভ্যতা পৃথিবীস্থ নানাদেশের সভ্যতার আদিকারণ। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত, এই বৌদ্ধধর্ম্মের অনুকরণে খৃষ্টধর্ম্মের নানা অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং শুনিতে পাই, ঈশাদেব বৌদ্ধধর্ম্মে শিক্ষিত হইয়া যোগসিদ্ধ হন এবং পাশ্চাত্য জগতে নিজ ধর্ম্মমত প্রচার করিয়া যান।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, ভারতবর্ষ চতুর্দ্দিকে প্রাকৃতিক দুর্লঙ্ঘ্য অবরোধে বেষ্টিত হওয়াতে ইহার নরপতিগণ কস্মিনকালে এ দেশ হইতে অন্যান্য দেশে দিগ্বিজয়ার্থ বহির্গত হন নাই। বলি, যে ভারত নানাদেশে স্বীয় জ্ঞানধর্ম্ম বিকীর্ণ করিয়া উঁহাদিগকে সাত্ত্বিক ভাবে জয় করিয়াছে, সে ভারতের অধীশ্বরবর্গ সশস্ত্রে ও সসৈন্যে দিগ্বিজয়ার্থ বহির্গত হইয়া যদি অপর দেশের নগরাদি লুণ্ঠন না করিয়া

থাকেন, তাহাতে কি তাহাদের উপর কোনরূপ দোষারোপ করা উচিত? আর যে খৃষ্টান ও মুসলমান নরপতিগণ স্ব স্ব ধর্ম্মপ্রচারার্থ নরকণ্ঠবিনিঃসৃত শোণিতপ্রবাহে নানা দেশ প্রবাহিত করাইয়াছেন ও রাশি রাশি ধর্ম্মগ্রন্থ দগ্ধ করাইয়াছেন, তাহাতে কি তাঁহাদের কোনরূপ প্রশংসাবাদ করা উচিত?

বুদ্ধদেব ধর্ম্মপ্রচারার্থ জগতে সর্ব্বপ্রথম সন্ন্যাসমার্গ করিয়া যান। পরসেবায় ও ধর্ম্মসেবায় সমস্ত জীবন কিরূপে অতিবাহিত করিতে হইবে, তাহা তিনি ভালরূপ নির্দ্দেশ করেন। তিনি যদি সন্ন্যাসী-কুল প্রবর্ত্তন না করিতেন, বৌদ্ধধর্ম্ম অর্দ্ধভূমণ্ডলে বিস্তৃত হইত না। তৎসৃষ্ট ভিক্ষুভিক্ষুণীগণ দেশে দেশে এ ধর্ম্মের কীর্ত্তিধ্বজা রোপিত করিয়া জগতের মহোপকার করিয়া যান। যে মহম্মদদেব তরবারি বলে স্বধর্ম্ম প্রচার করিতে উপদেশ দেন, তিনি তামসিক উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। আর যে বুদ্ধদেব অহিংসা পরম ধর্ম্মের বীজমন্ত্র সকলের হাড়ে হাড়ে বিদ্ধ করিয়া যান, কোন্ বৌদ্ধ নিজ ধর্ম্ম প্রচারার্থ শোণিতপাত ও নগরলুণ্ঠন করিতে স্বীকৃত হইবেন? তাঁহার ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব বশতঃ ইহা স্বতঃ নানাদেশে প্রচারিত হইয়াছে। ধর্ম্মপ্রচারার্থ তাঁহারই যথার্থ সাত্ত্বিক উপায়। যাঁহারা স্ত্রীলোকের মোহিনী মূর্ত্তি দেখাইয়া বা দুর্ভিক্ষ সময়ে অন্নদান দিয়া অপরকে স্বধর্ম্মে দীক্ষা দেন, তাঁহাদের রাজসিক উপায় বলা উচিত।

বুদ্ধদেব সন্ন্যাসীদিগের জন্য যোগসাধন, ইন্দ্রিয়সংযম, নিষ্কামধর্ম্ম ও ধর্ম্মপ্রচার জীবনের মহৎ ব্রত বলিয়া উপদেশ দেন এবং জনসাধারণের জন্য অহিংসা পরমধর্ম্ম, বিশুদ্ধ নৈতিক চরিত্রগঠন, পরোপকার, দয়াদাক্ষিণ্যাদি, পিতৃমাতৃভক্তি প্রভৃতি সামজিক ধর্ম্ম উপদেশ দেন। তাঁহার মতে, কি সন্ন্যাসী, কি গৃহস্থ সকলের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য অন্তে নির্ব্বাণলাভ। এজন্য তিনি বিষয়বাসনা যথাসাধ্য মন্দীভূত করিতে সকলকে প্রোৎসাহিত করিয়া যান। দোষের

মধ্যে তিনি কাহাকেও নির্গুণ ব্রহ্ম বা সগুণ ঈশ্বর দেখান নাই। এজন্য অনেকেই মনে করেন, তিনি নিরীশ্বরবাদী বা নাস্তিক। যথার্থ বলিতে কি, বৌদ্ধেরা বুদ্ধদেবকে ঈশ্বর স্থানে পূজা করে এবং তিনি তাঁহাদের নিকট পরমব্রহ্মের মায়ারূপ।

বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতে সহস্র বৎসর সগৌরবে প্রাদুর্ভূত ছিল। নানা প্রদেশের নরপতিগণ নানাপ্রকারে ইহার পৃষ্ঠপোষণ করিয়া যান। পরে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পর ইহা ভারতে ক্রমশঃ অবনতি প্রাপ্ত হইতে থাকে এবং তিন শতাব্দীর ভিতর ব্রাহ্মণজাতির বুদ্ধি কৌশলে ইহা এ দেশে লোপ পাইয়া যায়, অথবা চিরদিনের জন্য নির্ব্বাসিত হইয়া যায়। মনে হয়, বৌদ্ধধর্ম্ম ইহার জন্মভূমি হইতে বিতাড়িত হইবার সময়ে অশ্রুপূর্ণলোচনে কৃতঘ্ন ভারতমাতাকে সহস্র অভিসম্পাত প্রদান করিয়াছিল ; সেজন্য আজ আমাদের দুঃখিনী ভারতমাতা পরাধীনতারূপ নিগড় শৃঙ্খলে আবদ্ধা এবং চীন প্রভৃতি দেশ চিরস্বাধীনতা সুখে সুখী।

যে সময়ে বুদ্ধদেব ভারতে অবতীর্ণ হন, উহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে মহাত্মা মহাবীর এ দেশে জৈনধর্ম্ম প্রচার করেন। এ ধর্ম্মও বেদ ও জাতিভেদের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয় এবং অহিংসা পরমধর্ম্মের জয় ঘোষনা করে। এ ধর্ম্মে সন্ন্যাসিকুল না থাকায় বৌদ্ধধর্ম্মের মত ইহার সেরূপ উন্নতি বা বিস্তৃতি হয় নাই। পরে যখন ঐধর্ম্ম ভারতে লোপ পায়, অনেক বৌদ্ধ জৈনধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করে। ইহাতে এখনও ভারতের নানা অঞ্চলে অনেক জৈনধর্ম্মাবলম্বী লোক দেখা যাইতেছে। ইহারা যেমন অহিংসাপরায়ণ, তেমন সদাচারী।

বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত হিন্দুধর্ম্মের সৌসাদৃশ্য।

যৎকালে উভয়ধর্ম্ম ভারতে একত্র প্রাদুর্ভূত ছিল, তৎকালে উহারা পরস্পর পরস্পরের মতামত, আচার ব্যবহার ও উপাখ্যানাদি লইয়া

নিজ নিজ দেহ পুষ্ট করে। সত্য বটে, পূজ্য দেবতা, বৈদিক যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও জাতিভেদ লইয়া উহাদের পার্থক্য ছিল; কিন্তু ধ্যানযোগ, যোগাভ্যাস, নির্ব্বাণ, মায়াবাদ, যোনিভ্রমণ, কর্ম্মফল, অহিংসা, তীর্থভ্রমণ, মন্দিরাদি নির্ম্মাণ ও প্রতিষ্ঠা, জপমালা, সন্ন্যাস-ধর্ম্ম, বিশ্বমৈত্রিভাব, নিষ্কামধর্ম্ম, ভক্তিযোগ, দানধর্ম্ম, শাস্ত্রানুশীলন মঠবিহারাদিনির্ম্মাণ, তন্ত্রশাস্ত্ররচনা প্রভৃতি নানাবিষয়ে পরস্পর পরস্পরকে চালনা করে এবং পরস্পর পরস্পরের সাহায্য গ্রহণ করে। সনাতন ধর্ম্মের যে আভ্যন্তর যোগেশ্বরপ্রকটিত, বুদ্ধদেবও সেই আদ্যন্তর হইতে অধ্যাত্মবিজ্ঞানের মহৎ মহৎ সত্য পাইয়া স্বীয় ধর্ম্মমত জগতে প্রচার করেন। এজন্য নানাবিষয় লইয়া উভয় ধর্ম্মে এত অধিক সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। যথার্থ বলিতে কি, উভয় ধর্ম্ম সেই সনাতন ধর্ম্মরূপ প্রাচীন বৃক্ষের দুইটী শাখা, একটী অর্দ্ধভূমণ্ডলে বিস্তৃত, অপরটী কেবলমাত্র ভারতে বিস্তৃত। এজন্য বৌদ্ধকে ভ্রাতৃভাবে আমাদের আলিঙ্গন করা উচিত।

ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের বিলোপসাধন

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আশ্চর্য্যান্বিত হন, বৌদ্ধধর্ম্ম কি প্রকারে নির্ব্বিবাদে ও বিনাযুদ্ধে ইহার জন্মভূমি ভারত হইতে চির নির্ব্বাসিত হইয়া গেল? ইহার লোকজন কি অন্য বৌদ্ধদেশে চলিয়া গেল, না এখানে সব মরিয়া হেজিয়া গেল? তাহা নহে। সাধারণ বৌদ্ধ-গণ হিন্দুদিগের পূজাপদ্ধতি ও আচার ব্যবহার অবলম্বন করাতে হিন্দুসমাজভুক্ত হইয়া গেল এবং পুনরায় হিন্দুনামে পরিচিত হইল। দেখ যেমন পালেষ্টাইন খৃষ্টধর্ম্মের জন্মভূমি হইলেও ঐ ধর্ম্ম সে দেশ হইতে চিরনির্ব্বাসিত হইয়াছে, সেইরূপ বৌদ্ধধর্ম্ম এ দেশে জন্মগ্রহণ করিলেও চিরদিনের জন্য নিজ জন্মভূমি হইতে তাড়িত হইয়াছে। কথায় বলে, 'গেঁয়ো যোগী ভিক্ পায় না।' সেজন্য উপরোক্ত

দুই ধৰ্ম্ম উৎকৃষ্ট হইলেও নিজ নিজ দেশে প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে নাই।

এখন বল দেখি, যে বৌদ্ধধৰ্ম্ম সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া ভারতে প্রবল ছিল, যে ধৰ্ম্ম প্রবলপ্রতাপান্বিত রাজন্যবর্গ দ্বারা ভালরূপ পৃষ্ঠপোষিত হইয়াছিল, সে ধর্ম্মের চিহ্নমাত্র, এমন কি নামগন্ধ পর্য্যন্ত আমরা কেন দেখিতে পাই না? হিন্দুসমাজের জনসাধারণ এই পর্য্যন্ত জানে, যে শ্রীবিষ্ণু নবম বুদ্ধ অবতার গ্রহণ করিয়া নাস্তিক মত প্রচার করিয়া যান। যাহা হউক, এস্থলে ব্রাহ্মণজাতির অপার বুদ্ধিকৌশল ও ব্রহ্মতেজ আমাদের চক্ষে জাজ্বল্যমান দেখাইতেছে। যেমন বৌদ্ধধৰ্ম্ম বেদ ও জাতিভেদের মস্তকে পদাঘাত করিয়াছিল, উহাদের রক্ষক ব্রাহ্মণ জাতিও নানা কৌশল ও প্রাণপণচেষ্টা করিয়া ঐ ধর্ম্মের বিনাশ সাধন করিয়াছেন।

ওহে পূজ্যপাদ ব্রাহ্মণগণ! ধন্য তোমাদের বুদ্ধিকৌশল। ধন্য তোমাদের ব্রহ্মতেজ! বিনা রক্তপাতে, বিনা যুদ্ধে তোমরা সাত্ত্বিক-ভাবে শত্রুবর্গের পরাজয় সাধন করিয়াছ। এধৰ্ম্ম নিরাকরণের জন্য ইতিহাস কোনরূপ ধৰ্ম্মযুদ্ধের সাক্ষ্য প্রদান করে না। তরবারি বলে ব্রাহ্মণগণ জয়লাভ করেন নাই। যে জাতি চিরদিন ব্রহ্মতেজে তেজীয়ান ও ব্রহ্মবর্চ্চে বলীয়ান, যে জাতি সমাজের অধিনায়ক হইয়াও স্বার্থত্যাগবশতঃ সামান্য ভিক্ষোপজীবী, বলা উচিত, সে জাতির ব্রহ্মতেজেই বৌদ্ধধৰ্ম্ম ভারতে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে।

ইতিহাস পাঠে বুঝা যায়, হিন্দু রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষণে, কুমারিলাভট্ট, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি মহাত্মাগণের আবির্ভাবে এবং আধুনিক পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ববশতঃ সনাতন হিন্দুধৰ্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মের উপর জয়লাভ করিতে সমর্থ হয়। রাজন্যবর্গের মধ্যে মগধের গুপ্তবংশীয় চক্রবর্ত্তী রাজাদের চেষ্টায়, ভিন্ন ২ প্রদেশের রাজপুত রাজাদের সহায়তায় এবং দাক্ষিণাত্যে নানা রাজাধিরাজের

উৎসাহে হিন্দুধর্ম্ম কালক্রমে ঐ ধর্ম্মের উপর জয়লাভ করিয়াছে। নানা অঞ্চলের ব্রাহ্মণগণও আদৌ নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তাঁহারা পুরাণ ও তন্ত্র প্রভৃতি রাশি ২ ধর্ম্মগ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়া স্ব ২ সমাজে প্রচার করিয়াছিলেন। ইহাতে পৌরাণিক ধর্ম্মের পূর্ণ বিকাশ ঘটে এবং বৌদ্ধধর্ম্মের বিলোপ হইয়া যায়।

আরও দেখ, নিসর্গপ্রধান ভারতভূমিতে নিরীশ্বরবাদী বৌদ্ধধর্ম্ম বহুকাল স্থায়ী হইতে পারে না। এজন্য এধর্ম্ম এদেশে কালক্রমে স্বয়ং কালকবলিত হইয়া গিয়াছে। এদেশে দুর্ব্বল মানব প্রকৃতিদেবীর ভয়াবহ মূর্ত্তি দর্শনে ঈশ্বরে বিশ্বাস ব্যতীত কিছুতে নিজের ভয়বিহ্বল মনকে সান্ত্বনা করিতে পারেন না; এজন্য নির্গুণ পরব্রহ্মে বা সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাস এদেশে প্রকৃতিসিদ্ধ। যখন স্বয়ং প্রকৃতি প্রকৃতি-সেবক ব্রাহ্মণজাতির উপর এত সদয়, তখন ব্রাহ্মণদ্বেষী বৌদ্ধধর্ম্ম প্রকৃতির বিপক্ষে গমন করিয়া কি প্রকারে এদেশে বহুকাল স্থায়ী হইতে পারে? মনে রাখিবেন, বৌদ্ধধর্ম্মে পরব্রহ্মও নাই, ঈশ্বরও নাই, বুদ্ধদেবও ঈশ্বরের অবতার নন; কিন্তু তিনি সদ্‌গুরু-রূপে বৌদ্ধজগতে পূজিত হন। এই মহৎ ভ্রমবশতঃ এধর্ম্ম ভারতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

যখন বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতে প্রবল হইয়া উঠে, তৎকালে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্ম্মই সমাজে প্রচলিত ছিল। হিন্দু রাজাদের অধীন ব্রাহ্মণদের প্রতিপত্তি ও সমাদর অধিক ছিল। কিন্তু বৌদ্ধ নরপতিগণের অধীনে তাঁহাদের প্রতি আদৌ কোনরূপ অত্যাচার হইত না। তাঁহারা আপনাদের সমাজ চালাইতেন। তৎকালে উভয় ধর্ম্মের অধিনায়কগণ স্ব স্ব সমাজে ভালরূপ পূজিত হইতেন। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের অন্তিম দশায় শ্রমনগণ সমাজে বড় অবজ্ঞাত হইতেন এবং সাধারণ বৌদ্ধগণ হিন্দুদিগের বাক্যযন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য ক্রমশঃ উহাদের আচার ব্যবহার অবলম্বন করত হিন্দুসমাজভুক্ত হইয়া গেল।

বৌদ্ধযুগে আর্য্যসমাজ চারিবর্ণে অস্পষ্টরূপে বিভক্ত থাকায় জাতিভেদের শাসন কঠোর ছিল না। এজন্য হিন্দুসমাজের বহুসংখ্যক লোক দলে দলে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করে। কিন্তু শ্রেষ্ঠ জাতির মধ্যে অল্পসংখ্যক লোক বৌদ্ধ হইয়া যায় এবং ব্রাহ্মণ জাতির ভিতর অনেকে জাতীয় সম্মান ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ হন নাই। ঐ ধর্ম্মের অবনতি হইলে যখন অধিকাংশ বৌদ্ধ হিন্দুসমাজভুক্ত হইতে থাকে, তখন পুরাকালের চারিবর্ণকে মূলভিত্তি করিয়া বৃত্তি অনুসারে আধুনিক জাতিভেদপ্রথা সর্ব্বত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। পৌরাণিক যুগে আধুনিক প্রথা পূর্ণমাত্রায় ক্রমশঃ বিকসিত হইয়াছে এবং সমাজশাসন পূর্ব্বাপেক্ষা কঠোর হইয়াছে। বহুকাল একত্র বসবাস করাতে বৌদ্ধধর্ম্মের পূজাপদ্ধতি ও উৎকৃষ্ট মতামত ক্রমশঃ হিন্দুধর্ম্মে মিলিত হইয়া গিয়াছে। বুদ্ধদেবের সংসারত্যাগ বৌদ্ধদিগের ভিতর যেমন করুণারসোদ্দীপক, শ্রীরামচন্দ্রের বনগমন হিন্দুদিগের ভিতরও তেমনি করুণারসোদ্দীপক। কালক্রমে বুদ্ধদেবও হিন্দুদিগের প্রধান দেবতা বিষ্ণুর এক অবতার বলিয়া গণ্য হন। বৌদ্ধধর্ম্মের পীঠস্থল, গয়া, শ্রীক্ষেত্র, কাশী, প্রয়াগ, মথুরা প্রভৃতি পবিত্র ক্ষেত্রগুলি হিন্দুদিগের মহৎ তীর্থ হইয়া যায়। এই প্রকারে চতুর ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধধর্ম্মের সাঁল ও নোড়া লইয়া উহার দাঁতের গোড়া ভাঙ্গিয়া দেন এবং সাত্ত্বিকভাবে উহার পরাজয় সাধন করেন।

যেমন খৃষ্টজগতে মারটিন লুথর কর্ত্তৃক প্রটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হইবার পর সেইণ্ট ইগ্‌নেসাস লয়োলাপ্রমুখ ধর্ম্মসংস্কারকগণ ইউরোপের জনসাধারণের সহানুভূতি পাইয়া রোমান কাথলিক চার্চ্চের পুনঃ সংস্কার করত প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের গতি রোধ করেন, সেইরূপ এদেশেও শঙ্করাচার্য্যপ্রমুখ সংস্কারকবৃন্দ সনাতন হিন্দুধর্ম্মের আমূল সংস্কার করত বৌদ্ধধর্ম্মের পরাজয় সাধন করিয়াছিলেন। জগৎগুরু শঙ্করাচার্য্যদেব অল্পবয়সে সমগ্র বেদ-বেদান্তে পারদর্শিতা লাভ করিয়া

সন্ন্যাসব্রতে ব্রতী হন ও যোগসিদ্ধ হন। পরিশেষে নিরীশ্বরবাদী বৌদ্ধধর্ম্মের পরাজয়ের জন্য তিনি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন। সত্য বটে, দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার ও তৈমুরলঙ্গের ন্যায় তিনি চতুরঙ্গ বলে বেষ্টিত হইয়া দেশের পর দেশ দগ্ধ ও লুণ্ঠন করিতে করিতে লোক-ক্ষয় করেন নাই; কিন্তু তাঁহারই বিজয় যথার্থ সাত্ত্বিক বিজয়। তিনি নানা অঞ্চলের পণ্ডিতমণ্ডলী একত্রিত করিয়া ধর্ম্মবিষয়ে যে তুমুল আন্দোলনতরঙ্গ উত্থাপিত করেন, তাহাই সমগ্র ভারতে অভিব্যাপ্ত হইয়া মুমূর্ষু হিন্দুধর্ম্মকে পুনরুজ্জীবিত করে। তাঁহার উৎসাহরূপ অগ্নিশিখা সর্ব্বত্র যে দাবানল প্রজ্বলিত করে, তাহাতে বৌদ্ধধর্ম্ম ভস্মীভূত হইয়া যায়।

শঙ্করাচার্য্যদেব হিন্দুধর্ম্মের উন্নতি কল্পে যে সকল অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তন করেন ও যে সকল পুস্তক রচনা করেন, তাহাতে তাঁহার যশসৌরভ যাবচ্চন্দ্রদিবাকর দেদীপ্যমান থাকিবে এবং তাহার নাম ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত চিরদিন বিঘোষিত হইবে। গৃহস্থ দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত উন্নতি অসম্ভব বুঝিয়া তিনি ভারতের চতুষ্কোণে চারিটী মহামঠ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদিগের অনুকরণে হিন্দু সন্ন্যাসীকুল প্রথম প্রবর্ত্তন করিয়া যান। তাঁহার এই সকল শিষ্যানুশিষ্যগণ পূর্ব্বতন শাস্ত্রসমূহের তৎকালীন বিশ্বাসানুযায়ী আমূল সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করিয়া হিন্দুসমাজকে যেরূপ নবোৎসাহে উৎসাহান্বিত করেন, তাহাতে আধুনিক শৈব ধর্ম্মের জয়জয়কার ঘটে।

কোথায় হে পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্যদেব! ধন্য তোমার যোগবল! ধন্য তোমার সন্ন্যাসব্রতধারণ! ধন্য তোমার অসীম উৎসাহ! তুমি কোথায় বদ্রীনারায়ণ ও রামেশ্বরসেতুবন্ধ, কোথায় দ্বারকা ও শ্রীক্ষেত্র, কোথায় কাশী ও নাসিক, সর্ব্বস্থলে পদব্রজে হাঁটিতে হাঁটিতেও শীত-গ্রীষ্মের দারুণ কষ্ট উপেক্ষা করত সনাতন ধর্ম্মের কীর্ত্তিধ্বজা রোপিত

করিয়া যাও। তোমার নিকট এ ধর্ম্ম কিরূপ ঋণপাশে আবদ্ধ, তাহা কেহ একমুখে বর্ণন করিতে পারিবেন না। ভারতে তোমার জন্ম না হইলে আমাদের সনাতন হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃত দেবভাষা ভূপৃষ্ঠে বিলুপ্ত হইয়া যাইত। তখন কোথায় বা বেদবেদান্ত, কোথায় বা রামায়ণ ও মহাভারত, কোথায় বা ষড়্দর্শন, সকলই অনন্ত কালের অনন্ত স্রোতে ভাসিয়া যাইত।

বৌদ্ধধর্ম্মকে ভারত হইতে নির্ব্বাসিত করিবার জন্য হিন্দুরাজন্যবর্গ ও পণ্ডিতবর্গ যাহাই করুন না কেন, ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা উচিত, যে পৌরাণিক ধর্ম্ম ঈশ্বরকে পিতৃমাতৃভাবে, পতিপুত্রভাবে অপার ভক্তি ও প্রেমের সহিত আরাধনা করিতে শিখায় এবং আমাদের মনে সাত্ত্বিক ভাবরস উথলিয়া দেয়, সে ধর্ম্মের উৎকর্ষ বশতঃ, সে ধর্ম্মের মনোগ্রাহিতাবশতঃ বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতে স্বতঃ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

বৌদ্ধযুগে হিন্দুধর্ম্ম।

এই বিষয় ভালরূপ বর্ণন করিবার জন্য ঐ যুগকে তিনভাগে বিভক্ত করা উচিত।

(১) প্রাথমিক সময়।

(২) মধ্যবর্ত্তী সমৃদ্ধ সময়।

(৩) অন্তিম সময়।

প্রথম অবস্থায় বৈদিক যাগযজ্ঞের উপর সাধারণের অনাস্থা বর্দ্ধিত হইতে থাকে; এজন্য বৌদ্ধমত স্থানে স্থানে সাদরে গৃহীত হয়। মধ্যবর্ত্তী সমৃদ্ধ সময়ে হিন্দুদিগের ভিতর স্মার্ত্তধর্ম্ম প্রবল হয়; কিন্তু অনেক স্থলে ইহা টিম্ টিম্ করিতে থাকে। অন্তিম দশায় পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ধর্ম্ম নানাস্থানে স্ফুরিত হইতে থাকে।

রাষ্ট্রবিপ্লব বল, ধর্ম্মবিপ্লব বল, সকল প্রকার, সামাজিক বিপ্লব ঘটিবার পূর্ব্বে জাতীয় মন তজ্জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। বুদ্ধদেবের

আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতে বৈদিক যাগযজ্ঞের উপর অনেকের অনাস্থা বর্দ্ধিত হইতেছিল। তাহাদের মুখপাত্রস্বরূপ বুদ্ধদেব ভারতে অবতীর্ণ হইয়া বৈদিক যাগযজ্ঞের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হন। যে ধর্ম্মানুষ্ঠান সমাজে বহুকাল একঘেয়ে চলে, উহার উপর অনেকের অনাস্থা জন্মায়। এজন্য বুদ্ধদেবের মতামত অনেকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাতে বৌদ্ধধর্ম্ম বৈদিক ধর্ম্মের উপর সহজে জয়-লাভ করিতে সমর্থ হয়।

বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইবার অনেক পূর্ব্ব হইতে বৈদিকধর্ম্ম আর্য্য সমাজে স্মার্ত্ত ধর্ম্মে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। কালক্রমে বৈদিক ভাষায় অনেক পরিবর্ত্তন ঘটাতে চতুর্ব্বেদ সাধারণ পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়ে। সকলের উপকারার্থে শ্রুতিশাস্ত্র হইতে সহজ বোধগম্য আধুনিক সংস্কৃত ভাষায় স্মৃতিশাস্ত্রগুলি রচিত হইতে আরম্ভ হয়। উহাদের ভাষা যেমন বৈদিক ভাষা হইতে পৃথক, বিষয় ও তেমনি উহাদের হইতে পৃথক। ইহারা সাধারণপ্রচলিত বিশ্বাসানুযায়ী লিখিত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থে বৈদিক দেবতার পরিবর্ত্তে অন্যান্য দেবতার উল্লেখ পাওয়া যায়। সমাজের ক্রমোন্নতি ও ধর্ম্মোন্নতির সহিত সাধারণ বিশ্বাসগুলি যে ভাবে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে, ধর্ম্মও তদনুরূপ আকার ধারণ করে। এ কারণ বৈদিক ধর্ম্ম হইতে স্মার্ত্ত ধর্ম্মের এত পার্থক্য দেখা যায়।

স্মার্ত্তধর্ম্ম

এই ধর্ম্মানুসারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, সূর্য্য ও গণেশ এই পঞ্চ দেবতার পূজন ভারতের নানাস্থানে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এক এক দেবতা লইয়া এক এক মূল সম্প্রদায় হিন্দুসমাজে উত্থিত হয়। এই পঞ্চ দেবতার মধ্যে প্রথমে ব্রহ্মা, পরে শিব, তৎপরে বিষ্ণুর উপাসনা দেশবিশেষে প্রবল হয়। শুনিতে পাই, তৎকালে ইহাদের প্রতি-মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়া পূজিত হইত না।

যে সময়ে যোগসিদ্ধ কপিলদেবের সাংখ্যমত হিন্দুসমাজে আদৃত হইতে আরম্ভ হয়, সেই সময় হইতে প্রকৃতির ত্রিগুণানুসারে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর পরব্রহ্মের সৃষ্টিস্থিতিসংহারকারী ত্রিমূর্ত্তি রূপে পূজিত হইতে আরম্ভ হয়। সূর্য্যদেবের পূজন বৈদিক সময় হইতে চলিয়া আইসে। গণেশ বা গণপতির পূজন মহারাষ্ট্র দেশে প্রবল হয়।

যে সময়ে মনুসংহিতা রচিত হয়, সে সময়ে হিন্দুধর্ম্মের ব্রহ্মযুগ প্রবর্ত্তিত বলা উচিত। আজকাল বিষ্ণুর যে সকল গুণবাচক শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে, ব্রহ্মযুগে সে সকল শব্দ ব্রহ্মায় প্রযুক্ত হইত। এখন বিষ্ণু নারায়ণ, ব্রহ্মযুগে ব্রহ্মা নারায়ণ ছিলেন। তৎকালে লোকে ব্রহ্মার মৎস্য প্রভৃতি অবতার গ্রহণে বিশ্বাস করিত। এখন ব্রহ্মার কোন উপাসক-সম্প্রদায় ভারতে বর্ত্তমান নাই। শিবোপাসনা প্রবল হইয়া ব্রহ্মার উপাসনা লোপ করিয়া দেয়। এজন্য শাস্ত্রে দেখিতে পাই, মহাদেব ব্রহ্মার একটী মস্তক ছেদন করেন। শিবোপাসকগণ শাস্ত্রে তাঁহার ভূয়সী নিন্দা করেন। তিনি স্বদুহিতার উপর প্রেমাসক্ত, এ অপরাদ তাঁহারাই প্রচার করেন।

সত্যবটে, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থায় হিন্দুসমাজে আধুনিক পৌরাণিক ধর্ম্ম আদৌ বিকাশ পায় নাই, তথাচ ইহার মৌলিক বিশ্বাসগুলি স্মার্ত্তধর্ম্মের উন্নতির সহিত বহুকাল হইতে সমাজে ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইতে ছিল। তাহার সাক্ষ্য, যে শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ অসাধারণ বীরত্ব ও লোকাতিগ গুণগ্রামের জন্য ক্ষত্রিয়সমাজে বহুকাল হইতে বিখ্যাত হন এবং যাঁহাদের কীর্ত্তিকলাপ আদিরামায়ণে ও আদিমহাভারতে গীত হওয়ায় উঁহাদের উপর জনসাধাণের বিশ্বাস ও ভক্তি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তাঁহারা উত্তরকালে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া পূজিত হন।

যে লিঙ্গোপাসনা বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে

এসিয়ার পশ্চিমাঞ্চল হইতে ভারতে প্রবেশ করে, সেই শৈবধর্ম্ম কয়েক শতাব্দীর ভিতর ভারতে সর্ব্বত্র প্রবল হয় এবং কাশী ইহার কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠে। শঙ্করাচার্য্যদেব শৈবধর্ম্মের সম্যক উন্নতিসাধন করিয়া যান। কথিত আছে, তিনি অষ্টম শতাব্দীতে মালেবর দেশে জন্মগ্রহণ করেন। যে মহাত্মার নিকট হিন্দুধর্ম্ম চিরঋণে আবদ্ধ, দেখ, তিনি দরিদ্রের গৃহে পাণ্ডব-বর্জ্জিত দেশে জন্মগ্রহণ করেন। ভগবল্লীলা কে বুঝিতে পারে ?

বৌদ্ধধর্ম্মের অন্তিম দশায় পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ধর্ম্ম হিন্দুসমাজে পূর্ণভাবে বিকসিত হয় এবং এ ধর্ম্মের ভক্তিযোগও পূর্ণভাবে বিকাশ পায়। এই ভক্তিযোগের সমক্ষে নিরীশ্বরবাদী বৌদ্ধধর্ম্ম দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করে। এই মহাবন্যায় উপরোক্ত ধর্ম্মের তৃণগাছটী পর্য্যন্ত ভাসিয়া যায়।

বৌদ্ধধর্ম্ম বিলোপে ভারতের মঙ্গলামঙ্গল।

যদি ভারতে বৌদ্ধধর্ম্ম লুপ্ত না হইয়া হিন্দুধর্ম্ম লোপ পাইত, ইহার ভাগ্যনেমি বিভিন্ন রূপে বিঘূর্ণিত হইত। যে দেশ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতির বুদ্ধিভ্রংশবশতঃ নানা ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছে সে দেশ চীনের ন্যায় এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধীন থাকিত। যে দেশ ক্ষত্রিয় জাতির বুদ্ধিভ্রংশবশতঃ বিভিন্ন ভাষাভাষী ও চির বিদ্বেষানলে দূষিত, সে দেশ বুদ্ধদেবের কল্যাণে একভাষী হইয়া সুদৃঢ় একতায় নিবদ্ধ হইত। যে দেশ বিগত সাত শত বৎসর পরাধীন হইয়া বিধর্ম্মী রাজার নানা নিগ্রহ ও অত্যাচার সহ্য করিতেছে, সে দেশ চিরদিন স্বাধীনতাসুখে সুখী হইত। জাতিভেদ থাকাতে যে দেশ চিরদিন জাতিবিদ্বেষে কলুষিত, সে দেশ একজাতি গঠন করিয়া পরমানন্দে থাকিত। যে দেশ চিরদিন আধ্যাত্মিক বিষয়ে অত্যুন্নত ও আধিভৌতিক বিষয়ে পশ্চাৎপদ, সে দেশ বুদ্ধদেবের কল্যাণে উভয় বিষয়ে

অত্যুন্নত হইত। কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম লুপ্ত হইলে সংস্কৃতদেবভাষা ও বেদবেদান্তাদি ধর্ম্মশাস্ত্র ভূপৃষ্ঠে লোপ পাইত এবং আমরা এখন যেমন ভাবরসে উথলিয়া উঠিতেছি, সে ভাবরস শুষ্ক হইয়া যাইত।

বিলুপ্ত বৌদ্ধধর্ম্মের স্থায়ি চিহ্ন।

(১) প্রাকৃত পালী ভাষায় লিখিত বৌদ্ধ গ্রন্থগুলি এখনও ভারতের নানাস্থানে পাওয়া যায়।

(২) হিন্দুশাস্ত্রানুসারে জগতে নাস্তিকমত প্রচারার্থ বিষ্ণুর নবম অবতারে বুদ্ধদেবের আবির্ভাব।

(৩) যে গয়াধামে বুদ্ধদেব বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়া নিজ ধর্ম্মমত গগনভেদি রবে প্রচার করিতে আরম্ভ করেন এবং যাহা চিরদিনের জন্য বৌদ্ধদিগের এক প্রধান তীর্থ, সেই গয়া আজ হিন্দুদিগেরও এক প্রধান তীর্থ। তথায় পিতৃপুরুষদিগের উদ্দেশে পিণ্ডদান দিলে উহাদের অক্ষয় স্বর্গবাস হয়। এস্থলে হিন্দু ও মুসলমান জাতির ব্যবহার দেখ। বিধর্ম্মী আরঙ্গজীব হিন্দুধর্ম্ম বিলোপের জন্য কাশীর বিশ্বেশ্বরের মন্দির ভগ্ন করিয়া উহার উপাদানে নিকটে এক মসজিদ্ নির্ম্মাণ করান। বিধাতার ভবিতব্য, বিশ্বেশ্বরের মন্দির পুনঃ নির্ম্মিত হইল এবং উহার চুড়াদেশ স্বর্ণপটাহে আবৃত হইল। তথায় লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী নানাদেশ হইতে আসিয়া বিশ্বেশ্বরের পূজা করিতেছে, আর আরঙ্গজীবনির্ম্মিত মসজিদ্‌টী একপাশে প্রায় জনশূন্য ভাবে পড়িয়া আছে। ব্রাহ্মণগণ বুদ্ধগয়ার ধ্বংসসাধন করেন নাই। উহা পূর্ব্বে যেমন ছিল, এখনও তেমনি আছে। কিন্তু উহার সন্নিকটে হিন্দুমাত্রেরই অবশ্যপ্রতিপাল্য পূর্ব্বপুরুষদিগের উদ্দেশে পিণ্ডদানের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহারা যথার্থ সাত্ত্বিকভাবে বৌদ্ধধর্ম্মের পরাজয় সাধন করেন।

(৪) শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি যথার্থতঃ বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি। কৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রা বৌদ্ধধর্ম্মের ত্রিমূর্ত্তি অনুসারে হিন্দুশাস্ত্র

হইতে গৃহীত। তথাকার মহাপ্রসাদ জাতিভেদাবজ্ঞাকারী বৌদ্ধমতের পরিচায়কমাত্র। তথাকার রথযাত্রাও বৌদ্ধ ও জৈনদিগের রথ চালনার পরিচয় দিতেছে।

(৫) ভারতের নানাস্থলে এখনও বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি ধ্যানমগ্ন শিবমূর্ত্তি বলিয়া পূজিত হইতেছে।

(৬) অশোকাদি নৃপতিগণের কীর্ত্তিস্তম্ভ ও তাঁহাদের খোদিত অনুশাসনপত্র।

(৭) অজয়স্ত, ইলোরা ও এলিফাণ্টা দ্বীপের পর্ব্বতগহ্বরস্থ পূর্ব্বতন মন্দিরাদি ও প্রতিমূর্ত্তি।

(৮) নানাস্থানের বৌদ্ধবিহার ও স্তূপের ভগ্নাবশেষ।

ব্রাহ্মণঠাকুরেরা যাহাই বলুন না কেন, উপরোক্ত স্মৃতিচিহ্নগুলি ভারতে বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তৃতির পূর্ণ পরিচয় দিতেছে।

পরিশেষে বক্তব্য, বৈদিক যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান অপেক্ষা অহিংসাপরায়ণ, নীতিপ্রধান বৌদ্ধধর্ম্ম যে শ্রেষ্ঠ, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আবার যে ধর্ম্ম পরব্রহ্ম বা ঈশ্বরের আরাধনা না করিয়া তাঁহার স্থানে স্বপ্রবর্ত্তক বুদ্ধদেবকে পূজা করিতে শিখায়, যে ধর্ম্ম মানবমনের সাত্ত্বিক ভাবগুলির স্ফূর্ত্তি আদৌ জানে না, সে ধর্ম্ম অপেক্ষা উহার বিজেতা, পৌরাণিক ধর্ম্ম যে শ্রেষ্ঠ, তদ্বিষয়েও কোনরূপ সন্দেহ নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের বিলোপসাধনে ব্রাহ্মণজাতির যে অপার বুদ্ধিকৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা অতীব প্রশংসনীয়। মুসলমান ও খৃষ্টধর্ম্ম তরবারি বলে, পাশব বলে অন্য ধর্ম্মের বিলোপসাধন করিয়াছে। কিন্তু সনাতন হিন্দুধর্ম্ম কোথাও এক বিন্দু শোণিতপাত না করিয়া নিজের তেজেও সাত্ত্বিকভাবে স্বশত্রুবর্গকে পরাস্ত করিয়া উহাদিগকে কালক্রমে স্বসমাজে সমীকৃত করিয়া লইয়াছে। ইহা অপেক্ষা ব্রাহ্মণজাতির পক্ষে গৌরবের বিষয় আর কি হইতে পারে? এ জাতি প্রভূত শক্তির আধার। এই যে আজ ভারতের ষষ্ঠাংশ লোক

মুসলমান দেখিতেছ, যদি এ জাতি পুনর্বায় রাজশক্তির সম্পূর্ণ সহায়তা প্রাপ্ত করে, উহারা কালক্রমে সমস্ত মুসলমানদিগকে হিন্দু করিয়া লইতে পারে।

পৌরাণিক যুগে হিন্দুধর্ম্ম।

খৃঃ ৫০০ হইতে খৃঃ ১২০০, ৭০০ বৎসর

নিরীশ্বরবাদী বৌদ্ধধর্ম্মকে ভারত হইতে নির্ব্বাসিত করিবার পর পূজ্যপাদ ব্রাহ্মণগণ সকল বিপদ আপদ হইতে উদ্ধার পাইয়া নির্ব্বিবাদে ও নির্ব্বিঘ্নে পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করিতে থাকেন। তাঁহাদের মুখপাত্রস্বরূপ শঙ্করাচার্য্য ও রামানুজ স্বামী দক্ষিণাপথে আবির্ভূত হইয়া শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করিয়া যান। আর যে কত অজ্ঞাতনামা মহোপাধ্যায় পণ্ডিত পুরাণাদি লিখিয়া পৌরাণিক ধর্ম্মের বিস্তার করেন, ভারতের ইতিহাসে তাঁহাদের কোনরূপ নিদর্শন নাই।

বৈদিকযুগে ফলমূলাহারী ঋষিদিগের যেরূপ সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল, পৌরাণিকযুগে ব্রাহ্মণগণ হিন্দুসমাজে সেইরূপ পূজ্য হন। এই সময় তাঁহাদের ভাগ্য অতি সুপ্রসন্ন। সমগ্র ভারতের রাজন্যবর্গ, কি রাজাধিরাজ, কি সামান্য জায়গীরদার, সকলেই তাঁহাদের প্রধান সহায়, পৃষ্ঠপোষক ও আশীর্ব্বাদপ্রার্থী। সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া যে বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত তাঁহারা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত ছিলেন, তাহা এখন বিলুপ্ত। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকুল আর নাই, তৎপরিবর্ত্তে হিন্দু-সন্ন্যাসীগণ দেশে দেশে হিন্দুধর্ম্মের বিজয়ভেরী বাজাইতেছেন। এখন তাঁহারাই হিন্দুসমাজে সর্ব্বেসর্ব্বা; তাঁহারাই রাজন্যবর্গের প্রধান পরামর্শদাতা। দেবত্রে ও ব্রহ্মত্রে তাঁহাদের ঘর, দ্বার ও উদর ভোরপুর।

বিলুপ্ত ধর্ম্মের পূজাপদ্ধতি ও মালমসলা লইয়া তাঁহারা সনাতন

হিন্দুধর্ম্মের পুরাতন বনিয়াদের উপর নূতন হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিলেন। এই সময়ে দেশে দেশে বিবিধ পুরাণ, উপপুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্র রচিত হওয়ায় সমগ্র ভারত শাস্ত্রগ্রন্থে ছাইয়া পড়ে এবং আধুনিক হিন্দুধর্ম্মের ভক্তিমার্গ সম্যক বিকাশ পায়। এই সময়ে দেশে দেশে বৃত্তি অনুসারে আধুনিক জাতিভেদপ্রথা সর্ব্বত্র প্রবর্ত্তিত হয়। তদানীন্তন রাজন্যবর্গ সমাজপতি ব্রাহ্মণদিগের সুপরামর্শানুসারে পৌরাণিক ধর্ম্মের সম্যক পোষকতা করেন এবং লক্ষ লক্ষ রজৎমুদ্রা ব্যয় করিয়া সুবিশাল মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করত স্বধর্ম্মের উন্নতিসাধনে সবিশেষ মনোনিবেশ করেন। তাঁহাদের নির্ম্মিত মন্দিরগুলি কালের সর্ব্বসংহারিকা শক্তি উপেক্ষা করত এখনও আকাশমার্গে স্বীয়,মস্তক উত্তোলন পূর্ব্বক সগর্ব্বে তাঁহাদের বদান্যতার কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ দেদীপ্যমান আছে। শ্রীক্ষেত্র, রামেশ্বর প্রভৃতি তীর্থস্থলের মন্দিরাদিদর্শনে কাহার না মন ভক্তিরসে আপ্লুত হইবে? এই সময়ে হিন্দুসমাজে কোথাও শৈবধর্ম্ম, কোথাও বৈষ্ণবধর্ম্ম, কোথাও শাক্তধর্ম্ম প্রবল হইতে থাকে। এই সময়ে যে সকল পুরাণ, উপপুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্র রচিত হয়, উহারাই উপরোক্ত ত্রিবিধধর্ম্মকে দেশবিশেষে প্রবল করিয়া দিয়াছে।

সত্য বটে, যাবতীয় পুরাণ ও উপপুরাণ পৌরাণিক ধর্ম্মের সম্যক পোষণ, বর্দ্ধন ও উন্নতিসাধন করে এবং নানা দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি-পূজন বিধিবদ্ধ করে, তথাচ স্থিরনিশ্চয় জানিবে, অতি প্রাচীন কাল হইতে ঐ সকল দেবদেবীর উপর বিশ্বাস সমাজের অস্থিমজ্জায় নিহিত ছিল। পৌরাণিকগণ সমাজের সাধারণ বিশ্বাসগুলিকে নূতন পরিচ্ছদে ও নূতন অলঙ্কারে বিভূষিত করিয়া সাধারণের সমক্ষে ধারণ করিয়াছেন; ইহাতে ঐ সকল বিশ্বাস জাতীয় হৃদয়ে আরও বদ্ধমূল হইয়াছে। যেমন ব্যাকরণ রচিত হইবার বহুপূর্ব্ব হইতে ভাষা সমাজে চলিতে থাকে এবং ইহার নিয়মাবলি গঠিত হইতে

থাকে, পরে ব্যাকরণ লিখিত হইয়া ইহার সম্যক উন্নতিসাধন ঘটে; সেইরূপ অকৃত্রিম ধর্ম্মের বিশেষত্ব এই যে, সমাজে কালবশে যে সকল বিশ্বাস ও মতামত উত্থিত হয়, শাস্ত্রকারেরা আপনাদের উন্নত জ্ঞানের সাহায্যে ঐ সকল বিশ্বাসকে নূতন বেশভূষায় বিভূষিত করিয়া ধর্ম্মের উন্নতিসাধন করিয়া গিয়াছেন।

তাহার সাক্ষ্য দেখ, শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ লোকাতিগ গুণরাশির জন্য বহুকাল হইতে সকলের আদর্শপুরুষ হওয়াতে হিন্দুসমাজে পূজিত হইতেছিলেন। পরে পৌরাণিক যুগে শাস্ত্রকারেরা তাঁহা-দিগকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া মানাতে তাঁহারা সমাজে আরও অধিক পূজনীয় হন। সেইরূপ পৌরাণিকগণ এক দিবসে এক সভায় বসিয়া তমঃপ্রধান শিবকে বিশ্বের সংহারকর্ত্তা ও সত্ত্বপ্রধান বিষ্ণুকে ইহার পালনকর্ত্তা বলিয়া প্রতিপাদন করেন নাই। উহাদের উপর সাধারণের বিশ্বাস বহুকাল হইতে সমাজে চলিতে ছিল, পরে শাস্ত্রকারেরা আপনাদের উন্নত দার্শনিক জ্ঞানের সাহায্যে উহাদের ভালরূপ মীমাংসা করিয়া ঐ সকল বিশ্বাস সমাজে আরও বদ্ধমূল করিয়াছেন। বিজ্ঞানের মতে এ সকল ধর্ম্মমত সামাজিক নির্ব্বাচনে হিন্দুসমাজে প্রতিষ্ঠিত ও কালক্রমে বিকসিত বলা উচিত।

বৈদিক ও স্মার্ত্তযুগে নানা দেবদেবীর উপর সকলে বিশ্বাস করিত বটে, কিন্তু উহাদের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া কেহ পূজা করিতে শিখে নাই। বৌদ্ধদিগের ভিতর বুদ্ধদেবের মূর্ত্তিপূজনের অনুকরণে হিন্দুসমাজেও পৌরাণিক যুগে মূর্ত্তিপূজনের সূত্রপাত হয়। এ কথা কতদূর সত্য তাহা বলা যায় না। পাঞ্জাব প্রদেশের ভূগর্ভ খনন করিয়া প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিতেছেন, পঞ্চ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের অনেক পূর্ব্বে ভারতে ইষ্টক-নির্ম্মিত মন্দিরের নিদর্শন পাওয়া যায়। যখন মন্দির পাওয়া যাইতেছে, তখন মন্দিরাধিষ্ঠিত দেবমূর্ত্তিও ছিল। সে যাহা হউক,

প্রথমে লিঙ্গোপাসনা আরম্ভ হয় এবং তদবধি ভারতে শিবলিঙ্গ-পূজন সর্ব্বত্র চলিতেছে।

লিঙ্গোপাসনার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া অনেকে মনে করেন, ভক্তি প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রবৃত্তিগুলি স্ফুরিত হইবার পূর্ব্বে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি হৃদয়ে সমধিক প্রবল ছিল। এখনও জনসাধারণ নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি দ্বারা যতদূর চালিত হইতেছে, উহারা ধর্ম্মপ্রবৃত্তি দ্বারা সেরূপ চালিত হয় না। নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির মধ্যে কামরিপু চিরদিন মানব-হৃদয়ে সম্যক প্রবল; এজন্য অতি পুরাকাল হইতে নিকৃষ্ট সুখাসক্ত মানব কামরিপু সেবনের প্রধান অঙ্গ, লিঙ্গ ও যোনির উপাসক হয়। যেমন বর্ব্বরাবস্থায় বাহ্যজগতের ভীতিবিস্ময়োদ্দীপক নৈসর্গিক দৃশ্যপটল তাহার সরল অন্তঃকরণকে প্রথম আকৃষ্ট করত তাহাকে ধর্ম্মপথে লইয়া যায়, সেইরূপ সৃষ্টিরক্ষার প্রধান অঙ্গীভূত জননেন্দ্রিয়-দ্বয় তাহার চিত্তকে আকৃষ্ট করত উহাদের উপাসনায় তাহাকে ধর্ম্ম পথে আরও অগ্রসর করায়। এ কারণ পুরাকাল হইতে লিঙ্গোপাসনা মানবসমাজে চলিতেছিল। ইতিহাসপাঠে অবগত হওয়া যায়, এইরূপ লিঙ্গোপাসনা মিসর, এসিরিয়া, ব্যাবিলন, মিডিয়া, গ্রীশ, রোম প্রভৃতি নানা সভ্যজনপদবর্গে প্রচলিত ছিল এবং এতৎ সম্বন্ধে এ সকল দেশে নানা বীভৎস কাণ্ড-সংঘটিত হইত।

ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, যৎকালে ভারতের আর্য্যজাতি পারসীকদিগের সংস্রবে ছিল, তৎকালে আর্য্যসমাজে সূর্য্য ও অগ্নির উপাসনা প্রচলিত হয়। তৎপরে যে সকল পৌত্তলিক জাতি পশ্চিমোত্তর হইতে আগমন করিয়া ভারতে প্রবেশ করে এবং হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার অবলম্বন করিয়া হিন্দুসমাজভুক্ত হইয়া যায়, উহারা ভারতে লিঙ্গোপাসনা আনয়ন করে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে এ ঘটনা খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীতে সংঘটিত হয়। আবার অনেকে বলেন, লিঙ্গোপাসনা ভারত হইতে অন্যান্য দেশে নীত হইয়াছে।

লিঙ্গোপাসনা ভারতে প্রবর্ত্তিত হইবার পর ব্রাহ্মণ-জাতির জ্ঞান-ধর্ম্মের উন্নতির সঙ্গে ইহা ক্রমশঃ উন্নত ভাব ধারণ করিতে থাকে। যে লিঙ্গোপাসনা নিকৃষ্ট সুখের পরিচায়ক, যাহা লইয়া অন্যান্য দেশে নানা বীভৎস কাণ্ড অনুষ্ঠিত হইত, সেই অসভ্যোচিত লিঙ্গোপাসনা পাইয়া ধর্ম্মাত্মা ব্রাহ্মণগণ ইহার মহোচ্চ ও স্বর্গীয় ভাব স্ফুরণ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা পান। তাঁহারা ইহাকে পরমেশ্বর-পরমেশ্বরীর পূজায় বা প্রকৃতি-পুরুষের পূজায় পরিণত করিয়া লন। আমরাও ভক্ত সন্তানবৎ সেই শিবলিঙ্গকে জগৎপিতা জগদীশ্বর জ্ঞান করিয়া অশেষ ভক্তিভাবে পূজা করি এবং শিবযোনিকে জগদম্বা মহেশ্বরী জ্ঞান করিয়া অশেষ ভক্তিভাবে মা! মা! বলিয়া ডাকি ও তাঁহার পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করি। দেখ, যে লিঙ্গোপাসনা বৌদ্ধ, খৃষ্ট ও মুসলমান ধর্ম্মপ্রবর্ত্তনের সঙ্গে অন্যান্য দেশে বিলুপ্ত হইয়াছে, সে ধর্ম্মকে ব্রাহ্মণগণ এ দেশে কি ভাবে রক্ষা করিলেন।

লিঙ্গোপাসনার সহিত হিন্দুসমাজে পৌত্তলিকতার প্রথম সূত্রপাত হয়। শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা প্রবর্ত্তিত হইবার পর কালক্রমে বিশ্বেশ্বর, কেদারনাথ, সোমনাথ, রামেশ্বর, বদ্রীনাথ, ওঙ্কারনাথ প্রভৃতি দ্বাদশ শিবলিঙ্গ ভারতের নানাস্থানে জাগ্রত দেবতা জ্ঞানে পূজিত হইতে থাকে। উহাদের উপর জনসাধারণের বিশ্বাস ও ভক্তি যে ভাবে বর্দ্ধিত হয়, পৌরাণিকগণ উহাদের মাহাত্ম্য ও মহিমা স্ব স্ব গ্রন্থে সেই ভাবে প্রচার করেন এবং রাজন্যবর্গও উহাদের মন্দিরাদি নির্ম্মাণে ও পূজনাদি বিষয়ে সেইরূপ মুক্তহস্ত হন। ঐ সকল শিবলিঙ্গ কোন্ সময়ে ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কিন্তু ইহা সুনিশ্চিত, স্মরণাতীত কাল হইতে উহাদের পূজা হিন্দুসমাজে চলিয়া আসিতেছে এবং উহাদের পীঠস্থল চিরদিন আমাদের মহৎ তীর্থ।

পৌরাণিক যুগে যাবতীয় দেবদেবীর মূর্ত্তি গঠিত হইয়া সর্ব্বত্র

পূজিত হইতে থাকে। এই প্রকারে পৌত্তলিকতার কালোচিত উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে।

এই সকল দেবতার মূর্ত্তি ও অলঙ্কারাদি একমাত্র পুরাণে ও তন্ত্রশাস্ত্রে প্যাওয়া যায়। ইহাতে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, পৌরাণিক যুগে পরমভক্ত সাধক কবিগণ উহাদের মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া পৌত্তলিকতার সম্যক স্ফূর্ত্তি করিয়া যান। তাঁহারা বলেন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বর, দুর্গা, কালী, সরস্বতী, লক্ষ্মী প্রভৃতি পূজ্য দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি ক্রমবিকাশে হিন্দুজাতির মানসক্ষেত্রে উদিত হইয়াছে। সাধকগণের হৃদয়ে দেবোদ্দেশে ভক্তি যেরূপ স্ফুরিত হইতে থাকে, ভক্তিসূচক উপাদান লইয়া পূজ্য দেবতাদিগের মূর্ত্তি, রূপ ও অলঙ্কার ধীরে ধীরে কল্পিত ও বর্ণিত হইয়াছে। সত্ত্বপ্রধান বিষ্ণু একদিনে এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী পদ্মপলাশলোচন চতুর্ভুজ শ্রীবিষ্ণু হন নাই। মহাদেবের প্রতিমূর্ত্তিও সেইরূপ ভক্তসাধকদিগের নূতন নূতন ভক্তিসূচক উপাদানে গঠিত হইয়াছে।

এস্থলে আমরা পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মুখে ছাই দিয়া চিরদিন বলিব, এ সকল মূর্ত্তি আদৌ কল্পিত নহে। যোগসিদ্ধ মহর্ষিগণ দিব্যচক্ষে সূক্ষ্মজগৎস্থ দেবগণকে যেরূপ দেখিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহারা শাস্ত্রে বর্ণন করিয়া আমাদিগকে দেখাইয়া যান। যদি ইহাতেও তোমার মনের সন্দেহ দূর না হয়, তুমি মনে করিবে, ঈশ্বরকে নিরাকার রূপে ভাব বা সাকার মূর্ত্তিতে ভাব, যাহাতে তাঁহার প্রতি আন্তরিক ভক্তি সহজে প্রদর্শিত হইবে, তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পন্থা।

শৈবধর্ম্মানুসারে দেবাদিদেব মহাদেব পরব্রহ্মস্থানে পূজিত হন এবং তিনি তাঁহার প্রধান মায়ারূপ। তিনি সকলের নিকট পরাৎপর পরমপিতা পরমেশ্বর। তমঃপ্রধান মহাদেব সংসারের তমোগুণোদ্ভূত যাবতীয় অমঙ্গলরাশি দূরীভূত করেন, এজন্য তিনি শঙ্কররূপা বা শিবরূপী।

জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য্যদেবপ্রবর্ত্তিত সন্ন্যাসিকুল শৈবধর্ম্মকে ভারতে

বহুপ্রচারিত করিয়াছেন। তাঁহারাই মহাদেবকে পিতৃভাবে পূজা করিতে সর্ব্বত্র উপদেশ দিয়াছেন। যৎকালে অন্যান্য দেশে পরম পিতা পরমেশ্বর নিরাকাররূপে পিতৃভাবে পূজিত হন, তৎকালে দেবাদিদেব মহাদেব হিন্দুসমাজে সাকাররূপে পিতৃভাবে পূজিত হইতে থাকেন। এখনও বাবা তারকনাথ, বাবা বদ্রীনাথ বলিতে হিন্দুমাত্রেরই পিতৃভক্তি শতসহস্রধারে উথলিয়া উঠিতেছে। এখনও হিন্দুসমাজ "বুড়ো শিবের পায়ে সেবা" দিতে উন্মত্ত। এস্থলে বলা উচিত, বৃষবাহন, ত্রিশূলধারী অজিনবাসা জটামৌলি ভোলানাথের মূর্ত্তি সন্ন্যাসীদিগের মনোভিমত হইলেও গৃহস্থ জনসাধারণের সেরূপ মনোমত হয় নাই। এজন্য উত্তরকালে ভারতের নানাস্থানে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রবল হইয়াছে।

শৈবধর্ম্মানুসারে সমাজে দুইটী মহোৎসব এখনও প্রচলিত আছে, শিবরাত্র ও চড়কোৎসব। শিবরাত্রের দিন হিন্দুমাত্রেই উপবাসে থাকিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন এবং চৈত্রমাসে এখনও পল্লীগ্রামে অনেকে সন্ন্যাসী সাজিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করে। প্রজাবৎসল ইংরাজ-রাজের কল্যাণে আমাদের চড়কোৎসব লুপ্তপ্রায়।

বৈষ্ণব ধর্ম্ম।

পৌরাণিক যুগে বৈষ্ণবধর্ম্ম ভারতের নানা অঞ্চলে প্রচারিত হয়। যে ধর্ম্মাত্মা হিন্দু ঈশ্বরকে মনের সকলভাবে পূজিতে ইচ্ছা করেন, তিনি কি তাঁহাকে একমাত্র পিতৃভাবে পূজিয়া সন্তুষ্ট হইবেন? এজন্য তমঃপ্রধান মহাদেবকে পিতৃভাবে পূজিয়া তাঁহার মন যথার্থ অকৃতার্থ হইয়াছিল। তখন তিনি ভক্তিপ্রেমাদি মনের সাত্ত্বিক ভাবাবলির স্ফূর্ত্তির জন্য লালায়িত হইলেন। ইহাদের সম্যক স্ফূর্ত্তির জন্য সত্ত্বপ্রধান বিষ্ণুর উপাসনা প্রচারিত হইয়া সাধারণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিল। এই সময়ে বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবতাদি রচিত হওয়ায়

বৈষ্ণবধর্ম্মের জয় জয়কার ঘটে। এই প্রকারে হিন্দুধর্ম্মের চূড়ান্ত সময় আইসে এবং ধর্ম্মাত্মা হিন্দু মনের বিবিধ সাত্ত্বিকভাব ঈশ্বরে চালিয়া দিয়া হরি হরি বলিতে বলিতে ঈশ্বরপ্রেমে গদ্‌গদ হইয়া তাথৈ তাথৈ নৃত্য করিতে শিক্ষা করেন।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, বৈষ্ণবধর্ম্ম হিন্দুসমাজে কালক্রমে বিকসিত হইয়াছে। যে বিষ্ণু বৈদিক যুগে আদিত্য বিশেষ, পরে দার্শনিক যুগে হস্তপদের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা ছিলেন, তিনি পৌরাণিক যুগে পরব্রহ্মের বিশ্বপালনকর্ত্তা, সত্ত্বপ্রধান প্রধান মায়ারূপ হন এবং তদবধি হিন্দুসমাজে তিনি এইভাবে পূজিত হইতেছেন। এজন্য তাঁহারা উপহাস করিয়া বলেন, বৈদিক যুগের সামান্য আদিত্যরূপী বিষ্ণুর পদমর্য্যাদা শাস্ত্রে বর্দ্ধিত হওয়ায় কালক্রমে তিনি পরাৎপর পরমেশ্বরের পদ অধিকার করেন। যখন তাঁহাদের গড (god) শব্দ সামান্য দেবতা বুঝায় এবং ঐ শব্দের আদ্যক্ষর বড় করিলে (God) পরমেশ্বর বুঝায়, তখন তাঁহারা কেন আমাদের ধর্ম্মের উপর উপহাস করেন? সকলেরই গলদ দেখা যায়। তবে কেন একজন অপরের ধর্ম্মের উপর বিদ্রূপ করেন?

স্মার্ত্তযুগে যখন স্মার্ত্তধর্ম্ম হিন্দুসমাজে প্রবল হয়, তখন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সূর্য্য ও গণেশ এই পঞ্চ দেবতার মধ্যে বিষ্ণুর উপাসনা স্থানে স্থানে প্রবর্ত্তিত হয়। বৌদ্ধযুগে একদিকে শৈবধর্ম্ম, অপরদিকে বৈষ্ণব ধর্ম্ম ক্রমশঃ হিন্দুসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে থাকে। পৌরাণিক যুগে এই দুই প্রকার সম্প্রদায় প্রবল হইয়া অন্য তিন সম্প্রদায়কে (ব্রাহ্মিক, সৌর ও গাণপত্য) পশ্চাৎপদ করিয়া দেয়। কালক্রমে তমঃপ্রধান শিবের আরাধনার পরিবর্ত্তে সত্ত্বপ্রধান বিষ্ণুর উপাসনা নানা স্থানে প্রবল হইয়া উঠে। শ্মশানবাসী অজিনবাসা

ভস্মাবৃত ভোলানাথ সন্ন্যাসীকুলের মনোমত হইলেও গৃহস্থদিগের প্রীতিকর হয় নাই এবং শাস্ত্রকারেরা তাঁহাদের সন্তোষের জন্য পদ্মপলাসলোচন, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, পিতম্বরবাসা শ্রীবিষ্ণুর বা শ্রীকৃষ্ণের পূজন বহু প্রচারিত করেন। এদিকে বিষ্ণুপ্রধান পুরাণগুলি রচিত ও প্রচারিত হওয়ায় বৈষ্ণব ধর্ম্ম শৈবধর্ম্মকে নানাস্থানে পরাস্ত করিয়া দেয়।

পরে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে মহাত্মা রামানুজস্বামী দক্ষিণাপথে আবির্ভূত হইয়া বেদান্তমতের নূতন ব্যাখ্যা (বিশিষ্টাদ্বৈত বাদ) প্রচার করত বৈষ্ণব সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করিয়া যান। যেমন জগৎগুরু শঙ্করাচার্য্যদেব বৌদ্ধধর্ম্মের অন্তিম দশায় হিন্দুধর্ম্মের পুনরুজ্জীবন মানসে মঠাদিনির্ম্মাণ পূর্ব্বক শৈবসন্ন্যাসীকুল প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, সেইরূপ ধর্ম্মাত্মা রামানুজস্বামী বৈষ্ণবধর্ম্মের উন্নতিকল্পে নানাস্থানে আখড়া নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বৈষ্ণব সন্ন্যাসীকুল প্রবর্ত্তন করিয়া যান। আজকাল সমগ্র ভারতে যে সকল বৈষ্ণব সম্প্রদায় দেখা যায়, তিনি সকলের আদিগুরু এবং সকলেই তন্নির্দ্দিষ্ট পন্থা অবলম্বন করিতেছে।

যাহা হউক, যে দাক্ষিণাত্য বানর ও রাক্ষসের বাসভূমি, এবং যে দেশ কৃষ্ণাঙ্গ অনার্য্য জাতিতে পরিপূর্ণ, যেখানে আর্য্যসভ্যতা বহুপরে বিস্তীর্ণ হয়, সেই দাক্ষিণাত্যই আধুনিক পৌরাণিক ধর্ম্মের জন্মভূমি এবং ঐ অঞ্চল হইতে এ ধর্ম্ম সমগ্র ভারতে প্রচারিত হইয়াছে। এই দেশে উপরোক্ত দুই মহাত্মা যে দুন্দুভি বাজাইয়াছেন, তাহা এতকাল সর্ব্বত্র প্রতিধ্বনিত হইতেছে। ধন্য সে দেশ, যেখানে তাঁহারা আবির্ভূত হইয়া ভারত পবিত্রীকৃত করিয়াছেন। আর সে দেশের রাজন্যবর্গ ধন্য, যাঁহারা সুবৃহৎ মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়া ও শৈব বৈষ্ণব সন্ন্যাসিগণকে প্রতিপালন করিয়া পৌরাণিক ধর্ম্মের উন্নতিসাধন করিয়া আসিতেছেন।

বৈষ্ণবধর্ম্মানুসারে জন্মাষ্টমী, রাসযাত্রা, দোলযাত্রা, স্নানযাত্রা,

রথযাত্রা প্রভৃতি নানা মহোৎসব প্রচলিত আছে। ইহাদের মধ্যে দোলোৎসব প্রধান।

শাক্তধর্ম্ম।

শক্তির উপাসনা শিবযোনি হইতে প্রথম প্রবর্ত্তিত হয় এবং বিবিধ তন্ত্রশাস্ত্র এ ধর্ম্মকে বঙ্গদেশে প্রবল করিয়া দেয়। বৌদ্ধধর্ম্মের অন্তিম দশায় যখন অন্যান্য প্রদেশে অষ্টাদশ পুরাণ ও উপপুরাণ রচিত হইয়া পৌরাণিক ধর্ম্মকে প্রবল করিতে থাকে, তাহার কিছু কাল পরে এদেশে বিবিধ তন্ত্রশাস্ত্র রচিত হইয়া তান্ত্রিক ধর্ম্মকে প্রবল করিয়া দেয়। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত, একদিকে পৌরাণিক ধর্ম্ম, অপরদিকে তান্ত্রিক ধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মকে ভারতে নির্ম্মূল করিয়াছে।

পুরাণগুলির তথা-কথিত রচয়িতা মহর্ষি বেদব্যাস; কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্রগুলির রচয়িতা কে, তাহার কোন নিদর্শন ইতিহাসে পাওয়া যায় না। আমরা এই পর্য্যন্ত জানি, এ সকল শাস্ত্রে মহাদেব পার্ব্বতীকে উপদেশ দিতেছেন মাত্র। লেখকদিগের নাম থাকিলে, বোধ হয় ইহাদের এতদূর গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব হইত না। কেহ কেহ বলেন, বৌদ্ধদিগের তন্ত্রশাস্ত্র অপ্রচলিত করিবার মানসে ইহারা রচিত হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন, বৌদ্ধদিগের অনুকরণে ইহারা রচিত ও প্রচারিত হইয়াছে। অনেকে স্বীকার করেন, বাঙ্গালীজাতির বুদ্ধি অতি প্রখর বলিয়া এদেশে তান্ত্রিক ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে ও মৃণ্ময়ী প্রতিমূর্ত্তি পূজিত হইতেছে।

তন্ত্রোক্ত বীরাচারাদিদর্শনে অনেকে তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া বলেন—

To the historian the Tantric literature represents not a spesial phase of Hindoo Thought but a diseased

form of the human mind which is possible only when all political consciousness has vanished and the lamp of knowledge is extinct.

R. C. Dutt.

"তন্ত্রশাস্ত্রগুলি ইতিহাসলেখকের নিকট হিন্দুজাতির চিন্তাশক্তির বিশেষ কোন উন্নত অবস্থা প্রকাশ করে না। কিন্তু ইহারা মানব-মনের এক রুগ্ন অবস্থার পরিচয় দিতেছে। যখন জাতীয় জীবন প্রণষ্টপ্রায়, রাজনৈতিক সঞ্জীবতা অদৃশ্য ও জ্ঞানপ্রদীপ নির্ব্বাপিত, তখন সমাজে এরূপ রুগ্ন অবস্থা দেখা দেয়।"

দেখ! দেখ! তান্ত্রিক ধর্ম্মের কিরূপ অবমাননা ও লাঞ্ছনা! যিনি ঐ কথা লিখিলেন, তিনি কি সমগ্র তন্ত্রশাস্ত্র পাঠ করিয়া ঐরূপ মত দিয়াছেন, না তান্ত্রিকদিগের সুরাপানের ধুমধাম শুনিয়া ঐরূপ লিখিয়াছেন? বিবিধ তন্ত্রশাস্ত্র পাঠ করিয়া কি আমাদের মনে ঐরূপ জঘন্য ভাবের উদয় হয়? যে ধর্ম্মাত্মা হিন্দু যে কোন সাধনোপায়, উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট, অবলম্বন করুন না, তিনি সেই পথের আদ্যন্ত অবগত হইবার জন্য একান্ত ব্যগ্র, তাঁহার কি এই প্রকারে নিন্দা করা উচিত?

যে তন্ত্রশাস্ত্র মানবমনের আকাঙ্ক্ষানুযায়ী নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা হইতে মৃত্তিকানির্ম্মিত সাকার দেবদেবীর পূজা প্রকৃষ্ট পদ্ধতিতে উপদেশ দেয়, যে শাস্ত্র কলিকালের অধম মানবকে মা! মা! বলিয়া পরমেশ্বরীকে অশেষ ভক্তিভাবে ডাকিতে শিখায়, যে শাস্ত্র ষট্চক্রভেদ দ্বারা যোগের পরাকাষ্ঠা ও ইন্দ্রিয়দমনার্থ নিয়মসংযমাদি ভালরূপ শিক্ষা দেয়, সে শাস্ত্রের কি এমন করিয়া নিন্দা করা উচিত? যে শাস্ত্র লতাসাধন, শবসাধন প্রভৃতি উৎকৃষ্ট সাধনোপায় শিক্ষা দিয়া

মানবকে এ সংসারে সিদ্ধ পুরুষ করিতে চাহে, যে শাস্ত্র অদৃশ্য যোনিগত ডাকিনী ও প্রেতনীদিগকে সাধন দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া কলি-কালের মানবকে অসাধারণ ক্ষমতা দিতে চাহে, সে শাস্ত্রের কি এমন করিয়া নিন্দা করা উচিত? এখন যদি সে শাস্ত্র কলিকালের নিকৃষ্ট-সুখাসক্ত মানবকে স্থলবিশেষে সুরাপানাদি নিকৃষ্ট সুখভোগে রত করাইয়া তাঁহাকে ধর্ম্মপথের পথিক করিতে চাহে, তজ্জন্য কি এ শাস্ত্রের নিন্দা করা উচিত?

তন্ত্রোক্ত কুলক্রিয়ার উদ্দেশ্য অনেক। কেহ কেহ বলেন, অসভ্য অনার্য্য জাতির সংস্রবে বহুকাল থাকাতে যে সকল বীভৎস ক্রিয়াকলাপ হিন্দুসমাজে প্রবেশ লাভ করে, ব্রাহ্মণগণ আপনাদের ধর্ম্মোন্নতির সহিত উহাদিগকে ধর্ম্মের উন্নত ভাব ধারণ করাইতে চেষ্টা পান, এজন্য তন্ত্রশাস্ত্রে বীরাচার উপদিষ্ট হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, বঙ্গদেশ মুসলমান কর্ত্তৃক বিজিত হইবার পর দুর্ব্বল বাঙ্গালীকে ক্ষত্রিয়োচিত বীরধর্ম্মপালনে উত্তেজিত করিবার জন্য তন্ত্রশাস্ত্রে বীরাচার উপদিষ্ট হইয়াছে, যাহাতে লোকে ধর্ম্মের নামে মদ্য মাংস ভোজন করিতে করিতে নিষ্ঠুর হইবে এবং দেশোদ্ধারের জন্য অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিবে। ইহাই যদি কুলক্রিয়ার মহৎ উদ্দেশ্য হয়, এ উদ্দেশ্য আদৌ সংসিদ্ধ হয় নাই, কারণ বীরাচার পালন করিয়া কেহ সমাজে বীর বলিয়া পূজিত হন নাই।

আবার কেহ কেহ বলেন, কুলক্রিয়ার অন্তর্গত পঞ্চ মকারের অর্থ উত্তম, মধ্যম ও অধম অধিকারী ভেদে বিভিন্ন। জনসাধারণ পঞ্চ মকারের সচরাচর যেরূপ অর্থ করে, ইহাদের প্রকৃত অর্থ তাহা নহে। যাহা হউক, যে তন্ত্রশাস্ত্র নানাবিষয়ে এমন মহোচ্চ ও স্বর্গীয় ভাবে পূর্ণ, এক কুলক্রিয়ার জন্য উহার নিন্দা করা অনুচিত।

যে প্রকৃতিদেবী চতুর্দ্দিকে অনন্ত শক্তি লইয়া অনন্ত লীলা করিতেছেন এবং যাহাদের ঘাতপ্রতিঘাতে সংসারের যাবতীয়

ব্যাপার ঘটিতেছে, আজকাল বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ লৌকিক ঈশ্বরের পরিবর্ত্তে সেই প্রকৃতির উপাসনা করেন। তাঁহারা জড়জগতে একমাত্র জড়শক্তির প্রাধান্য স্বীকার করেন এবং সকল বিষয়ে ও সকল স্থানে উহারই বার্ত্তা লইতে একান্ত তৎপর। অতএব বলা উচিত, তাঁহারা যথার্থ প্রকৃতি ও শক্তির উপাসক। সেইরূপ শাক্ত সম্প্রদায় অচিন্তনীয় নির্গুণ পরব্রহ্মের স্থানে উহার আদ্যাশক্তি মহামায়া বা প্রকৃতির উপাসনা করে। প্রভেদের মধ্যে বৈজ্ঞানিকগণ নিরাকাররূপে, আর শাক্তেরা সাকাররূপে মহাশক্তির পূজার্চ্চনা করিতেছেন। তবে দেখ, যে ধর্ম্ম সেই মহাশক্তির কয়েক মনোরম প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিতে উপদেশ দেয়, সে ধর্ম্ম কি বিজ্ঞানসম্মত নয়? সে ধর্ম্ম কি বিকৃত মস্তিষ্কের প্রলাপ মাত্র?

নিরুপায় শৈশব অবস্থায় আমরা যে মাতার অমৃতায়মান স্তনপীযুষ পান করিয়া শশিকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হই, যাঁহার অঞ্চল ধরিয়া আমরা পা পা করিয়া হাঁটিতে শিখি, যিনি রোগের সময় বুকের রক্ত দিয়া আমাদের সেবা শুশ্রূষা করেন, সেই স্নেহময়ী মাতাকে আমরা কত স্নেহভরে, কত ভক্তিভাবে মা! মা! বলিয়া আজীবন ডাকি? এখন যে ধর্ম্ম প্রকৃতির জগদম্বারূপে মা দুর্গার দশভুজা প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া আমাদিগকে অশেষ ভক্তিভাবে মা! মা! বলিয়া ডাকিতে শিখায়, সে ধর্ম্ম কি বিকৃত মস্তিষ্কের প্রলাপ? কুলক্রিয়া শিখাইয়া আমাদিগকে সুরাপানাদিতে আসক্ত করুক, এক মাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা শিক্ষা দেওয়াতে সে ধর্ম্মের সাতখুন মাপ। কেন সে ধর্ম্মকে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম বলিয়া নিন্দা করিতেছ?

তন্ত্রশাস্ত্রমতে পরব্রহ্মের আদ্যাশক্তি মহামায়ার প্রতিমূর্ত্তি মৃত্তিকাদি উপকরণে নির্ম্মাণ করিয়া মন্ত্র দ্বারা উহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করত উহাকে সাক্ষাৎ সজীব জাগ্রত দেবতা জ্ঞানে পূজা করিতে

হয়। দেবীর পূজাও গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ নৈবেদ্যাদি ষোড়শোপচারে সম্পাদন করিতে হয়। কোন দেশের কোন জাতি মা। মা। বলিয়া ঈশ্বরকে এমন ভক্তিভাবে, এমন স্নেহভরে, এমন প্রাণভরে ডাকিতে জানেনা। কোন কালে কোন ধর্ম্ম এমন ভক্তি-পূর্ব্বক জগদম্বার শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতে শিখায় নাই। রে হিন্দুধর্ম্ম! বলিহারি তোমারি। তুমি ঈশ্বরের নামে, জগদম্বার নামে আমাদের মাতৃভক্তি কতদূর উথলিয়া দিতেছ। জগতের কোন ধর্ম্ম কোন কালে মাতৃভক্তির এতদূর পরাকাষ্ঠা ঘুণাক্ষরেও ভাবিতে পারে নাই। এজন্য সাহঙ্কারে বলিতেছি, জগতের সকল ধর্ম্ম এক পৌরাণিক ধর্ম্মের নিকট সুদূরে পরাস্ত জানিবে।

দুর্গোৎসব বাঙ্গালী জীবনের একটি মহানন্দদায়ক মহোৎসব। এরূপ মহোৎসব জগতের কোন দেশে দেখিতে পাওয়া যায় না। খৃষ্টানের খৃষ্টমাস ও মুসলমানের মহরম ইহার সহিত তুলনায় যৎ সামান্য ও তুচ্ছ বোধ হয়। পুজোপলক্ষে সমগ্র বঙ্গদেশ যেরূপ অপার আনন্দে উন্মত্ত হয়, এমন কুত্রাপি নয়নগোচর হয় না। দীনদরিদ্র বঙ্গবাসীর পর্ণকুটীরে জগজ্জননী অশেষ দুর্গতিনাশিনী মা দুর্গা বৎসরান্তে তিন দিনের জন্য আগমন করেন এবং তদুপলক্ষে সকলে আত্মীয় স্বজন লইয়া আনন্দোৎসব করে, এমন সর্ব্বমনোরম, এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর দৃশ্য কুত্রাপি নয়নগোচর হয় না। দুঃখের বিষয়, ভারতের অন্য কোন প্রদেশে এ মহোৎসব প্রচলিত হয় নাই। ইহার পরিবর্ত্তে কেবল দশহরার বিজয়োৎসব প্রচলিত দেখা যায়।

ওহে বঙ্গবাসিগণ! ধন্য তোমাদের জীবন। তোমরা বাল্যকাল হইতে এই আনন্দোৎসবে যোগদান করত এই পাপতাপপূর্ণ ভবসংসারে অন্ততঃ তিন দিনের জন্য জগদম্বার শ্রীচরণকমলে প্রণত হইয়া অপার আনন্দনীরে অভিষিক্ত হইতেছ, ইহা অপেক্ষা তোমাদের সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? পাঠক।

তোমার শুভাদৃষ্টবশতঃ এই সুন্দর মনোহর দৃশ্য এখনও তোমার নয়নপথে পতিত হইতেছে। কিন্তু লিখিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, বক্ষঃস্থল অশ্রুজলে প্লাবিত হইতেছে,যে পাশ্চাত্য কালস্রোত সমাজে খরবেগে বহমান, তাহা ইহাকেও কালগর্ভে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে এবং হয়ত তোমার প্রপৌত্রদিগের সময় এ দৃশ্য চিরদিনের জন্য বঙ্গে অস্তমিত হইবে।

যে মা দুর্গার প্রতিমা তোমরা চিরদিন পূজা করিয়া আসিতেছ, ইনি কে জান? ইনি যেমন তোমাদের জগজ্জননী, তেমনি ইনি তোমাদের পরমপূজনীয়া ভারতমাতা *। তাঁহার সুসময়ে ও স্বাধীন অবস্থায় তিনি এইরূপ রমণীয় উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে বিরাজমানা ছিলেন। তৎকালে তিনি জ্ঞানবিজ্ঞানে উদ্ভাসিত, এজন্য মা সরস্বতী তাঁহার বামদিকে। তৎকালে তিনি কৃষিশিল্প ও বাণিজ্য দ্বারা অতুল ধন ধান্যে ও সুখসমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ; এজন্য মা লক্ষ্মী তাঁহার দক্ষিণ দিকে। তৎকালে তাঁহার সুসন্তানগণ দেবসেনাপতি কার্ত্তিকের ন্যায় অসাধারণ শৌর্য্যবীর্য্যে দৃপ্ত ও উত্তেজিত,এজন্য কার্ত্তিক তাঁহার বামদিকে; তৎকালে তাঁহার সুসন্তানগণ সকল বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিয়া কৃতার্থ; এজন্য সিদ্ধিদাতা গণেশ তাঁহার দক্ষিণ দিকে; তৎকালে তিনি কেশরীতুল্যা পরাক্রান্তা বাহিনী লইয়া অসুরদলনে নিরতা, এজন্য তিনি সিংহের উপর সশস্ত্রে দণ্ডায়মানা এবং অসুররূপী অনার্য্য ও ম্লেচ্ছজাতিবর্গ তদীয় পাদমূলে ত্রিশূলবিদ্ধ হইয়া

---

* শাস্ত্রকারেরা পার্ব্বতীকে হিমালয়ের কন্যা বলিয়া উল্লেখ করেন। ভূতত্ত্ব পাঠে জানা যায়, যে আর্য্যাবর্ত্ত মহাদেশ গঙ্গা, যমুনা,সিন্ধু ব্রহ্মপুত্রাদি নানা নদীর পলি পড়িয়া গঠিত, এ সকল পলি হিমালয় হইতে আসিতেছে। এ জন্য আর্য্যাবর্ত্তকে হিমালয়ের কন্যা বলা উচিত। সুতরাং পার্ব্বতী আমাদের ভারতমাতা।

নিপতিত। যদিও সেই সৌভাগ্যবতী মাতার এখন ঘোর দুর্দ্দিন উপস্থিত, তিনি লক্ষ্মীর মাতা হইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছেন এবং তাঁহার কুপোষ্য কুসন্তানগণ দীনহীন বেশে কাঁদিয়া কাঁদিয়া দিন কাটাইতেছে, তথাচ যদি তাঁহার সন্তানগণ পূর্ব্বতন মূর্ত্তিতে তাঁহার পূজা করিতে থাকে, ভবিষ্যতে তিনি পুনরায় জ্ঞানবিজ্ঞানে ও ধনদৌলতে বিভূষিত হইবেন। এজন্য শাস্ত্রকারেরা চিরদিন মা দুর্গার পূজা করিতে আদেশ দিতেছেন। এখন বুঝিয়া দেখ, মা দুর্গার প্রতিমার গূঢ় উদ্দেশ্য কি?

এখন বিংশশতাব্দীতে আমরা কি প্রকারে মায়ের ষোড়শোপচারে পূজা দিব? এখন পুরোহিত ডাকিয়া, নৈবেদ্য দিয়া, ধূপ ধুনা জ্বালাইয়া কাঁসর ঘণ্টা বাজাইয়া তাঁহার পূজা দিলে তিনি কি আমাদের উপর সন্তুষ্ট হইবেন? এই বৈজ্ঞানিক যুগে তাঁহার বৈজ্ঞানিক পূজা আবশ্যক। আন্তরিক যত্ন, পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অনুশীলন করিলে আমরা কিয়ৎ পরিমাণে তাঁহার বৈজ্ঞানিক পূজা করিতে সমর্থ হইব।

(১) জ্ঞান ও ধর্ম্মের সম্যক অনুশীলন, যাহাতে দেশের অধিকাংশ লোক ভালরূপ বিদ্যা শিক্ষা করিয়া ও স্বধর্ম্মে আস্থাবান হইয়া বিদ্বান ও ধর্ম্মপরায়ণ হইতে পারে।

(২) কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতিসাধন, যদ্দ্বারা দেশে প্রভূত ধনাগম হইবে এবং অনেকের দারিদ্র্য দূরীভূত হইবে। ইহার জন্য বিলাতী কাপড়ের আমদানি বন্ধ করিবার জন্য খদ্দর যজ্ঞ, আর কৃষিজাত শস্যের রপ্তানি বন্ধ করিবার জন্য গ্রামে গ্রামে ধর্ম্মগোলা সংস্থাপন একান্ত আবশ্যক।

শৌর্য্যবীর্য্যের সম্যক অনুশীলন ও যুদ্ধবিদ্যাশিক্ষা, যাহাতে অনেকে দেশের কার্য্যে ব্রতী হইতে পারিবেন। নিরস্ত্র ভারতে ইহা কতদূর সম্ভব, তাহা কালে মীমাংসিত হইবে।

উপরোক্ত উপকরণে মায়ের পূজা দিলে আমরা কালে তাঁহার সুসন্তান হইব।

ব্রাহ্মণ ও পৌরাণিক ধর্ম্মের উপর শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আক্রোশ।

আমাদের সুশিক্ষিত বান্ধবগণ বলিবেন, এদেশের ব্রাহ্মণজাতি ঘোর স্বার্থপর ও অহঙ্কারী। ভারতের ইতিহাস পাঠে বুঝা যায়, এ জাতি কতদূর স্বার্থপর! দেখ, বৈদিক যুগে তাঁহারা বিবিধ যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তন করিয়া আপনাদের প্রভুত্ব আর্য্যসমাজে স্থাপন করেন। বৌদ্ধযুগে যাগযজ্ঞ রহিত হওয়াতে তাঁহাদের পদ-মর্য্যাদা কিয়ৎ পরিমাণে লাঘব হইয়া যায়। পৌরাণিক যুগে আধুনিক পৌত্তলিকতা প্রচার করিয়া তাঁহারা আপনাদের সামাজিক প্রভুত্ব পুনঃ স্থাপন করিতে সমর্থ হন। মুসলমান যুগে তাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করিয়া আপনাদের সামাজিক প্রভুত্ব বজায় রাখেন। খৃষ্টান যুগে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তৃতির সঙ্গে তাঁহাদের পদমর্য্যাদা ক্রমশঃ লাঘব হইতে চলিল।

দেখ, এ জাতি আপনাদের মানসম্ভ্রমবর্দ্ধনার্থ কতদূর প্রয়াসী! ব্রাহ্মণ দেখিলে তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতে হইবে, তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া পদরেণু মস্তকে ধারণ করিতে হইবে। স্বয়ং ভগবান ভৃগুপদচিহ্ন নিজ বক্ষঃস্থলে ধারণ করিতেছেন। ত্রৈলক্যা-ধিপতি ইন্দ্রদেব ব্রহ্মশাঁপে সহস্রাক্ষ হন, মহারাজ পরীক্ষিৎ ব্রহ্ম-শাঁপে সর্পদষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন; এমন যে যদুবংশ তাহাও ব্রহ্মশাঁপে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। মনুস্মৃতি খুলিয়া দেখ, বুঝিতে পারিবে, তাঁহাদের প্রতি কতদিকে কতদূর পক্ষপাত দেখান হইয়াছে। এমন স্বার্থপর জাতি ভূভারতে আর নাই বলিলে হয়। এখন পাশ্চাত্য শিক্ষা পাইয়া আমাদের চক্ষু কর্ণ ফুটিতেছে, তাঁহাদের সব

বুজরুকি একে একে খুলিতেছে। এখন আমরা তাঁহাদের কথায় মজি না, তাঁহাদের শ্লোকের বুক্‌নি গ্রাহ্য করি না। আর শত বৎসর পাশ্চাত্য শিক্ষা এইভাবে চলিলে, বোধ হয় এ জাতিকে পাততাড়ি গুটাইতে হইবে।

বলি, যে ভিক্ষোপজীবী ব্রাহ্মণজাতি যৎসমান্য দক্ষিণা পাইয়া আমাদিগকে আবহমানকাল ধর্ম্মপথে চালান ও আমাদের যাবতীয় ধর্ম্মানুষ্ঠান করান, তাঁহারা হইলেন তোমাদের বিবেচনায় ঘোর স্বার্থপর। যদি তাঁহারা স্বার্থপর হইতেন, তাঁহারা কি পাচ হাজার বৎসর এরূপ ভাবে পূজ্য থাকিতে পারিতেন? জগতের নিয়ম এই, যে জাতি অধিক স্বার্থপর হইবে, সে জাতির পতন অবশ্যম্ভাবি। তবে কেন এ জাতি ধ্বংস না পাইয়া এখনও ভারতে সমভাবে পূজিত হইতেছে। বেশ জানিবে, জগতীতলে ব্রাহ্মণজাতির ন্যায় আত্মোৎসর্গী, স্বার্থত্যাগী, সংযমী ও ধর্ম্মনিষ্ঠ জাতি আর দ্বিতীয় নাই। যদি এই পরাধীন অবস্থায়, এই দুর্ম্মূল্যসময়ে তাঁহারা কোন বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র স্বার্থপরতা দেখাইতেছেন, তাহা কেবল রাজার দোষে ও সমাজের দোষে।

আমাদের সুশিক্ষিত বান্ধবগণ আরও বলিবেন, অশেষদোষাকর পৌরাণিক ধর্ম্ম কেবল কুসংস্কারে পূর্ণ এবং ব্রাহ্মণ জাতির বুদ্ধিভ্রংশও হিন্দুজাতির জাতীয় অধঃপতন বশতঃ এই অপকৃষ্ট ধর্ম্ম এতকাল ভারতে প্রবল রহিয়াছে। তাঁহাদের ধ্রুব বিশ্বাস, এই পৌরাণিক ধর্ম্ম হইতে এ দেশের এমন দুর্গতি, আমরাও এতকাল পরাধীন, দীনদরিদ্র ও মূর্খ। তবে প্রথমেই ব্রাহ্মণজাতি ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মকে গোটেহেল কর, তবেই ভারতের মঙ্গল।

বলি, পৌরাণিক ধর্ম্ম কি কেবল কুসংস্কারে পূর্ণ? যে ধর্ম্ম কালোচিত উৎকর্ষ প্রদর্শন পূর্ব্বক মনের সকল ভাবে একমাত্র ঈশ্বর অন্বেষণ করিতে বলে, যে ধর্ম্ম ঈশ্বরকে আদর্শ করিয়া মনের যাবতীয়

সাত্ত্বিক ভাব স্ফুরণ করিতে চেষ্টা পায়, কে বলে, সে ধর্ম্ম অপকৃষ্ট? যে ধর্ম্ম ঈশ্বরকে পিতৃমাতৃভাবে, পতিপুত্রভাবে পুজিবার জন্য তাঁহার বিবিধ রূপ ও মূর্ত্তি দেখায় এবং তাঁহাকে বিবিধ ভাবে ডাকিয়া মনের বিবিধ ভাবের সম্যক স্ফুরণ করে, যে ধর্ম্ম পিতৃমাতৃ ভক্তি, দম্পতিপ্রেম ও পুত্রবাৎসল্যের পরাকাষ্ঠা শিক্ষা দিয়া আমাদের সাত্ত্বিক ভাবরস উথলিয়া দেয়, কে বলে সে ধর্ম্ম অপকৃষ্ট? কি বৈদিক, কি বেদান্ত, কি বৌদ্ধ, কি খৃষ্ট, কি মুসলমান, কি জড়োপাসনা, জগতের কোন ধর্ম্ম ভাববিষয়ে আদৌ শিক্ষা দেয় না; সকলেই এ বিষয়ে একপ্রকার নীরব ও নিশ্চেষ্ট। জগৎ মাঝারে ভারতের একমাত্র পৌরাণিক ধর্ম্ম এ বিষয়ে চরমোৎকর্ষ দেখাইতেছে। এজন্য শতমুখে ইহার অশেষ প্রশংসা করা উচিত।

আরও দেখ, আধুনিক উন্নত বিজ্ঞান ঈশ্বর, আত্মা, পরলোক কিছুই মানে না বটে; কিন্তু ইহাকেও স্পষ্ট স্বীকার করিতে হয়, যে সুখভোগের জন্য মানব ইহসংসারে লালায়িত, সেই সুখ বর্দ্ধনের জন্য তাঁহার মনের ভাবাবলির সম্যক স্ফূর্ত্তি করা একান্ত আবশ্যক; নতুবা তাঁহার জীবন অসার ও পশুতুল্য হইয়া পড়ে। এখন যে পৌরাণিক ধর্ম্ম ঈশ্বরকে বা তাঁহার অবতারবিশেষকে আদর্শ করিয়া মানবমনের বিবিধ সাত্ত্বিক ভাবের স্ফুরণ করিতে একান্ত যত্নবান্, কোন্ মুখে তোমরা সে ধর্ম্মের নিন্দা করিতেছ? কোন্ মুখে তোমরা সে ধর্ম্মকে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম বা অসার পৌত্তলিকতা বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছ? কি দর্শন, কি জ্যোতিষ, কি আয়ুর্ব্বেদ, কি কাব্য, কি সঙ্গীত, কি শিল্প, সকল বিষয়ে যেমন ভারত এক সময়ে অচিন্তনীয় ও অলৌকিক উন্নতি সাধন করে, তেমনি বৈদিক ধর্ম্মের উপর বৌদ্ধধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের উপর পৌরাণিক ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়া ভারত মানবধর্ম্মের চরমোৎকর্ষ দেখাইয়াছে। বোধশক্তি থাকে, এ ধর্ম্মের প্রকৃত মাহাত্ম্য বুঝিয়া নিজের বোধশক্তি চরিতার্থ কর। একমাত্র পৌরাণিক ধর্ম্মই

জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম এবং সকল ধর্ম্ম ইহার নিকট সুদূরে পরাহত জানিবে।

মুসলমানযুগে হিন্দুধর্ম্ম।

আজকাল যেমন জ্ঞানবিজ্ঞানের কল্যাণে জগতে খৃষ্টান জাতিবর্গের ভাগ্যোদয় ও সর্ব্বত্র জয়জয়কার, মধ্যযুগে সপ্তম শতাব্দীর পর মুসলমান ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের সঙ্গে একমাত্র ধর্ম্মের কল্যাণে মুসলমান জাতিবর্গের তদনুরূপ অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল। তাঁহাদের পয়গম্বর ঈশ্বরের প্রিয় সুহৃৎ মহম্মদ সাহেব বিধর্ম্মী কাফেরকে স্বধর্ম্মে দীক্ষা দেওয়ায় মহাপুণ্য নির্দ্দেশ করেন, এমন কি, যাঁহারা এরূপ করিবেন, তাঁহারা অনন্তকাল স্বর্গে পরমা সুন্দরী পরী লইয়া বিহার করিবেন। আর কোথায় আছে! তাঁহার এক সামান্য কথায় তদীয় সেবকবৃন্দ একহস্তে কোরাণ ও অপর হস্তে তরবারি লইয়া চতুর্দ্দিকে মার্ মার্ ও কাট্ কাট্ করিতে করিতে তিন শতাব্দীর ভিতর স্পেন হইতে কাবুল পর্য্যন্ত অর্দ্ধভূমণ্ডলে আপনাদের বিজয়পতাকা উড্ডীয়মান করত স্বরাজ্য ও স্বধর্ম্ম বিস্তার করিলেন। এ মহাবন্যায় ঐ সকল দেশের পূর্ব্বতন রাজ্য, জাতিধর্ম্ম, আচার ব্যবহার ও গ্রন্থাবলি সকলই ভাসিয়া অতুল জলধিগর্ভে নিমগ্ন হইয়া গেল। পাশ্চাত্য জগতে খৃষ্ট ধর্ম্ম এবং প্রাচ্য জগতে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম এ মহাস্রোতের গতিরোধ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

ছয় শত বৎসর ধরিয়া ভারতও এ ধর্ম্ম বিস্তারে বিলক্ষণ বাধা দিয়াছিল। এতকাল মুসলমান জাতি এই সুসমৃদ্ধ দেশের প্রতি যে লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন, তাঁহাদের সে মনোরথ পরে সিদ্ধ হইল। একাদশ শতাব্দীতে তাঁহারা ইহার অন্তঃপ্রবেশ করিয়া সোমনাথাদি মন্দির লুণ্ঠন করিয়া অপর্য্যাপ্ত ধনরাশি স্বদেশে লইয়া গেলেন। পরে দুই শতাব্দীর ভিতর এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশের জলবায়ুর

দোষে ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গ ক্রমশঃ নিবীর্য্য হইয়া পড়েন। পরে যখন তাঁহারা পরস্পর গৃহবিবাদে লিপ্ত হন, তখন মুসলমান জাতি সুযোগ পাইয়া হিন্দুরাজ্যগুলি একে একে বিধ্বস্ত করত আর্য্যাবর্ত্তে এক বিশাল সম্রাজ্য স্থাপন করিলেন।

এইবার রাজশক্তি হারাইয়া হিন্দুজাতির গৌরবসূর্য্য বহুকালের জন্য অস্তমিত হইল। যে স্বাধীন ভারত এতকাল নিজের সভ্যতাজ্যোতি ও জ্ঞানজ্যোতি ভূমণ্ডলে বিকীর্ণ করিতেছিল, সে ভারত এখন পরাধীন হইয়া বিধর্ম্মী রাজার পদানত হইল ও তিমিরাবৃত হইল। দেখ, ক্ষত্রিয়জাতি ভীষণমূর্ত্তি পাঠান জাতির তরবারির নিকট পরাস্ত হইয়া গেলেন। সেই দুর্দ্দিনে, সেই বিপদ সাগরে কে ভারতের জাতিধর্ম্ম ও জ্ঞানভাণ্ডার রক্ষা করিল? আমাদের সেই অশেষ পূজ্য ব্রাহ্মণজাতি, যাঁহারা চিরদিন হিন্দুসমাজের নায়ক, তাঁহাদেরই বুদ্ধিকৌশলে ও ব্রহ্মতেজে সকল রক্ষা পাইয়াছে। এখন তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপ বিশদরূপে দেখান আবশ্যক।

যে সনাতনধর্ম্মরক্ষক ব্রাহ্মণজাতি সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ায় কিঞ্চিৎ বিপন্ন হন, তাঁহারা পৌরাণিক ধর্ম্ম সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া ঐ ধর্ম্মের উপর জয়লাভ করতঃ সপ্ত শতাব্দীকাল নির্ব্বিবাদে, নির্ব্বিঘ্নে ও নিরাপদে ধর্ম্মরাজ্যের উপর একাধিপত্য করিতে থাকেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আর্য্যাবর্ত্তে মুসলমান সম্রাজ্য স্থাপনের সঙ্গে তাঁহাদের অদৃষ্ট একেবারে ভাঙ্গিল। বিধর্ম্মী রাজার শাসন কালে তাঁহারা ঘোর বিপদসাগরে পতিত হইলেন। সেই যে অকূল পাথারে পড়িলেন, তাহা হইতে তাঁহারা উদ্ধার পান নাই, এখনও হাবু ডুবু খাইতেছেন। উদ্ধার পাইবেন কি না, সন্দেহের বিষয়। এজন্য শাস্ত্র বলে লোকে মহাপাপে কলির ব্রাহ্মণ হয়। বৌদ্ধযুগে হিন্দু নরপতিগণের অধীনে বৈদিক যুগের ন্যায় ব্রাহ্মণজাতির সমান প্রতিপত্তি ও সমাদর ছিল এবং বৌদ্ধ

নরপতিগণ তাঁহাদের উপর কোনরূপ অত্যাচার ও উৎপীড়ন করা দূরে থাকুক, তাঁহাদের ভালরূপ প্রতিপালন করিতেন, কেবলমাত্র তাঁহারা যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করান নাই ও জাতিভেদ মানেন নাই। কিন্তু মুসলমান যুগে পঞ্চ শতাব্দীকাল যে সকল বাদসাহ, নবাব ও সুবেদার ভারত শাসন করেন, তাঁহারা অর্থ দিয়া ব্রাহ্মণ জাতির প্রতিপালন করা দূরে থাকুক, তাঁহাদের পৌত্তলিক ধর্ম্মকে সমূলে নাশ করিতে বদ্ধপরিকর হন।

মুসলমান যুগে মুসলমান জাতি হিন্দুধর্ম্ম বিলোপের জন্য কি না করিয়াছেন। তাঁহারা কত সহস্র সহস্র হিন্দুপরিবারকে তরবারি বলে ও রাজপ্রসাদ প্রলোভনে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া গিয়াছেন; কত শত শত দেবমূর্ত্তি ও দেবালয় ভগ্ন করিয়া তদীয় উপাদানে মস্‌জিদাদি নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সহস্র সহস্র ফকির ও মোল্লা কত উৎসাহের সহিত স্বধর্ম্ম প্রচার করিয়া সহস্র সহস্র হিন্দুকে মুসলমান করিয়া গিয়াছেন। উভয় জাতির পার্থক্য রাখিবার জন্য নিঘৃণ্য জেজিয়া শুল্ক সর্ব্বত্র স্থাপিত হইয়াছিল। ধর্ম্মান্ধ মুসলমানদিগের এমন উৎসাহে এখন ভারতের ষষ্ঠাংশ লোক মুসলমান বলিয়া পরিগণিত। যখন ধর্ম্মের জন্য তাঁহারা হিন্দুজাতির উপর এরূপ ঘোর অত্যাচার করিয়াছেন, তখন তাঁহাদের সে অপরাধ সহস্রবার মার্জ্জনীয়। জগতে সকলেই নিজ নিজ ধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেন এবং তাহাই সর্ব্বত্র প্রচার করিতে যত্নবান হন।

এখন দেখা যাওক, সেই ঘোর দুর্দ্দিনে, সেই বিপদসাগরে ব্রাহ্মণ জাতি কি প্রকারে আমাদের জাতিধর্ম্ম রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন? যেমন লোকবিশেষের জীবনে দুঃসময় পতিত হইলে একমাত্র ধর্ম্মপথ অবলম্বন করাতে সে দুঃসময় অনায়াসে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, সেইরূপ জাতীয় জীবনের দুঃসময়ে বা পরাধীন অবস্থায় একমাত্র জাতিধর্ম্ম ও জাতীয়তা রক্ষা করিতে পারিলে সে দুঃসময় অতিবাহিত হইয়া

জাতীয় অস্তিত্ব পৃথ্বীতলে অনায়াসে রক্ষা করা যায়। এজন্য ধর্ম্মাত্মা ব্রাহ্মণগণ সেই ঘোর বিপৎকালে ভারতের সর্ব্বত্র একমাত্র জাতিধর্ম্ম রক্ষা করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন।

নিম্নলিখিত উপায়ে তাঁহারা আমাদের জাতিধর্ম্ম পূর্ণাংশে রক্ষা করিয়াছেন।

(১) জাতিভেদের কঠোর শাসন।

(২) জাতিবিদ্বেষ জাগরিত করিয়া জেতৃ ও জিত জাতিকে সম্পূর্ণরূপ পৃথক রাখা।

(৩) নানা সংস্কারকবর্গের আবির্ভাব ও হিন্দুসমাজে উৎসাহ-প্রদান।

(৪) স্মার্ত্ত পণ্ডিতবর্গ দ্বারা নানাস্থানে নানা কালোচিত দেশাচার প্রবর্ত্তন।

(৫) তুলসীদাসপ্রমুখ কবিগণের নিজ নিজ প্রাকৃত ভাষায় রামায়ণাদি লিখন।

প্রথমতঃ। মুসলমানযুগে মুসলমান জাতি হিন্দুধর্ম্মের উপর যত অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিতে থাকে, ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের জাতিভেদ-রূপ দুর্ভেদ্য দুর্গকে আরও দৃঢ়তর করিয়া স্বসমাজ শাসন করেন। ইতিপূর্ব্বে পৌরাণিক যুগে বৃত্তি অনুসারে জাতিভেদ প্রথা সর্ব্বত্র প্রচলিত হয়। ইহাতে তাঁহারা স্বসমাজকে অষ্টে-পৃষ্টে বন্ধন করিয়া ইহার ভালরূপ শাসন করিতে সমর্থ হন। তাহা সত্ত্বেও এই যুগে শ্রেষ্ঠ জাতিবর্গের মধ্যে অল্পসংখ্যক লোক এবং অন্ত্যজ জাতিবর্গের মধ্যে বহুসংখ্যক মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া গিয়াছে। ডোম, ডোকলা, চামার, মেতর প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতিগুলি হিন্দুসমাজে অতি নিঘৃণ্য অবস্থায় ছিল বলিয়া উহারা মুসলমান ধর্ম্মের ক্রোড়দেশে আশ্রয় লইয়া আপনাদের জাতীয় সম্মান বর্দ্ধন করিয়াছে। ব্রাহ্মণজাতির দোষে ঐরূপ ঘটিয়াছিল।

দ্বিতীয়তঃ। জগতের নিয়ম এই যে, যখন কোন এক পরাক্রান্ত জাতি অপর দুর্ব্বল জাতিকে জয় করে, তখন জেতৃজাতি জিত জাতিকে ঘৃণা করিতে থাকে; কিছুকাল পরে যদি জিতজাতি জেতৃজাতির ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহার অবলম্বন করে, জাতিবিদ্বেষ মন্দীভূত হওয়ায় উহারা একজাতি গঠন করে। কিন্তু যদি দুর্ব্বল জিতজাতির ধর্ম্ম, আচার ব্যবহার ও সভ্যতা শ্রেষ্ঠতর হয়, উহারা যতই জেতৃজাতিকে ঘৃণা করিবে, উহাদের ততই মঙ্গল; উহারা কস্মিনকালে তাহাদের সহিত মিশ্রিত হইয়া যাইবে না। একারণ মুসলমানযুগে সমাজনায়ক ব্রাহ্মণগণ ঐ জাতির উপর চিরবিদ্বেষ জাগরিত করিয়া দিয়াছিলেন। সেজন্য হিন্দুরা মুসলমানজাতিকে ম্লেচ্ছ ও পাতিনেড়ে বলিয়া অবজ্ঞা করিত। কালের কঠোর আবশ্যকতায় হিন্দুসমাজে এরূপ চলিয়াছিল।

তৃতীয়তঃ। মুসলমান যুগে পঞ্চ শতাব্দীর ভিতর দেশে দেশে সনাতন ধর্ম্মের নানা সংস্কারক আবির্ভূত হন; তাঁহাদের মধ্যে রামানন্দস্বামী, বল্লভাচার্য্য, চৈতন্য, কবীর, নানক প্রভৃতি বিখ্যাত। ইতিপূর্ব্বে পৌরাণিক যুগে শঙ্করাচার্য্যদেব ও রামানুজস্বামী হিন্দু সমাজে যে উৎসাহরূপ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিঃসরণ করিয়া গিয়াছিলেন, উপরোক্ত মহাত্মাগণ তাঁহাদেরই প. চ অনুসরণ করিয়া সেই অগ্নি-স্ফুলিঙ্গকে আরও অধিক পরিমাণে উত্তেজিত করত সমগ্র হিন্দুস্থানে যে দাবানল প্রজ্বলিত করিলেন, তাহাতে মুসলমান ধর্ম্ম সবিশেষ দগ্ধ হইয়া গেল; কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম্মের ন্যায় একেবারে ভস্মীভূত হইয়া যায় নাই।

ঐ সকল মহাত্মাগণ ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে আবির্ভূত হইয়া সনাতন ধর্ম্মের এক এক নূতন ভাব স্ফুরণ করত নিজ নিজ সম্প্রদায় যেরূপ উৎসাহের সহিত প্রবর্ত্তিত করেন, তাহাতে মুসলমান ধর্ম্মের তেজ কথঞ্চিৎ মন্দীভূত হইয়া পড়ে। তাঁহাদের নিকটও এধর্ম্ম

চিরঋণে আবদ্ধ জানিবে। তাঁহারা যেরূপ উৎসাহের সহিত বিবিধ শাস্ত্র মন্থন পূর্ব্বক নিজ নিজ প্রাকৃত ভাষায় ধর্ম্মগ্রন্থ লিখিয়া ধর্ম্মোপদেশ দেন, সেই উৎসাহের গুণে বহুসংখ্যক হিন্দু মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে পারে নাই। তাহার সাক্ষ্য, মহাত্মা নানক পাঞ্জাবে শিখ সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত না করিলে, বোধ হয় সমগ্র পাঞ্জাব সিন্ধুদেশের ন্যায় মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া যাইত। সেইরূপ মধ্যপ্রদেশে কবীর, বঙ্গদেশে চৈতন্যদেব, মহারাষ্ট্রদেশে একনাথ স্বামী প্রভৃতি মহাত্মাগণ হিন্দুসমাজের মহোপকার করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহাদের উপদিষ্ট শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মমত প্রাপ্ত হইয়া হিন্দুসমাজ দেশে দেশে নূতন ধর্ম্মবলে বলীয়ান হইয়া মুসলমান ধর্ম্মের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সক্ষম হয়। সত্য বটে তাঁহারা যে সকল সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করেন, তন্মধ্যে সম্প্রদায়বিশেষ হিন্দুধর্ম্মের জাতিভেদপ্রথা না মানাতে সাধারণ সমাজ হইতে পৃথক ছিল; কিন্তু কালক্রমে সকলেই হিন্দুসমাজের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে।

চতুর্থতঃ। মুসলমান যুগে অধ্যাপকমণ্ডলীও মুসলমান ধর্ম্মের পরাজয়ের জন্য আদৌ নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। রঘুনন্দনপ্রমুখ স্মার্ত্তপণ্ডিতগণ স্মৃতিশাস্ত্রের নূতন সংস্করণ লিখিয়া কালোপযোগী আচার ব্যবহার প্রবর্ত্তিত করিলেন। উঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য, কি প্রকারে বিজিত হিন্দুসমাজ সকল বিষয়ে সদাচারী হইয়া ম্লেচ্ছ মুসলমান সমাজ হইতে চিরদিনের জন্য পৃথক থাকিবে। এই সময়ে দেশভেদে হিন্দুমহিলাগণের ভিতর অবরোধপ্রথা, সাধারণের ভিতর চৌকাপ্রথা, উচ্ছিষ্টপ্রথা প্রচলিত হয়। এই সময়ে দেশে দেশে নানা বৈশেষিক রীতিনীতি প্রবর্ত্তিত হয়। ইহাদের প্রধান উদ্দেশ্য, আহার বিহারাদি বিষয়ে জিতজাতি কোন প্রকারে জেতৃজাতির সহিত মিশ্রিত না হয়। পেটের দায়ে ম্লেচ্ছ জাতির গোলামি করিতে হয়,

স্বচ্ছন্দে গোলামি কর, কিন্তু কিছুতে উহাদের সহিত পানভোজনাদিতে মিশ্রিত হইবে না। এতদূর কঠোর নিয়মাবলি প্রবর্ত্তিত না হইলে, পবিত্র হিন্দুজাতি পঞ্চ শতাব্দী কাল ব্যাপিয়া এমন পবিত্র থাকিত না। ওহে নব্যসম্প্রদায়! এখন তোমাদের বিশ্বাস, এ সকল স্বধর্ম্মের কুসংস্কার মাত্র এবং ইহাদিগকে যতই পরিহার করা যায়, ততই দেশের মঙ্গল। কিন্তু বুঝা উচিত, কোন্ মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইহারা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল ?

পঞ্চমতঃ। রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতাদি শাস্ত্রগ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। একমাত্র ব্রাহ্মণজাতি উহাদের স্বাদ গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু পূর্ব্বে জনসাধারণ কথকঠাকুরদের মুখে শুনিয়া উহাদের বিষয় অবগত হইত। মুসলমানযুগে তুলসীদাসাদি ভক্ত কবিগণ নিজ নিজ প্রাকৃত ভাষায় ঐ সকল গ্রন্থ লিখিয়া সাধারণের পাঠ্য করিয়া যান। ইহাতে উহারা সকল দেশে ঐ সকল শাস্ত্র পাঠ করিয়া ভালরূপ ধর্ম্মশিক্ষা করিতেছে। এই প্রকারে মুসলমান ধর্ম্মের তেজ হিন্দুসমাজে সবিশেষ মন্দীভূত হইতে থাকে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন আর্য্যাবর্ত্তে মুসলমান সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়, তৎকালে অধিকাংশ ক্ষত্রিয় জাতি নিজ নিজ রাজ্য ও জায়গীর হারাইয়া পর্ব্বত, বনজঙ্গলে ও মরুভূমিতে গিয়া অনার্য্য জাতিবর্গকে পরাস্ত করত নিজ নিজ রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহাদের অনুগৃহীত ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের রাজ্যে বসবাস করিয়া দেবত্র ও ব্রহ্মত্রাদি উপভোগ করত প্রজাবর্গের জাতিধর্ম্ম ভালরূপ রক্ষা করিতে সমর্থ হন। মুসলমান সাম্রাজ্যের ভিতর তাঁহারা নবাব ও উজিরদিগের কিছুমাত্র সহানুভূতি না পাইলেও হিন্দু ধনাঢ্য ও জমিদারবর্গের আশ্রয়ে থাকিয়া দেবত্র ও ব্রহ্মত্রাদি ভোগ করত হিন্দুসমাজের জাতিধর্ম্ম যথাসাধ্য রক্ষা করিতে থাকেন। এই সময়

হইতে সকল প্রদেশে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ পেটের দায়ে জাতীয় ব্যবসা ত্যাগ করিয়া অন্যান্য বৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়।

দাক্ষিণাত্যে ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত অনেকগুলি সমৃদ্ধ হিন্দুরাজ্য বর্ত্তমান ছিল। তথায় ব্রাহ্মণ জাতির প্রতিপত্তি ও আধিপত্য বহুকাল সমভাবে ছিল। তৎপরে মহারাষ্ট্র জাতির অভ্যুদয় ঘটে। তাঁহারা মধ্যভারতে ও দাক্ষিণাত্যে অনেকগুলি সমৃদ্ধ রাজ্য স্থাপন করেন। এ কারণ ব্রাহ্মণগণ আদৌ বিপন্ন হন নাই এবং স্বসমাজের জাতিধর্ম্ম ভালরূপ রক্ষা করিতে সমর্থ হন।

মুসলমান যুগে পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ধর্ম্ম হিন্দুসমাজে উত্তরোত্তর উন্নতিলাভ করিতে থাকে এবং শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম দেশ ভেদে প্রবল হইয়া উঠে এবং ইহাদের উন্নতিকল্পে কত শত মহোপাধ্যায় পণ্ডিত যত্নবান ও সচেষ্ট হন, তাহার কোনরূপ নিদর্শন পাওয়া যায় না। যাহা হউক, যে প্রবল প্রতাপান্বিত মুসলমান ধর্ম্ম তরবারিবলে অর্দ্ধভূমণ্ডলে স্বীয় কীর্ত্তিধ্বজা রোপিত করে, সে ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের প্রভূত অনিষ্ট সাধন করিয়াও কালক্রমে উহার নিকট পরাস্ত হইয়া যায়। ইহার মুখ্য কারণ ব্রাহ্মণদিগের ব্রহ্মতেজ। যথার্থ বলিতে কি, তাহারা সাত্ত্বিকভাবে শত্রুকে পরাস্ত করিয়াছেন।

ধন্য সমাজনেতা ব্রাহ্মণগণ! ধন্য তোমাদের বুদ্ধিকৌশল! তোমরা সাত্ত্বিক ভাবে ভারতে মুসলমান ধর্ম্মের পরাজয় সাধন করিয়াছ। তোমরা আমাদের জাতিধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছ বলিয়া আজ আমরা পূর্ব্বপুরুষদিলের কীর্ত্তিকলাপ স্মরণ করিয়া বিস্ফারিতহৃদয়ে পবিত্র হিন্দুনামের গৌরব করিতেছি। আর যাহারা আমাদের মধ্যে মুসলমান হইয়া গিয়াছে, সেরূপ গৌরব করিবার শক্তি তাহাদের নাই; তাহারা কেবল নবাবী আমলের গৌরব করিতে পারে।

কোথায় হে মহর্ষিবংশসম্ভূত ব্রাহ্মণগণ! ধন্য তোমাদের ব্রহ্মতেজ! ভারতের একদিকে ক্ষাত্রতেজ যেমন নির্ব্বাপিতপ্রায়,

অপরদিকে ব্রহ্মতেজ তেমনি দেদীপ্যমান। যেমন ক্ষত্রিয়জাতি মুসলমান তরবারির নিকট পরাভব স্বীকার করিলেন, তোমরাও যদি মুসলমান ধর্ম্মের নিকট সেইরূপ পরাভব স্বীকার করিতে, কোথায় বা আমাদের বেদবেদান্ত, কোথায় বা আমাদের রামায়ণ ও মহাভারত, সকলই অনন্ত কালের অনন্ত স্রোতে ভাসিয়া যাইত। যেমন তোমরা কায়মনোবাক্যে ও প্রাণপণে আমাদের জাতিধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছ, এখনও তোমরা সেজন্য স্বসমাজের শীর্ষস্থানে অধিরূঢ় আছ। কুসংস্কার হউক, সুসংস্কার হউক, যাহাই কেন শিক্ষা দেও না, যখন তোমরা আমাদের জাতিধর্ম্ম রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছ, তখন আমরা তোমাদের শ্রীচরণকমলে স্বতঃ পরতঃ প্রণত হইব এবং তোমাদের পদরেণু মস্তকে ধারণ করিয়া কৃতার্থ হইব। হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যাঁহারা তোমাদের উপর নারাজ, তাহারা সমাজদ্রোহী॥ কে কোথায় শুনেছে, কে কোথায় দেখেছে, পাঁচশত বৎসর পরাধীন থাকিয়া জগতের কোন্‌জাতি নিজের অস্তিত্ব, জাতীয়তা ও জাতিধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারে? একমাত্র ভারতে এই অপরূপ দৃশ্য দেখা যাইতেছে। যাঁহাদের কৃপায়, যাঁহাদের ব্রহ্মতেজে ভারতের যথাসর্ব্বস্ব রক্ষা পাইয়াছে, কেন তাঁহাদের নিন্দা করিয়া নিজ জিহ্বা অপবিত্র করিতেছ?

খ্রীষ্টানযুগে হিন্দুধর্ম্ম।

ইংরাজদিগের আমলে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের যে পৌরাণিক ও তান্ত্রিক রূপ বিগত সার্দ্ধ সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া প্রতিষ্ঠিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহাই দেশে দেশে এখনও প্রবল দেখা যাইতেছে। পূর্ব্বাঞ্চলে শাক্তমত, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে বৈষ্ণবমত ও দাক্ষিণাত্যে শৈবমত প্রবল। এতকাল জ্ঞানধর্ম্মানুশীলন করিতে করিতে যে সকল উৎকৃষ্ট মতামত এ ধর্ম্মে ক্রমস্ফুরিত ও ক্রমবিকসিত হইয়াছে,

তাহাই সাধারণ সমাজে সাদরে গৃহীত, অনুশীলিত ও প্রতিপালিত হইতেছে। ইহার সামাজিক রূপের যে সকল আচার ব্যবহার ও রীতি-নীতি কালবশে দেশভেদে উত্থিত ও সামাজিক নির্ব্বাচনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাই তথায় সমভাবে প্রতিপালিত হইতেছে।

কোম্পানি বাহাদুরের আমলে, যখন ইংরাজি বিদ্যা, আপামর বিস্তৃত হয় নাই, তখন সমাজনায়ক ব্রাহ্মণদিগের কঠোর শাসনে সমাজের হিন্দুয়ানী আদৌ হ্রাস পায় নাই. মুসলমান জাতিবিদ্বেষ পূর্ণ মাত্রায় বর্ত্তমান ছিল, জাতিভেদ প্রথা ও অন্যান্য আচার ব্যবহার ভালরূপ প্রতিপালিত হইত। তখন ভোগবিলাস কাহাকে বলে, তাহা কেহ জানিত না। সকলে মোটা চাউল খাইয়া, মোটা ধুতি পরিয়া ও ধর্ম্ম কর্ম্ম করিয়া মনের আনন্দে দিন কাটাইত। তখন ইংরাজি বুটজুতা, মোজা, হ্যাটকোট, সকলই ঘৃণার বিষয় ছিল।

সুসভ্য রাজনীতিজ্ঞ ইংরাজরাজ সাক্ষাৎসম্বন্ধে ও পারৎপক্ষে প্রজাবর্গের ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহারের উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেন না। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ ধর্ম্মের এই চতুর্বর্গ ফলের মধ্যে তাঁহারা একমাত্র অর্থের পূজন ও সেবা করেন। সেজন্য তাঁহারা নানাদিকে কেবল ভারতের অর্থ শোষণ করিতেছেন; ইহার ফলে এদেশ ক্রমশঃ দরিদ্র হইতেছে এবং সকলে পেটের অন্নের জন্য অস্থির ও লালায়িত। মুসলমানযুগে হিন্দুধর্ম্ম যেরূপ বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল, খৃষ্টান যুগে ভারতের ধনদৌলত সেইরূপ বিপন্ন হইয়াছে। পূর্ব্বে সমাজনায়ক ব্রাহ্মণগণ স্বধর্ম্ম রক্ষা করিতে সমর্থ হন। আজ কাল সুশিক্ষিত সমাজনেতৃবর্গ দেশের ধনদৌলত রক্ষা করিতে কত দূর কৃতকার্য্য হইবেন, তাহা ভবিষ্যৎ ইতিহাসলেখকের বিবেচ্য। বিংশশতাব্দীতে অন্নসমস্যা-মীমাংসা ও দেশের ধনদৌলত-রক্ষণ আমাদের কালোচিত প্রধান ধর্ম্ম।

ভারতের মঙ্গলের জন্য ইংরাজরাজ এ দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা

বহু বিস্তারিত করিয়াছেন। এ শিক্ষা এক দিকে যেমন নানা সুফল আনয়ন করিতেছে, তেমনি ধর্ম্মবিবর্জ্জিতা হওয়ায় নানা কুফল দিতেছে। সুফলের মধ্যে আমরা এখন পাশ্চাত্য শিক্ষায় বিভূষিত হইয়া সভ্যতার পথে অগ্রসর হইতেছি, স্বরাজ ও স্বাধীনতা লাভের জন্য উৎসুক হইয়াছি এবং জগতে জাতীয় অস্তিত্ব দেখাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি। কুফলের মধ্যে, মুসলমান ধর্ম্ম সাক্ষাৎসম্বন্ধে হিন্দুসমাজের যতদূর না অনিষ্ট সাধন করিয়াছিল, পাশ্চাত্য শিক্ষা পরোক্ষভাবে তাহা অপেক্ষা ইহার অনেক অনিষ্ট সাধন করিতেছে ও সাধারণের হিন্দুয়ানী ক্রমশঃ মিটাইতেছে। এখন চাগতপ্রাণ শিক্ষিত সম্প্রদায় হ্যাট কোট পরিয়া চুরুট ফুকিতে ফুকিতে ফিরিঙ্গি সাজিতেছে। সমাজের বিলাসিতা ক্রমশঃ বাড়িতেছে। সুদূরপল্লী-গ্রামসমূহে হিন্দু আবভাব ও হিন্দুয়ানী পূর্ণভাবে বজায় থাকিলেও প্রধান ২ নগরীতে পাশ্চাত্য স্রোত খরবেগে বহমান হওয়াতে তথায় হিন্দুয়ানী ও চিরাগত ধর্ম্মভাব মন্দীভূত, সমাজশাসন শিথিল, অনেকে যথেচ্ছাচারী, অধ্যাপক ও পুরোহিতবর্গ নিরন্ন ও প্রায় অনাদৃত। কালস্রোত যেদিকে ও যে ভাবে বহিবে, জনসাধারণ সেই দিকে গা ভাসাইয়া দিবে। কালস্রোত রোধ করে, এমন সাধ্য কার?

হিন্দুধর্ম্মের এই অধঃপতনের দিনে এখনও দ্বাদশ মাসে ত্রয়োদশ মহোৎসব চলিতেছে, জীবনের দশবিধ সংস্কার কোথাও বৈদিক নিয়মানুসারে, কোথাও তান্ত্রিক নিয়মানুসারে অনুষ্ঠিত হইতেছে। এখনও শৈব বৈষ্ণব সন্ন্যাসিগণ দেশে দেশে তীর্থভ্রমণ করিয়া হিন্দু ধর্ম্মের বিজয়ভেরী সর্ব্বত্র বাজাইতেছেন। এখনও জনসাধারণ সমাজের মহোৎসব ও জীবনের সংস্কারগুলি প্রতিপালন করিয়া ও তীর্থভ্রমণাদি করিয়া বিশ্বাসানুযায়ী পুণ্যলাভ করিতেছে। এখনও সকল প্রদেশে পূজ্য ব্রাহ্মণগণ সম্মানিত ও পূজিত হইতেছেন এবং সকলকে হিন্দুশাস্ত্রানুসারে চালাইতেছেন।

খৃষ্টান মিসনরিগণ স্বধর্ম্মপ্রচারে দৃঢ়ব্রত হইয়া সর্ব্বপ্রথমে অনেক সুশিক্ষিত হিন্দুযুবককে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষা দেন। ইহাতে হিন্দুসমাজের অমঙ্গল কিয়ৎপরিমাণে সংঘটিত হয়। কিন্তু সুখের বিষয়, এখন তাঁহারা স্বধর্ম্মপ্রচারে প্রায় বিফলমনোরথ হইয়াছেন। তাঁহারা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছেন, ভারতবাসী কস্মিনকালে খৃষ্টধর্ম্মকে সাদরে আলিঙ্গন করিবে না; বরং ইহাকে ম্লেচ্ছ ধর্ম্ম বলিয়া চিরদিন অবজ্ঞা করিবে। সময়বিশেষে সমাজের দুই এক অপোগণ্ড বিবিজানের রূপমাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া খৃষ্ট ধর্ম্মের ক্রোড়দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে অথবা ঘোর দুর্ভিক্ষ সময়ে পেটের জ্বালায় অন্ত্যজ জাতির বালক বালিকাগণ মিসনরিদিগের আশ্রয়ে থাকিয়া খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে, তাহাতেই বা হিন্দুসমাজের কত ক্ষতি হইতে পারে?

যে স্থলে মুসলমানধর্ম্ম একহস্তে কোরাণ, অপর হস্তে তরবারি লইয়া এবং দুই হস্তে রাজপ্রসাদ বিতরণ করিতে করিতে পঞ্চ শতাব্দীর ভিতর হিন্দুধর্ম্মের যথার্থ অপকার করিতে পারে নাই, সে স্থলে খৃষ্টধর্ম্ম একমাত্র বাইবেল লইয়া নিজের মোহিনী বিদ্যা প্রচার করিতে করিতে দুই শতাব্দীতে এ ধর্ম্মের কতদূর অনিষ্ট সাধন করিবে বল? যথার্থ বলিতে কি, বেদান্তধর্ম্ম বল, পৌরাণিক ধর্ম্ম বল, ইহাদের সহিত তুলনা করিলে খৃষ্টধর্ম্ম অসার, অপদার্থ ও অবৈজ্ঞানিক। বিজ্ঞানের অনুশীলন যতই বৃদ্ধি পাইবে, খৃষ্টধর্ম্ম পাশ্চাত্য জগতে ততই নিষ্প্রভ হইবে। যখন হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম জগতে প্রচারিত হইবে, তখন কেহই ইহাকে সামান্য পৌত্তলিকতা জ্ঞানে অবজ্ঞা করিবেন না। বিবেকানন্দস্বামী বেদান্ত ধর্ম্মের যেরূপ মাহাত্ম্য জগতে প্রচার করেন, পৌরাণিক ধর্ম্মের সেরূপ মাহাত্ম্য তিনি প্রচার করিয়া যান নাই।

যৎকালে খৃষ্টধর্ম্মমত এদেশে সুশিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতর আদৃত হইতে থাকে এবং লোকে ঐধর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য উদগ্রীব হয়,

তখন মহাত্মা রামমোহন রায় বঙ্গীয় গগনে উদিত হইয়া বেদান্ত হইতে একমেবাদ্বিতীয়ং এর বার্ত্তা পুনঃ প্রচার করিয়া শিক্ষিত সমাজের ধর্ম্মপিপাসা ভালরূপ শান্ত করেন। তিনি খৃষ্টানদিগের গির্জ্জার আদর্শে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন এবং রবিবাসরে উহাদের ধর্ম্মানুশীলন দেখিয়া তিনিও ধর্ম্মাত্মা ভ্রাতাদের সহিত মিলিত হইয়া ঐ দিবসে সমাজগৃহে ঈশ্বরোপাসনাদি ধর্ম্মানুষ্ঠান বিধিবদ্ধ করেন। আধুনিক সাকারবাদী পুরাণ ও তন্ত্রের কথা ছাড়িয়া দেও, তিনি প্রাচীন কালের বেদান্ত ও উপনিষদ হইতে ব্রহ্মোপাসনা প্রচার করিয়া ভারতে খৃষ্টধর্ম্মের পরাজয় সাধন করিয়া যান।

যেমন জগদগুরু শঙ্করাচার্য্যদেব বেদান্তের প্রকৃত ব্যাখা প্রচার করিয়া নিরীশ্বরবাদী বৌদ্ধমত খণ্ডন করেন এবং বৌদ্ধসন্ন্যাসী দিগের আদর্শে শৈব সন্ন্যাসীকুল প্রবর্ত্তন করিয়া ভারতে ঐ ধর্ম্মের পরাজয় সাধন করেন; সেইরূপ মহাত্মা রামমোহন রায়ও বেদান্তের শ্রেষ্ঠ মত দ্বারা খৃষ্টধর্ম্মের মতামত খণ্ডন করেন এবং ঐ ধর্ম্মের আদর্শে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়া ভারতে উহার পরাজয় সাধন করেন। এই প্রকারে তিনিও ঐধর্ম্মের শীল নোড়া লইয়া উহার দাঁতের গোড়া ভাঙ্গিয়া দেন।

কোথায় হে মহাত্মা রামমোহন রায়! ধন্য তোমার ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ! ধন্য তোমার অগাধ বিদ্যাশিক্ষা! দেশের ব্রাহ্মণগণ তোমার উপর খড়্গহস্ত হইলেও তুমি কালের উপযোগিতানুসারে কুলোচিত কর্ম্ম করিয়া হিন্দুসমাজের কি মহোপকার সাধণ করিয়া গিয়াছ? একমেবাদ্বিতীয়ং এর বার্ত্তা প্রচার করিয়া তুমি যে সকল শিক্ষিত যুবকবৃন্দকে হিন্দুধর্ম্মপূজিত বেদান্তের সুশীতল অনাতপে আশ্রয় প্রদান করিয়াছ, তাঁহারা সকলেই তদভাবে নিশ্চয়ই খৃষ্ট-ধর্ম্মের ক্রোড়দেশে আশ্রয় লইতেন। যে সকল হিন্দুযুবক অশেষ পাশ্চাত্য বিদ্যায় বিভূষিত হইয়া পৌত্তলিকতাকে ঘৃণাচক্ষে অব-

লোকন করিবেন, তাঁহাদের মঙ্গলের জন্য তুমি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়া গিয়াছ। যদি তাঁহারা খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া চিরদিনের জন্য হিন্দুসমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া যাইতেন, এ সমাজের কত ক্ষতি হইত! এজন্য মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা উচিত, সুমহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্রাহ্মসমাজ এদেশে স্থাপিত হইয়াছে এবং রামমোহন রায়প্রমুখ ধর্ম্মাত্মাগণের নিকট হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজ চিরঋণে আবদ্ধ আছে।

জাতিভেদাদি না মানাতে ব্রাহ্মসমাজের উপর এখন সাধারণ হিন্দুসমাজের যেরূপ ঘৃণা ও বিদ্বেষ দেখা যায়, তাহা কালে মন্দীভূত হইবে এবং ব্রাহ্মসম্প্রদায়ও কালে সাধারণ হিন্দুসমাজের অঙ্গীভূত হইয়া যাইবে। তাহার সাক্ষ্য, যখন মহাপ্রভু চৈতন্যদেব বঙ্গদেশে বৈষ্ণবসম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করেন, তখন তৎপ্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ও সাধারণ সমাজের ঘৃণাস্পদ হইয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে তাহাও হিন্দুসমাজের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। হিন্দুধর্ম্মের এতদূর স্থিতিস্থাপকতা গুণ আছে, যদি এধর্ম্ম রাজশক্তির ভালরূপ সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষণ পায়, ব্রাহ্মসমাজ কোন্ ছার, মুসলমান ও খৃষ্টান সমাজকে কালবশে স্বসমাজে সমীকৃত করিয়া লইতে পারে। পুরাতন বৌদ্ধসমাজ কোথায় গেল? ব্রাহ্মণজাতির বুদ্ধিকৌশলে উহারা কালে সাধারণ হিন্দুসমাজভুক্ত হইয়া গিয়াছে।

আজকাল উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে যে সকল শিক্ষিত যুবক পৌত্তলিকতায় বীতশ্রদ্ধ হন, তাঁহাদের জন্য আর্য্যসমাজ স্থাপিত হইয়াছে। মহাত্মা বেদবিৎ দয়ানন্দসরস্বতী ইহার প্রবর্ত্তক। তিনিও সাকারবাদী পৌরাণিক ধর্ম্মের খণ্ডন করিয়া নিরাকারবাদী বেদান্তের মত বাহাল রাখেন; এ সমাজ ক্রমশঃ গঠিত হইতেছে। ইহার লোকবর্গ সাধারণ হিন্দুসমাজভুক্ত এবং প্রায় সকল বিষয়ে হিন্দুধর্ম্মের আচার ব্যবহার প্রতিপালন করে। অনেক মুসলমান এই দলে

যোগদান করিয়া ক্রমশঃ হিন্দু হইতেছে। যাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ হিন্দু ছিল এবং যাহারা পূর্ব্বতন আচার ব্যবহার মানিয়া চলিতেছে, তাহাদের স্বেচ্ছায় পুনরায় হিন্দু হওয়া একান্ত আবশ্যক এবং তাহাদিগকে পুনঃ গ্রহণ করাও হিন্দুসমাজের একান্ত আবশ্যক। যদি আর্য্যসমাজ এই কাজে সফলমনোরথ হইতে পারে, এ সমাজ হিন্দুসমাজের মহোপকার সাধন করিবে।

আজকাল শিক্ষিত সম্প্রদায় দলে দলে রামকৃষ্ণমিসনে যোগদান করিতেছেন। পূজ্যপাদ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব অশিক্ষিত হইয়াও একমাত্র মাকালীর সাধনবলে যোগসিদ্ধ হন। তিনি অতি সহজ ভাষায় যেরূপ উৎকৃষ্ট ধর্ম্মোপদেশ দেন, তাহাতে শিক্ষিত সম্প্রদায় মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া তদীয় শ্রীচরণ সেবা করিয়া গিয়াছেন। তিনি সকল ধর্ম্মের সমন্বয় করিয়া যান এবং কোন ধর্ম্মের প্রতি তিনি কোনরূপ বিদ্বেষভাব প্রকাশ করেন নাই। কি হিন্দু, কি ব্রাহ্ম, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান, সকলকে তিনি নিজ ক্রোড়দেশে আহ্বান করিয়াছেন। এই প্রকারে তিনি উহাদের মধ্যে একতাস্থাপনের বীজ রোপণ করিয়া যান।

তাঁহার প্রধান চেলা বিবেকানন্দস্বামী আমেরিকায় গিয়া যেরূপ দুন্দুভিস্বরে ইংরাজিভাষায় বেদান্তধর্ম্মের মতামত প্রচার করেন, তাহাতে পাশ্চাত্যজগৎ স্তম্ভিত হইয়া যায় এবং অনেকে হিন্দুধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া মিসনে যোগদান করেন। স্বামীজি ইংরাজিভাষায় হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থাবলি প্রচার করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায় পুনরায় স্বধর্ম্মে শ্রদ্ধাবান হইতেছেন। দুঃখের বিষয়, স্বামীজির অকালমৃত্যুতে ভারতগগন হইতে একটী উজ্জ্বলতম তারা খসিয়া পড়ে এবং হিন্দুসমাজের মহৎ অমঙ্গল ঘটিয়াছে।

যাহা হউক, এই মিসনের নানা শাখাপ্রশাখা এখন ভারতের

নানাস্থানে অভিব্যাপ্ত হইতেছে। এই মিসন স্থাপিত হইবার পর ব্রাহ্মসমাজের অবনতি আরম্ভ হইয়াছে। এখন শিক্ষিতসমাজ খৃষ্টান হওয়া দূরে থাকুক, ব্রাহ্মসমাজেও যোগদান করেন না। তাঁহারা সনাতন হিন্দুধর্ম্মের মাহাত্ম্য বুঝিয়া উহাতে নিষ্ঠাবান হইতেছেন।

ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত, মুসলমানযুগে হিন্দু মুসলমানের ভিতর যে বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল এবং যাহা এখনও সর্ব্বত্র ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে, খৃষ্টানযুগে তাহা একেবারে নির্ব্বাপিত করা আবশ্যক। দেখ, রামরহিম দুই ভাই এক ভারতমাতার সন্তান। উহারা এখন ভ্রাতৃভাবে পরস্পর আলিঙ্গন ও কোলাকুলি করিলে দেশের অশেষ মঙ্গল। আমরা যেমন পরাধীন, উহারাও তেমনি পরাধীন। তবে কেন পরস্পর খেয়োখেয়ী করিয়া মরি? ইংরাজরাজ আপনাদের মঙ্গলের জন্য উহাদিগকে পৃথক রাখিবার জন্য বিদ্বেষানলে ইন্ধন রাশি দিতেছেন। এই দুই জাতি পরস্পব মিলিত হইলে তাঁহাদের বিশেষ অমঙ্গল; এজন্য গাঁধিপ্রমুখ সমাজনেতৃগণ উহাদের ভিতর একতা স্থাপনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের চেষ্টা কতদূর সফল হইবে, তাহা ভবিষ্যৎ গর্ভে নিহিত। যে বিদ্বেষ সপ্ত শতাব্দী কাল ব্যাপিয়া চলিতেছে, তাহা কি ১০ ২০ বৎসরে প্রশমিত হইতে পারে, বা সভায় সামান্য বক্তৃতায় দূরীভূত হইতে পারে? তজ্জন্য উভয় জাতিকে ভালরূপ প্রস্তুত হইতে হইবে।

এ বিষয়ে মুসলমান জাতির কি কি কর্ত্তব্য :—

(১) গোহত্যা রহিত করা ও গোমাংস ভক্ষণ একেবারে নিষেধ করা।

(২) হিন্দুজাতির সদাচার অবলম্বন করিয়া উহাদের সহিত পানভোজনে মিশ্রিত হওয়া।

(৩) উহাদের মহোৎসবে যোগদান করা।

(৪) উহাদের পূজ্য দেবতাদিগের প্রতি কোনরূপ অবজ্ঞা বা বিদ্বেষ প্রকাশ না করা।

হিন্দুজাতির কি কি কর্ত্তব্য—

(১) মহম্মদদেবকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া মানা।

(২) উহাদের পীর প্রভৃতির উপর ভক্তি প্রদর্শন করা।

(৩) উহাদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়া ঘৃণা না করা এবং ক্রমশঃ পান ভোজনে মিশ্রিত হওয়া।

(৪) উহাদের মহরমাদিতে যোগদান করা।

হিন্দুমুসলমানের একতা স্থাপনে একদিকে মৌলবী ও ইংরাজ-কর্ম্মচারিগণ, অপরদিকে অধ্যাপক মণ্ডলী ও অশিক্ষিত লোক সম্পূর্ণ বাধা দিতেছে। এজন্য যাঁহারা রাজনৈতিক বিষয়ে সমাজনেতা, তাঁহারা বলেন, ধর্ম্মবিষয়ক মতামত ও বিশ্বাস যাহাই হউক না কেন, ভারতে স্বরাজলাভের জন্য হিন্দুমুসলমান একযোগে চেষ্টা করিলে উভয় জাতির মনোবাঞ্ছা কালে পূর্ণ হইবে।

দেশের শিক্ষিত নেতৃবৃন্দ ভারতের মঙ্গলের জন্য উভয় জাতির ভিতর একতাস্থাপনে কয়েক বৎসর যথাসাধ্য চেষ্টা পাইলেন; কিন্তু আমলাতন্ত্রের এক বোড়ের চালে সব মাৎ হইয়া গেল এবং স্বরাজের ধ্বজপতাকা কোথায় উড়িয়া গেল, তাহা কেহ দেখিতে পাইলেন না। নির্ব্বোধ অশিক্ষিত মুসলমানগণ সামান্য কারণে হিন্দুদিগের সহিত নানাস্থানে বিবাদ বিসম্বাদে লিপ্ত হইয়া ভারতের রাজনৈতিক গগনকে অন্ধকারাবৃত করিয়াছে। অনেকের ধারণা, যতদিন আমলা-তন্ত্র এদেশে সর্ব্বেসর্ব্বা থাকিবে, ততদিন উভয় জাতির ভিতর একতা স্থাপনে অনেক বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। যাঁহারা ভেদনীতি অব-লম্বন করিয়া ভারতশাসন করিতেছেন তাহারা আপনাদের স্বার্থ-খুঁজিবেন, তোমার আমার কথায় কেন কর্ণপাত করিবেন? এ সংসারে সকলেই নিজ নিজ স্বার্থ দেখিয়া থাকে।

যে অর্থপূজক ইংরাজ ভারতের অর্থ নানাদিকে শোষণ করিয়া আমাদিগকে ক্রমশঃ দীনদরিদ্র করিতেছেন, তাঁহাদের সেই অর্থ শোষণে সবিশেষ বাধা দেওয়া আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। তাহাই এখন আমাদের প্রধান ধর্ম্ম। সেজন্য ঘরে ঘরে তুলার চাষ, বস্ত্র বয়ন বা খদ্দরযজ্ঞ করা একান্ত আবশ্যক। সেই সঙ্গে বিলাতি বিলাস দ্রব্য বর্জ্জন করাও আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। ইহাতে দেশের প্রভূত অর্থ দেশে থাকিয়া যাইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পাশ্চাত্য শিক্ষা পাইয়া আমাদের রুচি বিকৃত হইয়া গিয়াছে। আমরা এখন বিলাতি দ্রব্য পছন্দ করি। পাঁচ জনে যাহা করে, তাহাই করিতে আমরা স্বতঃ প্রবৃত্ত হই। আমরা এখন ঘোর বাবু, অল্প পয়সায় বিলাতি দ্রব্য ব্যবহার না করিলে আমাদের বাবুয়ানী চলে না। সুতরাং বাধ্য হইয়া আমাদিগকে পদে পদে বিলাতি দ্রব্য ব্যবহার করিতে হয়। এই প্রকারে আমরা ইংরাজ মহাজনের পাদপদ্মে কত টাকা ঢালি, তাহার কি নিকাশ আছে? যদি পূর্ব্বের ন্যায় জাতিভেদের কঠোর শাসন থাকিত, এ সব অনাচার একদিনে বন্ধ হইয়া যাইত। আজ কালের সুশিক্ষিত সমাজনায়কগণ জাতিভেদের শাসন উঠাইয়া দিয়া আপনাদের পাদমূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। কবে তাঁহাদের সুমতি হইবে?

দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত।

বৈজ্ঞানিক-হিন্দুধর্ম্ম।

তৃতীয় ভাগ।

প্রথম অধ্যায়।

মানবসমাজ ও মানবপরিবার।

কতকাল হইতে মানব সমাজবদ্ধ ও পরিবারবর্গে বেষ্টিত হইয়া লোকালয়ে বাস করিতেছেন, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। কিন্তু ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত, আদিম অবস্থা হইতে তিনি সমাজবদ্ধ হইয়াছেন এবং বহুকাল সমাজে থাকিতে থাকিতে জ্ঞানশক্তির উন্মেষের সঙ্গে যখন সমাজে বিবাহপ্রথা প্রচলিত হয়, তখন হইতে তিনি পরিবার-বর্গে বেষ্টিত হইয়া লোকালয়ে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন।

যেমন অসঙ্গলিপ্সা তদীয় হৃদয়ে বলবতী বলিয়া তিনি আদিম অবস্থা হইতে পাঁচজনের সহিত মিলিত হইয়া সমাজে বসবাস করিতেছেন, তেমনি নানাকারণে কঠোর আবশ্যকতায় বাধ্য হইয়া নিজের সুবিধার জন্য তিনি সমাজবদ্ধ হইয়াছেন। জীবজগৎ অনু-সন্ধান করিলে বুঝা যায়, যে সকল উদ্ভিজ্জভোজী জীব এখনও মানবের শরণ লয় নাই, উহারা প্রাকৃতিক প্রতিদ্বন্দ্বিবর্গের সহিত জীবনসংগ্রামে জয়লাভ করিবার জন্য বা আত্মরক্ষার্থ দলবদ্ধ হইয়া থাকে। হস্তী, মহিষ, হরিণ, শূকর প্রভৃতি বন্যজন্তুগণ দলবদ্ধ হইয়া জঙ্গলে জঙ্গলে বিচরণ করে। দলবদ্ধ হইয়া থাকিবার প্রধান কারণ আত্মরক্ষা।

বিজ্ঞানের মতে আদিম অবস্থায় যখন বর্ব্বর মানব নিকৃষ্ট জন্তুর ন্যায় বনে বনে বিচরণ করিত এবং বৃক্ষকোটরে বা গিরিগুহায় বাস করিত, তখন সে মানব আত্মরক্ষার্থ দলবদ্ধ হইয়া থাকিত। এইরূপে বহুকাল দলবদ্ধ হইয়া থাকিতে থাকিতে তদীয় মনে জ্ঞানশক্তির কিঞ্চিৎ উন্মেষ আরম্ভ হয় এবং সেইসঙ্গে তাঁহার সমাজও ক্রমশঃ গঠিত হইতে আরম্ভ হয়। এই সমাজে বসবাস করাতে এত জ্ঞানোন্নতি, এত ধর্ম্মোন্নতি ও এত শ্রীবৃদ্ধিসাধন তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়াছে।

এখন একবার সেই আদিম অবস্থার বিষয় ভাবা উচিত। হায়! সে অবস্থা কিরূপ ভয়ঙ্কর! ও কিরূপ শোচনীয়! তখন কোথায় বা জ্ঞান! কোথায় বা ধর্ম্ম! মানবমনে কিছুই অঙ্কুরিত হয় নাই। তখন কোথায় বা সমাজপদ্ধতি! কোথায় বা পরিবারপদ্ধতি! জগতে কিছুই প্রবর্ত্তিত হয় নাই। তখন মানবকুল বনের বনমানুষের ন্যায় বনে বনে বিচরণ করিত। তখন উহারা গৃহাভাবে, অন্নাভাবে, বস্ত্রাভাবে নিকৃষ্ট জন্তুর ন্যায় নিকৃষ্ট জীবন নিকৃষ্ট সুখভোগে যাপন করিত।

যে স্থলে সুসভ্য মানব আজ অমরাবতীর প্রাসোদোপরি অধিশয়ান, সে স্থলে আদিমানব সামান্য বৃক্ষকোটরবাসী বা গিরিগহ্বরবাসী। যে স্থলে তিনি আজ বিবিধ সুস্বাদু খাদ্য ভোজন করিয়া অশেষরূপে পরিতৃপ্ত, সে স্থলে আদিমানব সহজাত বন্য ফলমূলে বা নিকৃষ্ট জন্তুর আমমাংসে দগ্ধোদর পূরণ করিয়া সর্ব্বথা অতৃপ্ত। যে স্থলে তিনি আজ বিবিধ মনোহর বস্ত্রেও বহুমূল্য আভরণে বিভূষিত, সে স্থলে আদিমানব উলঙ্গ, বল্কলধারী বা অজিনধারী। যে স্থলে তিনি আজ জ্ঞানবলে, ধর্ম্মবলে ও অর্থবলে জীবজগতের জীবরাজ, সে স্থলে আদিমানব চতুর্দ্দিকস্থ শ্বাপদকুলের ভয়ে ভীত ও ত্রস্ত। যে স্থলে আজ তিনি স্বগৃহে স্বজনবর্গে বেষ্টিত হইয়া পরমানন্দে আছেন, সে স্থলে স্বজনবর্গের সহিত আদিমানবের আলাপ পরিচয় কিছুমাত্র ছিল না।

যে স্থলে সুসভ্য মানব আজ দেশলাই জ্বালাইয়া নিমিষ মধ্যে অগ্নি উৎপাদন করিতেছেন, সে স্থলে বর্ব্বর মানব কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিতে করিতে অতিকষ্টে অগ্ন্যুৎপাদন করিত। যে স্থলে তিনি আজ বৃহৎ বৃহৎ অর্ণবপোত ও বাষ্পীয় পোত নির্ম্মাণ পূর্ব্বক দুস্তর সাগর সুখে পার হইতেছেন, সে স্থলে বর্ব্বর মানব অগ্নিসংযোগে বৃক্ষস্তম্ভের অভ্যন্তর ভাগ দগ্ধ করিয়া কদর্য্য সাল্‌তি নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক অতিকষ্টে সামান্য নদ নদী পার হইত। যে স্থলে সমাজের বিবিধ অনাটন ও অভাব স্বজাতিবর্গের সমবেত চেষ্টা ও পরিশ্রম দ্বারা পরিপূরিত ও দূরীভূত, সে স্থলে বর্ব্বর মানব নিজের সামান্য অভাব নিজে পূরণ করিতে ব্যস্ত। বর্ব্বর সমাজের এই ভীষণ অবস্থা, আর আধুনিক সুসভ্য সমাজের এমন রমণীয় ও সমৃদ্ধ অবস্থা, উভয়ের তুলনা করিলে স্পষ্ট বুঝা যায়, মানব কি প্রকারে সমাজে বসবাস করিয়া জ্ঞানানুশীলন করিতে করিতে স্বকীয় অবস্থার এতদূর উন্নতিসাধন করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

বহুকাল দলবদ্ধ হইয়া থাকিবার পর মনে জ্ঞানশক্তির কিঞ্চিৎ উন্মেষ হইলে বর্ব্বর মানবজাতির ভিতর কালক্রমে অগ্ন্যুৎপাদন ও মনোভাব ব্যক্ত করিবার জন্য বাক্য-কথন ভাষা উদ্ভাবিত হয়। অগ্ন্যুৎপাদন, লৌহাস্ত্রনির্ম্মাণ ও ভাষাসৃষ্টির সহিত জগতে সভ্যতার সূত্রপাত হয়। পরে দীর্ঘকালব্যাপী জাতীয় সাধনার গুণে জ্ঞান-শক্তির যেমন বিকাশ হইতে থাকে, তিনি সভ্যতার পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হন। সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে বিবাহপ্রথা সমাজে প্রবর্ত্তিত হয় এবং সেই সঙ্গে তাঁহার পরিবার গঠিত হয়। অনেকগুলি পরিবার একত্র একস্থানে বসবাস করাতে পল্লীসমাজ বা নগরসমাজ গঠিত হয়। এইরূপ বহুসংখ্যক পল্লীসমাজ বা নগরসমাজ এক রাজার অধীনস্থ হওয়ায় তাঁহার রাজ্য গঠিত হয়।

প্রত্নতত্ত্বের এ সকল কথা কতদূর প্রমাণসিদ্ধ, তাহা বলা যায় না।

যে অধ্যাত্মবিজ্ঞান বলে, চিরদিনই পৃথ্বীতলে সুসভ্য ও অসভ্য জাতি বসবাস করিতেছে, উহার সহিত এ সকল কথার সামঞ্জস্য হয় না। যাহা হউক, সুদূর ভবিষ্যতে এ সকল নিগূঢ় তথ্য মীমাংসিত হইবে।

এখন জিজ্ঞাস্য, মানব কিরূপে স্বজনবর্গে বেষ্টিত হইয়া নিজের পরিবার গঠন করিলেন? ইহার মূলকারণ অন্বেষণ করা আবশ্যক। জীবজগৎ অনুসন্ধান করিলে বুঝা যায়, যে অপত্যস্নেহ সকল স্ত্রীজাতীয় জীবের নৈসর্গিক সংস্কার, যদ্দ্বারা জীববৎস নিরুপায় অবস্থায় স্বীয় মাতা কর্ত্তৃক লালিত ও পালিত হয়, তাহা স্ত্রীজাতির হৃদয়ে যতদূর প্রবল, পুরুষজাতির ভিতর ততদূর নয়। উৎকৃষ্ট জীবদিগের ভিতর জীববৎস অসহায় অবস্থায় স্বীয় গর্ভধারিণীর প্রথম পরিচয় পায় এবং তদীয় স্তনদুগ্ধে লালিত ও পালিত হয়। পরে যখন ইহা প্রকৃতিজগৎ হইতে নিজের আহার্য্য অন্বেষণ করিতে শিক্ষা করে, তখন মাতার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া পড়ে। পিতার সহিত ইহার কোন সময়ে কোনরূপ সম্পর্ক থাকে না। যদৃচ্ছালব্ধ স্ত্রীসঙ্গম দ্বারা জীবজগতে সন্তান উৎপন্ন হইতেছে। ইতর প্রাণীদের ভিতর না আছে সমাজ, না আছে পরিবার। প্রকৃতি একমাত্র নৈসর্গিক সংস্কারে উহাদিগকে চিরদিন সকল বিষয়ে চালাইতেছে।

এখন একবার মানবপরিবারের দিকে দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে ইহার কিরূপ বিপরীত ভাব ও স্বর্গীয় ভাব! ধর্ম্মের কল্যাণে মানবগৃহ আজ স্বর্গের নন্দনকানন ও অপূর্ব্ব সুখশান্তির নিকেতন। এইখানেই তাঁহার অপূর্ব্ব স্নেহ, মমতা ও প্রেমের ফোয়ারা সদা খেলিতেছে। এই দুঃখের সংসারে, এই ভবমরুভূমিতে যদি তাঁহার কোন সুখের স্থান থাকে, সে তাঁহার স্বগৃহ, যেখানে স্বজনবর্গের হাসি হাসি চাঁদবদন দেখিয়া তাঁহার হৃদয়চকোর সদা পরিতৃপ্ত হইতেছে। এইখানেই তিনি নিজের দগ্ধ হৃদয় জুড়ান; বিপদে

পতিত হইলে স্বজনবর্গই তাঁহার জন্য কাঁদিতে থাকে ও বিপদের প্রতীকার করে। রোগযন্ত্রণায় অস্থির হইলে উহারাই তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করে, গায়ে হাত বুলায়, তালবৃন্ত দিয়া বাতাস করে ও ঔষধের জন্য ছুটাছুটি করে। ইহসংসার ত্যাগ করিলে উহারা শোকে আকুল হইয়া তাঁহার জন্য হাহাকার করিতে থাকে! তিনি যেখানে থাকুন না কেন, তাঁহার হৃদয়কম্পাস কাঁপিতে কাঁপিতে সদা স্বগৃহের দিকে ধাবিত হইবে। এখন তাঁহার পিতামাতা, মাসিপিসী ভ্রাতাভগিনী স্ত্রী পুত্র কন্যা পুত্রবধূ প্রভৃতি লইয়াই তাঁহার পরিবার। ইহাদিগকে লইয়াই তিনি এ সংসারে গৃহাশ্রমী বা গৃহী।

তাঁহার অবস্থা যেরূপ হউক না কেন, তিনি সুসভ্য হউন বা অসভ্য হউন, তিনি লক্ষপতি হউন বা পথের ভিখারী হউন, তাঁহার প্রাসাদ বা পর্ণকুটীর তাঁহার নিকট স্বর্গধাম। কি মোহিনী শক্তি বলে, কি যাদুবলে তাঁহার গৃহ এমন সুখশান্তির নিকেতন হইল? সুকুমারী, স্নেহময়ী, মায়ামমতাময়ী লক্ষ্মীস্বরূপা নারী গৃহরাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ও রাণী। তাঁহারই অমৃতবর্ষী মধুর হস্তের অমৃত-বর্ষণে আমাদের গৃহ আজ এমন স্বর্গের নন্দনকানন।

বহুকাল পরিজনবর্গ লইয়া একত্র বসবাস করাতে তাঁহার মনে ভক্তি, প্রেম, স্নেহমমতা, সৌভ্রাত্র প্রভৃতি সাত্বিক ভাবাবলি ক্রমশঃ স্ফুরিত হইয়াছে। ইহারা তদীয় হৃদয়ে বলবৎ বলিয়া তিনি চিরদিন স্বজনবর্গ লইয়া স্বগৃহে অবস্থিতি করিতেছেন। এখন উহারা তাঁহার শরীরের একপ্রকার অঙ্গীভূত। তাঁহার স্বার্থ, আর উহাদের স্বার্থ এখন অপরিহার্য্যরূপে জড়িত।

অনেকে মনে করেন, যে সকল সাত্বিক ভাবাবলি দ্বারা আমাদের পরিবার গঠিত ও রক্ষিত, তাহা আমাদের নৈসর্গিক সংস্কার। আমরা প্রকৃতিদত্ত সংস্কার বশতঃ স্ত্রীপুত্র লইয়া একত্র বসবাস করিয়া পরম

সুখে জীবন কাটাই। বিজ্ঞান এ কথার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলে, জাতীয় জীবনের শৈশব অবস্থা হইতে পরিজন মধ্যে বহুকাল থাকিতে থাকিতে ঐ সকল সাত্ত্বিক ভাব অভ্যাস বশতঃ এতদূর স্ফুরিত হইয়াছে। বিশেষতঃ মানবধর্ম্ম সকল দেশে উহাদের সম্যক স্ফুরণে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছে। এখন কালক্রমে উহারা এতদূর স্ফুরিত, যে বাস্তবিক নৈসর্গিক না হইলেও এখন উহারা প্রায় নৈসর্গিক ভাবে পরিণত। দেখ, মাতার অপত্যস্নেহ এক নৈসর্গিক সংস্কার; কিন্তু পিতার মনে যে অপত্যস্নেহ দেখা যায়, তাহা নৈসর্গিক না হইলেও বাল্যকালার্জ্জিত সংস্কারের সহিত প্রাপ্ত এবং অভ্যাস ও পুরুষানুক্রমণিকতা বশতঃ এখন এতদূর প্রবল; অতএব ইহাও একপ্রকার নৈসর্গিক।

এই সকল পারিবারিক ভাব হৃদয়ে এখন এত প্রবল, যে তিনি স্বজনবর্গকে ভোজন না করাইয়া নিজে ভোজন করেন না, উহাদিগকে বেশভূষায় বিভূষিত না করিয়া নিজে বেশভূষা পরিধান করেন না। উহাদের ভরণ পোষণের জন্য তিনি বিদেশ বিভূমে নির্বান্ধব পুরীতে একমাত্র ভগবানকে মাথায় রাখিয়া কত বিপদ আপদের সম্মুখীন হইয়া দুপয়সা আনিতে চেষ্টা পান। এখন নিজে রোগাক্রান্ত হইলে তিনি যেরূপ যন্ত্রণায় অস্থির হন,উহারা রোগাক্রান্ত হইলে উহাদের যন্ত্রণাদর্শনে তিনি তেমনি কাতর হন। স্ত্রীপুত্রের সহাস্যবদনদর্শনে তিনি যেমন হর্ষোৎফুল্ল হন, উহাদের ম্লানবদনদর্শনে তেমনি ম্রিয়মাণ হন। এই প্রকারে স্বজনবর্গের সহিত তাঁহার হৃদয়ের সহানুভূতি সম্পূর্ণ অকপট। এখন যেমন তাঁহার বিপদে, উহাদের বিপদ, তেমনি তাঁহার সম্পদে, উহাদের সম্পদ। উহাদের বিপদে যেমন তাঁহার বিপদ, তেমনি উহাদের সম্পদে তাঁহার সম্পদ। এই প্রকারে স্বজনবর্গে বেষ্টিত হইয়া তিনি স্বগৃহে পরম সুখে কালাতিপাত করিতেছেন।

সবে পরিজন মিলে থাকি এক ঠাঁই
কেমন সুখেতে তাহে জীবন কাটাই। (পদ্যপাঠ)

বেশ জানিবে, নিম্নলিখিত কয়েকটী কারণে মানবের সুখৈশ্বর্য্য এতদূর বর্দ্ধিত হইয়াছে।

(১) সমাজে স্বজাতির মধ্যে একত্র বসবাস করাতে।
(২) পরিবার মধ্যে স্বজনবর্গের সহিত একত্র বসবাস করাতে।
(৩) জ্ঞানানুশীলন করাতে।
(৪) ধর্ম্মানুশীলন করাতে।

পরিবার ও সমাজের উপর ধর্ম্মের অনুশাসন।

ধর্ম্মমাত্রেই সকল দেশে ও সকল সময়ে পরিবারের উপর ইহার প্রীতিকর অনুশাসন পূর্ণভাবে চালায়। যে পরিবার সমাজদেহের জীবাণুস্বরূপ, যাহার পুঞ্জীকরণ দ্বারা ইহা বিরচিত, সেই পরিবারের অশেষ সম্বন্ধ, স্বজনবর্গের ইতিকর্ত্তব্যতা প্রভৃতি নানা বিষয় ধর্ম্মই চিরদিন নিরূপিত করে ও সুচারুরূপে চালায়।

বলি, যে মানব আদিম অবস্থায় একমাত্র গর্ভধারিণীর সহিত শৈশবকালে কিছুদিনের জন্য পরিচিত ছিলেন এবং অন্য স্বজন বর্গের নামগন্ধ জানিতেন না, সে মানব আজ কোথা হইতে স্বজনবর্গে বেষ্টিত হইয়া উহাদের জন্য এতদূর স্নেহে ও মমতায় বদ্ধ হইলেন? কে তাঁহাকে এমন প্রেমডোরে ও মায়াডোরে উহাদের সহিত বাঁধিল? উহাদের জন্য এত ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করিতে কে শিখাইল? এ বিষয়ের গূঢ় কারণ নিরূপণ করা আবশ্যক।

ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, স্ত্রীজাতির অপত্যস্নেহ ও উভয় জাতির কামপ্রবৃত্তি আমাদের নৈসর্গিক সংস্কার। তদ্ভিন্ন হৃদয়ের যে সকল সাত্বিক ভাব দ্বারা মানবপরিবার গঠিত ও রক্ষিত, তাহা

আমাদের নৈসর্গিক সংস্কার নহে, কিন্তু বাল্যকালার্জ্জিত সংস্কার মাত্র। অতি পুরাকালে যখন অসভ্য অসহায় মানব প্রকৃতিজগতের ভয়াবহ দৃশ্যপটল দর্শনে ভীত ও চকিত হন, যখন চতুর্দ্দিকে শক্রবর্গে বেষ্টিত হওয়াতে তাহার জীবনসংগ্রাম আয়াসসাধ্য হয়, তখন তিনি কঠোর আবশ্যকতায় বাধ্য হইয়া প্রতিবেশীমণ্ডলীর সহিত একত্র বসবাস করিতে শিক্ষা করেন। বহুকাল পরে বিদ্যাবুদ্ধির ক্রমোন্নতির সহিত যখন মানবধর্ম্ম সমাজে বিবাহপ্রথা প্রবর্ত্তিত করে, তখন হইতে তিনি স্বজনবর্গের পরিচয় ক্রমশঃ পান। সংসার মধ্যে কে তাঁহার আত্মীয় বা অনাত্মীয়, তাহা তিনি এই সময়ে বুঝিতে পারেন।

সমাজে বিবাহপ্রথা প্রচলিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃষ্ট পদ্ধতিতে পরিবার গঠনের সূত্রপাত হইল এবং মানবও স্বজনবর্গের সহিত সুপরিচিত হইলেন। এইরূপে উহাদের সহিত বহুকাল একত্র বসবাস করাতে তাঁহার পারিবারিক ভাবগুলি তদীয় হৃদয়ে ক্রমশঃ স্ফুরিত হইয়াছে। ইহাদের সম্যক স্ফূর্ত্তি বশতঃ তিনি এখন স্বজনবর্গের সহিত এতদূর মায়া ও মমতায় আবদ্ধ।

এখন নৈসর্গিক সংস্কারে হউক, বাল্যকালার্জ্জিত সংস্কারে হউক, লোকাচারে হউক বা লোকপরম্পরায় হউক, এখন তিনি যে ভাবে স্বজনবর্গে বেষ্টিত, যদ্দ্বারা তাহার সুখসম্ভার অশেষরূপে পরিবর্দ্ধিত, তাহাতে হৃদয়ের যে সকল ভাবাবলির উপর পারিবারিক সংস্থানের মূলভিত্তি প্রোথিত, উহারা তাঁহার একপ্রকার নৈসর্গিক সংস্কার। যখন পারিবারিক ধর্ম্মপালন ব্যতীত তাঁহার জীবনযাত্রা অচল, তখন উহারা প্রকৃতরূপ নৈসর্গিক না হইলেও অভ্যাস ও পুরুষানুক্রমিকতা বশতঃ একরূপ নৈসর্গিক সংস্কারে পরিণত।

যেমন বিবেকরূপ বাল্যকালার্জ্জিত সংস্কার ব্যতীত তাঁহার সংসার অচল, সেইরূপ পারিবারিক ধর্ম্মপালন ব্যতীত তাঁহার গত্যন্তর নাই।

যে পরিবার মধ্যে থাকিয়া তিনি অশেষ সুখে সুখী, যে পরিবার ব্যতীত তাঁহার জীবনের এক মুহূর্ত্তও অতিবাহিত হয় না, যে পরিবার বলে তিনি জীবনের যাবতীয় বিপদ আপদ ও রোগশোককে তুচ্ছ জ্ঞান করেন, সেই পরিবারের উপর তাঁহার চিরবন্ধু ধর্ম্ম পূর্ণ অনুশাসন চালাইতেছে, ইহার বিবিধ সম্বন্ধ সুচারুরূপে নিরূপণ করিতেছে এবং পারিবারিক ভাবাবলির সম্যক স্ফুরণ করিতে চেষ্টা পাইতেছে।

এখন একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, ধর্ম্ম এ বিষয়ে মানবের কতদূর মহোপকার সাধন করিয়াছে! পুত্রকন্যার সহিত যে পিতার আদৌ পরিচয় ছিল না, সে পিতা আজ অপত্যস্নেহে বিভোর হইয়া স্বতঃ উহাদের ভরণ পোষণ করিতেছেন, রোগের সময় বিধিমতে উহাদের সেবাশুশ্রূষা করিতেছেন, উহাদের চাঁদবদনদর্শনে কৃতার্থ হইতেছেন। কে পিতাকে এমন বাৎসল্যভাব শিখাইল?

শৈশবে স্তন্যপানকালে পুত্রকন্যার সহিত যে মাতার কেবলমাত্র ক্ষণস্থায়ি পরিচয় ছিল, সে মাতার অপত্যস্নেহ আজ উহাদের জন্য আজীবন সমভাবে স্বরিত ও বিগলিত হইতেছে, উহাদের ম্লানবদন দর্শনে তিনি মনদুঃখে মর্ম্মাহত হইতেছেন, রোগের সময় তিনি বুকের রক্ত দিয়া উহাদের প্রাণপণ সেবা করিতেছেন এবং সংসারে এমন বিপদ নাই, যাহা তিনি উহাদের জন্য সহ্য না করিতে পারেন। কে মাতাকে এমন স্নেহময়ী করিল?

পিতার সহিত যে পুত্রকন্যার আদৌ পরিচয় ছিল না, নিরুপায় অসহায় অবস্থায় পালিত হওয়ায় সে পুত্রকন্যা আজ পিতাকে কিরূপ অশেষ ভক্তি ও সম্মান করিতেছে, বার্দ্ধক্যে তাঁহার কিরূপ সেবা করিতেছে ও পিতৃঋণ পরিশোধনার্থ কিরূপ যত্নবান। কে পুত্রকন্যাকে এতদূর ভক্তি দেখাইতে শিখাইল?

মাতার সহিত যে পুত্রকন্যার ক্ষণস্থায়ী সম্পর্ক ছিল, সে পুত্রকন্যা আজ স্নেহময়ী জননীকে "স্বর্গাদপি গরীয়সী" জ্ঞান করিতেছে, সে

পুত্রকন্যা কস্মিনকালে মাতার অপার স্নেহ, মমতা, ভালবাসা ও যত্ন কিছুতে বিস্মৃত হয় না। কে উহাদিগকে মা। মা! বলিয়া এমন সুমধুর স্বরে ডাকিতে শিখাইল? রোগের সময় যন্ত্রণায় অস্থির হইলে কে উহাদিগকে "বাবাগো! মাগো! গেলাম গো!" এই মধুর বাণী বলিতে শিখাইল?

যে সহোদর ভ্রাতার সহিত অপর ভ্রাতার কিছুমাত্র সম্পর্ক ছিল না, আজ উহারা এক গৃহে এক পিতামাতা দ্বারা প্রতিপালিত হওয়ায় ও একসঙ্গে খেলা দেলা করায় আজীবন অপার সৌভ্রাত্ররসে পরিপ্লুত হইতেছে, অপূর্ব্ব সহানুভূতিশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া পরস্পরের বিপদ মাথায় পাতিয়া লইতেছে। কে উহাদিগকে এতদূর সৌভ্রাত্র শিখাইল?

যে ভগিনীর সহিত ভ্রাতার আদৌ পরিচয় ছিল না, সে ভগিনী আজ ভ্রাতার জন্য কিরূপ অপূর্ব্ব স্নেহরসে আপ্লুতা ও উহার সেবায় কিরূপ যত্নবতী। কে ভগিনীকে এমন স্নেহের পুত্তলী করিল?

যে পুরুষ নারীজাতির সহিত যদৃচ্ছামত সঙ্গত হইয়া নিকৃষ্ট কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিত, সে পুরুষ আজ নারীর সহিত চিরদিনের জন্য পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়া উহাকে নিজের অর্দ্ধাঙ্গিনী ও সহধর্ম্মিণী করত সংসারধর্ম্ম পালন করিতেছে ও পরস্পর পরস্পরের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হইতেছে? কে পুরুষকে এমন পবিত্র প্রেমধর্ম্ম শিখাইল?

যে নারী পুরুষের সহিত যদৃচ্ছামত সঙ্গত হইয়া অপত্যোৎপাদন করত সৃষ্টি রক্ষা করিত, সে নারী আজ পরিণয়সূত্রে আবদ্ধা হওয়া অবধি চিরদিন ছায়ার ন্যায় নিজ স্বামীর অনুগমন করিতেছে এবং অপূর্ব্ব পতিপরায়ণতা শিক্ষা করিয়া সংসারধর্ম্ম করিতেছে। কে উহাকে এমন সতী, সাধ্বী ও পতিব্রতা নারী করিল?

এস্থলে মানবের সেই চিরবন্ধু ধর্ম্মই তাঁহার এই সকল পারিবারিক

ভাব স্ফুরণ করত তাঁহাকে সংসারে অনন্ত সুখে সুখী করিয়াছে। এক ধর্ম্মই তাঁহাকে পরিজনবর্গের সহিত এমন প্রেমডোরে, এমন মায়াডোরে বাঁধিয়াছে। সকল সমাজে ধর্ম্ম পরিবারস্থ প্রত্যেক পরিজনের সম্বন্ধ ভালরূপ নির্দ্দেশ করিয়া কতকগুলি অবশ্যপ্রতি-পাল্য নিয়মাবলি বিধিবদ্ধ করে। এ সকল নিয়ম উল্লঙ্ঘিত হইলে পারিবারিক সম্বন্ধ শিথিল হইয়া যায়, এমন কি পারিবারিক সংস্থান ভগ্ন হইয়া যায়। এজন্য ইহাদের উল্লঙ্ঘন সকল দেশে মহাপাতক বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহার জন্য পরিবার মধ্যে ব্যভিচার এত দূষণীয় ও নিন্দনীয় এবং উহাদের লইয়া নানা গালিগালাজ সকল সমাজে প্রচলিত আছে।

সমাজে পারিবারিক সংস্থান অটুট রাখিবার জন্য ধর্ম্ম পরিবারস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ভালরূপ নির্দ্দেশ করে। কি পিতা-মাতা, কি ভ্রাতাভগিনী, কি পুত্রকন্যা, কি দম্পতি সকলের কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য মানবধর্ম্ম চিরদিন ভালরূপ উপদেশ দিতেছে। সকল দেশের লোকেরা উহাদিগকে অন্তরের সহিত, প্রীতির সহিত চিরদিন পালন করিতেছে। পরিবার সম্বন্ধে ইহার যাবতীয় বিধান ও ব্যবস্থা এখন লোকাচারে পবিত্রীকৃত। এ সকল উল্লঙ্ঘন করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। কি রাজাধিরাজ, কি পথের কাঙ্গাল, কি মহোপাধ্যায় পণ্ডিত, কি গণ্ডমূর্খ, সকলেই প্রীতির সহিত স্বেচ্ছায় ইহাদিগকে যত্নপূর্ব্বক পালন করিতেছে।

দেখ, যে বীরপুরুষ সংগ্রামক্ষেত্রে নরমাংসলোলুপ ব্যাঘ্রবিশেষ, তিনিই আবার স্বগৃহে নিরীহ মেষশাবক। যে দুর্দ্দান্ত দস্যু অপরের কণ্ঠচ্ছেদ করিতে একান্ত উদগ্রীব, তিনিই আবার নিজের স্ত্রীপুত্রের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। সংসারে সকলেই নিজ নিজ পরিবারের জন্য সদা ব্যাকুল ও চিন্তিত। ইহাতে বুঝা উচিত, পারিবারিক ভাব এখন সকলের হৃদয়ে কতদূর স্ফুরিত।

যে ধর্ম্ম পরিবারের মঙ্গলের জন্য সকলের পারিবারিক ভাব সম্যক স্ফুরণ করে, সে ধর্ম্ম আবার সমাজের মঙ্গলের জন্য উহাদিগকে পরসেবায় ও ঈশ্বরসেবায় প্রোৎসাহিত করিবার জন্য সংসারের অনিত্য মায়াবন্ধন ছেদন করিতে বলে। দেখ, হিন্দুধর্ম্ম রামায়ণ দ্বারা আমাদের পারিবারিক ভাব সম্যক স্ফুরণ করে, আবার বেদান্ত দ্বারা আমাদিগকে সংসার ত্যাগ করিতে উপদেশ দেয়। এইরূপ উপদেশ পাইয়া খৃষ্টজগতে অবিবাহিত পাদরি ও নানগণ, মুসলমান-জগতে ফকিরগণ, বৌদ্ধজগতে ভিক্ষুভিক্ষুণীগণ, হিন্দুজগতে সাধু-সন্ন্যাসিগণ সংসারধর্ম্ম না করিয়া স্বধর্ম্মের সেবায় ও পরসেবায় জীবন উৎসর্গ করিতেছেন।

যে পরিবার সমাজদেহের জীবাণুস্বরূপ, উহার গঠনপদ্ধতি ও বিবিধ সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিবার পর মানবধর্ম্ম সকল দেশে সমাজের গঠনপদ্ধতি ও বিবিধ সম্বন্ধ ভালরূপ নিরূপিত করে। যে সমাজে বসবাস ব্যতীত দুর্ব্বল অসহায় মানবের গত্যন্তর নাই, যে সমাজে বাস করিয়া তিনি এতদূর জাতীয় উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ, সেই সমাজকে ধর্ম্ম চিরদিন সুচারুরূপে পরিচালিত করে। যেমন সমাজ ব্যতীত আমাদের গত্যন্তর নাই, সেইরূপ ধর্ম্ম ব্যতীত সমাজেরও গত্যন্তর নাই।

আজকাল বিজ্ঞান ধর্ম্মের যতই কেন নিন্দা করুক না, ধর্ম্মই সকল সমাজের স্থিতি ও উন্নতির একমাত্র মূলীভূত কারণ। যেমন সলিল বিনা মৎস্য এবং বায়ু বিনা জীবজন্তু জীবন ধারণ করিতে পারে না, সেইরূপ কোন না কোনরূপ ধর্ম্ম ব্যতীত কোন সমাজ জগতে স্থায়ী হইতে ও উন্নতি সোপানে আরোহণ করিতে পারে না। যথার্থ বলিতে কি, ধর্ম্ম সমাজের জনকজননীস্বরূপ এবং আদিম অবস্থা হইতে ইহা উহার সম্যক পালন, পোষণ ও শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিতেছে।

ধর্ম্ম আবার পতিত মানবের একমাত্র পরিত্রাতা। যে অযোনি-সম্ভব দেবরূপী মানব যুগধর্ম্মানুসারে স্থূলত্ববর্দ্ধনের সঙ্গে যোনিসম্ভব ও স্থূলদেহাবৃত হইয়া এখন অধঃপতিত, যিনি জ্ঞানশক্তির স্ফূর্ত্তির সঙ্গে আধ্যাত্মিকতা হারাইয়া এখন সংসারে অশেষ পাপতাপে জড়িত ও মৃত্যুমুখে পতিত, তাঁহাকে ধর্ম্ম প্রকৃত উদ্ধারের পথ প্রদর্শন করে এবং বিশ্বের আদিকারণ সেই মায়াতীত পরব্রহ্মের কোন মায়ারূপ দেখাইয়া ও পাপপুণ্যের যথার্থ স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহাকে ভব পারাবারে ভালরূপ সাহায্য করে।

সমাজের বিবিধ সম্বন্ধ সম্যক নিরূপিত করিয়া ও ইহার রীতিনীতি সুচারুরূপে পরিচালিত করিয়া ইহার শ্রীবৃদ্ধিসাধন করাই মানব-ধর্ম্মের এক প্রধান উদ্দেশ্য। ইহার জন্য ধর্ম্ম স্বসমাজে একপ্রকার ঈশ্বরোপাসনা বা দেবার্চ্চনা প্রবর্ত্তিত করিয়া জনসাধারণকে এক পথের পথিক করে। ইহার জন্য ধর্ম্ম জীবনের কূটপ্রশ্ন মীমাংসার্থ বিশ্বের আদিকারণ, পরলোক, ঐহিক সুখ দুঃখের কারণ প্রভৃতি নানা বিষয় লইয়া কতকগুলি সাধারণ মতামত প্রচার করত জন-সাধারণের সরল বিশ্বাসকে এক ছাঁচে ঢালে। ইহার জন্য ধর্ম্ম জীবনের অত্যাবশ্যক বিবাহাদি ঘটনাসম্বন্ধে একপ্রকার আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতি প্রচারিত করিয়া সমাজমধ্যে যথেচ্ছাচার নিবারণ করত দেশস্থ সকল লোককে এক রজ্জুতে আবদ্ধ করে ও সুশৃঙ্খলতার সহিত স্বসমাজ চালায়। ইহার জন্য হৃদয়ে যে সকল রিপু স্বভাবতঃ প্রবল, সমাজের উপযোগিতানুসারে উহাদের অযথা-চরিতার্থতা নিবারণ করিয়া ধর্ম্মপ্রবৃত্তিগুলির সম্যক স্ফূর্ত্তির জন্য ইহা সকল দেশে কতকগুলি অবশ্যপ্রতিপাল্য নিয়মাবলি বিধিবদ্ধ করে এবং তদ্দ্বারা সমাজস্থ যাবতীয় লোকের নৈতিক চরিত্র ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভাবে গঠন করে।

ধর্ম্মবিজ্ঞান বলে, ইহার জন্য যে সকল কর্ম্ম সমাজের বিশেষ

অনিষ্টকারক এবং যাহা সর্ব্বদা অনুষ্ঠিত হইলে ইহার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী, সে সকল অসৎ কর্ম্মকে ধর্ম্ম সকল দেশে মহাপাপ নামে অভিহিত করিয়া চিরদিনের জন্য অভিশপ্ত করে। সেইরূপ যে সকল কর্ম্ম সমাজের অশেষ কল্যাণদায়ক, যাহাদের অনুষ্ঠানে ইহার অশেষ উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধিসাধন হইবে, সে সকল সৎকর্ম্মকে ধর্ম্ম সকল দেশে মহাপুণ্য আখ্যা প্রদান করত উহাদের অনুষ্ঠানে সকলকে স্বতঃ প্রোৎসাহিত করে। ইহার জন্য ধর্ম্ম সাধারণ সমাজ রক্ষার্থ সাধারণ নিয়মাবলি ও সমাজবিশেষ রক্ষার্থ বৈশেষিক নিয়মাবলি সকল দেশে বিধিবদ্ধ করে। চুরি ও নরহত্যা করা মহাপাপ, পরোপকার করা মহাপুণ্য ইত্যাদি নিয়মগুলি ধর্ম্মনীতির অনুমোদিত সাধারণ নিয়মাবলির অন্তর্গত এবং ব্রাহ্মণ, পাদরি ও ফকির পালনে মহাপুণ্য, গোহত্যায় ও শূকর মাংসস্পর্শে মহাপাপ ইত্যাদি নিয়মগুলি বৈশেষিক ধর্ম্মের অন্তর্গত।

সমাজের প্রকৃত মঙ্গলসাধনের জন্য, ইহার যথার্থ সুখবর্দ্ধনের জন্য ধর্ম্ম সকল দেশে কতকগুলি মহোৎসব স্থাপন করে। আমাদের দোলদুর্গোৎসব, মুসলমানদের মহরম, খৃষ্টানদের খৃষ্টমাস প্রভৃতি মহোৎসবগুলি এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

এই প্রকারে ধর্ম্ম চিরদিন মানবসমাজকে চালাইয়া আসিতেছে। কিন্তু যে সমাজের যেরূপ শিক্ষা ও দীক্ষা, সে সমাজের ধর্ম্মও সেইরূপ উন্নত বা অবনত। অসভ্য সমাজ জড়োপাসনায় সন্তুষ্ট ও জড়-জগতের ভয়ে অস্থির। সুসভ্য সমাজ একেশ্বরের উপাসনায় সন্তুষ্ট ও জড়জগতের উপর আধিপত্য করিতে ব্যগ্র। এই প্রকারে সমাজের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ চিরদিন চলিতেছে; এমন কি, জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতিতে সমাজের উন্নতি এবং উহাদের অবনতিতে ইহার অবনতি সর্ব্বত্র দেখা যায়। জ্ঞানধর্ম্মের অনুশীলন যত বৃদ্ধি পাইবে, সমাজও তত উন্নত পদবীতে আরোহণ করিবে।

সমাজদেহ ও সামাজিক নির্ব্বাচন।

সমাজতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের মতে মানবসমাজ এক শরীরী পদার্থ। যেমন জীবদেহ বিবিধ যন্ত্র বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা বিরচিত, সেইরূপ সমাজবিশেষও বিবিধব্যবসায়ী ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণি বা জাতি দ্বারা গঠিত হইয়া থাকে। যেমন শবব্যবচ্ছেদ দ্বারা জীবদেহকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লিষ্ট করা যায়, সেইরূপ মানবসমাজকে তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লিষ্ট করিলে বুঝা যায়, উহাদের মধ্যে সৌসাদৃশ্য কতদূর?

জীবজগতের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতম জীব আমিবার (Amœba) বিষয় পর্য্যালোচনা কর, দেখিবে কতকগুলি সমভাবাপন্ন অস্ফুরিত জীবাণু একত্রিত হইয়া উপরোক্ত জীবের দেহ নিশ্মাণ করিয়াছে। উহার কোনরূপ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাই, কোনরূপ বৈশেষিক যন্ত্র নাই; অথচ জীবনযাত্রানির্ব্বাহোপযোগী যাবতীয় কর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে। উহার দেহস্থ প্রত্যেক জীবাণু জীবনধারণার্থ যাবতীয় কর্ম্ম সম্পাদন করে। সেইরূপ বর্ব্বর সমাজও কতকগুলি সমভাবাপন্ন লোকবর্গ দ্বারা গঠিত। ইহার কোনরূপ শ্রেণিবিভাগ বা জাতিবিভাগ নাই। সমাজস্থ যাবতীয় লোক প্রয়োজনানুসারে ইহার যাবতীয় কর্ম্ম সম্পাদন করে। সে সমাজে যে কৃষক, সেই আবার কর্ম্মকার, সূত্রধর ও পুরোহিত। সে সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তি প্রয়োজনমত যাবতীয় কর্ম্ম সম্পাদন করিতে বাধ্য হয়।

আবার জীবজগতের কোন এক উৎকৃষ্ট জীবের দেহ পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায়, যেমন ইহা বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বা বিবিধ যন্ত্রে বিনির্ম্মিত, যন্ত্রগুলির পরস্পর সম্বন্ধ তেমনি জটিল হইতে জটিলতর ও ঘনিষ্ঠ হইতে ঘনিষ্ঠতর। যন্ত্রগুলি স্ব স্ব ক্রিয়া স্বতন্ত্রভাবে যুগপৎ সম্পাদন করিয়া দেহের জীবন রক্ষা করে। যে জীবনশোণিত দেহের সর্ব্বস্থানে প্রবাহিত হইয়া যন্ত্রগুলিকে আহার্য্য যোগায়, এবং উহাদের

ক্রিয়াঘটিত আবর্জ্জনী বাহ্যজগতে ঘর্ম্ম ও মূত্রযোগে প্রক্ষেপ করে, সেই জীবনশোণিত প্রস্তুত করিবার জন্য কোন এক যন্ত্র (Alimentary canal) বহির্জগৎ হইতে খাদ্যসামগ্রীসমূহ আহরণ করে এবং ইহার বিবিধ রসযোগে পরিপাক করত উহাদিগকে শোষণ করিতে করিতে শোণিতে পরিণত করে; কোন এক যন্ত্র, হৃৎপিণ্ড (Heart) সমস্ত দেহের অবিশুদ্ধ শোণিত নিজ গহ্বরে শিরাযোগে একত্রিত করিয়া শোধনার্থ ফুস্‌ফুসে প্রেরণ করে এবং সেই যন্ত্র হইতে আগত বিশুদ্ধ শোণিতকে ধমনী যোগে দেহের সর্ব্বস্থানে সঞ্চারিত করে।

সেই দেহের কোন এক যন্ত্র ফুস্‌ফুস (Lungs) অবিশুদ্ধ কৃষ্ণবর্ণ শোণিতকে বাহ্যজগতের অম্লজানমিশ্রিত বায়ু সংযোগে পরিশুদ্ধ করিতে নিরত, কোন এক যন্ত্র, মস্তিষ্ক (Brain) ইন্দ্রিয়সংযোগে বাহ্য জগতের বিবিধ জ্ঞানলাভে নিরত, কোন কোন যন্ত্র মস্তিষ্কের আদেশ পালনে ব্যগ্র। এইরূপে মস্তিষ্ক, হৃদয়, ফুস্‌ফুস্‌, অন্ত্র, পাকস্থলী, যকৃৎ, মূত্রগ্রন্থি, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, হস্তপদাদি স্ব স্ব কর্ম্ম করিয়া সমগ্র দেহের কার্য্যপরম্পরা সুচারুরূপে সম্পাদন করিতেছে। সকল যন্ত্রই পরস্পর পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ এবং স্বাধীন হইয়াও সর্ব্বতোভাবে পরাধীন। একটী যন্ত্র বিকৃত হইলে সমস্ত দেহ বিকৃত হইবে। একের অনিষ্টে অপরের অনিষ্ট ও সমগ্র দেহের অনিষ্ট। এইরূপ জটিল যোগাযোগ দ্বারা সমস্ত দেহের ক্রিয়াপরম্পরা সুচারুরূপে চলিতেছে।

সেইরূপ উৎকৃষ্ট সমাজও নানাপ্রকার জটিল ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দ্বারা চিরদিন পরিচালিত হইয়া থাকে। যেমন শ্রমবিভাগ জীবদেহকে বিভিন্ন যন্ত্রে বিভক্ত করিয়া সমস্ত দেহের কার্য্য সুচারুরূপে চালায়, তেমনি সমাজজগতেও শ্রমবিভাগ সমাজবিশেষকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বা জাতিতে বিভক্ত করিয়া ইহার যাবতীয় অনাটন পূরণ করত ইহার

কার্য্যপরম্পরা সুচারুরূপে চালাইতে থাকে। শাসকবৃন্দ ইহার শাসন করে, সৈন্যদল ইহার রক্ষণাবেক্ষণ করে, কৃষককুল সকলের জন্য আহার্য্য প্রস্তুত করে, তন্তুবায়কুল সকলের জন্য পরিধেয় বস্ত্র বয়ন করে। এইরূপ সমাজস্থ নানা শ্রেণি বিবিধ কার্য্য করিয়া সমাজের অনাটন পূরণ করে ও বিধিমতে ইহার সেবা করে। সকল শ্রেণি স্বাধীন হইয়াও পরাধীন। এক শ্রেণি অপর শ্রেণির উপর সর্ব্বতো-ভাবে নির্ভর করে। সে সমাজে অর্থ দেহের জীবনশোণিতের ন্যায় সকলের প্রয়োজনীয় বস্তু সরবরাহ করে। জাতীয়তা সে সমাজের প্রাণস্বরূপ। ইহার স্থিতিতে উহার স্থিতি এবং ইহার ধ্বংসে উহার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

আরও দেখ, জীবসৃষ্টি ও সমাজসৃষ্টি, উভয়ই প্রায় এক প্রক্রিয়ায় সংসাধিত হয়। জীবদেহে পুমণু ও স্ত্র্যণু একত্রিত হইবার পর প্রথমে কতকগুলি সমভাবাপন্ন জীবাণু উৎপন্ন হয়। পরে সেই জীবাণুরাশি পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তন অতিক্রম করিতে করিতে ভিন্ন ভিন্ন ভাব ধারণ করে এবং ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া সম্পাদন করিতে আরম্ভ করে। এই প্রকারে ভিন্নভাবাপন্ন জীবাণুরাশি হইতে দেহের ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র নির্ম্মিত হয়।

সেইরূপ সমাজের প্রথম আদিম অবস্থায় সমভাবাপন্ন কতকগুলি লোক একস্থানে একত্রিত হইয়া থাকে। উহারা প্রয়োজনমত সকল কাজ চালাইয়া কষ্টে জীবন ধারণ করে। কালসহকারে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সমাজে নানা অনাটন উত্থিত হয়। এই সকল অনাটন পূরণার্থ নানা লোকে নানা কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়। কতকগুলি লোক কৃষিকার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া পড়ে, কতকগুলি কুম্ভকার ও তন্তু-বায়ের কার্য্য করে, কতকগুলি রজক, নাপিত, কর্ম্মকার, সূত্রধর, স্বর্ণকার প্রভৃতি নানা শ্রেণির কার্য্যে মনোনিবেশ করে। এই প্রকারে সমাজস্থ যাবতীয় লোক প্রয়োজনমত ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম করিয়া

পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে ও সমাজের অনাটন পূরণ করে। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, এক শ্রমবিভাগ জীবদেহ ও সমাজদেহ, উভয়কে ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রে ও বিবিধব্যবসায়ী ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করে।

এখন শ্রমবিভাগ লইয়া সমাজে দুই প্রকার পদ্ধতি দেখা যায়:—

(১) কুলপরম্পরাগত জাতিভেদপ্রথা।

(২) উত্তরকালীন শিক্ষানুযায়ী শ্রেণিবিভাগপ্রথা।

যেমন জীবদেহে যে সকল জীবাণু দ্বারা যন্ত্রবিশেষ গঠিত, উহাদের মধ্যে একটী জীবাণু নষ্ট হইলে বা স্বকার্য্য সাধন করিয়া ক্ষয় পাইলে উহার বংশধরেরা চিরদিন পৈতৃক কর্ম্ম সম্পাদন করে এবং কস্মিন কালে অন্য কার্য্যে মনোযোগ দেয় না; সেইরূপ যে সমাজ প্রকৃতির অনুকরণে গঠিত, সে সমাজে সন্তানসন্ততিবর্গ পুরুষানুক্রমে পৈতৃক ব্যবসায় চালাইয়া ইহার সুশৃঙ্খলতা ভালরূপ রক্ষা করে। তথায় কুলপরম্পরাগত জাতিভেদপ্রথা স্বতঃ উদ্ভূত হয়।

কিন্তু যে সমাজ প্রকৃতির বৈপরীত্যে গঠিত, যে স্থলে কৃত্রিম সভ্যতার অধিক সমাদর, তথায় জনসাধারণ পৈতৃক ব্যবসায়ের ধার ধারে না; উহারা যাবতীয় বৃত্তি ও ব্যবসায় উত্তরকালে শিক্ষা করিয়া অবলম্বন করে। যাঁহার যেরূপ অভিরুচি ও শিক্ষা, তিনি সেইরূপ বৃত্তি অবলম্বন করেন। এস্থলে উত্তরকালীন শিক্ষানুযায়ী সমাজে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণি উদ্ভূত হয়।

এইরূপ নানা যুক্তি দেখাইয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, মানব-সমাজ শরীরী পদার্থ।

এখন সামাজিক নির্ব্বাচন (Social Selection) শব্দের প্রকৃত অর্থ কি? ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বলেন, যেমন জীবজগতে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন ও যৌন নির্ব্বাচন নানা বিষয় পরিচালিত করে, সেইরূপ

সমাজজগতে সামাজিক নির্ব্বাচন নিজের অনুশাসন পূর্ণভাবে চালায়। জীবজন্তুদিগের ভিতর দেখা যায়, অবস্থাবৈষম্যে পতিত হইয়া উহাদের দেহ সম্বন্ধে যে সকল অভাব ও অনাটন উপস্থিত হয়, প্রকৃতি প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন দ্বারা সে সকল অনাটন কালে স্বতঃ পূর্ণ করিয়া দেয়; সেইরূপ মানবসমাজে দেখিতে পাই, অবস্থাবৈষম্যে পতিত হইয়া যে সকল অভাব ও অনাটন উত্থিত হয়, সমাজ নিজের মঙ্গলের জন্য, নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য রীতিনীতি ও দেশাচার সম্বন্ধে নানা পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া সেই সকল অনাটন ও অভাব স্বতঃ পূরণ করিয়া লয়। এস্থলে লোকবিশেষের ইচ্ছাশক্তির উপর নির্ভর না করিয়া সমাজস্থ যাবতীয় লোকের সমবেত ইচ্ছাশক্তি দ্বারা চালিত হইয়া সমাজ নিজের মঙ্গলের জন্য যাবতীয় রীতিনীতি স্বয়ং পছন্দ করিয়া লয়। যে সমাজের যেরূপ অনাটন ও অভাব, যেরূপ শিক্ষা ও দীক্ষা, সে সমাজ কালের অপরিহার্য্য নিয়মানুসারে স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য বা নিজের উন্নতি সাধনের জন্য সেইরূপ রীতিনীতি ও আচার ব্যবহার স্বয়ং পছন্দ করিয়া লয়। যে দীর্ঘকালব্যাপিনী প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া দ্বারা সমাজ নিজের মঙ্গলদায়ক বিষয় স্বয়ং পছন্দ করিয়া লয় ও অমঙ্গলদায়ক বিষয় স্বয়ং পরিত্যাগ করে, তাহার নাম সামাজিক নির্ব্বাচন (Social Selection)

যে সমাজে সাধারণের মনের ভাব যে দিকে ধাবিত হয়, সে সমাজে তদনুযায়ী রীতিনীতি ও অনুষ্ঠান কালে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। যে দেশে জনসাধারণ সাধারণতন্ত্রের পক্ষপাতী, তথায় সাধারণতন্ত্র কালে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়। ফ্রান্স দেশের ইতিহাস পাঠ কর, এ বিষয় ভালরূপ বুঝিতে পারিবে। যে দেশে অধিকাংশ শিক্ষিত প্রজাবর্গ যথেচ্ছাচারী রাজার অত্যাচারে প্রপীড়িত, সে দেশে রাজশক্তি খর্ব্ব করিবার জন্য পার্লেমেণ্ট প্রজার পক্ষে স্বতঃ

গঠিত হয় এবং কালে রাজশক্তি খর্ব্ব হইয়া পড়ে, যেমন ইংলণ্ড দেশ। যে দেশে সাধারণ লোকবর্গ অশিক্ষিত, তথায় উহারা যথেচ্ছাচারী রাজার রাজশক্তি খর্ব্ব করিতে না পারিয়া চিরদিন পদানত থাকে, যেমন প্রাচ্য জগৎ। যে দেশে পাশ্চাত্য বিদ্যার অধিক কদর, তথায় পাশ্চাত্য বিদ্যাশিক্ষার্থ নানা বিদ্যালয় স্বতঃ স্থাপিত হয়; আবার যখন শিক্ষিত সম্প্রদায় হা অন্ন। হা অন্ন। করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইবে, তখন উহার কদর কমিবে।

যে সমাজের যেরূপ শিক্ষা ও দীক্ষা, সে সমাজে সেইরূপ রীতি নীতি স্থাপিত হয়। আবার শিক্ষাদীক্ষার পরিবর্ত্তন হইলে তথায় অন্যপ্রকার রীতিনীতি প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। দেখ, যে ভারতে প্রাচ্যশিক্ষাবশতঃ প্রাচ্য রীতিনীতি স্থাপিত হইয়াছে, সে ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষাবশতঃ আজকাল পাশ্চাত্য আবভাব ও চালচলন ক্রমশঃ প্রকাশ পাইতেছে।

প্রকৃতি-জগতের ন্যায় সমাজজগতেও পরিবর্ত্তনই যুগধর্ম্ম। উভয়েই পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তন কালক্রমে অননুভূত ভাবে ঘটিতে থাকে। যেমন জীবজগতে যে জীব অবস্থার বৈষম্যে পতিত হইয়া জীবনধারণোপযোগী পরিবর্ত্তন প্রদর্শন করিতে না পারে, সে জীব জগতের সর্ব্বজনীন জীবনসংগ্রামে জয়লাভ করিতে না পারিয়া ভূপৃষ্ঠে লুপ্ত হইয়া যায়; সেইরূপ যে সমাজ কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে নিজের রীতিনীতি পরিবর্ত্তন করিতে না পারে, সে সমাজ জগতে স্থায়ী হয় না। তাহার সাক্ষ্য দেখ, মুসলমান যুগে যখন সনাতন হিন্দুধর্ম্ম নানাদিকে বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল, তখন হিন্দু সমাজ ইহার চিরন্তন রীতিনীতির কালোপযোগী পরিবর্ত্তন করে বলিয়া নিজের অস্তিত্ব জগতে বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছে।

যে দেশে যে সকল রীতিনীতি সাধারণ সমাজের অশেষ হিতকরী, যদ্দারা সকলে অশেষরূপে উপকৃত, উহারা সে সকল রীতি-

নীতির স্বতঃ পক্ষপাতী হয়, তাহাই তথায় স্বতঃস্থায়ী হয় এবং লোকপরম্পরায় চলিতে থাকে। আর যে সকল রীতিনীতির দ্বারা সমাজের অমঙ্গল ঘটে, তাহা সকলে পরিহার করিতে ব্যগ্র হয়। দেখ, বাল্যবিবাহ ও বরপণ দ্বারা বঙ্গীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেক অনিষ্ট ঘটিতেছে, কালে উহারা পরিত্যক্ত হইবে।

যে প্রথা লোকের বুদ্ধিভ্রংশবশতঃ একসময়ে সমাজে বলবতী হইয়া উঠে, সুশিক্ষা পাইয়া উহার কুফল বুঝিতে পারিলে সকলে উহা পরিহার করিতে ব্যগ্র হয়। যে বহুবিবাহ একসময়ে কুলীন ব্রাহ্মণসমাজে বলবৎ ছিল, তাহাই এখন সে সমাজে ক্রমশঃ পরিত্যক্ত হইতেছে। যে কৌলিন্যপ্রথার হলাহলে ব্রাহ্মণসমাজ এতকাল জর্জ্জরীভূত, সুশিক্ষা পাওয়াতে সে প্রথা ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে। ভ্রমসঙ্কুল মানবমন কোথাও অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন, কোথাও বা জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত। এজন্য শিক্ষার তারতম্যানুসারে ভিন্ন ভিন্ন রীতিনীতি ভিন্ন ভিন্ন সমাজে আদৃত হইয়া থাকে। আবার সাধারণের মতিগতি সময়ে সময়ে বিভিন্ন হইয়া থাকে : সে জন্য যাহা এক সময়ে সমাজে সম্যক আদৃত হয়, তাহাই আবার অন্য সময়ে সবিশেষ অনাদৃত হইতে দেখা যায়। মুসলমান যুগে অনেকে উর্দ্দু শিক্ষা করিতে উদ্‌গ্রীব ছিল। এখন নবাবী আমল গিয়াছে, কেহ উর্দ্দু শিক্ষা করিতে চায় না।

সমাজ সম্বন্ধে যে কোন বিষয় হউক না, যাহা বহুদিবস প্রচলিত হইয়া সমাজে বদ্ধমূল হয়, তাহাই ইহার অস্থিমজ্জায় নিহিত হইয়া থাকে, তাহাই তথায় সামাজিক নির্ব্বাচনে প্রতিষ্ঠিত বলা উচিত। পারিবারিক গঠনপদ্ধতি, শিক্ষা ও শাসন-প্রণালী, বিবাহপ্রথা ও অন্যান্য রীতিনীতি সকল দেশে একমাত্র সামাজিক নির্ব্বাচনে চালিত হইতেছে। সর্ব্বত্র দেখা যায়, সমাজ নিজের মঙ্গলের জন্য নিজের অনাটন নিজে পূরণ করিয়া থাকে।

যে দেশে অনেকে স্বার্থপর, তথায় উহারা স্ত্রীপুত্র লইয়া সংসার-ধর্ম্ম করে এবং অন্যান্য স্বজনবর্গের প্রতিপালন আদৌ করে না। যে দেশে পুত্রকন্যার বিবাহ পিতামাতার অবশ্য প্রতিপাল্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তথায় বাল্যবিবাহ স্বতঃ প্রাদুর্ভূত হয়। যে নারীবহুল দেশে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে, তথায় অনেকে কুমারী থাকিতে বাধ্য হয়। যে দেশে নারীজাতীর সতীত্ব ধর্ম্মের সমধিক সমাদর, তথায় অবরোধ প্রথা ও সতীদাহ স্বতঃ প্রাদুর্ভূত হয়। এই প্রকারে সমাজের যাবতীয় রীতিনীতি একমাত্র সামাজিক নির্ব্বাচনে সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত ও চালিত হইতেছে।

একসময়ে সভাসমিতি আহ্বান করিয়া ও প্রস্তাবানুমোদনাদি করিয়া যাহা প্রবর্ত্তন করা যায়, তাহা কৃত্রিম ও ক্ষণস্থায়ী প্রথা। কিন্তু সামাজিক নির্ব্বাচন প্রকৃতির অকৃত্রিম ও চিরস্থায়ী প্রথা। দেশহিতৈষিগণ সভাসমিতির বৈঠকে গলাবাজি করিয়া যতই কেন সদনুষ্ঠানগুলি দেশে প্রবর্ত্তিত করুন না, তাঁহাদের বিবিধ চেষ্টা পরোক্ষ-ভাবে সামাজিক নির্ব্বাচনের সাহায্য করিয়া থাকে। যাহা সমাজের কল্যাণদায়ক, তাহাই প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য সর্ব্বত্র সভ্যদেশের প্রথা অনুসারে সভাসমিতির বৈঠক বসে এবং অনেকে গলাবাজি করিয়া আকাশ ফাটান; কিন্তু যাহা সমাজের কল্যাণদায়ক, তাহাই সামাজিক নির্ব্বাচনে স্থায়ী হইবে, আর যাহা অনিষ্টকারক, তাহা কালে পরিত্যক্ত হইবে।

এই সামাজিক নির্ব্বাচনের এমনি গুণ, যে রীতি ইহা দ্বারা কালক্রমে প্রতিষ্ঠিত হয়, লোকবিশেষের ইচ্ছাশক্তি তাহাকে রহিত করিতে পারে না। যে নারীবহুল দেশে বিধবাবিবাহ অসঙ্গত বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস, তথায় বিদ্যাসাগরের ন্যায় মহোপাধ্যায় পণ্ডিত সহস্র চেষ্টা করিয়াও বিধবাবিবাহ চালিত করিতে পারেন না। যে দেশে সাধারণের বিশ্বাস, বিবাহের পূর্ব্বে কন্যা ঋতুবতী হইলে

উঁহার চতুর্দ্দশপুরুষ নিরয়গামী হয়, সে দেশে প্রবল প্রতাপান্বিত ইংরাজরাজ সহবাস বিষয়ক সম্মতি আইন (Consent Act) পাস করিয়াও বাল্যবিবাহ সমূলে রোধ করিতে পারেন না।

সুদীর্ঘকালে সমাজবিশেষ সামাজিক নির্ব্বাচন দ্বারা চালিত হইলেও খণ্ডকালে ইহা ইহার প্রতিনিধিবর্গ দ্বারা চিরদিন চালিত হইতেছে। যাঁহারা ইহার নেতৃবর্গ, তাঁহারা ইহার প্রতিনিধি এবং তাঁহারা ইহার বিবেকস্বরূপ। যেমন ব্যক্তিবিশেষ স্বীয় বিবেকবাণী দ্বারা অনুক্ষণ চালিত হন, সমাজও স্বীয় নেতৃবর্গ দ্বারা চিরদিন চালিত হইতেছে। তাঁহাদের যেরূপ শিক্ষা ও দীক্ষা, যেরূপ মতি ও গতি, তাঁহারা আন্দোলন দ্বারা স্বসমাজকে সেইভাবে চালাইতে থাকেন। তাঁহারা ইহার চিরন্তন রীতিনীতির কালোপযোগী পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া ইহাকে জগতে স্থায়ী করিতে চেষ্টা পান। দেখ যে ভারতে পরমারাধ্য অধ্যাপককুল এতকাল হিন্দুসমাজের নেতা ছিলেন এবং যাঁহাদের আদেশ ও উপদেশ রাজন্যবর্গ চিরদিন শিরোধার্য্য করিতেন, সে ভারতে আজকাল ইংরাজরাজ পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুশিক্ষিত সম্প্রদায় দ্বারা অনেক বিষয়ে চালিত হইতেছেন ; সুতরাং নানাস্থলে আমাদের চিরন্তন প্রথার সহিত বিরোধ উপস্থিত হইতেছে।

এস্থলে সকলের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, যে সকল বৈশেষিক রীতিনীতি সমাজের অস্থিমজ্জায় নিহিত ও কুলপরম্পরাগত, যাহারা সামাজিক নির্ব্বাচনে বহুকাল স্থায়ী হওয়াতে একপ্রকার নৈসর্গিক, যাহাদের অস্তিত্বের উপর ইহার মূলভিত্তি চিরদিন প্রোথিত, সে সকল মৌলিক ও চিরাভ্যস্ত রীতিনীতি কস্মিনকালে পরিত্যাগ করা উচিত নহে। সে সকল পরিত্যাগ করিলে সে সমাজ নিজের বৈশেষিকত্ব হারাইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া থাকে, যেমন এ দেশের জাতিভেদপ্রথা।

বাল্যকালার্জ্জিত সংস্কার বশতঃ জনসাধারণ সকলদেশে ও সকল সময়ে চিরাগত ও কুলপরম্পরাগত রীতিনীতির বিশেষ পক্ষপাতী হইয়া থাকে। এই পক্ষপাতবশতঃ সমাজমাত্রেই হঠাৎ কোন নূতন পরিবর্ত্তন চালাইতে চাহে না। ইহাতে ইহা চিরদিন স্থিতিশীল বা রক্ষণশীল (conservative) হইয়া থাকে। সমাজজগতে প্রকৃতি অনন্ত বৈচিত্র্য দেখাইবার জন্য সকল সমাজকে এরূপভাবে রক্ষণশীল করে।

অধিকাংশ মানবসমাজ প্রাকৃতিক কারণে রক্ষণ-শীল হইলেও কোন কোন সমাজ জ্ঞানবিজ্ঞানের সম্যক অনুশীলন করিতে করিতে উন্নতির পথে ধাবমান হয় এবং উন্নতিশীল হইয়া থাকে। রক্ষণশীলতা ও উন্নতিশীলতা এই দুইএর দ্বন্দ্ব চিরদিন সমাজে চলিতেছে। যখন প্রথমোক্ত প্রবল, তখন সমাজ অসভ্য বা অর্দ্ধসভ্য। যখন শেষোক্ত প্রবল, তখন ইহা সুসভ্য। জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সভ্যতাস্রোত জগতে এইরূপে বহমান হইতেছে। তন্মধ্যে যে সমাজ কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে নিজ অবস্থার উন্নতিসাধন করিতে না পারে, সে সমাজ কালে নিশ্চয়ই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

দেখ, রক্ষণশীল প্রাচ্যজগৎ বিধিনির্ব্বন্ধে এখন উন্নতিশীল পাশ্চাত্যজগতের সহিত যেরূপ ঘনিষ্ঠ সংঘর্ষে আনীত হইয়াছে, তাহাতে প্রাচ্যজগৎ যদি কালোপযোগী উন্নতি প্রদর্শন করিতে না পারে, পাশ্চাত্য জগৎ কালে ইহাকে গ্রাস করিবে। কিন্তু বিধাতার ভবিতব্য বোধ হয় অন্যরূপ। প্রাচ্যজগতে জাপান উন্নতির পথে ধাবমান হইয়া পাশ্চাত্য জাতিবর্গের সহিত সমকক্ষ হইতেছে। চীন জাগরিত হইয়া উন্নতির পথে ধাবমান হইয়াছে। অধম পরাধীন ভারতও পাশ্চাত্য শিক্ষা পাইয়া চিরাগত মোহনিদ্রা হইতে ক্রমশঃ জাগরিত হইতেছে এবং নিজের অভাব ও অনাটন বুঝিয়া উহাদিগকে পূরণ করিতে চেষ্টা পাইতেছে। কিন্তু ইহার হস্তপদ ভগ্ন হওয়ায়

উহাদের উপর দণ্ডায়মান হইতে পারিতেছে না এবং কেবলমাত্র তাল খাইতেছে। পায়ের উপর ভর দিয়া দাড়াইবার জন্য কতকাল ধরিয়া ইহাকে কত তাল খাইতে হইবে, তাহা একমাত্র ভগবানই জানেন।

জাতীয় সাধনা ও জাতীয় নিয়তি।

যে দীর্ঘকালব্যাপী সাধন বা অনুশীলন বলে জাতিবিশেষ এ জগতে কোন শারীরিক বা মানসিক গুণের সমধিক উৎকর্ষ লাভ করে, তাহার নাম জাতীয় সাধনা। যেমন ব্যক্তিবিশেষ কোন বিষয় আয়ত্ত করিবার জন্য এক মনে, এক ধ্যানে, অসাধারণ একাগ্রতা ও অধ্যবসায় সহকারে সেই বিষয়টী ক্রমাগত অনুশীলন করিতে করিতে বহুদিবসান্তে উহাতে ব্যুৎপত্তি লাভ করে; সেইরূপ জাতিবিশেষও কোন গুণের উৎকর্ষ লাভের জন্য বহুকাল ব্যাপিয়া এক মনে এক ধ্যানে, অসাধারণ একাগ্রতা সহকারে উক্ত গুণের সম্যক অনুশীলন করিতে থাকে। এইরূপে পুরুষানুক্রমে সম্যক অনুশীলন করিতে করিতে সে জাতি কিছুকাল পরে স্বীয় অভীষ্ট লাভ করিয়া সফলমনোরথ হয় এবং তদীয় বংশধরেরা উত্তরাধিকার-সূত্রে সেই উন্নত গুণ পাইয়া পূর্ব্বপুরুষদিগের জাতীয় সাধনার ফল ভোগ করে।

কয়েকটী দৃষ্টান্ত দ্বারা এ বিষয় ভালরূপ বুঝান আবশ্যক। দেখ, সুসভ্য মানবের বুদ্ধিশক্তি কিরূপ স্ফুরিত ও বিকসিত! আর অসভ্য মানবের বুদ্ধিশক্তি কিরূপ অস্ফুরিত ও অপরিপক্ক! ইহাদের বুদ্ধি-শক্তির তারতম্য কত কাল ব্যাপিয়া জাতীয় সাধনার গুণে সংঘটিত হইয়াছে, তাহা কে নির্ণয় করিবে?

দেখ এক মানবশিশু কত চেষ্টা ও কত সাধনা করিতে করিতে দুইটী পদের উপর দণ্ডায়মান হয় ও পদক্ষেপ করিতে শিখে! সেই-রূপ জাতীয় জীবনের শৈশবকালে মানবও কতকাল ব্যাপিয়া চেষ্টা

ও সাধন বলে চতুষ্পদ জন্তুর ভ্রমণপদ্ধতি ত্যাগ করিয়া প্রথমে দুইটী পদের উপর দণ্ডায়মান হইতে ও পদবিক্ষেপ করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা কি নির্ণয় করা যায়? যে ঘটনায় বা যে উৎকর্ষলাভে তাঁহার যুগযুগান্তর ব্যতীত হইয়াছে,সেই গুণ তিনি আজ শৈশবকালে অল্পদিনেই লাভ করিতেছেন।

আরও দেখ, একটী মানবশিশু আধ আধ স্বরে মা মা বলিতে বলিতে কিছুদিনে মাতৃভাষা শিক্ষা করিয়া নিজের মনোভাব ব্যক্ত করিতে শিখে। সেইরূপ জাতীয় জীবনের শৈশবকালে কতকাল ব্যাপিয়া চেষ্টা ও সাধন বলে মানব প্রথমে বাক্য-কথন ভাষায় নিজ মনোভাব ব্যক্ত করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা এখন নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। আমরা এই পর্য্যন্ত জানি,এরূপ সাধনায় তাঁহার যুগযুগান্তর ব্যতীত হইয়াছে। তাঁহার সেই ভাষার ক্রমোন্নতিও বহুকালে জাতীয় সাধন ও অনুশীলন বলে সম্পাদিত হইয়াছে এবং তাঁহার জাতীয় জ্ঞানভাণ্ডারও বহুকালব্যাপী সাধন বলে সঞ্চিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া আসিতেছে।

ইতর প্রাণিগণ সকল বিষয়ে একমাত্র নৈসর্গিক সংস্কার দ্বারা চালিত হয়। প্রকৃতি স্বয়ং উহাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করায়। উহাদিগকে কোন বিষয় হাতে হেতড়ে শিখিতে হয় না। কিন্তু মানবের নৈসর্গিক সংস্কার যে পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত, তাঁহার জ্ঞানশক্তি সেই পরিমাণে বিকসিত ও বিবর্দ্ধিত। একমাত্র সাধন বলে তাঁহাকে জীবনের যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তু সরবরাহ করিতে হয়। তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদন, বসতবাটী, বিলাসদ্রব্য সকলই তাঁহাকে একমাত্র সাধন বলে শিখিতে ও উপার্জ্জন করিতে হয়। তিনিও পুরাকাল হইতে সমাজবদ্ধ হইয়া সমবেত চেষ্টা দ্বারা ও জাতীয় সাধন বলে নিজের সকল অনাটন পূরণ করিয়া আসিতেছেন। এ বিষয়ে জাতীয় সাধনই তাঁহার প্রধান সহায় ও অবলম্বন। এই সাধন বলে তিনি

যে কেবল নিজের অনাটন পূরণ করিয়া নিশ্চিন্ত, তাহা নহে। তিনি ইহার বলে স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিতে ও অপর জাতির উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে একান্ত উৎসুক হন।

এখন দেখা উচিত, জাতীয় সাধন দেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে কত দূর সহায়তা করে? সত্য বটে, প্রকৃতি দেশবিশেষকে আনুকূল্য বিশেষ প্রদান করিয়া তত্রত্য জাতিকে উন্নতিপদবীতে অধিরোহণ করাইতে সম্যক সাহায্য করে, কিন্তু সমবেত জাতীয় সাধনাই সে জাতির জাতীয় উন্নতিসাধনের মূলীভূত কারণ। তাহার সাক্ষ্য দেখ, আধুনিক মার্কিন জাতি স্বদেশের প্রাকৃতিক উপাদানরাশির (Natural resources) সদ্ব্যবহার করিয়া কতদূর সুখসমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছে? কিন্তু তত্রত্য আদিম নিবাসীগণ চিরদিন যে তিমিরে সে তিমিরে আছে। উহাদের অবস্থা চিরকাল সমভাবে চলিতেছে। সেই সুফলা সুজলা মেদিনী পুরোভাগে বিস্তৃতা, অথচ বুদ্ধিশক্তি ও জাতীয় সাধনার অভাবে উহাদের অবস্থা কিঞ্চিন্মাত্র উন্নত হয় নাই। ইহাতে বুঝা উচিত, প্রাকৃতিক আনুকূল্য, মার্জ্জিতবুদ্ধি ও জাতীয় সাধনা এই তিনের একত্র মিলন ঘটিলে জাতিবিশেষ জগতে উন্নতি সাধন করিতে পারে।

যে দেশ অত্যুর্ব্বর, সে দেশের লোকেরা যদি কৃষিকার্য্য না জানে, উর্ব্বরতা থাকিলেই কি, আর না থাকিলেই বা কি? যে দেশে অপর্য্যাপ্ত পাথুরিয়া কয়লা বর্ত্তমান, সে দেশের লোকেরা যদি ইহার সদ্ব্যবহার না জানে, কয়লা থাকিলেই কি, আর না থাকিলেই বা কি? অতএব স্থিরনিশ্চয় জানিবে, জাতীয় উন্নতিসাধনের জন্য প্রাকৃতিক উপাদানরাশি থাকা যেমন আবশ্যক, তৎব্যবহারোপযোগী ক্ষমতা ও অনুশীলন তেমনি আবশ্যক। জাতীয় সাধনার গুণে তৎব্যবহারোপযোগী ক্ষমতা ও বুদ্ধি আইসে এবং সে জাতি ক্রমশঃ উন্নতিসোপানে আরোহণ করিতে থাকে। যখন যে জাতি

জগতে নিজের কৃতিত্ব দেখায়, তখন সে জাতি কেবল ইহার গুণে স্বীয় প্রভুত্ব ও প্রাধান্য স্থাপনে সমর্থ হইয়া থাকে।

ব্যক্তিবিশেষে ব্যষ্টিভাবে আত্মোন্নতির জন্য যেরূপ সাধ্য সাধন বা অসাধ্য সাধন করে, জাতিবিশেষও সেইরূপ সমষ্টিভাবে জাতীয় উন্নতি সাধনের জন্য সাধ্যসাধন বা অসাধ্য সাধন করিতে যত্নবান হয়। যে জাতির অধিকাংশ লোক ঐরূপ সাধন বা অনুশীলন করিতে সমর্থ, সে জাতির জাতীয় উন্নতি অচিরে সাধিত হয়।

দেখ, যে ইংরাজজাতির পূর্ব্বপুরুষগণ বনে বনে বিচরণ করিয়া সহজাত ফলমূলে উদর পূরণ করিত, যাহারা বনের বনমানুষ অপেক্ষা কোন অংশে শ্রেষ্ঠ ছিল না, সেই ইংরাজজাতির এখন কি ভাগ্যোদয় হইয়াছে? তাঁহারা আজ সসাগরা মেদিনীর অধীশ্বর। তাঁহাদের সুবিশাল সম্রাজ্যে সূর্য্যদেব অস্তমিত হন না। বল দেখি, কোন্ শক্তিবলে এ জাতি এত উন্নত ও সুসভ্য হইল এবং ভূমণ্ডলে এমন আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইল? যে কর্ত্তব্যপরায়ণতা, বাণিজ্যপ্রিয়তা ও শাসনতন্ত্রের শ্রেষ্ঠতার জন্য এ জাতি আজ জগতে অগ্রগণ্য, তাহা কেবল একমাত্র জাতীয় সাধনার ফল।

এই ইংরাজ জাতির এমনি গুণ, যিনি যে কর্ম্মক্ষেত্রে পতিত হউন না, তিনি নিজ কর্ম্মক্ষেত্রে অলৌকিক কর্ত্তব্যপরায়ণতা ও কৃতিত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক জাতীয় গৌরব বর্দ্ধন করিবেন। এ জাতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম ব্যতীত আর কিছুই জানে না। যিনি যে বংশে সম্ভূত হউন না কেন, নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্মে আলস্য বা ঔদাস্য কাহাকে বলে, তাহা তিনি আদৌ জানেন না; পরন্তু নিজ কর্ত্তব্যপালনে তিনি প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত হন না। ইহারই গুণে এ জাতি জগতে এত শ্রেষ্ঠ, এত সমৃদ্ধ ও এত ঐশ্বর্য্যশালী। যথার্থ বলিতে কি, এ জাতি জাতীয় সাধনার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে।

সেইরূপ যে জাপান শত বৎসর পূর্ব্বে অসভ্য ছিল, যাহার নাম

পর্য্যন্ত কেহ জানিত না, সে জাপানও জগতে অদ্ভুত বলের পরিচয় দিয়া জাতীয় সাধনার পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছে। রুষ জাপান যুদ্ধে জাপান যে জাতীয় শক্তি বিকাশ করে, তাহাও একমাত্র জাতীয় সাধনার ফল। সামান্য ক্ষুদ্র রাজ্য হইয়া জাপান সে যুদ্ধে বিশাল রুষ সাম্রাজ্যের ক্ষমতা খর্ব্ব করিয়া দেয়। ইউরোপের নিকট সুশিক্ষা পাইয়া ও একমাত্র জাতীয় সাধন বলে স্বাধীন জাপান জগতে মহোচ্চ পদবীতে আরূঢ় হইয়াছে। কিন্তু হায়! অধম পরাধীন ভারত ডানাকাটা পাখীর ন্যায় কেবল প্রাণে বাঁচিয়া-আছে; ইহার এখন কিছুই নাই। কাঁদিতে কাঁদিতে কেবল দুঃখের দিন গণিতেছে। অপরে যথাসর্ব্বস্ব লুটে পুটে লইয়া যাইতেছে। চোক রাঙ্গাইবারও ক্ষমতা নাই।

জাতীয় সাধনার সমক্ষে বাধাবিঘ্ন, আপদ বালাই সকলই ভস্মী-ভূত হইয়া যায়। বিন্দু বিন্দু বারি পতিত হইয়া প্রস্তরও ক্ষয় পাইতে থাকে। যে জাতি কোন মহদুদ্দেশ্য সাধনে তৎপর, উহার সমক্ষে যতই কেন বাধাবিঘ্ন ও বিপদ আপদ ঘনীভূত হউক না, সকলই উহা শনৈঃ শনৈঃ অতিক্রম করিবে ও নিজ গন্তব্য পথে অগ্রসর হইবে। উহার নিকট দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বতও অনায়াসগম্য হইবে। মহাসাগরের উত্তালতরঙ্গও নির্ব্বাতকমলপত্রবৎ স্থির হইবে। ভীষণ শৈলও উহার নিকট কোমল শয্যায় পরিণত হইবে। চতুর্দ্দিকস্থ অবস্থাস্রোতের মধ্যে যতই বিপদরাশি উত্থিত হইবে, সকলই আকাশে মিলিয়া যাইবে; একমনে এক ধ্যানে অসাধারণ অধ্যবসায় ও স্বাবলম্বন সহকারে ভগবানকে মাথায় রাখিয়া অসীম সাহসে নির্দ্দিষ্ট গন্তব্য পথে ধাবমান হইবে, কদাচ পশ্চাৎপদ ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবে না। জাতীয় সাধন বলে মহৎ কার্য্য সাধনার্থ অন্যান্য গুণও অচিরে প্রাপ্ত হইবে। এক পুরুষে হউক, পাঁচ পুরুষে হউক, স্বোদ্যম বলে সুযোগমতে নিজের অভীষ্ট মহৎ

কার্য্য সম্পাদন করিবেই করিবে। যে জাতি যাহা পাইবার জন্য একমনে জাতীয় সাধন করে, বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীহরি সে জাতির মনোবাঞ্ছা অচিরে পূর্ণ করিবেন। 'Heaven helps those who help themselves.'

মানসিক গুণের উন্নতির জন্য জাতীয় সাধন যেমন আবশ্যক, কোন শারীরিক গুণের উৎকর্ষ লাভের জন্য ইহা তেমনি আবশ্যক। যে দেশে যাহা শরীরের সৌন্দর্য্য বলিয়া খ্যাত, তাহা পাইবার জন্য সে দেশের লোকেরা কত যত্নবান হয়! তাহার সাক্ষ্য দেখ, চীন মহিলাগণ নিজ পদযুগল ক্ষুদ্র করিবার জন্য লৌহপাদুকাদি ব্যবহার করিয়া কত কষ্ট সহ্য না করে! বঙ্গমহিলা নিজের নিতম্বদেশ স্থূল ও নিবিড় করিবার জন্য যেরূপ যত্নবতী, ইংরাজ মহিলাও স্বীয় স্তনদ্বয় পীনপয়োধর ও কটিদেশ ক্ষীণ করিতে সেইরূপ যত্নবতী। গায়কগণ যেমন যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া কণ্ঠদেশ হইতে বিবিধ রাগরাগিণি সংবলিত সঙ্গীত নিঃসরণ করিতে শিক্ষা করে, নর্ত্তকগণও সেইরূপ অনেক সাধ্য সাধন করিয়া তালে তালে উত্তমরূপ নৃত্য করিতে শিক্ষা করে। এ জগতে সর্ব্ববিধ উন্নতি বা উৎকর্ষলাভ একমাত্র সাধনসাপেক্ষ। সাধন বা অনুশীলন ব্যতীত কোন জাতি বা কোন লোক কোন বিষয়ে উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে না।

এখন জাতীয় নিয়তি শব্দের প্রকৃত অর্থ কি? ইহাতে সমষ্টি-ভাবে সমগ্রজাতির অদৃষ্ট বুঝায়। যখন জাতিবিশেষ দুর্ভিক্ষ,মহামারী, জলপ্লাবন,ভূমিকম্প, রাষ্ট্রবিপ্লব প্রভৃতি দৈবঘটনা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া সুখদুঃখের ভাগী হয়, তখন জাতীয় নিয়তির পূর্ণ অনুশাসন চলিতে থাকে।

ইহাতে জাতির ভাগ্যলক্ষ্মী আরও বুঝায়। যে দিন থানেশ্বরের যুদ্ধে মহম্মদঘোরী পৃথ্বীরাজকে পরাস্ত করিয়া ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্য স্থাপন করেন, সেদিন মুসলমানজাতির ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহাকে

উত্তেজিত করিয়াছিলেন। সেইরূপ যে দিন পলাসীক্ষেত্রে লর্ড ক্লাইব মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া নবাবের বহুসংখ্যক সৈন্যদলকে পরাস্ত করিয়া ভারতে ব্রীটীশ সাম্রাজ্যস্থাপনের সূত্রপাত করেন, সেদিন ইংরাজজাতির ভাগ্যলক্ষ্মীই তাঁহাকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন; কারণ তদবধি কত লক্ষ লক্ষ ইংরাজ এদেশের ধনাগার হইতে অপর্য্যাপ্ত ধনদৌলত লইয়া গিয়া স্বদেশে অমৃত বর্ষণ করিতেছেন। এইরূপ মহৎ মহৎ কর্ম্ম এক মাত্র জাতীয় নিয়তিতে ঘটিয়া থাকে।

সত্য বটে, জাতিবিশেষ সমবেত চেষ্টা দ্বারা বা জাতীয় সাধনার গুণে সভ্যতার পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে থাকে, তথাচ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা উচিত, ইহার ভাগ্যলক্ষ্মী এ বিষয়ে ভালরূপ অনুশাসন না চালাইলে সে জাতি জগতে এমন কৃতিত্ব দেখাইতে পারে না। নবোত্থিত পাশ্চাত্য জগৎ যতই কেন পুরুষকার, উদ্যম ও সাধনার প্রশংসা করুক না, প্রবীণ প্রাচ্যজগৎ চিরদিন উপদেশ দিবে, সিদ্ধিলাভে ভাগ্যবল যেমন আবশ্যক, পুরুষকার ও স্বোদ্যম তেমনি আবশ্যক। দৈববল না থাকিলে, অবস্থার ভালরূপ যোগাযোগ ঘটে না, পুরুষকার ও উদ্যমশীলতা আদৌ স্ফূর্ত্তি পায় না। দৈববল থাকাতেই কার্য্যসিদ্ধির উপযোগী যাবতীয় গুণ, সুযোগ ও সাধন একত্র একাধারে মিলিত হইয়া থাকে। যেমন ব্যক্তিবিশেষ ব্যষ্টিভাবে নিজ কর্ম্মফলে আবদ্ধ, জাতিবিশেষও সমষ্টিভাবে সেইরূপ নিজ কর্ম্মফলে আবদ্ধ আছে। সূক্ষ্ম জগতের যে সকল দেবতা প্রথমোক্তের ভাগ্যলিপি চালাইতেছেন, তাঁহারাই আবার শেষোক্তের ভাগ্যলক্ষ্মী সামঞ্জস্যের সহিত চালাইয়া থাকেন।

কি জাতি, কি ব্যক্তি এ জগতে সকলেই নিজ নিজ কর্ম্মফলে আবদ্ধ জানিবে। এই যে শ্বেতাঙ্গ আজ কৃষ্ণাঙ্গকে পদে দলন করিতেছেন ও প্লীহা ফাটাইতেছেন, তাহাও উভয়ের কর্ম্মফল। এই যে এক জাতি অপর জাতির পদানত, তাহাও উভয়ের কর্ম্মফল। এই যে

সে দিন ইউরোপের মহাকুরুক্ষেত্রে সকলে মিলিয়া এতদিন কাটাকাটি করিল, তাহাও সকলের কর্ম্মফল। একমাত্র জাতীয় নিয়তিই সংসারে এ সকল অনর্থপাত ঘটাইয়া থাকে।

মানবের জাতীয় ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে বুঝা যায়, ভাগ্যলক্ষ্মী কি প্রকারে এ জগতে জাতিবিশেষকে অনুগৃহীত করিয়া আসিতেছেন। জাতীয় শুভাদৃষ্ট বশতঃ জাতিবিশেষ সময়বিশেষে জাতীয় সাধনার বলে সভ্যতাসোপানে আরূঢ় হয় ও জগতে একাধিপত্য স্থাপন করিতে সমর্থ হয়। প্রাচীন কালে ভারত, চীন, মিসর পারস্য, গ্রীশ, রোম প্রভৃতি পৌত্তলিক দেশগুলি জাতীয় নিয়তি বলে জাতীয় সাধনার গুণে সুসভ্য হইয়া জগতে আপনাদের আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল। মধ্যযুগে মুসলমান দেশগুলি ধর্ম্মবলে বলীয়ান হইয়া জগতে আধিপত্য করিয়া যায়। এখন পাশ্চাত্য খৃষ্টান জাতিদের ভাগ্যোদয় উপস্থিত। উহারা বিজ্ঞানবলে সুসভ্য ও জগতের অধীশ্বর। উহাদের সামান্য অঙ্গুলিহেলনে আজ সমগ্র জগৎ উঠিতেছে ও বসিতেছে। এইরূপ যে জাতির ভাগ্য যে সময়ে সুপ্রসন্ন হইবে, সে জাতি সে সময়ে একমাত্র জাতীয় সাধনার গুণে জগতে অত্যদ্ভুত লীলা দেখাইবে ও বীরভোগ্যা বসুন্ধরা ভোগ করিবে!

লোকবিশেষের জীবনে সুখদুঃখ চক্রবৎ পরিভ্রমণ করিতেছে। কখন তিনি অদৃষ্ট নেমির উপর দণ্ডায়মান হইয়া সুখের পর সুখ ভোগ করেন, কখনও বা নেমির নিম্নদেশে পতিত হইয়া শোকদুঃখের যন্ত্রণায় অস্থির হন্; সেইরূপ জাতিবিশেষের জাতীয় জীবন সুখদুঃখে জড়িত আছে। কোন না কোন সময়ে সে জাতি ধনধান্যে সুশোভিত হইয়া নানাদেশ জয় করত সুখসমৃদ্ধিতে স্ফীত হয়, আবার অন্য সময়ে অপর জাতির পদানত হইয়া কঙ্কালসার হইতে থাকে। দেখ, যে ইংরাজ আজ সসাগরা মেদিনীর অধীশ্বর, সে জাতি এক সময়ে

রোমের পদানত ছিল। যে সমৃদ্ধ রোম পুরাকালে বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া জগতে অত্যদ্ভুত লীলা দেখায়, বিধাতার ভবিতব্য, সেই রোম ভাগ্যহীন হইয়া বহুদিন অষ্ট্রীয়া রাজ্যের পদানত ছিল। যে ভারত তিনসহস্র বৎসর সগৌরবে ও সদর্পে নিজ স্বাধীনতা ভোগ করে, সে ভারত আজ ভাগ্যদোষে অপর জাতির পদানত। এইরূপে জাতীয় জীবনে সুখদুঃখ চক্রবৎ পরিভ্রমণ করিতেছে।

এ জগতে উন্নতির সীমা আছে, অবনতিরও সীমা আছে। যে জাতি যতই কেন উন্নত হউক না, সে জাতি যে চিরদিন উন্নতির পথে ধাবমান হইবে, ইহা প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধ। যে জাতি যত সমুন্নত হইবে, সে জাতি কালে তত অবনত হইবে। যে জাতি যত অবনত হইবে, সে জাতি পুনরায় কালে তত উন্নত হইবে। যে অভাগা ভারত আজ পরাধীন ও পরপদদলিত, সে ভারত কালে স্বাধীন হইবে ও অপর জাতিকে পদে দলন করিবে। আজ যে ভাগ্যবান পাশ্চাত্য জাতিবর্গ অপরাপর জাতিবর্গকে পদতলে রাখিয়া বসুন্ধরা ভোগ করিতেছেন, উহারাও কালে অবনত হইয়া নিজের প্রভুত্ব হারাইয়া বসিবেন। এইরূপে জাতীয় নিয়তির অনুশাসন জাতিবিশেষের উপর চিরদিন চলিতেছে। ইহার ফলাফল দেখিতে হইলে বৎসরের গণনা করিলে চলিবে না, কিন্তু শতাব্দীর গণনা করা উচিত।

জগতের নিয়ম এই, যাহার যাহাতে উৎপত্তি, তাহার তাহাতেই নিবৃত্তি বা লয়। যে সাম্যবাদ বা প্রতিযোগিতা হইতে আধুনিক খৃষ্টানজাতিবর্গের ভাগ্যোদয়, তাহাতেই উহাদের মৃত্যুবাণ নিহিত রহিয়াছে। জ্ঞানবিজ্ঞান ও অস্ত্রশস্ত্র বলে বলীয়ান হইয়া উহারা এখন নানা দুর্ব্বল জাতিদের অভিসম্পাত কুড়াইতে কুড়াইতে পৃথিবীময় নিজ নিজ সাম্রাজ্য বিস্তার করিতেছে বটে, কিন্তু 'কালস্য কুটিলা গতিঃ' কিছুকাল পরে উহারা পরস্পর ঈর্ষান্বিত হইয়া মহা-

সমরে লিপ্ত হইবে এবং পরস্পর কাটাকাটি ও খেয়োখেয়ি করিয়া যদুবংশের ন্যায় ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। সেদিনকার ইউরোপের কুরুক্ষেত্র মহাসমরে উহাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া সকলের মুখ হইতে এইরূপ ভবিষ্যৎবাণী নিঃসৃত হইতেছে। যখন এইরূপ তিনবার মহাসমর ঘটিবে, তখন উহারা আটলান্টিসবাসী দৈত্যকুলের ন্যায় ধ্বংস পাইবে। তখন ইউরোপ ছারখার হইয়া যাইবে এবং দুর্ব্বল জাতিদের অভিসম্পাত ফলিবে।

আরও দেখ, যে জাতিভেদপ্রতিষ্ঠিত পুরুষানুক্রমণিকতা হিন্দু জাতির উন্নতির মূলাধার, তাহাই আবার ইহার অধঃপতনের প্রধান কারণ। এই প্রকারে যাহাতেই জাতিবিশেষের উন্নতি, তাহাতেই সে জাতির অবনতি ঘটে। এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে প্রকৃতির ত্রিগুণের মহালীলাবশতঃ মন্দ ভালর সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে। ইহাতেই জাতীয় নিয়তি স্বোদ্দেশ্য সাধন করিতেছে। ইহাতেই জাতিবিশেষ উন্নত হইয়াও কালে অবনত হইতেছে এবং অবনত হইয়াও কালে উন্নত হইতেছে।

জাতীয় নিয়তির গুণে সভ্যতাস্রোত জগতে ক্রমশঃ বর্দ্ধনশীল। যে জাতি প্রাকৃতিক আনুকূল্যবিশেষ পাইয়া জাতীয় সাধন বলে প্রথম সভ্যতা সোপানে আরূঢ় হয়, উহার অনুকরণে যখন অপর জাতি সাধনবলে সভ্যতার পথে অগ্রসর হয়, তখন শেষোক্ত জাতি প্রথমোক্ত জাতি অপেক্ষা অধিক উন্নতি লাভ করে। তাহার সাক্ষ্য দেখ, আজকাল ইউরোপ পূর্ব্বতন গ্রীশান ও রোমান সভ্যতার ভগ্নাবশেষকে মূলভিত্তি করিয়া সাধনবলে যে অপূর্ব্ব সভ্যতাহর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিয়াছে, তাহা গ্রীশান ও রোমান সভ্যতা অপেক্ষা অনেক উচ্চদরের। এ সভ্যতার মূলমন্ত্র একমাত্র বিজ্ঞানানুশীলন। এই বিজ্ঞান বলে ইউরোপীয় জাতিবর্গ যেমন একদিকে আপনাদের সুখৈশ্বর্য্যবর্দ্ধনমানসে নানা উপায় ও কলকারখানা উদ্ভাবন

করিতেছে, তেমনি অপরদিকে উহারা ইহার বলে মহৎ মহৎ মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণকরত আপনাদের ধ্বংসের পথও পরিষ্কার করিতেছে। ইহাতে বুঝা উচিত, যেখানে সৃষ্টি, সেইখানেই সংহার, যেখানে জন্ম, সেইখানেই মৃত্যু, যেখানে উৎপত্তি, সেইখানেই লয়। লীলাময়ী প্রকৃতির অনন্ত লীলা বুঝা ভার।

রাষ্ট্রবিপ্লব, সমাজবিপ্লব সংগ্রাম প্রভৃতি সমাজের যাবতীয় দৈবঘটনা জাতীয় নিয়তি দ্বারা চিরদিন পরিচালিত হয়। জাতীয় নিয়তি আর কিছুই নয়, কেবল সমগ্র জাতির কর্ম্মফলের সমষ্টি। যেমন লোকবিশেষের সুখদুঃখ তদীয় কর্ম্মফলের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে, সেইরূপ সমগ্র জাতির সুখদুঃখ যাবতীয় লোকের কর্ম্মফলের উপর নির্ভর করিতেছে। আবার জাতীয় নিয়তি অধিকাংশ লোকের ভাগ্যচক্র চালায়। এস্থলে বিধাতাপুরুষগণ জাতিবিশেষের ভাগ্যের সহিত ব্যক্তিবিশেষের ভাগ্যের সামঞ্জস্য করিয়া দেন। দেখ, মুসলমানযুগে যে সকল হিন্দুদিগের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন ছিল, তাঁহারা আমীর, উমরা ও সুবেদারের সুনজরে পড়িতেন। এখন খৃষ্টানযুগে যাঁহাদের অদৃষ্ট ভাল, তাঁহারা ইংরাজকর্ম্মচারীদের সুনজরে পতিত হইতেছেন। ইহাতেই বুঝিয়া দেখ, জাতীয় নিয়তির সঙ্গে লোকবিশেষের ভাগ্যলিপি কিরূপ অপরিহার্য্যরূপে জড়িত রহিয়াছে।

অনেকে মনে করেন, রাষ্ট্রবিপ্লব ও সমাজবিপ্লব কেবল অন্ধদৈব কর্ত্তৃক সংঘটিত হয়। যাঁহারা মানবজীবনের গূঢ়রহস্যজ্ঞ, তাঁহারা একথা কদাচ স্বীকার করিবেন না। দেখ, ভারতে এক সিপাই বিদ্রোহ দ্বারা কত লক্ষ লক্ষ লোকের ভাগ্যলিপি পরিবর্ত্তিত হইল! কত সহস্র সহস্র শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ ইহাতে নিহত হইল! কত রাজা পথের ফকির হইল! আবার কত ফকির রাজা হইল! দেশের এরূপ বিশেষ বিশেষ ঘটনা কি অন্ধ দৈবের কাজ?

সূক্ষ্মজগৎস্থ দেবগণই জাতীয় নিয়তিকে চিরদিন চালাইতেছে

তাঁহারাই আমাদের বিধাতাপুরুষ। তাঁহাদের গূঢ় ক্রিয়াকলাপ কীটাণুকীট মানব কি বুঝিবে? ভারতে সিপাইবিদ্রোহ ঘটিবার ১০ বৎসর পূর্ব্বে পশ্চিমাঞ্চলের জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণ গণনা দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, ভারতে কোম্পানিবাহাদুরের রাজত্ব লোপ পাইবে ও ভীষণ কাটাকাটি হইবে। ইহাতে বুঝা উচিত, গ্রহগণের সঞ্চার বশতঃ ব্যক্তিবিশেষের নিয়তির ন্যায় জাতিবিশেষের নিয়তিও পরিবর্ত্তিত ও নিয়ন্ত্রিত হইতেছে।

আবার ব্যক্তিবিশেষের ভাগ্যের ন্যায় জাতিবিশেষের ভাগ্যও চিরদিন গূঢ় ও রহস্যময়। কে জানে কাহার ভাগ্যে কবে কি ঘটিবে? যে দিন ইংরাজদূত সার টমাস রো দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীর বাদসাহের দরবার দর্শনে বিমোহিত হইয়া দূর হইতে কুর্ণিশ করিতে করিতে বাদসাহের সমীপে আসিয়া দণ্ডায়মান হন, তিনি কি একবার মনে ভাবিয়াছিলেন, যে তাঁহার ভবিষ্য বংশধরেরা কালে এই দিল্লী মহানগরীতে দিল্লীশ্বরের স্বর্ণসিংহাসন অধিকার করিয়া রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন? আর বাদসাহও কি একবার মনে ভাবিয়াছিলেন, যে, তাঁহার ভবিষ্যবংশধরেরা এ সামান্য সনদপ্রার্থী বিদেশীর বংশধরের নিকট করযোড়ে সামান্য পেনসনের জন্য প্রার্থনা করিবেন? যে নেপোলিয়ান বোনাপার্টির ভয়ে সমগ্র মেদিনী থরহরি কম্পমানা, তিনিই কিনা শেষজীবনে সেণ্টহেলেনা দ্বীপে কারারুদ্ধ হইয়া এক গেলাস পানীয় জলের জন্য সেন্ত্রীর নিকট যোড়হস্ত হন। অতএব "পুরুষস্য ভাগ্যং দেবা ন জানন্তি কুতো মানবাঃ।"

যে ইংরাজরাজের বীরদর্পে সমগ্র মেদিনী আজ থরহরি কম্পমানা, ইনি কতকাল জগতের ভাগ্যলিপি চালাইবেন, তাহাও কেহ জানেন না। এ পরিবর্ত্তনশীল মর জগতে কিছুই স্থায়ী হইবার নয়। সর্ব্বসংহারক কালের কঠিন হস্তে পতিত হইয়া সকলই ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। সুবিশাল রোম সাম্রাজ্য কালে উত্থিত হয় এবং জল

বুদ্‌বুদের ন্যায় কালসমুদ্রে মিলিয়া যায়। সুবিশাল ব্রীটিশ সাম্রাজ্য কালে উত্থিত হইয়াছে এবং অচিরে বা বিলম্বে কালসাগরে মিলিয়া যাইবে। যে কোন জাতি জগতে যতই কেন প্রবলপ্রতাপান্বিত হউক না, উহাদের সাম্রাজ্য যতই কেন সুবিস্তৃত হউক না, জাতীয় নিয়তির সমক্ষে কাহারও নিস্তার নাই; সকলকেই ইহার পদমূলে মস্তক অবনত করিতেই হইবে। নিয়তিচক্র জগতে সদা ঘূর্ণ্যমান। কোন জাতির উপর কখন কোন্ দৈবচক্র পতিত হইবে, তাহাও কেহ জানেন না। আজ যে জাতি ধনবলে ও অস্ত্রবলে মত্ত হইয়া অপর দুর্ব্বল জাতিবর্গকে পদে দলন করিতেছে, হয়ত দর্পহারী মধুসূদন কল্য সে জাতির দর্প চূর্ণ করিবেন। আজ যে জাতি জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, হয়ত কিছুকাল পরে সে জাতির নামগন্ধ থাকিবে না। আজ যে পরাক্রান্ত জাতি অপর জাতির সর্ব্বস্ব ও প্রাণধন স্বাধীনতা হরণ করিতেছে, হয়ত সে জাতি কিছুকাল পরে নিজের স্বাধীনতা হারাইয়া অপর জাতির পদানত হইবে। এই প্রকারে নিয়তিচক্র চিরদিন এ সংসারে ঘুরিতেছে।

জাতীয়তা।

জাতীয়তা শব্দের প্রকৃত অর্থ কি? অনেকে ইহার অতি সঙ্কীর্ণ অর্থ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন পরিচ্ছদাদি বিষয়ে যে সকল বৈশেষিক রীতিনীতি থাকাতে কোন এক জাতিকে অতি সহজে চিনিতে পারা যায়, উহাদের সমষ্টিকে জাতীয়তা (Nationality) বলে; যেমন ধুতিচাদর দ্বারা বাঙ্গালী, জুতাটুপি দ্বারা মারহাট্টা দীর্ঘবেণী দ্বারা চীনামান প্রভৃতি জাতিগুলিকে দেখিবামাত্র অতি সহজে চিনিতে পারা যায়। কিন্তু জাতীয়তা শব্দের এরূপ সঙ্কীর্ণ অর্থ করা উচিত নয়।

যে সকল বৈশেষিক গুণাগুণ অনুশীলন করাতে, যে সকল বৈশেষিক রীতিনীতি ও দেশাচার পালন করাতে কোন এক জাতি

জগতে অপরাপর জাতি হইতে বিশিষ্ট বা পৃথক থাকে, উহাদের সমষ্টির নাম প্রকৃত জাতীয়তা। ইহার ভিতর জাতিবিশেষের ভাষা, ধর্ম্ম, শাসনতন্ত্র, রীতিনীতি ও দেশাচার সকলই অন্তর্নিহিত। আবার ইহাদের মধ্যে ভাষা, ধর্ম্ম ও শাসনতন্ত্র জাতীয়তা গঠনে সর্ব্ব-প্রধান।

জীবের জীবন যেরূপ, জাতির জাতীয়তাও সেইরূপ। জীবন নাশে জীব যেমন মৃত্যুমুখে পতিত হয়, জাতীয়তা নাশে জাতি-বিশেষের অস্তিত্ব সেইরূপ জগতে লুপ্ত হইয়া থাকে। জাতীয়তাই ইহাকে সজীব রাখে এবং যে দিন জাতীয়তা নষ্ট হইবে, সে দিন ইহা অন্য জাতিতে পরিণত হইবে। এ কারণ ভূমণ্ডলে জাতিমাত্রেই স্ব স্ব জাতীয়তা অনুশীলন করিয়া স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখিতে চিরদিন একান্ত যত্নবান।

জীবজগতে দেখা যায়, প্রকৃতি প্রত্যেক জাতিকে চিরদিন বিভিন্ন রাখিতেছে। সিংহ, ব্যাঘ্র, গরু, মহিষ প্রভৃতি সকল জন্তুই সংসারে সম্পূর্ণ পৃথক। শরীরের গঠন, আকৃতি, যন্ত্র ও প্রকৃতি লইয়া এবং দেহযাত্রানির্ব্বাহক নৈসর্গিক সংস্কার লইয়া উহাদের মধ্যে প্রত্যেক জাতি পৃথক। এই জাতিগত পার্থক্য কদাচ লুপ্ত হয় না। কস্মিনকালে এক জাতি সচরাচর অন্য জাতির সহিত মিশ্রিত হয় না। প্রাকৃতিক পুরুষানুক্রমণিকতা বশতঃ জাতিবিশেষ নৈসর্গিক ভেদাভেদ বজায় রাখিয়া অন্যান্য জাতি হইতে চিরদিন পৃথক থাকে।

আবার প্রকৃতি এক জাতীয় জীবগণকে দেশভেদে জলবায়ুর তারতম্যবশতঃ কথঞ্চিৎ পৃথক করিয়া রাখে। সেইরূপ জগতে মানবজাতিও বর্ণ ও ঈষৎ শারীরিক বৈলক্ষণ্য লইয়া ককেশিয়ান, মাঙ্গোলিয়ান প্রভৃতি কয়েক উপজাতিতে বিভক্ত আছে। এই জাতিগত পার্থক্য সর্ব্বথা নৈসর্গিক। ইহার সহিত জাতীয়তার

কোনরূপ সম্পর্ক নাই। কিন্তু প্রকৃতিচিহ্নিত কোন এক দেশের জাতিবিশেষ ভাষা, ধর্ম্ম, রীতিনীতি ও শাসনতন্ত্র লইয়া যে সকল ভেদাভেদ দেখায়, উহাদের সমষ্টিই সেই জাতির প্রকৃত জাতীয়তা। এ সকল ভেদাভেদ আদৌ নৈসর্গিক নহে, কিন্তু সর্ব্বথা কৃত্রিম ও সামাজিক।

প্রকৃতিজগতের অনুকরণে সমাজজগৎও প্রত্যেক মানবজাতিকে নানাবিষয়ে সম্পূর্ণ পৃথক রাখিতে চেষ্টা পায়। এস্থলে শরীরের গঠন ও প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছুমাত্র পার্থক্য না থাকিলেও প্রত্যেক জাতি দেশভেদে দেহযাত্রা, সংসারযাত্রা ও সমাজধর্ম্ম পালন সম্বন্ধে কতকগুলি বৈশেষিক রীতিনীতি ও আচার ব্যবহার পালন করিয়া নিজের অস্তিত্ব জগতে বজায় রাখিতে সচেষ্ট হয়। যে জাতি ঐসকল বৈশেষিক রীতিনীতি ও ধর্ম্মবিষয়ক নিয়মাবলি বিধিবৎ পালন করিয়া নিজের জাতীয়তা যত ভালরূপ রক্ষা করিতে পারিবে, সে জাতি তত সুদীর্ঘকাল জগতে স্থায়ী হইবে।

দেহধর্ম্ম, সংসারধর্ম্ম ও সমাজধর্ম্ম পালনার্থ যে সকল আচার ব্যবহার, রীতিনীতি ও অনুষ্ঠান সামাজিক নির্ব্বাচনে বহুদিবস হইতে জাতিবিশেষের মধ্যে প্রচলিত, উহাদের বিধিবৎ পালনে ইহার জাতীয়তা সম্যক রক্ষিত হয়। কেবল পরিচ্ছদাদি বাহ্য লক্ষণগুলি বজায় রাখিলে প্রকৃত জাতীয়তা রক্ষা করা হয় না। যদি আমরা হিন্দুয়ানী মিটাইয়া পরধর্ম্মে দীক্ষিত হই এবং উহার আচার ব্যবহার অবলম্বন করি, অথচ ধুতি চাদর ব্যবহার করি ও বাঙ্গালা ভাষায় কথোপকথন করি, বঙ্গদেশের নিবাসী বলিয়া আমরা জগতে বাঙ্গালী নামে পরিচিত হইব সত্য, কিন্তু আমাদের প্রকৃত জাতীয়তা লুপ্ত হইবে।

জীবজগতে প্রকৃতি পুরুষানুক্রমণিকতা দ্বারা জীবজন্তুদিগের বৈশেষিকত্ব ও পার্থক্য সম্পূর্ণভাবে বজায় রাখে। উহারা শারীরিক

গঠন ও প্রকৃতি নৈসর্গিক নিয়মানুসারে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়। ইহাই উহাদের জাতীয়তা বা জাতীয় বৈশেষিকত্ব। কিন্তু মানবমণ্ডলীর ভিতর নৈসর্গিক কারণে যে সকল অল্পাধিক ভেদাভেদ দেখা যায়, তাহা উহাদের জাতীয়তা নহে। সমাজোত্থিত রীতিনীতি ও ভেদাভেদের সমষ্টি উহাদের প্রকৃত জাতীয়তা। মানবহৃদয়ে বাল্যকালার্জ্জিত সংস্কার স্বভাবতঃ বলবৎ বলিয়া বাল্যকালে যাহা শিক্ষা করা যায় বা যাহার সংস্কার মনে বদ্ধমূল হয়, সাধারণতঃ সকলেই উহার পক্ষপাতী হইয়া থাকে। দেশের চিরন্তন রীতিনীতির উপর এই স্বাভাবিক পক্ষপাত বশতঃ জাতিবিশেষের জাতীয়তা চিরদিন মানবসমাজে সম্যক রক্ষিত ও পালিত হইয়া আসিতেছে।

মানবসমাজ ভালরূপ পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায়, জাতিবিশেষের জাতীয়তা ধর্ম্ম ও শাসনতন্ত্র দ্বারা চিরদিন বিভিন্নরূপে পরিচালিত হইতেছে। যে ধর্ম্ম যে সকল দেশে কালক্রমে বিস্তৃত হয়, সে ধর্ম্ম সেই সকল দেশে ঈশ্বরোপাসনা ও বিবাহাদি নানাবিষয়ে প্রায় এক প্রকার মতামত ও রীতিনীতি প্রবর্ত্তিত করিয়া স্বসেবকদিগকে অন্য ধর্ম্মাবলম্বী লোকবর্গ হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক ও বিভিন্ন রাখিতে সাধ্যমত চেষ্টা পায়। এই প্রকারে এক ধর্ম্মাবলম্বী কয়েক জাতি স্বধর্ম্মের রীতিনীতি ও আচার ব্যবহার বিধিবৎ পালন করিয়া স্বীয় জাতীয়তা রক্ষা করে। ইহার জন্য জগতে যতগুলি বৈশেষিক ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, ধর্ম্মানুসারে সমগ্র মানবজাতি কয়েক বিশিষ্ট জাতিতে বিভক্ত, যেমন বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃষ্টান, হিন্দু, পারসিক, ইহুদি প্রভৃতি। ইহারা সকলেই স্ব স্ব ধর্ম্মের নিয়মাবলি ও আচার ব্যবহার বিধিবৎ পালন করিয়া স্বীয় জাতীয়তা সম্যক রক্ষা করিতেছে।

ভৌগলিক সংস্থানানুসারে এক প্রকৃতিচিহ্নিত দেশের যাবতীয় অধিবাসী লইয়া এক জাতি গঠিত হয়। সচরাচর তথায় এক ভাষা

কালক্রমে উদ্ভূত হয় ও এক প্রকার শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সে জাতি ভাষা, রাজ্য, পরিচ্ছদাদি নানা বিষয় লইয়া অন্যান্য জাতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক থাকে। এস্থলে সে জাতির জাতীয়তা যেমন এক দিকে উহার ধর্ম্ম স্থাপন করে, তেমনি অপর দিকে উহার ভাষা, শাসনতন্ত্র ও ভৌগোলিক সংস্থানও স্থাপন করিয়া থাকে।

তথায় লোকপরম্পরায় স্বধর্ম্মনির্দ্দিষ্ট যে সকল রীতিনীতি ও আচার ব্যবহার কালক্রমে উত্থিত হয়, রাজা ও প্রজাবর্গ সমবেত হইয়া ঐ সকল বিধিবৎ পালন করতঃ জাতির জাতীয়তা সর্ব্বান্তঃকরণে রক্ষা করে। তথায় রাজার যে ধর্ম্ম, প্রজাবর্গেরও সেই ধর্ম্ম। রাজা যে সকল আচার ব্যবহার ও অনুষ্ঠানের পক্ষপাতী, প্রজাবর্গও তাহাই অন্তরের সহিত পালন করিতে থাকে। প্রজাবর্গ যে সকল অনুষ্ঠানের পক্ষপাতী, রাজাও উহাদের সন্তোষার্থ তাহাই প্রবর্ত্তন করেন। এই প্রকারে সেই প্রকৃতি-চিহ্নিত দেশের জাতীয়তা রাজা ও প্রজাবর্গ দ্বারা ভালরূপ রক্ষিত হইতেছে।

অপরপক্ষে যে দেশ বিজিত ও পরাধীন, যে দেশে রাজার ধর্ম্ম ও জাতীয়তা একরূপ এবং প্রজার ধর্ম্ম ও জাতীয়তা অন্যরূপ, সে দেশের জিত জাতি নিজের জাতীয়তা রক্ষণার্থ সমূহ বিপদে পতিত হয়। তথায় প্রথমে জেতৃ ও জিতজাতির ভিতর বিশেষরূপ বিদ্বেষভাব দৃষ্ট হয়। একত্র সংস্রবে থাকায় কিছুকাল পরে উভয় জাতির বিদ্বেষ-ভাব ক্রমশঃ মন্দীভূত হইতে থাকে। দুই তিন শতাব্দীর ভিতর উভয় জাতির বিমিশ্রণে এক অভিনব জাতি উৎপন্ন হয় এবং রাজার ধর্ম্ম ও জাতীয়তা কালক্রমে তথায় স্থাপিত হইয়া থাকে। এই প্রকারে দুর্ব্বল জিত জাতি নিজের জাতীয়তা ও অস্তিত্ব হারাইয়া জেতৃ জাতির অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। নর্ম্মান জাতি ইংলণ্ড বিজয় করিবার পর পূর্ব্বতন কেলটিক জাতির এইরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছিল।

যদি এইরূপ দুঃসময়ে জিত জাতি অন্তর্নিহিত শক্তি বলে স্বীয় ধর্ম্ম ও জাতীয়তার সম্যক অনুশীলন করিতে করিতে নিজের বৈশেষিকত্ব বজায় রাখিতে পারে, সে জাতি জগতে অমরত্ব লাভ করিবে এবং ইহার অস্তিত্ব কদাচ নষ্ট হইবে না। এ কারণ মুসলমান-যুগে এ দেশের ব্রাহ্মণগণ আমাদের জাতিধর্ম্ম রক্ষা করিতে এত সচেষ্ট হইয়াছিলেন এবং আধুনিক পারসিক জাতির পূর্ব্বপুরুষগণ মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত না হইয়া জাতিধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেখিতে পাওয়া যায়, এ জগতে কেবল হিন্দু, পারসিক ও ইহুদি জাতি আপনাদের চিরন্তন জাতিধর্ম্ম রক্ষা করিয়া স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সক্ষম হইয়াছে।

ধর্ম্মনির্দ্দিষ্ট জাতীয়তা শাসনতন্ত্রনির্দ্দিষ্ট জাতীয়তা অপেক্ষা মহোচ্চ ও উদার। ধর্ম্মবিশেষ কয়েক দেশে স্বসেবকমণ্ডলীর ভিতর একপ্রকার মতামত ও রীতিনীতি স্থাপন পূর্ব্বক উহাদিগকে অপূর্ব্ব সহানুভূতি শৃঙ্খলে আবদ্ধ করতঃ যে জাতীয়তা বর্দ্ধন করে, উহাকে সেই সকল দেশের শাসনতন্ত্র স্বাভিপ্রায়সাধনোদ্দেশে সঙ্কীর্ণ করিতে চেষ্টা পায়। ইহার জন্য দুই নিকটবর্ত্তী দেশ এক ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও শাসনতন্ত্রানুসারে উহাদের জাতীয়তা বিভিন্ন হইয়া থাকে এবং রাজনীতি লইয়া নানা সময়ে নানা কারণে উহারা বিবাদবিসম্বাদে লিপ্ত হয়। দেখ, সুসভ্য ইউরোপের সুসভ্য জাতিবর্গ এক খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইলেও উহাদের প্রত্যেকের জাতীয়তা অন্যান্য কারণে পৃথক এবং নানা সময়ে উহারা যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হয়।

যেমন রাজ্যবিশেষের পতাকা বৈশেষিক চিহ্নে চিহ্নিত ও উহার সৈন্যসামন্ত বৈশেষিক বেশভূষায় বিভূষিত বলিয়া উহারা অপর রাজ্যের পতাকা ও সৈন্যসামন্ত হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, সেইরূপ এক রাজার প্রজাবর্গ পরিচ্ছদাদি বিষয়ে বৈশেষিক প্রথা অবলম্বন

করিয়া অন্যান্য জাতি হইতে পৃথক থাকিতে চেষ্টা পায়। এস্থলে দেশবিশেষে বা জাতিবিশেষে পরিচ্ছদাদি বিষয়ে যে সকল বিভিন্ন প্রথা প্রচলিত হয়, জনসাধারণ তাহাই সর্ব্বান্তঃকরণে পালন করিয়া স্বজাতির জাতীয়তা রক্ষা করে। সচরাচর দেখা যায়, প্রত্যেক দেশের জনসাধারণ পরিচ্ছদাদি বিষয়ে বৈশেষিক প্রথা অবলম্বন করিয়া স্ব স্ব জাতীয়তা রক্ষণে একান্ত যত্নবান। ইহাতে অনেকে মনে করেন, পরিচ্ছদাদি বিষয়ে যে জাতির ভিতর যেসকল বৈশেষিক প্রথা প্রচলিত, তাহাই ভালরূপ পালন করিলেই জাতীয়তা রক্ষা করা হয়। কিন্তু জাতীয়তা শব্দের এরূপ সঙ্কীর্ণ অর্থ করা কদাচ উচিত নয়।

আমাদের নিকট জাতীয়তা শব্দের প্রকৃত অর্থ কিরূপ হওয়া উচিত? যদি আমরা স্বাধীন হিন্দু রাজার অধীন হইয়া অন্যান্য হিন্দু রাজ্যের সংস্রবে থাকিতাম, আমরাও পরিচ্ছদাদি বিষয়ে শাসনতন্ত্রপ্রতিষ্ঠিত বা লোকাচারে প্রবর্ত্তিত বৈশেষিক প্রথা অবলম্বন করিয়া স্বজাতির জাতীয়তা রক্ষা করিতাম। কিন্তু জাতীয় দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা এখন বিজাতীয় বিধর্ম্মী রাজার অধীন। এখন জাতীয়তা শব্দের প্রকৃত অর্থ আমাদের নিকট বহুপ্রসারিত হওয়া উচিত। এখন কেবলমাত্র পরিচ্ছদাদি বিষয়ে বৈশেষিক প্রথা বা চিহ্ন পালন করিলেই যে আমরা স্বজাতির জাতীয়তা রক্ষণে সমর্থ হইব, তাহা নহে। এক কথায় আমাদের জাতিধর্ম্ম রক্ষা করার নাম আমাদের প্রকৃত জাতীয়তা রক্ষা।

এখন বেশ জানিবে, জাতি ও ধর্ম্ম এই দুই কথার ভিতর সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। ধর্ম্ম রক্ষা করিতে হইলে স্বধর্ম্মনির্দ্দিষ্ট যাবতীয় নিয়মাবলি, অনুষ্ঠান, পূজাপদ্ধতি ও সংস্কার সকলই বিধিবৎ পালন করা উচিত; যে সকল আচার ব্যবহার এখন দূষিত বোধ হইতেছে, উহাদের কালোচিত সংশোধন করা উচিত, যে সকল

বিশ্বাস ও মতামত আবহমানকাল হিন্দুসমাজে প্রচলিত আছে, উহাদের বিজ্ঞানসম্মত অর্থ ও প্রত্যর্থ করিয়া সম্যক পোষণ করা উচিত; যে সকল শাস্ত্র সমাজে প্রচলিত, উহাদিগকে কাল্পনিক বলিয়া উড়াইয়া না দিয়া উহাদের বিজ্ঞানসম্মত অর্থ করিয়া আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত উহাদিগকে মান্য করা উচিত। জাতি রক্ষা করিতে হইলে আমাদের অশেষকল্যাণনিদান জাতিভেদপ্রথাটী বজায় রাখা উচিত এবং যে সকল দোষে ইহা এখন দূষিত, কালের উপযোগিতানুসারে সে সকল দোষ দূর করতঃ বিবাহাদিবিষয়ে যে সকল কড়াক্রান্তি বিচার বর্ত্তমান, উহাদের কালোপযোগী সংস্কার করিয়া সমস্তই বজায় রাখা উচিত। অতএব স্থিরনিশ্চয় জানিবে, জাতিধর্ম্ম ও হিন্দুয়ানী পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখিবার নাম আমাদের জাতীয়তা সংরক্ষণ।

এই জাতীয়তা রক্ষা এখন আমাদেরই দুর্ব্বল অসহায় করে সমর্পিত। আমাদের পরাধীনা দুঃখিনী ভারতমাতা এই প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম আমাদেরই স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছেন। আমরাও ইহা সর্ব্বান্তঃকরণে পালন করিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদভাজন হইতে চেষ্টা পাইব। যদি আমরা এবিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র ঔদাস্য বা অবহেলা করি, তিনিই আমাদিগকে সহস্র অভিসম্পাত দিবেন এবং আমরাও চির-দিনের জন্য জাঁহান্নমে যাইব। এখন ভাব দেখি, আমাদের কি দুর্দ্দিন উপস্থিত! আমরা কিরূপ বিপদে পতিত। এখন আমরা বিজাতীয় বিধর্ম্মী শাসনতন্ত্রের অধীন হওয়ায় জাতীয়তা রক্ষা করা আমাদের মহাদায়। এবিষয়ে আমাদের সহিত শাসকবৃন্দের কিছু মাত্র সহানুভূতি নাই; পরন্তু তাঁহারা পরোক্ষভাবে আমাদের জাতীয়তা সংহারে একান্ত তৎপর। আমরা খৃষ্টান হইয়া তাঁহাদের চালচলন ও রীতিনীতি অবলম্বন করিলে তাঁহারা সুখী হইবেন। পাশ্চাত্য শিক্ষারূপ যে মোহিনী দূতী তাঁহারা আমাদের ঘরে ঘরে

পাঠাইয়াছেন, উহার প্ররোচনায় আমরা দিশেহারা হইতেছি ও হিন্দুয়ানী মিটাইতে বসিয়াছি।

জগতের ইতিহাস জলন্তাক্ষরে সাক্ষ্য দিতেছে যে, জেতৃ ও জিতজাতি একস্থানে বহুকাল বসবাস করিলে একত্র মিশ্রিত হইয়া যাইবে এবং জিতজাতি সেইসঙ্গে নিজের জাতীয়তা ও অস্তিত্ব হারাইয়া বসিবে। এই ঐতিহাসিক মহাসত্য যেন আমাদের মনে চির জাগরূক থাকে। এ কথা যেন আমরা কস্মিন কালে বিস্মৃত না হই। ইংরাজরাজ ভারতের বহির্জগত জয় করিয়াছেন বটে; কিন্তু ইহার মনোজগৎ জয় করিবার এখনও অনেক বিলম্ব আছে। যে জাতি ত্রিংশ শতাব্দী ব্যাপিয়া নিজের জাতীয়তা সম্যক অনুশীলন করিয়া আসিতেছে, দুই তিন শতাব্দীতে সে জাতির জাতীয়তা কে সংহার করিতে পারে?

যে দিন দেখিবে,ভারত নিজের জাতীয়তা হারাইল ও জাতিধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিল, সেইদিন জানিবে ইংরাজরাজ ভারতের মনোজগৎ জয় করিলেন। জেতৃজাতি জিতজাতির সর্ব্বস্ব শোষণ করিতে পারে, ইহাকে দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে পারে, ছিন্নপক্ষ পক্ষীর ন্যায় যবস্থবে রাখিতে পারে, এমন কি অনশনেও মারিতে পারে। কিন্তু যদি জিতজাতি ধর্ম্মবলে বলীয়ান হয়, যদি ইহার ধর্ম্ম জেতৃ জাতির ধর্ম্ম অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট হয়, জেতৃজাতি কদাচ জিত জাতির জাতিধর্ম্ম সংহার করিতে পারিবে না।

সংসারে পাশববল বুদ্ধিবলের নিকট চিরদিন পরাস্ত হইতেছে। আবার বুদ্ধিবলও করুণাময় ঈশ্বরের ধর্ম্মরাজ্যে ধর্ম্মবলের নিকট পরাস্ত হইতেছে। হিন্দু চিরদিন ধর্ম্মবলে বলীয়ান বলিয়াই বৌদ্ধ ও মুসলমান ধর্ম্ম দেড়হাজার বৎসরেও ইহার জাতীয়তা নাশ করিতে সমর্থ হয় নাই। আজ ইহার চিরন্তন ধর্ম্মভাব শিথিল বলিয়া ইহার জাতিধর্ম্ম রসাতলে যাইবার উপক্রম। এখন আমরা যদি ধর্ম্মবলে

পুনরায় বলীয়ান হই এবং সমাজনেতা ব্রাহ্মণগণ কালোচিত উন্নতি সাধন করিয়া পুনরায় ব্রহ্মতেজে ও ব্রহ্মবর্চ্চে বলীয়ান হন, ইংরাজ-রাজ সহস্র চেষ্টা করিয়াও একমাত্র পাশ্চাত্য শিক্ষা বলে আমাদের জাতিধর্ম্ম কদাচ নাশ করিতে পারিবেন না।

ওহে নবযুগের শিক্ষিত নব্যসম্প্রদায়গণ! তোমরা অশেষ পাশ্চাত্য শিক্ষায় বিভূষিত হইয়া সভ্য ও ভব্য হও, ইহাতে ভারতের মঙ্গল। তোমরা বিজাতীয় বেশভূষা পরিধান করিয়া বাহ্যদর্শনে ইংরাজ সাজ, তাহাতে সমাজের বিশেষ ক্ষতি নাই। কিন্তু করযোড়ে মিনতি, মনের ভিতর ইংরাজ সাজিওনা ও ইংরাজী আবভাবের পক্ষপাতী হইও না এবং হৃদয়রাজ্য চিরদিন হিন্দুত্বে পূর্ণ রাখ। এই জাতীয় অধঃপতনের দিনে সুশিক্ষা পাইয়া জাতীয় উন্নতিসাধন করা যেমন আবশ্যক, প্রাণপণে ও সর্ব্বান্তঃকরণে জাতীয়তা রক্ষা করাও তোমাদের তেমনি আবশ্যক। তোমরা কি এখন এতদূর অধঃপতিত, যে তোমরা তোমাদের জাতীয় পূর্ব্বগৌরব বিস্মৃত হইয়া নবোত্থিত ম্লেচ্ছজাতির জাতীয়তা গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে সার্থকজন্মা জ্ঞান করিবে? ইহাই যদি তোমাদের মানস হয়, তোমরা অচিরে জাঁহান্নমে যাইবে। মনে রাখিবে, এ জগতে কোন জাতি চিরদিন সম সুখে যাপন করিতে পারে না বা চিরদিন স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে না। জাতীয় দুরদৃষ্টবশতঃ আজ তোমরা অপর জাতির পদানত। জাতিধর্ম্ম রক্ষা করিয়া জাতীয় উন্নতিসাধন করিলে এ দুঃসময় অতীত হইবে এবং তোমরাও জগতে পুনরায় জাতীয় পূর্ব্বগৌরব প্রকাশ করিতে পারিবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

হিন্দু-পরিবার ও হিন্দুসমাজের উপর হিন্দুধর্ম্মের অনুশাসন।

হিন্দুধর্ম্ম চিরদিনই স্বপরিবার ও স্বসমাজকে সুচারুরূপে পরিচালিত করিয়া আসিতেছে। ধর্ম্মমাত্রেই স্বসমাজের পারিবারিক সংস্থান অটুট রাখিবার জন্য কত সদুপায় অবলম্বন করে, কত নিয়মাবলি প্রবর্ত্তন করে? কিন্তু এ বিষয়ে হিন্দুধর্ম্ম যেরূপ স্বর্গীয় ও মহোচ্চ ভাব দেখাইয়াছে, এতদূর জগতের কোন ধর্ম্ম দেখাইতে পারে নাই। হিন্দুসমাজের পারিবারিক ভাব যতদূর স্ফুরিত ও বিকসিত, অন্য কোন মানবসমাজ এতদূর উন্নত ভাব প্রদর্শন করিতে পারে নাই।

এই যে আমরা দুর্গারূপে বা কালীরূপে পরব্রহ্মের আদ্যাশক্তি মহামায়াকে মা! মা! বলিয়া অশেষ ভক্তিভাবে চিরদিন ডাকিতেছি, ইহাতেই আমাদের মাতৃভক্তি ভগবতীর নামে উথলিয়া উঠিতেছে ও হৃদয়মাঝারে সম্যক স্ফুরিত হইতেছে। এই যে আমরা শিবশঙ্কর রূপে ঈশ্বরকে বাবা বলিয়া অশেষ ভক্তিভাবে চিরদিন ডাকিতেছি, ইহাতেই আমাদের পিতৃভক্তি ঈশ্বরের নামে উথলিয়া উঠিতেছে ও হৃদয়মাঝারে সম্যক স্ফুরিত হইতেছে। এই যে আমরা শ্রীকৃষ্ণরূপে ঈশ্বরকে জগন্নাথ ভাবিয়া অশেষ প্রেমভাবে ডাকিতেছি ও প্রেম ডোরে বাঁধিতেছি, ইহাতেই আমাদের প্রেম ও ভালবাসা ঈশ্বরের নামে উথলিয়া উঠিতেছে ও হৃদয়ে সম্যক স্ফুরিত হইতেছে। এই যে আমরা রামায়ণ, মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবত চিরদিন পাঠ করিতেছি বা কথকঠাকুরের মুখে শুনিতেছি, ইহাতেই আমাদের পারিবারিক ভাবরসের ফোয়ারা ছুটিতেছে।

যথার্থ বলিতে কি, ধর্ম্মাত্মা হিন্দুর পিতৃমাতৃভক্তি, অপত্যস্নেহ,

সৌভ্রাত্র ও দম্পতিপ্রেম এবং হিন্দুরমণীর পতিপরায়ণতা, সতীত্ব, অপত্যস্নেহ ও নৈষ্ঠিকতা যতদূর স্ফুরিত, এমন মহোচ্চ ধর্ম্মভাব কোন জাতির ভিতর দেখা যায় না। সকল দেশের রীতিনীতি তন্ন তন্ন করিয়া পর্য্যালোচনা কর, বুঝিতে পারিবে, হিন্দুজাতি এ বিষয়ে অপরাপর জাতি অপেক্ষা কত উচ্চআসনে প্রতিষ্ঠিত ও কত শ্রেষ্ঠ।

তাহার সাক্ষ্য দেখ, খৃষ্টান জাতিদের পারিবারিক ভাব কিরূপ অবিকসিত। উহারা স্ত্রী পুত্র লইয়াই একত্র বসবাস করে, পিতামাতা ও অন্যান্য স্বজনবর্গের সহিত উহাদের তাদৃশ সহানুভূতি নাই। যদি এক ভ্রাতা লক্ষপতি হন ও অপরভ্রাতা দীনদরিদ্র হয়, লক্ষপতি একবারও দরিদ্র ভ্রাতার দিকে উঁকি মারিবেন না। যদি দরিদ্র ভ্রাতা কোন কর্ম্মোপলক্ষে ধনাঢ্য ভ্রাতার গৃহে আইসে, সেখানে সে হুকা পাইবে না, বসিবার স্থানও পাইবে না; উহার ছেলেরা তাঁহার দ্বারদেশ মাড়াইতেও সাহস করিবে না। এমন অপরূপ দৃশ্য কি কেহ হিন্দুসমাজে দেখিয়াছেন? এদেশে একভ্রাতা লক্ষপতি হইলে অপরাপর ভ্রাতাগণ তাঁহার উপার্জ্জিত ধনের অংশীদার হয় এবং উৎসবে ও ব্যসনে সকল সময়ে তাঁহারা তাঁহার প্রাণান্ত সেবা করে।

যখন ইংরাজি ভাষায় এক নেফুই (Nephew) শব্দে ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভাগিনেয় উভয়কে বুঝায় এবং এক কজিন (Cousin) শব্দে মাসতুতা, পিসতুতা, জ্যাঠতুতা খুড়তুতা প্রভৃতি সকল ভ্রাতাকে বুঝায়, তখন বুঝা উচিত, ইংরাজদিগের পারিবারিক সম্বন্ধ বড় শিথিল। ইংরাজ বালক বালিকাগণ বাল্যকাল হইতেই পিতামাতা হইতে দূরে থাকে। এজন্য উহাদের পিতৃমাতৃভক্তি ভালরূপ স্ফুরিত হয় না। অপরপক্ষে ধর্ম্মাত্মা হিন্দু কি পিতামাতা, কি ভ্রাতাভগিনী, কি স্ত্রীপুত্র, কি অন্যান্য আত্মীয় স্বজন, সকলের সহিত অপূর্ব্ব সহানুভূতিশৃঙ্খলে চিরদিন আবদ্ধ থাকেন এবং সকলের জন্য তাঁহার মনপ্রাণ সমভাবে চিরদিন কাঁদিতে থাকে।

একজন ইংরাজ একমাত্র স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণের জন্য যেরূপ বিব্রত, একজন হিন্দু পরিবারস্থ পরিজনবর্গের ভরণপোষণের জন্য তেমনি বিব্রত। উহাদের সকলের জন্য তিনি চিরদিন সমভাবে ভক্তি, স্নেহ ও ভালবাসা দেখান। তিনি সকলের জন্য দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জ্জন করেন। যে পিতামাতার নিকট তিনি অশেষ ঋণে আবদ্ধ, তাঁহাদের প্রতি তিনি অলৌকিক ভক্তিরসে পরিপ্লুত থাকেন। তাঁহাদের মৃত্যু হইলে তাঁহাদের ঋণ পরিশোধনার্থ তাঁহাদের আদ্যশ্রাদ্ধে তিনি অকাতরে বিস্তর ব্যয়ভূষণ করেন। সহোদর ও সহোদরার জন্য তিনি অশেষ ত্যাগস্বীকার ও কষ্ট-স্বীকার করেন। হিন্দুরমণীর অলৌকিক পতিভক্তি, পতিসেবা, পতিপরায়ণতা ও সতীত্ব, যেজন্য এমন দুর্দ্দিনেও আমরা স্ত্রী-পুত্র লইয়া সুখসাগরে ভাসিতেছি, এমন কোন্ জাতি এ জগতে দেখাইতে পারে? একমাত্র হিন্দুধর্ম্মের গুণে আমাদের পারিবারিক ভাব এত অধিক স্ফুরিত ও বিকসিত হইয়াছে।

কি মুসলমান, কি খৃষ্টান, কি বৌদ্ধ, সকল ধর্ম্মই এ বিষয়ে হিন্দু-ধর্ম্মের নিকট সুদূরে পরাহত জানিবে। এই পারিবারিক ভাবের সম্যক স্ফূর্ত্তির জন্য এ ধর্ম্ম ঈশ্বরের নানারূপ দেখায় এবং তাঁহাকেই সকল বিষয়ে আমাদের পূর্ণ আদর্শ করে। তাঁহারই ভিন্ন ভিন্ন অবতার ও মূর্ত্তির ভিন্ন ভিন্ন লীলা শ্রবণ করিয়া আমরা চিরদিন পারিবারিক ভাবরসে ভাসিতেছি। যে রামায়ণ ও মহাভারত আমরা চিরদিন পাঠ করি, উহাদেরই গুণে আমাদের পারিবারিক ভাব এত অধিক স্ফুরিত হইয়াছে। বলি, হিন্দুসমাজের সেই চিরন্তন বিশুদ্ধ ধর্ম্মভাব এখন কোথায়? বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, পাশ্চাত্য কুশিক্ষা বশতঃ যে পাশ্চাত্য কালস্রোত খরবেগে সমাজে বহমান, উহার অনিবার্য্যবেগ বশতঃ আমাদের পারিবারিক সংস্থানের মূলদেশ উৎপাটিতপ্রায়; আর কিছুদিন পরে এ ধর্ম্মভাব সেই

কালস্রোতে ভাসিবে, তৎপরে বঙ্গোপসাগরে বহিয়া যাইবে। তখনই আমরা সকলে স্ত্রী পুত্র লইয়া সুখে কালাতিপাত করিব।

পাশ্চাত্য কুশিক্ষাবশতঃ এখন আমাদের পিতৃমাতৃভক্তি, সৌভ্রাত্র, ভগিনীস্নেহ ও পতিপরায়ণতা সকলই সমাজে মন্দীভূত হইতে চলিল। শিক্ষিতা নব্যা প্রেয়সীর উত্তেজনায় স্বজনবর্গ আজ গৃহ হইতে বিতাড়িত হইতেছে। কোথা হইতে এক পরের কন্যা আসিয়া আমাদের হৃদয়রাজ্য অধিকার করে এবং স্বজনবর্গকে একে একে দূরীভূত করে। হায়! সমাজের কি শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত! আজকাল সমাজের কত অকালকুষ্মাণ্ড বিবিজানের কু-পরামর্শে বৃদ্ধ পিতামাতার গ্রাসাচ্ছাদন বন্ধ করিয়া উহাদের মনে কিরূপ যন্ত্রণা দিতেছে। দরিদ্র ভ্রাতাকে একান্ন হইতে পৃথক্ করিয়া কিরূপ কষ্ট দিতেছে। এ সকল ভাবিলে কোন্ ধর্ম্মাত্মা হিন্দুর অশ্রুজল হৃদয়শোণিতরূপে প্রবাহিত না হইবে?

সমাজের যে ধর্ম্মভাব, যে পারিবারিক ভাব মন্দীভূত, তাহা কি আর পুনঃ স্থাপিত হইবে? একবার ভাব দেখি, কত কালব্যাপিনী জাতীয় সাধনার গুণে এ ধর্ম্মভাব হিন্দুসমাজে এতদূর স্ফুরিত ও বিকসিত হইয়াছে। কি পরিতাপের বিষয়। এ ধর্ম্মভাব কত অল্প সময়ের মধ্যেই সমাজ হইতে বিদূরিত হইতে চলিল। হায়রে ধর্ম্মনীতিবিবর্জ্জিতে পাশ্চাত্য বিদ্যে। তোর হলাহল পান করিয়াই সোনার ভারত আজ ছারেখারে যাইতে বসিয়াছে।

হিন্দুসমাজের উপর হিন্দুধর্ম্মের অনুশাসনও অপরূপ ও অলৌকিক। ধর্ম্মমাত্রেই স্বসমাজকে ভালরূপ বাঁধিতে চেষ্টা পায়। কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম স্বসমাজকে যেরূপ অষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধন করিয়াছে, এমন কোন ধর্ম্মে দেখা যায় না। ইহার বাহ্য সীমা নির্দ্ধারিত করিয়া এ ধর্ম্ম ইহার অভ্যন্তরীণ সীমাগুলি প্রকৃষ্ট পদ্ধতিতে নিরূপিত করিয়াছে। ইহার অশেষ মঙ্গলের জন্য যে সকল সদনুষ্ঠান অত্যাবশ্যক, তাহাতে

মহাপুণ্য নির্দ্দেশ করতঃ সকলকে ধর্ম্মভাবে, নিঃস্বার্থভাবে তৎ সম্পাদনে নিয়ত প্রোৎসাহিত করিতেছে। যথার্থ বলিতে কি, এধর্ম্ম স্বসমাজকে যেরূপ ধর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছে, ইহাকে যেরূপ আনন্দোৎসবে উৎফুল্ল করাইতেছে, ধর্ম্মোন্নতির জন্য যে সকল ক্রিয়া-যোগাদি উপদেশ দিতেছে, তাহা ভাবিলে কাহার না শরীর রোমাঞ্চিত হইবে? সমাজের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের জন্য এ ধর্ম্ম যে সকল ক্রিয়াযোগ উপদেশ দিয়াছে ও যে সকল রীতিনীতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছে, তাহা এজগতে অতুলনীয়। অধিক আর কি বলিব, যদি তোমাদের বোধশক্তি থাকে, ঐ সকল বুঝিয়া নিজ বোধ-শক্তি চরিতার্থ কর; দর্শনশক্তি থাকে, ঐ সকল দেখিয়া নয়ন সার্থক কর।

এখন হিন্দুধর্ম্মের সামাজিক রূপের সাধারণ নিয়ম বর্ণন করিতেছি। এ ধর্ম্ম স্বসমাজকে দুর্লঙ্ঘ্য অবরোধে বেষ্টিত করিয়াছে। এই দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরের মধ্যে যে দ্বারদেশ বর্ত্তমান, তাহা ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ। অভ্যন্তরের লোক সে দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া অনায়াসে বহির্দ্দেশে যাইতে পারে; কিন্তু বহির্দ্দেশস্থ কোন লোক সহজে সে দ্বারদেশ অতিক্রম করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না। হিন্দুসমাজের লোক স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অনায়াসে অন্য ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে পারে; কিন্তু অন্য ধর্ম্মের কোন লোক সহজে হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া হিন্দুসমাজভুক্ত হইতে পারে না।

যেমন কল্‌মা পড়াইলেই মুসলমান হয়, জরডান নদীর জলে অভিষিঞ্চন করিয়া দীক্ষা দিলেই খৃষ্টান হয়, হিন্দু করিবার তেমন কোন সহজ উপায় নাই। গঙ্গাজলে অভিষিঞ্চন করিয়া কর্ণমূলে মন্ত্র ফুঁকিলেই হিন্দু হয় না। পরন্তু হিন্দুজাতির আচারব্যবহার ও মতামত পুরুষানুক্রমে পালন করিতে করিতে লোকে কালবশাৎ এ ধর্ম্মের ক্রোড়দেশে আশ্রয় লাভ করে। এই প্রকারে পুরাকালে

শক, হুন, সিথিয়ান প্রভৃতি জাতিবর্গ কালক্রমে হিন্দুসমাজভুক্ত হইয়া গিয়াছে।

অনেকে হিন্দুধর্ম্মের এই কঠোর বিধানের জন্য বিস্তর নিন্দাবাদ করিয়া থাকেন। তাঁহারা ভাবেন, যে ধর্ম্ম মানবের পতিত-পাবন ও পরিত্রাতা, সে ধর্ম্ম কি সকলের জন্য নিজ দ্বারদেশ অবারিত করিয়া রাখিবে না? যদি কেহ ভক্তি ও শ্রদ্ধা পূর্ব্বক হিন্দুধর্ম্মের ক্রোড়দেশে আশ্রয় লইতে চান, এ ধর্ম্ম কি তাঁহার জন্য নিজ ক্রোড়-দেশ বিস্তার করিবে না? ইহা কি এ ধর্ম্মের সুবিচার? এরূপ ব্যবস্থা কি ন্যায়সঙ্গত বা যুক্তিসঙ্গত? দেখ বৌদ্ধ, খৃষ্ট ও মুসলমান প্রত্যেক ধর্ম্মই অন্যধর্ম্মাবলম্বীদিগকে নিজ ক্রোড়দেশে আশ্রয় লইবার জন্য সাগ্রহে ও সাদরে আহ্বান করিতেছে। তবে কেন একমাত্র অসার হিন্দুধর্ম্ম অন্যান্য ধর্ম্মের প্রতি স্বীয় দ্বারদেশ এমন কঠোর ভাবে চিরদিন অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে?

এস্থলে হিন্দুধর্ম্মের গূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতেছি, মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন। এবিষয়ে ইহার কিছুমাত্র অপরাধ বা অবিচার নাই; বরং ইহাতেই ইহার মহোচ্চ ভাব প্রদর্শিত হইয়াছে। যে হিন্দুধর্ম্ম প্রকৃতির সনাতন অকৃত্রিম ধর্ম্ম, যে ধর্ম্ম নানাবিষয়ে প্রকৃতির অনুকরণ করিয়া একমাত্র প্রকৃতির সেবা করে, সেই প্রকৃতি-সেবক হিন্দুধর্ম্ম এ বিষয়ে কেবলমাত্র প্রকৃতির অনুকরণ করিতেছে। প্রকৃতি যাঁহাকে উৎপাদন করিয়া হিন্দুসমাজে আনয়ন করিবে, তিনিই কেবল এ জগতে হিন্দুনামে পরিচিত হইবেন। হিন্দু করিবার ক্ষমতা সংসারে কাহারও নাই। পুরোহিতেরও নাই, অধ্যাপকেরও নাই, রাজারও নাই। কিন্তু যিনি অশেষ পুণ্যবলে হিন্দুসমাজে জন্মগ্রহণ করিয়া আজন্ম শাস্ত্রোক্ত বিবিধ সংস্কারে সংস্কৃত, পূত ও পবিত্রীকৃত হইবেন, তিনিই এজগতে হিন্দু নাম প্রাপ্ত হইবেন। হিন্দু করিবার ক্ষমতা তোমারও নাই, আমারও নাই ও কাহারও নাই।

স্বয়ং বিধাতা যাঁহাকে হিন্দু করিয়া সংসারে প্রেরণ করিবেন, তিনিই প্রকৃত হিন্দু। হিন্দু করিবার অন্য উপায় বা বর্ত্ম নাই। রে হিন্দুধর্ম্ম! বলিহারি তোমারি! তোমার কি অপার মহিমা! ভাই রে ভাই! এখন একবার ভাব দেখি, কি পুণ্যবলে তোমরা হিন্দুকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ! স্বাধীন হও বা পরাধীন হও, নিজের বংশমর্য্যাদা কদাচ ছাড়িবে না, আর হিন্দুয়ানী পূর্ণভাবে বজায় রাখিয়া নিজের হিন্দুনাম সার্থক করিবে।

যে হিন্দুধর্ম্ম কুলপরম্পরাগত জাতিভেদপ্রথা দ্বারা স্বসমাজকে স্তরে স্তরে বিভক্ত করে, সে ধর্ম্ম অন্যধর্ম্মাবলম্বী লোককে স্বীয় ক্রোড়দেশে আশ্রয় দিয়া হঠাৎ কোন্ জাতির অন্তর্ভুক্ত করিবে? যে সকল শ্রেষ্ঠ জাতি স্মরণাতীত কাল হইতে প্রতিষ্ঠিত, যাহাদের সীমা প্রকৃষ্টরূপ নির্দ্ধারিত, ঐ সকল শ্রেষ্ঠ জাতির ভিতর এ ধর্ম্ম একজন সামান্য আগন্তুককে কদাচ স্থান দিতে পারে না। ইহারই জন্য অন্য ধর্ম্মের লোক হঠাৎ এ ধর্ম্মের আশ্রয় লইতে চায় না এবং ইহাও উহাকে আশ্রয় দিতে চায় না।

খৃষ্টাদি কৃত্রিম ধর্ম্মের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া হিন্দুধর্ম্ম স্ব-সমাজের বাহ্যসীমা এতদূর নিগড় বন্ধনে অবরুদ্ধ রাখিয়াছে। স্ব-সমাজ রক্ষণার্থ এধর্ম্ম বিধর্ম্মীকে চিরদিন ম্লেচ্ছজ্ঞানে ঘৃণা করিতেছে এবং স্বসেবকমণ্ডলীর ভিতর যে পাপাত্মা ভ্রমক্রমে একবার পরধর্ম্ম অবলম্বন করিবে, এ ধর্ম্ম খড়্গহস্ত হইয়া উহাকে চিরদিনের জন্য স্ব সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে।

গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে; কিন্তু হিন্দুধর্ম্মত্যাগরূপ মহাপাপের কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত নাই। যদি তোমার বুদ্ধিভ্রংশবশতঃ একবার পদস্খলিত হইয়া তুমি পর ধর্ম্মের আশ্রয় লও, তুমি চিরদিনের জন্য স্বসন্ততিবর্গের সহিত স্বধর্ম্ম ও স্বসমাজ হইতে দূরীভূত হইবে। পরে কাতরকণ্ঠে যতই

কেন কাকুতি মিনতি কর না, তুমি ও তোমার বংশধরেরা কস্মিন কালে এ ধর্ম্মের আশ্রয় পাইবে না। নিজকৃত পাপের ফলাফল তুমি যে একেলা ভোগ করিলে, তাহা নহে; তোমার ভবিষ্যবংশধরদিগকেও পূর্ণাংশে তাহা ভোগ করিতে হইবে।

যদি ধর্ম্মবিষয়ে এমন কঠোর বিধান সমাজে প্রচলিত না থাকিত, তুমি কি আজ সপ্ত শতাব্দী ব্যাপিয়া পরাধীন থাকিবার পর স্বীয় পূর্ব্বপুরুষদিগের কীর্ত্তিকলাপ স্মরণ করিয়া বিস্ফারিত হৃদয়ে হিন্দুনামের গৌরব করিতে পারিতে? যে সকল ম্লেচ্ছ জাতিকে তুমি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেছ, নিশ্চয়ই তুমিও সেই সকল ম্লেচ্ছ জাতির অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইতে। অতএব নিশ্চয় জানিবে, সুমহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই হিন্দুসমাজের বাহ্য সীমা এতদূর নিগড় বন্ধনে অবরুদ্ধ রহিয়াছে।

যাহা হউক, বিগত সপ্ত শতাব্দী ভারতমাতা পরাধীন হওয়াতে তাঁহার অনেকানেক কৃতীপুত্র পরধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া হিন্দুসমাজ হইতে বহিস্কৃত হইয়া গিয়াছেন। এখন উঁহাদের বংশধরদিগকে পুনরায় হিন্দুধর্ম্মের ক্রোড়দেশে আনয়ন করা অতীব বাঞ্ছনীয়। ঘরের ছেলে ঘরে আসিবে, তাহাতে কাহার আপত্তি ও অমত? পশ্চিমাঞ্চলের আর্য্যসমাজ অনেক মুসলমানকে স্বসমাজভুক্ত করিতেছে। উঁহারা কালে সাধারণ হিন্দুসমাজভুক্ত হইয়া যাইবে।

যেমন সুশাসিত রাজ্য নিজের বাহ্যসীমা ভালরূপ সুরক্ষিত করিবার পর ইহার অভ্যন্তরীণ বিভাগগুলি প্রকৃষ্ট পদ্ধতিতে নির্দ্ধারিত করে, সেইরূপ হিন্দুধর্ম্ম স্বসমাজের বাহ্যসীমা ভালরূপ সুরক্ষিত করিবার পর ইহার অভ্যন্তরীণ বিভাগগুলি প্রকৃষ্ট পদ্ধতিতে নির্দ্ধারিত করিয়াছে। এই অভ্যন্তরীণ বিভাগগুলির সম্যক নির্দ্ধারণের জন্যই পরম কল্যাণকর জাতিভেদপ্রথা আবহমান কাল ভারতে সর্ব্বত্র প্রচলিত রহিয়াছে। এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রথা দ্বারা

হিন্দুধর্ম্ম একজন রাজাধিরাজ হইতে পথের কাঙ্গাল পর্য্যন্ত সমাজের যাবতীয় লোকবর্গকে একসূত্রে আবদ্ধ করিয়া সকলকে নিজ নখ-দর্পণে রাখিতেছে এবং উহাদিগকে চিরদিন সুশাসিত করিতেছে।

অন্যান্য সমাজের বাহ্যসীমা যেরূপ শিথিল, উহাদের অভ্যন্তরীণ বিভাগগুলিও তদনুরূপ অনির্দ্ধারিত। অন্যান্য ধর্ম্ম কেবল একাকার ও একছত্র করিবার জন্য এ সকল বিষয়ে এমন শৈথিল্য ও বিশৃঙ্খলতা দেখায়। প্রকৃতির বিপক্ষে গমন করিয়া যে কৃত্রিম সভ্যতাবর্দ্ধনের জন্য উহারা সতত প্রয়াসী, সেই সভ্যতার খাতিরে নিজ দলপুষ্টির খাতিরে উহারা সমাজের বাহ্য ও অভ্যন্তরীণ সীমা-গুলি এমন শিথিল ও বিশৃঙ্খল রাখিতে বাধ্য হয়; কিন্তু প্রকৃতি-সেবক হিন্দুধর্ম্ম এ বিষয়ে নিজ উপাস্য দেবী প্রকৃতির সম্যক অনু-করণ করিতেছে।

যেমন প্রকৃতি জীবজগৎ ও উদ্ভিজ্জজগতের যাবতীয় অধিবাসি-বর্গকে ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিভক্ত করিয়া উহাদের সীমা চিরদিনের জন্য নিরূপিত করত প্রত্যেককে জগতে সম্পূর্ণরূপে বিশিষ্ট ও বিভিন্ন রাখে; সেইরূপ হিন্দুধর্ম্মও সমাজের যাবতীয় অধিবাসিবর্গকে ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিভক্ত করিয়া উহাদের সীমা চিরদিনের জন্য সম্যক নির্দ্ধারিত করত প্রত্যেককে সংসারে বিশিষ্ট রাখিতে সাধ্যমত চেষ্টা পায়। এমন উৎকৃষ্ট সমাজবিভাগপদ্ধতি কোন ধর্ম্ম কোন কালে কোন দেশে ভাবিতে পারে নাই।

যে সমাজ যেরূপ ধর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ, সে সমাজ ধর্ম্মপথে তেমনি অগ্রসর হইবে, ইহার বলবীর্য্য ও সুখসম্ভার তেমনি বর্দ্ধিত হইবে, ইহার মঙ্গলও তেমনি নানাদিকে সাধিত হইবে। ইহারই জন্য হিন্দুধর্ম্ম সমাজের অশেষ মঙ্গলের জন্য যতদূরসম্ভব ইহাকে নানা-দিকে, নানাপ্রকারে ও নানাউপায়ে বাঁধিতে চেষ্টা পায়। ইহার জন্য এ ধর্ম্ম তোমার জীবনের প্রত্যেক কর্ম্মের উপর, সমাজের প্রত্যেক

রীতিনীতির উপর ও দেশের প্রত্যেক আচার ব্যবহারের উপর হস্তক্ষেপ করিয়া স্বীয় প্রীতিপ্রদ অনুশাসন চিরদিন পূর্ণমাত্রায় চালায়। এই প্রকারে এ ধর্ম্ম তোমার জীবনের প্রত্যেক কর্ম্ম চালাইয়া তোমার পতিত মানবজীবনকে প্রকৃতরূপ ধর্ম্মময় করিতেছে, সমাজের প্রত্যেক রীতিনীতি চালাইয়া ইহাকে প্রকৃত ধর্ম্মপথের পথিক করিতেছে; দেশের যাবতীয় আচার ব্যবহারকে সুচারুরূপে চালাইয়া উহাদিগকে সকলের অপার আনন্দদায়ক ও অশেষ সুখবর্দ্ধক করিতেছে।

তাহার সাক্ষ্য, গ্রামের মঙ্গলের জন্য জলাশয়প্রতিষ্ঠায় এ ধর্ম্ম মহাপুণ্য নির্দ্দেশ করে। এতকাল ইহার আদেশ মতে কত নৈষ্ঠিক হিন্দু নানাস্থলে নানা জলাশয় প্রতিষ্ঠা করত অক্ষয় পুণ্যলাভ করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে দেশের কত মঙ্গল, তাহা কি তোমরা একবার ভাবিয়া দেখিবে? গ্রামে গ্রামে তড়াগ, ব্যাপী পুষ্করিণী ও কূপ খনিত হওয়াতে সমগ্র দেশ সুজলা ভূমি এই আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং লোকের জলকষ্ট আদৌ নাই বলিলেই হয়। আমাদের সুশিক্ষিত বান্ধবগণ বলিবেন, জলাশয় প্রতিষ্ঠায় পুণ্য আবার কি? ইহাতে দেশের কিঞ্চিৎ মঙ্গল হয় মাত্র। তাঁহাদের নয়নসমক্ষে ইংরাজেরা সুসভ্য দেশের প্রথানুসারে নগরে নগরে বিশুদ্ধ পানীয় জল পয়ঃপ্রণালী যোগে সরবরাহ করিতেছেন। ইহাতে তাঁহারা ভাবেন, সামান্য জলাশয় প্রতিষ্ঠায় দেশের কত মঙ্গল হইবে? জলের কল স্থাপনেই দেশের প্রকৃত মঙ্গল। এ জন্য যে ধর্ম্ম জলাশয় প্রতিষ্ঠায় মহাপুণ্য নির্দ্দেশ করে, উহার কথা তাঁহারা উড়াইয়া দিবেন।

স্বসমাজের অশেষ সুখবর্দ্ধনের জন্য হিন্দুধর্ম্ম নানা মহোৎসব প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। ঐ সকল বিধিবৎ পালন করিয়া সমাজ যেরূপ আনন্দে উৎফুল্ল হইতেছে, এমন কুত্রাপি নয়নগোচর হয় না। এই

পাপতাপপূর্ণ ভবসংসারে আসিয়া মানব কেবল অশেষ জ্বালা ও যন্ত্রণায় অস্থির হন। তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় কেবল রোগশোকে অতিবাহিত হয়। এখন তাঁহার দুঃখময় জীবনকে প্রকৃত সুখময় করিবার জন্য এধর্ম্ম নানা উপায় অবলম্বন করে, নানাদিকে নানা আনন্দের উৎস উদ্‌ঘাটিত করে এবং বৎসরের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তাঁহাকে বিবিধ উৎসবে উৎফুল্ল করাইয়া জীবনের শোকরাশি ও দুঃখরাশি ভুলাইয়া দেয়।

সামাজিক ধর্ম্মপালনে এ ধর্ম্মের অতীব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। এ বিষয়ে হিন্দুধর্ম্ম কাহাকেও অণুমাত্র স্বাধীনতা বা যথেচ্ছাচারিতা প্রদান করে নাই। ধর্ম্মের মতামত, বিশ্বাস ও পূজাপদ্ধতি সম্বন্ধে এ ধর্ম্ম বিবিধ মার্গ উপদেশ দেয় ও বিবিধ সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করে। শিক্ষা, দীক্ষা, সংস্কার ও অভিরুচি অনুসারে যিনি যে কোন মার্গ অবলম্বন করুন না কেন, ধর্ম্ম কাহারও উপর কোনরূপ ওজর বা আপত্তি উত্থাপন করিবে না। কিন্তু সামাজিক বিষয়ে এ ধর্ম্ম চিরদিন সকলের উপর খড়্গাহস্ত; যে স্থলে কোন লোকের পদদ্বয় ঈষন্মাত্র স্খলিত হইতে দেখে, তৎক্ষণাৎ তাহা কর্ত্তন করিয়া ফেলে।

যে সকল রীতিনীতি ও আচারব্যবহার সামাজিক নির্ব্বাচনে স্মরণাতীত কাল হইতে সমাজে প্রতিষ্ঠিত ও ইহার পরম কল্যাণকর, তৎপ্রতিপালনে সকলকে সমভাবে প্রোৎসাহিত করিবার জন্য এ ধর্ম্ম সামাজিক বিষয়ে এত কঠোর ভাব ধারণ করিয়াছে ও এত কড়াক্রান্তি বিচার করিতেছে। ধর্ম্মজগতের নিয়ম এই, যে সমাজ যত উচ্ছৃঙ্খল ও যথেচ্ছাচারী, সে সমাজ তত ক্ষীণবীর্য্য ও তত অল্প কারণে ধ্বংস পাইবার সম্ভাবনা: কৃত্রিম ধর্ম্মের অত্যাচারে ও উৎপীড়নে ব্যতিব্যস্ত হইয়া নিজের অস্তিত্ব ও স্বজাতির জাতীয়তা পূর্ণ মাত্রায় রক্ষা করিবার জন্য এ ধর্ম্ম খড়্গাহস্ত হইয়া সামাজিক ধর্ম্মপালনে এত কঠোর নিয়ম করিতে বাধ্য হইয়াছে। এ বিষয়ে এমন কঠোর

ব্যবস্থা না থাকিলে হিন্দুধর্ম্মও হিন্দুজাতি কালের কঠিন হস্তে পতিত হইয়া ভূপৃষ্ঠে লয় প্রাপ্ত হইত। অতএব বেশ জানিবে, সুমহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই এ বিষয়ে এ ধর্ম্ম এত কঠোর ভাব ধারণ করিয়াছে।

যে ধর্ম্ম একদিকে সামাজিক ধর্ম্ম পালনে এত কঠোর ও অনুদার, সে ধর্ম্ম আবার অপর দিকে চিরকাল কালোচিত ও দেশোচিত। ইহাতে ইহার স্থিতিস্থাপকতা সম্যক বৰ্দ্ধিত হইয়াছে। যে সময়ে যে প্রদেশে সাধারণ লোকের যেরূপ বিশ্বাস ও আচার ব্যবহার লোকপরম্পরায় চালিত হইয়া সামাজিক নির্ব্বাচনে প্রতিষ্ঠিত হয়, এ ধর্ম্ম চিরদিনই উহাদের গুণকীৰ্ত্তন করিয়া উহাদিগকে সমাজে আরও বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছে। যে ধর্ম্ম পাঞ্জাবের হিন্দুসমাজকে মুসলমানদিগের সংস্রবে অনেক বিষয়ে হিন্দুয়ানী ত্যাগ করিয়া ম্লেচ্ছ ভাব অবলম্বন করিতে দেখিয়াছে, যে ধর্ম্ম আজকাল বঙ্গের শিক্ষিত সমাজকে ইংরাজদিগের সংস্রবে অখাদ্য ভোজন করিতে দেখিয়াও ধৈর্য্যালম্বন পূর্ব্বক নয়নদ্বয় নিমীলিত করিতেছে, যে ধর্ম্ম পুরাকালে বৌদ্ধদিগের পরমপূজ্য বুদ্ধদেবকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া মান্য করিয়াছে এবং গয়া শ্রীক্ষেত্রাদি বৌদ্ধতীর্থগুলিকে নিজের প্রধান তীর্থ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, সে ধর্ম্মের স্থিতিস্থাপকতা যে কত প্রবল এবং তজ্জন্য ইহার অন্তর্নিহিত শক্তিও যে কত প্রবল, তাহা বুঝিতে সকলের চেষ্টা করা উচিত।

এই স্থিতিস্থাপকতা গুণ থাকাতেই এ ধর্ম্ম পঞ্চ শতাব্দী ব্যাপিয়া প্রবলপ্রতাপান্বিত মুসলমান ধর্ম্মের সহিত ঘোরতর সংগ্রামে লিপ্ত হইয়া পরিশেষে জয়লাভ করিতে সমর্থ হয়। যদি এ ধর্ম্ম পুনরায় রাজশক্তির সহায়তা প্রাপ্ত হইয়া ভারতে একাধিপত্য করে, ইহা মুসলমানদিগকে স্বসমাজে সমীকৃত করিয়া লইয়া উহাদের নামগন্ধ উড়াইয়া দিতে পারে। যে বৌদ্ধধর্ম্ম সহস্র বৎসর ভারতে প্রবল

ছিল, সে ধর্ম্মের নামগন্ধ কেন ভারত হইতে চিরদিনের জন্য উড়িয়া গেল? বেশ জানিবে, একমাত্র স্থিতিস্থাপকতা গুণ থাকাতে হিন্দু-ধর্ম্ম সময়ে সময়ে দুর্ব্বল হইলেও অপর পরাক্রান্ত ধর্ম্মের পরাজয় সাধনে সবিশেষ দক্ষ।

যদি খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতে ব্রীটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত না হইয়া সর্ব্বত্র মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইত, হিন্দুধর্ম্ম রাজশক্তির পূর্ণ সহায়তা পাইয়া প্রজাবর্গের অন্তর্ভুক্ত মুসলমান জাতির উপর সকরুণ দৃষ্টিপাত করিত এবং কালক্রমে উহাদিগকে হিন্দুজাতিতে পরিণত করিয়া লইত। তৎকালে মুসলমান জাতি জৈনদিগের ন্যায় হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার অবলম্বন করিত এবং হিন্দুদেবদেবীর অনুকরণে মহম্মদ ও পীরদিগের পূজা করিতে শিখিত। তৎকালে কালোচিত হিন্দুধর্ম্মও স্বগ্রন্থে মহম্মদকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া গ্রহণ করিত এবং মহরম হিন্দুদিগেরও এক মহোৎসব হইত। তাহার সাক্ষ্য, এখন পশ্চিমাঞ্চলের হিন্দুরাজন্যবর্গ ও হিন্দু প্রজাবর্গ মুসলমানদিগের মহরমে যোগদান করিতেছে। তৎকালে দুর্ব্বল মুসলমান জাতির উপর পরাক্রান্ত হিন্দুদিগের কিছুমাত্র বিদ্বেষভাব থাকিত না। পঞ্চ শতাব্দীর ভিতর উহারা সকলে হিন্দুসমাজভুক্ত হইয়া হিন্দু হইয়া যাইত।

কিন্তু বিধাতার ভবিতব্য, ভারতের ভাগ্যনেমি বিভিন্নরূপে বিঘূর্ণিত হইল। পাণিপতের সংগ্রামে সমগ্র মহারাষ্ট্রজাতি পরাস্ত হইল, এবং উহাদের দিল্লীশ্বর হইবার আশা সুদূরে পরাহত হইল। অপর-দিকে পলাসীক্ষেত্রে ইংরাজজাতি জয়লাভ করিলেন এবং দক্ষিণে ফরাসী জাতির পতন হইল। ইহাতে বণিক-সম্প্রদায় ইংরাজ-দিগের সম্রাজ্য ক্রমশঃ ভারতে বিস্তৃত হইতে লাগিল। এখন রাজপুরুষগণ রাজ্যের মঙ্গলের জন্য ভারতশাসনে Divide and Rule এই রাজনীতি অনুসরণ করিয়া কখনও মুসলমানদিগের

গৌরব বাড়াইতেছেন, কখনও বা হিন্দুদিগের গৌরব বাড়াইতেছেন। কিন্তু মহাত্মা গাঁধির মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া উভয় জাতি কালে জাতি-বিদ্বেষ ত্যাগ করিয়া স্বরাজ পাইতে সচেষ্ট হইবে।

জগতের নিয়ম এই,উন্নতি হইলেই পতন হয় এবং পতন হইলেই উন্নতি হয়। যে হিন্দুজাতি বিগত সপ্তশতাব্দী পরাধীন ও অপরাপর জাতির পদানত, সে জাতির ভাগ্যচক্র নিশ্চয়ই পরিবর্ত্তিত হইবে এবং আমরা ভারতে পূর্ণরাজশক্তিসম্পন্ন হইব। অচিরে হউক, বিলম্বে হউক, আমাদের ভাগ্যলক্ষ্মী নিশ্চয়ই সুপ্রসন্ন হইয়া আমাদিগকে স্বরাজ দেওয়াইবে। তখন চিরস্থিতিস্থাপক হিন্দুধর্ম্ম ভারতের অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী লোকদিগকে স্বসমাজে সমীকৃত করিয়া লইবে; তখন এদেশের খৃষ্টানেরাও হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার অবলম্বন করিবে এবং খৃষ্ট স্থানে কৃষ্ণ ভজিবে। এখন এ সকল কথা উন্মত্তের প্রলাপ বলিয়া বোধ হইতেছে বটে, কিন্তু কালে ইহাই সত্য ঘটনায় পরিণত হইবে। যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের স্থিতিস্থাপকতা ভালরূপ বুঝিতে পারেন, তাঁহারা এ সকল কথা উন্মত্তের প্রলাপ বলিয়া মনে করিবেন না।

সামাজের মহোৎসব।

কি বৈদিক, কি স্মার্ত্ত, কি পৌরাণিক, সকল যুগেই সনাতন হিন্দুধর্ম্ম স্বসমাজকে অপার আনন্দে উৎফুল্ল করিবার জন্য নানা মহোৎসব প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। বৈদিক সময়ে বেদোক্ত যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া আর্য্যসমাজ যেরূপ আনন্দে উৎফুল্ল হইত, আজকাল তন্ত্রোক্ত ও পুরাণোক্ত উৎসবাদি করিয়াও হিন্দুসমাজ সেইরূপ আনন্দে উন্মত্ত হইতেছে। পুরাকালে আর্য্যনরপতিগণ অশ্বমেধাদি

যজ্ঞের অনুষ্ঠানে যেরূপ রাশি রাশি অর্থব্যয় ও অপার আনন্দলাভ করিতেন, এখনও হিন্দুনরপতিগণ ও তৎস্থানীয় জমীদারবর্গ শাস্ত্রোক্ত উৎসবাদির অনুষ্ঠানে অজস্র অর্থব্যয় ও অশেষ আনন্দলাভ করিতেছেন। পুরাকালে যজ্ঞানুষ্ঠান কালে আর্য্যসমাজ যেরূপ দীয়তাম, ভুজ্যতাম শব্দে মুখরিত হইত, এখনও মহোৎসবকালে হিন্দুসমাজ সেইরূপ দীয়তাম, ভুজ্যতাম শব্দে মুখরিত হইতেছে।

এই সকল মহোৎসব উপলক্ষে হিন্দুসমাজের গৃহে গৃহে যেরূপ সমারোহ ঘটিতেছে, আমরাও ব্রাহ্মণভোজনাদি করাইয়া যেরূপ আনন্দ ভোগ করিতেছি, তাহা এস্থলে বর্ণন করা নিষ্প্রয়োজন। বেশ জানিবে, স্বসমাজকে অতুল আনন্দে বিভোর করিবার জন্য, এই দুঃখের সংসারে সকলকে পরমানন্দে মাতাইবার জন্য এ ধর্ম্ম এত মহোৎসব প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। জগতের অন্যান্য ধর্ম্ম তন্ন তন্ন করিয়া পর্য্যালোচনা কর, বুঝিতে পারিবে, কোন দেশের কোন ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় এত মহোৎসব বিধিবদ্ধ করিয়া স্বসমাজকে এতদূর আনন্দে উৎফুল্ল করিতে পারে নাই।

বৎসরের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মহোৎসব বিধিবদ্ধ করিয়া হিন্দুধর্ম্ম স্বসমাজকে ভালরূপ ধর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ করিতেছে। যেমন ইহাদের দ্বারা সমাজের ধর্ম্মভাব একদিকে বর্দ্ধিত হইতেছে, সেইরূপ অপরদিকে ইহারা সমাজকে ধর্ম্মবন্ধনে বাঁধিতেছে। যে স্থলে খৃষ্টধর্ম্ম রবিবাসরে গির্জ্জায় দশজনকে একত্রিত করিয়া ঈশ্বরের আরাধনাদি করায় এবং মুসলমানধর্ম্ম শুক্রবারে মস্‌জিদে দশজনকে একত্রিত করিয়া ঈশ্বরের উদ্দেশে নামাজ পাঠ করায়, ঠিক সেই স্থলে সনাতন হিন্দুধর্ম্মও মন্দিরে মন্দিরে বা ধনবানদিগের চণ্ডীমণ্ডপে ঈশ্বরের উদ্দেশে দেবোৎসব করাইতেছে। ভালরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, উহাদের সকলের উদ্দেশ্য সমান। স্ব স্ব সমাজকে ধর্ম্মবন্ধনে ভালরূপ আবদ্ধ করিয়া ধর্ম্মভাব বিকীর্ণ করাই উহাদের

প্রধান উদ্দেশ্য। গির্জ্জায় ও মসজিদে ঈশ্বরভক্তি দেখান হয় বটে; কিন্তু মুখে বাগাড়ম্বরই অধিক প্রকাশ পায়। অপর পক্ষে হিন্দুধর্ম্ম মুখে কোনরূপ বাগাড়ম্বর না দেখাইয়া ষোড়শোপচারে দেবমূর্ত্তির পূজার্চ্চনা করিয়া কার্য্যতঃ ঈশ্বরভক্তি দেখাইয়া থাকে এবং সকলকে সুখাদ্য ভোজন করাইয়া অশেষরূপে পরিতৃপ্ত করায়।

গির্জ্জায় ও মস্‌জিদে পাদরি ও মৌলবির প্রমুখাৎ ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিলে যে শিক্ষা হয়, দেবমূর্ত্তির সম্মুখে কথকঠাকুরের প্রমুখাৎ অমৃতময়ী ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিলে বা যাত্রার অভিনয় দর্শন করিলে, তাহা অপেক্ষা কি অধিক শিক্ষা হয় না? বল দেখি, পাঠক! তুমি যাত্রার পালা ও কথকতা শ্রবণ করিয়া যে সুশিক্ষা পাও, সেরূপ শিক্ষা কি শত বক্তার বক্তৃতা শ্রবণে পাইবে? বক্তৃতা যেমন সকলে এক কর্ণ দিয়া শ্রবণ করে, উহা পরক্ষণেই অপর কর্ণ দিয়া বহির্গত হইয়া যায়; কিন্তু যাত্রা ও কথকতার সুশিক্ষা হৃদয়ের মর্ম্মে মর্ম্মে বিদ্ধ হয় ও তথায় স্থায়িভাবে থাকে। এখন পাশ্চাত্য সভ্যদেশের প্রথানুসারে আমাদের সুশিক্ষিত বান্ধবগণ বক্তৃতার অধিক সমাদর করিবেন বটে; কিন্তু যথার্থ বলিতে কি, এ দেশের যাত্রাও কথকতার সম্মুখে ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতা বা সারমন্ (sermon) ততদূর কার্য্যকারক নহে।

এই সকল মহোৎসব উপলক্ষে ধর্ম্মাত্মা হিন্দু চিরদিন অকাতরে ও মুক্তহস্তে বিস্তর অর্থব্যয় করিয়া দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করান, ষোড়শোপচারে উহাদের পূজা দেন, গ্রামস্থ ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য জাতিকে সুখাদ্য ভোজন করান এবং আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধব লইয়া আমোদ প্রমোদ করেন। বলি, তাঁহার এই অর্থব্যয় কি একটা অনর্থক ব্যয়মাত্র? যদি অনর্থকই না হইবে, কেন সুশিক্ষিত সম্প্রদায় আজ এ সকল ত্যাগ করিয়া এমন কৃতকৃতার্থ হইবেন?

দেখ, এ সংসারে সকলেই স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণের জন্য

অর্থোপার্জ্জন করে। এরূপ অর্থোপার্জ্জন করিতে মানবমাত্রেই বাধ্য। কিন্তু যে অর্থ ধর্ম্মোদ্দেশে দেবভক্তিপ্রদর্শনার্থ ও পর-সেবায় ব্যয় করা যায়, যে অর্থ দ্বারা পাঁচজন আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবকে সুখাদ্য ভোজন করাইয়া সুখী হওয়া যায়, যে অর্থের অংশ সমাজস্থ পাঁচজনকে বিবিধ উপায়ে দেওয়া যায়, সেই অর্থের উপার্জ্জনই আমাদের প্রকৃত অর্থোপার্জ্জন। সেই অর্থই আমরা সৎপাত্রে ব্যয় করি এবং এরূপ অর্থব্যয়েই আমাদের প্রকৃত শ্রেয়োলাভ ও পুণ্যলাভ হইয়া থাকে। ইহাতে সমাজের যেরূপ উপকার, আমাদের মনেরও তেমনি আত্মপ্রসাদলাভ ও গ্রামস্থ দশজনের নিকট তেমনি সুখ্যাতিলাভ করা যায়। অতএব বেশ জানিবে, দেবোৎসব দ্বারা হিন্দুসমাজের যে কত মহোপকার কতদিকে সাধিত হইতেছে, তাহা কে বর্ণন করিবে ?

পুরাকালে আর্য্যসমাজ বেদোক্ত বিবিধ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া মহোৎসব করিত। এই সকল মহোৎসব করিয়া স্বাধীন ভারত কিরূপ আনন্দে উৎফুল্ল হইত, তাহা হতভাগ্য পরাধীন ভারত বুঝিতে পারিবে না। আমাদের নিতান্ত পোড়া কপাল, সেজন্য যে গব্য ঘৃত আমরা চক্ষে দেখিতে পাই না, তাহাই তৎকালে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে অগ্নিতে আহুত হইত। এখন আমরা দ্বাদশটী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে কাতর হই, তৎকালে প্রত্যেক যজ্ঞে সহস্র সহস্র পংক্তিপাবন ব্রাহ্মণকে সদক্ষিণা ভোজন করান হইত। এখন ভাব দেখি, পূর্ব্বে ধর্ম্মার্থে কত অর্থরাশির ব্যয় হইত! আজ দানবীর শিলাদিত্যের সন্তোষক্ষেত্রে মহোৎসবের কথা শুনিয়া সমগ্র জগৎ স্তম্ভিত; কিন্তু কত সহস্র সহস্র শিলাদিত্য ভারতে দানোৎসব করিয়া গিয়াছেন, তাহা কি কেহ জানেন ?

যৎকালে আর্য্যনরপতিগণ মহাসমারোহে ঐ সকল মহোৎসব করিতেন, জ্ঞানগরিষ্ঠ মহর্ষিগণ ও মহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ চতুর্দ্দিক

হইতে সমবেত হইয়া সামবেদ গান করিতে করিতে অগ্নিতে হবন করিতেন এবং দর্শকবৃন্দ সতৃষ্ণনয়নে যজ্ঞানুষ্ঠান ব্যাপার দেখিতেন, তৎকালে আর্য্যসমাজে কি মনোরম দৃশ্য নানাস্থানে দেখা যাইত? সত্যবটে, বহুদিন হইতে চলিল, সে দৃশ্য ভারতে চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইয়াছে, তথাচ আজকাল যে সকল দেবোৎসব হিন্দু-সমাজে প্রচলিত দেখা যায়, উহারা পুরাকালীন মহোৎসবের ভগ্নাবশেষ মাত্র।

যাগযজ্ঞ সমাজে লুপ্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও ধর্ম্মাত্মা ব্রাহ্মণ প্রত্যহ পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন। বেদাধ্যায়ন ও বেদাধ্যাপন করিয়া ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃলোক তর্পণ করিয়া পিতৃযজ্ঞ, অগ্নিতে হবণ করিয়া দেবযজ্ঞ, ভোজনকালে বলি প্রদান করিয়া ভূতযজ্ঞ এবং অতিথিসৎকার করিয়া নৃযজ্ঞ তিনি সানন্দে সম্পাদন করিতেছেন।

ভারতের প্রত্যেক অঞ্চলে মহোৎসব লইয়া বিস্তর ইতরবিশেষ দৃষ্ট হয়। যে প্রদেশে যে মত প্রবল, তথায় তদনুসারে মহোৎসব প্রচারিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে শাক্তমত প্রবল; এ দেশে তন্ত্র-শাস্ত্রানুসারে দুর্গা,কালী, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি দেবীর মৃন্ময়ীমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়া পূজিত হইতেছে। দাক্ষিণাত্যে শৈব মত প্রবল; তথায় শিবলিঙ্গাদির প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি মন্দিরে মন্দিরে পূজিত হইতেছে। পশ্চিমাঞ্চলে বৈষ্ণব মত প্রবল, তথায় রাধাকৃষ্ণ ও সীতারামের যুগল মূর্ত্তি পাষাণে নির্ম্মিত হইয়া পুজিত হইতেছে। এইরূপ যে প্রদেশের যেরূপ শিক্ষা ও দীক্ষা এবং যে শাস্ত্রের আদর অধিক, তথায় তদনুরূপ মহোৎসব চলিতেছে। বঙ্গদেশের দুর্গোৎসব, পশ্চিমাঞ্চলের দোলোৎসব, মহারাষ্ট্র দেশের গণেশোৎসব, উড়িষ্যা-দেশের রথযাত্রা, ইহারা তৎ তৎ প্রদেশের মহানন্দদায়ক মহোৎসব। এই সব উপলক্ষে তত্রত্য জনসাধারণ আনন্দে বিভোর হইতেছে।

মন্দিরে প্রত্যহ প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি দেখিলে দেবভক্তি মনে উদিত হইবে বটে, কিন্তু একঘেয়ে বলিয়া উহাতে তাদৃশ আনন্দভোগ হইবে না। একারণ তন্ত্রশাস্ত্রানুসারে আমরা বৎসরের মধ্যে মধ্যে নিরূপিত সময়ে মৃত্তিকায় প্রতিমা গঠন করিয়া পূজা করি এবং তদুপলক্ষে পাঁচ জনকে লইয়া আমোদ প্রমোদ করি। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত, এই প্রকারে তন্ত্রোক্ত উৎসব করিয়া বঙ্গদেশ মহোৎসবের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছে। দুঃখের বিষয় অন্যান্য প্রদেশের ব্রাহ্মণগণ এ দেশের দেবদেবীর মৃন্ময়ী প্রতিমা দেখেন নাই ও স্বদেশে প্রবর্ত্তিত করেন নাই। বঙ্গবাসীর বুদ্ধি প্রখরা বলিয়া এ দেশে মহোৎসব সম্বন্ধে এত উন্নতি দেখা যায়।

আজকাল এদেশে বৎসরের দ্বাদশ মাসে ত্রয়োদশ মহোৎসব প্রচলিত, যথা :—

(১) গঙ্গাপূজা।
(২) স্নানযাত্রা।
(৩) রথযাত্রা।
(৪) দুর্গাপূজা।
(৫) লক্ষ্মীপূজা।
(৬) শ্যামাপূজা।
(৭) কার্ত্তিকপূজা।
(৮) জগদ্ধাত্রীপূজা।
(৯) রাসযাত্রা।
(১০) সরস্বতীপূজা।
(১১) দোলযাত্রা।
(১২) বাসন্তীপূজা।
(১৩) চড়কোৎসব।

বঙ্গীয় সমাজের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকে আনন্দে উৎফুল্ল করিবার জন্যই উপরোক্ত মহোৎসবগুলি বৎসরের মধ্যে মধ্যে নিরূপিত সময়ে অনুষ্ঠিত হইতেছে। পূর্ব্ববঙ্গে শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তির দিন মন্‌সা পূজা লইয়া গৃহে গৃহে বড় ধূমধাম হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত বৈষ্ণবদিগের ভিতর ফুলদোল, ঝুলনযাত্রা, গোষ্ঠ প্রভৃতি লইয়া কতকগুলি মহোৎসব প্রচলিত আছে। বঙ্গবাসীগণ এত মহোৎসব করিয়াও সন্তুষ্ট হন না। তাঁহারা গ্রামে, গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে

আবার বারোয়ারী করিয়া ধর্ম্মের নামে উৎসব করিয়া থাকেন। এই সকল বারোয়ারীতে যাত্রাদি নানা ধূমধাম চলিতেছে। অনেক স্থলে দেখা যায়, সুশিক্ষিত সম্প্রদায়, যাঁহারা একেবারে অন্ধকার হইতে আলোকে আসিয়াছেন, তাঁহারা এ সব ব্যাপারে আদৌ যোগদান করেন না। যাত্রার আসরে বসিলেই তাঁহাদের মাথা যেন কাটা যায়।

এই সকল মহোৎসব উপলক্ষে সমগ্র বঙ্গদেশে এখনও বিস্তর অর্থব্যয় হইতেছে। নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিবেন, আর কতকাল অশিক্ষিত হিন্দুসমাজ স্বার্থপর ব্রাহ্মণ জাতির আদেশমতে এই সকল বৃথা উৎসবে বৃথা অর্থব্যয় করিয়া বৃথা আমোদপ্রমোদ করিতে থাকিবে? এই অর্থরাশির সদ্ব্যবহার করিবার কি অন্য উপায় নাই? দেশহিতকর কার্য্যে মুক্তহস্ত হও, তোমার অর্থের সদ্ব্যবহার হইবে, দেশেরও মঙ্গল হইবে। সভাসমিতিতে, রাস্তাঘাট নির্ম্মাণে, দাতব্যচিকিৎসালয়, ইংরাজিস্কুল ও পুস্তকালয় স্থাপনে যথেষ্ট চাঁদা দেও, ইহাইত তোমার অর্থের সদ্ব্যবহার; তবে কেন বৃথা আমোদ প্রমোদ করিয়া অর্থরাশির এমন অপব্যয় করিতেছ? যে স্বার্থপর ব্রাহ্মণজাতি আপনাদের সামান্য স্বার্থসিদ্ধির জন্য আমাদের কষ্টের টাকার এমন অসদ্ব্যবহার করান, কবে তাঁহাদেরও সুমতি হইবে, কবে তাঁহারাও অন্ধকার হইতে আলোকে আসিবেন? এই দুঃসময়ে দেবোৎসব করিতে বলা আমাদের উপর ঘোর অত্যাচার। যাহা হউক, সুখের বিষয় তাঁহারা ক্রমশঃ সমাজ হইতে বিদায় লইতেছেন এবং তাঁহাদের পুত্রপৌত্রগণও ইংরাজ সাজিতেন।

হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যাঁহারা পরমপূজ্য ধর্ম্মযাজক ও ধর্ম্মোপদেশক অধ্যাপক ও পুরোহিতবর্গের এরূপ নিন্দাবাদ করেন, তাঁহাদিগকে কি বলা উচিত? খৃষ্টজগতের লোকেরা

পাদরিদের উপদেশ কেন শ্রবণ করে, কেন উহাদের ভরণপোষণ করে? যদি উহাদের কথা না মানিত বা উহাদের ভরণপোষণ না করিত, খৃষ্টধর্ম্ম কি রসাতলে যাইত না? যাঁহারা আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া জগতে পরিচয় দেন, হিন্দুধর্ম্মোপদেশকদের আদেশ-পালন ও ভরণপোষণ কি তাঁহাদেব অবশ্যপ্রতিপাল্য কর্ত্তব্যকর্ম্ম নহে? যখন তোমরা হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই ঈশ্বর ব্রাহ্মণপ্রতিপালন তোমাদের একটা সুমহৎ কর্ত্তব্যকর্ম্ম করিয়া দিয়াছেন। এখন শিক্ষাদোষে যদি সেই প্রকৃতিদত্ত কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা কর, তোমরা কি স্বধর্ম্মের নিকট, ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইবে না? দুঃখিনী ভারতমাতা কি তোমাদিগকে অভিসম্পাত দিবেন না? কেন জাতিধর্ম্ম আজ রসাতলে যাইবার উপক্রম?

দেখ, যে উকিল, মোক্তার ও ডাক্তারকে ফি দিতে দেশের শাসনতন্ত্র তোমাদিগকে এখন বাধ্য করায়, তোমরাও স্বেচ্ছায় হউক, নাপার্য্যমানে হউক উহাদিগকে ফি দিতেছ। তবে যে ব্রাহ্মণজাতির ভরণপোষণের জন্য হিন্দুধর্ম্ম সামান্য দক্ষিণা দিতে উপদেশ দেয়, তাঁহাদিগকে কিঞ্চিৎ কাঞ্চন মূল্য দিতে কেন তোমরা এত নারাজ হও? যদি আজ তোমাদের স্বাধীন হিন্দুরাজা থাকিতেন, তাঁহাদের কি এমন দুর্দ্দশা ঘটিত? যখন তোমরা ভগবদিচ্ছায় বিজাতীয় বিধর্ম্মী শাসনতন্ত্রের অধীন হইয়াছ, তখন আপনাদের জাতিধর্ম্ম ভালরূপ রক্ষা করিতে হইলে কায়মনোবাক্যে স্বধর্ম্মের উপদেশকবর্গের সেবা ও ভরণপোষণ করিতে হইবে। আর যদি Anglicised হইতে, ইংরাজ হইতে ইচ্ছা কর, জাতিধর্ম্ম ও পুরোহিত সকলকে রসাতলে প্রেরণ কর এবং নিজেও জাহান্নামে যাও।

পাঠক! এই যে দোলদুর্গোৎসবে তুমি বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজন লইয়া আমোদপ্রমোদ করিতেছ, ইহা কি তোমার বৃথা আমোদ

প্রমোদ ? এই যে তুমি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া শত সহস্র লোককে ভালরূপ ভোজন করাইয়া বিমল আনন্দ ভোগ করিতেছ, ইহাও কি তোমার মনের বৃথা আনন্দ? মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া তুমি যে অর্থ উপার্জ্জন কর, যদি সেই অর্থে পাঁচ জনকে লইয়া ধর্ম্মের নামে আমোদপ্রমোদ না করিলে, তুমি এ সংসারে আসিয়া কি করিয়া গেলে বল ? যদি স্বোপার্জ্জিত ধনের কিয়দংশ তুমি ধর্ম্মোদ্দেশে ব্যয় না করিলে বা পরসেবায় না লাগাইলে, কি প্রকারে তোমার পুণ্যলাভ হইবে ?

'আপদর্থে ধনং রক্ষেৎ' এই নীতি অনুসরণ করিয়া তুমি এখন ব্যাঙ্ক ঘরে টাকা জমা দেয়, কোম্পানীর কাগজ খরিদ কর, স্ত্রীলোকের আভরণ প্রস্তুত কর, লৌহসিন্দুকে টাকা ঢাল বা ঘরের মেজেয় পুতিয়া রাখ ; কঠোর আবশ্যকতায় বাধ্য হইয়া অর্থের এরূপ অসদ্ব্যবহার করিতেছ বটে ; কিন্তু সামর্থ্য থাকিতে যদি তুমি ধর্ম্মনির্দ্দিষ্ট সৎকাজ না কর, তুমি হিন্দুসমাজের নিকট, হিন্দুধর্ম্মের নিকট অপরাধী হইবে। সত্য বটে, ধর্ম্ম এ সকল দেবোৎসব তোমার অবশ্যপ্রতিপাল্য কর্ত্তব্যকর্ম্ম করিয়া দেয় নাই, সেজন্য সামর্থ সত্ত্বেও তুমি ইহাদের অনুষ্ঠানে এত ব্যয়কুণ্ঠ হইতেছ। সামর্থ্য না থাকে, তুমি পরের উৎসবে যোগদান কর এবং পরের সঙ্গে আনন্দে বিভোর হও। আর সামর্থ্য থাকে, তুমি দোলদুর্গোৎসব করিয়া পাঁচজনকে লইয়া আমোদ প্রমোদ কর। ইহাতে সমাজ মধ্যে তোমার অশেষ সুখ্যাতি হইবে, তোমার বংশ উজ্জ্বল হইবে ও তোমার অক্ষয় পুণ্যলাভ হইবে। আর যদি কুশিক্ষা পাইয়া এ সকল কুসংস্কার জ্ঞানে ত্যাগ করিতে চাহ, স্বধর্ম্মকে রসাতলে প্রেরণ কর, অধিক আর কি বলিব ?

এস্থলে আমাদের সুশিক্ষিত বান্ধবগণ বলিবেন, আর কি সেদিন আছে, দোলদুর্গোৎসব করিলে বংশ উজ্জ্বল হইবে ? এখন সিভি-

লিয়ান হইয়া জেলার জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট হইতে পারিলে বা ব্যারিষ্টার হইয়া ধনরাশি উপার্জ্জন করিতে পারিলে বংশ উজ্জ্বল হইবে। এখন আর ঐ সকল অনর্থক কাজে অনর্থক ব্যয় করিলে কোন্ ফলোদয় হইবে? মুর্খমণ্ডলীর ভিতর সুখ্যাতি পাইলেই কি, আর না পাইলেই বা কি? একজন দেশকালবিৎ অভিজ্ঞ লোক বলিবেন, যে সময় পড়িয়াছে, তাহাতে পুত্রকন্যাগণকে লালনপালন করিয়া সুশিক্ষা দিয়া পাত্রস্থ করাই এখন আমাদের মহাদায়, তবে কেন বাড়ারভাগ দোলদুর্গোৎসব করিতে বলিতেছ? এখন ঐ সকল রহিত হওয়াই দেশের মঙ্গল। আজকাল দুর্গোৎসব আগতপ্রায় দেখিলে কত লোক ভাবনায় অস্থির হন। প্রধান ভাবনা কেমন করিয়া আত্মীয় স্বজনের নিকট মান বাঁচাইবেন। আজকাল পূজার সময় জামাই বাড়ীর এক তত্ত্বতাবাসে যাহা খরচ পড়ে, তাহাতেই পূর্ব্বে দুর্গোৎসব হইয়া যাইত। দেখ, সময়ের কি ফেরফার!

এখন প্রধান প্রধান নগরীতে পাশ্চাত্য স্রোত যেরূপ খরবেগে বহমান, তাহাতে বোধ হয় দুই তিন শতাব্দীর ভিতর এ সকল মহোৎসব সমাজে রহিত হইয়া যাইবে, মালক্ষ্মীর পূজাটাও বন্ধ হইবে। যে সকল মহোৎসব করিয়া হিন্দুসমাজ এতকাল আনন্দে বিভোর ও ধর্ম্মপথে অগ্রসর, সে সকল রহিত হইলে ভারতের কি দুর্দ্দিন আসিবে। এই পরাধীন দুঃখের অবস্থায় যে সকল মহোৎসব লইয়া আমরা অশেষ সুখে সুখী, সে সকল রহিত হইলে ভারতের কি দুর্দ্দিন উপস্থিত হইবে। তখনই ধর্ম্মাত্মা হিন্দু মনোদুঃখে গাইবেন "পর তুমি দীপমালা নগরে নগরে, কিন্তু তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে।"

এ স্থলে পুণ্যশীলা হিন্দুমহিলাগণের ব্রতোৎসব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা আবশ্যক। তাঁহাদের ধর্ম্মোন্নতির জন্য, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি গুলির সম্যক স্ফূর্ত্তির জন্য যে সকল ব্রতোৎসব শাস্ত্রে উপদিষ্ট

হইয়াছে, তদ্দারাও হিন্দুসমাজ অশেষ প্রকারে উপকৃত ও ধর্ম্মপথে অধিক অগ্রসর দেখিতে পাওয়া যায়। বৎসরের মধ্যে মধ্যে তিথি বিশেষে, চতুর্দ্দশী, নবমী, অষ্টমী প্রভৃতি তিথিতে বিশেষ বিশেষ ব্রত পালন করিতে হয় এবং কয়েক বৎসর ধরিয়া এই সকল ব্রত পালন করিয়া উদযাপন করিতে হয়।

এখন ভাব দেখি, মা লক্ষ্মীরা কত আগ্রহ, উৎসাহ ও শ্রদ্ধার সহিত ঐ সকল ব্রত পালন ও উদ্‌যাপন করিতেছেন! বৎসরের নিরূপিত সময়ে ও কয়েক বৎসর ধরিয়া ঐ সকল ব্রত পালন করাতে ও তদর্থে উপবাস করাতে তাঁহারা ধর্ম্মপথে কতদূর অগ্রসর, তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রবৃত্তিগুলি কতদূর স্ফুরিত, তাঁহাদের মনের একাগ্রতা, ধৈর্য্য ও তিতিক্ষা কতদূর পরিবর্দ্ধিত, তাহা হিন্দুমাত্রেই ভালরূপ অবগত আছেন। তাঁহাদের এই সকল ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা গৃহস্থের মধ্যে ধর্ম্মের কি অলৌকিক ও মনোরম দৃশ্য প্রদর্শিত হইতেছে, যদ্দারা সুকুমারমতি বালকবালিকাগণ অল্প বয়স হইতেই স্বধর্ম্মের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতে শিখিতেছে?

নারীজাতি স্বভাবতঃ কোমলপ্রকৃতি, ধর্ম্মপরায়ণা, কল্পনাপ্রিয়া ও ভাবপ্রধানা। তাঁহারাই সকল দেশে পুত্রকন্যাগণের মঙ্গলোদ্দেশে সংসারাশ্রমের যাবতীয় ধর্ম্মানুষ্ঠান বিধিবৎ পালন করিয়া স্বধর্ম্ম বজায় রাখেন। ধর্ম্মমাত্রেই তাঁহাদিগকে নিজ নিজ অনুষ্ঠান ও রীতি-নীতি পালনে সবিশেষ মনোযোগী করে এবং তাঁহাদের দ্বারাই নিজ মতামত ও অনুষ্ঠান সমাজে চিরদিন বলবৎ রাখিয়া দেয়। দেখ, খৃষ্টজগতে নানেরা, বৌদ্ধজগতে ভিক্ষুণীগণ আজীবন একমাত্র ধর্ম্মসেবায় মনোনিবেশ করেন। হিন্দুধর্ম্মও বিধবাদিগকে গৃহে গৃহে যোগিনী সাজাইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করায় এবং বিধবা ও সধবা সকলের মঙ্গলের জন্য নানা অনুষ্ঠান বিধিবদ্ধ করে।

যে ধর্ম্ম সামান্য কথায় ধর্ম্মোপদেশ অপেক্ষা বিবিধ অনুষ্ঠানের অধিক সমাদর করে, সে ধর্ম্ম সমাজের অশেষ মঙ্গলোদ্দেশে মহিলাগণের জন্য নানা ব্রতোৎসব বিধিবদ্ধ করিয়াছে এবং যে নারীজাতি উপকথা অধিক ভাল বাসেন, তাঁহাদের ধর্ম্মোন্নতির জন্য সে ধর্ম্ম ব্রতকাহিনী রচনা করিয়া উপকথাচ্ছলে উৎকৃষ্ট ধর্ম্মোপদেশ দিতেছে। সাধারণ স্ত্রীসমাজ বেদান্ত ও উপনিষদ কদাচ বুঝিতে পারিবে না। উহাদিগকে উপকথাচ্ছলে ধর্ম্মোপদেশ দেওয়াই কর্ত্তব্য। সাধারণলোকশিক্ষার জন্যই রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণগুলি রচিত হইয়াছে। ঐ সকল শ্রবণ করিয়া অজ্ঞজনসাধারণ ও স্ত্রীলোকেরা যেরূপ উপকার বোধ করে, এমন কিছুতে সম্ভব নয়। অতএব পুরাণগুলিতে ব্রতকাহিনী রচনায় হিন্দুধর্ম্মের উদ্দেশ্য সুমহৎ।

এখন হিন্দুধর্ম্ম ব্রতপালনে স্ত্রীসমাজকে প্রোৎসাহিত করিবার জন্য উহাতে অক্ষয় স্বর্গবাস, অনন্ত পুণ্যলাভ, দীর্ঘায়ুলাভ, ধনলাভ ও পুত্র-লাভ নির্দ্দেশ করে। বলি, এ সকল কি বৃথা স্তোকবাক্য? মহিলাগণ ব্রতপালন করিয়া কি কোনরূপ সুফল পান না? তাঁহাদের এত কষ্টস্বীকার, এত ত্যাগস্বীকার ও এত উপবাস সকলই কি এ সংসারে পণ্ড ও অনর্থক? ধর্ম্মজগতের নিয়ম এই, যে বিষয়ে যাহার যেরূপ দৃঢ়বিশ্বাস, তিনি সে বিষয়ে বিশ্বাসানুযায়ী ফললাভ করেন। যখন হিন্দুমহিলার দৃঢ় বিশ্বাস, শাস্ত্রোক্ত ব্রত পালন করিলে তিনি ধনপুত্রে লক্ষ্মীলাভ করিবেন, তখন ব্রতপালন করিয়া তিনি ইহজীবনে হউক, পরজীবনে হউক, নিশ্চয়ই ধনপুত্রে লক্ষ্মীলাভ করিবেন। সংসারে কর্ম্মফলের বিরাম নাই। কোন্ পুণ্যকর্ম্ম হইতে আমরা কোন্ শুভফল পাইতেছি, তাহাই বা কে নির্ণয় করিতে পারে? তবে কেন শাস্ত্রের কথা অমান্য করিতেছ? মনে কর, শাস্ত্রোল্লিখিত কথা সকল ধর্ম্মের স্তোকবাক্য মাত্র, তথাচ যখন

আমরা দেখিতেছি, মহিলাগণ এই সকল ব্রত পালন করিয়া ধর্ম্ম-পথে অধিক অগ্রসর, তাঁহাদের মন ও ইন্দ্রিয়গণ অধিক সংযত, তাঁহাদের শরীরের স্বাস্থ্যও অধিক বর্দ্ধিত, তখন কি হিন্দুধর্ম্মের কোনরূপ দোষ দেওয়া কর্ত্তব্য ?

এখন ব্রতপালন লইয়া শিক্ষিত সমাজের যত আক্রোশ কেবল ব্রাহ্মণঠাকুরদের উপর। তাঁহারা ভাবেন, উঁহারা নিজ নিজ গৃহিণী ও পুত্রগণকে রম্ভা ও আতপ চাউল ভোজন করাইবার জন্যই এই সকল বিধি ব্যবস্থা দেন এবং আমাদের কষ্টের টাকার এমন শ্রাদ্ধ করান। তাঁহাদের ধ্রুব বিশ্বাস, এ সকল কেবল ধর্ম্মের কুসংস্কার মাত্র। এক কুসংস্কারের দোহাই দিয়া তাঁহারা স্বধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠানগুলিকে উড়াইতে চেষ্টা পান। অন্য কোন ধর্ম্মে এ সকল দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়াই তাঁহাদের স্বধর্ম্মের প্রতি এত আক্রোশ।

বলি, বৎসরের মধ্যে মধ্যে দেবপূজা ও উপবাস করাইয়া যদি মহিলাগণকে সহিষ্ণুতা ও সংযম উত্তমরূপ শিখান যায়, তাহা কি হিন্দুধর্ম্মের একটা কুসংস্কার ? কতকগুলি পুরাণোক্ত উপকথা শ্রবণ করাইয়া যদি তাঁহাদিগকে প্রকৃত ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া যায়, তাহাও কি এ ধর্ম্মের একটা কুসংস্কার ? সপ্তম দিবসে গির্জ্জায় বা সমাজে গিয়া মুখে ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিলে কি যথার্থ ধর্ম্মশিক্ষা হইবে ? আর যে উপায়ে সহিষ্ণুতা, তিতিক্ষা ও সংযম উত্তমরূপ শিক্ষা করা যায় এবং শরীরের রোগপ্রশমনশক্তি বলবতী করা যায়, তাহা কি ধর্ম্মাচরণ নহে ? এরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান কি মৌখিক ধর্ম্মোপদেশ অপেক্ষা শতগুণে শ্রেয়স্কর নহে ? তবে কেন তোমরা শাস্ত্রোক্ত ব্রতাদির এত নিন্দাবাদ করিতেছ ?

বেশ জানিবে, এই সকল শ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াযোগ উপদেশ দিয়াই হিন্দুধর্ম্ম আমাদের দুঃখের সাংসারকে সোণার সংসার

করিয়াছে ও ইহাকে অশেষ সুখের আকর করিয়াছে। ইহারই জন্য হিন্দুপরিবার আবহমানকাল এত সুখে সুখী। সংসারে ধনবান হও, দীনদরিদ্র হও, যখন তোমার গৃহিণী তোমার অবস্থানুসারে গৃহস্থালী চালাইয়া তোমার সামান্য পর্ণকুটীরকে স্বর্গের নন্দনকানন করিবেন, তখন তাঁহার মত পুণ্যবতী রমণী আর কে আছে? সমস্ত সভ্যদেশ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান কর, কুত্রাপি হিন্দুমহিলার ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণা, পতিপরায়ণা, সতী, সাধ্বী নারী তোমার নয়নপথে পতিত হইবে না। একজন ইংরাজ মাসে সহস্র মুদ্রা উপার্জ্জন করিয়াও ভার্য্যার ভোগবিলাসের জ্বালায় অস্থির হন, আর এ দেশে একজন দরিদ্র মাসে দশটীমাত্র মুদ্রা উপার্জ্জন করিয়া স্ত্রীপুত্র লইয়া সুখে কালাতিপাত করে। বলি, কাহার গুণে এমন হইয়া থাকে? একমাত্র হিন্দুধর্ম্মের গুণে, ইহার উপদিষ্ট ধর্ম্মানুষ্ঠানের গুণে আমাদের ভাগ্যে এমন সুখভোগ ঘটিতেছে।

বেশ জানিবে, ধর্ম্মিষ্ঠা হিন্দুমহিলাগণ ব্রতাদি পালন করিয়াই গৃহে গৃহে হিন্দুধর্ম্মের বিজয়ভেরি বাজাইতেছেন। এই সকল শুভকর্ম্মোপলক্ষে তাঁহারা গৃহে গৃহে যে মাঙ্গল্য শঙ্খ ধ্বনি করিতেছেন, উহারই গুণে এ ধর্ম্ম এতকাল ভারতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ওহে নবযুগের নব্য সম্প্রদায়গণ। পাশ্চাত্য বিদ্যার যে হলাহল পান করিয়া তোমরা আজ হিন্দুয়ানীর নানাবিষয়ে বীতশ্রদ্ধ, সে হলাহল আর মহিলা-মহলে বিকীর্ণ করিও না, তোমাদের সোণার সংসার একেবারে ছারখার হইবে। যে রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ করিয়া তাঁহারা এত অধিক ধর্ম্মপরায়ণা, সেই রামায়ণ ও মহাভারত চিরদিন তাঁহাদের হস্তে দেও, তোমাদের সংসার স্বর্গের নন্দন-কানন হইবে। আর যদি ইংরাজি পুস্তক হস্তে দেও, তাঁহারা কালসাপিনী বেশে বিষ উদ্গীরণ করিতে করিতে তোমাদিগকে দংশন করিবে, তোমরাও বিষের জ্বালায় জ্বালাতন হইবে।

শাস্ত্রোক্ত উৎসব সম্বন্ধে এখন বঙ্গের কিরূপ দারুণ দুরবস্থা উপস্থিত। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে এ বিষয়ে সাধারণ লোকের কিরূপ আগ্রহ ও উৎসাহ ছিল! আমাদের দুরদৃষ্টবশতঃ জীবনসংগ্রাম ক্রমশঃ আয়াসসাধ্য হইয়া উঠিতেছে এবং ধর্ম্মওনীতি বিবর্জ্জিতা পাশ্চাত্য শিক্ষা চতুর্দ্দিকে বহুবিস্তৃত হইতেছে। এ কারণ উৎসব সম্বন্ধে সমাজের চিরন্তন উৎসাহ ক্রমশঃ মন্দীভূত হইতেছে। দুঃখের বিষয়, যাঁহারা ইংরাজদের অনুগ্রহে বড় বড় চাকরী করেন, এ সকল বিষয় তাঁহাদের খেয়ালে চড়ে না। এখন সকলেই পুরোহিতদিগকে সামান্য দক্ষিণা দিতে নারাজ। তৎপরিবর্ত্তে উহারা স্বর্ণকার ও ইংরাজ দোকানদারের পাদপদ্মে স্বেচ্ছায় বিস্তর অর্থ ঢালিয়া দেন। এক ভোগবিলাসে দেশ ক্রমশঃ উৎসন্ন যাইতে বসিল।

জীবনের বিবিধ সংস্কার।

যে মানব এখন যুগধর্ম্মে অধঃপতিত, যিনি পূর্ব্বতন আধ্যাত্মিকতা হারাইয়া এখন সংসারের বিবিধ পাপতাপে জড়িত ও অশেষ জ্বালাযন্ত্রণায় প্রপীড়িত, যিনি মূত্রাশয় ও বিষ্ঠাশয়ের মধ্যবর্ত্তী জরায়ুগর্ভে জন্ম লইয়া মূত্র ও বিষ্ঠার মধ্য দিয়া ভূমিষ্ঠ হন, সেই অপবিত্র মানবকে প্রত্যেক ধর্ম্ম নিজ নিজ প্রথানুসারে সংস্কৃত ও মন্ত্রপূত করিয়া ধর্ম্মপথে লইয়া যাইতে চেষ্টা পায়। কিন্তু এ বিষয়ে হিন্দুধর্ম্মের কি অপার মহিমা। এ ধর্ম্ম আমাদের এই পাপতাপপূর্ণ জীবনের মহৎ মহৎ ঘটনার উপর স্বীয় সুবিমল জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া ইহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধর্ম্মময় করিতে চেষ্টা পায়।

যে স্থলে অন্যান্য ধর্ম্ম পতিত মানবকে দুইএকবারমাত্র মন্ত্রপূত করিয়া পবিত্র করে, সে স্থলে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম তাঁহাকে কয়েকবার মন্ত্রপূত করিয়া তাঁহার যথার্থ পবিত্রতা সম্পাদন করিতে চেষ্টা

পায়। দেখ, খৃষ্টধর্ম্ম খৃষ্টান শিশুকে স্বধর্ম্মে দীক্ষা দিবার সময় একবার মন্ত্রপূত করে এবং বিবাহের সময় আর একবার মন্ত্রপূত করে। কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম কি জন্মগ্রহণ, কি অন্নপ্রাশন, কি উপনয়ন, কি বিবাহ; কি মৃত্যু, সকল সময়েই আমাদিগকে মন্ত্রপূত করিয়া আমাদের এই অধঃপতিত কলিকলুষিত জীবনের প্রকৃত সংস্কার করিয়া দেয়। যে সনাতন ধর্ম্ম যুগযুগান্তর ব্যাপিয়া প্রচলিত, যে ধর্ম্মের আচার ব্যবহার পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সে ধর্ম্ম চিরদিনই স্বসেবকদিগকে এইরূপ উৎকৃষ্ট পদ্ধতিতে মন্ত্রপূত ও সংস্কৃত করিতেছে।

হিন্দুধর্ম্মের সংস্কারগুলি অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। কি বৈদিক, কি স্মার্ত্ত, কি পৌরাণিক, সকল যুগেই ইহারা বিধিবৎ প্রতিপালিত হইয়াছে ও হইতেছে। যে ভীমপরাক্রমশালী আর্য্যজাতি ভারতে স্বীয় কীর্ত্তিধ্বজা রোপিত করেন ও আর্য্যসভ্যতা বিকীর্ণ করেন, তাহারাই এই সকল সংস্কার প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন। আমরা যেমন তাঁহাদেরই শ্রেষ্ঠ বংশে উদ্ভূত ও আমাদের শিরায় শিরায় যেমন তাঁহাদের বিশুদ্ধ শোণিত বহমান, আমরাও সেইরূপ চিরদিন তাঁহাদেরই প্রবর্ত্তিত সংস্কারে নিজ জীবন সংস্কৃত ও মন্ত্রপূত করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতেছি! গ্রীশ বল, রোম বল, মিসর বল, পারস্য বল, সকল দেশের পুরাকালীন আচার ব্যবহার একবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই বিশ্বাচার্য্য দৃশ্য একমাত্র ভারতে চিরদেদীপ্যমান রহিয়াছে। রে হিন্দুধর্ম্ম! তুমিই এ সংসারে একমাত্র সত্য সনাতন ধর্ম্ম। কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে তুমিও কত পরিবর্ত্তন সহ্য করিয়াছ, কিন্তু কস্মিন কালে নিজ মূলপ্রকৃতি পরিত্যাগ কর নাই। কালের কত ঝঞ্ঝাবাত, কত প্রবল বাত্যা, কত ভীষণ বিপ্লব, তোমার মস্তকের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে; কিন্তু কস্মিন কালে তুমি নিজ মূলপ্রকৃতি

পরিহার কর নাই। জগতের কোন্ জাতি এমন অলৌকিক দৃশ্য দেখাইতে পারে?

সুশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ বলিবেন, যে স্বার্থপর ব্রাহ্মণ জাতির পূর্ব্বপুরুষগণ এ সকল সংস্কার সমাজে প্রবর্ত্তিত করিয়া আপনাদের ক্ষমতা ও প্রতাপ বর্দ্ধিত করেন, তাঁহাদেরই বংশধরেরা আপনাদের সামাজিক প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য উহাদিগকে সমভাবে এতকাল পালন করিতেছেন। যাঁহারা এ বিষয়টী পূর্ব্বাপর ভালরূপ বিবেচনা করিবেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ জাতির উপর এমন করিয়া ঝাল ঝাড়িবেন না। বলি, ব্রাহ্মণ জাতি কে? তাঁহারা না হয়, চিরদিন হিন্দুসমাজের নেতা। তাহাতেই কি তাঁহারা স্ব ইচ্ছায় প্রণোদিত হইয়া সামাজিক নিয়মের বিরুদ্ধে কোন কাজ করিতে পারেন? সমাজজগতের নিয়ম এই, যাহা সমাজবিশেষের পরমকল্যাণদায়ক, তাহা সেই সমাজে সামাজিক নির্ব্বাচনে স্বতঃ প্রতিষ্ঠিত ও স্থায়ী হইবে। যদি এই সকল সংস্কার দ্বারা হিন্দুসমাজ কোনরূপ উপকার না পাইত, ব্রাহ্মণজাতির কি সাধ্য, যে তাঁহারা কেবল মাত্র আপনাদের সামাজিক প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ইহাদিগকে এতকাল সমভাবে বজায় রাখিতে পারিতেন?

শুনিতে পাই, বিবিধ যাগযজ্ঞ প্রবর্ত্তিত করিয়াও ব্রাহ্মণজাতি আর্য্যসমাজে আপনাদের প্রভুত্ব স্থাপন করেন। কেন সে সকল যাগযজ্ঞ কালক্রমে সমাজে রহিত হইয়া গেল? কালের অনুপযুক্ত হওয়াতেই উহারা কালে সমাজে লোপ পাইয়াছে। পরন্তু জীবনের সংস্কারগুলি সামাজিক বিবর্ত্তনে কালক্রমে উত্থিত হইলেও সমাজের অনুপযুক্ত হয় নাই বলিয়া চিরদিন সমভাবে পালিত হইতেছে। অতএব যে সকল সংস্কার দ্বারা হিন্দুজাতির প্রাচীনত্ব সম্যক সূচিত, যদ্দারা আমাদের বিশুদ্ধ ও অবিমিশ্রিত জাতীয় শোণিত অখণ্ড

রূপে সপ্রমাণিত, সেই সকল সংস্কারের প্রধান চালক ও রক্ষক ব্রাহ্মণজাতির উপর কেন অকারণ দোষারোপ করিতেছ?

জীবনের সংস্কারগুলি জাতিভেদ প্রথার ন্যায় হিন্দুসমাজের অস্থিমজ্জায় নিহিত। ইহাদের সম্যক প্রতিপালনে মানব পবিত্র হিন্দুনামের যোগ্য হন। ইহারাই তাঁহাকে সমগ্র জগতে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করে ও দেবতুল্য করে। এবং তাঁহাকে জগতের যাবতীয় ম্লেচ্ছ জাতি হইতে বিশিষ্ট ও বিভিন্ন রাখে। ইহাদের প্রতিপালনে ত্রুটি হয় বলিয়া সনাতন হিন্দুধর্ম্ম অন্য জাতির কোন লোককে হঠাৎ স্বসমাজে গ্রহণ করিতে চায় না। জীবনের যে সময়ে যে সংস্কার অত্যাবশ্যক, সে সময়ে সে সংস্কার না হইলে কেহ পবিত্র হিন্দুনাম প্রাপ্ত হইতে পারে না এবং হিন্দুধর্ম্মও অন্য ধর্ম্মের কোন লোককে স্বসমাজে গ্রহণ করিতে পারে না। একারণ বিধর্ম্মী-দিগের নিকট ইহার দ্বারদেশ চিরদিন অবরুদ্ধ। এখন বুঝিয়া দেখ, তোমার হেয় অপদার্থ পৌত্তলিক হিন্দুধর্ম্ম এ জগতে কত শ্রেষ্ঠ এবং কি পুণ্যবলে তুমি হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ।

শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়ের ভিতর কেহ কেহ বলিবেন, যে সকল সংস্কার আবহমান কাল হিন্দুসমাজে প্রচলিত, উহারা সমাজদেহের অর্ব্বুদস্বরূপ। যেমন শরীরের কোন স্থানে অর্ব্বুদ উত্থিত হইলে উহা বিকলাঙ্গ হইয়া পড়ে এবং মধ্যে মধ্যে অল্পাধিক যন্ত্রণা দেয়; কিন্তু প্রাণনাশের ভয়ে অনেকে সেই অর্ব্বুদকে শাস্ত্রোপচার দ্বারা কর্ত্তন করিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করে না। সেইরূপ সংস্কারগুলি বহুকাল হইতে সমাজে চলিয়া আসিতেছে, সময়ে সময়ে ব্যয়বাহুল্য-বশতঃ আমাদের ক্লেশকর হইয়া উঠে; কিন্তু পাছে সমাজ ধ্বংস হয়, এই ভয়ে আমরা উহাদিগকে ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করি না।

ধর্ম্মনির্দ্দিষ্ট যে সকল সংস্কার এতকাল হিন্দুসমাজে চলিয়া আসিতেছে, তাহা আজ শিক্ষাদোষে বিকলাঙ্গকারী অর্ব্বুদ হইল।

হায়! হায়? সনাতন হিন্দুধর্ম্মের কি লাঞ্ছনা ও কি অবমাননা! যাহারা পতিতপাবন হিন্দুধর্ম্মের স্বর্গীয় আভরণ, যাহারা পতিত মানবের পরিত্রাণের জন্য, পবিত্রাকরণের জন্য বিধিবদ্ধ, যাহারা হিন্দুসমাজের অশেষ কল্যাণকর, উহারা হইলেন আজ শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের নিকট বিকলাঙ্গকারী অর্ব্বুদস্বরূপ। তাহা না হইলে কেন তাঁহারা পিতামাতার শ্রাদ্ধে দুই পয়সা ব্যয় করিতে এত কুণ্ঠিত হইবেন? কেন তাঁহারা এ সকল রহিত করিতে এত বদ্ধ-পরিকর হইবেন? যথার্থ বলিতে কি এই সকল সংস্কারই আমাদিগকে ইহসংসারে দেবোপম ও ধন্য করিতেছে।

দেখ, এ ধর্ম্মের কি অপার মহিমা? যে সকল ঘটনা জীবনের সাধারণ, অথচ অত্যাবশ্যক, তদুপলক্ষে, ইহা সকলকে মন্ত্রপূত করিয়া উহাদের স্বর্গীয় ভাব স্ফুরণ করে। ইহার এমনি গুণ, যখন তুমি ভ্রূণরূপে মাতৃগর্ভে জন্ম লও, তখনও ইহা তোমায় মন্ত্রপূত করিতেছে এবং যখন তুমি ইহসংসার হইতে চিরবিদায় লও, তখনও ইহা তোমার প্রেতাত্মার মঙ্গলের জন্য নানা অনুষ্ঠান বিধি-বদ্ধ করিতেছে।

শাস্ত্রোক্ত সংস্কার গুলি যথা:—

(১) গর্ভাধান।
(২) পুংসবন।
(৩) পঞ্চামৃত।
(৪) সীমন্তোন্নয়ন।
(৫) নামকরণ।
(৬) নিষ্ক্রামণ।
(৭) অন্নপ্রাশন।
(৮) কর্ণবেধ।
(৯) চূড়াকরণ।
(১০) বিদ্যারম্ভ।
(১১) উপনয়ন।
(১২) বিবাহ।
(১৩) শ্রাদ্ধ।

ইহাদের তাৎপর্য্য কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যান করা আবশ্যক।

নামকরণ। তুমি অশেষ পুণ্যবলে দুর্লভ মানবজন্ম গ্রহণ

করিয়া হিন্দুসমাজে ভূমিষ্ঠ হইলে। তৎকালে হিন্দুধর্ম্ম পুরোহিত বেশে তোমার নিকট আসিয়া তোমায় নিজ ক্রোড়দেশে স্থাপন করিবে, পবিত্র গঙ্গোদকে অভিষিঞ্চন করিয়া তোমার ভাবি মঙ্গলের জন্য তোমায় মন্ত্রপূত করিবে এবং দেবতাদিগের নামানুসারে তোমার নামকরণ করিয়া তোমায় সমাজে পরিচিত করিবে। এই প্রকারে তোমার নাম সমাজে রেজেষ্টারী করা হয়।

অন্নপ্রাশন। ভূমিষ্ঠ হইবার পর স্নেহময়ী মাতার স্তনদুগ্ধে লালিত ও পালিত হইয়া তুমি সপ্তম মাসে প্রবিষ্ট হইলে এবং তোমার দুই একটী দন্তও উদ্গত হইল। এখন তুমি সংসারে অন্ন ভোজন করিবার উপযুক্ত। তৎকালে হিন্দুধর্ম্ম পুরোহিতবেশে তোমার নিকট আসিয়া তোমায় স্বক্রোড়ে বসাইবে এবং দুই একটী অন্ন মন্ত্রপূত করত তোমার মুখে অর্পণ করিয়া উপদেশ দিবে "যে অন্ন ভোজন করিয়া তোমার শরীর আজীবন পরিপুষ্ট হইবে, সেই অন্ন আজ আমি তোমার রক্ষকস্বরূপ মন্ত্রপূত করিয়া তোমার মুখে অর্পণ করিলাম, যাও তুমি সংসারে এই অন্ন চিরদিন সুখে ভোজন কর এবং স্বাস্থ্যসুখে সুখী হইয়া দীর্ঘ জীবন লাভ কর। এই প্রকারে তোমার অন্নপ্রাশন হয় এবং তুমিও ধর্ম্মের শরণ লইয়া সংসারে পান ভোজনাদি করিতে আরম্ভ কর।

বিদ্যারম্ভ। পিতৃমাতৃস্নেহে পালিত হইয়া তুমি আজ পঞ্চম বর্ষে পতিত হইলে। এখন তুমি পাঠশালায় গিয়া বিদ্যা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিবে। তৎকালে হিন্দুধর্ম্ম পুরোহিত বেশে তোমার নিকট আসিয়া তোমায় স্বক্রোড়ে বসাইবে এবং পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক তোমার হস্তে হাতকড়ি দিয়া উপদেশ দিবে—"যে বিদ্যাবলে তুমি অর্থোপার্জ্জন করিয়া সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে, সেই বিদ্যা শিক্ষার জন্য আজ আমি তোমায় মন্ত্রপূত করিলাম এবং মা সরস্বতীর শ্রীচরণ কমলে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়াইলাম। যাও তুমি

মনোসুখে পাঠশালায় যাও ; তথায় মনোযোগের সহিত শিক্ষাগুরুর উপদেশ গ্রহণ কর ও যথাবিধি পরিশ্রম কর। তাঁহার অনুগ্রহে বিদ্যারূপ অমূল্য ধন লাভ করিবে।" এইরূপে ধর্ম্মানুসারে তোমার বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হয়।

উপনয়ন। এখন তুমি দশম বর্ষে পতিত হইলে এবং তোমার জ্ঞানশক্তিরও ক্রমশঃ উন্মেষ হইতে চলিল। এই সুকুমার বয়স হইতেই তোমার ধর্ম্মচর্য্যা একান্ত আবশ্যক। এই বয়সে তোমার কোমল অন্তঃকরণ ও সুকুমার মতি যে দিকে প্রণত হইবে, আজীবন উহারা সেই দিকে ধাবিত হইবে। এই বয়স হইতে তোমার মনের যে সংযমশিক্ষা আরম্ভ হইবে, অভ্যাসবশতঃ তাহা আজীবন সহজ ও সুগম হইবে। এই সময় হিন্দুধর্ম্ম পুরোহিতবেশে তোমার নিকট আসিয়া পবিত্র গঙ্গোদক অভিষিঞ্চন করত তোমায় মন্ত্রপূত করিবে, যজ্ঞোপবীত ধারণ করাইয়া বেদোক্ত গায়ত্রী মন্ত্রসুধা তোমার কর্ণকুহরে ঢালিবে এবং কয়দিনের জন্য ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করাইয়া তদাশ্রমোচিত সকল ভিক্ষা করাইবে। তৎকালে এ ধর্ম্ম তোমায় উপদেশ দিবে—"তুমি অপবিত্র মাতৃযোনির মধ্যদিয়া ভূমিষ্ঠ হওয়াতে এতদিন সংসারে অপবিত্র ছিলে, তোমার স্থূলদেহনিবদ্ধ আত্মাও এতদিন জ্ঞানশক্তির প্রকৃত উন্মেষ না হওয়াতে জড়ভাবাপন্ন ছিল। আজ আমি যজ্ঞোপবীত ধারণ করাইয়া তোমার যথার্থ পবিত্রতা সম্পাদন করিলাম, ধর্ম্মচর্য্যার জন্য তোমায় নবজীবন প্রদান করিলাম এবং সমাজের অন্যান্য জাতির নিকট তোমায় সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ ও মাননীয় করিয়াদিলাম। যে পবিত্র গায়ত্রীমন্ত্র আজ আমি তোমার কর্ণকুহরে প্রদান করিলাম, তাহা দ্বিসন্ধ্যা বা ত্রিসন্ধ্যা জপ করিয়া নিজ মনকে ক্রমশঃ সংযত ও সুসমাহিত করিতে শিক্ষা কর এবং আজীবন এই ধর্ম্মপথে বিচরণ করিতে থাক। ইহাতেই তোমার শ্রেয়োলাভ, পুণ্যলাভ ও মঙ্গললাভ হইবে। এই প্রকারে ধর্ম্মা-

মুসারে তোমার উপনয়নসংস্কার হয় এবং তুমিও দুইবার জন্ম লওয়াতে সংসারে দ্বিজনাম প্রাপ্ত হও।

বিবাহ। এখন তোমার যৌবন কাল উপস্থিত। তুমিও পৈতৃক ব্যবসায়ে বিশেষ অভিজ্ঞ ও পটু, অথবা কালোচিত বিদ্যা শিক্ষা করিয়া ভদ্রোচিত ব্যবসায় অবলম্বন করিবার উপযুক্ত। এখন তুমি অর্দ্ধাঙ্গিনী লইয়া সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিয়া সংসারধর্ম্ম করিতে একান্ত অভিলাষী। তোমার পিতামাতা তোমার জন্য একটী সুপাত্রী অন্বেষণ করিয়া মনোনীত করিয়াছেন। এই সময় হিন্দুধর্ম্ম পুরোহিতবেশে তোমাদের নিকট আগমন করিয়া তোমাদের উভয়কে মন্ত্রপুত করত উদ্বাহসূত্রে আবদ্ধ করিবে এবং তোমাদের সর্ব্বাঙ্গীন মিলন আজীবনের তরে সংঘটন করাইয়া দিবে। তখন এ ধর্ম্ম উপদেশ দিবে—'যাও, তোমরা উভয়ে মনসুখে সংসারাশ্রমে প্রবেশ কর, উভয়ের সহবাসে দুর্জ্জয় কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া অপত্যোৎপাদন কর ও পুন্নামক নরক হইতে উদ্ধার পাও, আত্মীয় স্বজনের ভরণ পোষণের জন্য দিবারাত্র পরিশ্রম কর, অর্দ্ধাঙ্গিনীকে সহধর্ম্মিনী করিয়া চিরজীবন একসঙ্গে একমনে, এক-ধ্যানে সংসারের যাবতীয় ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে থাক। ইহাতেই তোমাদের অশেষ সুখলাভ, মঙ্গললাভ ও পুণ্যলাভ হইবে।" এই প্রকারে ধর্ম্মানুসার তোমার বিবাহসংস্কার হইয়া থাকে।

পুনর্ব্বিবাহ। এখন তোমার অর্দ্ধাঙ্গিনী বয়ঃপ্রাপ্তা হইয়া প্রথম রজোবতী হইলেন। তুমিও পত্নীসহবাসসুখ ভোগ করিতে একান্ত অভিলাষী; কিন্তু ধর্ম্মের আদেশ ব্যতীত তুমি ইহাতে প্রবৃত্ত হইতে পার না। তখন হিন্দুধর্ম্ম পুরোহিতবেশে তোমাদের নিকট আসিয়া মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক তোমার ভার্য্যার পুষ্পোৎসব করাইবে এবং তোমাদের পুনর্ব্বিবাহ সংস্কার করাইয়া উপদেশ দিবে "যাও আজ হইতে তোমার অর্দ্ধাঙ্গিনী তোমার যথার্থ প্রাণপ্রেয়সী হইলেন, আজ

হইতে তাঁহারই সহবাসসুখে দুর্জ্জয় কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া উহাকে সংযত করিতে শিক্ষা কর এবং পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ অবলোকন কর।" তৎকালে এ ধর্ম্ম তোমার সহধর্ম্মিনীকে উদ্দেশ করিয়া উপদেশ দিবে "যাও আজ হইতে তুমি ছায়ার ন্যায় প্রাণ-পতির অনুসরণ কর, তাঁহার শ্রীচরণকমলসেবাই জীবনের মুখ্য-ব্রত করত সর্ব্বান্তঃকরণে পতিপরায়ণা ও সতী সধ্বী হইয়া সুখে সংসারধর্ম্ম কর এবং পরপুরুষকে কদাচ পাপনয়নে নিরীক্ষণ করিও না। এই প্রকারে তোমার পুনর্বিবাহসংস্কার ধর্ম্মানুসারে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

পঞ্চামৃতাদি। এখন তোমার প্রিয়তমা ভার্য্যা প্রথম গর্ভবতী হইলেন, দৌহৃদলক্ষণ বশতঃ তিনি ক্রমশঃশীর্ণ হইতেছেন। এখন তিনি কি প্রকারে সন্তান প্রসব করিয়া এই বিষম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন, এই ভাবিয়া অকূলচিন্তাসাগরে নিমগ্না। তৎকালে হিন্দুধর্ম্ম পুরোহিতবেশে তাঁহার দুঃখদর্শনে দয়াদ্রচিত্ত হইয়া তাঁহার নিকট আগমন করিবে, সাধের বিবিধ জিনিষ খাওয়াইয়া নানা প্রবোধ দিবে, পঞ্চামৃতাদি সংস্কার করাইয়া তদীয় মনে নানাবিধ ধর্ম্মভাব উত্তেজিত করিবে। ইহাতেই তাঁহার সকল চিন্তা দূরীভূত হইয়া যাইবে ও তাঁহার মন প্রকৃত শান্তিলাভ করিবে। পরে যথাসময়ে নবকুমারের মুখাবলোকন করিয়া তিনি অনন্ত সুখে সুখিনী হন। গর্ভাবস্থায় প্রসূতি নানাচিন্তায় উদ্বিগ্ন হইলে গর্ভজাত সন্তান বিকলাঙ্গ হইতে পারে, অথবা কোনরূপ মানসিক বিকার পাইতে পারে, এ কারণ এই সময়ে এ ধর্ম্মের এত ভাবনা। বেশ জানিবে, ভাবি সন্তানের মঙ্গলোদ্দেশেই গর্ভাবস্থায় হিন্দুধর্ম্মের নানা অনুষ্ঠান ও সংস্কার বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

আদ্যশ্রাদ্ধ। এখন তুমি জরাগ্রস্ত হইয়া বা কোন উৎকট রোগে আক্রান্ত হইয়া সংসার হইতে চিরবিদায় লইয়া গেলে।

তখন হিন্দুধর্ম্ম পুরোহিতবেশে তোমার রোরুদ্যমান পুত্রের নিকট আসিয়া তোমার প্রেতাত্মার প্রেতত্ব অপনোদনের জন্য কতকগুলি প্রেতকৃত্য করাইবে ও তোমার উদ্দেশে পিণ্ডদান দেওয়াইবে। তখন এধর্ম্ম তোমার কর্ত্তব্যপরায়ণ পুত্রকে উপদেশ দিবে—"যে পূজনীয় পিতার স্নেহে ও যত্নে তুমি প্রতিপালিত ও শিক্ষিত, যাঁহার পুণ্যবলে তুমি এমন কৃতী পুত্র হইয়া নিজ বংশ উজ্জ্বল করিতেছ, সে পিতার ঋণ তুমি কস্মিন কালে প্রতিশোধ করিতে পারিবে না। তথাচ তাঁহার প্রেতাত্মার প্রেতত্ব অপনোদনের জন্য তুমি শাস্ত্রোক্ত প্রেতকৃত্য করিয়া তাঁহার পিণ্ডদান দেও, সমাজের গোব্রাহ্মণরক্ষার্থ ব্রাহ্মণভোজন, ষোড়শদান ও বৃষোৎসর্গ ব্যাপার অনুষ্ঠান করিয়া তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পাদন কর এবং বন্ধুবান্ধব ও স্বজনবর্গ লইয়া তাঁহার পরলোকের জন্য মঙ্গল কামনা কর, তুমি কিয়ৎপরিমাণে পিতৃঋণ হইতে মুক্তিলাভ করিবে। ইহাতেই তোমার শ্রেয়োলাভ ও পুণ্যলাভ হইবে। এই প্রকারে ধর্ম্মানুসারে সকলের আদ্যশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

শাস্ত্রোক্ত সংস্কারগুলির তাৎপর্য্য যে কতদূর মহোচ্চ ও স্বর্গীয়, তাহা আমরা শিক্ষাদোষে বুঝিতেরপারি না। সমাজের আদেশমত সামান্য কর্ত্তব্য বোধে আমরা এখন উহাদিগকে পালন করিতেছি মাত্র এবং সমাজকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাইয়া যাহা আমরা পরিহার করিতে পারি, তাহাও ধীরে ধীরে পরিহার করিতেছি।

হিন্দু দ্বিজবালকের উপনয়নসংস্কার মুসলমানবালকের সুন্নৎ (Circumcision), খৃষ্টানবালকের খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষা (Baptism), ইহাদের তাৎপর্য্য সমান। যে মানব ইহসংসারে জন্মগ্রহণ করাতে অধঃ-পতিত, সেই মানবের উদ্ধারসাধনার্থ স্ব স্ব পতিতপাবন ধর্ম্ম তাঁহাকে মন্ত্রপুত করিয়া নিজ পথে লইয়া যাইতেছে। প্রভেদের মধ্যে, এই, কোন ধর্ম্ম পবিত্রতার চিহ্নস্বরূপ তাঁহাকে দুইগাছি পবিত্র সূত্র

পরিধান করায়, কোন ধর্ম্ম তাঁহার অঙ্গবিশেষ ছেদন করায়, কোনধর্ম্ম তাঁহার উপর পবিত্র নদীর জল অভিষিঞ্চন করায়। যাহা হউক, যে উপনয়নের উদ্দেশ্য এত সুমহৎ, কি পরিতাপের বিষয়! বঙ্গের ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ শূদ্র জাতিতে পরিণত হইয়া এখন উপনয়ন হইতে চিরবঞ্চিত? কবে তাঁহাদের এ নীচতা দূরীভূত হইবে?

শাস্ত্রানুসারে এই সকল সংস্কার আমাদের অত্যাবশ্যকীয় কর্ম্ম। হিন্দুধর্ম্মও ইহাদিগকে সকলের অবশ্যপ্রতিপাল্য কর্ত্তব্যকর্ম্ম করিয়া দিয়াছে। তোমার সামর্থ্য না থাকে, তুমি দোলদুর্গোৎসবাদি না করাইতে পার; কিন্তু হিন্দুসমাজে থাকিতে হইলেই পুত্রকন্যার বিবাহ দিতে হইবে ও মৃত পিতামাতার শ্রাদ্ধ করিতেই হইবে। রাজাধিরাজ হইতে পথের কাঙ্গাল পর্য্যন্ত সমাজস্থ যাবতীয় লোককে এইরূপ বিবিধ সংস্কারে মন্ত্রপূত করিয়া এ ধর্ম্ম স্বসমাজকে ধর্ম্মবন্ধনে ভালরূপ আবদ্ধ করিতেছে। কোন ধর্ম্ম কোন কালে কোন দেশে স্বসমাজকে এমন নিগড় বন্ধন পরাইতে পারে নাই।

কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব, কি শৈব, যিনি যে সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হউন না কেন, কি রাজাধিরাজ, কি মধ্যবিত্ত, কি পথের কাঙ্গাল, যিনি যে অবস্থায় থাকুন না কেন, হিন্দুসমাজের কোন ব্যক্তি গৃহস্থ মার্গে থাকিয়া ধর্ম্মের এই নিগড় বন্ধন হইতে অব্যাহতি পান না। হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিলেই সকলেই উপরোক্ত সংস্কারগুলির বাধ্য হইয়া থাকে।

উপরোক্ত সংস্কার প্রতিপালনার্থ ভারতের গৃহে গৃহে কিরূপ উৎসব, কিরূপ সমারোহ ও কিরূপ আমোদ প্রমোদ চিরদিন চলিতেছে, তাহা এস্থলে বর্ণন করা নিস্প্রয়োজন। সকলেই বাল্য কাল হইতেই এ সকল দেখিয়া আসিতেছে। যতদিন হিন্দুধর্ম্ম ভারতে দেদীপ্যমান থাকিবে, ততদিন আমাদের ভাগ্যে এই সকল আমোদ প্রমোদ মিলিবে। কিন্তু বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে,

যে পাশ্চাত্য কালস্রোত সমাজে খরবেগে বহমান, সে কালস্রোত কালে এ সকল চিরন্তন সংস্কারগুলিকেও ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। যে কাল পড়িয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, কেহ কেহ ইতিমধ্যে পিতৃ-দেবের শ্রাদ্ধ করিতে চান না, পুত্রকন্যার বিবাহ যেন তেন প্রকারেণ সম্পাদন করান।

এই সকল সংস্কার রহিত হইলে, হিন্দুধর্ম্মও রসাতলে যাইবে। তখন দুঃখিনী-ভারতমাতা নিজের কুপোষ্য কুসন্তানদিগকে সহস্র অভিসম্পাত দিবেন এবং উহারাও পূর্ব্ব জাতীয় গৌরব বিস্মৃত হইয়া নিঘৃণ্য ম্লেচ্ছ জাতিতে পরিণত হইবে। হে ভগবান! তুমি কি ভারতের ভাগ্যে তাহাই লিখিয়াছ? ভারতকে কি এমন দুর্দ্দিন দেখিতে হইবে। যে দিন ইহার সাধের সনাতন হিন্দুধর্ম্ম ভূপৃষ্ঠে লুপ্ত হইয়া যাইবে, হা হতবিধে। সেদিন আসিবার পূর্ব্বে ভারত যেন ভারতমহাসাগরে নিমগ্ন হইয়া যায়।

এই সকল সংস্কার উদ্দেশে হিন্দুসমাজে চিরদিন যে অর্থ রাশির ব্যয় হইতেছে, তাহা ধর্ম্মের জন্য ব্যয়, তাহা কদাচ অনর্থক ব্যয় মনে করিও না। ইহাতেই ধর্ম্ম ও সমাজ ভালরূপ রক্ষিত হইতেছে। শাস্ত্রের আদেশ, তোমার যেমন সামর্থ্য, তুমি এতদর্থে সেইরূপ ব্যয়ভূষণ করিবে। তুমি তিলকাঞ্চন দিয়া মৃত পিতামাতার আদ্যশ্রাদ্ধ করিতে পার বা অধ্যাপকবর্গকে সামাজিক বিদায়, ষোড়শদান ও বৃষোৎসর্গাদি নানা অনুষ্ঠান করিয়া গ্রামস্থ সহস্র লোককে সুখাদ্য ভোজন করাইয়া এই মহৎ কার্য্য মহাসমারোহে সম্পাদন করিতে পার। তুমি উনুস্থনু করিয়া অতি দীনভাবে পুত্র কন্যার বিবাহ দিতে পার বা জাঁকজমকের সহিত মহাসমারোহে তাহা সম্পাদন করিতে পার। যেমন করিয়া কর না কেন, ইহা তোমার অবশ্যপ্রতিপাল্য কর্ত্তব্যকর্ম্ম। যদি তুমি ইহাতে মুক্ত

হস্ত হও, গ্রামস্থ লোকেরা ও আত্মীয় স্বজন সকলেই তোমার অশেষ সুখ্যাতি করিবে এবং তোমার বংশ উজ্জ্বল হইবে।

দেশের জনসাধারণ বিবাহ শ্রাদ্ধাদিতে অর্থব্যয়কে আপনাদের পুণ্যকর্ম্ম মনে করে। উহারা জানে, এই প্রকারে শাস্ত্রের আদেশ মত অর্থব্যয় করিলেই ইহার প্রকৃত সদ্ব্যবহার করা হইবে। কিন্তু সুশিক্ষিত নব্যসম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে এরূপ অর্থব্যয়কে আপনাদের একটা অনর্থক অর্থব্যয় মনে করেন; তাঁহারা ভাবেন, এ সকল রহিত হইলেই দেশের প্রকৃত মঙ্গল হইবে। এখনও তাঁহারা নাপার্য্যমাণে সমাজের আদেশমত এই সকল অনুষ্ঠানে ব্যয়ভূষণ করিতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের মনের ভাব, উক্ত অর্থ-রাশি দেশহিতকর কার্য্যে ব্যয় করিলে দেশের প্রকৃত মঙ্গল হইবে।

দেখ, জাতিধর্ম্ম রক্ষা করা আমাদের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যদ্দ্বারা জাতিধর্ম্ম রক্ষিত হইবে, তাহাই আমাদের দেশহিতকর কার্য্য, তাহাতেই আমাদের পুণ্যলাভ ও শ্রেয়োলাভ। যখন ধর্ম্মের আদেশ, জীবনের সংস্কারগুলি প্রতিপালন করা একান্ত আবশ্যক, তখন স্বধর্ম্ম রক্ষা করিতে হইলে ঐ সকল বিধিবৎ পালন করিতে হইবে; তজ্জন্য ব্যয়কুণ্ঠ হইলে চলিবে কেন? তবে কেন তোমরা ধর্ম্মের আদেশ, সমাজের আদেশ পালন করিতে এত নারাজ হইতেছ? আজকাল ধর্ম্ম ও নীতিবিবর্জ্জিতা পাশ্চাত্য শিক্ষা বহু-বিস্তৃত হওয়ায় সমাজে ভোগবিলাসিতা যেরূপ হারে বাড়িতেছে, তাহাতে দেশ অচিরে ছারেখারে যাইবে। ভোগবিলাস চরিতার্থতার জন্য যে অর্থরাশি আমরা জলে ঢালি, তাহার চতুর্থাংশ ধর্ম্মোদ্দেশে ব্যয় করিলেও দেশের প্রভূত মঙ্গল।

যে সকল যজমানে ব্রাহ্মণ পুরোহিত নামে আমাদের ধর্ম্মানু-ষ্ঠান করান, তাঁহাদের জাতীয় অধঃপতন দেখিয়া আমাদের হৃদয়

বিদীর্ণ হইতেছে। কাহাদের দোষে তাঁহাদের এমন দুর্দ্দশা হইল? দোষ কি কেবল তাঁহাদেরই? আমাদের কি কিছুমাত্র দোষ নাই? আমাদের দোষেই তাঁহাদের এমন দুর্দ্দশা। আমরা যেমন সামান্য দক্ষিণাদানে কুণ্ঠিত হই, মূর্খ পূজারি ব্রাহ্মণেরাই এখন এ কাজ চালাইতেছেন। বুদ্ধিমান সুপণ্ডিতেরা এ কাজের দিকে আইসেন না। তাঁহাদের নিকট একাজ চিরদিন হেয়। যাঁহাদের শাস্ত্রে তাদৃশ ব্যুৎপত্তি নাই, মা সরস্বতীর সহিত যাঁহাদের আদৌ ভেঁট হয় নাই, তাঁহারাই আমাদের পূজ্য পুরোহিত। তাঁহারাও কেবল কতকগুলি মন্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া যজমানদের ধর্ম্মকর্ম্ম চালান। তাঁহারা যুগধর্ম্মে সংসারের তীব্র তাড়নায় প্রপীড়িত হইয়া সংসার নির্ব্বাহের জন্য অস্থির। তাঁহাদের পুত্রপৌত্রগণ ইংরাজি শিক্ষা করিয়া সাহেব সাজিয়া সাহেবের গোলামী করিতে লালায়িত। কিছুকাল পরে দেশে পুরোহিত পাওয়া ভার হইবে।

কোথায় হে বিপদভঞ্জন মধুসূদন! কবে দেশের সর্ব্বসাধারণ পুরোহিতদিগের মানমর্য্যাদা বুঝিয়া উঁদাদের ভালরূপ সুশিক্ষার জন্য, সংসার প্রতিপালনের জন্য সুবন্দোবস্ত করিয়া দিবে? উহারা লোপ পাইলে হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুজাতি জগতে লুপ্ত হইবে। ওহে সুশিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়গণ! যদি তোমরা হিন্দু নামের প্রকৃত গৌরব রক্ষা করিতে চাহ, যদি তোমরা নিজের জাতিধর্ম্ম রক্ষা করিয়া স্বজাতির পরিচয় দিতে চাহ, অগ্রে পুরোহিতগণের জাতীয় অধঃপতন দূর কর ও তাঁহাদের প্রতি সকরুণ দৃষ্টিপাত কর। উহারা বাঁচিলেই হিন্দুধর্ম্ম ও ও হিন্দুজাতি জগতে বাঁচিয়া থাকিবে। নতুবা সকলই জাঁহান্নমে চলিয়া যাইবে।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম।

পুরাকালীন ও আধুনিক।

পুরাকালীন আর্য্যসমাজের বর্ণাশ্রমধর্ম্মের কথা মনে উদিত হইলে, হৃদয় আহ্লাদে স্বতঃ নৃত্য করিয়া উঠে। জগতে কোন কালে কোন ধর্ম্ম বা কোন দেশে কোন জাতি মানবশিক্ষার এমন সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি উদ্ভাবিত করিতে পারে নাই। চীন হইতে পেরু পর্য্যন্ত সমগ্র মানবসমাজ তন্ন তন্ন করিয়া পর্য্যালোচনা কর, এমন অলৌকিক শিক্ষাপ্রণালী, এমন সর্ব্বাঙ্গীন মনোহর দৃশ্য কোথাও তোমার নয়নপথে পতিত হইবে না। যে জ্ঞানগরিষ্ঠ আর্য্যঋষিগণ ভারতে আর্য্যসভ্যতাজ্যোতি বিকীর্ণ করেন ও সনাতন হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করেন, তাঁহারাই নিজ নিজ জীবন ও চরিত্র গঠনের জন্য চারি আশ্রমধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন।

এই আশ্রমধর্ম্মের গুণে ভারত চিরদিন ধর্ম্মের পবিত্র ক্ষেত্র ও পীঠস্থান! ইহারই গুণে অর্দ্ধভূমণ্ডলবিস্তৃত বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতে জন্মগ্রহণ করে, যাহার অনুকরণে খৃষ্টধর্ম্মও পাশ্চাত্য জগতে কালক্রমে প্রচারিত হইয়াছে। ইহারই গুণে ভারত আয়ুর্ব্বেদ, দর্শন, অঙ্কশাস্ত্র জ্যোতিষ প্রভৃতি নানা বিদ্যায় সমগ্র জগতের আদিগুরু। ইহারই গুণে ভারত পূরাকালে প্রাচ্যজগতে অলৌকিক সভ্যতাজ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া ত্রিংশ শতাব্দী ব্যাপিয়া সতেজে ও সগৌরবে সেই সভ্যতা ভোগ করে। ইহারই গুণে প্রাচ্য দর্শন, আয়ুর্ব্বেদ, সংস্কৃত দেবভাষা ও সনাতন হিন্দুধর্ম্ম কালের সর্ব্বসংহারিকা শক্তি উপেক্ষা করত আমাদের জাতীয় গৌরবের অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ এখনও ভূমণ্ডলে জাজ্বল্যমান। ইহারই গুণে ভারতের আধ্যাত্মিকতা চিরদিন এত অধিক স্ফুরিত। ইহারই গুণে ভারতবাসী চিরদিন এত অধিক ধর্ম্মপরায়ণ ও নীতিপরায়ণ,

যে জন্য গ্রীকদূত মেগাস্থেনিস ও চীনপরিব্রাজকেরা তাঁহার এত সুখ্যাতি করিয়া গিয়াছেন। যে দেশে আশ্রমধর্ম্ম উদ্ভাবিত, সে দেশ জগতে কত ধন্য! যে জাতি ইহার নিয়মাবলি দ্বারা চিরদিন নিয়ন্ত্রিত ও উপকৃত, সে জাতি জগতে কত ধন্য! আর যে জাতির বংশধরেরা ইহার কথা শ্রবণ করিয়া পূর্ব্বপুরুষদিগের কীর্ত্তিকলাপ স্মরণ করে, তাহারাও জগতে কত ধন্য!

পুরাকালে আর্য্যসমাজের অশেষ মঙ্গলের জন্য কুলপরম্পরাগত বর্ণবিভাগ বা জাতিভেদপ্রথা প্রচলিত হইয়া যেমন সমাজ একদিকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতিতে বিভক্ত হইয়াছিল, তেমনি অপরদিকে ব্যক্তিবিশেষের, বিশেষতঃ শ্রেষ্ঠ জাতিদের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের জন্য, আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক উন্নতি সাধনের জন্য মানবজীবনকে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুক এই চারি আশ্রমে বিভক্ত করা হয়। তন্মধ্যে গৃহস্থাশ্রম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহাতে চারি বর্ণের সমান অধিকার। অপর তিন আশ্রম কেবল দ্বিজজাতির জন্য বিহিত ছিল।

পুরাকালে আর্য্যসমাজের অশেষ মঙ্গলোদ্দেশে এই চারি আশ্রম-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হওয়াতে মানব কি প্রকারে জীবনের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বেদান্তাদি অধ্যয়ন করিয়া ও সংযমাদি শিক্ষা করিয়া উভয় লোকের প্রকৃত শ্রেয়োলাভ করিতে পারিবেন, বা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ ধর্ম্মের এই চতুবর্গ ফল লাভ করিতে পারিবেন, তাহাই ভালরূপ শিক্ষা দেওয়া হইত। সমাজ বল, মানবজীবন বল, ধর্ম্মের ফলাফল বল, বেদ বল, নীতি বল, প্রত্যেকের চারি বিভাগ দেখা যায়। এজন্য সংসারে চারি বর্ণ বা জাতি, চারি আশ্রমধর্ম্ম, ধর্ম্মের চতুবর্গ ফল, চতুর্ব্বেদ ও সামদানভেদাদি চারি প্রকার নীতি প্রচলিত আছে। এইরূপ নানাবিষয়ে চারি প্রকার বিভাগ করাতে যোগসিদ্ধ মহর্ষিগণের অগাধ বিদ্যাবুদ্ধির সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়।

এই চারি আশ্রমধর্ম্মপালনই তৎকালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই তিন শ্রেষ্ঠ জাতির জাতীয় জীবন গঠনের পূর্ণ আদর্শ ছিল। এই চারি আশ্রমের কঠোর নিয়মাবলি বিধিবৎ পালন করিয়া তাঁহাদের জীবন ও চরিত্র ভালরূপ গঠিত হইত এবং শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্যক সাধিত হইত। এই আশ্রমধর্ম্মপালন করিয়াই তাঁহারা স্ব স্ব জীবন বরীয়ান ও মহীয়ান করিয়া গিয়াছেন। এই আশ্রমধর্ম্ম পালন করিয়াই তাঁহারা কালোচিত শিক্ষার পরাকাষ্ঠা লাভ করিতেন। যথার্থ বলিতে কি, এই আশ্রমধর্ম্ম পালন করাতেই ব্রাহ্মণজাতির আধ্যাত্মিকতা ও সদাচারিতা, ক্ষত্রিয়জাতির শৌর্য্যবীর্য্য ও সংগ্রামনৈপুণ্য এবং বৈশ্য জাতির শিল্পনৈপুণ্য এত অধিক স্ফুরিত হইয়াছিল।

যৎকালে সমগ্র মেদিনীমণ্ডল ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, যৎকালে আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার মূলমন্ত্রদাতা গ্রীশ ও রোম অসভ্য অবস্থা হইতে আদৌ উন্মুক্ত হইতে পারে নাই, তৎকালে স্বর্ণময়ী ভারতভূমি এই আশ্রমধর্ম্মের গুণে সমুজ্জ্বল সভ্যতালোকে উদ্ভাসিত হইয়াছিল ও নানাবিষয়ে অলৌকিক উন্নতি দেখাইয়াছিল। কি আয়ুর্ব্বেদ, কি জ্যোতিষ, কি দর্শনাদি বিদ্যা, সকল বিষয়েই এই আশ্রমধর্ম্মের গুণে জ্ঞানগরিষ্ঠ মহর্ষিগণ যে অলৌকিক উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, তাহা এখন শ্মশানসদৃশ ভারতের চিতাভস্মে ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে এবং আমরাও তাঁহাদের অধমাধম বংশধর হইয়া তাহা চক্ষে দেখিয়াও দেখিতে পাইতেছি না। আর আমাদের বিদ্যাশিক্ষায় শতধিক। আমরা কিনা আজ পরের মুখে ইহার যৎকিঞ্চিৎ শ্রবণ করিয়া পূর্ব্বপুরুষদিদগর কীর্ত্তিকলাপ স্মরণ করিতেছি।

এই আশ্রমধর্ম্ম পালন করাতে হিন্দুসমাজ চিরদিন কিরূপ উপকৃত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি।

দেখ, যে ব্রাহ্মণজাতি চিরদিন জ্ঞানধর্ম্মবিষয়ে হিন্দুসমাজের অধিনায়ক, যাঁহারা সমাজে ব্রহ্মবর্চ্চের জন্য সমধিক পূজ্য, তাঁহারা এই আশ্রমধর্ম্ম পালন করিয়া কিরূপ উপকৃত হইয়াছেন। ইহারই গুণে তাঁহারা বাল্যকাল হইতে শমদমাদি জীবনের কঠোর ব্রত অবলম্বন করাতে চিরদিন ধর্ম্মাত্মা, পুণ্যাত্মা, সদাচারী, সত্যব্রত ও নিষ্ঠাপর। আজীবন এই সকল কঠোর ব্রত পালন করাতে তাঁহাদের মনের ব্রহ্মতেজ প্রত্যেক লোমকূপ দিয়া বহির্গত হইয়াছে। এই ব্রহ্মবর্চ্চের জন্য তাঁহারা চিরদিন হিন্দুরাজন্যবর্গের নিকট সমধিক পূজ্য ছিলেন। এই ব্রহ্মতেজ দেখিলেই আমাদের মস্তক ভক্তিভাবে স্বতঃ অবনত হইয়া পড়িয়াছে এবং তাঁহাদের পদরেণু মস্তকে ধারণ করিয়া সকলে কৃতার্থ হইয়াছে। কিন্তু হায়! এখন তাঁহাদের সে ব্রহ্মতেজ কোথায়? তাঁহারা ছিলেন গোক্ষুরা। এখন হইয়াছেন জলঢোরা। সকলই সময়ের ফেরফার। এখন তাঁহারা কেবল নকল তেজে মরেন। আছে কেবল গর্ব্ব ও দেমাক।

এই আশ্রমধর্ম্মের গুণে তাঁহারা চিরদিন নিঃস্বার্থপর ও ভিক্ষোপজীবী। পাছে ধনাগমে মন কলুষিত হইয়া ভোগবিলাসের দিকে কিঞ্চিৎ ধাবিত হয়, এজন্য ভিক্ষাই তাঁহাদের জাতীয় ব্যবসায়। বল দেখি, সমাজের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া কে কোথায় স্বার্থত্যাগের এমন জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারে? পৃথিবীর কোন্ জাতির ভিতর এতদূর স্বার্থত্যাগ দেখিতে পাও? মিসর, পারস্য প্রভৃতি দেশের পুরোহিতজাতি জাতিধর্ম্ম বিলোপের সঙ্গে কালগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। কেবল আশ্রমধর্ম্মের গুণে এক ভারতে ব্রাহ্মণজাতি আমাদের জাতিধর্ম্ম রক্ষা করিয়া এখনও হিন্দুসমাজের পূর্ণ অধিনায়কত্ব ভোগ করিতেছেন।

অন্যান্য দেশে ধর্ম্মযাজকগণ স্বসমাজকে ধর্ম্মের উত্তম দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য বিধিমতে শাস্ত্রাদেশ পালন করেন; কিন্তু তাঁহারা

অনেক সময়ে স্বার্থত্যাগ করিতে পারেন না বলিয়া তাঁহাদের কার্য্যকলাপ উপদেশের বিপরীত ভাব ধারণ করে এবং তাঁহারাও সমাজে ঘৃণিত হইয়া পড়েন। অপরপক্ষে ব্রাহ্মণজাতি এক আশ্রমধর্ম্মের গুণে পূর্ণ স্বার্থত্যাগ করাতে চিরদিন স্বসমাজকে ধর্ম্মের উত্তম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন, তজ্জন্য তাঁহারা চিরদিন সমভাবে পূজিত হইতেছেন। বেশ জানিবে, এক আশ্রমধর্ম্মের গুণেই ব্রাহ্মণজাতি চিরদিন হিন্দুসমাজের অধিনায়ক।

যে ক্ষত্রিয় জাতি আধিভৌতিক বিষয়ে হিন্দুসমাজের অধিনায়ক, যাঁহারা শৌর্য্যবীর্য্য ও সংগ্রামবিদ্যার অনুশীলন করিয়া বহুকাল ভীমপরাক্রমশালী ছিলেন, যাঁহারা ভারতের নানাঅঞ্চলে বাহুবীর্য্যবলে নানা সমৃদ্ধ রাজ্য স্থাপন করিয়া বহুকাল ভারতের ভাগ্যলিপি চালাইয়াছেন, তাঁহারাও এই আশ্রমধর্ম্ম পালন করিয়া প্রথমে কত উন্নতি লাভ করেন, পরে বিলাসসাগরে মগ্ন হইয়া এধর্ম্ম পরিত্যাগ করাতে কালক্রমে কতদূর অবনত হইয়া পড়েন। যে স্থলে ব্রাহ্মণজাতি এক আশ্রমধর্ম্মের গুণে ভিক্ষোপজীবী হইয়া ভোগবিলাসকে সমূলে সংহার করত হিন্দুসমাজের অধিনায়কত্ব চিরদিন ভোগ করিতেছেন, সেস্থলে পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়জাতি আশ্রমধর্ম্ম পরিত্যাগ করাতে ভোগবিলাসে উন্মত্ত হইয়া কালক্রমে দুর্ব্বল ও অবনত হইয়া পড়েন ও রাজশক্তি হারাইয়া বসেন।

যতদিন তাঁহারা আশ্রমধর্ম্ম পালন করিতেন, ততদিন ক্ষত্রিয় বালকগণ উপনয়নের পর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া ভিক্ষোপজীবী না হইয়া শিক্ষাগারে শিক্ষাগুরুর নিকট ধনুর্বিদ্যাদি শিক্ষা করিতেন। এবিষয়ে দ্রোণাচার্য্য গুরুর নিকট কুরুপাণ্ডব বালকদিগের ধনুর্বেদশিক্ষা ভালরূপ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। দ্বিতীয় অবস্থায় তাঁহারা রাজ্যপালন, রাজ্যরক্ষা ও গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন

করিতেন ; পরিশেষে বৃদ্ধাবস্থায় রাজ্য হইতে অবসর লইয়া পারত্রিক মঙ্গলের জন্য বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুকাশ্রম অবলম্বন করিতেন।

ক্ষত্রিয়সমাজে বহুকাল আশ্রমধর্ম্ম পালিত হইয়াছিল। পরে তাঁহারা ভোগবিলাসে আসক্ত হইয়া আশ্রমধর্ম্মপালনে বড় শৈথিল্য দেখান। এই প্রকারে ভারতের নিবীর্য্যকারী জলবায়ুর দোষে তাঁহারা ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের দুর্ব্বলতা দেখিয়া শক, হুন, সিথিয়ান জাতিবর্গ পশ্চিমোত্তর হইতে আগমন করিয়া এদেশে রাজ্য স্থাপন করেন। এই প্রকারে আর্য্যক্ষত্রিয়-জাতির পতন হইল।

ব্রাহ্মণের পক্ষে আশ্রমধর্ম্মের কঠোর নিয়মাবলি। যাঁহারা প্রথম ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে প্রবেশ করিতেন, উপনয়নের পর তাঁহাদিগকে গুরুগৃহে থাকিতে হইত। তথায় ভিক্ষালব্ধ জীবিকায় দিনপাত করত স্বাধ্যায়পর হইয়া শিক্ষাগুরুর নিকট সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করিতেন। গ্রন্থাধ্যয়ন যতদূর হউক বা না হউক, সংযমাদি উত্তমরূপ শিক্ষা করিতে হইত। এইরূপে তাঁহারা গুরুকুলে ছত্রিশ, অষ্টাদশ বা নয় বৎসর কাল বসবাস করিতেন।

তৎকালে তাঁহারা দাসের ন্যায় গুরুর সেবাশুশ্রূষা করিতেন ; তাঁহার হবনের জন্য সমিধ কাষ্ঠ আহরণ করিতেন ; আহূত হইলে তাঁহার নিকট করযোড়ে দণ্ডায়মান হইতেন। অধ্যয়নের প্রারম্ভে ও অবসানে তাঁহাকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিতেন। প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে উদারান্নের জন্য গ্রামে ভিক্ষা করিতে বাহির হইতেন। কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করাতে স্বেচ্ছায় রেতঃস্খলন করিতেন না। ভোগবিলাস, অহঙ্কার, অভিমান কাহাকে বলে, তাহা তাঁহারা স্বপ্নেও জানিতেন না। এই প্রকারে শিক্ষিত হইয়া সকলেই দান্ত, শান্ত, শিষ্ট ও সংযমী হইতেন।

তৎকালে উদরান্নের জন্য কাহাকেও কিছুমাত্র ভাবিত হইতে হইত না। আর্য্যকৃষককুলের যত্নে ও পরিশ্রমে বসুন্ধরা সদা সুফলা, সুজলা, শস্যশ্যামলক্ষেত্রা ছিল। গৃহে গৃহে অপর্য্যাপ্ত ধান্য গোধূম মজুৎ, কাহারও কিছুমাত্র অভাব নাই। এক গৃহস্থের বাটী যাইলে দিনের যথেষ্ট আহার্য্য মিলিত। গৃহস্থগণ মহাপুণ্য ভাবিয়া সকলকে দান করিতেন। সে স্থলে লোকের কিসের অভাব! কিসের দুঃখ! কিন্তু হায়! বহুকাল হইল, ভারতে সে সুখের দিন অস্তমিত হইয়াছে। মুসলমান যুগে সকলেই পেট ভরিয়া আহারাদি করিয়াছে। কিন্তু এখন সুসভ্য যুগে আমরা সামান্য পেটের দায়ে অস্থির, উদরান্নের জন্য সদা লালায়িত।

এই জাতীয় কলিযুগে ব্রাহ্মণ বালকগণ ব্রহ্মচর্য্যের কঠোর ক্লেশ সহ্য করিয়া গুরুকুলে বাস করিতে পারে না; সেজন্য উপনয়ন কালে উহারা ৩।৪ দিনের জন্য ব্রহ্মচারী সজ্জা পরিধান করে ও আত্মীয় স্বজনের নিকট নকল ভিক্ষা করে। আজকাল চতুষ্পাঠীতে ব্রাহ্মণ বালকগণ ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করে না। শিক্ষাগুরুই উহাদের প্রতিপালনের ভার লইয়া থাকেন।

আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রণালীর সহিত অস্মদ্দেশীয় পূর্ব্বতন প্রথার তুলনা করিলে বুঝা যায়, পাশ্চাত্যশিক্ষা যেমন বহুব্যয় সাপেক্ষ, তেমনি ধর্ম্ম ও নীতিবিবর্জ্জিত হওয়ায় ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা বিষয়ে ইহা সম্পূর্ণরূপ অসার ও অকিঞ্চিৎকর। ইহাতে জ্ঞানশক্তি অধিক সুমার্জ্জিত ও জ্ঞানার্জ্জন অধিক হইলেও মনের সংযমাদি শিক্ষা আদৌ হয় না। ইহাতে গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ অতীব শিথিল। অধ্যাপক মহাশয় ছাত্রবর্গকে প্রায় চেনেন না। এরূপ শিক্ষার অপরিহার্য্য ফল অর্জ্জনস্পৃহা ও বিলাসপ্রিয়তা স্বতঃ বলবতী হইয়া থাকে। বিদ্যার গর্ব্ব ও অভিমান আইসে। ছাত্রেরা প্রায় দুর্ব্বিনীত, চপল ও অশিষ্টাচারী হইয়া থাকে। উহাদের চরিত্র প্রায়

প্রবঞ্চনা ও শঠতায় দূষিত হয়। ইহাতে পুস্তকলব্ধ জ্ঞানের সমাদর অধিক। কামানে বারুদ ঠাসার ন্যায় কতকগুলি জ্ঞান মনোমধ্যে ঠাসিয়া পরীক্ষাক্ষেত্রে উদগীরণ করিতে পারিলেই প্রশংসাপত্র পাওয়া যায়। কিন্তু পুরাকালীন শিক্ষাপ্রণালীতে যে পরিমাণে জ্ঞানার্জ্জন আবশ্যক, তাহাই সকলে শিক্ষা করিত। চরিত্রগঠন ও মনের সংযমশিক্ষা ইহাদেরই সম্যক আদর ছিল। এ কারণ হিন্দু-সমাজ চিরদিন এত ধর্ম্মপরায়ণ, ধর্ম্মভীরু, সদাচারী ও সত্যব্রত।

যাঁহারা গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতেন, তাঁহারা পাঠ সমাপনান্তে গুরুদক্ষিণা প্রদান পূর্ব্বক পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়া গৃহসংসার করিতেন। এই সময় তাঁহারা ইন্দ্রিয়জনিত সুখভোগ করিয়া স্ত্রী-পুত্র ও পরিজনবর্গ লইয়া অশেষ সুখে সুখী হইতেন। স্বাধীন ভারতে গৃহস্থ ব্রাহ্মণদিগের সুখের সীমা ছিল না বলিলেই হয়। রাজদত্ত ব্রহ্মত্র ও দেবত্র, গোদান ও প্রচুর দক্ষিণা পাইয়া তাঁহারা কেমন মনোসুখে কাল কাটাইতেন। সাধারণ সমাজে যেমন তাঁহাদের সম্মান ও প্রতিপত্তি, রাজদরবারেও তাঁহাদের তেমনি সম্মান ও ঐশ্বর্য্যলাভ। মনে কোনরূপ চিন্তা নাই। গৃহে কিছুরই অভাব নাই। আজকালের ন্যায় তাঁহারা জঠর যন্ত্রণায় প্রপীড়িত হইতেন না বা ব্রাহ্মণীর বাক্যবাণ সহ্য করিতে হইত না। ক্ষত্রিয়গণ জায়গীরাদি ভোগ করিয়া রাজ্যরক্ষণে ও রাজ্যশাসনে নিযুক্ত থাকিতেন। বৈশ্যগণ স্ব স্ব পৈতৃক ব্যবসা চালাইয়া ধনধান্যে ভোর-পুর থাকিতেন।

পুরাকালে ভারতবাসী গৃহস্থের কি সুখের দিন গিয়াছে! তৎ-কালে অনন্তরত্নপ্রসূতা ভারতমাতা আর্য্যজাতির জন্য অনন্ত রত্ন উৎপাদন করিতেন। চতুর্দ্দিকে শ্যামল শস্যক্ষেত্রগুলি ধান্য, গোধুম ও যবে পূর্ণ। গোমাতার কল্যাণে গৃহে অপর্য্যাপ্ত ঘৃত, দুগ্ধ ও দধি, কিছুরই অভাব নাই। রাজার কোনরূপ অত্যাচার নাই;

করভার নাই; উপসত্বের ষষ্ঠাংশ পাইয়াই তিনি সন্তুষ্ট। যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান বশতঃ অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি দৈব দুর্ঘটনা কিছুই ঘটিত না। সকলের গৃহ ধনধান্যে ও সুখসমৃদ্ধিতে পূর্ণ। সে স্থলে গৃহস্থমাত্রেই কেন না এত সুখী হইবে? স্বাধীন ভারতের কপালে এত সুখ ছিল বলিয়াই পরাধীন ভারতের কপালে ভগবান এত দুঃখ লিখিয়াছেন।

চারি আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থাশ্রমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই আশ্রম চিরদিনই হিন্দুসমাজের মূলভিত্তি, এবং ইহা দ্বারাই অপরাপর আশ্রম প্রতিপালিত হইতেছে।

যস্মাত্ত্রয়ো প্যাশ্রমিণা জ্ঞানোন্নেন চান্বহঃ
গৃহস্থেনৈব ধার্য্যন্তে তস্মজ্জ্যেষ্ঠাশ্রমো গৃহী।

(মনু)

"যেহেতুক তিন আশ্রমের লোক বা (ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ, ও ভিক্ষুক) সমাজের গৃহস্থদিগকে জ্ঞানপ্রদান করে বা উপদেশ দেয়, এবং তৎপরিবর্ত্তে উহাদের নিকট হইতে উদারান্ন লইয়া প্রাণধারণ করে, এ জন্য গৃহস্থাশ্রম সর্ব্বোৎকৃষ্ট।" এ কারণ অপরাপর আশ্রমবাসীদের প্রতিপালনের জন্য হিন্দুগৃহস্থের পক্ষে অতিথি-সৎকার ও ভিক্ষাদান চিরদিন সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম। সে কালে বিলাসিতা সমাজে আদৌ প্রশ্রয় পায় নাই। সকলে কেবল পুণ্যকর্ম্মে মনো-নিবেশ করিতেন।

পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠানই গৃহস্থমার্গের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য-কর্ম্ম।

ঋষয়ঃ পিতরো দেবা ভূতান্যতিথয়স্তথা
আশাসতে কুটুম্বিভ্যস্তেভ্যঃ কার্য্যং বিতানতা।

(মনু)

"ঋষিগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, অতিথিগণ ও অন্যান্য প্রাণিগণ পরিজনবেষ্টিত গৃহস্থের নিকট নিজ নিজ অভীষ্ট সিদ্ধির আশা করে।" বেদাধ্যয়ন, পিতৃলোকের তর্পণ, নিয়মিত সময়ে সন্ধ্যা ও আহ্নিক, অতিথিসৎকার ও আহারকালে অন্যান্য প্রাণিগণকে মুষ্টিমেয় অন্নদান, এগুলি গৃহস্থের অবশ্য প্রতিপাল্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

পুরাকালে হিন্দুসমাজের কি সুব্যবস্থা ও সুবন্দোবস্ত ছিল। ব্রাহ্মণগণ জ্ঞান ও ধর্ম্মের সম্যক অনুশীলন করিয়া স্বসমাজকে ধর্ম্মের পথে চালাইতেন। ক্ষত্রিয়গণ রাজ্যরক্ষণ ও পালন করিতেন। বৈশ্যগণ কৃষিবাণিজ্যাদি করিয়া দেশের অভাব পূরণ করিত। শূদ্রগণ উপরোক্ত তিন শ্রেষ্ঠ জাতির সেবায় নিযুক্ত থাকিত। সকল জাতিই সমাজনেতা দরিদ্র ব্রাহ্মণজাতির ভালরূপ প্রতিপালন করিত। ইহাতে উহারা উদারান্নের চিন্তা হইতে অব্যাহতি পাইয়া কেবল জ্ঞানধর্ম্মানুশীলনে মনোনিবেশ করিতেন।

জগতের নিয়ম এই যে, জ্ঞানধর্ম্মানুশীলনের জন্য যে সমাজের যত অবকাশ থাকিবে, সে সমাজ ততই সভ্যতাসোপানে আরূঢ় হইবে। হিন্দুসমাজের সুব্যবস্থামত জ্ঞানধর্ম্মানুশীলনবিষয়ে ব্রাহ্মণ জাতির অধিক অবকাশ থাকাতে ভারত পুরাকালে সভ্যতাসোপানে আরূঢ় হইয়াছিল। অতএব যে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম দ্বারা হিন্দুসমাজের এমন সুব্যবস্থা কালক্রমে স্বতঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাই ইহার সভ্যতা, শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতিলাভের মূলীভূত কারণ। ইহারই জন্য যে দরিদ্র ভিক্ষোপজীবী ব্রাহ্মণগণ জ্ঞানধর্ম্মের অনুশীলন করিয়া ভারতের পূর্ব্বতন সভ্যতা ও শ্রীবৃদ্ধি আনয়ন করিয়াছেন, তাঁহারাই ধর্ম্মানুসারে আমাদের দানের সুপাত্র। ইহারই জন্য ব্রাহ্মণভোজন, দক্ষিণাদান, ব্রহ্মত্র ও দেবত্রদান চিরদিন হিন্দুসমাজের প্রধান পুণ্যকর্ম্ম। হিন্দুধর্ম্ম সমাজের মঙ্গলের জন্যই এ সকল কর্ম্মে এত পুণ্য

নির্দ্দেশ করিয়াছে এবং নৈষ্ঠিক হিন্দুও এতকাল এই সকল পুণ্যকর্ম্ম সোৎসাহে সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন।

দেখ, যে স্থলে রাজা নিজকর্ম্মচারিবর্গকে যথেষ্ট বেতন দিয়া প্রজাবর্গের নিকট উহাদের সম্মান বর্দ্ধন করতঃ উহাদিগকে বিলাসী করিতেছেন, সেস্থলে সুবিবেচক হিন্দুধর্ম্ম ব্রাহ্মণভোজনে ও দক্ষিণা দানে মহাপুণ্য নির্দ্দেশ করাতে সকলের নিকট ব্রাহ্মণজাতির সম্মান বর্দ্ধন করিয়াছে বটে, কিন্তু উহাদিগকে ভোগবিলাসী আদৌ করে নাই, পরন্তু উহাদিগকে চিরদিন দরিদ্র রাখিয়া দিয়াছে। পাঠক-বর্গ! এখন বুঝিয়া দেখ, ব্রাহ্মণভোজনে পুণ্য নির্দ্দেশ করাতে এ ধর্ম্মের কত অপরাধ!

গৃহস্থাশ্রম কেবলমাত্র কামোপভোগের জন্য নহে। কিন্তু অশেষ ধর্ম্মাচরণই ইহার মূল উদ্দেশ্য. ইহাতে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই শাস্ত্রোক্ত ত্রিবর্গ ফল লাভ করিতে হইবে। ইহাতে প্রেয়সী লইয়া আমরা যেমন দুর্জ্জয় কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া অপত্যোৎপাদন করিব, তেমনি অর্থোপার্জ্জন করিয়া পরিবারপ্রতিপালন, অতিথিসৎকার, পরোপকার, তীর্থভ্রমণ, দেবসেবা প্রভৃতি নানা-ধর্ম্মানুষ্ঠান করিব। ইন্দ্রিয়সংযম ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য আমরা সহ-ধর্ম্মিনী লইয়া গৃহস্থমার্গে প্রবেশ করি। ভার্য্যা ও পুত্রকন্যা ব্যতীত গৃহ আদৌ শোভা পায় না। উহাদের লইয়া আমরা গৃহী। তন্মধ্যে ভার্য্যা গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপা। তদ্‌বিয়োগে আমরা গৃহ-শূন্য হই।

এই প্রকারে সংসারধর্ম্ম করিতে করিতে যখন গৃহস্থ পৌত্রাদির মুখোবলোকন করেন ও গলিতনখদন্ত হন, তখন তিনি পারত্রিক মঙ্গলের জন্য সংসারে বীতরাগ হইয়া বনে গমন করিতেন ও মুনিব্রত ধারণ করিতেন। তৎকালে তিনি জটাবল্কল ধারণ করিয়া পর্ণ কুটীরে বা গিরিগহ্বরে বাস করিতেন। তীর্থভ্রমণ, শাস্ত্রালোচনা ও

তপশ্চরণ করিয়া স্থূলদেহকে জীর্ণ ও শীর্ণ করত আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য চেষ্টা পাইতেন।

জীবনের অন্তিম ভাগে তিনি সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিতেন। তৎকালে তিনি পরিব্রাজক সন্ন্যাসীবেশে যতিব্রত ধারণ করিয়া অস্থিচর্ম্মসার হইতেন ও নিরপেক্ষভাবে পৃথিবী পর্য্যটন করিতেন। তৎকালে তিনি কৌপীনধারী হইয়া ভিক্ষালব্ধ জীবিকায় দিনপাত করত নারায়ণপর হইতেন এবং দিবারাত্র ব্রহ্মধ্যান করিতে করিতে ব্রহ্মে সমাহিতচিত্ত হইতে চেষ্টা পাইতেন। এই প্রকারে অনুক্ষণ ঈশ্বরের ধ্যান করিতে করিতে তিনি জীবনলীলা অবসান করিয়া স্বর্গধামে চলিয়া যাইতেন।

চতুরাশ্রমধর্ম্মের নিয়মাবলি আর্য্যজীবনগঠনের পূর্ণ আদর্শ ছিল। আমাদের প্রপিতামহগণ এই সকল বিধিবৎ পালন করিয়া নিজ নিজ জীবন বরীয়ান ও মহীয়ান করিয়া গিয়াছেন। ইহা দ্বারা আর্য্যসমাজের ঐহিক ও পারত্রিক উভয় প্রকার মঙ্গল সম্যক সাধিত হইত। ব্রাহ্মণগণ কৈশোরে শাস্ত্রাধ্যায়ন করিয়া বিবিধ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতেন, যৌবনে কামরিপু চরিতার্থ করিয়া সংসারের যাবতীয় ধর্ম্মকর্ম্ম সম্পাদন করত স্ত্রীপুত্র লইয়া সুখী হইতেন,বার্দ্ধক্যে পারত্রিক মঙ্গলের জন্য বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুকাশ্রম অবলম্বন করিতেন।

এখন কোন গৃহস্থ পুরাকালের ন্যায় বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুকাশ্রম অবলম্বন করে না। তৎপরিবর্ত্তে অনেকে তীর্থ স্থলে থাকিয়া সাধু-সঙ্গে ঈশ্বরচিন্তা ও ধর্ম্মালোচনা করেন। তীর্থস্থলে জীবনের শেষ ভাগ এই প্রকারে ঈশ্বরচিন্তায় ও শাস্ত্রালোচনায় যাপন করাই কলিকালের বানপ্রস্থ। কোথায় হে পুণ্যাত্মা লালাবাবু! এক ধীবরপত্নীর সামান্য কথায় (বাবু, বেলা যে গেল) আপনি অতুল ঐশ্বর্য্যভোগে জলাঞ্জলি দিয়া শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া জীবনের শেষভাগ

যেরূপ ধর্ম্মকর্ম্মে যাপন করিয়াছেন এবং তথায় যেরূপ অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে আপনি বঙ্গীয় জমিদারকুলের আদর্শ পুরুষ।

মহাত্মা বুদ্ধদেব যেরূপ বেদ ও জাতিভেদপ্রথা অমান্য করেন, সেইরূপ তিনি চতুরাশ্রমধর্ম্মও খণ্ডন করিয়া যান। চারি আশ্রমের পরিবর্ত্তে তিনি কেবল গৃহস্থাশ্রম ও সন্ন্যাসাশ্রম রাখিয়াছিলেন! তন্মধ্যে গৃহস্থগণ সংসারধর্ম্ম পালন করিতেন এবং সন্ন্যাসিগণ গৃহস্থাশ্রম হইতে বিনিবৃত্ত হইয়া স্বধর্ম্মের সেবায় বা উহার প্রচারে ব্রতী হইতেন। এই প্রকারে বৌদ্ধযুগে অনেকে গুরুদত্তমহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া নবোৎসাহে দলে দলে নূতন সন্ন্যাসমার্গ অবলম্বন করিলেন; ইহাতে পুরাকালের ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুকাশ্রম সমাজে রহিত হইয়া গেল।

এই প্রকারে বৌদ্ধযুগে চতুরাশ্রমধর্ম্ম বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইবার পর পশ্চিমোত্তর হইতে যে সকল পরাক্রান্ত পৌত্তলিক জাতি ভারতে আগমন করিয়া নানা স্থানে রাজ্য স্থাপন করিলেন, উহাদের বংশধরেরা পুরাতন ক্ষত্রিয়জাতির সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হওয়াতে রাজপুত নামে নূতন ক্ষত্রিয় জাতি হিন্দুসমাজে উৎপন্ন হইতে থাকে। তাঁহারা সর্ব্বান্তঃকরণে ব্রাহ্মণজাতির ও হিন্দুধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক হইলেন। তাঁহাদেরই সহায়তায় ব্রাহ্মণগণ ভারতে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধনে সমর্থ হন।

এই সময়ে জগৎ-গুরু শঙ্করাচার্য্যদেব হিন্দুসমাজে আবির্ভূত হইয়া বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণের অনুকরণে হিন্দুসন্ন্যাসিকুল প্রবর্ত্তন করিয়া সর্ব্বত্র পৌরাণিক ধর্ম্মের জয় জয়কার সাধন করেন। তদবধি হিন্দুসমাজে যে সকল নূতন সংস্কারকগণ আবির্ভূত হইয়া স্বধর্ম্মের সংস্কার করেন; সকলেই নিজ নিজ সন্ন্যাসিকুল প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন।

আজকাল হিন্দুসমাজে তুইটী আশ্রম দেখা যায়, (১) গৃহস্থাশ্রম (২) সন্ন্যাসাশ্রম; গৃহিগণ গৃহস্থমার্গে থাকিয়া সংসারধর্ম্ম পালন করিতেছেন; আর সন্ন্যাসীগণ সংসারে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া সন্ন্যাসব্রতে ব্রতী হইতেছেন। তাঁহারা শাস্ত্রালোচনা, ধর্ম্মানুষ্ঠান, দেবসেবা, তীর্থভ্রমণ প্রভৃতি পুণ্যকর্ম্মে জীবন যাপন করিতেছেন। সমগ্র ভারতে প্রধানতঃ আজকাল তুই প্রকার সন্ন্যাসী দেখা যায় (১) শৈব (২) বৈষ্ণব। শঙ্করাচার্য্যদেব শৈবসন্ন্যাসী দিগের আদিগুরু। উহারা এখন নানা আখড়ায় ও নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। দাক্ষিণাত্য ও পশ্চিমাঞ্চলের রাজন্যবর্গ ও শেঠেরা চিরদিনই উহাদের প্রতিপালন করিতেছেন। দেখা যায়, বঙ্গ, বিহার প্রভৃতি নারীবহুল দেশে অল্প সংখ্যক লোক সন্ন্যাস ব্রত অবলম্বন করে। কিন্তু মধ্যভারত, মধ্যপ্রদেশ ও দাক্ষিণাত্যে নারীজাতির সংখ্যা অল্প হওয়ায় তথায় বহুসংখ্যক সন্ন্যাসী দেখিতে পাওয়া যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

জাতিভেদ সম্বন্ধে সাধারণ মন্তব্য।

আজকাল আমাদের সুশিক্ষিত বান্ধবগণ জাতিভেদপ্রথার উপর অতীব নারাজ। তাঁহাদের বিশ্বাস, এদেশের কুলপরম্পরাগত জাতিভেদপ্রথা অশেষ দোষাকর; এই কুপ্রথা পৃথিবীর অন্য কোন দেশে দৃষ্ট হয় না। এই কুপ্রথা থাকাতেই ভারত এতকাল পরাধীন, স্বরাজের অযোগ্য ও দীনদরিদ্র। এই কুপ্রথাই আমাদিগকে প্রকৃত জাতীয় উন্নতি সাধন করিতে দিতেছে না। হে জগদীশ! কবে এ কুপ্রথা সমাজে রহিত হইবে? আমরাও সকলে ভাই ভাই

কোলাকুলি করিব এবং যে জাতির ভিতর হউক, সুপাত্রী দেখিয়া বিবাহ করিয়া সুখী হইব।

অপর পক্ষে জনসাধারণ সকল অঞ্চলে এখনও এ প্রথার বিশেষ পক্ষপাতী এবং ইহার নিয়মাবলী বিধিবৎ পালন করিতেছে। যেমন কেহই নিজের প্রাণত্যাগ করিতে চাহে না, তেমনি কোন হিন্দু নিজের জাতিধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতে চাহে না। সকলেই ইহাকে সুপ্রথা বলিয়া মনে করিতেছে। যাহা হউক, ইহার দোষগুণ বিচার করা একান্ত কর্ত্তব্য।

যিনি যাহাই ভাবুন, এদেশের জাতিভেদপ্রথাটী পুরাকালীন মানববুদ্ধির একটী সুমহৎ কীর্ত্তিস্তম্ভ। প্রাচীন কালে জ্ঞানগরিষ্ঠ সমাজতত্ত্বজ্ঞ মহর্ষিগণ এই সুপ্রথা আর্য্যসমাজে স্থাপন করিয়া যান। যেমন তাঁহারা মানবজীবনকে চারি আশ্রমে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক আশ্রমের সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিয়মাবলি নির্দ্দেশ করতঃ ইহার অচিন্তনীয় উন্নতি সাধন করেন, সেইরূপ তাঁহারা স্বসমাজকে চারিবর্ণে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক বর্ণের জাতীয় ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করতঃ ইহার অশেষ মঙ্গল সাধন করিয়া গিয়াছেন। মহর্ষিগণ কে, যে তাঁহারাই এ প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া যান? এ সুপ্রথা আর্য্যসমাজে স্বতঃ উত্থিত হইয়াছে। যথার্থ বলিতে কি, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাই এ প্রথা সৃষ্টি করিয়াছেন।

এস্থলে আমাদের সুশিক্ষিত বান্ধবগণ বলিবেন, যদি পুরাকালের ন্যায় ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে হিন্দুসমাজ কেবলমাত্র চারি জাতিতে বিভক্ত হইত, সে ত মন্দের ভাল ছিল। এখন যে আমরা এক এক জাতি নানা শাখাজাতিতে বা সমাজ উনসোত্তর জাতিতে বিভক্ত দেখিতেছি এবং উহাদের ভিতর পরস্পর বিদ্বেষানল ধূ ধূ জ্বলিতেছে। এই সকল দেখিয়া সমাজকে কি বলিতে ইচ্ছা হয়? ইহাতেই যে হিন্দুসমাজ একেবারে অধঃপাতে গিয়াছে।

আরও দেখ, পুরাকালে জাতিভেদ কুলপরম্পরাগত ছিল না। একজন শূদ্রও ব্রাহ্মণোচিত ক্রিয়াকলাপ অনুসরণ করিয়া ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হইতেন। মহাভারতে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহারা বলেন, পুরাকালে আর্য্য ঋষিগণ সমাজকে চারিবর্ণে বিভক্ত করিয়া সুপ্রথাই স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু পৌরাণিক যুগেই সমাজনেতা ব্রাহ্মণঠাকুরেরা ভারতকে অধঃপাতে দিবার জন্যই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সহিত আধুনিক জাতিভেদ প্রথা স্থাপন করিয়া দেশের প্রকৃত অমঙ্গল সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, তাঁহাদের প্রত্যেক কথার জবাব যথাস্থানে প্রদত্ত হইবে।

এই জাতিভেদপ্রথার উপর হিন্দুসমাজ এতকাল প্রতিষ্ঠিত। ইহাদ্বারাই এ সমাজ স্তরে স্তরে বিভক্ত, বিন্যস্ত ও সম্বদ্ধ। এমন সুশৃঙ্খল ও সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাজপদ্ধতি কোন দেশে নয়নগোচর হয় না। সকল দেশেই এই অনৈতিহাসিক সময়ের সমাজপদ্ধতি কালগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। একমাত্র স্বর্ণময়ী ভারতভূমিতে এ সুপ্রথা, এ প্রাকৃতিক প্রথা এখনও অক্ষুণ্ণপ্রতাপে দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

হিন্দুধর্ম্মের সহিত এ প্রথার সম্বন্ধ অতীব ঘনিষ্ঠ। ইহাই এ ধর্ম্মের সামাজিক রূপের প্রধান অঙ্গ এবং ইহাই হিন্দুসমাজের মূলভিত্তি। ইহাতে অনেকে মনে করেন, যেদিন জাতিভেদপ্রথা উঠিয়া যাইবে, সে দিন হিন্দুধর্ম্মের এক প্রধান অঙ্গ নষ্ট হইবে এবং ইহার সামাজিক রূপের বৈশেষিকত্ব লুপ্ত হইবে। সত্য বটে, কোন কোন সম্প্রদায় এ প্রথা আদৌ মানে নাই; কিন্তু সাধারণ হিন্দুসমাজ এখনও সর্ব্বত্র এ প্রথাকে মস্তকের শিরোমণি করিয়া রাখিয়াছে।

ভারতের ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে, নানাসময়ে নানাসম্প্রদায় উত্থিত হইয়া এই প্রথার উপর সগর্ব্বে পদাঘাত করিয়াছে। কিন্তু অধিকাংশই ইহার উপর দন্তস্ফোট করিতে না পারিয়া কালে ইহার

চরণতলে পতিত হইয়াছে। দেখ, যে প্রবলপ্রতাপান্বিত বৌদ্ধধর্ম্ম এ প্রথার উপর সাহঙ্কারে পদাঘাত করিয়াছিল, সে ধর্ম্ম সহস্রবৎসরেও ইহার কিছুমাত্র অপকার করিতে না পারিয়া মনোদুঃখে ভারত ছাড়িয়াছে। তবে পঞ্চশতাব্দীতে মুসলমানধর্ম্ম ও দুই শতাব্দীতে খৃষ্টধর্ম্ম কতদূর ইহার অনিষ্ট সাধন করিবে ?

এস্থলে জাতিভেদপ্রথার মূলমন্ত্র কি, তাহা বর্ণন করা আবশ্যক। ইতিপূর্ব্বে 'সমাজদেহ' নামক প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি "যেমন জীবদেহে যে সকল জীবাণু দ্বারা যন্ত্রবিশেষ নির্ম্মিত, উহাদের মধ্যে একটী জীবাণু নষ্ট হইলে বা স্বকার্য্য সাধন করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, উহার বংশধরেরা চিরদিন পৈতৃক কার্য্য সম্পাদন করে এবং কস্মিন কালে সে কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অন্য কার্য্যে মনোনিবেশ করে না; সেইরূপ যে সমাজ প্রকৃতির অনুকরণে গঠিত ও নির্ম্মিত, সে সমাজের সন্তানসন্ততিবর্গ পুরুষানুক্রমে পৈতৃক ব্যবসায় চালাইয়া সমাজের সুশৃঙ্খলতা রক্ষা করে; তাহারা কদাচ অন্য বৃত্তি অবলম্বন করে না। তথায় কুলপরম্পরাগত জাতিভেদপ্রথা স্বতঃ উদ্ভূত হয়।"

যে হিন্দুসমাজ প্রকৃতির অনুকরণে গঠিত ও নির্ম্মিত, যাহাতে কৃত্রিমতার লেশমাত্র নাই, যাহা চিরদিন প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার সমধিক আদর করে, সে সমাজ চিরদিন বৃত্তি ও ব্যবসায় অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিভক্ত এবং সে সমাজ এই কুলপরম্পরাগত প্রথাকে পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখিবার জন্য বিবাহাদি বিষয়ে নানা কড়াক্রান্তি বিচার করিতে বাধ্য হইয়াছে।

যেমন প্রকৃতি জীবজগৎ ও উদ্ভিজ্জজগতের যাবতীয় অধিবাসী-বর্গকে নানাজাতিতে বিভক্ত কয়িয়া প্রত্যেক জাতিকে দুর্লঙ্ঘ্য অবরোধে বেষ্টিত করতঃ ইহার জাতীয় উন্নতি সাধন করে; সেইরূপ প্রকৃতিসেবক হিন্দুধর্ম্মও স্বসমাজকে বৃত্তি অনুসারে নানাজাতিতে

বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক জাতিকে দুর্লঙ্ঘ্য অবরোধে বেষ্টিত করত ইহার সম্যক জাতীয় উন্নতি সাধন করিতে চেষ্টা পাইয়াছে। যেমন জীবজগতে দেহস্থ যন্ত্রাদিও দেহযাত্রানির্ব্বাহবিষয়ক পদ্ধতি লইয়া এক জাতি অপর জাতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন; সেইরূপ হিন্দুসমাজেও সংসারযাত্রানির্ব্বাহবিষয়ক পদ্ধতি ও অন্যান্য আচার ব্যবহার লইয়া একজাতি অপর জাতি হইতে লোকপরম্পরায় বিভিন্ন। যেমন জীবজগতে প্রত্যেক জাতি নানা বিষয় লইয়া প্রকৃতিকর্ত্তৃক দুর্লঙ্ঘ্য অবরোধে বেষ্টিত হইয়া সম্পূর্ণরূপ বিভিন্ন থাকে এবং খণ্ডকালে কোন এক জাতি অপর জাতিতে পরিণত হইতে পারে না; সেইরূপ হিন্দুসমাজেও প্রত্যেক জাতি নানা বিষয় লইয়া দুর্লঙ্ঘ্য অবরোধে বেষ্টিত ও সীমাবদ্ধ রহিয়াছে এবং খণ্ডকালে কোন এক জাতি অপর জাতিতে পরিণত হইতে পারে না। কুলপরম্পরাগত জাতিভেদ-প্রথা দ্বারা হিন্দুসমাজ যেরূপ প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় নানা জাতিতে বিভক্ত, এমন প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া কোন দেশে দেখা যায় না।

মানবপ্রকৃতি যেরূপ, তাহাতে সমাজের প্রথম অবস্থায় বৃত্তি অনুসারে কুলপরম্পরাগত জাতিভেদ দ্বারা ইহা বিভক্ত হইলে, ইহার অশেষ মঙ্গল সাধিত হয়; ইহা উন্নতির পথে স্বতঃ ধাবিত হয়। এজন্য পুরাকালে যে সকল জাতি সভ্যতাসোপানে আরূঢ় হয়, উহাদের ভিতর কুলপরম্পরাগত জাতিভেদ স্বতঃ উত্থিত হইয়াছিল এবং সকলেই এতদ্দ্বারা সম্যক উপকৃত হইয়াছিল। পারসীকদিগের ভিতর মেজাই জাতি, রোমানদিগের ভিতর পেট্রী-সিয়ান জাতি, মিসর দেশে পুরোহিতজাতি এবং এদেশের ব্রাহ্মণ জাতি এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ইতিহাসপাঠে অবগত হওয়া যায়, ঐ সকল জাতি কুলপরম্পরাগত জাতিভেদপ্রথা দ্বারা উন্নতির পথে, সভ্যতার পথে সমধিক অগ্রসর হইয়াছিল।

কলিযুগবর্দ্ধনের সঙ্গে মানবসমাজে কৃত্রিম সভ্যতার সমাদর

বর্দ্ধিত হইতেছে। এখন দেশে দেশে যে সভ্যতা দেখা যায়, তাহা প্রাকৃত অবস্থার ব্যভিচার। এখন মানব সকল দেশে প্রকৃতির বিপক্ষে সংগ্রাম করিয়া নিজের সভ্যতা বর্দ্ধন করিতেছেন। এই কৃত্রিম সভ্যতার নিকট যাহা অপ্রাকৃত বা কৃত্রিম, তাহারই অধিক সমাদর এবং তাহাই সমাজে অধিক প্রশ্রয় পায়। এ কারণ যে জাতিভেদপ্রথা প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় নানাদেশে প্রতিষ্ঠিত, তাহা কালক্রমে সে সকল দেশে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

যে বৌদ্ধ, খৃষ্ট ও মুসলমান ধর্ম্ম সমাজের আধিভৌতিক উন্নতি-সাধিকা কৃত্রিম সভ্যতার অধিক পক্ষপাতী এবং যাহাদের নিকট কৃত্রিমতার অধিক গৌরব ও সমাদর, উহারা প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠিত জাতিভেদপ্রথাকে নানাদেশে সমূলোৎপাটন করিয়াছে। সমগ্র জগতের মধ্যে কেবল একমাত্র প্রকৃতি-সেবক সনাতন হিন্দুধর্ম্ম ইহাকে সাদরে স্বসমাজে চিরদিন বজায় রাখিয়াছে। এখন যে সকল দেশে ঐ সকল কৃত্রিম ধর্ম্ম প্রচলিত, তথায় কুলপরম্পরাগত জাতিভেদপ্রথা আদৌ দৃষ্ট হয় না। তৎতৎ সমাজের অধিকাংশ লোক বাল্যকালের সংস্কার উপেক্ষা করতঃ উত্তর কালের শিক্ষানুসারে ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করে। ইহারা বৃত্তি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্তমাত্র।

এস্থলে আমাদের সুশিক্ষিত বান্ধবগণ বলিবেন, যখন আমরা সকল বিষয়ে প্রকৃতির বিপক্ষে গমন করিয়া সভ্যতা লাভ করিতেছি, তখন প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার প্রশংসা করিবার প্রয়োজন কি? জগতের নিয়ম এই, প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া অনুসারে চলিলে প্রকৃতি আমাদিগকে রক্ষণশীল করিয়া অবনতির দিকে লইয়া যাইবে। এজন্য প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠিত জাতিভেদ প্রথা ভারতকে কিছুকাল উন্নতি-সোপানে অগ্রসর করাইয়াছিল সত্য, কিন্তু পরিশেষে রক্ষণ-শীল করিয়া অবনতির পথে আনয়ন করিয়াছে। ইহার জন্য ভারত

এতকাল পরাধীন ও এতদূর অধনত। তবে কেন এ প্রথার প্রশংসা করিতে বসিলে?

এই জাতিভেদ প্রথা দ্বারা হিন্দুসমাজস্থ যাবতীয় লোক চিরদিন সমভাবে অনুশাসিত হইতেছে। বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য, যিনি যে সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হউন না, আস্তিক ও নাস্তিক, যিনি যে মত অবলম্বন করুন না, হিন্দুসমাজে থাকিতে হইলেই তাঁহাকে ইহার জাতিভেদপ্রথা মানিতে হইবে। সেইরূপ রাজা ও প্রজা, কৃষক ও বণিক, ধনী ও নির্ধন, যিনি যে অবস্থায় থাকুন না কেন, বা যেরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করুন না, হিন্দু-সমাজে থাকিতে হইলে তাঁহাকে ইহার জাতিভেদপ্রথা মানিতে হইবে এবং সমাজনির্দ্দিষ্ট কোন না কোন জাতির অন্তর্ভুক্ত হইতে হইবে। ভূমণ্ডলে হিন্দুনামে পরিচিত হইবার অন্য উপায় নাই, অন্য মার্গ নাই; কেবল সমাজনির্দ্দিষ্ট জাতীয় উপাধি দ্বারা সকলে হিন্দুনামে স্বসমাজে ও জগতে পরিচিত হইতেছেন। ঈশ্বর মান, আর নাই মান, দেবদেবী মান আর নাই মান, জগতে হিন্দু বলিয়া পরিচিত হইতে হইলে জাতিভেদপ্রথা সকলের সম্যক মাননীয় ও পালনীয়।

বেশ জানিবে, এ সুপ্রথা হিন্দুসমাজে সামাজিক নির্ব্বাচনে উত্থিত, প্রতিষ্ঠিত ও স্থায়ী এবং ইহার অস্থিমজ্জায় নিহিত। ইহা দ্বারা হিন্দুসমাজ অশেষরূপে উপকৃত বলিয়া ইহা এতকাল ভারতে স্থায়ী হইয়াছে। যদি ইহা কোন কালে সমাজের অনুপযুক্ত হইত, ইহা স্বতঃ পরিত্যক্ত হইয়া যাইত। একবার ভাব দেখি, এ প্রথা দ্বারা হিন্দুসমাজ কিরূপ সুচারুরূপে চালিত হইতেছে এবং ইহার যাবতীয় অভাব ও অনাটন পূর্ণ হইতেছে।

দেখ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণজাতি জ্ঞান ও ধর্ম্মের অনুশীলন করিয়া জাতীয় জ্ঞানভাণ্ডার বর্দ্ধন ও স্ফুরণ করিতেন এবং চতুর্দ্দিকে ধর্ম্মভাব

বিকীর্ণ করিতেন। ক্ষত্রিয়জাতি শৌর্য্যবীর্য্য ও সংগ্রামবিদ্যার অনুশীলন করিয়া দেশ রক্ষা পালন ও শাসন করিতেন। বৈশ্যজাতি কৃষিবাণিজ্যাদি চালাইয়া সমাজের যাবতীয় অভাব ও অনাটন পূর্ণ করিত। শূদ্র জাতি উপরোক্ত তিন শ্রেষ্ঠ জাতির সেবা শুশ্রূষায় দিনপাত করিত। সকল জাতিই নিজ নিজ জাতীয় ব্যবসায় চালাইয়া সংসারযাত্রা সুখে নির্ব্বাহ করিত। এক জাতি অপর জাতির সত্ত্বের উপর অনধিকার চর্চ্চা করিত না, কেহ কাহারও জাতীয় বৃত্তি নষ্ট করিতে চেষ্টা পাইত না। সকলেই নিজ নিজ পৈতৃক ব্যবসায় চালাইয়া পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিত ও সমগ্র সমাজকে সুচারুরূপে চালাইত। এই প্রকারে হিন্দুসমাজে সর্ব্বজনীন সামঞ্জস্য ও সুশৃঙ্খলতা স্থাপিত হইয়াছিল।

স্বাধীন ভারতে হিন্দু রাজন্যবর্গের আমলে হিন্দুসমাজ এই প্রথা দ্বারা কিরূপ অশেষ সুখে সুখী হইয়াছিল, তাহা পরাধীন ভারত আদৌ বুঝিতে পারিবে না। তৎকালে এই প্রথাকে পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখিবার জন্য তাঁহারা কোন জাতির কোন লোককে বৃত্তিবিপর্য্যয় করিতে দেন নাই। দেখ, আদর্শরাজা শ্রীরামচন্দ্র শূদ্র তপস্বীর মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন এবং আদর্শগুরু দ্রোণাচার্য্য নিষাদ-রাজকুমার একলব্যের বৃদ্ধাঙ্গুলি ছেদন করিয়াছিলেন। ইহাতে বুঝা উচিত, কোন এক জাতির লোক অপর জাতির বৃত্তি অবলম্বন করিতে না পারে, তাহা পরিদর্শন করা রাজাদিগের এক প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছিল।

বৌদ্ধযুগেই বৃত্তিবিপর্য্যয় ঘটিতে আরম্ভ হয়; এজন্য মগধে নন্দবংশের ন্যায় অপরাপর শূদ্র জাতিও ভারতের নানা প্রদেশে রাজত্ব করিয়া গিয়াছে। পৌরাণিক যুগে আধুনিক জাতিভেদপ্রথা সর্ব্বত্র স্থাপিত হইবার পর ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গ বৃত্তিবিপর্য্যয় যাহাতে না ঘটিতে পারে, সে বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন; পরে

মুসলমান ও খৃষ্টান যুগে বৃত্তিবিপর্য্যয় পদে পদে দেখা দিয়াছে। যাহা হউক, হিন্দু রাজাদিগের গুণে এ প্রথা এমন অক্ষুন্নপ্রতাপে এতকাল ভারতে বিদ্যমান রহিয়াছে। তাঁহাদেরই গুণে এ প্রথা হিন্দুসমাজে এমন বিশ্বজনীন সামঞ্জস্য ও সুশৃঙ্খলতা স্থাপন করিয়াছে।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন :—

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ,
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ।
শমোদম স্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব
জ্ঞানবিজ্ঞনাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্।
শৌর্য্যং তেজোধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নং
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষত্রকর্ম্ম স্বভাবজম্।
কৃষি গোরক্ষাবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রাস্যাপি স্বভাবজম।

(গীতা।)

"স্বভাবসিদ্ধ গুণ বশতঃ বা স্বভাবতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের জাতীয় কর্ম্ম বা বৃত্তি সংসারে ভালরূপ বিভক্ত রহিয়াছে। শম, দম, তপস্যা, সদাচার, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুশীলন ও আস্তিকভাব এই সকল গুণ ব্রাহ্মণজাতির স্বভাবসিদ্ধ। এই সকল কর্ম্ম ও গুণ থাকাতে তাঁহারা ব্রাহ্মণ নামে খ্যাত। শৌর্য্য,বীর্য্য, তেজস্বিতা,ধৈর্য্য,কার্য্যদক্ষতা,রণক্ষেত্রে পলায়ন না করা,দানশীলতা ও সকল বিষয়ে প্রভুত্ব খাটান,এই সকল গুণ ক্ষত্রিয়ের স্বভাবসিদ্ধ। এই সকল গুণে বিভূষিত হইলে তিনি ক্ষত্রিয় নামের উপযুক্ত। কৃষিকার্য্য, গোপালন ও বাণিজ্য, এ সকল কর্ম্ম বৈশ্যজাতির স্বভাবসিদ্ধ। উপরোক্ত তিন শ্রেষ্ঠ বর্ণের সেবাই শূদ্র জাতির স্বভাবসিদ্ধ কর্ম্ম।"

এখন একবার ভাব দেখি, সমাজের প্রত্যেক জাতি কত কাল ব্যাপিয়া স্ব স্ব জাতীয় ব্যবসায় বা বৃত্তি পুরুষানুক্রমে চালাইবার

পর শাস্ত্রকারেরা উহাদিগকে শাস্ত্রে স্বভাবসিদ্ধ বলিয়া প্রতিপাদন করিতে পারেন? এইরূপে লোকপরম্পরায় ও পুরুষানুক্রমে জাতীয় ব্যবসায়গুলি সমাজে চলিতে চলিতে যুগের পর যুগ শতাব্দীর পর শতাব্দী অতীত হইয়াছে, তবে উহারা স্বভাবসিদ্ধ বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস জন্মিবে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে তিন সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া এ প্রথা হিন্দুসমাজে চলিতেছে।

এস্থলে আমাদের সুশিক্ষিত বান্ধবগণ বলিবেন, যে অনার্য্য জাতি পরাজিত হইয়া আর্য্যসমাজভুক্ত হইয়াছিল, উহাদের বংশধর-দিগকে নিঘৃণ্য শূদ্র নামে অভিহিত করিয়া ক্রীতদাসের ন্যায়, গর্দ্দভের ন্যায় চিরদিন খাটান কি পরাক্রান্ত আর্য্যজাতির ভাল কাজ হইয়াছে? উহারা কি চিরদিন অপর জাতির পা টিপিয়া মরিবে ও কস্মিন কালে আপনাদের অবস্থা উন্নত করিতে পারিবে না, ইহাও কি ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার? উহারা চিরদিন সমাজের সেবা করিতেছে, অথচ উহারা অস্পৃশ্য,উহাদের ছায়া মাড়াইলে স্নান করিতে হয়, এ সব কি ঘোর অত্যাচার নহে?

এই যে পূর্ব্ববঙ্গের নমঃশূদ্র জাতি এতকাল ধরিয়া সমাজের সেবা করিতেছে, অথচ উহাদের জলস্পর্শ করিতে নাই, উহাদিগকে ঘরে উঠিতে দিতে নাই, বসিতে দিতে নাই, ইহাও কি ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার? আদিম নিবাসী বলিয়া কি উহাদিগকে এতদূর ঘৃণা করা উচিত? যদি বল, উহারা বড় অনাচারী, উহাদের উচ্ছিষ্টজ্ঞান নাই, উহারা ঘৃণার পাত্র। উহাদিগকে সদাচারী করিয়া লও, সম-সম্মে সত্ত্ববান কর, ইহাই ত মহতের চিহ্ন। কেহ কেহ বলিবেন, শূদ্রজাতির উপর দুর্ব্যবহারের জন্যই ব্রাহ্মণজাতির আজকাল এত দুর্দ্দশা উপস্থিত। সবে মাত্র কলির সন্ধ্যা; এখনও তাঁহাদের ভাগ্যে কি আছে, তাহাও কেহ জানেন না।

এই জাতিভেদপ্রথা দ্বারা হিন্দুসমাজ আবহমান কাল ধর্ম্মের

নিগড় বন্ধনে আবদ্ধ। কি রাজাধিরাজ, কি পথের কাঙ্গাল, সকলেই এ প্রথা দ্বারা সমসূত্রে আবদ্ধ। সকলেই ইহার কোন না কোন নির্দ্দিষ্ট সীমার অন্তর্ভুক্ত। যেমন হিন্দুসমাজ বৃত্তি অনু-সারে ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিভক্ত, তেমনি প্রত্যেক জাতির সীমা প্রকৃষ্ট পদ্ধতিতে নির্দ্ধারিত ও নিরূপিত আছে। কোন জাতির কোন লোক জাতীয় সীমা অতিক্রম করিতে পারে না। আবার যৎসামান্য ভেদাভেদ লইয়া এক এক জাতি কয়েক শ্রেণিতে, এক এক শ্রেণি কয়েক শাখাশ্রেণিতে, এক এক শাখাশ্রেণি কয়েক গোত্রে, এক এক গোত্র কয়েক বংশে চিরদিন বিভক্ত আছে। বংশ-বিশেষ ইহার কৌলিক উপাধি দ্বারা চিহ্নিত। এই প্রকারে প্রত্যেক জাতির সীমা যতদূর সম্ভব নিরূপিত ও স্থিরীকৃত হইয়াছে।

এই প্রকারে সমাজবিভাগ হওয়াতে হিন্দুসমাজে যে কত সামঞ্জস্য ও সুশৃঙ্খলতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ইহার যে কত মঙ্গল সম্পাদিত হইয়াছে, তাহা বর্ণনাতীত। যেমন সুশাসিতরাজ্যের প্রত্যেক খণ্ড শাসকবৃন্দের নখদর্পণে থাকে বা ইহার ভূচিত্রে অঙ্কিত থাকে, সেইরূপ যে সমাজ সুচারুপে শৃঙ্খলাবদ্ধ, সে সমাজের প্রত্যেক বক্তি ইহার কোন না কোন সুনির্দ্দিষ্ট সীমার বা জাতির অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

যদিও কুলপরম্পরাগত জাতিভেদ প্রথা অন্য কোন দেশে দেখা যায় না; কিন্তু ইহার পরিবর্ত্তে তথায় কোন না কোনরূপ সমাজ-বিভাগ আছে। সে সমাজ যেমন বৃত্তি অনুসারে নানা শ্রেণিতে বিভক্ত, তেমনি প্রত্যেক শ্রেণি আবার বিদ্যা ও অর্থ লইয়া এক-প্রকার বিভিন্ন। তথায় ধনবান দরিদ্রের সহিত মিশ্রিত হন না বা বিবাহাদি সূত্রে আবদ্ধ হন না, পণ্ডিত মূর্খের সংস্রবে থাকেন না ও আহারাদি করেন না। অন্যান্য দেশে অর্থ ও বিদ্যা মান-সম্ভ্রমের আকর; কিন্তু এদেশে আভিজাত্যই মানসম্ভ্রমের আকর।

ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে উচ্চ সম্ভ্রান্ত বংশদিগের সীমা প্রকৃষ্টরূপ নির্দ্ধারিত দেখা যায়। যখন লর্ডের জ্যেষ্ঠ পুত্র পৈতৃক উপাধি, মান সম্ভ্রম ও বিষয়ের উত্তরাধিকারী হন,তখন এ প্রথাকে কুলপরম্পরাগত জাতিভেদ জ্ঞান করা উচিত। প্রভেদের মধ্যে এই যে, তথায় এক জ্যেষ্ঠপুত্র ব্যতীত অন্যান্য পুত্রগণ কুলোচিত সম্মানে বঞ্চিত হন এবং দেশের রাজা লোকবিশেষকে গুণানুসারে বা ইচ্ছামত লর্ড উপাধিতে বিভূষিত করিতে পারেন। কিন্তু এদেশের হিন্দুসমাজ এক প্রকৃতিদেবী ব্যতীত অন্য কাহারও হস্তে এরূপ ক্ষমতা অর্পণ করে নাই। স্বয়ং প্রকৃতিদেবী যাঁহাকে ব্রাহ্মণের ঘরে প্রেরণ করিবেন, তিনিই জগতে চিরদিন ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হইবেন।

এক জনকে ব্রাহ্মণ করিবার ক্ষমতা সমাজের নাই, ব্রাহ্মণ জাতির নাই, অধ্যাপকের নাই, পুরোহিতের নাই; রাজারও নাই, এবং কাহারও নাই। কিন্তু যিনি অসাধারণ পুণ্যবলে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিবেন এবং শাস্ত্রোক্ত বিবিধ সংস্কারে সংস্কৃত হইবেন, তিনিই এসংসারে প্রকৃত ব্রাহ্মণ এবং তিনিই চিরদিন ব্রাহ্মণ জাতির মানসম্ভ্রমে বিভূষিত হইবেন। সেইরূপ অপরাপর জাতির লোক-বর্গকে এক প্রকৃতিদেবীই বংশোচিত ও কুলোচিত মানসম্ভ্রমে বিভূষিত করিতেছেন। ইহাতে কোন জাতির অপর উৎকৃষ্ট জাতির হিংসা করিবার কিছুমাত্র কারণ নাই।

হিন্দুধর্ম্মের আদেশ, সকলেই নিজ নিজ জাতীয় ব্যবসা চালাইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে ও সমাজের সেবা করিবে। শ্রেষ্ঠ জাতি যেমন শ্রেষ্ঠ বৃত্তি চালাইয়া সমাজের সেবা করে,নিকৃষ্ট জাতিও তেমনি নিকৃষ্ট বৃত্তি চালাইয়া সমাজের সেবা করিবে। ব্রাহ্মণ যেমন পূজার্চ্চনা করিয়া ও ধর্ম্মোপদেশ দিয়া সমাজের সেবা করিতেছেন, একজনচাষাও তেমনি ক্ষেত্রে শস্যোৎপাদন করিয়া সমাজের আহার্য্য সরবরাহ করিতেছে ও ইহার সেবা করিতেছে। ক্ষত্রিয়

যেমন রাজ্য রক্ষা ও পালন করিয়া সমাজের সেবা করিতেছেন, একজন মেতরও তেমনি লোকের ময়লা দূর করিয়া সমাজেরই সেবা করিতেছে।

উৎকৃষ্ট হউক, অপকৃষ্ট হউক, যিনি যে কাজ করুন না কেন, সকলেই নিজ নিজ কর্ম্ম দ্বারা সমাজের সেবা করিতেছে ও তদ্দ্বারা ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য করিয়া তাঁহার আরাধনা করিতেছে। অর্থোপার্জ্জন করিয়া সংসারধর্ম্ম চালান সকল কর্ম্মের মূল উদ্দেশ্য হইলেও আমরা এই সকল কর্ম্ম করিয়া একমাত্র ঈশ্বরের সেবা করিতেছি। সকলকে আশ্বাসবাণী দিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিতেছেন ঃ—

যতঃ প্রবৃত্তি র্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততং
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ

(গীতা)

"যে অন্তর্যামী ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, যাঁহা হইতে এই চরাচর বিশ্বের উৎপত্তি, প্রত্যেক মানব নিজ নিজ কর্ম্ম দ্বারা তাঁহারই আরাধনা করে ও সিদ্ধিলাভ করে।"

মুখে ঈশ্বরকে শতবার ডাকিলেই কি তাঁহার আরাধনা করা হইবে, তাহা কদাচ ভাবিও না। কায়মনোবাক্যে তাঁহার প্রিয় কার্য্য ও সমাজের কার্য্য কর, ইহাই তোমার প্রকৃত ঈশ্বোপাসনা। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, খৃষ্ঠান, মুসলমান, বৌদ্ধ ও কাফরি, যিনি সংসারের যে কাজ করুন না কেন. সকলেই সেই এক ঈশ্বরের কার্য্য করিতেছে, তদ্দ্বারা তাঁহারই আরাধনা করিতেছে। উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, মাষ্টার, কেরাণি, বণিক ও কৃষক, যিনি সংসারে যে কাজ করুন না কেন, সকলেই স্বকর্ম্ম দ্বারা সমাজের সেবা করিতেছেন ও তদ্দ্বারা ঈশ্বরের আরাধনা করিতেছেন। এ সংসারে নিজ নিজ কর্ত্তব্যপালনই প্রকৃত ঈশ্বরোপাসনা।

জাতিভেদপ্রথারূপ মহৎ হর্ম্ম্যটী হিন্দুসমাজে তিন মূলভিত্তির উপর প্রোথিত ও প্রতিষ্ঠিত। যদি ইহা এক ভিত্তির উপর স্থাপিত হইত, অন্যান্য দেশের ন্যায় এদেশেও এ প্রথা কোন্ কালে লুপ্ত হইয়া যাইত। কিন্তু তিন দিক হইতে তিনটী মূলভিত্তি একাধারে মিলিত হইয়া এই মহৎ হর্ম্ম্যকে চিরদিন ধারণ করিয়া আছে। ইহাতে কালের সর্ব্বসংহারিকা শক্তি উপেক্ষা করত এ প্রথা এখনও ভারতগগনে স্বীয় মস্তক উত্তোলন পূর্ব্বক সগর্ব্বে দেদীপ্যমান আছে। এক ভিত্তি বা দুই ভিত্তি কালে ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে, ইহা ধ্বংস পাইবে না। কিন্তু যখন তিনটী মূলভিত্তি যুগপৎ ধূলিসাৎ হইবে, তখনই এ হর্ম্ম্য ভূতলশায়ী হইবে। ইহার তিনটী মূলভিত্তি যথা :—

(১) জাতীয় ব্যবসায় বা বৃত্তি।

(২) বিবাহবিষয়ক নিয়মাবলী ও কড়াক্রান্তি বিচার।

(৩) খাদ্যাখাদ্যের বিচার।

যে সকল বৃত্তি অনুসারে অন্যান্য সমাজ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত, সেই সকল বৃত্তি এদেশে পুরুষানুক্রমে চালিত হওয়াতে জাতিভেদপ্রথা যেমন কালক্রমে উত্থিত হইয়াছে, তেমনি সমাজের সন্তানসন্ততিবর্গ চিরদিন পৈতৃক ব্যবসায় পুরুষানুক্রমে চালনা করাতে এ প্রথা এতকাল বজায় রহিয়াছে। যদি লোকে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য সময়গতিকে বাধ্য হইয়া পৈতৃক ব্যবসায় ত্যাগ করে, ইহাতে এ প্রথার অনিষ্টোৎপত্তি হইতে পারে। সেজন্য সমাজ-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা ইহা অপেক্ষা আরও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর ইহাকে স্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বিবাহবিষয়ক নিয়মাবলি ও কড়াক্রান্তি বিচার এবং খাদ্যাখাদ্যের বিচার প্রবর্ত্তন করিয়া তাঁহারা ইহাকে আরও সুদৃঢ় করিয়াছেন। ইহারই জন্য এক জাতির পুত্র কন্যাগণ কস্মিন কালে অপর জাতির পুত্রকন্যাদিগের সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইতে পারে না এবং এক জাতির লোকেরা শ্রেষ্ঠ

ব্রাহ্মণ জাতি ব্যতীত অপর কোন জাতির হস্তপক্ক অন্ন ভোজন করিতে পারে না।

বৃত্তিবিপর্য্যয়ের ন্যায় খাদ্যাখাদ্যের বিচারে শৈথিল্য দেখাইলে এ প্রথার বিস্তর অনিষ্ট ঘটিবে বটে; কিন্তু যে দিন বিবাহবিষয়ক নিয়মাবলী উল্লঙ্ঘিত হইবে, সে দিন এই জাতিভেদপ্রথা সমূলে বিনষ্ট হইবে, সে দিন এতকালের এমন সুরম্য হর্ম্ম্য ধূলিসাৎ হইবে। যাঁহারা বিদেশে গিয়া ম্লেচ্ছ খাদ্য ভোজন করেন, তাঁহারা বাধ্য হইয়া খাদ্যাখাদ্যের বিচারে শৈথিল্য দেখান। এখন তাঁহারা আর জাতিচ্যুত হন না। এখন দেখা যাউক, বিবাহবিষয়ক নিয়মাবলী কতকাল হিন্দুসমাজে নিখুঁৎরূপে প্রতিপালিত হইতে থাকে।

জাতিভেদ প্রথার অনেক গুণ। এ প্রথা চিরপ্রচলিত বলিয়াই হিন্দুধর্ম্ম যুগে যুগে স্বশত্রুবর্গকে পরাস্ত করিয়া ভারতে নিজ প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ। এ প্রথা চিরপ্রচলিত বলিয়াই হিন্দুজাতি এত রাষ্ট্রবিপ্লব ও ধর্ম্মবিপ্লবের মধ্যেও নিজের অস্তিত্ব ও জাতীয়তা বজায় রাখিতে সমর্থ। এ প্রথা চিরপ্রচলিত বলিয়াই তুমি এখনও হিন্দুনামের গৌরব করিতেছ, এখনও তোমার শিরায় শিরায় বিশুদ্ধ আর্য্যশোণিত বহমান, এখনও তুমি বেদবেদান্ত, রামায়ণ ও মহাভারত চক্ষে দেখিতেছ। এ প্রথা চিরপ্রচলিত বলিয়াই তোমার বুদ্ধিশক্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি এত অধিক স্ফুরিত এবং তোমার হস্তনির্ম্মিত শিল্প ও কারুকার্য্য দর্শনে জগৎ বিস্মিত ও স্তম্ভিত। এ প্রথা চিরপ্রচলিত বলিয়াই তুমি এত ধর্ম্মভীরু ও ধর্ম্মপরায়ণ এবং তোমার ভার্য্যা, দুহিতা, ভগিনী ও বধূ এত অধিক পতিপরায়ণা ও সাধ্বী। এ প্রথা চিরপ্রচলিত বলিয়াই তোমার পারিবারিক সুখসম্ভার অন্য দেশ অপেক্ষা এত অধিক বর্দ্ধিত।

আবার এ প্রথার দোষও অনেক। এ প্রথা চিরপ্রচলিত বলিয়াই হিন্দুসমাজ এতকাল কলহানলে ও বিদ্বেষানলে কলুষিত।

এ প্রথা চিরপ্রচলিত বলিয়াই একতাভাব সমাজের স্তরে স্তরে এতকাল জাজ্বল্যমান। এ প্রথা চিরপ্রচলিত বলিয়াই ভারত ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত হইয়া এতকাল অশান্তির নিকেতন ও যুদ্ধবিগ্রহের লীলাভূমি। এ প্রথা চিরপ্রচলিত বলিয়াই ভারত গৃহবিচ্ছেদে নিজের স্বাধীনতা হারায় এবং এতকাল অপর জাতির পদানত। এ প্রথা চিরপ্রচলিত বলিয়াই আমাদের জাতীয় জীবন হিংসা, দ্বেষ ও একতাভাবে চিরদূষিত। এই কুপ্রথাই আমাদের জাতীয় উন্নতিসাধনের প্রধান অন্তরায়। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মুখে শুনিতে পাই, যতদিন ভারতে এ কুপ্রথা থাকিবে, ততদিন আমরা ইংরাজ-রাজের নিকট স্বায়ত্তশাসন ও স্বরাজলাভে একান্ত অনুপযুক্ত।

যাহা হউক, এ প্রথার দোষের ভাগ অধিক, কি গুণের ভাগ অধিক, তাহাই এস্থলে বিচার্য্য।

জাতিভেদের উৎপত্তি ও বিস্তৃতি

হিন্দুশাস্ত্রমতে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতি সৃষ্টি করিয়াছেন। ব্রাহ্মণজাতি তাঁহার মুখ হইতে, ক্ষত্রিয়জাতি তাঁহার বাহুযুগল হইতে, বৈশ্যজাতি তাঁহার উরুদ্বয় হইতে এবং শূদ্রজাতি তাঁহার পাদদেশ হইতে উদ্ভূত। বেশ জানিবে, এ প্রথার প্রাচীনত্ব জ্ঞাপনার্থ শাস্ত্রকারেরা ঐরূপ লিখিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ কোন্ সময়ে এ প্রথা আর্য্যসমাজে প্রথম উত্থিত হইল, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। যখন এ প্রথা আর্য্যসমাজে স্বতঃ কালক্রমে উদ্ভূত, তখন বলা উচিত, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাই ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা।

শাস্ত্রে পাঠ করি, যুগযুগান্তর হইতে চতুর্ব্বর্ণ জগতে প্রাদুর্ভূত আছে এবং ব্রাহ্মণজাতি ব্রহ্মার মানসপুত্র বশিষ্টাদি মহর্ষির বংশ হইতে ও ক্ষত্রিয়জাতি চন্দ্রসূর্য্য দেবতাদিগের বংশ হইতে উদ্ভূত। এ কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? প্রাচীন যুগের যে সকল মহাত্মা

অধ্যাত্মবিজ্ঞানে ব্যুৎপন্ন হইয়া যোগসিদ্ধ হইতেন, তাঁহারাই শাস্ত্রোক্ত মহর্ষি। তাঁহাদেরই বংশে ব্রাহ্মণজাতি কালবশে উদ্ভূত হইয়াছেন। সেইরূপ যে সকল দেবরূপী মানব প্রাচীন যুগে পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়া শিল্পাদি শিক্ষাদিয়া ইহাকে সভ্যতাজ্যোতিতে উদ্ভাসিত করেন, তাঁহাদেরই বংশ হইতে আধুনিকযুগের রাজন্যবর্গ উদ্ভূত। এজন্য ভারতবর্ষ, চীন, মিসর প্রভৃতি সভ্যদেশগুলির পুরাতন রাজবংশ দেববংশের সহিত অশেষপ্রকারে সম্বন্ধ, একথা নানাশাস্ত্রে পাওয়া যায়।

এখন নানাশাস্ত্র মন্থন করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ জাতিভেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে যেরূপ মতামত প্রকাশ করিতেছেন, তাহাই এস্থলে বর্ণন করিব। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত, অতি প্রাচীনকালে আর্য্যসমাজে এ প্রথা আদৌ প্রচলিত হয় নাই, কারণ ঋকবেদের প্রাচীনতম সূক্তগুলিতে ইহার কোনরূপ নিদর্শন পাওয়া যায় না। ইহার দশম মণ্ডল, যাহা সর্ব্বপেক্ষা আধুনিক, তাহাতেই এ প্রথার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহাদের মত, পুরাকালে আর্য্যসমাজ যে প্রণালীতে গঠিত ও পরিবর্দ্ধিত, ইহার অপরিহার্য্য ফলস্বরূপ কুলপরম্পরাগত জাতিভেদপ্রথা সমাজে কালক্রমে স্বতঃ উত্থিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

যৎকালে আর্য্যজাতি পাঞ্জাবে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া আদিম-নিবাসী অনার্য্যজাতিবর্গকে সমরে পরাস্ত ও বশীভূত করিতে থাকেন, তৎকালে আর্য্যসমাজ দুইভাগে বিভক্ত ছিল, আর্য্য ও অনার্য্য। আর্য্যজাতি হইতে দ্বিজবংশীয় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এবং অনার্য্যজাতি হইতে শূদ্রজাতি সমুৎপন্ন। তৎকালে আর্য্যসমাজে জাতিভেদপ্রথা উত্থিত হয় নাই।

বৈদিক যুগে যাগযজ্ঞ সমাজে প্রবর্ত্তিত হইবার পর যাঁহারা যজ্ঞস্থলে মন্ত্রাদি পাঠ করিতেন এবং যাঁহাদের মন্ত্র শক্রসংহার ও বারিবর্ষণ প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় কর্ম্মে অভীষ্ট ফল প্রদান করিত,

তাঁহারা সমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিতেন। তাঁহারা মহর্ষি নামে খ্যাত হইতেন। তৎকালে লিপিবিদ্যা প্রচলিত না থাকাতে তাঁহারা মন্ত্রগুলি মুখে মুখে উত্তরাধিকারীদিগকে শিক্ষাদিয়া যাইতেন। এই প্রকারে আর্য্যসমাজে বংশবিশেষ মন্ত্র লইয়া বিশেগ প্রতিপত্তি লাভ করিতে থাকে। তদীয় বংশধরেরা পুরুষানুক্রমে উৎকৃষ্ট মন্ত্রগুলির উত্তরাধিকারী হওয়াতে তাঁহাদের সামাজিক প্রতিপত্তি ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইতে থাকে। এই সকল উৎকৃষ্ট মন্ত্র তৎকালে ব্রহ্মনামে কথিত হইত এবং যাঁহারা উহাদের অধিকারী, তাঁহারা ব্রাহ্মণ উপাধি পাইতেন।

কালক্রমে আর্য্যসমাজ আরও উন্নতির পথে অগ্রসর হইলে, যজ্ঞগুলিকে বহুব্যাপারবিশিষ্ট ও আড়ম্বরশালী করিয়া ব্রাহ্মণগণ আপনাদের সামাজিক প্রভুত্ব আরও বদ্ধমুল করিতে চেষ্টা পাইলেন। এইপ্রকারে তাঁহারাই কালক্রমে সমাজের অধিনেতৃত্ব পদে আরুঢ় হন এবং দেবভাষাও বেদবেদান্তাদি তাঁহাদের হস্তে থাকায় তাঁহারা আপনাদের জাতীয় প্রভুত্ব চিরদিন অক্ষুন্ন রাখিতে সমর্থ হন।

অনেকে অনুমান করেন, পাঞ্জাবের অন্তর্গত ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রদেশে জাতিভেদ প্রথা প্রথম উত্থিত হয়। একদিনে, এক কলমের আঁচড়ে, এক পণ্ডিত' বা এক রাজা কর্ত্তৃক ইহা আর্য্যসমাজে প্রবর্ত্তিত হয় নাই। কিন্তু কালের পর কাল, শতাব্দীর পর শতাব্দী অতীত হইতে ২ এ প্রথা সমাজে ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইয়াছে। অতএব সিদ্ধান্ত করা উচিত, সামাজিকনির্ব্বাচনে এ সুপ্রথা আর্য্যসমাজে উত্থিত হইয়াছে এবং আর্য্যজাতির বহুবিস্তৃতির সঙ্গে ইহা ভারতের অন্যান্য প্রদেশে নীত ও প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

যে সকল ব্রহ্মমন্ত্রের অধিকারী হওয়াতে শ্রেষ্ঠ আর্য্যগণ—ব্রাহ্মণ উপাধি পাইতেন, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ উহাদের অপরূপ অর্থ করিতেছেন। তাঁহাদের মতে ইহারা অসভ্য অশিক্ষিত আর্য্যকৃষক-

কুলের অবোধ্য মন্ত্র বা ভীতিসংবলিত গীতমাত্র। যেমন আজকাল অসভ্য সমাজে অশিক্ষিত কল্পনাপ্রিয় মানব কতকগুলি অবোধ্য মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক যন্ত্রণাগ্রস্ত লোকের যন্ত্রণা দূর করে, বিকৃত মস্তিষ্কের প্রলাপ নিবারণ করে, ভূত প্রেতাদি তাড়ায় ও সাপের বিষ ঝাড়ায়, সেইরূপ ব্রাহ্মণদিগের ব্রহ্মমন্ত্র সেই কল্পনাপ্রধান কুসংস্কারাচ্ছন্ন যুগে আর্য্য কৃষককুলের জন্য বারি বর্ষণ করাইত ও অনার্য্য জাতির পরাজয়ে উহাদের সাহায্য করিত। দেখ! দেখ! ব্রহ্মমন্ত্রের কিরূপ অবমাননা ও লাঞ্ছনা!

যে ব্রহ্মবিদ্যা বা অধ্যাত্মবিজ্ঞান ব্রাহ্মণ জাতির প্রপিতামহ যোগসিদ্ধ মহর্ষিগণ যোগবলে প্রাপ্ত হন, যে ব্রহ্মবিদ্যাকে তদীয় বংশধরেরা কলিযুগে পাইয়া আপনাদের আধ্যাত্মিক অবনতির সহিত উহার বিকৃত অর্থ করিতে করিতে ক্রমশই কলুষিত করিয়া ফেলেন, সেই স্বর্গীয় ব্রহ্মবিদ্যার অপভ্রংশ বা ভগ্নাবশেষ আজকালের চতুর্ব্বেদ—এই চতুর্ব্বেদের বাহ্য অর্থ দেখিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ব্রহ্মমন্ত্রসম্বন্ধে যে সকল সিদ্ধান্ত করিতেছেন, তাহা নৈষ্ঠিক হিন্দুর অশ্রোতব্য।

অন্যান্য জাতির উৎপত্তিবিষয়ে তাঁহাদের মতামত। পঞ্জাবের নানাস্থানে উপনিবেশ স্থাপিত হইবার পর রাজতন্ত্রপ্রণালী সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়। তৎকালে অশেষ শৌর্য্যবীর্য্যশালী যোদ্ধারাই প্রত্যেক আর্য্যসমাজের অধ্যক্ষ হইয়া অধিকৃত লোকবর্গকে শাসন করিতেন ও যুদ্ধক্ষেত্রে পরিচালিত করিতেন। সমাজের অনাটন বশতঃ কতকগুলি অসমসাহসিক বীরপুরুষ অধিপতিবর্গের চতুষ্পার্শ্বে সমবেত হইয়া পুরুষানুক্রমে শৌর্য্য বীর্য্য ও সংগ্রামবিদ্যা অনুশীলন করিতে লাগিলেন। অপর কতকগুলি আর্য্য যুদ্ধবিদ্যা পরিত্যাগ করিয়া কৃষিকর্ম্মাদি সমাজের শান্তিজনক কর্ম্মে মনোনিবেশ করিলেন। যুদ্ধে পরাভূত কতকগুলি অনার্য্য আর্য্যদিগের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইল।

এই প্রকারে তৎকালে শ্রমবিভাগ লইয়া আর্য্যসমাজ ভিন্ন ভিন্ন

শ্রেণিতে বিভক্ত হইয়াছিল। সমাজের সেই আদিম অবস্থায় প্রকৃতিসিদ্ধ পুরুষানুক্রমিকতাই বলবতী হইয়া থাকে। এজন্য সকলেই পুরুষানুক্রমে পৈতৃক ব্যবসায় চালাইতে থাকে। এই পুরুষানুক্রমিকতাবশত, কুলপরম্পরাগত জাতিভেদপ্রথা কালক্রমে আর্য্যসমাজে প্রতিষ্ঠিত ও বদ্ধমূল হইয়াছে। যুদ্ধে ব্যাপৃত বা রাজ্য শাসনে নিযুক্ত বিক্রমশালী পুরুষেরা ক্ষত্রিয় নাম প্রাপ্ত হন। কৃষিপ্রভৃতি সমাজের আবশ্যকীয় কর্ম্মে নিযুক্ত জনসাধারণ বৈশ্যনাম ধারণ করেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন জাতি আর্য্যজাতি হইতে উদ্ভূত। তাঁহারা শ্রেষ্ঠ জাতির চিহ্নস্বরূপ যজ্ঞোপবীত চির-দিন ধারণ করিয়া আসিতেছেন। আর্য্যসমাজভুক্ত আদিমনিবাসিগণ শূদ্র নাম প্রাপ্ত হইল এবং আজপর্য্যন্ত শ্রেষ্ঠ জাতিদের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত আছে।

ভারতের ইতিহাস তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলে বুঝা যায়, অতীত কালে জাতিভেদের প্রধান তিনটী সংস্করণ হইয়া গিয়াছে, যথাঃ—

(১) বৈদিকযুগে প্রথম সংস্করণ।

(২) স্মার্ত্তযুগে দ্বিতীয় সংস্করণ।

(৩) পৌরাণিক যুগে তৃতীয় সংস্করণ।

এই সকল ভিন্ন সংস্করণ বশতঃ জাতিভেদপ্রথা ভারতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে। তাহার সাক্ষ্য দেখ, আর্য্যসমাজের জাতিভেদ আর আধুনিক হিন্দুসমাজের জাতিভেদ, ইহাদের ভিতর আকাশপাতাল প্রভেদ দেখা যায়।

পুরাকালে ব্রাহ্মণজাতি অন্যান্য জাতি হইতে বিভিন্ন হইলেও এক জাতি ছিল। ইহার কোনরূপ শ্রেণীবিভাগ বা শাখা-শ্রেণী-বিভাগ ছিলনা। আজকালের ন্যায় দোবে, চোবে, তেয়ারী, বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বিভাগ ছিলনা। বিবাহাদি

বিষয়ে এত কড়াক্রান্তি বিচার ছিল না এবং সমাজে অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ চলিত। জাতিভেদের প্রথম অবস্থায় একজন শূদ্রও ব্রাহ্মণকুলোচিত অনুষ্ঠান অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভে সমর্থ হইত। যতদিন না সমাজে সুশৃঙ্খলতা স্থাপিত হইয়াছে, ততদিন এরূপ ব্যবহার অপরিহার্য্য। অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ হইতে স্মার্ত্তযুগে যে সকল বর্ণশঙ্কর উত্থিত হয়, উহারা কালক্রমে এক এক বিশিষ্ট জাতিতে পরিণত হইয়াছে।

বৌদ্ধযুগে যখন লোকে দলে দলে বৌদ্ধধর্ম্মের আশ্রয় লইতে থাকে, তখন ব্রাহ্মণগণ জাতিভেদপ্রথা দ্বারা ঐ ধর্ম্মের বিস্তৃতি রোধ করিতে চেষ্টা পান বটে; কিন্তু ভালরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। শ্রেষ্ঠ জাতিবর্গ দমনে রহিল; কিন্তু অধিকাংশ লোক এ প্রথার শাসন মানিল না। এজন্য উত্তরকালে প্রত্যেক জাতির নানা শ্রেণীবিভাগ আরম্ভ হইয়া সমাজশাসন আরও দৃঢ়তর হইতে থাকে। সহস্র বৎসর বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার পর যখন হিন্দুধর্ম্ম ইহার পৌরাণিক ও তান্ত্রিক রূপ বিকাশ করিয়া ঐ ধর্ম্মের উপর জয়লাভ করে, তখন ভারতের বৌদ্ধগণ হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার অবলম্বন করাতে ও দেবদেবীর পূজার্চ্চনা করাতে কালক্রমে তিন শতাব্দীর ভিতর একেবারে হিন্দু হইয়া গেল এবং হিন্দুসমাজ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের নামগন্ধ উড়িয়া গেল।

পৌরাণিক যুগে ভারতের হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের বংশধর সকলকে লইয়া বৃত্তি অনুসারে আধুনিক জাতিভেদ প্রথা সর্ব্বত্র স্থাপিত হয়। পুরাকালের প্রথাই আধুনিক প্রথার মূলভিত্তি। প্রথমোক্তের যে সকল দোষ, বিশৃঙ্খলতা ও অসামঞ্জস্য ছিল, সে সকল কাঁটিয়া ছাঁটিয়া ভালরূপ সংশোধন করা হইয়াছে। আধুনিক প্রথা সেই প্রাচীনকালের প্রথা হইতে ক্রমবিবর্ত্তিত ও ক্রমবিকসিত হইয়াছে। যেমন আধুনিক পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম সেই প্রাচীন কালের

বৈদিক ধর্ম্ম হইতে ক্রমবিবর্ত্তিত, সেইরূপ ইহার সর্ব্বপ্রধান সামাজিক প্রথাও সেই বৈদিক যুগের প্রথাকে মূলভিত্তি করিয়া কালক্রমে স্ফুরিত, বিকসিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে।

সনাতন হিন্দুধর্ম্মের বিশেষত্ব এই, কি ধর্ম্মরূপ, কি সামাজিক রূপ, কোন বিষয়ে ইহা ইহার মূলপ্রকৃতি কস্মিন কালে পরিহার করে নাই। সকল বিষয়েই ইহা প্রাচীন মূলভিত্তির উপর নূতন বৃহৎ হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিয়াছে। এজন্য আধুনিক জাতিভেদপ্রথা পুরাকালীন প্রথার উন্নত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ মাত্র। পুরাতন উপাদানরাশি যেমন তেমনি আছে। তদ্ভিন্ন দেশকালপাত্রভেদে অনেক নূতন নূতন উপাদানরাশি সংযুক্ত করা হইয়াছে।

ভারতের ভৌগোলিক সংস্থান পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়, ইহার ভিতর কতকগুলি দুর্লঙ্ঘ্য অবরোধ মধ্যে মধ্যে ব্যবহিত হওয়াতে ইহার এক প্রদেশ অন্য প্রদেশ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। যেমন প্রত্যেক প্রদেশের ভাষা এক প্রাকৃতিক ভাষা হইতে উদ্ভূত হইলেও নানা কারণে বিভিন্ন, সেইরূপ প্রত্যেক প্রদেশের জাতিবিভাগ এক মৌলিক আদর্শ অনুসারে গঠিত হইলেও নানা-কারণে বিভিন্ন দেখা যায়। বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণাদি জাতিবর্গের যেরূপ শ্রেণিবিভাগ, অন্যান্য প্রদেশের সেরূপ নয়। সকল প্রদেশে জাতি-বিভাগ সম্বন্ধে যথেষ্ট ইতরবিশেষ দেখা যায়।

হিন্দুসমাজস্থ প্রত্যেক জাতির জাতীয় গৌরব এক বৃত্তি অনুসারে স্থিরীকৃত। যে ব্রাহ্মণজাতি জ্ঞানধর্ম্মের অনুশীলন করিয়া ইহাকে চিরদিন চালাইতেছেন, তাঁহাদের বৃত্তি সর্ব্বোৎকৃষ্ট। যে ক্ষত্রিয় জাতি শৌর্য্যবীর্য্যের অনুশীলন করিয়া পূর্ব্বে দেশ রক্ষা ও পালন করিতেন, তাঁহাদের বৃত্তি দ্বিতীয় স্থানীয়। যে বৈশ্যজাতি কৃষি, গোপালন, বাণিজ্যাদি করিয়া সমাজের অনাটন পূরণ করিতেছেন, তাঁহাদের বৃত্তি তৃতীয়স্থানীয়। যে শূদ্রজাতি চিরদিন উপরোক্ত

তিন শ্রেষ্ঠ জাতির সেবা করিতেছে, উহাদের বৃত্তি নিকৃষ্ট। চণ্ডাল, মেতর, মুর্দ্দফরাস, ডোম, বাগ্‌দী, হাড়ী, ও মুচী এই সকল অন্ত্যজ জাতির ব্যবসায় অতীব ঘৃণাস্পদ।

বৃত্তি অনুসারে জাতিভেদপ্রথা হিন্দুসমাজে প্রতিষ্ঠিত হইলেও, নানা সময়ে বৃত্তিবিপর্য্যয় ভারতে ঘটিয়াছে। বৌদ্ধযুগে যখন জাতিভেদপ্রথা একপ্রকার রহিত হইয়া যায়, তখন বৃত্তিবিপর্য্যয় পদে পদে ঘটিয়াছিল। আজকাল ইহা যেমন সর্ব্বত্র দেখা যাইতেছে, মুসলমান যুগেও তেমনি দেখাদিয়াছিল। কিন্তু ভিক্ষোপজীবী ব্রাহ্মণ জাতির জাতীয় ব্যবসায় সমাজের অন্য কোন জাতি কস্মিন কালে অবলম্বন করিতে পারে নাই। অর্থকরী ক্ষত্রিয়বৃত্তি অপরাপর জাতি নানা সময়ে অবলম্বন করিয়া জাতীয় সম্মান বর্দ্ধন করিয়া গিয়াছে।

যেমন আজকাল অর্থকরী পাশ্চাত্য বিদ্যা শিক্ষা করিয়া অধিকাংশ জাতি নিজ নিজ জাতীয় সম্মান বর্দ্ধন করিতে যত্নবান, সেইরূপ পূর্ব্বেও বিশেষতঃ বৌদ্ধ ও মুসলমান যুগে কোন কোন বৈশ্য বা শূদ্রজাতি ক্ষত্রিয়োচিত শৌর্য্যবীর্য্য অনুশীলন করিয়া নিজ নিজ জাতীয় প্রতিপত্তি বর্দ্ধন করিয়া লইয়াছে। আরও দেখা যায়, কোন কোন শূদ্রজাতি বৈশ্যজাতির পৈতৃক ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া দেশবিশেষে জাতীয় সম্মান বর্দ্ধন করিয়াছে।

জাতীয় বৃত্তির পর আচার ব্যবহার প্রত্যেক জাতির জাতীয় গৌরব বর্দ্ধন করে। যেমন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতি শাস্ত্রোক্ত আচার ব্যবহার অবলম্বন করাতে সর্ব্বত্র শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া গণ্য, সেইরূপ আবার অনার্য্যজাতিসম্ভূত শূদ্র জাতির মধ্যে যে জাতি যে প্রদেশে শাস্ত্রোক্ত আচার ব্যবহার অবলম্বন করে, সে জাতির তদনুরূপ প্রতিপত্তি ও সম্মান দেখা যায়। তাহার সাক্ষ্য, বঙ্গদেশের কুম্ভকার ও তন্তুবায়জাতির যেরূপ পদমর্য্যাদা, মধ্যভারতে এই দুই

জাতির সেরূপ জাতীয় সম্মান নাই। তথায় কুম্ভকার জাতি শূকর প্রতিপালন করে ও তন্তুবায় জাতি (কোরী) গোমাংস ভক্ষণ করে; এজন্য উহারা অন্ত্যজ জাতি। পশ্চিমাঞ্চলের কাহার জাতির যেরূপ পদগৌরব, বঙ্গদেশে দুলে জাতির সেরূপ নহে। ও দেশের বেনেরা বৈশ্যজাতি, এদেশে সুবর্ণবণিকদিগের জল অস্পৃশ্য। বল্লালসেন তাঁহাদের এ দুর্দ্দশা ঘটাইয়াছেন। সমাজের অধিনায়ক ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতি যে দেশে যে জাতির পদমর্য্যাদা বাড়াইয়াছে, সে জাতি সে দেশে সেইরূপ সম্মানিত হইতেছে।

এখন প্রত্যেক জাতির বাহ্যসীমা প্রকৃষ্টরূপ নির্দ্ধারিত ও দুর্লঙ্ঘ্য অবরোধে বেষ্টিত। এখন জাতিবিশেষের কোন লোক অপর জাতিতে পরিণত হইতে পারে না। এ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবার পর প্রথম অবস্থায় সকল সমাজ অল্পাধিক বিশৃঙ্খলতায় পূর্ণ থাকে, পরে বহু দিবসান্তে সমাজে সুশৃঙ্খলতা স্বতঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়। এখন প্রত্যেক জাতির সীমা যেরূপ সুনির্দ্দিষ্ট, প্রথম অবস্থায় সেরূপ হওয়া অসম্ভব। এ কারণ পুরাকালে প্রত্যেক আর্য্যসমাজে ভিন্ন ভিন্ন জাতির বিমিশ্রণে নানা বর্ণশঙ্কর উৎপন্ন হইয়া প্রয়োজনমত ভিন্ন ভিন্ন জাতি সৃষ্ট হইয়াছিল। এ কারণ মহাভারতাদি গ্রন্থে দেখা যায়, এক জন শূদ্রও জ্ঞানধর্ম্মের অনুশীলন করিয়া ব্রাহ্মণের ন্যায় সম্মানিত হইতেন এবং মনুস্মৃতিতে অসবর্ণ বিবাহ অনুমোদিত হইয়া থাকে।

যে সময়ে সমাজের যেরূপ অনাটন, সে সময়ে তথায় সেইরূপ প্রথা প্রচলিত হইয়া থাকে। যখন বলদৃপ্ত আর্য্যজাতি নব্য ভারতের সুজলা ও সুফলা ভূমি প্রথম ভোগ করিতে ছিলেন, তখন লোকসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য অসবর্ণ বিবাহ একরূপ অপরিহার্য্য। জাতিভেদের প্রথম অবস্থায় যখন সমাজ নানা বিশৃঙ্খলতায় পূর্ণ থাকে, তখন অনুলোম

ও প্রতিলোম বিবাহ একরূপ অপরিহার্য্য। এজন্য শাস্ত্রে উহাদিগকে অনুমোদিত দেখা যায়।

এখন হিন্দুসমাজ প্রায় সকল প্রদেশে জাতিভেদ লইয়া সুশৃঙ্খলতায় পূর্ণ। এখন ঐ সকল নিকৃষ্ট চালচলন সর্ব্বথা ইহার অনুপযুক্ত। এজন্য উহারা এখন শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও লোকাচারবিরুদ্ধ। এখন যদি তুমি ইংরাজদিগের অসদনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়া শাস্ত্রের ঐ সকল প্রমাণ লইয়া অসবর্ণ বিবাহ পুনরায় সমাজে চালিত করিতে চাহ, তুমি কি এমন সুশৃঙ্খলতাপূর্ণ সমাজে বিশৃঙ্খলতা আনয়ন করিবে না বা ইহার ঘোর অনিষ্ট সাধন করিয়া বসিবে না? তাহাতে কি এ সুপ্রথা জাঁহান্নমে যাইবে না? আর যদি এ প্রথাকে জাহান্নমে পাঠাইতে চাহ, জাঁত পাঁত না দেখিয়া মনের সাধে ও মনসুখে যে কোন জাতির ভিতর হউক এক জাতির কন্যা বিবাহ করিয়া সুখসচ্ছন্দে থাক।

সমাজস্থ প্রত্যেক জাতির সীমা কিরূপে নির্দ্ধারিত হইল? এ বিষয়ে সমাজের শীর্ণস্থানীয় ব্রাহ্মণজাতি সর্ব্বাগ্রে সচেষ্ট হন। বিবাহাদি বিষয়ে নানা কড়াক্রান্তি বিচার প্রবর্ত্তন করিয়া তাঁহারা উহাদিগকে বিধিবৎ পালন করিয়া তাঁহারা আপনাদের জাতীয় সীমা নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। সত্য বটে, প্রথম অবস্থায় অনেক ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ জাতির প্রধান্য লাভে অভিলাষী হইয়া তৎজাতির কুলোচিত ধর্ম্ম পালন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণত্ব লাভে সমর্থ হন। কিন্তু কালক্রমে যখন এ জাতির সীমা প্রত্যেক সমাজে প্রকৃষ্টরূপ নির্দ্ধারিত হইয়া আসিল, তখন অপর কোন জাতির কোন লোক ব্রাহ্মণত্ব লাভে সমর্থ হয় নাই। ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভুত বিশ্বামিত্র তপোবলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন; কিন্তু বুদ্ধদেব তাহা লাভ করিতে না পারিয়া জাতিভেদের উপর খড়্গহস্ত হন।

সমাজের অন্যান্য জাতিগুলি ব্রাহ্মণজাতির অনুকরণে নিজ

নিজ জাতীয় সীমা নির্দ্ধারিত করিয়া লইয়াছে। এখনও দেখাযায় দেশভেদে কোন কোন নিকৃষ্ট জাতির সীমা ভালরূপ নির্দ্ধারিত হয় নাই। সকল প্রদেশের আচার ব্যবহার তন্ন তন্ন করিয়া পর্য্যালোচনা করিলে এ বিষয়টী একপ্রকার বুঝা যায়। অনেকে মনে করিতে পারেন, সকল জাতির নেতৃবৃন্দ কি আজকালের ন্যায় সভাসমিতি আহ্বান পূর্ব্বক প্রস্তাবানুমোদনাদি করিয়া নিজ নিজ জাতীয় সীমা নির্দ্ধারিত করিয়া লইয়াছে? যে সামাজিক নির্ব্বাচনে এ প্রথা কালক্রমে উত্থিত হয়, সেই সামাজিক নির্ব্বাচন কালক্রমে প্রত্যেক জাতির সীমা নির্দ্ধারিত করিয়া ইহাকে দুর্লঙ্ঘ্য অবরোধে বেষ্টিত করিয়া দিয়াছে।

সত্য বটে, সমাজের প্রথম বিশৃঙ্খল অবস্থায় অনেক বৈশ্য বা শূদ্র ক্ষত্রিয়োচিত শৌর্য্য বীর্য্য প্রদর্শন পূর্ব্বক অথবা ক্ষত্রিয় জাতির স্বপক্ষে বা বিপক্ষে অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক দেশবিশেষ জয় করত ভোগ করিয়াছে এবং কালক্রমে তদীয় বংশধরকে ক্ষত্রিয় জাতিতে পরিণত করিয়া দিয়াছে; সত্য বটে দেশভেদে অনেক শূদ্র বৈশ্যদিগের কৃষি বাণিজ্যাদি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া আপনাদিগকে বৈশ্য জাতিতে পরিণত করিয়াছে; তথাচ ইহা সুনিশ্চিত, যখন জাতীয় উন্নতির সঙ্গে সমাজস্থ প্রত্যেক জাতির সীমা ভালরূপ নির্দ্ধারিত হইয়া আসিল, তখন কোন জাতির কোন লোক অপর জাতিতে পরিণত হইতে পারে নাই।

যে ব্রাহ্মণজাতি আধ্যাত্মিক বিষয়ে সমাজের অধিনায়ক এবং যে ক্ষত্রিয় জাতি আধিভৌতিক বিষয়ে ইহার অধিনায়ক, উহাদের ভিতর প্রাধান্য লইয়া নানা সময়ে নানা বিবাদবিসম্বাদ চলিয়াছে। পরশুরামকর্ত্তৃক একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়করণ এবং বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের বিবাদ প্রভৃতি পৌরাণিক ঘটনা এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে। কিন্তু যে ব্রাহ্মণজাতি স্বার্থপরতার বশীভূত হইয়া সমাজের পূর্ণ অভিনেতৃত্ব প্রার্থনা করেন, তাঁহারাই বর্ণাশ্রম-

ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিয়া শমদমাদি জীবনের কঠোর ব্রত পালনে মনো-নিবেশ করিলেন, এবং স্বার্থপরতাকে একেবারে জলাঞ্জলি দিয়া সামান্য ভিক্ষোপজীবী হইলেন। ইহাতেই তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বিবর্গ বিমোহিত হইয়া গেলেন এবং তাঁহাদের বিবাদানল চিরদিনের জন্য হিন্দুসমাজে নির্ব্বাপিত হইয়া গেল।

এই প্রকারে ব্রাহ্মণজাতির সামাজিক প্রভুত্ব সকল প্রদেশে প্রায় সমভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু দেশবিশেষে ক্ষত্রিয় জাতি অধিক ক্ষমতাশালী হইয়া ব্রাহ্মণ জাতির প্রাধান্য খর্ব্ব করিয়া দিয়াছেন এবং দেশবিশেষে ব্রাহ্মণ জাতি সমাজে সমধিক প্রাধান্য লাভ করাতে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতির প্রাধান্য নষ্ট করিয়া উহাদিগকে শূদ্র জাতিতে পরিণত করিয়া দিয়াছেন, যেমন বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ জাতি উৎকৃষ্ট তান্ত্রিক ধর্ম্ম প্রচার করাতে সেন বংশীয় রাজন্যবর্গের অনুগ্রহে অধিক ক্ষমতাশালী হইয়া ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতিবর্গের অস্তিত্ব লোপ করিয়া সকলকে শূদ্র জাতিতে পরিণত করিয়াছেন। পালবংশীয় রাজাদের সময় উহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল; উহারা এখন উপনয়নে বঞ্চিত রহিয়াছে।

মনুস্মৃতি প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠে বুঝা যায়, হিন্দুধর্ম্ম ব্রাহ্মণ জাতির প্রতি চিরদিন নানা অনুগ্রহ দেখাইয়া আসিতেছে। আমরা এখন পাশ্চাত্য সাম্যমন্ত্রে দীক্ষিত। আমাদের স্বতঃ মনে হয়, শাস্ত্রকারেরা ব্রাহ্মণ জাতিকে অধিক সত্বে সত্ববান করাতে পক্ষপাত দোষে দূষিত হইয়াছেন। কিন্তু এতকাল হিন্দুসমাজের কোন লোক একবার স্বপ্নেও ভাবে নাই, যে ব্রাহ্মণজাতি দেবতাদিগের ন্যায় পূজ্য, যাঁহারা হিন্দুসমাজের অধিনায়ক, তাঁহাদের প্রতি অযথা পক্ষপাত দেখান হইয়াছে।

যেমন শাসনতন্ত্র শাসকবৃন্দের ক্ষমতা বর্দ্ধনার্থ উহাদের প্রতি স্বতঃ পক্ষপাতী হইয়া থাকে এবং দেশের আইন কানুন সকলের

উপদেশ মতে চলিয়া তুমি ধর্ম্মপথে এত অগ্রসর, একমাত্র জাতি নাশে তিনি আর তোমার মুখাবলোকন করিবেন না। যে পূজ্য পুরোহিতঠাকুর তোমার যাবতীয় ধর্ম্মানুষ্ঠান করান, একমাত্র জাতিনাশে তিনি আর তোমার দ্বারস্থ হইবেন না। যে রজক ও নাপিত তোমার সামান্যরূপ সেবা করে, অথচ যাহারা না থাকিলে তোমার সংসার প্রায় অচল, তাহারা পর্য্যন্ত তোমার উপর বিমুখ হইবে ও তোমার দ্বারস্থ হইবে না। জাতিচ্যুত হইবার পর যখন তোমার প্রাণসম পুত্রকন্যার বিবাহকাল উপস্থিত হয়, তখনই তোমার মস্তকোপরি শত বজ্রাঘাত পতিত হইবে। তখনই পুত্র কন্যার দিকে চাহিয়া তুমি সস্ত্রীক ক্রন্দন করিতে থাকিবে। তখনই তুমি নিজ-কৃত দুষ্কর্ম্মের জন্য মর্ম্মাহত হইয়া অন্তর্দ্দাহে ভালরূপ দগ্ধীভূত হইবে। তখনই সমাজ তোমার উপর বিকট হাস্য হাসিয়া উপদেশ দিবে :—

"সাবধান! সাবধান! ওরে মূঢ়মতি,
সতত জাগ্রত সেই সমাজের পতি।"

এ সংসারে সকলেই আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের নিকট সুখ্যাতির প্রার্থী। এখন যদি কোন গর্হিত কর্ম্ম করাতে তুমি সপরিবারে সবংশে ও সসন্ততিবর্গে চিরদিনের জন্য স্বজনবর্গ হইতে বিয়োজিত হও, একবার ভাব দেখি, সে শাস্তি কতদূর যন্ত্রণাদায়ক, কতদূর হৃদয়-মর্ম্মবিদারক! নিজকৃত দুষ্কর্ম্মের ফল তুমি যে একাকী ভোগ করিবে, তাহা নহে। কিন্তু তোমার ভবিষ্যৎ বংশধরদিগকেও সেই দুষ্কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হইবে।

যেমন মৃত্যু হইলে এই পৃথিবীর সহিত তোমার যাবতীয় সম্পর্ক চিরদিনের জন্য ছিন্ন হয়, সেইরূপ জাতিনাশেও সমাজস্থ সকলের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক চিরদিনের জন্য ছিন্ন হইবে। কিন্তু ভালরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, জাতিনাশ মৃত্যু অপেক্ষা অধিক

ভয়ঙ্কর। মৃত্যুর যন্ত্রণা ক্ষণস্থায়ী ও ইহাতে বংশের মানসম্ভ্রম কিছুই নষ্ট হয় না। কিন্তু জাতিনাশের অন্তর্দ্দাহ ও যন্ত্রণা আজীবনস্থায়ী এবং ইহাতে কুলমর্য্যাদা ও বংশের মানসম্ভ্রম সকলই নষ্ট হইয়া যায়।

যেমন রাজদণ্ডবিহিত দ্বীপান্তরবাসে সমাজচ্যুত ও পরিবারচ্যুত হওয়াতে অশেষ মনকষ্ট পাইতে হয়, সেইরূপ জাতিনাশেও আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হওয়াতে তেমনি মনকষ্ট পাইতে হইবে। যেমন দ্বীপান্তর প্রেরিত হইলে আসামীর নামে সম্বাদপত্রে ডিটি পড়িয়া যায়, তেমনি জাতিচ্যুত হইলে স্বজাতি ও আত্মীয় স্বজনের ভিতর তাহার নামে ডিটি পড়িবে।

আরও দেখ, যাঁহাদের সঙ্গে চিরদিন একত্রে বসবাস করিয়া বা সৌহার্দ্দ্য ও আত্মীয়তা করিয়া তুমি ইহজীবনে অশেষ সুখে সুখী, তাঁহারা যদি কোন গর্হিত কর্ম্মের জন্য তোমায় চিরদিনের জন্য সপরিবারে ত্যাগ করেন, তোমার সঙ্গে আহার বিহার না করেন, এমন কি, তাঁহাদের দ্বারস্থ হইলে তোমায় হুকা পর্য্যন্ত দেন না বা পংক্তিভোজনের সময় পংক্তি হইতে উঠাইয়া দেন, একবার ভাব দেখি তোমার মনে তৎকালে কিরূপ অন্তর্দাহ ও আত্মগ্লানি উপস্থিত হইবে! সে যন্ত্রণা অপেক্ষা কি মৃত্যুযন্ত্রণা সহস্রগুণে শ্রেয়স্কর নয়? ইহারই জন্য হিন্দুসমাজস্থ সকল লোকে জাতি-নাশকে সর্ব্বনাশ জ্ঞান করে এবং যে গর্হিত কর্ম্মে জাতিনাশের সম্ভাবনা থাকে, প্রাণ যায় সেও স্বীকার, তথাপি তাহাতে কেহ হস্তক্ষেপ করিতে চায় না।

জাতিভেদ দ্বারা হিন্দুসমাজ চিরদিন যেরূপ সুশাসনে সুশাসিত হইতেছে, উহার নিকট সভ্যদেশপ্রচলিত রাজনীতির অনুমোদিত বেত্রাঘাত, অর্থদণ্ড, কারাবাস, দ্বীপান্তরবাস, এমন কি প্রাণদণ্ডও অতিতুচ্ছ বোধ হয়। উহার সহিত ইহাদের তুলনাই হইতে পারে

না। সভ্যদেশগুলিতে শাসনতন্ত্রানুমোদিত এমন কঠোর আইন কানুন প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও কেন জনসাধারণ প্রকৃষ্টরূপ শাসিত হইতেছে না? কেন চৌর্য্যাদি অপরাধ তথায় চিরদিন সমভাবে চলিতেছে? সভ্যদেশের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ মহৎ মহৎ দণ্ডবিধি প্রণয়ন করেন এবং তত্রত্য রাজাও লক্ষ লক্ষ রজৎ মুদ্রা ব্যয় করিয়া বৃহৎ বৃহৎ আদালত স্থাপন করেন এবং সুবিচারের জন্য জজ ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করেন; কিন্তু চৌর্য্যাদি অপরাধ চিরদিন সমভাবে চলিতেছে। কিন্তু এদেশে চৌর্য্যাদি রাজদণ্ডনীয় অপরাধ-গুলি যদি জাতিভেদ দ্বারা শাসিত হইত, উহারা হিন্দুসমাজে অশ্রুত হইত।

যদি রাজনীতির অনুমোদিত বেত্রাঘাত, অর্থদণ্ড, কারাবাস দ্বীপান্তরবাস প্রভৃতিকে সমাজশাসনের রাজসিক পদ্ধতি জ্ঞান কর, এদেশের জাতিভেদের সমাজশাসনকে সর্ব্বথা সাত্ত্বিক উপায় জ্ঞান করা উচিত। সত্য বটে জাতিনাশরূপ সমাজশাসন কোন লোককে কোনরূপ শারীরিক যন্ত্রণা দেয় না, অথচ লোকে ইহাকে যতদূর ভয় করিয়া চলিবে, ফাঁসি কাষ্ঠকেও উহারা ততদূর ভয় করিবে না। বল দেখি, পাঠক! কোন ভ্রষ্টা বিধবা অন্তঃসত্ত্বা হইলে রাজদণ্ডকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কেন ভ্রূণহত্যাপাপে লিপ্ত হয়? একমাত্র সমাজশাসনই যে উহার মূলীভূত কারণ, তদ্বিষয়ে কোন-সন্দেহ নাই। একমাত্র জাতিনাশের ভয়ে সেই দুষ্কৃতকারিণী অবলা দেশের কঠোর আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন পূর্ব্বক এত বড় গর্হিত কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়। কেন লোকে বিধবাবিবাহ দিতে বা অসবর্ণ বিবাহ করিতে চায় না? সমাজশাসনই উহার একমাত্র কারণ।

বিজ্ঞ লোকেরা বলিবেন, সমাজশাসন জনসাধারণকে যেরূপ সৎপথে চালিত করে, কঠোর আইন প্রচলিত হইলেও রাজদণ্ডভয়

উহাদিগকে সৎপথে ততদূর রাখিতে পারে না। আদালতের চক্ষে ধূলি প্রদান করা অতি সহজ কথা! এক সাক্ষ্যের গোলমালে, এক কথার মারপ্যাঁচে সব পণ্ড হইয়া যায়। কিন্তু যাহাদের সহিত দিবারাত্র বসবাস করা যায়, যাহারা তোমার নাড়ীনক্ষত্র সমস্তই জানে, তাহাদিগকে প্রতারণা করা অনেক সময় দুষ্কর। এজন্য বলিতেছি, এদেশে জাতিভেদের সমাজশাসন সর্ব্বথা সাত্ত্বিক উপায়।

কোথায় হে জ্ঞানগরিষ্ঠ মহর্ষিগণ! ধন্য তোমাদের বুদ্ধিকৌশল! ধন্য তোমাদের সমাজতত্ত্বজ্ঞান! সমাজস্থ কোন ব্যক্তিকে কারাগারে নিক্ষেপ না করিয়া, দ্বীপান্তর প্রেরণ না করিয়া জাতিভেদপ্রথা প্রতিষ্ঠিত করিয়া তোমরা সমাজশাসনের যে পত্তন করিয়া গিয়াছ, তাহা ভাবিলে জগৎশুদ্ধ লোক বিস্মিত হইবে। পাশ্চত্য জগতের রাজনীতিজ্ঞ দিগ্‌গজ পণ্ডিতগণ বড় বড় দণ্ডবিধি প্রণয়ন করিয়া স্বসমাজকে এমন সুচারুরূপে, এমন সুশৃঙ্খলতার সহিত কদাচ শাসন করিতে পারিবেন না। আমাদের জাতীয় জীবনে এমন সুসময় গিয়াছে, যখন একমাত্র সমাজশাসনের গুণে চৌর্য্যাদি অপরাধ হিন্দুসমাজে অশ্রুত ছিল। এজন্য যবনদূত ও চীনপরিব্রাজকগণ আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের এত সুখ্যাতি করিয়া গিয়াছেন।

সুশিক্ষিত নব্যসম্প্রদায়ের মুখে শুনিতে পাই; হিন্দুসমাজ জাতিভেদপ্রথা দ্বারা অসংখ্যরূপে বিভক্ত হওয়াতে ইহার বলবীর্য্য সবিশেষ মন্দীভূত হইয়াছে এবং ইহা চিরদিন অনৈক্যবিষে জর্জ্জরীভূত হইতেছে। কিন্তু সমাজতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের মতে, যে সমাজের যত অধিক শাসন, সে সমাজের অন্তর্নিহিত শক্তিও ততোধিক; সে সমাজ অত্যল্প কারণে কদাচ বিনষ্ট হইতে পারে না। উচ্ছৃঙ্খলতা ও যথেচ্ছাচারিতাই সমাজমাত্রের মহানর্থকরী। যে সমাজে ইহারা অধিক প্রশ্রয় পায়, সে সমাজ অচিরে ধ্বংসমুখে পতিত হয়।

এখন যে সমাজ জাতিভেদপ্রথা দ্বারা ভালরূপ সুশাসিত, যাহাতে উচ্ছৃঙ্খলতা ও যথেচ্ছাচারিতা আদৌ আশ্রয় পায় না, সে সমাজ প্রভূত শক্তির আধার, সে সমাজ জগতে বহুকাল স্থায়ী হইয়া থাকে। কেন শাসনতন্ত্র স্বরাজ্যকে অষ্টে পৃষ্ঠে শাসনবন্ধনে আবদ্ধ করে? কেন ইহা ঘরের কানাচীতে কানাচীতে চৌকিদার, পাহারাওলা ও গুপ্তচর রাখিয়া সকলকে সুশাসিত করে? হিন্দুধর্ম্ম ও সেইরূপ জাতিভেদপ্রথা দ্বারা স্বসমাজকে অষ্টে পৃষ্ঠে বন্ধন করিয়া সুশাসিত করিতেছে। কিন্তু জাতিভেদরূপ ধর্ম্মনির্দ্দিষ্ট শাসনতন্ত্রকে কোনস্থলে চৌকিদার বা গুপ্তচর রাখিতে হয় না। কোনস্থলে সমাজদ্রোহী কোন গর্হিত কর্ম্ম ঘটিলেই, তাহা স্বতঃ ব্যক্ত হইয়া পড়ে এবং সর্ব্বসাধারণ ইহার শাসন করিয়া থাকে।

হিন্দুসমাজ চিরদিন জাতিভেদ দ্বারা সুশাসিত বলিয়াই কোন লোক হঠাৎ ইহার কোন সামাজিক নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না। তুমি অশেষ পাশ্চাত্য শিক্ষায় বিভূষিত হইয়া শাস্ত্রোক্ত দেবদেবীর উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়াছ; কিন্তু সমাজশাসনের ভয়ে তুমি কোনরূপ সামাজিক নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিতে পার না। যথার্থ বলিতে কি, এক সমাজশাসন দ্বারা হিন্দুধর্ম্ম রাজাধিরাজ হইতে পথের ভিখারী পর্য্যন্ত যাবতীয় লোকের শিখা এক রজ্জুতে বন্ধন করিয়াছে এবং কাহাকেও কোন বিষয়ে স্খলিতপদ বা বিপথগামী হইতে দেয় না। যথার্থ বলিতে কি, এক সমাজশাসনরূপ শাণিত তরবারি লইয়া হিন্দুধর্ম্ম সকলের গৃহে গৃহে পাহারা দিতেছে এবং সকলকে সাবধান করিতেছে। যাহার হস্তপদ কোন বিষয়ে স্খলিত হইতে দেখে, তৎক্ষণাৎ এই শাণিত তরবারি দ্বারা এ ধর্ম্ম উহার হস্তপদ ছেদন করিয়া ফেলে। এখন ভাবিয়া দেখ, এই সমাজশাসন দ্বারা হিন্দু-সমাজের কিরূপ মহোপকার সাধিত হইতেছে!

কালগুণে এই সমাজশাসন এখন আমাদের কিরূপ অশান্তির

কারণ হইয়া উঠিয়াছে। ব্যক্তিগত ঈর্ষার বশীভূত হইয়া কতলোক গ্রামে গ্রামে দলাদলী পাকাইতেছেন, কতলোককে হাররাণ ও পরেষাণ করিতেছেন। জাতিভেদের মহৎ উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া তাহারা ইহাকে আপনাদের হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার উপায়স্বরূপ করিতেছে। উৎকৃষ্ট জাতি নিকৃষ্ট জাতিকে ঘৃণা করিতেছে। নিকৃষ্ট জাতি উৎকৃষ্ট জাতিকে মানিতেছেনা। এই প্রকারে সমাজের স্তরে স্তরে হিংসা ও দ্বেষ সবিশেষ জাজ্বল্যমান।

এখন পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তৃতির সঙ্গে হিন্দুসমাজে কি অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে! সে চিরাগত সমাজশাসন এখন কোথায়? কোথায় বা সমাজশাসনকারী ধর্ম্মাত্মা ব্রাহ্মণগণ? এখন সকলই পাশ্চাত্য কালস্রোতে ভাসিতেছে ও খাবি খাইতেছে। আজকাল অধ্যাপক ও পুরোহিতগণ জঠরজ্বালায় অস্থির, তাঁহারা একমাত্র উদরান্নের জন্য চিন্তিত ও বিব্রত। এখন কেই বা তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করিবে। যদি তাঁহারা কোন বিষয়ে কিছু বলেন, ওমনি লোকে জবাব দিবে, "কেমন! চৈতন নাড়িয়া বামনাই ফলাইতে আসিয়াছ?" তাঁহারাও নিজের মান নিজের ঠাঁই, এই ভাবিয়া আস্তে আস্তে সরিয়া পড়েন।

আজকাল বড় বড় সহরে সমাজশাসন প্রায় উঠিয়া গিয়াছে এবং সকলেই যথেচ্ছাচারী। ইহার জন্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ই বিশেষরূপ দায়ী। তাঁহারা বুঝিতে পারেন না, সমাজশাসন পূর্ব্বের ন্যায় বলবৎ থাকিলে দেশের কত মঙ্গল হইত। আধুনিক শিক্ষিত নেতৃবৃন্দ কেবল গলাবাজী করিয়া আকাশ ফাটাইতে জানেন; কিন্তু কাজের বেলায় সকলে চুপচাপ বসিয়া থাকেন। পূর্ব্বে সমাজনায়ক ব্রাহ্মণগণ সভাসমিতিতে গলাবাজী করিতেন না; কিন্তু কুঁড়ে ঘরে ঘুরিয়া ফিরিয়া একমাত্র জাতিভেদের শাসন দ্বারা সমাজে অনর্গপাত

হইতে দিতেন না। এই প্রকারে তাঁহারা আমাদের জাতিধর্ম্ম বজায় রাখিতে সমর্থ হন।

আজকাল চরকায় সুতাকাটা, তাঁতে কাপড় বোনা, খদ্দরপ্রচলন, গোহত্যানিবারণ প্রভৃতি সৎকর্ম্মগুলি হিন্দুসমাজের মঙ্গলের জন্য একান্ত আবশ্যক। অনেকে এসকল বিষয়ে গলাবাজী করিয়া মাৎ করিতে চান; কিন্তু কাজের বেলায় আসল কাজ কিছুই দেখা যায় না। যখন জাতিভেদ দ্বারা সমাজশাসনরূপ ব্রহ্মাস্ত্র আমাদের হস্তে আছে, তখন আমরা নিজ বুদ্ধির দোষে সে অস্ত্র ব্যবহার করি না কেন? যদি গাঁধিপ্রমুখ নেতৃবৃন্দ ব্রাহ্মণদের সহিত একযোগে মিলিত হইয়া ঐ সকল বিষয়ে সমাজশাসন ভালরূপ চালাইতেন, তাঁহারা এতদূর ফাঁপরে পরিতেন না। তাঁহারা সমাজশাসন উঠাইয়া দিয়া নিজের পাদমূলে নিজে কুঠারাঘাত করিতেছেন। কবে তাঁহাদের সুমতি হইবে?

জাতিভেদের মহৎ গুণ।

যে জাতিভেদপ্রথা এতকাল ভারতে প্রচলিত, যাহা হিন্দুসমাজে সামাজিক নির্ব্বাচনে উত্থিত, প্রতিষ্ঠিত ও স্থায়ী, সেই প্রথা দ্বারা হিন্দুসমাজের কতদূর মঙ্গল সাধিত হইতেছে, তাহাই এস্থলে বিচার্য্য।

ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, এই প্রথা দ্বারা হিন্দুসমাজ চিরদিন সুশাসিত হওয়াতে কোন লোক সামাজিক নিয়মপালনে কোনরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা দেখাইতে পারে না; এজন্য ইহা প্রভূত শক্তির আধার এবং আমাদের জাতিধর্ম্ম এতকাল ভালরূপ বজায় আছে। এখন দেখাইতে ইচ্ছা করি, এই প্রথা ব্যক্তিবিশেষের বা জাতিবিশেষের শরীর ও মনের উৎকর্ষ সাধনে কতদূর সিদ্ধিপ্রদ।

ভালরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, এ সুপ্রথা দ্বারা এ দেশে কোন কোন বিষয়ে প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইতেছে। ইহার

প্রধান গুণ, যে জাতির ভিতর শরীরের অঙ্গসৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য্য এবং মনের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি লইয়া যেরূপ উন্নতিসাধন ঘটিবে, তাহা সেই জাতির সন্তানসন্ততিবর্গের ভিতর সম্পূর্ণরূপ নিবদ্ধ থাকাতে উহারা আরও উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে।

প্রকৃতির স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম এই, যেমন আমরা জন্মপরিগ্রহের সঙ্গে পিতামাতার শারীরিক ও মানসিক গুণাগুণ উত্তরাধিকার করি, সেই সঙ্গে আমরা আরও কতকগুলি বৈশেষিক জাতীয় ও কৌলিক গুণাগুণ প্রাপ্ত হই। এই প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে সিংহের শাবক সিংহ, শৃগালের শাবক শৃগাল, শ্বেতকায়ের পুত্র শ্বেতকায় এবং কাফরীর পুত্র কাফরী হইয়া থাকে। এই নিয়মানুসারে সুন্দর বা কুৎসিৎ পিতামাতার পুত্রকন্যাগণ প্রায় সুন্দর বা কুৎসিৎ, ধার্ম্মিকের পুত্র ধার্ম্মিক, অধার্ম্মিকের পুত্র প্রায় অধার্ম্মিক, কুলটা নারীর কন্যা প্রায় কুলটা, মাতালের পুত্র প্রায় মাতাল হইয়া থাকে।

[illegible]ন এই পিতৃমাতৃদত্ত শারীরিক ও মানসিক গুণাগুণের সমষ্টি আমাদের মূলপ্রকৃতি। ইহাকে সাধারণতঃ অনুবৃত্তি বলা উচিত। ইহা একমাত্র পুরুষানুক্রমিকতার ফল। এই পুরুষানুক্রমিকতার নিয়মাবলি (Laws of Heridity) চিরদিন আমাদের নিকট দুর্ব্বোধ্য। আমরা জানিনা, কোন্ পুরুষ হইতে কোন্ গুণাগুণ উত্তরাধিকার করিয়া থাকি। কেহ বলিতে পারেন না, কুষ্ঠাদি কুলজ পীড়াগুলি কোন্ পুরুষ হইতে কোন্ পুরুষে সচরাচর অনুক্রামিত হইয়া থাকে।

সত্য বটে, পিতামাতার গুণাগুণ আমরা অধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হই; কিন্তু সেই সঙ্গে পিতামহ, প্রপিতামহ, বৃদ্ধপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ প্রভৃতির কোন না কোন গুণ উত্তরাধিকার করি। শাস্ত্রকারেরা বলেন, আমরা সাতপুরুষের গুণাগুণ পাইয়া থাকি; এজন্য সাতপুরুষ পর্য্যন্ত হিন্দুসমাজে অশৌচ চলে এবং সাতপুরুষের

তর্পণ করিতে হয়। এস্থলে অনুবৃত্তির কার্য্যগুলি বুঝিতে চেষ্টা করা উচিত।

আবার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে ব্যায়ামাদি কায়িক পরিশ্রম ও দেশ-কালোচিত বিদ্যা শিক্ষা করিয়া আমাদের অনুবৃত্তিমূলক মূলপ্রকৃতি কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এই অনুশীলনমূলক প্রকৃতিকে পরিবৃত্তি বলা উচিত। ইহা একমাত্র অনুশীলনের ফল। এই অনুবৃত্তি ও পরিবৃত্তি সকলের জীবনে স্ব স্ব অনুশাসন চালাইয়া থাকে। তন্মধ্যে বোধশক্তি (আক্কেল) ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তিগুলির উপর অনুবৃত্তির অনুশাসন অধিক এবং বিদ্যা ও অর্থোপার্জ্জন করিয়া সমাজে গণ্য মান্য হইবার জন্য পরিবৃত্তি বা পুরুষকারের অনুশাসন অধিক।

প্রাচ্যজগৎ চিরদিন অনুবৃত্তির আদর করে; অপর পক্ষে পাশ্চাত্য জগৎ পরিবৃত্তির বা অনুশীলনের আদর করে। যোগসিদ্ধ মহর্ষিগণ পুরুষানুক্রমিকতার নিয়মাবলি বুঝিয়া স্বসমাজের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উৎকর্ষ সাধনের জন্য কুলপরম্পরাগত জাতিভেদপ্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া যান; আর নবোত্থিত পাশ্চাত্য জগৎ পুরুষানু-ক্রমিকতার নিয়মগুলি অগ্রাহ্য করিয়া সমাজের আধিভৌতিক উন্নতিসাধনের জন্য একমাত্র অনুশীলনের পক্ষপাতী হইয়াছে।

জাতীয় ও কৌলিক গুণাগুণের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ অধিক পরিমাণে অনুবৃত্তিমূলক। প্রকৃতির স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম এই, যে গুণ যে বংশের চিরাভ্যস্ত, তদীয় বংশধরেরা সেই গুণ অনায়াসে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হয়। যে বংশ বহুদিন হইতে ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য বিখ্যাত, সে বংশের অধিকাংশ সন্তানসন্ততি স্বভাবতঃ ধর্ম্ম-পরায়ণ হইয়া থাকে। কর্ত্তব্যপরায়ণ ইংরাজের পুত্র স্বতঃ কর্ত্তব্য-পরায়ণ হইবে। বিজ্ঞানবিৎ জার্ম্মানের পুত্র স্বতঃ বিজ্ঞানবিৎ হইবে। এজন্য সকলে বলে, বড় লোকের আঁস্তাকুড়ও ভাল।

বংশবিশেষের শারীরিক গুণাগুণ সম্বন্ধে যেরূপ নিয়ম আছে, ইহার মানসিক গুণাগুণ সম্বন্ধেও সেইরূপ নিয়ম চলিতেছে। যেমন পিতামাতার সৌন্দর্য্য অনুসারে পুত্রকন্যাগণের সৌন্দর্য্য স্বতঃ বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি অনুসারে শেষোক্ত-দিগের মানসিক ও আধ্যাত্মিক গুণাগুণ বৈশেষিক হইয়া থাকে। এই প্রকারে বংশবিশেষ কৌলিক গুণাগুণ অনুসারে উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট হইয়া থাকে

যে উৎকৃষ্ট বংশের সন্ততিগণ এখন সৌন্দর্য্যশালী ও ধর্ম্মপরায়ণ, সে বংশ যদি অন্য নিকৃষ্ট কুৎসিৎ ও পাপিষ্ঠ বংশের সহিত বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়, সে বংশের বংশধরেরা কি কালে অপগত ও অবনত হইবে না? এই যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দিগের পুত্রকন্যাগণ দেখিতে কেমন সুন্দর! উহাঁরা যদি যদৃচ্ছামত সঙ্গত হইত, উহাদের কি এমন সৌন্দর্য্য থাকিত? এই যে মুষ্টিমেয় ইহুদি ও পারসী জাতি জগতে কেমন সৌন্দর্য্যশালী? উহারাও যদি যদৃচ্ছামত সঙ্গত হইত, উহাদের কি এমন সৌন্দর্য্য ও অঙ্গসৌষ্ঠব থাকিত? ইহাতে বুঝা যায়, বংশ ও কুল সম্বন্ধে যেরূপ প্রাকৃতিক নিয়ম বর্ত্তমান, জাতি সম্বন্ধেও তদনুরূপ নিয়ম চলিতেছে। যে গুণ যে জাতির চিরাভ্যস্ত, সে জাতির সন্ততিবর্গ অনায়াসে সে গুণ উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হয়।

ইহাতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, কুলপরম্পরাগত জাতিভেদ-প্রথা সমাজে প্রচলিত থাকিলে এক এক জাতির গুণবিশেষের সম্যক উন্নতিসাধন হইয়া ঐ জাতির সন্ততিবর্গে তাহা ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইতে থাকে। ইহাতে গুণবিশেষ লইয়া জাতিবিশেষের ক্রমো-ন্নতি সাধিত হইয়া থাকে। তাঁতির ছেলে মেয়ে যেমনসুন্দর বস্ত্র বোনে, কতদিন শিক্ষা করিলে অন্য জাতির ছেলে মেয়ে সেরূপ

সুন্দর কাপড় বুনিতে শিখিবে? ঢাকাই মসলিন কয়জনে বুন্‌তে পারে? বেনারশী শাড়ী কয়জনে বুন্‌তে পারে?

যে সকল শ্রেষ্ঠ কৌলিক ধর্ম্ম বা উৎকৃষ্ট গুণাবলি বহুকাল ব্যাপিয়া সাধনবলে, অনুশীলনবলে এক বংশগত হইয়াছে, যদি-সেই শ্রেষ্ঠ বংশের সন্ততিবর্গ নিকৃষ্ট বংশে বা নিকৃষ্ট জাতিতে বিবাহ করে, তাহারা কি সেই সকল শ্রেষ্ঠ গুণের অপকর্ষ সাধন করিয়া নিজ বংশের অনিষ্ট সাধন করে না? ইহার জন্য উচ্চ জাতি নীচ জাতির সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইতে ঘৃণা বোধ করে এবং জাতি বিশেষের উচ্চ বংশও নীচ বংশের সহিত সঙ্গত হইতে চায় না।

যেমন ক্ষেত্রের বীজ বিশুদ্ধ হইলে তদুৎপন্ন শস্য সতেজও পুষ্টি-কারক হয়, সেইরূপ বংশবীজ বিশুদ্ধ হইলে ঔরসজাত সন্তান গুণ-বান ও ধার্ম্মিক হইয়া থাকে এবং বীজ অশুদ্ধ হইলে জারজ সন্তান উৎপন্ন হয়। সকলেই জানে, জারজ সন্তান কতদূর খচ্চর, বদ্‌মাস ও পাপিষ্ঠ হইয়া থাকে। উহার ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান কিছুই থাকে না।

বংশবীজ অবিশুদ্ধ হইলে সমাজে বর্ণশঙ্কর উৎপন্ন হয়। এজন্য অসবর্ণ ও অনুলোম প্রতিলোম বিবাহ সমাজে বহুকাল হইতে রহিত হইয়াছে। বর্ণশঙ্কর হিন্দুর নয়নে অতীব ঘৃণাস্পদ, এমন কি ইহাকে সকলে গালাগাল ভাবিয়া থাকে। বস্তুতঃ হিন্দুকুলে যিনি বিজন্মা, যাঁহার জন্মের ঠিক নাই, তিনি হিন্দুর সকল সত্ব, অধিকার ও সংস্কার হইতে চিরবঞ্চিত। ইউরোপীর সমাজে পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিলে, অনেকে এরূপ প্রশ্নকে শিষ্টাচারের বহির্ভূত জ্ঞান-করে এবং চটিয়া লাল হয়। ইহাতে সে সমাজের প্রকৃত অবস্থা বুঝা যাইতেছে। সে দেশে বর্ণভেদ নাই বলিয়া বর্ণশঙ্কর কাহাকে বলে, তাহা কেহ জানেন না। আমাদের মতে সে দেশে সকলেই বর্ণশঙ্কর।

বংশবীজ অশুদ্ধ হইবে বলিয়া যে দেশে জাতিভেদপ্রথা প্রচলিত নাই, তথায় উচ্চ বংশীয় সম্ভ্রান্ত লোকেরা নীচবংশীয়দিগের সহিত উদ্বাহসূত্রে আবদ্ধ হইতে অধিক ঘৃণা বোধ করে। ইংরাজদিগের ভিতর ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভ্রাতৃকন্যার মধ্যে কেন বিবাহ প্রচলিত আছে? কেবল বংশবীজ বিশুদ্ধ রাখিবার জন্য উহারা পরিবারিক সম্বন্ধ উল্লঙ্ঘন করিয়াও ঐরূপ জঘন্য প্রথা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে।

দেখ, আমাদের নিকট বর্ণশঙ্কর কতদূর দোষাবহ!

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্যচ
পতন্তি পিতরো হ্যেষাম্ লুপ্তপিণ্ডোদকাঃ।
দোষৈরেতৈ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্কর কারকৈঃ
উৎসাদ্যন্তে জাতি ধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ॥

(গীতা)

"বর্ণসঙ্কর কুল ও কুলনাশকদিগকে নিরয়গামী করিবে অর্থাৎ বংশে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইলে সমস্ত কুল ও কুলনাশক সকলেই নরকে গমন করিবে। তাঁহাদের পিতৃগণের পিণ্ড ও উদকক্রিয়া লুপ্ত হওয়াতে উহারা নরকে পতিত হইবে। ঔরসজাত পুত্রপ্রদত্ত পিণ্ড ও উদক পিতৃগণের একমাত্র গ্রাহ্য। কুলক্ষয়কারী পাপাত্মাদিগের দোষে যাবতীয় জাতিধর্ম্ম ও কুলধর্ম্ম একেবারে নাশ পাইয়া থাকে।"

যাহারা নিকৃষ্ট জাতিতে বিবাহ করে, তাহারা যে কেবল নিজের সন্তানদিগের অপকার করিতেছে, তাহা নহে; বংশবীজ অশুদ্ধ হওয়াতে তাহারা ভবিষ্য বংশধরদিগেরও প্রভূত অপকার করিয়া যাইতেছে। মোটামুটি দেখিলে এ অপকার বুঝা যায় না সত্য, কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, ইহাতে সমাজের কত অপকার ঘটিতে পারে। একজন ইংরাজ ইহাতে

কোন দোষ দেখিবেন না বটে, কিন্তু হিন্দুর নয়নে নানা দোষ জ্বল জ্বল করিতে থাকিবে। বল দেখি, যদি এক ব্রাহ্মণসন্তান বা কায়স্থবালক চণ্ডালের বা মুচীর কন্যা বিবাহ করে, উহাদের সন্তান কিরূপ গুণবান ও বুদ্ধিমান হইবে ?

কৌলিক গুণাবলির ক্রমোন্নতি এক পুরুষে বা এক ব্যক্তির জীবনে সংঘটিত হয় না, ; কিন্তু বহুকাল ব্যাপিয়া এই সকল গুণের সম্যক অনুশীলন করিতে করিতে এবং সেই সঙ্গে বংশবীজ যতদূর সম্ভব বিশুদ্ধ রাখিতে রাখিতে বংশবিশেষে উহাদের ক্রমোন্নতি সাধিত হইয়া থাকে।

এখন সদ্বংশজাত লোকেরা কোন্ কোন্ গুণে সচরাচর বিভূষিত হইয়া থাকেন ?

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেন :—

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জ্জবং
অহিংসাসত্যমক্রোধস্ত্যাগশান্তিরপৈশুনং
দয়াভূতেষ্বলোলুপং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলং
ওজঃ ক্ষমাধৃতিঃ শৌচমদ্রোহ নাভিমানিতা
বদন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য।

(গীতা)

"নিম্নলিখিত গুণগুলি সদ্বংশজাত লোকদিগের দৈব সম্পদ যথা :—মনের সৎসাহস, বিশুদ্ধ চরিত্র, পরমার্থ জ্ঞান লাভের জন্য একাগ্রতা, দানশীলতা, জিতেন্দ্রিয়তা, যজ্ঞানুষ্ঠান, বিদ্যানুশীলন, কালোচিত তপঃসাধন, সরলতা; অহিংসা, সত্যবাদিতা, বিনীত ও মৃদুস্বভাব, ক্রোধশূন্যতা, স্বার্থত্যাগ, মনের স্থায়ী শান্তি, সকল জীবে দয়া, ক্ষমাশীলতা, লজ্জাশীলতা, চপলতাশূন্যতা, সহিষ্ণুতা, শুদ্ধা-

চারিতা, অভিমানশূন্যতা ও মনের তেজস্বিতা ইত্যাদি এই সকল সদ্গুণরাশি থাকিলে মানব যথার্থতঃ দেবতুল্য হন।

এই সকল গুণের উৎকর্ষসাধনের জন্য জ্ঞানগরিষ্ঠ মহর্ষিগণ ভারতে কুলপরম্পরাগত জাতিভেদপ্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া যান, যাহাতে সমাজস্থ সকল জাতির ভিতর সদ্বংশজাত সন্ততিবর্গ উন্নতিসাধন করিতে পারিবে। এখন একবার ভাব দেখি, ঐ সকল সদ্গুণ কত সাধন বলে, কতকাল ব্যাপিয়া পুরুষানুক্রমে উহাদের সম্যক অনু-শীলন করিতে করিতে, কতকাল ব্যাপিয়া বংশবীজ পুরুষানুক্রমে বিশুদ্ধ রাখিতে রাখিতে উহারা একবংশে স্থায়ী হইতে পারে?

এই যে তোমাদের অশেষ ধর্ম্মপরায়ণতা দেখিয়া পৃথিবীর সকল জাতি শতমুখে তোমাদের প্রশংসা করিতেছে,এ ধর্ম্মপরায়ণতা, তোমা-দের কোথা হইতে আসিল? এই যে তোমাদের মধ্যে বাগ্মিবর-দিগের ইংরাজিবক্তৃতা শুনিয়া ইংরাজ চিরদিন অবাক এবং যাহারা সহস্র চেষ্টা করিয়াও বিজাতীয় ভাষায় এরূপ বক্তৃতা দিতে পারেন না, সে বক্তৃতাশক্তি তাঁহাদের কোথা হইতে আসিল? একমাত্র অনুশীলন বলে কি এতদূর উৎকর্ষ লাভ করা যায়। এইযে তোমা-দের অগাধ বুদ্ধিশক্তি দেখিয়া ইংরাজ তোমাদের উপর চিরদিন ঈর্ষ্যান্বিত; এ বুদ্ধিশক্তি তোমাদের কি প্রকারে নৈসর্গিক সম্বল হইল? কত জাতীয় সাধনা ও বীজশুদ্ধিরপ্রভাবে এ সকল গুণ এখন তোমাদের প্রকৃতিগত ও জাতীয় সম্বল হইয়াছে, তাহা কি তোমরা বুঝিতে চেষ্টা করিবে? বেশ জানিবে, পুরুষানুক্রমে গুণগুলির সম্যক অনুশীলন ও বংশবীজশুদ্ধি উহাদের উন্নতির প্রধান কারণ।

এখন কুলপরম্পরাগত জাতিভেদপ্রথা সমাজে প্রচলিত থাকিলে কৌলিক গুণসমূহের উন্নতিসাধনে, বিশেষতঃ মনের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উন্নতিসাধনে এ প্রথা জনসাধারণের যেরূপ সাহায্য করে, এমন

কিছুতে সম্ভব নয়। জাতিবিশেষের এক শ্রেষ্ঠ বংশের সহিত অপর শ্রেষ্ঠ বংশ উদ্বাহসূত্রে আবদ্ধ হইলে উহাদের সন্তানসন্ততিবর্গ শ্রেষ্ঠ গুণই উত্তরাধিকার করে এবং অতি সহজে জাতিধর্ম্ম ও কুলধর্ম্ম বাল্যকালে শিক্ষা করে। ইহাতে সমাজ সাধারণতঃ ধর্ম্মের পথে অধিক অগ্রসর হইতে থাকে।

অপর পক্ষে জাতিভেদপ্রথা সমাজে প্রচলিত না থাকিলে, সকলই একাকার থাকে। তথায় জাতিধর্ম্ম ও কুলধর্ম্ম কিছুই থাকে না। যাহার যেমন অভিরুচি, সে তেমনি ঘরে বিবাহ করে ও তদনুরূপ বৃত্তি অবলম্বন করে। ইহাতে ধর্ম্মপ্রবৃত্তির স্থায়ীভাবে উৎকর্ষসাধন না হওয়াতে সাধারণ সমাজ ধর্ম্মবিষয়ে পশ্চাৎপদ হইয়া পড়ে। এ কারণ অন্যান্য দেশের জনসাধারণ এত অধার্ম্মিক ও কদাচারী।

এখন ভাবিয়া দেখ, জাতিভেদ দ্বারা হিন্দুসমাজ চিরদিন কিরূপ উপকৃত?

হিন্দুসমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণজাতির ন্যায় পৃথিবীর কোন্‌-জাতি এত অধিক ধর্ম্মনিষ্ঠ, সদাচারী ও স্বার্থত্যাগী? যে জাতি হিন্দুসমাজের প্রকৃত অধিনায়ক, যাঁহাদের সামান্য অঙ্গুলিহেলনে রাজন্যবর্গ উত্থিত ও উপবিষ্ট হইতেন, তাঁহারা কিনা সামান্য ভিক্ষা-লব্ধজীবিকায় স্বীয় ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। পাঠানসম্রাট নাসীরুদ্দিন দিল্লীশ্বর হইয়াও পুস্তকবিক্রয়লব্ধ অর্থে নিজের ভরণ-পোষণ চালাইতেন। সেইরূপ ব্রাহ্মণজাতি হিন্দুসমাজের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়াও ভিক্ষোপজীবী হইয়াছেন। পাছে ধনাগমে জ্ঞানধর্ম্মা-নুশীলনে প্রত্যবায় ঘটে অথবা অহঙ্কারাদি ষড়রিপুর বশীভূত হইয়া নিজমনের ক্রমশঃ অবনতি করিয়া ফেলেন এবং সমাজকে ভালরূপ আত্মদৃষ্টান্ত দেখাইয়া ধর্ম্মপথে চলাইতে অসমর্থ হন, তজ্জন্য তাঁহারা ভিক্ষাই আপনাদের জাতীয় বৃত্তি করিয়াছেন। স্বার্থত্যাগের এমন

জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত কোন দেশের ধর্ম্মযাজকগণ আজ পর্য্যন্ত দেখাইতে পারেনাই। কোথায় হে পূজ্যপাদ ধর্ম্মাত্মা ব্রাহ্মণগণ! ধন্য তোমাদের আত্মোৎসর্গ! ধন্য তেমাদের ত্যাগস্বীকার ও ধর্ম্মসাধন! তোমাদেরই গুণে ভারত চিরদিন ধর্ম্মের পবিত্র ক্ষেত্র। এস্থলে কেহ যেন আজকালের পাচক, পূজারি, মাংসবিক্রেতা, কৃষক, সেপাই, ম্লেচ্ছ সেবক, মূর্খ আত্মম্ভরী মামলাবাজ ব্রাহ্মণদিগকে দেখিয়া ঐ জাতির বিচার করিবেন না। যে পৃথিবীতে চন্দ্রে কলঙ্ক, কমলে কণ্টক, মধুতে তীব্রতা আছে, সে পৃথিবীতে ব্রাহ্মণ জাতির ভিতর একদিকে মহর্ষি আছেন, অপর দিকে চণ্ডালস্থ চণ্ডালও আছে।

বল দেখি, ব্রাহ্মণজাতির এত অধিক ধর্ম্মপরায়ণতা ও নৈষ্ঠিকতা কোথা হইতে আসিল? একদিকে পুরুষানুক্রমে প্রগাঢ় ধর্ম্মানুশীলন ও শমদমাদি কঠোর ব্রতধারণ,অপরদিকে কুলপরম্পরাগত জাতিভেদ প্রথা দ্বারা বংশবীজশুদ্ধি ইহার প্রধান কারণ। বিজাতীয় ইতিহাস লেখকেরাও স্পষ্ট স্বীকার করেন, এ জাতির জাতীয় উন্নতি কেবল ত্রিংশশতাব্দী ব্যাপিয়া পুরুষানুক্রমিক জাতীয় সাধনার গুণে সংসাধিত হইয়াছে।

"The Brahmins of the present day are the result of 3000 years' heriditary education and selfrestraint.

Hunter.

যখন বিজাতীয় পণ্ডিতগণ ব্রাহ্মণ জাতির এত সুখ্যাতি করিতেছেন, তখন আমরা কেন না তাঁহাদের পদরেণু মস্তকে ধারণ করিব? বস্তুতঃ যে জাতি ধর্ম্মভাবে ও প্রেমভাবে হিন্দুসমাজকে আবহমান কাল চালাইতেছেন, যাঁহারা ঐহিক এশ্বর্য্যভোগে ও সুখবিলাসে জলাঞ্জলি দিয়া জ্ঞান ও ধর্ম্মের সম্যক অনুশীলন করিতে করিতে স্বসমাজকে ধর্ম্মপথে অধিক অগ্রসর করাইতেছেন, যাঁহারা এত সমাজবিপ্লব ও রাষ্ট্রবিপ্লবের মধ্যে আমাদের জাতিধর্ম্ম রক্ষা

করিয়াছেন, তাঁহাদের শ্রীচরণকমলে আমরা কেন না স্বতঃ প্রণত হইব?

কিন্তু বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, বক্ষঃস্থল অশ্রুজলে প্লাবিত হইতেছে, তাঁহাদের সে অধ্যাত্মিকতা, সে নৈষ্ঠিকতা, সে সদাচারিতা, সে স্বার্থত্যাগ এখন কোথায়? কোথায় বা তাঁহাদের সে ব্রহ্মতেজ, সে শাস্ত্রবল ও সে ধর্ম্মবল? তাঁহারাও এখন পাশ্চাত্য কালস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে জঠরজ্বালায় অস্থির হইয়া কেবল হাবুডুবু খাইতেছেন। কোথায় হে মহর্ষিকুলসম্ভূত পুণ্যাত্মা ব্রাহ্মণগণ! তোমরা আর কতকাল মৃতপ্রায় থাকিবে? আর কতকাল তোমরা এরূপ মোহনিদ্রায় নিদ্রিত থাকিবে? বেশ জানিবে এ নিদ্রা আরও গাঢ় হইলে ইহা তোমাদের কালনিদ্রায় পরিণত হইবে। এখনও তোমাদের পূর্ব্বতন জাতীয় গৌরবের অনেক চিহ্ন বর্ত্তমান। এখনও কালোচিত জাতীয় উন্নতিসাধন করিয়া নিঃস্বার্থ ধর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক পূর্ব্বগৌরব দেখাইতে চেষ্টা পাও। ইহাতে তোমরাও সংসারে ধন্য হইবে, হিন্দুসমাজও ধন্য হইবে। আর যদি তোমরা ক্রমশঃ অধঃপাতের দিকে অগ্রসর হও, হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুজাতি জগতে লুপ্ত হইবে।

আধ্যাত্মিক উন্নতির পর হিন্দুজাতির বুদ্ধিশক্তিও জাতিভেদপ্রথা দ্বারা সম্যক স্ফুরিত হইয়াছে। পাঠক! তুমি যে আজ সাতসমুদ্র ও তেরনদী পার হইয়া বিদ্যার পবিত্র ক্ষেত্র বিলাত ভূমিতে গমন পূর্ব্বক বিজাতীয় ভাষা ও বিজাতীয় বিদ্যার পরীক্ষাসমরে ইংরাজ-বালকদিগের সমকক্ষ হইতেছ, এমন কি অনেক সময়ে উহাদিগকে পরাস্ত করিয়া জয়মালা কণ্ঠে ধারণ করিতেছ, ইহাতে তোমার জাতীয় বুদ্ধিশক্তি কতদূর স্ফুরিত, তাহা কি প্রকাশ পায় না? আমাদের বুদ্ধিশক্তি এত অধিক স্ফুরিত দেখাইয়াই ত ইংরেজরা ঈর্ষান্বিত হইয়া আমাদের সিভিল সরভিস প্রভৃতি সকল সারভিসের

প্রবেশপথ রুদ্ধপ্রায় করিয়া দিয়াছেন। যদি ভারতে এই সকল পরীক্ষা গৃহীত হইত, কয়জন ইংরাজবালক আমাদের সহিত সমকক্ষ হইতে পারিত? এত অধিক বুদ্ধিশক্তি থাকাতেই আজ আমরা ইংরাজদিগের চক্ষুশূল হইয়াছি। যাহা হউক, জাতিভেদপ্রথা প্রচলিত থাকাতেই আমাদের বুদ্ধিশক্তি এত অধিক স্ফুরিত, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

ক্ষত্রিয় জাতির শৌর্য্যগুণও জাতিভেদপ্রথা দ্বারা সম্যক স্ফুরিত হইয়াছিল। যে জাতি শৌর্য্যগুণে সমগ্র ভারতে ভিন্ন ভিন্ন সমৃদ্ধ রাজ্য স্থাপন পূর্ব্বক দ্বিসহস্রবৎসর বীরদর্পে ও অপ্রতিহতপ্রভাবে আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন, যে জাতির ভিতর পিতার এক ত্যজ্য পুত্র বিজয় সিংহ মাতৃভূমি হইতে তাড়িত হইয়া লঙ্কায় গমনপূর্ব্বক তথায় নিজ রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন ও তদীয় বংশধরেরা সহস্রবৎসর সগৌরবে সেই রাজ্য ভোগ করিয়াছে, যে জাতির ভিতর পুরুরাজের শৌর্য্য, বীর্য্যও, অসমসাহসিকতা. দর্শনে যোধাগ্রগণ্য পৃথিবীবিজেতা মহৎ আলেকজাণ্ডার মুক্তকণ্ঠে ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন, যে জাতি একসময়ে শৌর্য্যগুণে এসিয়ার মধ্যভাগ হইতে ভারতমহাসাগরের প্রান্তস্থিত সুদূরবর্ত্তী দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত আপনাদের প্রতাপ ও গৌরব বিস্তার করিয়াছেন, সেই ভীমপরাক্রমশালী ক্ষত্রিয় জাতির জাতীয় উন্নতি বিষয়ে কেহ কি কিছুমাত্র সন্দেহ করিতে পারেন?

যে ক্ষত্রিয় জাতির ভিতর শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, ভীম, অর্জ্জুন বিক্রমাদিত্য, সমুদ্রগুপ্ত, শালীবাহন, শিবজী প্রভৃতি বড় বড় যোদ্ধা আবির্ভূত হইয়া ভারতমাতার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন, যে জাতির হলদিঘাটে অসাধারণ বীরত্ব দর্শনে টড সাহেব প্রত্যক যোদ্ধাকে থারমাপিলিবিজেতা লিওনিডাস নামে অভিহিত করিয়াছেন, যে জাতি পঞ্চশতাব্দী ব্যাপিয়া পরাধীনতায় থাকিয়াও পরিশেষে

শৌর্য্যগুণে মুসলমান সাম্রাজ্যের ধ্বংসসাধন করিয়াছেন, যে জাতির সহস্র সহস্র যোদ্ধৃবর্গ সংগ্রামস্থলে পরাভব স্বীকার না করিয়া অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করিতে করিতে নিজ নিজ জীবন বিসর্জ্জন করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই, যে জাতির সহস্র সহস্র সুকুমারী মহিলাগণও শত্রুহস্তে পতিত হওয়া অপেক্ষা চিতোররাণী পদ্মিনীর স্থায় অসমসাহসে অগ্নিকুণ্ডে প্রাণাহুতি দিয়া গিয়াছেন, সেই পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয় জাতির জাতীয় উন্নতিবিষয়ে কেহ কি কিছুমাত্র সন্দেহ করিতে পারেন?

দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের ভালরূপ জাতীয় ইতিহাস নাই। আমরা জানি না, ক্ষত্রিয় জাতির ভিতর কত নেপোলিয়ান, কত সীজার জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। সত্যবটে, ভারতের নিবীর্য্যকারী জলবায়ু ও ভোগবিলাস এ জাতিকে দুর্ব্বল করিয়া দেওয়াতে ইহাদের বিমিশ্রণে অপর ক্ষত্রিয় জাতির উত্থান ঘটে; কিন্তু ইহা সুনিশ্চিত, জাতিভেদপ্রথা দ্বারা এ জাতির সম্যক উন্নতিসাধন ঘটিয়াছিল। জাতীয়সংস্কারবশতঃ ও পুরুষানুক্রমে শৌর্য্যবীর্য্যের অনুশীলন করাতে এ জাতি এমন উচ্চপদবীতে আরূঢ় হইয়াছিল।

আজ ইংরাজের স্বার্থপর রাজনৈতিক ব্যবস্থানুসারে ক্ষত্রিয় জাতি নিরস্ত্র হইয়া বণিক ও মসীজীবী শ্রেণিভুক্ত হইয়াছে। কিন্তু যৎকালে ইউরোপীয় জাতিবর্গ বনে বনে বিচরণ করিয়া মহিলাগণের মনস্তুষ্টির জন্য নিজ নিজ অঙ্গ বিবিধ রাগে রঞ্জিত করাই জীবনের মুখ্যব্রত জ্ঞান করিত, তৎকালে ক্ষত্রিয় জাতি প্রাচ্যজগতে স্বীয় কীর্ত্তিধ্বজা উড্ডীয়মান করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, এ জগতে কিছুই স্থায়ী হয় না; সর্ব্বসংহারি কালের কঠিন হস্তে পতিত হইয়া সকলকেই বিনাশ পাইতে হয়, সকলকেই জাতীয় নিয়তির সমক্ষে মস্তক অবনত করিতে হয়। সেজন্য আমাদের সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। আমরা এখন সেই উচ্চ বংশে অধমাধম কুলাঙ্গার

স্বরূপ জন্মগ্রহণ করিয়া পরপদদলিত হইতেছি ও পরপদলেহনে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

জাতিভেদপ্রথা দ্বারা বৈশ্যজাতির উন্নতি প্রকৃষ্টরূপে সাধিত হইয়াছে। যে সমাজে বৃত্তি ও ব্যবসায় অনুসারে কুলপরম্পরাগত জাতিভেদপ্রথা প্রচলিত থাকে, সে সমাজের সন্তান-সন্ততিবর্গ বাল্যকালার্জ্জিত সংস্কার বশতঃ পৈতৃক ব্যবসায় অনায়াসে শিক্ষা করে ও অত্যল্প কালমধ্যে তাহাতে নৈপুণ্য ও দক্ষতা লাভ করে। এস্থলে অনুবৃত্তি ও পরিবৃত্তি উভয়ই জাতীয় উন্নতি সাধনে সম্যক সাহায্য করে। এই প্রকারে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বিবিধ শিল্প কালবশে উত্থিত হইয়াছে এবং উহাদের সম্যক উন্নতিসাধন হইয়াছে।

আমাদের হস্তনির্ম্মিত শিল্প ও কারুকার্য্য দর্শনে কেন আজ সমগ্র জগৎ বিমুগ্ধ ও স্তম্ভিত? কেন অন্য জাতি নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়াও সেরূপ শিল্পোন্নতি প্রদর্শন করিতে পারে না? বাষ্পীয় কল যোগে প্রভূত পরিমাণে বস্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিয়া সুলভ মূল্যে বিক্রয় করত তন্তুবায়কুলের জীবিকা ধ্বংস করা অতি সহজ কথা, কিন্তু হস্তে ঢাকাই মসলিন, বেনারসী সাড়ী ও কাশ্মীরী শাল প্রভৃতি প্রস্তুত করা যে কত দুরূহ ও সাধনসাপেক্ষ, তাহা একবার সকলের ভাবা উচিত।

যাহা হউক, জাতিভেদের গুণে দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যের এত অধিক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল যে, এক সময়ে পৃথিবীর সকল সভ্য জনপদবর্গে এ দেশের শিল্প অধিক সমাদৃত হইত। বাগদাদ, রোম ভিনিস, এথেন্স প্রভৃতি সকল মহানগরীতে এ দেশের দ্রব্য ছড়াছড়ি যাইত। এই শিল্পজাত সমৃদ্ধি বশতঃ বিজাতীয় ভাষায় ভারত (Gorgeous Ind) প্রভৃতি উপাধিতে বিভূষিত। এ কারণ ইউরোপীয়

জাতিবর্গ অসভ্য অবস্থা হইতে উন্মুক্ত হইবার পরই ভারতের সহিত বাণিজ্য করিতে এত ব্যগ্র হইয়াছিল।

যথার্থ বলিতে কি, ভারতের এই শিল্পজাত ঐশ্বর্য্য ও সমৃদ্ধির কাহিনী শ্রবণ করিয়াই বিগত সপ্ত শতাব্দী পরাক্রান্ত জাতিবর্গ শবমাংসলোলুপ গৃধ্রের ন্যায় উড়িয়া আসিয়া এ দেশ ছারখার করিতেছে। সত্যবটে পরাধীনা দুঃখিনী ভারতমাতা ক্রমশঃ দৈন্য-দশায় পতিত হইতেছে এবং তাঁহার বীর্য্যশোণিত নানাদিকে শোষিত হওয়ায় তিনি অস্থিচর্ম্মসার কঙ্কালরাশিতে পরিণত হইতেছেন, তথাচ তাঁহার দীনদরিদ্র সন্তানবর্গের হস্তনির্ম্মিত শিল্পদর্শনে এখনও অন্যান্য জাতি স্তম্ভিত ও চমৎকৃত হইতেছে। বেশ জানিবে, জাতি-ভেদপ্রথা সমাজে চিরপ্রচলিত বলিয়াই ভারতীয় শিল্পের এতদূর উন্নতিসাধন হইয়া গিয়াছে। কি পরিতাপের বিষয়! উৎসাহের অভাবে, পৃষ্ঠপোষণের অভাবে ও রাজার ঔদাস্যে সে শিল্পও জাহান্নমে যাইতে বসিল। যে পাশ্চাত্য কালস্রোত সমাজে খরবেগে বহমান, উহার সমক্ষে সকলই রসাতলে যাইবে, একমাত্র শিল্প কেন থাকিবে, বল? বিলাতী সুলভ ও ঝুটা মালের আদর অধিক হই-তেছে এবং সাচ্চা মালও ক্রমশঃ পেছিয়া যাইতেছে।

যে জাতিভেদ দ্বারা হিন্দুসমাজ নানাদিকে এতদূর উপকৃত, আজকাল সুশিক্ষিত সম্প্রদায় সে প্রথাকে সমাজদেহের বিকলাঙ্গ-কারী অর্ব্বুদ জ্ঞান করিতেছেন। পাশ্চাত্য গুরুগৃহে সুশিক্ষা পাইয়া তাঁহাদের মনে যে সকল সংস্কার বদ্ধমূল হইতেছে, তাহাতে তাঁহারা এ প্রথা রহিত করিতে পারিলে আপনাদিগকে সার্থকজন্মা জ্ঞান করেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

জাতিভেদ দ্বারা হিন্দুসমাজের সন্তোষবিস্তার।

মানবসমাজ কি প্রকারে প্রকৃত সন্তোষসুখে সুখী হইতে পারে? যে স্থলে জনসাধারণ সংসারযাত্রানির্ব্বাহোপযোগী যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রী অনায়াসে পায়, যেখানে উহাদের যাবতীয় অভাব ও অনাটন সহজে পূর্ণ হয়, তথায় সকলে সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে এবং তথায় সর্ব্বজনীন সন্তোষ উহাদের ভিতর স্বতঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। যে সমাজের অর্থাগম অধিক, তথায় জিনিসপত্র দুর্মূল্য হইলেও এক অর্থ সমস্ত সরবরাহ করিয়া সকলের অভাব পূর্ণ করে, যেমন ইউরোপীয় সমাজ। যে সমাজে অর্থাগম অত্যল্প, তথায় জিনিসপত্র সুলভ ও অনায়াসলভ্য হইলে সকলে সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে। আর যদি তথায় জিনিসপত্র ক্রমশঃ দুর্মূল্য হইতে থাকে, সকলের সমূহ কষ্ট উপস্থিত হয়, এমন কি, অনেকে অনশনে মারাও পড়ে।

এস্থলে ভারতের অবস্থা পূর্ব্বে কিরূপ ছিল, এখনই বা কিরূপ হইতেছে, এতৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। বড় সহর ও পল্লীগ্রামের অবস্থা তুলনা করিলে এ বিষয়টি ভালরূপ বুঝা যাইবে। সহরে পয়সা না হলে সংসার চলে না। উঠ্‌তে বস্‌তে পয়সা চাই। ডাইনে বামে কেবল পয়সার খেল। হাতে যে মাটী ঘসিবে, তাহাও পয়সা দিয়া কিনিতে হইবে। অন্য সামগ্রীর ত কথাই নাই। বিলাসিতা পুরাদমে চলিতেছে, যত মেহনৎ কর না কেন, অভাব কিছুতে পূর্ণ হইবার নয়। মনে বড় অশান্তি ও অসন্তোষ, আর কেবল পরহিংসা ও পরদ্বেষ।

অপর পক্ষে পল্লীগ্রামে পয়সার মুখ না দেখিলেও সংসার বেশ চলিয়া যায়। ২৪ বিঘা জমি আছে, ঘরেও মরাই ভরা ধান, বাগানে যথেষ্ট তরিতরকারী, পুকুরে ও বিলে যথেষ্ট মাচ, গোয়াল ঘরে যথেষ্ট ঘি দুগ্ধ; কিছুরই অভাব নাই; বাবুগিরি ও বিলাসিতা কিছুই নাই। ঘরে চরকা চলে, সুতা হয়। সেই সুতা তাঁতীকে দেয় তাঁতী কাপড় বুনিয়া গৃহস্থকে দেয়, তৎপরিবর্ত্তে ক্ষেতের ধান পায়। কুমার বৎসর ভরিয়া হাড়ী কলসী জোগায়, কেবল মাঘ মাসে ধান পায়। সকলের অভাব অল্পেই পূর্ণ হইয়া যায়। তাহারা দুবেলা দুমুঠা খায়, মোটা কাপড় ও মোটা চাদর পরে, আর মনের আনন্দে বেড়ায় ও গায়, কর্‌বার মধ্যে কেবল পুণ্যকর্ম্ম। তাহারা সুখী হইবে না ত, কে আর হবে সুখী? জাতিভেদের গুণে পল্লীগ্রামে এত সুখ ও শান্তি; আর পাশ্চাত্য রীতি অনুসারে সহরে এত অস্বস্তি ও এত অসন্তোষ।

যে সমাজে কুলপরম্পরাগত জাতিভেদপ্রথা প্রচলিত থাকাতে যাবতীয় লোক পৈতৃক ব্যবসায় বাল্যকালে শিক্ষা করিয়া তাহাই আজীবন চালায়, সে সমাজে সকল জাতির ভিতর সর্ব্বজনীন সন্তোষ স্বতঃ প্রতিষ্ঠিত ও বিস্তীর্ণ হইয়া থাকে। যিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করুন না কেন, বাল্যকাল হইতে বংশোচিত সংস্কার, শিক্ষা ও দীক্ষা পাইয়া তিনি যেমন অনায়াসে পৈতৃক ব্যবসায়ে নৈপুণ্য লাভ করেন, সেইরূপ বংশোচিত কর্ম্ম করিয়া তিনি আজীবন সুখে দিন যাপন করিতে থাকেন। তাঁহার পিতামহগণ যে ব্যবসা চালাইয়া সুখে জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন, সামাজিক নিয়মে তিনিও সেই ব্যবসায় চালাইতে বাধ্য হন। মনে জানেন, যখন আমি তাঁহাদের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তখন তাঁহাদেরই ব্যবসায় চালান আমার প্রধান শ্রেয়। ইহাই আমার জাতিধর্ম্ম ও কুলধর্ম্ম। শাস্ত্রও তাঁহাকে চিরদিন উপদেশ দিতেছে:—

স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ। (গীতা)

নিজ পৈতৃক ব্যবসায়ের উন্নতি ব্যতীত তাঁহার মনে অন্য কোনরূপ উচ্চাভিলাষ উদিত হইবে না; সমাজের অন্য কোন জাতির বৃত্তির উপর তিনি অনধিকার চর্চ্চা করিতে যাইবেন না।

এই প্রথার অনিবার্য্য ফল এই যে, প্রত্যেক জাতির লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তদুৎপন্ন পণ্য বা শিল্প সমাজে যথেষ্ট সুলভ হইবে, সাধারণের জীবনযাত্রা যতদূরসম্ভব অনায়াসসাধ্য হইবে এবং সকলেই সন্তোষসুখে সুখী হইবে। জাতিভেদপ্রথা দ্বারা ভারতের অভ্যন্তরীণ অবস্থা এতকাল এইরূপ চলিয়া আসিতেছিল।

তাহার সাক্ষ্য দেখ, পূর্ব্বে ধর্ম্মাত্মা ব্রাহ্মণ জ্ঞানধর্ম্মের অনুশীলন করিয়া সমাজ চালাইতেন এবং অন্যান্য জাতি যৎসামান্য দক্ষিণা দিয়া তাঁহার সংসার সুচারুরূপে চালাইত। তখন টাকায় ২৷৩ মণ চাউল। তবে কিসের কষ্ট? কিসের দুঃখ? কিসের ভাবনা? আজ-কালের ন্যায় কোন ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণীর বাক্যবাণ সহ্য করিতে হইত না। পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয় শৌর্য্যবীর্য্যের অনুশীলন করিয়া রাজ্য রক্ষা, শাসন ও পালন করিতেন এবং অন্যান্য জাতি রাজস্ব দিয়া তাঁহার সুখৈশ্বর্য্য বর্দ্ধন করিত। কায়স্থ জাতি রাজস্ব আদায় করিয়া বা রাজ্যের আয়ব্যয়ের হিসাব রাখিয়া সামান্য বেতনে সুখে দিন কাটাইত। কৃষককুল কৃষিকার্য্য করিয়া ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্যের ষষ্ঠাংশ রাজাকে করস্বরূপ দিয়া পরম সুখে সুখী হইত। অন্যান্য জাতিও পৈতৃক ব্যবসায় চালাইয়া সুখে দিন কাটাইত। কোন জাতি অপর জাতির বৃত্তি গ্রহণ করিত না।

খাচ্চিল তাঁতী তাঁত বুনে
কাল কলে এঁড়ে গরু কিনে।

এরূপ ব্যবসাবিভ্রাটে কেহ তৎকালে পড়িত না। যে মেতর, সে মেতরী করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইত না।

এই প্রকারে সমাজস্থ সকল জাতিকে নিজ নিজ ব্যবসায়ে নৈপুণ্য শিক্ষা দিয়া সকলকে সর্ব্বসুখে সুখী করিবার জন্য পুরাকালে জাতি-ভেদপ্রথা, ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সমাজের যাবতীয় অনাটন পূরণ করিয়া সকলের জীবনযাত্রা অনায়াসসাধ্য করিয়া দেশের মঙ্গলের জন্য এ সুপ্রথা সামাজিক নির্ব্বাচনে প্রতিষ্ঠিত ও স্থায়ী হইয়াছে। এজন্য মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে, এদেশের জাতি-ভেদ পুরাকালীন মানববুদ্ধির একটী সুমহৎ কীর্ত্তিস্তম্ভ (Monument of human genius).

আবহমানকাল ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে যে পল্লীসমাজ প্রচলিত ছিল, যাহার ভগ্নাবশেষ এখনও পল্লীগ্রামে দেখা যায়, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে ভালরূপ বুঝা যায়, তত্রত্য লোকেরা কিরূপে সুখস্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিত। এক জাতিভেদের গুণে সকলে সর্ব্বসুখে সুখী ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, "তেহি নো দিবসা গতা:" আমাদের যে সব সুখের দিন গিয়াছে। এখন যা যাইবে, তাহাও চিরদিনের জন্য যাইবে। কাঁদিলেই বা কি হইবে? সবই যে রসাতলে যাইতে বসিয়াছে।

যে দিন হইতে আমরা দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ রাজশক্তি হারাইয়া পরের পদানত হইয়াছি, সেই দিন হইতে আমাদের দুঃসময় আরম্ভ হইয়াছে। এখনও অনেকে জাতীয় ব্যবসায় চালাইতেছে বটে, কিন্তু তাহাতে জীবনসংগ্রাম সাধারণের আয়াসসাধ্য হওয়াতে যে যেদিকে জীবনধারণের উপায় দেখিতেছে, সে সেই দিকে ধাবিত হইতেছে। চিরকালই অন্নবস্ত্রের দায় সকলের মহাদায়। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে অনেকে জাতীয় ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া কৃষিকার্য্য, মশীবৃত্তি ও বণিকবৃত্তিতে মনোনিবেশ করিয়াছে। অন্যান্য জাতিও জাতীয় ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া নানা কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছে। আজকাল যেমন অনেকে ইংরাজি বিদ্যা শিক্ষা করিয়া

ব্রীটীশসিংহের কল্যাণে অর্থোপার্জ্জন করিয়া জাতীয় সম্মান বর্দ্ধন করিতেছে, মুসলমানযুগেও সেইরূপ অনেকে সৈনিকবৃত্তি ও উর্দ্দু-শিক্ষা করিয়া অর্থবলে জাতীয় সম্মান বর্দ্ধন করিয়াছিল। এইরূপে যে মহদুদ্দেশ্যসাধনের জন্য জাতিভেদপ্রথা ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা অনেক স্থলে ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে এবং সর্ব্ব-সাধারণের জীবনযাত্রা ক্রমশঃ আয়াসসাধ্য হওয়াতে আমাদের প্রকৃত দুঃসময় উপস্থিত হইয়াছে।

জাতিভেদ দ্বারা সমাজে যে সন্তোষ বিস্তীর্ণ হয়, তাহা সর্ব্বজনীন। তাহাতে কোন জাতির অসন্তোষের কিছুমাত্র কারণ থাকে না। কোন সম্প্রদায় ধর্ম্মঘট করিতে যায় না। কি উচ্চ, কি নীচ, সকল জাতিই সমভাবে সন্তুষ্ট থাকে। সকলের জীবনযাত্রা অনায়াসসাধ্য হওয়াতে উহারা স্ব স্ব অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকে। কোন জাতি অন্য কোন জাতির হিংসা করে না। সকল জাতিই জাতীর ব্যবসায় চালাইয়া সুখে ও সন্তোষে জীবন যাপন করেন. যিনি নীচকুলে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি ভাবিবেন, যেমন নিজ কর্ম্মদোষে নীচ কুলে জন্মিয়াছি, তেমনি নীচ কর্ম্ম করিয়া এ জীবন কাটাইব; কিন্তু পর-জন্মের জন্য বিবিধ পুণ্যকর্ম্ম করিব। আর যিনি উচ্চবংশে জন্ম-গ্রহণ করেন, তিনিও ভাবিবেন, অশেষ পুণ্যবলে যেমন উচ্চবংশে জন্মিয়াছি, তেমনি কুলোচিত কর্ম্ম করিয়া জাতীর সম্মান ভালরূপ রক্ষা করিব এবং পরজন্মে যাহাতে কোনরূপ অধঃপতন না ঘটে, তজ্জন্য অশেষ পুণ্যকর্ম্ম করিব।

অপর পক্ষে মানসম্ভ্রমের প্রধান আকর বিদ্যা ও অর্থোপার্জ্জনের জন্য যদি প্রতিযোগিতাপ্রথা সমাজে প্রবর্ত্তিত হয়, অধিকাংশ লোক অসন্তোষবিষে জর্জ্জরিত হইবে। যিনি নীচকুলোদ্ভব, তিনি বলিবেন, রেখে দে তোর জাঁত ও পাঁত, এখন কেবল স্বোদ্যম বলে স্বকীয় অবস্থার উন্নতি সাধন কর; ইহাই আমাদের প্রধান জীবনব্রত।

যিনি উচ্চবংশজাত, তিনিও নিজ বংশমর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য বিদ্যা ও অর্থোপার্জ্জন করিতে সচেষ্ট হইবেন, কিন্তু উভয়েই সমভাবে অসন্তুষ্ট হইবেন।

এই প্রতিযোগিতাপ্রথা দ্বারা যাঁহারা ভাগ্যবলে বা স্বোদ্যম বলে স্বকীয় অবস্থায় উন্নতি সাধন করিবেন, তাহারা যেমন সন্তুষ্ট, অন্যান্য লোক তেমনি অসন্তুষ্ট; ইহাতে যেমন একদিকে সমাজের কিয়দংশ লোকের সুখসমৃদ্ধি, অপর দিকে তেমনি অধিকাংশ লোকের বিপত্তি। একদিকে ধনাঢ্যদিগের যেমন অতুল সুখৈশ্বর্য্য, অপরদিকে দরিদ্রদিগের তেমনি অশেষ কষ্ট ও নিগ্রহ।

The country blooms a garden and a grave (Deserted village.

"দেশ একদিকে প্রমদোদ্যান, অপর দিকে শশ্মানে পরিণত।"

ইংরাজ এদেশে আসিয়া জাতিনির্ব্বিশেষে পাশ্চত্যশিক্ষা বহু বিস্তৃত করায় আমাদের পুরাতন সমাজ-পদ্ধতি ক্রমশঃ চূর্ণ বিচূর্ণ হইতে চলিল এবং পাশ্চাত্য প্রতিযোগিতাপ্রথা অনেক স্থলে দেখা-দিতেছে। জাতিভেদের সহিত এই প্রথার বিস্তর বিরোধ। যে দেশে বৃত্তি লইয়া কুলপরম্পরাগত জাতিভেদপ্রথা প্রতিষ্ঠিত হয়, তথায় প্রতিযোগিতাপ্রথা আদৌ প্রশ্রয় পায় না; পরন্তু ইহার প্রসর ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইতে থাকে; যেমন এদেশে বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ, যুদ্ধব্যবসায়ী ক্ষত্রিয়, আয়ুর্ব্বেদী বৈদ্যরাজ এবং কৃষক, উহাদের ভিতর প্রতিযোগিতা আদৌ নাই। কিন্তু উহাদের বালকগণ যদি ইংরাজীস্কুলে ইংরাজী শিক্ষা করে, উহাদের ভিতর প্রতিযোগিতা আসিয়া পড়ে এবং উহাদের মধ্যে যে লোক ভাগ্যবলে বা স্বোদ্যম-বলে অধিক অর্থোপার্জ্জন করিবে, সে অধিক সন্তুষ্ট ও সুখী হইবে এবং যে তাহা না করিতে পারিবে, সে তত অসন্তুষ্ট ও অসুখী হইবে।

যে প্রতিযোগিতাপ্রথা এদেশে নূতন আমদানি হইয়াছে, উহার

দোষগুণ বিচার করা অত্যাবশ্যক; কারণ শিক্ষিত সম্প্রদায় জাতিভেদপ্রথার উপর যেমন নারাজ, তাঁহারা এ প্রথার তেমনি পক্ষপাতী। ইহা একরূপ সর্ব্ববাদিসম্মত, এই প্রথাই দেশোন্নতি, সমাজোন্নতি ও আত্মোন্নতির প্রধান উপায়। ইহা ব্যতীত জগতে কোন জাতি, কোন দেশ, কোন সমাজ, এমন কি কোন ব্যক্তি কখন কোন বিষয়ে উন্নতি লাভ করিতে পারে না। যাহার প্রতিযোগিতাক্ষেত্র যত অধিক প্রসারিত, সে তত উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। যেমন জীবজগতে যাবতীয় জীবজন্তুদিগের ভিতর জীবনসংগ্রাম প্রচলিত থাকাতে উহাদের জাতীয় উন্নতি স্বতঃ সাধিত হয়, সেইরূপ সমাজজগতেও এক জাতি অন্যান্য জাতির সহিত নানাবিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া জগতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। এজন্য সংসারে এত যুদ্ধবিগ্রহ দেখা যায়।

যে সমাজের জনসাধারণ স্ব স্ব অবস্থায় সন্তুষ্ট, যাহাদের উদ্যমশীলতা ও উচ্চাভিলাষ আদৌ নাই, সে সমাজ সভ্যতার পথে অগ্রসর হইতে পারে না, কালে জড়ভাবাপন্ন হইয়া মোহনিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া পড়ে, যেমন প্রাচ্যসমাজ। অপর পক্ষে সমাজে প্রতিযোগিতাপ্রথা প্রবল হইলে সকলের উদ্যমশীলতা ও অধ্যবসায় বৃদ্ধি পায়। সে সমাজ যত অসন্তুষ্ট হইবে, তত উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে, যেমন পাশ্চাত্য সমাজ। ইহাতে সিদ্ধান্ত করা উচিত, প্রতিযোগিতার সঙ্গে একদিকে উন্নতি, অপর দিকে সর্ব্বজনীন অসন্তোষ আইসে। দেখ, এ প্রথা দ্বারা পাশ্চাত্য সমাজ অতি অল্পকাল মধ্যে সভ্যতা ও উন্নতির পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। উহারা পৃথিবীময় উপনিবেশ ও সাম্রাজ্যাদি স্থাপন করিয়া আপনাদের সুখের পথ প্রশস্ত করিতেছেন ও জাতীয় গৌরব বর্দ্ধন করিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এতদূর বাহ্য সুখসমৃদ্ধি বর্দ্ধিত হইলেও এই প্রথা দ্বারা সমাজে অসন্তোষরূপ বিষবৃক্ষের বীজ উপ্ত হইতেছে। আজকাল ইউরোপ-

খণ্ডে জীবনসংগ্রাম যেরূপ আয়াসসাধ্য ও কৃচ্ছসাধ্য, তাহাতে তত্রত্য অধিকাংশ লোক অসন্তোষরূপ অন্তর্দাহে পরিদগ্ধ হইতেছে। তথায় নীচশ্রেণীর লোকেরা উচ্চশ্রেণীর সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করে এবং সমাজে অনেকে বিপ্লব ঘটাইয়া উহাদের সমূল নাশ করিতে চায়। ইহার জন্য ইউরোপে বলসিভিক সম্প্রদায়ের উৎপত্তি। তথায় অল্প কারণে ধর্ম্মঘট উপস্থিত হয় এবং বিপ্লববাদীরা সময়ে সময়ে নানা উৎপাত করিয়া থাকে। কিন্তু জাতিভেদের গুণে জীবনসংগ্রাম এদেশে অনায়াসসাধ্য হওয়াতে সকলে সর্ব্বসুখে সুখী ছিল, কস্মিন কালে ধর্ম্মঘটাদি ঘটে নাই এবং নীচজাতিবর্গ উচ্চজাতিদিগকে কখন ঘৃণা করে নাই।

সুসভ্য জাতিবর্গের সুখসমৃদ্ধি যতই কেন বর্দ্ধিত হউক না, তাঁহাদের গৌরবসূর্য্য কালে অস্তমিত হইবে। এ জগতে উন্নতির সীমা আছে, অবনতিরও সীমা আছে। আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছ হও, তারপর শুকাইয়া যাইতে হইবে। যতদিন তাঁহারা রাজ্য ও বাণিজ্য বর্দ্ধনের সুবিধা পাইবেন, ততদিন তাঁহারা নানা দুর্ব্বল জাতির উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়া আপনাদের অভীষ্ট সিদ্ধ করিবেন। পরে যখন রাজ্য ও বাণিজ্যবিস্তারের সুবিধা পাইবেন না, তখন তাঁহারা পরস্পর ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া পুনরায় মহাযুদ্ধে লিপ্ত হইবেন। ইউরোপের মহাকুরুক্ষেত্র এ বিষয়ে ভালরূপ সাক্ষ্য দিতেছে। বিজ্ঞানের যত উন্নতিসাধন হইবে, মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রও সেইরূপ নির্ম্মিত হইবে। ইহাতেই কালে যদুবংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।

বেশ জানিবে, যে জাতিভেদপ্রথা হইতে ভারতের পূর্ব্বকালীন অভ্যুদয় ও উন্নতি, সেই প্রথা হইতে ইহার আধুনিক অবনতি ও দুর্ভাগ্য। সেইরূপ যে প্রতিযোগিতাপ্রথা হইতে পাশ্চাত্য জগতের আধুনিক অভ্যুদয় ও উন্নতি, সেই প্রথা হইতেই ইহার ভবিষ্যৎ পতন

অবশ্যম্ভাবি। প্রকৃতির নিয়ম এই, যাহার যাহাতে উৎপত্তি, তাহার তাহাতেই নিবৃত্তি। যে সলিল হইতে অগ্নির উৎপত্তি, সেই সলিলেই ইহার নিবৃত্তি বা নির্ব্বাণ। জাতিভেদ বল. প্রতিযোগিতা বল, উভয় প্রথাই দোষগুণে মিশ্রিত এবং উভয় দ্বারা দেশবিশেষের উন্নতি বা অবনতি সম্ভব। তবে যে সুপ্রথা দ্বারা সমাজ এতকাল সন্তোষসুখে সুখী, এই পরাধীন অবস্থায়, এই দুর্দ্দিনে সে প্রথার অনাদর করিয়া বিজাতীয় প্রথার কেন এত পক্ষপাতী হইতেছ ? দেখ, অল্প দিন মাত্র হইতে চলিল, এখনও শতাব্দী অতীত হয় নাই, পাশ্চাত্যশিক্ষা সাধারণভাবে এদেশে বিস্তৃত হইয়াছে। ইতিমধ্যে চাকরীর বাজারে, দাসত্বের বাজারে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। এ হাহাকার কি কখন মিটিবে ? একবার সমাজের দিকে চাহিয়া দেখ, কত বিএ উপাধিধারী যুবকদল হা অন্ন! হা অন্ন! করিয়া তৃষ্ণার্ত্ত চাতকের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কত উকিল সামলা মাথায় দিয়া বার লাইব্রেরীতে বসিয়া মাথা কুটিতেছে, মক্কেল যে নাই! কত ডাক্তার ষ্টিথসকোপ হাতে লইয়া নিজের ডিস্পেন্সারিতে বসিয়া পেট চোঁ চোঁ করিতেছে দেখিয়া কত কি ভাবিতেছে, রোগীপত্র যে আদপে নাই ? ইংরাজদের আমলে এ বেকার দল ক্রমশঃ আরও বাড়িবে, কদাচ কমিবে না। পরে এ সমস্যা মীমাংসা তাঁহাদের এক মহাদায় হইবে। তাঁহারা এদেশের আইনকানুন লইয়া এ দেশ শাসন করিতেছেন! কিন্তু সমাজের জাতিভেদপ্রতিষ্ঠিত পুরাণ পদ্ধতি মিটাইতে চেষ্টা করায় তাঁহারা এই বেকারের দল ক্রমশঃ বাড়াইতেছেন। এ হাঙ্গাম তাঁহারাই পোয়াইবেন।

অতীত কালে জাতিভেদ দ্বারা ভারতের মঙ্গলসাধন।

সকলে ইতিহাসে পাঠ করেন, বৌদ্ধধর্ম্ম খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রচারিত হইয়া খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতে প্রাদুর্ভূত ছিল

ও রাজন্যবর্গ দ্বারা ভালরূপ পৃষ্ঠপোষিত হইয়াছিল এবং মুসলমান জাতি ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত দোর্দণ্ডপ্রতাপে ভারতে রাজত্ব করিয়া যান। এস্থলে অনেকের মনে কৌতূহল হইতে পারে, যে বৌদ্ধ ও মুসলমানধর্ম্ম পৃথিবীর নানাদেশে বিস্তীর্ণ হইয়াছে, যে ধর্ম্মদ্বয়প্রচারে প্রবলপরাক্রান্ত নরপতিবৃন্দ চিরদিন বদ্ধপরিকর ছিলেন, সেই দুই পরাক্রান্ত ধর্ম্ম এমন সুদীর্ঘ কাল মধ্যেও ভারতের দুর্ব্বল হিন্দুধর্ম্মকে গ্রাস করিতে অসমর্থ হইল, ইহার প্রধান কারণ কি? কি মোহিনী শক্তি বলে, কি যাদুবলে অর্দ্ধসভ্য ভারতের অর্দ্ধসভ্য পৌত্তলিক হিন্দুধর্ম্ম এমন পরাক্রান্ত শত্রুদ্বয়কে পরিশেষে পরাস্ত করিতে সমর্থ হইল? পৃথিবীর কোন্ দেশে এমন অলৌকিক দৃশ্য কে কোথায় দেখেছে?

জগতের ইতিহাস ভালরূপ সাক্ষ্য দিতেছে, দুর্ব্বল ধর্ম্ম পরাক্রান্ত ধর্ম্মের সংস্রবে আসিলে দুই শতাব্দীর ভিতর নিজের অস্তিত্ব হারাইয়া বসে। তবে দুর্ব্বল হিন্দুধর্ম্ম কাহার বলে ও কি গুণে এমন সুদীর্ঘ-কাল ব্যাপিয়া পরাক্রান্ত বৌদ্ধ ও মুসলমান ধর্ম্মের সহিত ঘোরতর সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াও নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সমর্থ হইল? কেবলমাত্র জাতিভেদপ্রথা হিন্দুসমাজে প্রচলিত ছিল বলিয়া দুর্ব্বল হিন্দুধর্ম্ম স্বশত্রুদ্বয়কে পরাস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছে। এ ধর্ম্ম দুর্ব্বল হউক বা পরাক্রান্ত হউক, রাজন্যবর্গ দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত হউক, বা না হউক, এক জাতিভেদপ্রথার গুণে এ ধর্ম্ম চিরদিন প্রভূত বলে বলীয়ান।

একবার ভাব দেখি, ভারতের যে বৌদ্ধধর্ম্ম অর্দ্ধভূমণ্ডলে বিস্তীর্ণ ও সমাদৃত হইয়াছে, যে ধর্ম্মপ্রচারে অশোক কনিষ্কাদি চক্রবর্ত্তী অধীশ্বরবর্গ আজীবন প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কি আশ্চর্য্যের বিষয়, সে ধর্ম্ম ইহার জন্মভূমি ভারত হইতে চিরনির্ব্বাসিত হইল

এবং এ দেশে সে ধর্ম্মের এখন কোনরূপ নামগন্ধ পর্য্যন্ত নাই! যে মুসলমান জাতির দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে ও বিজয় ঘোষে ইউরোপ, এসিয়া ও আফ্রিকা, এই তিন মহাদেশ এক সময়ে প্রকম্পিত হইয়াছিল, যে মুসলমান জাতি এক হস্তে কোরাণ ও অপর হস্তে তরবারি লইয়া স্বধর্ম্মপ্রচারে দৃঢ়ব্রত হওয়াতে নানাদেশে পুরাতন জাতিধর্ম্মের সমূলোৎপাটন করিতে সমর্থ হইয়াছে, কি আশ্চর্য্যের বিষয়, সে জাতিও ভারতে পঞ্চশতাব্দীতে আমাদের জাতিধর্ম্ম গ্রাস করিতে অসমর্থ হইল ? একমাত্র জাতিভেদপ্রথা হিন্দুসমাজে চির-প্রচলিত বলিয়া সমাজনায়ক ব্রাহ্মণগণ নিরীশ্বরবাদী বৌদ্ধধর্ম্মকে ভারত হইতে চিরনির্ব্বাসিত করিতে ও পাষণ্ড মুসলমানধর্ম্মের পরাজয় সাধন করিতে সমর্থ হন। ভারতে জাতিভেদপ্রথা চির-প্রচলিত বলিয়া বৌদ্ধ ও মুসলমানধর্ম্ম হিন্দুসমাজ ও হিন্দুধর্ম্মকে বিপর্য্যস্ত করিয়াও একেবারে পরাস্ত করিতে পারে নাই। এই জাতিভেদের কঠোর শাসনগুণে হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজ অন্তর্নিহিত শক্তিবলে ও ব্রহ্মতেজে পঞ্চদশ শতাব্দীব্যাপী বৌদ্ধ ও মুসলমান যুগ অতিক্রম করত নবজীবনে উৎসাহিত হইয়া নিজ প্রতাপ অক্ষুন্ন রাখিতে বা পুনরুজ্জীবিত করিতে সমর্থ হইয়াছে।

এখন জিজ্ঞাস্য, এ প্রথা কি প্রকারে ভারতে বৌদ্ধ ও মুসলমান ধর্ম্মের পরাজয় সাধন করিল ? সত্য বটে, আমাদের প্রকৃত জাতীয় ইতিহাস নাই, সেজন্য আমরা ভালরূপ জানিনা, এ প্রথা আমাদের জাতিধর্ম্ম রক্ষণে কতদূর সাহায্য করিয়াছে। কিন্তু আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি, বৌদ্ধ ও মুসলমান যুগে ধর্ম্মাত্মা ব্রাহ্মণগণ জাতি-ভেদের কঠোর শাসন সমাজে প্রবল করিয়া দেওয়াতে আমাদের জাতিধর্ম্মরক্ষণে কৃতকার্য্য হন। সত্য বটে, বৌদ্ধযুগে আর্য্য-সমাজ চারিবর্ণে অস্পষ্ট বিভক্ত হওয়ায় সমাজ-শাসন প্রকৃষ্টরূপ চালিত হয় নাই এবং লোকে দলে দলে জাতিভেদের বন্ধন উল্লঙ্ঘন করিয়া

যাগযজ্ঞ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল, তথাচ অনেকে বিশেষতঃ শ্রেষ্ঠ-জাতিগুলি জাতিভেদের সুশাসনবশতঃ হিন্দুসমাজভুক্ত ছিল।

পৌরাণিক ও তান্ত্রিকধর্ম্মের উৎকর্ষ ও বেগাতিশয্য বশতঃ যখন বৌদ্ধধর্ম্ম এদেশে অবনত হইয়া পড়ে, তখন ব্রাহ্মণগণ বৈদিক যুগের জাতিভেদপ্রথাকে আরও স্ফুরিত ও প্রসারিত করিয়া বা ঐ প্রথার নূতন বিস্তৃত সংস্করণ করিয়া হিন্দু বৌদ্ধ লইয়া দেশে দেশে বৃত্তি অনুসারে আধুনিক প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। ইহাতে তাঁহারা সমাজকে ভালরূপ শাসন করিতে সমর্থ হন। মুসলমানযুগে এ প্রথা তাঁহাদের ভালরূপ কাজে লাগে। ইহার গুণে তাঁহারা আমাদের জাতিধর্ম্ম রক্ষণে এতদূর কৃতকার্য্য হন। কালাপাহাড়ের ন্যায় অনেক হিন্দুকুলের কুলাঙ্গার মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া আমাদের জাতিধর্ম্মের উপর, দেবদেবীর উপর যথেষ্ট অত্যাচার করিয়াছে বটে, কিন্তু সাধারণ হিন্দুসমাজ সর্ব্বত্র স্বধর্ম্মে একনিষ্ঠ ছিল।

তৎকালে যে হিন্দুকুলের কুলাঙ্গার নবাব ও উজিরদের প্রসাদ প্রলোভনে প্রলোভিত হইয়া ফকির মোল্লাদের বাক্‌চাতুর্য্যে বিমোহিত হইয়া বা মুসলমান মহিলার প্রেমপাশে বদ্ধ হইয়া বুদ্ধি-ভ্রংশবশতঃ মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইত, হিন্দুসমাজ তাহাকে চিরদিনের জন্য জাতিচ্যুত করিয়া জাতীয় সম্মান ও সত্ত্ব হইতে চিরবঞ্চিত করিয়া দিত এবং তাহার বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজন হইতে তাহাকে চিরবিয়োজিত করিত। সে ব্যক্তির সহিত স্বজাতির কোন লোকের আর কোন সংস্রব থাকিত না। জাতিচ্যুত হওয়াতে সে ব্যক্তি যেন দ্বীপান্তরে প্রেরিত হইত। তৎকালে তাহার মনে কিরূপ যন্ত্রণা ও আত্মগ্লানি উত্থিত হইত। এখন বল দেখি, এরূপ যন্ত্রণা ও লাঞ্ছনা পাইয়া শ্রেষ্ঠ জাতিবর্গের মধ্যে কে এমন নির্ব্বোধ, যে তিনি নিজের জাতিধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিবেন? ডোম, ডোগ্‌লা,

চামার, মুচি মেতর প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতির মধ্যে অনেকে দেশে দেশে উক্তধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া আপনাদের সামাজিক সম্মান বর্দ্ধন করিয়া গিয়াছে। ইহার জন্য এখন ভারতের ষষ্ঠাংশ লোক মুসলমান বলিয়া পরিচিত।

এই জাতিভেদের সুশাসনবশতঃ হিন্দুসমাজে চিরদিন সমস্বরে বিঘোষিত হইতেছে, "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।" আজকাল যে ভয়ে লোকে হঠাৎ খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে চায়না, সেই ভয়ই হিন্দুসমাজে সকল জাতির ভিতর চিরদিন জাগরুক রহিয়া আসিতেছে। যেমন আজকাল যদি কোন হিন্দুকুলের কুলাঙ্গার কোন কারণবশতঃ খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করে, সেই পাপিষ্ঠের নাম লইয়া চারিদিকে হৈ চৈ পড়িয়া যায় এবং সকলে তাহাকে ছি! ছি! করিতে থাকে, সেইরূপ বৌদ্ধযুগে কোন লোক বৌদ্ধ হইলে এবং মুসলমানযুগে কোন লোক মুসলমান হইলে সকলে তাহাকে ছি! ছি! করিত। কে এমন নির্ব্বোধ, যে তিনি এতদূর লাঞ্ছনা ও অপমান সহ্য করিয়া নিজের জাতিধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিবেন? তবে বুঝিয়া দেখ, অতীত কালে জাতিভেদপ্রথা হিন্দুসমাজের কতদূর মঙ্গল সাধন করিয়াছে।

যে প্রথা এতকাল হিন্দুসমাজে প্রচলিত থাকাতে তুমি আজ জগতে বৌদ্ধ বা মুসলমান বলিয়া পরিচিত হও নাই, যে প্রথা থাকাতে তুমি আজ হিন্দু নামের ও পবিত্র হিন্দু শোণিতের গৌরব করিয়া বিস্ফারিত হৃদয়ে অন্যান্য জাতিদিগকে ম্লেচ্ছ জ্ঞানে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতে শিখিয়াছ, যে প্রথা থাকাতে তুমি আজ বেদবেদান্ত, ষড়দর্শন, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদি পাঠ করিয়া নিজের ধর্ম্মপিপাসা শান্ত করিতে করিতে ধর্ম্মপথে অধিক অগ্রসর হইতেছ, সে প্রথাটী কি তোমার মস্তকের শিরোমণি নয়? এমন অমূল্য

রত্নকে কি কদাচিৎ পায়ে ঠেলিতে আছে বা পায়ে খাঁৎলাইতে আছে? ইহা কি সমাজদেহের অর্ব্বুদস্বরূপ?

যে সুপ্রথার গুণে অতীতকালে বৌদ্ধ ও মুসলমান ধর্ম্ম পরাস্ত হইয়াছে, যে প্রথার গুণে আজকাল সুসভ্য খৃষ্টধর্ম্ম নিজের মোহিনী বিদ্যা প্রচার করিয়াও পরাস্ত হইতেছে, সেই সুপ্রথা সমাজে অক্ষুণ্ণ রাখিলে কে বলিতে পারে, ভবিষ্যতে ইহা দ্বারা ভারতের আরও না কত মঙ্গল সাধিত হইবে? বিশেষতঃ এই পরাধীন অবস্থায় এই সুপ্রথাই আমাদের জাতিয়তারক্ষা করিবার একমাত্র ব্রহ্মাস্ত্র। তবে কেন দুপৃষ্ঠা ইংরাজি পড়িয়া তোমরা আজ সবে ধন নীলমণিকে গঙ্গার জলে বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হইয়াছ?

মুসলমান অর্দ্ধচন্দ্র ভারতগগনে উদিত হইয়া পৎ পৎ শব্দে উড়িতে উড়িতে চলিয়া গেল; এখন ব্রীটিশসিংহ ভারতকে নিজ নখরে ধরিয়া চারিদিকে হুঙ্কার ছাড়িতেছে এবং ইহার অর্থ লইয়া ছিনিমিনি খেলিতেছে, রুষভল্লুক ও জার্ম্মান ঈগল আসিবার জন্য সময়ে সময়ে বিভীষিকা প্রদর্শন করে, পীতজাতিও লোলুপ দৃষ্টিতে ভারতেব দিকে তাকাইয়া আছে; যিনিই আসুন না কেন, জাতিভেদপ্রথাকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিলে হিন্দুধর্ম্ম সকলকে অষ্টরম্ভা দেখাইবে। যে প্রথার গুণে হিন্দুজাতি ও হিন্দুধর্ম্ম জগতে অমর, সে প্রথা কি আমাদের মস্তকের শিরোমণি নয়? ভাই রে ভাই! এমন সুপ্রথার নিন্দা করিও না। তোমার জিহ্বা শতধা বিদীর্ণ হইবে। তোমার মস্তকোপরি শত বজ্রপাত হইবে।

জাতিভেদের মহৎ দোষ।

বৌদ্ধযুগে যৎকালে প্রাতঃস্মরণীয় বুদ্ধদেব দুন্দুভিস্বরে বিশ্বমৈত্রী ভাব প্রচার করত জাতিভেদের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হন, তৎকালে অনেকে এপ্রথাকে ঘৃণাচক্ষে অবলোকন করিতেন। বিধাতার ভবি-

তব্য, ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধধর্ম্মের উপর জয়লাভ করিয়া সর্ব্বত্র আধুনিক প্রথা প্রবর্ত্তিত করত হিন্দুসমাজকে অষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধন করিয়া ফেলিলেন। তদবধি তাঁহাদের উপদেশমত কেহই এ প্রথার কোনরূপ দোষ বুঝিতে পারে নাই। সকলেই এই সামাজিক প্রথার সমক্ষে মস্তকে অবনত করিয়া আসিতেছে।

যখন মুসলমান তরবারির নিকট ক্ষত্রিয়জাতি পরাস্ত হইয়া রাজশক্তি হারাইয়া বসে, তখনও কেহ এ প্রথার কোনরূপ দোষ বুঝিতে পারে নাই। মুসলমানযুগে তাঁহাদের সমাজপদ্ধতি দেখিয়া কোন কোন সংস্কারক এ প্রথার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া স্বসম্প্রদায়ের ভিতর ইহা রহিত করিয়া যান; কিন্তু কেহই সাধারণ হিন্দুসমাজে ইহা রহিত করিতে পারেন নাই বা ইহার উপর কোনরূপ দন্তস্ফোট করিতে পারেন নাই। তদবধি ইহা সর্ব্বত্র অবাধে লোকপরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে।

আজকাল ইংরাজরাজের অনুগ্রহে আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষা পাইয়া সাম্যমন্ত্রে দীক্ষিত। এই শিক্ষার গুণে আমাদের চক্ষুকর্ণ এখন নানাদিকে ফুটিতেছে। এখন আমরা টোলো পণ্ডিতদিগের কথায় আর ভুলি না। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতর অনেকেই এ প্রথার উপর অতীব নারাজ। তাঁহাদের বিশ্বাস, এই কুপ্রথাবশতঃ ভারতের এত দুর্গতি ও দুর্দ্দশা, ইহা এতকাল পরাধীন ও পরের পদানত। এ কুপ্রথা রহিত না হইলে আমরা কস্মিনকালে জাতীয় উন্নতিসাধন করিতে পারিব না এবং পায়ের উপর ভর দিয়া দাড়াইয়া অপর জাতির সমকক্ষ হইতে পারিব না।

ইংরাজী শিক্ষা পাইয়া আমরা স্বতঃ মনে করি, যে প্রথা সমাজে জন্মঘটিত অযথা বৈষম্য আনয়ন করে এবং নীচ জাতিবর্গকে স্বকীয় অবস্থার উন্নতিসাধন করিতে অবসর দেয় না, সে প্রথা কি দোষাকার নয়? যে প্রথা সমাজে থাকাতে একজন পাপাত্মা ও গণ্ডমূর্খ

উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া বংশোচিত সম্মানাদিতে চিরবিভূষিত, আর একজন ধর্ম্মাত্মাও অশেষ বিদ্যাবিশারদ হইয়া নীচবংশে জন্মগ্রহণ করাতে চিরদিন হেয় ও ঘৃণাস্পদ; যে প্রথা কেবল আভিজাত্যের সমাদর করিয়া অনুশীলনের দিকে তাদৃশ দৃষ্টিপাত করে না, সে প্রথা কি দোষাকর নয়?

এখন যে ন্যায়বান ইংরাজরাজ জাতিনির্ব্বিশেষে প্রজাপালনার্থ, উহাদের সুখসমৃদ্ধি বর্দ্ধনার্থ সমাজের সকল জাতিবর্গকে সমসত্ত্বে সত্ত্ববান করিয়া উহাদিগকে বিদ্যা ও অর্থ উপার্জ্জন করিবার যথেষ্ট অবসর দিতেছেন, যাঁহারা পাশ্চাত্য বিদ্যা বিস্তীর্ণ করিয়া নীচজাতি-বর্গকেও পাকে প্রকারে উচ্চজাতির সমকক্ষ করিতেছেন, তাঁহাদের উপর প্রথমোক্তেরা কিরূপ কৃতজ্ঞ! বৌদ্ধধর্ম্মবিলোপের পর ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম নীচজাতিবর্গ বিদ্যা ও অর্থ উপার্জ্জন করিয়া উচ্চ জাতির সমকক্ষ হইতে চেষ্টা পাইতেছে। ইংরাজের কল্যাণে এখন অনেকে নীচকুলে জন্মগ্রহণ কয়িয়া অশ্বযানে দোলায়-মান ও সমাজে সুসম্মানিত।

এখন আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষা পাইয়া পাশ্চাত্য সাম্যবাদের বিশেষ পক্ষপাতী। অতএব ইহার গুণাগুণ বিচার করা কর্ত্তব্য।

সাম্যবাদ শব্দের প্রকৃত অর্থ কি? যে সমাজের যাবতীয় লোক সমসত্ত্বে সত্ত্ববান ও সকল বিষয়ে সমান অধিকারে অধিকারী, যে স্থলে কোন বিষয় লইয়া কোনরূপ ভেদাভেদ দেখা যায় না, সেই সমাজেই প্রকৃত সাম্যবাদ প্রচলিত আছে। যে জীবজগতে প্রকৃতি যাবতীয় জীবজন্তুকে অবস্থানুযায়ী সমসত্ত্বে সত্ত্ববান করে, উহাদের ভিতর প্রকৃত সাম্যবাদ প্রচলিত আছে। আদিম অবস্থায় যখন বর্ব্বর মানবজাতি প্রাকৃত অবস্থায় অবস্থিত ছিল, তখন উহাদের ভিতরও প্রকৃত সাম্যবাদ প্রচলিত ছিল। আধুনিক বলশিভিক-

দিগের মূলমন্ত্র, সমাজের সকল ভেদাভেদ মিটাইয়া দেওয়া ও সকলকে সমসত্ত্বে সত্ত্ববান করা। কিন্তু উহারা এবিষয়ে কতদূর কৃতকার্য্য হইবে, তাহা বলা যায় না।

চীন হইতে পেরু পর্য্যন্ত সকল দেশ অনুসন্ধান করিলে বুঝা যায়, মানবসমাজমাত্রেই অসংখ্য ভেদাভেদ, অসংখ্য পার্থক্য বিদ্যমান। বিদ্যা বুদ্ধি, অর্থ, সম্মান, সুখ ও ধর্ম্ম, সকল বিষয়েই বিরাট ভেদাভেদ দেখা যায়। ইহা আদৌ সাম্যবাদ নহে, পরন্তু বিষম বৈষম্যবাদ। যে পৃথিবীতে তুমি যে পরিমাণে সুখী, তোমার প্রতিবেশিগণ সেই পরিমাণে অসুখী, যে পৃথিবীতে বিদ্বান ও ধনবান যেরূপ সম্মানিত, মূর্খ ও দরিদ্র সেইরূপ ঘৃণিত, যে পৃথিবীতে একজন প্রাসাদোপরি অধিশয়ান, অপর একজন ভূতল-শায়ী, যে পৃথিবীতে ধনবান, মধ্য-বিত্ত ও দরিদ্র, এই তিন শ্রেণী সর্ব্বত্র বিদ্যমান, সে পৃথিবীতে প্রকৃত সাম্যবাদ কিরূপে স্থাপিত হইতে পারে? তবে শিক্ষিত সম্প্রদায় কিরূপ সাম্যবাদ চান।

যেমন রাজপুত্র, ধনাঢ্য পুত্রও ভিক্ষুক পুত্র, সকলেই এ জগতে রিক্ত হস্তে আইসে ও রিক্ত হস্তে চলিয়া যায়, মোটামুটি প্রকৃতির নিকট, ঈশ্বরের নিকট উহাদের কোনরূপ জন্মঘটিত বৈষম্য নাই; সেইরূপ সমাজস্থ যাবতীয় লোকের কোনরূপ জন্মঘটিত কুলপরম্পরা-গত বৈষম্য না থাকার নাম সাম্যবাদ। উত্তরকালীন শিক্ষানুসারে সমাজে অর্থ ও বিদ্যা লইয়া বৈষম্য আসুক, তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই; কিন্তু জন্মঘটিত বৈষম্য না থাকায় নাম সাম্যবাদ।

যে স্থলে ভারতের জাতিভেদ প্রকতির অনুকরণে কুলপরম্পরা-গত বৈষম্য আনয়ন করে, সে স্থলে পাশ্চাত্য জগতের সাম্যবাদ জন্মঘটিত বৈষম্য মিটাইয়া উত্তরকালীন শিক্ষানুসারে বিদ্যা ও অর্থ লইয়া সমাজে প্রভূত বৈষম্য আনয়ন করিয়া থাকে। যে স্থলে হিন্দুসমাজ কলিকালের বর্দ্ধিষ্ণু আধিভৌতিকতার পরিবর্ত্তে যুগধর্ম্মে

অপগত আধ্যাত্মিকতার কিঞ্চিৎ বর্দ্ধনার্থ পুরুষানুক্রমিকতামূলক অনুবৃত্তির সমাদর করিয়া কুলপরম্পরাগত আভিজাত্য ও কৌলিন্যের সম্মান করে, সে স্থলে পাশ্চাত্য সমাজ আধ্যাত্মিকতার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া একমাত্র আধিভৌতিক উন্নতিসাধনের জন্য অনুশীলনমূলক পরিবৃত্তির সম্যক সমাদর করিয়া বিদ্যা ও অর্থের যথোচিত সম্মান করিয়া থাকে। কিন্তু উভয় প্রথা দ্বারা সমাজে প্রভূত বৈষম্য আনীত হইয়াছে।

এস্থলে হিন্দুধর্ম্মের অপরাধ এই যে, সমাজে সুশৃঙ্খলতা স্থাপন করিবার জন্য এবং সকলকে সন্তোষসুখে সুখী করিবার জন্য ইহা প্রকৃতির আদেশ ভালরূপ পালন করিতেছে। এজন্য প্রকৃতি যাহাকে যে কুলে আনয়ন করিবে, এ ধর্ম্মও তাহাকে সেইরূপ সম্মান করিবে। অপর পক্ষে পাশ্চাত্য জগৎ সকলকে বিদ্যা ও অর্থের উপার্জ্জনে প্রোৎসাহিত করিবার জন্য প্রকৃতির আদেশ অবহেলা করে অথবা ইহার বিপক্ষে গমন করে।

যাহা হউক, জাতিভেদ বল, তথা কথিত সাম্যবাদ বল, উভয় প্রথাই দোষগুণে মিশ্রিত, যেহেতুক উহারা সমাজে বিষম বৈষম্য আনয়ন করে। তিন সহস্র বৎসর হইতে চলিল, জাতিভেদপ্রথা এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এজন্য ইহার গুণগুলি ভস্মাচ্ছাদিত থাকায় দোষগুলি কেবল আমাদের চক্ষে জ্বল জ্বল করিতেছে। অপর পক্ষে পাশ্চাত্য সাম্যবাদ অল্পদিন হইতে চলিল এদেশে আমদানি হইয়াছে, সেজন্য ইহার দোষগুলি ভস্মাচ্ছাদিত থাকায় গুণগুলি আমাদের চক্ষে জ্বল জ্বল করিতেছে এবং আমাদের মনকে ভালরূপ আকৃষ্ট করিতেছে। এই সাম্যবাদ তিন সহস্র বৎসর ভারতে প্রচলিত থাকিলে, ইহার অবস্থা যে কিরূপ ভয়ঙ্কর হইবে, তাহা এখন আমরা কল্পনায় আনিতে পারি না। অনেকের ধারণা, জাতিভেদপ্রথা এতকাল প্রচলিত থাকাতে হিন্দুসমাজে যে সুশৃঙ্খলতা ও সন্তোষ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল

ইংরাজ বৃত্তিবিপর্য্যয় করিয়া উহাদের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছেন। সেজন্য বলা উচিত, কুক্ষণে তাঁহারা এদেশে পাশ্চাত্য সাম্যমন্ত্রের দীক্ষা দিয়াছেন।

আজকাল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতর ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত, যে একতার অসদ্ভাব প্রত্যেক প্রদেশে হিন্দুসমাজের স্তরে স্তরে অন্তর্নিহিত ও চিরজাজ্জ্বল্যমান, উহার একমাত্র মূলীভূত কারণ অশেষ দোষাকর জাতিভেদপ্রথা। বস্তুতঃ যে কুপ্রথা মানবমনকে ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলে, নীচজাতিদিগকে ঘৃণা করিতে শিক্ষা দেয় এবং সমাজে ঈর্ষা, দ্বেষ ও হিংসা স্বতঃ আনয়ন করে, সে প্রথার কে প্রশংসা করিবে? শাস্ত্রের আদেশ "উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্'। এই উপদেশানুসারে উদার প্রেম শিক্ষা করিয়া পৃথিবীস্থ সমস্ত জাতিকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করা উচিত। এতদূর উদার-চরিত না হইতে পার, অন্ততঃ প্রকৃতিচিহ্নিত স্বদেশের যাবতীয় লোকের উপর সমান ভালবাসা ও সহানুভূতি দেখাইয়া স্বজাতিপ্রেম, স্বদেশানুরাগ ও জাতীয়তা সম্যক অনুশীলন করা উচিত। এসব করা দূরে থাকুক, জাতিভেদ দ্বারা আমরা দেশের একভাষী, এক ধর্ম্মাবলম্বী যাবতীয় লোককে ঘৃণা করিতে শিখি, কেবল স্বজাতির মুষ্টিমেয় লোকের সহিত আহার বিহারও কুটুম্বিতা করি। বস্তুতঃ এদেশের যত দলাদলি, যত জাতিবিদ্বেষ, যত অসম্মিলনভাব একমাত্র জাতিভেদ হইতে উদ্ভূত।

কেহ কেহ বলেন, জগতের পূর্ব্বতন দাসত্বপ্রথা যেরূপ ছিল, এদেশের জাতিভেদও প্রায় তদনুরূপ। স্বার্থপরতার বশীভূত হইয়া লোকে সহজে দাসত্বপ্রথা রহিত করিতে চায় নাই। সেইরূপ স্বার্থপরতার বশীভূত হইয়া এদেশের উচ্চজাতিবর্গ স্ব স্ব জাতীয় সম্মান ত্যাগ করিতে চান না এবং নীচ জাতিদিগকে মস্তক উত্তোলন

করিতে না দিয়া উহাদিগকে দাসের ন্যায় খাটাইয়া লন। এমন কুপ্রথাকে কি প্রশ্রয় দেওয়া উচিত ?

দেখ, পৃথিবীর অন্যান্য জাতি সাধারণ-বিপদে কিরূপ সম্মিলিত হইয়া বিপদ প্রতীকারের চেষ্টা পায়! কিন্তু হিন্দুজাতি কোন বিষয়ে একতায় বদ্ধ হইয়া কাজ করা কাহাকে বলে, তাহা উহারা জানে না বা শিখে না। শিক্ষিত সমাজ বল, অশিক্ষিত সমাজ বল, সর্ব্বত্র কেবল দলাদলি ও অসম্মিলনভাব। শিক্ষিত সম্প্রদায় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলেন; অর্দ্ধ শতাব্দীর ভিতর এ সমাজ তিন দলে বিভক্ত হইয়া গেল। শিক্ষিত সম্প্রদায় জাতীয় সমিতি (Congress) স্থাপন করিলেন। অর্দ্ধ শতাব্দীর ভিতর ইহাও নানা দলে বিভক্ত হইয়া পড়িল। যখন শিক্ষিত সমাজের অবস্থা এরূপ, তখন অশিক্ষিত সমাজের কথা ছাড়িয়া দেও। উহারা ত চিরদিন দলাদলি পাকাইতেছে ও পরস্পর খেয়োখেয়ি করিতেছে। এই দলাদলির জন্য ভারত উচ্ছন্ন গিয়াছে।

একতার অসদ্ভাব আমাদের জাতীয় জীবনের মহৎ কলঙ্ক ও মহৎ দোষ। এই এক দোষে এদেশ এতকাল পরাধীন ও পরের পদানত। অনেকের মত, যতদিন এ কুপ্রথা প্রবল থাকিবে, ভারত কস্মিন কালে জগতে মুখ উত্তোলন করিয়া সভ্যতার পথে অগ্রসর হইতে পরিবে না, আমরাও পায়ের উপর ভর দিয়া দাড়াইয়া অন্য সুসভ্য জাতির সমকক্ষ হইতে পারিব না। অতএব এ কুপ্রথাকে, এ অনাচারকে অচিরে কর্ম্মনাশার জলে বিসর্জ্জন দেওয়াই শ্রেয়।

যেমন এক প্রকৃতি-চিহ্নিত দেশে এক শাসনতন্ত্র, এক ভাষা, এক ধর্ম্ম ও একপ্রকার রীতিনীতি কালক্রমে স্থাপিত হয়, সেইরূপ তথাকার সমগ্র অধিবাসী এক জাতি গঠন করিলে উহাদের ভিতর সহানুভূতি চিরদিন সম্যক অনুশীলিত হইতে থাকে এবং সাধারণ বিপদে সকলে সমবেত চেষ্টা দ্বারা ইহার প্রতীকার করিতে

চেষ্টা পায়। এখন যদি সেই প্রকৃতি-চিহ্নিত জাতি কুলপরম্পরাগত জাতিভেদ দ্বারা অসংখ্য জাতিতে বিভক্ত হয়, সে জাতি কি সাধারণ বিপদে একতায় বদ্ধ হইয়া একযোগে কাজ করিয়া উহার প্রতীকার করিতে শিখিবে? সে জাতির জাতীয় জীবন ও জাতীয়তা কি রসাতলে যাইবে না?

এই সকল নানা কারণে এ প্রথা এখন কোন দেশে দেখা যায় না। কেবল আমাদের মাথা খাইবার জন্য এ কুপ্রথা এতকাল এদেশে প্রবল রহিয়াছে। যাহা হউক, এপ্রথা আমাদের মাথাটী চিবাইয়া খাইতেছে। এই অনাচারবশতঃ এদেশ মুসলমান কর্ত্তৃক অনায়াসে বিজিত হইয়াছিল এবং ইংরাজও বিনা যুদ্ধে, বিনা শোণিতপাতে একমাত্র বুদ্ধিবলে ইহার সার্ব্বভৌম অধীশ্বর হইয়াছেন। সকলের মুখে শুনিতে পাই, এই কুপ্রথাই আমাদের জাতীয় উন্নতির প্রধান অন্তরায়। কেবল শিখাধারী টোলোপণ্ডিতদের ও মহিলাগণের খাতিরে এপ্রথা সমাজে একপ্রকার শ্বসেমিরে আছে। এইবেলা গলাটীপিয়া ইহাকে মারিতে পারিলে দেশের প্রভূত মঙ্গল হইবে। সমাজের চরমপন্থিগণ আপনাদের মন্তব্য এই প্রকারে জাহির করিতেছেন।

এখন ভালরূপ বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত, যে একতার অসদ্ভাব হিন্দুসমাজের স্তরে স্তরে জাজ্বল্যমন, যাহার জন্য ভারত এতকাল পরাধীনতারূপ অতলজলধিগর্ভে নিমগ্ন, উহার প্রধান কারণ কি জাতিভেদপ্রথা? বলি, যে প্রথা অতীতকালে ভারতের অশেষ মঙ্গল ও উন্নতিসাধন করিয়াছে, যাহার গুণে জ্ঞানধর্ম্ম ও ভাষাশিল্প সকলই অত্যুচ্চ পদবীতে অধিরূঢ় হইয়াছে, যে প্রথা থাকাতে ভারত দ্বিসহস্র বৎসর স্বাধীনতা ভোগ করিয়া প্রাচ্যজগতে নিজ সভ্যতা-জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়াছে, যে প্রথা থাকাতে হিন্দুজাতি আয়ুর্ব্বেদ ও দর্শনাদি বিদ্যায় পৃথিবীস্থ অন্যান্য জাতির আদিগুরু হইয়াছে, সেপ্রথা

কি প্রকারে একতাভাবের সর্ব্বপ্রধান কারণ হইতে পারে? সত্য বটে, এ প্রথা জাতীয় অনৈক্যরূপ হুতাশনে চিরদিন ইন্ধনরাশি অর্পণ করিয়া ইহাকে সমাজে ধিকি ধিকি জ্বালাইয়া রাখিয়াছে, তথাচ ইহার সকল দোষ এ প্রথার স্কন্ধে ন্যস্ত করা অনুচিত। যিনি যাহাই ভাবুন, একতাভাবের মূলীভূত কারণ একমাত্র জাতিভেদ প্রথা নহে।

যে ভারত ভূগোলে পর্ব্বতসাগরবেষ্টিত ও প্রকৃতিচিহ্নিত দেশ হইয়াও প্রকৃত এক মহাদেশ, যে ভারতে পর্ব্বতাদি দুর্ল্লঙ্ঘ্য অবরোধ মধ্যে মধ্যে ব্যবহিত হওয়ায় ইহা চিরদিন ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত এবং ঐ সকল প্রদেশে অতিপুরাকাল হইতে ভিন্ন ভিন্ন রাজবংশ ও ভিন্ন ভিন্ন ভাষা কালক্রমে উত্থিত, সে ভারতে কি প্রকারে সকল জাতির ভিতর সার্ব্বভৌম একতা স্থাপিত হইতে পারে?

যে ভারতে পুরাকাল হইতে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন জাতি আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে, যে ভারতে ব্রাহ্মণজাতির বুদ্ধিভ্রংশবশতঃ ক্ষত্রিয়জাতির ভিতর চিরসমরানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, যে ভারতে অতি পুরাকাল হইতে ধর্ম্মের মতামত লইয়া ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় উত্থিত হইয়াছে, যে ভারতে চিরকালই ভিন্ন ভিন্ন জাতি সভ্যতার ভিন্ন ভিন্ন সোপানে আরূঢ় হইয়া আসিতেছে, সে ভারতে কি প্রকারে সকল জাতির ভিতর সার্ব্বভৌম একতা স্থাপিত হইতে পারে?

আজ ইংরাজি ভূগোলে ভারত এক প্রকৃতি-চিহ্নিত দেশ বলিয়া পরিগণিত বটে, কিন্তু যখন প্রাকৃতিক কারণে ইহাতে নানা প্রদেশ, নানাভাষা ও নানা রাজ্য সমুত্থিত হইয়াছে, তখন এমন বিভিন্নভাষাসংবলিত, বিভিন্নরাজ্যবিশিষ্ট ভারতে কি প্রকারে সার্ব্বভৌম একতা স্থাপিত হইতে পারে? এই সকল নানাকারণে

প্রদেশে প্রদেশে ও জাতিতে জাতিতে একতার এমন অসদ্ভাব দেখা যাইতেছে।

এখন প্রত্যেক প্রদেশের অধিবাসিবর্গ কুলপরম্পরাগত জাতিভেদ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হওয়ায় উহাদের ভিতর একতাভাব ও জাতিবিদ্বেষ কতদূর ছিল, তাহার বিচার করা কর্ত্তব্য। এস্থলে পুরাকালীন পল্লীসমাজ, যাহার ভগ্নাবশেষ এখনও পাড়াগাঁয়ে দেখা যায়, উহার বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায়, জাতিভেদ কতদূর কুফল বা সুফল আনায়ন করিয়াছিল।

কৃষিপ্রধান ভারতের প্রত্যেক রাজ্যে অসংখ্য পল্লীসমাজ ছিল। এই সকল পল্লীগ্রামে অবশ্যকমত সকল জাতি বসবাস করিত। উহারা আজিকালের ন্যায় কেবল দলাদলি ও মামলাবাজী করিয়া দিন কাটাইত না, পরস্পর সৌহার্দ্দে ও মিত্রতায় আবদ্ধ হইয়া নিজ নিজ জাতীয় ব্যাবসায় চালাইয়া সুখস্বচ্ছন্দে দিনযাপন করিত। গ্রামে কোনরূপ বিবাদ বা হাঙ্গাম উপস্থিত হইলে, মণ্ডলমহাশয় পঞ্চায়তের সহিত পরামর্শ করিয়া সরাসার বিচার করিতেন ও মিটাইয়া দিতেন; আজকালের ন্যায় চাউল চীড়ে কোমরে বাঁধিয়া মহকুমায় দৌড়িতে হইত না, উকিল মোক্তার ও নেড়েপ্যায়দার পায়ে তেল দিতে হইত না এবং খরচ পত্র করিতে করিতে হায়রাণ হইতে হইত না।

পল্লীসমাজস্থ লোকেরা সাধারণ বিপদে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া সমবেত চেষ্টা দ্বারা উহার প্রতীকারের চেষ্টা পাইত। রাজধানীতে এক রাজবংশের পর অপর এক রাজবংশের উত্থান ও পতন হইয়াছে, এক বিজেতার পর অপর এক বিজেতা দেশ লুণ্ঠন করিয়া গিয়াছে, কিন্তু কস্মিন কালে পল্লীসমাজের সুখের ব্যাঘাত ঘটে নাই। উহারা জাতিভেদ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইলেও

পরস্পর একতায় ও সহানুভূতিশৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল। তবে তুমি কি প্রকারে বলিতে চাহ, একতাভবের প্রধান কারণ জাতিভেদপ্রথা?

সেইরূপ এ প্রথা ভারত পরাধীন হইবার প্রকৃত কারণ নহে। যে যে কারণে ইহা এতকাল পরাধীন, তাহা একে একে নির্দ্দেশ করিতেছি।

এই গ্রীষ্মপ্রধান ভারতের জলবায়ুর এমনি গুণ, যে পরাক্রান্ত জাতি এদেশে বহুকাল বসবাস করিবে, তদীয় বংশধরেরা দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইয়া পড়িবে। সুতরাং উহারা অন্য পরাক্রান্ত জাতি কর্ত্তৃক সহজে বিজিত হইয়া থাকে। অনৈতিহাসিক সময়ে আর্য্য-ক্ষত্রিয়জাতির অভ্যুত্থান, নানা অঞ্চলে নানা রাজ্যস্থাপন, পুনরায় উহাদের অধঃপতন, পশ্চিমোত্তর হইতে সিথিয়ান প্রভৃতি জাতির আগমন, রাজ্যস্থাপন, পুরাতন ক্ষত্রিয়জাতির বিমিশ্রণে নূতন ক্ষত্রিয়-জাতির সংগঠন বা রাজপুতবংশের উৎপত্তি, পুনরায় উহাদের অধঃপতন, পশ্চিমোত্তর হইতে বিভিন্ন মুসলমানজাতির আগমন ও সাম্রাজ্যস্থাপন, পুনরায় উক্ত সাম্রাজ্যের ধ্বংস সাধন প্রভৃতি ঐতিহাসিক ঘটনাবলি এবিষয়ে ভালরূপ সাক্ষ্য দিতেছে। এ কারণ পরাক্রান্ত ইংরাজজাতি এদেশে বসবাস করিতে চাহেন না।

মনে কর, কুলপরম্পরাগত জাতিভেদপ্রথা দ্বারা ক্ষত্রিয়জাতির অধঃপতন ঘটাতে ভারত মুসলমানকর্ত্তৃক সহজে বিজিত হইয়া পরাধীন হইয়াছিল। পরাক্রান্ত মুসলমানজাতির ভিতর কি কোন প্রকার জাতিভেদপ্রথা ছিল, যদ্দারা এ জাতিও ভারতে দুর্ব্বল হইয়া অধঃপতিত হইয়াছে? এই যে ইংরাজগণ, যাঁহারা জাতিভেদের সমস্ত দোষ আমাদের চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইতেছেন, তাঁহারাও কি কালে দুর্ব্বল হইয়া সাধের ভারতসাম্রাজ্য খোয়াইবেন না? যেদিন মহাকালের সুদর্শনচক্র পতিত হইবে, সেদিন তাঁহারাও কোথায় ভাসিয়া যাইবেন। অতএব যাহারা ভাবেন, এক জাতিভেদ

প্রথা হইতে ভারত এতকাল পরাধীন, তাঁহাদের সে সংস্কার যুক্তি-সঙ্গত নহে।

দেখ, জাতিভেদপ্রথা ক্ষত্রিয়জাতিকে রাজ্যরক্ষণে ও পালনে নিযুক্ত করিয়াছিল এবং অন্যান্য জাতিকে ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতে দেয় নাই। এখন যদি ক্ষত্রিয়জাতি সুখৈশ্বর্য্যে মত্ত হইয়া বিলাসসাগরে ভাসিতে ভাসিতে ভারতের নিবীর্য্যকারী জলবায়ুর দোষে কালক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়েন ও স্বাধীনতা হারাইয়া বসেন, অথবা পরস্পর গৃহবিবাদে লিপ্ত হওয়ায় অন্য পরাক্রান্ত জাতিকর্ত্তৃক সহজে বিজিত হন, তজ্জন্য কি জাতিভেদপ্রথা দায়ী? যে ক্ষত্রিয়জাতি এই প্রথার গুণে ভীমপরাক্রমশালী হইয়া দ্বিসহস্র বৎসর ব্যাপিয়া ভারতে স্বাধীনতা ভোগ করেন, পরে সে জাতি যদি দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ তাহা হারাইয়া বসেন, তজ্জন্য কি জাতিভেদপ্রথা দায়ী? অতএব যাঁহারা মনে করেন, এই কুপ্রথা হইতে ভারত এতকাল পরাধীন, তাঁহাদের সে সংস্কার আদৌ যুক্তিসঙ্গত নহে।

আরও দেখ, এদেশ অনন্তরত্নপ্রসবিত্রী হওয়াতে ইহার এত সৌভাগ্য ও এত দুর্ভাগ্য। যে স্বর্ণময়ী ভারতভূমি মস্তকে হিম-গিরির অভ্রভেদী শৃঙ্গগুলি ধারণ করিয়া ভারতমহাসাগরের জলীয় বাষ্পরাশিকে অন্য দেশে যাইতে না দিয়া নিজ সমতলক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে বর্ষণ করাতে চিরদিন সুজলা, সুফলা ও শস্যশ্যামলক্ষেত্রা, সে দেশ যেমন একদিকে ধনধান্যে ও সুখসমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ, তেমনি অপরদিকে ইহার প্রথিত ধনরাশি লুণ্ঠনের জন্য নানা পরাক্রান্ত জাতি গৃধ্রকুলের ন্যায় কোথা হইতে উড়িয়া আসিতেছে। বাণিজ্য, লুণ্ঠন, রাজ্যস্থাপন প্রভৃতি নানা উদ্দেশ্যসাধনের জন্য উহারা আসি-তেছে এবং আমাদের ভারতমাতাও উহাদের অত্যাচরে ক্রমশঃ কাঙ্গালের মা হইতেছেন।

যে ভারতে জাতিভেদপ্রথা পুরাকাল হইতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়

একদিকে যেমন ইহার জ্ঞান, ধর্ম্ম, শিল্প প্রভৃতির অলৌকিক উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তেমনি অপরদিকে জীবনসংগ্রাম চিরদিন অনায়াসাধ্য হওয়ায় জনসাধারণ সহজে আয়াসপ্রিয়, সন্তোষপ্রিয় ও বিলাসপ্রিয় হইয়াছে। ইহাতে উহারা কালক্রমে দুর্ব্বল হইয়া স্বাধীনতা হারাইয়া বসিয়াছে। অতএব এই প্রথা ইহার সম্পত্তি ও বিপত্তির মূলকারণ। সংসারের নিয়ম এই, যাহা উৎকৃষ্ট, তাহাই আবার অপকৃষ্ট, যাহা অমৃতোপম, তাহাই আবার বিষতুল্য। যে জাতিভেদপ্রথা আমাদের জাতীয় উন্নতির মূল কারণ, তাহাই আবার জাতীয় অবনতি আনয়ন করিয়াছে। ভারত পরাধীন হইবার ঐ দোষ টুকু ঐ প্রথার স্কন্ধে অর্পণ করা উচিত।

যদি ভারত পুরাকাল হইতে ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত না হইয়া চীন প্রভৃতি দেশের ন্যায় এক সম্রাটের অধীনে এক বিশাল হিন্দু-সাম্রাজ্য গঠন করিত, আজ আমাদিগকে পরাধীনতারূপ লৌহ-শৃঙ্খল পরিধান করিতে হইত না। এক প্রকৃতি-চিহ্নিত দেশ নানা রাজ্যে বিভক্ত হইলে রাজন্যবর্গ অল্পকারণে ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইয়া থাকেন। ইহাতে তাঁহারা অন্য পরাক্রান্ত জাতিদ্বারা অনায়াসে বিজিত হন। ইতিহাস চিরদিন সাক্ষ্য দিবে, কনৌজাধিপতি জয়চন্দ্র ও দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ সামান্য কারণে পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইয়াই ভারতকে যবনমুখে প্রক্ষেপ করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে, জাতিভেদ প্রথা থাকাতে হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুজাতি জগতে অমর এবং আমরাও অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অধিক ধর্ম্মপরায়ণ এবং অঞ্চলে অঞ্চলে নানা রাজ্যের উত্থান ও পতনবশতঃ এদেশ বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে অসমর্থ হওয়ায় এতকাল পরাধীন ও পরের পদানত। আসল কথা, ব্রাহ্মণ জাতির গুণে আমরা জাতি-

ধর্ম্ম রক্ষা করিতে সমর্থ, আর ক্ষত্রিয় জাতির দোষে আমরা পরাধীন এবং আধিভৌতিক উন্নতিপথে পশ্চাৎপদ। অতএব যাঁহারা ভাবেন, এক জাতিভেদ হইতে ভারত এতকাল পরাধীন, তাঁহাদের সে সংস্কার যুক্তিসঙ্গত নহে।

যে সৈনিক ভূম্যধিকারপ্রথা (Feudal System) মধ্যযুগে ইউরোপের মহানর্থকারী হওয়ায় কালে লুপ্ত হইয়া যায়, সেই কুপ্রথাই ভারতের যাবতীয় অমঙ্গলের মূলীভূত কারণ। কুক্ষণে হিন্দুরাজন্যবর্গ অধীনস্থ যোদ্ধৃবর্গকে বা সামন্তবর্গকে জায়গীর প্রদান করিতেন এবং তদ্রক্ষণে সৈন্য রাখিতে আদেশ দিতেন। অধীশ্বর দুর্ব্বল হইলে তাঁহারা নিজ নিজ উচ্চাভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিতেন। এই প্রকারে ভারত পুরাকাল হইতে নানা রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে। নানারাজ্য স্থাপনের সঙ্গে দেশে দেশে নানা প্রকার ভাষা উত্থিত হয়। এ কারণ ভারতের প্রদেশে প্রদেশে একতার এত অসদ্ভাব দেখা যাইতেছে।

এখন ভাবিয়া দেখ, ব্রাহ্মণজাতি কিরূপ বুদ্ধিমান। তাঁহারা সমগ্র ভারতে এক সংস্কৃত দেবভাষায় জ্ঞান ও ধর্ম্মের চর্চ্চা করিয়া ধর্ম্মরাজ্য চিরদিন শাসন করিয়া আসিতেছেন, এজন্য তাহারা এখনও হিন্দুসমাজের অধিনায়ক; আর ক্ষত্রিয়জাতির নির্বুদ্ধিতাবশতঃ দেশে দেশে নানা প্রাকৃত ভাষার উত্থান হওয়াতে তাঁহারা রাজশক্তি হারাইয়া কালস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছেন। যদি তাঁহারা সমগ্র ভারতে এক প্রাকৃত ভাষা স্থাপন করিতেন, এক বিশাল হিন্দুসাম্রাজ্য ভারতে স্থাপিত হইত এবং আজ আমাদিগকে পরাধীনতাশৃঙ্খল পরিধান করিতে হইত না।

পুরাকালে কত রাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তিত্ব প্রাপ্ত হন; কিন্তু কেহই সমগ্র ভারতে এক বিশাল হিন্দুসাম্রাজ্য স্থাপন করিতে সমর্থ হন নাই। বৌদ্ধযুগে মগধের মৌর্য্যবংশ বহুবিস্তৃত সাম্রাজ্য ভোগ করেন এবং

সর্ব্বত্র এক প্রাকৃত পালিভাষা স্থাপনে সচেষ্ট হন। কিন্তু পৌরাণিক যুগে ভারতের ঘোর অনিষ্টোৎপত্তি হইয়া গিয়াছে। তৎকালে সমাজ যেমন বৃত্তি অনুসারে নানাজাতি ও নানাশাখাজাতিতে বিভক্ত হয়, তেমনি ইহার নানাপ্রদেশে নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপিত হওয়ায় অঞ্চলে অঞ্চলে নানা প্রাকৃত ভাষার উত্থান ঘটে। এইপ্রকারে কুপরামর্শদাতা ব্রাহ্মণগণ ও নির্ব্বোধ ক্ষত্রিয়গণ ভারতের মাথাটী বহুকালের জন্য খাইয়া যান। এই মহৎ ভ্রমকালে সংশোধিত হইবে কিনা, তাহাই সন্দেহের বিষয়। কে বলিতে পারে, সমগ্র ভারতে কালে এক শাসনতন্ত্র, এক ভাষা ও এক ধর্ম্ম স্থাপিত হইবে কিনা?

মুসলমানযুগে পাঠান ও মোগল বাদসাহগণ পারসী ও হিন্দির বিমিশ্রণে উর্দ্দু ভাষা সর্ব্বত্র স্থাপন করিতে চেষ্টা পান। কিন্তু তাঁহারাও এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হন নাই। আজকাল ইংরাজরাজ স্বদেশের শিক্ষাপ্রণালী বহুবিস্তৃত করিয়া এদেশের নানাজাতিকে কথঞ্চিৎ সহানুভূতিশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতেছেন বটে, কিন্তু প্রত্যেক প্রদেশের প্রাকৃতিক ভাষার উন্নতিসাধনে সচেষ্ট হইয়া প্রত্যেক জাতিকে যতদূরসম্ভব পৃথক রাখিয়া দিতেছেন। ইহাতে ভারতের ভবিষ্যৎ মঙ্গল হউক বা না হউক, তাঁহাদের সাধের ভারতসাম্রাজ্য আরও সুদৃঢ় হইতেছে।

এখন ভালরূপ অনুধাবন করিলে বুঝা যায়, জাতিভেদপ্রথা ভারত পরাধীন হইবার প্রধান কারণ নহে। যে যে কারণে ইহা এতকাল পরাধীন, তাহা একে একে নির্দ্দেশ করিতেছি—

(১) ভারত চিরদিন ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত হওয়ায় রাজন্য-বর্গের ভিতর পরস্পর ঈর্ষ্যা, দ্বেষ ও যুদ্ধবিগ্রহ। তাহার সাক্ষ্য মহা-ভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ।

(২) ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃত ভাষার

উত্থান হওয়াতে এক প্রদেশের লোকেদের সহিত অপর প্রদেশের লোকের সহানুভূতি ও একতার অসদ্ভাব।

(৩) গ্রীষ্মপ্রধান দেশের জলবায়ু স্বতঃ নিবীর্য্যকারী হওয়াতে জাতীয় অপগমন ও অবনতি—

(৪) সৈনিক ভূম্যধিকারপ্রথা, যদ্দ্বারা যোদ্ধৃবর্গ বড় বড় জায়গীর পাইয়া রাজ্য বিস্তার করিতেন বা স্বাধীন হইতেন।

(৫) জাতিভেদের গুণে জীবনযাত্রা সুগম হওয়ায় সাধারণ লোকের আয়াসপ্রিয়তা ও ভোগবিলাসিতা।

জাতিভেদের বর্ত্তমান অবস্থা।

যে জাতিভেদপ্রথা বহুকাল হিন্দুসমাজে প্রচলিত রহিয়াছে, যাহা স্বাধীন ভারতে বৃত্তি অনুসারে সর্ব্বত্র পূর্ণভাবে সুরক্ষিত হইত, তাহা পরাধীন ভারতে সবিশেষ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। যে ব্রাহ্মণ পূর্ব্বে একমাত্র জ্ঞান ও ধর্ম্মের অনুশীলন করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন, তিনিও অনেকস্থলে রাজার পৃষ্ঠপোষণের অভাবে জাতীয় ব্যবসায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সৈনিকবৃত্তি, মসীবৃত্তি, বণিকবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ক্ষত্রিয়জাতি অনেক স্থলে পৈতৃক ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া বণিকবৃত্তি বা কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন।

যাহারা পৈতৃক ব্যবসায় চালাইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে না, তাহারা কৃষিপ্রধান ভারতে প্রায় কৃষিকার্য্য অবলম্বন করে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় জাতি কৃষিকার্য্য করান বটে, কিন্তু কস্মিনকালে তাঁহারা স্বহস্তে হলচালনা করেন নাই। তাঁহারাই এ কার্য্যকে অতীব হেয় ও ঘৃণাস্পদ করিয়া রাখিয়াছেন। অন্য কোন দেশের লোকেরা কৃষিকার্য্যকে আদৌ ঘৃণা করে না। ইউরোপে যিনি কৃষক (farmer), তিনি সমাজে বিশেষ গণ্য ও মান্য। আর এদেশে একজন কৃষককে চাষাবেটা বলিয়া সকলে ঘৃণা করে। যাহারা সাধারণের প্রাণধারণোপযোগী প্রধান খাদ্য উৎপাদন করে, তাহারা

কি ঘৃণার পাত্র? যাঁহারা ঘরে বসিয়া ব্যোম ব্যোম করেন, তাঁহারা হইলেন স্বর্গের দেবতা; আর যাহারা রৌদ্রে পুড়িয়া, বৃষ্টিতে ভিজিয়া সারাদিন খাটিয়া ধান্য গোধূম উৎপাদন করে ও দেশশুদ্ধ সকলকে খাওয়ায়, তাহারা হইল নরকের কীট। সমাজের কি বিচার? এ সমাজ অধঃপাতে যাইবে না ত, আর কোন্ সমাজ যাইবে? ঈশ্বরের অভিসম্পাত সে সমাজের উপর স্বতঃপতিত হইতেছে।

মুসলমানযুগে হিন্দুসমাজে নানা জাতির ভিতর বৃত্তিবিপর্য্যায় ঘটিলেও জাতিভেদপ্রথা অক্ষুণ্ন ছিল। খাদ্যাখাদ্যের বিচার পূর্ণমাত্রায় প্রবল ছিল। সমাজশাসনও ভালরূপ থাকায় ব্রাহ্মণগণ জিত হিন্দুজাতিকে জেতা মুসলমানজাতি হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক রাখিতে সক্ষম হন। তৎকালে পারসীনবীশ ও উর্দ্দুনবীশদিগের আদর অধিক ছিল বলিয়া নগরবাসী শ্রেষ্ঠজাতিদিগের মধ্যে অনেকে পারসী ও উর্দ্দু শিক্ষা করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেন। তৎকালে ক্ষত্রিয়বৃত্তি বা সৈনিকবৃত্তি সমাজে অধিক সমাদৃত হইয়াছিল। এজন্য অধিকাংশ জাতির বলিষ্ঠ পুরুষগণ শৌর্য্যবীর্য্যের অনুশীলন করিয়া আপনাদের সামাজিক প্রতিপত্তি বর্দ্ধন করিয়াছিল। ইহার গুণে হিন্দুনরপতিগণ, বিশেষতঃ রাজপুত ও মহারাষ্ট্রজাতি মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংস সাধন করিতে সক্ষম হন।

ইংরাজদিগের আমলে কোম্পানিবাহাদুরের রাজত্বকালে যতদিন পাশ্চাত্যশিক্ষা সাধারণ ভাবে প্রচলিত হয় নাই, ততদিন জাতিভেদের শাসনও খাদ্যাখাদ্যের বিচার পূর্ণভাবে বজায় ছিল। কিন্তু যেদিন হইতে ইংরাজরাজ স্বহস্তে ভারতশাসনভার গ্রহণ করেন, তদবধি প্রজাবর্গের মঙ্গলার্থ তাঁহারা পাশ্চাত্যশিক্ষা জাতিনির্ব্বিশেষে বিস্তীর্ণ করিয়াছেন ও সকলকে বিদ্যা ও অর্থ উপার্জ্জন করিবার সমান অবসর দিতেছেন। তাঁহাদের উদার নীতির অন্তরালে থাকিয়া

আজকাল প্রায় সর্ব্বত্র অধিকাংশ লোক পৈতৃক ব্যবসায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাশ্চাত্য বিদ্যা শিক্ষা করিয়া বা অন্য কোন অর্থকরী বৃত্তি অবলম্বন করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেছে; এমন কি অনেক নিকৃষ্ট বংশোদ্ভব ব্যক্তি জাতীয় ব্যবসায় পরিত্যাগ করত ইংরাজি বিদ্যাবলে বা বাণিজ্যবলে অর্থোপার্জ্জন করিয়া আপনাদিগকে ভদ্রশ্রেণিভুক্ত করিতেছে ও উচ্চজাতির সমকক্ষ হইতেছে। পল্লীগ্রামে যেরূপ হউক না, বড় বড় নগরীতে আভিজাত্যের তাদৃশ সম্মান নাই, ইহার পরিবর্ত্তে অর্থ ও বিদ্যাই এখন সকলের মানসম্ভ্রমের আকর।

আজকাল যিনি যে জাতির অন্তর্ভুক্ত হউন না, সকলেই একমাত্র অর্থ ও বিদ্যা উপার্জ্জন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর। এতদ্ব্যতীত কেহই স্বসমাজে ও স্বজাতির ভিতর মাননীয় হইতে পারেন না। রাজা যাঁহার খাতির করিবেন, প্রজারাও তাঁহার খাতির করিতে বাধ্য। যে ধনবান ও বিদ্বান ইংরাজরাজের নিকট যেমন পূজ্য, তাঁহারা সর্ব্বত্র সাধারণের নিকটও তেমনি পূজিত হইতেছেন। এখন জীবনসংগ্রাম ক্রমশঃ আয়াসসাধ্য হওয়াতে এক অর্থ ব্যতীত কাহারও সংসার চলেনা। সেজন্য যে যেদিকে পারে, সে সেইদিকে কেবল অর্থোপার্জ্জনের ফিকির খুঁজিতেছে।

আজকাল ইংরাজবাহাদুর সকল বিভাগে কর্ম্মচারিবর্গকে উচ্চহারে বেতন দিতেছেন। এই প্রলোভন পাইয়া অনেকে সরকারী চাকরী পাইবার জন্য একান্ত উদ্গ্রীব। শুনিতে পাই, পূর্ব্বে রাজসেবায় কৃষিকর্ম্মের অর্দ্ধ ফল পাওয়া যাইত। এখন রাজসেবায় যাহা লব্ধ হয়, কৃষিকার্য্যে তাহার অর্দ্ধাংশ পাওয়া যায় না। এখন সরকারী চাকরী ব্যতীত ব্যারিষ্টারি, ওকালতি, মোক্তারি, ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারি, ওভাসিয়ারি, কণ্ট্রাক্টারি, স্কুলমাষ্টারি, কেরাণিগিরি, দোকানদারি প্রভৃতি নানা ভদ্রোচিত অর্থকরী বৃত্তি সমাজে দেখা দিয়াছে। জাতিনির্ব্বিশেষে সকলে নিজ নিজ অভিরুচি ও শিক্ষা অনুসারে

ঐ সকল বৃত্তি অবলম্বন করিয়া অর্থোপার্জ্জন করত সুখস্বচ্ছন্দে দিন যাপন করিতেছেন। এইপ্রকারে শিক্ষিত সম্প্রদায় নানা উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিবার জন্য প্রাণপণ করিতেছেন। এখন ইহাই আমাদের জাতিধর্ম্ম ও কালোচিত ধর্ম্ম।

রাজা প্রজাবর্গকে যেদিকে চালাইবেন, উহারা সেইদিকে ধাবিত হইবে। তাহার সাক্ষ্য দেখ, যখন হিন্দুরাজন্যবর্গ জ্ঞানধর্ম্মানুশীলনের জন্য ব্রাহ্মণদিগের জীবিকা অনায়াসসাধ্য করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা শাস্ত্রাধ্যয়নে অধিক মনোযোগী হইতেন। আর যখন তাঁহারা দেখিলেন, পৈতৃক ব্যবসায়ে দারিদ্র্য ব্যতীত আর কিছুই নাই, তখন তাঁহারাও পাশ্চাত্য বিদ্যা শিক্ষা করিয়া অর্থোপার্জ্জন করত আপনাদের গৃহ সচ্ছল করিতেছেন। কালোচিত ধর্ম্মপালন ব্যতীত কেহই সর্ব্বজনীন জীবনসংগ্রামে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারেন না।

যাহাহউক, ইংরাজপ্রতিষ্ঠিত বৃত্তিগুলির সমক্ষে জাতিভেদপ্রতিষ্ঠিত পুরাতন বৃত্তিগুলি ক্রমশঃ বিপর্যাস্ত ও লুপ্ত হইতেছে। এই বৃত্তিবিপর্যায়ে শ্রেষ্ঠজাতিবর্গের যেরূপ ক্ষতি, নীচ জাতিদের তেমনি লাভ। ইহাতে এক দলের ভাল, অপর দলের মন্দ ঘটিবে। ইহাতে জাতিভেদপ্রতিষ্ঠিত সর্ব্বজনীন সন্তোষ অন্তর্হিত হইবে বটে, কিন্তু উদ্যমশীলতা ও স্বাবলম্বন বৃদ্ধি পাইয়া সমাজকে উন্নতিরপথে, সভ্যতার পথে ক্রমশঃ অগ্রসর করাইবে।

আজকাল ইংরাজি স্কুলকলেজে সকল জাতির বালকগণ একত্র একসঙ্গে বসিয়া পড়াশুনা ও খেলাদেলা করিতেছে। ইহাতে উহাদের জাতিবিদ্বেষ বাল্যকাল হইতে ক্রমশঃ মন্দীভূত হইতেছে। ইহাতে জাতিভেদের কঠোরতা শিথিল হইতেছে এবং জাতীয় একতাস্থাপনের সূত্রপাত হইতেছে। জাতিতে জাতিতে ঘৃণা ও বিদ্বেষ আবার কি? এ সকল যত হ্রাস পাইবে, ততই ভারতের

মঙ্গল। ব্রাহ্মণগণ শূদ্রদিগকে ঘৃণা করেন ও একত্র বসিতে দেন না, এক পংক্তিতে খাওয়া ত বহুদূরের কথা। এসকল আচার ব্যবহার যত লোপ পাইবে, ততই ভারতের মঙ্গল। এইপ্রকারে যদি ইংরাজরাজ এ দেশের চিরাগত জাতিবিদ্বেষ দূরীভূত করিয়া সকল জাতির ভিতর একতা স্থাপন করিতে পারেন, ভারতমাতা তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে।

ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, পৈতৃক বৃত্তি অনুসারে যেমন কুল-পরম্পরাগত জাতিভেদপ্রথা হিন্দুসমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তেমনি বিবাহবিষয়ক নিয়মাবলি ও কড়াক্রান্তি বিচার এবং খাদ্যাখাদ্যের বিচার এ প্রথাকে চিরদিন সুরক্ষিত করিতেছে। ইংরাজরাজের উদার রাজনীতি অনুসরণ করাতে পৈতৃক ব্যবসায় কিয়ৎপরিমাণে উঠিয়া যাইতেছে, কিন্তু এখনও বিবাহবিষয়ক নিয়মাবলি বিধিবৎ সর্ব্বত্র প্রতিপালিত হইতেছে। ইহাতেই এ প্রথা এখনও সমাজে অক্ষুন্ন রহিয়াছে।

বিবাহবিষয়ে কড়াক্রান্তি বিচার এ প্রথার মূলভিত্তি। এ মূলভিত্তির একখানি ইষ্টকও নষ্ট হইয়া যায় নাই। এবিষয়ে পূর্ব্বাপর যে অঞ্চলে যেরূপ নিয়মাবলি ও আচার ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে, তাহাই সে অঞ্চলে যথাবিধি পালিত হইতেছে। পৈতৃক বৃত্তি লোপ পাইবে, খাদ্যাখাদ্যের বিচার উঠিয়া যাইবে, তাহাতে এ প্রথার অল্পই ক্ষতি। কিন্তু যেদিন বিবাহবিষয়ক নিয়মাবলি উল্লঙ্ঘিত হইয়া অসবর্ণ বিবাহাদি সমাজে ধীরে ধীরে প্রবেশ লাভ করিতেছে দেখিবে, সেইদিন জানিবে জাতিভেদরূপ সুমহৎ হর্ম্ম্য ধূলিসাৎ হইতে চলিল। এবিষয়ে সমাজশাসন এখনও পূর্ণমাত্রায় চলিতেছে। পাশ্চাত্য শিক্ষা এখনও এ সমাজশাসনকে শিথিল করিতে পারে নাই। ভবিষ্যতে কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা দেখিতে পাইবেন।

জাতিভেদের ভবিষ্যৎ।

যে জাতিভেদপ্রথা ত্রিংশ শতাব্দী ব্যাপিয়া ভারতে প্রচলিত, সে প্রথা কি কালে রহিত হইবে, না যেভাবে আছে, সেইভাবে চিরদিন চলিতে থাকিবে? শাস্ত্রের আদেশ, কলিকালে এ প্রথা সমাজে রহিত হইবে ও সবই একাকার হইয়া যাইবে। শাস্ত্রের কোন্ কথা মিথ্যা হইয়া থাকে? তবে এ ভবিষ্যৎবাণী সুদূর ভবিষ্যতে সত্য ঘটনায় পরিণত হইবে। যে পাশ্চাত্য কালস্রোত সমাজে খরবেগে বহমান, ইহাতে উহার সূত্রপাত দেখা যাইতেছে। যে সমাজশাসনের গুণে হিন্দুজাতি ও হিন্দুধর্ম্ম স্বশত্রুবর্গকে পরাস্ত করিয়া নিজের অস্তিত্ব এতকাল বজায় রাখিতে সক্ষম, সে শাসন পাশ্চাত্য শিক্ষার দোষে ক্রমশঃ শিথিল হইতেছে; তবে কিপ্রকারে আশা করা যায়, এ প্রথা চিরদিন এইভাবে থাকিবে?

শাস্ত্রের আদেশঃ —

"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।"

"সংসারে ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই নাই। দেশের বড় বড় লোকেরা যে পথে যাইবেন, সেই পথে সকলের যাওয়া উচিত।" যখন দেশের বড় বড় লোকেরা এ প্রথার উপর মনে মনে নারাজ, তখন কি প্রকারে আশা করা যায়, এ প্রথা চিরদিন এইভাবে থাকিবে। যখন সমাজের অধিনায়ক ব্রাহ্মণজাতির ক্ষমতা ক্রমশঃ লুপ্ত হইতেছে, তখন কি প্রকারে আশা করা যায়, এ প্রথা চিরদিন এইভাবে থাকিবে। যখন কালগতিকে জাতীয় বৃত্তি ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে ও খাদ্যাখাদ্যের বিচার ধীরে ধীরে উঠিয়া যাইতে আরম্ভ হইয়াছে, তখন কি প্রকারে আশা করা যায়, এ প্রথা চিরদিন এইভাবে থাকিবে। এখন বিবাহবিষয়ক নিয়মাবলি বিধিবৎ পূর্ণমাত্রায় রক্ষিত

হইতেছে। যদি দেশের বড় বড় লোকেরা কালক্রমে ঐ সকল নিয়ম উল্লঙ্ঘন্ করিতে আরম্ভ করেন, তখন ত এ প্রথা লুপ্ত হইয়া যাইবে। কালে কিরূপ দাড়ায়, তাহা এখন ভবিষ্যৎগর্ভে নিহিত।

এখনও এ প্রথার অনুশাসন সকলের উপর সমভাবে চলিতেছে। দেখ, মাদ্রাজ অঞ্চলে যে ব্রাহ্মণ খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন, তিনিও আপনার ন্যায় খৃষ্টানব্রাহ্মণের পুত্রকন্যার সহিত নিজের পুত্রকন্যার বিবাহ দিতে স্বতঃ ইচ্ছুক হন। কায়স্থ ব্রাহ্ম কায়স্থব্রাহ্মের সহিত উদ্বাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইতে ইচ্ছা করেন। ইহাতেই বুঝা উচিত যে, জাতি-ভেদের অনুশাসন সমাজ হইতে শীঘ্র উঠিয়া যাইবে না। বস্তুতঃ যে প্রথা তিন হাজার বৎসর চলিয়া আসিতেছে, সে প্রথা কি দুই তিন শতাব্দীতে রহিত হইতে পারে? বাল্যকালের সংস্কার কি লোকে সহজে ত্যাগ করিতে পারে? ইহাতে সিদ্ধান্ত করা উচিত, এ প্রথা সমাজ হইতে সহজে উঠিয়া যাইবে না।

দেশের জনসাধারণ এ প্রথাকে সুপ্রথা বলিয়া জানে এবং ব্রহ্মার সৃষ্টি বলিয়া ইহা যে কোনকালে রহিত হইবে, তাহা তাহারা একবার স্বপ্নেও ভাবে না। সংসারে কে এমন নির্ব্বোধ, উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করাতে প্রকৃতিদত্ত যে সকল স্বত্বে সত্ত্ববান, তাহা তিনি একদিনে অনায়াসে ত্যাগ করিয়া বসিবেন? বিকৃত মস্তিষ্কের খেয়ালবশতঃ এক ব্যক্তি উপবীত ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু জ্ঞান-বান হইয়া কে তাহা ত্যাগ করিবে? নীচজাতিদের মধ্যে যাঁহারা উচ্চ শিক্ষা পাইতেছেন, তাঁহারা স্বতঃ ভাবেন, এ কুপ্রথা কালে রহিত হইয়া যাউক; কিন্তু উচ্চ জাতিদের মধ্যে কেহই এমন ইচ্ছা করেন না, এ সুপ্রথা কালে রহিত হইয়া যাউক।

আজকাল সুশিক্ষিত সম্প্রদায় এ প্রথা সম্বন্ধে নানারূপ জল্পনা ও কল্পনা করিতেছেন। যাঁহারা চরমপন্থী, তাঁহারা ভাবেন, এই অশেষ দোষাকর কুপ্রথা সমাজে অচিরে রহিত হইয়া যাউক।

তৎপরিবর্ত্তে ভারতের হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান যাবতীয় অধিবাসি-বর্গ জাতিবিদ্বেষ ও ধর্ম্মবিদ্বেষ ত্যাগ করিয়া নূতন জাতীয় জীবন গঠন করিতে করিতে এক জাতিভুক্ত হউক, ইংরাজরাজের অনুগ্রহে ভালরূপ পাশ্চাত্য শিক্ষা পাইয়া একতাবদ্ধ ও সুসভ্য হউক, জগতের মধ্যে গণ্য ও মান্য হউক, এবং দেশদেশান্তরে আপনাদের কীর্ত্তিধ্বজা রোপিত করুক। তাঁহাদের এ অভিলাষ কত মহোচ্চ, কত উদার! হা হতবিধে! কেন তুমি তাঁহাদের এ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতেছ না? একদিনে বেয়নেট বলে বা কলমের এক আঁচড়ে এ মহৎ কার্য্যটী কি সিদ্ধ হইতে পারে না?

দেখ ইংরাজরাজ একদিনে সতীদাহ উঠাইয়া দিয়াছেন। মনে করিলে একদিনে তাঁহারা এ প্রথা উঠাইয়া দিতে পারেন। আমরা ত ডানাকাটা পাখীবিশেষ। আমরা তাঁহাদের কি করিতে পারি? কিন্তু উদার রাজনীতিজ্ঞ ইংরাজ অতীত ঘটনা দেখিয়া এ বিষয়ে কদাচ হস্তক্ষেপ করিবেন না।

ওহে চরমপন্থিগণ! তোমাদের এ কিরূপ বিবেচনা! ইংরাজ-দিগের আমলে, এই পরাধীন অবস্থায় যদি হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান প্রভৃতি জাতিগুলি এক জাতি গঠন করে, সে জাতি কি জগতে হিন্দু বলিয়া পরিচিত হইবে? সে জাতি কি আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের জাতীয় গৌরব ও কীর্ত্তিকলাপ সমস্তই বজায় রাখিবে? সে জাতি কি জেতৃজাতির ধর্ম্ম ও রীতিনীতি অবলম্বন করিয়া দোয়াসঁলা ফিরিঙ্গি জাতিতে পরিণত হইবে না? তাঁহার সাক্ষ্য দেখ, মুসলমান যুগে ভারতের ষষ্ঠাংশ লোক মুসলমান হইয়া গিয়াছে। এখন উহারা আমাদের হইতে কত পৃথক! উহাদের ম্লেচ্ছ ব্যবহার দেখিয়া আমা-দের কত ঘৃণাবোধ হইতেছে! জগতের নিয়ম এই, জেতৃজাতির সহিত জিতজাতি মিশ্রিত হইলে শেষোক্ত জাতি নিজের জাতিধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিবে। পঞ্চশতাব্দী ব্যাপিয়া ব্রাহ্মণগণ আকাশপাতাল আলোড়ন

করিয়া আমাদের জাতিধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছেন। এখন কিনা তোমরা নিজের বুদ্ধির দোষে সেই জাতিধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতে বসিবে ?

আর যদি ভাগ্যবলে হিন্দুজাতি কালে স্বাধীনতা লাভ করিয়া রাজশক্তি প্রাপ্ত হয়, সে সময়ে স্বচ্ছন্দে জাতিভেদপ্রথা উঠাইয়া দেও এবং ভারতের হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান লইয়া এক জাতি গঠন কর, তাহাতে হিন্দুজাতিরই অশেষ মঙ্গল। তাহাতে অনেক ঘরের ছেলে ঘরে আসিবে। যতদিন ভারত পরাধীন থাকিবে, ততদিন জাতিভেদ পুর্ণমাত্রায় বজায় রখিয়া নিজের জাতিধর্ম্ম রক্ষা করিতে হইবে। ইহাই এখন আমাদেব প্রধান জাতীয় শ্রেয়।

চরমপন্থীদের ভিতর কেহ কেহ বলেন, জাতিভেদ প্রথা রহিত হইলে, বিভিন্ন প্রদেশের হিন্দুজাতিগণ পরস্পর পরস্পরের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া কালে এক হিন্দুজাতি গঠন করিবে এবং রাজার অনুগ্রহে এক ভাষা অনুশীলন করিয়া সার্ব্বভৌম একতায় আবদ্ধ হইবে। ইহাতেই এ জাতি কালক্রমে স্বাধীনতা পাইয়া ভারতে এক বিশাল রাজ্য স্থাপন করিবে। এই জাতীয় একতা স্থাপনের জন্য ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সুশিক্ষিত গণ্যমান্য লোকেরা জাতীয় সমিতিতে একত্রিত হইয়া রাজনৈতিক আন্দোলন করিতেছেন ও আপনাদের অভাব ও অনাটন রাজপুরুষ-দিগকে জানাইতেছেন।

অনেকে বলেন, যাবতীয় হিন্দুজাতি জাতিবিদ্বেষ ত্যাগ করিয়া পরস্পর বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইলে জাতীয় একতা স্থাপিত হইবে। যে বাঙ্গালীজাতি স্বভাবতঃ দুর্ব্বল, সে জাতি যদি শিখজাতির সহিত উদ্বাহসূত্রে আবদ্ধ হয়, তদুৎপন্ন বংশধরেরা আধুনিক বাঙ্গালী অপেক্ষা পরাক্রান্ত জাতি হইবে। যাহা হউক, তাঁহাদের আশা যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায়ানুগত বটে ; কিন্তু চিরাগত বিবাহবিষয়ক নিয়মা-

বলি উঠাইয়া এবং প্রত্যেক প্রদেশের প্রাকৃত ভাষা মিটাইয়া এক হিন্দুজাতি গঠন করা এখন অসম্ভব বোধ হইতেছে।

আবার অনেকে বলেন, জাতিভেদপ্রথা সহজে ভারত হইতে উঠিয়া যাইবে না; কিন্তু বিবাহবিষয়ক নিয়মাবলি দেশভেদে কিঞ্চিৎ শিথিল করা উচিত। যদি এক প্রদেশের এক জাতি অন্য প্রদেশের সেই জাতির সহিত মিশ্রিত হয়, ইহাতে জাতীয় একতা কালে স্থাপিত হইবে। যদি দক্ষিণরাঢ়ীশ্রেণীস্থ কায়স্থগণ বঙ্গজ কায়স্থ ও পশ্চিমাঞ্চলের লালাজাতির সহিত মিশ্রিত হয়, যদি বঙ্গের গোপজাতি পশ্চিমাঞ্চলের আহীর জাতির সহিত মিশ্রিত হয়, ইহাতে ভারতের অনেক মঙ্গল হইবে। তদুৎপন্ন বংশধরেরা বলিষ্ঠ হইবে। এখন দেখাযাউক, কালে সকল জাতির ভিতর কিরূপ দাড়ায়।

জাতিভেদসম্বন্ধে শেষ মন্তব্য।

ইতিপূর্ব্বে নানাস্থলে দেখাইয়ছি, জাতিভেদপ্রথাটী দোষগুণে মিশ্রিত। কিন্তু ইহার দোষের ভাগ অপেক্ষা গুণেরই ভাগ অধিক। যখন পুরাকালে হিন্দুসমাজ এই সুপ্রথা দ্বারা সভ্যতাজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়াছে, যখন এই সুপ্রথা দ্বারা হিন্দুজাতি বৌদ্ধ ও মুসলমান যুগে নিজের জাতিধর্ম্ম রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে, তখন এই পরাধীন অবস্থায় ইহার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হওয়া কি উচিত?

প্রকৃতির ত্রিগুণের ক্রিয়াবশতঃ প্রত্যেক পার্থিব পদার্থ ভালমন্দে মিশ্রিত। সংসারে যে বস্তু যত উৎকৃষ্ট, সে বস্তু আবার তত অপকৃষ্ট। যে সুরা অমৃতপ্রায় শরীরে সঞ্জীবনীশক্তি প্রদান করাতে অমৃতোপম, সেই সুরা অন্যস্থলে অনর্থকর প্রাণনাশক মহাবিষ। সেইরূপ যে জাতিভেদ সমাজস্থ যাবতীয় লোকের কৌলিক গুণাগুণের উৎকর্ষ সাধনে ও আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনে স্বতঃ সাহায্য করে, যে প্রথার

দ্বারা সমাজের শিল্প, জ্ঞান ও ধর্ম্ম সহজে ক্রমোন্নতি লাভ করে, যে প্রথা দ্বারা সমাজ ভালরূপ শাসিত হওয়ায় হিন্দুজাতি ও হিন্দুধর্ম্ম জগতে অমর, সে প্রথা যেমন একদিকে অমৃততুল্য, তেমনি অপরদিকে জীবনসংগ্রাম অনায়াসসাধ্য করিয়া সমাজে সর্ব্বজনীন সন্তোষ বিস্তীর্ণ করাতে ও একতাভাব আনয়ন করাতে আধিভৌতিক উন্নতিসাধনে ব্যাঘাত প্রদান করে, তজ্জন্য ইহা বিষতুল্য।

যাহাহউক, যে প্রথা হিন্দুসমাজের মূলভিত্তি, যাহা ইহার অস্থি-মজ্জায় নিহিত, যাহা সামাজিক নির্ব্বাচনে উত্থিত, প্রতিষ্ঠিত ও এত-কাল স্থায়ী, যাহা হারাইলে আমরা জাতিধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিব, এই পরাধীন অবস্থায় সেই প্রথার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হওয়া কি উচিত? আমরা কি ভারতমাতার এমন কুপোষ্য কুসন্তান, যে সমুজ্জ্বল রত্ন আমাদের প্রপিতামহগণ মস্তকে ধারণ করিয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন ও আপনাদের জাতিধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছেন, সেই অমূল্য রত্নটী কি আমরা এখন পায়ে থাঁৎলাইয়া দূরে প্রক্ষেপ করিব? হা হতবিধে! তোমার মনে কি আছে, জানিনা! কেন আজ সুশিক্ষিত সম্প্রদায় এ প্রথার উপর ক্রমশঃ এত নারাজ হইতেছেন? তুমি কি হিন্দুজাতিকে রসাতলে প্রেরণ করিবার জন্যই তাঁহাদিগকে এমন কুমতি দিতেছ?

প্রকৃতির মহাকবি কালিদাস বলেন :—

অনন্তরত্নপ্রভবস্য যস্য হিমং
ন সৌভাগ্যবিলোপি জাতং
একোহি দোষো গুণসন্নিপাতে
নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেম্বিবাঙ্কঃ।

(কুমার সম্ভবং)

"যে হিমালয় অনন্ত রত্নের আকর, একমাত্র তুষার তাহার ঐশ্বর্য্য নষ্ট করিতে পারেনা। যেখানে নানাগুণের সমাবেশ, তথায় একটী মাত্র দোষ চন্দ্রে কলঙ্কের স্থায় ঢাকিয়া যায়।" সেইরূপ জাতিভেদ প্রথার অনেক গুণ, দোষের মধ্যে একতার অভাবই ইহার প্রধান দোষ। এত গুণের মধ্যে ইহার এ দোষ ঢাকিয়া যাইতেছে।

জনসাধারণ ইহার এ দোষ দেখিতে পায় না। কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায় যাঁহারা সমাজে সার্ব্বভৌম একতা স্থাপন করিয়া ভারত উদ্ধার করত ইহাকে পুনরায় সভ্যতার পথে অগ্রসর করাইতে চাহেন, তাঁহারা এই দোষের জন্য এ প্রথার উপর অতীব নারাজ। তাঁহারা বলেন এবং ইহা সর্ব্ববাদি সত্য, ভারতোদ্ধারের জন্য সর্ব্বাগ্রে জাতি-বিদ্বেষ ত্যাগ করিয়া আমাদিগকে একতায় বদ্ধ হইতে হইবে ও একযোগে সমবেত চেষ্টা দ্বারা কাজ করিতে হইবে। নতুবা আমাদের নিস্তার নাই এবং আমাদিগকে পরের পদানত থাকিতে হইবে। দেখ যে প্রথা সমাজে অনৈক্যরূপ কালাগ্নিতে এতকাল ইন্ধনরাশি অর্পণ করিয়া ইহাকে ধিকি ধিকি জ্বালাইয়া রাখিয়াছে, সে কুপ্রথাকে সর্ব্বাগ্রে সমূলে নাশ করিতে হইবে, নতুবা আমাদের কিছুতে ভদ্রস্থতা নাই। যদি আমরা জগতে পায়ের উপর ভর দিয়া দাড়াইতে ইচ্ছা করি, সর্ব্বাগ্রে আমাদিগকে একতায় বদ্ধ হইতে হইবে। সেজন্য যে প্রথা ইহার প্রধান অন্তরায় ও বিরোধী, উহাকে ধীরে ধীরে রহিত করিতে হইবে।

নৈষ্ঠিক হিন্দু প্রত্যুত্তর দিবেন, যে প্রথা ভারতের প্রভূত মঙ্গল সাধন করিয়াছে, যাহা থাকাতে আমরা বৌদ্ধ ও মুসলমান জাতিতে পরিণত হই নাই, সে সুপ্রথা এই পরাধীন অবস্থায় ত্যাগ করিয়া যদি আমরা জেতৃ জাতির সহিত মিশ্রিত হইয়া দোয়াসলা ফিরিঙ্গী হইয়া যাই, তখন আমাদের কি দুর্দ্দিন উপস্থিত হইবে? দেখ, এখনই কত হিন্দুকুলের কুলাঙ্গার দুপৃষ্ঠা ইংরাজি পড়িয়া হ্যাটকোট

পরিয়া মেম বিবাহ করিতে ইচ্ছুক; কেবল সমাজশাসনের ভয়ে উহারা আপনাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে পারে না। জাতিভেদ উঠিয়া গেলে আর কি নিস্তার আছে? লোকে দলে দলে মেম বিবাহ করিবে, আর চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করিবে।

বেশ জানিবে, জাতিধর্ম্ম রক্ষা করিয়া সহস্র বৎসর জেতৃ জাতির গোলামী করিতে হয়, সেও ভাল, তথাচ আমরা একদিনের জন্য সতীসাধ্বী হিন্দুরমণীকে ফিরিঙ্গ জাতির অঙ্কশায়িনী করিতে পারিব না। ডোম ডোগলা ও মেতরের কন্যা লইয়া ফিরিঙ্গিরা থাকুক, কিন্তু ভদ্রলোকের কোন মেয়ে যেন কখন উহারা পায় না। যাহা-হউক, পরাধীন অবস্থায় জাতিভেদপ্রথা কোন মতে রহিত করা উচিত নয়।

সংসারের তীব্র তাড়নায় বাধ্য হইয়া পৈতৃক ব্যবসায় ত্যাগ করিতে হয়, স্বচ্ছন্দে ও মনসুখে তাহাই কর, তাহাতে সমাজের কোন ক্ষতি নাই। পেটের দায়ে বিদ্যা ও অর্থ উপার্জ্জনের জন্য বিদেশে গিয়া ম্লেচ্ছ জাতির ম্লেচ্ছ খাদ্য খাইতে হয়, স্বচ্ছন্দে তাহাও খাও, তাহাতে বিশেষ ক্ষতি নাই। কিন্তু জাতিভেদপ্রথা বজায় রাখিবার জন্য বিবাহাদি বিষয়ে যে সকল নিয়মপদ্ধতি চলিয়া আসিতেছে, তাহা বিধিবৎ পালন কর, পারৎপক্ষে কদাচ তাহা উল্লঙ্ঘন করিও না। তবেই তোমরা ভারতমাতার সুসন্তান হইবে।

আর এক কথা চিরদিন মনে রাখিবে। জাতিবিদ্বেষ ত্যাগ করিবে। যে জাতি হউক না কেন, কোন জাতিকে ঘৃণা করিবে না। সকল লোকই নিজ নিজ জাতির ভিতর সম্মানিত। গোপ বল, কৈবর্ত্ত বল, নমঃশূদ্র বল, মেতর বল, সকল জাতিই নিজ নিজ সমাজে সম্মানিত। আর অমুক জাতি অস্পৃশ্য, উহাদের জল পান করিতে নাই, এ সকল অন্যায় আচার বিচার শীঘ্র সমাজ হইতে উঠাইয়া দেও। কলিকাতা প্রভৃতি মহানগরীতে ব্রাহ্মন কায়স্থ এক

পংক্তিতে ভোজন করিতেছে, অন্যান্য জাতির ভিতর এ বিচার শীঘ্র উঠিয়া যাইবে। হিন্দু কোন্ ছার। কালে মুসলমানদের সহিত এক পংক্তিতে ভোজন করিতে হইবে। কালের উপযোগিতানুসারে এ প্রথার বিস্তর পরিবর্ত্তন ঘটিবে।

পঞ্চম অধ্যায়।

বিবাহপ্রথা।

প্রাণিজগতের স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম এই যে, জীবজন্তুগণ সর্ব্বাগ্রে স্বোদর পূরণ করিয়া স্বজীবন রক্ষা করিবে, তৎপরে স্ত্রীজাতির সহিত সঙ্গত হইয়া অপত্যোৎপাদন করত স্ববংশ বৃদ্ধি করিবে। যে সকল জীবজন্তু জগতে উভলিঙ্গ (Hermaphrodite) স্ত্রীপুরুষের সঙ্গম ব্যতীত উহাদের অপত্যোৎপাদন হইয়া থাকে। এস্থলে স্বয়ং প্রকৃতি শরীরাভ্যন্তরে স্ত্র্যণু ও পুমণুর সংযোগ ঘটাইয়া দেয়। দৈত্যাসুর যুগে মানবজাতিও উভলিঙ্গ ছিল, সে জন্য এখনও পুরুষ জাতির বক্ষঃস্থলে স্তনদ্বয় ও বস্তিদেশে জরায়ু অস্ফুটভাবে দেখা যায়। এখন জগতের উচ্চজাতীয় প্রাণিগণ স্ত্রীপুরুষে বিভক্ত। স্ত্রীপুরুষের সঙ্গম ব্যতীত উহাদের সন্তানোৎপাদন হয় না।

শরীর রক্ষার্থে প্রকৃতি সকল জীবজন্তুর মনে ক্ষুধারূপ এক নৈসর্গিক সংস্কার প্রদান করে। এই ক্ষুধা দ্বারা চালিত হইয়া জীবমাত্রেই নিজ উদর পূরণ করিয়া প্রাণধারণ করিতেছে। সেইরূপ জন্তুদিগের মধ্যে স্ত্রীপুরুষের সঙ্গমের জন্য উহাদের মনে কামপ্রবৃত্তি প্রদত্ত হইয়া থাকে। অন্যান্য নিকৃষ্ট জীবজন্তু নৈসর্গিক সংস্কারে চালিত হইয়া সময়বিশেষে কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করত অপত্যোৎপাদন

করে। কিন্তু যুগধর্ম্মে বা জাতীয় সাধনার গুণে এ নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি মানবহৃদয়ে স্বতঃ বলবতী। এখন যেমন তিনি কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থতার জন্য সদা লালায়িত, স্ত্রীজাতিও সেইরূপ তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গিনী হইয়া তাঁহার নিকট অশেষরূপে পূজ্যা। এখন ভার্য্যাই তাঁহার ভবসাগরের তরণীস্বরূপ এবং সভ্যদেশে যে জাতি স্ত্রীজাতির উপর যত অধিক সম্মান প্রদর্শন করে, সে জাতি সভ্যতার তত উচ্চ পদবীতে আরূঢ়।

প্রকৃতি যেমন একদিকে স্ত্রীপুরুষের সঙ্গমের জন্য সকল জীবজন্তুর মনে কামপ্রবৃত্তি প্রদান করে, সেইরূপ অপরদিকে জীবজগতের অশেষ মঙ্গলের জন্য উহাদের মনে ইহা ঈর্ষ্যা বলবতী করিয়া দেয়। এই প্রকৃতিদত্ত ঈর্ষ্যা দ্বারা চালিত হওয়াতে এ জগতে সকল জীবজন্তুর ক্রমোন্নতি সাধন হইতেছে। হৃদয়ে প্রকৃতিদত্ত ঈর্ষ্যা বলবতী বলিয়া উহাদের মধ্যে বলিষ্ঠ জীব দুর্ব্বলকে তাড়িত করিয়া স্বয়ং স্ত্রী সম্ভোগ করত বলিষ্ঠ সন্তান উৎপাদন করিতেছে। ইহাতেই জীবজগতে প্রত্যেক জাতির ক্রমোন্নতি সাধন হইতেছে। যেমন সর্ব্বজনীন জীবনসংগ্রামে যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন হওয়াতে প্রত্যেক জাতির বলিষ্ঠ সন্তানগুলি রক্ষিত হইতেছে ও দুর্ব্বলগুলি নষ্ট হইতেছে; সেইরূপ এই প্রকৃতিদত্ত ঈর্ষ্যা দ্বারা চালিত হইয়া প্রত্যেক জাতির বলিষ্ঠ জীবগুলি স্ত্রীজাতির সহিত সঙ্গত হইয়া বলিষ্ঠ সন্তন উৎপাদন করিতেছে এবং সে সন্তান জীবনসংগ্রামে জয় লাভ করিতেছে।

এই প্রকৃতিদত্ত ঈর্ষ্যাবশতঃ সকল জীবজন্তুর ভিতর স্ত্রীজাতি লইয়া এত কলহ ও বিবাদ দেখা যায়। আশ্বিনমাসে কুকুরজাতির ব্যবহার, হস্তীর মত্ততা, বানর, বিড়াল ও সিংহাদি হিংস্র জন্তুদিগের পুংশাবক হত্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক ঘটনা এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে। সকলেই জানেন, মানবহৃদয়েও স্ত্রীজাতি লইয়া ঈর্ষ্যা সমধিক বলবতী। কেন তুমি স্বীয় পরিণীতা ভার্য্যাকে অন্তঃপুরের নিভৃত

স্থলে রাখ? কেন তুমি তাঁহাকে অবগুণ্ঠনবতী কর? কেন তুমি তাহাকে এমন সতীত্বধর্ম্ম উপদেশ দেও? ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত, জীবজগতের অশেষ মঙ্গলের জন্যই স্বয়ং প্রকৃতি যাবতীয় জীব-জন্তুর হৃদয়ে ঈর্ষ্যা এত বলবতী করিয়া দিয়াছে।

ভাষাসৃষ্টি, গোধূমাদির প্রচলন, বস্ত্রাদির ব্যবহার, বিবাহপ্রথা প্রভৃতি ঘটনাবলি মানবসমাজে কোন্ সময়ে প্রথম প্রবর্ত্তিত হইল, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। ঋকবেদাদি জগতের প্রাচীন গ্রন্থপাঠে বুঝা যায়, তৎকালে বিবাহপ্রথা সমাজে ভালরূপ প্রচলিত ছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন, ৫।৬ হাজার বৎসর হইল, বিবাহপ্রথা জগতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু অনেক পূর্ব্ব হইতে এ প্রথা সংসারে চলিয়া আসিতেছে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, আদিম অবস্থায় যখন মানব নিতান্ত বর্ব্বর অবস্থায় অবস্থিত ছিল, তৎকালে বিবাহপদ্ধতি সমাজে আদৌ প্রচলিত হয় নাই। তৎকালে অসভ্য মানব নিজ কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থতার জন্য নিকৃষ্ট জন্তুর ন্যায় যদৃচ্ছালব্ধ স্ত্রীলোকের সহিত ক্ষণকালের জন্য সঙ্গত হইত। সমাজে লজ্জার লেশমাত্র ছিল না। উলঙ্গ পুরুষ উলঙ্গ নারীর সহিত যদৃচ্ছামত সঙ্গত হইত। তৎকালে পুরুষজাতি প্রকৃতি-দত্ত ঈর্ষ্যার বশীভূত হইয়া নারীজাতি লইয়া প্রতিবেশীমণ্ডলীর সহিত তুমুল সংগ্রামে লিপ্ত হইত, এমন কি, সমাজের সেই আদিম অবস্থায় ইহার জন্য পুরুষজাতির ভিতর কত শোণিতপাত, কত বিবাদবিসম্বাদ সংঘটিত হইয়াছে, তাহা এখন আমাদের কল্পনাতীত।

তৎকালে পারিবারিকপদ্ধতিও সমাজে প্রবর্ত্তিত হয় নাই। তৎকালে মানবশিশুগণ নিরুপায় শৈশব অবস্থায় একমাত্র গর্ভ-ধারিণীর স্তনদুগ্ধে লালিত ও পালিত হইত এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সহজাত বন্য ফলমূলে বা অন্য জন্তুর আম মাংসে উদর পূরণ করিত।

তৎকালে পিতার সহিত উহাদের আদৌ পরিচয় ছিল না এবং মাতার সহিত শৈশবকালে কিছুদিনের জন্য উহাদের সম্পর্ক ছিল। তৎকালে পুরুষজাতির মনে অপত্যস্নেহ আদৌ স্ফুরিত হয় নাই।

সমাজের সেই ভীষণ আদিম অবস্থায় বিবাহপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে স্ত্রীজাতি লইয়া পুরুষজাতির ভিতর যে কত শোণিত-পাত, কত দ্বন্দ্ব ও কত হত্যা সংঘটিত হইয়াছে, তাহা ভাবিলে কাহার না মন আতঙ্কে বা দেহ রোমাঞ্চে পূর্ণ হইবে? তখন নারীহৃদয়ে কোথায় বা দম্পতিপ্রেম ও সতীত্বধর্ম্ম! কোথায় বা তাহার পতি-পরায়ণতা ও পতিসেবা! তদীয় হৃদয়ে কিছুই স্ফুরিত হয় নাই। একমাত্র নৈসর্গিক অপত্যস্নেহ দ্বারা চালিত হইয়া নারী স্বীয় গর্ভ-জাত অপত্যদিগের লালন পালন করিত। তখন কোথায় বা ভ্রাতা! কোথায় বা ভগিনী! কোথায় বা পিতা! কাহারও সহিত কাহারও পরিচয় নাই, সম্বন্ধ নাই। সকলেই এ জগতে অপরিচিত ও অজ্ঞাত।

সমাজের দ্বিতীয় অবস্থায় কিঞ্চিৎ জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে যখন মানব-সমাজ গঠিত হইতে থাকে, তখন রীতিমত বিবাহপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে আধুনিক পারিবারিক সংস্থানের কিঞ্চিৎ আভাস দেখা-দিল। স্ত্রীপুরুষ একত্রে বসবাস করিতে লাগিল এবং এক সঙ্গে ঔরসজাত সন্তানগণের লালন পালন করিতে শিখিল। উহাদের মিলনও বহুদিবস স্থায়ী হইতে থাকে এবং লোকাচারে পবিত্রীকৃত হইতে থাকে। এখন হইতে ভ্রাতায় ভ্রাতায়, ভগিনীতে ভগিনীতেও পিতাপুত্রে পরিচয় আরম্ভ হইল। এখন হইতে পুরুষের মনে অপত্যস্নেহ ও নারীর হৃদয়ে প্রেম প্রস্ফুরিত হইতে লাগিল। স্ত্রীজাতি লইয়া পুরুষজাতির ভিতর যে ঈর্ষ্যাজনিত তুমুলসংগ্রামে ও দ্বন্দ্বযুদ্ধে সমাজ এতকাল কলুষিত হইতে ছিল, তাহা স্থগিত হইতে আরম্ভ হইল এবং সমাজে কথঞ্চিৎ শান্তি স্থাপিত হইল।

সমাজের তৃতীয় অবস্থায় যখন বিদ্যাবুদ্ধি ও ধর্ম্মের ক্রমোন্নতির সহিত ইহা কিঞ্চিৎ সভ্যতাসোপানে আরূঢ় হয়, তখন রীতিমত বিবাহপ্রথা সমাজে প্রবর্ত্তিত হইল এবং সেই সঙ্গে সামাজিক সম্বন্ধ ক্রমশঃ জটিল হইতে জটিলতর হইতে লাগিল। সকল দেশেই মানবধর্ম্ম এ প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া পারিবারিক সংস্থানকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত করিয়াছে। এই প্রথা প্রচলিত হওয়াতে মানবসমাজে নানাবিষয়ে যুগান্তর উপস্থিত হইল। যে ঈর্ষ্যাজনিত বিবাদানলে ইহা এতকাল কলুষিত ছিল, তাহা চিরদিনের জন্য নির্ব্বাপিত হইল ও সমাজে শান্তি স্থাপিত হইল। কেবলমাত্র এখন সময়ে সময়ে স্ত্রীলোকের ব্যভিচারের জন্য সে শান্তিভগ্ন ও শোণিত-পাত ঘটিতে দেখা যায়।

বিবাহপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইবার পর স্ত্রীপুরুষ অপূর্ব্ব দাম্পত্য মিলনে ও সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়া নূতন কর্ত্তব্যপাশে আবদ্ধ হইলেন। এখন হইতে নারী পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গিনী ও সহধর্ম্মিণী এবং সতীত্বধর্ম্মে বিভূষিতা হইয়া তাঁহার প্রতি অশেষরূপে প্রেমাসক্তা, তাঁহার দুঃখে প্রকৃত দুঃখিনী, তাঁহার সুখে প্রকৃত সুখিনী ও তাঁহার গৃহের লক্ষ্মী-স্বরূপা হইলেন। এখন হইতে পুরুষ নারীর নিকট প্রেমময় প্রাণপতি, পুত্রকন্যাগণের নিকট স্নেহময় ও ভক্তিভাজন পিতা এবং গৃহস্বামী হইয়া সকলের ভরণপোষণের জন্য নানাকর্ম্মে বিব্রত হইলেন। এখন হইতে প্রত্যেক ব্যক্তি পিতৃকুল, মাতৃকুল ও শ্বশুরকুল এই তিন কুলের পরিচয় পাইলেন এবং তাঁহার আত্মীয়স্বজনের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইল। পিতৃকুলে যেমন তাঁহার নানাআত্মীয়স্বজন, মাতৃকুলে ও শ্বশুরকুলেও সেইরূপ, সকলের সঙ্গে তিনি এখন অপূর্ব্ব স্নেহপাশে আবদ্ধ হইলেন। এইপ্রকারে মানবধর্ম্ম সমাজে বিবাহপ্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া মানব-জাতির সুখসম্ভার সম্যক বর্দ্ধিত করিয়াছে।

কি সভ্য, কি অর্দ্ধসভ্য, কি অসভ্য, সকল দেশেই এ প্রথা এখন

প্রচলিত আছে। কি খৃষ্টান, কি মুসলমান, কি বৌদ্ধ, কি হিন্দু, কি জড়োপাসক, সকল ধর্ম্মের ভিতর এ সুপ্রথা প্রচলিত আছে। সকল দেশেই তত্রত্য ধর্ম্মযাজকগণ ইহার অধিনায়ক। তাঁহারাই সর্ব্বত্র স্ত্রীপুরুষকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিতেছেন এবং উহাদের মিলনকে মন্ত্রপূত করিয়া আজীবনস্থায়ী করিতেছেন। তাঁহারাই আবার ইহার আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানগুলি প্রবর্ত্তিত করিয়া সকলের সমক্ষে ইহার প্রকৃত মর্য্যাদা বর্দ্ধন করিয়াছেন।

যেমন বিবাহপদ্ধতি সমাজের পরমকল্যাণকর, এমন কি ইহা ব্যতীত সমাজধ্বংস অবশ্যম্ভাবী, সেইরূপ সকল দেশেই এ প্রথার গৌরব ও মাহাত্ম্য পূর্ণাংশে প্রকটিত ও পরিবর্দ্ধিত করা হইয়াছে। যে সময়ে ও যে দেশে লোকের যেরূপ অভিরুচি, উহারা সেইরূপ সমারোহে এই বিবাহোৎসব সম্পাদন করাইতেছে। সত্য বটে, সন্তানোৎপাদন দ্বারা বংশরক্ষা করাই দম্পতিমিলনের মুখ্য উদ্দেশ্য, তথাচ বিবাহসংস্কার দ্বারা উহাদের মিলন মন্ত্রপূত করাতে এবং বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজনে পরিবৃত হইয়া সমারোহ ও উৎসবের সহিত উহাদের মিলন সংঘটিত করাতে সমাজের যে কত মঙ্গল সাধিত হইতেছে, তাহা বর্ণনাতীত। বেশ জানিবে, এ সুপ্রথা মানবসমাজে সামাজিক নির্ব্বাচনে উত্থিত, প্রতিষ্ঠিত ও এতকাল স্থায়ী এবং কস্মিনকালে ইহার নাশ হইবে না।

দম্পতিমিলনের উপর জীবনের ভাবি সুখদুঃখ অধিক পরিমাণে নির্ভর করে বলিয়া সমাজস্থ সকল লোক বিবাহসংস্কারকে জীবনের প্রধান ঘটনা মনে করে এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ইহার জন্য লালায়িত হয়। যেদেশে জীবনসংগ্রাম অনায়াসসাধ্য, তথায় লোকে ইচ্ছামত ও সুবিধামত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়। যেদেশে ইহা আয়াসসাধ্য, তথায় লোকে হঠাৎ বিবাহ করিতে চায় না এবং পরিবারপ্রতিপালনের সংস্থান করিয়া উদ্বাহসূত্রে আবদ্ধ হয়।

প্রথমোক্ত প্রদেশে বাল্যবিবাহ প্রশ্রয় পাইতে পারে! কিন্তু শেষোক্ত দেশে ইহা একপ্রকার অসম্ভব।

কোন কোন দেশে পুত্রকন্যার বিবাহ পিতামাতার অবশ্যপ্রতি-পাল্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কোন কোন দেশে উহারা স্বয়ং পাত্রীপাত্র পছন্দ করিয়া লয়। বিবাহসম্বন্ধে নানাদেশে নানাপ্রকার আচার ব্যবহার প্রচলিত আছে। যে দেশে যেরূপ দেশাচার বহুকাল হইতে প্রচলিত, তাহাই সেদেশের উপযুক্ত, তাহাই সে দেশের সদাচার এবং জনসাধারণ তাহারই পক্ষপাতী। আবার উহাদের মতিগতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে ইহারা কালে কালে পরিবর্ত্তিত হইতে দেখা যায়।

আজকাল সুসভ্য ইউরোপখণ্ডে এ প্রথার তাদৃশ সমাদর দেখিতে পাই না। তত্রত্য লোকেরা ইহাকে জীবনের সামান্য ঘটনা মনে করে এবং এতদুপলক্ষে কোনরূপ ব্যয়বহুল উৎসব বা সমারোহ করে না। তথায় পাত্রীপাত্র দুই চারিজন বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া গির্জ্জায় যায় এবং পাদরি সাহেবের নিকট লেখাপড়া করিয়া বিবাহ-রূপ চুক্তিনামায় বদ্ধ হয়। মনে করিলেই উহারা এ চুক্তিনামা সহজে ছেদন করিতে পারে। বিবাহকালে বরের মস্তকে অনেক পাদুকা প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। মনে করে এমন মালটা ফাঁক্‌তালে লইয়া যাইতেছে, জুতা খাইয়া যাও, এজন্য অনেকে জুতা ছোঁড়ে।

এই অর্দ্ধসভ্য ভারতে এ প্রথার কত সমাদর দেখ! লেখাপড়া কিছুই হয় না, সাক্ষী সাবুদ কিছুই থাকে না, অথচ কস্মিনকালে কেহ এ বিবাহবন্ধন ছেদন করিতে পারে না। ইহার আনুষঙ্গিক ব্যাপারই কত! কত সমারোহ, কত উৎসব, ও কত অর্থব্যয়! আয়ুবর্দ্ধান্ন, নান্দীমুখশ্রাদ্ধ, কন্যাসম্প্রদায়, স্ত্রীয়াচার, সপ্তপদীগমন, বাসিবিবাহ, বৌভাত, ফুলশয্যা প্রভৃতি কতই না অনুষ্ঠান করিতে হয়। এস্থলে আমাদের একজন সুশিক্ষিত বান্ধব বলিবেন, যখন বরকন্যাকে হাতে হাতে সঁপে দিলেই সব ল্যাঠা মিটিয়া যায়, তবে

এত হাঙ্গাম করিবার প্রয়োজন কি? এদেশে স্বার্থপর ব্রাহ্মণেরা সকল কাজে হাঙ্গাম বাড়াইয়া আপনাদের সামাজিক প্রভুত্ব বজায় রাখিয়াছেন। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যত আক্রোশ কেবল ব্রাহ্মণ-ঠাকুরদের উপর।

উদ্বাহসূত্রে আবদ্ধ হইলে স্ত্রীপুরুষের মিলন আজীবনস্থায়ী হয়। সমাজের অশেষ মঙ্গলের জন্য ধর্ম্ম সকল দেশে দম্পতিমিলনকে দুশ্ছেদ্য করিতে চেষ্টা পায়। কিন্তু যে দেশে ধর্ম্মতন্ত্র অপেক্ষা শাসনতন্ত্রের ক্ষমতা অধিক, তথায় ধর্ম্মানুষ্ঠিত বিবাহবন্ধনও রাজ-দণ্ডবিধিঅনুসারে ছিন্ন হইতে পারে, যেমন ইউরোপীয় সমাজ। আর যে দেশে শাসনতন্ত্র অপেক্ষা ধর্ম্মতন্ত্রের ক্ষমতা অধিক, তথায় ধর্ম্মানুষ্ঠিত বিবাহবন্ধন কোন সময়ে কোন কারণে ছিন্ন হইতে পারে না, যেমন হিন্দুসমাজ। পাশ্চাত্যসমাজ ব্যভিচারিণী কুলটা স্ত্রীলোককে আদালতের আশ্রয় লইয়া শাসন করে; কিন্তু প্রাচ্য-সমাজ উহাকে জাতিচ্যুত করিয়া শাসন করে।

বিবাহসংস্কার সমাজের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রথা বলিয়া জারজ সন্তান প্রায় সকল দেশে সমভাবে হেয় ও ঘৃণাস্পদ। কোন কোন দেশে এতৎসম্বন্ধে সমাজ-শাসন এত অধিক যে, ভদ্রলোকদিগের ভিতর জারজ সন্তান প্রসব একেবারে অসম্ভব। তথায় জারজ সন্তানগুলি ভ্রূণাবস্থায় হত হয় অথবা আশ্রমবিশেষে (Foundling asylum) উহারা প্রতিপালিত হয়। দেখা যায়, জারজ সন্তানগুলি প্রায় খচ্চোর, কুলঘ্ন ও পাপাচারী হইয়া থাকে।

আবার যে সমাজে বিবাহপ্রথার তাদৃশ সমাদর নাই, তথায় লোকে পরিণীতা ভার্য্যা ত্যাগ করিয়া অন্য স্ত্রীলোকের সহিত বসবাস করে এবং স্ত্রীলোকও বিবাহিত পতি ত্যাগ করিয়া অন্য মনোভিমত পুরুষের সহিত সঙ্গত হয়। তথায় সতীত্বধর্ম্মের আদর আদৌ নাই এবং পিতাপুত্রের সম্বন্ধ শিথিল বলিয়া ভাগিনেয় মামার

বিষয় উত্তরাধিকার করে। এ প্রথা মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কোন কোন স্থলে দৃষ্ট হয়। তথায় কেহই ইহার জন্য সমাজে নিন্দনীয় হয় না। যেমন যে দেশে জাতিভেদ নাই, সে দেশে বর্ণশঙ্কর উৎপন্ন হয় না অর্থাৎ সকলই বর্ণশঙ্কর; সেইরূপ যে দেশে বিবাহ নামমাত্র, বা আদৌ নাই, সে দেশে সকলেই জারজ সন্তান এবং সে সন্তান কি প্রকারে পিতার বিষয় উত্তরাধিকার করিবে?

ধনপুত্রলাভ যেমন ভাগ্যাধীন, স্ত্রীরত্নলাভও সেইরূপ সকলের ভাগ্যাধীন। জন্মলগ্নের গণনানুসারে সপ্তম জায়াগৃহে গ্রহাদির যেরূপ সঞ্চার, তোমার ভাগ্যে তদনুরূপ ভার্য্যালাভ ঘটিবে। যদি ঐ ঘরে বৃহস্পতি বা বুধ থাকেন, তুমি স্ত্রীরত্ন পাইয়া সর্ব্বসুখে সুখী হইবে, অথবা শনি বা রাহু থাকে, তোমার স্ত্রীবিয়োগ ঘটিবে বা দুশ্চরিত্রা ভার্য্যার জ্বালায় অস্থির হইবে। এখন পিতামাতা তোমার জন্য পাত্রী মনোনীত করুন, অথবা তুমি নিজে দেখিয়া শুনিয়া পাত্রী মনোনীত কর, বেশ জানিবে, ভাগ্যানুসারে তোমার স্ত্রীলাভ ঘটিবে।

জনসাধারণের বিশ্বাস, বিবাহ প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ। বস্তুতঃ যে বিবাহের উপর দম্পতিদ্বয়ের জীবনের ভাবি সুখদুঃখ সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করে, সে বিবাহ কি অন্ধ দৈববশাৎ (By mere blind chance) ঘটিতে পারে? দেখ, তোমার পিতামাতা তোমার জন্য পাত্রী অন্বেষণ করিয়া তোমায় পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিতেছেন। এস্থলে তোমার পিতামাতা বা ঘটকঠাকুর তোমার বিবাহের নিমিত্তকারণ বটে; কিন্তু তোমার যেমন ভাগ্যলিপি, তুমি সেইরূপ সুশীলা সাধ্বী ভার্য্যা পাইয়া অশেষ সুখে সুখী হইবে, অথবা দুঃশীলা কুলটা ভার্য্যা পাইয়া উহার জ্বালায় অস্থির হইবে।

সকল দেশেই বিবাহসংস্কারে নানা বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হইয়া থাকে। কেন সামান্য কথার জন্য বিবাহসম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যায়?

কেন বর কন্যা সামান্য কথার জন্য সম্প্রদান কালে পিড়ি হইতে উঠিয়া চলিয়া যায়? বিবাহ প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ বলিয়া ইহাতে এত বাধাবিঘ্ন উত্থিত হয়। যদি তুমি বা তোমার পিতামাতা সহস্রবার স্বচক্ষে দেখিয়া পাত্রী বা পাত্র মনোনীত কর, তথাচ তুমি বা তাঁহারা ভাগ্যলিপি পরিবর্ত্তন করিতে পারিবে না। ভাগ্যের গুণে তোমার বা তাঁহাদের চক্ষে উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট হইবে এবং অপকৃষ্ট উৎকৃষ্ট হইবে যাঁহার যেমন ভাগ্য, তাঁহার তেমনি যোগাযোগ লাগিবে এবং তাঁহার তেমনি পতিপত্নীলাভ ঘটিবে।

বিবাহ প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ বলিয়া পুরোহিত মহাশয়, মুন্সি বা পাদরি সাহেব প্রজাপতির প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া দুইটী অপরিচিত জীবকে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করিয়া উহাদের ভাগ্যলিপি সংযোজিত করিয়া দেন। বিবাহের পর উভয়েই মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া যায়, একপ্রকার চালচালন চলে এবং সমসুখদুঃখের ভাগী হয়। যেমন দেবা, তেমনি দেবী, যেমন হাড়ী, তেমনি শরা। অতএব বিবাহ প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ বলাতে তোমরা একথা হাসিয়া উড়াইওনা।

হিন্দুবিবাহ

চতুরাশ্রমের মধ্যে যে গৃহস্থাশ্রম হিন্দুসমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মার্গ, যদ্দ্বারা এ সংসার চিরদিন রক্ষিত ও পালিত, সেই আশ্রমে প্রবেশ করিবার জন্য বিবাহ উহার দ্বারস্বরূপ। এই দ্বারদেশ মাড়াইয়া সকলে পরিণীতা ভার্য্যার সহিত সংসারাশ্রমে প্রবেশ করে এবং আশ্রমোচিত জাতিধর্ম্ম ও কুলধর্ম্ম পালন করিয়া নিজ নিজ জীবন অতিবাহিত করে। যদিও নিকৃষ্ট কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া পুত্রোৎপাদন দ্বারা বংশরক্ষা করাই বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য, কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের কি অপার মহিমা! এধর্ম্ম বিবাহের এই মুখ্য উদ্দেশ্যকে গৌণ উদ্দেশ্যে পরিণত করে এবং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ এই চতুর্বর্গ-

ফলের মধ্যে ধর্ম্মার্থকাম এই ত্রিবর্গসাধন গৃহস্থমার্গের প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া চিরদিন উপদেশ দেয়।

এস্থলে শাস্ত্রের আদেশ এই যে, তুমি অর্দ্ধাঙ্গিনীসহবাসে বিধি-নিষেধানুসারে কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া অপত্যোৎপাদন করিবে, অর্থোপার্জ্জন করিয়া পরিজনবর্গের ভরণ পোষণ করিবে এবং শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া সমাজসেবা করিবে। ইহার জন্য তোমার পরিণীতা ভার্য্যা যথার্থতঃ তোমার সহধর্ম্মিণী এবং তাঁহাকে লইয়া তুমি সংসারে যাবতীয় ধর্ম্মকর্ম্ম করিতেছ।

এই শাস্ত্রাদেশবশতঃ তুমি পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী প্রভৃতি পরিজনবর্গের সেবায় নিজ সহধর্ম্মিণীকে গৃহমধ্যে নিয়োজিত কর এবং তুমি স্বয়ং উহাদের ভরণপোষণের জন্য বহির্জগৎ হইতে অর্থোপার্জ্জন কর। ইহার জন্য তুমি দেবদেবীর পূজার্চ্চনায় ও অন্যান্য ধর্ম্মানুষ্ঠানে গৃহমধ্যে তাঁহাকে নিয়োজিত কর। ইহার জন্য তাঁহার সহিত এক গ্রন্থিতে আবদ্ধ হইয়া গুরুদেবের নিকট মন্ত্রদীক্ষা লও এবং উভয়ে সেই মন্ত্র আজীবন জপ করিয়া মনের একাগ্রতা লাভ করিতে সচেষ্ট হও। ইহার জন্য অতিথি গৃহে আসিলে তুমি তাঁহাকে উহার সেবায় নিযুক্ত কর এবং ভিক্ষুক দ্বারস্থ হইলে উহাকে মুষ্টিমেয় ভিক্ষা দিতে বল। এইপ্রকারে গৃহস্থের যাবতীয় ধর্ম্মানুষ্ঠানে তোমার সহধর্ম্মিণী তোমার ডানহাত। অতএব এইপ্রকারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করাই হিন্দুবিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য।

শাস্ত্রে হরগৌরীর মিলনই হিন্দুবিবাহের পূর্ণ আদর্শ। স্বয়ং মহাদেব পার্ব্বতীকে বিবাহ করিবার পূর্ব্বে মদনদেবকে ভস্মীভূত করেন। ইহা কি কেবল কবিদিগের কল্পনামাত্র? ইহাতে কি হিন্দুবিবাহের মূল উদ্দেশ্য প্রকাশ পাইতেছে না? যেমন হর-গৌরীর মিলন হইবার পূর্ব্বে হরকোপানলে মদনদেব ভস্মীভূত হন, সেইরূপ উদ্বাহসূত্রে আবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে দুর্জয় কামরিপু দমন করা

প্রত্যেক হিন্দুযুবকের প্রধান কর্ত্তব্য। ইহাতে বুঝায়, পশুর ন্যায় ইন্দ্রিয়সেবন বা পাশববৃত্তি চরিতার্থ করা হিন্দুবিবাহের মূল উদ্দেশ্য নয়।

দেখ, পার্ব্বতী ত্রৈলোক্যসৌন্দর্য্যমিবোদিতং বপুবলে মহাদেবকে বশীভূত করিতে পারেন নাই। তাঁহাকে রূপলাবণ্যে মোহিত করিতে গিয়া মদনদেব ভস্মীভূত হন এবং তিনিও ভগ্নমনোরথা হন! পরে অসাধারণ তপোবলে তিনি তাঁহাকে বশীভূত করেন।

অদ্য প্রভৃত্যবনতাঙ্গি! তবাস্মি দাসঃ ক্রীতস্তপোভিঃ।

(কুমার সম্ভবং)

"তুমি তপোবলে আমার জয় করিলে এবং আজ হইতে আমি তোমার ক্রীতদাস হইলাম।"

ওহে হিন্দুযুবক! তুমিও সেইরূপ ভার্য্যার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইবে না; পরন্তু তাঁহার অশেষ গুণগ্রামে ও ধর্ম্মাচরণে মুগ্ধ হইবে। রূপলাবণ্য কয়দিনের জন্য, কিন্তু গুণগ্রাম আজীবনের তরে।

পার্ব্বতী মহাদেবকে পাইবার জন্য অসাধারণ তপস্যা করেন। হিন্দুধর্ম্মও মনোমত বর পাইবার জন্য কুমারীদিগকে শিবারাধনা করিতে উপদেশ দেয়। যাহাহউক, নিকৃষ্ট কামপ্রবৃত্তি দমন করিয়া অশেষ ধর্ম্মাচরণ করা হিন্দুবিবাহের মূল উদ্দেশ্য। বল-দেখি পাঠক! কোন্ দেশের কোন্ ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় বিবাহের এমন মহোচ্চ উদ্দেশ্য কল্পনা করিতে পারে? কোন্ দেশের কোন্ জাতি হিন্দুজাতির ন্যায় বিবাহের এমন স্বর্গীয় ভাব স্ফুরণ করিতে পারে?

এখন একবার হিন্দুসমাজের দম্পতিমিলন দেখ এবং ইহার স্বর্গীয় ভাব দেখিয়া নয়ন সার্থক কর। হিন্দুবিবাহে পতি ও পত্নীর যেরূপ সর্ব্বাঙ্গীন মিলন ঘটে, এমন অপরূপ দম্পতিমিলন কোন দেশের কোন জাতি কস্মিনকালে কল্পনা করিতে পারে নাই। খৃষ্ট-

ধর্ম্ম বলে, আদি মানব আদামের একখণ্ড পঞ্জরাস্থি লইয়া ঈশ্বর আদিনারী ঈভকে সৃজন করেন। এজন্য খৃষ্টধর্ম্মমতে দম্পতিমিলন আংশীক, কদাচ সর্ব্বাঙ্গীন নহে এবং ইহজীবনে ইহাকে ছেদন করা যায়। কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম বলে, বিশ্বরচনায় স্বয়ম্ভু স্বয়ং দ্বিখণ্ডিত হইয়া স্ত্রীপুরুষ সৃজন করেন। এজন্য হিন্দুবিবাহে সেই দ্বিখণ্ডিত স্বয়ম্ভুকে পুনরায় একীকরণ করা হয়। ইহাতে দুইটী বিভিন্ন প্রকৃতির জীব সর্ব্বাঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া একীভূত হইয়া যায়।

বিবাহকালে বর কন্যাকে বলিতেছেন—

প্রাণৈস্তে প্রাণান্ সন্দধামি অস্থিভিরস্থীনি মাংসৈ মাংসানি ত্বচা ত্বচং।

"তোমার প্রাণ ও আমার প্রাণ, উভয়কে একাধারে সংযুক্ত করিব। তোমার অস্থিদ্বারা আমার অস্থির সংযোগ করিব। তোমার মাংসের দ্বারা আমার মাংসের যোগ ঘটাইব। তোমার ত্বক দ্বারা আমার ত্বক সংযুক্ত করিব।" একারণ শোণিতে শোণিতে সর্ব্বাঙ্গীন মিলন ঘটে বলিয়া বর কন্যার সীমন্তপ্রদেশে রক্তের চিহ্নস্বরূপ লোহিতবর্ণ সিন্দূর পরাইয়া দেন। আহা! মরি! মরি! এমন সর্ব্বাঙ্গীন দম্পতিমিলন কে কোথায় দেখেছে বা কে কোথায় ভেবেছে?

সাংখ্যোক্ত প্রকৃতিপুরুষের মিলনে ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় ব্যাপার চলিতেছে। সেই প্রকৃতিপুরুষের মিলনের ন্যায় হিন্দুবিবাহে নারীও পুরুষের সহিত মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া থাকে। হিন্দুসমাজে দম্পতিমিলন আজীবনস্থায়ী, কস্মিনকালে কেহ এ বিবাহবন্ধন ছেদন করিতে পারে না। এতদূর প্রাণে প্রাণে মিলন ঘটান হয় বলিয়া তোমার পরিণীতা ভার্য্যা তোমার অর্দ্ধাঙ্গিনী এবং তোমাদের মিলন চিরদিন অচ্ছেদ্য।

পাশ্চাত্যজগৎ শাসনতন্ত্রের বা আদালতের আশ্রয় লইয়া বিবাহ-বন্ধন স্থলবিশেষে ছেদন করিয়া দেয়! আর হিন্দুসমাজ এবিষয়ে

শাসনতন্ত্রকে আদৌ হস্তক্ষেপ করিতে দেয় না। এখন দেখা উচিত, কোন্ প্রথা অধিক প্রশংসনীয়?

সাম্যবাদী পাঠক বলিবেন, যেস্থলে দুশ্চরিত্র ও কলহপ্রিয় স্ত্রী-পুরুষের মিলন হওয়াতে গৃহ চিরবিবাদানলে কলুষিত, তথায় উহাদের বিবাহবন্ধন ছেদন করা কর্ত্তব্য। এজন্য পাশ্চাত্যসমাজ উহাদিগকে আইনবলে বিবাহবন্ধন ছেদন করিয়া নিশ্চিন্ত করে। আর এদেশে উভয়ে চিরদিন জ্বালাতন হইতে থাকে। তবে পাশ্চাত্য-প্রথাই শ্রেষ্ঠ।

এস্থলে সূক্ষ্মদর্শী পাঠক বলিবেন, পাশ্চাত্য সমাজের মাকালফল দেখিয়া ভুলিও না। ইহার বহির্দ্দেশ যেরূপ চাকচিক্যময়, অভ্যন্তর তেমনি পূতিগন্ধে ভরা। এই পূতিগন্ধ কিরূপ, তাহা বুঝাইবার জন্য এদেশের প্রথা সম্যক আলোচনা করা উচিত।

এ দেশে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে যে কারণে যতই কেন কলহ ও মনো-বিবাদ উপস্থিত হউক না, সামাজিক নিয়মানুসারে উহারা কলহ মিটাইয়া একত্রে বসবাস করিতে বাধ্য হয়। স্ত্রী ও পুরুষ স্বপ্নেও ভাবিতে পারে না, বিবাহবন্ধন ছেদন করিয়া অন্য উপায় অবলম্বন করিব। উহাদের ভিতর যে বিবাদ ঘটে, তাহা ত ক্ষণস্থায়ী, অল্পেই মিটিয়া যায়। এজন্য শাস্ত্রকারেরা বলেন ঃ—

অজাযুদ্ধে ঋষিশ্রাদ্ধে প্রাতর্মেঘডম্বরে
দম্পতিকলহেচ বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া।

"ছাগলের লড়াই, ঋষির শ্রাদ্ধ, প্রাতঃকালে মেঘাড়ম্বর এবং স্ত্রীপুরুষের কলহ, এই সকল উপলক্ষে প্রথমে অধিক আড়ম্বর দেখা যায়, কিন্তু কাজের বেলায় কিছু নয়।" ইহাতে বুঝা উচিত, এদেশে দম্পতিকলহ নামমাত্র, অল্পেই মিটিয়া যায়। কিন্তু যদি বিবাহবন্ধন ছেদন করিবার উপায় থাকিত, এই সামান্য কলহ ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিত; তখন কেঁচো খুঁড়িতে খুঁড়িতে কালসাপ

বাহির হইত। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায়, পাশ্চত্য সমাজ নিজের ব্যবস্থা দ্বারা গৃহবিবাদানলে ইন্ধনরাশি অর্পণ করিতেছে ; আর হিন্দুসমাজ সেই বিবাদানলে শান্তিবারি অভিষিঞ্চন করিয়া উহাকে নিবাইতেছে।

আরও দেখ, যদি স্ত্রীজাতি জানিত বা উহাদের এরূপ সত্ত্ব থাকিত, যে উহারা এক পতি পরিত্যাগ করিয়া পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারে, স্বামীর প্রতি নারীর কি অনন্তপ্রেম ও হৃদয়ে অনন্ত ভালবাসা উদয় হইবে ? মনে জানে, এ পতি তাহাকে অধিক জ্বালা-যন্ত্রণা দেয় বা সুখের পথে কণ্টক বপন করে, আদালতের আশ্রয় লইয়া উহাকে স্বামীত্ব হইতে বরখাস্ত করিব এবং পত্যন্তর গ্রহণ করিয়া সুখিনী হইব। যদি দ্বিতীয় পতি সময় দোষে অপ্রিয়বাদী ও কলহপ্রিয় হয়, উহাকেও একখাদে গাড়িব। যদি তৃতীয় পতি আমার সুখের পথে কণ্টক বপন করে, উহাকেও বরখাস করিয়া সেই খাদে গাড়িব। এইরূপ বৎসর বৎসর এক একটা আনিব ও তাড়াইব। বল দেখি, এ বেটী কেমন বাহবা ! এইরূপ পাশ্চত্য সমাজে সময়ে সময়ে নানা কালনাগিনী বিষ উদ্গার করিতে থাকে এবং অনেককে অস্থির করে। এইরূপ সুসভ্য পাশ্চাত্য সমাজে বৎসরে বৎসরে বিবাহবন্ধন ছেদনের জন্য কত মামলা হইতেছে; তাহার খপর কি কেহ রাখেন ?

এখন একবার হিন্দুসমাজের দিকে তাকাও, দেখিবে ইহা কিরূপ অপূর্ব্ব সুখশান্তিতে পূর্ণ। হিন্দুধর্ম্মের গুণে তোমার পরিণীতা ভার্য্যা তোমার কিরূপ বশীভূতা ও অনুগতা। দীনদরিদ্র হও, বা লক্ষপতি হও, যখন তোমার ভার্য্যা তোমার উপর অনন্ত প্রেম, ভালবাসা, ও ভক্তি দেখাইবে, তখন তোমার সংসার সোণার সংসার হইবে এবং তুমিও তাহাকে লইয়া আজীবন সুখসাগরে ভাসিবে। সমাজ হিন্দুরমণীকে বিবাহবন্ধন ছেদন করিতে দেয় না বলিয়া তোমার এত সুখও এত শান্তি। সত্য বটে, এ প্রথায় লোকবিশেষ দুশ্চরিত্রা ও

কলহপ্রিয়া ভার্য্যা লইয়া অশেষ জ্বালা যন্ত্রণা পায়: কিন্তু ইহাতে সমাজের অধিকাংশ লোকের সুখ ততোধিক বর্দ্ধিত হইতেছে। অপর পক্ষে সাম্যবাদী পাশ্চত্যসমাজ অধিক স্বাধীনতাপ্রিয়, এবিষয়ে স্ত্রীজাতিকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করাতে তাঁহারা নিজ পাদমূলে কুঠারাঘাত করিয়া বসিয়াছেন।

এখন হিন্দুবিবাহে যে সকল নিয়মও কড়াক্রান্তি বিচার প্রচলিত দেখা যায়, উহাদের কিঞ্চিৎ সমালোচনা করা আবশ্যক।

হিন্দুসমাজে পিতৃকুলের সপ্তম পুরুষ ও মাতৃকুলের পঞ্চম পুরুষ পর্য্যন্ত রক্তে সংস্রব থাকিলে বিবাহ ন্যায়সঙ্গত ও শাস্ত্রসম্মত হয় না, এমন কি এক গোত্রোদ্ভূত স্ত্রীপুরুষের মিলন শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও দেশাচারবিরুদ্ধ। অন্যান্য দেশে বিবাহবিষয়ে এমন কঠোর নিয়ম দেখা যায় না। তথায় পিতৃমাতৃকুলের মধ্যে এক পক্ষের রক্তের সংস্রব না থাকিলেই বিবাহ ন্যায়সঙ্গত হইয়া থাকে। এজন্য মুসলমান ও খৃষ্টান জাতিদের ভিতর এক ভ্রাতার পুত্রের সহিত অপর ভ্রাতার কন্যার বিবাহ হইয়া থাকে। এস্থলে উহাদের মতে পিতৃকুল এক হইলেও মাতৃকুল বিভিন্ন বলিয়া তাদৃশ বিবাহ ন্যায়সঙ্গত। তাঁহারা বলেন, মাতার দুগ্ধের সংস্রব না থাকিলেই বিবাহ যুক্তিসিদ্ধ।

এস্থলে হিন্দুধর্ম্ম বলিবে, স্মরণাতীত কাল হইতে যে পারিবারিক সংস্থান সমাজে প্রতিষ্ঠিত, উহার নিয়মানুসারে যিনি তোমার খুল্লতাত ভগিনী, তিনি আবার কি প্রকারে তোমার অর্দ্ধাঙ্গিনী হইবেন? ইহাতে কি পারিবারিক প্রথার পবিত্র সম্বন্ধ উল্লঙ্ঘিত হইতেছে না? অতএব সে পাপকথা কদাচ মুখে আনিও না বা স্বপ্নেও ভাবিও না। ম্লেচ্ছজাতিরা ঐরূপ বিবাহ দেয়, উহারা স্বচ্ছন্দে করুক। পাঁঠাপাঁঠীর কিছুমাত্র বিচার আচার নাই। তবে কেন পবিত্র হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া তোমরা এরূপ জঘন্য প্রথা অবলম্বন করিয়া পবিত্র কুলকে নষ্ট করিবে? আর এক কথা, যে

হিন্দুসমাজ স্ত্রীপুরুষের মিলন দ্বারা দুইটী বিভিন্ন বংশের মিলন ঘটায়, সে সমাজ এক বংশোদ্ভূত স্ত্রীপুরুষের বিবাহ কি প্রকারে অনুমোদন করিবে ?

মহারাষ্ট্রদেশে এক ব্যক্তি তদীয় মাতুলকন্যাকে বিবাহ করে। তত্রত্য লোকেরা বলে, শ্রীকৃষ্ণের পুত্র নিজ মাতুলকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, এজন্য এ প্রথা তথায় বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু আমদের নিকট এ প্রথা বীভৎস ও ঘৃণার্হ। কেহ কেহ বলেন, যে দেশে লক্ষ্মণ শূর্পনখার নাক কাটেন, সেই নাককাটা দেশের লোকেরাই এই কুপ্রথা চালাইয়া আসিতেছে।

অনেকে বলেন, বিবাহবিষয়ে অস্মদ্দেশীয় প্রথা গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। যে দেশে গ্রীষ্মাতিশয্যবশতঃ জনসাধারণ স্বভাবতঃ দুর্ব্বল, সে দেশে বিবাহবিষয়ে এমন কঠোর নিয়ম প্রচলিত না থাকিলে কুলজ পীড়ার উৎপীড়নে অনেক বংশ অত্যল্পকাল মধ্যে নির্ব্বংশ হইতে পারে। মানবসমাজে কতকগুলি কুলজপীড়া (ক্ষয়কাশ, ক্যান্সার, হাঁপানি, উপদংশ, অন্ত্রবৃদ্ধি, কুষ্ঠাদি) এক পুরুষ হইতে পুরুষান্তরে অনুক্রামিত হইয়া অনেক লোককে অকালে কালগ্রাসে পাতিত করে। পুরুষানুক্রমিকতার নিয়মাবলি এত দুর্বোধ্য, কেহ বলিতে পারেন না, কোন্ সন্তানে কোন্ পুরুষের গুণাগুণ বা কুলজ পীড়া প্রতিফলিত হইবে। কিন্তু ইহা সুনিশ্চিত, যে স্থলে রক্তের অধিক সংস্রব থাকে, সেস্থলে কুলজ পীড়ার প্রকোপ অত্যন্ত প্রবল হইয়া থাকে। এজন্য আমাদের শাস্ত্রের বিধিনিষেধ এদেশে অতীব মঙ্গলদায়ক এবং শীতপ্রধান দেশে ইহার ব্যত্যয় ঘটিলে সমাজের তাদৃশ অনিষ্টোৎপত্তি না হইলেও হইতে পারে। শাস্ত্রকারেরা অগাধ পর্য্যবেক্ষণ ও ভূয়োদর্শনের গুণে যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাই আমাদের পরমকল্যাণকর।

বিবাহবিষয়ে হিন্দুসমাজে আর একটী কঠোর নিয়ম দেখা যায়। ইহাই কুলপরম্পরাগত জাতিভেদপ্রথার মূলভিত্তি। ইহার গুণে এক জাতির পুত্রকন্যাগণ অপর জাতির পুত্রকন্যাদিগের সহিত কস্মিনকালে উদ্বাহসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারে না। বিবাহবিষয়ক এই সাধারণ নিয়ম প্রত্যেক জাতিকে দুর্লঙ্ঘ্য অবরোধে বেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছে : যিনি এই জাতীয় অবরোধ উল্লঙ্ঘন করিবেন, তিনি চিরদিনের জন্য সমাজচ্যুত ও জাতিচ্যুত হইবেন। সমাজে থাকিতে হইলেই সকলকে এ নিয়ম বিধিবৎ পালন করিতে হইবে। এই নিয়ম থাকাতেই জাতিভেদপ্রথা পূর্ণমাত্রায় এতকাল সুরক্ষিত হইতেছে। এই নিয়ম থাকাতেই সমাজে অসবর্ণ বিবাহ বা অনুলোম প্রতিলোম বিবাহ একেবারে রহিত হইয়াছে এবং বর্ণশঙ্কর উৎপন্ন হইতে পারে না।

জাতিভেদপ্রথা দ্বারা হিন্দুসমাজ আবহমানকাল ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিভক্ত। ইহা দ্বারা এক এক জাতি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণিতে, এক এক শ্রেণি ভিন্ন ভিন্ন শাখাশ্রেণিতে, এক এক শাখাশ্রেণি ভিন্ন ভিন্ন গোত্রে, এক এক গোত্র ভিন্ন ভিন্ন বংশে বিভক্ত হইয়া কি উচ্চ কি নীচ সমাজস্থ যাবতীয় লোক এক রজ্জুতে আবদ্ধ রহিয়াছে। এজন্য সমগ্র সমাজে সর্ব্বজনীন সামঞ্জস্য ও সুশৃঙ্খলতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যখন বিবাহসংস্কার দ্বারা স্ত্রীপুরুষের মিলন ঘটে, অন্যান্য দেশের ন্যায় এ দেশে অসম্বদ্ধ ব্যাক্তিদ্বয়ের মিলন ঘটে না। কিন্তু তদ্দ্বারা সমাজস্থ এক জাতির এক শ্রেণিস্থ ও ভিন্ন গোত্রীয় দুইটী বিভিন্ন বংশের মিলন ঘটিয়া থাকে। এমন সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সমাজপদ্ধতি কোন দেশে নয়নগোচর হয় না।

আবার জাতিভেদপ্রথাকে পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখিবার জন্য হিন্দুধর্ম্ম পুত্রকন্যার বিবাহ পিতামাতাগুরুজনের অবশ্যপ্রতিপাল্য

কর্ত্তব্যকর্ম্ম করিয়া দিয়াছে। যদি ভার্য্যা মনোনীত করিবার ক্ষমতা হিন্দুসমাজ তোমায় দিত, তুমি হয়ত অনেক স্থলে পিতার সুপুত্র হইয়া অপর জাতির পরমাসুন্দরী কন্যা পছন্দ করিয়া বিবাহ করিতে। হয়ত এক ব্রাহ্মণবালক এক কায়স্থকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া আপনাকে সার্থকজন্মা জ্ঞান করিত। সমাজের এই যথেচ্ছা-চারিতা নিবারণ করিবার জন্য ভার্য্যা মনোনীত করিবার ক্ষমতা তোমার শ্রেষ্ঠ-ধর্ম্ম তোমায় দেয় নাই, তৎপরিবর্ত্তে তোমার গুরুজনকে দিয়াছে।

এবিষয়ে তোমার অভিজ্ঞ বয়োজ্যেষ্ঠ পিতামাতা গুরুজন যেরূপ বিজ্ঞতার সহিত কাজ করিবেন, যে ব্যক্তি যৌবনমদে উন্মত্ত ও হট্‌কারিতা দোষে সদা বিপথে চালিত, সে ব্যক্তি কি তাহা দেখাইতে পারে? সে ব্যক্তি কেবল কন্যার সৌন্দর্য্যে ও বাহ্যচাকচিক্যে বিমোহিত হইবে। কিন্তু গুরুজনেরা পাত্রীর যেমন রূপ, তেমনি গুণও দেখিবেন, সেই সঙ্গে কুলমান সকলই দেখিবেন। তাঁহারা নানাদিক ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করিবেন। স্থলবিশেষে নিষ্ঠুর পিতা-মাতা অর্থের প্রলোভন পাইয়া কুৎসিৎ কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দেন বটে; তথাচ এ প্রথার নিন্দা করিও না। যাহাহউক, ভালরূপ অনুধাবন করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, এদেশের প্রথা হিন্দুসমাজের সম্পূর্ণ উপযোগী।

অন্যান্য দেশে বিবাহ দেবমন্দিরে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে এবং এতদুপলক্ষে তাদৃশ উৎসব দেখা যায় না। কিন্তু হিন্দুবিবাহ চিরদিন গৃহপ্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হইতেছে, এবং আমরাও এতদুপলক্ষে পাঁচজন বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনকে খাওয়াইয়া অশেষ পরিতোষ লাভ করি। যে নারীজাতি গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, যাঁহাদের গুণে ইহা আমাদের স্বর্গের নন্দনকানন এবং যাঁহারা এতদুপলক্ষে আমোদে

আত্মহারা হন, তাঁহাদের পরিতোষের জন্য এ মহোৎসব গৃহরূপ পবিত্র মন্দিরে চিরদিন সম্পন্ন হইতেছে।

বিবাহ মানবজীবনের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা। ইহার উপর দম্পতির ভবিষ্যৎ সুখদুঃখ অধিক পরিমাণে নির্ভর করে। এজন্য এ শুভকার্য্যে হিন্দুধর্ম্ম পিতৃলোকদিগের উদ্দেশে নান্দীমুখশ্রাদ্ধ করাইয়া উহাদের সন্তোষ বর্দ্ধন করায়, পবিত্র বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক বরকর্ত্তা ও ও কন্যাকর্ত্তা দ্বারা পাত্রপাত্রীর আদানপ্রদান করায় এবং সপ্তপদী গমন প্রভৃতি বিবিধ স্ত্রী-আচার সম্পাদন পূর্ব্বক সাধারণের চক্ষে বিবাহের প্রকৃত মর্য্যাদা ও গৌরব বর্দ্ধন করে। এ শুভকার্য্যে যে সকল পবিত্র মন্ত্র ব্যবহৃত হয় বা এতৎ সম্বন্ধে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে যে সকল বিভিন্ন আচার ব্যবহার প্রচলিত, তাহা এস্থলে উল্লেখ করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।

এস্থলে কেহ কেহ বলিবেন, বিবাহে অবোধ্য সংস্কৃত ভাষায় মন্ত্রোচ্চারণ করিবার কি প্রয়োজন? সহজ চলিত ভাষায় মন্ত্রপাঠ করিলে বা বিবাহিত জীবনের কর্ত্তব্যের উপর লেক্‌চার (Lecture) দিলে কি ভাল দেখায় না? বরকন্যা বা উহাদের বন্ধুবান্ধব যে মন্ত্রের ভাবার্থ বুঝিতে অক্ষম, সেই মন্ত্রগুলি শুকসারিকার ন্যায় উহাদিগকে পড়াইলে কি লাভ?

বিবাহে অবোধ্য মন্ত্রপাঠের উদ্দেশ্য সুমহৎ। যে মন্ত্র হউক না কেন, উহার ভাবার্থ যত গূঢ় থাকে, সাধারণের পক্ষে ততই মঙ্গল। অনেকস্থলে দেখা যায়, Ignorance is the bliss, অজ্ঞতাই মঙ্গলের কারণ। যেমন চিকিৎসাবিজ্ঞানে অজ্ঞতাই সাধারণের পক্ষে শ্রেয়স্কর; উহারা ঔষধের গুণাগুণ যত কম বুঝিবে, উহাদের পক্ষে ততই মঙ্গল; সেইরূপ মন্ত্রের ভাবার্থ লোকে যত না বুঝিবে, উহাদের পক্ষে ততই মঙ্গল; কারণ অজ্ঞতা মনে সরল বিশ্বাস আনয়ন করে। চলিত প্রাকৃত ভাষায় মন্ত্রোচ্চারণ করিলে কি বিবাহের যথার্থ মর্য্যাদা

রক্ষিত হইবে? যে বিবাহসংস্কার স্বর্গীয়, যাহা এখন লোকাচারে পবিত্রীকৃত, সে বিবাহ কি ছাগছাগীবিক্রয়ের ন্যায় চলিত ভাষায় সম্পন্ন হওয়া উচিত?

আরও দেখ, হিন্দুবিবাহ কি পাশ্চাত্য সমাজের বিবাহের ন্যায় সামান্য চুক্তিনামা, যে দম্পতিদ্বয়কে উহার সর্ত্তগুলি, কড়ারনামাগুলি ভালরূপ বুঝাইয়া দিতে হইবে? ইহাতে কি সভ্যদেশোচিত আইন-কানুনের কোনরূপ মারপ্যাঁচ বা দ্ব্যর্থ আছে, সেজন্য ইহার মন্ত্রগুলি ভালরূপ বুঝা উচিত? বেশ জানিবে, সমাজের অশেষ মঙ্গলের জন্যই বিবাহের মন্ত্রগুলি সংস্কৃত দেবভাষায় চিরদিন উচ্চারিত হইতেছে।

ধর্ম্মানুষ্ঠিত যে বিবাহসংস্কার এতকাল সমাজে প্রচলিত, যাহা এখন লোকাচারে পবিত্রীকৃত, সেই সংস্কারের নিকট দেশীয় রাজন্য-বর্গ চিরদিন নতশির ছিলেন, এবং উহার উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতেন না। কিন্তু যদি বিধর্ম্মী রাজতন্ত্র হিন্দুধর্ম্মের অননুমোদিত অন্য কোন প্রকার বিবাহপ্রথা সম্প্রদায়বিশেষে প্রবর্ত্তিত হইতে দেখে, সে স্থলে শাসনতন্ত্র তিন আইনের (Act. iii) ন্যায় কানুন-জারি করিতে বাধ্য হয় এবং তৎসম্পাদিত বিবাহসংস্কারকে নিজ আদালতে রেজিষ্টারী করিতে আদেশ দেয়।

শাস্ত্রে আটপ্রকার বিবাহপদ্ধতি দেখা যায়; যথা—

(১) ব্রাহ্ম।	(৫) আসুরী।
(২) আর্য্য।	(৬) রাক্ষস।
(৩) প্রাজাপত্য।	(৭) পৈশাচ।
(৪) দৈব।	(৮) গান্ধর্ব্ব।

হিন্দুসমাজের প্রথম অবস্থায় যখন ইহা নানা বিশৃঙ্খলতায় পূর্ণ ছিল, তখন ঐ সকল প্রথা দেশভেদে ও জাতিভেদে প্রবল হইয়াছিল। এখন কেবল প্রজাপত্য বিবাহ সর্ব্বত্র দেখা যায় এবং

অন্যান্য প্রথা সমাজের অনুপযুক্ত হওয়াতে সামাজিক নির্ব্বাচনে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

সেইরূপ পুরাকালে অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ সমাজে প্রচলিত ছিল। শ্রেষ্ঠ জাতির পুরুষবিশেষ নিকৃষ্ট জাতির কন্যা সহিত বা নিকৃষ্ট জাতির পুরুষবিশেষ শ্রেষ্ঠ জাতির কন্যার সহিত বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইত এবং স্বামীর অবর্ত্তমানে স্ত্রী দেবর দ্বারা সন্তান উৎপাদন করাইত। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য ঐ সকল প্রথা সমাজের প্রথম অবস্থায় স্বতঃ প্রাদুর্ভূত হয়। যাহা সমাজের অনাটন ও প্রয়োজনবশতঃ লোকাচারে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, শাস্ত্রকারেরা তাহাই নিজ নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এজন্য এখনও ঐ সকল পদ্ধতি তুমি নানাশাস্ত্রে দেখিতে পাও।

এখন হিন্দুসমাজ সর্ব্বত্র সুশৃঙ্খলতায় পূর্ণ। এই সর্ব্বজনীন সুশৃঙ্খলতা তিন সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া বিবাহাদি বিষয়ে অশেষ কড়াক্রান্তি বিচার করিতে করিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখন যাঁহারা পাশ্চাত্যসমাজের অসদনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়া ঐ সকল শাস্ত্রের বচন উদ্ধৃত করত অসবর্ণ বিবাহের অনুমোদন ও পোষকতা করেন, তাঁহাদের বিবেচনাশক্তি কিরূপ? তাঁহারা কি হিন্দুসমাজের সুশৃঙ্খলতা একেবারে ধ্বংস করিয়া ফেলিবেন না?

সমাজের যে অবস্থায় জাতিভেদপ্রথা সুপ্রণালীতে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তৎকালে অনুলোম প্রতিলোম বিবাহ চলিতেছিল। পরে সমাজে সুশৃঙ্খলতা স্থাপনের সঙ্গে উহারা রহিত হইয়া গিয়াছে। আবার যখন জাতিভেদপ্রথা উঠিয়া যাইতে আরম্ভ হইবে, তখন ঐ সকল প্রথা সমাজে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিবে। যতদিন ভারত পরাধীন থাকিবে, ততদিন জাতিধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য জাতিভেদ-প্রথা বজায় রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। সেজন্য ঐ সকল কুপ্রথা যাহাতে সমাজে প্রবেশ লাভ না করিতে পারে, সে বিষয়ে আমাদিগকে

বিশেষ মনোযোগী হইতে হইবে। আর যদি জাতিভেদ উঠাইয়া দিয়া সব একাকার করিতে চাও, স্বচ্ছন্দে অসবর্ণ বিবাহাদি দিতে থাক।

এখন যিনি অপর জাতির কন্যাকে বিবাহ করেন, তিনি সমাজ-চ্যুত ও জাতিচ্যুত হন। তাঁহাকে জাতিচ্যুত করিয়া শাসন করিবার কি কোনরূপ কারণ নাই? তিনি কি সাধারণ সমাজের চক্ষে পূজ্য কুলতিলক, না পাষণ্ড কুলাঙ্গার? একবার ভাব দেখি, তিনি কিরূপ সমাজদ্রোহী। যে জাতিভেদ দ্বারা আমরা এতকাল জাতিধর্ম্ম রক্ষা করিয়া আসিতেছি, সে প্রথার মস্তকে তিনি কি পদাঘাত করিতেছেন না? কালাপাহাড় উড়িষ্যা বিজয়ের পর জগন্নাথদেবকে পোড়াইয়া ভারতের ইতিহাসে নিজের মুখখানিও পোড়াইয়া গিয়াছেন। সেইরূপ যিনি এখন জাতিভেদ উঠাইতে চেষ্টা করিবেন, তিনিও প্রকৃত কুলাঙ্গার হইবেন। বিধর্ম্মী রাজার অনুগ্রহে তিনি বিদ্যা ও অর্থবলে যশস্বী হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার সে মানসম্ভ্রম অনর্থকর। তিনি ভারতমাতার অভিসম্পাতের যোগ্য।

পতিপত্নীনির্ব্বাচন প্রথা।
(Cortship)

সুসভ্য ইউরোপীয় সমাজে এই প্রথা বহুদিন হইতে বলবতী। তথায় পুত্রকন্যাগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মনোমত পাত্রী বা পাত্র অন্বেষণ করিয়া উদ্বাহসূত্রে আবদ্ধ হয় এবং চিরজীবন সুখে কাটায়। তথায় পিতামাতা উহাদের লালন পালন করেন, বিদ্যাশিক্ষার্থে বিস্তর ব্যয়ভূষণ করেন। কিন্তু উপযুক্ত পাত্রী বা পাত্রের সহিত বিবাহ দিয়া উহাদের সুখের পথ যে পরিষ্কার করিয়া দিবেন, তাহা তাঁহারা আদৌ কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ করেন না। তাঁহারা ভাবেন, ছেলেরা নিজের সুখের পথ নিজে খুঁজিয়া লইবে, আমরা কেন উহাতে হস্তক্ষেপ করিয়া দোষের ভাগী হইব?

আরও দেখ, যে সমাজে কন্যার অধিক বয়সে বিবাহসংস্কার

ঘটে, তথায় এ প্রথা স্বতঃ আইসে। পুরাকালে এদেশে ক্ষত্রিয়-সমাজে স্বয়ম্বরপ্রথা প্রচলিত ছিল। এই প্রথানুসারে বয়োজ্যেষ্ঠা ক্ষত্রিয়কন্যা নিজ পতি মনোনীত করিয়া লইতেন এবং মনোমত বর পাইয়া সুখে জীবন অতিবাহিত করিতেন।

আজকাল শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়ের ভিতর অনেকে ইউরোপীয় প্রথার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাঁহারা পাশ্চাত্য গুরুকুলে শিক্ষা পাইয়া পশ্চাত্য প্রথার স্বতঃ পক্ষপাতী হন এবং ইহাকে এদেশে চালাইতে পারিলে আপনাদিগকে সার্থকজন্মা জ্ঞান করেন। ওহে সুশিক্ষিত পাঠক! তুমি এস্থলে বলিতে পার, যাঁহাকে লইয়া তুমি আজীবন সংসারধর্ম্ম করিবে, যিনি তোমার অর্দ্ধাঙ্গিনী ও সহধর্ম্মিণী হইবেন, তাঁহাকে পূর্ব্বাহ্নে দেখিয়া শুনিয়া মনোনীত করিতে পারিবে না, তাঁহার কিরূপ মেজাজ ও প্রকৃতি, তাঁহার মনের কিরূপ ভাবগতি, তিনি কিরূপ শিক্ষিতা ও ধর্ম্মিষ্ঠা, এ সকল পরীক্ষা না করিয়া তুমি তাঁহার সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইবে ও সংসারসমুদ্রে ঝাঁপ দিবে, ইহা কি হিন্দুধর্ম্মের সুব্যবস্থা?

পাশ্চাত্য সমাজ প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজপত্নী মনোনীত করিবার ক্ষমতা দিয়াছে। বিবাহের পূর্ব্বে তিনি ভাবিপত্নীর স্বভাবাদি কেমন উত্তমরূপ পরীক্ষা করিয়া লন। তৎকালে তিনি ভাবি অর্দ্ধাঙ্গিনীর সহিত কেমন সুখে প্রেমালাপ করিতে থাকেন। উভয়েই কেমন প্রেমতরঙ্গে দুলিতে দুলিতে প্রেমসাগরে গা ভাসাইয়া দেন। কত মজা! কত হাসির ঘটা! কত প্রেম-পত্রিকা! তার কি কিছু দিশ্‌পিশ্‌ আছে! সমস্ত জীবনের মধ্যে এই তাঁহাদের সুখের সময়। এই সময়ে তাঁহারা প্রেমসাগরে ডুবু ডুবু হন। যদি সংসারে যথার্থ প্রেম থাকে, এই সময়ে তাঁহারা তাহার পূর্ণ আস্বাদ পান। আবার বিবাহের অব্যবহিত পরে তাঁহারা কেমন সুখে প্রেমলীলা করিতে করিতে মধুমাস (Honey moon) ভোগ করেন।

পাশ্চাত্য সমাজের সুখের কথা ভাবিলে যে সমাজ আমাদিগকে ঐ সকল স্বর্গীয় সুখ হইতে চিরবঞ্চিত করিতেছে, উহার উপর কি গালিবর্ষণ করিতে ইচ্ছা হয় না? হায়! সে সুখের দিন আমাদের ভাগ্যে কবে হবে, যে দিন বিবাহের পূর্ব্বে আমরাও মনোমত নারী লইয়া প্রেমসাগরে ভাস্‌তে ভাস্‌তে স্বর্গসুখ ভোগ করিব? রে নিষ্ঠুর হিন্দুসমাজ! তোরে শতধিক্!

এস্থলে অধিক আর কি বলিব? পাশ্চাত্য ফুলশয্যার তলদেশে কালসর্প লুকায়িত রহিয়াছে। ঐ দেখ, সেই কালসর্প মধ্যে মধ্যে উঁকি মারিতেছে, ফণা তুলিতেছে ও জিহ্বা লক্ লক্ করিতেছে। আর প্রাচ্য প্রস্তরশয্যায় উপর সুখচন্দ্রমা চিরদিন হাসিতেছে ও খেলিতেছে। ইহার জ্যোৎস্নায় পরিপ্লুত হইয়া আমরা চিরদিন সুধা পান করিতেছি।

প্রাচ্য সমাজে পিতামাতা পাত্রীপাত্র অন্বেষণ করিয়া বিবাহ দেন বলিয়া আমরা কি নিজ নিজ পত্নীর সহিত যৌবনকালে প্রেমতরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে স্বর্গসুখ ভোগ করি না? হিন্দুসমাজের প্রেমলীলা ও প্রেমবিহার পাশ্চাত্য সমাজ হইতে কি কোন অংশে ন্যূন? তাঁহাদের মধ্যে যেমন মজা ও হাসির ঘটা, আমাদের মধ্যেও চিরদিন সেইরূপ চলিতেছে। প্রভেদের মধ্যে আমরা অবাধে নারীজাতির সহিত মিশ্রিত হইতে পাই না। একমাত্র পরিণীতা ভার্য্যার সহিত আমাদের প্রেমলীলা, চলিতেছে, আর তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় ষোড়শসহস্র গোপিনী লইয়া দিবারাত্র মজা করেন।

এখন এস, পাশ্চাত্য সমাজের 'কালসর্প দেখাইতেছি। পতি-নির্ব্বাচনপ্রথার যে গুণগুলি থাকুক না কেন, ইহার দোষগুলি আমাদের চক্ষে জ্বল জ্বল করিতেছে.

<u>প্রথমতঃ</u>। পাশ্চাত্যজগতে পুরুষজাতি বল, স্ত্রীজাতি বল ইহার জন্য প্রত্যেককে সংসারের নানা ঝঞ্চাবাত সহ্য করিতে হয়।

কতবার নৈরাশ্যসাগরে নিমগ্ন হইবার পর পরীক্ষা করিতে করিতে তবে মনোমত বর বা কন্যা পাওয়া যায়! তথায় প্রথমোদিত প্রেম অনেক স্থলে নৈরাশ্যসাগরে কিরূপ নিমগ্ন হয় ও কত বাধাবিঘ্ন সহ্য করে। এক পুরুষ মনোমত হইল না, নারীও অন্যপুরুষের জন্য ধাবিতা হইলেন। এই প্রকারে তাঁহাদের জীবনের অধিকাংশ সময় কেবল পতিপত্নীনির্ব্বাচনে ব্যয়িত হয় এবং তাঁহারাও বিবাহিত জীবনের সুখভোগ করিতে পান না। পরে কষ্টে সৃষ্টে যদি তিনি একটী মনোভিমতা নারী পান, তাঁহাকে বিবাহ করেন। কিন্তু তাঁহার বিলাসবিভ্রম ও খামখেয়ালের জ্বালায় তাঁহাকে সারদিন সারা হইতে হয়। ইহা অপেক্ষা অবিবাহিত থাকাই শ্রেয়স্কর।

দ্বিতীয়তঃ। কুমারী কন্যা বয়ঃস্থা হইয়া পতিনির্ব্বাচনের জন্য পুরুষজাতির সহিত অবাধে মিশ্রিত হইলে তিনি অনেক স্থলে অক্ষতযোনি থাকেন না। সে দেশে নৃশংস কামপরায়ণ পুরুষজাতি কেবল অম্বল চাকিয়া বেড়ায়। অনেকেই বিবাহ করিয়া কেবল দইমাখান লুচি খান বা পরের উচ্ছিষ্ট ভোজন করেন। ইহাতে সমাজে সতীত্বধর্ম্মের বিস্তর বিপর্য্যয় হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলিবেন, বিবাহের পূর্ব্বে বরকন্যা যাহাতে আপনাদের দুরভিসন্ধি পূরণ না করিতে পারে, তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। এ উপায় কথায় শোভা পায়, কিন্তু কার্য্যকালে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া থাকে। কথায় বলে, গরু বাছুরে ভাব থাকিলে বনে বসিয়া দুধ দেয়।

তৃতীয়তঃ। বিবাহিতা হইবার পূর্ব্বে কন্যা সময়বিশেষে গর্ভবতী হইয়া জারজ সন্তান প্রসব করে। তথায় কত নৃশংস পুরুষ বিবাহের নামে কত কুমারীর পেটটী করিয়া ছাড়িয়া দেয়, তাহার কি ইয়ত্তা আছে? একবার ভাবিয়া দেখ, ইহা আমাদের চক্ষে কিরূপ বীভৎস, জঘন্য ও দোষাকর! কুমারী কন্যা হিন্দুর ঘরে গর্ভবতী হইলে কি ভয়ঙ্কর সর্ব্বনাশ!

গোপনে গর্ভপাত করাইবে, কন্যাকে কাটিয়া ফেলিবে বা গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিবে। লোকনিন্দায় ও লজ্জায় কোথাও মুখ দেখাইতে পারিবে না। কিন্তু ইউরোপীয় সমাজে সকলের ঘরে এইরূপ ঘটিতেছে বলিয়া ইহাতে কোনরূপ নিন্দাও নাই বা লজ্জাও নাই। তথায় এই প্রথাদ্বারা বৎসরে বৎসরে বহুসংখ্যক জারজ সন্তান ভূমিষ্ঠ হইতেছে এবং উহারা মাতাকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া নিরাশ্রয়া-বাসে (Foundling asylum) প্রতিপালিত হইতেছে। এ কারণ সে দেশে পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিলে অনেকে চটিয়া লাল হয়।

চতুর্থতঃ। স্থলবিশেষে পুরুষ স্ত্রীলোকের রূপলাবণ্যে বিমুগ্ধ হইয়া আন্তরিক গুণ উপেক্ষা করত উদ্বাহসূত্রে আবদ্ধ হয়। কিন্তু উত্তরকালে দুশ্চরিত্রা ভার্য্যার জ্বালাতনে অস্থির হইয়া আদালতের আশ্রয়ে বিবাহবন্ধন ছেদন করিতে বাধ্য হয়। ঈদৃশ অভিযোগ সে দেশের দৈনন্দিন ঘটনা। যাহাহউক, হিন্দুধর্ম্মের গুণে ঈদৃশ ঘটনা এদেশে আদপে শুনা যায় না, এমন কি একেবারে অসম্ভব।

পঞ্চমতঃ। স্থলবিশেষে অনেক অবলা সরলা কতিপয় ধূর্ত্ত, শঠ পুরুষ কর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়া অসৎ পথে নীত হয়, এমন কি অনন্যোপায় হইয়া নীচ গণিকাবৃত্তি অবলম্বন করে। এদেশে দুশ্চরিত্রা কুলটা বিধবা ঐ নীচবৃত্তি অবলম্বন করে; কিন্তু ইউরোপে অবিবাহিতা কুমারীরাই এই জঘন্য ব্যবসায় চালাইয়া থাকে।

ষষ্ঠতঃ। অনেকস্থলে বয়ঃস্থা কুমারীর বিবিধ খেয়াল ও বিলাস-বিভ্রমের জ্বালায় অস্থির হইয়া অনেক পুরুষ বিবাহসম্বন্ধ ছেদন করিতে বাধ্য হয়। ইহাতে কন্যা অনূঢ়া থাকিয়া যায়।

সপ্তমতঃ। কোন কোন কুমারী অনেক পুরুষের আস্বাদ পাইয়া অনূঢ়াবস্থায় থাকিতে ভালবাসে। সংসারে থাকিয়া সন্তান

উৎপাদন করিয়া উহার লালনপালন করা স্ত্রীলোকের কঠোর ব্রত, এই ভাবিয়া উহারা গলায় ঐ ফাঁস দিতে চাহে না।

অষ্টমতঃ। এ প্রথায় প্রতিযোগিতা অধিক পরিমাণে চলিয়া থাকে। সেজন্য সমাজের কুৎসিৎ ও দরিদ্রা কন্যাগুলির বিবাহ অনেক সময়ে দুর্ঘট হইয়া উঠে।

উপরোক্ত দোষগুলি দেখিয়া কোন্ নির্ব্বোধ এদেশে এ প্রথার পক্ষপাতী হইবে?

অপর পক্ষে শুনিতে পাই, এ প্রথা দ্বারা মনোমত বরকন্যার মিলন হওয়াতে অনেকে সুখে সংসারধর্ম্ম করে। যখন এ প্রথা পাশ্চাত্য জগতে এতকাল স্থায়ী, তখন নিশ্চয়ই ইহাদ্বারা ঐ সমাজ উপকৃত হইতেছে, এবং তথায় ইহা সামাজিক নির্ব্বাচনে প্রতিষ্ঠিত বলা উচিত। ইহার যতগুণ থাকুক না কেন, যতদিন হিন্দুসমাজ জাতিভেদ ও সতীত্বধর্ম্মের সমাদর করিবে, ততদিন এ সমাজ পাশ্চাত্য প্রথাকে ঘৃণাচক্ষে অবলোকন করিবে এবং কস্মিনকালে ইহার প্রশ্রয় দিবে না। এ সমাজ বিবাহের পূর্ব্বে বরকন্যাকে অবাধে প্রেমবিহার ও প্রেমালাপ করিতে দিবে না; পরন্তু নিতান্ত নাপার্য্যমাণে উহাদের একবার চাক্ষুষ মিলন ঘটাইতে পারে মাত্র।

পুরাকালে আর্য্যসমাজে ক্ষত্রিয় জাতির ভিতর পতিনির্ব্বাচনপ্রথা বা স্বয়ংবরপ্রথা প্রচলিত ছিল। তৎকালে অসূর্য্যম্পশ্যা রূপসী রাজকন্যা ক্ষত্রিয়জাতির শৌর্য্যবীর্য্যের পুরস্কারস্বরূপ বিবেচিত হইত। একারণ শ্রীরামচন্দ্র হরধনু ভগ্ন করিয়া জানকীরত্ন লাভ করেন এবং অর্জ্জুন লক্ষ্যভেদ করিয়া পঞ্চভ্রাতার জন্য দ্রৌপদীরত্ন লাভ করেন।

তৎকালে স্বয়ংবর সভার কি অপরূপ সৌন্দর্য্য ও শোভা ছিল! তথায় নানাদেশের রাজন্যবর্গ রমণীয় বেশভূষায় বিভূষিত হইয়া সমাগত হইতেন। রাজকন্যা স্বহস্তে বরমাল্য লইয়া সূতমুখে তাঁহাদের কীর্ত্তিকলাপ শ্রবণ করত মনোমত পরাক্রান্ত বরের গলায়

মাল্য প্রদান করিতেন। ইহাতে স্থলবিশেষে রাজায় রাজায় ঘোরতর যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত হইত এবং শৌর্য্যবীর্য্যের আদর বাড়িত। স্বয়ংবরপ্রথার সহিত পাশ্চাত্য প্রথার তুলনা করিলে কি বোধ হয়, বল দেখি? আমরা বলি "চন্দ্রসূর্য্য হদ্ব্যকল্পে, জোনাকির পোঁদে বাতি।"

পুরাকালে ক্ষত্রিয়জাতির ভিতর কন্যাহরণ বড় সুখ্যাতির কাজ ছিল। এজন্য আদর্শমানব শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিনী প্রভৃতি রাজকুমারিগণকে হরণ করিয়া বিবাহ করেন এবং রাজন্যবর্গকে প্রোৎসাহিত করিয়া যান। পরে ইহাদ্বারা হিন্দুসমাজের অনিষ্টোৎপত্তি হওয়াতে কালে ইহা স্বতঃরহিত হইয়া গিয়াছে।

বেশ জানিবে, স্বয়ংবর ও কন্যাহরণ এই দুই প্রথাদ্বারা ক্ষত্রিয়-জাতির শৌর্য্যবীর্য্য সম্যক অনুশীলিত ও আদৃত হইত। আজ কন্যাহরণ দণ্ডবিধি অনুসারে রাজদণ্ডনীয় ঘোরতর অপরাধ; কিন্তু পুরাকালে ক্ষত্রিয়জাতির চক্ষে রাজ্যলাভ ও রাজকুমারীলাভ তুল্য-মূল্য ছিল।

ভারতে মুসলমানসাম্রাজ্য স্থাপনের সঙ্গে যখন ক্ষত্রিয়জাতি রাজশক্তি হারাইয়া বসে, তখন স্বয়ংবর প্রথাদ্বারা হিন্দুসমাজের ঘোর অনিষ্টোৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া ইহা রহিত হইয়া যায়। পূর্ব্বে শক, হুন প্রভৃতি যে সকল পৌত্তলিক জাতি ভারতে প্রবেশ করিয়া নিজ নিজ রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, সকলেই এই প্রথা দ্বারা ক্ষত্রিয়কন্যা বিবাহ করিয়া হিন্দুসমাজভুক্ত হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের বংশধরেরাই এখন রাজপুত নামে খ্যাত। কিন্তু মুসলমানযুগে জিতজাতিকে বিধর্ম্মী জেতৃজাতি হইতে সম্পূর্ণ-রূপে পৃথক রাখিবার জন্য এ প্রথা স্বতঃ রহিত হইয়া যায়। যাহা স্বাধীন ভারতে প্রচলিত ছিল, তাহা পরাধীন ভারতের অনুপযুক্ত হওয়াতে কালে লোপ পাইয়াছে।

স্বয়ংবর প্রথাদ্বারা ক্ষত্রিয়জাতির অশেষ মঙ্গল সাধিত হইলেও আমরা চিরদিন এ প্রথাকে অন্তরের সহিত অভিশপ্ত করিব। সকলেই ইতিহাসে পাঠ করেন, কনৌজাধিপতি জয়চন্দ্র স্বশত্রু দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজের প্রতিমূর্ত্তি নিজ সিংহদ্বারে দ্বারবানরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন; তদীয় অবিমৃশ্যকারিণী কন্যা সংযুক্তা স্বয়ংবর কালে পিতৃশত্রু পৃথ্বীরাজের প্রতিমূর্ত্তির কণ্ঠদেশে বরমাল্য অর্পণ করিয়াছিলেন। ইহাতে জয়চন্দ্র মর্ম্মাহত হইয়া স্বশত্রুদমনার্থ মহম্মদঘোরীকে ভারতে আহ্বান করেন এবং টিরোরীর যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ হত হন। এই প্রকারে যে প্রথার কুফল বশতঃ ভারত যবনমুখে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, উহাকে দুঃখিনী ভারতমাতা চিরদিন অভিশপ্ত করিবে।

আজকাল শিক্ষিত সম্প্রদায় পাশ্চাত্য প্রথার পক্ষপাতী বটে; কিন্তু তাঁহারা চন্দনতরুভ্রমে দুর্ব্বিপাক বিষবৃক্ষ আশ্রয় করিতে যাইতেছেন। তাঁহারা পাশ্চাত্য সমাজের বাহ্য চাকচিক্য দর্শনে বিমোহিত। ইহার পূতিগন্ধ এখনও তাঁহাদের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করে নাই। যখন প্রবেশ করিবে, তখন তাঁহারা ত্রাহি মধুসূদন ডাক ছাড়িবেন। পাশ্চাত্য সমাজ বিভিন্ন আদর্শে গঠিত; তথায় জাতিভেদপ্রথা নাই এবং নারীজাতির সতীত্ব ধর্ম্মের কিছুমাত্র আদর নাই। তথায় সকলেই অবাধপ্রেমবিহারের পক্ষপাতী। সে দেশে পতিনির্ব্বাচনপ্রথা চিরদিন বলবতী থাকিবে এবং প্রতিযোগিতা সকল বিষয়ের ন্যায় বিবাহকেও চিরদিন অনুশাসিত করিবে। সে দেশে যে সকল প্রথা উদ্ভূত, তাহা সেই দেশের উপযুক্ত, কিন্তু এ দেশের অনুপযুক্ত। এই বিলাতি কলম এদেশে রোপন করিলে কালে বিষময় ফল উৎপাদন করিবে।

বাল্যবিবাহ।

সকলেই জানেন, বাল্যবিবাহ অশেষ দোষাকর। আমরা যে ক্রমশঃ নিবীর্য্য হইতেছি, ইহার প্রধান কারণ এই বাল্যবিবাহ।

কি নারী, কি পুরুষ, কাহারও বাল্যবিবাহ করা উচিত নয়। শিক্ষিত সম্প্রদায় ইহার দোষগুলি ভালরূপ দেখিতে পাইতেছেন। কিন্তু ইহার যে কোন গুণ আছে, তাহা তাঁহারা দেখিয়াও দেখেন না। সেজন্য এস্থলে ইহার গুণাগুণ বিচারে প্রবৃত্ত হইলাম।

এ কুপ্রথা ভারতে কিপ্রকারে উত্থিত হইল? হিন্দুসমাজ জাতি-ভেদ, স্ত্রীজাতির সতীত্বধর্ম্ম ও পারিবারিক সংস্থান পূর্ণভাবে বজায় রাখিবার জন্য পুত্রকন্যার বিবাহ পিতামাতাগুরুজনের অবশ্যপ্রতি-পাল্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া দিয়াছে। তাঁহারাও পুত্রকন্যার বয়সেরদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া সুবিধামত উহাদিগকে উদ্বাহসূত্রে আবদ্ধ করিতে পরিলেই আপনাদিগকে সার্থকজন্মা জ্ঞান করেন।

এ দেশে পুত্রকন্যার বিবাহ পিতামাতার একটী মহৎ দায়িত্ব। এই গুরুতর দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য সকলেই সমভাবে ব্যগ্র হন। আবার গ্রীষ্মাতিশয্যবশতঃ প্রকৃতি স্বয়ং এদেশে অপেক্ষা-কৃত অল্পবয়সে নারীজাতির রজোধর্ম্ম সংস্থাপন পূর্ব্বক লোককে অপত্যোৎপাদনে প্রণোদিত করে। এই দুই কারণে বাল্যবিবাহ হিন্দুসমাজে ক্রমশঃ প্রবল হইয়াছে।

যেরূপে এ প্রথা সমাজে প্রবিষ্ট হউক না, যখন দেখি, কোন এক জাতির ভিতর পঞ্চমবর্ষীয় বালকের সহিত দুগ্ধপোষ্য বালিকার বিবাহ হইতেছে, তখন সমাজকে শত ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হয়। যাহাদের কিছুমাত্র জ্ঞানোদয় হয় নাই, এমন অপোগণ্ড শিশুদের বিবাহোৎসব করাইয়া নির্ব্বোধ পিতামাতা পাঁচজন আত্মীয়স্বজন লইয়া আমোদপ্রমোদ করে এবং উহাদের মাথাটী খায়। এরূপ স্থলে যদি কন্যা বৈধব্য দশায় পতিত হয়, অপরাধী পিতামাতা আপনাদের দুরদৃষ্টের দোষ দিবে, কিন্তু বুদ্ধির দোষ দিবে না। এরূপ বিবাহ বাল্যবিবাহের চরম বিকৃতি। যাহা হউক, পাশ্চাত্য

শিক্ষাবিস্তৃতির সঙ্গে এরূপ বিবাহ সমাজে ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে।

পুরাকালে আর্য্যসমাজে পুরুষজাতির বাল্যবিবাহ কোথাও প্রচলিত ছিল না।

ত্রিংশদ্বর্ষো বহেৎকন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীং
ত্র্যষ্ট বর্ষোঽষ্টবর্ষাং বা ধর্ম্মেসীদতি সত্বরঃ।

(মনুস্মৃতি)

"ত্রিশবৎসরের পুরুষ মধুরদর্শনা দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করিবে। চব্বিশ বৎসরের পুরুষ অষ্টমবর্ষীয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করিবে। যদি গৃহস্থাশ্রমের ক্ষতি হয়, তৎপূর্ব্বে বা অধিক সত্বর বিবাহও যুক্তিসঙ্গত।" ইহাতে বোধ হইতেছে, পুরাকালে পুরুষজাতির বিবাহ অধিক বয়সে ও স্ত্রীজাতির বিবাহ তদপেক্ষা অল্পবয়সে বা প্রথম ঋতুবতী হইবার পূর্ব্বে সম্পাদিত হইত। কিন্তু কালক্রমে প্রত্যেক জাতির অনাটন ও প্রয়োজন অনুসারে উপরোক্ত সাধারণ নিয়মের বিস্তর ব্যত্যয় ঘটিয়া গিয়াছে।

ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্রজাতির ভিতর পুরুষদিগের বিবাহ আরও অল্পবয়সে এবং ক্ষত্রিয়জাতির ভিতর কন্যাদিগের বিবাহ আরও অধিক বয়সে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। যেখানে যেমনটী আবশ্যক, সেখানে তাহাই সামাজিক নির্ব্বাচনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখনও পূর্ব্ববঙ্গে দেখা যায়, দরিদ্র কুলীন ব্রাহ্মণদিগের ভিতর কন্যাগণ অধিক বয়স পর্য্যন্ত অনূঢ়া থাকে, এমন কি, কোন কোন স্থলে সমস্ত জীবনে উহাদের বিবাহ সংঘটিত হয় না।

বাল্যবিবাহের গুণাগুণ সম্বন্ধে অনেকে বলেন, যে সকল কারণে হিন্দুপরিবার অশেষ সুখের আলয়, যদ্দ্বারা আমাদের সুখসম্ভার এত বর্দ্ধিত হইয়াছে, তন্মধ্যে স্ত্রীজাতির বাল্যবিবাহ একটী অন্যতম কারণ। আমাদের শিক্ষিত বান্ধবেরা একথা শ্রবণে আমাদের

উপর বিশেষ নারাজ হইবেন; কিন্তু যদি তাঁহারা ভালরূপ বিবেচনা করিয়া দেখেন, তাঁহাদের স্পষ্ট প্রতীতি হইবে, এ প্রথার দোষ যেমন অনেক, ইহার গুণও অনেক। যদি ইহার কিছুমাত্র গুণ না থাকিত, ইহা কদাচ এতকাল সমাজে স্থায়ী হইতে পারিত না। যদি ইহাদ্বারা কেবল সমাজের অনিষ্টোৎপত্তি হইত, ইহা কালে স্বতঃ লুপ্ত হইয়া যাইত।

এ প্রথার মহৎগুণ—

(১) অল্পবয়স্কা বিবাহিতা কন্যা শ্বশুরকুলোচিত ধর্ম্মাধর্ম্ম ও আচারব্যবহার ভালরূপ শিক্ষা করিবার যথেষ্ট অবসর পায়।

(২) সমাজে সতীত্বধর্ম্মের কোনরূপ বিপর্য্যয় ঘটে না।

(৩) স্বামীর প্রতি নারীর প্রথমোদিত প্রেম অবাধে ও অপ্রতিহতবেগে পতিত হয় এবং দৈববাধা না ঘটিলে কদাচ নৈরাশ্য সাগরে নিমগ্ন হয় না।

এ প্রথার মহৎ দোষ। যথা :—

(১) সম্পূর্ণ অঙ্গ পুষ্টি হইবার পূর্ব্বে নারী সন্তান প্রসব করিলে, সে সন্তান প্রায়ই রুগ্ন ও নিবীর্য্য হইয়া থাকে।

(২) অল্পবয়সে সন্তান প্রসব করিলে মাতার অঙ্গপুষ্টির বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মে; তিনি প্রায় দুর্ব্বল ও কৃশ হইয়া থাকেন।

(৩) সমাজে রুগ্ন সন্তান উৎপন্ন হইলে জাতীয় অধঃপতনের পথ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হয়।

মানবসমাজের পদ্ধতি অনুসারে নারী বাল্যাবস্থায় পিত্রালয়ে পালিতা ও শিক্ষিতা হন, পরে বিবাহিতা হইয়া শ্বশুরালয়ে গিয়া নানাবিধ নূতন কর্ত্তব্যপাশে আবদ্ধা হন। এই সকল বিবিধ কর্ত্তব্য কর্ম্ম শিক্ষা করিবার জন্য উহাকে অবসর প্রদান করা উচিত; যে বয়সে উহার মন বিবিধ সংস্কার পাইবার জন্য উন্মুক্ত থাকে, সেই

বয়সে উহার বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য। বাল্যাবস্থায় মনের ভাব যেদিকে ধাবিত হইবে, আজীবন ইহা সেইদিকে চালিত হইবে।

Just as sapling is bent, the tree is inclined. অতএব এমন বয়সে কন্যার বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য, যে বয়সে সে কন্যা শ্বশুর বাড়ীর কুলোচিত ধর্ম্ম ও গৃহস্থের যাবতীয় কর্ম্ম ভালরূপ শিক্ষা করিতে পারিবে। যে বয়সে ঐ সকল নবোত্থিত সংস্কার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইলে উহারা আজীবন স্থায়ী হইবে, সেই বয়সেই কন্যাবিবাহের প্রশস্ত সময়।

পিত্রালয়ে বালিকার মনে যে সকল সংস্কার বদ্ধমূল হইতে ছিল, শ্বশুরালয়ে গিয়া সে সকল সংস্কার উহাকে অনেক সময় পরিহার করিতে হয়। দরিদ্রের কন্যা ধনবানের গৃহে বা ধনবানের কন্যা দরিদ্রের গৃহে পতিতা হইলে, উহাকে কত নূতন নূতন ধর্ম্ম ও কর্ম্ম শিক্ষা করিতে হয়। সেস্থলে বাল্যাবস্থায় বিবাহ দিলে কন্যা শ্বশুরকুলোচিত ধর্ম্ম ও কর্ম্ম সহজে শিক্ষা করিবে। একারণ বাল্যবিবাহ স্ত্রীসমাজে প্রবল। অপর পক্ষে অধিক বয়সে বিবাহ দিলে কন্যা শ্বশুরালয়ে সমীকৃত হইয়া কুলোচিত ধর্ম্ম ও কর্ম্ম ভালরূপ শিক্ষা করিতে পারিবে না। তাহার মন সর্ব্বদা পিত্রালয়ে ধাবিত হইবে এবং ভ্রাতাভগিনীর উপর অধিক আসক্ত থাকিবে। অতএব অল্প বয়সেই উহার বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য।

এস্থলে আমাদের সুশিক্ষিত বান্ধবগণ বলিবেন, বাল্যাবস্থায় যে সময়ে বিবাহিত জীবনের দায়িত্বজ্ঞান বা কর্ত্তব্যজ্ঞান জন্মে না, যে বয়সে কন্যা খাইতে ও পরিতে শিখে না, যে বয়সে দাম্পত্য-প্রেম কাহাকে বলে, তাহাই বুঝেনা, সে বয়সে এমন ধাষ্টমী করিবার কি প্রয়োজন? এ সকল কি ধর্ম্মের অনাচার নয়? বলি, যে ধর্ম্ম নারীকে স্বামীর সহধর্ম্মিণী করিয়া চিরদিন ধর্ম্মচর্য্যায় মনোনিবেশ করায়, সে ধর্ম্ম কি উহাকে দাম্পত্য প্রেম শিখাইবে, না শ্বশুরালয়ের

ধর্ম্মকর্ম্ম অগ্রে শিখাইবে? এখন বুঝিয়া দেখ, অষ্টমবর্ষে গৌরীদান বলাতে ধর্ম্মের কি মহৎ উদ্দেশ্য?

হিন্দুসমাজের পারিবারিক গঠনপদ্ধতি যেরূপ, তাহাতে নারী-বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে পুত্রবধূস্বরূপ স্বামীর পিতামাতা ও অন্যান্য পরিজনবর্গের সেবায় নিযুক্ত হন। স্বামীর প্রতি পত্নীভাবে ও ও পুত্রগণের প্রতি মাতৃভাবে তাঁহার যে সকল কর্ত্তব্যকর্ম্ম, তাহা তিনি সকল দেশেই প্রীতির সহিত, আগ্রহের সহিত পালন করিতেছেন। কিন্তু হিন্দুসমাজ স্বামীর আত্মীয়স্বজনের প্রতি যথোচিত সদ্ব্যবহার করিতে আদেশ দিতেছে। শ্বশ্রূমাতাঠাকুরাণীকে স্নেহময়ী মাতা ও ও ননদিনীকে স্নেহের পুত্তলী ভগিনী জ্ঞান করিতে হইবে, বাঘিনীর সমান ভাবিলে চলিবে না। শ্বশুরালয়ে গিয়া এ সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম শিক্ষা করা একান্ত আবশ্যক।

অতএব বলা উচিত, যে স্বার্থপর সমাজে পারিবারিক সম্বন্ধ অতীব শিথিল এবং স্বামী ও পুত্রকন্যা ব্যতীত অন্য কাহারও সহিত নারীর কিছুমাত্র ঘনিষ্ঠতা নাই, সে সমাজে কন্যা যৌবন প্রাপ্ত হইয়া বিবাহিতা হইলে, উহার তাদৃশ অমঙ্গল নাই। কিন্তু যে সমাজে পারিবারিক একান্নপদ্ধতি থাকাতে নারীকে শ্বশুরালয়ে স্বামী ও পুত্রকন্যা ব্যতীত অন্যান্য পরিজনবর্গকে যথোচিত স্নেহভরে দেখিতে হইবে ও ভক্তিভাবে উহাদের সেবা করিতে হইবে, সে সমাজে শ্বশুর কুলোচিত শিক্ষা পাইবার জন্য উহার অপ্রাপ্তবয়সে বিবাহ দেওয়া শ্রেয়। এ কারণ শাস্ত্রের লিখন অষ্টম বর্ষে গৌরীদান।

হিন্দুসমাজ চিরদিন সতীত্ব ধর্ম্মের সম্যক সমাদর করে এবং নারীজাতির সতীত্বধর্ম্ম পূর্ণাংশে বজায় রাখিবার জন্য উহাদের বিবাহ যৌবনারম্ভের পূর্ব্বে সম্পাদন করায়। এ বিষয়ে ধর্ম্মের আদেশ অতীব কঠোর। যাহার গৃহে বিবাহের পূর্ব্বে কুমারী কন্যার রজঃস্বলা হইবে, উহার চতুর্দ্দশ পুরুষ সেই রক্ত পান করিয়া নিরয়গামী হইবে।

বস্তুতঃ রজঃস্বলা হইয়া কুমারী কন্যা পিতৃগৃহে থাকিলে সমাজে সতীত্বধর্ম্মের বিপর্য্যয় ঘটিবে, ভ্রূণহত্যা হইবে, বর্ণশঙ্কর উৎপন্ন হইবে ও জারজ সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবে। এ কারণ হিন্দুধর্ম্ম খড়্গহস্ত হইয়া কন্যার বিবাহ রজঃস্বলা হইবার পূর্ব্বে সম্পাদন করাইতেছে। এ কারণ প্রবল প্রতাপান্বিত ইংরাজরাজ সহবাসবিষয়ক সম্মতি আইন (Consent act) পাস করিয়াও হিন্দুসমাজের বাল্যবিবাহ সম্যক রোধ করিতে পারিলেন না। যতদিন সমাজে সতীত্বধর্ম্মের সমাদর থাকিবে, ততদিন এ দেশে রজঃস্বলা হইবার পূর্ব্বে কন্যার বিবাহ হইবে।

ইউরোপীয় সমাজে ইহার বিপরীত ভাব দৃষ্ট হয়। তথায় নারীজাতির ভিতর সতীত্বধর্ম্মের আদৌ আদর নাই। তথায় কোন স্ত্রীলোকের এমন জ্ঞান নাই, যে ব্যভিচারে ধর্ম্মনাশ হইবে। তথায় অনেকে গিলিত চর্ব্বণের ন্যায় ক্ষতযোনি কন্যার বিবাহ দোষাবহ জ্ঞান করে না এবং যৌবনকালে প্রেমোন্মত্ত হইয়া নারীজাতির সহিত অবাধে ও স্বাধীনভাবে প্রেমবিহার করিতে ভালবাসে। তথায় কি প্রকারে উহাদের বাল্যবিবাহ চলিতে পারে? সে দেশ এখন জ্ঞানালোকে, বিজ্ঞানালোকে ও সভ্যতালোকে উদ্ভাসিত; সে দেশ কেন অর্দ্ধসভ্য ভারতের ন্যায় ঈর্ষ্যাজনিত সতীত্বধর্ম্মের আদর করিবে? সে দেশ ইহাকে বিতাড়িত করিয়া সকলকে প্রেমসাগরে ডুবাইয়া মজা দেখাইবে।

বাল্যবিবাহের আর একটী মহৎগুণ এই যে, যৌবনারম্ভে বিবাহিতা নারীর নবোদিত প্রেম স্বামীর প্রতি অপ্রতিহতবেগে পতিত হয়। তাদৃশ অনন্যপ্রেম ও ভালবাসা এজগতে অতিদুর্ল্লভ। দৈব বাধা বা বিঘ্ন না ঘটিলে ইহা কদাচ নৈরাশ্যসাগরে নিমগ্ন হয় না। ইহা আজীবন এক অবিরাম স্রোতে বহমান হয় এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই অকৃত্রিম ভালবাসার নিকট যাহা অতীব কুৎসিৎ, তাহাও কমনীয় কান্তিতে পরিণত হয়। স্বামী

অতীব কুৎসিৎ হইলেও, তিনি ভার্য্যার পরমারাধ্য দেবতা এবং ভার্য্যা কুরূপা হইলে তিনি স্বামীর গৃহলক্ষ্মী ও তদীয় নয়নের রসাঞ্জনস্বরূপা। স্বামী বা পত্নী যেরূপ হউন না কেন, তাঁহাকে লইয়াই তোমাকে চিরদিন সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। তোমার ভাগ্যের লিখন যেরূপ, তেমার অদৃষ্টে তদনুরূপ স্ত্রীরত্ন বা স্বামীরত্ন মিলিবে। তুমিও তাঁহাকে লইয়া চিরদিন সন্তুষ্ট থাকিবে এবং তাঁহার প্রতি আন্তরিক অকপট ভালবাসা দেখাইয়া সর্ব্বসুখে সুখী হইবে।

অপর পক্ষে পাশ্চাত্যসমাজে বিপরীতভাব দৃষ্ট হয়। তথায় বিবাহের জন্য অবলা সরলাকে কত বেগ পাইতে হয় ও সংসারের কত ঝঞ্ঝাবাত অতিক্রম করিতে হয়। কতবার নৈরাশ হইবার পর ঢুঁড়িতে ঢুঁড়িতে তবে মনোমত বর মিলিবে। কত জায়গায় তাহার নয়নের কটাক্ষবাণ, রূপলাবণ্য ও প্রেমালাপ নৃশংস পুরুষের মন আকর্ষণ করিতে না পারিয়া ব্যর্থ হইবে। অনেকস্থলে তাহার প্রথমোদিত প্রেম নৈরাশ্যসাগরে নিমগ্ন হইয়া যাইবে এবং তাহাকে আজীবন দুঃখিনী করিবে। এখন বুঝিয়া দেখ, এ দেশের স্ত্রীজাতির বাল্যবিবাহ সমাজের কিরূপ মঙ্গলদায়ক।

এরূপ বিবাহ হিন্দুসমাজের নানাদিকে মঙ্গলদায়ক হইলেও ইহাতে ঘোর অনিষ্টোপৎত্তি হইতেছে। সত্য বটে, এই গ্রীষ্মপ্রধান-দেশে প্রকৃতি কন্যার অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ-বর্ষ বয়সে ঋতু স্থাপন করিয়া উহাকে অপত্যোৎপাদনে সমর্থা করে, তথাচ অল্প বয়সে সন্তান উৎপাদন করিয়া উহাকে স্তনদুগ্ধ পান করাইতে করাইতে শরীরের যে অবসাদজনক ক্ষয় দেখা দেয়, তাহাতে উহার শরীরের বৃদ্ধি বিষয়ে বিস্তর ব্যাঘাত উপস্থিত হয়, ইহা স্বভাবতঃ দুর্ব্বল ও কৃশ হইয়া পড়ে এবং অজীর্ণাদি নানা রোগে আক্রান্ত হয়। ইহার উপর স্বামীর নানা অত্যাচার; ছাড়ান ছোড়ান নাই, আবার গর্ভ ও সন্তান প্রসব। চারি পাঁচটী

প্রসব করিয়াই তিনি ইহসংসার হইতে চিরবিদায় লইয়া যান এবং স্বর্গে গিয়া বিশ্রামসুখভোগ করেন। তবে দেখ, অল্প বয়সে বিবাহ দিবার কি কুফল! যদি সমাজস্থ অধিকাংশ স্ত্রীলোকের এইরূপ দুরাবস্থা ঘটিতে থাকে, সে সমাজ কি অচিরে জাঁহান্নমে যাইবে না?

যে বাল্যবিবাহ দ্বারা শরীরের এত অপকার, সে প্রথা কস্মিনকালে ক্ষত্রিয়সমাজে প্রবর্ত্তিত হয় নাই। ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্রজাতির ভিতর এ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে তাদৃশ অমঙ্গল নাই, কারণ ঐ সকল জাতি শারীরিক বলবীর্যের অনুশীলন করিত না। কিন্তু যে ক্ষত্রিয়জাতি পুরুষানুক্রমে শৌর্যবীর্য্যের অনুশীলন করিয়া দেশ রক্ষা করিতেন, তাঁহাদের ভিতর এ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে সমাজের ঘোর অনিষ্টোৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা; এজন্য এ প্রথা তাঁহাদের ভিতর আদৌ প্রবর্ত্তিত হয় নাই। যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিতে ও যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতেই তাঁহাদের জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত। তাঁহারাও সুবিধামত সমরক্ষেত্র হইতে অবসর লইয়া বয়োজ্যেষ্ঠা কন্যার পাণিগ্রহণ করত স্ববংশ রক্ষা করিতেন। ক্ষত্রিয়সমাজে বাল্যবিবাহ প্রবর্ত্তিত না হওয়াই প্রকৃতিসিদ্ধ।

প্রকৃতিজগতে দেখা যায়, যে বৃক্ষ ফলোৎপাদন করিতে আরম্ভ করে, উহার বৃদ্ধি স্থগিত হইয়া যায়, উহা অনেকস্থলে মর্কটরূপ ধারণ করে। কলমী আম্রবৃক্ষ অল্পসময়ে ফলোৎপাদন করে বলিয়া উহার তাদৃশ বৃদ্ধি নাই। সেইরূপ যে নারী অল্পবয়সে অপত্যোৎপাদন করিতে আরম্ভ করে, উহারও শরীরের ভালরূপ অঙ্গপুষ্টি হয় না এবং ইহা কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। অতএব প্রকৃতি যদি অল্পবয়সে উহার ঋতু স্থাপন পূর্ব্বক অপত্যোৎপাদনে প্রণোদিত করিয়া আমাদিগকে বিপথে লইয়া যায়, আমরা কেন সেরূপস্থলে প্রকৃতির আদেশপালন করিব? ইহাতে শিক্ষিত সম্প্রদায় সিদ্ধান্ত

করেন, দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ বর্ষে কন্যা ঋতুবতী হইলেও তাহার বিবাহ সপ্তদশ বা অষ্টাদশ বর্ষে দেওয়া কর্ত্তব্য।

পুরুষজাতির বাল্যবিবাহ অশেষ দোষাকর। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত, বীজ পরিপক্ক না হইতে হইতে তদ্দ্বারা সন্তান উৎপাদিত হইলে, সে সন্তান সচরাচর দুর্ব্বল ও রুগ্ন শরীর লইয়া ভূমিষ্ট হয় এবং আজীবন দুর্ব্বল থাকে অথবা অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়া অপরাধী পিতামাতাকে শোকসাগরে ভাসাইয়া যায়। ইহাতে জাতীয় অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী।

সকলেই জানেন, কৈশোরে শুক্র মানবদেহে আবির্ভূত হইলেও ইহা নিতান্ত অপরিপক্কাবস্থায় থাকে। তৎকালে ইহা দ্বারা সন্তান উৎপাদিত হইলে, সে সন্তান প্রায়ই নিবীর্য্য ও নিস্তেজ হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ এই বয়সে শুক্রের অপব্যবহার হইলে শরীরের বিস্তর ক্ষতি জন্মে। ইহা ক্রমশঃ নিবীর্য্য ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে এবং ইহার বৃদ্ধি বিষয়ে বিস্তর ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। ষোড়শ বর্ষীয় বালকের সহিত দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকার বিবাহ দিলে সে বালক পাকতাড়া মারিয়া যায় এবং চল্লিশ বৎসরের উর্দ্ধ জীবিত থাকে না। একবিংশতি বর্ষ অতীত না হইলে শুক্র পরিপক্কতা লাভ করে না। অতএব চতুর্বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমের পুর্ব্বে পুরুষজাতির বিবাহ অসঙ্গত।

পঠদ্দশায় হিন্দুযুবকদিগের বিবাহ দেওয়া অনুচিত। ইহাতে বিদ্যাশিক্ষার বিস্তর ব্যাঘাত জন্মে। এ দেশের চিরন্তন প্রথা ছাত্রজীবনে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করা শ্রেয়। এ বয়সে যাঁহারা রমণস্বাদ পান না, তাঁহারা নানাবিদ্যায় পণ্ডিত হন। এ বয়সে রেতস্খলন যতই অল্প হইবে, মস্তিষ্কের স্মরণশক্তি ততই বৃদ্ধি পাইবে। বাল্যস্বভাবসুলভ চপলতা বা কুসংসর্গবশতঃ যাহারা রেতস্খলন করে, উহাদের শরীর ও মনের নানাবিধ অপকার জন্মে। ইহাতে শরীর

যেমন কৃশ, নিস্তেজ ও স্ফূর্ত্তিশূন্য হয়, মন ও সেইরূপ দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে। দিবারাত্র অধ্যয়ন অসহ্য হয়, স্মৃতিশক্তি মন্দীভূত হয়, স্নায়বীয় দৌর্ব্বল্য দেখা দেয়। এ বয়সে যে পিতা-মাতা মেধাবী পুত্রের বিবাহ দিবেন, তাঁহারা তাঁহার মাথাটী খাইয়া বসিবেন। আর যদি গুণধর পুত্র অসৎপথে অগ্রসর হয়, তবে বিবাহ দিয়া উহাকে সৎপথে রাখিতে চেষ্টা পাইবে।

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতর অনেকের ধারণা, আমরা যে ক্রমশঃ এত ক্ষীণবীর্য্য ও অল্পায়ু হইতেছি, সূতিকাগারে যে এত বহুসংখ্যক শিশু নষ্ট হইতেছে বা শৈশবে নানাবিধ উৎকট পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, ইহার একমাত্র কারণ অশেষ দোষাকর বাল্যবিবাহ। তাঁহাদের বিশ্বাস, এ কুপ্রথা রহিত হইলেই আমাদের ভবিষ্য বংশধরেরা কালক্রমে বলিষ্ঠ জাতিতে পরিণত হইবে। কিন্তু পূর্ব্বাপর ভালরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয়, বাল্যবিবাহ ইহার প্রধান কারণ নহে। পূর্ব্বে সমাজে এ প্রথা অধিক পরিমাণে প্রচলিত ছিল, কিন্তু জনসাধারণ এত ক্ষীণবীর্য্য হয় নাই। ক্ষত্রিয়সমাজে এ প্রথা কখনও প্রবর্ত্তিত হয় নাই; অথচ উহারাও অধঃপতিত হইয়া রাজশক্তি হারাইয়া বসিল। ইহাতে বুঝা উচিত, দেশের নির্বীর্য্যকারী জলবায়ু ইহার প্রধান কারণ।

দেখ, শীতপ্রধান দেশের অধিবাসিবর্গ স্বাভাবিক কারণে দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ ও দীর্ঘায়ু হইয়া থাকে; আর গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সকলে স্বাভাবিক কারণে খর্ব্বকায়, ক্ষীণবীর্য্য ও অল্পায়ু হইয়া থাকে। শেষোক্ত দেশে অনেকে আয়াসপ্রিয়, ভোগবিলাসী ও পরিশ্রমকাতর হয়। ইহাতেই জাতীয় অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। এজন্য সিদ্ধান্ত করা উচিত, দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় যে এত ক্ষীণবীর্য্য ও অল্পায়ু, ইহার মুখ্য কারণ দেশের জলবায়ু।

তদ্ভিন্ন অনেকগুলি গৌণকারণও দেখা যায়।

(১) বাল্যবিবাহ।

(২) বিজাতীয় সুশিক্ষা পাইবার জন্য অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম।

(৩) জীবনসংগ্রাম ক্রমশঃ আয়াসসাধ্য হওয়াতে অন্নবস্ত্রের অতিরিক্ত ভাবনা ও চিন্তা।

(৪) পুষ্টিকর আহার্য্যের অভাব।

(৫) ব্যায়ামাদির অভাব।

(৬) ভোগবিলাস, অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়সেবন ও পানদোষ।

(৭) চিরন্তন রীতিনীতি পরিত্যাগ। যখন এইরূপ নানা-কারণে আমরা হীনবীর্য্য হইতেছি, তখন এক বাল্যবিবাহের উপর কি সমস্ত দোষ আরোপ করা উচিত?

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতর যাঁহারা অভিজ্ঞ ও মধ্যপন্থী, তাঁহারা বলেন, বিবাহ বিষয়ে যে সকল প্রথা আবহমানকাল সমাজে চলিয়া আসিতেছে, উহাদের ভিতর এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, যে একের অভাবে অপরের বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা; অতএব যে বাল্য-বিবাহ দ্বারা হিন্দুপরিবার অশেষ সুখে সুখী হইয়াছে, যদ্দারা স্ত্রী-সমাজের সতীত্বধর্ম্ম পূর্ণাংশে রক্ষিত হইতেছে, সে প্রথা একেবারে রহিত করা অনুচিত। অথচ যুগধর্ম্মে কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে যে প্রথার যেরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকিবে, তাহাও বিধিবৎ পালন করিতে হইবে। আমাদের প্রধান লক্ষ্য একদিকে স্ত্রীসমাজের সতীত্ব পূর্ণাংশে রক্ষা করিতে হইবে, অপরদিকে জাতীয় অবনতি দূর করিতে হইবে। উভয় দিক দেখিয়া শুনিয়া অতিসন্তর্পণে আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। সতীত্বধর্ম্মের কিছুমাত্র ব্যাঘাত না করিয়া এমন বয়সে কন্যার বিবাহ দিতে হইবে, যাহাতে বলিষ্ঠ সন্তান উৎপন্ন হইবে।

আজকাল পাশ্চাত্য সভ্যতা বিস্তৃতির সঙ্গে এদেশে জীবনসংগ্রাম

আয়াসসাধ্য হওয়াতে অনেক কৃতবিদ্য যুবক অর্থোপার্জ্জনের সংস্থান না করিয়া উদ্বাহসূত্রে আবদ্ধ হইতে চান না। এই প্রকারে পুরুষ জাতির ভিতর বাল্যবিবাহ ক্রমশঃ রহিত হইয়া যাইতেছে। সেইরূপ আজকাল কন্যাবিবাহ যেরূপ ব্যয়সাপেক্ষ, তাহাতে কন্যার যে অষ্টম-বর্ষে গৌরিদান চিরপ্রসিদ্ধ ছিল,তাহা এখন চতুর্দ্দশ বর্ষে পরিণত হইয়াছে। বোধ হয়, শতাব্দী পরে ইহা অষ্টাদশ বর্ষে উপনীত হইবে।

অনেকের ধারণা, বরপণ আজকাল যেরূপ হারে বাড়িতেছে, তাহাতে বোধ হয়, দুই এক শতাব্দীতে নারীজাতির বাল্যবিবাহ রহিত হইয়া যাইবে এবং বয়োজ্যেষ্ঠা কন্যাগণ নিজ নিজ জাতির ভিতর পতিনির্ব্বাচন করিয়া বিবাহ করিবেন। এখন দেখা যাউক, তাঁহাদের ভবিষ্যৎবাণী কতদূর সফল হইবে।

পরিশেষে বক্তব্য, এখন আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষা পাইয়া যেরূপ উন্নতিপথে অগ্রসর হইতেছি, তাহাতে আমাদের শীঘ্র স্বরাজলাভ করিয়া জগতে পায়ের উপর ভরদিয়া দাঁড়াইতে হইবে। এখন শারীরিক বলবীর্য্যের সম্যক অনুশীলন করিয়া ভারতের সকল জাতি-বর্গকে সংগ্রামক্ষেত্রের উপযোগী করিতে হইবে। যে ভেতো বাঙ্গালীজাতি সপ্তশতাব্দী ব্যাপিয়া পরাধীনতায় থাকিয়া আজ ভীরু ও কাপুরুষ বলিয়া খ্যাত, সে জাতিকেও ভীমপরাক্রমশালী করিতে হইবে। সে জন্য ক্ষত্রিয়জাতির ন্যায়, কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক সকলের ভিতর বাল্যবিবাহ রহিত করা উচিত। অনেকের ধারণা, এখন পুরুষজাতির চব্বিশ হইতে ত্রিশ বৎসর ও নারীজাতির ত্রয়ো-দশ হইতে অষ্টাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত বিবাহের প্রশস্ত কাল। এরূপ করিলে আমাদের সকল দিক বজায় থাকিবে।

বহুবিবাহ ও কৌলিন্যপ্রথা।

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট এই দুই প্রথা অতীব জঘন্য ও অশেষ দোষাকর। পাশ্চাত্যশিক্ষাবিস্তৃতির সঙ্গে অশেষ দোষাকর

বহুবিবাহপ্রথাটী এখন সমাজে লুপ্তপ্রায়। এখন পারৎপক্ষে কেহ দুই বিবাহ করিতে চান না এবং সকলেই এপ্রথাকে ঘৃণাচক্ষে অবলোকন করিতেছেন।

কৌলিন্যপ্রথা এখনও সমাজে বলবতী রহিয়াছে এবং স্থল-বিশেষে ইহা নিঘৃণ ব্যাপারে পরিণত হইতেছে। কিন্তু সুখের বিষয়, ইহারও পূর্ব্ব গৌরব অনেক স্থলে ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে।

কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যদি বহুবিবাহ সমাজের এতই দোষাকর, তবে কি প্রকারে এ প্রথা এতকাল হিন্দুসমাজে স্থায়ী হইল? প্রকৃতির স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম এই, যে প্রথা যে সমাজের উপযোগী ও মঙ্গলদায়ক, সে প্রথা সে সমাজে সামাজিক নির্ব্বাচনে বহুকাল স্থায়ী হইবে। যে দেশে খাদ্যসামগ্রীর প্রাচুর্য্যবশতঃ জীবন-সংগ্রাম অনায়াসসাধ্য, যে দেশে নারীজাতির সংখ্যা পুরুষজাতির অপেক্ষা অধিক এবং যে দেশে নারীজাতির পদগৌরব অপেক্ষাকৃত ন্যূন, সে দেশে স্বার্থপর পুরুষজাতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির সম্যক চরিতার্থ-তার জন্য বহুবিবাহ করিয়া থাকে এবং সে দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রও ইহাকে ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া প্রচার করে না। এজন্য এ দেশে ধনাঢ্যগণ, রাজন্যবর্গ ও কুলীন ব্রাহ্মণগণ এতকাল বহুবিবাহ করিয়া আসিতে-ছেন।

পূর্ব্বে ঈশ্বরাবতার শ্রীকৃষ্ণের বহুদারপরিগ্রহ দর্শনে অনেকে এ প্রথাকে ঘৃণাচক্ষে অবলোকন করিতেন না। বস্তুতঃ নারীবহুল দেশে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য এ প্রথার আবশ্যকতা সম্যক অনুভূত হইয়া থাকে। এ জন্য পুরাকালে আর্য্যসমাজে এ প্রথা স্বতঃ প্রচলিত ছিল। শাস্ত্রে সকলেই পাঠ করেন, রাজন্যবর্গ বিবাহকালে অনেক দাসী উপঢৌকন পাইতেন। এ কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? যেমন আজকাল অনেক ধনাঢ্য মুসলমান বাঁদি রাখিয়া উহাদের গর্ভে সন্তান উৎপাদন করে; সেইরূপ লোকসংখ্যাবৃদ্ধির জন্য

রাজন্যবর্গও দাসীগর্ভে সন্তানোৎপাদন করিতেন।* ইহাও একপ্রকার বহুবিবাহের তুল্যমূল্য।

দেশে জীবনসংগ্রাম বহুআয়াসসাধ্য হইলে লোকে পারৎপক্ষে বহুবিবাহ করিয়া বহুসন্তান উৎপাদন করিতে আদৌ সম্মত হয়না। অনেকস্থলে উহারা এক বিবাহ করিয়া সংসারফাঁদে পা দিতে চায় না অথবা বিবাহ করিয়া সন্তানোৎপত্তি রোধ করিতে চেষ্টা পায়। ফ্রান্স দেশে ফ্রেঞ্চ কাপস্যুলের (French capsule) ব্যবহার কেন প্রচলিত হইল?

দেশে নারীজাতির সংখ্যা অধিক হইলে যদি পুরুষজাতি বহু বিবাহ করে, তাহাতে সমাজের কিছু মাত্র অমঙ্গল নাই, বরং ইহাতেই সমাজের প্রভূত মঙ্গল। এস্থলে কঠোর আবশ্যকতায় বাধ্য হইয়া পুরুষজাতি বহুবিবাহ করে, নতুবা অনেক স্ত্রীলোক কুমারী থাকিয়া যায়। সেইরূপ যে দেশে পুরুষজাতির সংখ্যা নারীজাতি অপেক্ষা অধিক, তথায় লোকযাত্রানির্ব্বাহের জন্য নারী-জাতি বহুবিবাহ করিতে বাধ্য হয়। এজন্য দেশবিশেষে, যেমন তিব্বত দেশ, নারীজাতির বহুবিবাহ প্রচলিত আছে। তথায় পাঁচ ভ্রাতায় মিলিত হইয়া এক স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করে।

তুমি যদি সে দেশে গিয়া উপরোক্ত প্রথার ভূয়সী নিন্দা কর, তত্রত্য লোকে তোমার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিবে। নারীবহুল দেশে পুরুষজাতির বহুবিবাহ যেমন যুক্তিসঙ্গত, পুরুষবহুল দেশে নারীজাতির বহুবিবাহ তেমনি যুক্তিসঙ্গত। এজন্য মহাভারতে দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী লিখিত আছে। পাঞ্জাবের কোন কোন স্থলে এখনও এপ্রথা দেখা যায়।

দেশে নারীজাতির পদগৌরব অধিক হইলে উহারা কোন মতে পুরুষজাতিকে বহুবিবাহ করিতে দিবে না বা পরস্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করিতে দিবে না। সেইরূপ দেশে পুরুষজাতির পদগৌরব অধিক

হইলে উহারা পরস্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করে অথবা বহুবিবাহ করিয়া থাকে। এ কারণ প্রাচ্য জগতে পুরুষজাতির ভিতর বহুবিবাহ প্রচলিত আছে; আর পাশ্চাত্য জগতে ইহা কস্মিন কালে প্রবর্ত্তিত হয় নাই।

দম্পতিদ্বয়ের ভিতর অনন্যপ্রেম ও অনন্যভালবাসা ব্যতীত সংসার সুখের নিকেতন হয় না। এক বিবাহে যেমন সুখ ও শান্তি, দুই বিবাহে তেমনি জ্বালাতন ও অশান্তি। এক মাগীকে শাসনে রাখা যায় না, পুরুষকে ভেড়া করিয়া রাখে। যখন দুই মাগী কোমর বাঁধিয়া রণরঙ্গ বেশে আসিবে, তখন পুরুষ বেচারীকে ছিঁড়িয়া খাইবে। এই সব দেখিয়া শুনিয়া বুদ্ধিমান লোকে পারৎপক্ষে দুই বিবাহ করিতে চায় না। আবার আজকাল দুর্মূল্যতাবশতঃ জীবন-সংগ্রাম ক্রমশঃ আয়াসসাধ্য হইতেছে। এখন এক বিবাহ করিয়া পুত্রকলত্রাদির লালনপালন করাই দুর্ঘট। এই সব নানাকারণে বহুবিবাহ সমাজে প্রায় লুপ্ত হইয়াছে।

অষ্ট শতাব্দী হইতে চলিল, কৌলিন্যপ্রথা এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেনবংশের কুলতিলক মহাত্মা বল্লালসেন এই প্রথার প্রতিষ্ঠাতা। তিনিই ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ও সদ্গোপ এই চারি শ্রেষ্ঠ জাতির ভিতর এই প্রথা প্রকৃষ্ট পদ্ধতিতে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তদবধি ইহা বঙ্গীয় সমাজে বদ্ধমূল রহিয়াছে। যে দেশে কুলপরম্পরাগত জাতিভেদপ্রথা প্রবল থাকাতে ব্যক্তিগত উন্নতি অপেক্ষা বংশগত বা কৌলিক উন্নতি জনসাধারণের অধিক আদরণীয়, তথায় আভিজাত্যসূচক কুলপরম্পরাগত কৌলিন্যপ্রথাও যে কালে প্রতিপত্তি লাভ করিবে, তাহাতে বিচিত্রতা কি? ইহার জন্য প্রত্যেক জাতির ভিতর কুলীনদের মানসম্ভ্রম এত অধিক এবং উহাদের ঘরে মৌলিকেরা পুত্রকন্যার বিবাহ দিতে এত অভিলাষী।

যেমন মক্কেলদের ভিতর উকিলবাবুদের ও রোগীদের ভিতর

ডাক্তারবাবুদের মানসম্ভ্রম, সেইরূপ মৌলিকদের ভিতর কুলীনদের মানসম্ভ্রম। তাঁহারাও বিবাহকালে বা অন্য সময়ে কুলমর্য্যাদা কড়ায় গণ্ডায় উসুল করিতে ছাড়েন না। তৎকালে তাঁহারা মৌলিক ভায়াদের মুণ্ডপাত করিতে ভুলেন না।

শাস্ত্রের আদেশ "বান্ধবাঃ কুলমিচ্ছন্তি"; এজন্য সকলের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধব কুলীনঘরে পুত্রকন্যার বিবাহ দিলে অশেষ সুখ্যাতি করিয়া থাকে। ইহাতেই কুলীনদের গৌরব ও মানসম্ভ্রম বাড়িয়াছে। তাঁহারাও আভিজাত্যের বড়াই করিয়া মৌলিকদিগকে ঘৃণা করিতেছেন ও ধরাকে শরার ন্যায় জ্ঞান করিতেছেন। প্রত্যেকজাতির ধনবান লোকেরা কুলীনঘরে কাজকর্ম্ম করিয়া নিজ বংশ উজ্জ্বল করিয়া আসিতেছেন। কৌলিন্য- প্রথা উৎকৃষ্ট হউক বা অপকৃষ্ট হউক, পাশ্চাত্যশিক্ষাবিস্তৃতির সঙ্গে কুলীনদের কুলমর্য্যাদা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে।

শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায় জাতিভেদের উপর যেমন নারাজ, তাঁহারা কৌলিন্যপ্রথার উপর তেমনি নারাজ। তাঁহারা ভাবেন, সমাজের একি অবিচার ও অনাচার, যে কুলীন বংশের একজন পাপাত্মা, দরিদ্র ও মূর্খ সম্মানিত হইবে; আর মৌলিক বংশের একজন ধার্ম্মিক, ধনবান ও বিদ্বান তাদৃশ সম্মান লাভ করিবে না? যে প্রথা এমন অবিচারের প্রশ্রয় দেয়, সে প্রথা কি জঘন্য নয়? কোথায় সমাজে অর্থ ও বিদ্যার সম্মান হইবে, না কোথায় গুণ থাকুক, আর নাই থাকুক, কেবল দৈববশাৎ কুলীন ঘরে জন্মগ্রহণ করাতে লোকবিশেষ সমাজে গণ্যমান্য হইবে? যে প্রথা এমন অবিচার করে, সে প্রথা কি জঘন্য নয়? ইহাকে অচিরে গোটেহেল করা উচিত।

কৌলিন্যপ্রথা দ্বারা সমাজে যে সকল কুফল ফলিতেছে, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। যে সকল সভাসদ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতদিগের সুপরামর্শে মহাত্মা বল্লালসেন দেশের মঙ্গলের

জন্য কৌলিন্যপ্রথা স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধরদিগেরই ভিতর এ প্রথা আজকাল কিরূপ জঘন্য ও নিঘৃণ ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে। সে সকল লজ্জার কথা শুনিলে মাথা হেঁট করিতে হয়, আর বঙ্গীয় সমাজকে সহস্র গালি দিতে ইচ্ছা হয়। যাঁহারা ব্রহ্ম-বর্চ্চের জন্য, শাস্ত্রজ্ঞানের জন্য সদা বড়াই করেন, তাঁহাদের ভিতর এমন অনাচার, এমন কদাচার! ছি! ছি! ছি! সে সব পাপকাহিনী কোন্ মুখে প্রকাশ করিব? হাতের লেখনী কম্পিত হইতেছে, গাত্র অবসন্ন হইতেছে। না লিখিলেও নয়, সেজন্য লিখিতে বাধ্য হইলাম। পাঠকগণ অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

প্রথমতঃ। দরিদ্র কুলীনব্রাহ্মণের ঘরে কত কন্যা অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিতা থাকে! উহারা কি সকলে সতীসাবিত্রী থাকে? কুলভঙ্গ হইবার ভয়ে, নীচঘরে উহাদের বিবাহ দেওয়া যাইবে না। বংশজ ও শ্রোত্রিয় ঘরে বিবাহ দিলে নৈকশ্যত্ব ঘুচিয়া যাইবে, -পুত্র-পৌত্রাদির সর্ব্বনাশ হইবে। কন্যা চিরকুমারী হইয়া গৃহে থাকুক বা ঐ অবস্থায় মরিয়া যাউক, আর মধ্যে মধ্যে ভ্রূণহত্যাদি পাপে লিপ্ত হউক, তথাচ প্রাণ থাকিতে নীচঘরে কদাচ উহার বিবাহ দিতে পারিবে না। কুমারীকন্যা ঘরে বসিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলুক, পিতা-মাতা ও সমাজকে সহস্র অভিসম্পাত দেউক, কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নাই, তথাপি নীচঘরে বিবাহ দিতে পারিবে না। সমাজের এ কি ঘোর অত্যাচার! এ সমাজ কি মানবসমাজ, না দানবসমাজ?

দ্বিতীয়তঃ। যদি পরিবর্ত্তন করিয়া বা অন্য কোন প্রকারে একটী কুলীন পাত্র ঠিক করিয়া কন্যার বিবাহ দেন, দেওয়া না দেওয়া প্রায় সমান কথা। বিবাহিতা কন্যা অনেক স্থলে পিত্রালয়ে বাস করে, স্বামীর সহিত সম্পর্ক নাই বলিলেই হয়। তিনি যে নৈকশ্য কুলীন, তাঁহার অনেক বিবাহ। তিনি কালভদ্রে দেখা দেন; কন্যার এমন কি তপস্যার জোর, যে তিনি উহাকে লইয়া ঘর করিবেন। যদি

কোন প্রকারে বিবাহিতা কন্যা গর্ভাবতী হইলেন, এমনি মধ্যে মধ্যে সন্ধ্যার পর উচ্ছিষ্ট কলাপাত দ্বারদেশে পড়িতে লাগিল; রটাইতে থাকে, জামাতা মধ্যে মধ্যে আসিতেছেন। এই প্রকারে সমাজে মান বাঁচান হয়। বল দেখি, সে সমাজকে কি বলিতে হয়? ইহা কি মানবসমাজ, না দানবসমাজ?

তৃতীয়তঃ। যিনি নৈকষ্য কুলীন, তিনি কুলমর্য্যাদা পাইলেই ইচ্ছামত বিবাহ করিতে পারেন। তাহার অশেষ দয়া, তিনি অনেক কুলীন কুমারীকে নাম মাত্র গ্রহণ করিয়া উহাদের আইবুড়ো নাম ঘুচান ও দুপয়সা বেশ রোজগার করেন। নবাব শতাধিক বেগম রাখিতেন, তিনিও শতাধিক বিবাহ করিতে পারেন। নবাব বেগমদিগকে সুখস্বচ্ছন্দে রাখিতেন। কিন্তু তিনি যাঁহাকে বিবাহ করুন না, তাঁহাকেই পিত্রালয়ে ছাড়িয়া যান, প্রতিপালনের ভার তাঁহাকে লইতে হয় না।

স্ত্রীও পিত্রালয়ে ভালরূপ চরিয়া খান এবং সন্তান উৎপাদন করিলে সে সন্তান কুলীন ব্রাহ্মণের উপাধি প্রাপ্ত হয়। খাতাপত্র দেখিয়া তিনি মধ্যে মধ্যে শ্বশুরালয়ে দেখা দেন এবং শ্বশুরের নিকট স্ত্রীসহবাসের জন্য ফি আদায় করেন। তাঁহাকে পুরুষবেশ্যা বলিব, না, আর কি বলিব? অর্থোপার্জ্জনের কেমন সুন্দর ফিকির ও মজা! জামাই আদরে খাইবেন এবং যাইবার সময় বিদায় ফি লইয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিবেন। যখন তিনি পলিতকেশ ও গলিতনখদন্ত হন, তখনও তিনি বিবাহ করিতে ছাড়েন না। বিবাহ করিলেই হাতে যে দুপয়সা আসিবে। এমন সুযোগ কে ছাড়ে? বারমাস ত্রিশ দিন তিনি কোন না কোন শ্বশুরের অন্ন ধ্বংসান। বেশ মজা! সর্ব্বত্রই জামাই আদর ও সহবাস ফি মজুৎ। যে সমাজ এমন কুরীতির প্রশ্রয় দেয়, ইহাকে কি বলিতে ইচ্ছা হয়? ইহা কি মানবসমাজ, না দানবসমাজ?

আর নেবু কচ্লাইবার প্রয়োজন নাই। যৎকালে বল্লালসেন আভিজাত্য অনুসারে এ দেশে কৌলিন্য প্রথা স্থাপন করেন, তিনি কি একবার স্বপ্নেও ভাবিয়াছিলেন, যে তাঁহার পরামর্শদাতাদিগের ভবিষ্যবংশধরেরা এই প্রথা দ্বারা অসংখ্য বিবাহ করিয়া উদরপূর্ত্তি করিবেন? কৌলিন্য প্রথার উদ্দেশ্য সুমহৎ। কিন্তু স্বার্থপর লোকেরা ইহাকে নিঘৃণ ব্যাপারে পরিণত করিয়া এতদূর কলুষিত করিয়া ফেলিয়াছে। যাহা হউক সুখেরবিষয়, পাশ্চত্য শিক্ষাবিস্তৃতির সঙ্গে এ সকল কদাচার সমাজে ক্রমশঃ রহিত হইতেছে এবং কুলীন ব্রাহ্মণসন্তানগণ এখন এক বিবাহ করিয়া সুখে সংসারযাত্রা করিতেছেন।

যতদিন বঙ্গীয় সমাজে কৌলিন্যপ্রথা সগৌরবে প্রচলিত ছিল, ততদিন সকলেই স্ব স্ব জাতির ভিতর কুলীন ঘরে পুত্রকন্যার বিবাহ দিতে সমুৎসুক ছিলেন। এখন যুগধর্ম্মে প্রধান প্রধান নগরীতে পূর্ব্বতন স্রোত মন্দীভূত হইয়াছে এবং তৎপরিবর্ত্তে পাশ্চাত্য স্রোত বহমান হইতেছে। এখন পূর্ব্বতন কৌলিন্য প্রথার তাদৃশ সমাদর নাই এবং ইহার পরিবর্ত্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী সুশিক্ষিত যুবকদল ব্রীটীশসিংহের কল্যাণে স্ব স্ব জাতির ভিতর কৌলিন্য মর্য্যাদায় বিভূষিত হইতেছেন। স্বাধীন বঙ্গের স্বাধীন রাজা আভি-জাত্যানুসারে পুরাতন কৌলিন্যপ্রথা স্থাপন করিয়াছিলেন এবং এতদিন ইহা পরাধীন বঙ্গে সম্যক সমাদৃত হইয়া আসিয়াছে।

আর নবযুগের নব কৌলিন্যপ্রথা ইংরাজরাজ পরোক্ষভাবে অর্থ ও বিদ্যার তারতম্যানুসারে প্রত্যেক জাতির ভিতর স্থাপন করিয়াছেন। ইহাও সর্ব্বত্র সমভাবে সকলের নিকট সমাদৃত হইতেছে। পূর্ব্বে কুলীনগণ বৈশেষিক উপাধিতে বিভূষিত হইতেন! এখন নব্য কুলীনগণও বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম এ, বি এ প্রভৃতি শ্রুতিমনোহর উপাধিতে বিভূষিত হইতেছেন। প্রভেদের মধ্যে

প্রথমোক্ত কুলীনদের পদমর্য্যাদা কুলপরম্পরাগত এবং উহারা অল্পে সন্তুষ্ট; কিন্তু শেষোক্তদের পদগৌরব ব্যক্তিগত, পরিশ্রমজন্য ও অর্থজন্য এবং উহারা অল্পে সন্তুষ্ট হন না।

এতকাল সকলে কুলীন ঘরে কন্যার বিবাহ দিতে সমুৎসুক বলিয়া কুলীনগণ পুত্রের বিবাহকে অর্থোপার্জ্জনের উপায়স্বরূপ করিয়াছেন। এখন নবযুগের নব্য কুলীনসম্প্রদায়ও বিবাহকে অর্থোপার্জ্জনের উপায়স্বরূপ করিতেছেন; তজ্জন্য তাঁহারা কন্যা-কর্ত্তার মুণ্ডপাত করিতে ছাড়েন না। সমাজে স্বার্থপরতা প্রবল বলিয়া লোকাচারে যাঁহারা যে বিষয়ে অধিক সত্ব পান, তাঁহারা সচরাচর সে সত্বের অপব্যবহার করিয়া বসেন। ভারতের মঙ্গলের জন্য ইংরাজরাজ এদেশে পাশ্চাত্যশিক্ষা বিস্তীর্ণ করিয়া এম এ, বি এ উপাধি বিতরণ করিতেছেন। কিন্তু স্বার্থপর লোকেরা পুত্রের বিবাহোপলক্ষে এতদ্দ্বারা আপনাদের উদর পূর্ত্তি করিতে সাধ্যমত চেষ্টা পাইতেছেন। এখন দেখা যাউক, কতকাল নব্য কুলীনদের পদগৌরব সমাজে বর্ত্তমান থাকে?

বিধবাবিবাহ।

আজকাল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতর অনেকে এ প্রথার বিশেষ পক্ষপাতী। কিন্তু ইহা চিরদিন শাস্ত্র ও লোকাচারবিরুদ্ধ। বঙ্গীয় সমাজে ইহা যে অবৈধ, তাহাই এস্থলে নানা বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়া সম্প্রমাণ করিব।

প্রকৃতির স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম এই, যে দেশ অত্যুর্ব্বর, যথায় আহার্য্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এবং যে জাতি সুসভ্য, যাহাদের অর্থাগম অধিক, সে দেশে ও সে জাতির লোকসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য বহুসংখ্যক কন্যাসন্তান স্বতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে। আজকাল আদমসুমারী দ্বারা একরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছে, সভ্য দেশে ও সভ্য জাতির ভিতর পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক। ভারতেও এই প্রাকৃতিক নিয়ম

চলিতেছে। ইহার উর্ব্বরাঞ্চলে ও উচ্চজাতির ভিতর পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক এবং অনুর্ব্বরাঞ্চলে ও নিকৃষ্ট জাতিদের ভিতর স্ত্রীলোকের সংখ্যা ন্যূন। এই অত্যুর্ব্বর বঙ্গদেশও চিরদিন সুজল, সুফল ও শস্যশ্যামলক্ষেত্রাকীর্ণ। এমন সুসমৃদ্ধ দেশ ভারতের অন্য কোন স্থানে দৃষ্টিগোচর হয় না। এদেশেও প্রায় সকলজাতির ভিতর নারীজাতির সংখ্যা অধিক।

এখন যে দেশে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক, তথায় পুরুষজাতির ভিতর বহুবিবাহ স্বতঃ প্রচলিত হইবে, অথবা স্ত্রীজাতির ভিতর বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইবে না। ইহাদের ব্যতিক্রম হইলে অনেকের ঘরে অবিবাহিতা কুমারী থাকিয়া যাইবে। আবার যে দেশে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা অল্প, তথায় প্রাকৃতিক কারণে স্ত্রীজাতির বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইবে অথবা দ্রৌপদীর ন্যায় উহাদের বহুবিবাহ ঘটিবে। ইহাদের ব্যতিক্রম হইলে অনেক পুরুষের বিবাহ আদৌ ঘটিবে না এবং উহারা সংসারধর্ম্ম করিতে পারিবে না।

এখন জিজ্ঞাস্য, যে দেশে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক, তথায় কি বিধবাদিগের পুনঃসংস্কার করান উচিত? যদি উহারা পত্যন্তর গ্রহণ করেন, উহারা কি আপনাদের সমসংখ্যক ভগিনীদিগকে পরোক্ষভাবে পতি হইতে বঞ্চিতা করিবেন না? তাহার সাক্ষ্য, এদেশে অল্প সংখ্যক বিধবা পরপুরুষের প্রলোভনে পদস্খলিতা হইয়া জঘন্য বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করে, আর ইউরোপীয় সমাজে অধিকাংশ কুমারী পেটেরদায়ে ঐ জঘন্য বৃত্তি চালায়। উহারা সমস্ত জীবনে বিবাহিতা হইবার সুযোগ আদৌ পায় না। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের গুণে কোন জাতির ভিতর অবিবাহিতা স্ত্রীলোক এদেশে প্রায় দেখা যায় না।

হিন্দুধর্ম্ম স্বসমাজস্থ স্ত্রীজাতিকে সম্বোধন করিয়া বলিবে, যেমন

ঘরে জন্মগ্রহণ কর না, তোমরা প্রকৃতপক্ষে এ সংসারে কাঙ্গালিনী। বিবাহ দিয়া পিতামাতাগুরুজন তোমাদের আঁচলে এক অমূল্য নিধি বা পরেশপাথর বাঁধিয়া দেন। এই প্রস্তরের গুণে তোমরা নিজ নিজ গৃহে রাজরাণী সাজ এবং পতিপুত্র লইয়া পরমসুখে জীবন কাটাও। এ রত্ন হারাইলে তোমরা যে কাঙ্গালিনী, সে কাঙ্গালিনী হইবে। তোমাদের সকলকে বিবাহিতা করিয়া সুখিনী করিবার জন্য আমি এই নারীবহুল দেশে বিধবাবিবাহ প্রবর্ত্তিত করি নাই এবং এ বিষয়ে কোনরূপ প্রতিযোগিতা স্থাপন করি নাই।

অপর পক্ষে প্রতিযোগিতাপ্রিয় পাশ্চাত্যসমাজ স্ত্রীজাতিকে সম্বোধন করিয়া বলিবে, যেরূপ ঘরে জন্মগ্রহণ করনা, তোমরা প্রকৃতপক্ষে এ সংসারে পরমারাধ্যা দেবী, সর্ব্বত্রই তোমাদের সম্মান ও প্রতিপত্তি, পুরুষগণ তোমাদেরই ভেড়ুয়া। কুমারী হও বা বিধবা হও, ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্য বলে নিজ নিজ পছন্দসই বিবাহ করিয়া পরম-সুখে জীবন যাপন কর। এক পতি পরলোকগত হয়, অন্য মনোমত পতি পুনরায় বিবাহ কর; সেও যদি পরলোকগত হয়, তৃতীয় পতি স্বচ্ছন্দে বিবাহ কর। আমি তোমায় কোনমতে বাধা দিব না। ইহাতে যদি দেশের দরিদ্র ও কুৎসিৎ কন্যাগণ কুমারী থাকিয়া যায়, তাহাতে আমার কি ক্ষতি? যদি কোনরূপ ক্ষতি হয়, তাহা আমি চক্ষে দেখিয়াও দেখিব না। ভিতরে যাহাই থাকুক না, আমার বাহ্যস্তরে কেমন মনভুলানে চাকচিক্য থাকিবে!

যাঁহারা প্রতিযোগিতার বিশেষ পক্ষপাতী, তাঁহারা এস্থলে বলিবেন, যেমন জীবজন্তুদিগের ভিতর বলবানই জীবনসংগ্রামে জয়লাভ করাতে যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন হইয়া উহাদের ক্রমোন্নতি হইতেছে, সেইরূপ মানবসমাজে যদি সুরূপা ও ধনাঢ্য স্ত্রীলোকদিগের বিবাহ-বিষয়ে প্রাধান্য থাকে এবং কুরূপা ও দরিদ্রা স্ত্রীলোকগণ জীবনসংগ্রামে

পাশ্চৎপদ হইয়া যায়, তাহাতে সমাজের বিশেষ ক্ষতি নাই। ঈদৃশী স্ত্রীলোক কুমারী থাকুক বা বিধবা থাকুক, দুই অবস্থাই উহার তুল্যমূল্য ; কিন্তু যাহারা রূপবতী ও ধনবতী, উহারা কুমারী হউক বা বিধবা হউক, উহাদের বিবাহ অগ্রে দেওয়া কর্ত্তব্য। নবোত্থিত পাশ্চাত্য সমাজ ইহার জন্য বিধবাদিগের পুনঃসংস্কার করাইয়া থাকে। কিন্তু সমদর্শী প্রাচীন হিন্দুসমাজ এরূপ বিধানের উপর চিরদিন নারাজ। দেশের দরিদ্রা ও কুরূপা কন্যাগুলির আদৌ বিবাহ হইবে না, উহারা চিরদিন কুমারী থাকিবে, এ কেমন কথা ? বিবাহবিষয়ে এরূপ প্রতিযোগিতা স্থাপন করিলে সমাজের অস্থিমজ্জায় অসন্তোষ-রূপ বিষবৃক্ষের বীজ রোপন করা হইবে।

যে ধর্ম্ম গৃহস্থাশ্রমের যাবতীয় স্ত্রীপুরুষের সুখবর্দ্ধনের জন্য বিবাহ-সংস্কার বিধিবদ্ধ করে, সে ধর্ম্ম কি কদাচ কতকগুলি স্ত্রীলোককে আজীবন কুমারী রাখিতে পারে ? এ কারণ এ ধর্ম্ম সমাজের অশেষ মঙ্গলের জন্য খড়্গহস্ত হইয়া এই নারীবহুল দেশে বিধবাদিগের পুনঃসংস্কার করায় না।

ভারতের সকল প্রদেশে শ্রেষ্ঠ জাতিবর্গের ভিতর বিধবাবিবাহ দেখা যায় না। যখন ইহা এতকাল রহিত আছে, তখন বলা উচিত, সামাজিক নির্ব্বাচনে ইহা ঐ সকল জাতির ভিতর অপ্রচলিত। যদি সমাজের অনাটনবশতঃ বিধবাবিবাহ আবশ্যক হইত, ইহা লোকাচারে প্রবর্ত্তিত হইত এবং শাস্ত্র ইহাকে কদাচিৎ রোধ করিতে পারিত না। যখন ইহা এতকাল প্রচলিত না হইয়াও হিন্দুসমাজ সর্ব্বথা সুখী, তখন কি ইহার পুনঃ প্রবর্ত্তন করা উচিত ?

আবার ভারতের প্রদেশবিশেষে নিকৃষ্ট জাতিদের ভিতর বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে। তথায় স্ত্রীজাতির সংখ্যা অল্প হওয়াতে পুরুষজাতি অনন্যোপায় হইয়া বিধবা স্ত্রীলোক লইয়া সংসারধর্ম্ম করিতে বাধ্য হয় কিন্তু সুখের বিষয়, কোন স্থলে কোন জাতির

ভিতর এরূপ বিবাহ শাস্ত্রানুসারে মন্ত্রপূত করা হয় না। ইহাকে বিবাহ বলে না। লোকাচারে বা রাজাদেশে প্রবর্ত্তিত হউক, ইহাকে নিকা করা বলে। এরূপ মিলনকে বিবাহ বলিলে, ঐ পবিত্র সংস্কারের অবমাননা করা হয়।

মধ্যভারতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও কায়স্থ ব্যতীত নিকৃষ্ট জাতিদের ভিতর নিকে করা প্রথা প্রচলিত আছে। উহাদের ভিতর স্ত্রীজাতির অল্পতাই ইহার প্রধান কারণ। সেইরূপ এই কারণ বশতঃ তিব্বত দেশে, পাঞ্জাবের স্থলবিশেষে, দক্ষিণ মালেবর উপকূলে নেয়ার জাতির ভিতর স্ত্রীলোকের বহুবিবাহ প্রচলিত আছে। তথায় কয় ভ্রাতা মিলিত হইয়া এক পত্নীর পাণিগ্রহণ করে।

দেশবিশেষে ও জাতিবিশেষে বিধবাবিবাহ প্রচলিত দেখিয়া পরাশরমুনি নিজ সংহিতায় লিখিয়া যান :—

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥

(পরাশর সংহিতা)

"পতি মৃত হইলে, অন্য স্থানে চলিয়া গিয়া বসবাস করিলে, পরিব্রাজক বা সন্ন্যাসী হইলে, জাতিচ্যুত হইলে ও ক্লীব হইলে, এই পঞ্চ আপদে স্ত্রীলোকের পত্যন্তর গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।" এখন এই শ্লোকানুসারে বঙ্গ প্রভৃতি নারীবহুল দেশে ও ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি নারীবহুল জাতির ভিতর বিধবাবিবাহ প্রচলিত করা কি যুক্তিসঙ্গত ? যদি প্রচলিত কর, তোমরা প্রকৃতির বিপক্ষে গমন করিবে।

এখন অভাগিনী চিরদুঃখিনী বিধবাদিগের, বিশেষতঃ বাল-বিধবাদিগের অশেষ যন্ত্রণা ও দুঃখ দেখে সকলেরই মনপ্রাণ কাঁদিতেছে। যে দিন নারী বৈধব্যদশায় পতিত হয়, সেইদিন হইতে তাহাকে দুর্ল্লভ মানবজীবনের যাবতীয় সুখভোগে জলাঞ্জলি দিতে হয়। সেইদিন হইতে তাহার নিকট এ সংসার অমানিশার ঘোর

অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। তদীয় কোমল হৃদয়ে প্রাণপতির জন্য আজীবন দুর্ব্বহ শোকের তুষানল প্রজ্বলিত হইতে থাকে। সেই তুষানলে তাহার শরীর পুড়িয়া পুড়িয়া খাক হইতেছে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর যাইতেছে, কত শোকের উচ্ছ্বাস, কত দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িতেছে, কত নয়নবারি বিগলিত হইতেছে।

ঐ শুন! অভাগিনী বালবিধবা কি বলিয়া কাঁদিতেছে —

ভারত শ্মশান মাঝে আমি রে বিধবাবালা,
বিষের মুরতি করে বিধি মোরে পাঠাইলা।
পিতামাতা নিদয় হয়ে পরের হাতে সঁপেদিলা,
কেড়ে নিয়ে কমলকলি কণ্টকে গাঁথিল মালা।
বিবাহ কি তাও জানি না, কেবলমাত্র পড়ে মনে,
অনিচ্ছাতে শৈশবেতে খেলেছি এক দুঃখের খেলা।
না জানি সে কেমন পতি, মনে নাইকো সে মুরতি
তথাপি যুবতী হয়ে পেটে অন্ন নাইকো দুবেলা।

(মকুন্দ দাস)

বালবিধবা চিরদিন নৈরাশ্যসাগরে নিমগ্না। তদীয় হৃদয়ে নৈরাশ্যের একটানা স্রোত খরবেগে বহিতেছে। "Hope never comes that comes to all" সকলেই কোন না কোন আশায় বুক বাঁধিয়া জীবনের শোকদুঃখ বহন করে। কিন্তু অভাগিনী বালবিধবার চিরজীবনে কোনরূপ আশার সঞ্চার হয় না। যেমন ক্রীতদাস দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া চিরজীবন দুঃখে কাটায় এবং কোন সময়ে মুক্তিলাভের আশা করে না; সেইরূপ বিধবাও চিরদিন পরের গলগ্রহ হইয়া দুঃখের দিন দুঃখে অবসান করে এবং নারীজীবনের প্রধান সুখভোগে কোনরূপ আশা করিতে পারে না।

যে দুর্জ্জয় কামপ্রবৃত্তি দমন করা কলিকালে অনেকেরপক্ষে দুঃসাধ্য, সেই কামপ্রবৃত্তি অবলাবিধবা কি প্রকারে দমন করিবে?

রে নিষ্ঠুর হিন্দুসমাজ! তোমার কি দয়ার লেশমাত্র নাই? এতগুলি অবলা বিধবাকে কেন তুমি জন্মের মত এত কষ্ট দিতেছ এবং ভ্রূণহত্যাদি মহাপাপে লিপ্ত করাইতেছ? দেখ, কত বাল বিধবা এক মাত্র বিধবাবিবাহের অভাবে তিনকুলে কালী দিয়া নগর মধ্যে জঘন্য বেশ্যাবৃত্তি চালাইয়া দগ্ধোদর পূরণ করিতেছে এবং পাপজীবন পাপে অবসান করিতেছে। এ সব দেখে শুনে তোমার মনপ্রাণ কি কখন কাঁদিবে না? তুমি কি উহাদের প্রতি কখন সদয় হইবে না? আর কতকাল তুমি উহাদের উপর এরূপ ঘোর অত্যাচার করিতে থাকিবে?

বিধবাবিবাহ অপ্রবর্ত্তনে হিন্দুধর্ম্মের যে সকল গূঢ় উদ্দেশ্য আছে, তাহা একে একে খুলিতেছি, মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করুন।

প্রথমতঃ। যে ধর্ম্ম দম্পতিমিলনে নারীজাতিকে চিরদিনের জন্য পুরুষদিগের অর্দ্ধাঙ্গিনী করে এবং উহাদের প্রাণে প্রাণে, শোণিতে শোণিতে, অস্থিতে অস্থিতে ও ত্বকে ত্বকে সর্ব্বাঙ্গীন মিলন ঘটায়, সে ধর্ম্ম কি প্রকারে বিধবাকে পত্যন্তর গ্রহণ করাইবে? যে নারীকে একবার মন্ত্রপূতা করিয়া এক পুরুষের গলায় বাঁধিল, উহাকে আবার কি প্রকারে অন্য পুরুষের গলায় বাঁধিবে? ইহাতে সে ধর্ম্মের মাহাত্ম্য ও গৌরব কোথায় থাকে? যে সনাতন ধর্ম্মানুসারে এক নারী মন্ত্রপূতা হইয়া তোমার অর্দ্ধাঙ্গিনী ও সহধর্ম্মিণী, হইলেন, তুমি যেখানে থাক না কেন, সে নারী সেই ধর্ম্মানুসারে চিরদিন তোমার অর্দ্ধাঙ্গিনী ও সহধর্ম্মিণী থাকিবেন। তুমি ইহলোকে থাক, পরলোকে যাও বা দ্বীপান্তর প্রেরিত হও; সে নারী কিপ্রকারে আবার মন্ত্রপূতা হইয়া পরপুরুষের অর্দ্ধাঙ্গিনী হইবেন? যে বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য দম্পতিমিলন অনন্তকালস্থায়ী এবং কামরিপু দমন করিয়া আজীবন

ধর্ম্মাচর্চ্চা করা, বিধবাদিগের পুনঃসংস্কার দেওয়াতে, সে বিবাহের মূল উদ্দেশ্য কি নষ্ট করা হইবে না? অন্যান্য জাতি, যাহারা অধিক কামপরায়ণ ও রিপুপরতন্ত্র, যাহারা আদৌ সংযম শিক্ষা করে নাই, তাঁহারা কামরিপু চরিতার্থতার জন্য বিধবাদিগের পুনঃ সংস্কার করাইতে পারে; কিন্তু যে হিন্দুজাতি এতকাল নানাবিষয়ে সংযম শিক্ষা করিয়া আসিতেছে, সে জাতি কি প্রকারে একমাত্র কামরিপু চরিতার্থতার জন্য বিধবাদিগের পুনঃ সংস্কার করাইবে? আর হিন্দু-বিবাহ কি পাশ্চাত্য জগতের ন্যায় একটা কথার চুক্তিনামা, যে ইহাকে ছেদন করিলেই হইল? তবে বিধবাবিবাহ চালিত করে নাই বলিয়া কেন তোমরা স্বধর্ম্মের এত নিন্দাবাদ করিতেছ?

দ্বিতীয়তঃ। এ বিষয়ে এ ধর্ম্ম নিজের শিক্ষয়িত্রী প্রকৃতিদেবীর সম্যক অনুকরণ করিতেছে। সংসারে প্রকৃতি সকলদিকে ও সকল বিষয়ে পাঁচজনকে কাঁদায় ও দশজনকে হাসায়। কেবলমাত্র পাঁচ জনকে কাঁদাইয়া দশজনকে অধিক পরিমাণে সুখী করিবার মানসে এ ধর্ম্ম বিধবাদিগের পুনঃসংস্কার করায় না। সমাজে দশজন বিধবা পত্যন্তর গ্রহণ করিতে না পাইয়া আজীবন ক্রন্দন করে ও দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বটে, কিন্তু ইহাতে যাবতীয় সধবা ও পুরুষজাতির সুখ ততোধিক বৰ্দ্ধিত হইতেছে। এ দেশে বিধবাবিবাহ অপ্রচলিত বলিয়া স্ত্রীলোক স্ব স্ব স্বামীর প্রতি অনন্যভক্তি ও অনন্যপ্রেম দেখায় এবং অনন্যগতি হইয়া তাঁহাদের শ্রীচরণসেবাই জীবনের মুখ্য ব্রত জ্ঞান করে। ইহার জন্য আমরা আজ নিজ নিজ স্ত্রীর গুণে মুগ্ধ হইয়া এই জাতীয় অধঃপতনের দিনেও হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে সার্থকজন্মা জ্ঞান করিতেছি। যে সকল কারণে হিন্দুপরিবারের সুখসম্ভার এতদূর বৰ্দ্ধিত, তন্মধ্যে বিধবাবিবাহের অপ্রচলন ইহার অন্যতম কারণ।

যদি স্ত্রীলোক জানিতে পায়, বিধবা হইলে পুনরায় পত্যন্তর গ্রহণ

করা যায়, স্বামীর প্রতি তাহার মনে কি অনন্যপ্রেম উদয় হইবে এবং উহার কি এতদূর বশীভূতা হইবে? স্ত্রীবিয়োগে পুরুষজাতি পুনরায় দারপরিগ্রহ করে। স্ত্রীলোক স্বামীর প্রতি যতদূর অকপট ও অনন্যপ্রেম দেখায়, স্বামী কি উহার প্রতি ততদূর আন্তরিক প্রেম ও ভালবাসা দেখাইতে পারে? পাঠকগণ! নিজ নিজ বক্ষঃস্থলের উপর হস্তার্পণ করিয়া বল দেখি, এ কথা যথার্থ কিনা?
যখন দেখিব, পত্নীবিয়োগে তুমি পুনরায় দারপরিগ্রহ করিলে না, তখন বুঝিব, তোমার ভালবাসা অকৃত্রিম ও অকপট; আর যখন দেখিব, স্ত্রীবিয়োগের অব্যবহিত পরেই তুমি দ্বিতীয় সংসার করিলে, তখন বুঝিব, তোমার ভালবাসা সর্ব্বথা মৌখিক এবং কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থতার জন্য তোমার দারপরিগ্রহ।

যাহা হউক হিন্দুমহিলার অসাধারণ পতিভক্তি, পতিপ্রেম ও পতিপরায়ণতা এ জগতে অতুলনীয়। সেই অনন্যপ্রেমের তুলনায় পাশ্চাত্যসমাজের দম্পতিপ্রেম সর্ব্বথা মৌখিক ও অকিঞ্চিৎকর। অতএব মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা উচিত, স্বামীর প্রতি স্ত্রীলোকের অনন্যভক্তিও অনন্যপ্রেম দেখাইবার জন্য এ ধর্ম্ম বিধবাদিগকে পত্যন্তর গ্রহণ করিতে দিতেছে না। ইহাতে জন কতক বিধবা সংসারে দারুণ কষ্ট পায় বটে, কিন্তু সমাজস্থ সমগ্র পুরুষজাতি ও সধবাদিগের সুখ সেই পরিমাণে বর্দ্ধিত হইতেছে। তবে বিধবাবিবাহ চালিত করে নাই বলিয়া কেন তোমরা স্বধর্ম্মের এত নিন্দাবাদ করিতেছ?

তৃতীয়তঃ। জাতিভেদপ্রথা এতকাল প্রচলিত থাকাতে বংশসম্বন্ধে প্রত্যেক জাতির ভিতর যে সুশৃঙ্খলতা দৃষ্ট হয়, বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইলে সেই সুশৃঙ্খলতা একবারে নষ্ট হইয়া যাইবে। দেখ, হিন্দুসমাজের নিয়মানুসারে পুরুষজাতি ইহার প্রধান অঙ্গ এবং নারীজাতি ইহার অপ্রধান অঙ্গ। এদেশে ব্যক্তিবিশেষ বিবাহ সংস্কার দ্বারা অন্যবংশোদ্ভূতা কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া উহাকে

স্ববংশভুক্তা ও স্বোপাধিধারিণী করে। এস্থলে পুরুষ দশবংশোদ্ভূতা দশটী কন্যাকে স্ববংশভুক্তা করিলে সমাজের কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। কিন্তু যে নারী বিবাহিতা হইয়া একবংশভুক্তা হইয়াছে, সে নারী বিধবা হইয়া পত্যন্তর গ্রহণ করিলে অপরবংশভুক্তা হইবে। ইহাতে সমাজে অশেষ বিশৃঙ্খলতা আসিবে। বংশ ও উপাধি লইয়া যে সমাজবিভাগ আবহমান কাল চলিতেছে, উহার বিস্তর বিপর্য্যয় ঘটিবে। এখন যে বিধবাবিবাহ দ্বারা সুশৃঙ্খল হিন্দুসমাজে পুনরায় বিশৃঙ্খলতা আসিবে, তাহা কি প্রবর্ত্তন করা উচিত? তবে কেন তোমরা স্বধর্ম্মের এত নিন্দাবাদ করিতেছ?

চতুর্থতঃ। বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইলে, কখন কখন সমাজে বিষময় ফল উৎপন্ন হইবে। মুসলমান সমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলিত বলিয়া কেহ কেহ কন্যার বিবাহ দিয়া পণ লইয়া বেশ দুপয়সা রোজগার করে, কিছু দিন পরে বিষপ্রয়োগে বা অন্য কোন উপায়ে জামাতাকে হত্যা করিয়া পুনরায় কন্যার বিবাহ দেয় ও দুপয়সা রোজগার করে। খৃষ্টীয়সমাজে কোন কোন পাপিষ্ঠা মহিলা পতিহত্যা করিয়া পুনরায় বিবাহ করে। হিন্দুসমাজে বিধবাবিবাহ অপ্রচলিত বলিয়া এ সকল দুর্ঘটনা স্বপ্নের অগোচর। তবে কেন তোমরা স্বধর্ম্মের এত নিন্দবাদ করিতেছ?

পঞ্চমতঃ। বিধবাবিবাহ প্রচলিত থাকিলে সমাজে অনেক সময়ে কুমাতা সৃষ্টি হইবে। বিধবাবিবাহ প্রচলিত নাই বলিয়া কুমাতার দৃষ্টান্ত এদেশে অতি বিরল। ইংরাজিপুস্তকে অনেকে পাঠ করেন, পাশ্চাত্যসমাজে বিধবা পত্যন্তর গ্রহণ করিলে তাহার প্রথম পক্ষের সন্তান অধিকাংশ স্থলে মর্ম্মাহত হইয়া থাকে। যৎকালে তদীয়মাতা নবোঢ়া হইয়া মধুমাসের আমোদপ্রমোদে উন্মত্তা হন, তৎকালে সে সন্তান তাঁহাকে মনে মনে সহস্র অভিসম্পাত প্রদান করে। প্রকৃতির মহাকবি সেক্ষপীয়ার হ্যামলেট মুখে ইহাই ব্যক্ত করিয়া-

ছেন। এদেশে পিতা পত্নীবিয়োগে পুনরায় দারপরিগ্রহ করিলে তাঁহার প্রথমপক্ষের সন্তানেরা তাঁহার উপর বিরূপ হইয়া থাকে। এরূপ হওয়াই প্রকৃতিসিদ্ধ; কিন্তু হায়! দেশাচারের সমক্ষে হৃদয়ের উচ্চ ভাবাবলিকেও সময়ে সময়ে বলিদান দিতে হয়। এখন যে বিবাহ দ্বারা সন্তানের নিকট স্নেহময়ী জননী পর হইবেন, সে বিবাহ কি সমাজে চালিত করা উচিত?

যে সমাজ বলে, "কুপুত্র হউক, কুপিতা হউক, কুমাতা যেন হয় "না", সে সমাজে কি কুমাতা সৃষ্টি করিবার জন্য বিধবাবিবাহ চালিত করা উচিত? তবে কেন তোমারা স্বধর্ম্মের এত নিন্দাবাদ করিতেছ?

এইরূপ নানাকারণবশতঃ এই নারীবহুল দেশে হিন্দুধর্ম্ম খড়্গহস্ত হইয়া বিধবাবিবাহ প্রচলিত করে নাই।

শিক্ষিত সম্প্রদায় বলিবেন, স্ত্রী ও পুরুষ উভয় লইয়াই সমাজ। পুরুষ যে সত্বে সত্ববান, স্ত্রীলোককে কি সেসত্বে সত্ববতী করা উচিত নয়? পুরুষ পত্নীবিয়োগে পুনরায় দারপরিগ্রহ করে, স্ত্রীলোক কেন পতিবিয়োগে পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারিবে না? উভয়ের প্রতি সমদর্শী হওয়া কি সমাজের কর্ত্তব্য নয়? তবে কেন এ সমাজ পত্নীবিয়োগে পুরুষকে পুনরায় দারপরিগ্রহ করিতে আদেশ দেয়, আর পতিবিয়োগে স্ত্রীলোককে তাহা হইতে চিরবঞ্চিতা রাখে?

নারীবহুল দেশে পত্নীবিয়োগে পুরুষ পুনরায় দারপরিগ্রহ করিলে সমাজের মঙ্গল ব্যতীত কিছুমাত্র অমঙ্গল নাই। পরন্তু বিবাহ না করাতে সমাজের বিশেষ অমঙ্গল হইবে। কথায় বলে, "কুমারীর ভাগ্যে এয়ো মরিয়া যায়"। নারীজাতির সংখ্যা পুরুষজাতি অপেক্ষা যে পরিমাণে অধিক, সেই পরিমাণের অনুপাতে পুরুষজাতির পুনঃবিবাহ না হইলে কি প্রকারে সেই সংখ্যার সামঞ্জস্য হইবে? অতএব নারীবহুল দেশে পত্নীবিয়োগে পুরুষজাতির পুনরায় দারপরিগ্রহ করাই শ্রেয়।

অভিজ্ঞ লোকদিগের মত, এই অভূর্ব্বর দেশে সকল জাতির ভিতর স্ত্রীপুরুষ লইয়া যে তারতম্য দেখা যায়, তাহাতে বিধবাদিগের পুনঃসংস্কার না হওয়াতে, স্থলবিশেষে পুরুষজাতির বহুবিবাহ ঘটাতে এবং পত্নীবিয়োগে পুরুষজাতির পুনরায় দারপরিগ্রহ করাতে সেই নৈসর্গিক তারতম্যের কথঞ্চিৎ সামঞ্জস্য হইয়া থাকে। এ কারণ এদেশে কোন জাতির ভিতর অবিবাহিতা কুমারী দেখা যায় না।

এখন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের রুচি পরিবর্ত্তিত ও জীবনযাত্রা কৃচ্ছ্রসাধ্য হওয়াতে বহুবিবাহ প্রায় রহিত হইয়াছে; এমন কি, অনেকে দারপরিগ্রহ করিতে চান না। সেস্থলে বিধবাবিবাহ চালিত করিয়া বহুসংখ্যক স্ত্রীলোককে কি এখন কুমারী রাখা উচিত? যদি বল, স্ত্রীলোক বিধবা থাকুক বা কুমারী থাকুক, ইহা তৎসমান কথা। কার্যতঃ উভয়ে সমান বটে, একজনের পতি নাই ও অপরের পতি হয় নাই এবং উভয়েই পরের গলগ্রহ, তথাচ যদি সমাজ নিজের ব্যবস্থা দ্বারা অনেক স্ত্রীলোককে আজীবন কুমারী রাখিতে বাধ্য হয় এবং উহাদের বিবাহ দিয়া সংসারে সুখিনী করিবার অবসর আদৌ প্রদান না করে, এরূপ ব্যবস্থা উহায় পক্ষে ঘোর অবিচার ও প্রকৃত অনাচার। কিন্তু নারীবহুল দেশে বিধবাবিবাহের অপ্রবর্ত্তন আদৌ অনাচার নহে।

কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, ইউরোপীয় সমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলিত বলিয়া তত্রত্য লোকেরা কি স্ত্রীপুত্র লইয়া প্রকৃত সুখী হয় না? উহারা অর্থ বলে বাহ্যদর্শনে সুখী বটে, কিন্তু আমরা দীনদরিদ্র হইয়াও স্ত্রীপুত্র লইয়া যতদূর সুখী, উহারা ততদূর হইতে পারে না। বল দেখি, পাঠক! কেন বহুসংখ্যক ইংরাজ বিবাহিত জীবনকে ক্লেশকর ভাবিয়া অনূঢ়াবস্থায় থাকিতে ভালবাসে? ইংরাজপত্নী স্বামীর প্রতি অনন্যপ্রেম ও ভালবাসা দেখাইতে জানেন না। উহার বিলাসবিভ্রমের জ্বালায় তিনি সদাই অস্থির। মেমসাহেব

ত মনে জানেন, এ স্বামী বেটার মৃত্যু হইলে অন্য মনোমত পতি বিবাহ করিয়া অধিক সুখী হইব, অথবা এ স্বামী অধিক গোলযোগ করিয়া আমার সুখের পথে কণ্টক বপন করে, আইন আদালতের আশ্রয় লইয়া উহাকে স্বামীত্ব হইতে বরখাস্ করিয়া দিব।

ওহে ইংরাজিনবীশ পাঠকগণ! যদি তোমরা স্বগুরু ইংরাজদিগের অসদনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়া ঐ সকল কুপ্রথা এ দেশে চালিত কর, তোমরা কি এমন সোণার সংসারকে ছারখার করিবে না? দেশের রত্নগুলি উৎপাটন করিয়া তৎপরিবর্ত্তে কতকগুলি বৈদেশিক কণ্টক বপন করিলে ভারত কি মরুভূমিপ্রায়, শ্মশানপ্রায় হইবে না? যে সকল সুপ্রথা লইয়া এই প্রাচীন সমাজ এতকাল শান্তিসুখে সুখী, সেদিনকার নবোত্থিত ইউরোপীয় সমাজের অনুকরণে সে সকল উৎকৃষ্ট প্রথা ত্যাগ করিলে কি তোমরা প্রকৃত সভ্যতাপথে অগ্রসর হইবে? ইহাতে কি তোমরা সংসারে প্রকৃত সুখের পথ দেখিতে পাইবে? হা হতবিধে! কাহারও যেমন এমন দুর্ম্মতি না ঘটে।

যখন বালবিধবারা অনেক স্থলে রিপুপরতন্ত্রা হইয়া বিপথে গমন করে, তখন সমাজের মঙ্গলের জন্য যাহারা অক্ষতযোনি, যাহাদের নিষ্ঠুর পিতামাতা বাল্যকালে নামমাত্র বিবাহ দিয়াছে, উহাদের পুনঃসংস্কার একান্ত আবশ্যক। কিন্তু যখন বঙ্গীয় নারী-বহুল সমাজে বিধবাবিবাহ অবিধেয়, তখন কোন স্থলে ইহা প্রবর্ত্তিত করা উচিত বোধ হয় না। "ছিদ্রেম্বনর্থা বহুলী ভবন্তি," একদিকে সামান্য ছিদ্র থাকিলে কালক্রমে তাহা বহুবিস্তৃত হইয়া পড়িবে। বালবিধবার বিবাহ দিলে বয়োজ্যেষ্ঠা বিধবাও পুনঃবিবাহের জন্য উন্মত্তা হইবেন কিন্তু যেরূপ কাল পড়িতেছে, তাহাতে বোধহয় দেশের মহৎ মহৎ লোকেরা অর্থের প্রলোভন দিয়া বালবিধবাদিগের বিবাহ দিতে আরম্ভ করিবেন এবং নিরন্ন ব্রাহ্মণগণ অধিক দক্ষিণা

পাইয়া সে বিবাহও মন্ত্রপূতা করিবেন। এখন দেখা যাউক, হিন্দুসমাজ তজ্জন্য কিরূপ বন্দোবস্ত করে।

হিন্দুধর্ম্ম বিধবাদিগের জন্য সহমরণ বা আজীবন ব্রহ্মচর্য্য উপদেশ দেয়। মরি! মরি! ধর্ম্মের কি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা! শাস্ত্রের কি উৎকৃষ্ট আদেশ! যে সমাজে স্ত্রী পতির অর্দ্ধাঙ্গিনী ও পতির অস্তিত্বে স্বয়ং অস্তিত্ববতী সে সমাজে যে সহমরণ উপদিষ্ট হইবে এবং স্ত্রীজাতিও যে সোৎসাহে ও সাগ্রহে অসাধারণ বীরত্বের সহিত চিতারোহণ করিয়া প্রাণপতির স্বর্ণদেহের সহিত নিজদেহ বিসর্জ্জন দিবে, তাহাতে কোন্ বিচিত্রতা? যে সমাজ স্ত্রীপুরুষের মিলনে উহাদের প্রাণে প্রাণে, অস্থিতে অস্থিতে ও ত্বকে ত্বকে সর্ব্বাঙ্গীন মিলন ঘটায়,যে সমাজে স্ত্রী প্রাণাধিক পতির জন্য অনন্ত ও অনন্যপ্রেমরসে চিরদিন আপ্লুতা, সে সমাজে প্রাণপতির মৃত্যুতে হতভাগিনী বিধবা ইহজীবনের যাবতীয় সুখভোগেজলাঞ্জলি দিয়া সেই প্রেমের খাতিরে সংসারাশ্রমে যে প্রকৃত যোগিনী সাজিবেন এবং শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া যে প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবেন ও বিধিমতে সমাজের সেবা করিবেন, তাহাতে কোন্ বিচিত্রতা?

এখন যুগধর্ম্মে হিন্দুসমাজে ইংরাজরাজের অনুগ্রহে সহমরণ রহিত হইয়াছে। এখন ব্রহ্মচর্য্য ও সমাজসেবা বিধবাদিগের একমাত্র অবলম্বন। উহারা রিপুদমনার্থে সমস্ত দিবসে একবার নিরামিষ ভোজন করিবে, একাদশীতিথিতে নিরম্বু উপবাস করিবে, বৎসরের মধ্যে মধ্যে সামর্থ্যমত ব্রতাদি পালন করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে এবং আজীবন কায়মনোবাক্যে গৃহস্থের যাবতীয় কাজকর্ম্ম করিয়া আত্মীয়স্বজনের সেবায় নিরতা হইবে। এই প্রকারে মা লক্ষ্মী বিধবারা শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া গৃহে গৃহে হিন্দুধর্ম্মের বিজয়-ভেরী চিরদিন বাজাইতেছে ও সমাজের সেবা করিতেছে।

যে স্থলে সুসভ্য ইউরোপের বিধবারা রিপুপরতন্ত্রা হইয়া নানা

পুরুষ অন্বেষণ করিতে করিতে উহাদিগকে ফাঁদে ফেলিতে চেষ্টা পায়, সে স্থলে এই অৰ্দ্ধসভ্য ভারতের বিধবারা যথাসাধ্য ইন্দ্রিয়দমন-পুর্ব্বক গৃহস্থালীতে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করিতেছে। ইহাতে হিন্দু-সমাজের যে কত মহোপকার, তাহা একমুখে বর্ণন করা যায় না। তোমার গৃহে তোমার নয়নসমক্ষে তোমার বিধবা খুড়ি, জেঠী, মাসী, পিসি, ভাজ, ভগিনী ও কন্যা যে কত কাজ ও কত সেবা করিতেছে, তাহা তুমি চক্ষে দেখিয়াও দেখিতেছ না। হিন্দুসমাজের কি মনোহর সুবন্দোবস্ত! কোথায় হে রঘুনন্দনপ্রমুখ স্মার্ত্তপণ্ডিতগণ! ধন্য তোমাদের সমাজতত্ত্বজ্ঞান! ধন্য তোমাদের সদবিধান! হিন্দু-পরিবারের সুখ বর্দ্ধনার্থে তোমরা কত উৎকৃষ্ট প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছ! আর আমাদের পাশ্চত্যশিক্ষায় শত ধিক্! আমরা কি না দুপৃষ্ঠা ইংরাজি পড়িয়া তোমাদের প্রতিষ্ঠিত পরম কল্যাণকর সদনুষ্ঠানগুলি পায়ে ঠেলিতে বসিয়াছি।

হিন্দুধৰ্ম্ম বিধবাদিগকে সংসারে যোগিনী সাজায়। যিনি প্রাণ-পতির খাতিরে জীবনের যাবতীয় সুখভোগে জলাঞ্জলি দিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন, তিনিই এ সংসারে প্রকৃত যোগিনী! যিনি একাহারে নিরামিষ বা হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া মধ্যে মধ্যে নিরম্বু উপবাস করিয়া নিজ দেহ জীর্ণ ও শীর্ণ করেন, যিনি দুর্দ্দম্য কাম-প্রবৃত্তির দমনার্থ ইন্দ্রিয়সংযম করিতে ভালরূপ শিক্ষা করেন, তিনিই এ সংসারে প্রকৃত যোগিনী। যিনি অসাধারণ ধৈর্য্য ও তিতিক্ষা গুণে নিজের কষ্টরাশি অম্লানবদনে বহন করিয়া দিবানিশি ধৰ্ম্মভাবে ও প্রেমানন্দে গৃহস্থের যাবতীয় কাজকৰ্ম্ম সম্পাদন করেন ও পর-সেবায় নিযুক্ত থাকেন, যিনি শাস্ত্রোক্ত ব্রতাদি পালন করিয়া নিজ-জীবন বরীয়ান ও মহীয়ান করেন, তিনিই এ সংসারে প্রকৃত যোগিনী। গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া গেরুয়াবসন পরিধান করিয়া যোগিনী সাজিলেই প্রকৃত যোগিনী হয় না। কিন্তু যিনি স্বগৃহে

থাকিয়া পতির প্রতি অনন্ত প্রেমের খাতিরে মনে মনে সর্ব্বস্ব-ত্যাগিনী ও ব্রহ্মচারিনী হন এবং পরসেবায় মনপ্রাণ সমর্পণ করেন, তিনিই যথার্থ কর্ম্মযোগিনী।

এই সকল কর্ম্মযোগিনীদের ধর্ম্মসাধনার জন্য হিন্দুধর্ম্মের বিধি-ব্যবস্থা অতীব প্রশংসনীয়া। আমাদের বিধবা মালক্ষ্মীরা ঐ সকল ব্যবস্থা পালন করিয়া কিরূপ সদাচারী, ধর্ম্মপরায়ণা ও দীর্ঘায়ু হন, তাহা এস্থলে বর্ণন করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। যেস্থলে খৃষ্টাদি অপকৃষ্ট ধর্ম্ম নিকৃষ্ট কামপ্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য বিধবা-দিগের পুনঃসংস্কার করাইয়া উহাদের প্রথমসংস্কারকে হেয় ও অপবিত্র করে, সেস্থলে তোমার সনাতন ধর্ম্ম উহাদের প্রথম সংস্কারকে চিরপবিত্র রাখিবার জন্য পুনঃসংস্কার না করাইয়া উহাদিগকে সংসারে যোগিনী সাজায় ও নানা ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রোৎসাহিত করে।

এই সকল কর্ম্মযোগিনিগণ পরমারাধ্য পতির খাতিরে, সমাজের খাতিরে যে অসহ্য কষ্ট ইহজীবনে ভোগ করিতেছেন, তাহা কি অনর্থক যাইবে এ সংসারে যিনি ধর্ম্মের জন্য, সমাজের জন্য দুঃখ-রাশি ভোগ করেন, সে দুঃখভোগ কি কখনও অনর্থক যায়? দেখ, পার্ব্বতী মহাদেবের সহিত পরিণীতা হইবার পূর্ব্বে অসাধারণ তপস্যা করিয়া যে কষ্টরাশি সহ্য করিয়াছিলেন, তাহার ফলস্বরূপ তিনি তাদৃশ প্রেম ও তাদৃশ পতি লাভ করিয়াছিলেন। সেইরূপ এদেশের বিধবাগণ বৈধব্যদশায় অসাধারণ তপস্যা করিতে করিতে যে কষ্ট-রাশি বহন করিতেছেন, তাহার ফলস্বরূপ এই পুণ্যবলে তাঁহারাও পরজন্মে প্রাণপতি লইয়া অশেষ সুখে সুখিনী হইবেন ও ধনপুত্রে লক্ষ্মীলাভ করিবেন। যদি শাস্ত্রের একথা মিথ্যা হয়, সংসার মিথ্যা ও সকলই মিথ্যা জানিবে।

নারীবহুল ইউরোপীয় সমাজে বহুসংখ্যক স্ত্রীলোক কুমারী থাকাতে

তাঁহারা সংসার হইতে অপসৃত হইয়া মঠাদিতে বাস করেন এবং স্বধর্ম্মপ্রচারে ও পরোপকারব্রতে ব্রতী হন। তথায় বিধবাবিবাহ প্রচলিত বলিয়া তাঁহারা পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইবার অবসর প্রাপ্ত হন না এবং অনন্যগতি হইয়া ধর্ম্মের আদেশমত সন্ন্যাসব্রতে ব্রতী হন। কিন্তু এদেশে বিধবাবিবাহ অপ্রচলিত বলিয়া কোন স্ত্রীলোককে কুমারী থাকিতে হয় না বা স্বধর্ম্মপ্রচারের জন্য সন্ন্যাসিনী সাজিয়া স্বগৃহ হইতে বহিষ্কৃতা হইতে হয় না। অদৃষ্টদেবী যাঁহাদিগকে বৈধব্যদশায় পাতিত করিয়া সংসারে প্রকৃত বৈরাগ্য অবলম্বন করায় ও যোগিনী সাজায়, তাঁহারাই ধর্ম্মনির্দ্দিষ্ট বিবিধ ক্রিয়াকলাপ অনুসরণ করিয়া প্রত্যেক পরিবারের মধ্যে কার্য্যতঃ স্বধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন ও ইহার বিজয়ভেরী বাজাইতেছেন।

ইউরোপীয় সমাজে খৃষ্টান তপস্বিনিগণ (Nuns) লোকের কত উপকার করেন এবং কত আগ্রহ ও যত্ন পূর্ব্বক রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করেন। এবিষয়ে তাঁহাদের যত্ন, আগ্রহ ও উৎসাহ দেখিয়া অনেকে শতমুখে তাঁহাদের প্রশংসা করিবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, হিন্দুবিধবারা তাঁহাদের নয়নসমক্ষে গৃহে বসিয়া কি করিতেছে, তাহা তাঁহারা চক্ষে দেখিয়াও দেখিবেন না। তাহারা কত যত্ন ও কত উৎসাহের সহিত পরিবারস্থ রোগীদের সেবাশুশ্রূষা করিতেছে, কত গুমুৎ ফেলিতেছে, কত আনন্দের সহিত গৃহস্থের যাবতীয় কাজ-কর্ম্ম করিতেছে! তাদৃশ যত্ন, তাদৃশ মায়ামমতা, তাদৃশ উৎসাহ, কে কেহ সামান্য রজতমুদ্রায় ক্রয় করিতে পারিবেন? মাহিনা দিয়া চাকরাণী রাখিলে সে কি তোমার জন্য এতদূর করিবে?

রে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম! ধন্য তোমার ব্যবস্থা! ধন্য তোমার উপদেশ! সমাজের মঙ্গলের জন্য, আমাদের সুখের জন্য তুমি যে সকল উৎকৃষ্ট প্রথা এতকাল চালাইয়া আসিতেছ, আজ তোমার কুপোষ্যেরা ধর্ম্ম ও নীতি বিবর্জ্জিতা শিক্ষার দোষে সে সকল প্রথার

যথার্থ মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া উহাদিগকে সমূলোৎপাটন করিতে উদ্যত। হায়! কবে তাঁহাদের সুমতি ও সুশিক্ষা হইবে? পাশ্চাত্য সমাজের বাহ্য চাকচিক্য দেখিয়া ভুলিও না। ইহার অন্তঃপ্রবেশ করিয়া দেখ, ভিতর হইতে কিরূপ দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে। পাশ্চাত্য সমাজ কেবল মাকালফল। এই সুন্দর ফল দেখিয়া তোমরা এখন সব ভুলিতেছ। পেটের দায়ে লেখাপড়া শিখিতে বাধ্য হইয়াছ। মনের সাধে লেখাপড়া শিখিতে থাক, কিন্তু দেশের রত্নগুলি উৎপাটন করিয়া বিদেশীয় কণ্টক রোপণ করিও না। তাহা হইলে দেশ ছারেখারে যাইবে এবং তোমরাও সবলে জাহান্নমে যাইবে। আর অধিক কি বলিব?

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বরপণ—

পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তৃতির সঙ্গে যে সকল কুরীতি ও কুপ্রথা হিন্দুসমাজে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতেছে, তন্মধ্যে শিক্ষিতসমাজের বরপণ আজকাল অশেষ দোষাকর। এই বরপণরূপ বিষধরের দংশনে আজ অনেকে জর্জ্জরীভূত ও মর্ম্মাহত। ইহার বিষের জ্বালায় সকলেই অস্থির ও কাতর।

বল্লালসেনপ্রতিষ্ঠিত কুলীনদের তাদৃশ অত্যাচার নাই। তাঁহাদের কুলমর্য্যাদার জন্য যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য দিলেই যথেষ্ট হয়। তাঁহারা অল্পে সন্তুষ্ট, সকলে স্বেচ্ছায় সে বরপণ দিয়া আসিতেছে। সেইরূপ ইতর জাতিবর্গের ভিতর কন্যাপণ চলিতেছে এবং কোন গরীব গুর্ব্ব ইহার জন্য উৎপীড়িত হয় না। কিন্তু ইংরাজরাজপ্রতিষ্ঠিত আধুনিক নব্য কুলীনদের (বিএ ও এম এ উপাধিধারী যুবকদলের) বিশেষতঃ তাঁহাদের পিতামাতার ভয়ানক

অত্যাচার। তাঁহাদের উদর জালাবিশেষ। ইহা অল্পে পূর্ণ হইবার নয়। দে, দে, আরও দে, এই কথাই কেবল ইহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইতেছে। যেমন করিয়া পার, যা দিয়া পার, এ জালা ভরিতে হইবে, নতুবা বিবাহ বরখাস্‌।

এই সকল নব্য কুলীনগণ যেরূপ অগাধ পরিশ্রম ও ঘোর তপস্যা করিয়া কঠিন বিজাতীয় বিদ্যায় সুপণ্ডিত হইতেছেন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রুতিমনোহর উপাধিতে বিভূষিত হইতেছেন, তাঁহাদের পিতামাতা ও বন্ধুগণ সেইরূপ বিবাহকালে তাঁহাদের কুলমর্য্যাদাস্বরূপ অধিক বরপণ আদায় করিতে ছাড়েন না। যে স্বর্গীয় অমূল্য বিদ্যাধন পাইবার জন্য পিতামাতার এত অর্থরাশি ব্যয় এবং তাঁহাদের এত প্রাণান্ত পরিশ্রম, যে স্বর্গীয় ঐশ্বর্য্য পাইবার জন্য তাঁহাদের হৃদয়-শোণিত শুষ্কপ্রায় এবং তাঁহারাও অস্থিচর্ম্মসার, সেই বিদ্যা ও উপাধির মূল্যস্বরূপ তাঁহারা অধিক বরপণ আদায় না করিলে কি প্রকারে তাঁহাদের বংশমর্য্যাদা রক্ষিত হইবে?

আজকাল যাঁহার ঘরে এক আধটা ছেলে এক আধটা পাস করে, তাঁহার বুকখানা ফুলিয়া দশহাত হয়। তিনি মনে মনে ভাবেন, "এই ছেলেটাকে মানুষ করিতে আমার কিনা ব্যয় পড়িয়াছে? বাল্যকাল হইতে রোগপরিচর্য্যা, ডাক্তারিখরচ, স্কুলের বেতন, পুস্তকক্রয় বাবদ আমার কত দিকে কত টাকা উড়িয়া যাইতেছে। এখন ইহার বিবাহকাল উপস্থিত, চতুর্দ্দিক হইতে নানা সম্বন্ধও আসিতেছে। এ ক্ষেত্রে আমার কি প্রধান কর্ত্তব্য? যে অর্থরাশি ব্যয় করিয়া আমি ছেলেটী মানুষ করিতেছি, নিদেনপক্ষে ইহার অর্দ্ধাংশ আদায় না করিয়া কেমন করিয়া উহার বিবাহ দিব? সংসারে কে এমন নির্ব্বোধ, নিজের পাওনা গণ্ডা না বুঝিয়া লইবে?

"এ বাজারে যে সোনার চাঁদ অলৌকিক বিদ্যাশিক্ষা করিয়া বংশ উজ্জ্বল করিয়াছেন, যিনি ইংরাজরাজের কল্যাণে ভবিষ্যতে প্রভূত

অর্থোপার্জ্জন করিয়া পরম সুখে কালাতিপাত করিবেন, তাঁহার বিবাহকালে কন্যাকর্ত্তার নিকট হইতে অতিরিক্ত বরপণ আদায় না করিয়া কেমন করিয়া তাঁহার কন্যাকে এমন পুত্ররত্নের অর্দ্ধাঙ্গিনী হইতে দিব? যিনি যত অধিক টাকা দিবেন, আমি তাঁহার কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিব। পাত্রী যেমন হউক না, আমি highest bidder এ ছেলেটী বিক্রয় করিব। যিনি থালাভরা আঁয়োট পাতা ভোরে টাকা ও গহনা দিবেন, তাহার কন্যার সহিত আমার পুত্রের বিবাহ হইবে।

"আরও দেখ, এই পরের কন্যা গৃহে আসিয়া ছেলেটাকে ভেড়া বানাইবে, আমাদিগকে একে একে দূরীভূত করিবে এবং পুত্রের উপার্জ্জিত ধনের পূর্ণ অধিকারিণী হইবে। আমরা যে এত কষ্ট করিয়া উহাকে মানুষ করিলাম ও লেখাপড়া শিখাইলাম, তাহার ফলভোগ আমাদের অদৃষ্টে নাই। তবে কেন আমরা উহার বিবাহ-কালে সেই কন্যার পিতার নিকট হইতে গলায় কাপড় দিয়া এই বেলা অধিক পরিমাণে বরপণ আদায় না করিয়া লইব?"

এইরূপ নানা কুচিন্তা করাতে এ কুপ্রথা বঙ্গীয় সমাজে দেখা দিয়াছে। শতাব্দী পূর্ব্বে রূপার গহনা সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। এখন সোণার গহনা না হইলে কাহারও মন উঠেনা। রূপার গহনা দেখিলে স্ত্রীলোকেরা ছি! ছি! করিয়া ফেলিয়া দিবে। এই কারণ বশতঃ বিবাহে এত অর্থরাশি ব্যয় পড়িতেছে। বরকর্ত্তাও কন্যাকর্ত্তার মণ্ডপাত করিতে ছাড়েন না। তিনি পুত্রবধূমাতার গহনাপত্র তদীয় পিতার স্কন্ধে ফেলিতে ভুলেন না। এই প্রকারে এই বরপণ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে।

দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থগণ এই কুপ্রথার মূল। তাঁহাদের এ জাতীয় কলঙ্ক বঙ্গের ইতিহাসে চিরদিন বিঘোষিত হইবে। তাঁহারা ইংরাজরাজের অনুগ্রহে পাশ্চাত্যশিক্ষা পাইয়া জজ ওকালতি

করিয়া প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন। তাঁহাদের মহিলাগণ ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া কন্যার প্রতি অতিরিক্ত স্নেহবশতঃ জামাতাকে অতিরিক্ত হারে বরপণ দেওয়াতে এই কুপ্রথা তাঁহাদের ভিতর প্রবল হইয়া উঠে। তাঁহাদের দেখাদেখি অন্যান্য জাতির সুশিক্ষিতেরাও ইহার প্রশ্রয় দিতেছে। এখন কায়স্থ ভায়ারা ইহার বিষের জ্বালায় ছট্‌ফট্ করিতেছেন ও ত্রাহি মধুসূদন ডাক ছাড়িতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা অতি গরীব, তাঁহারা এই কুপ্রথার জন্য স্বজাতিবর্গকে সহস্র ধিক্কার ও অভিসম্পাত দিতেছেন।

আজকাল শ্রাদ্ধের দানসাগর, আর বিবাহের যৌতুকদান তুল্য-মূল্য। উভয় প্রকার দানসাগরে বিবিধ বহুমূল্য দ্রব্যের আয়োজন করিতে হয় এবং বিস্তর অর্থনাশ হইয়া পড়ে। প্রভেদের মধ্যে প্রথমোক্ত দানসাগরের দানসামগ্রী পাঁচজন সুব্রাহ্মণের গৃহে যাওয়াতে অশেষ পুণ্যলাভ হয় ও তাঁহাদের আশীর্বাদ পাওয়া যায়। কিন্তু শেষোক্ত দানসাগরের দানসামগ্রী একমাত্র বরকর্তার গৃহে যাওয়ায় যেমন কর্মদণ্ড ভুগিতে হয়, তেমনি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। এখন দেখা উচিত, কোন্ দানসাগরের বাহার ও আড়ম্বর বেশী? শেষোক্ত দানসাগরে কত সোনার গহনাপত্র জল জল করিতেছে ও ঝন্ ঝন্ করিতেছে! কত চক্‌চকে রূপাদান ঝন্ ঝন্ করিয়া পড়িতেছে! কত রৌপ্যবাসন ছড়াছড়ি যাইতেছে! কেমন ইহুদিসাড়ী ও বেনারসী সাড়ী! কেমন সোনার চেইন ও ঘড়ি আংটী! সকলই এ জগতে মনোরম ও অলৌকিক!

একবার ভাব দেখি, সেই অপূর্ব দৃশ্য দেখিয়া বরকর্তার মন কিরূপ আনন্দনীরে অভিষিক্ত হইতে থাকে! যখন তাঁহার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবেরা সেই অলৌকিক দানসামগ্রীর অশেষ প্রশংসা কীর্ত্তন করিতে থাকেন, তখন তাঁহার হৃদয় কিরূপ আনন্দে বিস্ফা-

রিত হয়? কিন্তু বরমাতার আনন্দের সহিত তুলনা করিলে তাঁহার আনন্দ যৎসামান্য ও অকিঞ্চিৎকর। বরমাতা সে দৃশ্য দেখিয়া আকাশের চাঁদ স্বহস্তে পান। তখন তিনি ভাবেন, "এতদিনে আমার মানবজন্ম সার্থক হইল। এতদিন যে কষ্ট করিয়া আমি পুত্ররত্ন পালন করিলাম, আজ ভগবান সে কষ্টের পুরস্কার দিলেন।" তৎকালে তাঁহার বুকখানা ফুলিয়া দশহাত হয় এবং তিনিও ধরাকে সরা জ্ঞান করেন। কোন সামগ্রীর কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইলে তিনি এক পদাঘাতে সকলই দূরে প্রক্ষেপ করিয়া দেন। তৎকালে তাঁহার তর্জ্জন গর্জ্জন দেখিয়া সকলে অবাক্।

এখন একবার কন্যাকর্ত্তার ঘরের দিকে উঁকি মার। দেখিবে বরকর্ত্তার গৃহে যেমন উৎসব ও আনন্দ, কন্যাকর্ত্তার গৃহে সেইরূপ নিরুৎসব ও নিরানন্দ। ডাকাত পড়িলে গৃহবাসী যথাসর্ব্বস্ব হারাইয়া হাহাকার করিতে থাকে, কন্যাকর্ত্তাও এ ক্ষেত্রে মেয়ের বিবাহে যথা সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া হাহাকার করিতেছেন। নববধূরা ভীষণ বিষধরের ভীষণ দংশনে কাপুরুষ উভয়ে ছট্ পট্ করিতেছে ও ভূতলে গড়াগড়ি দিতেছে! কত দুঃখের উচ্ছ্বাস বহিতেছে! কত দীর্ঘনিশ্বাস পড়িতেছে! কত কাতরধ্বনি উত্থিত হইতেছে। কত অশ্রুজল বিগলিত হইতেছে। তাহাদের মনোবেদনাজনিত কষ্ট ও যন্ত্রণা দেখিয়া কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি বঙ্গীয় সমাজকে শতধিক্কার না করিবেন?

যৌতুকদানে বা খাওয়ান দেওয়ানে ত্রুটি হইয়াছে বলিয়া বরমাতা কন্যাকে পাঠান নাই ও অসহ্য বাক্যযন্ত্রণা দিতেছেন। মাতার শিরে বজ্রাঘাত পড়িয়াছে। আর কি নিস্তার আছে? স্ত্রীপুরুষ উভয়ে নির্জ্জনে বসিয়া ক্রন্দন করিতেছেন। স্বজনবর্গ নানারূপ বুঝাইতেছেন; তাহাতে কি মাতার মন প্রবোধ মানে? তিনি কন্যাশোকে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া বসিয়াছেন। বেগতিক দেখিয়া কন্যার পিতা জামাইবাড়ী ছুটিলেন। সেখানে বৈঠকখানায় হতবুদ্ধ হইয়া

বসিয়া রহিলেন। কেহই আক্ড়ায় না, এক ছিলিম তামাক পর্য্যন্ত দিল না। তিনি ত হাঁ করিয়া ম্লানবদনে বসিয়া আছেন। পরে অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া যদি তিনি বৈবাহিকের নিকট যাইতে পান, কত যোড়হস্ত, কত নাকেখৎ কতবার পায়ে পড়িলেন, তথাচ নিষ্ঠুর বৈবাহিকের ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি মনে মনে হাসিতেছেন, এ বেটাকে কেমন নাকাল করেছি। হায় রে! হিন্দু সমাজের কি নিষ্ঠুর দেশাচার।

এই জঘন্য বরপণবশতঃ আমরা আজকাল কন্যার বিবাহ দিতে গিয়া ঘোর বিপদে পতিত হই। কন্যা ভূমিষ্ঠা হইলে গৃহ নিরানন্দময় হয়। শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনি কিছুই হয় না। কিছুদিন পরে এ মেয়েটা পার করিবার সময় যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিতে হইবে ও অনেক হায়রাণ হইতে হইবে। এমন কি, প্রাণ লইয়া টানাটানি পড়িবে; পরিশেষে হয়ত দেনার জ্বালায় জেলে যাইতে হইবে।

দেখ, প্রাণসম নবনীতনিভ কন্যারত্ন আমাদের নয়নপুত্তলি। তদীয় কমনীয় সুস্মিতে মুখ কেমন আলোকিত! সেই স্নেহময়ী কন্যাকে সৎপাত্রস্থা করিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? কিন্তু বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, সেই প্রাণসম কন্যার যত বয়োবৃদ্ধি হইবে, পিতার মন দিবানিশি ততই চিন্তাসাগরের উত্তাল তরঙ্গে উদ্বেলিত ও আলোড়িত হইবে। হায়! সে অবস্থা কিরূপ শোচনীয়!

দেখিতে দেখিতে কন্যা বিবাহের যোগ্য হইল। বিবাহ না দিলে আত্মীয় স্বজনের নিকট মান থাকিবে না। গৃহিণীর আদেশ, যেমন করিয়া পার, কন্যাকে সৎপাত্রে অর্পণ করিতে হইবে, যাহাতে সে খেয়ে পোরে সুখে থাক্‌তে পারে। সৎপাত্রে অর্পণ করাও সহজ কথা নয়; তাহাতে যে বিস্তর অর্থব্যয়। তিনি যে ছাপোষা, ৩০ টাকা বেতনের সামান্য কেরাণিবাবু বা মাষ্টারবাবু। অর্থাভাবে চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতেছেন। কোথায় যাইবেন, কি করিবেন, কে এ বিপদে

তাঁহার সহায় হইবে, এই সকল চিন্তায় তিনি দিবানিশি নিমগ্ন। কর্জ্জ ব্যতীত তাহার আর অন্য উপায় নাই। সম্বলের মধ্যে গৃহিণীর খান কতক ফঙ্গবেনে গহনা, আর বাস্তুভিটা। তাহাই বন্ধক দিতে মনস্থ করিলেন।

যৎকিঞ্চিৎ পাথেয় লইয়া তিনি মেয়ের জন্য পাত্র অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। ভাল মন্দ কত পাত্র দেখিলেন; কিন্তু গৃহিণীর কিছুতে মন উঠিল না। যেখানে যান না কেন, বরকর্ত্তার এক এক ক্ষুরের প্যাচে তাঁহার মর্ম্মগ্রন্থি বিদীর্ণ হইতে লাগিল। কেউ হাঁক্‌চেন ৫ হাজার, কেউ হাঁকচেন ৩ হাজার, কেউ হাঁক্‌ছেন ২ হাজার। এসব শুনে তাঁহার পীলে চমকে গেছে। পরিশেষে অনেক জায়গায় সন্ধান করিবার পর তিনি এক সামান্য গৃহস্থ ঘরে হাজার টাকায় কন্যার সম্বন্ধ ঠিক করিলেন। কিন্তু হাজার টাকা তিনি কখন চক্ষে দেখেন নাই। এখন উপায় কি? উপায় একমাত্র ভগবান।

একবার ভাবিয়া দেখ, এই কন্যাদানগ্রস্ত অভাগার কত কষ্ট, কত হায়রাণ ও কত পেরেষাণ! নিষ্ঠুর সমাজের নিষ্ঠুর দেশাচারে প্রপীড়িত হইয়া তিনি আপনার অদৃষ্টকে কত ধীক্কার দিতেছেন! বিপদ প্রতীকারের জন্য বিপদভঞ্জন মধুসূদনকে কত ডাকিতেছেন! তিনি এমনও ভাবেন, কোন্ পাপে এ সর্ব্বনেশে মেয়ে আমার ঘরে জন্ম নিল। আঁতুড়ে নূন খাওয়াইয়া মারিলে সব ল্যাটা মিটিয়া যাইত। এখন কেমন করিয়া ইহাকে পার করি? এখন এত টাকা কোথায় পাই? হায় রে বিধাতঃ! তোর মনে এতই ছিল।

কন্যাকর্ত্তার যেমন দুঃসময়, বরকর্ত্তার তেমনি সুসময়। প্রথমের যেমন দুরদৃষ্ট, দ্বিতীয়ের তেমনি শুভাদৃষ্ট; প্রথমের যত ক্ষতি, দ্বিতীয়ের তেমনি লাভ। আজকাল যাহার ঘরে এক আধটী যাদুমণি এক আধটা পাস করে, তিনি ত সস্ত্রীক রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হন,

আর কন্যাকর্ত্তা সেই নবভূপতির সম্মুখে নবমী পূজার কম্পমান ছাগের ন্যায় বলিদানার্থ নীত হয়। সেই ভীষণ যূপকাষ্ঠ, সেই ভীষণ খড়্গ, সেই মালকোচামারা ভীমমূর্ত্তি কামার দেখিয়া তাহার অন্তরাত্মা পরিশুষ্ক হইতেছে, নয়নদ্বয় অশ্রুজলে ডব ডব্ করিতেছে এবং সর্ব্বাঙ্গ ঘন ঘন প্রকম্পিত হইতেছে। সে অবস্থায় তাহার কিরূপ লাঞ্ছনা ও অবমাননা! সে বেচারার দুরবস্থা দেখে কোন্ সহৃদয় ব্যক্তির মনপ্রাণ না কাঁদিবে, বল? রে নিষ্ঠুর স্বার্থপর শিক্ষিত সমাজ! তোমাদের বিদ্যাশিক্ষায় শত ধিক্! তোমরা বঙ্গমাতার কি সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছ, তাহা কি একবার ভাবিয়া দেখিবে? তোমরা ঘোর স্বার্থপরতার বশীভূত হইয়া পরস্পর খেয়োখেয়ী করিতে করিতে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছ! কবে যে তোমাদের সুবুদ্ধি হবে, তাহা ভগবানই জানেন।

এখন দেখ, কন্যাকর্ত্তাকে আরও কত নিগ্রহ ভোগ করিতে হয়। যে চুক্তিনামায় তিনি বদ্ধ হইয়াছেন, তাহা শুনিয়া তাঁহার পরিজনবর্গ অবাক্। সতী সাধ্বী স্ত্রী নিজের গহনাগুলি তৎক্ষণাৎ বাহির করিয়া দিলেন। তিনিও সে গুলি ও বাস্তুভিটা বন্ধক দিয়া কর্জ্জ করিলেন। তাহাতেও সমস্ত টাকার জোগাড় হইল না। কাজেই তাঁহাকে জুয়াচ্চুরি অবলম্বন করিতে হইল। পরিশেষে যে কালরাত্রে তাঁহার মুণ্ডপাত হইবে, সেই কালরাত্রি উপস্থিত হইল! স্ত্রীপুরুষ উভয়েই অশেষ চিন্তায় চিন্তিত, কি প্রকারে এ কালরাত্রি কাটিবে। গৃহে মহোৎসব; পুরোহিত, নাপিত ও আত্মীয় স্বজন সকলেই যথাসময়ে হাজির। বর ও বরযাত্রা দেখা দিল। তিনি সকলের নিকট গলায় কাপড় দিয়া যোড়হস্তে বলিতেছেন, এ যাত্রা যাহাতে আমার মান বাঁচে, আপনারা সকলে তাই করিবেন। সম্প্রদান কালে দেখা গেল, কতকগুলি সোণার গহনার পরিবর্ত্তে গিল্টীর গহনা দেওয়া হইয়াছে, রূপার বাসনের পরিবর্ত্তে জার্ম্মান সিল্ভারের বাসন দেওয়া

হইয়াছে পিতল কাঁসাও ফঙ্গবেনে, নগদ টাকাও কিছু বাকী আছে। আর আছে কোথায়! সকলই হুলস্থুল পড়িয়া গেল। বরকর্ত্তার আদেশ,বিবাহ বরখাস্। বরও পীড়ি হইতে উঠিয়া গেল। সম্প্রদান বন্ধ হইল। বেচারা পুরোহিত বেগতিক দেখিয়া সরিয়া পড়িলেন। কন্যার পিতামাতার মস্তকে বজ্রাঘাত পড়িল। কন্যাকর্ত্তার আত্মীয় স্বজন মধ্যে পড়িয়া মিটাইলেন, ৫০০৲ টাকার হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিলে সম্প্রদান হইবে। তিনিও তৎক্ষণাৎ তাহাই লিখিলেন, মনে জানেন, দৌহিত্র হইলে এ টাকা দেওয়া যাইবে। বরযাত্রা ও কন্যাযাত্রা কিঞ্চিৎ মিষ্টমুখ করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিল। বরও বাসরঘরে গেল। এই প্রকারে যোগেযাগে অতিকষ্টে সেই কালরাত্রি কাটিল।

এখন ভাব দেখি, সেই কালরাত্রে কন্যার পিতামাতা কত কাতর-কণ্ঠে ভগবানকে ডাকিতেছিল, যাহাতে তাহাদের মানসম্ভ্রম রক্ষা পাইবে। আরও দেখ, হৃদয়শোণিত শোষণ করিয়া কন্যার পিতা যে অর্থ আজীবন উপার্জ্জন করিয়াছেন, সেই অর্থের শ্রাদ্ধ করিয়া ও যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া তিনি পাকে প্রকারে উপস্থিত বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইলেন। কেবলই কি অর্থের শ্রাদ্ধ? অদৃষ্টের লিখন, কত যোড়হস্ত, কত নাকেখত, কত নিগ্রহ, কত বাক্যবাণ সহ্য করিতে হইয়াছে। এ বিষয়ে যাঁহারা ভুক্তভোগী, তাঁহারাই কন্যা-কর্ত্তার দুঃখে দুঃখিত হইবেন, অপরে কি বুঝিবে?

এখন একবার ভাব দেখি, এই জঘন্য কুপ্রথাবশতঃ হিন্দুবিবাহ কিরূপ বীভৎস ব্যাপারে পরিণত। যে বিবাহের উদ্দেশ্য সর্ব্বথা মহোচ্চ ও স্বর্গীয়, সে বিবাহ আজ সামান্য ছাগছাগীবিক্রয়ের ন্যায় মহানান্ধকারজনক ব্যাপারে পরিণত। আরও ভাবিয়া দেখ, যাহার ঘরে ৪৫টী অবিবাহিতা কন্যা থাকে, তাহার কি সর্ব্বনাস! এমন অবস্থায় অনেকে গলায় দড়ি দিয়া মরিবে বা বিষ

খেয়ে মরিবে। মেয়েগুলাই কেরোসিনে পুড়িয়া মরিবে ও বাপমাকে উদ্ধার করিবে। এ প্রথার ভবিষ্যৎ বড় শোচনীয়।

এখন সকলেই বুঝিতেছেন, এক বরপণে বঙ্গদেশ অচিরে ছারখারে যাইবে। ছারখারে যাইবার বাকী কি? একবার নেত্রোন্মীলন করিয়া দেখ, কত শত হিন্দুপরিবার এই বিষধরের দংশনে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া কি কষ্টে দিন যাপন করিতেছে। কত লোক ইহার জন্য ফতুর হইতেছে বা দেনার জন্য জেলে যাইতেছে। ইহার জন্য কত লোকের ঘরে হাহাকার উঠিতেছে, কত দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িতেছে ও কত অশ্রুজল বিগলিত হইতেছে! হায় রে! নিষ্ঠুর সমাজের কি নিষ্ঠুর দেশাচার!

ওহে ইংরাজরাজের নব্য কুলীনগণ! তোমরা আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবিধ শ্রুতিমনোহর উপাধিতে বিভূষিত হইয়া বিবাহকালে বিস্ফারিতহৃদয়ে স্বোপার্জ্জিত বিদ্যার করস্বরূপ কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার নিকট হইতে অধিক বরপণ আদায় করিবার জন্য কোমর বাঁধিতেছ বটে, মনে রাখিও, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাস এখন উনুনের ছাই পাঁশে পরিণত হইতে চলিল। অর্দ্ধশতাব্দী পরে যখন এম এ উপাধিধারী যুবকবৃন্দ সামান্য ৩০৲ টাকা বেতনের জন্য লালায়িত হইবে, তখন দেশের লোক উপাধির কদর বুঝিবে ও তোমাদের কুলমর্য্যাদা বাড়াইবে। আর এক কথা মনে রাখিও, সংসারের নিয়ম, ঘুটে পোড়ে, গোবর হাসে। আজ তোমরা কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার উপর পাশব অত্যাচার করিতে করিতে মনের সাধে হাসিতেছ, কিছুদিন পরে যখন তোমরা কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া অকূল পাথারে পড়িবে, তখন তোমাদের দুঃখে বনের শিয়াল কুকুরও কাঁদিবে। তবে এই বেলা এই পুতনারাক্ষসীকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেল; আর কেন উহাকে বাড়াইতেছ। মনে থাকে যেন, এই রাক্ষসী পরে সকলের ঘরে ঘুঘু চরাইবে বা সরিষা বুনিবে।

আর ওহে সুশিক্ষিত যুবক! যদি তুমি সকল স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্র পিতার কন্যাকে স্বল্পব্যয়ে বিবাহ করিয়া তাঁহাকে এই সমূহ বিপদ হইতে উদ্ধার কর, স্বয়ং বঙ্গমাতা দুই হাত তুলিয়া তোমায় আশীর্ব্বাদ দিবেন। সেই আশীর্ব্বাদের জোরে তুমি অচিরে ধনপুত্রে লক্ষ্মীলাভ করিবে।

এখন এই জঘন্য প্রথা কি প্রকারে বঙ্গীয়সমাজে রহিত হইবে, তজ্জন্য অনেকেই বিশেষ চিন্তিত। যদি সকলে এ বিষয়ে সামান্য স্বার্থত্যাগ করে এবং সমাজস্থ সকল জাতি যদি সামান্যরূপ জাতি-ভেদের শাসন চালায়, এ কুপ্রথা অচিরে রহিত হইবে। যে দেশে জাতিভেদের কঠোর শাসন সপ্ত শতাব্দী ব্যাপিয়া পরাধীনতা স্বত্বেও আমাদের জাতিধর্ম্ম পূর্ণাংশে রক্ষা করিতে সমর্থ, সে দেশে এক সামান্য কুপ্রথা রহিত করিতে কতক্ষণ লাগে? সবেমাত্র কলিকাতা মহানগরী ও ইহার চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামসমূহে এ কুপ্রথা প্রবল হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গে নাই, বেহারে নাই, দাক্ষিণাত্যে নাই, আর কোথাও নাই। এখন যদি পশ্চিমবঙ্গের সমাজস্থ প্রত্যেক জাতি নিজ নিজ জাতীয় সমিতিতে আন্দোলন করিয়া অতিরিক্ত বরপণ বন্ধ করিতে পারে, তবেই দেশের মঙ্গল; নতুবা যদি এই কুপ্রথা বৃদ্ধি পায়, দেশের লোক যেমন অনাহারে মরিবে, তেমনি মেয়েছেলের বিবাহ দিতে পারিবে না এবং দেশও উচ্ছন্নে যাইবে।

দুঃখের বিষয় সুশিক্ষিত সমাজ, যাঁহাদের চাল চলন দেখিয়া সকলে চলে, তাঁহারা জাতিভেদের শাসন উঠাইয়া দিয়া নিজেরা নিজেদের পায়ে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। তাঁহারা এখন যথেচ্ছাচারী এবং ইংরাজ-রাজের অনুগ্রহে প্রভূত সম্পত্তিশালী হওয়াতে তাঁহাদের মহিলাগণই এই সকল কুপ্রথা চালাইতেছেন। সমাজনায়ক ব্রাহ্মণগণ জঠরযন্ত্র-ণায় অস্থির হইয়া নিদ্রা যাইতেছেন। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপর তাঁহারা আর কলম চালাইতে চান না। পূর্ব্বে জনসাধারণ তাঁহাদের

নিকট যোড়হস্ত ছিল। এখন তাঁহারাই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট যোড়হস্ত। তবে কেন শেষোক্তেরা তাঁহাদের কথা মানিবেন?

যেরূপ সময় পড়িয়াছে, চাকরীরবাজারে যেরূপ হাহাকার উঠিয়াছে ও দুর্ম্মূল্যতা যেরূপ হু হু শব্দে বাড়িতেছে, তাহাতে কাচ্চাবাচ্চা মানুষ করা ও লেখাপড়া শিখান আমাদের মহাদায়। এখন আবার জামাই বাড়ীর তত্ত্বতাবাদ কেন? এ সকল রহিত করা একান্ত আবশ্যক। আইবুড়ো ভাতের তত্ত্ব, ফুলশয্যা সকলই রহিত করা একান্ত আবশ্যক। না উঠাও নিজেরা ভুগিবে। অপরে কেহ ভুগিবে না। বিবাহে গহনাপত্র দেওয়া ও বরাভরণ দেওয়া সবই উঠাইতে হইবে। এই সব উঠিয়া যাইলে মেয়ের বিবাহ দিতে গিয়া কেহ সর্ব্বস্বান্ত হইবেন না। এখন দেখ, কতদিনে এ সব কুচাল রহিত হইয়া সমাজের সুমতি দেখা দেয়?

সতীত্বধর্ম্ম।

স্ত্রীজাতির ভিতর সতীত্বধর্ম্মের উৎপত্তি কোথা হইতে হইল? সমাজের আদিম অবস্থায় যে নারী ইহার বিষয় কিছুই অবগত ছিলেন না, তিনি আজ কোথা হইতে স্বীয় পতিপরায়ণতাগুণে স্বামীকে এতদূর বশীভূত করিতেছেন? আদিম অবস্থায় যে নারী পুরুষজাতির সহিত যদৃচ্ছামত সঙ্গত হইয়া অপত্যোৎপাদন করত সৃষ্টি রক্ষা করিতেন, তিনি আজ কি কারণে পরমারাধ্য পতির শ্রীচরণকমলসেবাই স্বজীবনের মুখ্য ব্রত জ্ঞান করিতেছেন?

অতি প্রাচীনকালে যখন ধর্ম্ম মানবসমাজে বিবাহপদ্ধতি প্রবর্ত্তন করত পারিবারিক সংস্থান গঠন করে, সেই সময় হইতে ইহা সমাজের মঙ্গলের জন্য স্ত্রীজাতির ভিতর সতীত্বধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া আসিতেছে। সমাজমাত্রেই সতী সধ্বী নারী যেরূপ মাননীয়া ও পূজনীয়া, কুলটা ব্যভিচারিণী নারী বা বারবিলাসিনী সেইরূপ নিন্দনীয়া।

বীজশুদ্ধিই সতীত্বধর্ম্মের মূলাধার। বংশবীজকে সর্ব্বতোভাবে বিশুদ্ধ রাখিবার জন্য স্বয়ং প্রকৃতি জীবমাত্রেরই হৃদয়ে ঈর্ষাকে বলবতী করিয়া দিয়াছে। ইহা পুরুষের হৃদয়ে যেরূপ বলবতী, নারীর হৃদয়েও তদনুরূপ। ইহার বেগ সকল সময়ে দুর্নিবার্য্য ও অপ্রতিহত। কি রাজাধিরাজ ও পথের কাঙ্গাল, কি পণ্ডিত ও মূর্খ, কি ধর্ম্মাত্মা ও পাপাত্মা, সকলেই এই প্রকৃতিদত্ত ঈর্ষা দ্বারা সমভাবে চালিত হন। স্বামী স্ত্রীকে যেমন সাবধানে রাখেন, স্ত্রীও যতদূরসাধ্য স্বামীকে সাবধানে রাখিতে চেষ্টা পান। কেন নবাব-সাহেব নিজের বেগমদিগকে খোজা দ্বারা সুরক্ষিত করিতেন? কেন নারীবহুল পাশ্চাত্য সমাজে পুরুষজাতির ভিতর বহুবিবাহ প্রচলিত হয় নাই?

এই প্রকৃতিদত্ত ঈর্ষ্যা হৃদয়ে এত বলবতী যে, ইহার বেগ রোধ করিবার শক্তি কাহারও নাই। যিনি সংসারে নিতান্ত ভীরু ও কাপুরুষ, তিনিও পত্নীর সতীত্ব রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন। ইহার বেগ এত প্রবল, যদি কোন ব্যক্তি নিজের পরিণীতা ভার্য্যার চরিত্রবিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র সন্দেহের কারণ দেখিতে পান, তাঁহার মনে দারুণ ক্রোধের হুতাশন যুগপৎ উত্থিত হইবে। স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে পুরুষজাতির ঈর্ষ্যা এত বলবতী, যে নারী বিবাহিতা হউক বা অবিবাহিতা হউক, আজ কোন ব্যক্তির নয়নতারা এবং যাহাকে পাইয়া তিনি কৃতার্থ জ্ঞান করিতেছেন, যদি সেই নারীকে তিনি পরপ্রেমে আসক্তা বা পরপুরুষের অঙ্কশায়িনী দেখেন, তিনি কিছুতেই মনের উদ্বেগ সহ্য করিতে পারিবেন না; এমন কি, সেই নারীর প্রাণসংহার ব্যতীত তাঁহার ক্রোধানল কিছুতে নির্ব্বাপিত হইবে না। পুরুষজাতি সম্বন্ধে স্ত্রীজাতির ঈর্ষ্যা এত বলবতী, যে নারী নিজ স্বামীকে পরস্ত্রীর প্রেমাসক্ত দেখেন, তিনি পুত্রকন্যার

মায়ামমতা ভুলিয়া গিয়া উদ্বন্ধনে, জলনিমজ্জনে বা বিষভক্ষণে অম্লানবদনে নিজ প্রাণ বিসর্জ্জন দিবেন।

অনেক দিন হইল, পাপীয়সী এলোকেশী হত হইয়াছে; কিন্তু তাহার দুষ্কৃতির ধ্বজা এখনও বঙ্গীয় সমাজে উড়িতেছে এবং স্ত্রীলোকেরা এলোকেশীপেড়ে কাপড় পরিয়া সেই পাপীষ্ঠার কথা স্মরণ করিতেছে। এখন একবার ভাব দেখি, মানবসমাজে কত নিরীহ লোক অসতী ভার্য্যার ব্যভিচারে বা কত সতীসাধ্বী নারী স্বামীর ব্যভিচারে মনে মনে কিরূপ দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করে। ইহার জন্য সমাজে কত শোণিতপাত, কত নরনারীহত্যা ও কত বিবাদ-বিসম্বাদ ঘটিতেছে।

এই সকল শোণিতপাত ও বিবাদবিসম্বাদ রহিত করিবার জন্য ও বংশবীজ যতদূরসম্ভব বিশুদ্ধ রাখিবার জন্য মানবধর্ম্ম চিরদিন স্ত্রীসমাজে সতীত্বধর্ম্ম উপদেশ দিতেছে। ফলতঃ যে সংসারে পুরুষ-জাতির মন একদিকে স্ত্রীজাতিসম্বন্ধে প্রকৃতিদত্ত ঈর্ষায় পরিপূর্ণ, অপরদিকে দুর্দ্দম্য কামপ্রবৃত্তির অযথাচরিতার্থতার জন্য সদা লালায়িত, সে পাপসংসারে স্ত্রীজাতির সতীত্বধর্ম্ম স্বার্থপর পুরুষজাতির উপরোক্ত নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিদ্বয়ের প্রধান নিয়ামক ও অনুশাসক। এজন্য স্ত্রীজাতির সতীত্বধর্ম্ম মানবসমাজের অশেষ কল্যাণকর ও মঙ্গলদায়ক। ধর্ম্মমাত্রেই ইহার সম্পূর্ণ পোষকতা করিতেছে।

সতী সাধ্বী ললনা এসংসারে লক্ষ্মীস্বরূপা। সামান্য দুই গাছি শাঁখা পরিয়া সতী যে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করেন, বহুমূল্য মণি-মুক্তাভরণ সে শোভা দিতে পারে না। কুলটা রমণী সেইরূপ আভরণে বিভূষিত হইলেও তাহার দুষ্ক্রিয়ার পূতিগন্ধ কি উহাতে আচ্ছাদিত হইতে পারে? যে সকল উৎকৃষ্ট গুণে বিভূষিতা হইলে নারী সর্ব্বত্র মাননীয়া হন, তন্মধ্যে সতীত্বধর্ম্মই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। যিনি এগুণে বঞ্চিতা, তিনি যতই কেন অন্যান্য গুণে বিভূষিতা হউন না,

তিনি যতই কেন বিদূষী ও যশস্বিনী হউন না, তিনি এসংসারে ঘোর পাপীয়সী, পিশাচী ও কালসাপিনী; আর যিনি এ গুণে বিভূষিতা, তিনি যতই কেন গুণহীনা হউন না, তিনি পরমারাধ্যা দেবী।

এখন সংসারে কোন্ নারী প্রকৃত সতীসাধ্বী? স্বামী কুৎসিৎ বা সুশ্রী হউন, ধনবান বা দরিদ্র হউন, পণ্ডিত বা মূর্খ হউন, যিনি তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া মনে মনে ভাবিবেন—

"কত তপ করেছিনু জন্ম জন্মান্তরে
তাই তোমা হেন স্বামী মিলিল আমারে।
আমার ভাগ্যের কথা কহা নাহি যায়,
তাই বিধাতা তোমারে আমায় মিলায়।"

তিনিই এ সংসারে প্রকৃত সতী। যিনি এক মনে, এক ধ্যানে, অনন্যভক্তি ও প্রেমের সহিত পরমারাধ্য পতির শ্রীচরণ সেবা করেন, কদাচ পরপুরুষ সন্দর্শন বা উহার ছায়া স্পর্শ করেন না, এমন কি, কদাচ উহার বিষয় অনুচিন্তন করেন না, তিনিই এসংসারে প্রকৃত সতী।

পতিসেবাই স্ত্রীলোকের প্রধান ধর্ম্মকর্ম্ম। তাঁহাদের জন্য অন্য কোন প্রকার যাগ, যজ্ঞ ও তপস্যা নাই। তাঁহাদের যাবতীয় ধর্ম্মানুষ্ঠান একমাত্র পতিসেবায় নিবদ্ধ।

নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতং।
পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে॥ (মনুস্মৃতি)

"স্ত্রীলোকের পক্ষে পৃথক যজ্ঞ, ব্রত বা উপবাস কিছুই নাই। সর্ব্বান্তঃকরণে একমাত্র পতিসেবা করিলে তাঁহারা স্বর্গলোকে-মাননীয়া হইবেন"। যদি পতিসেবা করিয়া নারী স্বর্গে যান, তবে যাঁহারা আজকাল বিদুষী সাজিয়া স্বামীকে মস্‌লা পিসিতে বলেন বা রন্ধনকার্য্যে নিযুক্ত করেন, দেহান্তে তাঁহাদের দশা কি হইবে?

রে হিন্দুধর্ম্ম! ধন্য তোমার উপদেশ! ধন্য তোমার বিধিব্যবস্থা! তুমি সমাজের সুখের জন্য ও মঙ্গলের জন্য স্ত্রীজাতিকে কিরূপ সতীত্বধর্ম্মে বিভূষিত করিতেছ, যাহার গুণে এই জাতীয় দুর্দ্দিনেও আমাদের মরুভূমিসম গৃহ আজ স্বর্গের নন্দন-কাননে পরিণত এবং আমরা দীনদরিদ্র হইলেও নিজ নিজ স্ত্রীর গুণে মোহিত হইয়া আপনাদিগকে সার্থকজন্মা জ্ঞান করিতেছি। এখন বল দেখি, অর্দ্ধসভ্য ভারতের পৌত্তলিক হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় কোন্ দেশের কোন্ ধর্ম্ম স্ত্রীজাতিকে এতদূর সতীত্বধর্ম্মে বিভূষিত করে? খৃষ্ট, মুসলমান, ও বৌদ্ধধর্ম্ম, সকল ধর্ম্মই এবিষয়ে হিন্দুধর্ম্মের নিকট সুদূরে পরাহত জানিবে। হিন্দুরমণী পরপুরুষের সহিত ব্যভিচারে নিজের ধর্ম্মনাশ ও মহাপাতক জ্ঞান করিবেন; কিন্তু কোন দেশের কোন স্ত্রীলোক ইহাতে এতদূর পাপ জ্ঞান করিবেন না। মনে জানেন, ইহাতে বিবাহিত পতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হইবে মাত্র। খৃষ্টধর্ম্ম এবিষয়ে আদৌ হস্তক্ষেপ করে নাই; সেজন্য দুঃখের বিষয়, ইউরোপীয় সমাজে সতীত্বধর্ম্মর তাদৃশ সমাদর নাই। তথায় স্ত্রীপুরুষ উভয়েই ভাবেন, রাস্তার নর্দ্দমায় প্রস্রাব করা যেমন, পরস্ত্রী বা পরপুরুষের সহিত সহবাস করাও তদনুরূপ। আত্মতৃপ্তির জন্য যদি কেহ কোন বস্তু ভোজন করে বা কোন স্ত্রীলোকের সহিত সহবাস করে, তাহাতে দোষ কি, পাপ আবার কি?

সুসভ্য ইউরোপের সুসভ্য অধিবাসিগণ ব্যভিচারিণী পত্নীর সতীত্বের বিনিময়ে কিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য পাইলেই সন্তুষ্ট হইবেন। তাঁহারা অর্থের প্রকৃত মর্য্যাদা বুঝিয়াছেন। তাঁহারা ভাবেন, স্ত্রীলোকের সতীত্ব একটা কথার কথামাত্র এবং উহাদের ব্যভিচার মনের দুর্ব্বলতাপরিচায়ক বটে; কিন্তু ইহাতে তাদৃশ পাপ নাই। যখন স্ত্রীলোক আত্মতৃপ্তির জন্য, আত্মসুখের জন্য এবং পাঁচ অধমকে তরাইবার জন্য এ কাজ করে, তখন ইহাতে পাপ আবার কি? এই সব ভাবিয়া

তাঁহারা মনের প্রাকৃতিক উদ্বেগ সম্বরণ করতঃ সামান্য অর্থের সমক্ষে সতীত্বধর্ম্মকে বলিদান দিতেছেন। কিন্তু আমরা অর্দ্ধ সভ্য ভারতের অর্দ্ধসভ্য, অশিক্ষিত অধিবাসী; আমরা এরূপ স্থলে কদাচ মনের এমন উদারতা দেখাইতে পারি না এবং এরূপ আচরণকে আমরা চিরদিন জঘন্য মহাপাতক বলিয়া অভিশপ্ত করিব।

আজ ভারতীয় দণ্ডবিধির (Indian panal code) আইন অনুসারে যিনি হত্যাপরাধ করেন, তিনি ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলেন বা দ্বীপান্তরে প্রেরিত হন। সেজন্য যিনি কুলটা নারী ও তদীয় উপপতির শাসনে ক্রোধান্ধ হইয়া উহাদিগকে হত্যা করিয়া বসেন, তিনিও সেই দণ্ডবিধির আইন অনুসারে হত্যাপরাধে অভিযুক্ত হইয়া প্রায় দ্বীপান্তর প্রেরিত হন। সেই দণ্ডবিধি স্ত্রীলোকের সতীত্ব অপেক্ষা দেশের লোকসংখ্যাবৃদ্ধির অধিক গৌরব করে বলিয়া তাদৃশ হত্যাকারীর উপর অযথোচিত দয়া প্রকাশ করেনা। ধন্য ইংরাজজাতির দণ্ডবিধিজ্ঞান! ধন্য তাঁহাদের সমাজতত্ত্বজ্ঞান! কোথায় সেই বীরপুরুষ বীরধর্ম্মপালনের জন্য পুরস্কৃত হইবেন? না কোথায় তিনি সেই দণ্ডবিধির সমক্ষে প্রাণদণ্ডার্হ অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া বিপন্ন হইতেছেন। পূর্ব্বে হিন্দুরাজাদের আমলে তিনি শিরোপা পাইয়া পুরস্কৃত হইতেন। এখন সময় গুণে তিনি ঘোর বিপদে পতিত হন। সুতরাং আমরাও ব্যভিচারিণী নারীকে গৃহ হইতে বহিস্কৃতা করিয়া উহার শাসন করি, পারৎপক্ষে অস্ত্রাদি চালনা করিতে যাই না।

ইহা আমাদের পরম গৌরবের বিষয় যে, ভারত স্ত্রীজাতির সতীত্বধর্ম্মের জন্য চিরবিখ্যাত এবং এ বিষয়ে এ দেশ সমগ্র ভূমণ্ডলের ভিতর সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। যে ধর্ম্ম সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তী প্রভৃতি সতী সাধ্বী আদর্শমহিলাগণের ক্রিয়াকলাপ স্ত্রীজাতির সমক্ষে ধারণ করিয়া উহাদিগকে পতিপরায়ণা

হইতে চিরপ্রোৎসাহিত করে, যে ধর্ম্ম সতীদাহে অনন্ত পুণ্যনির্দ্দেশ করিয়া উহাদিগকে পতিসহমরণে উত্তেজিত করে, সে ধর্ম্মের ন্যায় জগতের আর কোন্ ধর্ম্ম সতীত্বধর্ম্মের এতদূর আদর করিবে ?

দেখ, অন্যান্য দেশে কেবলমাত্র পতির বিরাগভাজন হইবার ভয়ে স্ত্রীলোকেরা তাহার সমক্ষে লজ্জাশীলতা দেখায় ও পরপুরুষের সহিত ব্যভিচার করিতে সম্মত হয় না। কিন্তু উহারা কদাচ ভাবে না, ইহাতে আমাদের ধর্ম্মনাশ হইবে এবং আমরা পাপপঙ্কে লিপ্ত হইব। পরন্তু হিন্দুধর্ম্মের গুণে এ দেশের মহিলাগণ ব্যভিচারে ধর্ম্মনাশ হইবে, কুলনাশ হইবে ও জাতিনাশ হইবে, এইরূপ ভাবিয়া থাকেন; বিবাহিত পতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিবেন, অথবা তাঁহার বিরাগভাজন হইবেন, এ সব কথা আদৌ ভাবেন না।

আরও দেখ, এদেশে কত শত শত মনস্বিনী সীমন্তিনী নৃশংস পুরুষজাতির পাশব অত্যাচারের সমক্ষে বীরদর্পে, অম্লানবদনে ও নিঃসঙ্কোচে স্বীয় বক্ষঃস্থলে ছুরিকা আঘাত করত প্রাণবিসর্জ্জন করিয়া নিজের সতীত্বধর্ম্ম রক্ষা করিয়া গিয়াছেন! অন্যান্য দেশে এ দৃশ্য অতীব বিরল। তথায় স্ত্রীজাতি তথা-কথিত একটা মনের ভ্রান্তি সতীত্বধর্ম্মের বেদিসমক্ষে নিজ প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত হইবে বা শিহরিয়া উঠিবে।

হিন্দুসমাজ দুশ্চরিত্রা কুলটা নারীকে গৃহচ্যুতা, সমাজচ্যুতা ও জাতিচ্যুতা করিয়া অতি কঠোর ভাবে শাসন করিয়া থাকে। অন্য কোন সমাজে এতদূর কঠোর শাসন দেখিতেপাওয়া যায় না। তথায় বিবাহরূপ চুক্তিনামা ছেদন করিলেই যথেষ্ট হইয়া থাকে। আজকাল যে দেশ যত সুসভ্য, তথায় এই বিবাহ বন্ধনছেদনই দৈনন্দিন ঘটনা। ইহাতে বুঝা উচিত, সে সমাজের অভ্যন্তর কিরূপ পূতিগন্ধে পূর্ণ।

এ দেশে নারীজাতি এত কঠোর ভাবে শাসিত হয় বলিয়া উহাদের চরিত্র অনেক স্থলে ব্যভিচারদোষে দূষিত হয় না। উহারা

এত কঠোর ভাবে শাসিত হইতেছে, তথাচ শাস্ত্রকারেরা বলেন „পুরু- ষস্য ভাগ্যং স্ত্রিয়াং চরিতং দেবা ন জানন্তি কুতো মানবাঃ”। বস্তুতঃ নারীজাতির মন অল্প কারণে বিকৃত হইতে পারে বা অল্প প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইতে পারে। স্থিরনিশ্চয় করিয়া রাখ, যে নারী স্বামী ব্যতীত অপর কোন পুরুষের আস্বাদ পায়, তাহার মন সদা পর পুরুষের প্রতি ধাবিত হইবে; আর যে নারী পাঁচজনের সহিত সঙ্গত হইবে, তাহাব প্রায় সন্তানাদি জন্মিবে না; যদি জন্মে, সে ত জারজ হইবে এবং পিতৃপুরুষগণ তদ্দত্ত পিণ্ডদান গ্রহণ করিবেন না। এই সকল কারণে স্ত্রীজাতির সতীত্ব রক্ষা করিবার জন্য উহাদিগকে কঠোর ভাবে শাসন করা উচিত। এ স্থলে সাম্যবাদী পাঠক বলি- বেন, স্ত্রীলোকের ব্যভিচারে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই সমভাবে অপরাধী এবং অনেক স্থলে দেখা যায়, পুরুষই স্ত্রীলোককে পাপপথে প্রলো- ভিত করাতে অধিক অপরাধী হইয়া থাকে; তবে কেন হিন্দুসমাজ পুরুষের দোষ উপেক্ষা করিয়া স্ত্রীজাতির উপর কঠোর শাস্তি বিধান করে? ইহা কি এ সমাজের পক্ষে উহাদের উপর অবিচার নয়? বিশেষ অনুধাবন করিলে বুঝা যায়, পুরুষকৃত দুষ্কর্ম্মের স্থায়ি চিহ্ন উহার নিকট থাকে না! কিন্তু স্ত্রীলোককৃত অপরাধের স্থায়ি চিহ্ন উহার নিকট থাকে। যদি ব্যভিচার দ্বারা স্ত্রীলোক গর্ভবতী হয়, বংশবীজ অশুদ্ধ হইবে, বর্ণশঙ্কর বা জারজ সন্তান উৎপন্ন হইবে। ইহাতে হিন্দুসমাজের ঘোর অনিষ্টোৎপত্তি হইবে। যে সমাজ জাতিভেদ দ্বারা স্তরে স্তরে বিভক্ত হইয়া সুশৃঙ্খলতায় পূর্ণ, সে সমাজে বর্ণশঙ্কর কিরূপ অমঙ্গলের কারণ। এ জন্য এ সমাজ খড়্গহস্ত হইয়া ব্যভিচারিণী নারীকে এত কঠোর ভাবে শাসন করিতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু ব্যভিচারী পুরুষকে সমাজ কোনরূপ শাসন করে না বটে, কিন্তু পূর্ব্বে রাজন্যবর্গ ও জমিদারগণ উহার অর্থদণ্ড করিয়া এক প্রকার শাসন করিতেন। এখন ইংরাজরাজের দণ্ডবিধি ব্যভিচারের জন্য কোন লোককে কিছু-

মাত্র শাস্তি বিধান করেনা, স্ত্রীপুরুষের সম্মতি থাকিলে সাতখুন মাপ।

আরও দেখা যায়, যে সমাজে স্ত্রীজাতির উপর পুরুষজাতির প্রাধান্য অধিক, তথায় পুরুষজাতি ব্যভিচারের জন্য স্ত্রীলোকের শাসন করে, যেমন প্রাচ্য সমাজ। আর যে সমাজে পুরুষের উপর স্ত্রীলোকের প্রাধান্য অধিক, তথায় স্ত্রীলোকই ব্যভিচারের জন্য পুরুষকে শাসন করে এবং স্থলবিশেষে বিবাহ বরখাস করিয়া দেয়। তথায় মেমসাহেব ব্যভিচার করিলেই সাহেবকে ঘাড় পাতিয়া সকল সহ্য করিতে হয়। তিনি ত উহার ভেড়ুয়া।

সতীদাহ।

স্মরণাতীত কাল হইতে এ দেশে সতীদাহ চলিয়া আসিতেছিল। শতাব্দী হইতে চলিল, ইহা বন্ধ হইয়াছে। তথাচ এতৎ সম্বন্ধে কিঞ্চিত সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

সতীদাহ সতীত্বধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা। পূর্ব্বে যে মনস্বিনী সাধ্বী রমণী মৃতপতির ক্রোড়দেশে স্বমস্তক বিন্যাস পূর্ব্বক চিতানলে ভস্মীভূতা হইতেন, তিনি সমাজে সতী বলিয়া পূজিতা হইতেন। বিবাহকাল হইতে তিনি স্বজীবনে পতিসেবারূপ যে মহাযজ্ঞ আরম্ভ করিতেন, প্রাণপতির মৃত্যুকালে তদীয় চিতানলে নিজ দেহ বিসর্জ্জন দিয়া সেই মহাযজ্ঞের পূর্ণাহুতি দিতেন। তিনি আজীবন যে পতি-পরায়ণতারূপ মহাব্রতে ব্রতী হইতেন, পতির মৃত্যুকালে সেই জীবনব্রত উদ্‌যাপন করিয়া নিজ জীবন বিসর্জ্জন দিতেন। অনেকের মতে দ্বিসহস্র বৎসর এ প্রথা হিন্দুসমাজে প্রবল ছিল এবং ক্ষত্রিয় জাতির ভিতর বীররমণীগণ ইহাকে প্রথম প্রবর্ত্তিত করিয়া যান।

সতীদাহের কথা উত্থাপিত হইবামাত্র আমাদের কোন কোন সুশিক্ষিত বান্ধব ইহার নিন্দাবাদ করিয়া বলিবেন, “রে বর্ব্বর হিন্দুধর্ম্ম! তুমি কি নিষ্ঠুর! কি নির্ঘৃণ! কেন তুমি অকারণ

এমন লোমহর্ষণ ব্যাপার উপদেশ দিয়াছিলে, যাহা শুনিয়া আমাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হইতেছে ও শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে ? কেন তুমি অনর্থক এতগুলি অবলা সরলাকে জীবন্ত দগ্ধ করিতে উপদেশ দিয়াছিলে ? আর হিন্দুসমাজই কি নিষ্ঠুর। এই লোমহর্ষণ ব্যাপার ইহা আগ্রহের সহিত,স্থলবিশেষে বলপূর্ব্বক সম্পাদন করাইত ? আর শাস্ত্রকারেরাই বা কতদূর অর্ব্বাচীন ! তাঁহারা কি না ধর্ম্মের নামে সুকুমারমতি অবলাগণকে ঘোর অধর্ম্ম শিক্ষা দিতেন ও প্রাণে মারিতেন ? পঞ্চদশবর্ষীয়া বিধবাবালা অশীতিবর্ষবয়স্ক বৃদ্ধের সহিত পুড়িয়া মরিবে, আর পাঁচজনে বাজনা বাজাইয়া আমোদ করিবে ইহা অধর্ম্ম নয় ত আর কি ?

একবার ভাব দেখি; শরীরের কোন স্থান দগ্ধ হইলে কিরূপ যন্ত্রণায় অস্থির হইতে হয় ? এখন একটী সুকুমার নবনীতনিভ জীবন্ত দেহ প্রদীপ্ত হুতাশনে একেবারে দগ্ধ হইবে এবং তদুপরি কলসপূর্ণ ঘৃত আহুতি প্রদত্ত হইবে, বল দেখি, সে মৃত্যু কতদূর যন্ত্রণাদায়ক ? সে দৃশ্য কতদূর ভয়াবহ ও কতদূর হৃদয়শোণিত-শোষণকারী। ওহে করুণাময় ইংরাজরাজ ? তোমরা এই লোমহর্ষণ ব্যাপারে অবলাদিগের দারুণ যন্ত্রণা দর্শনে ব্যথিতহৃদয় ও দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া ভাবিয়াছিলে, যে একটা মনের ভ্রান্তি তথাকথিত সতীত্ব ধর্ম্মের জন্য উহারা অশেষ যন্ত্রণা পাইয়া দেহ বিসর্জ্জন করিতেছে, পরিশেষে আইন বলে এ কুপ্রথা ভারতে রহিত করিয়া দিয়াছ; ইহাতে তোমরা যে কেবল নারীজাতির আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছ তাহা নহে; আমরাও তোমাদিগকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি।

এখন সতীদাহে হিন্দুধর্ম্মের কি মহোচ্চ উদ্দেশ্য, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করা উচিত। যে সতীত্বধর্ম্ম দ্বারা হিন্দুসমাজ এতদূর উপকৃত, যে ধর্ম্ম স্ত্রীজাতির সর্ব্বোৎকৃষ্ট আভরণ, সেই সতীত্বধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা

শিক্ষা দিবার জন্য এ ধর্ম্ম এমন লোমহর্ষণ ব্যাপার উপদেশ দিয়াছে এবং ইহাতে অক্ষয় স্বর্গবাস নির্দ্দেশ করিয়াছে। এই স্বর্গীয় উপদেশের গুণে মৃতভর্ত্তৃকা অবলা অম্লানবদনে, হাস্যমুখে, ব্রহ্মানন্দে নৃত্য করিতে করিতে প্রাণপতির মৃতদেহের সহিত চিতায় আরোহণ করিতেন এবং যৎকালে সেই হরগৌরীমূর্ত্তি প্রদীপ্যমান অগ্নিরাশিতে ভস্মীভূত হইয়া যাইত, উভয়ে সলিঙ্গশরীরে বিমানারোহণ পূর্ব্বক স্বর্গধামে চলিয়া যাইতেন।

বাইবেল পাঠে অবগত হওয়া যায়, ঈশ্বরের প্রিয়পুত্র ঈশাদেব পতিত মানবের উদ্ধারের জন্য নিজ প্রাণ উৎসর্গ করেন এবং মৃত্যুর তৃতীয় দিবসে কবর হইতে উত্থিত হইয়া সলিঙ্গশরীরে স্বর্গধামে চলিয়া যান। ধর্ম্মজগতে ধর্ম্মের অসীম মাহাত্ম্য চিরদিন এই প্রকারে বিঘোষিত হইতেছে। তবে যে বীররমণী জগতে সতীত্ব ধর্ম্মের মাহাত্ম্য দেখাইবার জন্য প্রাণপতির মৃতদেহের সহিত নিজ দেহ আহুতি প্রদান করিতেন, তিনিও কি সশরীরে স্বর্গধামে যাইতেন না? তবে যদি অক্ষয় স্বর্গবাসের প্রলোভন দেখাইয়া হিন্দুধর্ম্ম অবলাকে পতিসহমরণে প্রোৎসাহিত করিয়া থাকে, তাহাতে এ ধর্ম্মের কি অপরাধ?

বল দেখি, পাঠকপাঠিকাগণ! সতীর সেই জ্বলন্ত দেহ হইতে দর্শকদর্শিকাবৃন্দ ধর্ম্মের কিরূপ জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত পাইতেন? তাঁহারা কি সকলে সেই পবিত্র মঙ্গল্য চিতাভস্ম মস্তকে ধারণ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতেন না? ধর্ম্মের সেই পীঠস্থল দর্শন করিলেও কি তাঁহাদের অশেষ পুণ্য সঞ্চয় হইত না? যাঁহাদের সমক্ষে সেই পুণ্যবতী নারী মৃত পতির সহিত স্বদেহ বিসর্জ্জন দিতেন, তাঁহারা কি তদীয় পতিপরায়ণতা স্মরণ করাইয়া স্ব স্ব ভার্য্যাদিগকে সতীত্ব ধর্ম্ম উপদেশ দিতেন না?

সতীদাহের উদ্দেশ্য যে কত মহোচ্চ, তাহা একমুখে বর্ণন করা যায়না। দুঃখের বিষয়, আমরা অপকৃষ্ট যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। ধর্ম্মের এ মহোচ্চ দৃশ্য আমাদের নয়নপথে পতিত হয় নাই। কিন্তু যেরূপ শুনিতে পাই, ইহাতে বোধ হয় ইহার ভিতর হিন্দুধর্ম্মের মহোচ্চ উদ্দেশ্য নিহিত ছিল। যে সমাজে বিবাহসংস্কার দ্বারা দুইটী বিভিন্ন প্রকৃতির জীব একত্র একাধারে সর্ব্বাঙ্গে চিরদিনের জন্য এরূপ ভাবে মিলিত হয় যে, একের অস্তিত্বে অপরটী অস্তিত্ববতী, একের নাশে অপরের নাশও অবশ্যম্ভাবী, যে সমাজে নারীজাতি উদ্বাহসূত্রে আবদ্ধা হইবার পর ভক্তিভাজন স্বামীর শ্রীচরণসেবাই মহাব্রত জ্ঞান করে এবং যাবজ্জীবন একমনে, এক ধ্যানে ও সর্ব্বান্তঃকরণে সেই ব্রত পালন করে, যে সমাজে কাঙ্গালিনী নারী পতিরূপ অমূল্য নিধি পাইয়া স্বগৃহে রাজরাণী সাজে এবং আজীবন ছায়ার ন্যায় উহার অনুগমন করে, যে সমাজে পরমারাধ্য প্রাণাধিক পতির মৃত্যুতে নারী পুনরায় কাঙ্গালিনী হইয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে দেখিতে অকূলপাথারে নিমগ্না হয় এবং যোগিনী সাজিয়া জীবনের যাবতীয় সুখভোগে জলাঞ্জলি দেয়, সে সমাজে স্বয়ং প্রকৃতি অবলা বিধবাদিগকে পতিসহমরণে উত্তেজিত করে এবং সে সমাজের প্রকৃতিসেবক ধর্ম্মও উহাদের হৃদয়স্থ প্রাকৃতিক উদ্বেগানুসারে পতিসহমরণে প্রোৎসাহিত করিবার জন্য উপদেশ দেয় :—

তিস্রঃ কোট্যার্দ্ধ কোটীচ যানি রোমানি মানবে,
তাবৎ কালং বাসেৎ স্বর্গে ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি।
ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বিলাদুদ্ধরতি বলাৎ,
এবমুদ্ধৃত্য ভর্ত্তারং তেনৈব সহ মোদতে। (পরাশর সংহিতা)।

"দেহে সাড়ে তিন কোটী রোম বর্ত্তমান। এই সকল রোম দগ্ধ হয় বলিয়া যিনি স্বামীর অনুগমন করিবেন, তিনি ততকাল স্বর্গলোকে বাস করিবেন। যেমন সাপুড়ে সর্পকে বলপূর্ব্বক গর্ত্ত হইতে বাহির

করে, সেইরূপ সহমৃতা নারীও নিজ পতিকে বলপূর্ব্বক নরক হইতে উদ্ধার করিয়া তাঁহার সহিত স্বর্গধামে আনন্দ ভোগ করিবেন।"

শশিনা সহ যাতি কৌমুদী
সহ মেঘেন তড়িৎ প্রলীয়তে।
প্রমদা পতিবর্ত্মগা
ইতি প্রসিদ্ধং বিচেতনৈরপি।

(কুমারসম্ভবং)।

"চন্দ্রের সহিত জ্যোৎস্না চলিয়া যায়। মেঘের সহিত তড়িৎ লয় পায়। অতএব নারীজাতি যে পতিসহমরণে যাইবে, এ কথা অচেতন পদার্থ দ্বারা ভালরূপ প্রতিপাদিত হইতেছে।"

ধর্ম্মের এই সকল আশ্বাসবাণী পাইয়া অভাগিনী বিধবারা যে পতিসহমরণে যাইতে উত্তেজিত হইবে, ইহাতে কোন্ বিচিত্রতা? পুরাকালে কালেভদ্রে এক আধটা গ্রামে এক আধটা সতী হইতে পারিত। যে সে মনে করিলেই সতী হইতে পারিত না। যাহারা নিঃসন্তান ও স্বামীবিরহে একদণ্ড থাকিতে পারিত না, তাহারাই পুণ্যলাভের জন্য সহমরণে যাইত।

যখন এ প্রথা এতকাল হিন্দুসমাজে প্রচলিত ছিল, তখন নিশ্চয়ই ইহা দ্বারা এ সমাজের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইয়াছে। তাহা না হইলে কি প্রকারে এ প্রথা এতকাল স্থায়ী হইল? শতাব্দী হইতে চলিল, এ প্রথা রহিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও বিধবারা পতিসহ-মরণে যাইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়। দেশের কঠোর আইন কেবল উঁহাদিগকে দমনে রাখিতেছে।

ওহে প্রজাবৎসল ইংরাজরাজ! সতীদাহে ধর্ম্মের যে কোন মহৎ-উদ্দেশ্য থাকুক না কেন, তোমরা এই লোমহর্ষণ, গর্হিত ও বীভৎস কাণ্ড দর্শনে ব্যথিতও দয়ার্দ্র হইয়া অবলাজাতির উদ্ধার মানসে সুবিবেচনামত আইন বলে এ কুপ্রথা রহিত করিয়া কালের

উপযোগিতানুসারে ভারতের মঙ্গল সাধন করিয়াছ বটে; কিন্তু বল দেখি, তোমাদের মধ্যে যে সকল ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মের জন্য অগ্নিকুণ্ডে প্রাণাহুতি দিয়া গিয়াছেন, তোমরা কেন তাঁহাদের যশোরাশি জাতীয় ইতিহাসে এমন স্বর্ণাক্ষরে চিরদিন ঘোষণা করিতেছ?

কোথায় হে পূজ্যপাদ ইংরাজকুলতিলক ল্যাটিমার ও ক্রান্মার! তোমরা খৃষ্টধর্ম্মের মাহাত্ম্য বর্দ্ধনার্থ অগ্নিকুণ্ডে স্বদেহ বিসর্জ্জন দিয়া স্বদেশে যে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া গিয়াছ, তাহা কস্মিনকালে নির্ব্বাপিত হইবার নয়। তোমরা নিষ্ঠুর রাজ্ঞী মেরীর অত্যাচার বশতঃ প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া স্বর্গধামে চলিয়া গেলে, তথাচ নিজ ধর্ম্ম ত্যাগ করিলে না। তোমাদের মনের অসীম সাহস ও অমিততেজ দর্শনে স্বদেশবাসিগণ চিরদিন সহস্রমুখে তোমাদের যশঃ কীর্ত্তন করিতেছে।

সেইরূপ এদেশে যে সকল মহোদয়া মনস্বিনী বীররমণী সতীত্ব-ধর্ম্মের পবিত্র মন্দিরে স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে স্বদেহ বিসর্জ্জন করিয়া ভারতমাতাকে পবিত্রীকৃত করিয়া গিয়াছেন, আমরাও সহস্রমুখে তাঁহাদের গুণকীর্ত্তন কেন না করিব? প্রভেদের মধ্যে ইংলণ্ড দেশে অল্পসংখ্যক লোক এক সময়ে ধর্ম্মের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করাতে জাতীয় ইতিহাসে বিখ্যাত হইয়াছেন; আর এ দেশে আবহমানকাল অসংখ্য অসংখ্য পুণ্যবতী মহিলা সতীত্ব ধর্ম্মের যূপকাষ্ঠে প্রাণ উৎসর্গ করিয়া স্বর্গধামে চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের নাম কেহ কোথাও শুনিতে পান না।

ইতিহাসে সকলে পাঠ করেন, যে দিন চিতোরের মহারাণী বীররমণী পদ্মিনী দিল্লীশ্বর পাপিষ্ঠ আলাউদ্দিনের নিকট স্বীয় সতীত্ব-ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন, সে দিন স্বর্গের দেবতাগণ তদীয় বীরত্ব দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার উপর পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন। রাজপুতনার চারণগণ চিরদিন তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ

গায়িতেছে। কিন্তু ভারতের গ্রামে গ্রামে ও নগরে নগরে কত পদ্মিনী সতীত্বধর্ম্মের বেদি সমক্ষে এমন লোকাতিগ বীরত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা কি আমরা জানি? জঙ্গলে ময়ূর নাচে, কে দেখিতে যায়? জাতীয় ইতিহাসের অভাবে তাঁহাদের সুকীর্ত্তি অনন্ত কালের অনন্ত স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহা সুনিশ্চিত, যে যে স্থলে ও যে যে সময়ে তাঁহারা সতীত্বধর্ম্মের মন্দিরে এরূপ অসাধারণ বীরত্ব দেখাইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন, সেই সেই স্থলে ও সেই সেই সময়ে তাঁহারা সমধিক পূজ্যা ও যশস্বিনী হইয়া স্ত্রীসমাজের আদর্শ-স্থানীয়া হইয়াছেন। তবে অক্ষয় স্বর্গবাসের প্রলোভন দেখাইয়া যদি হিন্দুধর্ম্ম কতকগুলি পুণ্যবতী বিধবাকে পতিসহমরণে প্রোৎসাহিত করে, তাহাতে ইহার কোন্ অপরাধ?

আরও দেখ, যাঁহারা শত্রু হস্ত হইতে স্বদেশ রক্ষা করিবার জন্য সমরক্ষেত্রে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক নিজ নিজ প্রাণ উৎসর্গ করেন, স্বদেশবাসিগণ তাঁহাদের স্মরণার্থ কীর্ত্তিস্তম্ভাদি নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন। লোকবর্গকে দেশহিতৈষিতা শিক্ষা দিবার জন্য সকল দেশে তাঁহাদের প্রতি এতদূর সম্মান দেখান হয়। সেইরূপ সতীত্ব ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য স্থানে স্থানে সতীর চিতার উপর সমাধি নির্ম্মিত হইত।

এ সংসারে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। সকলকেই কোন না কোন অসাধ্য রোগে বা দৈব ঘটনায় আক্রান্ত হইয়া শমনসদনে যাইতে হইবে। কিন্তু যে লোকের অসাধারণ মৃত্যু দ্বারা সমাজ বিশেষরূপ উপকৃত হইবে, তিনি ইহসংসারে যশোমন্দিরের উচ্চস্থান অধিকার করিবেন এবং পরলোকেও বিশেষ সদ্গতি লাভ করিবেন।

যদি নিত্যমনিত্যেন নির্ম্মলং মলবাহিনা
যশঃ কায়েন লভ্যেত তন্ন লব্ধং ভবেন্নু কিং।

(হিতোপদেশঃ)

"যদি ক্ষণবিধ্বংসী মলবাহী শরীর দ্বারা স্থায়ী নির্ম্মল যশলাভ করা যায়, তবে সংসারে কি না লব্ধ হইল?" তবে স্ত্রীসমাজকে সতীত্বধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা শিক্ষা দিবার জন্য যদি হিন্দুধর্ম্ম পতিপরায়ণা বিধবাদিগকে মৃত পতির সহিত মৃত্যুকে সহাস্যবদনে আলিঙ্গন করিতে উপদেশ দেয়, তাহাতে ইহার কোন্ অপরাধ?

উদ্দেশ্য ও ফলাফল দেখিয়া সকল কার্য্যের দোষগুণ বিচার করা কর্ত্তব্য। অস্ত্রচিকিৎসায় ক্লোরোফরম অবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে হস্ত-পদাদি ছেদন করা প্রভূত যন্ত্রণাদায়ক ছিল। তৎকালে প্রাণরক্ষার্থে এত যন্ত্রণা দিয়াও অঙ্গবিশেষ ছেদন করা হইত বলিয়া কি অস্ত্র-চিকিৎসার দোষ দিতে হইবে? সেইরূপ যদি স্ত্রীসমাজকে সতীত্ব-ধর্ম্মের অলৌকিক দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য কোন কোন পুণ্যবতী বিধবা অগ্নিদাহের প্রভূত যন্ত্রণায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া মৃত পতির চিতা-নলে ভস্মীভূত হন এবং হিন্দুধর্ম্মও এরূপ মৃত্যুতে অক্ষয় স্বর্গবাস নির্দ্দেশ করে, তাহাতেই বা ইহার কোন্ অপরাধ?

আজকাল সভ্যদেশের দণ্ডবিধি সমাজশাসনের জন্য হত্যাকারীকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইয়া উহার প্রাণদণ্ড করিতেছে। এস্থলে শাসনতন্ত্র রাজ্যের মঙ্গলের জন্যই হত্যাকারীর এমন কঠোর দণ্ডবিধান করিয়া থাকে। এরূপ প্রাণদণ্ড করাতে দণ্ডবিধির কি দোষ দেওয়া কর্ত্তব্য? সেইরূপ যদি সতীত্বধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা শিক্ষা দিয়া সমাজের বহুসংখ্যক স্ত্রীলোককে সতী সাবিত্রী করিবার জন্য ধর্ম্মতন্ত্র কতকগুলি পতি-পরায়ণা বিধবাকে জীবন্ত দগ্ধ করত উহাদের প্রাণদণ্ড করে, দেশের মঙ্গল ভাবিয়া এরূপ প্রাণদণ্ড করাতে ধর্ম্মতন্ত্রের কোনরূপ দোষ দেওয়া কর্ত্তব্য নয়। প্রভেদের মধ্যে ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণবায়ু অত্যল্প সময়ে বহির্গত হইয়া যায় এবং ইহাতে তাদৃশ যন্ত্রণা নাই। কিন্তু সতীদাহ ব্যাপার প্রভূত যন্ত্রণাদায়ক, এজন্য অনেকের নিকট বীভৎস। তথাচ ইহার মহোপকার ভাবিয়া ইহার নিন্দা করা উচিত নয়।

শাসনতন্ত্র হত্যাকারীকে বলপূর্ব্বক ফাঁসি দিতেছে। কিন্তু সতী স্বেচ্ছায় সহমরণে যাইতেন। লোকে ফাঁসিকে ভয় করিতেছে বটে; কিন্তু হত্যাপরাধ সমাজে চিরদিন সমভাবে চলিতেছে। ইহাতে তাদৃশ মঙ্গল নাই; কালে ইহা রহিত হইবে। পরন্তু অশেষ পুণ্যলাভের জন্য সতী ঐরূপ মৃত্যুকে হাস্যবদনে আলিঙ্গন করিতেন ও নিজ জীবন বরীয়ান করিতেন। পূর্ব্বাপর সকল দিক ভাবিয়া দেখিলে হিন্দুধর্ম্মের কোনরূপ দোষ দেওয়াযায় না।

ইংরাজরাজ আইন বলে সতীদাহরূপ বীভৎস ব্যাপার রহিত করিয়া ভারতের অশেষ মঙ্গল সাধন করিয়াছেন বটে, কিন্তু এখন ও সময়ে সময়ে সহমরণ দৃষ্ট হইতেছে। এখনও স্থলবিশেষে পতি-পরায়ণা পতিব্রতা বিধবা উদ্বন্ধনে, বিষভক্ষণে বা জলনিমজ্জনে মৃত পতির উদ্দেশে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন। সে স্থলে পুণ্যবতী বিধবা স্বামীর প্রতি অনন্ত ও অনন্য প্রেমের খাতিরে বা বৈধব্য দশার অসহ্য যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য নিজ প্রাণ উৎসর্গ করেন। দণ্ডবিধির কঠোর আইনও নারীহৃদয়ের এই প্রকৃতিদত্ত উদ্বেগ রোধ করিতে সমর্থ হয় না। সত্য বটে, এই বীভৎস ব্যাপার রহিত হওয়াতে অনেক বিধবা প্রাণে বাঁচিয়াছে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভ্রূণহত্যা ও বেশ্যাবৃত্তির মহাপাপ সমাজে ক্রমশঃ অধিক প্রশ্রয় পাইতেছে।

ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায়, সতীদাহ ব্যাপারটী কালক্রমে এতদূর গর্হিত হইয়া পড়িয়াছিল, যিনি বহুবিবাহ করিতেন, তদীয় মৃত্যুকালে তাঁহার যাবতীয় পরিণীতা ভার্য্যাগণকে বলপূর্ব্বক চিতারোহণ করান হইত। কোন কোন স্থলে এরূপ দেখা যাইত যে, কোন কোন বিধবা অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া অর্দ্ধদগ্ধাবস্থায় চিতাহইতে বহির্গত হইত এবং পার্শ্ববর্ত্তিগণ বলপূর্ব্বক উঁহাকে দগ্ধ করাইত। এমন স্থলে সুসভ্য, ন্যায়বান ও পরম

কারুণিক ইংরাজরাজ আইন বলে এ কুপ্রথা রহিত করিয়া সমগ্র ভারতের যে কত মঙ্গল সাধন করিয়াছেন, তাহা বর্ণনাতীত।

যদি ধর্ম্ম সমাজের মঙ্গলের জন্য কোন প্রথা চালিত করে এবং কালক্রমে উহা জঘন্য ব্যাপারে পরিণত হয়, উদারনীতিজ্ঞ শাসনতন্ত্র প্রজাবর্গের মঙ্গলের জন্য ইহা রহিত করিতে বাধ্য। যেমন সুসভ্য ইউরোপে আজকাল উদার শাসনতন্ত্র ধর্ম্মতন্ত্রের ক্ষমতা খর্ব্ব করিয়া বিধর্ম্মিগণকে জীবন্ত দগ্ধ করিতে দেয় না, সেইরূপ উদাররাজনীতিজ্ঞ ইংরাজরাজও এ দেশে সতীদিগকে জীবন্ত দগ্ধ হইতে দেন না।

পরিশেষে বক্তব্য, সতীদাহ কালোচিত ধর্ম্ম নহে। এখন ঘোর কলির রাজত্ব চলিতেছে। এখন কি একটা সামান্য মনের ভাবের জন্য অবলা বিধবাদিগকে জীবন্ত দগ্ধ হইতে দেওয়া উচিত? ইহাকে রহিত করিবার জন্য, এস আমরা মহোদয় বেন্টিক সাহেবকে মুক্তকণ্ঠে সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করি। প্রবলপ্রতাপান্বিত বাদসাহ আকবর যাহা রহিত করিতে পারেন নাই, বুদ্ধিমান ইংরাজ তাহাই সামান্য আইন বলে এক কলমের আচড়ে রহিত করিয়াছেন।

অবরোধপ্রথা।

পরমপূজ্যপাদ ইংরাজদিগের ভিতর স্ত্রীজাতির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেখিয়া আজকাল অধিকাংশ শিক্ষিত যুবক স্ত্রীজাতিকে স্বাধীনতা প্রদান করিতে অভিলাষী। তাঁহারা মনে করেন, যতদিন হিন্দু মহিলাগণ অন্তঃপুররূপ কারাগারে অবরুদ্ধা থাকিবেন, ততদিন এ সমাজের প্রকৃত মঙ্গল নাই, ততদিন ইহা উন্নতির পথে, সভ্যতার পথে অগ্রসর হইতে পারিবে না। "না জাগিলে ভারতললনা, ভারত জাগে না, জাগে না।"

তাঁহাদেরই নয়নসমক্ষে ইংরাজমহিলাগণ অপরূপ বেশভূষায় বিভূষিত হইয়া পুরুষজাতির সহিত কেমন অবাধে মিশ্রিত হইতে

ছেন, অশ্বযানারোহণে বা মোটরকারে তাঁহাদিগের সহিত মধুরালাপ করিতে করিতে কেমন নির্ম্মল বায়ু সেবন করিতেছেন এবং সাধারণ সভাসমিতি আপনাদেরউজ্জ্বল রূপলাবণ্যে কেমন আলোকিত করিতে-ছেন। ইউরোপীয় সমাজের এরূপ বাহ্য চাকচিক্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহারাও ভাবেন, এমন সুদিন কবে হইবে, যেদিন আমরাও হিন্দু মহিলাগণের সহিত অবাধে মিশ্রিত হইব, তাঁহাদিগের বাক্যসুধা পান করিতে করিতে নির্ম্মল বায়ু সেবন করিব এবং সকল সভাসমিতি তাঁহাদের অলৌকিক রূপলাবণ্যে উদ্ভাসিত করিব।

যে অর্দ্ধসভ্য মুসলমান ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া স্ত্রীজাতিকে অন্তঃপুরের অন্ধকারে আবদ্ধ করিয়া রাখে, উহার ন্যায় এই বিংশ শতাব্দীর অত্যুজ্জ্বল সভ্যতালোকের মধ্যে স্ত্রীজাতিকে কি এমন অন্ধকারে রাখা উচিত? যখন পুরুষজাতি অবাধে সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতেছে ও ইচ্ছামত সকল কাজ করিতেছে, তখন উহারা কেন স্ত্রীজাতির উপর ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া তাহাদিগকে পিঞ্জরে আবদ্ধ রাখিবে? পুরুষজাতি যে সত্ত্বে সত্ত্ববান, স্ত্রীজাতিকেও সেই সত্ত্বে সত্ত্ববতী করা উচিত। আর অন্তঃপুরে রাখিলেই কি উহারা সতী সাবিত্রী থাকিবে? যিনি কুচরিত্রা বা কুলটা, তাঁহাকে পিঞ্জরে রাখ বা কারাগারের নির্জ্জন কুটীরে রাখ, তিনি সকল স্থলেই নিজ দুরভিসন্ধি পুরণার্থ অবসর পাইবেন; আর যিনি সচ্চরিত্রা, তিনি যেখানে থাকুন না, যে ভাবে থাকুন না, তেই তিনি প্রলোভিতা হইয়া বিপথে যাইবেন না এবং সর্ব্বত্র ব নিজের সতীত্ব রক্ষা করিবেন। এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা আমাদের সুশিক্ষিত বান্ধবগণ স্ত্রীস্বাধীনতার সম্পূর্ণ পক্ষ-

তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের মন এখন পাশ্চাত্য বিদ্যার পূর্ণ তিতে উদ্ভাসিত, যাহারা তথাকথিত ভারতীয় সভ্যতার পথপ্রদ-ক, তাঁহারা ইতিমধ্যে ইংরাজদিগের ন্যায় স্ব স্ব মহিলাগণকে সুন্দর

:বশভূষায় বিভূষিত করিয়া সর্ব্বত্র সমভিব্যবহারে লইয়া যাইতেছেন ও সভাসমিতি উজ্জ্বল করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের ভিতর যাঁহারা বিজ্ঞ ও পরিণামদর্শী, তাঁহারা বলেন, যত দিন না সাধারণ হিন্দু-সমাজ পাশ্চাত্য শিক্ষা পাইয়া সমুন্নত হইবে ও প্রকাশ্যভাবে স্ত্রীজাতিকে অভ্যর্থনা করিতে শিখিবে, ততদিন উহাদিগকে অবাধে স্বাধীনতা প্রদান করা অনুচিত। তাঁহারা মনে মনে অবরোধপ্রথার পক্ষপাতী হইলেও কার্য্যতঃ কোনরূপ চপলতা দেখান না এবং নিজ নিজ স্ত্রীকে স্বাধীনতা দেন না।

দেশের জনসাধারণ এখনও অবরোধপ্রথার বিশেষ পক্ষপাতী; উহারা স্ত্রীস্বাধীনতার উপর খড়্গহস্ত। বোধ হয়, বাল্যকালার্জ্জিত সংস্কারবশতই উহারা ঐরূপ ভাবিয়া থাকে। এখন দেখা যায়, কলিকাতা প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগরীতে স্ত্রীজাতি প্রকাশ্যভাবে অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইতে পায় না। কিন্তু পল্লীগ্রামে উহারা গঙ্গাস্নান, প্রতিমাদর্শন, নিমন্ত্রণরক্ষা প্রভৃতির জন্য প্রকাশ্যভাবে গমনাগমন করে। যাহা হউক, কোন স্থলে উহারা পুরুষজাতির সহিত অবাধে ও প্রকাশ্যভাবে মিশ্রিত হইতে পায় না।

এখন যুগধর্ম্মে হিন্দুসমাজে পাশ্চাত্য স্রোত যেরূপ খরবেগে বহমান, তাহাতে বোধ হয়, অবরোধপ্রথাটী কালে লুপ্ত হইতে পারে। এজন্য স্ত্রীস্বাধীনতার দোষগুণ এস্থলে বিশদরূপে বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

হিন্দু শাস্ত্র পাঠে অবগত হওয়া যায়, পুরাকালে যখন স্বাধীন ভারতবর্ষ সভ্যতাজ্যোতিতে উদ্ভাসিত ছিল, তৎকালে আধুনিক অবরোধপ্রথা হিন্দুসমাজে প্রবর্ত্তিত হয় নাই। কিন্তু স্ত্রীজাতির লজ্জাশীলতা ও সতীত্ব পূর্ণাংশে রক্ষিত হইত। এসকল বিষয়ে রাজন্যবর্গের ও দৃষ্টিপাত ছিল এবং সমাজও সামান্য ব্যভিচারের জন্য উহাদিগকে কঠোর ভাবে শাসন করিত। এরূপ স্থলে অবরোধপ্রথা অনাবশ্যক

বলিয়া কোথাও ইহা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। পরে মুসলমানযুগে যখন হিন্দুজাতির রাজশক্তি লুপ্ত হইল, তখন জাতিধর্ম্ম রক্ষার ন্যায় স্ত্রীসমাজের সতীত্ব রক্ষা করিবার জন্য অবরোধপ্রথা জেতৃ জাতির অনুকরণে নানা অঞ্চলে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

এখন জিজ্ঞাস্য, যে মুসলমানজাতি স্ত্রীজাতির উপর ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া তাহাদিগকে অন্তঃপুররূপ কারাগারে নিবদ্ধ রাখে, উহাদের অনুকরণ করিয়াই কি এ প্রথা হিন্দুসমাজে প্রবেশ করিয়াছে? সত্য বটে, উহাদের দেখাদেখি এ প্রথা এসমাজে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু এ স্থলে আমাদের প্রপিতামহগণ কঠোর আবশ্যকতায় বাধ্য হইয়া ইহাকে চালাইয়াছিলেন। তাঁহারা উহাদের সীস নোড়া লইয়া উহাদের দাঁতের গোড়া ভাঙ্গিয়া দিয়াছে।

মুসলমানজাতি চিরদিন অধিক কামপরায়ণ। ইংরাজরাজের দোর্দ্দণ্ডশাসন সত্বেও উহারা কত জায়গায় কত হিন্দুরমণীর সতীত্ব নাশ করিতেছে। মুসলমানযুগে ইহা দৈনন্দিন ঘটনা ছিল। এমন স্থলে অবলাগণকে রক্ষা করিবার জন্য, জেতৃ জাতির নিকট হইতে উহাদের সতীত্ব সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিবার জন্য এ প্রথা হিন্দুসমাজে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। এজন্য যে অঞ্চলে মুসলমানদিগের প্রতাপ অধিক, তথায় ইহা অধিক বলবতী? আর্য্যাবর্ত্তে তাহাদের প্রতাপ অধিক ছিল, তথায় ইহা যতদূর বলবতী, দাক্ষিণাত্যে ততদূর নয়। প্রধান প্রধান নগরীতে এ প্রথা যত প্রবল, পল্লীগ্রামে ততদূর নয়। শ্রেষ্ঠ জাতির ভিতর ইহা যত প্রবল, নীচজাতির ভিতর সেরূপ নয়। যাহা হউক, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত, জেতৃ জাতির নিকট হইতে হিন্দু মহিলাগণের সতীত্ব রক্ষা করিবার জন্যই এ প্রথা হিন্দুসমাজে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

যখন এ প্রথা এতকাল হিন্দুসমাজে চলিতেছে, তখন নিশ্চয়ই ইহা এ সমাজের বিশেষ উপযোগী এবং ইহা দ্বারা এ সমাজ সম্যক উপকৃত

হইতেছে। যথার্থ বলিতে কি, যে সমাজ স্ত্রীজাতির সতীত্ব ধর্ম্মের সম্যক সমাদর করে, সে সমাজ পরাধীন অবস্থায় নিজের জাতিধর্ম্ম রক্ষার ন্যায় স্ত্রীজাতির সতীত্ব রক্ষণে যত্নবান হইয়া যে অবরোধ প্রথাকে কালে বলবতী করিবে, তাহাতে কিছু মাত্র বিচিত্রতা নাই। যে মহারাষ্ট্র জাতির স্বাধীনতা অল্পদিনমাত্র লুপ্ত হইয়াছে, যাহাদের জাতীয়তা এখনও পূর্ণমাত্রায় সজীব, তাহারা পুরাকালীন হিন্দুজাতির ন্যায় স্ত্রীজাতিকে স্বাধীনতা প্রদান করিতেছেন; আর যে বঙ্গদেশে ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে স্বাধীনতা বহুদিবস হইল লুপ্ত হইয়াছে, তত্তৎ প্রদেশে কঠোর আবশ্যকতায় বাধ্য হইয়া লোকে স্ত্রীসমাজে অবরোধ-প্রথা প্রচলিত রাখিয়াছে।

ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যতদিন আমরা বিজাতীয়, বিধর্ম্মী শাসনতন্ত্রের অধীন থাকিব, ততদিন জাতিধর্ম্মরক্ষার ন্যায় স্ত্রীজাতির সতীত্বরক্ষার জন্য অবরোধপ্রথাকে পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখা উচিত। পরাধীন অবস্থায় যদি আমরা স্ত্রীজাতিকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়া সকল জাতির সহিত উহাদিগকে অবাধে মিশ্রিত হইতে দিই, আমরাই নিজ পাদমূলে নিজে কুঠারাঘাত করিয়া বসিব ও সমাজের অনিষ্ট সাধন করিব। দেখ, এমন কঠোর প্রথা ও জাতিভেদের কঠোর শাসনসত্ত্বেও কত শত হিন্দুমহিলা দেড়শতাব্দীর ভিতর ফিরিঙ্গ জাতির অঙ্কশায়িনী হইয়া হিন্দুসমাজ হইতে বহিষ্কৃতা হইয়া গিয়াছে! কত শত হিন্দুমহিলা বিজাতীয়দিগের অর্থ প্রলোভনে উহাদের নিকট নিজ সতীত্বরত্ন বিক্রয় করিয়াছে! অতএব স্থিরনিশ্চয় করিয়া রাখ, যতদিন ভারতমাতার এমন দুর্দ্দিন যাইবে, ততদিন স্ত্রীসমাজে স্বাধীনতা প্রদান করা সর্ব্বতোভাবে অনুচিত। স্ত্রীস্বাধীনতার সর্ব্বপ্রধান দোষ এই যে, ইহাতে সমাজে সতীত্ব ধর্ম্মের বিপর্য্যয় ঘটে। সকলেই স্বীকার করিবেন, স্ত্রীলোকেরা স্বাধীন ভাবে সমাজে বিচরণ করিলে, পাপিষ্ঠ নরাধমেরা আপনাদের

দুরভিসন্ধি পূরণার্থ যেরূপ সুযোগ পাইবে, অবরোধপ্রথা প্রবল থাকিলে, উহারা কদাচ সেরূপ সুযোগ পাইবে না। স্ত্রীপুরুষ একত্র অবাধে মিলিত হইলে পরস্পর পরস্পরকে প্রলোভিত করিবে। অতএব স্ত্রীজাতিকে পুরুষজাতির সহিত অবাধে মিশ্রিত হইতে দেওয়া কদাচ উচিত নয় এবং উহাদিগকে অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ রাখাই বিধেয়।

যে হিন্দুসমাজ জাতিভেদ দ্বারা স্তরে স্তরে বিভক্ত, যে সমাজে বিবাহবিষয়ে নানা কড়াক্রান্তি বিচার বর্ত্তমান এবং যে সমাজে বর্ণসঙ্কর চিরদিন হেয় ও ঘৃণাস্পদ, সে সমাজে স্ত্রীজাতির সতীত্ব পূর্ণভাবে বজায় রাখিবার জন্য অবরোধপ্রথা একান্ত আবশ্যক যদি বল, যে স্ত্রীলোক দুশ্চরিত্রা, তিনি অন্তঃপূরে থাকিলেও নিজ দুরভিসন্ধি পূরণার্থ নানা সুযোগ দেখিবেন; কিন্তু যদি সে স্ত্রীলোক স্বাধীন ভাবে বিচরণ করেন, তিনি প্রকাশ্যভাবে গণিকার ন্যায় ব্যবহার করিবেন।

স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ সরলা ও কোমলপ্রকৃতি; নৃশংস পুরুষজাতির অত্যাচারে ও প্রলোভনে উহাদের চরিত্র অল্পকারণেই দূষিত হইতে পারে। হিন্দুসমাজ উহাদিগকে নানাপ্রকারে শাসন করিয়াও সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ রাখিতে পারে নাই! এরূপ স্থলে উহাদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়া পুরুষজাতির সহিত অবাধে মিশ্রিত হইতে দেওয়া কি উচিত? যদি বল, রমণী সুশিক্ষিতা হইলে সতীত্ব ধর্ম্মের সম্যক আদর করিবেন; তিনি সমাজে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিলেও নিজের সতীত্ব ভালরূপ বজায় রাখিবেন এবং স্বামীর প্রতি কদাচ বিশ্বাসঘাতকতা করিবেন না। কিন্তু যে সুশিক্ষিতা বিবাহিতা রমণী পরপুরুষকে বলিতে পারেন, wife কি widow হয় না, (বিবাহ বিভ্রাট) তিনি বিধবা হইলেই সেই পরপুরুষকে বিবাহ করিবেন, তাঁহার আবার সতীত্বধর্ম্ম কি? পাশ্চাত্য শিক্ষা

পাইলে রমণী সতীত্ব ধর্ম্মে বিভূষিতা হন না। তিনি ত শিক্ষা করেন, ইহা মনের একটা ভ্রান্তিমাত্র, পরিণীত স্বামীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা না করাই তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য।

আমাদের সুশিক্ষিত বান্ধবগণ মনে করেন, স্ত্রীজাতি স্বাধীনতা পাইলে তাঁহারাও পুরুষদিগের ন্যায় অশেষ বিদ্যায় বিশারদা হইয়া সংসারকে সুখের আলয় করিবেন, স্থলবিশেষে অর্থোপার্জ্জন করিয়া স্বামীর সাহায্য করিবেন, এবং সন্তানদিগকে শৈশবকাল হইতে সুশিক্ষিত করিয়া দেশকে অচিরে সভ্যতাজ্যোতিতে উদ্ভাসিত করিবেন। তাঁহাদের মনের কি উচ্চাভিলাষ ও বিশ্বোদার ভাব! দেখিতেছি, তাঁহারা মর্ত্ত্যলোকে অমরাবতী স্থাপন করিতে ইচ্ছুক। তাঁহারা স্ত্রীলোককে সতী সাবিত্রী না করিয়া স্বর্গের উর্ব্বশী মেনকা করিতে চাহিতেছেন। যে পাশ্চাত্য সুধা পান করিয়া তাঁহারা আজ সুখৈশ্বর্য্যের চরমসীমায় উপনীত, সেই স্বর্গীয় সুধা স্ত্রীমহলে বিতরণ না করিলে কি প্রকারে তাঁহাদের গৃহ সুখশান্তির নিকেতন হইবে? যে বিদ্যাবলে তাঁহারা প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিয়া সপরিবারে সংসারে অশেষ সুখে সুখী হইতেছেন, সে সুখের মাত্রাবর্দ্ধনার্থ কি স্ত্রীজাতিকেও সেই স্বর্গীয় বিদ্যায় বিভূষিতা করা উচিত নয়? যাঁহারা এখন স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী, তাঁহারাই প্রকৃত সমাজদ্রোহী, তাঁহারাই ভারতমাতার কুসন্তান।

এখন একবার দেখ দেখি, পাশ্চাত্য সমাজের বাহ্য চাকচিক্যের অন্তরাল হইতে মধ্যে মধ্যে ওটা কি উঁকি মারিতেছে? কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ? ওটা যে কালসর্প! উহার ঘোর দংশনে মানবমাত্রেই পঞ্চত্ব পাইবেম। তোমার দর্শনশক্তি থাকে, কালসর্পের কালরূপ দর্শন করিয়া সাবধান হও, আর দর্শনশক্তি না থাকে, উহার বাহ্য চাকচিক্য দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া যাও। যে ভোগবিলাস পাশ্চাত্য সমা-

জের ঘোর অনর্থকর, তাহাই পাশ্চাত্য শিক্ষার অনিবার্য্য ফল। এই ভোগবিলাসে এ দরিদ্র দেশ অচিরে ছারখারে যাইবে।

যে পাশ্চাত্য গরল পান করিয়া সকলে আজ অর্দ্ধস্তিমিতনেত্রে নেশায় অঘোর ও বিঘোর, সেই কালকূট বিষ কি স্ত্রীমহলে বিতরণ করিতে আছে? ইহাতে কি সোণার ভারত মরুভূমিপ্রায় হইবে না? ইহাতে কি দেশ জাহান্নমে ডুবিবে না? পেটের দায়ে ইংরাজি পড়িতে হয়, মন দিয়া নিজে পড়াশুনা কর ও দুপয়সা আনিবার চেষ্টা দেখ, স্ত্রীলোকদিগকে তাহা শিখাইবার কি প্রয়োজন? উহাদিগকে ইংরাজি পড়াইয়া গাউন পরাইয়া কি মেম সাহেব সাজাইতে চাহ? উহাদের মুখে দুইটা ইংরাজি বুক্‌নী শুনিলেই কি তোমারা সার্থকজন্মা হইবে? অহহ! তোমাদের কি দুর্বুদ্ধি! কি মতিভ্রংশ!

যে শিক্ষাবলে নারী অশেষ গুণবতী হইয়া সন্তানের নিকট স্নেহময়ী মাতা, স্বামীর নিকট সতী সাধ্বী স্ত্রী ও সহধর্ম্মিণী হইবেন, যে শিক্ষাবলে তিনি গৃহস্থের যাবতীয় কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন করিয়া গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপা হইবেন, সেই শিক্ষায় তাহাকে বিভূষিতা কর; রামায়ণ ও মহাভারত তাঁহার হস্তে দেও, আর কালকূটপূর্ণ পাশ্চাত্য গ্রন্থ তাঁহার হস্তে দিও না। যিনি এরূপ শিক্ষায় সুশিক্ষিত হইবেন, তিনিই দীনদরিদ্র বাঙ্গালীর গৃহে শোভা পাইবেন এবং তিনি নিজের সদ্‌গুণরাশিতে স্বগৃহ উজ্জ্বল করিবেন। আর তাঁহাকে পাশ্চাত্য শিক্ষা দিয়া বিলাসিনী করিতে চাহ, তোমরাই নিজে আপনাদের সুখের পথে কণ্টক বপন করিবে।

বল দেখি পাঠক? একজন গাউনপরিহিতা সুশিক্ষিতা নব্যানারী সাধারণ সভায় গমন করিয়া নিজ রূপরাশিতে সভাগৃহ উজ্জ্বল করিতেছেন, না একজন সাড়ীপরিহিতা অশিক্ষিতা রমণী প্রতিমার সম্মুখে গললগ্নীকৃতবাসে পুত্রগণের সহিত পুষ্পাঞ্জলি দিতেছেন, সে দৃশ্য

তোমায় ভাল লাগিবে? প্রথম দৃশ্যটী তুমি পাপনয়নে ও হাস্তবদনে দেখিবে, আর দ্বিতীয় দৃশ্যটী তুমি অপার ভক্তির সহিত দেখিবে। বৃদ্ধা পুণ্যবতী পিতামহীর সহিত নবযুগের অলঙ্কারপ্রিয়া সুন্দর বেশভূষায় বিভূষিতা নব্যা নারীর তুলনা করিয়া দেখ, বুঝিতে পারিবে, আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা স্ত্রীসমাজের কতদূর উপযোগী।

পাশ্চাত্য জগতে স্ত্রীজাতি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে ও পুরুষজাতির সহিত অবাধে মিশ্রিত হয়? ইহাতে কি তথায় কোনরূপ বিষময় ফল উৎপন্ন হইতেছে না? যে দেশে সতীত্ব ধর্ম্মের আদৌ আদর নাই এবং অধিকাংশ পুরুষ যৌবনে নারীজাতি লইয়া প্রেমবিহার করিতে ভাল বাসে, তথায় সকলে স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতী হইবে; তাহা না হইলে, কিসের মজা! কিসের বাহার! পাশ্চাত্য সমাজের বাহ্য আড়ম্বর ও বাহ্য চাকচিক্য দর্শনে ব্যামোহিত হইও না। ইহার গভীরতম প্রদেশ অন্বেষণ কর, বুঝিতে পারিবে স্ত্রীস্বাধীনতা দ্বারা তথায় কত লোক প্রকৃত সুখী।

বল দেখি পাঠক! তোমার প্রাণের ভার্য্যা পরপুরুষ লইয়া স্বগৃহে আমোদপ্রমোদ করিবে, আর তুমি তাহা দেখিয়াও দেখিবে না, অথবা অন্যত্র চলিয়া যাইবে, রক্তমাংসের শরীর ধারণ করিয়া কে এ দৃশ্য সহ্য করিতে পারে? পেটের দায়ে তুমি অফিসে চাকরী করিতে গেলে, তোমার ভার্য্যাও সেই সুযোগে পুরুষবান্ধবের সহিত অন্যত্র প্রেমালাপ করিতে গেলেন, এ দৃশ্য কি তুমি কদাচ সহ্য করিতে পার? কিন্তু হায় কঠোর দেশাচারের সমক্ষে মনের উচ্চ ভাবাবলিকেও বলিদান দিতে হয়। ওহে সুসভ্য স্বাধীনতাপ্রিয় ইউরোপবাসিগণ! তোমরা মুখে স্ত্রীস্বাধীনতার যতই কেন প্রশংসা করনা কেন, তোমরা নিশ্চয়ই ইহা দ্বারা সময়ে সময়ে মর্ম্মাহত হইয়া এই দেশাচারের উপর সহস্র অভিসম্পাত প্রদান করিয়া থাক। যে সাম্যবাদের বীজমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তোমরা স্ত্রীজাতিকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান

করিতেছ, তাহাই তোমাদের সকল অনর্থের মূলীভূত কারণ। নারী-জাতির পাদপদ্মে তোমরা যে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছ, তাহাতে উহাদিগকে স্বাধীনতা না দিয়া যাবে কোথায়? সুতরাং সকল মর্ম্মবেদনা চোক কান বুজিয়া তোমাদিগকে সহ্য করিতে হইবে।

আরও দেখ সুকুমারী নারীজাতি আমাদের নয়নতারা, উহা-দিগকে এই ভবমরুভূমির প্রচণ্ড আতপে ও প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে নিক্ষেপ করা কি উচিত? আমরা শ্রমশীল কষ্টসহিষ্ণু পুরুষজাতি। আমরা বাহ্য জগতের বিপদরাশি মস্তকে বহন করিয়া উহাদের সুখের জন্য নিয়ত পরিশ্রম করিব; কিন্তু উহারা গৃহাভ্যন্তরে থাকিয়া অন্তঃপুররূপ নন্দনকাননের সুবাসিত স্নিগ্ধ নির্ম্মল বায়ু যেন চিরদিন সেবন করে। বেশ জানিবে, যে সকল সুপ্রথা দ্বারা আমাদের সংসার অশেষ সুখের আলয়, তন্মধ্যে স্ত্রীজাতির অবরোধপ্রথা অন্যতম। এখন বিশেষতঃ এই পরাধীন অবস্থায় এ প্রথা ত্যাগ করিয়া স্ত্রীজাতিকে স্বাধীনতা প্রদান করিলে, আমাদেব সোণার সংসার মরুভূমিপ্রায় হইবে।

সকল কথার সার কথা এই, যদি সাধারণ স্ত্রীলোককে সতীত্ব ধর্ম্মে বিভূষিতা করিয়া সমাজের সুখ বর্দ্ধন করিতে চাহ, তবে অবরোধ-প্রথার পক্ষপাতী হইবে। আর যদি উহাদের সতীত্বের উপর লক্ষ্য-পাত না করিয়া স্বাধীন প্রেমে দেশকে মজাইতে চাহ, তবে ইংরাজ দিগের অসদনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়া উহাদিগকে স্বাধীনতা প্রদান কর এবং অবাধে পুরুষজাতির সহিত মিশ্রিত হইতে দেও। ইহাতে সমাজে যে বিষময় ফল উৎপন্ন হইবে, তাহা তোমার ভবিষ্যবংশধরেরা ভোগ করিবে। সেজন্য পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, যতদিন ভারত পরাধীন থাকিবে, ততদিন স্ত্রীস্বাধীনতার কথা মুখে আনিবে না।

সপ্তম অধ্যায়।

দেশাচার

দেশবিশেষে নানা বিষয় লইয়া যে সকল রীতিনীতি ও আচার ব্যবহার কালক্রমে প্রবর্ত্তিত হয়, উহাদের সমষ্টিকে দেশাচার বলে। জনসাধারণের জীবনযাত্রানির্ব্বাহের জন্য ইহারা সামাজিক নির্ব্বাচনে সমাজবিশেষে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। যে সমাজের যেরূপ অনা-টন, শিক্ষা ও দীক্ষা, সে সমাজে সেইরূপ দেশাচার কালক্রমে প্রব-র্ত্তিত হয় এবং কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে ইহারা আবশ্যকমত কথ-ঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে।

দেশাচার দুইপ্রকার মৌলিক ও বাহ্য। যে সকল রীতিনীতি সমাজদেহের অস্থিমজ্জায় নিহিত, যদ্দারা সমাজবিশেষ জগতে প্রকৃষ্টরূপ চিহ্নিত ও বিশেষিত, উহাদিগকে মৌলিক দেশাচার বলে। উহাদিগকে পরিহার করিলে জাতির জাতীয়তা নষ্ট করা হইবে। আর পরিচ্ছদাদি বিষয়ে যে সকল আচারব্যবহার সমাজের বাহ্য স্তরে নিহিত, উহাদিগকে বাহ্য দেশাচার বলে। উহাদের পরিবর্ত্তনে জাতির জাতীয়তা নষ্ট হইবে না এবং সমাজের তাদৃশ অমঙ্গল ঘটি-বেনা।

দেশের দেশাচারগুলি ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি ও সমাজনীতি দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। যে সকল রীতিনীতি ধর্ম্ম সমাজে প্রবর্ত্তিত করে, তাহা ধর্ম্মনীতির অনুমোদিত। ধর্ম্মযাজকগণ ইহাদের রক্ষক ও পৃষ্টপোষক। যে সকল রীতিনীতি ও আইন কানুন শাসনতন্ত্র রাজ্যের মঙ্গলের জন্য প্রতিষ্ঠিত করে, তাহা রাজনীতির অনুমোদিত। রাজা ও তাঁহার কর্ম্মচারিবর্গ ইহাদের রক্ষক ও পৃষ্ঠপোষক। যে

সকল রীতিনীতি লোকাচারে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা সমাজনীতির অনুমোদিত। ইহারা সামাজিক নির্ব্বাচনে প্রতিষ্ঠিত বলা উচিত। সমাজ নিজের পছন্দমত ইহাদিগকে প্রবর্ত্তিত করে। সমাজের নেতৃবৃন্দ ইহাদের রক্ষক ও পৃষ্ঠপোষক। তাঁহারাই ইহার প্রতিনিধি এবং তাঁহারাই ইহার বিবেকস্বরূপ। তাঁহারাই সকল দেশে মানবসমাজকে সকল সময়ে চালাইয়া আসিতেছেন।

এক এক দেশে এক একবিষয় লইয়া একপ্রকার দেশাচার কালক্রমে প্রবর্ত্তিত হয়। অনুচিকীর্ষা হৃদয়ে প্রবল বলিয়া সকলেই প্রতিবেশিবর্গ ও বন্ধুবর্গের অনুকরণে সদা ব্যগ্র। ইহাতেই সমাজবিশেষে একপ্রকার দেশাচার কালক্রমে প্রচলিত হইয়া থাকে। তোমার বন্ধুবর্গ ও প্রতিবেশিবর্গ যেরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে ও যেরূপ আচারব্যবহার অনুসরণ করে, তুমিও সেই রূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে ও সেইরূপ আচারব্যবহার অবলম্বন করিবে। তাহারা যে খাদ্য ভোজন করে, তুমিও সেই খাদ্য পছন্দ করিবে। তাহারা যেরূপে খাদ্য পাক করে, তুমিও সেইরূপে খাদ্যপাক করিতে শিখিবে। তাহারা যেরূপে ভোজন করে, তুমিও সেইরূপে ভোজন করিতে শিখিবে।

তাহারা যে বস্ত্র পরিধান করে, তুমিও সেই পরিধেয় বস্ত্র স্বতঃ পছন্দ করিবে। তাহারা যে প্রণালীতে বস্ত্র পরিধান করে, তুমিও বাল্যকাল হইতে সেই প্রণালীতে বস্ত্র পরিধান করিতে শিখিবে। তাহারা যেরূপে অর্থোপার্জ্জন করিয়া বা জীবনের প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে, তুমিও সেইরূপে অর্থোপার্জ্জন করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে শিখিবে। এইরূপে সমাজবিশেষে সংসারের নানা বিষয় লইয়া নানাপ্রকার দেশাচার কালক্রমে প্রচলিত হইয়া থাকে।

লোকযাত্রানির্ব্বাহের জন্য নানাদেশে নানাপ্রকার দেশাচার

প্রচলিত হইয়া থাকে। শরীর, পরিবার ও সমাজ রক্ষা করিতে পারিলে আমাদের লোকযাত্রানির্ব্বাহ করা হয়। উপরোক্ত তিন বিষয় লইয়াই নানা দেশে নানা রীতিনীতি ও আচারব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে।

এখন শরীররক্ষা বা দেহযাত্রানির্ব্বাহের জন্য নিম্ন লিখিত বিষয়ে নানা আচারব্যবহার দেখা যায়, যথা—

(১) খাদ্যনির্ব্বাচন, পাকপ্রণালী ও ভোজনপ্রণালী।

(২) পরিধেয় ও পরিধানপ্রণালী।

(৩) বসবাসের জন্য গৃহনির্ম্মাণপ্রণালী।

(৪) স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য স্নানবিধি ও ব্যায়ামাদি।

(৫) আমোদ প্রমোদের জন্য ক্রীড়া কৌতুক ইত্যাদি।

(৬) জীবনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসংগ্রহ বা অর্থোপার্জ্জন প্রণালী।

উপরোক্ত বিষয়গুলি লইয়া নানাদেশে নানা রীতিনীতি লোকাচারে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। যে দেশের যেরূপ অনাটন ও শিক্ষা, তথায় সেইরূপ রীতিনীতি প্রচলিত হয়। শীতপ্রধান বা গ্রীষ্মপ্রধান দেশে যেরূপ খাদ্য ও পরিধেয় আবশ্যক, তথায় সেইরূপ খাদ্য ও পরিধেয় প্রাকৃতিক কারণে প্রচলিত হইয়া থাকে। যে দেশ যেরূপ সভ্যতাসোপানে আরূঢ়, তথায় তদনুরূপ উৎকৃষ্ট রীতিনীতি লোকপরম্পরায় চলিয়া আইসে। যে জাতি অসভ্য অবস্থায় যৎসামান্য পর্ণকুটীরে বাস করিত ও চীর বল্কল ধারণ করিত, সে জাতি সুসভ্য হইলে রমণীয় অট্টালীকায় বাস করে ও সুন্দর পট্টবস্ত্র পরিধান করে। যাহা হউক, এই সকল রীতিনীতি সমাজের বাহ্যস্তরে নিহিত থাকে এবং অল্পকারণে পরিবর্ত্তিত হইতে দেখা যায়।

অর্থোপার্জ্জনবিধি, যদ্দ্বারা সকলে আপনাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করে, ইহা লোকপরম্পরায় প্রচলিত হইলেও দেশের

শাসনতন্ত্র দ্বারা সম্যক অনুশাসিত হইয়া থাকে। তাহার সাক্ষ্য দেখ, এ দেশের ব্যারিষ্টারী ওকালতী, মোক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারী, ডাক্তারী, প্রভৃতি যে সকল ভদ্রোচিত ব্যবসায় চালাইয়া লোকে প্রভূত ধনোপার্জ্জন করিতেছে, তাহা ইংরাজরাজপ্রতিষ্ঠিত। ইংরাজদের রাজত্ব রহিত হইলে ইহাদের তত কদর থাকিবে না।

এখন পারিবারিকধর্ম্মপালনের জন্য, বংশরক্ষার জন্য যে সকল আচার ব্যবহার প্রচলিত হয়, তাহা নিম্নে লিখিতেছি যথা :—

(১) উদ্বাহবিধি ও ইহার আনুষঙ্গিক যাবতীয় আচার ব্যবহার।

(২) পুত্রকন্যাগণের লালনপালনবিধি।

(৩). পরিবারপালনবিধি।

বিবাহবিষয়ক রীতিনীতি মানবধর্ম্মই সকল দেশে স্থাপন করে এবং স্মরণাতীত কাল হইতে প্রচলিত বলিয়া ইহারা সমাজমাত্রেই বদ্ধমূল ও লোকাচারে পবিত্রীকৃত। পরিবার সম্বন্ধে যাবতীয় রীতিনীতি ধর্ম্মই সকল দেশে স্থাপন করিয়া চিরদিন নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। মানবজাতির অশেষ মঙ্গলের জন্য পারিবারিক সংস্থান সমাজের প্রায় আদিম অবস্থা হইতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ইহার উপর ধর্ম্মের অনুশাসন চিরদিন সমভাবে চলিতেছে। ধর্ম্মই মানবহৃদয়ে নানা পারিবারিক ভাব স্ফুরণ করত তাঁহাকে চিরদিন সুখসাগরে ভাসাইতেছে ও তাঁহার গৃহকে স্বর্গের নন্দনকানন করিতেছে। ইহার উপর দেশের শাসনতন্ত্রের অনুশাসন অত্যল্প। ধর্ম্মবিষয়ক মতামত যতই কেন পরিবর্ত্তিত হউক না, পারিবারিক ধর্ম্ম সকল দেশে প্রায় একরূপ। কোন কালে ইহার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন বা ব্যতিক্রম ঘটে না। ইহা সনাতন ধর্ম্মের ন্যায় চিরদিন একস্রোতে প্রবাহিত হইতেছে।

জড়োপাসনা বল, পৌত্তলিকতা বল, একেশ্বরবাদ বল, সকল

প্রকার ধর্ম্মমতই পারিবারিক ধর্ম্মের নিকট চিরদিন নতশির এবং ইহার সম্যক আদর করে। পারিবারিক রীতিনীতি সকল দেশে লোকাচারে পবিত্রীকৃত। ইহারা সকল সমাজে বিধিবৎ প্রতিপালিত হইতেছে। ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠিত পরিবাররূপ পবিত্র মন্দিরের মাহাত্ম্য এত অধিক, যে রাজনীতি ইহার অভ্যন্তরে আদৌ হস্তক্ষেপ করে না।

সমাজরক্ষা হেতু দেশের ধর্ম্মতন্ত্র ও শাসনতন্ত্র উভয়েই সমভাবে মনোযোগী। মানবজাতির অশেষ মঙ্গলের জন্য যেমন ধর্ম্ম সমাজের নানা বিষয়ে হস্তক্ষেপ করত নানা দেশাচার প্রতিষ্ঠিত করে, শাসনতন্ত্রও সেইরূপ রাজনীতিঘটিত নানা বিষয়ে হস্তক্ষেপ করত নানা আইন কানুন প্রবর্ত্তিত করে। যে স্থলে ধর্ম্ম পরের দ্রব্য অপ-হরণে মহাপাপ নির্দ্দেশ করত সকলকে সাবধান করিতেছে, সে স্থলে শাসনতন্ত্র সমাজের মঙ্গলের জন্য অপহরণকারিকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া ইহার শান্তি রক্ষা করিতেছে। যে স্থলে ধর্ম্ম জলাশয় প্রতিষ্ঠার মহাপুণ্য নির্দ্দেশ করতঃ সকলকে তদনুষ্ঠানে প্রোৎসাহিত করে, সেস্থলে শাসনতন্ত্র বৃহৎ বৃহৎ তড়াগ বা জলের কল স্থাপন করিয়া দেশের মঙ্গল সাধন করে। যে স্থলে শাসনতন্ত্র সমাজের আধি ভৌতিক বিষয় চালাইয়া সর্ব্বতোভাবে ইহার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে চেষ্টা পায়, সে স্থলে ধর্ম্ম ইহার আধ্যাত্মিক বিষয় চালাইয়া সকলের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল সম্পাদান করে।

কোন কোন দেশে ধর্ম্মতন্ত্র শাসনতন্ত্র অপেক্ষা বলবৎ, যেমন প্রাচ্য সমাজ। ইহাতে স্থলবিশেষে ধর্ম্মনীতির সহিত রাজনীতির বিরোধ উপস্থিত হইয়া থাকে। সে দেশে ধর্ম্মই দেশাচার পরিচালিত করিয়া ইহার সুখ বর্দ্ধন করে। আর যে দেশে ধর্ম্মতন্ত্র ক্ষীণবীর্য্য, সে দেশে শাসনতন্ত্র ও লোকাচার অধিকাংশ দেশাচারকে সুপথে চালাইয়া ইহার সুখবর্দ্ধন করিতে চেষ্টা পায়। তাহার সাক্ষ্য, এ দেশে ধর্ম্মতন্ত্র অধিক প্রবল বলিয়া ইহাই জাতিভেদাদি প্রবর্ত্তন

করিয়া স্বসমাজকে চিরদিন ভালরূপ সুশাসিত করিতেছে। এই সমাজশাসনের নিকট দেশের শাসনতন্ত্র চিরদিন নতশির এবং উহার উপর ইহা কিছুমাত্র হস্তক্ষেপ করে না।

এখন জিজ্ঞাস্য, দেশাচার কি প্রকারে এক দেশ হইতে দেশান্তরে নীত হয়? দেশবিশেষে দেশাচারপ্রবর্ত্তনে ধর্ম্মের অনুশাসন পূর্ণ ভাবে চালিত হয়। যে সকল সুপ্রথা কোন এক ধর্ম্ম নিজের উৎকৃষ্ট মতানুযায়ী সমাজে স্থাপন করে, সে ধর্ম্ম যে যে দেশে প্রচারিত হয়, তত্তৎ অধিবাসিগণ উহার শ্রেষ্ঠ প্রথাগুলি অবলম্বন করিয়া জাতীয় উন্নতিসাধন করে। এইরূপে এক দেশের উৎকৃষ্ট প্রথাগুলি ধর্ম্ম দ্বারা দেশান্তরে প্রবর্ত্তিত হইতেছে। তদ্ভিন্ন দিগ্‌বিজয়, বাণিজ্য, তীর্থভ্রমণ প্রভৃতি যে সকল উপায়ে এক জাতি অন্য জাতির সংস্রবে আইসে, উহাদের দ্বারাও দেশাচার এক দেশ হইতে দেশান্তরে কিয়ৎপরিমাণে নীত হইতেছে।

ইতিহাস পাঠে বুঝা যায়, যখন সমাজবিশেষ কোন কারণ বশতঃ অন্য সমাজের সংস্রবে আইসে, তখন উভয় সমাজ পরস্পরকে নানা বিষয়ে অনুশাসিত করিতে থাকে। যদি উহাদের ভিতর এক সমাজ বিদ্যাবুদ্ধি ও ধর্ম্ম বিষয়ে অধিক সমুন্নত হয়, ইহার সংসর্গে অপর নিকৃষ্ট সমাজ নানা বিষয়ে নানা উপকার পায়। এই প্রকারে এক সমাজ অন্য সমাজের সংস্রবে ক্রমশঃ উন্নতঃ পদবীতে অধিরোহণ করিতে থাকে এবং এই প্রকারে একের উৎকৃষ্ট প্রথাগুলি অন্য সমাজে কালক্রমে অনমুভূতভাবে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। এই প্রকারে পৃথ্বীতলে জাতিবিশেষের ক্রমোন্নতি সাধন হইতেছে।

এইরূপ নানা উপায়ে সমাজবিশেষ উন্নতির পথে, সভ্যতার পথে ধাবিত হইলেও স্বয়ং প্রকৃতি ইহাকে রক্ষণশীল করিতে চেষ্টা পায়। যে সকল প্রথা তথায় বহুকাল হইতে প্রচলিত, তাহা উৎকৃষ্ট হউক বা অপকৃষ্ট হউক, বাল্যকালার্জ্জিত সংস্কারবশতঃ সকলে উহাদের

স্বতঃ পক্ষপাতী হয় এবং সহজে পরিহার করিতে চায় না। এস্থলে যে সমাজ প্রকৃতি দ্বারা অধিক পরিমাণে চালিত, সে সমাজ স্বকীয় পুরাণপদ্ধতি বজায় রাখিয়া রক্ষণশীল হয় এবং তদবস্থায় বহুকাল স্থায়ী হয়। জগতের অনন্ত পরিবর্ত্তনের মধ্যে সে সমাজ এই প্রকারে স্থিতিশীল না হইলে কালক্রমে ইহা নষ্ট হইয়া বিভিন্নসমাজে পরিণত হইয়া থাকে। স্থিতিশীলতাবশতঃ ভিন্ন ভিন্ন সমাজ জগতে সভ্যতার ভিন্ন ভিন্ন পদবীতে আরূঢ় দেখা যায়।

যে জগতে উন্নতির সীমা আছে, অবনতিরও সীমা আছে, সে জগতে এক মাত্র রক্ষণশীলতাই জাতিবিশেষকে এক এক অবস্থায় স্থায়ী করিয়া দেয়। প্রত্যেক জাতির জাতীয় জীবনে রক্ষণশীলতা ও উন্নতিশীলতা এতদুভয়ের মধ্যে মহাদ্বন্দ্ব সংঘটিত হইতেছে। কখনও বা ইহা রক্ষণশীলতা দ্বারা চালিত হইয়া সাম্যাবস্থায় থাকে ও নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখে; কখনও বা ইহা উন্নতিশীলতা দ্বারা চালিত হইয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হয় ও জগতে নিজের কীর্ত্তি-কলাপ বিকীর্ণ করে।

যে হিন্দুসমাজ এতকাল পুরাণ পদ্ধতি বজায় রাখিয়া নিজের বৈশেষিকত্বের গৌরব করে, সে সমাজ চিরদিন প্রকৃতি কর্ত্তৃক অধিক পরিমাণে পরিচালিত হইতেছে। এ সমাজ চিরকালই কৃত্রিমতার অনাদর করিয়া প্রাকৃতিক অকৃত্রিমতার গৌরব করে; এজন্য সেই প্রাচীন কালের বিশুদ্ধ আর্য্যশোণিত আমাদের শিরায় শিরায় এখনও বহমান এবং সেই প্রাচীন কালের প্রথাগুলি আমাদের ভিতর এখনও অক্ষুণ্ণ প্রতাপেও অপ্রতিহত ভাবে বর্ত্তমান। সত্যবটে, এ সকল চিরন্তন প্রথাগুলি কালের অনাটনের সঙ্গে অনেক স্থলে ও অনেকাংশে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; কিন্তু ইহাদের মূলপ্রকৃতি কস্মিন কালে নষ্ট হয় নাই। জাতিভেদপ্রথা ও জীবনের বিবিধ সংস্কার, যাহা হিন্দুসমাজের অস্থিমজ্জায় নিহিত, তাহা পুরাকালে

আর্য্যসমাজে যেরূপ ভাবে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, এখনও উহারা সর্ব্বত্র সেই ভাবে প্রচলিত রহিয়াছে; অথচ যুগধর্ম্মে কালের অনাটনের সঙ্গে উহারা কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

এ মর জগতে সকলই নশ্বর ও পরিবর্ত্তনশীল। সকল বিষয়ে পরিবর্ত্তনই যুগধর্ম্ম। পরিবর্ত্তন ব্যতীত কোন বিষয় জগতে স্থায়ী হইতে পারে না। হিন্দুসমাজের চিরন্তন প্রথাগুলিও নিজের মূলপ্রকৃতি বজায় রাখিয়া কালের অনাটনের সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হইতে হইতে ভারতে স্থায়ী হইয়াছে। যে সকল রাষ্ট্রবিপ্লব ও ধর্ম্মবিপ্লব দ্বারা এ দেশ মধ্যে মধ্যে আক্রান্ত হইয়াছে, উহারা ইহার চিরন্তন প্রথাগুলিকে সমূলে নাশ করিয়া সমাজ ধ্বংস করিতে পারগ হয় নাই; পরন্তু ঐ সকল প্রথাই কালের উপযোগিতানুসারে কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া এতকাল স্থায়ী হইয়াছে ও হিন্দুজাতিকে জগতে অমর করিয়াছে। বল দেখি পাঠক! ভূমণ্ডলের কোন্ জাতি এত বাধাবিঘ্ন সত্ত্বে, এত বিপ্লবের মধ্যে নিজের জাতীয়তা রক্ষা করিয়া পবিত্র আর্য্যশোণিতের গৌরব করিতে পারে? প্রাচীন গ্রীশ ও রোমের আর্য্য অধিবাসিগণ আকৃতিতে এ দেশের আর্য্যদিগের ন্যায় ছিলেন। আজ কাল তত্রত্য লোকেরা আমাদের হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। ইহার প্রধান কারণ, উহাদের শোণিত, নানা প্রকারে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে।

এখন হিন্দুসমাজের প্রথাগুলি চিরকাল প্রায় সমভাবে থাকিবার প্রধান কারণ কি? অনেকে বলেন, এদেশে ধর্ম্মতন্ত্র প্রবল বলিয়া সমাজনেতা ব্রাহ্মণজাতির সামাজিক প্রভুত্ব চিরকাল সমভাবে চলিতেছে। কি বৈদিক যুগ, কি স্মার্ত্ত যুগ, কি পৌরাণিক যুগ, কি ভারতের স্বাধীন অবস্থা, কি ইহার পরাধীন অবস্থা, সকল যুগে ও সকল অবস্থায় ধর্ম্মের প্রভাব হিন্দুসমাজে চিরদিন সমভাবে প্রবল। একারণ ব্রাহ্মণজাতির আধিপত্য চিরদিন সমভাবে

চলিতেছে। তাঁহারাই আবহমানকাল এ সমাজ চালাইতেছেন ও ইহার প্রথাগুলি সমভাবে রাখিয়া দিয়াছেন। বলি, যদি ঐ সকল প্রথা দ্বারা হিন্দুসমাজ ভালরূপ উপকৃত না হইত, ব্রাহ্মণজাতির কি সাধ্য, যে তাঁহারা ইহাদিগকে চিরদিন সমভাবে রাখিতে পারিতেন? অতএব সাহঙ্কারে বলা উচিত, ঐ সকল প্রথা হিন্দুসমাজের সম্পূর্ণ উপযোগী, উহাদের দ্বারা ঐ সমাজ চিরদিন সম্যক উপকৃত; এজন্য উহারা সামাজিক নির্ব্বাচনে এতকাল স্থায়ী হইয়াছে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, ভারত চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতার্ণবরূপ দুর্লঙ্ঘ্য অবরোধে বেষ্টিত বলিয়া হিন্দুজগৎ চিরদিন বাহ্য জগৎ হইতে পৃথক এবং উহাদ্বারা অল্প পরিমাণে অনুশাসিত। এ কারণ ইহার প্রথাগুলি চিরদিন সমভাবে চলিতেছে।

তাঁহাদের এ মতটী খণ্ডনযোগ্য। চিরকাল ভারত বাহ্য জগৎ দ্বারা অনুশাসিত হইয়া আসিতেছে। অনৈতিহাসিক সময়ে কাল্ডিয়া ব্যাবিলন, ইরান, মিসর প্রভৃতি অনেক দেশের সহিত ভারতের ঘনিষ্ঠ সংস্রব ছিল। ঐতিহাসিক সময়ে সভ্য গ্রীশ ও রোমের সহিত ভারতের নানা সংস্রব ছিল। অশোকাদি নৃপতিবৃন্দ বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারার্থ চীন প্রভৃতি নানাদেশে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী প্রেরণ করিতেন এবং শক, হুন শিথিয়ান প্রভৃতি নানা জাতি নানা সময়ে ভারতে প্রবেশ করিয়া রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। আরও দেখা যায়, আরব প্রভৃতি নানা দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছিল। এইরূপ নানাকারণে ভারত বাহ্য জগৎ দ্বারা চিরদিন অনুশাসিত হইয়াছে। মুসলমানজাতি ব্যতীত অন্যান্য যে সকল জাতি ভারতে আসিয়াছিল, সকলে কালক্রমে হিন্দুজাতির প্রথা অবলম্বন করিয়া হিন্দু হইয়া গিয়াছে, কেহই ঐ সকল প্রথা পরিহার করেনাই।

যাহা হউক, যখন বৌদ্ধধর্ম্ম সহস্র বৎসর ভারতে প্রচলিত

থাকিয়াও আমাদের জাতিধর্ম্ম গ্রাস করিতে পারে নাই, যখন প্রবল পরাক্রান্ত মুসলমানধর্ম্ম পঞ্চ শতাব্দী ব্যাপিয়া ভারতে একাধিপত্য করিয়াও আমাদের জাতিধর্ম্ম গ্রাস করিতে পারে নাই, যখন বিজ্ঞানবলে বলীয়ান খৃষ্টধর্ম্ম দেড় শতাব্দীতে আমাদের জাতিধর্ম্ম গ্রাস করিতে পারে নাই, তখন কেন আমরা সুশিক্ষিত হইয়া আমাদের চিরন্তন প্রথা সংরক্ষণে নিরুৎসাহ হইব ? আমরা চিরদিন ঐ সকল প্রথা কালের উপযোগিতানুসারে বজায় রাখিয়া আপনাদের জাতিধর্ম্ম পূর্ণ মাত্রায় রক্ষা করিব এবং কালে স্বরাজ লাভ করিয়া জগতে স্বজাতির কীর্ত্তিধ্বজা উড়াইব !

ভারতবর্ষ পাশ্চাত্য ভূগোলশাস্ত্রে একটী প্রকৃতি-চিহ্নিত দেশ হইলেও প্রকৃত ইহা এক মহাদেশ। একদিকে শীতপ্রধান, নাতিশীতোষ্ণ ও গ্রীষ্মপ্রধান দেশের সর্ব্বপ্রকার প্রকৃতি ইহাতে একাধারে মিলিত। অপর দিকে ইহার বিভিন্ন প্রদেশগুলি প্রাকৃতিক দুর্লঙ্ঘ্য অবরোধে বেষ্টিত হওয়াতে ইহারা চিরদিন বিবিধভাষী বিভিন্ন জাতিবর্গের লীলাভূমি। এবংপ্রকার বৈচিত্র্যবিশিষ্ট মহাদেশে এক প্রকার দেশাচার হওয়া অসম্ভব; এজন্য হিন্দুধর্ম্মের মূলবিশ্বাস ও মূলাচার সকল প্রদেশেএকরূপ হইলেও দেশভেদে ও কালভেদে ইহার বিবিধ প্রথা ও আচারব্যবহার বিভিন্নরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। যে প্রদেশে যেরূপ অনাটন উপস্থিত হইয়াছে এবং বিদ্যাবুদ্ধি বিষয়ে ইহার যেরূপ উন্নতিসাধন হইয়াছে, তথায় জাতীয় আচার ব্যবহার সেইরূপ সামাজিক নির্ব্বাচনে পরিবর্ত্তিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ কারণ হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত সকল সম্প্রদায়ের ভিতর আচার ব্যবহার লইয়া বিস্তর ইতরবিশেষ দেখা যায়।

এস্থলে সকলের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, যে দেশে যেরূপ আচার ব্যবহার চালিত হইয়া বহুকাল স্থায়ী হইয়াছে, তাহাই সে দেশের সম্পূর্ণ উপযোগী এবং তাহাই তথাকার সদাচার।

যস্মিন দেশে য আচার, পারম্পর্য্যক্রমাগতঃ
বর্ণনাঞ্চাশ্রমানাঞ্চ স সদাচার উচ্যতে।

(মনুস্মৃতিঃ)

"চারি বর্ণ ও চারি আশ্রম সম্বন্ধে যে দেশে যে সকল আচার ব্যবহার লোকপরম্পরায় চালিত হইয়াছে, তাহাই সে দেশের সদাচার বলিয়া উক্ত।"

এখন একবার ভাব দেখি, মহর্ষি মনুর উপরোক্ত মহৎ বাক্যে কত বৈজ্ঞানিক সত্য নিহিত রহিয়াছে। পরম্পরাগত যে সকল প্রথা বহুকাল একদেশে চালিত হওয়ায় উহাদের দ্বারা তত্রত্য সমাজের অশেষ মঙ্গল বর্দ্ধিত হইতেছে, সে সকল প্রথাই সে দেশের উৎকৃষ্ট; তাহাই তথায় সমাজিক নির্ব্বাচনে প্রতিষ্ঠিত এবং তাহাই সকলের পালন করা কর্ত্তব্য। যখন তুমি বিভিন্ন সমাজের সংস্রবে বিভিন্নরূপ শিক্ষা পাইবে, তখনই তুমি উহাদিগকে দোষার্হ জ্ঞানে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইবে। আজ যদি তুমি ইউরোপীয় সমাজ না দেখিতে বা ইউরোপীয় বিদ্যার আস্বাদ না পাইতে, তুমি কি কদাচ পাশ্চত্য জাতির চালচলন পছন্দ করিতে এবং দেশের পরম্পরাগত দেশাচারগুলিকে কি কদাচ কুসংস্কার জ্ঞানে ঘৃণা করিতে? বেশ জানিবে, একমাত্র ধর্ম্ম ও নীতিবিবর্জ্জিতা পাশ্চাত্যশিক্ষাই আমাদের সকল অনর্থপাতের মূলীভূত কারণ।

উপধর্ম্ম পালন।

অনেকের মুখে শুনিতে পাই, হিন্দুধর্ম্ম আজকাল এতদূর অবনত ও অপদার্থ যে, জনসাধারণ ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ অংশ বিস্মৃত হইয়া কেবলমাত্র কতকগুলি দেশাচার পালন করিতে অতীব ব্যগ্র। ধর্ম্মের উচ্চ উপদেশ অনুসারে ধর্ম্মপ্রবৃত্তিগুলির সম্যক স্ফূর্ত্তি করিয়া নৈতিক চরিত্র গঠন করা দূরে থাকুক, উহারা এখন কতকগুলি দেশাচার

পালন করিয়াই হিন্দুনামে পরিচিত হইতেছে। উহাদের বিশ্বাস, এই সকল দেশাচার পালন করিলেই আমাদের যথার্থ পুণ্যলাভ ও শ্রেয়োলাভ হইবে।

এখন জিজ্ঞাস্য, কতকগুলি দেশাচারপালনই কেন আজকাল হিন্দুধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ হইল? সকলেই ত জানেন, দেশাচারপালন ধর্ম্মের অপ্রধান অঙ্গ বা উপধর্ম্ম মাত্র, তবে কেন সকল সম্প্রদায়ের ভিতর দেশাচারপালনই ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে এবং উহারা এ বিষয়ে কিছুমাত্র শৈথিল্য দেখায় না? তুমি বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্ত, যে সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হও না কেন, হিন্দুসমাজে থাকিতে হইলেই ইহার দেশাচারগুলি পালন করা তোমার অবশ্যপ্রতিপাল্য কর্ত্তব্যকর্ম্ম। হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজ তোমার এ বিষয়ে কিছুমাত্র স্বাধীনতা প্রদান করে নাই। তুমিও ইহাতে অণুমাত্র যথেচ্ছাচারিতা প্রদর্শন করিতে পার না। ধর্ম্মের এই কঠোর আদেশ সকলকে শিরোধার্য্য করিতে হয়। যিনি ইহা পালন না করিবেন, তিনি সমাজচ্যুত ও জাতিচ্যুত হইবেন।

যাঁহারা প্রকৃত সমাজতত্ত্বজ্ঞ নন, তাঁহারাই উপধর্ম্মপালনকে স্বধর্ম্মের একটা কুসংস্কার মনে করিবেন। এস্থলে আমাদের সুশিক্ষিত বান্ধবগণ মনে করেন, ধর্ম্ম মনের বিশ্বাসমাত্র, অপার ভক্তির সহিত পরমপিতা পরমেশ্বরের উপাসনা কর, ধর্ম্মের উপদেশানুসারে নিজ জীবন গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত কর, সাধ্যানুসারে পরোপকার কর, কদাচ পরের অনিষ্ট চিন্তা করিও না; ইহাই তোমার যথার্থ ধর্ম্মসাধন। যে দেশাচারের সহিত ধর্ম্মের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই বলিলেই হয় এবং যাহা লোকাচারে প্রবর্ত্তিত মাত্র, সেই দেশাচার পালন করিলে যথার্থ শ্রেয়োলাভ হইবে, আত্মার উন্নতি সাধন হইবে ও পরলোকে সদ্গতি হইবে, এ সকল কথা কি ধর্ম্মের বুজরুকি নহে? আর কতকাল মূর্খলোকে এরূপ কুসংস্কার

জালে জড়িত থাকিয়া নিজ জীবন হেয় ও অপদার্থ করিতে থাকিবে?

এখন উপধর্ম্মপালন কেন হিন্দুধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ হইল, ইহাতে এ ধর্ম্মের কি গূঢ় রহস্য, তাহা উদ্‌ঘাটন করা আবশ্যক।

যখন কোন এক উৎকৃষ্ট সমাজ অন্য পরাক্রান্ত সমাজের সংঘর্ষণে বিপর্য্যস্ত হয়, তখন প্রথমোক্ত সমাজ নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য সাধারণ ধর্ম্ম উপেক্ষা করিয়া বৈশেষিক ধর্ম্মের সম্যক অনুশীলন করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী দুই সমাজ একত্র এক স্থলে বসবাস করিলে, প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে উভয়ে পরস্পর পরস্পরকে আচারব্যবহার ও মতামত সম্বন্ধে যে কেবল পরিচালিত করিবে, তাহা নহে; কিন্তু যে সমাজ অধিক পরক্রান্ত, সে সমাজ দুর্ব্বল সমাজকে কালসহকারে গ্রাস করিয়া স্বধর্ম্ম বিস্তার করিবে। কখনও বা উভয় জাতির বিমিশ্রণে এক অভিনব জাতি উৎপন্ন হইবে এবং পরাক্রান্ত সমাজের ধর্ম্ম সেই নূতন সমাজে গৃহীত হইবে।

এস্থলে যদি দুর্ব্বল সমাজ কোন প্রকারে স্বীয় বৈশেষিকত্ব বজায় রাখিতে পারে, সে সমাজ কালের কঠিন হস্তে পতিত হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে না এবং যতদিন ইহা নিজের বৈশেষিকত্ব ও পার্থক্য বজায় রাখিতে পারিবে, ততদিন ইহা পৃথ্বীতলে স্থায়ী হইবে।

মধ্যযুগে মুসলমানজাতির ভাগ্যোদয়ে এ জাতি ধর্ম্মবলে ও অস্ত্রবলে ভূমণ্ডলে প্রবলপ্রতাপান্বিত হইয়া উঠে। উহারা যে দেশ অধিকার করে, সে দেশে পূর্ব্বতম রাজ্যবিলোপের সঙ্গে পূর্ব্বতন ধর্ম্ম সমূলে বিলুপ্ত হইয়াছে। এখন সে দেশে মুসলমানধর্ম্ম ব্যতীত পূর্ব্বতন ধর্ম্মের নামগন্ধ নাই। যে পারসীক সমাজ খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে স্বধর্ম্ম রক্ষার্থ জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে আশ্রয় লয়, উহারা অগ্ন্যুপাসক বলিয়া উহাদের পারস্যদেশবাসী মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত কোনরূপ সম্পর্ক বা সহানুভূতি নাই। সেইরূপ ভারতের যে সকল বৌদ্ধভ্রাতা জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধদেশে আশ্রয়

লইয়াছে, উহাদের সহিত এখন আমাদের কিছুমাত্র সহানুভূতি নাই। সেইরূপ যে সকল হিন্দু মুসলমান হইয়া গিয়াছে, উহাদিগের সহিত আমাদের এখন কোন সহানুভূতি নাই!

পরাক্রান্ত মুসলমানজাতি ভারতে পঞ্চশতাব্দী ব্যাপিয়া এত সুদীর্ঘকাল একাধিপত্য করিয়াছে। হিন্দুধর্ম্ম বিলোপের জন্য উহারা কত শত শত হিন্দুপরিবারকে তরবারিবলে ও রাজপ্রসাদ প্রলোভনে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছে। কত শত শত দেবমূর্ত্তি ও দেবালয় ভগ্ন করিয়া তদীয় উপাদানে মস্‌জিদাদি নির্ম্মাণ করিয়াছে! এত উৎপাত, এত অত্যাচার ও এত উপদ্রব করিয়াও উহারা হিন্দুধর্ম্মের কোনরূপ স্থায়ী অপকার বা অমঙ্গল সাধন করিতে পারে নাই। উহারা হিন্দুসমাজের উপর যেরূপ অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিতে লাগিল, হিন্দুজাতিও সেইরূপ আপনাদের ধর্ম্মরূপ অভেদ্য দুর্গকে আরও দৃঢ়তর করিলেন। এ কারণ মুসলমানযুগ হইতেই খাদ্যা-খাদ্যের বিচার, চৌকাপ্রথা, উচ্ছিষ্টপ্রথা সমুদ্রযাত্রানিষেধ প্রভৃতি বৈশেষিক নিয়মপালনই হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে এবং নৈষ্ঠিক হিন্দু উহাদিগকে বিধিবৎ পালন করিয়া এত কাল জাতিধর্ম্ম রক্ষা করিতেছেন।

মুসলমানযুগে যে সকল আচারব্যবহার হিন্দুসমাজে প্রচলিত হয়, উহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য, কি প্রকারে জিত হিন্দুজাতি জেতা মুসলমানজাতি হইতে চিরদিনের জন্য পৃথকভূত হইয়া থাকিবে। দেখ, নিয়তিচক্রে ও বিধিনির্ব্বন্ধে পরাক্রান্ত মুসলমানজাতি ভারতে আসিয়া বিশাল সম্রাজ্য স্থাপন করিলেন ও পরাক্রান্ত মুসলমান ধর্ম্ম দুর্ব্বল হিন্দুধর্ম্মকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। সে স্থলে হিন্দুধর্ম্মও প্রাণভয়ে মুসলমানধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণভাবে পৃথক থাকিয়া অথবা হিন্দুরাজন্যবর্গের সহিত পর্ব্বত, জঙ্গল ও মরুভূমিতে আশ্রয় লইয়া স্বসেবকমণ্ডলীর ভিতর মুসলমানজাতির উপর চিরবিদ্বেষানল

প্রজ্বলিত এবং বৈশেষিক ধর্ম্মাচরণ দ্বারা উহাদিগকে চিরদিনের জন্য সম্পূর্ণভাবে পৃথক রাখিতে চেষ্টা পাইল। হিন্দুসমাজনেতা ব্রাহ্মণগণ এতদূর চেষ্টা না করিলে তাঁহারা কি আমাদের সনাতন হিন্দুধর্ম্ম ও প্রাচ্য বিজ্ঞান রক্ষা করিতে পারিতেন?

দেখ, ভারতের নির্বীর্য্যকারী জলবায়ু ভীমপরাক্রমশালী ক্ষত্রিয় জাতিকে মুসলমান জাতির নিকট পরাস্ত করাইয়া জাতীয় অধঃপতন আনায়ন করিল। কিন্তু ব্রহ্মতেজে তেজীয়ান ও বলীয়ান ব্রাহ্মণজাতি সেই অধঃপতিত হিন্দুজাতির আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করিয়া ও বৈশেষিক ধর্ম্মপালনে সকলকে প্রোৎসাহিত করিয়া ভারতে মুসলমান ধর্ম্মের পরাজয় সাধন করিলেন। কোথায় হে পূজ্যপাদ ধর্ম্মাত্মা ব্রাহ্মণগণ! ধন্য তোমাদের সমাজতত্ত্বজ্ঞান! ধন্য তোমাদের ধর্ম্মানুশীলন। তোমাদেরই গুণে ভারতমাতার পবিত্র হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দুজাতি, সংস্কৃত দেবভাষা ও বেদবেদান্ত জগতে আজও দেদীপ্যমান রহিয়াছে। তোমাদেরই পদরেণু যেন আমরা মস্তকে ধারণ করিয়া চিরদিন কৃতার্থ হই।

এখন যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়া সমাজনেতা ব্রাহ্মণজাতি আমাদের জাতিধর্ম্ম রক্ষা করিতে সমর্থ হন, তন্মধ্যে জনসাধারণের বৈশেষিক দেশাচারপালন বা উপধর্ম্মপালন একটী প্রধান উপায়। তাঁহাদেরই জন্যে আজ পর্য্যন্ত সাধারণ হিন্দুসমাজ সকল প্রদেশে বৈশেষিক নিয়মাবলি যথাবিধি ও কায়মনোবাক্যে পালন করিয়া স্বজাতির জাতীয়তা ও বৈশেষিকত্ব পূর্ণ ভাবে রক্ষা করিতেছে। ইহারই জন্য দেশাচারপালনে হিন্দুসমাজের এত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও এত কড়াক্রান্তি বিচার। ইহারই জন্য যাঁহারা সমাজের বৈশেষিক নিয়মাবলি উল্লঙ্ঘন করেন, তাঁহারা জাতিচ্যুত হন।

যদি সামাজিক বিষয়ে এত কঠোর নিয়ম সমাজে চালিত না হইত তোমরা কি আজ সপ্ত শতাব্দী পরাধীনতায় থাকিবার পর স্বীয় পূ

পুরুষদিগের কীর্ত্তিকলাপ স্মরণ করিয়া বিস্ফারিত হৃদয়ে হিন্দু নামের এত গৌরব করিতে পারিতে? নিশ্চয়ই যে মুসলমানজাতিকে তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন, তোমরাও সেই মুসলমানজাতির অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইতে। পাঠকগণ? তোমরা কি একবার স্মরণ করিবে, মুসলমানযুগে কত সহস্র সহস্র হিন্দু সপরিবারে মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া গিয়াছে? এখন তাহারা কোথায়, তোমরাই বা কোথায়? তাহাদের কিরূপ ম্লেচ্ছ ব্যবহার এবং তোমাদের কিরূপ সদাচার?

ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্বন্ধে হিন্দুসমাজে এত কঠোর নিয়মাবলী চালিত হইলেও এবং মুসলমানজাতি এত অধিক ঘৃণিত হইলেও পশ্চিমাঞ্চলে হিন্দু ও মুসলমানজাতি এতকাল একত্র বসবাস করাতে উভয় জাতির ভিতর অনেক বিষয়ে সহানুভূতি দেখা যায়। তত্রত্য হিন্দুগণ পরিচ্ছদাদিবিষয়ে মুসলমানজাতির অনুকরণ করিয়াছে এবং এতকাল পারসী ও উর্দ্দু শিক্ষা করিয়া আপনাদের জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। বঙ্গদেশ, গুজরাট ও দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি দেশে হিন্দুরা মুসলমান জাতিকে যেরূপ ঘৃণা করে, উত্তরপশ্চিমাঞ্চল ও পাঞ্জাবের হিন্দুরা ঐ জাতিকে সেরূপ ঘৃণা করেনা। সেস্থলে চৌকাদি প্রথা হিন্দুসমাজে চালিত হইয়া তত্রত্য হিন্দুদিগকে ঐ জাতি হইতে যতদূরসম্ভব পৃথক রাখিয়া দিয়াছে।

বেশ জানিবে, পরাধীন অবস্থায় যে সকল বৈশেষিক দেশাচার পালন করিয়া আমরা আমাদের জাতিধর্ম্ম বা জাতীয়তা রক্ষা করিতে পারিব, তাহাই এখন ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ হওয়া উচিত। এ কারণ সামান্য উপধর্ম্মপালনই হিন্দুধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। ইহা এ ধর্ম্মের বুজরুকিও নয়, প্রলাপও নয় বা কুসংস্কারও নয়। কঠোর আবশ্যকতায় বাধ্য হইয়া হিন্দুসমাজ এ সকল বিধিব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়াছে। পাশ্চত্য শিক্ষায় বিকৃত মস্তিষ্কের নিকট ইহা কুসংস্কার হইতে পারে, কিন্তু

ইহাই সমাজের সুসংস্কার। যতকাল আমরা পরাধীন থাকিব, তত কাল আমাদিগকে এ সকল বিধিবৎ পালন করিতে হইবে, নতুবা আমাদের জাতীয়তা অচিরে বঙ্গোপসাগরে ডুবিবে।

সদাচার।

দেহযাত্রা সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিবার জন্য যে সকল বিশুদ্ধ আচারব্যবহার বহু কাল হইতে হিন্দুসমাজে চলিয়া আসিতেছে, উহাদের সমষ্টিকে সদাচার বলে। এক জন নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ নিজ দেহ ও মনকে সদা পবিত্র রাখিবার জন্য যে সকল আচার ব্যবহার অবলম্বন করেন, তাহাই শাস্ত্রোক্ত সদাচার। এই সকল সদাচার পালন করাতে হিন্দুজাতি জগতের মধ্যে এক প্রধান শুদ্ধাচারী জাতি এবং উহাদের পালনে নানা ত্রুটি থাকাতে অন্যান্য জাতিকে আমরা চিরদিন ম্লেচ্ছ জ্ঞানে ঘৃণা করিয়া থাকি।

শাস্ত্রোক্ত সদাচার গুলির উদ্দেশ্য প্রধানতঃ তিনটী—যথা (১) শরীরের স্বাস্থ্যবর্দ্ধন ও নীরোগতা।

(২) ইহার পবিত্রতা সম্পাদন।

(৩) মনও আত্মার পবিত্রতা।

নানাবিধ পীড়ার যে সকল বীজাণু (Germs) আমাদের অজ্ঞাতসারে চতুর্দ্দিক উড়িতেছে, ঘুরিতেছে ও ফিরিতেছে, জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে শুদ্ধাচারী হইলে উহাদের হইতে অনেক সময়ে অব্যাহতি পাওয়া যায়। যদিও উহারা নানা দুর্লক্ষ্য সূত্র অবলম্বন করিয়া শরীরে প্রবেশ করিতেছে, তথাচ সদা সদাচারী হইলে উহারা অনেক সময়ে শরীরাভ্যন্তরে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইতে পারে না। এ কারণ জ্ঞানগরিষ্ঠ মহর্ষিগণ সদা শুদ্ধাচারী হইবার জন্য সকলকে এতদূর প্রোৎসাহিত করিয়া যান।

যে গৃহে বাস করিবে, সদা উহাকে পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন রাখিবে এবং যথেষ্ট বায়ু ও আলোক যাইবার পথ রাখিবে; নতুবা স্বাস্থ্যের বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মিবে। সেইরূপ যে বাহ্য দেহের অভ্যন্তরে মানবমন বিরাজিত, যাহার সহিত ইহা অশেষরূপে সম্বদ্ধ এবং যাহার স্বাস্থ্য ও বিশুদ্ধতার উপর ইহার প্রকৃত স্বাস্থ্য, বিশুদ্ধতা ও সুখভোগ সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করে, সেই বাহ্যদেহকে সদাচার দ্বারা সদা বিশুদ্ধ না রাখিলে, মনকে কি প্রকারে বিশুদ্ধ রাখিতে পারিবে? এজন্য দেহশুদ্ধিই মনঃশুদ্ধির প্রথম সোপান। ধর্ম্মাত্মা হিন্দুও সর্ব্বাগ্রে নানা সদাচার দ্বারা নিজ দেহকে সর্ব্বতোভাবে পবিত্র ও বিশুদ্ধ রাখিতে চেষ্টা পাইয়া থাকেন। আমাদের উচ্ছিষ্টপ্রথা, স্নানবিধি, মলমূত্রত্যাগকালে শরীরের শুদ্ধতাসম্পাদন, অশৌচান্তে শুদ্ধতা, দিনচর্য্যা, ঋতুচর্য্যা প্রভৃতি যতপ্রকার ক্রিয়াযোগ শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে, উহাদের প্রধান উদ্দেশ্য বাহ্যদেহকে কি প্রকারে বিশুদ্ধ ও নীরোগ রাখিতে পারিবে।

তাহার সাক্ষ্য দেখ, নিয়মিত স্নান দ্বারা শরীরের ময়লা দূর না করিলে, গাত্র হইতে দুর্গন্ধ বাহির হয়। প্রত্যহ দন্তধাবন না করিলে মুখ হইতে দুর্গন্ধ বাহির হয়। ইংরাজ আহারের পর তাম্বুল সেবন করেন না বলিয়া তাঁহাদের মুখ হইতে সময় সময় কিরূপ দুর্গন্ধ আইসে। মুসলমান অতিরিক্ত প্যাজ রসুন খায় বলিয়া তাহার মুখ হইতে কিরূপ দুর্গন্ধ ছুটিতেছে। অনেক জাতি এত অপরিষ্কার, উহাদের গাত্র হইতে বিকট বোঁটকা গন্ধ ছাড়ে, যাহার ঘ্রাণে আমাদের স্বতঃ ঘৃণার আইসে। সদাচারের অভাবই ইহার প্রধান কারণ।

অতএব দেখ, শরীর সদাচার দ্বারা বিশুদ্ধ না হইলে মন বিশুদ্ধ হয়না এবং মন বিশুদ্ধ না হইলে আত্মাও বিশুদ্ধ হয়না। এজন্য আত্মার পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য সদাচারপালন একান্ত বিধেয় এবং ইহাতে এত পুণ্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

যে সকল সদাচার দ্বারা শরীরের স্বাস্থ্য ও আয়ুর্ব্বল বর্দ্ধিত হয়, যদ্দ্বারা ইহা পূত ও পবিত্রীকৃত হয়, কেন হিন্দুধর্ম্ম উহাতে এত পুণ্য, নির্দ্দেশ করিল? যে ধর্ম্ম শয়নে, স্বপনে ও জাগরণে, এমনকি, প্রতিমুহুর্ত্তে আমাদের যাবতীয় কর্ম্মের উপর স্বীয় প্রতিপ্রদ অনুশাসন পূর্ণভাবে চালাইয়া আমাদের কলিকলুষিত জীবনকে প্রকৃত ধর্ম্মময় করিতে চায়, সে ধর্ম্ম সদাচারের মহাপুণ্য নির্দ্দেশ করিবে না? যদি শাস্ত্রকারেরা উপদেশ দিতেন, শরীরের স্বাস্থ্যের জন্য এ সকল আচারব্যবহার পালন করা একান্ত আবশ্যক, তুমিও সামান্য স্বাস্থ্যের খাতিরে ইহাদিগকে কর্ত্তব্যজ্ঞানে যতদূর পালন করা উচিত, ততদূর করিতে। যে সময়ে তুমি সুস্থ শরীরে বাহাল তবীয়াতে থাকিতে, সে সময়ে তুমি এ সকল একরূপ অগ্রাহ্য করিতে। কিন্তু যখন তাঁহারা উপদেশ দিতেছেন, ইহাদের সম্যক পালনে তোমায় অশেষ পাতকনাশ হইবে ও পুণ্যলাভ হইবে এবং তুমি ইহকালে ও পরকালে সুখে থাকিবে, তখন তুমিও কত ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত, কত মনের প্রীতি ও আনন্দের সহিত উহাদিগকে পালন করিয়া সুফল পাইবে!

এখন একবার পুণ্যবতী হিন্দুমহিলাগণের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, দেখিতে পাইবে, কত আগ্রহ, কত উৎসাহ ও কত ভক্তির সহিত তাঁহারা এই সকল আচারব্যবহার চিরদিন বিধিবৎ পালন করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের ধ্রুব বিশ্বাস, এই সকল সদাচারে যতই কড়াক্রোান্তি বিচার করা যায়, মা লক্ষ্মী তাঁহাদের উপর ততই সুপ্রসন্না হইবেন এবং গৃহস্থের ততই মঙ্গল হইবে! এবিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র ত্রুটি হইলে তাঁহারা আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হন, ভাবেন সর্ব্বনাশ হইল, সর্ব্বনাশ হইল এবং সংসারে কোনরূপ বিপদ আপদ ঘটিলে তাঁহারা সদাচার ভঙ্গের উপর ইহার কারণ আরোপ করেন।

সদাচারপালনে হিন্দুবিধবাদিগের যত্ন ও শ্রদ্ধা অতীব প্রশংস

নীয়। তাঁহারাই এই সকল পালন করিয়াই গৃহে গৃহে স্বধর্ম্মের বিজয়ভেরী চিরদিন বাজাইতেছেন। যথার্থ বলিতে কি, পুণ্যবতী হিন্দুমহিলাগণের গুণেই আমাদের মরুভূমিপ্রায় সংসার এখনও স্বর্গের নন্দনকানন ও অশেষ সুখের আলয়। যে সকল সদাচার পালন করিয়া তাঁহারা এতকাল এমন পুণ্যবতী ও ধর্ম্মিষ্ঠা, পাশ্চাত্য হলাহল পান করাইয়া তাঁহাদিগকে ঘোর বিলাসিনী সাজাইয়া এ সকল বিষয়ে বীতশ্রদ্ধ করা কি উচিত? যদি এরূপ করিতে চাহ, তোমরাই নিজ পাদমূলে নিজে কুঠারাঘাত করিয়া বসিবে।

নবযুগের শিক্ষিত নব্যসম্প্রদায় এই সকল আচার ব্যবহারের উপর বড় নারাজ। তাঁহারা ভাবেন, এই সকল শিক্ষা দিয়াই ব্রাহ্মণঠাকুরেরা আমাদিগকে কুসংস্কারজালে জড়িত করিয়া রাখিয়াছেন এবং আমাদের মাথাটি ভালরূপ খাইয়াছেন। তাঁহাদের মুখে আরও শুনিতে পাই, এই বিটলে বামুনেরাই ভারতের সর্ব্বনাশ করিয়াছে এবং ইহাকে এতকাল উন্নত হইতে দেয়নাই। কতকগুলি মূর্খ পূজারি ব্রাহ্মণ দেখিয়া তাঁহারা ঐ জাতির উপর এরূপ অকারণ ঝাল ঝাড়িতেছেন।

তাঁহারা উচ্ছিষ্টপ্রথার উপরও বড় নারাজ। আহারকালে বস্ত্রে উচ্ছিষ্ট পতিত হইলে তাঁহারা গোপনে উহা অঙ্গুলি দ্বারা প্রক্ষেপ করিয়া দেন ও পরিধেয় বস্ত্র ত্যাগ করেন না। তাঁহাদের নয়নসমক্ষে তাঁহাদের পরমপূজ্য ইংরাজগুরুগণ ও বিলাতপ্রত্যাগত ভ্রাতৃবৃন্দ আজ পাদুকায় সুশোভিত হইয়া টেবিলে বসিয়া কেমন মনসুখে তৃপ্তি পূর্ব্বক ভোজন করিতেছেন। দেখ, তাঁহাদের কিছুমাত্র উচ্ছিষ্টজ্ঞান নাই, অথচ তাঁহারা আমাদের অপেক্ষা কত পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন! টেবিলের উপর কেমন সাদা ধপ্‌ধপে চাদর! কেমন চক্‌চকে কাঁটা ও চামচ! কেমন পরসিলেন ডিস্ ও পেয়ালা। কেমন জলজ্বলে কাঁচের গেলাস? সকলই এ জগতে মনোরম ও অপরূপ? আর আমরা কিনা

পীড়িতে বা আসনে বসিয়া কাঁসার থালায় বা পাথরে হাতে মাখিয়া ভোজনকরি ? ছি। ছি ? ছি ? সাধে কি বলি, আমরা Half civilized এবং black miggar ?

পাশ্চাত্য জাতিদের ভোজনসুখ দেখিয়া আমাদের কি মনে হয়না, এমন সুদিন কবে হবে, যে দিন আমরাও তাঁহাদের ন্যায় টেবিল চেয়ারে বসিয়া আহারাদি করিব ও একলম্ফে সভ্যতার আগ্‌ডালে চড়িব ; কেবল কতকগুলি মূর্খা বৃদ্ধা স্ত্রীলোকদিগের অত্যাচারে এখ-নও আমাদিগকে পীড়িতে বসিয়া আহার করিতে হইতেছে ও উচ্ছিষ্ট প্রথা মানিতে হইতেছে। বোধ হয়, উহারা ইহসংসার হইতে বিদায় লইলে যখন উহাদের স্থান সুশিক্ষিতা নব্যা ভব্যা মহিলাগণ অধি-কার করিবেন, তখন আমরাও সুখস্বচ্ছন্দে টেবিলে বসিয়া আহারাদি করিব ও ভারতোদ্ধার করিব।

বলি, যে প্রথা দ্বারা হিন্দুসমাজ এতকালে পরম সুখে সুখী, যং-দ্বারা আজ পর্য্যন্ত কোন লোকের, কি ধনবান, কি দরিদ্র, কাহারও কিছু মাত্র কষ্ট বা অসুবিধা ঘটে নাই, যদ্দ্বারা আমাদের গৃহ সর্ব্ব-তোভাবে পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন হইতেছে, তাহা কি এই দুর্দ্দিনে রহিত করিয়া ব্যয়বহুল প্রথা অনুসরণ করা উচিত ? তবে কেন তোমরা দুপৃষ্ঠা ইংরাজী পড়িয়া বিলাতি কলম রোপন করিতে ব্যগ্র হইয়াছ ? বিলাতি মাকালফলের বাহ্য চাকচিক্য দেখিয়া ভুলিও না। উহার অভ্যন্তর পূতিগন্ধে পূর্ণ। যখন উহার আঘ্রাণ পাইবে, তখন ত্রাহি মধুসূদন ডাক ছাড়িতে হইবে।

এস্থলে পশ্চিমাঞ্চলের চৌকাপ্রথার বিষয় কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা আবশ্যক। বঙ্গদেশের উচ্ছিষ্টপ্রথার ন্যায় এ প্রথা তথায় সম্যক আদরণীয়। তত্রত্য হিন্দুরা নিজ নিজ চৌকার পবিত্রতা প্রাণপণে রক্ষা করে। যে চুল্লীতে তাহারা অন্ন-ব্যঞ্জন পাক করে, উহার অনতিদূরে এক গণ্ডি দিয়া রাখে ; ইহাই তাহাদের চৌকা। এই

চৌকায় তাহারা পক্ক অন্ন-ব্যঞ্জন রাখিয়া দেয়। যদি কেহ অসাবধানতাবশতঃ উহার ভিতর প্রবেশ করে, অন্নব্যঞ্জন স্পর্শ না করিলেও তাহারা সমস্তই প্রক্ষেপ করিয়া দেয়। একজন সুশিক্ষিত পাঠক বলিবেন, অন্নব্যঞ্জন আদপে স্পর্শ করা হইল না, অথচ সমস্তই আস্তাকুড়ে প্রক্ষিপ্ত হইল, এ কেমন কথা। কি কুসংস্কার! কি কুসংস্কার! এমন অনাচারের কি প্রশ্রয় দিতে আছে?

এখন চৌকাপ্রথার গূঢ় রহস্য বুঝিতে চেষ্টা করা উচিত। মুসলমানযুগে যখন পশ্চিমাঞ্চলের জিত হিন্দুজাতি জেতৃ মুসলমান জাতির সহিত একত্র বহুকাল বসবাস করাতে নানা বিষয়ে উহাদের সহানুভূতি দেখা দিল, তখন হিন্দুসমাজ ঘোর বিপদে পতিত হইয়া নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য ব্যাকুলচিত্তে চৌকাপ্রথা প্রবর্ত্তন করিয়া পানভোজনাদিতে কোন হিন্দু মুসলমানের সহিত মিশ্রিত না হয়, এরূপ ব্যবস্থা করিয়া উভয় জাতিকে চিরদিনের জন্য পৃথক রাখিতে চেষ্টা পায়। তত্রত্য হিন্দুরা যদি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত এ সুপ্রথা পালন না করিত, হিন্দুধর্ম্ম কি সে সকল অঞ্চলে এমন অক্ষুণ্ণ প্রতাপে দেদীপ্যমান থাকিত?

দেখ, অর্দ্ধশতাব্দীর ভিতর এই জাতীয়তাবিহীন অন্তঃসারশূন্য বঙ্গদেশে অনেক যুবক পাশ্চাত্য বিদ্যায় বিভূষিত হইয়া অম্লানবদনে ম্লেচ্ছ খাদ্য ভোজন করিতেছে ও চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করিতেছে। কিন্তু পঞ্চ শতাব্দী ব্যাপিয়া যে হিন্দুজাতি পশ্চিমাঞ্চলে জেতৃ মুসলমান জাতির সহিত অশেষ সংস্রবে রহিল, সে জাতি কেবল চৌকাদি প্রথা অবলম্বন করিয়া স্বীয় বৈশেষিকত্ব বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। যে সুপ্রথা হিন্দুজাতির জাতিধর্ম্ম সংরক্ষণে সমর্থ, সে প্রথাকে কি ধর্ম্মের একটা কুসংস্কার বলা উচিত বা উহার উপর কোনরূপ বিদ্রূপ করা উচিত?

ধর্ম্মাত্মা হিন্দুর প্রাতরুত্থান ও প্রাতঃস্নান যে কত পুণ্যদায়ক ও

স্বাস্থ্যবর্দ্ধক, তাহা এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক। যে ব্রহ্মমুহূর্ত্ত সমস্ত দিবসের মধ্যে বসন্তকালের ন্যায় সুমধুর, যে সময়ে সর্ব্বাপেক্ষা নির্ম্মল ও সুশীতল বায়ু মৃদুমন্দ হিল্লোলে বহিতে থাকে, যে সময়ে সর্ব্বপ্রকার উৎকট ব্যাধি সৌম্যও শান্ত রূপ ধারণ করে, সেই ব্রহ্মমুহূর্ত্তে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করার অনেক গুণ। ভূমণ্ডলে যাঁহারা দীর্ঘজীবী, তাঁহারাই এই ব্রহ্মমুহূর্ত্তে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া থাকেন। এই সময় মলমূত্রত্যাগ ও মুখপ্রক্ষালনাদি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া বাহ্য জগতের বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিলে শরীরের স্বাস্থ্য ভালরূপ বর্দ্ধিত হয়। আজকাল সুশিক্ষিত নগরবাসিগণ প্রায় প্রাতঃভ্রমণ করিয়া থাকেন। ইহাতে প্রাতঃকালের বিশুদ্ধ বায়ু সেবন ও অঙ্গসঞ্চালন করাতে তাঁহারা সুস্থশরীরে জীবন অতিবাহিত করেন। আর পল্লীগ্রামস্থ ধর্ম্মাত্মা হিন্দু ব্রহ্মমুহূর্ত্তে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সুদূরবর্ত্তী ময়দানে মল মূত্রত্যাগ করত সুদূরবর্ত্তী নদীতে বা জলাশয়ে স্নানাদি সমাপন করেন। ইহাতে তাঁহার প্রাতঃকালের বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করা হয়।

এখন জিজ্ঞাস্য, প্রাতঃস্নান কি প্রকারে শরীরের স্বাস্থ্য বর্দ্ধন করে? অতি প্রত্যূষে সকল জলাশয়ের জল শীতকালে উষ্ণ ও গ্রীষ্মকালে শীতল থাকে। সেই সময় শরীরের স্বাভাবিক উত্তাপের সহিত জলের উত্তাপের অধিক তারতম্য থাকে না; তজ্জন্য যে স্নানবিধি দ্বারা শরীরের স্নায়বীয় বল ও ক্ষুধা বর্দ্ধিত হয়, যদ্দ্বারা বাহ্যজগতের আকস্মিক বায়ুপরিবর্ত্তনের কুফল অনায়াসে সহ্য করিবার ক্ষমতাও বর্দ্ধিত হয়, তাহা উপরোক্ত সুসময়ে সমাপন করা কর্ত্তব্য। ইহাতে ইহার যাবতীয় সুফল উত্তমরূপ অনুভূত হইতে থাকে। প্রাতঃস্নানে স্বাস্থ্য বর্দ্ধিত হয় বলিয়া শাস্ত্র ইহাতে এত পুণ্য নির্দ্দেশ করে এবং পশ্চিমাঞ্চলে কার্ত্তিক মাসে ও বঙ্গদেশে মাঘ মাসে হিন্দু মহিলাগণ প্রাতঃস্নান করিয়া পুণ্যলাভ করিতেছেন।

প্রাতঃস্নান সমাপন করিয়া পুণ্যাত্মা ব্রাহ্মণ সন্ধ্যা আহ্নিক ও জপপ্রাণায়াম করিয়া ধর্ম্মচর্য্যা করিতে থাকেন এবং পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয় জাতি ব্যায়ামাদি করিয়া স্বধর্ম্মের নিয়ম বিধিবৎ পালন করিতে থাকেন। এখন দেখা উচিত, এরূপ করাতে কি কি মহোপকার সাধিত হইতেছে? স্নানের সময় স্নানবীয় ক্রিয়া দ্বারা শরীরের বহির্দ্দেশস্থ শোণিতপ্রবাহ প্রবলবেগে প্রবাহিত হয় এবং ইহার অভ্যন্তরীণ শোণিতপ্রবাহ মন্দীভূত হওয়ায় ক্ষুধা বর্দ্ধিত হয়। এখন এই সময়ে ব্যায়ামাদি করিলে বহির্দ্দেশস্থ শোণিতপ্রবাহ আরও প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে থাকে এবং পাকস্থলীর শোণিতপ্রবাহ আরও মন্দীভূত হওয়ায় ক্ষুধা অধিক বর্দ্ধিত হয়। অতএব স্নানের পর ব্যায়ামাদি করিবার প্রশস্ত সময়। ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রাতঃস্নানের যাবতীয় সুফল সম্যক অনুভূত হয়। তদ্ভিন্ন নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া যথাবিধি প্রীতির সহিত অনুষ্ঠিত হওয়াতে তাঁহার মন অশেষরূপে পবিত্র ও বিশুদ্ধ থাকে। এইরূপে ব্রাহ্মণজাতির সাত্ত্বিকভাব সম্যক স্ফুরিত হইতেছে। নিত্য জপপ্রাণায়াম দ্বারা শ্বাসক্রিয়া রোধ করাতে ফুস্‌ফুসের বল বর্দ্ধিত হইতেছে এবং সেই সঙ্গে উঁহাদের আয়ুর্ব্বলও ভালরূপ বর্দ্ধিত হইতেছে।

মলমূত্র ত্যাগ কালে জলশৌচাদি করিয়া বিশুদ্ধ হইবার জন্য যে সকল আচার ব্যবহার হিন্দুসমাজে চিরপ্রচলিত আছে, তাহাও অতীব প্রশংসনীয়। এ বিষয়ে আমাদের সুশিক্ষিত বান্ধবগণ কি তাঁহাদের অশেষপূজ্য গুরুগণের অনুকরণ করিতে ইচ্ছা করেন? তাঁহাদের অপকৃষ্ট চালচলন ভাবিলে কি আমাদের ন্যক্কার আইসে না? যে বংশসম্ভূত বলিয়া তাঁহারা গর্ব্ব প্রকাশ করেন, তদ্বংশোচিত ব্যবহার কি তাঁহারা এ স্থলে দেখাইতেছেন না? সে পাপকথার উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই।

খাদ্যাখাদ্যের বিচার।

যে দিন হইতে মানবজাতি জগতে উদ্ভূত, সেই দিন হইতেই খাদ্যাখাদ্যের বিচার চলিতেছে। আদিম অবস্থায় স্বয়ং প্রকৃতি সকল দেশে মানবের খাদ্য নির্ব্বাচন করিয়া থাকে। খাদ্য নির্ব্বাচনে প্রকৃতিদত্ত আস্বাদই আমাদের প্রধান সহায়। যে দেশে যেরূপ খাদ্য আবশ্যক, সে দেশে মানব নিজ রসনার আস্বাদ দ্বারা চালিত হইয়া সেইরূপ খাদ্য পছন্দ করে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে যে শিশু একখণ্ড মিষ্টান্ন পাইয়া অশেষ তৃপ্তি বোধ করে, শীতপ্রধান দেশে সেই শিশু একখণ্ড মাংস পাইয়া সেইরূপ তৃপ্তি বোধ করিবে। জীবজগতের যাবতীয় জীবজন্তু প্রকৃতিদত্ত আস্বাদ দ্বারা চালিত হইয়াই নিজ নিজ খাদ্য নির্ব্বাচন করিতেছে। একখণ্ড মিষ্টান্ন তোমার যেরূপ মুখরোচক, একখণ্ড গলিত পূতিগন্ধময় মাংস গৃধ্রকুলের তেমনি মুখরোচক।

আদিম অবস্থায় আদিমানব সহজাত বন্য ফলমূলে ও নিকৃষ্ট জন্তুর আমমাংসে উদর পূরণ করিত। যেমন বর্ব্বর সমাজে শিকার-প্রিয় অসভ্য মানব নিকৃষ্ট জন্তু শিকার করিয়া ও উহার আম মাংস অগ্নিতে সামান্যরূপ দগ্ধ করিয়া এখনও ভোজন করে, সেইরূপ আদিম অবস্থায় আদিমানবজাতি এক কালে ঐরূপ নিকৃষ্ট জন্তু শিকার করিয়া উহার আম মাংস ভোজন করিত। তৎকালে উহারা আরও বানর ও বনমানুষের ন্যায় বন্য ফলমূল ভোজন করিয়া বনে বনে বিচরণ করিত।

পরে জ্ঞানশক্তির উন্মেষের সঙ্গে যেমন উহারা সভ্যতাপথে কিঞ্চিত অগ্রসর হইতে থাকে, বনের ফলমূল ত্যাগ করিয়া উহারা আহার্য্য দ্রব্যের ক্রমোন্নতি সাধনে মনোনিবেশ করে। যেমন একদিকে উহারা নিজ বুদ্ধিবলে ও পরীক্ষাবলে বন্য ফলমূলের উন্নতিসাধন করিয়া উহাদিগকে অধিক পুষ্টিকারক করিতে থাকে, সেইরূপ অপরদিকে

কৃষিকার্য্য শিক্ষা করিয়া বন্য ধান্য, গোধূম, যব প্রভৃতি ওষধিবর্গের উন্নতি সাধন করিয়া ইহাদিগকে আপনার প্রধান খাদ্য করিয়া লয়। সেই সঙ্গে ইহাদিগকে অধিক মুখরোচক ও সহজে জীর্ণ করিবার জন্য উহারা ইহাদিগকে নানা উপায়ে ও নানাপ্রকারে পাক করিতে শিক্ষা করে।

জগতে সভ্য আর্য্যজাতির আবির্ভাবের কত পূর্ব্বে ধান্য গোধূমাদির প্রচলন মানবসমাজে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা অসম্পূর্ণ প্রত্নতত্ত্ব এখনও নির্ণয় করিতে পারে নাই। থিওসফিক্যাল পুস্তকে পাঠ করা যায়, আট্‌লান্টিন্‌ মহাদ্বীপে দৈত্যযুগে এই সকল শস্য জগতে প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল।

যে যুগে, ইহারা প্রবর্ত্তিত হউক না, খাদ্যোন্নতি বিষয়ে মানবের জাতীয় সাধনাই তাঁহার প্রধান সহায়। কত উদ্ভাবনাশক্তি চালাইবার পর কত প্রকারে পরীক্ষা করিবার পর ধান্য, গোধূম, যব প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য সংসারে উৎপাদিত হইয়াছে, তাহা এখন নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। সেইরূপ কত উদ্ভাবনাশক্তি ব্যয় করিতে করিতে বা কত প্রকারে পরীক্ষা করিতে করিতে মোদককুল প্রথম মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতে শিখিল, তাহাও বলা যায় না। এখন মিষ্টান্ন অনায়াসে প্রস্তুত হইতেছে দেখিয়া আমরা স্বতঃ মনে করি, বোধ হয় মিষ্টান্ন চিরদিন এইরূপে প্রস্তুত হইতেছে। প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক যাবতীয় বস্তুর ন্যায় খাদ্যসামগ্রীও সমাজে ক্রমবিবর্ত্তনে বিবর্ত্তিত ও ক্রমবিকসনে বিকসিত হইয়াছে। সকলদেশে যত প্রকার মুখরোচক উৎকৃষ্ট খাদ্য প্রস্তুত হইতেছে, সকলই জাতীয় সাধনার গুণে কালক্রমে উদ্ভাবিত হইয়াছে।

যে দেশে যেরূপ খাদ্য ভোজন করিলে শরীর পুষ্ট হইবে, তথায় সেইরূপ খাদ্য চিরপ্রচলিত আছে এবং অভ্যাসবশতঃ তাহাই তত্রত্য লোকের মুখরোচক। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে শ্বেতসারজনিত (Starchy

farinaceous) খাদ্য ও শীতপ্রধান দেশে যবক্ষারজানজনিত (Nitrogenous) খাদ্য অধিক আবশ্যক। তথায় তাহাই চিরপ্রচলিত দেখা যায়। এস্থলে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন আবশ্যকমত দেশবিশেষে ইহার খাদ্য প্রতিষ্ঠিত করে, সামাজিক নির্ব্বাচন ইহার ক্রমোন্নতি সাধন করে এবং লোকাচারে ইহা তথায় চিরপ্রচলিত থাকে।

এস্থলে কেহ যেন এমন মনে করিবেন না, চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষা করিয়াই লোকে পুষ্টিকারক খাদ্যদ্রব্য সমাজে প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। যেমন ব্যাকরণ রচিত হইবার বহুপূর্ব্বে জাতীয় ভাষা উদ্ভূত হয় ও ইহার নিয়মাবলি ক্রমশঃ গঠিত হইতে থাকে; সেইরূপ স্বাস্থ্যবিজ্ঞান (Hygiene) রচিত হইবার বহুপূর্ব্বে খাদ্যাখাদ্যের বিচার সমাজে আরম্ভ হইয়াছে। এখন আধুনিক উন্নত চিকিৎসাবিজ্ঞান সকলদেশের খাদ্য রাসায়নিক প্রক্রিয়াবলে বিশ্লিষ্ট করিয়া স্পষ্ট নির্দ্দেশ করে যে দেশে যেরূপ খাদ্যের প্রয়োজন তথায় সেইরূপ খাদ্য চিরপ্রচলিত রহিয়াছে।

এ দেশে ধর্ম্ম খাদ্যাখাদ্যের নানা কড়াক্রান্তি বিচার করে; কিন্তু পাশ্চাত্য জগতে ধর্ম্ম এ বিষয়ে আদৌ হস্তক্ষেপ করে না। লোকপরম্পরায় যাহা প্রবর্ত্তিত, তাহাই সকলে অনুসরণ করে এবং আধুনিক উন্নত স্বাস্থ্যবিজ্ঞান যাহা নির্দ্দেশ করে, তাহাই সকলে অন্তরের সহিত শিরোধার্য্য করিয়া লয়। ইহা দেখিয়া সুশিক্ষিত নব্য সম্প্রদায় খাদ্যাখাদ্যের বিচারকে স্বধর্ম্মের একটা প্রধান কুসংস্কার মনে করেন।

তাঁহারা ভাবেন, ভূমণ্ডলের কোন জাতি খাদ্য বিষয়ে এমন অযথা বিচার আচার পালন করে না, অথচ উহারা কেমন সুস্থ শরীরে দীর্ঘ জীবন ভোগ করিতেছে। তবে কেন আমরা ধর্ম্মের খাদ্যাখাদ্যবিষয়ক অনর্থক উপদেশ পালন করিয়া আপনাদের সুখের পথে কণ্টক

বপন করিব? কোথায় এই বৈজ্ঞানিক যুগে উন্নত স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের সুমধুর উপদেশ শ্রবণ ও পালন করিয়া দীর্ঘায়ুঃ লাভ করিব? না কোথায় স্থবির মুমূর্ষু হিন্দুধর্ম্মের অযথা উপদেশ শ্রবণ করিয়া আমরা বিবিধ ভোগ্য বস্তু হইতে আপনাদিগকে চিরবঞ্চিত করিয়া রাখিব? হা! হতবিধে! তোমার এ কিরূপ বিড়ম্বনা! আমরা আর কতকাল এইরূপ কুসংস্কারজালে আবদ্ধ থাকিব?

রে অপদার্থ হিন্দুধর্ম্ম! তোমার এ কি অনাচার! যেমন তুমি অনর্থক এ সকল বিচার আচার নির্দ্দেশ করিয়া অনধিকারচর্চ্চা করিয়াছিলে, আমরাও এখন সুশিক্ষা পাইয়া ও পিতার সুপুত্র হইয়া তোমার আজ্ঞা প্রকাশ্যভাবে উল্লঙ্ঘন করিতেছি ও আপনাদের সুখের পথ পরিষ্কৃত করিতেছি।

এখন খাদ্যাখাদ্যের বিচারে হিন্দুধর্ম্মের কি গূঢ় রহস্য, তাহা উদ্ঘাটন করা একান্ত আবশ্যক। প্রকৃতির যে সনাতন ধর্ম্ম কলি-কলুষিত মানবের আধ্যাত্মিকতার কিঞ্চিৎ স্ফূর্ত্তি করাইয়া তাঁহাকে প্রকৃত ধর্ম্মপথের পথিক করিতে চায়, যে ধর্ম্ম ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের জন্য তাঁহার যাবতীয় কর্ম্মের উপর স্বীয় স্নিগ্ধ, প্রীতিপদ অনুশাসন চিরদিন চালায়, যে ধর্ম্ম তাঁহার জন্য কেবল সুখের পথ অন্বেষণ করে, সে ধর্ম্ম কি তাঁহার শারীরিক ও মানসিক উন্নতি ও স্বসমাজের মঙ্গলের জন্য খাদ্যাখাদ্যের বিচার করিবে না? যে খাদ্য এই কলিযুগের অন্নগতপ্রাণ মানবের জীবনশোণিত অনুক্ষণ উৎপাদন করিতেছে এবং যে শোণিত তাঁহার দেহের যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সঞ্চারিত হইয়া জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্তে তাঁহাকে অনন্ত চেষ্টায় চেষ্টান্বিত করিতেছে, যে খাদ্য কেবলমাত্র তাঁহার স্থূলশরীর পোষণার্থ ব্যবহৃত হয়, এমন নহে, কিন্তু যে সূক্ষ্ম মন স্থূল মস্তিষ্কে নিবদ্ধ হইয়া বাহ্য দেহের সহিত অশেষ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, সেই সূক্ষ্ম মনের উপর যে খাদ্যের অনুশাসন সম্পূর্ণরূপে চালিত হইতেছে, সেই

অশেষ মঙ্গলনিদান খাদ্যের উপর ধর্ম্ম ইহার অনুশাসন চালাইবে না, এই বা কেমন কথা? ইহা কি ধর্ম্মের অযথাহস্তক্ষেপ বা অনধিকারচর্চ্চা?

মনে স্থিরনিশ্চয় করিয়া রাখ, এ বিষয়ে তোমার সনাতন ধর্ম্ম অন্যান্য ধর্ম্ম অপেক্ষা অধিক অগ্রসর। যে স্থলে উহারা এ বিষয়ে আদৌ হস্তক্ষেপ করে না বা মৌনাবলম্বন করে, সে স্থলে এ ধর্ম্ম স্বসেবকদিগের মঙ্গলোদ্দেশেই নিজ শাস্ত্রে বিবিধ বিধিনিষেধ দিয়া সকলকে প্রকৃত সুখের পথে লইয়া যাইতে চেষ্টা পায়। খাদ্য সম্বন্ধে শাস্ত্রে যে সকল ব্যবস্থা আছে, উহার গূঢ় উদ্দেশ্য বুঝা সুকঠিন। শাস্ত্র আদেশ দেয়, অমুক তিথিতে অমুক দ্রব্য ভোজন নিষিদ্ধ, কিন্তু এরূপ নিষেধ করিবার কোন কারণ ইহা দেখায় না। ধর্ম্মাত্মা হিন্দু এত-কাল শাস্ত্রাদেশ বিধিবৎ পালন করিয়া আসিতেছেন।

আজকাল শিক্ষিত সমাজ বৈজ্ঞানিক যুক্তি ব্যতীত কোন বিষয় বিশ্বাস করেন না। যদি তাঁহাদের পূজ্যতম বিজ্ঞান শাস্ত্রাদেশ সমর্থন করে, তবে তাঁহারা শাস্ত্রের কথা মানিতে পারেন। যেমন বিজ্ঞান পরীক্ষাবলে দধি ও তক্রের গুণাগুণ নির্দ্দেশ করিল, এমনি তাঁহারা দধিতক্র ভোজনে বিশেষ মনোযোগী হইলেন। তাঁহাদের ধ্রুব বিশ্বাস, উন্নত বিজ্ঞান অসাধারণ পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষাবলে যাহা সমর্থন করে, তাহা জগতের অমোঘ সত্য, তাহা কস্মিন কালে খণ্ডিত হইবেনা; আর যাহা শাস্ত্র উল্লেখ করে, তাহা নানাবিধ কুসংস্কারে ও ভ্রমে পূর্ণ এবং ইহার আদেশ যতই পরিহার করা যায়, ততই সমাজের মঙ্গল।

এখন দেখা যাউক, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান খাদ্য সম্বন্ধে কতদূর নিরূপণ করিয়াছে। রসায়ন শাস্ত্র (chemistry) অসাধারণ পরীক্ষাবলে সকল দেশের খাদ্য সামগ্রীর উপাদানরাশিকে অশেষরূপে বিশ্লিষ্ট করিয়া বৈজ্ঞানিক নিয়মানুসারে উহাদের যথোচিত শ্রেণিবিভাগ করে

এবং সেই সঙ্গে শরীরস্থ যন্ত্র সমূহের উপাদানরাশিকে বিশ্লিষ্ট করিয়া উহাদের সহিত খাদ্যসমূহের স্বাভাবিক উপযোগিতা নির্দ্দেশ করে। এই প্রকারে খাদ্যসমূহ ৫ শ্রেণিতে বিভক্ত, যথাঃ—

(১) শ্বেতসারজাতীয়

(২) যবাক্ষারজানজাতীয়

(৩) তৈলাক্ত

(৪) ক্ষারজাতীয়

(৫) জলীয়

শরীরতত্ত্ব (Physiology) বিশদরূপে বুঝাইয়া থাকে, খাদ্যসমূহ কিরূপে শরীরাভ্যন্তরে পরিবর্ত্তিত হইয়া স্বকার্য্য সাধ করিতেছে, অর্থাৎ কিরূপে উহারা অন্ত্র, পাকস্থলী প্রভৃতি উদরাভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন যন্ত্রের বিভিন্ন রসসংযোগ পরিপাক পাইয়া অন্ত্রস্থ শিরারাশি দ্বারা শোষিত হইয়া শোণিতে মিশ্রিত হইতেছে, পরে যকৃৎ, প্লীহা, থাইরয়েড, অস্থি মজ্জাদিতে প্রবাহিত হইতে হইতে ক্রমশঃ যথার্থ শোণিত হইতেছে, কিরূপে দেহস্থ যন্ত্রসমূহের জীবাণুরাশি শোণিতপ্রবাহ হইতে স্বস্ব উপাদান গ্রহণ করত উহাদিগকে সমীকৃত (assimilate) করিয়া স্বদেহ পোষণ করিতেছে ও স্বকার্য্য সাধন করিতেছে।

সেইরূপ স্বাস্থ্যবিজ্ঞানও অসাধারণ পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষাবলে খাদ্যসমুদয়ের গুণাগুণ ভালরূপ নির্দ্দেশ করে এবং শারীরিক স্বাস্থ্যের উপর উহাদের কিরূপ ক্রিয়া প্রকাশিত হয়, তাহাও বিশদরূপে নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা পায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এখনও অসম্পূর্ণ! খাদ্যসমুদায় জড়দেহে কিরূপ কার্য্যপরম্পরা দেখায়, তাহা ধারাবাহিকরূপে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ করা সুকঠিন। উহাদের পরিবর্ত্তন পরম্পরার বাহ্যস্তর বিজ্ঞান ভালরূপ নির্দ্দেশ করিতেছে বটে, কিন্তু অন্তঃস্তর নির্ণয় করিতে পারে নাই। আবার ইহা পাশ্চাত্য খাদ্যের

গুণাগুণ যেরূপ নির্দ্দেশ করে, প্রাচ্য খাদ্যের গুণাগুণ এখনও সেরূপ নির্দ্দেশ করে নাই। সেস্থলে বিজ্ঞানের কথা একমাত্র শিরোধার্য্য, আর ধর্ম্মের আদেশ অশ্রোতব্য, তাহা কি প্রকারে বলিব? যখন বিজ্ঞান এখনও অসম্পূর্ণ এবং শাস্ত্র যোগেশ্বর প্রকটিত, তখন বিজ্ঞানের সমক্ষে শাস্ত্রের আদেশ কি অমান্য করা উচিত?

মনে কর, ধর্ম্মশাস্ত্র যোগেশ্বরপ্রকটিত নয়, তোমার আমার ন্যায় সাধারণ মানবের রচিত, তথাচ শাস্ত্রকারেরা কি নিজ নিজ গ্রন্থে যুগযুগান্তর ব্যাপিয়া সঞ্চিত বহুদর্শিতার ফলাফল উল্লেখ করেন নাই? সমাজে লোকপরম্পরায় অগাধ পর্য্যবেক্ষণ ও ভূয়োদর্শনের গুণে যে সকল জ্ঞানরাশি সঞ্চিত হইয়াছে, তাহাতে বিশারদ হইয়া তাঁহারা খাদ্যাখাদ্যের গুণাগুণ বুঝিয়াছিলেন এবং কোন্ খাদ্য কোন্ তিথিতে শরীরের অপকারক, তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এখন তাঁহাদের আদেশ কি হাসিয়া উড়াইবার যোগ্য? দেখ, ত্রয়োদশী তিথিতে বার্ত্তাকু ভোজন নিষিদ্ধ· সেই তিথিতে ইহার ভিতর পোক দেখা দেয়। সেই পোক সমেত বেগুণ খাইলে কি তোমার দেহ ব্যাধিগ্রস্ত হইবে না?

যে ধর্ম্মশাস্ত্র ঈশ্বরাদেশ বলিয়া জনসাধারণের বিশ্বাস, সে শাস্ত্র কি তোমার আমার ন্যায় অধম মানবকে বুঝাইবার জন্য বাক্যাড়ম্বর প্রকাশ করিয়া কতকগুলি অসার যুক্তি প্রদর্শন করিবে? সে শাস্ত্র উপদেশ দিবে, আমার আদেশ মত তোমরা ঐ সকল বিধিনিষেধ অন্ধবিশ্বাসের সহিত পালন কর, ইহাতেই তোমাদের শ্রেয়োলাভ ও মঙ্গললাভ হইবে।

আরও দেখ, যে সূক্ষ্ম মানবমন দেহাভ্যন্তরে থাকিয়া ইহার সহিত অশেষ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, সেই সূক্ষ্ম মনের স্বাস্থ্যাস্বাস্থ্যলাভে বা উৎকর্ষাপ-কর্ষলাভে খাদ্যসমূহ কিরূপ অনুশাসন চালায়, এবিষয়ে পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান একেবারে নীরব। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত, মনের উপরও

উহাদের অনুশাসন অধিক পরিমাণে চালিত হইতেছে। যেমন বহুদিবস ধরিয়া আমিষ ও লঙ্কাদি ভোজন করিলে লোকের কোপনস্বভাব বর্দ্ধিত হয়,অথবা হবিষ্যান্ন ভোজন করিলে সাত্বিকভাব বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ প্রত্যেক খাদ্যদ্রব্য শরীর ও মন উভয়ের উপর সমভাবে অনুশাসন চালাইতেছে। এখন যদি ধর্ম্ম তোমার মনে সাত্বিকভাবের স্ফূর্ত্তির জন্য খাদ্যবিশেষকে দোষার্হ বলিয়া উপদেশ দেয়, উহার সে আদেশ কি মান্য করা উচিত নয়?

শাস্ত্রে খাদ্যসমূহ তিন শ্রেণিতে বিভক্ত, যথা :—

(১) সাত্বিক।

(২) রাজসিক।

(৩) তামসিক।

যাহাতে সাত্বিকভাব বর্দ্ধিত হয়, তাহা সাত্বিক আহার। যাহাতে রাজসিক ভাব বর্দ্ধিত হয়, তাহা রাজসিক আহার। যাহাতে তমোগুণ বর্দ্ধিত হয়, তাহা তামসিক আহার।

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবর্দ্ধনাঃ
রস্যাঃস্নিগ্ধাঃস্থিরা, হৃদ্যাআহারাঃ সাত্বিকপ্রিয়াঃ।
কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষ বিদাহিনঃ
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ।
যাতযমাং গতরসং পূতিং পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ং। (গীতা)

"যে খাদ্যে আয়ু, উৎসাহ, বল, আরোগ্য, সুখ ও আনন্দ বর্দ্ধিত হয়, যাহা সুরস ও স্নিগ্ধ, যাহার সুফল শরীরে বহুদিবস স্থায়ী এবং যাহার দর্শনমাত্র মনে অপার আনন্দোদ্রেক হয়, সেরূপ খাদ্য সাত্বিক লোকের প্রিয়। যে খাদ্য অতিশয় কটু, অম্ল, লবণাক্ত, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ ও নীরস, যাহাতে শরীরের জ্বলন উপস্থিত হয় এবং যাহাতে দুঃখ, শোক ও ব্যাধি উৎপন্ন হইতে পারে, সে রূপ খাদ্য রাজসিক লোকের

প্রিয়। যাহা একদিন পূর্ব্বে পক্ক, যাহার সুস্বাদ এখন আদৌ নাই, যাহা দুর্গন্ধময়, উচ্ছিষ্ট ও অপবিত্র, সেরূপ খাদ্য তামসিক লোকের প্রিয়।"

ইহাতে বুঝা উচিত, যে স্থলে বিজ্ঞান শরীরের উপর খাদ্যের ক্রিয়াপরম্পরার বাহ্যস্তর ভালরূপ নির্দ্দেশ করে, সে স্থলে হিন্দুধর্ম্ম শরীর ও মন উভয়ের উপর খাদ্যসমূহের কিরূপ ক্রিয়া হইতে পারে, তাহাই নির্দ্দেশ করিতেছে। তবে কেন তোমরা বিজ্ঞানের দুইটা কথা শ্রবণ করিয়া স্বধর্ম্মের অমূল্য আদেশকে কুসংস্কার বলিয়া উড়াইতেছ? নিশ্চয় জানিবে, শরীরের অশেষ সত্বিকভাবের স্ফূর্ত্তি এবং ইহার প্রকৃত সংযমশিক্ষার জন্য হিন্দুধর্ম্ম খাদ্যাখাদ্যের উপর এতদূর বিচারাচার বিধিবদ্ধ করিয়াছে, যাহাতে তোমরা উহাদিগকে বিধিবৎ পালন করিয়া স্বাস্থ্যসুখে সুখী হইবে এবং সেই সঙ্গে মনের অশেষ সাত্বিক ভাব লাভ করিয়া মানবজীবনের যথার্থ শ্রেয়োলাভ করিবে।

খাদ্যাখাদ্যের বিচারে হিন্দুধর্ম্মের আর একটী মহৎ উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে। যে জাতিভেদ হিন্দুসমাজের মূলভিত্তি, যাহার অস্তিত্বে ইহা অস্তিত্ববান ও জগতে চিরবিশিষ্ট, সেই জাতিভেদ-প্রথাকে পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখিবার জন্য হিন্দুজাতিকে চিরদিনের জন্য অন্যান্য জাতি হইতে বিভিন্ন রাখিবার জন্য এ ধর্ম্ম খাদ্যবিষয়ে আরও কতকগুলি কঠোর নিয়মাবলি প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। ইহারই জন্য ম্লেচ্ছ খাদ্য চিরদিন হিন্দুসমাজে অস্পৃশ্য এবং এক ব্রাহ্মণ ব্যতীত কোন জাতির হস্তপক্ক অন্ন অন্য এক জাতি ভক্ষণ করিতে পারে না। খাদ্যবিষয়ে এমন কঠোর নিয়ম কোন দেশে কোন জাতির ভিতর প্রচলিত নাই দেখিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায় ভাবেন, এ সকল বিচার-আচার ধর্ম্মের কুসংস্কার মাত্র। ইহাদিগকে যতই পরিহার করা যায়, সমাজের ততই মঙ্গল।

এ বিষয়ে ধর্ম্মের গূঢ় উদ্দেশ্য বুঝা আবশ্যক। যে ধর্ম্ম ইহার বাহ্য সীমা এমন কঠোরভাবে রক্ষা করে যে, অপর ধর্ম্মের কোন লোক কোন কালে ইহাতে প্রবেশলাভ করিতে পারে না, সেধর্ম্ম ইহার অভ্যন্তরীণ প্রত্যেক জাতির সীমা যতদূর সম্ভব রক্ষা করিতে চেষ্টা পাইয়াছে। যে ধর্ম্ম বিবাহবিষয়ক কঠোর নিয়মাবলী প্রবর্ত্তিত করিয়া প্রত্যেক জাতিকে কুলপরম্পরাগত করে এবং দুর্লঙ্ঘ্য অবরোধে চিরবেষ্টিত করত ইহাকে দুর্গের ন্যায় অভেদ্য করে, সে ধর্ম্ম সমাজের অশেষ মঙ্গলের জন্য ইহার জাতিভেদরূপী অভেদ্য দুর্গকে আরও দৃঢ়তর ও অপ্রধৃষ্যতর করিবার জন্য খাদ্যবিষয়ক কঠোর নিয়মাবলি প্রবর্ত্তিত করিয়াছে।

যেমন সুশাসিত রাজ্যের বাহ্য সীমা দুর্লঙ্ঘ্য অবরোধে বেষ্টিত ও সৈন্যসামন্ত দ্বারা সুরক্ষিত, সেইরূপ যে হিন্দুজাতির বাহ্য সীমা দুর্লঙ্ঘ্য অবরোধে বেষ্টিত ও চিররক্ষিত, ইহার অভ্যন্তরীণ প্রত্যেক জাতির সীমাও ভালরূপ সুরক্ষিত করা হইয়াছে। এস্থলে প্রকৃতি-সেবক হিন্দুধর্ম্ম কলিযুগের শিশ্নোদরপরায়ণ মানবের শিশ্ন ও উদর ভালরূপ অনুশাসন করিয়া জাতিভেদরূপ দুর্গকে চিরদিনের জন্য অভেদ্য করিবার জন্য বিবাহ ও খাদ্য বিষয়ে এমন কঠোর নিয়মাবলী প্রবর্ত্তিত করিয়াছে।

এই সকল কঠোর নিয়মাবলী প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম যুগে যুগে স্বীয় কীর্ত্তিধ্বজা গগনমার্গে উড্ডীয়মান করিতে সমর্থ এবং হিন্দুসমাজও উহাদিগকে বিধিবৎ পালন করিয়া এত বাধাবিঘ্ন সত্ত্বে ও এত রাষ্ট্রবিপ্লবের মধ্যে স্বীয় জাতীয়তা বা জাতিধর্ম্ম রক্ষা করিতে সমর্থ। এখন ভাবিয়া দেখ, কোন্ মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য হিন্দু-ধর্ম্ম খাদ্যাখাদ্য বিষয়ে এমন কঠোর নিয়মাবলী প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। ভারতমাতার ঘোর দুর্দ্দিনে তাঁহার সুসন্তানগণ এই সকল নিয়মাবলী

প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইহারই জন্য হিন্দুজাতি, হিন্দুধর্ম্ম ও জাতি-ভেদ জগতে এতকাল স্থায়ী হইয়াছে।

পূর্ব্বে যাঁহারা হিন্দুয়ানীর মস্তকে পদাঘাত করিয়া অস্পৃশ্য ম্লেচ্ছ খাদ্য ভোজন করিতেন, তাঁহারা জাতিচ্যুত ও সমাজচ্যুত হইতেন। এখন সময়গতিকে ভারতমাতার কৃতী পুত্রগণ ইউরোপ ও আমেরিকায় গিয়া ম্লেচ্ছ খাদ্য ভোজন করিতেছেন, অথচ কেহ জাতিচ্যুত হন না। যে সময়ে যেরূপ আচার ব্যবহার সমাজে আবশ্যক বোধ হয়, সমাজ তাহাই নিজে নির্ব্বাচন করিয়া লয়।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, কুক্কুট মাংস হিন্দুর অস্পৃশ্য হইল কেন? চরক্ সংহিতাদি আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে ইহার যথেষ্ট প্রশংসা দেখা যায়। রাজপুতনা ও মধ্যভারতের ক্ষত্রিয়জাতি বন্য কুক্কুট শিকার করিয়া ভক্ষণ করে। দাক্ষিণাত্যে নীচ মহারাষ্ট্রজাতি কুক্কুট পালন ও ভক্ষণ করে। তৈলঙ্গদেশে কায়স্থগণ এ পক্ষী পালন করে। তবে কেন আর্য্যাবর্ত্তে এমন পুষ্টিকারক ও সুস্বাদু মাংস পরিত্যক্ত হইল? ইহার একমাত্র কারণ এই যে, মুসলমানজাতি অতিশয় কুক্কুটভক্ত বলিয়া এ মাংস হিন্দুসমাজে ম্লেচ্ছখাদ্য জ্ঞানে এতকাল ঘৃণিত হইতেছে এবং হিন্দুধর্ম্ম ও স্বসমাজকে মুসলমান সমাজ হইতে বিশিষ্ট রাখিবার জন্য এ মাংসভোজনে মহাপাতক নির্দ্দেশ করিয়াছে। যদি তুমি জাতীয়তা অধিক ভালবাস, জাতীয়তার খাতিরে, সমাজের খাতিরে ও ধর্ম্মের খাতিরে এ মাংস ম্লেচ্ছখাদ্য জ্ঞানে তোমার ঘৃণা করা উচিত। কালের ফেরফার, সমাজের এ সকল বিচার আচার এখন পণ্ড হইতে চলিল। অনেকে পাশ্চাত্য বিদ্যায় বিভূষিত হইয়া হ্যাট কোট পরিয়া বাবুর্চীর হস্তপক্ক মুরগী খাইতেছে; অনেকে আবার স্বগৃহে সপরিবারে মুরগী রন্ধন করিয়া ভোজন করিতেছে। হায় রে! অর্দ্ধ শতাব্দীর ভিতর সমাজের কি অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে! উহারা ভাবে, মুরগী খেলেই

আয়ুর্ব্বল বাড়িবে? এজন্য এখাদ্য ভোজনে উহাদের এত ফূর্ত্তি ও এত উৎসাহ। যাহা হউক, কলিকাতা মহানগরীতে এ সব অনাচার এখন দেখা যাইতেছে? কিন্তু সুদূরবর্ত্তী পল্লীগ্রামে হিন্দুয়ানী পূর্ণভাবে রক্ষিত হইতেছে।

কোথায় হে বঙ্গীয় সমাজের আধুনিক তিলকবৃন্দ! তোমরা অশেষ পাশ্চাত্য বিদ্যায় বিভূষিত হইয়া আজ রাজপ্রসাদ লাভেচ্ছায় ম্লেচ্ছ জাতির সহিত মিশ্রিত হইয়া ম্লেচ্ছ খাদ্য অম্লানবদনে ভোজন করিতেছ। ইহাতে হিন্দুয়ানী ক্রমশঃ মিটিয়া যাইবে এবং বঙ্গদেশ অচিরে ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইবে সত্য বটে, এখন মুষ্টিমেয় লোক ইংরাজদিগের সহিত সামান্যরূপ মিশ্রিত হইয়া পান ভোজন করাতে সমাজের তাদৃশ অমঙ্গল নাই! কিন্তু যখন তোমাদের দেখাদেখি লোকে দলে দলে ইংরাজ সাজিয়া ম্লেচ্ছ খাদ্য ভোজন করিবে, তখন হিন্দুয়ানী কোথায় থাকিবে?

আজ তোমরাই জ্ঞানবলে ও অর্থবলে হিন্দুসমাজের পূর্ণ আদর্শ। তোমরা কি জান না।

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ
স যৎ প্রমাণং কুরুতেলোকস্তদনুবর্ত্ততে।

(গীতা)

"সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যেরূপ আচার ব্যবহার অনুসরণ করেন, অন্যান্য লোকে তাহাই অনুকরণ করিবে। তাঁহারা যাহা সপ্রমাণ করেন, জনসাধারণ তাহাই পালন করিবে।" তোমরা কি বুঝিতে পারিতেছ না, তোমাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কত সহস্র সহস্র হিন্দুযুবক ম্লেচ্ছ খাদ্য ভোজন করিয়া কালে হিন্দুয়ানীর মস্তকে পদাঘাত করিবে এবং তোমাদের ভবিষ্য বংশধরেরা কালক্রমে এই প্রকারে ইংরাজসমাজভুক্ত হইয়া যাইবে। আজ তোমরা উহাদের সহিত একত্র ভোজন দোষাবহ জ্ঞান করিতেছ না; কিছু দিন পরে

তোমাদের প্রপৌত্রগণ উহাদের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইতে ঘৃণা বোধ করিবে না।

এখন বুঝিয়া দেখ, তোমরা হিন্দুসমাজের কিরূপ অমঙ্গলের সূত্রপাত করিতেছ? যে পবিত্র হিন্দুনাম তোমাদের প্রপিতামহগণ পরাধীন অবস্থায় একবিংশ পুরুষানুক্রমে অশেষ কষ্টরাশি সহ্য করিয়া রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন, তোমরা আজ সেই পবিত্র হিন্দুকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া সামান্য বুদ্ধির দোষে সেই পবিত্র হিন্দুনামকে রসাতলে প্রেরণ করিতে উদ্যত হইয়াছ? যে সকল নিয়ম পালন করাতে পবিত্র আর্য্যজাতির পবিত্র শোণিত তোমাদের শিরায় শিরায় এখনও বর্ত্তমান, সে সকল নিয়ম কি এই জাতীয় দুর্দ্দিনে পালন করিয়া নিজের জাতীয়তা রক্ষা করা উচিত নয়? তবে কেন তোমরা উহাদিগকে উল্লঙ্ঘন করিতে ব্যগ্র হইয়াছ?

এস্থলে আমাদের শিক্ষিত বান্ধবগণ বলিবেন, পাশ্চাত্য শিক্ষা পাইয়া আমাদের চক্ষু কর্ণ ফুটিয়াছে। ব্রাহ্মণজাতির কঠোর শাসনে এতকাল যে মোহনিদ্রায় আমরা নিদ্রিত ছিলাম, তাহা এখন ভগ্ন হইয়াছে। এখন আমরা ইউরোপ, আমেরিকা, চীন, জাপান, আফ্রিকা প্রভৃতি নানা দেশে গিয়া বিদ্যা ও অর্থ উপার্জ্জন করিব এবং যাহাতে দেশের মুখ উজ্জ্বল করিতে পারি, সে বিষয়ে আমাদিগকে সাধ্যমত চেষ্টা পাইতে হইবে। এখন কি কেবল জাতিধর্ম্ম রক্ষা করিয়া অর্দ্ধসভ্যাবস্থায় স্থিতিশীল থাকা যায়? এখন আমরা উদ্যমশীলতা ও উন্নতিশীলতার পূর্ণ পরিচয় দিব।

এখন আমাদিগকে সভ্য দেশের শিল্পবিজ্ঞানাদি শিক্ষা করিয়া অন্যান্য জাতির সমকক্ষতা লাভ করিতে হইবে। যদি দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন না করিতে পারিলাম, ভবসংসারে আসিয়া আমরা কি করিয়া গেলাম? এখন কি খাদ্যবিষয়ে ধর্ম্মের অযথা বিচার আচার পালন করা উচিত? যে অবস্থায় পতিত হইব, যে দেশে

যাইব, তদবস্থোচিত ও তদ্দেশোচিত আহারাদি করিয়া জীবন কাটাইব। মন্ত্রের সাধন বা শরীরের পতন, এই ভাবিয়া দুঃখিনী পরাধীনা ভারতমাতাকে উদ্ধার করিতে হইবে। এ মহৎ তপস্যায় ভগবান আমাদের একমাত্র সহায়। তাঁহারই মহৎ কার্য্য সাধন করিব; এখন ইহাই আমাদের পরম ধর্ম্ম। এ সাধনার যূপকাষ্ঠে যদি জাতিধর্ম্ম ও প্রাণ বলি দিতে হয় তাহা আমরা অম্লানবদনে ও নিঃসঙ্কোচে দিব। তবে কেন সামান্য খাদ্যাখাদ্যের বিচার লইয়া আমাদিগকে নিরুৎসাহ করিতেছ?

যখন দেশের মঙ্গলের জন্য,ইহার বা রাজার কার্য্যে তোমাদিগকে বাধ্য হইয়া ধর্ম্মের খাদ্যবিষয়ক বিচার আচার অমান্য করিতে হইবে, তখন অম্লানবদনে ও হাস্যমুখে ম্লেচ্ছ খাদ্য খাইয়া কিছুদিন জীবন ধারণ কর, তাহাতে হিন্দুসমাজ তোমাদিগকে আর জাতিচ্যুত করিবে না। এখন শিক্ষিত সমাজের এতদূর সুবুদ্ধি হইয়াছে।

যদি কালগতিকে সমাজের কোন দেশাচার ইহার অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে, উহার কি কালোচিত সংস্কার করা উচিত হয় না? যখন দেশের মঙ্গলের জন্য বা বিদ্যাধনোপার্জ্জনের জন্য আমাদিগকে ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে যাইতে হইবে, তখন খাদ্যাখাদ্যের বিচার বিদেশ বিভূমে আমাদের নানা ক্লেশের কারণ। আমরা স্বতঃ পরতঃ ঐ সকল উল্লঙ্ঘন করিতে বাধ্য হইব। খাদ্যবিষয়ক বিচারাচার এখন আমাদের জাতীয় উন্নতির এক প্রধান অন্তরায়। ইহাদিগকে উঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণঠাকুরেরা যাহাই বলুন না কেন, আমরা সময়ের উপযোগিতানুসারে চলিব ও জাতিধর্ম্ম বজায় রাখিব।

অষ্টম অধ্যায়।

হিন্দুসমাজের সাধারণ কর্ত্তব্য।

পুণ্যবলেই জীব সংসারে মানবরূপে দেখা দেয়; আবার সেই মানব বহু পুণ্য বলে হিন্দুকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। যে অনন্তরত্ন-প্রসবিত্রী ভারতভূমি বসুন্ধরাদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কন্যা ও প্রকৃতি-দেবীর সহস্র অনুগ্রহে অনুগৃহীতা, অশেষ পুণ্যবল না থাকিলে কেহ উহার সুখৈশ্বর্য্য ভোগ করিতে পারেন না। যে প্রাচীন আর্য্যজাতি নানাদেশে জ্ঞানধর্ম্মের জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া বহুকাল ভূমণ্ডলে নিজ কীর্ত্তিধ্বজা উড্ডীয়মান করেন, যে জাতির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আবিষ্কার করিবার জন্য পাশ্চাত্য জগৎ পুরাতন জ্ঞানভাণ্ডার সম্যক অনুসন্ধান করিতেছে, অশেষ পুণ্যবল না থাকিলে, কেহ সে জাতির বংশধর হইতে পারেন না। যে হিন্দুজাতি এতকাল প্রাচ্য দর্শন সংস্কৃত দেবভাষা ও সনাতন ধর্ম্ম অনুশীলন করিয়া জাতীয় আধ্যাত্মিকতার চরম উন্নতি লাভ করে এবং যে জাতির রীতিনীতি ও আচার ব্যবহার পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অশেষ পুণ্যবল না থাকিলে কেহ সে জাতির কুলতিলক হইতে পরেন না। এখন বুঝিয়া দেখ, কি পুণ্যবলে তোমরা সকলে হিন্দুকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ।

যে ভারতমাতা পুরাকালে জ্ঞানবিজ্ঞানে উদ্ভাসিত ও ধনধান্যে পূর্ণ হইয়া নিজের সন্তানবর্গকে অসাধারণ শৌর্য্যবীর্য্যে সুশোভিত করত ত্রিংশ শতাব্দী ব্যাপিয়া স্বাধীনতা ভোগ করেন ও ধরণীবক্ষে নিজ জয়পতাকা উড্ডীয়মান করেন, তাঁহার এখন কি দুর্দ্দিন উপস্থিত! তোমাদেরই দুরদৃষ্টক্রমে তিনি এখন পরাধীনা, পরের পদানতা ও পরপদমথিতা। লক্ষ্মীর মাতা হইয়া তিনি এখন

তোমাদিগকে ক্রোড়ে লইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছেন। নানা জাতি আসিয়া তাঁহার ধনাগার লুণ্ঠন করিতেছে; আর তোমরা নির্বীর্য্য হইয়া দীন হীন বেশে পেটের দায়ে উহাদের গোলামী করিতেছ।

সংসারের নিয়ম এই, ভাগ্যনেমির বিঘূর্ণনে যে জাতির যত সৌভাগ্য আসিবে, কালে সে জাতির তত দুর্ভাগ্য ঘটিবে। যে ইংরাজ আজ সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর, সেই ইংরাজ পঞ্চ শতাব্দী ব্যাপিয়া রোমের পদানত ছিল। যে ভারত তিন হাজার বৎসর স্বাধীন থাকিয়া পরম সুখে সুখী ছিল, সে ভারত সপ্ত শতাব্দী পরাধীন হইয়া অশেষ দুঃখে দুঃখী হইয়াছে। এই দুঃসময়ে আমাদের প্রধান জাতীয় শ্রেয় কি? কোন কোন কার্য্য করিলে আমরা পুনরায় দুঃখিনী মাতার মুখ উজ্জ্বল করিতে পরিব এবং তাঁহার সুসন্তান হইয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদভাজন হইব?

যে ভারতমাতাকে তোমরা এতকাল মা দুর্গারূপে পূজা করিয়া আসিতেছ, তাঁহার প্রতিমার গূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিলেই তোমরা জাতীয় শ্রেয় ভাস্করূপ বুঝিতে পারিবে। যোগসিদ্ধ শাস্ত্রকারেরা আমাদিগকে যাহা দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা জগতের অমোঘ সত্য। এ প্রতিমার একদিকে মা সরস্বতী। তোমরাও অশেষ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যায় বিভূষিত হইয়া তাঁহার বরপুত্র হইবে ও ভারত মাতার মুখ উজ্জ্বল করিবে; ইহার অপর দিকে মা লক্ষ্মী, যিনি ধনদৌলতের অধীশ্বরী। তোমরাও মা লক্ষ্মীর বরপুত্র হইয়া দেশের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতিসাধন করত ইহার ধনাগম বৃদ্ধি করিবে, কদাচ ইহাকে দৈন্যদশায় পতিত হইতে দিবে না। তবে তোমরা ভারতমাতার মুখ উজ্জ্বল করিতে পারিবে। এ প্রতিমার একদিকে দেবসেনাপতি কুমার কার্ত্তিক, যিনি দেবকার্য্য সাধনার্থ তাড়কাসুর নিধন করেন। তোমরাও অসাধারণ শৌর্য্যবীর্য্যে সুশো-

ভিক্ত হইয়া ও অশেষ পাশ্চাত্য সংগ্রামবিদ্যায় বিশারদ হইয়া দেব-কার্য্য সাধন করিবে ও ভারতমাতার মুখ উজ্জ্বল করিবে। ইহার অপরদিকে সিদ্ধিদাতা গণেশ। তোমরাও সেই গণপতির পূজা করিয়া তনমনধনসে সকল কাজ করিবে ও অলৌকিক সিদ্ধিলাভ করিবে। এই প্রকারে তোমরা মাতার মুখ উজ্জ্বল করিতে চেষ্টা পাইবে। মা দুর্গা সিংহোপরি দণ্ডায়মান হইয়া মহিষাসুরকে ত্রিশূল-বিদ্ধ করিতেছেন। তোমরাও সিংহবাহিনী চমূ গঠন করিয়া অসুর নাশে প্রবৃত্ত হইবে অথবা ব্রীটিশসিংহের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া রাজকার্য্যে বা দেবকার্য্যে দেহপাত করিবে। ভারতমাতা চিরদিন তোমাদিগকে এইরূপ নানা অভয়বাণী দিতেছেন।

ভারত স্বাধীন হউক বা পরাধীন থাকুক, তাহা ভগবানের ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে; তোমার আমার ইচ্ছায় কিছু হইতে পারে না। আর যাঁহারা দৈব ইচ্ছার বিরুদ্ধে অসময়ে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটাইতে চেষ্টা পাইবেন, তাঁহারা সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবেন। এখন এই পরাধীন অবস্থায় জাতীয় শ্রেয় লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে নিম্নলিখিত বিষয় গুলিতে বিশেষ মনোনিবেশ করিতে হইবে।

(১) জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষা।

(২) শারীরিক বলের অনুশীলন ও বিলাসিতা ত্যাগ।

(৩) জাতিধর্ম্ম রক্ষা।

(৪) গোব্রাহ্মণ রক্ষা।

(৫) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষাবলে মনের উন্নতি সাধন, চিরন্তন জাতীয় আধ্যাত্মিকতা রক্ষা ও আধিভৌতিক উন্নতিসাধন।

(৬) ধনাগমের জন্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষিশিল্পের উন্নতি-সাধন ও দেশে নানা যৌথকারবার সংস্থাপন।

(৭) ইংরাজদিগের শোষণনীতি রোধের জন্য নানাউপায় অবলম্বন ও এতদর্থে জাতিভেদের সমাজশাসন একান্ত আবশ্যক

(৮) ইংরাজরাজের পূর্ণ বিশ্বাসভাজন হইয়া ভারতে পার্লমেণ্ট গঠন ও স্বরাজলাভ।

(৯) দুর্ম্মূল্যতা নিবারণের জন্য গ্রামে গ্রামে ধর্ম্মগোলা সংস্থাপন।

(১০) সমাজের নিকট শেষ ভিক্ষা।

জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষা।

শুনিতে পাই, বাঙ্গালী জাতি ক্রমশঃ ধ্বংসপথে অগ্রসর হইতেছে। ইহার যে কয়েকটী কারণ দেখান হয়, তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান। প্রথমতঃ। মেলেরিয়ায় পল্লীগ্রামগুলি একপ্রকার উজাড়। চতুর্দ্দিকে রেলবাঁদ নির্ম্মিত হওয়ায় জলনিঃসরণের সুবিধা নাই। ইহাতে মেলেরিয়ার এত প্রকোপ। বাবুরা ইহার ভয়ে নিজ গ্রাম ছাড়িয়া সহরে বাস করিতেছেন। সেখানে শৃগাল কুকুরের তাণ্ডব নৃত্য চলিতেছে, আর কালপ্যাঁচা বাড়ী পাহারা দিতেছে। কালাজ্বর নূতন আমদানী হইয়াছে। কলেরা ও বসন্ত সংক্রামকরূপে বৎসরে বৎসরে অনেক লোকক্ষয় করিতেছে।

দ্বিতীয়তঃ। সকল জিনিস পত্র আক্‌্রা, এখন খাবে কি? পয়সা যে হাতে নাই। ঘি দুধ ত চোখের ডুমুরফুল। গোদের উপর বিষফোড়া। ছেলে বুড়ো সকলের মধ্যে চাপানের ধুম পড়িয়া গিয়াছে। পেটে ভাত পড়ুক, না পড়ুক, চা পান করিতেই হইবে। আবার সকল জিনিষ ভেজাল, খেলেই বুকজ্বালা, আর অম্বলের ঢেকুর উঠিবে। যাবে কোথা বাবা! এ সব খেয়ে চল্লিসের ভিতর মর্ত্তে হবে যে!

তৃতীয়তঃ। পেটের দায়ে ইংরাজি শিখ্‌তে গিয়া ছেলেদের গোপার দেহপাত করিতে হয়। তার উপর বাবুয়ানার কত ফ্যাসান বাড়িতেছে, বিলাসিতা পুরাদমে চলিতেছে। ইহাতে স্বাস্থ্য নষ্ট

হইবে না, ত আর কি হইবে? আবার ইংরাজের কল্যাণে কাহাকে দু পা হাট্‌তে হয় না। চারিদিকে রেল, ট্রাম, বাস্, মোটরকার, ঘোড়ার গাড়ী। পয়সা থাক্‌লেই চড়া যায়। কেমন মজা! কেমন সুখ! বুড়ো ঠাকুরদাদার ভাগ্যে এ সব সুখ ছিল না। তোমরা কি জান, এখন পঞ্চাশ পার না হতে হতে তোমরা কেন বুড়িয়া যাও?

এই সকল নানা কারণে আমরা এখন ধ্বংসপথে অগ্রসর। যেরূপ কাল পড়িতেছে, জিনিসপত্রের দর যেরূপ বাড়িতেছে, তাহাতে ৩।৪ পুরুষ পরে আমরা না খাইতে পাইয়া মারা যাইব। আমরা যদি মারা পড়ি, তাহাতে ইংরাজের ক্ষতি কি? তাঁহারা ত বিলাতে টাকা গম চাউল পাঠাইবেন। তাঁহারা সুসভ্য জাতি, তাঁহারা কদাচ অবাধবাণিজ্য বন্ধ করিবেন না। গম চাউলের পরিবর্ত্তে তাঁহার কি দেন জান? আমাদের হস্তে দিল্লীকা লাড্ডু দিয়া নাচ্‌তে বলেন। আমরাও এমনি অপদার্থ, বিলাতি জিনিস পাইয়া আমরা ভাবি, আকাশের চাঁদ পাইলাম এবং মনের আনন্দে নাচিতে থাকি। যত বিলাতি মাল দেখিতেছ, এ সব দিল্লীকা লাড্ডু।

বুড়ো ঠাকুরদাদা গল্প করিতেন, শতবৎসর পূর্ব্বে কোম্পানি বাহাদুরের সময় লোকে একটী মাত্র টাকা ট্যাকে লইয়া বাজারে যাইত। সেখানে ১/ মণ চাউল, যথেষ্ট তরকারী ও মাছ খরিদ করিয়া কিছু পয়সা ফেরৎ লইয়া বাড়ী আসিত। এ সব কথা কি আমাদের নিকট এখন স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইতেছে না?

স্বাধীন ভারতের কথা ছাড়িয়া দেও, মুসলমানদের সময়ে খাওয়া-পরা সম্বন্ধে আমাদের কোনরূপ কষ্ট ছিল না। আমাদের যত কষ্ট এই ইংরাজদিগের আমলে। গাঁট কসার মত ইংরাজ সকল দ্রব্যের মূল্য কস্‌চেন, তাহাতে উহাদের দর ক্রমাগত বাড়িতেছে। বাড়িতে বাড়িতে পরে এতদূর উঠিবে, অনেকে খাইতে পাইবে না। ইহাতে জমীদার, তালুকদার, কৃষক ও মুটেমজুরদের কষ্ট না হইতে পারে।

মরিবে মধ্যশ্রেণী, যাহাদের পেসা চাকুরী ও দোকানদারী। একে ত চাকুরীর বাজারে হাহাকার পড়িয়াছে, অপরদিকে জিনিস পত্র এত মহার্ঘ, কেমন করিয়া সংসার চালাইবে? দেখিতেছ কি, মৃত্যু যে অনিবার্য্য।

অজন্মা হউক, সুজন্মা হউক, গম চাউল মহার্ঘই থাকিবে। আমরাত শস্যের বিদেশরপ্তানি বন্ধ করিতে পারিব না। কাজেই ভগবানকে ডাকা ছাড়া আমাদের অন্য কোন উপায় নাই। এখন সকলকে কোথাও না কোথাও যেমন বেতন হউক, মাথা গুঁজে থাকিতে হইবে। কি করিবে বল, পেটের দায় যে মহাদায়। যাঁহার যেমন অদৃষ্ট, তিনি কোন না কোন উপায়ে সেইরূপ রোজগার করিয়া সংসার চালাইবেন। এখন রূপচাঁদের পূজাই আমাদের প্রধান ধর্ম্ম। যিনি যেমন করিয়া পারেন, যে উপায়ে পারেন, যেস্থলে পারেন, একমাত্র রূপচাঁদের পূজা করিয়া ধর্ম্মের চতুর্ব্বর্গফল লাভ করিতে চেষ্টা পাইবেন। তবে জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারিবে। না করিলে সপরিবারে ওসসন্ততিতে যমের বাড়ী যাইতে হইবে।

শারীরিক বলের অনুশীলন ও বিলাসিতাত্যাগ।

দুই বেলা দুই মুঠা খাইয়া জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষা করিবার পর শারীরিক বলের অনুশীলন স্বজাতির মঙ্গলের জন্য একান্ত আবশ্যক। এ বিষয়ে প্রত্যবায় ঘটিলে সে জাতি ধ্বংসপথে অগ্রসর হইবে। প্রত্যহ রীতিমত ব্যায়ামাদি করিলে শরীরের বল সম্যক বৃদ্ধি পায়। পৃথিবীতে যে জাতি যত ব্যায়ামপটু, সে জাতি তত বীর্য্যবান। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলও পাঞ্জাবের জনসাধারণ ব্যায়ামপটু বলিয়া উহারা এত বীর্য্যশালী, আর বাঙ্গালী জাতি ব্যায়ামবিমুখ বলিয়া এত ক্ষীণবীর্য্য ও নিস্তেজ। পুরুষানুক্রমে বল-বীর্য্যের অনুশীলন না করাতে এ

জাতি এখন এত দুর্ব্বল হইয়াছে। এখন এ বিষয়ে আমাদের জাতীয় শ্রেয় কি? কিজন্য আমরা এত নিস্তেজ হইতেছি? কেন ইংরাজেরা আমাদিগকে Oleaginous Babu বলিয়া ঘৃণা করেন? একমাত্র ব্যায়ামের অভাবে আমরা এই দুর্নাম কিনিয়াছি।

যাহারা চাষী ও মুটে মজুর, যাহাদিগকে যথেষ্ট কায়িক পরিশ্রম করিতে হয়, আর যাহারা বসিয়া বসিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করে এবং কোনরূপ কায়িক পরিশ্রম করে না, সকলের পক্ষে সৈনিক পুরুষের ন্যায় নিত্য নৈমিত্তিক ব্যায়াম অত্যাবশ্যক। ব্যায়াম দ্বারা বলবীর্য্যের অনুশীলন না করিলে কোন জাতি জগতে জাতীয় শ্রেয় লাভ করিতে পারে না। অতএব সকলে মিলিত হইয়া বায়াম চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিবে।

ব্যায়াম চর্চ্চায় কি কি বুঝায়? ইহাতে (১) চুচুকাটি খেলা (২) ফুটবল খেলা (৩) মুগুর ও ডাম্‌বেল ভাঁজা (৪) ডনফেলা (৫) বাইক চড়া (৬) ঘোড়ায় চড়া (৭) সাঁতার দেওয়া (৮) লাটি খেলা ইত্যাদি বুঝায়। বাঙ্গালী চরিত্রের মহৎ কলঙ্ক, দেশের ছাত্রগণ পঠদ্দশায় এ সকল ব্যায়ামের চর্চ্চা করে; কিন্তু সংসারে প্রবেশ করিবামাত্র উঁহাদিগকে আজীবনের তরে ত্যাগ করিয়া বসে, মনে করে, ঐ সকল ব্যায়াম করিলে বুঝি, মানের লাঘব হইবে ও সাধারণের নিকট হাস্যাস্পদ ও লজ্জিত হইতে হইবে। এরূপ ধারণা দেশের বড় অমঙ্গলের কারণ। একেত আমরা নিরস্ত্র হইয়া পুরুষানুক্রমে নির্বীর্য্য হইতেছি; তাহার উপর যদি আমরা যৌবন কালে ব্যায়ামাদি করিয়া শারীরিক বলবীর্য্যের সম্যক অনুশীলন না করি, আমরা অচিরে আরও অধঃপাতে যাইব। যাইতেছি এখন আমরা সেই পথে। চল্লিশ পার না হতে হতে আমরা বুড়িয়া যাই ও পটোল তুলি।

ওহে সুশিক্ষিত সম্প্রদায়। যদি নিজ নিজ শরীর সুস্থ রাখিয়া

দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে চাহ, যদি স্বজাতিকে বীর্য্যবান করিয়া দেশের উন্নতিসাধন করিতে চাহ, সংসারে প্রবেশ করিয়াও রীতিমত ব্যায়ামাদি করিবে, মুগুর ভাঁজিবে, ডন ফেলিবে, ফুটবল ও লাটি খেলিবে। নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ার ন্যায় এ সকল আজীবন অভ্যাস করিবে। দেখিতে পাইবে, সোত্তর বৎসর বয়ঃক্রম কালে তোমরা যুবকের ন্যায় বলিষ্ঠ, কর্ম্মঠ ও পরাক্রমশালী থাকিবে। এ বিষয়ে সকলকে উৎসাহ দিবার জন্য গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায়, নগরে নগরে ক্লাব ও আখড়া স্থাপন কর এবং তথায় দশজনে মিলিয়া মিশিয়া ব্যায়ামাদি কর। ইহার সুফল তোমরাও স্বজীবনে ভোগ করিবে এবং তোমাদের ভবিষ্যবংশধরেরাও ভালরূপ ভোগ করিবে। এখন তোমরা তাস, সতরঞ্জ ও পাশা খেলিয়া অনেক সময় বৃথা আমোদ আহ্লাদে কাটাও, কিন্তু ইহাতে শরীরের যে কত ক্ষতি, তাহা বুঝিয়াও বুঝিবে না। আরামের জন্য ইহারা যেমন আবশ্যক, শরীরের বলবৃদ্ধির জন্য ব্যায়ামাদি সেইরূপ আবশ্যক। একে ত দেশের জলবায়ুর দোষে আমরা ক্রমশঃ নিবীর্য্য হইতেছি, তাহার উপর অতিরিক্ত অন্নচিন্তা, ভেজালদ্রব্য ভোজন ও বিলাসিতা প্রভৃতি নানা কারণে আমরা আরও নিস্তেজ হইতেছি। আবার ছাত্রজীবনে অনেকে অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম করিয়া সোণার দেহ পাত করিতেছে। এ সকল কুচালের একমাত্র মহৌষধি আজীবন ব্যায়ামানুশীলন।

যাঁহারা বলেন, ঘি দুধ প্রভৃতি পুষ্টিকর খাদ্য না পাইলে একমাত্র ব্যায়ামে কি শরীর বীর্য্যশালী হইবে? তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত, মুটে মজুর কি খায়? অথচ উহাদের দেহ দেখ, কেমন সবল! ব্যায়াম অভ্যাস থাকিলে সামান্য শাকান্নে দেহ পুষ্ট ও সবল হইবে।

সকল কথার সার কথা এই, যদি পায়ের উপর ভর দিয়া জগতে দাঁড়াইতে ইচ্ছা কর, শারীরিক বলবীর্য্যের সম্যক অনুশীলন করা

এখন আমাদের প্রধান জাতীয় সাধনা। তদ্ব্যতিরেকে আমরা কখনও দুঃখিনী ভারতমাতার মুখ পুনরায় উজ্জ্বল করিতে পারিব না। দেখ, শিখগুরু গোবিন্দ সিং নিজ সম্প্রদায়কে অস্ত্রধারণ ও ব্যায়াম শিক্ষা দিয়া শিখজাতির কতদূর জাতীয় উন্নতিসাধন করিয়া যান, যাহার গুণে শিখফৌজ আজ ইংরাজরাজের ডানহাত, আর আমরা তাঁহাদের নিকট ভীরু ও কাপুরুষ। নিজেদের দোষে আমরা এরূপ হইয়াছি। যদি আমাদের মধ্যে ব্যায়ামচর্চ্চা বহুকাল থাকিত, আমরা এমন দুর্নাম কিনিতাম না। এখন এই দুরপনেয় জাতীয় কলঙ্ক দূর করিতে চেষ্টা করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য।

আজকাল বাবুয়ানির কি ধুম পড়েছে। ইংরাজি লেখাপড়া শিখিয়া আমরা এখন সভ্য ও ভব্য হইতেছি, সকলেই বাবু সাজিতে একান্ত ব্যগ্র। পেটে খাইতে পাই, না পাই, বাবু না সাজিলে লোকের কাছে মান থাকিবে না। বাবুগিরির কত ফ্যাসান কতদিকে বাড়িতেছে। এ হাওয়া রোধ করে, কাহার সাধ্য? মাথায় সুগন্ধি তৈল মাখিতে হইবে, পায়ে মোজা চড়াইয়া পাম্পসু বা বুট জুতো পায়ে দিতে হইবে; নাকে খড়খড়ি বসাইতে হইবে, মুখ হইতে চুরুটের ধূম ছাড়িতে হইবে, গায়ে কত রকম সার্ট কোট লাগাইতে হইবে। কি শীত, কি গ্রীষ্ম, সকল সময়ে গরমাগরম চা পান করিতে হইবে। যাঁদের পয়সা অধিক, তাঁহারা হ্যাট কোট পরিয়া পুরা সাহেব সাজিতেছেন। আজকাল পিতৃপুরুষগণ একবিন্দু জল পান না; বাবুরা ভাবিতেছেন, এক বাবুগিরির জোরে সকলকে নরক্ হইতে উদ্ধার করিবেন। মেয়েদের কতরকম সাজগোজ, কত রকম গহনা পত্র! দেখে শুনে অবাক হইতে হয়। রাঁধ্‌বার বেলায় হাত খোড়া, কাজকর্ম্মের বেলায় পা খোড়া, সাজগোচের বেলায় কোমর বাঁধিয়া বসে। এ সব দেখে শুনে বুড়োঠাকুর দাদা বল্‌চেন, সকলই উচ্ছন্ন যাইবার পথ পরিষ্কার করিতেছে। দেখা যাক, কয় পুরুষে

উহারা সকলে মরে। যাহা হউক, এ সকল বাবুগিরির চাল না ছাড়িলে আমাদের কোনরূপ ভদ্রস্থতা নাই, আমাদের ধ্বংস একপ্রকার অনিবার্য্য।

জাতিধর্ম্ম রক্ষা।

মুসলমানযুগে ধর্ম্মান্ধ রাজজাতির অত্যাচারে আমরা জাতিধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য বড় বিব্রত হইয়াছিলাম। তৎকালে সমাজনায়ক ব্রাহ্মণ-জাতি জাতিভেদের কঠোর শাসন প্রবর্ত্তন করিয়া ও রীতি নীতির কালোচিত ও দেশোচিত পরিবর্ত্তন করিয়া আমাদের জাতিধর্ম্ম রক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর হন। ভগবদিচ্ছায় তাঁহারা এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হন। পঞ্চশতাব্দী কাল তাঁহারা মুসলমানধর্ম্মের সহিত ঘোরতর সংগ্রামে লিপ্ত হইয়া পরিশেষে উহার উপর জয়লাভ করেন। আজকাল উদাররাজনীতিজ্ঞ ইংরাজরাজ প্রজার জাতিধর্ম্মের উপর সাক্ষাৎসম্বন্ধে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেন না বটে; কিন্তু তাঁহারা যে পাশ্চত্য শিক্ষা বিকীর্ণ করিতেছেন, উহা ধর্ম্ম ও নীতিবিবর্জ্জিতা হওয়ায় উহার বিষময় ফলে আমাদের জাতিধর্ম্ম আজকাল রসাতলে যাইবার উপক্রম। এই মনমোহিনী দূতি ঘরে ঘরে ঢুকিয়া আমাদের কাণে কি বীজমন্ত্র ঝাড়িতেছে, তাহাতে জাতিধর্ম্ম আর থাকে না। ইহার বিষময় ফল নানাস্থলে উল্লেখ করিয়াছি।

হিন্দুসমাজের চিরন্তন অধিনায়ক ব্রাহ্মণজাতির প্রভুত্ব ক্রমশঃ মন্দীভূত হইতেছে। তৎপরিবর্ত্তে ইংরাজরাজের কল্যাণে পাশ্চাত্য শিক্ষায় বিভূষিত নব্যসম্প্রদায় বিদ্যা ও অর্থবলে সমাজের অধিনায়ক হইতেছেন। তাঁহাদের মতামত লইয়া গভর্ণমেণ্ট নানাবিষয়ে চালিত হন, কিন্তু জনসাধারণ ধর্ম্ম ও রীতিনীতি বিষয়ে ব্রাহ্মণজাতি দ্বারা একমাত্র পরিচালিত হইতেছে।

আমরা স্বাধীন হই বা পরাধীন থাকি, লক্ষপতি হই বা দীনদরিদ্র

থাকি, যে প্রাচীন আর্য্যজাতির আমরা একমাত্র বংশধর, সেই জাতির জাতীয়তা সম্যক অনুশীলন করিয়া ইহার অস্তিত্ব জগতে চিরদিন বজায় রাখা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। আবার সেই জাতি যদি যুগধর্ম্মে দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ অবনত ও অধঃপতিত হইয়া পড়ে, ইহার কালোচিত উন্নতিসাধন করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। অত এব এই পরাধীন অবস্থায় হিন্দুয়ানী পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখিয়া কালো চিত জাতীয় উন্নতিসাধন করা আমাদের প্রধান জীবনব্রত।

সুশিক্ষিত নব্যসম্প্রদায় ভাবিতেছেন, জাতিধর্ম্ম থাক বা না থাক, তাহাতে ভারতের কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। কিন্তু সুসভ্য ইংরাজরাজের অনুগ্রহে কালোচিত সুশিক্ষা পাইয়া সভ্যতাসোপানে আরোহণ করা ও স্বরাজ লাভ করা এখন আমাদের প্রধান জীবনব্রত। ইহাতে কালে ভারতের প্রকৃত মঙ্গল সম্পাদিত হইবে। এজন্য তাঁহারা জাতিধর্ম্মের দিকে তাদৃশ দৃষ্টিপাত না রাখিয়া কেবল পাশ্চাত্য শিক্ষা বলে জাতীয় উন্নতিসাধন করিতে ও পাশ্চাত্য আদর্শে সমাজকে পুনর্গঠিত করিতে বদ্ধপরিকর। অপরদিকে পুরাতন সম্প্রদায় প্রাচ্য-বিদ্যার অনুশীলন করত জাতীয় উন্নতির দিকে তাদৃশ দৃষ্টিপাত না করিয়া কেবল জাতিধর্ম্ম, পুরাতন সমাজপদ্ধতি ও রীতিনীতি বজায় রাখিতে একান্ত তৎপর। যথার্থ বলিতে কি, এস্থলে উভয় সম্প্রদায়ই মহৎ ভ্রমে পতিত। প্রথমোক্ত সম্প্রদায় জাতীয় উন্নতিসাধন করিতে যে ভাবে ধাবিত, তাহাতে তাঁহারা কালে জাতিধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া বসিবেন; আবার শেষোক্ত সম্প্রদায় যে ভাবে জাতিধর্ম্ম ও পুরাতন পদ্ধতি বজায় রাখিতে ব্যগ্র, তাহাতে ভারত যে তিমিরে, চিরদিন সে তিমিরে থাকিবে এবং হয়ত পরিশেষে হিন্দুজাতি ভূপৃষ্ঠ হইতে লিপিয়া পুঁছিয়া যাইবে।

বিজ্ঞ লোকেরা পরামর্শ দেন এখন আমাদের মধ্যপথে যাওয়া একান্ত আবশ্যক। আমরা জাতিধর্ম্ম ও পুরাতন রীতিনীতি যথা-

সাধ্য বজায় রাখিয়া আবশুকমত উহাদের কালোচিত সংস্কার করত সভ্যতার পথে ও উন্নতির পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইব। বাহ্যদর্শনে সাহেব সাজিতে হয়, স্বচ্ছন্দে তাহাই সাজিব। কিন্তু মনের ভিতর চিরদিন হিন্দু থাকিব।

অনেকের মত, পরাধীন অবস্থায় প্রকৃত জাতীয় উন্নতিসাধন করিতে পারা যায় না। এই যে অনেকে আজকাল ছুইটা ইংরাজি বুক্নী ঝাড়িতে শিখিয়া বাড়াই করে, আমরা কি হনু রে, ইহাতেই কি দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হইবে? ইংরাজরাজপুরুষগণ তাঁহাদের প্রয়োজনমত আমাদিগকে পাশ্চাত্যশিক্ষা দিতেছেন, যাহাতে আমরা তাঁহাদের গোলামী ভালরূপ করিতে শিখিব। তাঁহারা কি আমাদিগকে কৃষি, শিল্প, সংগ্রাম, নৌবিদ্যা শিক্ষা দিতেছেন, যাহাতে আমরা পায়ের উপর দাঁড়াইয়া অন্য জাতির সমকক্ষ হইতে পারিব? এই যে চল্লিশ বৎসরের উপর ভারতের সুশিক্ষিত গণ্য মান্য লোকেরা জাতীয় সমিতিতে দেশের মঙ্গলের জন্য নানা আন্দোলন করিয়া আসিতেছেন, রাজপুরুষগণ তাঁহাদের কয়টা কথায় কর্ণপাত করিয়াছেন? এই যে তোমাদের নয়নসমক্ষে জাপান অর্দ্ধ শতাব্দীর ভিতর জাতীয় উন্নতিসাধন করিয়া জগৎকে বিমোহিত করিল, ইহার একমাত্র কারণ জাপান স্বাধীন এবং উহাদের নিজের রাজা ও পার্লামেণ্ট আছে। যতদিন ভারত পরাধীন থাকিবে, ততদিন ইহার ভাগ্যবিধাতারা জাতীয় উন্নতিসাধন করিতে আমাদিগকে যে পরিমাণে অবসর দিবেন, আমরা সেই পরিমাণে জাতীয় উন্নতিসাধন করিতে পারিব। ঘটিতেছে তাহাই এবং ঘটিবে তাহাই। আর অধিক লম্ফ ঝম্ফ করি, হাত পা ভাঙ্গিয়া ভূতলে পড়িব, ডুবিব ও মরিব। সেজন্য বিজ্ঞ লোকেরা পরামর্শ দেন, পরাধীন অবস্থায় জাতিধর্ম্ম রক্ষা করিয়া জাতীয় উন্নতিসাধন করিবে এবং যাহাতে রাজপুরুষগণের বিশ্বাসভাজন হইতে পার, সে বিষয়ে সাধ্যমত চেষ্টা পাইবে।

সংসারে পরিবর্ত্তনই যুগধর্ম্ম। জাতিধর্ম্ম সম্বন্ধে যে সময়ে যেরূপ রীতিনীতি প্রচলিত হইবে, তাহাই সকলে পালন করিতে বাধ্য। পাশ্চত্যশিক্ষার গুণে দেশের রীতিনীতির অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। ইহা রোধ করে, কাহার সাধ্য ? এই যে ব্রাহ্মণজাতি শূদ্রজাতিকে এতকাল ঘৃণা করিয়া একসঙ্গে বসিতে দেন না ও উহাদের সহিত এক পংক্তিতে ভোজন করেন না, তাহাও কালে রহিত হইবে। কৃতবিদ্যমাত্রেই একসঙ্গে ভোজন করিবে। শূদ্র কোন ছার! যখন মুসলমানজাতি দাড়ি কামাইয়া হিন্দুজাতির চালচলন অবলম্বন করিবে, তখন উহাদের লইয়া এক পংক্তিতে ভোজন করিতে হইবে। এই যে পূর্ব্ববঙ্গে নমঃশূদ্রজাতিকে ব্রাহ্মণেরা অস্পৃশ্য করিয়া রাখিয়াছেন, উহারাও পাশ্চাত্য শিক্ষা পাইয়া আপনাদের জাতীয় সম্মান বর্দ্ধন করিবে এবং উহাদের জলপান করিতে হইবে। এইরূপ নানাদিকে ও নানাবিষয়ে ধীরে ধীরে যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, তাহা পালন করিতে হইবে।

গোব্রাহ্মণ রক্ষা।

গোব্রাহ্মণ রক্ষা করা হিন্দুমাত্রেরই প্রধান ধর্ম্ম। এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইলে আমরা পাপের ভাগী হইব। ভারতের এই দুঃসময়ে গরুখোরদের জ্বালায় আমাদের গোধন প্রায় নির্ম্মূল, গোবংশ জাহান্নমে গিয়াছে, গোলক আর নাই, গোলোকবিহারী এখন কর্ম্মনাশার জলে ভাস্‌চেন। যে মা ভগবতীর কৃপায় আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ অপর্য্যাপ্ত ঘিদুধ খাইয়া পরাক্রমশালী ছিলেন, সেই মাতার অভিসম্পাতে আমরা এখন নিবীর্য্য ও ধ্বংসপথে অগ্রসর। এখন কি উপায়ে আমরা তাঁহার আশীর্ব্বাদ পাইতে পারি ? এক গোহত্যা নিবারণ করিতে পারিলে দেশের প্রভূত মঙ্গল হইবে। যে রাজপুরুষগণ গরুখোরদের সুবিধার জন্য সাধারণের অন্তরালে

গোহত্যা করাইতেছেন, কচি কচি গোবৎস দেখিলে যাঁহাদের নোলা সক্ সক্ করে, তাঁহাদের নিকট আবেদন করাই বৃথা। তাঁহারা কিছুতে আমাদের কথায় কর্ণপাত করিবেন না। মনে করিলেই তাঁহারা এক কলমের আঁচড়ে এক মুহূর্ত্তে গোহত্যা নিবারণ করিয়া সমগ্র হিন্দুজাতির ধন্যবাদ পাইতে পারেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহাদের ভিতর এখন কোন উইলবারফোরস বা উইলিয়াম বেন্টিক নাই, যিনি এ মহৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন।

সমাজের অনর্থকর অসদনুষ্ঠান দুই প্রকার শাসন দ্বারা বন্ধ করা যাইতে পারে। (১) রাজার শাসন (২) সমাজশাসন। যখন বিধর্ম্মী রাজতন্ত্র ইহার পৃষ্ঠপোষক ও সহায়, তখন একমাত্র সমাজ শাসন দ্বারা ইহাকে নিবারণ করা উচিত। যে দেশে জাতিভেদপ্রথা ও প্রায়শ্চিত্তবিধান বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, সে দেশে সমাজশাসনের ভাবনা কি? যদি সমাজস্থ প্রত্যেক জাতি এরূপ নিয়ম করে, যে ব্যক্তি কসাই হস্তে গরু বিক্রয় করিয়া পরোক্ষভাবে উহার নিধন করাইবে, তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। এস্থলে সুশিক্ষিত নব্য সম্প্রদায় অধ্যাপকবর্গের সহিত এক যোগে কাজ করিতে হইবে, তবে অল্পদিনের ভিতর গোহত্যা এ দেশে এক প্রকার বন্ধ হইতে পারে। যাঁহারা সমাজসংস্কারক, তাঁহারা কেবল লেক্‌চার দিয়া বাহাদুরি লইতে ব্যগ্র, কিন্তু তাঁহাদের মগজে এ সকল সদুপায় আদৌ ঢোকে না। কুক্ষণে তাঁহারা জাতিভেদের শাসন ও প্রায়শ্চিত্তবিধান উঠাইয়া দিয়া দেশের অমঙ্গল সাধন করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণ জাতি রক্ষা করা হিন্দুসমাজের অবশ্যপ্রতিপাল্য সুমহৎ কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইলে হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দুয়ানী, সংস্কৃত দেবভাষা, মন্দিরাদি সকলই রসাতলে যাইবে। যাঁহারা জাতীয় ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষা পাইয়া ইংরাজদিগের

গোলামী করিতেছেন বা দোকানদারী করিতেছেন, তাঁহাদের কথা বলা হইতেছে না। কিন্তু যাঁহারা যজন, যাজন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপন এই চারি কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন, এবং যাঁহারা সমাজের ঔদাস্যবশতঃ পেটের দায়ে চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতেছেন, তাঁহাদের ভরণ পোষণের ভার হিন্দুমাত্রেরই লওয়া উচিত, যাহাতে তাঁহারা অন্নচিন্তা হইতে অব্যাহতি পাইয়া শাস্ত্রালোচনায় অধিক মনোনিবেশ করিতে পারিবেন। এখন তাঁহাদের স্বধর্ম্মী রাজা নাই, যাঁহারা তাঁহাদের ভালরূপ ভরণ পোষণের ভার লইবেন। সুখের বিষয়, ইংরাজ রাজও তাঁহাদের কিছু কিছু বৃত্তি দিয়া থাকেন। তাঁহাদের সুশিক্ষার জন্য স্থানে স্থানে চতুষ্পাঠী স্থাপন করা আবশ্যক এবং এই দুর্মূল্য সময়ে তাঁহাদের দক্ষিণার হার বৃদ্ধি করাও আবশ্যক। এই যৎসামান্য উপকার পাইলে তাঁহারা দুই হাত তুলিয়া সকলকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। যদি প্রত্যেক জাতি নিজ নিজ জাতীয় সমিতিতে গুরু, পুরোহিত ও অধ্যাপকবর্গের গৃহ সচ্ছল করিবার জন্য মাসিক বৃত্তি স্থাপন করেন, ইহাতে দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে।

সময়ের ফেরফার, দরিদ্র অধ্যাপকের ছেলেরা এখন টোলে পড়ে না, পড়ে স্কুলে ও কলেজে সাহেব সাজিবার জন্য। কিছুকাল পরে যখন পাশ্চত্য শিক্ষার কদর কমিবে এবং লোকে বি এ, এম এ পাস করিয়াও আজকালের অধ্যাপকবর্গের মত পেটের দায়ে হাহাকার করিবে, তখন উাহাদের ছেলেরা পুনরায় টোলে পড়িবে এবং ইংরাজি ও শিখিবে, যাহাতে যেন তেন প্রকারেণ উদরান্নের কিঞ্চিৎ সংস্থান করিতে পারিবে।

শাস্ত্রে পাঠ করি, লোকে মহাপাপে কলির ব্রাহ্মণ হয়। এই পরাধীন অবস্থায় তাঁহাদেব ঘোর দুর্দ্দশা দেখিয়া শাস্ত্রকারেরা ঐরূপ লিখিয়া গিয়াছেন। এখন তাঁহাদের জাতীয় অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া যাহাতে তাঁহাদের প্রকৃত উন্নতিসাধন হইতে পারে, যাহাতে তাঁহারা

সদাচারী, শাস্ত্রাধ্যায়ী, ব্রহ্মবর্চ্চে বলীয়ান হইতে পারেন, এরূপ শিক্ষা দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। দুঃখের বিষয়, আমাদের এই সামান্য অরণ্য রোদনে কেই বা কর্ণপাত করিবেন, কেই বা কোমর বাঁধিয়া খাড়া হইবেন? সুশিক্ষিত সম্প্রদায়ের ইচ্ছা বিট্‌লে বামুনেরা চলে যাক।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষা বলে মনের উন্নতিসাধন,
চিরন্তন জাতীয় আধ্যাত্মিকতারক্ষা ও
আধিভৌতিক উন্নতিসাধন।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষা, উভয় প্রণালী দোষগুণে মিশ্রিত। যেমন প্রথমোক্ত একদিকে আমাদিগকে আধ্যাত্মিক পথে, ধর্ম্মপথে অগ্রসর করায়, তেমনি আধিভৌতিক উন্নতিসাধনে রক্ষণ-শীল করিয়া থাকে। আবার শেষোক্ত যেমন একদিকে আমাদিগকে উন্নতিশীল করে, তেমনি ইহা অপরদিকে ধর্ম্মপথে পশ্চাৎপদ করিয়া দেয়। সেজন্য প্রথমোক্তের দোষগুলি শেষোক্তের গুণ দ্বারা দূরীভূত করিতে হইবে, তবে উভয় শিক্ষাপ্রণালী অনুসরণ করিয়া আমরা প্রকৃত জাতীয় শ্রেয় লাভ করিব।

দেখ, প্রাচ্যশিক্ষা অনেককে কুসংস্কারজালে জড়িত করে, কল্পনা-জগতে ভ্রমণ করায় এবং পার্থিব বিষয় ভালরূপ শিক্ষা দেয় না। অপরপক্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষা মন হইতে কুসংস্কার ক্রমশঃ দূরীভূত করে, সকলের চক্ষু কর্ণ ফুটাইয়া দেয় এবং পার্থিব বিষয়ে ভালরূপ শিক্ষা দেয়। যেমন প্রথমোক্ত আমাদিগকে স্বধর্ম্মে নিষ্ঠাবান্, ভাবপ্রধান ও সরল করে এবং সংসারে নিঃস্বার্থপর করিয়া বৈরাগ্য শিক্ষা দেয়, তেমনি শেষোক্ত আমাদিগকে স্বধর্ম্মে বীতশ্রদ্ধ, স্বার্থপর, ধূর্ত্ত, শঠ ও ভোগবিলাসী করিয়া কেবল অর্থের পূজন করিতে শিক্ষা দেয়। সে স্থলে উভয়প্রথার বিমিশ্রণে আমরা প্রকৃত শ্রেয়োলাভ করিব।

এখন জাতীয় আধিভৌতিক উন্নতির প্রকৃত অর্থ কি? দুপৃষ্ঠা ইংরাজি পড়িয়া ইংরাজি আবভাব ও ইংরাজি চালচলন দেখাইয়া

ইংরাজ সাজিলেই কি আমরা সভ্যতার পথে অগ্রসর হইব? হ্যাট কোট পরিয়া চুরুট মুখে দিয়া ড্যাম রাসকেল্ বলিতে বলিতে বা মদে চুর্‌চুরে হইয়া হেলিতে দুলিতে যাইলেই কি আমরা সভ্যতার পথে অগ্রসর হইব?

হোটেলে গিয়া টেবিলে বসিয়া কাঁটাচামচ লইয়া কাট্‌লেটকারি খাইতে শিখিলেই কি আমরা সভ্যতার পথে অগ্রসর হইব? বিলাতি জুয়াচুরি শিখিয়া বিলাতী ফন্দীবাজী খেলিয়া পাঁচজনকে ঠকাইয়া ধনবান হইলেই কি আমরা 'সভ্যতার পথে অগ্রসর হইব? আমরা এরূপ দানবীয় সভ্যতার পক্ষপাতী নহি। ইংরাজদিগের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা উহাদের ন্যায় সকল বিষয়ে কর্ত্তব্যপরায়ণ, উদ্যমশীল ও অধ্যবসায়ী হইব, সময়ের মূল্য জানিয়া ইহার রীতিমত সদ্ব্যবহার করিতে শিখিব, সুশিক্ষাবলে মনের প্রকৃত উন্নতিসাধন করিব, জ্ঞানবিজ্ঞান ও ধর্ম্মের সম্যক অনুশীলন করিয়া দেশকে সমুজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত করিব, কৃষিশিল্পের উন্নতিসাধন করিয়া দেশের অর্থাগম বৃদ্ধি করিব, দেশের শাসনপদ্ধতি সুপ্রণালীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ইহার মুখ উজ্জ্বল করিব। এই প্রকারে আমরা ক্রমশঃ 'আধিভৌতিক উন্নতি পথে অগ্রসর হইতে থাকিব।

অনেকে বলেন, পাশ্চাত্য জগতের নিকট সুশিক্ষা পাইয়া জাপান যে পথে গিয়া অর্দ্ধশতাব্দীর ভিতর সুসভ্য হইয়াছে, সেই পথে আমাদেরও যাওয়া কর্ত্তব্য। যাইতে ত ইচ্ছা হয় বটে, কিন্তু যাইতে পারি কই? দুরদৃষ্টক্রমে আমরা যে এখন পরাধীন ও পরের পদানত। আমরা যদি স্বাধীন হইতাম এবং জাপানের ন্যায় আমাদের নিজের পার্লামেণ্ট থাকিত, আমরাও অর্দ্ধশতাব্দীর ভিতর সুসভ্য হইতাম এবং জগতে নিজেদের পূর্ণ কৃতিত্ব দেখাইতাম।

আমাদের জাতীয় উন্নতির পথে কত বাধাবিঘ্ন রহিয়াছে। কেবলই যে এ পথ বন্ধুর ও কণ্টকাকীর্ণ, তাহা মনে করিও না। কত নর-

মাংসলোলুপ সিংহ ও ব্যাঘ্র এই পথে ফিরিতেছে! কত দুরারোহ পর্ব্বত ও শৈল এইপথে আছে! সে সকল উল্লঙ্ঘন না করিলে আমরা গন্তব্যস্থলে পৌছিতে পারিব না।

(১) যখন দেখি, রাজনীতিজ্ঞ ইংরাজ আপনাদের প্রয়োজনমত এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা দিতেছেন এবং সংগ্রাম, নৌ, শিল্পবিদ্যাও কৃষিবিদ্যা কিছুই শিক্ষা দিতেছেন না, তখন জাতীয় উন্নতির আশা কোথায়? "তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়।"

(২) যখন দেখি, স্বার্থপর ও স্বজাতিপ্রিয় ইংরাজ স্বদেশের মঙ্গলের জন্য এ দেশের ধনদৌলত নানা উপায়ে ও নানাদিকে শোষণ করিয়া স্বগৃহে অমৃত বর্ষণ করিতেছেন, আর ভারতবাসী "দিনের দিন সবে দীন ভারত হয়ে পরাধীন" এই বলিয়া মনোদুঃখ প্রকাশ করিতেছেন, তখন জাতীয় উন্নতির আশা কোথায়? "তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়।"

(৩) যখন দেখি কূটরাজনীতিজ্ঞ ইংরাজ ভারতসাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত করিবার জন্য সমগ্র প্রজাবর্গকে নিরস্ত্র করিয়াছেন এবং উহারা দিনের দিন নিবীর্য্য ও নিস্তেজ হইয়া ডানাকাটা পাখীর ন্যায় রহিয়াছে, তখন জাতীয়উন্নতির আশা কোথায়? "তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়"।

(৪) যখন দেখি, ইংরাজদের কাজে বুকের রক্ত ঢালিয়া দিলেও এবং সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাদের গোলমী করিলেও আমরা কোনমতে তাঁহাদের বিশ্বাসভাজন হইতে পারি না, সেজন্য সংগ্রামবিভাগে কোন উচ্চপদ পাইবার আশা করি না, তখন জাতীয় উন্নতির আশা কোথায়? "তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়।"

(৫) যখন দেখি, ন্যায়বান ইংরাজ জাতিনির্ব্বিশেষে গুণের কদর করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেও অনেকস্থলে গুণের কদর না করিয়া জাতিবিশেষের ভালরূপ কদর করেন, ইহাতে অনেক

সুশিক্ষিত যুবক হা অন্ন! হা অন্ন! করিতে করিতে গৃহে বেকার বসিয়া থাকে বা সামান্য চাকরী করিয়া দিনপাত করে, তখন জাতীয় উন্নতির আশা কোথায়? "তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়"।

(৬) যখন দেখি, বিপ্লবপন্থীদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য যাঁহারা দেশের কার্য্যে মনপ্রাণ সমর্পণ করেন, তাঁহাদিগকে ন্যায়-বিচারী ইংরাজ বিনাবিচারে বা নকল বিচারে কারাগারে প্রেরণ করিতেছেন, ইহাতে অনেকে দেশের যথার্থ কার্য্যে ভীত হইতেছেন, তখন জাতীয় উন্নতির আশা কোথায়? "তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়।"

(৭) যখন দেখি, ইংরাজরাজ অবাধবাণিজ্যের প্রশ্রয় দেওয়াতে দেশের গম চাউল অন্যান্য দেশে রপ্তানি হইতেছে, সেই সঙ্গে সকল দ্রব্যের দুর্মূল্যতা ক্রমশঃ বাড়িতেছে এবং অন্যান্য দেশের সৌখীনদ্রব্য সুলভমূল্যে ক্রয় করিয়া অনেকে ফোতোনবাব সাজিয়া হেলিতে দুলিতে চলিছে, তখন জাতীয় উন্নতির আশা কোথায়? "তদা কাশংসে বিজয়ায়সঞ্জয়।"

(৮) যখন দেখি, অপরিমিত গোহত্যাবশতঃ গোবংশ নির্মূল হইতে চলিল, সেইসঙ্গে আমরাও দুগ্ধাভাবে, ঘৃতাভাবে ও অন্যান্য ভেজাল দ্রব্য খাইয়া ক্রমশঃ নিস্তেজ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছি, তখন জাতীয় উন্নতির আশা কোথায়? "তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়।"

(৯) যখন দেখি আজকালের সমাজনায়কগণ গলাবাজি করিয়া আকাশ ফাটাইতে ও বাহবা লইতে ভালরূপ শিখিয়াছেন, কিন্তু কাজের বেলায় সকলে চুপচাপ মারিয়া বসিয়া থাকেন, ইহাতে দেশ কেবল হুজুগে মাতে, কাজে কিছুই হয় না, তখন জাতীয়উন্নতির আশা কোথায়? "তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়।"

(১০) যখন দেখি, ছোকরার দল, নেঁইটে ইন্দুরের দল নিভৃতে

বোমা প্রস্তুত করিয়া ভারতসাম্রাজ্যকে অসময়ে এক ফুৎকারে উড়াইয়া দিতে চায়, পরে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া জেলে গিয়া মরে, তখন জাতীয় উন্নতির আশা কোথায়? "তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়।"

(১১) যখন দেখি, আজকাল অনেকে দুপৃষ্ঠা ইংরাজি পড়িয়া সাহেব সাজিয়া হিন্দুয়ানি ত্যাগ করিতেছে ও পাশ্চাত্য চালচলন দেখাইতেছে, আর দেশশুদ্ধ লোকে তাহাদেরই প্রশংসা করিতেছে, তখন জাতীয় উন্নতির আশা কোথায়? "তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়।"

(১২) যখন দেখি, দেশের ছেলে ছোকরার দল চাচুরুটবিড়ি খাইয়া ক্রমশঃ পাকতাড়া মারিতেছে ও অকালে পটোল তুলিতেছে, তখন জাতীয় উন্নতির আশা কোথায়? "তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়।"

(১৩) যখন দেখি, ধর্ম্মান্ধ মুসলমানেরা নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ হিন্দুদিগের সহিত সামান্য কারণে মারামরি, লাঠালাঠি করিতেছে ও দেশের শত্রুগণ দুইহাত দিয়া তালি দিতেছে, তখন জাতীয়উন্নতির আশা কোথায়? "তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়।"

এইরূপ আমাদের জাতীয় উন্নতিসাধনে নানাদিকে নানা বাধাবিঘ্ন দেখা যাইতেছে। এই সকল বাধাবিঘ্ন কালে উড়িয়া যাইবে কি, তাহা একমাত্র ভগবানের ইচ্ছা। ইংরাজ যতই কেন কঠোর দমননীতি অবলম্বন করুন না, তাঁহারা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উচ্চাভিলাষ আর কিছুতে দমন করিতে পরিবেন না।

হিন্দুসমাজের সাধারণ কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয় অংশ।

(ধনাগমের জন্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষিশিল্পের উন্নতিসাধন ও দেশে নানা যৌথকারবার সংস্থাপন।)

ভারতে অসংখ্য নদনদী থাকায় এ দেশ চিরদিন অত্যুর্ব্বরও কৃষিপ্রধান। আর্য্যজাতির শুভাগমন হইতে কৃষিকার্য্য এদেশে ভালরূপ চলিয়া আসিতেছে। এই প্রকারে বসুন্ধরাদেবীর অনুগ্রহে আমরা চিরদিন অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিয়া আসিতেছি। বৈদিক যুগে এ কার্য্যের যেরূপ উন্নতি সাধন হইয়াছিল এবং যেরূপ অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহৃত হইত, তাহাই চিরদিন সমভাবে চলিয়া আসিতেছে। তাঁহারাই গোময়কে ক্ষেত্রের সার বলিয়া প্রথম ব্যবহার করিতে শিক্ষা দেন। লোকপরম্পরায় ও পুরুষানুক্রমে এদেশের কৃষিকার্য্য পুরাণপদ্ধতিতে চলিয়া আসিতেছে। কোন্ ঋতুতে কোন্ ফসল বপন ও রোপন করিতে হয়, তাহা কৃষকেরা হাতে হেতড়ে শিক্ষা করিয়া থাকে।

আজকাল আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশে কৃষিকার্য্যের বৈজ্ঞানিক উপায়ে যেরূপ উন্নতিসাধন হইতেছে, তাহা এদেশে চালিত করা অত্যাবশ্যক। এজন্য শিক্ষিত সম্প্রদায়কে বিশেষ চেষ্টা পাইতে হইবে। চাষাদের ছেলেরা যাহারা ইংরাজি লেখাপড়া শিখিতেছে, তাহারা যদি কোমর বাঁধিয়া আমেরিকায় গিয়া মজুর বেশে ঐ সকল বিষয় ভালরূপ শিক্ষা করিয়া এদেশে চালায়, তাহারা ভারতমাতার মুখ উজ্জ্বল করিবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, হ্যাট কোট পরিলেই মাথা গরম হইয়া যায় এবং স্বাধীনভাবে ব্যবসায় না চালাইয়া সকলেই সরকারী চাকরীর প্রার্থী হইয়া থাকে। ইহার জন্য এদেশে বেকার-দল এত বাড়িতেছে। লেখাপড়া শিখিয়া তাহারা যদি নিজ নিজ জাতীয় ব্যবসায়ের উন্নতি সাধন করে, ইহা অপেক্ষা সুখের বিষয়

আর কি হইতে পারে? কিন্তু আজকাল ইংরাজের নাতি ঝাঁটা সকলেই ভালবাসে।

এদেশে যৌথকারবার করিয়া কলকারখানাদ্বারা কৃষিকার্য্য চালিত করা যুক্তিসঙ্গত বোধ হয় না। কারণ এদেশে লোকসংখ্যা অধিক এবং যে সকল জমিজারাৎ আছে, তাহা ভালরূপ বিলিবন্দোবস্ত। কিন্তু যেস্থলে অধিক ভূসম্পত্তি জঙ্গল হইয়া পড়িয়া আছে, তথায় এ পদ্ধতি চলিতে পারে, যেমন সুন্দরবন, বর্ম্মাদেশ আসাম অঞ্চল ও মধ্যভারত।

যদি গ্রামে গ্রামে কৃষিবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়া অনেককে কৃষি-কার্য্যের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ভালরূপ শিক্ষা দেওয়া যায় এবং উহারা কৃষকদিগকে হাতে হেতড়ে শিক্ষা দেয়, তাহাতে দেশের অশেষ শ্রীবৃদ্ধিসাধন হইবে।

শিল্প সম্বন্ধে আমাদের এখন কি দুর্দ্দিন উপস্থিত। যে ভারত নিজের হস্তনির্ম্মিত শিল্প দেশবিদেশে চালাইয়া এতকাল ধনবান ছিল, সে ভারত আজ নিজের শিল্পে জলাঞ্জলি দিয়া পরের শিল্প ব্যবহার করত অধঃপাতে যাইতেছে। অদৃষ্ট নেমির বিঘূর্ণনে এইরূপ ঘটিতেছে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের ভাগ্যে যে পরিমাণে সুখ ছিল, আমাদের ভাগ্যে সেই পরিমাণে দুঃখ হইতেছে। এসব চক্রীর চক্র ব্যতীত আর কিছুই নয়। যে জাতির লক্ষ্মী ছাড়িয়া যায় এবং যাহাদের জাতীয় জীবন ধ্বংসপথে অগ্রসর হয়, তাহারাই পরের দ্রব্য ব্যবহার করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে। বিলাতি বস্ত্রের ও বিলাতী দ্রব্যের প্রবল বন্যায় আমাদের তাঁতী, যোগী, জোলা, কোরী, ও কামার সকলই হাবুডুবু খাইতেছে ও নিরন্ন হইয়াছে। এখন উপায় কি? কেবল লেকচার দিয়া পিকেটিঙ্গ করিলে সুফল পাইবে না। এতদর্থে নানা উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতর যেমন লেকচার আবশ্যক, অশিক্ষিত

লোককে উৎসাহ দিবার জন্য স্বেচ্ছাসেবকদল, বৈরাগীদল ও সাধুসন্ন্যাসিগণ ধর্ম্মের ধ্বজা উড়াইয়া গ্রামে গ্রামে বিলাতিদ্রব্য ব্যবহারের অপকারিতা সঙ্কীর্ত্তন বলে দেখাইবে। পুরাতন শিল্পগুলি জীর্ণোদ্ধার করিতে হইবে, জাতিভেদের শাসন দ্বারা বিলাতি দ্রব্য বয়কট করিতে হইবে এবং নানা দেশে নানা লোক পাঠাইয়া ঐ সকল সৌখীন দ্রব্য এদেশে প্রভুত পরিমাণে প্রস্তুত করিতে হইবে। মহাত্মা গাঁন্ধি ত ফেল মারিলেন। কবে দ্বিতীয় গাঁন্ধী ভারতগগনে উদিত হইয়া দেশশুদ্ধ সকলকে পুনরায় মাতাইবেন এবং ঐরূপ প্রণালীতে কাজ করিয়া প্রকৃত সুফল পাইবেন। রাজবিদ্রোহিতা স্বপ্নেও ভাবিও না। আমরা কেবল দেশের টাকা দেশে রাখিবার জন্য বিলাতি দ্রব্য বর্জ্জন করিব ও খদ্দর যজ্ঞ করিব।

দেখ, স্বাধীন চীন একদিনে আফিঙ ত্যাগ করিল। আমরা পরাধীন হইলেও কি বিলাতি দ্রব্য এক পুরুষে ত্যাগ করিতে পারিব না? যদি ব্রাহ্মণজাতির সুপরামর্শে রীতিমত জাতিভেদের শাসন সকল প্রদেশে সকল জাতির ভিতর প্রবর্ত্তিত হয়, অল্পদিনের ভিতর বিলাতিদ্রব্যের ব্যবহার এদেশ হইতে উঠিয়া যাইবে। এসব উন্মত্তের প্রলাপ নয় বা ইন্দুরের পরামর্শ নয়। কুক্ষণে শিক্ষিত সম্প্রদায় জাতিভেদের সমাজশাসন উঠাইয়া দিয়াছেন।

যৌথকারবলে পাশ্চাত্য জগতে মা লক্ষ্মী ঘরে ঘরে বাঁধা, আর প্রাচ্য জগৎ এ সুপ্রথা জানে না বলিয়া মা লক্ষ্মী চিরদিন চঞ্চলা। এতকাল এদেশে লোকে নিজ নিজ মূলধন লইয়া ব্যবসাবাণিজ্য করিতেছে ও লাভবান হইতেছে। বাজারে অংশ বিক্রয় করিয়া দশজনের টাকা লইয়া কি প্রকারে বড় বড় কারবার চালাইতে হয়, তাহা এদেশের লোক আদৌ জানিত না। আজকাল ইংরাজের দেখাদেখি যৌথকারবার ক্রমশঃ দেখা দিতেছে। যৌথকারবার চালাইতে হইলে সততা, ন্যায়পরতা ও বিশ্বসনীয়তা একান্ত আবশ্যক।

এ সকল সদগুণ না থাকিলে পরের ধনে পোতদারী করা যায় না। যেমন একতাভাব আমাদের জাতীয় জীবনের মহৎ কলঙ্ক, সততাভাব ও সেইরূপ। কবে এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় সততা ও ন্যায়পরতা অবলম্বন করিয়া বড় বড় যৌথকারবার চালাইতে সক্ষম হইবেন এবং দেশের সর্ব্বসাধাধণও উহাদিগকে বিশ্বাস করিয়া অংশ খরিদ করিবে?

আজকাল শিক্ষিত সম্প্রদায় ইংরাজ সওদাগরঅফিসে বা কোন কোম্পানীর অধীনে সামান্য মাছিমারা কেরাণী হইলে আপনাদিগকে ভাগ্যবান মনে করেন। তাঁহাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, তাঁহারা ইংরেজের নাতি ঝাঁটা খাইয়া উহাদের গোলামী করিতেছেন। কবে তাঁহাদের এমন সুমতি হইবে যে, তাঁহারাও উদ্যমশীলতা ও স্বাবলম্বন বলে এক একটী যৌথকারবার স্থাপন করিতে পারিবেন?

ভারতে ৩০ কোটী লোকের বাস। যদি প্রত্যেক লোক একটী টাকা করিয়া চাঁদা দেয়, ৩০ কোটি টাকায় ৩০০০ যৌথকারবার লক্ষ টাকা মূলধনে স্থাপিত হইতে পারে এবং ইহাতে ১০ লক্ষ লোক প্রতিপালিত হইতে পারে! দেশের লোক মধ্যে মধ্যে এক একটা হুজুগ লইয়া মাতে, কিন্তু আসল কাজ ভুলিয়া থাকে। স্বদেশী আন্দোলন বল, স্বরাজলাভ বল, সব ভুয়োবাজি।

ইংরাজের শোষণ নীতি রোধ করিবার উপায় কি?

ইংরাজ দশহাত দিয়া দশদিক হইতে ভারতকে শোষণ করিতেছেন। যে দিকে তাকাও, সেইদিকে দেখিবে কেবল শোষণ, শোষণ, পুনঃ শোষণ। এই শোষণবশতঃ ভারতমাতা ক্রমশ অস্থি-চর্ম্মসার হইতেছেন। তাঁহার বীর্য্যশোণিত হাড়গিলা চুষে খাইতেছে, আর কি রক্ষা আছে?

তুমি যে বাস্তুভিটায় বাস কর বা যে জমি আবাদ কর, তাহার কর

জমিদারের মারফৎ রাজাকে চিরদিন দিয়া আসিতেছ। কিন্তু আজকাল ভাতের সহিত যে লবণটুকু খাইবে, সেজন্য তোমায় টেক্স দিতে হইবে। লজ্জানিবারণার্থে যে কাপড়খানি পরিবে, তজ্জন্য দোকানদারের মারফৎ ইংরাজকে কিছু দিতে হইবে। ছেলের চিকিৎসাপত্র করাইবে, ঔষধ বাবদ দোকানদারের মারফৎ ইংরাজকে কিছু দিতে হইবে। মদ, আফিঙও গাঁজা যে কোন মাদক দ্রব্য সেবন কর না কেন, আফগারি টেক্স না দিলে নিস্তার নাই। দেওয়ানি বা ফৌজদারী আদালতে বিচারপ্রার্থী হও, কোর্টফি বাবদ ইংরাজকে অল্পাধিক অর্থ না দিলে তিনি তোমার কথায় কর্ণপাত করিবেন না। সে দিন কি আছে, যে গ্রামের মণ্ডলমহাশয় পঞ্চায়েত লইয়া বিনা অর্থব্যয়ে তোমার বিচার করিয়া দিবেন? যে চাকরী বা ব্যবসায় কর না কেন, অতিরিক্ত আয় হইলে ইংরাজকে আয়কর না দিয়া নিস্তার নাই। এইরূপ সম্রাজ্যের আয়বৃদ্ধি করিবার জন্য দরিদ্র প্রজাবর্গের উপর কতদিকে কতরকম টেক্স চাপান আছে। কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম। সে কর্ম্ম কে বাধা দিতে পারে? তুমি বাঁচ, আর মর, তাহাতে তাঁহাদের কি ক্ষতি? তাঁহারা ত নিজের কর্ম্মচারিবর্গকে উচ্চহারে বেতন ও পেন্সেন দিবেন এবং রাজ্যের মঙ্গলের জন্য নানাদিকে রেল, খাল ও রাস্তা নির্ম্মাণ করিবেন ও শোরখোর গোরাদিগকে পালিবেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভারত হইতে বৎসরে বৎসরে যে টাকা উঠে, উহার অধিকাংশ বিলাতে চলিয়া যায় এবং দেশে অল্পমাত্র থাকে। ইহাতে দেশের দারিদ্র্য ক্রমশঃ বাড়িতেছে। আবার গোদের উপর বিষ ফোড়া। অবাধ বাণিজ্যবশতঃ নানাদেশের সৌখীন দ্রব্য দেশ ছাইয়া ফেলিতেছে এবং ইহার ধন দৌলত নানাদেশে ছড়িয়া পড়িতেছে। আমরাও এতদূর অপদার্থ হইয়াছি, বিদেশের ভুষীমাল অল্প টাকায় খরিদ করিয়া মনের আনন্দে নাচিতেছি। কবে দেশ-

শুদ্ধ লোকের এমন সুবুদ্ধি হইবে, তাহারা বিলাতি বর্জ্জন করিয়া দেশের অর্থ দেশে রাখিতে সাধ্যমত চেষ্টা পাইবে?

(ইংরাজরাজের অনুগ্রহে স্বরাজ লাভ ও
দেশে পার্লমেণ্টগঠন।)

আজকাল গাঁধিপ্রমুখ নেতৃবৃন্দের গলাবাজীতে স্বরাজ লইয়া দেশে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। এ হুজুগে অনেকেই মাতিয়াছেন; তাঁহাদের বিশ্বাস, স্বরাজলাভ অতি সহজ কথা, তাসের কেল্লার মত এক ফুৎকারে ইংরাজদিগের ভারত সাম্রাজ্যকে উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে। কেহ কেহ স্বরাজের নিশান উড়াইতেছেন, যেন স্বরাজ পাইয়াছেন।

এখন স্বরাজ শব্দের প্রকৃত অর্থ কি? ইহার দুই প্রকার অর্থ করা উচিত।

(১) সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়া আমরা নিজেদের রাজ্য নিজেরাই চালাইব।

(২) ইংরাজরাজের অধীনে থাকিয়া আমরা দেশে পার্লমেণ্ট গঠন করিয়া ভারত সাম্রাজ্য চালাইব। নিরস্ত্র ভারত যে তরবারি বলে ইংরাজকে এ দেশ হইতে তাড়াইয়া স্বাধীনতা লাভ করিবে, ইহা এখন স্বপ্নের অগোচর বোধ হইতেছে। যে রোমানেরা ইংরাজদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে নিরস্ত্র করিয়া শাসন করিয়াছিল, উহাদের উপর সমূহ বিপদ পতিত হইলে উহারা ব্রীটন ছাড়িয়া চলিয়া যায়; সেইরূপ ইংরাজ আমাদিগকে নিরস্ত্র করিয়া শাসন করিতেছেন, উহাদের উপর যখন সমূহ বিপদ পতিত হইবে, তখন উহারাও এ দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন এবং আমরাও স্বাধীনতা লাভ করিব। ইংরাজ ধনকুবের হইয়া যেরূপ ভোগবিলাসিতায় মগ্ন হইতেছেন, তাহাতে বোধ হয় অচিরে বা কাল বিলম্বে তাঁহারা ধ্বংসপথে অগ্রসর হইবেন এবং সাধের ভারত সাম্রাজ্য হস্তান্তর হইবে।

ভারত স্বাধীন হউক বা না হউক, তাহা একমাত্র ভগবদিচ্ছার উপর নির্ভর করে; এখন জিজ্ঞাস্য আমরা ইংরাজরাজের অধীন থাকিয়া কি প্রকারে স্বরাজ লাভ করিব ? যে আমলাতন্ত্র এখন ভারত শাসন করিতেছে, উহার ক্ষমতা হ্রাস পাইলে এবং যে জাতীয় সমিতিতে আমরা এতকাল রাজনৈতিক অন্দোলন করিতেছি, উহা ভারতের পার্লমেণ্ট বলিয়া স্বীকৃত হইলে আমরা স্বরাজ লাভ করিব। কিন্তু এরূপ স্বরাজলাভ সহজসাধ্য নয়। ইহাতে অনেক কাটখড় লাগিবে।

যে ইংরাজ বাইবেলে শিক্ষা করেন, যিনি তোমার বামগণ্ডস্থলে চপেটাঘাত করিবেন, তুমি তাঁহার দিকে দক্ষিণ গণ্ডস্থল ফিরাইয়া দিবে, সে ইংরাজের নিকট যোড়হস্তে ভিক্ষা চাহিলে বা কান্নাকাটি করিলে কিছুই পাইবে না। তাঁহার সহিত অতি সবিধানে চলিতে হইবে। কিন্তু বিকৃত মস্তিষ্কের খেয়ালে অসময়ে বোমা প্রস্তুত করিয়া দুই চারি জন কর্ম্মচারীকে হত্যা করিলে তোমরা স্বরাজ লাভের পথে কণ্টক বপন করিবে। চিরদিন মনে রাখিবে, পিপীলিকার পালক উঠে মরিবার তরে; একদিকে তাঁহাদের পূর্ণ বিশ্বাসভাজন হইয়া তাঁহাদের কাজে বুকের রক্ত ঢালিতে হইবে, অপর দিকে নানা বিষয়ে কৃতিত্ব লাভ করিয়া তাঁহাদিগকে দেখাইতে হইবে, আমরা স্বরাজ লাভ ব্যতীত কিছুতে সন্তুষ্ট হইবে না, তবে তাঁহারা ক্রমশঃ আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন।

নিরস্ত্র ভারত সাত্ত্বিক উপায়ে বা ধর্ম্মবলে রাজপুরুষদিগকে কিরূপে পরাস্ত করিতে পারে, তাহা মহাত্মা গাঁন্ধি গগনভেদী রবে নিরুপদ্রব অসহযোগনীতি ও খদ্দর যজ্ঞ প্রচার করিয়া দেখাইয়াছেন। তাঁহার মহামন্ত্রে সমগ্র ভারত আজ অনুপ্রাণিত ও উৎসাহান্বিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যাঁহার ঘরে হাড়ী ঢন্ ঢন্, তিনি কেমন করিয়া ইংরাজের চাকরী ছাড়িবেন ; এজন্য অসহযোগনীতি পপাত ধরণীতলে

এখন বিলাতি বর্জ্জন ও খদ্দর যজ্ঞ জাতিভেদের সমাজশাসন দ্বারা চালাইতে পারিলে দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে। এমন সুদিন কবে হবে, যে দিন সমাজশাসনের গুণে ঘরে ঘরে চরকা চলিবে ও তুলার চাষ হইবে এবং তাঁতি যুগীরা কাপড় রাতদিন বুনিবে, তখন দেশের প্রভূত অর্থ দেশে থাকিবে এবং ইংরাজ ও প্রমাদ গণিবে। তখনই স্বরাজ আমাদের অর্দ্ধকরতলস্থ হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় মেয়েরা এখন ঘোরবাবু, চরকার নামে তাহারা নাঁক সেঁটকায়। তাহাদিগকে ভালরূপ শিক্ষা দিতে হইবে। শতাব্দী পূর্ব্বে যেরূপ চরকা ঘরে ঘরে চলিত, পুনরায় সেইরূপ চালাইতে হইবে। তবে আমাদের খদ্দরযজ্ঞ সুসম্পন্ন হইবে।

এখন স্বরাজ আমাদের রাজনৈতিক গগনের ধ্রুবতারা। এই মহোচ্চলক্ষ্য হইতে আমরা কস্মিনকালে ভ্রষ্ট হইব না। এতদর্থে আমাদিগকে আকাশ পাতাল আলোড়ন করিতে হইবে; জেলে যাইতে হয়, হাসিতে হাসিতে জেলে যাইব, অনশনে মরিতে হয়, না খাইয়া হাসিতে হাসিতে মরিব, ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিতে হয়, হাসিতে হাসিতে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিব, তোপের মুখে যাইতে হয়, হাসিতে হাসিতে তোপের মুখে যাইয়া প্রাণবায়ু উড়াইয়া দিব। তখন আমরা মনের আনন্দে গাইব—

মাল্লি মাল্লি কল্লি ভাল, এখন চাঁদবদনে স্বরাজ বল।

যখন আমরা ব্রীটিশ পার্লমেণ্টের অনুগ্রহে স্বরাজ লাভ করিব, তখন ভারতের ভাগ্যাকাশে নূতন দিনমণি উদিত হইবে এবং আমরা ইংরাজজাতির পার্শ্বে থাকিয়া পৃথ্বী মাঝে নূতন কীর্ত্তিধ্বজা উড়াইব। তখন সাম্রাজ্যের সকল বিভাগ যেমন ইংরাজদের হস্তে ন্যস্ত থাকিবে, আমাদের হস্তে ও তদপেক্ষা অধিক ন্যস্ত থাকিবে। আমরা উহাদের সহিত একাসনে বসিয়া সকল বিষয় সুচারুরূপে চালাইব। দেশের মঙ্গলের জন্য যে সকল অভাব ও অনাটন উত্থিত হইবে, আমরা

উহাদের সহিত একযোগে আইন কানুন করিয়া তাহা পূরণ করিব। সাম্রাজ্যের আয়ব্যয়, শাসনপ্রণালী, বিচার, শিক্ষা, পূর্ত্ত, সংগ্রাম প্রভৃতি সকল বিভাগে আমরা উহাদের সহিত সমসত্ত্বে সত্ত্ববান হইয়া সুশৃঙ্খলতার সহিত চালাইব। তৎকালে আমরাও জেলার জজ ম্যাজিষ্ট্রেট ও সৈন্যদলের মেজর কর্ণেল হইব এবং জেতৃ ও জিতজাতির মধ্যে কোনরূপ ভেদাভেদ ও হিংসাদ্বেষ থাকিবে না। সকলেই এক মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবে। তখন আমরা পরাধীন হইয়াও স্বাধীন হইব এবং নির্ধন হইয়াও ধনশালী হইব।

কেহ কেহ বলেন, যে স্বার্থপর ইংরাজ ভারতবাসীর স্বার্থ অপেক্ষা স্বজাতির স্বার্থ অধিক দেখেন, যাঁহাদের শাসনপদ্ধতির মূলমন্ত্র ভারত-শোষণ করিয়া স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা, সে ইংরাজ কি কস্মিন কালে জিতজাতিকে এতদূর সত্ত্ব দিবেন? আমরা যতই কেন তন্‌মন্‌ধন্‌সে তাঁহাদের সেবা করি না, ভবি ভোলবার নয়, তাঁহারা আপনাদের স্বার্থ ও প্রতিপত্তি চিরদিন অক্ষুন্ন রাখিবেন; সেস্থলে তাঁহাদের নিকট স্বরাজ আশাকরা আমাদের দুরাশা মাত্র। এখন দেখাযাউক, কালে কোথাকার জল কোথায় মরে।

দুর্মূল্যতা নিবারণ ও বেকার-সমস্যা মীমাংসা।

ইংরাজদিগের আমলে জিনিষপত্রের দুর্মূল্যতা ক্রমশঃ বাড়িবে এবং সেই সঙ্গে বেকারের দলও ক্রমশঃ বাড়িবে। এতকাল ভারতে খাদ্যসামগ্রী সুলভ ছিল এবং বেকারের দল দেখা দেয় নাই। যে জাতিভেদপ্রথা দ্বারা হিন্দুসমাজস্থ সকলের জীবনযাত্রা অনায়াসসাধ্য ছিল, যখন ইংরাজ বৃত্তিবিপর্য্যয় দ্বারা সে জাতিভেদের মূলে আঘাত করিয়াছেন এবং পাশ্চাত্যশিক্ষা আপামর বহুবিস্তৃত করিয়াছেন, তখন ঐ দুই রাক্ষসী আমাদিগকে জ্বালাইয়া পোড়াইয়া খাক করিবে।

খাদ্যসামগ্রীর দুর্মূল্যতা ইংরাজদিগের গাসছা। উহারা বাল্য-

দুর্মূল্যতা নিবারণ

তপালিত হয়। উহারা এদেশের
কাল হইতে দুর্মূল্যতার বুঝিতে পারিবেন না। দুর্মূল্যতা
পুরাণপদ্ধতির মহৎ গুণ হাদের ভাবনা কি? উহাদের সাম্রাজ্য
যতই কেন বৃদ্ধি পাউ উহারা যাইবেন, সেখানে উহারা ক্ষীরটুকু
পৃথিবীময় ব্যাপ্ত; ে ভারতবাসীর ভারত ব্যতীত অন্য গতি
ভোজন করিবেন।
নাই। দুর্মূল্য ত বাড়িবে, তাহাকে ঘরে বসিয়া মরিতে হইবে।

সচরাচর তাব তিনটী কারণ দেখান হয়।

(১) বাণিজ্যবশতঃ এদেশের গম চাউল বিদেশে রপ্তানি হইতেছে। যে স্থলে ভারতমাতা পূর্ব্বে নিজের সন্তানসন্ততিকে প্রতিপালন করিতেন, সেস্থলে আজকাল তাঁহাকে বিদেশের অনেক পামকেও প্রতিপালন করিতে হইতেছে; সুতরাং তাঁহার দরিদ্র বর্গ বিপন্ন হইয়া অনাহারে মরিতেছে।

(২) এখন লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। দেশে মেলেরিয়া, জ্বর, বসন্ত, ওলাউঠা, প্লেগ প্রভৃতির প্রকোপ থাকিলেও যুদ্ধ না থাকাতে লোকসংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছে।

(৩) জমির উর্ব্বরাশক্তি ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে।

ইংরাজদিগের আমলে দুর্মূল্যতা বাড়িবে বৈ কদাচ কমিবে না। রা বাণিজ্যপ্রিয়, তাঁহারা কদাচ অবাধ বাণিজ্য রহিত করিবেন দেশের গম চাউলের রপ্তানি বাড়িবে, কদাচ কমিবে না। ছিল, কি হইয়াছে, আবার কি হইতে চলিল। এখন সকলেই কলের রুধির পান করিতেছে। উকিল মোক্তার মক্কেলের রুধির পান করিতেছে, ফি বাড়াইতে পারিলেই বড় খুসী। ডাক্তার কবিরাজ রোগীর রুধির পান করিতেছেন; ফি বাড়াইতে পারিলেই বড় খুসী। ব্যবসাদার পণ্যদ্রব্যের মূল্য বাড়িলেই বড় খুসী। যখন দেশশুদ্ধ লোকের মতিগতি এইরূপ, তখন দুর্মূল্যতা কি প্রকারে কমিবে।

সংসারের নিয়ম এই, 'যথা রাজা, ... চালাইবেন, প্রজাবর্গও সেইরূপ চলিবে।' রাজা যেমন ... করিবেন না, দুগ্ধের দর ক্রমশঃ বাড়িবে এবং ... দুগ্ধাভাবে ভালরূপ প্রতিপালিত হইবে না। ... গম চাউলের বিদেশ রপ্তানি বন্ধ করিবেন না, উহাদের দর ক্র... বাড়িবে এবং অনেকে না খাইতে পাইয়া মারা যাইবে। এই ... দেশ কালে উজাড় হইবে।

কেহ কেহ বলেন, গ্রামে গ্রামে ধর্ম্মগোলা স্থাপন করিয়া বণিক সম্প্রদায়কে বয়কট করিলে দুর্মূল্যতা কিয়ৎপরিমাণে হ্রাস পাইতে পারে। কিন্তু যখন এতকাল পরাধীন থাকাতে আমাদের জাতীয়তা নষ্টপ্রায়, তখন ধর্ম্মগোলা স্থাপন করে কে? কেন কাজের মেও ধরিবে? যখন বণিকসম্প্রদায় গম চাউলের ... বাড়াইবেন, তখন গরীব চাষারা কি সে প্রলোভন ছাড়িতে পারিবেন? কে জাতভায়াদের খাওয়াইবার জন্য নিজের স্বার্থে আঘাত করিবেন? এই সব ভাবিয়া চিন্তিয়া অনেকে বলেন, গ্রামে গ্রা... বিড়... সংস্থাপন ইঁদুরের পরামর্শ মাত্র।

চিরদিনই ভারতে অনেকে বেকার বসিয়া থাকে ... প্রতিপালনের জন্য হিন্দুসমাজে একান্নের ব্যবস্থা স্মর... হইতে চলিয়া আসিতেছে। যখন সকল দ্রব্য সুলভ ... বিলাসিতা আদৌ সমাজে প্রবেশ করে নাই, তখন ... কিছুমাত্র কষ্ট ছিল না। আজকাল যেমন দুর্মূল্যত... হুহুশব্দে বাড়িতেছে, বিলাসিতা তেমনি অপরদিকে সমা... করিতেছে; এখন বেকারদের সমূহ কষ্ট উপস্থিত। এ বে... কি প্রকারে মিটিবে?

দেখ, ইংরাজ এদেশে স্বদেশের প্রথানুসারে জাতি-নি... আপামর পাশ্চাত্য শিক্ষা দিতেছেন এবং সকলকে ইচ্ছামত

রতে পারিব কি না, তাহাই সন্দেহের বিষয়। যতদিন আমরা াজরাজের অধীনস্থ হইয়া থাকিব, ততদিন তাঁহাদের রাজভক্ত া হইয়া নানা বিষয়ে তাঁহাদের নিকট সুশিক্ষা পাইয়া জাতীয় তি সাধনে একাগ্র হইব।

বহুপুণ্য ফলে

জন্মে নর এ ভারতে। কিন্তু চিরদিন
রাখিও মনে, বৎস। কর্ম্মগুণে যদি
নাহি পার উজ্জ্বলিতে মাতৃভূমিমুখ,
বৃথায় জনম তব। কি বলিব আর
ভারত সন্তান তুমি, আর্য্যবংশধর
ভুলিও না কোন দিন। করি আশীর্ব্বাদ
সভ্য হও, ধন্য হও, ভারতমাতার
হও উপযুক্ত সন্তান। স্বদেশের হিত
ধ্রুবতারাসম নিত্য রাখি লক্ষ্য পথে
হও, বৎস অগ্রসর, ভারত জননী
করিবেন শুভ তব আশীর্ব্বাদ দানে।

(যোগেন্দ্র নাথ)

ে ভারত মাতাকে তোমরা এতকাল মাতৃর্গারূপে পূজা করিয়া তেছ, সেই প্রতিমার গূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিয়া মা সরস্বতী ও মা বরপুত্র হইয়া তাঁহাকে জ্ঞানবিজ্ঞানে উদ্ভাসিত করিতে নদৌলতে ও সুখসমৃদ্ধিতে পূর্ণ করিতে সাধ্যমত চেষ্টা পাইবে। াহিনী চমু গঠন করিয়া দেবসেনানী কার্ত্তিকের ন্যায় অসাধারণ র্য্য দৃপ্ত হইয়া দুঃখিনী মাতার নয়নবারি নিবারণ করিবে ও থ উজ্জ্বল করিবে। ইহাই এখন আমাদের রাজনৈতিক ধ্রুবতারা।

যে ভারতমাতাকে তোমরা এতকাল কালিকা করিয়া আসিতেছ, সেই মা কালীকে চিরদিন প্রাণভরে ডাকিতে থাকিবে। তিনিই আমাদের সকল দুঃখ দূর ক

ওমা শ্যামা, জাগ, জাগ, জননি
তুমি না জাগালে মা কে আর জাগাবে
ভারতের ভাগ্যাকাশে উঠিছে দিনমণি,
দয়াময়ী নাম ধর, দয়া কি মা আছে তে
দয়া থাকিলে কি কাঁদে মাগো ত্রিশ কে

তৃতীয় ভাগ সম্পূর্ণ।